

বঙ্গলক্ষ্মী

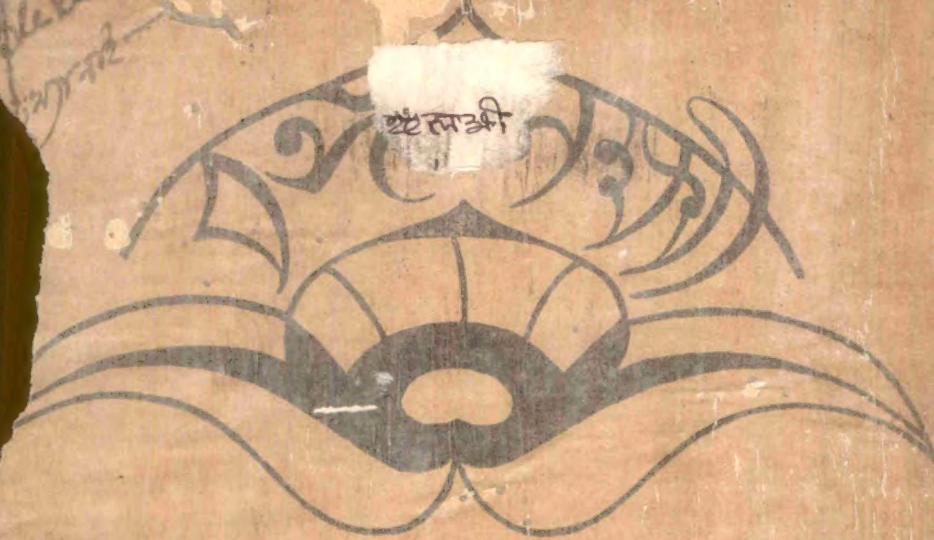


রামচন্দ্রের লকাবিজ্ঞাপ্তে সাগরতীরে শিব প্রতিষ্ঠা

—রামেশ্বরম

911154

৭৫৬-৩ ১২৬
C/K-H01826-5-p011154



চতুর্দশ বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

১ম সংখ্যা

স্বামী-স্ত্রী

শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক

হুকুম হয়েছে, নাদি সিংহকে
স্বীয় পরিবার মাঝ,
আপন হস্তে ছুরিকা আঘাতে
মরিতে হইবে আজ।

নতবা দারুণ যন্ত্রণা দিয়া
প্রকাশ্য রাজ পথে
শাখিত হইবে হত্যাকাণ্ড
রাজার আদেশ মতে।
শুশ্রূষিত সবে, পত্নীর তাঁর
মুখেতে সরেনা বাণী,
শাখিতে লাগিল পতিপ্রাণা সেই
সোনার প্রতিমাখানি।

সহসা ভাঙিল নির্মল জ্যোতি,
শাখিত ছুরিকা ধরি'
আমূল তাহার নিজের বক্ষে
বসাইল সুন্দরী!
সতী বলে ধীরে, এসো প্রিয়ভূম,
কিছুই নাহিক ভয়
এই ত দেখ না, মরণ মোটেই
নাহে 'ত' কষ্ট কর।

দুটি পায়ে রাশিকৃত ধূলোমাখা, দূর-পথে হেঁটে-আমা
পথিক নদীর তীরে পাছের তলে ফাঁকা যায়গা দেখে একটু
বসলেন; গায়ে মোটা চাদর জড়ানো খাট বন্ধরের ধুতি পরা
সঙ্গে একটু চটের ব্যাগ, তারই মধ্যে তাঁর পথচলার বা-কিছু
স্বল্প। গ্রামখানা তাঁর চেনা নয়, এদিক-ওদিক-চাওয়া-
চোখের চাওনি দেখে বোঝা যায়। বাঁকাভরা পাকা
কলার কাঁদি নিয়ে চাষী যাচ্ছে হাটে বেচতে, পথিকের ক্ষুধার
উজ্জেক, হেঁকে বললেন, ওহে চাষীভারা, গোটা দুই কলা
বেচে যাও এদিকে। চাষী থেমে বলে,—এক কাঁদি নাও
তো বেচি, নতুবা আমার বড় বন্ধের জমিদার বাড়ী—নূতন
খোকার ভুজুনো—একশ কাঁদি কলা গেলে কিনে নেবে
এখন,—আমার তো মোটে ছ'কাঁদি। পৌছতে না পৌছতে
লুফে নেবে।

পথিক বলল,—দাও আমাকে দুটো, নাও পয়সা, আজ
ভোমার ভাগ্যে কিছু না কিছু বাড়তি লাভ হবেই বলে
দিলুম। সাতপাঁচ ভেবে চাষী মোটা দুটো কলা বেছে দিল
পথিকের হাতে, বলল, পয়সা এখন থাক—কেরার পথে নিয়ে
যাব। বলে চাষী হনুহনিয়ে সামনের পথ ধরে সোজা গেল
চলে।

(২)

জমিদারবাড়ী বেজায় ঘটা—বান্ধনা বাস্তির রোল
উঠেছে পাড়া জাগিয়ে। যে আসে, ছোট গোছের পিতলের
পেটা গামলায় তেল হলুদ, নূতন গামছা, কৌচড়ভরা চিড়ে
মুড়কী, চারটি করে নারকেলের ছাপা না নিয়ে ফেরে না।
চায়ীর ছেলে ভিথুর ভাগ্যেও মিলল জমিদারবাড়ীর বিদায়,
—পেয়ে আফ্লাদে নে আটখানা। মনে ভাবল, পথের সেই
লোকটি বলেছিল তো ঠিক! আজ আমার ভাগ্যে লাভের
গুণ্ডা যোলআনা, শুধু কলাবেচা নয়।

কেরার পথে পথিকের সঙ্গে ভিথু চায়ীর দেখা।—

বগবৎ ঠাকুর, আপনি বুঝি গণংকার! আমার ভাগ্য

ঠিকঠাক বলে দিলেন কেমন করে। বলে
খুসীভরা মন নিয়ে লুটিয়ে পড়ল পথিকের প

(৩)

বেলা দশটা, পথিক নাইতে নামলেন ন
নদীর জল কুলকুল স্নেহে বয়ে চলেছে পূব
কে জানে কোথা তার উৎপত্তি, কোথায় গি
জলে নেমে পথিক ডুব দিলেন অনেকবার
চেয়ে দেখেন জনদশেক লোক পরিবেষ্টিত
আসছেন নদীতে স্নান করতে; ফিরে গিয়ে
হোমংজ্ঞ সমাপন করে ছেলের মুখে অন্ন দেওয়া

নিটোল দেহ, লম্বাগোছের পৈতৃধারী ব্রাহ্মণকে
স্নান করতে দেখে জমিদার ভাবলেন, ডেকে নি
দিনে পথিক ব্রাহ্মণকে, ভোজন করিয়ে বিদায় দক্ষিণ
ভাল করে, যখন পথের মাঝে পাওয়া গেল পথিক
কাছে গিয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আজ আমার
ব্রাহ্মণ ভোজন,—আপনি যদি দয়া করে দানের ঘরে
করে কৃতার্থ করেন। গ্রাম থেকে অল্পত ব্রাহ্মণ
দিনে যেতে দিতে পারি না।

পথিক স্থিরদৃষ্টিতে জমিদারের দিকে চেয়ে
কিম্বৎক্ষণ পরে ভেবে বললেন,—আপনার ভা
ঘটবে অবিলম্বে; আজকের ভোজে আমার নিমন্ত্রণ

জমিদার অবাক হয়ে ভয়চকিত দৃষ্টিতে বল
বলছেন ব্রাহ্মণ?—আপনি কি ভাগ্যফল গুণতে
আমার ভাগ্যে কি রকম অনিষ্টের আশঙ্কা করেন?

—বিস্তনাশ, মহাত্রাস, বিদ্যাতার লিখন,
পাববেন না—

ভয়ে জমিদার হতবুদ্ধি। সঙ্গে পাইক দুজনকে ব
ধর ব্রাহ্মণকে, নিয়ে চল আমার বাড়ী। জন্মাবদি
কোন পাপ করি নাই, কোন অমঙ্গল ঘটাই না
ধানে—আমার ভাগ্যে দারুণ বিপত্তি। অসম্ভব ক
পথিব—একের পাপপুণ্যে পরিবারের, সমাজের

হিত, কল্যাণ অকল্যাণের নির্ভর নয়। একের পাপে অজ্ঞের সর্বনাশ হতেও পারে। ধর্মরাজের স্বপ্ন বিচারি, জ্ঞানের তুলনাগুণের পরিমাপ, বোঝে সাধ্য কার? দেশ কালে মানুষ সকলের সঙ্গে সকলে জড়িত। একের পাপপুণ্যের ভাগ বাঁটোয়ারা হচ্ছে সকলের মধ্যে। দেখুন, আপনার পরিবারের কারো পাপের ফল আপনার মস্তকে পড়ে কি না! চলুন, আমি স্বেচ্ছায় আপনার বাড়ী যাই, ধর্মধর্মির প্রয়োজন নাই।

(৪)

উদ্ভাসিত চিত্তে জমিদার নদীতে স্নান শেষে পথিককে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর দিকে চললেন। ঘরের কাছে পৌঁছে দেখেন লাল পাগড়ীধারী আদালতের পেয়াদার হুয়ার ঘেরা। ক্রোকী পরোয়ানা বেরিয়েছে জমিদারের নামে—বাপের গোপন দেনা পঁচলীক—জমিদারী ক্রোক হয়েছে। জমিদার কপদিকশূন্য, পথে বসেছেন। ব্যাকুল দৃষ্টিতে পথিক-ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে বললেন।

—এমন স্বপ্ন গণনা শক্তি আপনার জন্মাল কি করে আপনি মানুষ না দেব অংশের কোন অবতার?

—আমি মানুষ, ছোট থেকে জ্যোতিষ শিখেছিলুম বটে কিন্তু সে বিদ্যা কাজে লাগাই নাই কোন দিন। আপনার মস্তকে সেটি থেটে গেল। আমি ব্যথিত হয়েছি, আমার বিচার ফল আপনার দুর্ভাগ্যকে দেখিয়ে দিল বলে।

—দুর্ভাগ্যের অতলে তলিয়ে গেছি ঠাকুর এখন উপায়?

—পুণ্য ককন—অজস্র পুণ্য ককন। সাধ্যমত কল্যাণ সাধুন আশ্রয়পর সকলের। গ্রহবৈষ্ণবা কেটে গিয়ে পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হবেন সোভাগ্যে।

—পথ বলে দিন পথিকঠাকুর পুণ্য অর্জনের।

—সবার স্বপ্নে স্বপ্ন কিনে নিন স্বত পাবেন অশ্বের গুণে।

—মাথাটা রাখি কোথায়?

—আকাশ তলে, জলে স্থলে।

—ভর করি কিসে?

—আপনাতে।

হঠযোগ বিধি

ভুক্তদাসন

হলানস বর্ণনায় আমরা মেরুদণ্ডের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। ভুক্তদাসনেরও মেরুদণ্ডের গতি ও স্থিতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক আছে। মেরুদণ্ডের বিষয়ে কথা বলা দরকার যে পুরুষ ও রমণীর এই অস্থিস্থাপনার বৈকল্য এক নয়। উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের সঙ্গে ইংরাজি অক্ষর S-এর তুলনা করা চলে। রমণীর কোমরের অংশে (lumbar region) মেরুদণ্ডের বক্রতা পুরুষের চেয়ে বেশী। বাঙালীর বিষয়ে আমরা যে তাঁদের এই অংশের বক্রতা স্বাভাবিক বলায় হাকিয়ে গেছি। তার কারণ একাধিক। আমাদের মেয়েদের শিক্ষাকালে দেহের ভঙ্গিমা শেখার আবস্থা থাকলে এ দোষ বহুলভাবে নিবারিত হতে পারত, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে এই বিশেষ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

কোন বিদ্যালয়েই নেই। মেরুদণ্ডের এই উল্লম্বিত বক্রতার মাহুষের মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু কোন কালেই এই দোষহীন রমণীর দেহকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য অথবা জীবনী-শক্তির অধিকার দেয় না।

অবস্থান্তরে এই বক্রতা আবার বৃদ্ধি পায়, সে কথা আমার পাঠিকাবর্গকে বিশেষ করে জানানো উচিত। যে অবস্থা ওপরে বর্ণনা করা গেল তা মেয়েদের জীবনের সাধারণ অবস্থা। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দেহের ভার উন্নতিশীল ভাবে বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক কথা, তাতে যেমন দেহের ভারকেন্দ্রের পরিবর্তন হয় তেমনি কোমরের মেরুদণ্ডের ওপর অস্বাভাবিক ভার পড়ে তার বক্রতাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শুধু এই কথাই নয়, নিম্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল এই বিশেষ অবস্থার জন্য বাধা পায় বলে অনেক রমণী অস্তঃসত্ত্বাবস্থায় ক্ষীণ পিরাবোগে (varicose veins)

আক্রান্ত হন। এ অবস্থা সকল মাগেরই হতে পারে, কেউই এ ভয় থেকে মুক্ত নন। তবে স্থিতির কথা এই যে সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর মেরুদণ্ডের বক্রতা ও ক্ষীত শিরাগুলি ক্রমশঃ তাদের স্বাভাবিক অবস্থা কিরে পায়। কিন্তু যে অবস্থায় প্রসূতি দুর্বল থেকে যান, যেখানে প্রসূতি পরিচর্যা যথেষ্ট হয় না, কিংবা যেখানে নবপ্রসূত সন্তানকে যথেষ্ট বিশ্রাম না লাভ করে গৃহের কাজকর্মে শোগ দিতে হয়, ক্ষীতশিরারোগ ও মেরুদণ্ডের অত্যন্ত উচ্চারিত বক্রতা তাঁর জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকে। ক্ষীতশিরারোগে আধুনিক চিকিৎসা তা অস্ত্র দ্বারা, কিন্তু এই অস্ত্র-চিকিৎসাও যে এই রোগ নিমূল করে এমন কোন কথা নেই।



ভুজঙ্গাসন

প্রসঙ্গক্রমে আমরা যে কালে এই আলোচনায় এসে পড়েছি, এ কথা বলে রাখা ভাল যে যোগশাস্ত্রকারেরা ক্ষীত শিরাগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় কিরিয়ে দেবার জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন তা অপূর্ণ। এই ব্যবস্থার নাম সর্বাঙ্গাসন, যা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। পূর্ব উপদেশ মত দৈনিক কিছুকাল সর্বাঙ্গাসন অভ্যাস করলে ক্ষীতশিরার ত বটেই অগাধ অনেক দেহযন্ত্রের বিকৃতি ও আরোগ্যের বিশেষ করে সেই সকল বিকৃতি যার সঙ্গে পুত্র ভূমিষ্ট হবার যোগ আছে। সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা কেবল পত্রিকায় করা সম্ভব নয়। যারা ইচ্ছা করেন তাঁরা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে জানতে পারেন।

মেরুদণ্ডের উচ্চারিত বক্রতার ঞ্চুধ দিয়ে বা অস্ত্র দিয়ে কোন চিকিৎসা নেই। যা আছে তা আরোগ্যমূলক

ব্যায়াম সহকারী এবং তার মধ্যে হঠযোগ-বিদ্যি প্রধান। ভুজঙ্গাসন সেই দ্বারার একটি বিশিষ্ট ব্যায়াম।

ভুজঙ্গাসন আরম্ভ করা অত্যন্ত সহজ কথা। যে কোন বয়সের নারী ও পুরুষ তা করতে পারেন।

ভুজঙ্গাসন-বিধি

কোন সমতল স্থানে—শয্যা দ্বিপদ হতে পারে, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। পিঠ দুটি একত্রে থাকবে এবং পায়ে পাতা ওপর দিকে রাখা দরকার। কপাল শয্যা লেগে থাকবে। এই বার করপন্নব দুটো আপনার কাঁধের কাছাকাছি শয্যার ওপর রাখুন; কহুই দুটি পিঠের দিকে উঠে থাকবে। ভুজঙ্গাসনের এই প্রাথমিক অবস্থা।

আস্তে আস্তে হাতগ্ৰহণ করে মাথা ওপর দিকে যতদূর সম্ভব তুলুন। যেই মনে হবে যে ঘাড়ের পেশী ও মেরুদণ্ড আকৃষ্ট হতে আরম্ভ হয়েছে হাতের কোন সাহায্য নিয়ে, অর্থাৎ হাতের ওপর ভর না দিয়ে, কাঁধ দুটি থেকে ওপরে তুলুন ও যতদূর সম্ভব দেহের উর্দ্ধভাগটিকে ওপর দিকে তুলুন। এমন একটা সময় তারপর যখন হাতের সাহায্য ছাড়িয়ে দেহ আর তোলা যাবে না, সময়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে দেহ আরো ওপরে তুলুন। এই অবস্থার পূর্বে পুরোবাহ ও বাহ ত্রিকোণাকারে বাঁকা ছিল। দেহ উর্দ্ধে উঠলেও বাহ কতকটা সোজা হবে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সোজা হবে না, কহুই খানিকটা বাঁকি রাখতেই হবে। যখন আপনি এই অবস্থায় এসে পড়েছেন তখন আপনার মেরুদণ্ড ঘাড় থেকে নিতম পর্যন্ত ধূকের

আকার ধারণ করেছে। ভুজঙ্গাসনের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ। আননের নাম ভুজঙ্গ এই কারণে যে দেহের এই পরিস্থিতির সঙ্গে চক্রধারী কাল সাপের সাদৃশ্য আছে, অথবা চক্রধারী সর্পের দৈহিক ভঙ্গীর অনুকরণে এই আগনের সৃষ্টি হয়েছে। আপনার দেহ যখন এই বিশিষ্ট অবস্থায় অবস্থিত, মেরুদণ্ডটির স্বাভাবিক বক্রতার পরিধির ভিত্তিতে সম্পূর্ণভাবে আকৃতিত। ভুজঙ্গাসন অভ্যাসকালে ক্রমশঃ আপনাকে বোধ হবে যে মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি একের পর একটি করে আকৃতিত হচ্ছে; এ অনুভূতি হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আসনটি প্রথমতঃ আট সেকেন্ড কাল রক্ষা করুন। তারপর আন্তে আন্তে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসুন। এই প্রত্যাবর্তনে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আকৃতিত যেমন ঘাড়ের দিক থেকে আরম্ভ হয়েছিল, সম্প্রসারণের ক্রিয়া তেমনি অপরপ্রান্ত অর্থাৎ নিত্যস্থিত মেরুদণ্ড থেকে আরম্ভ হবে। প্রথমে সেই প্রান্তটা শিথিল করুন, তারপর সেই শিথিলতা একটীর পর একটি অস্থি থেকে ঘাড়ের দিকে প্রসারিত হোক। হাত দুইটি যখন দেহের ভারমুক্ত হবে তখন দেহের উপরার্দ্ধ ধীরে ধীরে হাতের কোন সাহায্য না নিয়ে নামান। অবশেষে ঘাড় নীচু করে কপাল শব্যায় রাখুন।

চারবার এবং প্রত্যেকবার আট সেকেন্ড করে ভুজঙ্গাসন করুন। যখন অভ্যাস সরল হয়ে যাবে, উন্নতিশীলভাবে

প্রত্যেক ব্যায়ামের সময় বুদ্ধি করুন। প্রত্যেকবার তিন মিনিট পর্যন্ত সময়ের শেষ সীমা।

ভুজঙ্গাসনের উপকার কি?

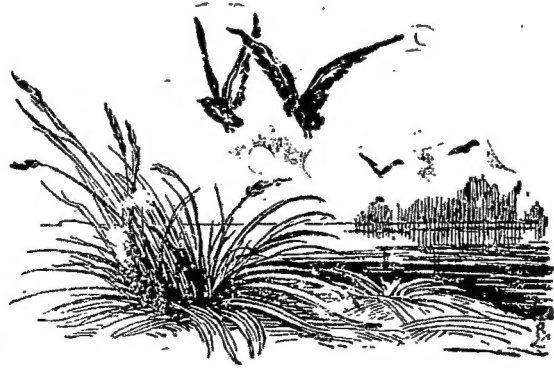
পিঠের পেশীগুলি ভুজঙ্গাসনের সময় একবার আকৃতিত ও সম্প্রসারিত হয় ও সে গুলি স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়ে ওঠে। মেরুদণ্ডটির স্থিতিস্থাপকতাও তদ্বারা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এ ক্রিয়ার সময় পিঠে যথেষ্ট রক্ত চলাচল হয়ে থাকে বা স্বাভাবিক অবস্থায় বড় একটা হয় না।

যদি অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য পিঠের পেশীগুলিতে বেদনা হয়, ভুজঙ্গাসনে সে বেদনা দূরীভূত হয়।

পিঠের পেশী ও তন্তুগুলির ওপর বিশিষ্ট ক্রিয়ার জন্য যদি মেরুদণ্ডের কিছু বক্রতা থাকে সে বক্রতা ক্রমশঃ নিবারিত হয়।

পিঠে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মেরুদণ্ডস্থিত বাতনাড়ীগুলি সক্রিয় ও স্বাস্থ্য সম্পন্ন হয়ে ওঠে, ভুজঙ্গাসনের অভ্যাসে পেটের পেশীগুলিও মজবুত হয়।

যাদের খাবার অব্যবহিত পরে পেট ফাঁপে তারা সে সময়ে ভুজঙ্গাসন অভ্যাস করলে পেট ফাঁপা নিবারিত হয়। হলাসন ও ভুজঙ্গাসন এক সঙ্গে অভ্যাস করলে হলাসনের দেহের ওপর যা ক্রিয়া সেই ক্রিয়াগুলি বৃদ্ধি পায় ও দেহকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে।



ভাগ্যহীনা

শ্রীহেমলতা দেবী

সহরের ঐ প্রান্তভাগে অভাগ্য পাড়ায়
ভাগ্যহীনীর ভবনখানি,—অভুক্ত তাড়ায়
সেই ভবনের দ্বারী—বলে “ভাগো ভুখালোক,
নেহি মিলেগা রদ্বি কোড়ি—রত্নি অন্নভোগ;
লেনেকো হাম রই হঁসিয়ার, দেনেকো নেই বাৎ,
হঠো ইধার, হঠো উধার, ঠারো জি কৈ মাৎ।”
হাজার মাহুষ ছুয়ার হোতে ফিরে ফিরে যায়,
ভাগ্যহীনীর অভাগ্য চোখ কারে না তাকায়।
পথের কুকুর আশে পাশে ছুয়ার ঘেসে থাকে
এঁটো পাতের পাতা চেটে ভেউ-ভেউইয়ে ডাকে।
কাকে-চিলে ঝটাপটি করে চিলে ছাদে,
উঠান খুঁটে পায়না কণা, চুটকি চড়াই কাদে।
ক্রমে তাদের চলাফেরা হয়ে এল বন্ধ
একটি প্রাণীর মুখ দেখে না চক্ষু থাকতে অন্ধ।
হাত দুখানি শুকায়ে কাঠ কাজে না লেগে
পা দুখানি পাথর পথের পরশ না মেগে।
অভাগ্য তার অন্ধ ব্যোপে আনে জড়ত্ব
প্রাণে কাঁপে প্রাণপুতলি,—মনে মূঢ়ত্ব।

ছুয়ার দিয়ে দিনে শুয়ে দেখলো দুঃস্বপন,
আগুন—আগুন—চারদিকে তার আগুন আফালন,
লকলকিয়ে লেহায় আগুন, ধবধবকিয়ে জলে
ভাগ্যহীনীর ভবনখানি বেডল দাবানলে।
ঐরে আগুন, ঐরে আগুন—আসছে আগুন ছুটে,
তন্দ্রাঘোর ভাগ্যহীনা চীৎকারিয়া উঠে।
গণ্যকারের গণনা আর জ্যোতিষীদের তথ্য
রাতের স্বপন যেমন তেমন, দিনের স্বপন সত্য!
যোজন দূরে জলন পাঁহাড় আগুন জলা মুখ
গলা আগুন বলক বলক পড়ছে বেয়ে বুক।
ঘূর্ণী হাওয়া হঠাৎ লেগে ছুটলো আগুন বেগে,
দন হতে ঐ বনান্তরে গেল আগুন লেগে।
ভাগ্যহীনীর দ্বারে আগুন পৌঁছাল ঐ এসে
জলছে ভবন, দিনের স্বপন সত্য হোল শেষে!
দাউ দাউ দাউ আগুন জলে, হাউ হাউ হাউ রব,
আগুন জলা, বাতাস চলা, পুড়িয়ে ফেলা সব।
মুখে আগুন, বকে আগুন, গোখে আগুন ঠ্যাকে,
চক্ষু খুলে ভাগ্যহীনা শুধুই আগুন তাখে।

আগুনঘেরা ভবনশিরে শুল্লো আকাশবাণী,
অভাগ্য তোর দন্ধ হোল—ভাগ্য দিল আনি
এই আগুনের উর্দ্ধ শিখা, কাটল জড়ের বাধা;
ভাগ্যহীনায় কোল দিল সে, ঘুচলো সকল আধা
জড়িয়ে জড়ের জঠরজালে ছিল যে আহম
আগুন বীজে জন্ম নিল—ভাগ্য স্বপ্রদম।

কলিকাতার কোলাহল হইতে বহুদূরে আমার এই নিভৃত পল্লীর স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া মনে হয় যেন আধুনিক সভ্যতার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। এখানে থিয়েটার—সিনেমা নাই, অলিতে গলিতে চায়ের দোকান নাই এবং কোলাহল ও ব্যস্ততা নাই। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নাই—কিন্তু তথাপি মনে হয় যেন পল্লী-জীবনের কোথায় একটা বিরক্তিকর নিরবচ্ছিন্ন বৈচিত্র্য-হীনতা আছে। এখানে বসিয়া মনে হয়—আমরা যে সময়ে বাঁচিয়া আছি ইহা কি সেই আলোক-প্রাপ্ত বিংশ-শতাব্দী? বিংশ-শতাব্দী তাহার বহু দোষ-ত্রুট সত্ত্বেও যে মানুষের জীবনকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একজন বিখ্যাত লেখকের ভাষায় বলিতে গেলে “It has contributed a Car to drive, a Radio to hear a distant song, Aeroplanes and Trains for our quick journey and, above all, made Electricity our constant servant.” পল্লী-জীবনে এইগুলির অভাবের জন্ত দুঃখ করিবার কারণ নাই; ইহাদের স্ববিধা এবং অস্ববিধা উভয়ই আছে। কিন্তু পল্লী-জীবনের সর্বাঙ্গিক পরিতাপের বিষয় এই যে বিংশ-শতাব্দীর ক্রম-বিবর্তনশীল ভাব-ধারার সহিত ইহার কোনই সংস্পর্শ নাই।

বর্তমান যুগের সহিত আমাদের এই নিরক্ষর ও অর্ধ-শিক্ষিত পল্লীবাসীদের কোনই সংস্রব নাই। মন্দাক্রান্তা ছন্দের মন্থর গতির মত ইহাদের উৎসাহহীন বৈচিত্র্যহীন জীবন চলিতেছে। ইহাদের নিকট ভারতবর্ষের পরাধীনতা ও স্বাধীনতালাভ সমান; মহাত্মা গান্ধী ইহাদের নিকট দেশের অর্থনৈতিক দুর্বস্থার জন্ত দায়ী; রবীন্দ্রনাথের নাম ইহারা অনেকেই জানে না; ‘পথের পাঁচালী’র মত অপূর্ণ উপন্যাসের নাম বা ‘কাশবনের কন্যা’র নাম অপূর্ণ কাব্যের নাম ইহাদের নিকট উচ্চারণ করিলে

ইহারা দাঁত রায়েব পাঁচালীর কথা বলিয়া অশ্রুপাত করে এবং ‘তেমনটি আর হয় না’ বলিয়া বিজ্ঞের মত মন্তব্য প্রকাশ করে।

আমাদের এই পল্লীতে দৈনিক সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষেধ! কেবলমাত্র একখানি পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে নানা-প্রকার অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ এবং বটতলার রোমাঞ্চকর উপ-ত্বাসের বিজ্ঞাপন বহন করিয়া ছিদাম মূদীর দোকানে মশলা বাধিবার জন্ত দখীতির মত আত্মদান করিতে আসে! এখানে পুস্তক পাইবার মোটেই উপায় নাই। সাহিত্যের নানাবিধ তর্ক ও সমস্যা লইয়া আমাদের এই “তৈল ঢালা স্বিঞ্চ তলু” এবং “নিদ্রারসে ভরা” নিরীহ পল্লীবাসীদের স্থানান্তর ব্যাঘাত হয় না! আজও অনেক গ্রাম্য বৃদ্ধ (উদয়নকথাকোবিদ নহে!) দেখিতে পাই যাঁহারা পঞ্জিকার মালমার বিজ্ঞাপন পড়িয়া সাহিত্য-রসের দুখা মিটায়! প্রসঙ্গক্রমে একবার আমাদের পাড়ার একজন অর্ধশিক্ষিত (পৌণে শিক্ষিত আখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে!) ভদ্রলোকের নিকট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলাম। ভদ্র-লোক (?) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শরৎচন্দ্র কোনও হাকিমের নাম কিনা এবং তিনি কত ‘ব্যাতন’ পান। প্রশ্ন শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

এই সব সরল প্রশ্ন (ইহারা অনেক সময় কুটনীতিতে তথাকথিত ‘সহরে’ মানুষকেও ছাড়াইয়া যায়।) পল্লী-বাসীদিগকে ইহাদের মূঢ়তা ও অজ্ঞতাসত্ত্বেও আমি ভাল-বাসি। ইহাদিগকে গতানুগতিক অন্ধ সংস্কার হইতে মুক্ত করা কত দুঃস্বপ্ন তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ জানে না। কলিকাতায় চায়ের দোকানে পাখার তলে বসিয়া পল্লীসংস্কারের স্বপ্ন দেখা খুব সহজ, কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই সহজ নহে।

জীবনকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারা একটা

আর্ট। ইহা সব সময় বায়সাধ্য নয়; ইচ্ছা ও উৎসাহের অভাবেই মানুষ অনেক সময় কুৎসিত জীবন যাপন করে। পল্লীর সম্বন্ধে এ কথা রীতিমত খাটে। পল্লী-বাসীরা অধিকাংশক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়া বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করিয়া থাকে। কোন প্রকারে উদরপূর্তি করিয়া বিপ্রহরে নিদ্রা দিতে পারিলেই ইহারা মনে করে যে ইহাজীবনে আর কিছুই করিবার নাই। ইহাদের আলাপ ও আলোচনা গৃহস্থালীকে কেন্দ্র করিয়া চলিতে থাকে। এই ক্ষুদ্র পাখী-ডাকা ছায়া-ঢাকা গ্রামস্থানির বাহিরে যে বিশাল জগৎ ভাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য লইয়া পড়িয়া

আছে—সে সংবাদ ইহারা রাখে না—ইহারা শুধু জামে-রাধার গরে খাওয়া এবং রাধা।”

পল্লী-জীবন সম্বন্ধে আমার যাহা অভিজ্ঞতা তাহা লিখলাম; কবিত্বের উচ্ছ্বাসে “Sweet Auburn” বলিয়া অশ্রুপাত করি নাই—যাহা দোখযাছি তাহাই বলিতেছি। দুঃখ হয় যে পল্লীগুলি এইরূপ নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু জীবনকে স্বন্দর, মধুর, শান্ত ও উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারিলে পল্লীজীবন অত্যন্ত আনন্দময় হইয়া উঠে।

মাধুকরী

ফুলের মধু ভিক্ষা করে ফুলের দ্বারে মধুকর,
ফুলের ফসল তাহার কাছে চির-মধুর-তৃপ্তিকর!
জানে না সে মধুর কিবা, ভিক্ষা হ'ল ভিক্ষা তা'র,
যেচে যেচে পূর্ণ করে মধুচক্র আপন'র।
এ নহে ত মাধুকরী, মাধুর্যা তা'র নাই কোথাও,
কেবল সে কয়—“গাই তব জয়, ভিক্ষা আমায়

দাও গো দাও।

মধুপুরের আঁট নায়িকা কর্তৃক বটে মাধুকরী,
মধুর রসের প্রতীক হ'য়ে চাইত তা'রা এই মাধুরী।
দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য-ভাব মান্‌ল হেথায় পরাজয়,
শাস্ত এই মধুর রসই ঘুচায় জরা, মরণ-ভয়।

শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী

উদর পূরণ তরে ভিক্ষা, সে ত শুধুই অ-মাধুরী,
গুরুসেবা, বিশ্ব-সেবায় ভিক্ষা চাওয়াই মাধুকরী।
এমন চাওয়া চাইতে পারে ত্যাগীই ত্যাগের মহিমায়,
নইলে মাধুকরী-বৃত্তি ভাসায় ভোবায় দো-টানায়।
সিন্ধু-সলিল কর্ণিরবি মেঘের গায়ে ঝরায় জল,
সে জলপানে বহুধরা দিচ্ছে নানা ফসল ফল।
কর্ষণেতে মধু ক্ষরে, বর্ষণে তা'র বিশ্বে শিব,
এমন মাধুকরীর তরে বিশ্বে বাঁচে বিশ্ব-জীব।
এই মাধুরীর মাধুকরী জুটা'ল আজ মধু যা,
শত্রু-মিত্র যে যেখানে, তা'দের সেবায় দিলাম তা'।

(উদ্ধৃত)

একজিবিসন

শ্রীমুখাকান্ত রায়চৌধুরী

আজকাল চারিদিকে পড়েছে একজিবিসনের তাগিদ। সকলেই চায় নিজেকে সাক্ষর চোখের সামনে একজিবিসনের সামগ্রী করতে। এটা হোলো চলতি হাওয়া। হাওয়ার টানে ভেঙে যাচ্ছে পর্দা। যে রূপ ছিল পর্দার আড়ালে সে বেরিয়েছে বাইরে। অন্যর মহলের পাঠ যাচ্ছে উঠে। ঘোমটা যাচ্ছে রোজ খসে' তাই গুঠনের রেওয়াজ হোলো লোপ। কিন্তু সব কিছুকেই তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেওয়া কেই কি মুক্তিমাগের সাধনা বলে গণ্য করব, এই প্রশ্নটাও আজ অনেকের মনে জেগেছে। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি এবং বন্ধনের, আত্ম প্রকাশ এবং আত্ম গোপনের দোরোথ নিয়ম অহরহ কাজ করচে। এই নিয়মের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। একজিবিসনের যুগে বাস করে আমরা হয়েছি পরের রুচির মুখাপেক্ষী। এই ব্যাপারেও দাস্তভাবের বন্ধনকে দৃঢ় করা হচ্ছে। আসল মুক্তি যেনেছে হার এই একজিবিসনী যুগে। যে একজিবিসন করে সে লোকের সামনে থলে ধরে এমন সব বিষয় যা বহু লোকে চায়, আর এমন বিষয়ও থলে ধরে, যা লোকে জানত না কিন্তু দেখবার পর তার প্রতি হয় আকৃষ্ট। অর্থাৎ এর দ্বারা নিজের রুচির দিকে টেনে আনা হচ্ছে পরের রুচিকে, এবং পরের রুচির কাছে নিজেকে করা হচ্ছে বিক্রী। এই যে একটা একজিবিসনী নীতি এটা কি মানুষের মনুষ্যত্ব চর্চার পক্ষে সব দিক দিয়েই সহায়ক?

আব্রু রক্ষা করার কি সত্যি আর প্রয়োজন নেই? সবই কি আত্মপ্রকাশের উদ্দামতায় দেবো হাটের বস্ত্র করে? নিজেকে কি কোনো জায়গায় নিজের একান্তে বসে গ্রহণ করব না? আমার নগ্নতা আমার অসংযম, আমার দুর্বলতা সবই কি দেব জনসাধারণের চলতি রুচির বেদীতলে উদ্ঘাটন করে? এই রকমে নিজেকে ক্রমাগত উদ্ঘাটন করাই কি জীবন ধারণের পক্ষে

শ্রেয়? প্রথমেরই বলেছি, আত্ম প্রকাশ করাও মানুষের প্রকৃতি। কিন্তু কি প্রকাশ করার সাধনাকে মানুষ মানা বলে গণ্য করেছে? যা মহৎ, যা সুন্দর, যা কল্যাণকর তাই প্রকাশ করাই সাধনা, না, যা সহজে, বিনা ক্লেশে প্রকাশ করা যায় তাই সাধনা? ভালো মন্দের খিচুড়ীর ভিতর থেকে ক্রমাগত ভালোই উজ্জল কোরে প্রকাশ করাই কি সত্যিকার সাধনা নয়।

মুখের কালো রঙকে পাউডার মেখে রাখি তেঁক, আর ঠোঁট করি লালরঙে লাল, দেহের নগ্নতাকে ঢাকি বস্ত্র দিয়ে, বাড়ীর আবর্জনাকে, নোঙরামীকে দূরে দেই ফেলে অস্তাকুঁড়ে—ঘরকে করি পরিষ্কার, নিজের কাপড়কে করি নির্মাল 'নির্মলীন' সাবান দিয়ে। যদি বাইরেই এই সব অবাঞ্ছনীয়তা একজিবিসনের সামগ্রী না হয় এবং বাইরের এই সব অবাঞ্ছনীয়তার লোপসাধনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি, তবে ভিতরেও যে সব অবাঞ্ছনীয়তা রয়েছে আমাদের চরিত্রে তার প্রতীকারের কি সত্যি কোনো প্রয়োজন নেই? তারা কি কেবলি কবে নিজেকে প্রকাশ, শুধু প্রকাশের মত্ততায়?

(২)

লজ্জার বাঁধনে যারা পড়েনি বাঁধা, তারা হয়েছে নিলজ্জা। নিলজ্জতার চর্চা যেন বড় হয়ে উঠেছে এই প্রগতির যুগে। পুরুষ সেই ভাবচর্চায় হারিয়েছে তার পৌরুষ, মেয়েরা হারাচ্ছে নারীত্ব—যে নারীত্বের মধ্যে রয়েছে পত্নীত্ব, মাতৃত্ব, ভগ্নীত্ব, আরো সব এমন সুন্দর ভাব যে ভাবের কাছে পুরুষ পূজারীর মত এসে ভেঁট দেয় তার মনুষ্যত্ব, তার পৌরুষ। নিলজ্জতার চর্চায় পুরুষ দিনের পর দিন হারাতে বসেছে তার পৌরুষ। তাই আজ পুরুষ সব চেয়ে বঞ্চিত বেশী। আজ তার অন্তরের প্রার্থনায় তাই

ফুটছে দৈত্বে,—তার বিরাট অন্তরের প্রার্থনাপাত্রে
অমৃতের বদলে পড়ছে এসে জ্বরা। তাই সে আজ
মৃত্যুঞ্জয়ী না হয়ে হচ্ছে মৃত্যুপথগামী। নারী তার রূপ,
যৌবন, লাবণ্য, মর্যাদা নিয়ে, পুরুষের কাছে ছিল ভুলভিতায়
ঘেরা পরম বাঞ্ছনীয়। তাই পুরুষ তাকে ভুলভ সাধনার
সামগ্রী মনে করে, কত কবিতা কত গান করেছে
রচনা। আজ নারীকে পাবার জন্তে পুরুষের অন্তরে
নিবেছে পূজার প্রদীপ,—জ্বলেছে তার বদলে কামনার
উন্নত শত বর্জিকা। পূজাও তার একান্তের নির্জনতা
ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে উৎসব-অঙ্গনে, একেবারে হাটের
কোলাহলে, রূপ তার তাই হয়েছে সার্বজনীন। আজ
নিজের একান্ত বলে আর কিছু নাই, বাহিরের তাঁকের
চলেছে জোর সাধনা; আমার যা কিছু সব দেহ মন, সবই
হতে চলেছে সার্বজনীন। নিজের গভীরতর সাধনার
দরজার খিল গেছে খুলে, পবিত্র অপবিত্র সব কিছু নিয়ে
আমরা হয়েছি মুক্ত। এই যে মুক্তি এর মধ্যে এসেছে
বিদ্রোহ।

এই যে বিদ্রোহ, এ কার বিরুদ্ধে? বিদ্রোহ তখন
আনে কল্যাণ যখন তা ঘটে অসত্যের বিরুদ্ধে। গাছ, সে
তো ক্রমাগতই নিজেকে করতে প্রকাশ লতায় পাতায় ফুলে
ফলে, সে প্রকাশ তার আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্ত, আত্ম ধ্বংসের
জন্ত নয়। কিন্তু গাছের যে শিকড় অদৃশ্য হয়ে নিরন্তর
মাটির অন্ধকারে জীবন বিকাশের রস বরছে সংগ্রহ সেই
শিকড় যদি অগ্রাহ্য করে মাটির সঙ্গে তার অদৃশ্য সাধনাকে,
করে যদি সে নিজেকে বাহিরের আলোকে প্রকাশ, ছেদন
করে যদি তার সেই আঁকড়ে থাকার স্বত্বকে, তবে তার
ফল কি হবে? গাছ বাহিরের বন্ধনকে অস্বীকার করে
অন্ধকার হতে নিজের ভাল পালাকে ঠেলে তোলে জোর
করে উপরের দিকে, আলোকের দিকে; সেই আলোর দিকে
দিকে এগিয়ে চলার শক্তি সে পায় ঐ অন্তর্নিহিত মাটির
নিচের সাধনা হতে। তার বিদ্রোহ বাহিরের মুক্তিপথে,
তার সাধনা ভিতরের বন্ধনকে স্বীকার করায়।

(৩)

যে বিদ্রোহভাব নিজের ভিতরের সাধনার করে ব্যাঘাত

সৃষ্টি, সে বিদ্রোহ বাহিরের শত্রুকে ধ্বংস করবার পূর্বকই
নিজেকে করে ধ্বংস। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে
গেল। গল্পটি সধনতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে শুনে ছিলেম—
আমার একজন প্রচেষ্টা শিক্ষক মহাশয়ের কাছে। গল্পটি এই—
একজন উদ্যান-বিলাসীর ছিল একটি পোষা বাদর।
বাদরটি গুল্লের বাদর বলেই তার উপর ছিল প্রভুর প্রগাঢ়
বিশ্বাস। প্রভু বিদেশে যাবার পূর্বে প্রিয় বাদরটিকে বলে
গেলেন “দেখ আমি যে নতুন গাছের চারা লাগিয়েছি সে
চারাগাছগুলির শিকড় ভালো করে মাটিতে না লাগা পর্যন্ত
রোজই নিয়মিত জল দিও, শিকড় লেগে গেলে তার পর
নিয়মিত জল না দিলেও চলবে।” বাদরটি প্রভুর আদেশ
শিরোধার্য করে নিলে এবং প্রভু বিদেশে থাকা কালে
কর্তব্য পালনে ক্রটি করেনি কিন্তু তবু গাছ গুলি গেল মরে।
বিদেশ থেকে প্রভু ফিরে এসে দেখেন সব চারা মরে গেছে
এবং সেগুলি এক যায়গায় জড় করা আছে। তিনি বাদরকে
কৈফিয়ৎ তলব করলেন, কেন একটিও চারা গাছ লাগল না।
বাদর একটু বিরক্ত হয়েই বলে “আজ্ঞে, দোষ আমার কিছু
নেই। প্রতিদিন নিয়মিত অটল জল ঢেলেছি প্রত্যেকের
গোড়ায় এবং প্রতিদিন গাছগুলোকে উপড়ে তুলে দেখেছি
যে শিকড়গুলো মাটি কামড়ে ধরেছে কিনা—কর্তব্যে
কোনো রকম অবহেলা না করে রোজ জল দিয়েছি আর
রোজই গাছ তুলে দেখেছি শিকড় লাগল কিনা।” প্রভুর
আর বুঝতে বিলম্ব হলোনা কেন গাছগুলো মরে গেল।
কিন্তু এ সম্বন্ধে বাদরকে কিছু বলা চলে না কেনে প্রভু দীর্ঘ
নিঃশ্বাস ফেলে অস্ত্র কাজে মন দিলেন।

বর্তমান একজীবিসনী যুগে আমাদের ভাববার সময়
এসেছে। আমাদের মনুষ্যত্বকে আমাদের আদর্শকে রক্ষা
করতে হলে, আমাদের বিশেষ করে চিন্তা করতে হবে,
আমাদের সংস্কারের কোন্ কোন্ শিকড়কে উৎপাটন করা
দরকার আর কোন্ কোন্ শিকড়কে তার আসল জায়গায়
আঁকড়ে থাকবার নিয়মে বাধা দেওয়া হবে না। সব
কিছুকেই যে বাইরে প্রকাশ করা বা একজিবিট করা নিরাপদ
এবং শ্রেয় নয়, এই সত্যটুকু ভালো করে বুঝবার পক্ষে
উপরোক্ত গল্পের মর্মবিষয়টি সহায়ক।

(৪)

একজিবিসনী যুগের ষাঁরা প্রবর্তক তাঁরা বলেন, “বাইরে এক, ভিতরে আর এক” এটা ভগ্নাত্মীর লক্ষণ, সামাজিক আদর্শের রাজ্যে পতিত্বে এবং সন্তীত্বে, বৈধব্যে এবং কুমারীত্বে, বিপত্নীকত্বে এবং কোমার্যে আদর্শরক্ষার সাত্ত্বিকতা নাই—আছে একটা জগৎজোড়া ভগ্নাত্মী। অতএব ভগ্নাত্মীর খোলস ভেঙে দাও। মন্দির আর গোসল থানার দরজা কর এক, সবাই দিব্যচক্ষে দেখুক শালুঘের আসল রূপ, আসল প্রকৃতি। আসল পরিচয় লাভের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠুক মানুষ মানুষ হয়ে—দেবত্ব আর দেবীত্বের কাল্পনিক সংস্কার দাও ভেঙে, সেই ভাঙনের উপর গড়ে উঠুক অভিজ্ঞালো জীবন। আদিম সম্বন্ধই হোক সত্য, অর্থাৎ নর আর নারীর সম্বন্ধ;—মাতা পিতা, ভাই বোন, এসব তৈরী কর। সামাজিক সংস্কার দাও ভেঙে।

এই মতবাদের মধ্যেই আছে নিছক ভগ্নাত্মী! ষাঁরা এই মত পোষণ করেন, নিজেদের পারিবারিক সম্বন্ধের সর্বদিকের সঙ্গে তাঁরা কতটুকু তাল রক্ষে করে চলেন সেটা কেউ ভালো কোরে দেখে না!

এটা অবশ্যই সত্য, যা অগ্নায় সেটা তলে তলে চলেও সমাজদেহে ক্ষতি আনে, স্তবরাং সেটাও অবাস্তবীয়। কিন্তু অবাস্তবীয় বিষয়কে জীবন প্রকাশের কিছা আশ্রয় বিকাশের সহায়ক হিসেবে গণ্য করাটাও বাস্তবীয় কিনা সেইটেই আজকের দিনে বিশেষ করে ভাববার কথা। এটা তো মানতেই হবে যে আমাদের মধ্যে যে-সব ভাবনার এবং কামনার উদয় হয় তার সবটাই আমাদের শ্রেয়ের পথে কল্যাণের পথে নেয় না। এই শ্রেয় বিচারের বিচার-কাঠি হচ্ছে আমার আত্মসম্মান রক্ষার দিক। বাইরের দিকের আর্থিক এবং সামাজিক মান অপমানের কথাটা এই ক্ষেত্রে একমাত্র ভাববার কথা নয়, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অন্তরের গভীরতম জায়গায় যে আত্মবৈশিষ্ট্যের মানবোধ আমাদের মধ্যে আছে, সেই আত্মসম্মানবোধের চর্চার একান্ত অভাব ঘটেছে এই একজিবিসনী যুগে।

বাহিরের ঐশ্বর্য্যকে বাইরে প্রকাশ করা এক কথা, আর কাচের মত স্বচ্ছ পাতলা ফিন্ফিনে সাদী পরে, ভিতরের

পেটি কোটের রঙের বাহারকে ফুটিয়ে তার উপর দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ, কিছা ফিন্ফিনে ধুতি পরে তার ভিতরকার দামী কাপড়ের বিলম্বিত জাঙ্জিয়াকেও লোকের দৃষ্টিগোচর করা কি একই কথা? এসব ফ্যানসনকে সমাজ সংস্কারের অবশ্য প্রয়োজনের কোঠায় ফেলে ক্রমে যে সংস্কারে এসে পৌঁছব সেটা শেষ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে কতটা দুর্গতি আনবে তাও ভাববার সময় হয়েছে।

চরিত্রবান এবং চরিত্রবতী হওয়া আমাদের সকলের পক্ষে যদি স্বাভাবিক এবং অনায়াসসাধ্য ব্যাপার হতো তাহলে, আজ মহাত্মা ইত্যাদি ব্যক্তির খাতির থাকত না। কাজেই এটা যেন কেউ না মনে করেন যে ভারতে এই একজিবিসনী আদর্শ প্রবেশ করবার পূর্বে আমরা সকলেই সচ্চরিত্রের প্রতীক ছিলাম আর এই যুগে সকলে মিলে দল বেঁধে অধঃপতনের চরম কোঠায় পৌঁছচি। সেদিক দিয়ে বিষয়টাকে বিচার করবার চেষ্টা করা অসম্ভব। কথা হচ্ছে আদর্শের পরিবর্তন নিয়ে। শুধু ভারতের কেন—সর্বদেশেই চরিত্ররক্ষার আদর্শটাই গৃহাশ্রমকে রেখেছে,—বর্তমান যুগে রক্ষমঞ্চ সেঁদিয়ে পড়ছে ঘরে, অথচ ঘর হোলো এমন একটু বড় আশ্রম, যে আশ্রয়ে মানুষ বেঁধেছে তার বাসা বহু যুগে বহু সাধনার ফলে। বহু যুগের ঘাত প্রতিঘাতের দ্বার লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর গড়ে উঠেছে গৃহাদর্শ। জীবনে খুঁটিনাটি ছোট ছোট বিষয়ের মধ্যে বড় আদর্শের প্রভাব থাকে, সত্য, কিন্তু এসব ছোটখাটো বিষয়গুলিই আদর্শ নয় আদর্শ তাই যা আমাদের দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারকে কতোতোলে সুন্দর,—কল্যাণময়। এই একজিবিসনী যুগে দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারগুলি হচ্ছে বড়, তারাই চলেছে ক্রমশঃ গত প্রেয় পথের দিকে, আদর্শ হয়ে পড়েছে গরীব বেচারী মতন, সে তার শ্রেয়মার্গ নিয়ে আছে সদর রাস্তার পাশে পাশে গলি খুঁজির মধ্যে। সেই গলির বাড়ীতে জানালা বসে থাকে মাথায়-কাপড়-টানা বউ স্বামীর প্রতীক, সেই গলির বাড়ীতে ঢোকেনি ইলেক্ট্রিক, জলচে সেখানে আজো সেই তেলের প্রদীপ, বেড়িও ঢোকেনি সেখানে আজো সন্ধ্যাবেলায় জলে সেখানে তুলসী তলায় প্রদীপ বেজে ওঠে শাঁখ। সে বাড়ীর বউ ঘরের কাজে যখন যাওয়া চলে সিনেমায়,—আজো স্নেহে দুঃখে, হাসি কাঁদে,

সে বেচারী গৃহকর্মে থাকে রত। ভয়ে সে আদর্শ সদর রাস্তায় যায় না ছুটে, পাছে স্বামী-কর-মুক্ত, অথচ পথে গুণ্ডা-কবলে বন্দিণী বউটির মতন হয় তার দুর্দশা। সত্যিই কি ধীরে ধীরে আমরা আদর্শকে ছেড়ে দুর্দশার দিকে যাচ্ছি না চলে ?

আমরা বাঙালী, বাঙলার ঘরে ঘরে বাইরের হাওয়া ঢুকেছে, বাইরের আলো ঢুকেছে ; এসেছে নাচ, এসেছে গান,—আসেনি সেই আলো যে আলোয় দেখতে পাব নিজের ঘরের, নিজের গনের কোন কোণায় কত আবর্জনা।

আসেনি সেই গান যে গান মনকে করে একা-ঘরের সঙ্গী। সব এসেছে—কিন্তু এসেছে বাইরের তামাসা নিয়ে, নিয়ে বাইরের উন্মাদনা। কুসংস্কারের পর্দা তুলে, কাটিয়েছি সুবিরহের জড়তা, এসেছি বাইরের নবচিন্তার দারুণ বাড় তুফানে—এখানে আর রইল না আমার বলতে কিছু। সেই একই মৃত্যু এল রূপ বদল করে আধুনিকের বেশে। আজ সব আবরু-খুইয়ে আমি অতি-আধুনিক। আমি আমার ভিতর বাহিরের অভ্যন্তরীণ—আমি আজ একজীবিসনের রাজ্যে সম্পূর্ণ নয়।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত

কুমারী পুণ্যলেখা চক্রবর্তী

পৃথিবীতে সচরাচর আমরা দেখিতে পাই অন্তঃসারশূন্য জিনিষেরই অধিক সমাদর। মানুষের ক্ষেত্রে খাঁটি মানুষ অপেক্ষা নকল মানুষেরই আদর অধিক। ধনবল, জনবল, বাছবল দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু বাহির হইতে দেখিতে অতি সাধারণ মানুষের ভিতর মহৎ অন্তঃকরণ দেখিলে আমরা তাহার সমাদর করিতে জানি না। প্রকৃত মহত্বের সমাদর করিতে না শিখিলে মহৎ হওয়া অসম্ভব। ধন, মান, পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা দ্বারা মহত্ব বোঝা সম্ভব নহে। ধন-মান-বশহীন মানুষের ভিতর ব্রহ্মে সমর্পিত, উন্নত চিন্তা ও কামনারাশি পরিপূর্ণ, পরসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিতহৃদয় দেখিয়া তাহার সমাদর করিতে শিখিলেই আসল বস্তুর সমাদর করা হয়। বরিশালের পটুয়াখালি গ্রামে ১৮৫৬ অব্দে যে ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহ জন্মগ্রহণ করেন তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা বা অর্থবল ছিল না কিন্তু মানুষ হইতে হইলে, চরিত্রবান হইতে হইলে যাহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন—সত্যনিষ্ঠা, সংযম, ত্যাগ, প্রেম, পরিব্রতা, ভগবানে অটল বিশ্বাস প্রভৃতি সদগুণ তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

অশ্বিনীকুমারের জীবনের কথা জানে না এমন লোক বোধহয় আজিকার সভায় কেহই উপস্থিত নাই। তাই তাঁহার জীবনীর বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া অশ্বিনী কুমারের মহত্বের উৎস কোথায় সেই সম্বন্ধেই দু'একটা কথা বলিতে চেষ্টা করিব। অশ্বিনীকুমার আজীবন তাঁহার অন্তর্নিহিত বিবেকের বাণী—ভগবানের বাণী শুনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই বাণী শুনিতে গিয়া তাঁহাকে সাংসারিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হইয়াছে কিন্তু জীবনদাতার আশীর্বাদে জীবনের সে ক্ষতিতে তিনি ক্ষেপণ করেন নাই। ঈশ্বরের সহিত তিনি আপনাকে যুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই জীবনের সকল অবস্থায় তিনি অচল অটল থাকিতে পারিতেন। তাঁহার অটল সত্যনিষ্ঠা অবিচল ধৈর্য, অতুলনীয় সংযম ও অসাধারণ মানব-প্রেমের কথা চিন্তা করিলেও মন বিশ্বাসানন্দে পূর্ণ হয়। বাল্যকাল হইতেই যে দেবতার বাণী শুনিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন পরিণত বয়সেও সেই দেবতাই তাঁহাকে স্মৃতি হ্রুৎ সকল অবস্থায় তাঁহারই দিকে আকর্ষণ করেন। সেই আনন্দময় রসস্বরূপের সহিত যুক্ত থাকিয়াই তিনি অগ্নান

বদনে প্রসন্নচিত্তে, নির্বাসনক্লেশও সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাশ্রয় দেবতার প্রসন্নমুখ তাঁহার সকল দুঃখকে স্বখে পরিণত করে। তিনি এক ভগবানকে জানিয়াছিলেন বলিয়াই গণ্ডীর ভিতর থাকিতে পারেন নাই। ভগবানকে পিতা বলিয়া জানিলে তাঁহার সন্তান সমুদয় নরনারীকে ভাইভগ্নী বলিয়া মানিতেই হয়। অশ্বিনীকুমারও তাঁহা মানিয়াছিলেন, সেইজন্তই তিনি গোপাল* মেথরকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়াছেন, নমস্কৃত্যে তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসাইয়াছেন। তিনি জীবনব্যাপিয়া জ্ঞান, সত্য ও নীতির পূজা করিয়াছেন; বিশ্ববাসী নরনারী এক মায়েয় সন্তান জানিয়া দলাদলিকে কখনও মনে স্থান দেন নাই। তাঁহার আদেশ সেখান্বে দেবাদেশের ত্রায় প্রতিপালিত হইত।

সাধক অশ্বিনীকুমার সাধনা, সংঘম ও তপস্যার যে পথ দেশবাসীর নিকট দেখাইয়া গিয়াছেন তাঁহার প্রদর্শিত সেই পথ অনুসরণেই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিপূজা অহুষ্ঠিত হইবে। হতভাগ্য বঙ্গদেশ তাঁহার উপযুক্ত সমাদর আজও বুঝি করিতে শিখে নাই।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার মত অকপট দেশনায়কই বা আজ পর্যন্ত কয়টা জন্মিয়াছেন? প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি যে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার কথা বলিয়াছিলেন সে কথায় তখন কেহই কর্ণপাত করেন নাই, আজ দেশনায়কগণ জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন।

অশ্বিনীকুমারের প্রভাব ত্যাগে—চরিত্রবলে। অর্থলোভ খ্যাতির লোভ, পদমর্যাদার লোভ ভুণের ত্রায় তুচ্ছ করিয়া

তিনি নরসেবার জন্ত আশনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাই বরিশালবাসী তাঁহাকে দেবতার ত্রায় ভক্তি করিত। বরিশালবাসীর হৃদয়ে তাঁহার রাজাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু বিধাতার অলজ্ঞ্যবিধানে এমনদিন আসিবেই আসিবে যেদিন বঙ্গভূমি অশ্বিনীকুমারের সত্যনিষ্ঠা, প্রেম, পবিত্রতা



মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত

ভক্তি, প্রভৃতি দেবতুল্য সদগুণরাজির সমাদর করিতে শিখিবে। আজ ভবিষ্যতের স্মৃতিচিহ্ন প্রতি চাহিয়া আশাপূ হৃদয়ে তাহার জন্ত প্রতীক্ষা করি। অশ্বিনী কুমারো পুণ্যময় নাম সেদিন প্রতি গৃহে ভক্তিভরে উচ্চারিত হইবে। পটুয়াখালি পুণ্যময় মহাতীর্থে পরিণত হইবে

জাগরণ

শ্রীউমাশশী দেবী বি, এ

খ্যাদাদের গ্রামখানা একেবারে খাঁচা পাড়া গাঁ যাকে বলে। গ্রামবাসীরা সকলের কাজ সেরে ঘরে ফিরে গিয়ে পাঁচখানা কাঁথা মুড়ি দিয়ে ম্যালেরিয়ায় কাঁপে, বিকালবেলা জর ছেড়ে গেলে ভাত খেয়ে রতন মুদীর দোন্ধানে গিয়ে আড্ডা দেয়।

মেয়ে মহলেও নিরানন্দের কিছু ছিল না। পাচী ঠাকুর বি তেমনই এর কথা ওর কাছে ওর কথা তার কাছে বলে ঝগড়াটা বাধিয়ে দিয়ে নিশ্চিত মনে গৃহ-কর্ম করেন; তার পর যুদ্ধ, দুপক্ষই যখন সাক্ষী মানতে আসে তিনি নাকি স্বরে গালে হাত দিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলেন “দেখ দেখি বাছা! আমি কোন দিকে যাই? আমার কাছে কেউ কি তোরা পর? আমার এ পিঠ ও পিঠ দুই সমান” বলে তিনি তাঁর হবিষ্যর আলো চালকটা (কটা মানে আধসেরের ওপর) ঝাড়তে বসেন। তারপর কোলাহলনিরতা ঘোষাল গিন্নীকে উদ্দেশ্য করে বলেন “আহা যা বলেছ খুড়ী তা আর বলতে, গাঁয়ের চোকখাকী গতর খাকীদের অমনিই কথা।” আবার অল্প সময়ে মোড়ল গিন্নীকে সাহসনা দেন “শুনিস কেন? ও বামুনের মেয়ে কি কম?” তারপর তিনি ঠোঁট উল্টে ছড়া কার্টেন “বলে যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড় ঘরানী, আর যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনী।”

তারিণী পিসী তেমনি পাড়া শুদ্ধ বউএর কাজে খুঁত ধরে গিন্নীদের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ফাটিয়ে দেয়। কেউ বললে বলে “হক কথা বলবো তার আবার ভয় কিসের লা?”

স্বর্ণ দিদি দুপুর বেলা পাড়া শুদ্ধ মহিলাদের কাছে তেমনি রামায়ণ পড়ে।

সকলেই আহা—উছ ক’রেসীতার দুঃখে সহানুভূতি জানায়। স্বর্ণ দিদির স্বর শোনা যায় “এতক বলিল যদি পবন নন্দন” আর সকলেই নড়ে চড়ে ভাল হয়ে বসে এবং সীতার দুঃখে একসঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

অপরাজে বউএরা তেমনি সব একসঙ্গে কলসী কাঁখে নতুন পুতুরে গা ধুতে গিয়ে, নিজের স্বখ-দুঃখের কথা বলে, শাশুড়ীদের নিন্দে করতেও কস্বর করে না।

স্বর্ঘ্য যখন পাটে বসে শান্ত কৃষক লাঙ্গল ঘাড়ে করে তার কুটীরের দিকে ফেরে, রাখাল বালকের বাঁশের বাঁশীতে কি এক উদাসী স্বর বেজে উঠে’ গ্রাণকে আকুল করে তোলে।

তখন ঘরের ভেতরে মিটমিটে রেড়ীর তেলের প্রদীপের আলোয় ঠাকুর মা তাঁর নাতি নাতিনীদের নিয়ে গল্প করেন সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে কুঁচবরণ রাজকন্তা যার মেঘবরণ চুল, তাঁর হাতের অপের বোলাও অবিশ্রাম গতিতে ঘোরে, ইতিমধ্যে ঠাকুরমার চোখে তন্দ্রা আসে, তিনি গল্প বন্ধ ক’রে ঢোলেন, ছেলের দল একসঙ্গে চৈচিয়ে ওঠে “ও ঠাকুরমা, তারপর?” ঠাকুরমার তন্দ্রা ছুটে যায়, তাঁর মুখ এবং হাত আবার একসঙ্গে চলতে শুরু করে। এমন করে দিনগুলি যেমন স্মরণাতীত যুগ থেকে চলে আসছে—তেমনই চলছিলো হঠাৎ দেশে এল স্বদেশীর বস্তা। কলকাতায় তখন হলুতুল, এমন কি আসন্নপ্রসবা নারীও কাঁথাকানি সঙ্গে করে বয়কটে নেমেছে। বলা বাহুল্য, তার ঢেউ এসে খ্যাদাদের গ্রামের শান্ত জীবন-নদীতেও আলোড়ন তুললে।

তারা সকলে মিলে একটা লাইব্রেরী খোলার পরামর্শ করলে। বই পড়ার ইচ্ছে মেয়ে পুরুষ সকলেরই কিন্তু কিনে পড়ার সামর্থ্য কারো নেই। আর তা ছাড়া আপনাদের কাণে কাণে একথা বলতে আমার লজ্জা নেই যে বই কিনে পড়লে আনন্দটুকু তেমন উপভোগ করা যায় না, যেমন যায় বিনা পয়সায় বই পড়ে। যাকুগে, খ্যাদা ডান হাতে চাঁদার খাতা আর বাঁহাতের বুড়ো আঙ্গুল চুষতে চুষতে (বলা বাহুল্য এটি তার মুদ্রাদোষ) গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু ব্যাপার বড় স্ববিধে বলে মনে হলো না। কেননা প্রথমে মুখে উৎসাহ দিলেও কাজের বেলায় সকলেই

সরে পড়লো। কেউ বল্লে—এ বছর পাটের দাম নেই, আসছে বছর দেখা যাবে। কেউ বল্লে—তার মেয়ের বিয়ের পরে যাহোক কিছু দেবে ইত্যাদি কিন্তু লাইব্রেরী কোন রকম করে খানকয়েক বই কিনে চণ্ডীমণ্ডপের একটা ঘর দখল করে একখানা প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দেওয়া হ'লো। পাড়ার বউএরা বই পড়বার লোভে টাকারটা সিকিটা নুকিয়ে ছেলেদের দিলে।

তারপর একটা হোমিওপ্যাথী ডিসপেন্সারী, সেটাও কোন রকমে হয়ে গেল। কারণ অস্থি বিশুদ্ধ হ'লে ছকোশ দূর থেকে প্রতাপ ডাক্তারকে কেও আনতে গেলে রোগীর ভালো যাহোক তা হোক গাঁটের কড়ি খসে বিস্তর।

পূজোর সময় ছিঁচুকে চোরের জালায় গেরস্থর ঘটাবাটা সামলানো দায় হয়ে উঠলো, ছেলেরা সকলে মিলে একটা রক্ষীদল গড়লে। স্থির হ'লো যে তারা রাতে পালা করে পাড়ায় পাড়ায় পাহারা দেবে। তারা ভ্রমেও বুঝতে পারেনি যে বাঙ্গালা দেশে পরের উপকার করতে যাওয়ার মানে নিজের সর্বনাশকে ডেকে আনা। সন্ধ্যার সময় খ'য়াদা যখন একটা সদ্যকৃত্তিত প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠী নিয়ে বাড়ী ঢুকলো তার পিসীমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর মতে অভবড় লম্বা লাঠী নিয়ে সারারাত চোর তাড়িয়ে বেড়ানো যা আর কোম্পানীর (গবর্ণমেন্ট) সঙ্গে লড়াই করাও তাই।

তিনি খ'য়াদার কোন যুক্তিই শুনবেন না। উণ্টে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে পাঁচ বাড়ীর লোক জুটে সকলেই পিসীর পক্ষ নিয়ে ভাইপোকে একেবারে সাত হাত জলে ফেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হ'লো না।

বুড়োরা প্রথমে ছেলেদের খুব উৎসাহ দিলেও দিন কয়েকের মধ্যে বুঝতে পারা গেল তাঁরা পেছ হটছেন। তার কারণ অনেক। প্রত্যেকেই চান আর সব বাড়ী ফেলে তাদের বাড়ীই সারারাত পাহারা দিক এবং তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুন কিন্তু এ ত মুখ ফুটে বলা যায় না কাজেই এই ইচ্ছাটা মনের ভিতরে কুণ্ডলী পাকাতে লাগলো।

গ্রামের মধ্যে মোড়লরাই ছিলো মাতঙ্গর। মোড়ল গিন্নী তাঁর বেঁটে বেঁটে হাতে এক গোছা সোণার চুড়ী পরে স্নানের ঘাটে যখন হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছড়া কেটে কেটে প্রতিবেশিনীদের সমালোচনা করতেন তখন মুখে কেউ কিছু না বল্লেও অন্তর জলে যেত এখন গাঁয়ে যদি চুরী কিংবা ডাকাতি হয়, মোড়লদের বাড়ীই আগে হ'বে, কিন্তু এমন পোড়া অদৃষ্ট যে নিজের পেটের ছেলে শত্রু হয়ে সারারাত পাহারা দিয়ে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত কোরছে। স্বতরাং গিন্নীরা স্ব স্ব ছেলেদের নানা কথা দিয়ে বুঝিয়ে কর্তাদের নির্বুদ্ধিতাকে খিকার দিয়ে অবস্থা

এমন জায়গায় এনে দাঁড় করালে যে রক্ষীদল আপন থেকেই ভেঙ্গে গেল। অবশ্য বাইরে কেউ কিছু বল্লে না কিন্তু মনে মনে সকলেই এর কারণ বুঝলে আর মোড়লর এ পাড়ার ওপর চটে রইল। ব্যাপারটা আরো এক জাঁকালো হয়ে উঠলো স্কুল নিয়ে।

ছেলের দল স্থির করলে তারা মেয়েদের জন্তে একটা প্রাথমিক স্কুল খুলবে। বুড়ো বুড়ীর দল গেল ফেপে। একে আজকালকার দিনে ঝি বউকে শাসনে রাখাই দায় তার ওপরে আবার তারা যদি লেখা পড়া শেখতে তা হলে শুকুজনের মাথায় পা দিয়ে হাঁটবে। আর মেয়েরা “লেখা পড়া” শিখে জজ হবে? না “ম্যাজিষ্ট্রটর” হ'বে? লেখাপড়া শিখবে? তারপর লেখা পড়া শিখে মধ্য গরম হয়ে রাত্রির অন্ধকারে কেমন করে তারা চাকাদেয় তা ও পাড়ার গৌসাইদের মেয়ের ব্যাপার শুনলেই বুঝতে পারা যায়। কাজেই সেটাই ছেলেদের স্কুলে পরিণত হ'লো। এখন সমস্তা বাধলো মাষ্টার নিয়োগ করা নিয়ে; আপাততঃ পাঁচটাকা মাইনেতে একজন মাষ্টার নিযুক্ত করা হ'বে কিন্তু কারে রাখা যায়। কারণ ইতিমধ্যে বুড়োরা আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন শিক্ষার উৎসাহ দেওয়ার জন্তে নয় তাঁদের বেকার শ্রালকের অসংস্থানের জন্তে। বেকার শ্রালক এ পাড়ার ঘোষ কর্তার, ওপাড়ার মোড়ল কর্তার দুজনেরই আছে। এখন কার কপাণো ভাগ্যলক্ষ্মী জয়টিকা পায়। তারপর কেমন করে যে ঘোষ কর্তার মুখে কালী দিয়ে মোড়লের ভাগ্যবান শালা মাষ্টারীতে নিযুক্ত হ'লো তা লিখতে গেলে একখানি সাতকাণ্ড রামায়ণ হয়ে পড়ে। অপমানটা ঘোষকর্তাকে খুবই লাগলো। তিনি সব গুড়ের কারবারে গুছিয়ে নিয়ে মোড়ল কর্তার সঙ্গে সম্বন্ধে নেমেছেন; প্রথম পরাজয়ই তাঁকে আরও চেতিত তুলে, তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক করে স্কুলের বিরুদ্ধে ইম্পেট্টরকে লিখলেন যাতে গ্রান্ট না দেয়, তাহলেই স্কুলটা আপনা আপনিই উঠে যাবে। কিন্তু কিছু হলো না, মোড়ল একদিন সহরে গিয়ে একটা প্রায় সের দশেব ওজনের রুই মাছ কিনে ইম্পেট্টরকে দিয়ে এলো। বল বাহুল্য, তার পরের মাস থেকেই গ্রান্ট মঞ্জুর হয়ে গেল। কিছুতেই কিছু হলো না দেখে তখন এ পাড়ার ছেলেদের ওপারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলো এবং এ পাড়াতেও আর একটি স্কুল স্থাপিত হলো। ছোটগ্রামে দুটো স্কুল, কোনটাই ভাল চললো না। ফলে দু পক্ষের মনেই আগুন ধুমায়িত হতে লাগলো।

মোড়লদের ছিল তেজারতীর কারবার। দশ টাকার স্বদে আসলে বেড়ে কেমন করে লোকের ভিটে মাটী চাঁটী উদ্ধার করতে পারতো, সে মোড়ল কর্তা যেমন বুঝতো, তেমনটি আর কেউই নয়। লোক আড়ালে গালাগালি দিত,

অভিশাপ দিত, কাবুলীওয়ালার সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক স্থাপন কোরত, কিন্তু সামনে সকলেই মোড়ল কর্তাকে ভোষামোদ করতে কসুর করত না। তিনি একজন দেবতুল্য ব্যক্তি এ তারা হলপ করেও বলতে পারতো। ঘোষ কর্তা স্থির করলে মোড়লের এই আঁতে ঘা দিতে হবে। তার হৃদ খাওয়াটি বন্ধ করলে তেজ আপনিই মরবে। ঘোষ কর্তা হঠাৎ কৃষক দরদী বন্ধু সোজে তাদের উন্নতির জন্তে একটা নলকূপ বসিয়ে দিলে, পাঁচ সের বীজ ধান দান করে বলে বেড়াতে লাগলো পচিশ সের দিয়েছে; তারপর স্বযোগ বুঝে গ্রামে কৃষকদের জন্তে Agricultural Bank এর জন্তে লেখালেখি শুরু করলে। ফলে সত্যি সত্যি একদিন গ্রামে ব্যাংক স্থাপিত হলো। কৃষকদের উপকারে সঙ্গে সঙ্গে ঘোষেরও অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হলো। এর পরে আশুন আর চাপা রইলো না। বাহিরে আত্মপ্রকাশ করলে, ফলে এপাড়া ওপাড়া দুটো দল হয়ে গেল।

বার্ষিক বারোয়ারীর যাত্রাটা অধর বাড়ুঘোর বাড়ীর সামনে যে খানিকটে পড়ো জমি আছে তাতেই বরাবর হয়ে থাকে, তাতে সব চেয়ে বাড়ুঘোরই লাভ বেশী কারণ বছরে একবার অন্ততঃ সাধারণের খরচায় তাঁর জমির জঙ্গলটা সাফ হয়ে যায়। বাড়ুঘো গিন্নী যাত্রার দিন বেলা তিনটার সময় থেকে চিকের সামনেই অন্ততঃ কুড়িজনের জায়গা একখানি সতরঞ্চি পেতে দখল করে থাকেন। তারপর খেয়ে দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে যাত্রা আরম্ভ হ'লে হেলতে দুলতে ভিড়ের ভেতর দিয়ে আসেন কারো হাত কারো মাথা মাড়িয়ে আর বলেন,—“ওলো ছুবি লো—সব সব এ কালের মেয়েগুলো যেন খিদী, বামুন হুন্দর জ্ঞান নেই।” স্তরায় এ বছরেও বখন অশ্ববারকার মত ছেলেরা জঙ্গল পরিষ্কার করতে গেল, অধর বাড়ুঘো পৈতে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ধপাস করে জমির ওপর পড়ে চোঁচাতে লাগলো “দোহাই মহারাণীর দোহাই। তোর যদি বামুনের ভিটে জোর করে দখল করিস ত বেকহত্যের পাপ হবে। অনন্তকাল নরকে পচবি”—ইত্যাদি, এ পাড়ার বুঝতে বাকী রইলো না যে ঘোষ কর্তার নামে একটা মিথ্যে মোকদ্দমা শুরু করার জন্তে এসব মোড়লের কারসাজী। ঘোষেরা এগ্রিকালচার অফিস থেকে আক্ গাছ এনে পুতেছেছিলো প্রায় দশ বিঘে জমীতে। গাছগুলো এমন ভাবে বেড়ে উঠেছিলো যে, যে দেখতো সেই বলতো আহা কি চমৎকারই না হয়েছে ঘোষকর্তা দিনের মাথায় পঞ্চাশবার আকের দিকে চাইত আর লোহার সিঁদুকের দিকে চাইত। মাসখানেক পরেই আক্ কাটার সময়, হঠাৎ

একদিন ভোরবেলা, ঘোষকর্তা তখন উঠে “তারা মন্দোদরী” ইত্যাদি করতে করতে চোখে মুখে জল দিয়েছে এমন সময়ে মাঠ থেকে কিয়েগরা ছুটে ছুটে এসে খবর দিলে “ওগো কত্তা তোমার আক্ যে সব শুয়ে রয়েছে একেবারে, একটা দাঁড়িয়ে নেই, দশ বিঘে জমির আক্ একেবারে সেরেফ কেটে দিয়েছে।” বাড়ীতে একটা তুমুল হাঁউ হাঁউ হট্টগোল উঠলো। উত্তেজনা ঘোষের কাপড়ের শুধু একটা খুঁট ঘুনসীতে আটকে আছে মাত্র সেই অবস্থায় সামনে একটা খড় কাটা বঁটা ছিলো সেইটাই হাতে তুলে নিয়ে ঘোষ চোঁচাতে চোঁচাতে চলো আজ শা.....খুনকোরব খুন করে ফাঁসী যাব ইত্যাদি

ঘোষ গিন্নী গাল দিতে দিতে মড়াকান্না শুরু করে দিলে। মোড়ল গিন্নীর সেদিন স্নানের ঘাটে সেকি হাতনাড়া। প্রতি কথায় কথায় হৈসে গড়িয়ে পড়েন, পাশের নিস্তারিণী ঠাকুরঝিকে বলেন “বলিস কিলো মুক্জী এমন! ও বাবা” তারপর তাঁর স্বভাব অনুযায়ী নিস্তারিণীর মুখের ওপর হাত নেড়ে বলেন “একেই বলে ধুকড়ার ভেতর খানচাল।” এ পাড়ার লোকেরা ঘোষকে উত্তেজিত করতে লাগলো এ অপমান নীরবে সহ্য করা হবে না, তাহলে মোড়লরা চিরদিনের জন্তে ঠাট্টা করবে। ঘোষ কর্তার পয়সা তখন গুড়ের কলসীর কাণায় ঝুলে আসছে, রক্ত গরম স্তরায় একদিন রাত্রে লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মোড়লের পঞ্চাশ বিঘে জমির ধান কেটে নিয়ে এল। এরপর আর এ বিষ গাঁয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না, নিকটবর্তী মহকুমা কোর্টে গিয়ে হাজির হ'লো।

দুপক্ষই উকীল মোক্তার নিযুক্ত করলে। সাক্ষীদের পেটে এবং পায়ে তেল মাশিশ শুরু হ'লো। কোর্ট আর ঘর করে করে জুতোর তলা ক্ষয়ে গেল। জলের মত টাকা খরচ হ'তে লাগলো। দুপাড়ারই স্থূল উঠে গেল। লাইব্রেরীর বইগুলো যে যেমনে পেলো “পর অব্যম্ লোষ্ট্রবৎ” হিসাবে আত্মসাত করলে। গাঁয়ে বসে থাকলে পরচর্চা চলে কিন্তু পেট চলেনা, স্তরায় খ'দাদা আর কালো কলকাতা যাত্রা করলে চাকরীর সন্ধান—কেলোকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কি হলোরে তোদের নব জাগরণের? কেলো উত্তর দেয় “জেগেছেত”, খ'দাদা পাশ থেকে জবাব দেয় “শুধু জাগা নয় জাগরণের যা লক্ষণ প্রাণের স্পন্দন তা রীতিমতই দেখা দিয়েছে এবং জীবননাটে যে যার অংশ রীতিমতই প্লে করছে।”

কিশোর গৌরাজ

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

পট-পরিবর্তন

পথের খানিক দূরে—

নিমাই ও সহপাঠী—মুরারি গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

নিমাই—কবিরাজ ম'শায় ভাল আছেন?

মুরারি—ভালই আছি। ছোট্ট ঠাকুরটি, তোমাকে দেখলে যে হাতে চাঁদ পাই! এস ভাই দু'টো কথা বলি।

নিমাই—আপনার মত পণ্ডিতের সঙ্গে বাজে কথা ব'লে কি হবে? আস্থন, একটু বিদ্যার চর্চা হোক।

মুরারি গুপ্ত—বেশ তো—বেশ তো, তুমিই বল।

নিমাই। আচ্ছা, আমি ত্রায়ের প্রথম যুগটি জিজ্ঞাসা করছি। এই কয়টি বিষয় আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

মুক্তির লক্ষণ কি কি?

মুরারি—অত শত কি মনে আছে? তুমি ছেলে মানুষ, আমি বুড়ো হ'য়েছি ঠাকুর, তোমার সঙ্গে কি আমার তর্ক করা চলে?

নিমাই—আপনার ব্যাকরণ মনে আছে? এই ধরন ক্রমদীপ্তর—

মুরারি—তোমাদের মত কি আমি আর নূতন টোলে ভর্তি হ'য়েছি যে গরুর করে সব বলে যেতে পারি!

নিমাই—তবে ন'দের প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে আপনি একজন, এমন দর্প করে বেড়ান কেন?

মুরারি—তর্ক করব কি, তোমার মুখখানি দেখে তর্কের খেই হারিয়ে ফেলি।

নিমাই—ও সকল বাজে কথা ছাড়ুন। তর্কে হেরে স্নেহ-গদগদ করে ভালমানুষী করলে আমি ভুলব না। আপনার পাণ্ডিত্য নেই, অথচ পাণ্ডিত্যের যশটা খুব লুটে থাকেন। এ সমস্ত ব্যাকরণ, ত্রায়, অলঙ্কার শাস্ত্রের কথা—বড় কঠিন সমস্ত। এ সকল নিয়ে বড়াই করবেন না। আপনি বৈদ্য, কবিরাজী শাস্ত্রটাই ভাল করে দেখুন। কফ,

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্লেষ্মা ও পিত্তির লক্ষণ দেখে ব্যবস্থা করুন গে, লতাপাতা বেটে অনুপান তৈরী করে রোগী সামলে ফিরুন। অগাধ সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে মরবেন না। যান—যান, পথ ছাড়ুন।

(মুরারি গুপ্তের যন্ত্রবৎ নিমাইয়ের কথা পালন)

মুরারি—(একটু দূরে যেয়ে আনাত্তিকে)—ওকে দেখলে এত আনন্দ হয়! এতো অপমান কলে তবু কণ্ঠ ধেন মধু-মাখা, আমার কাছে ওর নিন্দাবাদ ফুলচন্দনের মত বোধ হচ্ছে! জগন্নাথ মিশ্রের এ ছেলেটি কে? কোন্ দেবতা বালক বেশে আমাদের নদেতে এসেছেন?

পটক্ষেপ

(গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলের পাথের পথ)

অদূরে নিমাই ও টোলের ছাত্রগণ

১ম ছাত্র—নিমাই, এত বড় প্রবীণ বুড়ো কবিরাজ ম'শায়কে এই নগরে কে না সম্মান করে। ইনি শুধু শাস্ত্রজ্ঞ ও কবিরাজ নন, একজন মস্তবড় কবি। এমন লোককে তুমি ছেলে মানুষ হয়ে এতটা অপমান করলি। ছিলেটি লোকগুলি হয় ত এখুনি কাজির কাছে যেয়ে নালিস করবে, তারপর আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। তোর সঙ্গে রাস্তায় চলা যে বিপদ দেখছি। কখন কি করে বসবি, তার পরে আমরা শুদ্ধ মারা পড়ব।

নিমাই—ছিলেটিদের আমি কি করেছি? একটু খানি হাসি-ঠাট্টা বোঝে না। বেকুব বাদ্দালগুলি, ওর কথায় কাজি অমনি পাইক পাঠিয়ে দিবে আর কি! গোরাই কাজি এত বেকুব নয়। আর মুরারি গুপ্ত? ও'য়ে আমার লোক। আমার নিজের জনকে আমি চিনি। তোদের ভাবতে হবে না। তোরা যদি ভয় পাস, তবে আমার সাথে আর আসিস না।

পড়ুয়া—তোমাকে ছাড়া কি আমরা থাক্কে পারি?

পটক্ষেপ

দৃশ্য পরিবর্তন

(জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর নিকটবর্তী—রাজপথ)

কয়েকজন ভদ্রলোক ও মুরারি গুপ্ত

১ম ভদ্রলোক—প্রণাম কবিরাজ মশায়, কোথায় গিয়েছিলেন! টোলের ছেলেরা বলছিল, যে, নিমাই ছোড়া নাকি আপনাকে পথে অপমান করেছে!

মুরারি গুপ্ত—কিছু না—কিছু না। নতুন লেখাপড়া শিখেছে, খুব ফুর্টি হয়েছে—তার উচ্ছ্বাস সামলাতে পারছে না। বুড়ো বুড়ো আরো কত পণ্ডিতের বিদ্যা পরীক্ষা করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বালক যা-ই করুক, আমার বড় ভাল লাগে তাকে। গ্রীষ্মকালে যেমন কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে দিলেও নদীর জল গায়ে লাগলে ভাল লাগে, ওর এই পাগলামিও তেমনি তৃপ্তি ও আনন্দ দেয়। নিমাই আমাকে যা-ই বলুক না কেন, ওর সে সকল আবদারের কথা আমার কাণে মধু বর্ষণ করে। হাঁ, একটা দুখ—ধর্মের কথা একটিবারও বলে না। ভগবানের তত্ত্ব-সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। এমন চমৎকার ছেলে, কিন্তু ধর্মহীন, এটি আমার বৃকে বাজে।

প্রতিবাসী ভদ্রলোক—যা হোক আপনারা আর ওকে আশ্বাস দিবেন না। শিশুকালে তো দুরন্ত হ'য়ে উঠেছিল। তরুণ যৌবনে তো টোলের সেরা ছাত্র হয়েছে। শুনছি নদের শত শত টোলের মধ্যে নিমাইয়ের মত আর একটি পড়ুয়া নেই। কিন্তু বিদ্যা-শিক্ষায় কি লাভ, যদি চরিত্র না শোধরায়? এতো বিদ্বান হ'য়েও যে নিমাই, সেই নিমাই পাগল।

মুরারি গুপ্ত—আহা থাকুক, ওর পাগলামিতে কোন দোষ নাই, তা স্বরণ্যর মত চঞ্চল ও হাওয়ার মত স্বাধীন। আমার কাছে ওর এই বাল্যভাব বড়ই মধুর বোধ হয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওর প্রকৃতির গতি ফিরবে। ভগবান তাঁর এই সপ্নের জিনিষটির উপর তাঁর সোহাগের ছাপ মেরে লোক-হিতে লাগাবেন।

প্রতিবাসী—তথাস্তু, কবিরাজ মশায়, তাই হোক! (যুক্ত করে) ভগবান ওকে স্মৃতি দাও। হাঁ, জগন্নাথ মিশ্রের নাকি অস্থখ?

মুরারি গুপ্ত—হাঁ, তাকেই তো দেখতে এসেছিলুম। কাল রাতে যে জরটুকু হ'য়েছিল, তা দোষাশ্রিত হ'য়ে বড়ই বাড়াবাড়ি চলছে। এ যাত্রা ওকে বোধ হয়, রাখতে পারা যাবে না। ধন্য মেয়ে শচী দেবী—ওর মন ওকে স্বামীর আসন্ন বিপদ বুঝিয়েছে। কাল সারা রাত্রি একটা জলন্ত আশ্রয়ভরা মৃৎপাত্র বুকে রেখে নারায়ণ শিলার কাছে ধর্না দিয়ে পড়েছিল—বুকে এত বড় একটা ফোঁস পড়েছে। আজ দু'দিন কিছু খায়নি। এত বড় চঞ্চল ছেলে নিমাই বাবার কাছে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর কাঁদছে।

প্রতিবাসী—একেবারেই কি আশা নেই?

মুরারি—আমার তো তাই বোধ হচ্ছে—আর দু'তিন দিনের বেশী যে টেকে, মনে হয় না।

[বিমর্ষভাবে সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

—দৃশ্য—

(জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী)

শচী ও নিমাই

শচী—আজ ছ'মাস হল কর্তা গেছেন, তুই আমার বৃকের কাছে আয়। এখন সংসারের উপায় কি? জগৎ আঁধার দেখছি (কান্না)।

নিমাই—মা, তুমি যদি এমন করে কাঁদ, তবে আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, আমি এখানে মাথা খুঁড়ে মরব।

শচী—বালাই যাট, এমন কথা বলিস না। না বাবা, আর আমি কাঁদব না।

নিমাই—দাদাও গেছেন, বাবাও গেলেন। বাবা দাদার শোকে অস্থির ছিলেন, একদিনের জন্তুও তাঁকে ভুলতে পারেন নি। আমার কেবল চোখে চোখে রাখতেন। হারাই-হারাই-আশঙ্কায় মুখ শুকিয়ে যেত। বাবা কত বড় পণ্ডিত ছিলেন মা, অথচ চির-দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছিলেন। কোন বড় লোকের বাড়ীতে গেলে অবস্থার

উন্নতি করতে পারতেন। কিন্তু সে কি ব্রহ্মণ্য-তেজ! বলতেন—নিম, আমরা তো শুকনো পাতা খেয়ে, বায়ু আহার করে বেঁচে থাকবার জাত। আমাদের দেবতার শয্যা তো মহাসমুদ্রে একটা বটপাতা। বাঁমুন কখনও কি দারিদ্র্যের ভয় করে? ওতে আরও ব্রহ্মণ্য-তেজ বাড়ে। এই তেজস্বী পুরুষের মনটা ছিল কোমলতায় গড়া। সে কি স্নেহ! মা, আমি বড় হতভাগ্য, আমি জন্মেই দাদাকে হারালেম। দাদা আমায় না দেখে থাকতে পারতেন না। তবে কেমন করে ইচ্ছা করে আমায় ছেড়ে গেলেন? বাবা তো একদণ্ড আমায় না দেখলে পাগল হয়ে যেতেন। সেই বাবাও চলে গেলেন। মা, আমি বড় দুর্ভাগ্য।

শচী—যাট, তুমি দুর্ভাগ্য হবে কেন? আজ ছ'মাস হ'ল তিনি গেছেন। • শুক্লা চতুর্থী তিথিতে সেই সর্বনাশ হয়েছে। আজ আবার সেই তিথি। এখন তো সংসার একেবারে অচল হয়েছে। বাবা, তুমি তো খুব বড় পণ্ডিত হ'য়েছ। বাসুদেব দত্ত বলেছেন, গঙ্গাতীরে তাঁর যে বড় আটচালা ঘরটা আছে তা তিনি বিনা ভাড়ায় দেবেন, উপরন্তু তুমি যদি সেখানে টোল খোল, তবে পড়ুয়াদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করে দেবেন। নদের টোলের অধ্যাপকেরা দেশের সর্বত্র নিমন্ত্রণ ও বিদায় পেয়ে থাকেন। তুমি কি টোল খুলবে?

নিমাই—আমি রাজি আছি, ছাত্রের অভাব হবে না। আমি টোল খুললে অনেক ছাত্র হবে।

শচী—(স্বগত) যা হোক কথার গতি ফিরিয়ে ওর মনটা কতক স্থির করেছি। না হ'লে পিতৃশোক ও কথায় কথায় গঙ্গার জলে ডুবে মরতে যায়!

[ঈশানের প্রবেশ]

শচী—কি ঈশান, বাজারে যাবে না? নিমাই আমার বেতো শাক ভালবাসে। আর আর যা আনবে, ভার সঙ্গে বেতো শাক আনা চাই। আমি যাই রান্নার ব্যবস্থা করি গে।

[সকলের প্রস্থান]

পটক্ষেপ

তৃতীয় অঙ্ক

(এক বৎসর পরে)

প্রথম দৃশ্য—

গঙ্গাতীর, মিশ্রঘাট

লক্ষ্মী—(একলা একদৃষ্টে পূর্বদিকে তাকাইয়া স্বগত) কই আজ তো ও বাড়ীর ছোট ছুলালটি মোটেই এদিকে আসছেন না। আমি যে রোজই ওঁকে দেখব বলে ঘাটে এসে বসে থাকি; রোজই তো এই সময় একলাটি আসেন। চোখে চোখে মিলে গেলে মুখ টিপে হাসেন। ওঁর হাসিতে যে আমার সর্বাস্ত্র এলিয়ে পড়ে। ওঁর চাউনি—কি সে পদ্ম-পলাশ চোখের চাউনি। আমি যেন চন্দের স্বধা পান করে উঠি! হাঁ, ওঁকে ত সকাই পরম সুন্দর বলে শতমুখে প্রশংসা করে। কিন্তু আমার চক্ষে ওঁকে দেখে যে চোখের পিপাসা মেটে না। আচ্ছা আগে আগে তো নিমুদা আমার সঙ্গে কথা বলতেন। এখন কথা বলতে এসে যেন লজ্জায় ঘেমে যান। কি যেন বলতে চান, কিন্তু ওঁর চাউনিতে যেন আমার সারা দেহ নৃত্য করতে থাকে, সমস্ত দেহে যেন আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। ইঁ্যা, এমন লজ্জা তো আমার কোনদিন ছিল না। আমি যে লজ্জায় পালাবার পথ পাই না। আমার লজ্জা দেখে নিমুদা স'রে পড়েন, কাছে আসতে চেয়েও আসেন না। আজ আমি ওঁর সাথে এগিয়ে যেয়ে কথা বলব। উনি তা হলে হয় ত কিরে যাবেন না। মনের কথাটি বলবেন। কই সন্ধ্যা তো যায়, তিনি হয় ত আজ আর আসছেন না। (ভূষিত দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া) ঐ যে আসছেন। (দৃষ্টি অন্তদিকে ফিরিয়ে নিয়ে অন্তমনস্কতার ভাণ)।

নিমাই—(এগিয়ে এসে) কি গো লক্ষ্মী, তুমি আগে ত আমার সঙ্গে কথা কইতে, আজকাল এমন লজ্জা কর কেন?

লক্ষ্মী—ঠাকুর, তোমায় দেখে আমার বড্ড লজ্জা করে।

নিমাই—তা' এখন বুঝি আমায় তোমার ভাল লাগে না?

লক্ষ্মী—(মাথা নত করে, মুহূ স্বরে) খুব ভাল লাগে।

নিমাই—তবে কথা কও না কেন?

লক্ষ্মী—লজ্জা পায়।

নিমাই—আমি তোমায় দেখার জন্য অনাচে কানাচে বুরি, কতদিন ইচ্ছা হয় তোমার সঙ্গে কথা কই। তুমি বড় সুন্দরী।

লক্ষ্মী—ইস, তোমার মত সুন্দর কে? (সজল চোখে)
তুমি আমায় ঠাট্টা করছ?

নিমাই—না ঠিক বলছি, আমি তোমায় বড় সুন্দর দেখছি। আমার ইচ্ছা করে, আমি দিন রাত তোমার সঙ্গে কথাবলি। তুমি কি আমায় ভালবাস?

লক্ষ্মী—(অধোবদনে নিরুত্তর)

নিমাই—কথা বলছ না যে?

লক্ষ্মী—কি বলব?

নিমাই—তুমি আমায় ভালবাস কি না?

লক্ষ্মী—তোমায় ত ন'দে শুদ্ধ সকলে ভালবাসে।

নিমাই—তা বাস্তব, তুমি ভালবাস কি না?

লক্ষ্মী—(মুখ কাপড়ে ঢেকে) বাসি গো বাসি, খুব ভালবাসি (ছুটে পলায়ন)

[শশিমুখীর প্রবেশ]

শশী—কি গো নিমুদা, এমন সিঙ্কি-খোরের মত দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? এই না লক্ষ্মী এখান থেকে ছুটে চলে গেল। ওকে কিছু বলেছ নাকি?

নিমাই—কি আর বলব, বলবার কি আছে?

শশী—বিয়ে-টিয়ে করব বলে ভয় দেখাও নি ত?

নিমাই—ধেং—

শশী—যখন তোমার বয়স ছয় বছর ছিল, তখন তুমি তিন বছরের মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে! সে রোগটী তোমার বেশ আছে।

নিমাই—যা বা—আর ছেলেমি করিস না।

শশী—আমি লক্ষ্মীর প্রাণের সহ—গঙ্গাজল, সে তার মনের সব কথা আমায় খুলে বলে।

নিমাই—(আগ্রহ দেখাইয়া) কি বলে? আমার কথা কিছু বলে নাকি?

শশী—বরং তোমার কথা ছাড়া আর কোন কথাই বলে না।

নিমাই—বল না, কি বলে?

শশী—যাই, এই মাত্র তাড়িয়ে দিচ্ছিলে! আমার বাড়ীতে ঢের কাজ আছে। বাবা নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাড়ী ফিরে এসে শশী শশী বলে ডাকছেন।

নিমাই—এই কথাটা একটু বলে যা। লক্ষ্মী আমার কথা কি বলে?

লক্ষ্মী—বলবে আর কি! তোমায় সে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছে। রোজ প্রাতে ফুল তুলে আনে, দুর্বাগুলি ধুয়ে, চন্দন ঘষে তামার পায়ে রাখে আর বলে তোমায় সে নিবেদন করে দিয়েছে। রোজ রাতে সে তোমার ছবি পূজা করে।

নিমাই—আমার ছবি! আমার ছবি পেল কোথায়?

লক্ষ্মী—ও, তাও তুমি জান না? তার দাদা যে তাকে ছবি আঁকা শিখিয়েছে। সে তোমার একখানি চমৎকার ছবি আঁকেছে। তা কাউকে দেখতে দেয় না। শুধু আমি দেখেছি। তার বাবা তাকে খুব ভাল সংস্কৃত শিখিয়েছেন। সে তোমার কথা নিয়ে সংস্কৃত কত কবিতা লেখে। সে বলে যে, যেমন আমার ফুল চন্দন, তেমনই আমার কবিতা। এই উপচারের তিল-তুলসী দিয়ে আমার জীবন ওকে নিবেদন করে দিয়েছি। আমি বলুম, তোর সঙ্গে যদি ওর বিয়ে না হয়? সে বলে না হ'লে আর করব কি? চিরকুমারী হ'য়ে মনে মনে তার পূজারী হ'য়ে থাকব।

পট-পরিবর্তন

মিশ্রবাট,

নিমাই ও লক্ষ্মী

লক্ষ্মী—আমাদের এই দেখা-শোনা নিয়ে পাড়ায় কথা উঠবে। আমার বয়স তো চৌদ্দ হয়েছে, তুমিও ঠাকুর ১৮১৯ বছরের ছেলে, আমাদের নির্জনে দেখা শুনাটা কি ভাল?

নিমাই—কি নিন্দা লক্ষ্মী! নিন্দা হ'লে আমি অমনি তোমায় বিয়ে করে ফেলব। সকলের মুখ বন্ধ হ'য়ে যাবে। (হাস্য)

লক্ষ্মী—(স্বগত) কি সুন্দর হাসি! যেন কত কুন্দ ফুটেছে, রজনী গন্ধার কুঁড়ি দেখা যাচ্ছে! (প্রকাশ্যে) ছিঃ ঠাকুর, তুমি বড় পাগল। কি যে বল!

নিমাই—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

লক্ষ্মী—কি বল?

নিমাই—তোমার নাম তো লক্ষ্মীপ্রিয়া, আমি যদি তোমায় শুধু প্রিয়া বলে ডাকি!

লক্ষ্মী—(স্বগত) এমন শোভাগ্য কি আমার হবে? আমি কি চাঁদ হাতে পাব?

[লক্ষ্মীর লজ্জায় আরক্ত হয়ে পলায়ন]

নিমাই—এষে “সংকারিণী স্তবকিনীলতেব।” আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, কাব্য পড়বার এমন ঝোঁক তো আমার কোন কালেই ছিল না। কেবল “স্বমসি মম জীবনং স্বমসি মম ভূষণং—স্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নং” প্রভৃতি শ্লোক আপনা আপনি আমার মুখে আসে। “কুসুমপি যৌবনং অঙ্গেষু সন্মথং” এবং “সরসিজমহুবিধং শৈবালে সাপি রমাং। মলিনমপি হিমাংশু লক্ষ্মী লক্ষ্যং তনোতি, ইয়মধিক মনোজ্ঞা বন্ধলেনাপি তস্মৈ, কিমপি হি মধুরানাং মণ্ডনাং না কৃতীনাং” প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ যেন মর্মে নতুন করিয়া বুঝি। আগে তো অলঙ্কার ও ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে এগুলি পড়তুম, এখন যে এগুলির রসে আমি দিনরাত ডুবে থাকি! লক্ষ্মী! তোমার রূপ যে আমার চোখে লেগে রয়েছে, কোথায় গেল অষ্টাধ্যায়, কুসুমাজ্জলী আর তত্ত্ব চিন্তামণি!

পটক্ষেপ

গঙ্গাতীরে রাজপথ

নিমাই ও বনমালী ঘটক

নিমাই—ঘটক মশাই নমস্কার।

ঘটক—কি ছোট পণ্ডিতটি? বড় যে গম্ভীর দেখাচ্ছে? ওটা যে তোমার স্বভাবে মোটেই মানায় না! তোমার গাম্ভীর্য্য দেখলে যে আমার হাসি পায়। নদী যদি চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায় (মৃদু হাস্য)—

নিমাই—ঘটকরাজ, হানবেন না, আমি প্রকৃতই কষ্ট পাচ্ছি।

ঘটক—সকলের ছলল তুমি! আমাদের চোখে মণি, মায়ের জীবন সর্বস্ব। তুমি কষ্ট পাচ্ছ! তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগলে যে নদেবাসীর বুকে শেলের মত বিধে। তোমার কি কষ্ট?

(নিমাই ঘটককে টেনে নিয়ে রাস্তার এক কোণে নিরালায় কি বলতে লাগলেন)

বনমালী—বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এর জন্ত তোমার ভাবনা কি? আমি এখনই বাঁধদার বাড়ী যাচ্ছি—এই বিয়ে ঠিক করে আসছি। তোমার মত জামাই পেলে যে তাঁরা লুফে নেবেন।

নিমাই—তা,—আমি আপনার জন্ত এখানে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছি।

বনমালী—এখন ঠিক দুপুর বেলা, বলভদ্রা এখন বাড়ীতেই আছেন, তার স্ত্রীও আছেন, কথা বলে এখনি ফিরে আসছি। (প্রস্থান)

নিমাই—(পদচারণ করিতে করিতে) বুকটা ছুঁ ছুঁ করছে। লক্ষ্মী, তোমায় না পেলে কি করব! এক একবার মনে হয়, তোমাকে নিয়ে পালিয়ে কোন নিবিড় জঙ্গলে চলে যাই। সেখানে পাতার কুটীর তৈরী করে থাকি, তুমি আর আমি! কিন্তু মাকে ছেড়ে তো আমি থাকতে পারব না। মা যে আমার মুখের দিকে চেয়েই আছেন। এই তো কতক্ষণ হোল বনমালী ঘটক গেছেন, ফেরবার নামটি নাই। তাঁরা কি দেখে আমার হাতে লক্ষ্মীকে দেবেন? লক্ষ্মী যে তাঁদের বড় আদরের মেয়ে! আমার চেহারাটা ভাল মশাই বলে! বয়স ও বর্ণ, পাণ্ডিত্যের কিছু খ্যাতি হয়েছে, কিন্তু লোকে আমায় বলে নিম্নে পাগল। মা’ তা’ করি,—শুধু যে যাব, লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দাও আমি ঠিক বলছি, আমি শুধু যে যাব। শুধু যে যেতে আর কি? কারকে ভেদচায় না, শ্রেয় করব না, খুব গম্ভীর চালে বসে থাকব। এ আর শক্ত কথা কি? কিন্তু আমি যে গরীব! এই গরীব পাগল ছেলের হাতে তাদের সুন্দর ছললীকে দেবে কেন? না দিলে দোষ দিতে পারি না। আমার কি সম্পত্তি আছে যাতে লক্ষ্মীকে স্থখে রাখতে পারি? আচ্ছা সেই কোন

P11154

~~২১~~

সময় ঘটক ঠাকুর গেছেন, এখন পর্যন্ত ফেরবার নামটি নাই! বোধ হয় সম্মতি পায় নাই, খুব তর্ক জুড়ে দিয়েছে। এই যে পথের ডান দিকে মাথাটা দেখা যাচ্ছে—ওটা একটা টিকি নয়? হাঁ ঘটকই বটে! শীগ্গির চলে এস। এমন গুনে গুনে পা ফেলছ কেন? মনে হচ্ছে এই পথটুকু আসতে তোমার আরো দুটি দণ্ড লাগবে।

ঘটকের আগমন

নিমাই—কি হোল, বলুন। শীগ্গির—শীগ্গির বলে ফেলুন! এতটা দেরি করলেন কেন, আমার তো রোদে প্রাণ ওষ্ঠাগত!

ঘটক—রোদ না আর কিছু! আমার যখন তোমার মত বয়স ছিল—তখন একটা দিন একটা বছরের মত ঠেকত। আমার দেরী তোমার কাছে তেমনি বেশী ঠেকছে।

নিমাই—আচ্ছা আপনাকে আর ভণিতা করে সময় নষ্ট করতে হবে না। বলে ফেলুন।

ঘটক—খবর খুব ভাল, তারা তো এতটা আশাই করতে পারেনি! যে দিন তোমার মা বলবেন, সেই দিনই তারা প্রস্তুত। এখন সন্দেশ আনো।

নিমাই—এখন আরো কাজ আছে—এখনও সন্দেশ খাওয়ার সময় হয় নি। আপনি আমার মায়ের কাছে যেয়ে বলুন যে বল্লভ আচার্য্য আপনাকে দিয়ে তাঁদের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। এখন মায়ের মতটা অহুকুল করে ফেলে এবং দিনটা ঠিক করে সন্দেশ আদায় করুন।

ঘটক—তবে তুমি এইখানেই অপেক্ষা করবে?

নিমাই—করব বই কি? সেরারের মত দেরী করবেন না?

বন—কিছুমাত্র দেরী করি নাই, তুমি সেরারের মত উতলা হ'য়ে না।

[প্রস্থান।]

নিমাই—(পূর্ববৎ পদাচার্য্য করতে করতে স্বগত) ম-কি মত দিবেন না? অবিশ্বি আমার মতটা হয় ত জানতে চাইতে পারেন। না চাইলেই বা কি? ধর তিনি যদি এই বিয়ে করতে বলেন, তবে আমি কি মায়ের

আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি? আমি লক্ষ্মীকে বিয়ে করতে সম্মত। মা তো আমারই মা, ছেলের বিয়েতে কি আর তিনি নারাজ হ'তে পারেন! আর তিনি তো বুড়ো হয়েছেন, আমার কর্তব্য তাঁকে সংসারের নানা ভাবনা ও বাঞ্চাট হ'তে যতটা পারি রেহাই দেওয়া। লক্ষ্মী তো ছায়ার মত তাঁর পায়ে পায়ে হাঁটবে। আচ্ছা এই ফান্সন মাসই তো বিয়ের মাস! কোন্ কোন্ দিন আমাদের রাশির পক্ষে ভাল ও স্তত্বেয়ক যোগ আছে, পাজিটা দেখে তা এখনি ঠিক করে ফেলব, আশুক ঘটক।

[চিন্তাশ্রিত ভাবে পায়েচারি, বনমালী ঘটকের আগমন]

নিমাই—কি ঘটকরাজ, (মুখ দেখে) একি আপনার মুখ এমন মলিন দেখছি কেন? আপনি যেন কোন অশুভ সংবাদ এনেছেন মুখ দেখে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।

বনমালী—খবরটা অবশ্য ভাল নয়। বরং তোমার মায়ের কতকটা ধমক খেয়ে আসতে হয়েছে।

নিমাই—ধমক! কেন—কি অপরাধ?

বনমালী—তিনি প্রস্তাব গুনে বলেন, ঘটক, তুমি এই প্রস্তাবের উৎসাহ দিচ্ছ! যিনি মাথার উপর ছিলেন, তিনি চলে গিয়েছেন, আমার হৃদয়ের ছেলে নিমাই, শিবের সন্তে, তার উপর সংসারের ভার। এখন ও লেখাপড়া করছে, দু'দিন হ'ল সবে একটা টোল খুলেছে, এর মধ্যে—এই কিশোর বয়সে ওর ঘাড়ে একটা বধু চাপিয়ে দেব! আর তোমাদের মত বন্ধু-বান্ধবেরা—যারা এই ছোট অনাথ সংসারটার হিত চিন্তা করবেন, ছেলেটি যাতে উপার্জন ক'রে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, কোথায় সেই বুদ্ধি দেবেন, তা' না, এই উঠন্ত বয়সে তার উপরে চাপ দিয়ে ভারটা বাড়াবার উজোগ করছেন! আমার দুঃসময়, চার-দিক আঁধার দেখছি; এ সময়ে বিয়ের আমোদ-প্রমোদ! কি বলব, আমার কপাল!" তিনি এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যে, আমার আর একটা কথা উত্তরে বলার পথ দেখতে পেলুম না।

নিমাই—তাই তো, আমি নিজে গিয়ে কথাটা পাড়ি।

[উভয়ের প্রস্থান]

পটক্ষেপ

—দৃশ্য পরিবর্তন—

(জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী)

নিমাই—(বাড়ীর ভিতরে ঢুকে) মা, মা, মা—

শচী—(ঘর হইতে বাইরে এসে) কেন রে নিমাই, এমন করে জোরে জোরে ডাক্‌ছিস কেন, যেন তোর রাগ হয়েছে?

নিমাই—রাগ একটু হয়েছে বই কি? বনমালী ঘটক বড় আশা করে নাকি কি কথা তোমাকে বলতে এসেছিলেন তুমি তাঁকে ধমকে দিয়েছ! আহা বেচারী মুখ কালো ক'রে চলে গেলেন, তাঁকে দেখে বাস্তবিকই আমার বড় কষ্ট হ'ল, তোমার এমনধারা ব্যবহার উচিত হয় নি। আমি বড় ব্যথা পেয়েছি। তুমি তাঁকে ডেকে এনে এমনভাবে কথা বল, যেন তাঁর মনের কষ্ট দূর হয়। তিনি তো ঠিক কাজই করেছেন। তাঁর পেশাই এই। দেখলুম, যেন তাঁর মুখে কেউ কালি ঢেলে দিয়েছে।

[প্রস্থান।]

শচী—(স্বগত) হাঁ, বুঝছি, ব্যথাটা পেয়েছ তুমি, প্রস্রাবটা অবস্থা বলভাচার্য্যের বাড়ী থেকে এসেছে, কিন্তু মূলে তুমি! হাঁরে নিমাই, তোর যাতে স্থখ হয়, তার জন্ত আমি প্রাণ দিতে পারি, এ ছার জীবনের আর কি লক্ষ্য আছে? আমার কি অমৃত অরুচি? একটি বউ পেলে যে আমি হাতে স্বর্গ পাই। কেবল তোর ভবিষ্যৎ ভেবে না আমি আমার ইচ্ছা রোধ করে রেখেছি। তোর যখন ইচ্ছা—আর লক্ষ্মীয় মত এমন লক্ষ্মী মেয়ে, তখন আমার এই যোগাযোগে কোনই অমত নেই। বরং এই ব্যাপারে আমার খালি বুকটাও অনেকখানি নূতন আশায় ভর্তি হয়ে যাবে। আমি যত শীঘ্র পারি, বিয়ের উত্তোগ করছি।

ঈশান—ঈশান—একবারটি এদিকে এস।

[ঈশানের প্রবেশ]

ঈশান—এই যে আমি, কেন মা কি করতে হবে?

শচী—তুমি এখুনি যেয়ে বনমালী ঘটককে ডেকে আন।

পটক্ষেপ

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

গদাধরের বাড়ীর নিকট করবী-তলা

গদাধর ও নিমাই

নিমাই—কি হে গদাই, তোমায় যে আর দেখতে পাবারই যো নেই! প'ড়ে শুনে একবারে তুমি গীর হ'লে! ধর্ম ধর্ম ক'রে মেতে উঠেছ। সন্ধ্যাকালে গদার তীরে আগে বেড়াতে যেতে, তা ছেড়ে দিয়েছ!

গদাধর—তুমি ভাই বুড়ো হয়েও রাস্তা ঘাটে যে সকল উপদ্রব কর, তা বড় অশোভন।

নিমাই—কেন? একটু নির্দোষ আশ্রয় প্রার্থনা কি দোষের? তাতে কি একটু ক্ষুভি হয় না? এই নদে সহরটা আশ্রয়, যে দিকে একটু কিছু হবে, সেই দিকেই লোকের ভিড়! রাস্তা দিয়ে একটা হাতী গেলও শত শত লোক জড় হবে, আর কোন সাধু বা অসাত্ত্বিক দেখলে তেমনই ভিড়! চুরি ডাকাতি বেড়ে চলেছে, দরিদ্রের হুংখ কার মনে দয়ার উদ্রেক করে না—বেবল ধর্ম ধর্ম করে লোকে পাগল। এই সকল বাজনা বাজিয়ে গাল বাদ্য করে, নৈবিদ্যি সাজিয়ে কি ধর্ম হয়? ধর্ম বসে তাস-পাশা খেলবেন। না হয় বিষয় সম্পর্কে গল্প করবেন। এদিকে পুরুষ ঠাকুর চীৎকার করে মন্ত্র পড়ে তার জন্ত স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করবেন। গায়ে কতকগুলি ছাই মেখে, গাঁজা খেয়ে চক্ষু লাল করে, চিমটে হাতে সাধু-বেদী ভণ্ডা চলেছেন, তার ভিতর যত নষ্টামি, আর বিশ্বাস নরনারী যেয়ে তাঁর পায় পড়ে কত কাতর নিবেদন করবেন, যেন তাঁরা কত অপরাধী! বাক্ সে সকল কথা! কিন্তু তোমার মত পণ্ডিতও যে শেষে এই কপটাচারীদের সাদ মিশে যাবে—এটা আশ্চর্য্য! কে ঈশ্বরপুত্রী এসেছেন—সে যেন এক আশ্চর্য্য বস্তু! অমনি পি'পড়ের সারের মত চলছে পুরুষ, স্ত্রী তাঁকে দর্শন করতে, তাঁর পায়ে অপরাধ জানাতে। বুড়ো কেবলই ভুল সংস্কৃতে মন্ত্র আওড়ায় আর ধর্ম ব্যাখ্যা করে, আমি মাঝে মাঝে ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছি। সত্যি সত্যি বলছি, এই ধর্ম ধর্ম আমার ভাল লাগে না। জন সাধারণের মধ্যে ধর্ম কি এক পাও এগিয়েছে?

এই ভণ্ডাদের দ্বারা কি জগতের কোন মঙ্গল হয়েছে? কিন্তু তুই যেয়ে ঈশ্বরপুরীর আড্ডায় বকের মত বসে থাকিস কেন, বল দেখি? ও যে ভুল শ্লোক বকে যায়, তাকি তুই বুঝিস না? কিন্তু ওর কাছে তুই একেবারে যেন জুজু, গদগদ কর্ত। এই ভণ্ডামি তুই করিস দেখে বড় ব্যথা হয়। আর পুরী-গোসাঁইও তো তোকে পেয়ে বসেছে! যা বলছেন, যা কচ্ছেন, তোর দিকে নজরটি ঠিক আছে। টিকটিকি যেমন আরশোলা ধরে, তোকে গোসাঁই ভেল্লি ধরেছেন।

গদা—দ্যাক নিমাই, গোসাঁই-সম্বন্ধে এরূপ কথা বলতে নাই। তুই কি বলতে চাস যে, ব্যাকরণ জানাটা পুরুষার্থ? ইনি একজন খাটি ঈশ্বর-প্রেমিক, অথচ তোমার ব্যবহারটা কি, তা বুঝতে পাচ্ছ না? তিনি কত ভক্তি-প্রেমের সঙ্গে তোমার কাছে তাঁর স্বরচিত বিমুগ্ধভক্তি রত্নাবলীর শ্লোক বলতে গেলেন। আর তুমি তার থেকে খুঁজে ব্যাকরণের ভুল বের ক'রে বললে, “এ ধাতু আত্মনেপদ নয়।” যখন তিনি তন্ময় হ'য়ে ভক্তির ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন তোমার সেই ব্যাকরণের খবরদারী দেখে, তিনি একেবারে ভাবাচাচাকা খেয়ে গেলেন। তিনি পরাতত্ত্ব আপনাকে আবিষ্ট ক'রে কথা বলছিলেন, তখন তুমি এই বাধা দিলে, তিনি সকলের কাছে অপদস্থ হ'লেন। তাঁর কিন্তু মান-অপমান-বোধ নেই। তিনি বলেন, ‘বেশ তো’, ওরা ত এখন পড়ছে। এ সকল ক্রটি বিচ্যুতির দিকে একটু স্তম্ভ দৃষ্টি রাখবেই।” তিনি তোকে কত ভালবাসেন, আর বলেন, এই ছেলেটিকে দেখলে আমার হরিভক্তি বেড়ে যায়। ওর নির্মল সঙ্গ-প্রফুল্ল-শ্বেত-গন্ধের মত মুখখানি দেখলে আমার মনে হয়—মুখখানি যেন একখানি শাক্ত। তার মধ্যে ভগবানের নাম লেখা।” তাঁর উপর তোর এই মনোভাব ও ব্যবহার!

নিমাই—নে—নে, আর ভণ্ডামি করতে হবে না। এ সকল ভক্তি-বিটলামি আমি একেবারেই সইতে পারি না। আর, তোর মধ্যে গোসাঁই কি দেখছেন যে, উঠতে বসতে কেবল ‘কই গদাধর, কোথায় গেল’রব? আমাকে ভালবাসেন, ছাই ভালবাসেন, তোর দিকে চেয়েই সব কথা, সব ব্যাখ্যা, আর তোরা সব জুজুরা, বৌদ্ধ স্থবিরের মত ব'সে ব'সে ওই সকল ভুল শ্লোক শুনে যাস, যেন তোরা কত বোদ্ধা! এ

সকল ভণ্ডামি টণ্ডামি ছেড়ে দে। যাই, টোলে যেতে হবে।

গদাধর—নিমুদা, তোর টোল তো খুব জাঁকিয়ে উঠেছে। তোর পড়ানো শুনবার জ্ঞান শুদ্ধি, বাইরের লোকও বিশ্বর জমা হয়। তাঁরা তোর খুব তারিফ করেন, বলেন নবদীপে মহা মহা পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনেছি, কিন্তু এমন ক্ষুরধার বুদ্ধি কারে নাই। ব্যাকরণটা এত কঠিন জিনিষ, তুই এই কঠোর বিষয়টাকে নাকি দস্তুরমত মনোজ্ঞ করে তুলেছিস?

নিমাই—বলেছি তো এই নগরটা একটা তাজ্জব জায়গা। যে কেউ জোরে কথা বলবে, অমনি ভিড় জমা হবে। রাস্তার লোক এসে ব্যাকরণ অধ্যাপনার বিচার করতে বসবে ও সমালোচনা করবে। ও-সকল স্তোক বাক্যে আমার তৃপ্তি হয় না। তুই একদিন যাস, আমার টোল দেখতে।

গদাধর—যাব, নিশ্চয়ই যাব।

নিমাই—যাস তাই। আমি তো তোর সমালোভে ভ্রমরের মত উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। তা, তুই কি আর আমার কাছে আসতে চাস? কেবল ঈশ্বর পুরীর পেছন পেছন ফির্বি। তাই ভাবি, তোর মত পণ্ডিতকে এই বুড়া মিন্সে কি করে যাদু করে?

[ঈশানের প্রবেশ]

ঈশান—নিমুঠাকুর, মা আপনাকে ডেকেছেন, আজ তিনি পাঁচ সাত রকমের তরকারী রান্না করেছেন। তা ছাড়া বেতো শাক, উচ্ছে ও পটল ভাজা আছে। আর আপনার টোলের এক ছাত্র অনেকটা দুখ দিয়ে গেছে। তিনি তাই দিয়ে পুলা পিঠে ও ক্ষীরের নানারূপ মিষ্টান্ন তৈরী কর্ছেন। গদাই ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

নিমাই—(গদাধরের প্রতি) শুনলে তৌ? এখন চল।

গদাধর—তা য়ায়ের ডাক, প্রসাদ পাব, এতো এড়াবার যো নাই। তাঁর হাতের রান্নার যশ তো নদেবাসীর ভাল করেই জানে। খাবার লোভ তো চিরদিনই আছে। একবার যে খেয়েছে, সে কি কখন ভুলতে পারে?

নিমাই। তোকে অনেক দিন দেখতে পান না, এইজন্ত এই ঘুম দিয়ে তোর দর্শন ইচ্ছা কর্ছেন

গদাধর। আচ্ছা, তাঁর আর বক্তৃতা করে তাঁর উদ্দেশ্য
বুঝাতে হবে না! [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—তৃতীয় দৃশ্য—

(জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী) • • •

[লক্ষ্মীর শয়্যাগৃহ—লক্ষ্মী একাকী]

লক্ষ্মী—(স্বগত) 'ছটি' মাস 'বাড়ীতে' নেই। তিনি
যখন যান, মা যেতে দিতে চান নি। 'কিন্তু' মাকে বসেন,
বঙ্গদেশে তাঁর সম্মান খুব বেশী, সেখানে থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে,
তাঁর বিশ্বাসিগর টাকা সে দেশের টোলে খুব চলে কিনা;
সেখানে 'প্রচুর' দক্ষিণা দেবে। 'আর' পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ
না রাখলে চলবে 'কি' 'ক'রে?' 'কতখান' থেকেই তো নিমন্ত্রণ
আসবে। 'সে' 'সকল' উপলক্ষে বিচার করাও 'তো' পণ্ডিতদের
কাজ। 'মা' 'তো' 'এই' 'সব' 'শুনে' 'ছেড়ে' 'দিলেন', 'কিন্তু' 'আমার'
মন 'তো' 'কিছুতেই' 'মানে' 'না'। 'আমি' 'যে' 'সেই' 'অবধি'
মণিহারী ফণীর 'মত' 'হ'য়ে 'আছি। 'কে' 'যেন' 'কানে' 'কানে'
বলছে, 'তাকে' 'আর' 'পাবে' 'না! 'হায়' 'তিনিই' 'যে' 'আমার'
দৈবতা—'আমার' 'পক্ষপ্রাণ',—'তাকে' 'না' 'দেখে' 'আর' 'কতদিন'
এমন' 'করে' 'থাকব'। 'এক' 'একটি' 'দিন' 'যায়' 'যেন' 'এক' 'একটি'
বহুরের 'মত'। 'সময়' 'তো' 'আর' 'কাটে' 'না'। 'শচীর' 'প্রবেশ'।

শচী—বোমা, এই 'দ্যাখো' 'নিম্ন' 'চিঠি' 'পাঠিয়েছে।
নদের' 'মথুরা' 'পাণ্ডা' 'ছিলেটে' 'গেছিল', 'তারি' 'সাথে' 'আমার'
নিম্ন' 'চিঠি' 'দিয়েছে। 'চিঠি' 'দশই' 'জ্যৈষ্ঠ' 'লিখেছে', 'আজ'
আষাঢ়ের 'বিশে',—'এক' 'মাসের' 'কিছু' 'উপর'। 'তা' 'মথুরী'
পাণ্ডা 'নানা' 'জায়গা' 'ঘুরে' 'এসেছে', 'তা' 'না' 'হোলে' 'চিঠিখানা'
আরো 'আগেই' 'পাওয়া' 'যেত'। 'এই' 'শাওণ' 'মাসের' 'শেষ'
শেষি 'নিম্ন' 'বাড়ী' 'ফিরবে'। 'তুমি' 'চিঠিখানি' 'পড়ে' 'দ্যাখো';
আজ 'মালিনী' 'সহ' 'আমাদের' 'খাওয়ার' 'নিমন্ত্রণ' 'ক'রে' 'গেছেন'।
সে 'গেছে' 'অবধি' 'তুমি' 'যে' 'একবারে' 'ঘরের' 'কোণ' 'নিয়েছ'!
'কান্ন' 'সঙ্গে' 'মেশ' 'না', 'ঘরের' 'বার' 'হও' 'না'। 'পত্রটি' 'পড়ে'
দে'খ, 'সে' 'কেমন' 'সম্মান-আদর' 'পেয়েছে'; 'জেনে' 'খুসী' 'হবে'।
সইএর 'বাড়ী' 'যাওয়া' 'চাই', 'একটু' 'সাজগোজ' 'করতে' 'হবে';

এমন 'সুন্দর' 'চুলে' 'একবারে' 'জট' 'ধরে' 'গেছে'। 'ধুতুরা' 'ফুলের'
মত 'গা' 'থেকে' 'ধূলি' 'উড়ছে'। 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন' 'হয়ে' 'ভাল'
সাড়ী' 'প'রে 'যেও'। 'শশীমুখীকে' 'বলেছি'; 'সে' 'তোমার' 'চল'
বৈধে' 'দেবে'। 'সইয়ের' 'বাড়ীতে' 'ভাল' 'মুখে' 'কথা' 'বাহা'
বোলো'। 'নিম্নের' 'জন্ম' 'দিন' 'রাত' 'আমার' 'মনটা' 'ছট্‌ফট্‌' 'করে',
'কিন্তু' 'আমি' 'তোমার' 'মতন' 'এতটা' 'মুসড়ে' 'পড়ি' 'নাই'! 'এ' 'ও'
যে 'তার' 'অকল্যাণ' 'হয়'।

লক্ষ্মী—মা, আমার 'কান্ন' 'বাড়ীতে' 'যেতে' 'ইচ্ছে' 'হয়' 'না'।
'কান্ন' 'সঙ্গে' 'কথা' 'কইতে' 'ইচ্ছে' 'হয়' 'না'। 'কিন্তু' 'ও' 'বাড়ীতে'
'গেলে' 'তো' 'হবে' 'না', 'তাঁরা' 'ভাববেন' 'কি'? 'যখন' 'আপ' '
বলছেন, 'যাবই'।

(শচীর প্রস্থান)

(লক্ষ্মীর একান্তে নিমায়ের পত্র পাঠ)

শ্রীচরণকমলেশ্বর—পাদপদ্মে শত শত প্রণাম পূর্ণ্য
নিবেদন,—

মা, আমি 'নদে' 'হ'তে 'রওনা' 'হয়ে' 'উলো', 'শান্তিপুর'
প্রভৃতি 'জায়গায়' 'কিছু' 'দিন' 'ঘুরে', 'ফরিদপুরে' 'কোটালীপাড়া'
ঢাকায় 'বিক্রমপুর', 'এবং' 'এগারসিন্দুরে' 'কতক' 'দিন' 'ছিলাম'
তার 'পরে' 'ছিলেটে', 'ঢাকা' 'দক্ষিণ' 'গায়ে' 'এসে' 'আমাদের'
পৈত্রিক 'বাড়ীতে' 'কতক' 'দিন' 'কাটালেম'; 'আমার' 'ঠাকুর'
দাদা' 'মারা' 'গেছেন', 'বাবার' 'মৃত্যুর' 'কথা' 'শুনে' 'তিনি' 'মাত্র'
১৫ 'দিন' 'জীবিত' 'ছিলেন'। 'আমার' 'বড়' 'কষ্ট', 'তাকে' 'দেখতে'
পেলেম 'না'। 'ঠাকুরমা' 'আমাকে' 'পেয়ে' 'যে' 'কি' 'আদর' 'কলেন'
তা 'আর' 'কি' 'বলব'। 'আমাদের' 'বাড়ীর' 'ঠিক' 'আঙ্গিনার' 'মধ্যে'
একটা 'কাটাল' 'গাছ' 'আছে', 'তার' 'কোয়াগুলি' 'কি' 'মিষ্ট' 'ও'
সুগন্ধ'। 'একটি' 'ফল' 'পাকলে' 'যদি' 'একবারে' 'পেয়ে' 'গন্ধ' 'ভেসে'
ভেসে' 'আসে'। 'মেরো' 'খুড়োর' 'ইচ্ছাক্রমে' 'আমাকে' 'একখানে'
চণ্ডীয়া 'পু' 'থি' 'নকল' 'করে' 'দিতে' 'হয়েছিল'। 'আদত' 'পু' 'থি' 'একে-
বারে' 'গলে' 'গিয়েছিল', 'কিন্তু' 'আমাকে' 'দিয়ে' 'সে' 'বই' 'মকল'
করার' 'অর্থ' 'আমাকে' 'কয়েক' 'দিন' 'সেখানে' 'থরে' 'রাখবার' 'চেষ্টা'।
বহু 'কষ্ট' 'করে' 'আমাকে' 'পিতৃভূমি' 'হ'তে' 'আমার' 'অহুমতি'
ধেতে' 'হয়েছে'। 'যাহা' 'হউক', 'আমায়' 'যারা' 'নিতে' 'নদে'
গিয়েছিলেন 'সেই' 'দীর্ঘহরি' 'বিদ্যারত্ন' 'ও' 'অজিতপঞ্চানন'
আমার' 'সঙ্গেই' 'ছিলেন'। 'যেখানে' 'গিয়াছি', 'সেইখানেই'

লোকের ভিড়। মেয়ে-পুরুষেরা আমায় যে কি আদর আপ্যায়ণ করেছেন, তা আর কি বলব! (এই পর্য্যন্ত পুড়ে লক্ষ্মী আঁচলে মুখ মুছল—“আমার প্রাণের ঠাকুর তোমাকে বুকে পেলে কে ছাড়তে চায়।” পুনরায় পুত্র পাঠ।) এখানকার টোলগুলিতে আমার ব্যাকরণের টীকা সন্ধান পড়ে। পূর্ববঙ্গের সব জায়গায় লোকে আমার নাম জানে নদের লোকের মত তারা আমাকে ‘নিমাই পাগলা’ বলে জানে না, দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। এখানে আমার নাম “পণ্ডিত বিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর, বাদী সিংহ। তোমার কাছে নামটা খুবই অদ্ভুত শোনাচ্ছে। বিদ্যাসাগর উপাধিটা তো গদাধর পণ্ডিতের কাছে পাওয়া। কিন্তু তুমি জান, কেশব কাশ্মীরীকে বিচারে জয় করার পরে নদের পণ্ডিতেরা একটা সভা করে আমাকে ‘বাদী সিংহ’ উপাধি দিয়াছিলেন। আদর ও শ্রদ্ধা এখানে যা পেয়েছি, তা আর কি বলব! আমাদের ২৪ বৎসর আর অর্থাভাব হবে না। কিন্তু আমার মনটা উতলা হয়ে আছে। তোমার পাদ-পাদ্মের জন্ত। কবে তোমার পায়ের ধূলা মাথায় নিতে পারব, আবার কবে তোমার অমৃততুল্য রান্না খাব? মা আমি যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারছি না।

আর একটা কথা, সেদিন স্নেহ দেখলেম লক্ষ্মীকে। সে যেন সজল চক্ষে বলছে, আমায় তোমার শ্রীচরণ সেবার অধিকার দিয়েও দিলে না। তুমি ফিরে আসবে, কিন্তু আমায় পাবে না। সেই অবধি মনটা বড় বিচলিত হয়ে আছে। কে যেন কাণে কাণে আমায় বলছে তাকে আর পাবে না। তোমরা খুব সাবধানে থেক।—পদাশ্রিত নিমাই।”

মিশ্রের বাড়ীতে গদাধরের প্রবেশ

গদা—মা, মা, বাড়ী আছেন?

শচী—কে গা, আমার গদাই নাকি? এস বাছা, তুমি যে আমার নিমুর প্রাণের সখা, সে তো তোমায় ছাড়া জানে না। আমার বড় দুঃখের নিমু। এস, তোমায় দেখলে মনে হয় যে নিমু এসেছে।

গদা—মা, আজ মথুর পাণ্ডার কাছ থেকে নিমুর চিঠি পেয়েছি আপনারাও পেয়েছেন, নিমু লিখেছে। এ চিঠিখানিও পুড়ে দেখবেন, আমার অল্প একটু কাজ আছে, থাকতে পারছি না, শীগ্গির যাত্রার দরকার। নির মুদ্রা

তো ভাল আছেন? আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাব। (শচীর হাতে চিঠি দিয়ে প্রস্থান)

(পত্রখানি শচীর পাঠান্তে লক্ষ্মীকে দেওয়া)

(লক্ষ্মী নির্জন কক্ষে বসে পত্রখানি পড়ছেন)

“গদাই ভাই—নমস্কার,—আমি যে আদরটা বাঙ্গালদেশে দেশে পাচ্ছি, তা’ আর কি বলব ভাই!

সে দেশের, লোকের ‘আ’ অক্ষরের উপর এতটা জোর দেয়, যে ‘আ’কার যে শুক, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। ‘বাবা’ বলতে এতটা হা করে দীর্ঘ টানে, স্বরবর্ণটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়, এজন্য এদেশটাকে আমি ‘হা-করা দেশ’ নাম দিয়েছি। অরুণ এনাম আমার মনে মনেই আছে। ‘আইছুন’ রসখান। “কত ভাগ্যি পায়ের ধূলা দেউখান, কি কান্তি, সোনার বর্ণ দুর্গা পুরতিমা, ওরে বংশীবদন, শীগ্গির আউখান, বড় পাখা দিয়া বাতাস কর, ওরে, এমন দিন আর আইতো না, ঠাকুর তো সাক্ষ্য নন্দনন্দন” এইরূপ কথা শুনে কাণ ঝালা-পালা হয়ে গেছে। কিন্তু এদের কি আন্তরিকতা, কি স্নেহ, ভালবাসা! এদের দেশের পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, হরমা প্রভৃতি নদ-নদীর মত এদের বিশাল হৃদয়, স্বগভীর প্রেম! এমন রাজ্য কোথায়ও দেখিনি। কি সুন্দর, সুখদ, নয়নাভিরাম ক্ষেতগুলি ও বনাশ্র-ভূমি! এত বড় নদীর আমরা ধারণাই করতে পারি না। মনে হয় আকাশের নীচে নদ-নদীগুলি আকাশের এক একটা বৃহৎ খণ্ড, আকাশ থেকে অকস্মাৎ মাটিতে পড়ে গেছে, তারা মাটির হওয়া সহ করতে না পেরে ছুটে চলেছে অনন্তের দিকে।

একটা কথা তোকে নিজ মুখে বলবার সুবিধে পাইনি। যে দিন কেশব কাশ্মীরীর সঙ্গে তর্কের লড়াই হয়, সেদিন তুই নদেতে ছিলি না, অবশ্য সে গল্প তুই অনেকের কাছে শুনেছিস, কিন্তু আমার মুখে একবার শোন। তোর সঙ্গে গল্প তো কোন কালেই আমার ফুরোয় না। চিঠি লিখতে বসে মনে হচ্ছে যেন তাকে পেয়েছি।

কেশব কাশ্মীরীতো হিন্দুস্থানের পণ্ডিতগুলি জয় করে এক বোঝা জয়পত্র নিয়ে নদেতে এসেছিল। অবশ্য নবদ্বীপ বাহাদুর সার্কভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি প্রধান প্রধান নৈরায়িক ছিলেন। মহেশ্বর বিশারদ, এবং আরবু আর ডো

পণ্ডিতের তো কথাই নাই। ত্রায়ে বিচারে তাঁরা পাহাড়-পর্বত হঠাৎবার শক্তি রাখেন। শ্রুতি, অলঙ্কারেও তাঁরা অপরাধেয়। কিন্তু তাঁরা একটা বড়যন্ত্র করেন—নিম্নে ছেলেটার দুর্দান্ত আশ্পর্শ হ'য়েছে। আমাদের বড়োদের টিকি ধরে নাড়া দিতে আসে, ওর টোলে অধ্যাপনার ও খ্যাতি হয়েছে। এই কারণে ছোড়াটা ওরাকে সরা জ্ঞান কচ্ছে। বুঝলে ভাই গদাই, ওরা আমার হাসি ঠাট্টা বুঝতে পারে না। আমার উপর মিছামিছি এই বিদ্বিষ্ট ভাব। তারপর যা হ'ল, তা বলছি; ওরা ঠিক করলেন দ্বিধিজয়ী কাম্বীরী পণ্ডিতকে আমার দিকে লেলিয়ে দিতে। আমি জ্বল হ'লেও ওরা খুসী হবেন এবং দ্বিধিজয়ীর পরাজয় হ'লেও খুসী হবেন। যেহেতু নদের একটা ছোড়ার সঙ্গে পারলেন না, তার আর টিকিটা আফালন করে বড়াই করতে স্ববিধে থাকবে না, পূর্বপ্রাপ্ত জয়পত্রের কোথা ঘাড়ে ক'রে নদে হ'তে সরে পড়বেন।

তাঁরা গঙ্গার তীরে আমার টোলে দ্বিধিজয়ী লেলিয়ে দিলেন। তিনি তো একটা অলঙ্কারের পাহাড়! আমার দিকে উপেক্ষার দৃষ্টি হেনে বললেন—“তুমি যে বালক! তোমার সঙ্গে কি বিচার করব। আমি বল্লম, আপনি মহা-পণ্ডিত, আপনাদের সঙ্গে কি বিচার করব,—আমি শিশু, আপনাদের মুখে একটা গঙ্গার স্তব শুনব, এই যে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছেন, এর সম্বন্ধে একটা কবিতা বলুন। দ্বিধিজয়ী বলেন, আমার কবিতার মর্ম তুমি কি বুঝবে? শুনেছি তুমি ব্যাকরণের পড়ো। ব্যাকরণটাতো শিশুশাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান না থাকলে আমার কবিতা বোঝা তোমার অদৃষ্টে নাই। তারপর অনেক বিনয়-কথায় বিশেষরূপ অমুরক্ত হয়ে তখন তখনই একটা গঙ্গার স্তব মুখে মুখে রচনা করে আবৃত্তি করলেন। বাহাদুর বটে! শব্দের বন্ধারে, ছন্দের দ্রুতগতি-ভঙ্গীতে আমার ছাত্তরেরা ভাবলে, অদ্বিতীয় পণ্ডিত বটে এই দ্বিধিজয়ী। তাঁরা কতকটা ভড়কে গেল। গঙ্গাদাস পণ্ডিত আমার স্মরণ শক্তির প্রশংসা করে আমাকে শ্রুতি ধর উপাধি দিয়েছিলেন। বিদেশী পণ্ডিত যে শ্লোকগুলি বলে, আমি তখন তখনই তা' আবৃত্তি করায় সে চমকে গেল। তারপরে তার রচিত ভুবানী ভূত্পদে বিরুদ্ধজিহ্বিত দোষ, এবং পরবর্তী পদে পদে নানারূপ অলঙ্কারের দোষ বা'র করে

সেই বুটো মৃত্তোর গৌরব নষ্ট ক'রে ফেল্লম, তখন তাঁর মুখখানি শুকিয়ে গেল। তারপরে, সে শুনেছিল আমি নাস্তিক, তাই উল্টোদিক দিয়ে বিচার স্বরূপ করে। বয়ে আমাকে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে। আমি বল্লম নিজা তিন রকমের—ভক্তা, স্থপ্তি ও স্বপ্তি। এদের লক্ষণ কি আমাকে বুঝিয়ে দিন। তার উত্তরে বলে, তদ্রূপ জগতের একটা অশ্পষ্ট আভাস মনে থাকে, স্থপ্তিতে সেগুলি স্বপ্নের আকারে দেখা দেয়। কিন্তু স্থপ্তিতে কিছুই থাকে না। তখন আর কি থাকবে?

আমি বল্লম, তা হ'লে স্বপ্নস্থির আগে যে আমি তার পরে যে আমি, এই দুয়ের ভিতর মাঝখানটায় আমি কিছুই বুঝল না। পণ্ডিত বলে, “কি আর থাকবে? যেমন ধবংসের পর কিছুই থাকে না, শবটো পোড়ালে দেহে কিছুই থাকে না, স্থপ্তিতে মাহুষের সমস্ত অভিজ্ঞান তেমনই নষ্ট হয়।” আমি—“তা হ'লে স্বপ্নস্থির পূর্বে যে আমি, আর জাগরণের পরে যে আমি, এই দুই যে এক, তার সাক্ষ্য দেয় কে?”

এর উত্তর দ্বিধিজয়ী দিতে পারলেন না। আমি বল্লম—“সেই সর্বসাক্ষী আত্মা সর্বদা জীবের মধ্যে বিচরমান থাকেন, তিনিই পরিচয় দেন। অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে আমি আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করাতে দ্বিধিজয়ী দুইবারই হেরে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে চলে গেল। এই জয়ের পরে নদের পণ্ডিতেরা আমায় “বাদী সিংহ” উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে এই পণ্ডিতটির দুর্গতির কথা বিস্তারিতভাবে বলব। যাবার সময় না কি দ্বিধিজয়ী বলে গেছে, স্বয়ং দেবী ভারতী তাঁকে স্বপ্নে বলে গেছেন “নিমাই পণ্ডিতের জিহ্বায় আমি সর্বদা নৃত্য করি, সে একটা আগুনের ফুলকি, তাঁকে ঘাঁটাতে গিয়েছিল কেন?”

বাহাল দেশে যে এই গল্প কত রকম আকারে অতিরঞ্জিত হয়ে পৌছেছে, তা' আর কি বলব! কতজনে কত কথা-আমায় জিজ্ঞাসা করেছে। এক জন বলে “অয়—আপনি নিজে কে গোপন করছেন ক্যান? দ্বিধিজয়ী তো আপনার বিষমুর্ভি দেইখা স্বদর্শন চক্রের ভয়ে পালানো গেছল।” আর একজন বলে “আপনি তো এক কথায় দ্বিধিজয়ীর কঠরোধ-কইরা দিছলাইন। তার আর বাকি

বাইর অইল না—আপনি কে আমরা জানতে পারছি।
আমরা চোখে ধূলা দিতে পাইরব্যান না। আমরা বাঙ্গাল,
কিন্তু বড় সেয়ানা বাঙ্গাল, আপনি তো শঙ্খ-চক্রধর বিষ্ণু,
যশোদার ঘরে ননী চুরি কইরা খাইছিলাইন, আর গোপীর
বস্ত্র লইয়া কদম গাছে চড় ছিলাইন।”

যাক্, এখন আর ছুটো কথা বলে এই দীর্ঘ পত্রের শেষ
করব। আমি আসবার সময় লক্ষ্মীর যে কাদ কাদ মুখ
দেখে এসেছি এবং এখানে এসে যে তার সম্বন্ধে শ্রুতি দেখেছি,
তাতে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি। সে যে আমার কত
প্রিয়, তা দূরে এসে বুঝতে পেরেছি। তার অমঙ্গল হ'লে
ঠিক যেন আমি ঘর ছেড়ে পালাব। তুমি সর্বদা মা
ও লক্ষ্মীর খবর নিও। নিমুদা।”

(পত্র দুইখানি লক্ষ্মীর বারংবার মাথায় ঠেকানো এবং
আঁচলে চোখ মোছা।)

পটক্ষেপ

—দৃশ্য পরিবর্তন—

গদাধরের বাড়ী

[গদাধর উপবিষ্ট ও ছুটিতে ছুটিতে ঈশানের প্রবেশ]

ঈশান—গদাই ঠাকুর, সর্বনাশ হয়েছে, লক্ষ্মী
ঠাকুরকে গোথরো সাপে কামড়িয়েছে, শ্রীবাস জ্যোষ্ঠামশাই
ও মা মালিনী আমাদের বাড়ীতে। তুমি শীঘ্র দিহু রোবাকে
নিয়ে এস, আমি মুরারি কবরেজকে ডাকতে চল্লম।

পটক্ষেপ।

দৃশ্য পরিবর্তন

শচীর আঙ্গিনা

লক্ষ্মী শায়িত, কাছে মুরারিগুপ্ত উপবিষ্ট, দিহু ওবা
পায়ে ডুরি বাঁধছে। শচী লক্ষ্মীর হাত ধরে, মালিনী
কাদছেন।

লক্ষ্মী—মা, আমার জীবন ফুরিয়ে এসেছে, তাঁর
ছবিখানি আমার চোখের সামনে ধরুন। তাঁর পাদপদ্ম
এমন সময় দেখতে পেলুম না মা। আমার সোনার সঙ্গার
ছেড়ে চল্লম। মা অত কাদবেন না, তাঁকে বুঝাবেন। তিনি
আমায় ছাড়া থাকতে পারবেন না, যে একরোখা মেজাজ,
কি করে বসেন তার ঠিক কি? মা, আর কথা বলতে
পারছি না, চোখের দৃষ্টি খোলা হয়ে আসছে। মা আর
কাদবেন না, মালিনীর প্রতি জ্যোষ্ঠাই মা, আপনাদের কাছ

থেকে যাচ্ছি, বড় কষ্ট, হায় একবার তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে
যেতে পারলুম না, ছবিখানি আমার মাথার দিকে রাখুন।

(কথা বন্ধ)

দিহু—এ রাজ গোথরোর কামড়। দেখছেন না, শ্বেত
পদ্ম একেবারে নীল হয়ে উঠেছে। এ শিবের অসাধ্য।
আপনার কাদবেন না। কবরেজ মশাই কি বলেন?

মুরারি গুপ্ত—নদের কাছে ৫০৬০ খানি গাঁ জুড়ে দিহু
তোমার মত রোজা নেই, তুমি যখন ছেড়ে দিলে, তখন
আমি কি করব। তবে যত উৎকর্ষ ঐশ্বর্য আছে তা দিয়ে
এই বিষের প্রতিক্রিয়া করতে চেষ্টা করব। আশানে পর্যন্ত
চিকিৎসা করব।

পটক্ষেপ

দৃশ্য পরিবর্তন

(নদের রাজপথ)

গদাধর, রত্নগর্ভ, রঘুনাথ প্রতিটি নিমাইয়ের সখাগণ।

গদাধর—নিমাই তো আজ ফিরে আসছে! যে
নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর পর ওর কাছে কি বলে
দাঁড়াব? এত সম্মান পেয়ে এসেছে, কোথায় অভিনন্দন
করে গঙ্গার ঘাট থেকে তুলে আনব, না অকস্মাৎ একি
ব্যাপার, আগার বুকেটা কেটে যাচ্ছে। ওর মন বুঝেছিল।
খুব স্নেহ-মমতা থাকলে, প্রিয়জনের মঙ্গলমঙ্গল মন বুঝিয়ে
দেয়। ঐ যে কথায় বলে “ছয় মাসের পথে যদি পুত্র মরি
যায়। সকলে জানিবার আগে, আগে জানে মায়।”

রত্নগর্ভ—তোর কাছে তো নিমুদা চিঠি লিখেছিল,
তাতে কি লক্ষ্মীর কথা কিছু ছিল?

গদাধর—কেবল কি আমার কাছে! ওর মায়ের কাছে
লক্ষ্মীর সম্বন্ধে একটা হৃৎস্পের কথা লিখেছিল। আমায়
সদা সর্বদা ওর বাড়ীতে যেয়ে লক্ষ্মীর খবর রাখতে লিখে-
ছিল। এখন কি বলে ওর কাছে দাঁড়াব! লক্ষ্মী তো শুধু
নামে লক্ষ্মী নয়, সে যে রূপে গুণে লক্ষ্মী প্রতিমাই ছিল!

রঘুনাথ—সে সকল যা ইউক, আমাদের গঙ্গার ঘাটে
যেয়ে শুকে আনুভেই হবে। আসবার পূর্বে যখন খবর
পাঠিয়েছে তখন আমাদের না দেখলে তার প্রাণটা কেমন
করে উঠবে? ভাববে, দুদিন বাড়ী ছেড়ে গেছি, আর ওরা
আমায় ভুলে গেছে।

গদা—যেতেই হবে, যদিও আমার পা এগুচ্ছে না,
কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকছে। প্রস্থান।

ক্রমশঃ

সন্তরণে বঙ্গ বালিকা

—শান্তি পাল

ইংরাজী ১৯২৫ সালে কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় বারুইপুরে (২৫ পরগণা) জন্মগ্রহণ করে। তাহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন শিক্ষিত, খেলাধুলায় উৎসাহশীল ব্যক্তি। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষার দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি। ১৯৩৪ সালে কুমারী লীলা সেন্ট্রাল হাইস্কুল ক্লাবের সভ্যা হয় এবং আমার নিকট সন্তরণ শিক্ষা শুরু করে। ঐ বৎসর প্রায়



কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায়

দুই মাস সন্তরণ শিক্ষার পর আমাদের সমিতির বাৎসরিক সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং পুরাতন সন্তরণ কুশলাদিগের সহিত বেশ কৃতিত্ব সহকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া চতুর্থ স্থানে আসে। আমি উহার সন্তরণের ভঙ্গি দেখিয়া সেই দিন হইতে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি।

১৯৩৫ সালে লীলা ৫০ মিটার উপুড় ও চিৎ সাঁতারে ১২ বৎসরের অনধিক বালিকাদিগের মধ্যে ৩১.০ মিটার

উপুড় সাঁতারে বড় মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং গঙ্গাবক্ষে ১ মাইল সন্তরণে বড় মেয়েদের পরাজিত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করে।

১৯৩৬ সালে ৫০ ও ১০০ মিটার সন্তরণে ছোট ও বড় মেয়ে সকলকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে মেয়েদের মধ্যে নূতন 'রেকর্ড' স্থাপন করে এবং সন্তরণ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠা সন্তরণ-কুশলা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঐ বৎসর বেঙ্গল অলিম্পিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ৩০ ফুট উচ্চ বীম্পমক হইতে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম নানারূপ ভঙ্গিতে বম্পের কলা কৌশল প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করে।

১৯৩৭ সালে লীলা পুনরায় ১০০ মিটার উপুড় সাঁতারে কয়েকজন আংলো-ইণ্ডিয়ান সন্তরণ-কুশলাকে পরাজিত ও নিজের সময়-সীমা ভঙ্গ করে। ঐ বৎসর গঙ্গাবক্ষে ৭ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ৩০.৩৫ জন পুরুষ প্রতিযোগীর মধ্যে লীলা পঞ্চম স্থানে আসিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষ গতি স্পর্শ করিতে পারে নাই। শ্রোতবোলে ভাসিয়া যাওয়ায় তাহার সাঁতার নাকচ হয়। কিন্তু ইহাতে লীলা কিছুমাত্র বিরক্ত হইতে হয় নাই। পুনরায় নিখিল ভারত ৩০ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বাংলার সন্তরণ-ক্ষেত্রে এক নূতন ইতিহাস রচনা করে। এই প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘপথ সন্তরণ-প্রতিযোগিতা বলিয়া খ্যাত। যাহাতে নামজাদা বড় বড় সন্তরণবীর যোগদান করিতে সাধারণতঃ সাহসী হন না, সেই প্রতিযোগিতায় ১২জন ভারতের শ্রেষ্ঠ দীর্ঘ-পথ সন্তরণ কুশলের মধ্যে একমাত্র বালিকা লীলা ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই প্রসঙ্গে 'য়ুগান্তর' বলেন—শ্রীমতী লীলা বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁর এই অশ্রুতপূর্ব সাফল্য জগতের ইতিহাসে জাজ্জল্যমান। সন্তরণক্ষেত্রে ইনি যে অদ্ভুত কীর্তি দেখাইলেন তাহার তুলনা হয় না। শ্রীমতী লীলার সন্তরণভঙ্গি আধুনিক ও উন্নত ধরণের। আমরা ভগ্ন-

গানের নিকট তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি। তিনি যেন
নিত্য নূতন কলাকৌশল দেখাইয়া সমগ্র পৃথিবীতে আপন
ঐশ্বর্য প্রতীষ্ঠা করেন। আজ আমরা কুমারী লীলার
গর্বে গৌরব অমুভব করিতেছি।” অমৃত বাজার বলেন
‘Unique distinction for Miss Chatterjee—
First girl to accomplish the feat since the
inception of the race—Most noteworthy
feature of Saturday’s swimming feats is
the performance of a girl swimmer. Miss
Lila Chatterjee aged 13 years, who finish-

coaching by this veteran swimmer was
good enough to make Miss Lila Chatterjee
a figure so successful in the city’s
longest distance swim.”

(৩০ মাইলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

আমি লীলা ও শ্রীমান সনাতন শীল শুক্রবার ৮ই
সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে হুগলী ঘাট করিলাম। সেখানে
সনাতনের এক আত্মীয়ের অতিথি হইলাম। লীলা রাত্রি
৮টার মধ্যে নৈশ ভোজন শেষ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল।



লীলা—৩০ মাইল সম্ভরণ প্রতিযোগিতা

ed sixth in order. It was indeed a unique
achievement for her specially considering
the lengthy course of 30 miles—a feat
accomplished for the first time since the
inception of the race.

On Miss Chatterjee’s success congratula-
tions should go principally to Mr. Santy
Paul, the tutor of this girl swimmer.
Apart from the girl herself a year’s

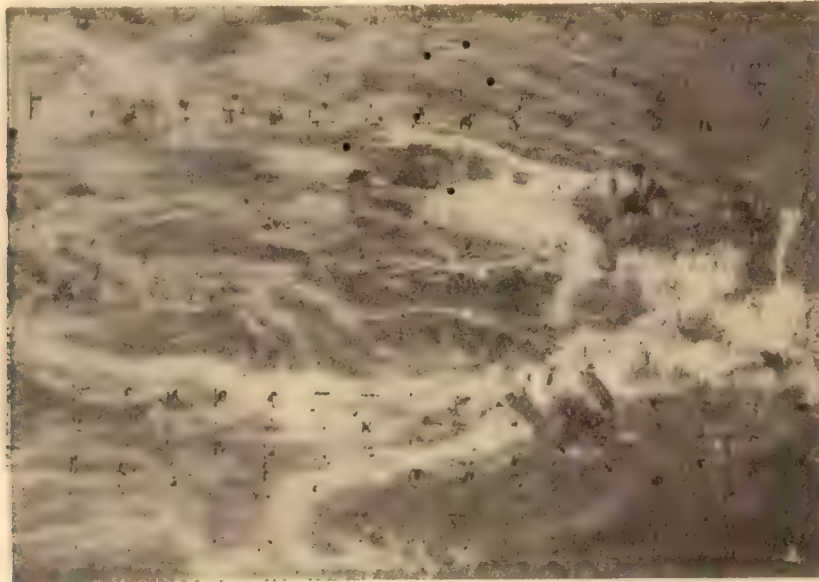
আমি ও সনাতন উভয়ে রাত্রি ১০টার সময় খাওয়া দাওয়ার
পর বাটার সংলগ্ন প্রান্তরে দুইখানি ইঁজি চেয়ারে বসিয়া
বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

সম্ভরণকুশলদিগের মধ্যে অনেকেই আমার এ দুঃসাহসের
কাণ্ডে অগ্রসর হইতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহা-
দের মন্তব্য আমার চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।
কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—“আমরা যাহা কখনও সাহস
করি নাই, অর্থাৎ ৩০ মাইল সম্ভরণ দিতে, শাস্তিরাব সে
কাণ্ডে অগ্রসর হইতেছেন।” আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া

হিলাম—“আপনারা স্বভাবের দ্বারা শিক্ষিত সস্তরণবীর, কি ভাবে সস্তরণ করিতেছেন তাহা নিজেরাই অবগত নন। বিজ্ঞানের সঙ্গে আপনাদের বিশেষ পরিচয়ও নাই, সুতরাং আপনাদের এ যুক্তিহীন মন্তব্যকে আমি গ্রহণ করিতে সম্মত নই। বিজ্ঞান এই পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে।” আমি সনাতনের সহিত এই বিষয়েই আলোচনা করিতেছিলাম। রাত্রি ২ টার সময় শ্রীমান রাধাবল্লভ সাধুর্থা ও ভ্রামাঙ্গদ গোস্বামী লীলার পথপ্রদর্শক ও জীবন রক্ষক—নৈহাটীর ঘাট হইতে খেয়াগার হইয়া উপস্থিত হইলেন।

উক্ত সভাগণ এবং উদ্যোক্তা কর্তৃপক্ষদের অফিসিয়াল জীবন-রক্ষক শ্রীমান্ অবনী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্যক্তিগত জীবন-রক্ষক শ্রীমান্ রাধা বল্লভ সাধুর্থা আংশিক ভাবে দায়ী। উদ্যোক্তাগণও বালিকার জন্য ‘রিপোর্টার’ ও ফোটোগ্রাফার সমেত একখানি ক্ষুদ্র ‘লাঞ্চ’ দিয়া যে ভাবে সারা পথ উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাহা ভুলিবার নয়।

প্রত্যুষে ৬টার সময় উদ্যোক্তাগণ প্রতিযোগিতাগকে প্রস্তুত হইবার জন্য শ্রীমান্ হইতে ‘ভেঁা’ বাজাইলেন। প্রতিযোগীরা একে একে নৌকাযোগে সকলেই শ্রীমারে গিয়া উঠিলেন। বেলা ৬টা ১৫ সময় যাত্রাভাগ্যক সম্বন্ধে



৩০ মাইল সস্তরণে লীলা

তখন সকলেই পুনরায় উদয়নে গিয়া বসিলাম এবং স্নানারূপ গল্পেরাশ্রি অভিযাহিত করিলাম।

পরদিন প্রাত্যহস ১০ টার সময় কলেজ স্কয়ার হইতে ক্লাবের সভ্য শ্রীযুক্ত ভ্রামাঙ্গদ দত্ত—জীবন-রক্ষকদিগের নেতা, ও শ্রীযুক্ত জুলাল চন্দ্র দে আমাদের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্য ও উদ্যোক্তাগণ সকলেই আসিলেন এবং কুমারীর জন্য তাঁহাদের শুভেচ্ছা জানাইলেন এবং আশীর্বাদ করিলেন। বলা বাহুল্য এই সস্তরণের সাক্ষ্যের জন্য

করিলেই সঁাতাকরণ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। আমরাও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া লীলার নৌকা পার্শ্বে ভিড়াইলাম। রাধাবল্লভ বাবু জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কুমারীর সহিত ছোরে পাল্লা দিয়া ভিড় হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সে সময় হইতে প্রায় চন্দন নগর পর্যন্ত কুমারী সর্বগ্রহে সঁাতার কাটিতে লাগিল। আমি তাহার গতিবেগ নিরীক্ষণ করিয়া জীবন-রক্ষককে ধীরে ধীরে যাইবার জন্য উপদেশ দিলাম। আমি আরও বলিলাম যে, বালিকা সঁাতাকরণ পক্ষে এক্ষণ গতিবেগে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। সরকারী

জীবন রক্ষক পথ দেখাইয়া ধীরে ধীরে পাড়ি দিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ সাতার কাটিবার পর জীবন রক্ষক জল হইতে উঠিয়া পড়িলেন, এবং লীলা এক নির্দিষ্ট গতি বেগে একা চলিল।

চন্দ্রনগর পার হইবার পরেই সামান্য ঝড় উঠিল। কুমারীকে ঘোলা জলে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল ঘুসিতে হইল। তারপর বারাকপুরের সন্নিকটে পৌঁছিলে কুমারীকে সামান্য অবসন্ন দেখিতে পাইলাম। গতির বেগ কমিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে চিৎ হইয়া সাতার কাটিতে আদেশ করিয়া, তাকাতাড়ি জীবন রক্ষক হাতে 'আই-লোশন'

লোশন' দিয়া সামান্য বেদনানার রস পান করাইলাম। আশ্চর্যের বিষয় এই স্বদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে কুমারী কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য হাত পাড়ি বন্ধ বা কোনরূপ অভিযোগ করে নাই।

বেলা প্রায় ১২টার সময় কুমারটুলী ঘাটে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। এই পথ অতিক্রম করিতে কুমারীর প্রায় ৫ ঘণ্টা, ৩৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। সকলেই এই ক্ষুদ্র প্রতিযোগিনীকে দেখিবার জন্য ঘাটে ঘাটে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অগণিত দর্শকের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে লীলা স্বয়ং জল হইতে উঠিল এবং বরাবর পায়ে



৩০ মাইল সমুদ্রগে লীলা

দিয়া তাহাকে জলে নামাইয়া দিলাম। তিনি অনতি-বিলম্বে কুমারীর চক্ষে 'ড্রপারের' সাহায্যে তাহা প্রয়োগ করিলেন এবং কুমারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহাকে ক্লান্ত বেদনানার রস পান করাইলেন। ইহার পর প্রায় ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে কুমারী আবার শরীরে বল পাইয়া পূর্ববৎ জোরে সাতার দিতে শুরু করিল।

বালি ব্রিজ পার হইয়া আর একবার চক্ষে 'আই

হাটিয়া ঘাটের সন্নিকটে অস্থায়ী হাসপাতালে গিয়া নিয়ম মত প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৫ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া গৃহে ফিরিল। তারপর দই ৬ সামান্য অন্ন ভক্ষণ করিয়া, কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইয়া অপরাহ্নে যথাসময়ে অত্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে দৈনন্দিন খেলা শুরু করিয়া দিল। মুখে তাহার এতটুকু ক্লান্তির চিহ্ন দেখি নাই।

বিজয়িনী

(উপন্যাস)

প্রথম খণ্ড

শেষ পর্য্যন্ত সময় তার গ্রামে ফিরলো।

অকস্মাৎ সহর ছেড়ে তার এই গ্রামে আসার কারণ প্রায় সকলেরই অজানা। কাণা-ঘুয়ায় অনেক কথাই রটে কিন্তু তাতে তো আর বিশ্বাস করা চলে না। ভিন্ন ভিন্ন দলে ভিন্ন ভিন্ন গল্প রটলো কিন্তু কোনটা যে প্রকৃত তা আর কেউই পারলো না। অহুমান কর্তে সহজে। তবে সব গল্পগুলোকে এক করে সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে তার আবালা সোমেন করেছে তাকে ফতুর আর সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে সে হ'য়েছে অবিখ্যাসী প্রতিপন্ন।

সোমেনের অসামান্য ব্যবহারে তার অন্তর হ'ল দ্বিধাবিভক্ত, চিন্তাশক্তি হ'ল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। অতি শৈশবকাল থেকেই তার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল অগাধ। সেই অহুপ্রেরণা থেকেই সে বাসতো জগতের সব মানুষকেই ভালো। যুগা কি ক্রোধ কখনও তুলেও করেনি তার অন্তরকে কলুষিত। কিন্তু এই আচম্ভক আঘাতে চোখে এ পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য হ'য়ে পড়ে হতভী, মলিন। ক্রমে ক্রমে সে আর পারে না রাখতে কোন কিছুতেই আস্থা।

তার জীবনের আরম্ভটা হয়েছিল খুবই আশাপ্রদ-ভাবে। সে নিজে ছিল চিন্তাশীল ও ধীমান। সব বিষয়েই তার ছিল একটা অদ্ভুত অহুসন্ধান-প্রবৃত্তি আর অদ্ভুত বোধশক্তি। এতে করে' সকলেরই সে হ'য়ে উঠেছিল প্রিয়পাত্র, বিশ্বাসভাজন।

বাল্যকাল হ'তে সোমেনই ছিল তার একমাত্র বন্ধু, স্নেহ, সখা সবই। একসঙ্গে খাওয়া, বসনা, দাঁড়ানো এবং আরও নানান রকম তুচ্ছাতুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের দু'জনের মধ্যে যুট্ট হয় অচ্ছেদ্য বন্ধন। কিন্তু কেউই তখন জানতে পারে নি' যে, এই থেকেই আসবে এক নিদারুণ অভিশাপ।

শ্রীনির্ম্মলকুমার ভট্টাচার্য্য

লেখাপড়া ছাড়ার পর দুই বন্ধুতে এক সঙ্গেই আরম্ভ করে কর্মজীবন। ব্যবসার মধ্যে দুইজনে অসাধারণ রুচিও থাকে দেখাতে। সময়ের অমায়িক ব্যবহারে অল্প সময়ের মধ্যেই বহুলোক হতে লাগলো তাদের সঙ্গে কর্মসুত্রে আবদ্ধ। দিনে দিনে তার সং বলে একটা খ্যাতি চাড়াতে থাকলো ব্যবসায়ী সমাজে। ইহজগতে আপন বলতে কেউ না থাকায় সময়ের এই কর্ম-প্রেরণার উদ্বেগ ছিল না অর্থোপার্জন। সে চাইতো কেবল নিজেকে কাজের মধ্যে রাখতে ডুবিয়ে।

রেবার সঙ্গে ওদের দু'জনেরই ছিল সমান হ্যাঁতা। সে ওদের ছাত্রজীবনের বন্ধু পূর্ণেশের বোন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই ওরা এ বাড়ীতে যাতায়াত করে আরম্ভ। আর তাতে পড়ে না ছেদ বহুদিন ধরে'।

দীর্ঘ বন্ধুত্বের মধ্যে সময়ের চোখে একদিনও ধরা পড়ে নি' যে রেবা তাদের মধ্যে ভালবাসতে পারে কাউকেও।

সে নিজে ছিল নির্বিকার, পৃথিবীর সকলকেই সে সমানভাবে ভালবাসতো, কাজেই অন্ত্রে তাকে ভালবাসে কিনা তা' দেখবার তার ছিল না কোনই অবসর। সোমেন কিন্তু দেখলো যেন সময়ের প্রতি রেবার সহানুভূতি একটু বেশী।

২

সময়ের ব্যবসার অবস্থা দিন দিন হতে' থাকে উন্নততর। হঠাৎ একদিন সোমেন এসে বলে—সময় ভাই, স্পেকুলেশনে হেরেছি বড্ড, চাই কিছু টাকা—এই হাজার পঞ্চাশেক।

সময় যে কোনও রকমে নিজে অত টাকা দিতে পারে না তা সোমেনের জানা ছিল খুবই ভালোভাবে। সময় তুলে কখনও শত্রুকেও করতো না অবিখ্যাস—প্রিয় বন্ধু সোমেনের কথা তো স্নেহ পরাহত। সে এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি কাছে চাইলো পরামর্শ। পরামর্শও সোমেনের ছিল আগে থেকেই ঠিক করা। সোজা বন্ধো, তুই যদি নিজের নামে

রেবার কাছে ধার চাসু তো তিনি দ্বিক্ৰান্তি কর্কেন না। সমরও বুঝলো তাই।

হুঁমাসের চুক্তিতে রেবার বাবা অমূল্য বাবু সানন্দ চিত্তে সমরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেন ধার। ব্যবস্কা-ক্ষেত্রে এই রকম সাময়িক দেনার ব্যাপক প্রচলন থাকতে তিনি ব্যাপারটায় হলেন না মোটেই আশ্চর্য্য। আর যেখানে সময়ের মত অকলঙ্ক-চরিত্র যুবক অধর্ম্ম, সেখানে কোন রকম দ্বিধার বালাই নাই তিনি বুঝলেন।

ক্রমে হুঁমাস কেটে যায়। সোমেনের যেন শোধ করার নেই কোনই আগ্রহ। সমর বলে—সোমেন ভাই, টাকাটার কি হবে, আমার যে বাইরে মুখ দেখানো দায়। সোমেন উত্তর দেয়—যোগাড় তো কিছুতেই পারছি না কর্ত্তে। তুই কিছুদিন গা-টাকা দে না। একেবারে টাকা নিয়েই হবি হাজির।

সমর ভাবে কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ছেড়ে থাকবে গিয়ে রামকৃষ্ণপুরে লীলাদের বাড়ীতে। লীলার অস্থখ, ডাক্তার বলেছে যক্ষ্মা। আহা তার ছোট ছোট ভাই বোন সুলোর কি অবস্থা হয়েছে কে জানে? আর সোমেন যদি এই রেবাদের খুলে বলে তা'হলে তার এই সাময়িক অসদ্ব্যবহার আচরণের কতকটা হবে উপশম।

সমরের দূর সম্পর্কের এক মেসো ছিলেন, তাঁর বাড়ীতে সোমেনের পরামর্শ মত গা টাকা দিয়ে থাকবে, সমর ঠিক করল।

৩

মেসো ছিলেন অত্যন্ত গরীব। কোন এক সওদাগরী অফিসে ৫০০ টাকা মাইনের 'তিনি কেরানীর কাজ করতেন। অথচ পোষ্য ছিল পাঁচটি; বড় ছেলে উল্লাস বিধবা মেয়ে লীলা, তারপর দু'টি ছোট ছোট ছেলে আর একটি মেয়ে সবার ছোট। হঠাৎ এক মাঘের কনকনে শীতের রাতে ভক্তলোক গেলেন মারা। সে কী ভীষণ অবস্থা! ঘরে এমন একটা পয়সা নেই যে সৎকার করা হয়। শ্মশানে বাবার জন্যে লোক ডেকে পাওয়া যায় না! কেউ বলে স্ত্রী সন্তান-সন্তবা, কেউ বলে মাতুলি আছে, অতএব

শ্মশানে বাবার নাম মুখে আনা অন্যায়। অত বড় কলকাতা সহরে একটাও লোক পাওয়া গেল না।

সমর বাড়ীতে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ রাত বারোটার সময় কড়ানাড়ার আওয়াজে দরজা খুলে অবাক হ'ল উল্লাসকে দেখে। তারপর শিবপুর, তিলজালা, এই সব জায়গায় ছুটোছুটি করে টাকা যোগাড় করলে সমর, গোটা রাতক মাতালকে ধরে আনলো। তাদের তখন প্রথম রাতের নেশার ঝোঁকটা আসছিলো কমে, অতএব আর এক পত্তন পাওয়া যাবে এই আশায় দ্বিগুণ উৎসাহে উঠে পড়লো কোমর বেঁধে। প্রায় রাত সাড়ে চারটের সময় মড়া বাড়ীর থেকে করা হ'ল বার। তারপর আর দশটা বাঙ্গালী হুঁমু পরিবারের বেলায় যা ঘটে থাকে উল্লাসদের বেলায়ও তার কিছুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলো না।

সমর যথাসাধ্য সাহায্য ওদের কর্ত্তে লাগলো, কিন্তু তাতে আর কতটা হয়। একটা পরিবারের পক্ষে মাসখয়ের মত করে বেঁচে থাকতে হলে যা দরকার তা কখনও দান সাহায্যে সম্ভব হয় না। কাজে কাজেই উল্লাসরা কোন রকমে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে দিন কাটাতে লাগলো।

লীলাকে যখন তার বাবা এক মধ্যবিত্ত গেরস্ত ঘরে তুলে দিয়েছিলেন তখন তিনি সৌভাগ্যেরই করেছিলেন আশা। ছেলেটি ই, বি, রেলওয়ে ওয়ার্কশপে সবে এপ্রেন্টিস হ'য়ে চুকেছে। ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ। তার আবার তার বড় ভাইটি কলিকাতার এক বড় অফিসে করে কাজ, মাইনে পায় প্রায় শত খানেক টাকা। তাঁর থাকবার মধ্যে আছে স্ত্রী আর একটি খুব ছোট ছেলে।

বিয়েটা বেশ ঘটা করেই হ'ল। হুঁচার খানা গধনাও উঠলো লীলার অঙ্গে। মনে মনে তার বড়ই দুঃখ হ'ল, হায়, এমন দিনে মা যদি থাকতো।

তিন বছর যেতে না যেতেই লীলা মুছলো সিঁহুর। প্রথম প্রথম ভাসুর আর জা' খুবই দেখালো সহায়ভূতি, তার পরেই আরম্ভ হ'ল নির্ধাতন। একদিন হঠাৎ জা' বল্ল—যা না লীলা, আমার ঐ ভাগ্যেদের সঙ্গে চন্দ্রনাথে তীর্থ করে' আস না।

ভাগ্যেটি তাঁর একটি গাঁজাখোর বেশ্যাসক্ত। এমন

কোন দুঃখ ছিল না যা এই নরপুংগব ও-অঞ্চলে বাকী রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য সে-সব লীলারও ছিল না অজানা। সুতরাং সে 'ধম্মকন্ম মতি নেই, বেহায়া' উপাধিতে ভূষিত হ'য়েও 'তীর্থ' ক'রতে হ'ল না রাজী। তারপরেই একদিন হ'ল গহনা সমেত লীলার বাজ্ঞ উদ্বাও। সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল যে তার স্বামীর অংশ আছে এমন একটা সম্পত্তি তাকে না জানিয়েই ভাঙুর করেছে বিক্রী। এই সব দেখে লীলার বাবা মেরেকে নিজের বাড়ী না এনে থাকতে পারলেন না।

তারপর আরম্ভ হ'ল মামলা। লীলার স্বস্তুর বাড়ীর গ্রামের যারা সব চেয়ে বড় জমীদার সেই চক্রবর্তীরা তার বাবাকে পরামর্শ দিলেন, নাশিশ করে ওর স্বামীর অংশ ওকে অধিকার করাও।

লীলার ভাঙুরও চালালো নানারকম প্যাচ-মিথ্যা সাক্ষী, কত কী—লীলা নাকি স্বয়ং রফা করে আপন স্বস্তুর বিক্রী করে' টাকা নিয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই গেল ফাঁসে। হাকিম রায় দিলেন, সম্পত্তির দশ আনা ভাঙুরের ছ' আনা লীলার।

হাকিম ভো রায় দিয়েই খালাস। কিন্তু গোল বাধলো সম্পত্তির দখল নিয়ে। ভাঙুর তো আর দেবে না সহজে ছেড়ে। তার জন্তে চাই টাকা। এ দিকে লীলাদের বাড়ীতে হাড়ী চড়ে না এমন অবস্থা।

উপর্যুপরি ক' বছর মামলা করে লীলার বাবা নিজের ব'লতে যা কিছু সবই খুইয়েছিলেন। উপরন্তু কোথা হ'তে হাঁপানী রোগ এসে কল্ল' তাঁর দেহকে আশ্রয়। তিনি রইলেন বিছানায় পড়ে। পয়সার অভাবে চিকিৎসাও জুটলো না তাঁর ভালভাবে। সঙ্গে সঙ্গে কামাই হওয়ার দরুণ অফিস থেকেও সাহেব দিল চির বিদায়।

লীলা দুঃখে প্রতিজ্ঞা করলো সম্পত্তির দখল নেবে না। যারা একদিন আত্মীয়া বধু ইত্যাকার আখ্যা দিয়ে বরণ-ডালা সাজিয়ে ঘরে তুলেছিল তারা যখন এমন ব্যবহার কর্তে পারলে, তখন দরকার নেই তাদের সম্পত্তি নিয়ে। তার ভাগ্যে যা থাকে তাই-ই ঘটবে।

এরই বছর চারেক পরের কথা। লীলার বাবা স্বর্গ-গত হলে পর তারা কোন রকমে সময়ের রামকৃষ্ণপুরের

বাড়ীখানাতে এসে আশ্রয় নেয়। উল্লাস এ দিকে এদিকে ঘুরে অতি কষ্টে একটা কুড়ি টাকা মাইনের চাকরী করে যোগাড়। বাবা মারা যাবার পরে সে অনেকবারই লীলার ভাঙুরের কাছে গিয়েছিল। অহরোধ প্রার্থনা কোন কিছুই সে রাখে নি' বাকী, যাতে তার বোনকে পাঠাতে পারে স্বস্তুর বাড়ীতে।

ভাঙুর কিন্তু স্বযোগ বুঝে তাতে কাণ দেয় নি। তার নিজের ছেলেটিও তখন এম, এ, ও আইন একসঙ্গে পড়তো সেও বাপের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেশ উকিলী চালাত উল্লাসকে তাড়ালো। অগত্যা ভাগ্যের উপর নির্ভা কর ছাড়া তার আর কোনই উপায় রইলো না।

8

সময় লীলাদের বাড়ীতে এসে বেশ কিছুদিনের জন্তে গাড়লো আসন তাদের দায় কিছুটা ঠেকতে পারবে ভেবে। দেখান থেকেই করবে অফিসে যাওয়াত। সোমেনের সঙ্গে সেখানে রোজই হবে দেখা। তারপর টাকার যোগাড় হ'লে একেবারে নিয়ে উঠবে দেবাদের বাড়ী।

লীলার প্রায় ছ'মাস ধরে যক্ষ্মা দেখা দিয়েছে। চিকিৎসাও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই হয়নি, এর কারণ যতটা তার অভাব ঠিক ততটা লীলার নিজের অবহেলা। সে আর বেঁচে থাকতে চায় না। রোগকে সে ভগবানের আশীর্বাদ বলেই গণ্য করেছে। সময়ই প্রায় তাদের সংসার চালাতো, আবার তার ঘাড়ে আর একটা নতুন বোঝা চাপুক এটা লীলা চাইতো না। তাই কতদূর রোগটা যে গড়িয়েছে সে খবরটা সকলের কাছে চেপেই রেখেছিল এতদিন। কিন্তু সময় হঠাৎ এসে পড়ে নিজে চোখে দেখে সবই পারলো বুঝে নিতে।

লীলার জ্বর প্রতিদিন ১০৩° ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে। ইচ্ছে করেই সে আর করে না রাঁধাবাড়া। যদি ছোট ছোট ভাইবোনদের মধ্যে রোগের হয় সংক্রমণ সেই ভয়েই সে চলে যথাসম্ভব তাদের সান্নিধ্য এড়িয়ে।

সময় হয়ে উঠলো মহা ব্যস্ত। কোন কথা না শুনে সহরের বড় ডাক্তারকে দিল ডাক। কিন্তু তাহলে কী হবে, সবাই-ই

দিয়ে গেল একটি অভিমত—Already doomed—See her dying quiet. তবে আরামে রাখার জন্য সমুদ্রের ধারে নিয়ে যেতে পার। সমর ঠিক করলো লীলাকে নিয়ে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাবে। লীলা কিন্তু কিছুতেই নয় রাজী। সমরও ছাড়বে না, নিজের জিদ্দ করবে বজায়। শেষ পর্যন্ত লীলাকে রাজীই হ'তে হ'ল।

উল্লাস ছোট ভাই বোনদের দিয়ে কলকাতাতে থাকবে, এই হল ঠিক। কেননা, তাকে করতে হবে অফিস আর ভাই বোনেরা ঐ রকম রোগীর কাছে থেকে কি কর্কে বরং তাতে ভয়ই আছে বেশী।

অফিসে গিয়ে সমর বলল—দেখ সোমেন, লীলাকে নিয়ে আমি কিছুদিন চেষ্টা যাবো। —কোথায়—সোমেন জিজ্ঞাসা করে। বিশেষ কোন জায়গার ঠিক করি নি, তবে প্রথমে সোজা যাব পুরীতে, তারপর যদি সুবিধে হয় তো যাবো আলমোড়ায়। আর দেখ তুই রেবাদের বাড়ীতে আমার উধাও হওয়ার কারণ এইটেই বলিস।

৫

রেবাদের বাড়ী মহা হলস্থল—সমর কোথায়? সোমেনের কাছে কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি। সে সময় বুঝে আরম্ভ করেছে নিজের কাজ হাসিল কর্তে। মাত্র এইটুকু সে জানিয়েছে যে সম্ভবতঃ সমর বিদেশে কোথায় গেছে কিন্তু কারণ কী বা কবে ফিরবে তা কিছুই যায় নি জানিয়ে।

কথাটা সন্দেহেরও বটে, রহস্যেরও। তবে আশ্বাস এই যে সমরের আগেকার ব্যবহার ভাল থাকাতে রেবার বাবা চট করে তখন কিছু একটা ঝাঁচ কর্তে পাশের ন।

সোমেনকে গোড়া থেকেই রেবারা একটু এড়িয়েই চলতো। এর কারণটা তাদের নিজেদেরই ছিল অজানা। তাকে যেন কেমন এক রকম লাগতো ওদের। এ ব্যক্তির ভিতরে আছে যেন কোথাও একটা বিষাক্ত তীর এই-ই তাদের ধারণা। সমরকে নানা রকমে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েও তার কাছ থেকে রেবারা সোমেনের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য পায় নি। এবং তার ব্যবহারে তিলমাত্র যে সন্দেহের অবকাশ নেই সেটাই হয়ে এসেছিলো বারে বারে

প্রমাণিত। কিন্তু এখন সমর অন্তর্দান হওয়ার পর থেকে রেবাদের সোমেনকে একটু সহিতে হচ্ছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা রেবা বসে বসে দান্তের 'ইন্ফার্মো' খানার পাতা ওলটাচ্ছিল, এমন সময় সোমেন গিয়ে হ'ল সেখানে হাজির। ইদানীং তার এ বাড়ীতে আসা-যাওয়াটা ঘন ঘনই হয়ে উঠেছিল। • সম্প্রতি রেবার বাবাও সমর সম্বন্ধে তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত কতকটা স্থির করে ফেলেছিলেন। বলা বাহুল্য, এর জন্যে সোমেনকে পরিচয় কর্তে হয় অসামান্য।

সোমেন হঠাৎ বলে উঠলো—চল না রেবা, কোথাও গিয়ে একটু হাওয়া বদলে আসা বাক।

—সত্যি, কথাটা আমারও কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছে, কিন্তু সমরবাবুর কোন একটা খবর না পাওয়া পর্যন্ত বাবা যে কোথাও যেতে রাজী হবেন তা বলে মনে হয় না।—রেবা উত্তর দিলে—সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তাঁর মত করাবার ভার রইলো আমার। তোমার নিজের দিক দিয়ে যখন কোনই অমত নেই,—তাতে কি আর বাড়ীর আর সকলের যাওয়ার কোন অন্ত্রবিধে হবে—তা বলে তো আমার মনে হয় না।

—না, তা বটে—কিন্তু মনটা আমারও বড় দমে গেছে। আচ্ছা আপনার কি সত্যিই বিশ্বাস হয় যে সমর বাবু টাকা নিয়ে উধাও হ'য়েছেন—আমার কিন্তু কি মনে হয় জানেন,—হয়তো তিনি এমন কোন একটা ব্যাপারে আটকে পড়েছেন যে তাঁর পক্ষে এ রকমভাবে অনুপস্থিত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।—রেবা বললে বিষমভাবে।

—কি জানি, কিছুই তো আর জোর করে বলা চলে না। মানুষের মন না মোতি—কখন যে কে কি করে ফেলতে পারে তা বোঝা অসম্ভব। এই-ই শেষ না আরও বেশী কিছু দেখতে হবে তাও ঠিক করে বলতে পারি না। সোমেনের ভাষায় বেশ সন্দেহের ইঙ্গিত।

—কেন, কেন, আপনি একথা বলছেন কেন—সমর বাবুর সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন না কি?—রেবার কথায় উৎকর্ষ পুরো মাত্রায়।

—না, না, জান্‌বো কেন? কথাটা এমনি সাধারণ ভাবেই বলেছি—সোমেন সামলে নেয় আবার।

৬

সমর লীলাকে নিয়ে পুরীতে পৌঁছাল। সমুদ্রের ধারে ভিক্টোরিয়া ক্লাবেতেই ওরা তখনকার মত উঠলো। লীলা তো সমুদ্র দেখে অবধি সে দিকে তাকিয়ে কেবল দেখে আর দেখে। সমর যতই বলে, চলো বেড়াই, নানারকম দেখবার জিনিষ আছে, লীলা ততই তাতে করে আপত্তি; বলে তার চেয়ে তুমি বসে বসে বাঁশী বাজাও আর আমি ঐ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শুনে যাই। সমর উত্তর দেয়, না না অত বেশী সমুদ্রের দিকে তাকিও না। প্রবাদ আছে চৈতন্তদেব ঐ নীল জল দেখতে দেখতে তন্নয় হয়ে ওগ মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। মনে ভেবেছিলেন যে ঋষির পরশ বৃক্ষ ঐ নীলের মধ্যেই আছে ছেয়ে। লীলা উত্তর দেয় বেশতো তা' হলে তো আর কিছুই চাই না। ঐ নীলের মধ্যে ডুবতে পেলো নিশ্চয়ই সাড়া পাব সেই পীতাম্বরধারী দেবতার।

লীলা বলে, সমরদা বাজাও, বাজাও, চূপ করে থেক না। প্রভুর এই নীলচলে একটু যদি মোহন বাঁশীর রেশ পাওয়া যায় তাতে সেই দেবতার প্রতিই মন আপনা থেকে হয়ে উঠবে উন্মুখ। নীলের দেশে অজানা যাত্রায় যখন পাড়িই দিতে হবে তখন এই বাঁশীই আমাদের পথ দেখাবে।

সমর এ কথার কোন উত্তর পায় না খুঁজে। যন্ত্র চালিতের মত বাঁশীতে দেয় ছুঁ। করুণ রাগিনীর মুর্ছনাতে বাতাসের রক্তে রক্তে অহরনিত হয় কোন এক অজানা ব্যাথার অশ্রুশাশি; লীলা হঠাৎ সে সুরে দেয় গলা মিলিয়ে। সমর বাধা দিয়ে ওঠে। কিন্তু সে বাধা মানে না—গেয়েই যায়।

একদিন সমর জোর করেই লীলাকে ধরে নিয়ে যায় জগন্নাথের মন্দির দেখাতে। পথে সে মন্দিরের গঠনশিল্প ইতিহাস এই সব নানা তথ্য থাকে বোঝাতে। লীলা কিন্তু মন্দির সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যানটা পড়েছিল। সে বাধা দিয়ে সেই গল্পই থাকে পাড়তে। সমর ওঠে হেসে

আকুল ভাবে। বলে ওটা আসলে বৌদ্ধ মন্দির। হিন্দু রাজার আক্রমণের সময় বৌদ্ধরা ওটা আধগড়া ভাবেই ফেলে পালায়। তারপরে হিন্দুরা ওটাকে শেষ করে দিজেদের ধর্মের গণ্ডীভূত করে। লীলা কিন্তু মোটেই রাজী নয় ও কথা মেনে নিতে। ছ'জনে লাগে মহা তর্ক। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সমরকেই চূপ করে যেতে হয়।

প্রায় একমাস এইরূপ ভাবেই কাটে। লীলার শরীর যেন সারুতে থাকে একটু একটু করে। দেখা গেল দেহের ওজনও বেড়েছে একটু। সমরের আনন্দ আর মান্তে চায় না বাধা। একদিন সে বললো—চল একদিন কণারকের সূর্যামন্দির দেখে আসি।

লীলার কিন্তু এতে আপত্তি। সে সমরদার এই তার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগিতায় বড় বেশী লজ্জিত।

যারা জন্মলাভ করে অবধি পেয়ে আসে আঘাত উপেক্ষা, মর্ষ বেদনায় যাদের বুক জ্বলতে থাকে দিনরাত তারা তাদের সেই দুঃখে অতিরিক্ত সহ্যহুভূতি বা ভাল-বাসাতে পায় নিদারুণ লজ্জা।

আজীবন লীলা কেবল আঘাতই পেয়েছিল। কিন্তু তার জন্য সে তত বেশী মর্ষাহত হত না। সব রকম অসহ্যকেই সে কব্বতো সহ্য করবার চেষ্টা। মনকে শাস্ত্যনা দিত এই বলে যে জগতের এই দিকটাই দেখতে তার জন্ম। কিন্তু ধুমকেতুর মত সমর অপর দিকের ভাষা নিয়ে এল তার হৃদয়ের প্রতি কন্দরে।

প্রকৃতিগত স্বভাবশুলভ ধ্বংসের পথে চলতে চলতে যেন এক প্রবল আলোড়ন এসে চলবার শক্তিটাকেই দিক পজু করে। সাধ্য রইল না সে এগোয় আর একটা পা সহ্যহুভূতির বিষম সংঘাতে যুগধরা প্রাণ আর পাবুলে না থাকতে টিকে।

আবেগ প্রাণ হৃদয়ের প্রকৃতিই এই। যে কোন রকম ভাব প্রবণতা তার উপর করে প্রভাব বিস্তার অতিরিক্ত ভাবে,—তা ভালবাসায়ও যে পরিমাণ যুগায় ও ঠিক তাই।

যদি সমরেশ এসে লীলার বুকের রাজ্যে ঝড় না বহাতো তা' হলে নিশ্চয়ই সে পৃথিবীর সব কিছুকে মানিয়ে নিয়ে পার্বতো শেষের দিনকে কব্বতে বরণ হাসিমুখে। কিন্তু এখন সে বিবাদের সঙ্গে শেষবার এ জগতের পানে মেললে,

তারদৃষ্টি। মনে হলো—ভগবান যদি দিলে তো পরাণ ভরে' দিলে না কেন? শেষের দিনে সে পারুলো না আশ্বাসের সঙ্গে অপর জগতের পানে বাড়তে পা। এই পৃথিবীরই অনাস্বাদিত দিকটা তার আত্মাকে রইলো আঁকড়ে।

(৭)

রেবার কতকটা অমত সত্ত্বও সোমেন তাদের নিয়ে উঠলো এসে পুরীতেই। স্বর্গদ্বারের কাছে আগে থেকেই একথানা বাড়ীও ঠিক করে' এসেছিল। কিন্তু পৌছে দেখে সেখানা ইতিমধ্যেই মালিক দিয়েছে ভাড়া অস্থলোককে। কাজে কাজেই বাধ্য হ'য়ে উঠলো শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া ক্লাবে।

ট্রেনের শান্তি অপনোদনে প্রথম দিনটা গেল কেটে। কেউই পারুলো না বেরোতে একটুও। সন্ধ্যার সময়টা সোমেন “চাইল্ড হারল্ড” থেকে কয়েকটা জায়গা পড়ে' শোনালো অমূল্য বাবুকে।

পরের দিন ভোরে সোমেন আর রেবা বেরোল সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। বিশাল জলরাশির বিরাট সে রূপ দেখে' রেবার বিস্ময় যেতে থাকে ছাড়িয়ে সীমা। মনকে অধিকার করে এক অদ্ভুত চিন্তা অতি মাত্রায়। বুকে যেন করে উঠে থা থা। কোথায় যেন রয়ে গেছে একটা ফাঁক। সব চিন্তা সব মানসিকতা যেন একটা বিরাট শূন্যতার চারদিক ঘিরে ক'বুচে হাঁহাকার।

হঠাৎ সে সোমেনকে করে জিজ্ঞাসা—আচ্ছা, সময় বাবু যে এতটা পাষণ হতে পারেন এটা কি আপনি আগে কোনদিন পেরেছিলেন ভাবতে! আমার কিন্তু একদিনও মনে হয় নি যে এ রকমটা পারে ঘটতে।

ধীরস্থরে সোমেন দেয় উত্তর—পরিবর্তনশীল জগতে কোনও জিনিষই বরাবর থাকতে পারে না এক রকম। এই যদি আমার নিজের কথাটাই ধরি। আমিই কি আর ছিলাম এতটা উদার! পার্থিব আসক্তিতে আমার মন এতদিন পেয়ে এসেছিল নিদারুণ গ্লানি। কিন্তু সময়ের এই রকম ব্যবহারে কেন জানি না আমার মত বৈষয়িক লোকও দিনে দিনে হ'তে চলেছে নিরাসক্ত

উদাসীন। মনে হয় এ জগতে যদি হৃদয়ই মানুষের পারলুম না জয় করতে তবে আর আমি বীর কিসের?

—তা হবে। আমার মনে কিন্তু এতে বড় আঘাত লেগেছে—আর পারছিও না সেটাকে সহিতে। বড় বিশ্বাসী বড় দরদী বলেই তাকে মনে হত।—বেদন ভরা স্বরে রেবা বলে।

আঁচস্থিতে সোমেন উঠে দাঁড়ায়, বলে—দেখ, দেখ, ঠিক সময়ের মত নয়?—সঙ্গে ও কে একটা মেয়ে ফরসা, রোগা। এটিকে তো দেখিনি জীবনে কখনো। হবে বা কেউ সব কথাই তো আর তার আমি জানতুম না।

সোমেনের দেখানো পথের দিকে তাকিয়ে রেবা ও দেখলো—হ্যাঁ,—সেই তো—ও মূর্তি তো ভুল হবার নয়—কিন্তু মেয়েটি কে?

• নিরুদ্ধ অভিমানে তার বুকের ভিতরে জাগতে লাগলো লজ্জা, অভিমান, ক্রোধ আরও কত কী। চকিতে সে বলে উঠলো—আর নয় সোমেন বাবু, চলুন, বাড়ী ফিরে যাই—আর আজ পারবো না বেড়াতে।

হোটলে ফিরেই রেবা অমূল্য বাবুকে ফেললো সব কথা বলে। তিনিও আল্পপূর্বিক হয়ে পড়লেন আর এক দফায় বিস্মিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে বললেন—তোমরা কি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ যে তাকেই দেখেছ? ভাল ক'রে না দেখে কারও সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করলে সেটা শুধু অন্যায় নয়, পাপ হবে।

এ কথায় উত্তেজনার সঙ্গে রেবা বলে উঠলো—না বাবা, আমার এ চোখে ভুল বড় কম হয়।

এবার সোমেন যোগ দিল—আজই না হয় তার সম্বন্ধে আমার মনে কিছু বিরুদ্ধভাব জেগেছে। আর সেটা তারই দোষে। কেন সে ভুলে গেল যে তার আর আমার মধ্যে সম্বন্ধ কি? সে কি জানে না পৃথিবীর কোনও জায়গায় তার যদি স্থান না থাকে, আমার কাছে তার আছে স্থান! আপনি কি মনে করেন অমূল্য বাবু তার জন্যে আমার মনের কোণে ব্যথা জাগেনা? সমবেদনা দেয় না ছোঁয়াচ? রাগ হয়, দুঃখ হয় আমাকে তার এই ভুলবোঝা দেখে।

লীলার জরটা যেন ক্রমশঃ আস্তে থাকে কমে। মনে মনে সমর ভাবে এবারে বোধ হয় সে ঝুঁচবে। একদিন দেখা গেল ওজন নিয়ে, দেহের ভার তো বাড়েই নি বরং কমে গেছে বেশ কিছু। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দিলেন—The last hour—

লীলা হঠাৎ একদিন ধরে বসে কনারুকে যাবে সূর্য্য মন্দির দেখতে। সমরও রাজী হয়। অতএব এক গরর গাড়ী ভাড়া করে' তারা কবুলো যাত্রা।

মন্দির দেখে আর তার গঠনশিল্প আর ইতিহাসের বিষয়ে আলোচনা করে দুই জনেরই মনে জেগে উঠলো অপক্লপ আনন্দের ঢেউ। বিশ্বাসের সঙ্গে লীলা বলে উঠলো, 'আচ্ছা সে যুগের লোকের মানসিক বৃত্তির সবটাই কি পরিচর্যা হতো এই অধ্যাত্ম স্বকুমার ভাবের আরাধনায়? তাদের কি কোনও দিনই এই বাস্তব জগতের রক্ষা, দুঃখ আর হানাহানিতে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে নি একদিনও। চিরশান্তি কি অনড় অটল হ'য়ে নিবিড়ভাবে করেছিল আশ্রয় তাদের মনকে?

—না না এও এক বেদনার রূপ, অহুতাপের প্রতীক। দুঃখে জর্জরিত এক মুক্তিকামী আত্মাই করেছিল এই অমর শিল্পবৃত্তির প্রতিষ্ঠা। মন্দিরের ইতিহাসটা তো জান। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাঘ যখন হয় কুষ্ঠরোগে পঙ্গু, তখনই এখানে এসে করে আরম্ভ সূর্য্যদেবের উপাসনা। আর সে পায় রোগমুক্তি। অতএব বুঝেছ তো, এখানে আছে পাপের হাত থেকে পরিভ্রাণ পাবার বার্তা, পরম শক্তির আরাধনার মাংসাত্ম্য। —সমর বলে।

—আচ্ছা এই যে সারা পৃথিবীময় মানুষ ভোগ ক'চ্ছে কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা, এর কারণটা কী? বুঝলুম না হয় ঐ কৃত কৰ্মের পাপের সাজা এই সব। কিন্তু জিজ্ঞাস্যটা এই যে তাঁরই হাতে যখন পাপ আর পুণ্য দু'য়েরই হয় সৃষ্টি তখন কেন তিনি জগতের জন্ত শুধু করেন না পুণ্যের জন্মদান,—যখন নাকি পাপকে তিনি চান না জয়ী দেখতে আর তা ছাড়া পাপীকে পাপ করার মনোবৃত্তিও তো তিনি দেন। লীলা জিজ্ঞাসা করে।

—এ-রহস্য—চিরহুজের। তবে বিভিন্ন মহাত্মারা দিয়ে গেছেন এ বিষয়ে বিভিন্ন মত। কিন্তু আমার কি মনে হয় জান? যে তার সবগুলোই ঠিক, যতটা পরিমাণে ঠিক ততটাই আবুর বেঠিক।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়—জগতে সবই একসঙ্গে ঠিক আর বেঠিক। এ শিক্ষা আমরা তোমার কাজ থেকেই পেয়েছি ইতিমধ্যে বেশ ভালো ভাবে। হঠাৎ পেছন দিক থেকে কে একজন উঠলো বলে'।

চমকে উঠে সমর পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে অমূল্য বাবু, লীলা আর সোমেন রয়েছে দাঁড়িয়ে। এ দৃশ্যের জন্তে সমর ছিল না বিন্দুমাত্রও প্রস্তুত। সে পাবুলো না একটাও কথা বলতে।

অমূল্য বাবু বলতে লাগলেন—যে শিক্ষা সমর, তুমি দিয়েছ আমাদের তার থেকে বোধ হয় মহাভারতেও শিক্ষা আছে কম। আমার এখন কি মনে হয় জান, তোমার মনের অন্তর্নিহিত এই কুবৃত্তির বীজ প্রকাশ পেত' অনেক দিন আগেই কেবল সোমেনের আবেষ্টনে তাতে পেয়েছিল নিঃস্তর বাধা। সোমেনকে আমরা বরাবরই এসেছিলুম ভুল বুঝে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে তুমিই তাকে চেষ্টা করে' করে তুলেছিলে আমাদের চোখের সামনে কালিয়াময়।—এই কথা কটা শেষ করে' তিনি রেবার হাত ধরে' বলেন—চলো মা, আর এখানে নয়।

সোমেন বলে উঠলো—আপনি একটু এগোন আমি যাচ্ছি। তারপর সমরেশের খুব কাছে সরে গিয়ে নীচু গলায় বললে—অমূল্য বাবু মনে যে এ ধারণটা স্থম্পষ্ট হয়ে পড়েছে এ মোছা তো আমার শক্তিতে ঘটবে না। এতদিন কি গা-ঢাকা দিতে হয়! আমার কথায় কি আর একটুও বিশ্বাস করে। জানিস্-ই তো, অমূল্য বাবু কি রকম ঘাবী ব্যবসাদার। আচ্ছা আজ আমি, কলকাতায় গিয়ে দেখা করতে ভুলিস্ নি'। যা' হয় একটা ভেবে ঠিক করা যাবে।

উত্তরে সমরেশ কোন কথাই বলো না, কেবল একটা দৃষ্টবাদ জানালো।

লীলা এতক্ষণ ছিল হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে। এবারে

এগিয়ে এসে ব্যস্তমস্তভাবে জিজ্ঞাসা কল্লে—কি হ'য়েছে
সমরদা—ব্যাপার কী ?

সমরেশ এবার নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বল্লে—ও কিছুই
না,—আমাদের ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা।

যখন তারা পুরীতে ফিরে এল, তখন দেখলে যে
হোটেলের দরজার কাছে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে ;
আর তাতে মাল পত্তর সব ওঠানো হচ্ছে। সিঁড়ির ওপরে
উঠতেই সামনেই আবার সোমেন রেবা আর অমূল্য বাবু।
অমূল্য বাবু বা রেবা কেউই তার সঙ্গে কথা বল্লে না।
সটান নীচে গেল নেমে। সোমেন শুধু জিজ্ঞেস করলো—
কতদিন থাকবি এখানে ?

—কাল ভুবনেশ্বরে যাব—সমরেশ উত্তর দিল।

ঘরের ভিতর গিয়ে সমর ইজিচিয়ারটাতে পড়লো
বসে। প্রায় এক মিনিটের ভিতর বেয়ারাটা এসে একখানা
কাগজ তার হাতে দিয়ে বল্লে—যে মেয়ে লোকটি হু'জন
বাবুর সঙ্গে এইমাত্র চলে গেল' সেই-ই সমরকে দেবার
জন্তে তাকে কাগজখানা দিয়ে গেছে।

প্রথমে সমর চিঠিখানা পড়তে সাহস পেল' না। হাতে
ফরেই রইলো বসে'। কি জানি কেন পড়বার তার
আগ্রহ হচ্ছিল না একটুও। প্রায় পনের মিনিট ঐ রকম
ভাবে বসে' থাকার পর ও খুললে সেখানা—উত্তেজনার
সঙ্গে মেয়েলী হাতে লেখা ছুটি ছত্র—

—এই কি প্রতিদান ! টাকার কথা নয়—আগে যদি
একটুও জানাতে তা'হলে আজ আমার বুক এমনি ক'রে
ভাঙতো না কখনও।—নীচে কারও নাম সই ছিল না।

সমরেশ তেমনি নির্বাক হয়ে বসে' রইলো।

(৯)

ভুবনেশ্বরে সমর সোমেনের কাছ থেকে একখানা চিঠি
পেল। জানতে পারলো অমূল্য বাবু ক'লকাতায় গিয়ে
তার নামে নালিশ করে' তার ব্যবসার অংশ ক্রয়
করবার জন্তে অহুমতি চেয়েছেন।

এদিকে আবার লীলার জরটা বেড়ে গেল অসম্ভব
রকমে। অতএব তাকে দিনরাতই থাকতে হল রোগীর
কাছে। সোমেনকে লিখে জানালো—আমি স্বেচ্ছায়
নিজের অংশ অমূল্যবাবুকে ছেড়ে দিচ্ছি। দেনা শোধ
হিসেবে তিনি তা নিয়ে নিন, তাতে আমার শান্তি বই
হু'খ নেই।

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে সে এক অনাস্বাদিতপূর্ব তৃপ্তির
পেল পরিচয়—যেন এক হুঃসহ বোঝা গেল' নেমে তার
বুকের ওপর থেকে।

পনের দিন ধরে অবিশ্রান্ত বস্ত্রণায় ছটফট করে' লীলা
পৃথিবী ত্যাগ করলো। তার সংকার বা করবার তা
শেষ করে সমরও এসে উঠলো। সোজা রামকৃষ্ণপুরে
উল্লাসের কাছে। এবার তার ভাবনা হ'ল অতঃপর
আর কি করা যায়। তবে দৃঢ় সঙ্কল্প করলো, লোকালয়ে
আর নয়। চাই নির্জনতা, চাই পলায়ন ঝাড়াবিক্ষুব্ধ
জনমতের বিশাল কক্ষব্যস্ততার প্রবাহ থেকে।

অফিস বা সোমেনের বাড়ী কোথাও আর সে পা
বাড়ালো না। (ক্রমশঃ)



মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

মহিলার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি

১৯৩৮ সালের জন্ত সাহিত্যে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক মিসেস এম্ পালবাক নোবেল পুরস্কার লাভ করিলেন। পালবাক এক মার্কিন মিশনারীর কন্যা, তাঁহার জন্ম চীন দেশে। তাঁর কৈশোরের রঙ্গীন দিনগুলি চীনের নানা স্থল ভ্রমণের স্মৃতিতে ভরিয়া গিয়াছিল। তাই তাঁর The good Earth, Sons এবং A house divided গ্রন্থে চীনের স্থল ভ্রমণ, হাসি কান্না, আশা-নিরাশা, মৃতি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ১৯৩১ সালে এই 'গুড্ আর্থ' উপন্যাস বলিয়া নির্বাচিত হয়। এবং "পুলিটজার" পুরস্কার লাভ করেন। ছায়াচিত্র জগতেও এই বইখানি খুবই খ্যাতিলাভ করিয়া ছিল।

তাঁহার The Exile, West wind, East wind, The mother, Fighting anger, This proud heart প্রভৃতি গ্রন্থগুলি খুব প্রসিদ্ধ। তাঁহার পূর্বে ১৯০৯ সালে সুইডেনের লেখিকা সেলমা লেগারলফ, ১৯২৬ সালে ইতালীর লেখিকা গ্র্যাৎসিয়া দেলেডা এবং ১৯২৮ সালে নরওয়ের লেখিকা মাদাম সিগ্রিড উন্সসেং এই তিন জন মহিলা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রবাসে কৃতি বাঙ্গালী মহিলা

মিসেস শেফালিকা বসু মাদ্রাজ প্রদেশে ভেলোর জেলার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বন বিভাগের উচ্চতম কর্মচারী মিঃ বি, কে, বসুর পত্নী। শ্রীমতী শেফালিকা বসু বয়েজ স্কাউট ও গার্ল গাইড সঙ্ঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার রূপে প্রবাসে প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছেন।

প্রবাসে কৃতি বাঙ্গালী ছাত্রী

(ক) নাগপুরের অবসর প্রাপ্ত সবজ্জের কন্যা কুমারী ইভা ঘোষ বি, এ রাষ্ট্র বিজ্ঞান শিখিবার জন্ত নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। মধ্য প্রদেশে ইনিই প্রথম রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রী।

(খ) বার্মার, রেঙ্গুনের এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির কন্যা কুমারী রমা ব্যানার্জি বি, এ, বি, টি সম্পত্তি লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানে এম, এড্‌ (মাস্টার এক এডুকেশন) উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

(গ) কুমারী ইরিশ খাঁ বি, এ, বাঙ্গালীর মেয়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি এ পাশ করিয়া তিনি মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস, ক্রাফটস্ বিদ্যালয়ে চিত্র অঙ্কন বিজ্ঞা শিক্ষা করিতেছেন। তিনি বিখ্যাত বাঙ্গালী গিল্লী অধ্যক্ষ দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরীর ছাত্রী। তাঁহার চিত্রাঙ্কন কৌশল "বঙ্গলক্ষ্মীতে" শীর্ষে প্রদর্শিত হইবে।

নারীর পুরুষের উপর অদ্ভুত প্রতিহিংসা—

কুমারী সারা হীলসোপ নীসনগরবাসিনী; আশী বৎসর বয়সে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। যখন তাঁর বয়স দুই বৎসর, তখন এক যুবকের রূপে-গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুরাগিনী হন। যুবকও তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। বিবাহের সমস্ত আয়োজন পূর্ণ, বিবাহের পূর্বে রাত্রে যুবক হঠাৎ অন্তর্ধান হয়। অনেক অনেক অন্বেষণে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর পরে কুমারী সারা জানিলেন যে, সেই যুবক আর একজনকে বিবাহ করিয়াছে। তিনি ব্যথিত হইলেন, এই যুবক ব্যতীত অত্র কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিবেন না বলিয়া ইতিপূর্বে যে মানন করিয়াছিলেন, তাহাও বিনষ্ট হইল।

তিনি তাঁহার আসামান্য রূপ যৌবন প্রভাবে বহু ধর্মী ও গুণিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন এবং তাহার তীব্র প্রেম-নলে সেই সব যুবকদের হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এই প্রকরে তাহাদের সহিত প্রেমের অভিনয় করিয়া বিবাহ-আদি স্থির করিয়া হঠাৎ পরিত্যাগ করিতেন। এ প্রকারে দশ বৎসরের মধ্যে তিনি ৫০টা যুবকের জীবন একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়া তাঁহার হতাশ জীবনের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

অবশ্য তার পর ত্রিশ বৎসর হইতে আশী বৎসর পর্য্যন্ত এই পঞ্চাশ বর্ষ তিনি অতি সাধু ও ধর্মপরায়াণা ও পরহিতব্রতী হইয়া জীবন কাটাইয়াছিলেন।

পারলোকে গোবিন্দ মোহিনী সিংহ—

বাংলার কৃতি সন্তান যিনি প্রথম দেবী এড্‌ভোকেট জেনারেল, যিনি প্রথম ভারতীয় ল মেম্বর, যিনি প্রথম ভারতীয় আণ্ডার সেক্রেটারী অব সেটস্ ফর ইণ্ডিয়া, যিনি প্রথম ভারতবাসী লর্ড, যিনি প্রথম ভারতবাসী প্রাদেশিক গভর্নর হইয়াছিলেন, সেই স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সহধর্মিণী গোবিন্দমোহিনী সিন্‌হা ৬৯ বৎসর বয়সে ১২ই কার্তিক পরলোকে গমন করিয়াছেন।

তিনি বাঙ্গালার এক গৃহস্থ পরিবারের কন্যা, বাঙ্গালার শিক্ষা, কৃষ্টি, আচার তাহাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তিনি একজন প্রকৃত বিলাতি লর্ডের স্ত্রী লেডী সিন্‌হা হইয়া বাঙ্গালী ঘরের বধুর ন্যায় দরদী। একদিন যখন লর্ড সিন্‌হা রোডে (পূর্বের ইলিসিয়াম রোডে) মুর্শাদাবাদ নবাবের বাটীর অফিসিয়াল রিসিভার তরফে দখল লইবার জন্য যাইলাম, তখন তিনি অতি মিনতি করিয়া বলিলেন চৈত্র মাস, আমি বাড়িটা ছাড়িতে চাহিনা যদিও ছাড়িব বলিয়া ঠিক করিয়া ছিলাম। এই ভিটা আমার লক্ষ্মী, উনি যদি আজ থাকিতেন ইহা ক্রয় করিয়া লইতাম। সামান্য লোক আমরা অথচ কত যত্ন, কত স্নেহ, কি নিরহঙ্কার ব্যবহার। বড় হইতে হইলে নম্রতাই যে আদর্শ।

লেডী মুখার্জি, মহারাণী স্ননীতি দেবী, লেডী সিন্‌হার অভাবে আজ বাঙ্গালার অভিজাত নারী সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

মাদ্রাজ কর্পোরেশনে মহিলা সদস্য

বর্তমানে মাদ্রাজ কর্পোরেশনে সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল। মিসেস্ আশ্রান সোয়ামীনাথান কংগ্রেস পক্ষের ব্যক্তি, ৪জন প্রবল পুরুষ প্রতিদ্বন্দীকে হারািয়া মাদ্রাজ পৌরসভায় সদস্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেস তিনটি সদস্য হারাইলেও তাহাদের সংখ্যাধিক্য খুবই বেশী এবং মেওর কংগ্রেসী দলের লোক হইলেন। ইহা একমাত্র মহিলা সদস্য।

ধূমপান নারীর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর

জাশ্মানিতে প্রকাশ হইয়াছে যে ধূমপান সাধারণতঃ মাহুষের স্বাস্থ্যহানি করে, বিশেষতঃ নারীগণের। বিশেষতঃ প্রমাণ করিয়াছেন যে ধূমপান করিলে নারীর সন্তান উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হয়। সেইজন্য জাশ্মানিতে নারীর ধূমপান নিষেধ করিবার জন্য জাইন প্রণয়ন হইবে। হীটলার ও মুসলীনী এই দুইজন মহাপুরুষ ধূমপান করেন না। নারীর ধূমপান যেমন বিষদৃশ তেমনি অস্বাস্থ্যকর।

মহিলা সমবায় শিল্প আশ্রম লিঃ—

মাননীয়া লেডী বনু মহোদয়ার উদ্যোগে, ভারত সরকারের অর্থাত্মকুল্যে এবং নারী শিক্ষা সমিতির কর্মীদের সাহচর্যে The Women's Co-operative Industrial Home Ltd. এই মহিলাদের বাণিজ্য কেন্দ্রটি দমদম চনং গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে স্থাপিত হইল। মহামতি লেডী ব্রাবার্ড এই প্রতিষ্ঠানটির ২৯শে কার্তিক উদ্বোধন করেন।

যে সব মহিলা বাণীভবন, শিল্প ভবন হইতে নানা শিল্প উৎপন্ন করিবার কৌশল ও শক্তি অর্জন করেন তাহারা বিদ্যালয়ের বাহিরে গিয়া তাহাদের বিদ্যার সম্যক ব্যবহার করিতে পারেন না এবং নিজে নিজে পণ্য উৎপাদন করিবার কাঁচামাল পাইবার সুবিধা বা উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিবার বাজার পান না।

এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সেই সব অভাব দূর হইবে। শিল্প বিদ্যালয় হইতে পূর্ণভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই আশ্রমে ভর্তি হইতে হইবে। এবং সেখানে যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল তাহাদের সরবরাহ করা হইবে। তাহারা পণ্য উৎপন্ন করিয়া দিলে তাহা আশ্রম হইতে বিক্রয় হইবে। আশ্রমের খরচা, শিল্পীদের খোরাকী, বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা মেয়ে কারিকরদের মজুরী স্বরূপ দেওয়া হইবে।

আজকাল অন্নসমস্যার দিনে ইহা যে এক মহৎ ও প্রকৃত উপকারী প্রতিষ্ঠান তাহা বলাই বাহুল্য। বিজু এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীবৃদ্ধি করুন। ইহা এণ্টা ভারতে অভিনব সমবায় বাণিজ্য মহিলা প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে হয়। লেডী বনু ইহার সভানেত্রী।

গীতার পুনরুজ্জ্বলিত

অচেতনঃ—৩৩২ ; ১৫১১ ; ১৭৬

তৃতীয় অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে 'অচেতনঃ' শব্দ পাওয়া যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ণযোগ উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের অলুপ্তাসন হইতেছে যে দীপ্তরাধনার্থ কর্ণ করিবে। এই অলুপ্তাসনকে ঘেষবশতঃ যাহারা অর্পণ করেন না, তাঁহারা বিবেকহীন, কর্ণে ও ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে যে জ্ঞান, তাহা তাঁহাদের নাই, অতএব তাঁহারা 'অচেতনঃ' অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সর্বজ্ঞান বিমূঢ় বলিয়া জানিবে।

১৫১১—পঞ্চদশ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে 'অচেতনঃ' শব্দ পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান গুহ্যতম শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা জানিয়া লোকে বুদ্ধিমান ও কৃতকৃত্য হয়। যত্নশীল যোগিগণ শরীর মধ্যে অবস্থিত আত্মাকে দেখেন, কিন্তু মন্দমতি 'অচেতনঃ' অর্থাৎ অকৃতাত্ম্যাক্তির। যত্নশীল হইলেও, শরীরস্থ আত্মাকে দেখিতে পান না।

১৭৬—সপ্তদশ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে 'অচেতনঃ' শব্দ আছে।

শ্রীভগবান বলিতেছেন যে, যাহারা দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বল সম্পন্ন হইয়া শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক ঘোর তপস্তায় নিযুক্ত হয়, তাহারা শরীরস্থ ভূত সমূহকে বধা উপবাসাদি দ্বারা ক্রিষ্ট করতঃ অন্তঃশরীরস্থ আমাকে (পরমাত্মাকে) কর্ণ করিয়া থাকে ; এই সকল 'অচেতনঃ' অর্থাৎ মন্দমতি ব্যক্তিসকলকে জুর স্বভাব বলিয়া জানিবে।

আশ্চর্য্যবৎ—২১২০

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে, 'আশ্চর্য্যবৎ' শব্দ তিন বার পাওয়া যায়। যাহা অকস্মাৎ দৃষ্ট হয়, যাহা অদ্ভুত ও পূর্বে অদৃষ্ট, তাহাই আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্যের জ্ঞান, এই অর্থে 'আশ্চর্য্যবৎ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন

কিরূপ ছবিজ্ঞেয়, তাহা 'আশ্চর্য্যবৎ' শব্দটি তিন বার ব্যবহার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বুঝাইলেন।

এই আত্মাকে কোন ব্যক্তি শাস্ত্র বা আচার্য্যোপদেশ দ্বারা দর্শন করেন, এবং আত্মাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যান, কারণ তাঁহার অর্ঘটন ঘটন চাতুর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হন, তখন তিনি কেবল অবাক হইয়া দর্শন করেন মাত্র—ভাষা সেই আশ্চর্য্য বস্তুকে ব্যক্ত করিতে পারে না।

অতঃ কেহ এই আত্মার বিষয় আশ্চর্য্যভাবে বর্ণনা থাকেন এবং সেই কথা কেহ আশ্চর্য্যভাবে শুনিয়া থাকেন।

অতঃ কেহ বা বিশদভাবে এই আত্মার বিষয় বর্ণনা, আত্মাকে অবধারণ করিতে পারে না। আত্মা এইরূপ ছবিজ্ঞেয় পদার্থ। আত্ম-তত্ত্ব-বিৎ বক্তা অদ্ভুত, ইহার শ্রোতাও অদ্ভুত ; কুশল ইহার শ্রোতা এবং কুশল ইহার বক্তা—যেমন গুরু তেমনি শিষ্য।

তদ্বদর্শী জ্ঞানী গুরুর নিকট সমগ্র বিদ্যাই প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট, গুরু এই প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট আত্মজ্ঞানকে শিষ্যকে দান করেন।

যাহা মহান্ যাহা ভূমার অল্পবর্তী, তাঁহার শ্রোতা ও বক্তা অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যবৎ, তাঁহারা উভয়েই মহিয়তার প্রভাবে আচ্ছন্ন।

'বুদ্ধিঃ' শব্দ গীতায় ১৮বার ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—২৩০, ২৪১, ২৪৪, ২৫২, ২৫৩, ২৬৫, ২৬৬ ; ৩১, ৩৪০, ৩৪২ ; ৭৪, ৭১০ ; ১০৪ ; ১৩৫ ; ১৮১৭, ১৮৩০, ৩১, ৩২। যদিও বুদ্ধি গুণাল্লসারে ত্রিবিধ, ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধির দ্বিবিধ বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন—'এষা তেহতিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে দ্বিঃ শৃণু' (২৩০) অর্থাৎ—এই তোমার নিকট সাংখ্য বিষয়ে বুদ্ধি অভিহিত হইল ; এক্ষণে তুমি যোগ বিষয়ে বুদ্ধি শ্রবণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক শ্রীভগবান দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা কহিয়াছেন—‘জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাম্’। অতএব শ্রীভগবানের মতে বুদ্ধি দুই প্রকার যথা—(১) সাংখ্য বুদ্ধি ও (২) যোগ বুদ্ধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোক হইতে ৩১ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীভগবান যে পরমার্থ আত্মতত্ত্বের নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই সাংখ্য শব্দের দ্বারা অভিহিত। জন্ম প্রভৃতি ছয় প্রকার বিকার আত্মার হইতে পারে না, এই কারণে আত্মা অকর্তা, এইরূপ প্রকরণের অর্থ নিরূপিত হইলে সাংখ্য বিষয়ে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম সাংখ্য বুদ্ধি। যে সকল জ্ঞানিগণের এই প্রকার সাংখ্য বুদ্ধি অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারা ‘সাংখ্য’ শব্দের দ্বারা অভিহিত হন। এই প্রকার সাংখ্য বুদ্ধি উদয় হইবার পূর্বে, আত্মা ও শরীর ভিন্ন হইলেও, আত্মা কর্তা ও স্বত্বদুঃখভোক্তা এই প্রকার চঞ্চলবুদ্ধি প্রযুক্ত ধর্ম ও অধর্মের জ্ঞান আসে, কিন্তু ব্যবসায়িক বুদ্ধির উদয় হইলে, আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তাহারই নাম যোগ। এই যোগ বিষয়ে যে বুদ্ধি, তাহাই যোগ বুদ্ধি।

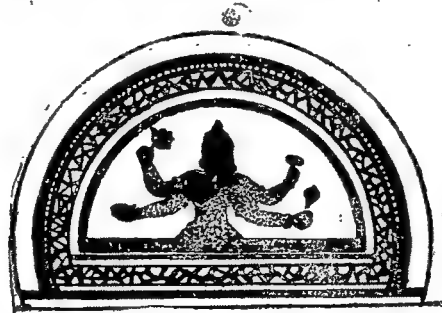
‘সমাধাবচনা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাস্পাসি’—২।৫৩ অর্থাৎ যখন এই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি নিশ্চলা (স্থির) হইয়া পরমাত্মা পরমেশ্বরে অবিচলিত থাকিবে, সেই সময় তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ বিবেক-প্রজ্ঞা নামক সমাধি প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্তের প্রশমতা লাভ হয় এবং এই প্রশমতা লাভ করিলে জীবের সমস্ত দুঃখের বিনাশ ঘটে, যেহেতু প্রশমচিত্ত হইলে বুদ্ধি অতি শীঘ্র স্থিরতা লাভ করে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে নিশ্চল হয়। এই অবস্থার নাম যোগ।

বুদ্ধি জগৎরূপা অপরা প্রকৃতি হইতে জাত। অপরা প্রকৃতি অষ্টধা বিভক্ত; ইহা হইতে জীবনামক পরা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ভূতই এই প্রকৃতিদ্বয় (অর্থাৎ পরা ও অপরা প্রকৃতি) হইতে উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়।

মন, বুদ্ধি অহঙ্কারের সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, কারণ তাহারা জড়। পরা প্রকৃতি জীবের আধারেই জগৎ বিদ্যুত রহিয়াছে। এই জগৎকে জীব ধরিয়া নাই, কারণ জীবের স্ব-কর্তৃত্ব নাই। পরা প্রকৃতি জীবের দ্বারাই শ্রীভগবান এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। জীব যখন তাহার সাধারণ বুদ্ধিকে শ্রীভগবানে যুক্ত করিতে পারে, তখনই তাহার বুদ্ধি যোগযুক্ত হয়, এবং তাহাই বুদ্ধিযোগ। প্রকৃতির তিন গুণ। বুদ্ধি প্রকৃতি জাত, অতএব বুদ্ধিও ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্বিকী, রাস্বসী ও তামসী।

যদ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য, অকার্য, ভয়, অভয়, বন্ধ এবং মোক্ষ অবগত হইতে পারা যায় তাহাই সাত্বিক বুদ্ধি। যাহার দ্বারা ধর্ম, অধর্ম, কার্য, অকার্য যথার্থরূপে জানা যায় না তাহাই রাস্বস বুদ্ধি। যে অজ্ঞানাস্বকারে আবৃত বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম এবং সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থকে বিপরীত ভাবে প্রতিপন্ন করে, তাহাই তামস বুদ্ধি।

পৃথিবীস্থ মানবাদি কিম্বা স্বর্গবাসী দেবগণ মধ্যে প্রকৃতি সত্ত্ব গুণত্রয় হইতে কেহই মুক্ত নহে। কিন্তু বাহ্যিক বুদ্ধি সর্বত্র আশ্রিত রহিত, যিনি জিতাত্মা, ফলস্পৃহা রহিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও মমতা শূন্য হইয়া পরম ভক্তি প্রভাবে শ্রীভগবানের সর্বব্যাপিত্ব ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।



দক্ষিণ ভারত-পথে

জানি না কোন যুগে, বৈদিক, না প্রাগঐতিহাসিক, না পৌরানিক যুগ হতে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে মহাসাগর কূলে প্রকৃতির মনোরম ক্রোড়ে রামেশ্বর তীর্থের মহিমা ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। অসীম নীলাম্বুমালায় উত্থান-পতনের স্রায় কত জাতি, কত বংশ, কত রাজ্য, কত ধর্মের এই ভারতের বক্ষে উত্থান ও পতন হইয়াছে। কিন্তু রামেশ্বরের মহিমা যে কবি বর্ণনা করিয়াছে, তাহা যেমন অপূর্ব তেমনি স্বাথ্য হইয়া আছে।

যে বিশ্বাত্ম বিশ্ববীজম্ নিখিলভয় হরম্ ত্রিনেত্রম্ পঞ্চবক্তৃ মহা দেব ভারতের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্বতের তুষারের দৃষ্টি সাগরের ঢেউয়ের মধ্যে বজ্রিনাথে বিরাজমান হইয়া শত সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কোটি কোটি নরনারীর স্রায় আকর্ষণ করিতেছে, সেই শিব-মহিমা অনন্ত ক্ষিরোদ সাগরের কূলে রামের দ্বারা বালুকায় গঠিত আজো বিরাজিত থাকিয়া কোটি কোটি ভক্তকে আকর্ষণ করিতেছে। বাল্মীকির স্রায় মহাকবি এই প্রকার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময় স্থানই ভগবৎ লীলা কল্পনায় আনিতে পারেন।

পুরীর চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভবনে গন্তিরার সম্মুখে সপরিবারে কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত পর্যটন কথা মনে উদয় হওয়াতে দক্ষিণ ভারতে যাত্রার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইল। সেই দিন (২০শে আশ্বিন ১৩৪৫) পুরীধামে স্রার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষী জী লেডী বসন্তকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিত বিধবা-আশ্রমের প্রাণস্বরূপা বড়-মা (শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর) আশ্রমে বসিয়া আমাদের আগ্রহ অল্পভব করিলেন। তিনিও আমাদের সহিত সেই মহাতীর্থে যাইবার জন্ত আকুলিত হইলেন। তাঁর চৌষটি বৎসর বয়স, তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য, তাঁর পদমর্যাদা, তাঁর সমাজ ও বংশোচিত আচার, তাঁর আরামদায়ক জীবন-যাত্রার উপকরণ-অভাব কিছুই রামেশ্বর দর্শন বাসনা হতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। একেই বলে তীর্থের মহিমা! এমনি

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

করে নর-নারীকে আকর্ষিত করে তীর্থের অনৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তাঁর শিল্প বৈভব, তাঁর দেব-দেবীর পূজা-উৎসব, তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান চর্চা।

তৎপর দিন সন্ধ্যায় পুরী হইতে মাদ্রাজ দ্রুত যাত্রী ট্রেনে সন্ধ্যা ৬:১০ মিঃ রওনা হওয়াগেল। প্রথম যাত্রা ভাঙ্গ করিবার বাসনা ওয়ালটেরার সহরে। প্রাতেই ২৯১ মাইল অতিক্রম করে সরাসরি বিনা গাড়ী বদল করে ঘাইতে পাণ্ডা যাইবে জানিয়া এই ট্রেন স্থবিধাজনক মনে হইল। এসব গাড়ীতে মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে শয়নের স্থান বেশ পাওয়া যায় এবং যাত্রীদের নামা উঠার কোলাহল থাকে না। তবে মধ্যে মধ্যে 'গদীওয়াল' গাড়ী বলে চীৎকার করিতে হয়।

সাক্ষী গোপাল

শারদিয়া পূর্ণিমা তিথি, শুভ জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী, সমগ্র দেশ যেন পুলকে ভাসিয়া উঠিয়াছে। ট্রেনের দ্রুত-গতির স্রায় পথের দুই পার্শ্বের শশ্যশ্রামলা ক্ষেত্রগুলি যেন রজত সাগরের স্রায় ছুটিতেছে। ক্রোশের পর ক্রোশ জগন্নাথদেবের দেউল নয়ন ও মন হইতে যাইতে চায় না। সাক্ষীগোপালের নারিকেল ব্যবসায়ীদের কোলাহল সাক্ষী গোপালের অদ্ভুত সাক্ষী দিবার কাহিনী মনে জাগিয়া দিল। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক যুবক ব্রাহ্মণ কুমার সহ বৃন্দাবনে যার। যুবক বৃদ্ধের খুব সেবা ও যত্ন করে। বৃন্দাবনে গোপাল মন্দিরে বিগ্রহ সম্মুখে তাহার কণ্ঠার সহিত যুবকের বিবাহ দিবে প্রতিজ্ঞা করে। পরে স্বদেশে আসিয়া তাহা অস্বীকার করে এবং বলে গোপাল আসিয়া সাক্ষী দিলে তাহাকে কণ্ঠা দিবে। যুবক নিরুপায় হইয়া বৃন্দাবনে যায়, যুবতীর ধর্ম ও ব্রাহ্মণের সত্য রক্ষার জন্ত গোপালের নিকট মিনতি করে এবং সাক্ষী দিবার জন্ত বিদ্যানগরে (পুরীর নিকট)

যাইতে অল্পরোধ করে। বিগ্রহ হাসিয়া বলে ‘প্রস্তর মূর্তি কি কখন চলে’। দ্বিজ বলে ‘এই ত ঠাকুর কথা বলিতেছ, তুমি সব পার’। “তখন বলিল আচ্ছা তুমি যাও আমি তোমার পিছু যাইব, কিন্তু পিছন দিকে চাহিও না, আমার নূপুর ধনি কেবল শুনিবে, যখনই পিছু পানে চাহিবে আমি আর যাইব না।” বৃন্দাবন হতে বিগ্রহের নূপুর ধনি শুনিয়া আসিতেছিল, বিদ্যানগরের নিকট আসিতে নূপুরের কড়াই ভিতর বালি প্রবেশ করাতে ধনি বন্ধ হয়, তাই যেমন বিগ্রহ ঠাকুরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্ত পিছনে চাহিল অমনি পাষাণ মূর্তি দেখিল। আর নড়িল না, সেই মোহন মুরতি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল। তখন সেই বৃদ্ধ বিগ্রহ যুবককে কস্তা দান করিল। সেই অবধি সেই দেশের রাজা বৃহৎ দেউল নির্মাণ করিয়া এবং সম্পত্তি প্রদান করিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মোহন সাক্ষীগোপাল মূর্তি সকলের হৃদয় ভর্তিতে থুত করিয়া দেয়। পুরী হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে তিন টাকা ভাড়া দিয়া চারি ঘণ্টায় সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া আসা যায়।

খুঁদা জংসন ছাড়িয়া এবার গাড়ী দক্ষিণ ভারতভিমুখে ছুটিল! কিস্তি দূর সাতাশ আটশ মাইল যাইবার পর চিক্কা হ্রদের দেখা পাওয়া যাইল। যখন চিক্কা হ্রদের তীরে গাড়ী ছুটিতেছিল তখন হ্রদের নীল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ধ্বমালার উপর চল্লিশ রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব মনোরম উজ্জলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক মাইল গাড়ী এই মনোরম হ্রদের তীরে ছুটিতেছিল, তখন চোখের সামনে কত সুদৃশ্য চিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছিল। হ্রদের শুভ্র-জলরাশির মধ্যে পার্বত্যময় বৃক্ষলতা-গুল্ম শোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি, হ্রদ তীরে ধীর কুটিরের দীপমালা, অঙ্গনতলে জেলে ডিঙ্গির সারি, নানা রঙ্গের তালি যুক্ত পাল বিতাড়িত নোকাগুলি হ্রদের অপূর্ব শোভা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

রেসের বাঁধের তলে জেলে ডিঙ্গি হতে আইসটা গন্ধ মৎস্য প্রিয় বাঙ্গালীর রসনায় লোভ সঞ্চার করিলেও নিরাশ্রয় প্রাণ ভরিয়া দিল। চিক্কা হ্রদের মহিমা কলিকাতাবাসীর নিকট মৎস্য সরবরাহর আড্ডা বলিয়া পরিচিত। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শালিনী বলিয়া জানা ছিল না। চিক্কা

হ্রদের শোভা রঙা ষ্টেশনের নিকটেই শেষ হইয়া যাইল। রঙায় নাগিয়া চিক্কা হ্রদ বিহার করাই সুবিধাজনক।

তারপর গঞ্জাম জিলার শস্য শ্রামল ক্ষেত্র, যেন বঙ্গমাতার এক অঞ্চলের অংশ খসিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালারই মতন কোথায় বা চাষী ধাত্ত গাছের পাট করিতেছে, কোথায় বা বলদ যুগল লইয়া লাঙ্গল চালাইতেছে, কোথায় বা বিচিত্র রঙ্গের সাড়ী পরিধানা নারীগণ গাছ নীড়াইতে নিযুক্ত। গঞ্জাম জিলা এখন দুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া উড়িয়াও মাদ্রাজ প্রদেশভুক্ত হইয়াছে। গঞ্জামের দক্ষিণ অঞ্চল হইতে অল্প দেশেই দ্রাবিড়ি নরনারীর আভাষ পাই। এখান হইতেই উন্মুক্ত আকাশতলে বিন্দ্র অনবগুপ্ত নানা রঙ্গের সাড়ী পরিহিতা রমণীদের চোখে পড়ে। প্লাচ লাল ও হরিদ্রা এই দোরঙ্গা সাড়ী এই অঞ্চলের প্রিয়।

• মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রবেশ মাত্রই সর্বত্র এক পার্থক্য চক্ষে পড়ে তাহা মাদীর রাজ্য রং। উষার আলোকের রক্তিম-চ্ছটার সহিত রাজ্যমাটির ঢেউ অপূর্ব দৃশ্য স্বজন করে। অল্প দেশ হইতে সুদূর—হাজার মাইল পথ এই রাজ্য মাটির সহিত পরিচয় লাভ হইয়াছে।

বাঙ্গলার পাশটে এটেল মাদী, মধ্য ভারতের কাল মাটি, উত্তর ভারতে সাদা মাদীর সহিত দক্ষিণ ভারতের পার্থক্য বেশ উপলব্ধি করা যায়। গঞ্জাম জিলা হইতেই তাল, নারিকেল, কদলী বৃক্ষের সমাবেশ যতই দক্ষিণভিমুখে যাওয়া যায় ততই দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিকে সমুদ্রকূল আর একদিকে পূর্বঘাট পর্বতমালা বেষ্টিত ভূমি যেমন উর্বর, তেমনি স্বাস্থ্যকর। বরহামপুর সহরের নিকট সমুদ্রকূলে অবস্থিত গোপালপুর স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। রিজলীবাতি, কলের জল, সমুদ্রের হাওয়া, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য বাঙ্গালীকে এই গোপালপুর আকৃষ্ট করে। বরহামপুর ষ্টেশনে কয়েকজন বাঙ্গালী যাত্রীও দেখিলাম।

উষার রক্তিম আলোকচ্ছটার সহিত প্রকাণ্ড সরোবর-তীরে ভিজিয়ানা গ্রাম রাজার প্রাসাদ ও অটালিকার শোভা গাড়ী হইতেই দেখিতে পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ গাড়ী দৌড়িবার পর ওয়ালটোয়ার ষ্টেশনে হাঁপ ছাড়িয়া থামিল।

ওয়ালটেয়ার

কোথায় যাইব কিছুই স্থির নাই, পুরীতে মিস
জ্যোতিষ্ময়ী গাঙ্গুলী এম-এ মহোদয়। একটা পাহনিবাসের
অম্পষ্ট নাম করিয়াছিলেন। তাই বলাতে ট্যাক্সীওয়ালা
ওয়ালটেয়ার ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে ভিজিগাপটম
সহরের সমুদ্রকূলে “ফিরোজি ম্যানসনে”র নামে লইয়া
উপস্থিত করিল। ১০ টাকা ভাড়া লাগিল। একেবারে
সমুদ্রের উপর দশ ফুট উচ্চ পোস্তার উপর পাথরের
অট্টালিকা। জিজ্ঞাসায় জানা গেল ১১০ টাকায় এক
একখানি ঘর ভাড়া পাওয়া যায়; খালিও আছে। আলো,
জল, মেথর খরচ নিজেদের। অহুস্কানে অল্প স্থান না
পাওয়ায় দ্বিতলে বড় স্টুট ২১০ টাকা দিয়া গ্রহণ করা
হইল। বাটার অবস্থান ও দৃশ্য সকলকে আকৃষ্ট করিল।
লাগাওয়া বাথরুম থাকায় বড়মা আনন্দিত, আমার কন্যা
বালিকা রমা বলিয়া বসিল, এই বাটিতেই “চোখের বালি”
ফিল্মিমের বিনোদিনী ছবি তুলিয়াছে। সে সমস্ত স্থান
উপলব্ধি করিয়া আনন্দে লাফাইতে লাগিল।

গোল বাধিল জল ও আহার লইয়া। আমরা সঙ্গে
কুকার আদি লইয়া ছিলাম, কিন্তু তখন সীমাচলে যাইবার
কথা হওয়াতে কোন হোটেল খুঁজিতে গেলাম। পাশেই
অনেক সাহেব ফিরিজির বাস, রবিবার গির্জায় গমন

করিতেছে, প্রবাসী মেমকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তার
পুরান এক ভৃত্যকে সঙ্গে দিয়া কয়েকটা রেপ্তুরেটে পাঠাইয়া
দিলেন। এক স্থানে ক্রাসনাল বোডিং, প্রতি ভোজ ১০
আনা স্থির হইল। আহারও উত্তর ভারতীয় স্বাদে—ভাত,
ডাল, সজীর তরকারী; মাছের কোর্স, টমাটোর চাটনি,
আলু পাপর ও ভাজা,। সবই স্বতপক ও স্বস্বাদু।

সীমাচলম্

আহারাতেই আমরা একটা মোটর গাড়ী পাচ টাকা
যাতায়াত ভাড়া ঠিক করিয়া সীমাচল যাত্রা করিলাম।
ওয়ালটেয়ার হইতে নয় মাইল দূরে ৮০০ ফুট উচ্চ পর্বতশিখো
সীমাচলম্‌য়ের মন্দির বিরাজিত। সীমাচলম্‌ যাইবার সীমা-
চলম্‌ ষ্টেশন আছে, তথা হইতে তিন মাইল যাইতে হয়।
তাহা অপেক্ষা ওয়ালটেয়ার হইতে যাওয়া সুবিধা। ঘোড়ার
গাড়ী ভাড়া ১১০ লাগে। মোটর বাসও সময় সময় যায়,
ভাড়া ৮০ মাত্র।

সীমাচলম্‌ হিন্দুদের এক প্রিয় তীর্থ, ইহার আবহাওয়া
প্রাকৃতিক দৃশ্যই যাত্রীদের মন হরণ করে। চারিদিক
বনরাজি শোভিত পর্বত ও জলধারার কলনিবাদ ১১২০
বাধান ধাপ অতিবাহন করিয়া উঠিবার শ্রম দূর করিয়া দেয়।

(ক্রমঃ)

ঘুম পাড়ানী গান

শ্রীমমতা ঘোষ

ঘুম আসেনা মণির আমার, পুটর পুটর চায়,
এমনি করে ধীরে ধীরে রাত যে বেড়ে যায়।

কোলেই থাকে শুয়ে।

মুখ বাঁকিয়ে কেঁদে ওঠে নামাই যদি ভুঁয়ে।

যাহ আমার বোঝে সবই—বুদ্ধি তাহার কত,
চায় সে কেবল মায়ের কোলে থাকতে অবিরত।

ছোট্ট ছেলে ও যে—

কোল, বিছানায় তফাৎটুকু কেমন করে বোঝে?

জেগেই আছে—রাত যে বাড়ে, আসবে কখন ঘুম?

রাজার রাজা টোটে দেবে আবেণ মাখা চুম।

চোখের পাতার 'পরে

নামবে কখন ঘুম-পরীরা হাল্কা হাওয়ার ভরে?

নিঝুম নিশীথ—ঝিঁঝিঁ ডাকে, ঘুমায় সকল লোক,
মাণিক আমার, বন্ধ কর ডাগর দুটি চোখ।

নেই কি ঘুমের মন?

ঘুমিয়ে থাক মায়ের কোলে মায়ের বুকের ধন।

সোনা আমার, ঘুম যাবে যে—ঘুম বুঝি ওই আসে,
মায়ের মত গভীরভাবে খোকায় ভালবাসে।

প্রাণের পুতুল মোর

ঘুমাও সুখে, জাগবে আবার হবে যখন ভোর।

পল্লী-সাহিত্যে বিরহ-গীতিকা

বাংলার প্রাচীন পল্লী-সাহিত্যের মূল্য অপরিসেয়। বাংলার কথক, কবি, বাউল ও কীর্তনীয়ার রচিত কাব্যই বাংলার প্রাচীন সাহিত্য। বাংলার বাউল গান, কীর্তন, ব্রতকথা, ডাক বা খনার বচন, গাজীর গান, পীর সংবাদ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যের উপাদান। কৃত্তিবাস, কালীদাস, পীর লালন সা, আলোয়াল, চণ্ডীদাস, বিজ্ঞাপতি, রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের রচিত সাহিত্যই বাংলার পল্লীর অতুলনীয় সম্পদের পরিচায়ক। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে এই পল্লী-সাহিত্য হইতে, এইজন্তই প্রাচীন পল্লী-সাহিত্য অমূল্য সম্পদের আধার।

এইরূপ পল্লী-সাহিত্যে প্রেমের কবিতা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছিল। বাংলা দেশের বারমাসী শ্রেণীর সারি গানগুলি প্রেমের কবিতা নামে আখ্যা পাইবার যোগ্য।

প্রাচীন বাংলার পল্লী কবিরাই বারমাসী কবিতাগুলির রচয়িতা। পল্লীর অধিবাসীরা এই সকল বারমাসী সঙ্গীত গাহিয়া একটা অনাবিল আনন্দলাভ করে। পল্লীপ্রদেশে বারমাসী সঙ্গীতগুলি খুবই জনপ্রিয়। নায়িকার বিরহ-মর্মব্যথার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গ্রাম্যকবি এই সব গান রচনা করিয়াছেন। কবিতাগুলির ভাষা নির্বাকীর মত মুক্ত এবং উপমা ও চিত্রগুলি মনোরম ও অতুলনীয়; এই গানগুলির ভিতর দিয়া আমরা প্রাচীন বাংলার নায়ক নায়িকার সত্যকার সরল প্রেমের পরিচয় লাভ করি। এই কবিতাগুলিতে প্রাচীন সামাজিক রীতি-নীতির বহু উপ-করণ পাওয়া যায়। নায়িকার বেদনাবিধুর চিত্তের অস্থিরতা কবি অশেষ রচাননৈপুণ্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি বারমাসী শ্রেণীর বিরহ গীতিকার উল্লেখ করিব।

“মাঘে মাধব কৈল মধুরা গমন,
চারিদিকে অন্ধকার দেখি বৃন্দাবন।
জ্যেষ্ঠে যমুনার জল খেলে বনমালী,
এখন কোন সখী দিচ্ছে জল অঞ্জলি অঞ্জলি।”

শ্রীমুরেঙ্গনাথ দাশ বি, এ

আষাঢ়েতে রাধানাথ যদি পড়ে মনে,
অশ্রু আসিবে হরি রথযাত্রা সময়ে।
ভাদ্রেতে ভরা নদী দুকুল পাথার,
কেমনে আসিবে হরি না জানে সাতার।
আশ্বিনে আশ্বিনা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে,
অবশু আসিবে হরি পূজা দেখিবারে।
অগ্রহায়ণ মাসেতে ক্ষেতে পাকা ধান,
বৃন্দাবনে কৃষক নাই কে করিবে নবান।
পৌষ মাসে পত্র লেখিয়া দিলেম সখীর হাতে,
অবশু আসিবে হরি পত্রপাঠ মাতে।”

• এই বারমাসী কবিতাটির উপরে বৈষ্ণব যুগের প্রভাব পড়িয়াছে। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অল্পপস্থিতিতে শ্রীমতী রাধিকার বিরহ ব্যথার অল্পমাত্রা কবিতাটিতে ফুটিয়াছে (এই কবিতাটি রাজসাহী জেলার মান্দা থানা হইতে সংগৃহীত।)

“সাত ভাই এর বোন আমি বড় সোহাগের,
গিয়াছিলাম যমুনার ঘাটে চান করিবার,
কোন বা দেশের ছিল রাজা তুলে নিল নৌকায়।

* * *

হালিয়া ভাইরে হাও বণ্ড
তোমার হালের ভোঁওর আঁকা ঝাঁকা,
আমার পতিকে বিয়ে দিও,
যার হাতে কোমল শাখা।”

যমুনার ঘাট দিয়া কত অজানা দেশের অজানা মাঝি নৌকা চালাইয়া যায়। নায়িকা এই যমুনার ঘাটে স্নান করিতে আসে। নদীপথের নৌকার মাঝি তাহাকে নৌকায় তুলিয়া নিল। নায়িকা নায়ককে ত্যাগ করিয়া যাইতে রাজি নয়। সে ঘাটের সকলকে তাহার হৃদয়ের গভীর আকুলতা জ্ঞাপন করিতেছে।

“কোথায় গেলে প্রাণ প্রিয়ে বলত’ এখন,
খেলা সাজ করি কোথা করিলে গমন।”

ছল ছল করে আমার নয়নের নীর,
জগৎ আঁধার আমি দেখি রাত্রিদিন।
টলমল অঙ্গ তোমার কিবা শোভা পায়;
ঠারেতে ডাকিলে তুমি আস তথায়।
ফাল্গুন মাসেতে প্রিয়ে প্রথম মিলন,
বরবেশে তথা আমি করি আগমন।
ভাসিয়াছিলাম তোমার প্রেমের সাগরে,
মরিয়াছ তবু আত্মরূপে আছ অন্তরে।
শরতের চন্দের মত বদন তোমার,
স্বাকার শ্রেষ্ঠ তুমি ভুবন মাঝার।
ক্ষিতিতলে রহিলাম তোমার লাগিয়া,
জন্মান্তরে আত্মরূপে মিলিবে হাসিয়া।”

জীবন মৃত্যুতে কবি অধীর ও আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন।
জীবন কথা মনে কল্পিতেই কবির স্মৃতিতে পত্নীর ভালবাসার
কথা, আদরের কথা উদ্ভিত হইতেছে। ফাল্গুনী বসন্তের
প্রথম মিলন। যৌবনের খেলাধুলা, সংসারের মায়ামগতা,
দাম্পত্য জীবনের সমস্ত কথা একত্রীভূত হইয়া কবিকে
অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মৃত্যুতে জীবন শারীরিক অল্পপ-
স্থিতি ঘটয়াছে সত্য কিন্তু কবির মানসপটে তাঁহার স্মৃতি
চিত্র বর্তমান থাকিবে। ইহাই হইল কবির সান্ত্বনা। জীবন
প্রাত কবির এইরূপ পবিত্র শ্রদ্ধা ও আন্তরিক অম্লরক্তি
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

“আমরা নারী অবলা,

সয় না জালা,

ঘরে নাই মোর প্রাণের পতি

আমরা যুঁতী জাতি

আর মালতী বঁধু সহী।

ও বঁধু ফুল গাঁথোছি নানান জাতি,

এ ফুল কার গলে দিব, প্রাণ জুড়াব,

কোথায় যাবা পাব প্রাণের পতি।

আর কালার সাথে প্রেম কর্যা

মোর স্বখ হলো না কোন কালে,

জলে লো সহী

সমুদ্রে বাঁপ দিলে কি মাংস ?

আমরা নারী অবলা

সয়না জালা,

ঘরে নাই মোর প্রাণের পতি।

“ও বিদাশী বন্ধুরে

তোমর জন্ত প্রাণ কাঁদে।

তোমর জন্ত প্রাণ কাঁদে (লো সহী),

তোমর জন্ত প্রাণ কাঁদে ॥

সমুদ্রে উঠে ঢেউ, • •

কূলে এস্যা লাগে।

আমার দেহের মাঝে উঠে ঢেউ,

কেহ নাহি দ্যাখে ॥

তুমি হলে বট বিরঞ্চি,

আমি তরু লতা।

তোমার মনের কথা দ্যাখ,

আমার মনে গাঁথা ॥

(শেষোক্ত তিনটি কবিতা ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা
খানা হইতে সংগৃহীত ।)

এই সকল গীতি কাব্যের ভাবমাধুর্য্য অতি চমৎকার।
এইগুলি পড়িয়া সমস্তটুকু মাধুর্য্য উপভোগ করা যায় না।
গান শুনিলে সমস্ত মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায়। পল্লীর
লোক আজও এই সকল গান তুলিতে পারে নাই।
শিক্ষিত সমাজের অনাদর অবজ্ঞা সহ্য করিয়াও পল্লীর
কবি প্রাণের সমস্ত আনন্দ দিয়া বাংলার কাব্যকে বাঁচাইয়া
রাখিয়া ধন্য হইয়াছে।

আমাদের গাজন, দোল, দুর্গোৎসব, মহরম প্রভৃতি
অমূল্যগুলির ক্রমশঃ অন্তর্দানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অনেক
গৌরবের জিনিষ অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। বাংলার
এই সকল প্রাচীন গৌরবের জিনিষ বাঁচাইয়া রাখিতে
হইলে বাংলার পল্লী সাহিত্যকে বাঁচাইতে হইবে এবং
তাহাকে সম্পূর্ণ সমাদর করিতে হইবে। *

* এই কবিতাগুলি লেখক কর্তৃক সংগৃহীত ও “বাংলার
শক্তি”তে পূর্বে প্রকাশিত।

“সাত ভাই চম্পা”

(গল্প)

ব্রাহ্ম লাইনের ছোট্ট একটা স্টেশন। একথানা পুরাতন ওয়াগনের চাকাগুলি খুলিয়া মাটিতে বসাইয়া কৃত্রিম একটা ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে একথানা টেবিল ও একটা আলমারী লইয়া আমাদের আশপাশের স্টেশন। পাশেই একটা অল্পরূপ ওয়াগনের মধ্যে আমার কোশ্চটার। তাহা ছাড়া চতুর্দিকে শুধু দিগন্ত জোড়া উল্লু মার্চ আর সবুজ ধানের ক্ষেত।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি, শীতটা তখন বেশ জুকিয়া পড়িয়াছে। একদিন সকাল বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি আশপাশের মাঠগুলোতে মহাসমারোহে ধান কাটা শুরু হইয়াছে। স্টেশনের পিছনে নীচু জমিটার কয়েকজন কৃষক মাথায় গামছা বাঁধিয়া উৎসাহে কাজে লাগিয়াছে। জমির আলের উপর বসিয়া একটি বৃদ্ধ তামাক টানিতে টানিতে তাহাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণে রত। বৃদ্ধটি হয় ত ঐ জমিটার মালিক আর ঐ লোকগুলি তাহারই নিযুক্ত কিষান, অত বড় জমিটার মালিক যে, মা লক্ষী যাহার ঘরে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান তাহাকে আর স্বহস্তে জমি চাষ করিতে হয় না।

এখানে আমি নূতন আসিয়াছি, বিশেষ কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় হয় নাই এখনও। স্টেশনের কাজকর্ম সারিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন মাঠের দিকে গেলাম, সূর্য্য-কিরণস্নাত পাকা ধানের ক্ষেতে কর্মরত কিষাণের দল তখন কর্মে ক্ষান্ত দিয়া পথিপার্শ্বের আশখু গাছটার ছাঁয়ায় বিশ্রাম করিতে বসিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে বসিয়া বছর পনের ষোল'র একটি গোবান্দী কিশোরী থামা হইতে মুড়ী লইয়া কিষাণদের গামছায় আঁজলা করিয়া টালিয়া দিতেছে। আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধটি বলিল, নমস্কার মাষ্টার বাবু, বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?” পঁচিশ টাকা বেতনের স্টেশন মাষ্টার আমি, “অনেকেই আমাকে চেনে, স্টেশন মাষ্টার বলিয়া একটু সম্মমও করে। বৃদ্ধটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এবার ধান কেমন হলো মোড়োল?”

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

“অমনি হলো একরকম বাবু, আপনাদের আশীর্বাদে”, বিনীতভাবে মোড়োল উত্তর দিল।

মেয়েটি এতক্ষণ একপাশে বসিয়াছিল, আমাকে মোড়লের সহিত গল্প করিতে দেখিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল “এবার আমি যাই বাবা।”

তামাক টানিতে টানিতে মোড়ল বলিল, “আচ্ছা যা এস।” মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম “ওটা বুঝি তোমার মেয়ে?” “হ্যাঁ বাবু—ঐ একটি মাস্তুর মেয়ে” এই বলিয়া বৃদ্ধ অতি সম্ভরণে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। কিষাণদের মধ্যে যে লোকটা সর্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করিয়া সে বলিল, “তুমি ও বাড়ী গেলে না কেন বাবা?”

ঐ লোকটির সংবাদে বুঝিতে পারিলাম যে সে তাহারই ছেলে। জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমার ক’টা ছেলে মোড়োল?” বিশ্রামরত চারটা লোককে আনুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া মোড়োল বলিল “ঐ যে বাবু চারটা।” লোকগুলি তাহার মাহিনা করা চাকর নয়, মাহুষ করা ছেলে। চাষাবাদের কথা লইয়া মোড়লের সহিত কিয়ৎক্ষণ গল্প করিয়া সেদিনকার মত উঠিয়া আসিলাম।

পরদিন সকাল বেলায় স্টেশনের কাজকর্ম সারিয়া কুকারে রান্না চাপাইবার জন্ত বসিয়া ছুরী দিয়া তরকারী কুটিতেছি, এমন সময় একটা খটা হাতে করিয়া মোড়লের মেয়েটি আসিয়া বলিল “একটু জল নেব মাষ্টার বাবু?” তাহার কণ্ঠস্বরে লজ্জা বা কুণ্ঠার লেশমাত্র নাই। স্টেশনের টিউবওয়েল হইতে মেয়েটিকে জল লইবার অহুমতি দিয়া তরকারীগুলি ধুইবার জন্ত তাহার পিছনে পিছনে আমিও টিউবওয়েলের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার হাতের চুবড়ীটার দিকে আঁচোখে একবার তাকাইয়া ঝড় নাড়িয়া মেয়েটি বলিল “ও, আপনি বুঝি কুটনো ধোবেন? দাঁড়ান আমি ধুয়ে দিচ্ছি।” এই বলিয়া সে আমার হাত হইতে চুবড়ীটা টানিয়া লইয়া আমাকে টিউবওয়েলটা পাম্প করিতে ইঙ্গিত করিল। কুটনোগুলি ধোয়া হইলে চুবড়ীটা এক

পাশে রাখিয়া মেয়েটা বলিল “এবার আমি জল নিই একটু। বলিলাম “নাও”। ঘটাটা পূর্ব হইলে ঢক ঢক করিয়া ঘটীর জলটুকু পান করিয়া মেয়েটা বলিল “আঃ জলটা ত বেশ ঠাণ্ডা।” মেয়েটার ছেলে মাল্লুবা দেথিয়া আমার হাসি পাইতেছিল—বলিলাম “পাতাল থেকে আসচে কি না?”

অনর্থক একটুখানি হাসিয়া মেয়েটা আর এক ঘটা জল লইয়া মাঠের পথে নামিয়া গেল।

সেই হইতে প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম মেয়েটা টেনেনের টিউবওয়েল হইতে জল লইয়া যাইতেছে। কোনদিন বা আমার সহিত ছ’ একটা কথাবার্তা কহিত, কোনদিন আমাদের কৰ্মব্যস্ত দেখিয়া নিঃশব্দে জল লইয়া সে চলিয়া যাইত।

দিন পনের পরের কথা।

মাঠের ধান কাটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কাটা ধানগুলি মাঠেতেই গাদা দিয়া ধান ঝাড়া শুরু হইয়াছে। অবসর মত এক একদিন মাঠে গিয়া পাছতলায় বসিয়া মোড়লের সঙ্গে কিস্তি চাষাবাদ সম্বন্ধে গল্প করি। এই কয়দিনের আলাপে তাহার সঙ্গে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। এই সহজ সরল স্বভাবের পল্লীপ্রাণ লোকটাকে আমার লাগে মন্দ নয়। কথায় কথায় একদিন মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম “মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ কবে মোড়ল?”

বিস্মিত চোখে আমার মুখের পাণে তাকাইয়া মোড়ল বলিল “ও আপনি জানেন না বুঝি, অনিলা যে বিধবা।” মোড়লের মেয়েটার নাম অনিলা। জিজ্ঞাসা করিলাম “সে কি মোড়ল, ঐটুকু মেয়ে বিধবা?”

নির্লিপকণ্ঠে মোড়ল বলিল “হ্যাঁ, পাঁচ বছর বয়সে মাকে আমার গৌরীদীন কোরে পুণি কোরেছিলুম, বছর পেরুতে মা পেরুতেই হাতে হাতে সেই পুণির ফল ফল্লে।” বুকের কণ্ঠস্বর যেন এক প্রাণান্তকারী নিঃশ্বাস বেরুয়ে ভাঙিয়া পড়িল উপক্রম করিল। এমন সময় দূরে অনিলাকে মুড়ীর ধামা হাতে করিয়া মাঠের দিকে আসিতে দেখিয়া ঐ প্রসঙ্গ চাপারদিবার জন্ত মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম “ছেলেদের স্কুলে কিয়ৎকাল পড়েছে?” তামাক টানিতে টানিতে অগমনস্বভাবে মোড়ল শুধু বলিল “হ্যাঁ।”

বৈকাল বেলা টেনেন ঘরের সম্মুখে বসিয়া একখানো মাসিক পত্রিকার পাতা উন্টাইতেছিলাম। দূরে অশ্রু বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে অপরাহ্নের স্নান সূর্য্য তখন অশ্রু দিগন্তে। পাক্কা ধামক্ষেতের বুকে অপরাহ্নের মিলাইয়া যাওয়া শেষ রোদ যেন আলো ও ছায়ার জাল বুড়িয়া যাইতেছে। চতুর্দিকে বেশ একটা নয়নাভিরাম রোমাঞ্চের দৃশ্য।

সহসা গেট খোলার শব্দে পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি, দুহাতে গেট তেলিয়া অনিলা টেনেনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ইতিপূর্বে এ সময়ে তাহাকে এখানে আসিতে দেখি নাই কখনও। নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম “আজ যে এ সময়ে অনিলা, গাড়ী দেখতে এলে বুঝি?” স্মিতহাস্তে অনিলা বলিল “গাড়ী ত আমাদের বাড়ীর উঠোন থেকেই দেখা যায়।”

• “তবে কি জল নিতে, ঘটা কৈ?”

“এই ভরসঙ্কে বেলায় বুঝি কেউ জল খায়?” এই বলিয়া অনিলা তাহার আঁচলের গেরোটা খুলিয়া বড় বড় ছুটে বেগুন বাহির করিয়া বলিল “আমাদের গাছে হয়েছে, বাবা পাঠিয়ে দিলে।” বেগুন ছুটোর দিকে একবার আঁড়চোখে চাহিয়া বলিলাম “তাত দিলে কিন্তু অত শত কেটে কুটে রান্না করে কে?”

বিস্মিতের মত অনিলা বলিল “ওমা বেগুন ছুটেতে পারেন না বুঝি? আচ্ছা আমি কুটে দিচ্ছি” এই বদিয়া অনিলা আমার অমুখতির অপেক্ষা না করিয়াই ঘরের দিকে যাইবার জন্ত পা বাড়াইল। হাতের বইখানা চেয়ারের উপর উন্টাইয়া রাখিয়া আমিও নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলাম। ঘরটার চতুর্দিকে সচকিতে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অনিলা বলিল “কৈ দিন ত আপনার বটীখান কোথায় আছে।” তাহাকে বলিলাম “থাক অনিলা, তোমার আর অত কষ্ট করতে হবে না।” “না না কষ্ট আর কি দিন না সত্যি।” তাহার কণ্ঠে ক্ষুদ্র বালিকার মত কেমন একটা বায়না করণ মিনতি।

তরকারির বুড়িটা থেকে ছুরীখানা বাহির করিয়া দিয়া বলিলাম “এই আমার কুটনো কোটা বটী।”

“বাঃ বেশ বটীখানি ত, যান আপনি বাইরে বসে পড়ুন

গিয়ে, আমি কুটনো কুটছি।” এই বলিয়া সে কুটনো কুটিতে বসিয়া গেল, আমিও বাহিরে আসিয়া পুনরায় পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিলাম।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অনিলা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল “শুধু ঝোলের কুটনোটা কুটে দিলুম, আমি এবার যাই অনেকগুলি এসেছি।”

মুখ তুলিয়া বলিলাম “ভাতটাও কেন রেখে দিয়ে গেলে না?” “বামুনার বুঝি কখনও শুদ্ধরদের হাতে ভাত খায়? এই বলিয়া সে এক জুকুমার ভদ্রিতে ঝাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে মাঠের বৃকে নামিয়া গেল। মাঠে তখনও সপাসপ শব্দে ধান ঝাড়া চলিতেছে।

তাহার পর চার পাঁচদিন আর অনিলার সহিত দেখা হইল না। সম্ভবতঃ সে এই কয়দিন মাঠে আসে নাই, আসিলে নিশ্চয়ই একবার ষ্টেননের দিকে আসিত।

বসিয়া বসিয়া হেঁটমুখে টিকিট বিক্রয়ের হিসাব পত্র মিলাইতেছিলাম, এমন সময় দরজার নিকট খুট করিয়া একটা শব্দ হইতে মুখ তুলিয়া দেখি দুয়ারের আংটা ধরিয়া অনিলা আমার দিকে চাহিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম “এই যে—এ কয়দিন আর মাঠে আসনি বুঝি?”

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনিলা উত্তর দিল “না, বাবার অসুখ কোরেছে কি না।”

“কার অসুখ, মোড়লের? কি হয়েছে?”

“জর, বৃক সর্দি, আজ একটু ভাল আছে।”

অনিলা বেশিঞ্চ দাঁড়াইল না, যাইবার সময় বলিয়া গেল কাল থেকে মাঠে আর কেহ আসিবে না, ধান ঝাড়া সব শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব সেও আর মাঠে আসিবে না। এ বছরের মত মাঠের সহিত তাহারও প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।

দিন কয়েক পরের কথা।

সেদিন দুপুর বেলায় বেড়াইতে বেড়াইতে একবার গ্রামের দিকে গেলাম। মোড়লের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তাহার ছোট ছেলের সহিত দেখা হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমার বাবা কেমন আছে?”

বিনীতভাবে মোড়লের ছেলের জবাব দিল “সেই একই রকম বাবু, বৃকের যন্ত্রণাটা আরও বেড়েছে।”

তাহাকে বলিলাম “চল তোমার বাবাকে দেখে আসি।”

“আস্থন না” বলিয়া সে অতি আগ্রহের সহিত আমায় বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

তক্তোপোষের উপর কাঁথা পাতিয়া বিছানা করিয়া মোড়ল মৃদিত চক্ষে চূপটা করিয়া শুইয়া আছে। পাশে বসিয়া অনিলা পিতার বৃকে ধীরে ধীরে মালিস করিতেছে। মুখখানি তাহার ঈষৎ শুষ্ক। আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে সে সচকিত হইয়া একটু নড়িয়া বসিল। মোড়লকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “কেমন আছ মোড়ল?” চক্ষু উন্মীলন করিয়া মোড়ল আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া উদগ্রীব কণ্ঠে বলিল “কে মাষ্টার বাবু?”

“হ্যাঁ, কেমন আছ তুমি?”

“আর থাকা থাকি বাবু, এবার গেলেই হয়” তাহার কণ্ঠস্বরে এক অনন্ত বেদনার স্বর। মোড়লকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলাম যে তাহার কোন ভয় নাই, শীঘ্রই সে সারিয়া উঠিবে। আমার কথায় তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি নিরস নিষ্ঠুর শুষ্ক হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল “না বাবু এ বয়সে আর মরবার ভয় নেই, ভাবনা শুধু ঐ গোড়াকপালী মেয়েটার জন্তে; আমি মরে গেলে ওর যে কি হবে?” মোড়লের স্তিমিত চক্ষু দুইটা অন্তরের এক অপরিহার্য বেদনায় ঘেন চক্ চক্ করিয়া উঠিল। পাশে বসিয়া পিতার রক্ত কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে অনিলা বলিল “এবার তোমার দুধটা নিয়ে আসি বাবা, সেই ত কোন সকালে খেয়েছ।” “যা মা যা” এই বলিয়া মোড়ল সন্তোষে দু আঙুলে অনিলার গালটা টিপিয়া ধরিল।

অনিলা চলিয়া গেলে মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “শুশুর বাড়ীতে ওর কে আছে?”

ব্যথিতকণ্ঠে মোড়ল বলিল “নেই কেউই, যাযগা জমি সব বিলি করা আছে, আমার ছেলেরা মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা শোনা কোরে আসে।”

মোড়লের মুখে শুনিয়াছিলাম, পার্শ্ববর্তী একটা গ্রামে

অনিলার খণ্ড বাড়ী, সেখানে কিছু ধান জমি, বিধা পাঁচেকের একখানি বাগান ও পুকুর সমেত ছোট একখানি বসতবাড়ী আছে। মোড়ালের বড় ছেলের খণ্ড বাড়ীও ঐ গ্রামে, অনিলাদের বাড়ীর কাছেই।

ছুধের বাটীটা হাতে করিয়া অনিলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছুধটুকু পান করিয়া অনিলাকে উদ্দেশ্য করিয়া মোড়ল বলিল “তুমি ও ঘরে একটু শোও গিয়ে মা, আমি ততক্ষণ মাষ্টার বাবুর সঙ্গে দুটো গল্প করি।” সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া অনিলা শূন্য ছুধের বাটীটা হাতে করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

অনিলা চলিয়া গেলে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মোড়ল আকস্মিক এক অভাবনীয় প্রশ্ন করিয়া বলিল “আচ্ছা বাবু আগ কাল ত আখ্‌ছার বিধবা বিয়ে হচ্ছে, কোন রকম কোরে অনিলার বিয়ে দেওয়া যায় না?”

আজকালকার দিনে যদিও ঐরূপ পরিকল্পনা একেবারে অবাস্তব নয় এবং চেষ্টা করিলে হয়ত সন্মতিক্রমসাধ্য, তবুও মোড়ালের মত একজন পল্লীগ্রামবাসী গতানুগতিক পন্থী পুরাতন লোকের মুখে স্বকল্পার বিধবা-বিবাহ দিবার কথা শুনিয়া আমাদের একটু বিস্মিত হইতে হইল। খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া কতকটা আপন মনে মোড়ল বলিতে লাগিল “আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি মেয়ে জামাইয়ের নামে লেখাপড়া কোরে দেব, তা ছাড়া অনিলার মা’র গয়নাগুলো সব ওই পাবে।”

মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম “বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে তুমি এ গাঁয়ে একদিনও টিকতে পারবে মোড়ল?”

“মান হাসিয়া মোড়ল বলিল, “আমার আর ক’টা দিনই বা বাবু?”

“কিন্তু তোমার মেয়ে জামাইতো রইল, ছ’দিন পরে যখন তাদের ছেলে পুতে হবে তাদের বিয়ে থা দেওয়া আছে—”

“ততদিনে হয় ত গাঁয়ের লোকেরা বুঝতে পারবে যে ছ’ বছর বয়সের বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমি বিছু অজ্ঞায় কাজ করিনি।” শান্ত অথচ দৃঢ়বস্ত্রে মোড়ল জবাব দিল।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া মোড়ালের কথাটা ভাবিতে লাগিলাম।

মোড়ল বলিল “বাবু, অনিলার এ দশা হবার পর থেকে ভগবানকে কত ডেকেছি—হে ঠাকুর তুমি আমার নাও কিন্তু এখন ভাবছি অনিলাকে এ অবস্থায় রেখে গেলে স্বগ্গে গিয়েও আমার চোখের জল ফেলতে হবে।” বুদ্ধের কোটরপ্রবিষ্ট দুইটি চক্ষের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু পড়না বাধিয়া উঠিয়া ছিঁড়িয়া পড়া মুক্তার মত শীর্ণ দুইটি গাল বহিয়া বিছানার উপর টস্ টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

এই ধরনের দুঃখ বেদনায় সীতানা দিবার ভাষা সব সময়ে মনের মধ্যে জোগাইয়া ওঠে না। চুপটি বহিয়া বসিয়া মোড়ালের কপালের উপর ধীরে ধীরে হাত রাখা ইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ বেলা গড়াইয়া আসিতে লাগিল। অন্ধুর ঘড়িতে তং চং করিয়া তিনটা বাজিল। সময় হতে আর একদিন আসিব বলিয়া মোড়ালের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। ঘরের বাহিরে আসিয়া উঠানে পা দিবামাত্র কোথা হইতে অনিলা বলিল “আবার আসবেন।” এদিক ওদিক চাহিয়া দেখি উঠানের একপাশে বাঁশুর একটা মাচার উপর যেখানে ঘন বিস্তৃত কয়েকটি লাউয়ের গাছ পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া পাতায় পাতায় জায়গাটির উপর বাঁকাচেরা একটুখানি ছায়াপাত করিয়াছে তাহারই পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অনিলা আমার দিকে চাহিয়া আছে। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম যে আবার আসিব।

তাহার পর দিন পনের কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আর একদিন অনিলাদের বাড়ী গিয়াছিলাম, অনিলা বাড়ী ছিল না। মোড়ালের অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে নামিয়া আসিতেছে। বৃকে অসহ বেদনা, কথা কহিতে কষ্ট হয়।

সেদিন রাত্রে অকাতরে ঘুমাইতেছিলাম, হঠাৎ হরিবোল দেওয়ার শব্দে আচমকা ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। চারিদিকে অতল নিয়তির মধ্যে আকস্মিক এই ভয়ঙ্কর হরিশ্রবণ শুনিয়া একটা অননুভূত আশঙ্কায় আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বালিসের তলা হইতে দেশলাই বাহির করিয়া আলো জালিলাম। আবার সেই “বল হরি হরিবোল।” ছেঁৎ করিয়া মোড়ালের ক’

মনে পড়িয়া গেল; লোকটা কেমন আছে কে জানে? পরদিন সকাল বেলায় ষ্টেশনের পোর্টারটাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম গতকল্য রাত্রি বারটার সময় মোড়োল স্বর্গগমন করিয়াছে। অনিলার কথা মনে পড়িল। মাতৃ-পিতৃহারা আশৈশব স্বামী-সোহাগ-বঞ্চিতা অভাগিনী অনিলা! কিন্তু তবুও সে ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের একটা মাত্র ভগ্নি।

মহাসমারোহে মোড়োলের আত্ম শান্তি হৃদম্পর্শ হইয়া গেল। আত্মবাসের 'বিরিট পাঠ' হইতে আরম্ভ করিয়া স্বকল্পী কীর্তনীয়ার বিহীন সঙ্গীত পর্যন্ত কিছুই আর বাদ পড়িল না। সর্বশেষে একদিন কাঙালী ভোজনও করান হইল। গ্রামের সকলে একবাক্যে মোড়োলের পুত্র চতুষ্টয়ের প্রশংসা করিয়া বলিল "ইহা ছেলের মত ছেলে বটে।"

প্রায় মাসখানেক পরে একদিন সকাল বেলায় দ্বাতন করিতে করিতে ষ্টেশনের প্রাচীরে পায়চারী করিতেছি এমন সময় দেখি একটা শিশি হাতে করিয়া অনিলা রেলওয়ে ক্রসিং পার হইয়া ওপারে যাইতেছে। সঙ্গে একটা প্রোচা বয়সী বিধবা স্ত্রীলোক। আমাকে দেখিয়া অনিলা বলিল "খুব সকাল বেলায় উঠেছেন যে দেখছি।" তাহার কণ্ঠস্বর চরিত্রগত বেশ একটা শাস্ত্র সংযত ভাব। সর্বদা বেশ একটা প্রশান্ত অথচ প্রদীপ্ত যৌবনশ্রী।

জিজ্ঞাসা করিলাম "এত সকালে কোথায় যাচ্ছ অনিলা?"

"চণ্ডীতলার কলজে। আজ ক'দিন থেকে বড্ড জরে ভুগছি কি না?"

"চণ্ডীতলা? সেত অনেকটা।"

হাসিয়া অনিলা বলিল "আমরা চাষ-ভূষি লোক মাষ্টার বাবু, আমাদের পথ চলা অভ্যাস আছে।"

"মোড়োলের মত অবস্থাপন্ন লোকের মেয়েকে যে একদিন রোগজীর্ণ দুর্বল দেহ লইয়া এককোশ দূরে দাতব্য হাসপাতালে দীনহীন কাঙালের মত ঔষধ আনিতে যাইতে হইবে ইহা কখনও কল্পনা করি নাই। তাহার ছেলেদের ঘরে এখনও গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, সংসারের বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে

দেখিয়া অনিলা বলিল "খাচ্ছা এখন যাই, আসবার সময় আবার হয়ত দেখা হবে।" এই বলিয়া অনিলা আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

কথায় কথায় সেদিন ষ্টেশনের পোর্টারটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মোড়োলদের বাড়ীর খবর কি রে?"

পোর্টারটা স্থানীয় লোক। আমার কথার উত্তরে সে বলিল "আর বলবেন না বাবু ওদের কথা, চার ভায়ে আলাদা হয়েছে, বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাঁটয়ারা নিয়ে ওদের ভায়ে ভায়ে লাঠালটি চলছে, সংসারটা একেবারে ছারখার হয়ে গেল।" ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, সংসারে নিত্য যাহা ঘটে হয়ত বা ইহা তাহারই একটা পরিচ্ছেদ। একটু থাকিয়া পোর্টারটা বলিতে লাগিল "মুন্সিফ হয়েছে মোড়োলের মেয়েটার; ভাগের বোন, কেউ একা তার ভার নিতে চায় না, সবাই বলে—আমি ছাপোষা লোক, কোথায় পাব।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "ক'র সংসারে সে আছে?"

"দিন কয়েক এর ঘরে দিন কয়েক ওর ঘরে এই কোরে সে কাটাচ্ছে। অর-ভুগে ভুগে মেয়েটার অস্থি চর্খসার হয়েছে, এক ফোটাও ওষুধ পড়ে না পেটে, তার ওপর ঐ রোগা শরীরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।"

"সে কিরে, অনিলা যে ওদের মায়ের পেটের বোন।"

"তা হলে কি হয় বাবু, বৌএরা হচ্ছে বাড়ীর কর্তা, নন্দ ত আর তাদের মায়ের পেটের বোন নয়।"

একটুখানি ভানিয়া বলিলাম "এখন ওর পক্ষে সব চেয়ে ভাল খণ্ডর বাড়ীতে গিয়ে থাকা,—হাজার হোক স্বামীর ভিটে।"

ঈষৎ বিস্মিত সুরে পোর্টার বলিল "তা জানেন না বুঝি, বাপের কাজের সময় মোড়োলের বড় ছেলে যে সেখানকার সব বেনামীতে কিনে নিয়েছে।"

অবাক-বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম "কিরকম?"

"তখন বড় ছেলে ছিল বাড়ীর কর্তা, বাপের কাজের সময় সে বলে, হাতে টাকা নেই, সম্পত্তি কেনবারও খন্দের জুটছে না। ঠিক এই সময়ে তার এক সঙ্কল্প এসে বলে, অনিলা, যদি তার বিষয়টা বিক্রী করে—তাহলে সে কিনতে রাজী আছে—তার বাড়ীর কাছেই কি না।"

অনিলাও আর দ্বিক্রান্তি না ক'রে বড় ভায়ের সম্বন্ধকে সব বিক্রী কবলা কোরে দিলে।”

মোড়ালের বুধোৎসর্গ শ্রদ্ধের অভূতপূর্ব দৃশ্যগুলি একটীর পর একটা করিয়া আমার ঘোষের সম্মুখে বায়ো-স্কোপের ছবির মত জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বড়লোকী দান-সামগ্রী, আত্মীয়-কুটুম্বের সবগরজে শ্রদ্ধ বাড়ীর সেই উৎসব-সমারোহ, কীর্ত্তন গান। বিধবা মেয়ের বিষয় বিক্রীর টাকায় স্বর্গে গিয়া মোড়োল হয় ত মাতীর পৃথিবীর দিকে একবার পিছন ফিরিয়া একটা গভীর হৃৎকের নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল।

ইহার পর মাস পাঁচ ছয় কাটিয়া গিয়াছে। মোড়ালের ছেলেদের বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা হইয়া গিয়াছে। ঠিক হইয়াছে অনিলা প্রত্যেক ভায়ের সংসারে বছরে তিন মাস করিয়া থাকিবে।

ন'টা বাহায়র লোকালখানার আগমন প্রতীক্ষায় সে দিন সকাল বেলায় অভ্যাসমত টেশনের প্লাট ফর্মে পায়চারী করিতেছিলাম এমন সময় গ্রামের দিক হইতে একখানা দুই চাকা গরুর গাড়ী আসিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়োয়ানের পিছনে মোড়ালের ছোট ছেলেটিকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “কি হে, কোথায় যাবে?”

গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া :ছেলেটা বলিল “হাস-পাতালে যাচ্ছি, অনিলাকে নিয়ে—

“হাসপাতালে? অনিলাকে নিয়ে? অনিলার কি হয়েছে?”

শান্তভাবে ছেলেটা বলিল যে জরে ভুগিয়া ভুগিয়া শেষটা

অনিলার কালাজরে দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তার তাহাকে হাসপাতালে দিতে উপদেশ দিয়াছে, ভারি ছোঁয়াচে রোগ কিনা তাই। তাহার কথায় প্রথমটা একটু বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলাম কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবটা কাটিয়া গেল। মাল্লবের কাছে মাল্লবের প্রয়োজন হয় সার্থের প্রয়োজনে, সেই প্রয়োজন যখন ফুরাইয়া আসে তখন আর পিছনের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইবার প্রয়োজন হয় না। সংসারের নিয়মই এই। হুন্ হুন্ শব্দে হুইসিল দিতে দিতে ট্রেনখানা আসিয়া হাজির হইল। গরুর গাড়ীটার দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া ট্রেন এটেও করিবার জন্ত গার্ডের গাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। ট্রেনখানা চলিয়া গেলে পিছন ফিরিয়া দেখি ফটক খোলা পাইয়া গরুর গাড়ীটা তখন লাইনের ওপারে মাঠের পথে নামিয়া পড়িয়াছে। মনে করিলাম ছুটিয়া গিয়া অনিলাকে একবার দেখিয়া আসি কিন্তু তাহার এই যাত্রাপথের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাকে পিছু ডাকিয়া লাভ কি?

এই ঋনেই এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি, পরিশিষ্ট একটু খানি আছে। অনিলার হাসপাতালে যাওয়ার মাসখানেক পরে একদিন দুপুর বেলায় গ্রামের পথ দিয়া যাইতে যাইতে মোড়ালের বাড়ীর ভিতরে কাহার ক্রন্দন শুনিতে পাইলাম, “ঠাকুর-জি তুমি ফাঁকি দিয়ে কোথায় গেলে গো!”

মৃত্যুর পরধারে মাল্লবের অন্তবেদনা পৌঁছায় কিনা সন্দেহ: অনিলার ভ্রাতৃবন্ধুদের তাহা জানা নাই।



পুস্তক-পরিচয়

শ্রীস্বরেজনাথ সেন প্রণীত

আর্য্যপ্রভা—

(হিন্দু সংস্কৃতির কথা) ও শ্রীগোরাঙ্গ প্রেস হইতে প্রকাশিত, মূল্য—৪।০ আনা ।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ৩৪ অধ্যায়ে সমাপ্ত । বাঙ্গালা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ একটিও দেখা যায় না । ইহার প্রথম অধ্যায় বেদ । যে নিহিত বীৰ্য্য সৰ্বভূতে বর্তমান তাহাই বেদ—বেদ নিত্য সত্য । ঐতিহ্য অংশ বেদ নহে । যাহা নিত্য সত্য তাহা অপৌকষেয় । যাহা ঐ নিত্য সত্যকে কর্মজীবনে পরিণত করিবার উপায় প্রদর্শন করে, তাহাই ঐতিহ্য ; এইজন্ত ঐতিহ্যের মর্যাদা বেদবৎ বলবান । স্মরণাতীত যুগ হইতে বৈদিক ভাবের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল গ্রন্থকার তাহা বহু প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন । ঐতিহাসিক আলোচনায় পাশ্চাত্য মতের যে সব ক্রটি লক্ষিত হয়, গ্রন্থকারের সুনিপুণ লেখনীতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে । হিন্দু জীবনের উদ্দেশ্য চিত্তভঙ্গি, উপায় ব্রহ্মচর্য্য । এই অধ্যায় দৃষ্টি অস্ত্র কুজাপি নাই । সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় বেদ ও তন্ত্রের কথা গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে । বিজ্ঞানের কথায় গ্রন্থকার ইহা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন । তিনি বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন । ভারতীয় পুরাণ ও পুরাণের রহস্য কি তাহাও আলোচ্য গ্রন্থে দেখান হইয়াছে । গ্রন্থকার সর্বত্রই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বহু যুক্তি দিয়া ছন । বৈদিক সাধনা কাণ্ডে তিনি গায়ত্রী সাধনার উদ্দেশ্য বলিয়াছেন ও গায়ত্রী মন্ত্রের নূতন অর্থ দিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তিনি অনেক আলোকপাত করিয়াছেন । যজ্ঞ সম্বন্ধে গ্রন্থে অনেক নূতন কথা আছে । বেদ ও তন্ত্রে যে তত্ত্বগত পার্থক্য নাই তাহা গ্রন্থপাঠে বুঝিতে পারা যায় । সঙ্গীত বিজ্ঞান আলোচনায় গ্রন্থকার সাধকের দৃষ্টিকোণ হইতে সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন ।

তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সব সাধারণ ভ্রম ধারণা আছে, গ্রন্থকার সে সমস্ত দেখাইয়া সাধারণের উপকার করিয়াছেন । গ্রন্থে হিন্দুর বহু দর্শন শাস্ত্রের বিষয় যেমন আলোচনা করিয়াছেন, তন্ত্রের দর্শনতত্ত্বগুলিও সেইরূপ পরিষ্কাররূপে বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । অল্প কথায় অতি দুর্ব্বহ বিষয়গুলি বোধগম্য করাইবার ক্ষমতা গ্রন্থকারের আছে । শব্দ ও ধ্বনি তত্ত্ব কি তাহার আলোচনা গ্রন্থমধ্যে আছে । মূলধ্বনি সর্বত্রই এক । মূলধ্বনির মর্যাদা হিন্দু রাখিয়াছেন । অস্ত্র মূলধ্বনিকে বিকৃত করায় স্বর ও বাজনের উচ্চারণের মৌলিকত্ব নষ্ট করা হইয়াছে । ইহা অবৈজ্ঞানিক । মন্ত্র ও মন্ত্রবিদ্যার আলোচনা গ্রন্থকার বিশেষরূপে করিয়াছেন । তন্ত্রসাধনার কথায় গ্রন্থকার অনেক গুঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন । গ্রন্থে তন্ত্রের কাল নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে এবং তন্ত্রের প্রভাব হিন্দুর সমাজজীবনে কতদূর কার্যকরী হইয়াছে তাহা সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে । ‘পথ নির্ণয়’ নামক প্রবন্ধগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও ঐ জীবনীতে আমরা কি শিক্ষা পাই তাহা বর্ণিত হইয়াছে । বৈষ্ণব সাধনা ও তাহার লক্ষ্য আমরা ভুলিয়া যাই, আর সেইজন্তই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও জগদ্ধিতায় তাঁহার সম্যাস গ্রহণ, গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন । বৈষ্ণব সাধনার নামে ও তন্ত্র সাধনার নামে ব্যভিচার কিরূপে প্রকাশ পায়, তাহা গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সকলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন ।

গুরুতত্ত্ব কি তাহা গ্রন্থকার গ্রন্থের একাধিক স্থানে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । ‘বাধা প্রদানের শক্তিই গুরুশক্তি,’ গুরুহৃদয়েই কাম,—এই প্রকার উক্তিগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই ।

‘ধর্ম ও অধর্ম’ এই অধ্যায় হইতে সমাজ-বিজ্ঞান প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে।

‘জাতি ও সমাজ,’ ‘জাতি, সমাজ ও সভ্যতা,’ ‘জাতীয় অধঃপতনের কারণ,’ ‘প্রক্ষেপকারীদের আত্মকথা,’ ‘সভ্যতা-কথা,’ ‘পারিবারিক জীবন’ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে হিন্দু-সমাজ-তত্ত্বের মূল প্রদর্শিত হইয়াছে।

তুলনামূলক আলোচনায় পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য দেখান হইয়াছে। কি কারণে পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে বুঝিতে ভুল করে তাহা গ্রন্থকার নির্ণয় করিয়াছেন। অভ্যুদয়ের আদর্শে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়। এই সঙ্গে ‘বিবাহ’ প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘আর্য্যপ্রভার’ উপসংহারটি প্রভার মতই হিন্দুর সকল দিকে আলোকপাত করিয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের নিকট অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং জীবনে বহু সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার বহুলক অভিজ্ঞতা তিনি এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থকার কলিকাতা পার্শ্ববাগান ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি’তে ধারাবাহিকরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা ‘বিবেকানন্দ সোসাইটির’ অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

অধুনা প্রায় উঠিয়াছে যে রাজনৈতিকক্ষেত্রে ধর্মের স্থান আছে কিনা। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে হিন্দু তাঁহার

ধর্মকে একটি স্বতন্ত্র কোঠায় ফেলিতে পারেন না। গ্রন্থকার আলোচ্যগ্রন্থে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন যে কর্মক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে গীতোকৃত উপদেশই ধর্ম, ‘স্বস্থ্য মূলং ধর্ম’। হিন্দু সর্বক্ষেত্রে দেখিতে চান চরিত্রবল, পবিত্রতা, বীর্য ও চিত্তশুদ্ধি। গ্রন্থের ভাষা অতি সংক্ষিপ্ত ও সরল।

আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই পুস্তকখানি পড়িতে অজরোধ করি এবং এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

•খোঁয়াপারে—শ্রীশান্তি পাল প্রণীত—৬২১১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীস্বলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

শ্রীশান্তি পাল সাতার শিক্ষক হিসাবে সুপরিচিত এবং কবিপ্রসিদ্ধিও লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই ক্ষুদ্র কবিতার বইখানি তাঁহার পূর্ব যশ অক্ষর রাখিবে। ছন্দর গতিশীলতা ও নিখুঁত বর্ণনাগুলি স্তম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহার প্রচার কামনা করি।

—ফাল্গুনী

লক্ষ্মীর বাঁপি

মহামাত্রা মিষ্টার চেম্বারলেন্ ইউরোপে পাকাপাকি রকমের শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হ’য়ে রাজা-প্রজার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হ’য়েছেন ব’লেই জগতের লোক জেনেছিল। এমন জানায় যুদ্ধ-ভীতি হ্রাসই পেয়েছিল—বুকের পাষণে নেমে গিচ্ছিল। কিন্তু জার্মানীর নিত্য-নূতন চাল এবং হুত উপনিবেশগুলি ফিরে চাওয়ার দাবী ও জুলুম দেখে বুঝতেই হচ্ছে অচিরে অশান্তির তুমুল বাড়-উঠবে এবং জগদ্ব্যপী মহাসমর অনিবার্য্য। দক্ষিণ আফ্রিকার

উপনিবেশও জার্মান-দাবীর অন্তর্গত। যে দাবী নিয়ে তর্ক দ্বন্দ্ব চললে ভারত গবর্ণমেন্ট কিছুতেই চুপ্ ক’রে থাকতে পারবেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিক লক্ষ লক্ষ রয়েছে। এখন তা’রা ইংরাজ সরকারেরই প্রজা। হুতরাং-জার্মানীর দাবী-আব্দার মেনে নিতে পারবেন না সে সরকার। সেরূপ ক্ষেত্রে সংঘর্ষ হ’বারই সম্ভাবনা জাপান তখন কি করবে, কে জানে! হিটলার-মসোলিনীর দর্প আকাশচুম্বি হ’য়ে জগতের ভীতি উৎপাদন করছে।

এমন অভিবৃদ্ধি নেপোলিয়নেরও একদিন হ'য়েছিল। কাইজারও হয়েছিলেন একদিন দোদীপ্ত প্রতাপ। সে প্রতাপ ধূলার সঙ্গে মিশে গিচ্ছিল যে অদৃশ্য শক্তির শাসনে, এবারও তাই হ'বে কিনা ভবিতব্যতাই বলতে পারে।

ছাড়ার মত কাষ করে, তা'দের স্থান দেওয়া উচিত কোন্‌খানে, সেটা স্থির ক'রে দিবার মানুষ নাই কি কেহই?

—০—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নগুচির পত্রের উত্তর দিয়েছেন মুখের মত। জাপানী-কবি নগুচি এখন এক প্রকার জাপান-গভর্ণমেন্টের উকীল। তর্কযুক্তির দিক দিয়ে তিনি যা'বেন কিনা সম্ভব। অহমানে বুঝতে হয়, নগুচির পত্র ব-কলমী। মহাচীন গ্রাস করবার জন্ত কলকাতা নাড়ছে দর্পী দস্তী জাপান। “অতি দর্পে হতা লঙ্কা”, জাপান বুঝেও বুঝবেনা এখন লোভের বশবর্তী হ'য়ে। সুতরাং জাপানী-কবি বিশ্বকবির প্রজ্ঞোত্তর ও ভাবধারা বুঝবেন না, বুঝতে চাইবেন না জাগন্ত-যুগে। হায় রাজা-লিপ্সা, আর হায় কবি-উকীল।

—০—

ইউরোপের অনেক জাতিই যে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট, সেটা বিলক্ষণই দেখা যাচ্ছে। এমন আকর্ষণের কারণ কি, সেই প্রশ্নই অনেকে ক'রে থাকেন। “বঙ্গলক্ষ্মীর” একজন কুমারী-কবি সে প্রশ্নের উত্তরে কবিতার ভাষায় বলছেন—

“হীরা সোণার পাহাড় যেথায়

মানুষ সেথায় হাত পাত্তে,

হাতাহাতি মাতামাতি

ওরই তরে সব জাতে।”

দক্ষিণ আফ্রিকায় সোণা ও হীরা প্রচুর। সুতরাং আকর্ষণ ত স্বাভাবিকই। কিন্তু সঞ্চয়ে মহাজনেরা সেখানে যে সব অত্যাচার উপদ্রব করেন, তা'র গুণকাহিনী ব্যক্ত হ'য়ে পড়েছে পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড হেলের উক্তি। নারী-নিগ্রহের সংবাদ পেয়ে আমরা উৎকণ্ঠিত হ'য়েছি। লক্ষ্মীর কৃপা পেতে যে সকল লোক লক্ষী-

ঘোড়দৌড়, কুকুর-দৌড়, সেয়ার মার্কেটের খেলা প্রভৃতিতে যে কত লোকের সর্বনাশ হয়, সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারী হয় কত জন, তা'র করুণ কাহিনী আমরা শুনেছি অনেকেরই মুখে। বহু মহিলা এ সম্বন্ধে বহু অল্পোপায় ক'রে থাকেন, তা'দের স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা ও অস্বাভাবিক স্বজনের দুর্দশা দেখে। আইনের আড়ালে আশ্রয় পেয়ে এই সব খেলায় হুয়ার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু যে সব খেলায় অধিকাংশ লোকেরই সর্বনাশ হয়, সে সব খেলা আইন ক'রে বন্ধ করা উচিত কিনা, সেটা আমরা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকেই জিজ্ঞাসা করি।

—০—

যে সকল মহিলা ‘পর্দা’ মেনে চলেন, তা'রা যা'তে সেটা আর না-মানেন, সে বিষয়ে অনেকে আগ্রাণ চেষ্টা করছেন। পর্দা-প্রথা আমরা যে খুব বেশী সমর্থন করি, তা নয়; কিন্তু এ প্রথার স্বর্ণক্ষেত্রেও অনেকের অনেক কথা হয়ত বলবার আছে, আর সে সকল কথা হয়ত উপেক্ষনীয়ও না হ'তে পারে। সুতরাং ও নিয়ে বেশী তর্ক বিতর্ক না করাই ভাল। পর্দা-প্রথায় স্ববিধা ও অস্ববিধা দুইই আছে, না-থাকাতোও তা'ই। পর্দার মধ্যে টি বি বাসা বেঁধেছে এখন, একথা বললে, পর্দা-পছন্দীরাও ত বলতে পারেন—“পর্দা প্রথার যখন খুব বেশী প্রচলন ছিল, সে সময়ে ত ও রোগের আদৌ প্রকোপ ছিল না। বালা-বিবাহ সম্বন্ধেও ঐ একই যুক্তি। যখন ও বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন Intellectual giant এর সংখ্যা একালের অপেক্ষা বরং বেশীই হ'ত; আর ধীর, বীর, জ্ঞানী, বিবেকীর সংখ্যাও অল্প ছিল না।” এ সকল কথার যাথার্থ্য নিরূপণ করতে হলে বিশেষ অন্বেষণের আবশ্যক। কারণ, টি বি শুধু পর্দার ভিতরেই বাসা বেঁধে নাই; পর্দার বাহিরেও

তা'র উপদ্রব আছে। বাগক ও যুবক মহলেও টি বি মহাশয় বেশ আসর জমিয়ে বসে আছেন। বুদ্ধ-মহলে বরং তাঁ'র কৃপা কম। ভেজাল-খাদ্য, অনিয়ম, অপরিণামদর্শিতা যে এই ব্যাধির জন্ত কতকটা দায়ী নহে, একথাও খুব জোর ক'রে বলা চলে না। তা'র পর রেস্তোরা, হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার, ট্রাম্, বাস ট্রেন প্রভৃতিও যে ও রোগ দেশময় ছড়ায় না, টেলিফোনে নিষ্কিণ্ট শীকরকণা তুল্য নিষ্টিবনও যে তা'তে সাহায্য করে না, পথ, ঘাট, মাঠ ঘর ও বাহিরের আবর্জনা, মলমূত্র, গয়র প্রভৃতি যে টি বি মহাশয়ের খাদ্য জোগায় না, সে কথায় “না” বলতে পারে কোন্ বিবেচক ব্যক্তি? আসল কথা—স্বাস্থ্য-রক্ষা ও শরীর পালনে আমাদের তেমন যত্ন ও চেষ্টা নাই। একরূপ ক্ষেত্রে কেবল পদ্ধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে লাভ কি?

—৯—

রাস পূর্ণিমায় এ বৎসর “চুড়ামণি যোগ” হ'য়ে গেল বহুকাল পরে। অসংখ্য মহিলা ও পুরুষ-স্নাতকের সমাগম হ'য়েছিল নানা স্থানে—বিশেষ কলিকাতা ও নবদ্বীপে। কালী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানেও অল্প হয় নাই। একটু আধটু ছুঁটনাও যে না ঘটেছে, সে কথা বলা চলে না। স্বচ্ছাসেবকগণের কর্মপটুতা সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রশংসনীয়। রেল-কোম্পানী, ট্রাম-কোম্পানী, ট্যাক্সি-ওয়ালা এবং নানা জব্যের ব্যবসায়ীগণ বেশ ছুই পয়সা উপার্জন করেছে—ক'রে থাকে এমনই পর্ক উপলক্ষে। ভিক্ষুক-সম্প্রদায়ও এই সুযোগে অল্প উপার্জন করে নাই। গাঁটকাটা, পকেটমারদেরও উপার্জনের মনোহর পড়েছিল বোধ হয়। পুলিশ অবশ্য সজাগই ছিল। এই সময়টায় রেল-কোম্পানী ও ট্রাম কোম্পানী যদি পূজা-কনসেনস ও এক্স-মাস্ কনসেনসনের মত “চুড়ামণিযোগ কনসেনস” দিতেন। তবে যাত্রীদেরও কিছু অর্থ বাঁচত, আর কোম্পানীরাও বিনা লোকসানে প্রভূত স্নান উপার্জন করতে পারতেন। স্নান অজ্ঞানের এ সুযোগ ত্যাগ ক'রে ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই তাঁ'রা। ভবিষ্যতে সে বুদ্ধি হ'বে ব'লে আশা করা যায়।

—১০—

“বঙ্গলক্ষ্মীর” একজন গ্রাহক শ্রীযুক্ত শঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্তীর বদান্ধতার কথা শুনে আমরা যারপরনাই স্থবী হয়েছি। তিনি সামান্য চাকরী করেন এবং বেতনও সামান্য। দরিদ্র-নারায়ণ সেবা নিরত শঙ্কর প্রসাদ সেই সামান্য বেতন থেকেই দান করেন বেলুড় মঠে, শ্রামবাজার অরুফ্যানেজে, রামকৃষ্ণ-অনাথ ভাণ্ডারে, পুরীস্থিত বঙ্গ কুমারী বিধবাস্রমে এবং অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠানে। শঙ্কর নামের সার্থকতা হয়েছে তাঁ'র পরের তরে মাথা-ব্যথা। এ ব্যথা অল্পবয়সেই সোভাগ্য সকলের হয় না। তাঁ'র দান অবশ্য সামান্য; কিন্তু প্রাণ মছান। পিতৃমাতৃ-ভ্রাতৃ-ভ্রাতৃবৎসল, বন্ধুবৎসল জনসেবক শঙ্কর প্রসাদ এমন দরদী হয়েছেন একজন দরদী কবির আদর্শে ও নির্দেশে। সাধু, সাধু! শঙ্কর প্রসাদের আদর্শ অমূল্যকরীয়।

—১১—

প্রভুপাদ জীবেন্দ্রমোহন গোস্বামী বিপত্নীক হয়েছেন শুনে আমরা ব্যথিত হ'লাম। শোক-সন্তপ্তের প্রতি আমরা সহায়ভূতি প্রকাশ করি। নারী-শিক্ষা বিস্তারের স্বর্গতার অসামান্য অহুরাগ ছিল। প্রভুপাদ জীবেন্দ্রমোহন অগুত্রক। তাঁ'র বিত্ত যদি শিক্ষা-বিস্তারে ব্যয়িত হয়, অগুত্রক হওয়ার ক্ষোভ আর থাকবে না তাঁ'র, এ কথা বললে বোধ হয় অসঙ্গত হ'বে না। শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা করলে তাঁ'র পত্নীর স্মৃতি-গৌরবও বর্দ্ধিত হ'বে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

—১২—

সেন-ল কোম্পানীর অগ্রতম সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হীরালাল দেব পুত্র ডাক্তার টি, সি দেব মহিলা আয়ারল্যান্ডের মিস আইলিনের বিবাহ কিছুদিন পর্কে হ'য়ে গিচ্ছিল। ডাক্তার দে এখন ওয়েল্‌স্বাসী। সংগতি তিনি সত্বীক স্বদেশ ও স্বজনগণকে দোতে এসেছিলেন। মিসেস দে স্বামীর সঙ্গে এদেশে এসে বৃষ্ণে গেলেন—তাঁ'র স্বামী, বর্তমানে ওয়েল্‌স্বাসী হ'লেও বিশ্বাস করেন—পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম। মিসেস আইলিনের স্বামীভক্তি স্বপ্নের শাণ্ডড়ী এবং স্বামীর অগ্রান্ত গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে আমরা চমৎকৃত হ'য়েছি।

ভারতীয় কৃষ্টি, কলাচার ও আচার ব্যবহারের প্রতি তাঁ'র বিশেষ আস্থা ও অনুরাগ আছে শুনে আমরা তাঁ'র মনস্তত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করি। নবদম্পতীকে আশীর্বাদ করবার জন্ত বিগত ১১ই নভেম্বর তারিখে চা ও জলযোগের আয়োজন হয়েছিল। তাঁ'দের সম্বন্ধনা করবার জন্ত ইংরাজী ভাষায় স্বাগত সন্তাষণ ছাপাও হ'য়েছিল আর পড়াও হ'য়েছিল। ও পর্বটা বাদ দিলেই হত ভাল। বন্ধুবর হীরালাল চায়ের নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থাও যেন

করেছিলেন বলে মনে হয়—কেন না, “ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা আশ্বিন”, তাঁ'কে বলতে শুনা গিছিল। চা-পাটিতে ওটা হাসির কথা বটে। আহাৰ্য্যের মধ্যে চপের সঙ্গে বৈষ্ণবী-মালপোয়াও পাওয়া গিছিল। সে যাইহোক, তাঁ'র জন্ত জলযোগে গোলযোগ হয় নাই। আনন্দ-ধারাই প্রবাহিত হয়েছিল উৎসব-ক্ষেত্রে। নবদম্পতী চিরস্থায়ী হোন— তাঁ'দের আয়ু, যশ, বিত্ত বৃদ্ধি হোক, এই আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ।

বীরশ্রেষ্ঠ কামাল আতাতুর্ক

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ

নব্য তুরস্কের স্রষ্টা ও বিরাট বীরশ্রেষ্ঠ গাজী মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের পরলোক গমনে বিশ্বের রাষ্ট্রীয় জগতে বিশেষ ক্ষতি হইল। মহাযুদ্ধের ফলে যে তুর্কজাতির অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার উদ্যোগ হইয়াছিল, সেই জাতিকে রক্ষা করিয়াছিল আনাতলিয়ায় এক সাধারণ সৈনিক প্রবর। তুরস্কের দারুণ দুর্ভাগ্যের দিনে কামাল অলৌকিক বীরত্ব ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রণবীরদের অন্ততম। প্রথমে আনাতোলিয়ার সহজপ্রকৃতি জনগণের মনে তিনি দেশমুক্তির অপূর্ণ উৎসাহ বহি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। পরে বহু প্রতিকূলতাসত্ত্বেও বহু রণক্ষেত্রে তিনি গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতা ও গৌরব অক্ষুর রাখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দেশ ও জাতিকে সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া স্বসংস্কৃত ও নববলে দীপ্ত করিয়াছিলেন। তুরস্কের অগ্রগমনের পথে প্রত্যেকটি প্রাচীন সংস্কারকে তিনি অপূর্ণ সাহস ও নিষ্ঠিকতার সহিত জাতীয় জীবন হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। বিশ্বের রাষ্ট্রনেতা ও সংস্কারকদের মধ্যে কামাল সর্বাপেক্ষা তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। একদিনের মধ্যেই তিনি বর্ণমালা ও পদপ্রথার বিলোপ সাধন করেন এবং নর-নারীর সমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাই আজ

খ্রিস্ট সহস্র ছাত্রী তাঁ'র শব্দধারের প্রতি সম্মান প্রদান করিতে গিয়াছিল। তিনি ধনি-দরিদ্র, সমস্ত দেশবাসীর প্রতি প্রযোজ্য একরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। নির্জীব ও উৎসাহহীন তুর্কী জাতির মধ্যে নূতন প্রেরণা ও নবজীবন সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। খালিফের ধর্মশাসনের চাপে পীড়িত জাতিকে খালিফার হাত হইতে উদ্ধার ও সর্বতোভাবে উদার ও স্বাধীন করিয়াছিলেন। ‘ফেজের’ মোহ ও গোঁড়ামী ত্যাগ করাইয়া সময় উপযোগী পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়াছিলেন। দেশপ্রিয়তা সকলের অপেক্ষা কি বংশ, কি ধর্ম, এমন কি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় গণ্য করিতে শিখাইয়াছিলেন।

সুতরাং বাহাদুর সাফ্রা আয়েম্কার যাইয়া তুরস্কের নারী-স্বাধীনতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যান। উহাতে যে মর্যাদা ও নম্রতা রহিয়াছে তাহা যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনি জাতিগঠনের সহায়ক। তিনি বলেন “কামাল পৃথিবীর ডিক্টেটরদিগের মধ্যে সর্বজন প্রিয়। তাঁ'র মতবাদ ও আদর্শের কোন গোঁড়ামী ছিল না। অত্বে কোন জাতির অন্ধ অনুসারক তিনি ছিলেন না।”

মুস্তাফা কামাল বিচার বুদ্ধির দিক দিয়া একজন স্বাধীনতাবাদী। তুরস্কের পক্ষে প্রতিকূল কোন কার্য বা চিন্তাধারা তিনি অন্ধের মতন অনুকরণ করিতে তুর্কীদের

দেন নাই। তিনি একজন প্রকৃত তুর্কী ছিলেন। তিনি ফেরেশতা বা শ্বশি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাস্তব সংসারের কাজের লোক। জীবিত অবস্থায় নিজের পরিকল্পনার সাফল্য লাভ দেখা খুব কম লোকের ভাগ্যে ঘটে, কামাল তাঁর বিংশ বৎসর কার্যকাল মধ্যে তাহার পরিকল্পনা সফল করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতে পারিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি স্বভাষ চন্দ্র বসু কর্পোরেশন সভায় বলিয়াছেন “কামাল আতাতুর্ক কেবলমাত্র তুরস্কের শ্রেষ্ঠ সম্ভান বলিয়াই নহেন পরন্তু বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবরূপেও ইতিহাসে চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কৰ্ম্মী, শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই নহে; পরন্তু জাতিগঠন কার্যেও তিনি ইহার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার জীবনী নিজ দেশের লোকদিগকে কেবল অল্পপ্রাণিত করিবে না, সমগ্র মানব জাতি তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা অল্পপ্রাণিত হইবে। তিনি কেবল সেনাপতি অথবা রাজনীতিকরূপে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নব্য তুরস্কের শ্রেষ্ঠ। আমি ইস্তাম্বুলে

যাইয়া তথাকার অধিবাসীদের স্বচ্ছন্দ ভাবে চলাফেরা, নারীদের স্বাধীন ও সরল মুখচ্ছবি, রাস্তাঘাটে চারিদিক রোমান অক্ষর ব্যবহার, নরনারী সকলেরই ইউরোপীয় বেশে এবং তাদের এত সাধের ‘ফেজ টুপী’ চিরতরে অন্তর্হিত এবং অসাম্প্রদায়িক ভাব দেখিয়া হইয়াছিলাম।

এদেশের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগকে একবার তুমি ভ্রমণ করিয়া আসিতে অনুরোধ করি।”

কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুতে জাধুনিক সভ্যতা এতটী মহাশক্তিশ্বর ব্যক্তিকে হারাইল! একটী মাত্র পুরুষের শক্তি ও দৃঢ়সংকল্প দ্বারা কি মহান বিরাট কার্য সাধিত হইতে পারে, বীরশ্রেষ্ঠ কামাল তার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন। একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা, কুটনীতিজ্ঞ ও জাতির স্রষ্টা—তোমায় নমস্কার। তোমায় শ্রদ্ধাজলি দিবার অধিকার ও শক্তি আমাদের নাই। তুমি মানব-শ্রেষ্ঠ তাই তোমায় নমস্কার।

কেন্দ্রসমিতির কথা

মহিলা সমিতির প্রতি নিবেদন।

(১)

সবিনয় নিবেদন,

আগামী পৌষ মাসে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি ১৪শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। আগামী বর্ষে উপযুক্তভাবে ইহার কার্যপরিচালন করিবার জন্য সমগ্র মহিলা-সমিতির সভ্যাগণের মঙ্গলোচ্ছা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, সভ্যাগণ সমিতির ভিতর দিয়া নারীজাতির মঙ্গলকার্যসাধনে সাহায্য করিবেন। কেন্দ্র-সমিতির কার্যের সফলতা মফঃস্বলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহিলা-সমিতির উপর নির্ভর করে। নানা স্থানে ছোট ছোট মহিলা-সমিতিসমূহের সমষ্টিগত কার্য কেন্দ্রীভূত হইয়া জাতিগঠনের সোপান নির্মাণ করিতেছে। আশা করি, ক্রমে

ক্রমে সমস্ত মহিলা-সমিতি সুপরিচালিত, সুগঠিত এবং প্রকৃত উন্নতিমূলক কার্যের প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইবে।

১৩শ বৎসর পূর্ণ হওয়ার বিলম্ব না থাকায় অনতিবিলম্বে কেন্দ্র-সমিতির বার্ষিক কার্যবিবরণী লিখিত হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্ম সমস্ত মহিলা-সমিতির কার্যবিবরণী আগামী ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্র-সমিতির কার্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে হইবে। কি কি বিষয়ে মহিলা সমিতির বিবরণী প্রদান করিতে হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল :—(১) মহিলা-সমিতি স্থাপনের ইতিহাস, (২) উদ্দেশ্য, (৩) বর্তমান সভ্যসংখ্যা, (৪) ইন-সেবার কার্য, (৫) পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান ও

মেলামেশার বিষয়ে চেষ্টা, (৬) মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার, (৭) মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কার্য, (৮) গৃহশিল্প-শিক্ষা:—(ক) গৃহশিল্প-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কিরূপ, (খ) কোন শিক্ষয়িত্রী আছেন কিনা? (গ) কি কি বিষয়ে গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, (ঘ) কতজন মহিলা কি কি প্রকার গৃহশিল্প শিক্ষা করিয়াছেন, (ঙ) গৃহ-শিল্প-শিক্ষা করিয়া কতজন মহিলা মাসিক কি পরিমাণ উপার্জন করিতেছেন, (চ) আপন আপন গৃহের ব্যবহারোপযোগী যে সকল দ্রব্য সমিতির সভ্যারা প্রস্তুত করেন, তাহার মূল্য মাসিক কি পরিমাণ হইতে পারে, (ছ) প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা কিরূপ আছে, (জ) কোন শিল্প-প্রদর্শনীর অস্থান হইয়াছিল কিনা, (ঝ) নিম্নলিখিত শিল্প ও চাকর-কলার কোনগুলি সমিতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন:—সেলাই ও কাট-ছাঁট, রিপুকর্ষ, সূচিশিল্প, চিকণের কাজ, লেস, আসন, কাঁথা, বেত ও বাঁশের কাজ, সূতা কাটা, বস্ত্র বয়ন, মণিপুত্রী তাঁতে তোয়ালে বোনা, পাটের ও শোনের দড়ি প্রস্তুত, নানাপ্রকার মিঠাই ও সন্দেশ প্রস্তুত, মুড়ি ভাজা, বড়ি দেওয়া, লিথিবার কালী তৈয়ারী, সাবান প্রস্তুত, কাপড় ও কাগজের ফুল তোলা, তালের পাখা, পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি হইতে নানাপ্রকার জিনিষ প্রস্তুত, স্থপারী কাটা, পাপোষ, নানাপ্রকার উলের কাজ, রেশমের সূতা তৈয়ারী, কার্পেট প্রস্তুত, চিত্রাঙ্কন, আলিপনা, মাটির, কাপড়ের ও কাঠের গুঁড়া দ্বারা পুতুল ও খেলনা তৈয়ারী, সূতা ও কাপড়ে রং করা প্রভৃতি; (ঞ) দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্ত সমিতি হইতে জিনিষ সরবরাহ করা হয় কিনা? (৯) মহিলা সমিতির কয়টা অধিবেশনে কি কি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে (১০) সমিতির স্থায়ী গৃহ আছে কিনা, (১১) সমিতির সভায় যাতায়াতের উপায়, (১২) সমিতি সম্বন্ধে সাধারণের সহায়ভূতি কিরূপ, (১৩) সভী বাগান এবং উদ্যান-রচনায় মহিলা-সমিতির কার্য, (১৪) গো-পালন, কৃষি প্রভৃতি কার্যে সভ্যগণের ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং সমিতির সহায়তায় তাহার আলোচনা, (১৫) বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষা বিধান, (১৬) পারিবারিক জীবনে অধিকতর নৈপুণ্যলাভের জন্ত সমিতির সভ্যগণের চেষ্টা, (১৭) বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার পরিচালনে

সাহায্য, (১৮) পল্লীসংগঠনে মহিলা সমিতির কার্য, (১৯) ধাত্ত্রীবিদ্যা শিক্ষা, রোগীর সেবা, আকস্মিক বিপদে প্রাথমিক সাহায্যদান, টোটকা চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষাদান (২০) বিধবাদের জন্ত সমিতির কর্মপ্রচেষ্টা, (২১) সমিতির বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ, (২২) বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব।

মহিলা সমিতি-পরিচালনে উৎকৃষ্ট কার্য করার জন্ত কেন্দ্র-সমিতি মহিলা-সমিতিকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া থাকেন।

বিনীত

শ্রীহেমলতা দেবী

সম্পাদিকা

(২)

সবিনয় বিনয়,

আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন যে, প্রতি বৎসর জাহ্নয়ারী মাসে কেন্দ্র-সমিতির উৎসব সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলা-সমিতির উৎসব শিল্প দ্রব্যের একটি বিরাট প্রদর্শনীর অস্থান হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরের জায় এভাবেও সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতির কর্তৃপক্ষগণ আগামী জাহ্নয়ারী মাসের ১৫ই তারিখ হইতে এইরূপ একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। আপনারদের সাহায্য এবং সহায়ভূতি না পাইলে ঐ অস্থান সাফল্য-মণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। সেই জন্তই এই অস্থানসম্পর্কে কি কি করা প্রয়োজন তাহা নিবেদন করিবার জন্তই আপনাদিগকে এই পত্র দিতেছি। কেন্দ্র-সমিতির শিল্পবিজ্ঞান-মন্দিরে ঐ প্রদর্শনীর স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। আপনারদের সমিতিতে যে সকল শিল্পদ্রব্য উৎসব করা হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এবং বিক্রয়ের জন্ত আমাদের নিকট ৬০ বি, মির্জাপুর স্ট্রীটে পাঠাইয়া দিবেন। প্রেরিত দ্রব্যের একটি তালিকা আপনারা রাখিবেন এবং একটি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটিতে নম্বর দিয়া দিবেন। যে গুলি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার উপরে “বিক্রয়ার্থ” এই কথা লিখিয়া মূল্য নির্দেশ করিয়া দিবেন এবং অপরগুলির উপরে “বিক্রয়ার্থ নহে” শুধু এই

লিখিবেন। তালিকাসহ দ্রব্যগুলি রেলওয়ে পার্শ্বলৈন ষ্ট্রীট ডেলিভারী (60-B, Mirzapur Street, Harrison Road Junction) দিবার কথা লিখিয়া এমন সময় পাঠাইবেন, যেন এই জাহ্নবীর পূর্বে আমাদের অফিসে পৌঁছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি প্রদর্শনী শেষ হইয়া গেলে আশ্রয়াদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আপনাদের সমিতি হইতে যে সকল প্রতিনিধি বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত হইবেন তাঁহারা প্রদর্শনী পরিচালনে আমাদিগকে সাহায্য করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কোন সময়ের মধ্যে আপনাদের দ্রব্যাদি আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে, অল্পগ্রহপূর্বক যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন। কলিকাতার প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিই বিশেষভাবে বিক্রয় হইয়া থাকে :— কাঁথা, সতরঞ্চ, টেবিল ক্লথ, মুগার কাজ করা টিপার কাভার, উলের জামা, টুপী, মোজা, গলবন্ধ (কম্ফাটার), আলোয়ান প্রভৃতি ; বিভিন্ন প্রকারের কাপড় ও পুতির ব্যাগ, ফুলের সাজি, ছেলেদের কাপড়, সতরঞ্চের আসন, গালিচার আসন, কাগজ বা মাটির খেলনা, বাঁশী, সাবান, সেক্ট, জ্যাম-জেলি আঁচার, মোরব্বা, বিভিন্ন প্রকারের চটের আসন, পাপোষ, মাছের আঁশের সাজি, এম্ব্রয়ডারী, নারিকেলের আঁশের বা চুলের ঘড়ির চেন, কাপড়ের পাড়ের পর্দা, বালিশের ঢাকনা, বিভিন্ন প্রকারের চিত্র, রিক্কেলের বোতাম, পেপার-ওয়েট, কাঠের পুতুল, মাটির এবং কাঠের ছাঁচ, নারিকেলের মালায় বাটী, চায়ের পেয়ালা, ফুলদানী, ভাঙ্গা পাথরের সন্দেশের ছাঁচ, দড়ি বা শোনের সিকা, খেজুর এবং নারিকেল পাতার

টুপী, পাখা, ব্যাগ, কাগজের পাখা, বেতের বুড়ি, বাঁচ, বাস্কেট, সাজি ইত্যাদি ও বিভিন্ন প্রকারের নারিকেলের খাবার (বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটা) ।

কেন্দ্র সমিতির এই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত করিবার বিষয়ে আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। অল্পগ্রহপূর্বক পত্রোত্তরে বাধিত করিবেন।

বিনীতা

শ্রীহেমলতা দেবী

সম্পাদিকা

বিশেষ দৃষ্টব্য :—

বর্তমান বর্ষের কেন্দ্র-সমিতির প্রাপ্য বার্ষিক টাঁদা য.৩ আপনাদের না দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্বদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিবিধ :—আলোচ্যমাসে হাওড়া জিলার অন্তর্গত আন্দুল-মোরী গ্রামে একটি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে কেন্দ্র সমিতি হইতে নানাবিধ শিল্প দ্রব্যাদি প্রেরণ করা হইয়াছিল। সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয় স্বেচ্ছা শিষ্যের জগৎ প্রথম জ্যেষ্ঠী প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হয়।

মহিলা দিবসে কেন্দ্রসমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবী সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি এই সভায় দেশের শিল্পোন্নতি ও মেয়েদের কর্তব্য সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

জয়যাত্রার ইঙ্গিত

১৯৩৬ সালের এভারেস্ট অভিযানের কাহিনীতে কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে। 'দু'জন অভিযানকারী কী ভাবে প্রাণ তুচ্ছ করে' হিমালয়ের উপরে উঠবার চেষ্টা করেছিলেন, তাহা বর্ণনা করে' দলপতি হিউ-রাট্‌লেজ্‌ লিখেছেন :

"এ-বছর হিমালয়ে বৃষ্টি এসেছিলো অস্বাভাবিক রকম শিগ্‌গির। আমাদের দলের লোকেরা পূর্বদিকার অভিযান প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল; এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল গরম হাওয়া বদলে' উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দারুন ঝড় বইতে শুরু করেছে; আর সেই ঝড়ে পর্বতের ঢালু কিনারা থেকে আলগা বরফ খসে' গিয়ে মনে হচ্ছিল যেন পড়ে' আছে হাওয়ায় জমা কঠিন বরফের স্তর।

"তাড়াতাড়ি আমাদের দলের দু'জন—উইন্‌ হ্যারিস্‌ আর শিপ্টন্‌—দড়ি বেঁধে সেই বরফ পেরুতে, আরম্ভ করলে। এমন সময় হঠাৎ ওদের দুশো ফুট উপরে বরফের মধ্যে চিড়্‌ দেখা দিলো' আর একটা বিরাট বরফের প্রপাত নেমে চললো চারশো ফুট নিচে' গভীর গহ্বরের দিকে। শিপ্টন্‌ সেই বিরাট তুষার-প্রপাতের সঙ্গে নিচের দিকে নেমে চললো, আর উইন্‌ হ্যারিস্‌ মরীয়া হয়ে যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো সেখানকার কঠিন পাহাড়ের গায়ে কুঠার বসিয়ে দিয়ে তার চারিদিকে ক্রমাগত দড়ি জড়তে লাগলো। কিন্তু তক্ষুণি শিপ্টনের দেহের আর-জমা বরফের টুকরোগুলোর প্রায় পাঁচ মণ ওজনের টান সেই কুঠারকে পাহাড়ের গা থেকে ছিড়ে নিতে আরম্ভ করলে। শিপ্টন্‌ হয়তো ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে গহ্বরের মধ্যে পড়েই যেতো—যদি কোনো আশ্চর্য্য দৈব উপায়ে সেই বরফের স্রোত পর্বত-কিনারের কয়েক ফুটের মধ্যে এসে থেমে না যেতো।

"আরোহী দু'জন তখন তাড়াতাড়ি উঠে' সাবধানে

বরফের নিচুস্তর নেমে এলো। আর সব অভিযানকারীরা এতক্ষণ এদের কার্যকলাপ দেখছিলেন, এখন তাড়াতাড়ি এসে গরম লাগে এদের অভ্যর্থনা করে' নিলে। শরীর চাড়া-করা চায়ে বড় এক চুমুক দিয়েই কিন্তু এরা আবার বসে' গেল রংবাক্‌ তুষারস্রুপ আর উপত্যকার পশ্চিম দিকে কি করে' আরোহণ আরম্ভ করা যায়, তারই পরামর্শে।"

এভারেস্ট আজও বিজিত হয় নি, আর পরাজিত হয় নি মানুষের বীর-চিত্র। সাহসী মানুষ একবার যখন হিমালয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আর সে সেই চিরন্তন তুষারস্রুপের ভীষণ নির্জনতা দেখে ভয় পায় না। আবার মানুষ হিমালয়ের চূড়ায় উঠতে যাবে, তাজা করা চা সঙ্গে নিতেও সে ভুলে যাবে না একথা নিশ্চিত।

গত বছর নভেম্বর মাসে লণ্ডনের ক্যাম্পিং ক্লাবে এক ডিনারে বিখ্যাত হিমালয়-অভিযানকারী ফ্রাঙ্ক স্মাইথ তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, যে হিমালয়ের উপরে এভারেস্টের পথেও রোজ সকালে তিনি পেতে আশা করেছেন তাঁর প্রাত্যহিক সকাল বেলাকার চা। মিষ্টার স্মাইথের এ-উক্তির উপর সম্ভব্য করে' বিলেতের বিখ্যাত দৈনিক 'ইন্‌নিং নিউজ' লিখেছে :

"কেনই বা নয়? মানুষ পৃথিবীতে নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করেছে—শুধু অ্যাডভেঞ্চার বা বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের জন্তে নয়, বরং আসলে সোণা-রূপো মশলা-পাতির জন্তেই। এভারেস্টের চূড়ায় যদি একটা হীরের খনি থাকতো, অথবা যদি সেখানে খুব লাভজনক একটা স্বাস্থ্যনিবাস হতে পারতো তবে মানুষ ছ'মাসের মধ্যে এভারেস্টে উঠে' যেতো। বাস্তবিক ওই সকাল বেলাকার চাহের পেয়ালার মধ্যেই আমরা মানবসভ্যতার জয়যাত্রার ইঙ্গিত দেখতে পাই।"

আজকালকার দিনে যেনারী কেবল একান্তভাবেই গৃহিণী তিনি আমাদের আদর্শ নহেন, যেরে বাহিরে সর্বত্রই যিনি কল্যাণী তিনিই আদর্শ; স্বাধার জীবন কেবলমাত্র চিরাগত প্রাদেশিক প্রথা ও সংস্কারের ছাঁচে ঢালা তিনি আদর্শ নহেন কিন্তু স্বাধার মধ্যে বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান ও ভাবের বিচিত্র ধারা গভীর ও সুন্দরভাবে সম্বতি লাভ করিতে বাধা না পায়, তিনিই আদর্শ।

সরোজনলিনীর জীবনী পড়িয়া আমরা এই আদর্শের পরিচয় পাইলাম।

—রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গলক্ষ্মী

সরোজনলিনী-স্মৃতি-সংখ্যা

১৪শ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

মাঘ—১৩৪৫

২২শে নভেম্বর ১৯২০

—সরোজনলিনী দত্ত

আজ সকালে উঠতে আমাদের বড় দেরি হল। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নীচে গিয়ে খেলুম, কিন্তু দেরি হওয়ার জন্য মাঝ পাওয়া গেল না—শুধু ডিম পাওয়া গেল! বস্তা তার কলেবে গেল, আমরা বেরিয়ে প্রথমে বারকার-এর (Barker) দোকানে গেলুম জিজ্ঞাসা করতে যে কেন ওরা বুচুর জন্য প্রণ, জেম, ও ম্যান-মাইট পাঠায়নি। কদিন হোল ওদের বুচুর কাছে এই জিনিষগুলো পাঠাতে বলে এসেছিলুম কিন্তু কয়েকটা জিনিষ পাঠিয়েছিল, ও-তিনটা জিনিষ পাঠায়নি। এতেই বোঝা যায় যে বিলেত দেশেও লোক ঠকাতে চেষ্টা করে; এটা এমন কিছু আশ্চর্য্য দেশ নয়। আমি বিলেতে আসবার আগে মনে করতাম যে বিলেতে সব জিনিষ পাওয়া যায় আর সেখানকার দোকানগুলি বুঝি কিছু আশ্চর্য্য বস্তু। কিন্তু সে ভ্রম আমার ভেঙ্গে গেছে। এ দেশটা যে কোন যাদুপুরী নয় বা এদেশের দোকানদাররা যে আমাদের দেশের দোকানদারদের মতই মানুষ তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এরাও ভুল করে, ঠকাতে চেষ্টা করে। অনুসন্ধান-দপ্তরে (Enquiry office) গিয়ে বলতে তারা বল যে

এবিষয় তদন্ত করে আমাদের জানাবে। আজ ভয়ানক কুয়াশা হয়েছে, আমাদের হোটেলের কাছে বেশি ছিল, ; সেখানে ছয়-সাত ফুট দূর পর্যন্ত শুধু দেখা যাচ্ছিল; এই রকম কুয়াশায় বড় অসুবিধে ও অনেক দুর্ঘটনাও হয়ে থাকে। খুব সাবধানে গাড়ী, মোটর চালাতে হয়। যারা পায়ে চলে তাদের এমন দিন সব চেয়ে ভাল, কারণ যতক্ষণ না তাদের রাস্তা পার হতে হয় ততক্ষণ শুধু লোকের সঙ্গে ধাক্কা ছাড়া আর কিছুই ভয় নেই—তবে রাস্তা পার হতে এদেরও প্রাণ হারাবার ভয় আছে।

'হাই স্ট্রীট'-এর কাছে আসতেই কুয়াশাটা কম মনে হল। বারকার-এর (Barker) দোকান থেকে আমরা Tube Railway (সুড়ঙ্গ-রেলপথ) ধরে অক্সফোর্ড স্ট্রীট-এ আমাদের কোর্ট, দস্তানা ইত্যাদি দেখতে গেলুম। অনেক ঘুরবার পর দস্তানাটা পাওয়া গেল; আর কিছুই সময় হোল না, বাড়ী ফিরে লাঞ্চ খেলুম। ফিরে এসে দেখলুম বস্তা ফিরে এসেছে। সে কখনো সোমবারে লাঞ্চ খেতে আসে না, সেজন্য ব্যাপার কি—জিজ্ঞাসা করতে বলল যে আজকার লেকচারারের অসুখ, তাই ছুটি। লাঞ্চ খেয়ে আমরা কাপড় পরলুম। ক্যাক্সটন হল (Caxton Hall) একটা লেকচার ছিল, (The preservation of ancient monuments of India) 'ভারতীয় পুরাতন সৌধ-সংরক্ষণ'—বিষয়ে। প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। লর্ড কারজন (Lord Curzon) সভাপতি হবেন। তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য আমরা গেলুম কিন্তু পাঁচই সামনে জায়গী না পাওয়া যায়, ভাল শুনতে না পাওয়া যায় সেই ভয়ে প্রায় তিন-পোয়া-ঘণ্টা আগে গেলুম। তখন একটা কমিটি মিটিং হবে, সেজন্য আমাদের চলে আসতে হল। বাইরে এসে একটু ঘুরে আবার গিয়ে বসে গেলি। প্রায় ৪টার সময় অনেক ভারতীয় লোক এলেন। মিঃ ওয়েস্টব্রুকও (Mr. Westbrook) এলেন। মিসেস আসেন নি। আমরা ৪টায় মিটিং-এর ঘরে গেলুম, কিন্তু দুঃখের বিষয় লর্ড কারজন-এর অসুখ হওয়ায় তিনি আসতে পারেন নি। সেজন্য স্থানীয় ভাওনগ্রীকে (Sir Bhownagree) সভাপতি করা হোল। সকলেই সেজন্য বিশেষ দুঃখিত হলেন। কারণ লর্ড কারজনই পুরাতন মন্দির ইত্যাদি যাতে না নষ্ট হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনিই ভাল বলতে পারতেন।

“আরকিয়োলজি” সম্বন্ধে যিনি একটা নোট লিখেছিলেন তিনি নিজেকে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর নাম ডাঃ ভোগেল, (Dr Vogel) তিনি আমাদের দেশে গিয়ে সেখানে “আরকিয়োলজি” দেখে এই নোটটা লিখেছিলেন। কাগজটা এই এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী পড়লেন। আমাদের দেশের অনেক সুন্দর মন্দির ইত্যাদি অথহে এখন ধূলিসাৎ হয়েছে। সেগুলি যাতে আর না নষ্ট হয় তার জন্য গবর্ণমেন্ট প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাহায্য দ্বারা সে-সব সুন্দর মন্দির ইত্যাদি এখন খোঁজ করাচ্ছেন ও যাতে না নষ্ট হয় তার চেষ্টা করছেন। লর্ড কারজন ভাইসরয় হয়ে এ-বিষয় অনেক করেছিলেন। তিনি ভারত-বর্ষের একটা খুব উপকার করে গেছেন।

ভারতীয়রা তাদের এই মূল্যবান শিল্প (art) চেনে না, এবং ইংরাজরাই যে তাদের এ বিষয় চোখ খুলে দেখিয়ে দিচ্ছে, কাগজে এ-কথা ছিল এবং ভারতীয় লোকের নিজের থেকে তাদের এ-সব শিল্প (আর্ট) রক্ষা করবার চেষ্টা করা চাই, কাগজে তাও ছিল। কয়েকজন ইংরেজ স্ত্রীলোক ও কয়েকজন পুরুষও এ বিষয় কিছু কিছু বলেন। স্ত্রীলোক দুটিই আমাদের দেশের সৌন্দর্য্য দেখে এসেছেন। একজন হচ্ছেন স্যার ম্যাকেনার স্ত্রী, অন্যটি তাঁর নন্দ। তাঁর নাম মিসেস ভিলিয়ার্স স্টুয়ার্ট (Villiers Stuart)। ইনি “মোগল গার্ডেন” বলে ভারতীয় বাগানের বিষয় বই লিখেছেন। এঁরা ভারতের সুন্দর শিল্পের (art) বিষয় বলেন। তারপর উনিওক ছুচার কথা বলেন। উনি বলেন যে শুধু আমাদের দেশের লোকেরা যে তাদের জিনিষের মূল্য বোঝে না, তা নয়—এদেশেও (ইংলণ্ডে) অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত এরা নিজেদের মূল্যবান (art) শিল্প রক্ষা করতো না; তার চিহ্ন আমরা (Winchester Abbey) উইন্চেস্টার অ্যাবিতে দেখে এসেছি। আমাদের দেশের লোকের যে এ-বিষয় মনোযোগ দেওয়া উচিত তাও তিনি স্বীকার করলেন। ওঁর বলার পর ওঁর সঙ্গে লেডী ম্যাকেনা ও মিসেস স্টুয়ার্ট দুজনেই এসে কথা বলেন। লেডী ম্যাকেনা ও মিসেস স্টুয়ার্ট আমাদের রবিবারে চা-তে আসতে নিমন্ত্রণ করলেন,—কিন্তু তখন আমরা অন্য একটা লেকচার শুনতে যাব, তাই আসতে পারবো না—তার পরের রবিবারের পরের রবিবারে আসবো, বললাম।*

† শ্রীযুক্ত গুরুদয় দত্ত

* বিলাত ভ্রমণের দিন-লিপি হইতে উদ্ধৃত।

“...আমি যদি ঘরের কর্তব্য
অবহেলা করি তবে সামাজিক
কর্তব্য করবার অধিকার লাভ
হবে না।”

—সরোজনলিনী



জীবন-সাথী

গুরুসদয় দত্ত

আমার হৃদ কমলে তোমার নিত্য-অধিষ্ঠান
অথই আনন্দেতে করে স্পন্দিত মোর প্রাণ ॥
আমার সসীম সাথে জোড়া তোমার অসীম হিয়া
ছুটায় আমার অনুভূতি মৃত্যুরে লজিয়া ॥
কত কোটি জনম ধরে তপস্বী সন্ধিয়া—
জীবন-সাথী রূপে তোমায় পেলাম আমি প্রিয়া ॥

নারী-কল্যাণ

• ত্রিখগেন্দ্রাথ মিত্র, রায়বাহাদুর

নারী-কল্যাণ সম্বন্ধে বর্তমান কালে অনেক সমস্তা দেখা দিয়াছে এবং দিতেছে। আমরা—যাহারা পুরাতন সংস্কারে পুষ্ট হইয়াছি, আমরা সেগুলিকে এড়াইয়া যাইতে পারিলেই যেন স্বস্তি বোধ করি। কেহ কেহ সেগুলিকে উপেক্ষার চোখে দেখেন, কেহ বা উপহাসের দ্বারাই সমাধান করিতে ব্যস্ত। কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতির যেরূপ দ্রুত পরিবর্তন ঘটতেছে তাহাতে সমাজের দিক দিয়া এই সমস্তাই গুরুত্ব হিসাবে সব চেয়ে বড় বলিয়া মনে হয়। অসংকট বা অর্থনৈতিক কারণেই ইহার জটিলতা বাড়িয়া যাইতেছে। সমাজের অবস্থা যদি জ্ঞানের মত থাকিত, তাহা হইলে এরূপ উৎকট ভাবে নারীদিগের দুর্গতি বাড়িয়া উঠিত না।

এক্ষণে কর্তব্য কোন পথে? নারীদিগকে বিবাহের আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কারণ বিবাহের সম্ভাবনা ক্রমেই স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়া আসিতেছে। যাহাদের বিবাহ হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও ভাবনার অন্ত নাই। সকল স্বামীই সঙ্গতিপন্ন নহেন। যেখানে সেরূপ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেখানে রমণীগণের পক্ষে এবং তাহাদের অভিভাবকগণের ভাবিবার অনেক আছে। মোট কথা, প্রত্যেক নারীর পক্ষে এখন সব চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন এই, কি ভাবে তাহাকে গঠন করিলে কল্যাণ হইবে।

বহুদিন পূর্বে অস্ত্রান্ত্র দেশে এইরূপ বৃত্তিসংকটের ফলে অর্থায় অর্থনৈতিক কারণে এই সমস্তা দেখা দিয়াছে এবং সেই সেই দেশের লোক এই সমস্তার সমাধানে মনোযোগী হইয়াছে। আমাদের দেশে কালের চাকা কিছু দীরে

চলে। আমরা বহু শতাব্দীর জড়িমা হইতে সহজে মুক্তি লাভ করিতে চাহি না। ভাব এই যে, চলিতেছে ত চলুক; কিন্তু আর যে চলিয়া উঠিতেছে না। বিলাতে কিম্বা মার্কিণে রমণীগণের জন্ত নানাবিধ কর্মের সুযোগ রহিয়াছে। তাহাতে সহস্র সহস্র শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত রমণী অনায়াসে জীবিকা নির্বাহের দ্বারা সুখে জীবন যাপন করিতে পারেন। যেমন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা, টেলিফোনের চাকরী, রেলওয়ের টিকিট বিক্রয় এবং জীবনবীমার দালালি। আমার সহিত ভিয়েনায় একজন মহিলার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমেরিকায় জীবনবীমা সঙ্ঘের কেরাণীর কাজ করেন। তাহার বেতন মাসে তিনশত টাকা। প্রতি বৎসর ছুটি লইয়া তিনি নানা দেশ দেখিয়া বেড়ান।

যেখানে এই সকল সুযোগ নাই, যেখানে অল্প সমস্তার নিরাকরণ নাই, সেখানে পুরাতন আদর্শের দোহাই দিয়া নারী-কল্যাণের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হয়। সয়োজনলিনীর পুণ্যনামে যে প্রতিষ্ঠানটি হইয়াছে, তাহার জায় বহু প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। বহু সমিতি, বহু অস্থান, বহু আয়োজনের অবকাশ আছে। তাহা না হইলে হাজারে হাজারে মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটি পার করিয়া দিলেই সমস্ত কর্তব্যের অবদান হইল বলিয়া মনে হয় না। যাহাদের কল্যাণে সমাজের কল্যাণ, যাহাদের অকল্যাণে সমাজের সর্বনাশ, গৃহের বিপদ, পরিবারের ধ্বংস, শান্তির মূলচ্ছেদ, তাহাদের কথা না ভাবিলে প্রত্যাব্যভাগী হইতে হইবে, সমাজ-শৃঙ্খলা উৎসন্ন যাইবে এবং দেশের অবনতি অনিবার্য হইবে।



“মফঃস্বলের মেয়েদের প্রশস্ত-
তার চিন্তা ও ভাবের সংস্পর্শে এনে,
আর তাঁদের স্ববিস্তৃতভাবে দেখবার
শক্তি দিয়ে খুব ভাল কাজ করতে
পারা যায়।”

—সরোজনলিনী

সরোজনলিনী-প্রতিষ্ঠান

ত্রিবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নারীজাতির কল্যাণের উপর দেশের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত। সরোজনলিনী-স্মৃতি-সমিতি এদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদের অক্লান্ত সেবা-কার্যের মধ্য দিয়া আমাদের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া। ইহাদের অধীনে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রায় চারশত মহিলা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের যে মেয়েরা কখনো লেখাপড়া শিখিবার কল্পনাও করেন নাই, এই মহিলা-সমিতিগুলির সাহায্যে বর্তমানে তাঁহারা বর্ণের গভীর রহস্যের সহিত পরিচিত হইতেছেন। সরোজনলিনী-স্মৃতি-সমিতির বিভিন্নমুখী অল্প বহুতর সেবা-কার্যের কথা বাদ দিয়াও যখন এই একটি মাত্র দিকের কথা চিন্তা করি, তখনই বুঝিতে পারি, কতদিনের গাঢ় জমাট অন্ধকার-রাশির উপর সরোজনলিনী-সমিতি আলোক পাত করিতেছেন। তাঁহাদের এই একটি মাত্র সেবার তুলনা নাই।

একটি চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া মহিলাকে আমি জানিতাম। তিনি পূর্বে বিন্দুমাত্র লেখাপড়া শেখেন নাই। হঠাৎ কোতুলপরবশ হইয়া চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর ছোট ছোট দোহিজ-দোহিজীর বর্ণ পরিচয় পড়িয়া অক্ষরের সহিত পরিচয় লাভ করেন। আমার সঙ্গে যেদিন দেখা সেদিন তিনি ৬যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বিখ্যাত “মজন্তালি সরকারের” গল্পটি ছেলেদের বইয়ে পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন। জীবনে এই তিনি প্রথম পুস্তক পড়িবার আনন্দ উপভোগ করিলেন। কি আনন্দের হাসি দেখিয়াছিলাম তাঁর মুখে সেদিন! সরোজনলিনী-স্মৃতি-সমিতির বাস যখন রাস্তা দিয়া যায়, তখন সেই প্রৌঢ়া মহিলাটির সেদিনকার আনন্দমাখা হাসিমুখ আমার মনে পড়ে।

“গণ্ডীর মধ্যে থেকেই আমরা
অনেক উন্নতি করতে পারি—কিন্তু
আজকাল শুধু গণ্ডীর মধ্যে থাকলেই
চলবে না—দিনকাল বদলাচ্ছে।”

—সরোজনলিনা

অমৃতাবদান

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

আকাজ্জার অশ্রুমাখা অমাবস্তা-নিশীথিনী
ধ্যায়ার্ণ-গম্ভীর
নীরবে জাগিয়াছিল;—নিকষ কালোর বুকে
স্তব্ধ নিয়তীর
অঙ্গুলী উঠিল কাঁপি;—অকস্মাৎ ধীরে ধীরে
অপস্রহমান
যবনিকা-অন্তরালে সহস্র প্রদীপ লয়ে
লক্ষ নারীপ্রাণ
কাহার আরতি করে? দূরপাশ, শুনে যাও,—
মর্ত্য-অমৃতের
এই তীর্থে এস যদি, নীরবে জানায়ে নতি
তব হৃদয়ের!
মমতার মুৎপ্রদীপে স্নিগ্ধ যে-কুটীরঙ্গন
প্রাসাদ-রাজার
সেই দীপ-ধারিণীর বক্ষে দেখো, আছে আঁকা
দেবীমূর্তি কাঁর।
প্রতি উষা হেসে ওঠে, প্রতি সন্ধ্যা গানে ভরে
যাঁদের কল্যাণে
সেই কণ্ঠা-বধূদের জিজ্ঞাসা করিও বন্ধু,
কার অবদানে
নবীন-বঙ্গের বালা দিনে দিনে হয়ে ওঠে
শুদ্ধা—তপস্বিনী—?
উচ্চারিবে সম কণ্ঠে তাহারা সকলে—শুনো,
“সরোজনলিনী”

স্মৃতির পূজা

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

যে মহীয়সী নারীর স্মৃতি আমাদের মনে জাগে, তিনি যে কতখানি শক্তি লইয়া এই জগতে আসিয়াছিলেন, তা তাঁর রচিত প্রতিষ্ঠান হইতেই সহজেই বোঝা যায়।

পুরুষদের জ্ঞান অনেক কিছু করিয়াছেন, কিন্তু অভাগিনী নারীদের কথা কোনদিনই কেহ চিন্তা করেন নাই; চিরদিন একরূপ আগাছার আশ্রয়ই তারা এই সংসারের মধ্যে নিজেদের অমূল্য জীবন নষ্ট করিয়াছে! তাদের মধ্যে যে মনরূপী ভগবান আছেন, তারাও যে স্বথ হুঃখ সম-অহুঃভব করে...যে কোন কাজ শিক্ষা দিলে, নারীরও যে করিবার শক্তি আছে, এবং তারা সেই শিক্ষায় যে নিজেদের অন্নের সংস্থান করিতে পারে, তাহা এই স্নানামথন্তা মহিলার পূর্বে অজ্ঞ কেহই ভাবেন নাই।

নারীর ব্যথা, নারীই বোঝে। কিন্তু সংসারক্ষেত্রে ইহার বিপরীত দেখা যায়। স্বজাতি-বিদ্বেষাচরণ নারীর যেন একটা স্বভাবের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজ শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পাওয়ায়, তাদের মনের সে সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া ক্রমে প্রসারতা লাভ করিতেছে। ইহার প্রবর্তক হিসাবে বলিতে গেলে সরোজনলিনী দেবী। নারীর জ্ঞান এই দান পৃথিবীতে তাঁকে চির অমর করিয়া রাখিবে।

আজ বাংলার বাহিরেও বহু জায়গায় এই সমিতির শাখা দেখা যায়, তাহাতে মেয়েরা অতি শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত কায করিয়া থাকেন। ইহারই ক্ষুদ্র একটি শাখার সহিত আমার কিছুদিন পূর্বে পরিচয় ছিল। জব্বলপুরে থাকিতে এই সমিতির সামান্য কাযের ভার সভ্যাগণ আমার উপর দিয়াছিলেন। সেখানে সম্পাদিকা থাকিবার সময় এই দেবীর এবং তাঁর কার্যের বর্তমান কর্মসী মহিলা-গণের সম্বন্ধে অতি সামান্যই আমি জানিতে পারি। সেই হইতে “সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির” উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়। ইহাদের সহিত পরিচিত হইবার একটা অদম্য ইচ্ছা আমার ছিল, কিন্তু এতদূরে থাকায় সে সুযোগ বা সুবিধা কোন দিনই পাইয়া উঠি নাই...আজ তাঁর স্মৃতির স্মরণে আমার অন্তরের এই শ্রদ্ধা-অর্থ্য বঙ্গলক্ষ্মীর মধ্য দিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতেছি।

নিমচ্, আপন ইণ্ডিয়া।

সরোজনলিনীর স্মৃতি

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

ভারতের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে মহিমময়ী নারীশ্বের অভাব অল্পভব আমাদের কখনও করিতে হয় নাই। একই নিঃশ্বাসে ঋণা, লীলাবতী, বিশ্বারা, সজ্জমিত্রা, দুর্গাবতী প্রভৃতি মহীয়সী মহিলার নাম স্মরণপথে উদ্ভূত হয় এবং সেই পুণ্যস্মৃতির সাগরে অবগাহন করিয়া আমরা ধন্য হই। কবে কোন্ স্বদূর অতীতে অজ্ঞাত কুলবধূরূপে তাঁহারা গৃহসংসার পাতিয়াছিলেন কিন্তু শুধু সংসারের স্বার্থবহুল আবেষ্টনী তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; নীলাকাশের বিহ্বল চন্দ্রালোক হইতে যেমন স্নিগ্ধ কিরণধারা নামিয়া আসিয়া তজ্জাতুর ধরণীকে মুচ্ছিত করিয়া দেয় সেইরূপ তাঁহাদের গরিমারশি আজিও অগ্নানভাবে আমাদের এই পৃথিবীতে কিরণধারা বর্ষণ করিতেছে, অথচ আমরা জানি না কোথায় তাঁহাদের গরিমার উদয়াচল আর কোথায় তাঁহাদের গরিমার অস্তাচল।

আজিও আমাদের দেশ হইতে সেই মাতৃহ ও সেই নারীহ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই; হয়ত প্রয়োজনীয়তার বশে আমরা সেই মহান আদর্শ হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি কিন্তু একেবারে আদর্শভ্রষ্ট হইয়া পড়ি নাই; যুগান্তরের বহু সমস্ত্রা হয়ত সময়ে সময়ে আমাদেরিগকে অধ্যুষিত করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু তাহাতে একেবারেই আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি নাই; তাই সেই স্বদূর অতীত যুগের মতো আজিও বধূরাণী সরোজনলিনী সংসারের নিজস্ব আবেষ্টনীর মধ্যে শুধু আবদ্ধ রহিলেন না; সংসারক্ষেত্রের নিরলস মুহূর্তে কর্তব্যের অগ্নি একটি আহ্বান তিনি সন্মোপনে গুনিয়াছিলেন এবং সেই আহ্বানেই তিনি সাড়া দিয়াছিলেন।

আমাদের নারীসমাজের অগ্নি নির্দিষ্ট সামাজিক গণ্ডীর বহু বাধা-নিষেধের কথা সরোজনলিনীর জ্ঞাত ছিল। তাঁহাকেও হয়ত একদিন অল্পরূপ ঘটনার বিভীষিকা আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্ত তিনি তাঁহার সমুৎপত্ত-ভাগিনী ভগিনীদের ব্যাখ্যায় ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কার্যধারা ও স্মৃতিকে উজ্জীবিত রাখিবার জন্ত সরোজনলিনী-স্মৃতিসমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে মহিলাগণের দ্বারাই মহিলাদের সর্ববিধ শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। বাংলার জননী ও বধুগণের আর্থিক, শিক্ষা-বিষয়ক, নৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ উন্নতির চেষ্টা করা সরোজনলিনীর ঐকান্তিক বাসনা ছিল। তাই ১৯১৩ সালে তিনি নারী আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন; অস্বরোদগত সেই বাসনা আজ মহীকহে পরিণত হইয়াছে। ইহা শুধু বাংলার মধ্যে আবদ্ধ নাই, দিকে দিকে ইহা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। সরোজনলিনীর স্মৃতি-বিরোধিত মহিলা সমিতিতে আজ সমাগত হইয়া নিভৃত পল্লীর ও চঞ্চল নগরীর বধুকুল তাঁহাদের নিজেদের স্বখচ্ছুরের কথা চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন। সেখানে তাঁহারা তাঁহাদের সামাজিক অবস্থার কথা, পড়াশুনার কথা, ধাত্রাবিদ্যা, মাতৃস্বের কথা, সেবা শুশ্রূষার কথা, নানাবিধ শিল্পশ্রব্য প্রস্তুতের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। সরোজনলিনীর বাসনা পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

স্বপ্ন-কুসুম

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আমি বসে আছি একা মৌনস্তব্ধ আজি এই প্রদোষ-প্রাকালে,
সন্মুখে মন্ডর পদে নামিছে ভ্রমর-কৃষ্ণ শান্ত নিশীথিনী,
অদূরে আকাশ-প্রান্তে বলমল ছাতিমান শশী-সুহাসিনী
ব্রীড়ায় অপূর্ব দীপ্তি;—সহসা উদিত তুমি ইন্দু-কর-জালে
আমার অন্তর মাঝে অক্ষুট মুকুল সম পত্র-অন্তরালে;
তব মহিমার বাণী শুনে যত ভ্রান্ত মেয়ে পথ যায় চিনি'
স্বপ্নলব্ধ দৈব-অনুকম্পা সম, যার লাগি মর্ত্য-নিবাসিনী
লভে' পুত জ্ঞান, বিদ্যা, তার পদে প্রগতির পুষ্প-অর্ঘ্য ঢালে।
কেমনে ভুলিয়া যাবো? রূপায়িত কীর্তি যার অক্ষি-অগ্রভাগে,
সোনায় জড়ানো আছে যে কাহিনী আমূচ্ছিত মূর্ত্ত ইতিহাসে
পঙ্কজে নলিনী সম; নারী-বক্ষে অগ্নিমন্ত্র দীক্ষিয়া সোহাগে
মুছে দিলে গ্রানিময় মূঢ় যে জীবন,—তারি দীপ্তিচ্ছটা ভাসে;
আজি তুমি কাছে নাই। যে স্বপ্ন-কুসুমে তুমি গঁথেছিলে মালা
অকালে নহে সে স্নান, যোগ-ভ্রষ্ট, ত্রিয়মাম,—পূর্ণ তেজে আলা।

সরোজনলিনী স্মৃতি

শ্রীমতী অরুণিমা ও কুমারী পীযুষকণা

সত্য-শিব-সুন্দরের রূপলেখা রূপায়িত
তোমাতে গো সরোজনলিনী,
ব্রজেন্দ্রের শিক্ষা-যুগে হ'য়েছিলে সেবাব্রতা
সেবারতা আদর্শ রমণী!

কালের অকাল ডাকে কর্ম-ভরা ধরা ছেড়ে
চ'লে গেছ আজ অমরায়,
অ-দেখায় বিশ্ব নিশ্ব—মানব-হৃদয়ে তব
জয়গান চির-ঘোষণায়!



—সরোজনলিনী দত্ত

অচিনে চিনিয়াছিলে সাধন ও আরাধনে
—ভাগ্যে তব শ্রীগুরুসদয়,
অনিত্যের মাঝখানে শাস্ত্রের শতদলে
করেছিলে সব মধুময়!

নিরাশার অন্ধকারে বেদনার গুরুভারে
অশ্রু বারে কাতর নয়নে,
অ-কাতর তব লোক ভুলিয়াছে ব্যথা শোক
বিশ্বসেবাব্রতীর স্মরণে!



—সরোজনলিনী দত্ত

“দ্বী-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা
যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি দুরূহ
কাজ। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে
এখনো অনেক লোক দ্বী-শিক্ষার
মূল্যই উপলব্ধি করেনি।

যে দেশে মা শিক্ষিতা নয় সে
দেশের ছেলে শিক্ষিত হ’তেই
পারে না।”

—সরোজনলিনী

সরোজনলিনী-স্মৃতিরেখা

শ্রীমতীশ্রীলেখা দেবী

দুঃখ, শোক, ঝঙ্কাহত

অিয়মান,—লাজে নতশির,

অপমান-উৎপীড়িতা,

অসহায়্য বঙ্গ-রমণীর

কেহ ত’ বোঝেনি ব্যথা,

শোনেনিক করুণ রোদন ;

মুছাতে নারীর অশ্রু

নারী কভু করেনি যতন।

জ্যোতির্ময়ী উষা সম

অপসারি অমা নিশীথিনী ;

উদিলে রমণীমাঝে

কল্যাণী গো ! সরোজনলিনী !

উচকুল-সমুদ্ভা, কুলবধু,

কুলের গৃহিনী ;

পরার্থে আপন স্বার্থ বিসর্জিলে

সতী সীমন্তিনী !

নারীর মরমব্যথা বেজেছিল

অন্তরে তোমার ;

মোচন করিতে ক্রেশ

একো অংশ বিশ্বমাতৃকার ;

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে

প্রচারিলে ডাকিয়া সবায়

ঘূচাতে নারীর হুঃখ

নারী-হস্তে রয়েছে উপায় ।

ভয়ীর ব্যথায় যদি

নাহি কাঁদে ভগিনীর প্রাণ,

আপনার লজ্জা সে যে,

নারীদেহের তীব্র অপমান !

সে বাণী স্পর্ষিয়াছিল বাঙ্গালীর

তদ্ভ্রাচ্ছন্ন প্রাণে,

জেগেছিল বঙ্গনারী, আন্তরিক

তোমার আহ্বানে ।

গৃহে ছিলে লক্ষ্মীরূপা

মাতৃরূপা দেশহিতব্রতে ;

অগন্যায়ী জীবনেতে

মগ্ন শুধু ছিলে কর্ণশ্রোতে ।

অকালে গিয়াছ চলে' ত্যাজি সব

চিরদিন তরে ;

কীর্তি তব অমলিন

অলিতেছে সোনার আখরে ।

স্মৃতি তব নারী প্রাণে

আজও নব প্রেরণা জাগায় ;

বঙ্গের অন্তর-লোকে,

বিরাজিছে মহামহিমায় ।



“সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়ে
আমরা ;—আমাদের দেশের মেয়ে-
দের চরিত্র এমন হওয়া উচিত যেন
অন্ত দেশের মেয়েরা তার অনুকরণ
করে।”

—সরোজনলিনী

নিবেদন

শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায়

তোমার মন্দিরে আমি আসি নাই অকারণে, দেবী,
ছিল স্বার্থ—ক্ষুদ্রতা নরের,
হয়তো আকাঙ্ক্ষা ছিলো—অর্থ পাব এই কল্প সেবি,
উচ্চাসন পাব গৌরবের !
আজও কি সে মোহ গেছে ? যায় নাই,—মানুষের মন
ধন, মান, যশের কান্দাল—
তথাপি বলিতে পারি—আমার এ মন্দির মার্জন
আমারে দিয়েছে এতকাল
যে স্বর্গের অনুভূতি—যে প্রেরণা, তুচ্ছ তাহা নয় ;
—সেইটুকু অস্তিত্ব আমার
আমারে বুঝিতে দিও—তোমার সে শাস্ত্রত বাঙ্গায়
শ্রী-রূপে জানাই নমস্কার ।



নারী

জগতের আদিক্ষণে উমা হৈমবতী,
যে পরাবিভার জ্ঞানে তোষে স্বর্গপতি,
যে প্রেমে সৃজাতা দিল বৃদ্ধমুখে অন্ন,
ক্লেশ-রক্ত চিহ্ন মুছি' 'ম্যাকডালীন'-ধন,
সে প্রেম কলিত প্রেম নয় কভু নয়
আজো সেই রক্ত নারী-ধমনীতে বয়।

যে স্নেহে জননী তাঁর আপন সন্তানে
পালন করেন নিত্য স্তন্যসুধা দানে,
রোগে-শোকে যন্ত্রণায় ছুঁদ্বিধে বিপাকে
যে স্নেহ সন্তানে বৃকে আঁকড়িয়া রাখে,
সে স্নেহ কলিত স্নেহ নয় কভু নয়
স্নেহসিক্ত রক্ত নারী-ধমনীতে বয়।

অস্তুরে অমৃত আনে প্রাণে নব গীতি
প্রিয়জনে প্রিয়তম করে যেই প্রীতি ;
মধুময় মনোলোক—নূতন প্রভাতে
দৃষ্টি করে বিনিময় নিখিলের সাথে,
সে প্রীতি কলিত প্রীতি নয় কভু নয়
নারীবক্ষে আজো তার রয়েছে সঞ্চয়।

যে প্রীতি মানুষ সাথে মানুষের মন
সুনিবিড় সখ্যাসূত্রে গাঁথে অনুক্ষণ,
শুভক্ষণে সে প্রীতির সৌরভ বিলাতে
নারীসনে নারীমন আনিল ম্লিলাতে।
স্বদেশে বিদেশে করি' ব্যবধান লয়
নারী আজি দিল তার সত্য পরিচয়।

“স্বামীর কল্যাণের জগৎ শাখা
পরিতে হয়; আমাদের দেশের এই
সুন্দর প্রাচীন প্রথা কে আমি বড়
ভালবাসি।”

—সরোজনলিনী

সরোজনলিনী

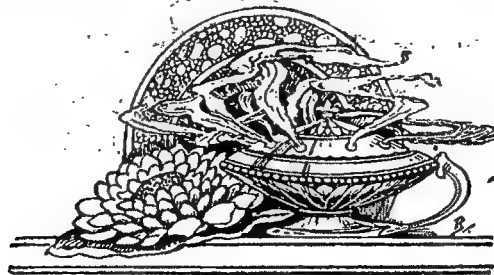
শ্রীকামাখ্যা শাস্ত্রী

বিধাতুঃ সৃষ্টিমাধুর্য্যং জীবমাত্র-জনৌ নহি ।
ভবাদৃশীনাং নারীগাং জননাং তৎ-সুসঙ্গতম্ ॥
বিলাসভাবভাবস্তুে পাশ্চাত্যভাবপুৰিতে ।
ধনাঢ্যেহপি গৃহে লব্ধা জন্ম স্বং-কৃতিজং মহৎ ॥
প্রাচ্যাভিমানমনসা স্বকীর্য্যার্থ-প্রেক্ষয়া ।
সূর্য্যদ্যুতি-সমং দত্তং ধরগ্যাং কৰ্ম্ম তৎপরম্ ॥

অঞ্জলি

স্বপ্ন তোমার সত্য হয়েই
অতীত এসেছে বর্তমানে,
তোমার গঙ্গা হোল বন্দিত
অযুত নারীর পুণ্যস্থানে ।
অনাগত-কাল-উদগাতা তুমি
আনিলে যে হোম-বহি বহি’
বাংলা তাহাতে হোল পবিত্র,
হবে পবিত্র নিখিল মহী ।

শ্রদ্ধা তোমাতে জানাব কি দিয়া
শ্রদ্ধার হিয়া পড়িছে মুয়ে—
বাংলার বধু, কন্যা, জননী
প্রাণ পেল দেবী, তোমায় ছুঁয়ে ।
দিকে দিকে তারা আসিতেছে আজ
শ্রদ্ধা-পুষ্প-অর্ঘ্য নিয়া,—
সেই ডালাগুলি একত্র করি’
দিলাম তোমায় অঞ্জলিয়া ।



সম্পাদিকার জগন্না

সরোজনলিনী-প্রতিষ্ঠানে বড়লাটপত্নী

গত ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার বড়লাটপত্নী. সরোজনলিনী-প্রতিষ্ঠানটি দেখতে আসেন। সমিতির কর্তৃপক্ষরা তাঁকে যথোপযুক্ত সমাদরে সন্মিলন করেন। ময়ূর-ভঞ্জন রাজমাতা সূচাক দেবী, লেডী নিরুপমা সিংহ ও সমিতির প্রেসিডেন্ট মাননীয় বিচারপাত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় দ্বারদেশে উপস্থিত থেকে সম্মানে তাঁকে ভিতরে আনেন। শিল্প-শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণ ব্রতচারী পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা করে। উচ্চবংশীয়া সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট নারীর আগমনে সেদিনকার ভাষায় উপস্থিত মহিলা মাত্রই বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন। স্বদেশ-বিদেশের ব্যবধান ভুলে নারী-স্বদেশের একাই সেদিনকার অস্থানটিকে গৌরবান্বিত করেছিল। সেই মর্মের একটি কবিতা ও তার ভাবের অভিব্যক্তি নিপুন শিল্পী দ্বারা চিত্রিত করে তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। খুব খুসীর সঙ্গে তিনি সেটি পছন্দ করলেন, মনে হোল। যাবার সময় সেটিরই আগে ধোঁজ করলেন, সঙ্গে নেওয়া হোল কিনা। কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। মূল কবিতাটি ও তার ইংরাজী অনুবাদ বঙ্গলক্ষ্মীর অন্তর্ভুক্ত দেওয়া গেল। গত বৎসর শীতকালে তিনি লাক্সলবেড়িয়া গ্রামখানি দেখে যে কত খুসী হয়েছিলেন, যাবার সময় আমাদের কাছে তার উল্লেখ করে সেকথাটি জানিয়ে গেলেন।

নারীর হৃদয় সকল জাতির মধ্যে সমান। সকল দেশের দুঃখ-অসহায় নিরাশ্রয় নারীদের সঙ্গে যদি ধনী ও উচ্চপদস্থা মহিলারা মিলেন ও তাঁদের জন্য ভাবেন তবে নারীস্বদেশ-জ্বলন্ত সমবেদনা পরস্পরের জন্য জাগবেই, এবং নারীর দুঃখ নিবারণে তাঁরা যথার্থভাবে সচেষ্ট হবেন। নারীর প্রতি নারীর ব্যবহারে উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র ভেদ নাই, আমরা মনে করি। মাননীয় বড়লাট পত্নীকে তাঁর সহায়ত-

সূচক আগমন ও শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপনের জন্ত আমরা সম্মান কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সরোজনলিনী

সকল রকম উন্নতির পথে অনায়াসে এগিয়ে চলবে, নিজের স্বন্দর অন্তঃকরণটি স্বন্দরতর করে তুলে প্রিয়তম স্বামী ও বৃকের ধন সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করবে, সাধারণতঃ নারীজীবনের এইটিই কাম্য। বর্তমান যুগে নারী-চরিত্র সৃষ্টির জন্ত উৎসাহ, উদ্বুদ্ধ। ইহাকেই আমরা নারীপ্রগতির আদর্শ মনে করি। সরোজনলিনীর জীবনে ও চরিত্রে এই আদর্শটি সত্য ফোটা খেত পদ্মের মত চলচল ও সুবাসে পরিপূর্ণ। তাঁর সংসার ছিল সুখের সংসার, নারীর কাম্য সুখ সব তিনি পেয়েছিলেন, তাই অকাতো চলে গেলেও তাঁর মধ্যে একটি পূর্ণতা রূপ গ্রহণ করেছিল, দেখা যায়। এই সাধারণ আদর্শটি ছাড়া আরো একটি আদর্শের ভাব তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছে। দেশের ও দেশের কাজে তাঁর স্বাভাবিক অহুরাগ। নারী-শিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠাত্রী লেডী অবলা বহু তাঁর কর্মের প্রারম্ভে একদিন আমাকে বলেছিলেন, “দেশের জন্ত প্রাণ দিয়ে খাটতে পায়ে কম বয়সের এমন ছাত্রটি শিক্ষিতা মেয়ে খুব দরকার দেশের কাজে। একজনকে দেখছি, যার প্রাণে সত্যিকার সাড়া আছে ঐ কাজের। তাঁকে জুড়তে হবে আমাদের মধ্যে। কর্মে তাঁর স্বতঃপ্রবৃত্ত অহুরাগ। সেটা যেন তাঁর প্রাণের ধর্ম। আমি তাঁকে কর্মক্ষেত্রে পাব, আশা করে রয়েছি বড় শক্তিমতী মেয়ে সরোজনলিনী।” লেডীবহুর হয়তো কথাগুলি মনে নাই, কিন্তু আমার আছে। কর্ম-প্রচেষ্টা অনেকেরই মধ্যে জাগে কিন্তু সেটি ধরে থাকার মত প্রাণ-শক্তি সকলের মধ্যে নাই। যেখানে সেটি থাকে কর্ম সেখানে অল্প থেকে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়।

সরোজনলিনীর কর্ম তাঁর জীবিতকালে অল্পেরে দেখা দিয়ে তাঁকে ছেড়েও যেতে রইল তাঁর প্রিয়তম স্বামীর ও দেশবাসী পাঁচজনের চেষ্টায়, যত্নে। আমরাও কাজের ক্ষেত্রে পেয়ে

স্বখী হয়েছি এই প্রতিষ্ঠানে। অন্তরের আনন্দ না পেলে আমরা কখনই এ কর্মে জুড়ে থাকতে পারতাম না এতকাল। দেশের প্রিয় কথাদের আহ্বান করছি, তাঁরা নিঃসংশয়চিত্তে এই কর্মভার গ্রহণে অগ্রসর হোন, নিষ্ফল হবেন না।

অপরিচিতা

বড়দিনের ছুটির ফাঁকে রেলপথে কমতি ভাড়ার সুযোগ পেয়ে সুবিধা থাকলে অনেকেই দূর-নিকট নানা স্থান দেখে এসে খুসী হন। ধারা হাত-পা-বাড়া মানুষ, তাঁরা যান-ই।

এবার বড়দিনে রেলপথে যাবার সময় একটি নৃত্যাতর দৃষ্ট দেখে মনটা বেশ একটু খুসী হয়ে উঠেছিল। হাবড়া থেকে একজন প্রবীণা ইংরাজ মহিলা ছাড়া কামরায় আর কেউ সঙ্গী ছিল না। আসানসোলে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর দরজাটা খুলে গেল—খাঁচার পর খাঁচা উঠতে লাগল কুলীর হাতে। ক্রমান্বয়ে নয়টি খাঁচা উঠলো দেখে অবাক। প্রত্যেক খাঁচার গরম কাপড়ের ঘেরা-টোপ। কোন মানুষের এমন মাল উঠছে, এতগুলো খাঁচা নিয়ে কে চলেছে দেখবার জ্ঞান মনটা উৎসুক, চেয়ে আছি দরজার দিকে। ওভারকোট গায়ে একটি মেয়ে উঠলেন, চুলগুলি কাল রেশমের জাল দিয়ে আটকান। মাথায় টুপি পরা বা ওড়না দেওয়া নয়। চেহারা দেখে ধরা যায় না মেয়েটি কোন জাতি। প্রকাণ্ড বিছানার প্যাকেট, দুটি স্টকেশ, দুটি বাস্কেট, দুটি বড় বড় চুপড়ী, তাতে ম্যাগেজিন, কমলালেবু, আপেল, কর্কড্রু গেলাস ইত্যাদি পথ চলার নানা সরঞ্জাম। শেষে একটি ভাল জাতের দামী কুকুর সঙ্গে উঠলেন আর একটি মেয়ে—তাঁর পোষাক পুরুষের মত প্যান্ট পরা, গায়ে ওভারকোট। মাথায় কোন কিছুই ঢাকা নাই। এতগুলি জীবজন্তু সঙ্গে নিয়ে একটু নতুন ধরণের চেহারার মেয়ে দু'টি কোথা থেকে কোথায় চলেছে, বোঝা গেল না। জাল-মাথায় মেয়েটি এসে বসলো আমার পাশে, অতট প্রবীণা ইংরাজ মহিলার পাশে অত বেঞ্চে বসতে গেল। গাড়ী ছাড়ল—পাশের মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকাল দু-তিনবার, শেষে

বল্ল, এতগুলো খাঁচা চুকিয়ে আপনাদের অসুবিধা করলুম নাকি? দাঁড়ান, পাশের মুখ ধোবার কামরায় এগুলোকে রেখে আসি—বলে একটার পর একটা খাঁচা ভরতে লাগল মুখ ধোবার ছোট কামরাটিতে। দুই-হাতে দুটো খাঁচা নিয়ে যায় আর বলে—জানেন, এতে পাখী আছে—চমৎকার পাখী; লোভ সামলাতে না পেরে কিনে নিয়ে যাচ্ছি দেশে। নিজেদের চেয়ে এদের যত্নে রেখেছি। কোয়েটায় নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখাব। নটা খাঁচার চৌদ্দটা পাখী আছে।

এই প্রথম শুনলুম তারা কোয়েটার বাতী।

—তোমরা বুঝি কোয়েটার লোক?

—না, আমরা কোয়েটার লোক নই, সেখানে কাজ করি—আমরা ভারতীয়।

• একটু বিশ্বয়ের সঙ্গে বল্লুম, ভারতীয়? ভারতের কোন প্রদেশে বাতী?

—সে অনেক পরিচয়; পিতামহ আমার আমেরিকান। পিতামহী আমেরিকাবাসী রেড ইণ্ডিয়ান। বিবাহ করে তাঁরা ভারতে চলে আসেন, দাক্ষিণাত্যে বাস করেন। বাবা আমার বিয়ে করেন খাঁচা বাঙ্গালী মেয়ে। আমি তাই অন্ধকথানা বাঙ্গালী। বাঙ্গালী দেখলেই মাকে মনে পড়ে ও বাঙ্গালীকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়।

এই দুটো কথায় তার দিকে আমার মনটা কেমন আকৃষ্ট হল। মেয়েটির ধরণটা কেমন বাঙ্গালী-বাঙ্গালী, যদিও মুখের ভাষা ইংরাজি এবং চেহারাটা মিশল খাঁচার। কথা কয়ে অপরিচিতের সঙ্গে ভাব করার ধাত তার বাঙ্গালীর মত। বল্ল—মা আমার ছিলেন বাঙ্গালী খৃষ্টানের মেয়ে, ফিরিঙ্গী খৃষ্টানের স্ত্রী, কিন্তু বাঙ্গালীমানার অভ্যাস ছাড়েন নি তিনি এতটুকু। আমি মানুষ হয়েছি বোম্বাইএ, সেখানকার স্কুল কলেজেই আমার শিক্ষা। আই-এ পাশ করে গভর্ণমেন্ট-বৃত্তি পেয়ে আয়ারল্যান্ডে চার বছর থেকে ডাক্তারী শিখে এসেছি, গভর্ণমেন্ট আমাকে বেলুচিস্থানের রাজধানী কোয়েটার হাঁসপাতালে চাকরী দিয়েছেন, সেই থেকে কোয়েটাবাসিনী হয়ে রয়েছি। কোয়েটায় ফল দুধ প্রচুর, মাংস সস্তা, হাতে গড়া রুটি খায় সুস্বাদু, ভাতের কেউ মুখ দেখে না। বয়স আমার পঁয়ত্রিশ, মাইনে পাই তিনশ—অভাব নাই

কোন দিকে। কোয়েটায় ভয়ানক শীত, শীতের সময় তিন মাস পাই ছুটি বছরে—জাপান, চীন, যাক্স, বালী, সুমাত্রা, আগেই দেখে এসেছি, এবার সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখতে এসেছিলুম। আগামী বর্ষে যাব আফ্রিকায়, সেখানে আমার এক মহিলা বন্ধু আছেন।

মেয়েটির আলাপিত্তা স্বভাব দেখে আমি তো অবাক—তার উপর টান না হয়ে যায় না। আমাকে বলে, চলুন না কোয়েটায়, নতুন দেশ দেখে আসবেন। ভারতবর্ষের পাশেই তো! এই দেখুন, আমরা কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছি পৃথিবীর চারদিকে—যখন যে-দিকে খুসী।

বল্লম,—আমারও ঘোরার সাধ কম নয়। বৃদ্ধ বয়সে আমিও ঘুরে বেড়াই যখন যেদিকে সুবিধা পাই। আমার ইউরোপ ভ্রমণের কথা শুনে সে উল্লসিত হয়ে উঠল খুব। বল্লম—আমি কন্টিনেন্টে যেতে পারি নাই, একবার যাব। তার ডান হাতে আট গাছা সোনার চুড়ী, অঙ্গ হাতে রিষ্টওয়াচ বাঁধা। বল্লম,—এ চুড়ী ক'গাছি অবিকল বাঙ্গালী প্যাটার্নের। বাঙ্গালী মেয়েদের হাতে এই নমুনার চুড়ী সর্বদা দেখতে পাই। এ নমুনা তুমি পেলে কোথায়!

—এ চুড়ী আমার মায়ের হাতের। একে খুলিনা আমি কোন দিন। মাকে মনে রাখি এই চুড়ী ক'গাছি পরে। মা আমার মারা গেছেন চার বছর হোল।

এই আধা-বাঙ্গালী মেয়েটি আমার মনটা টেনে নিল অনেকখানি তার দিকে। মনে হোল, বলি—বাংলাদেশে কয়েকদিন থেকে যাও। কিন্তু সে তখন চলেছে কোয়েটার দিকে, কোয়েটা পর্যন্ত টিকিট কেনা। জিজ্ঞাসা করলুম,—বিবাহ কর নাই?

—না।

—কেন?

—ইচ্ছা নাই, বেশ আছি।

আমাকে মধুপুরে নামতে হোল, আমার সময় মেটে আমার হাত ধরে বল্লম—মনে রাখবেন, কোয়েটা আসবেন।

একখানা রুমাল আমাকে দিতে চায় তার স্বরণচিহ্ন। বল্লম, রুমাল না থাকলেও তুমি আমার মনে থাকবে।

বাড়ী এসে মনে ভাবলুম, এই বাঙ্গালী-মনেঘোষা মেয়েটি আমার 'বড়দিনে'র বড় লাভ।

অমৃত বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরিন্দাস মজুমদারের উদ্যোগে কলিকাতার উপকণ্ঠে দমদমের নারায়ণপুর-কলোণীতে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে "অমৃত বিশ্ববিদ্যালয়"। আগামী অক্ষয় তৃতীয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত বিবরণ পরে পাঠক পাঠিকাদের যথাসময়ে জানাব।

স্বর্গীয়া নির্মলা সোম

গত ৮ই জানুয়ারী দেশের খ্যাতনামা বিদূষী কন্যা নির্মলা সোম পরলোক গমন করেছেন। শ্রীশিক্ষার প্রথম যুগে বারা শিক্ষার উচ্চ শিখরে উঠতে পেরেছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। সাহিত্য-সাধনাতেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল, তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সুগৃহিণী ও সুমাতা ছিলেন। ধর্মবিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল, তিনি খৃষ্টকে পরিজ্ঞাতা বলে বিশ্বাস করতেন। সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির প্রধানা মহিলা কর্মিনী, অগ্রতমা কুমারী নীরজবাসিনী সোমের তিনি মাতা। দুই কন্যা, একটি পুত্র, একটি পৌত্র ও একটি পৌত্রী তিনি রেখে গেছেন। আমরা তাঁর শোককৃতপ্ত সন্তানদের অঙ্গ দ্বন্দ্বের আশীর্বাদ প্রার্থনাকরি ছিলাম।



মধ্য আমেরিকার আনুষ্ঠানিক ধর্ম-প্রেরণা

শ্রী অপরূপকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শতাব্দী অতীত হইল। অধুনা স্পেন বৃহৎ উপনি-
বেশিক শক্তিরূপে গন্য না হইলেও, সমগ্র মধ্য আমে-
রিকা ও মেক্সিকোর মধ্যে যে স্বচ্ছ এবং তীক্ষ্ণ স্মৃতিচিহ্ন
রাখিয়া গিয়াছে তাহা কালক্রমে কোন দিন নিশ্চিহ্ন
হইবে না। সমগ্র দেশটি ছিল তাহাদের অধীনস্থ।
ইংরাজ এবং ওলন্দাজগণ তাহাদের প্রজাপুঞ্জের
ভিতর রাখিয়া গিয়াছে স্ব স্ব সভ্যতার ছাপ কিন্তু
স্প্যানিয়ার্ডদের ত্রায় এ জাতির ভিতর তাহারা
শৌর্য্য, অদম্য উৎসাহ, দৃঢ় সঙ্কল্প প্রভৃতি সদগুণরাজি দিতে
পারে নাই। আমাদের দেশেরও অবস্থা দেখিয়া মনে
হয় ইংরাজের আইন কাছন, ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যবহারিক
কুশলতা, শাসন সংক্রান্ত দক্ষতা এবং ভাবাই কেবলমাত্র
ভবিষ্যত স্বাধীন ভারতে থাকিতে পারে। আর কিছুই
থাকিবে না। আলডুস হাক্সলি তাই বলিতেছেন—
“A hundred years after their independence
one would find in the habits of the
Indian people almost no trace of our long
occupation of the country.” স্বাধীন ভারতে
ওলন্দাজের বৈশিষ্ট্য পাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু অধুনা
ব্যাটাভিয়া অথবা সিঙ্গাপুর হইতে যাত্রা করিয়া বোম্বাইর
উপকূল, এমন কি দক্ষিণ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জস্থ সুদূর
জেলো পর্যন্ত যাইলে মেক্সিকোর ‘চারো’ পোষাক
পরিহিত মালয়দিগকে রাস্তাঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়।
মানিলায় গেলে দেখিতে পাওয়া যায় ফোর্ডকার এবং
গণতান্ত্রিক মার্কিন আচার ব্যবহার সৌজন্য। এসবের
ভিতর একটু নজর করিলে বুঝা যায় স্পেনীয় প্রভাব
কিরূপভাবে বিদ্যমান। মধ্য আমেরিকায় স্পেনীয় প্রভাব
খুব বেশী। গুয়াতেমালা মেক্সিকোর কতিপয় জেলার
অধিবাসীদিগের দশজনের মধ্যে অন্ততঃ নয় জনের দেহে
খাঁটি রেড ইণ্ডিয়ান রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু
এইসব বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে। এবং
সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় পোষাক পরে। সভ্যতর জেলা-

গুলিতে বিশেষতঃ মেক্সিকোর উনবিংশ শতাব্দীর ছাঁটকাট
অল্পসারে পোষাক তৈয়ারী হয়। পুরুষেরা কার্পাস নির্মিত
সাদা জ্যাকেট ও ট্রাউজার পরে এবং মেয়েরা লম্বা ঝুলের
স্কার্ট পরে। মেয়েদের মাথায় ল্যাক্সাসারের তৈরী শাল
জড়ানো থাকে। দেশের দূরাঞ্চলে সর্বাপেক্ষা গুয়াতে-
মালায়, এখনও লোকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর স্পেনীয়
কুশাণ পরিচ্ছদ পরিতে অভ্যস্ত—পরম্পরাগত ‘স্যাফো পাফা’
বগু-যোদ্ধা এবং ‘গয়া’ দস্তায়ে পল্লীগুলিতে এরূপ পরিচ্ছদ
বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। তাহাদের জীরা অতি প্রাচীন ধরণের
পোষাক পরে। সে পোষাকের মধ্যে ইউরোপীয় প্রভাব
নাই। গুয়াতেমালার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মেয়েদের পোষাকে
স্বাতন্ত্র্য আছে। বিজেতাদের প্রভাব তাহাদের পোষাক
পরিচ্ছদে পাওয়া যায় না। সংখ্যালঘিষ্ঠ মেয়েদের আচার
ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ এবং রীতিনীতিতে স্পেনীয় ভাব
পরিমল্লিত হয়। ইণ্ডিয়ানদের আর্ট এবং শিল্পবিদ্যায়
ইউরোপীয় প্রভাব বিদ্যমান। সঙ্গীতে এবং ভাস্কর্য্যে
তাহার বিচ্যুতি ঘটে নাই।

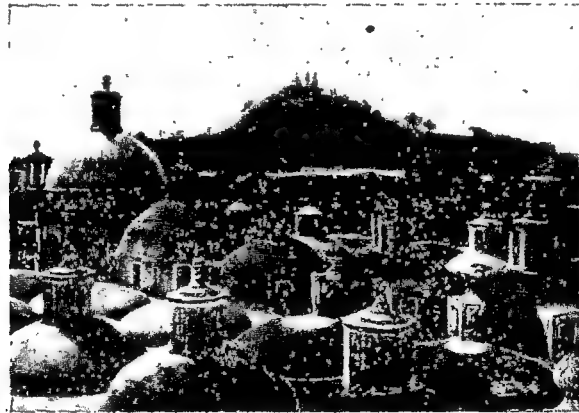
একশত বৎসর এবং তাহারও কিছু বেশী দিন হইল,
মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার পাঁচটি গণতান্ত্রিক রাজ্য
স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু দূরগত স্পেনীয়দের অতীত কৃষ্টি
এখনও দেশবাসীর অন্তর্লোকে অধীশ্বর হইয়া রহিয়াছে।

কেন যে স্প্যানিয়ার্ডরা তাহাদের প্রজাপুঞ্জের হৃদয় জয়
করিয়াছিলেন তাহা অব্বেষণ করিলে বেশীদূর যাইতে হয়
না। বিজেতার ধর্ম প্রচারকও ছিলেন। তাহারা
তাহাদের বিজিত শত্রুদিগকে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত
করিয়াছিলেন। ইংরাজরা কোন কোন সময়ে উত্তর
আমেরিকাতে তাহাদের শত্রুদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়া-
ছিলেন আবার কোন কোন সময়ে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন
পূর্বক তাহাদিগকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে বাধ্য করিয়া-
ছিলেন। কোন জাতির জীবনের সমগ্র পথ পরিবর্তন
না করিলে তাহার ধর্মের পরিবর্তন করা যায় না—

বিজিতকে প্রেম না দিলে বিজিতার কোন উদ্দেশ্যই সাফল্য
মণ্ডিত হয় না।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মালয়গণ, জুকাতানের মায়া
মেস্কিকো এবং আমেরিকার বহুসংখ্যক ইণ্ডিয়ান জাতির
ক্যাথলিক ধর্মভুক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্পেনীয়
প্রভাব গভীরভাবে রহিয়াছে। ব্যাপকভাবে ধর্মপরিবর্তনের
কোন অবলম্বনই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না যতক্ষণ
পর্যন্ত ধর্মান্তর গ্রহণকারীগণকে অল্পবিস্তরভাবে আনুষ্ঠানিক
ব্যাপারে উদার অনুমোদন না দেওয়া হয়। এই উদার
অনুমোদন ছিল বলিয়া পৌত্তলিক ইউরোপকে খৃষ্টধর্ম
করায়ত্ত করিতে পারিয়াছিল। জনপ্রিয় পৌত্তলিক পাল-
পার্কনের অনুষ্ঠান এবং দেবতাদিগের পূজাগুলিকে যতদূর
সম্ভব রাখা হইয়াছিল। প্রাচীন পরিভ্রম দিনগুলিতে পাল

হয় তত্ত্বাস্থানে ইউরোপীয় ইতিহাসের বিগত অধ্যায়ের
চিত্র প্রতিভাত হইতেছে। ইউরোপে সহস্র বৎসর পূর্বে
যে রূপভাবে ধর্মপ্রচারকগণ খৃষ্টধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া
পৌত্তলিকতার কতিপয় পালপার্কণ ও আচার্য্যগণ
বজায় রাখিয়াছিলেন। ঠিক সেইরূপই, চারিশত বৎসর
পূর্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারক গণ আমেরিকাতে স্থানীয়
জনপ্রিয় পৌত্তলিক পালপার্কণ গুলিকে খৃষ্টধর্মের
অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন—খৃষ্ট এবং তাঁহার অসংখ্য
শিষ্যগণের লীলামাহাত্ম্যে চৈতন্যশক্তিতে উজ্জ্বলিত
করিয়া। তাঁহারা স্থানীয় কুসংস্কারগুলির মূলচ্ছেদ করিবার
দৃঢ়সংকল্প করেন নাই। এমতাবস্থায় সমগ্র দেশব্যাপী খৃষ্ট-
ধর্মের কীর্তন ধ্বনি সে সময়ে গগন পবন মুখরিত করিল।
কুসংস্কারগুলি বজায় রাখিয়াও ধর্মান্তর গ্রহণকারীগণের মন



পার্কণের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিয়াছে এবং এসব পাল
পার্কনে কোন না কোন খৃষ্টান সাধু মহাত্মার নাম যুক্ত
হইয়া আসিয়াছে। তাই খৃষ্টান জগতে দীর্ঘকালস্থায়ী
স্থানীয় পাল পার্কনের উৎসব অনুষ্ঠান দেখা যায়।
কাষ্ঠাদির পাতলা পাত দিয়া তাহাতে খৃষ্টধর্মের প্রতীক
রাখিয়া দেবতাগণকে শিরস্ক প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত পূর্বক
পাল পার্কণ অনুষ্ঠিত হয়। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়
খৃষ্টান জগতে এখন সম্পূর্ণরূপে পৌত্তলিক প্রভাবমুক্ত হইতে
পারে নাই।

স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতেও ঠিক এইরূপ ব্যাপার
চলে। মধ্য আমেরিকা এবং মেস্কিকো ভ্রমণ করিলে, মনে

সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। ইউরোপেও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা
হইয়াছিল। প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মগুলির ভাবধারা বহু-
দিন ধরিয়া ইউরোপে শীর্ণানদীর ত্রায় প্রবাহিত হইয়াছিল।
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ডাইনি ধর্মমত চলিয়া আসি-
য়াছে। আমেরিকাতেও ক্যাথলিক ধর্মের পার্শ্বে অবৈজিত
যুগের পৌত্তলিক ধর্মমতের প্রাণধারাকে পাওয়া যায়।
ডাইনি ধর্মমতের মূলোৎপাটন একেবারে সম্ভব হয় নাই।

বহু পর্য্যটক এবং অতি আধুনিক পেশাদার নৃতত্ত্ববিদ-
গণ মেস্কিকো এবং আমেরিকার বর্তমান বংশধরগণের
প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু
ইহাদের অপ্রণালীবদ্ধ জীবনের কোন দিকটাই ঠিক বুঝিয়া

উঠিতে পারেন নাই। মেক্সিকোর সমস্ত ষ্টেটগুলিতে ধর্ম-যাজকদিগের প্রভাব খর্ব করা হইয়াছে এবং একত্র ‘এন্টিকারি কাল লেজিসলেশান’ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মধ্য আমেরিকার সর্বত্র ধর্মযাজকদিগের সমস্ত শক্তি প্রতিহত করা হইতেছে। পুরোহিতের সংখ্যা খুবই অল্প এবং গির্জার কর্তৃপক্ষগণের কোন শক্তি নাই। তাঁহাদিগের আদেশ অমান্য হইতেছে। ইহারা ধর্মযাজক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে আইন-প্রযোজনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য হইতেছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি



মধ্য আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানদের দেবমূর্তি

নীতি হইতে ইণ্ডিয়ান কৃষক সম্প্রদায়কে মুক্তি দেওয়া। তাঁহারা চাহিয়াছেন দেশ হইতে ধর্মের গোঁড়ামীকে লোপ করিতে কিন্তু তাহার ফলে সর্বশক্তি সম্পন্ন গির্জার অল্পশাসন-ভীতি মুক্ত হইয়া ইণ্ডিয়ানেরা অধুনা একপ্রকার কুসংস্কারেই আচ্ছন্ন থাকে নাই, আর একটি কুসংস্কার ইহাদের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। একদিকে ইহারা যেমন গোড়া ক্যাথলিক তেমনি পূর্বের ন্যায় পৌত্তলিক হইতেছে। একথা সত্য,

ইহারা সর্বদাই ক্যাথলিক এবং পৌত্তলিকরূপে জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু যে সময়ে গির্জার শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, সে সময়ে ইহাদিগকে গুপ্তভাবে পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপাদি করিতে হইত। এখন গির্জা এবং পাদ্রীরা শক্তিহীন হওয়ায় প্রকাশ-ভাবে ইহারা পৌত্তলিক আচারানুষ্ঠান পালন করিতেছে।

পুরোহিত-শূন্য অসংখ্য গির্জা এতদ্দেশে ম্লান হইয়া রহিয়াছে। একদিন যেখানে প্রত্যেক রবিবারে সম্ভো-পালনার ঐক্যকণ্ঠ ধ্বনি উঠিত সেখানে আজ রিবার্ট স্তব্ধতা, সমাধিক্ষেত্রের ন্যায় রাহিয়াছে। ক্যাথলিক পাল পার্কণের অল্পশাসন হয় না বলিলেই চলে, যদিই বা হয়, তাহা ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

গুয়াতেমালা এবং মেক্সিকোর কতিপয় অঞ্চলে পৌত্তলিক যুগের পুনরুদয় ঘটিয়াছে। মোমোস্টেনানগো নামে উত্তর গুয়াতেমালায় একটি নাগরিক প্রদেশ আছে। অন্যান্য মধ্য আমেরিকার সহর বা গ্রামের ন্যায় ইহারও অসংখ্য গির্জা আছে। ইণ্ডিয়ানেরা এখানে আসিয়া প্রার্থনা করে এবং বাতি জালায়। কিন্তু সহরের চতুর্দিকে জঙ্গল এবং মৃত-স্থানগুলিতে কয়েক শত গৈয়ো বেদী ও বন্য স্তূপ আছে। এ সব স্থানে ইণ্ডিয়ানদের ‘মুণ্ডো’ নামক দেবতার পূজা হয় (মুণ্ডো মানে ধরিত্রী) এই দেবতা প্রাচীন কুইচি-মায়্যা দেবতার অল্পরূপ। ‘হুরাকানের মতে, কুইচি-মায়্যা দেবতার অর্থ ধরিত্রী-হৃদয়। (মোমোস্টেনানগো এবং ইণ্ডিয়ানদিগের অন্যান্য বসতি-কেন্দ্র গুয়াতেমালার পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। মায়্যাসভ্যতার যুগস্থ প্রাচীন সাম্রাজ্যের আসন ছিল পর্বতগুলি এবং কারিবীয় জেলার মধ্যস্থ নিম্নভূমিতে। অধুনা ইহা সম্পূর্ণভাবে মানবের বসতিশূন্য। কুইচি এবং কাক্চি কুইয়েল জাতিরা আলভারাদো কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। ইহারা মায়াদিগের দীন আত্মীয়বর্গ। ইহাদের নিজস্ব সংস্কৃতিও দেখা যায়। এই সংস্কৃতি মায়াদিগের সংস্কৃতি হইতে নিকৃষ্ট। পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থিতি অসংখ্য আছে কিন্তু নিম্নতম প্রদেশগুলিতে অবস্থিত অপূর্ব প্রাচীন মায়্যা সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষগুলির সহিত তুলনার উপযোগী নহে। মোমোস্টেনানগো বেদীগুলির উপর কোন প্রতিমা নাই। মুণ্ড দেবতা এসব বেদীর আকর্ষণ শক্তি মাত্র; তিনি নিয়মিতভাবে পূজা পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট

প্রার্থনা করা হয়। ইহারা পূজার পৌরহিত্য বিশিষ্টবংশানুক্রমিক ধারায় প্রেতবিদগণ পাইয়া থাকে। নাগরিক জীবনের মধ্যে ইহাদের প্রভাব বিশেষরূপে দেখা যায়। প্রত্যেক দুই শত ষাট দিন অন্তর তিন দিন ব্যাপী মুণ্ডা দেবের বিরাট পূজাপার্বণ চলিতে থাকে। মায়াদিগের পঞ্জিকা প্রোক্ত তিথিনুক্রমায়ী দিন না দেখিয়া একরূপ পূজাপার্বণ হইয়া আসিতেছে। সহস্র সহস্র ইণ্ডিয়ান দূর হইতে এই পার্বণে যোগ দিতে আসে। বেদীগুলিতে উপাসনা হয়, আবার বেদীতেও মুণ্ডা দেবতার উপাসনা হইতেছে। গির্জায় গিয়া অসংখ্য 'মুণ্ডাভক্ত' গির্জার পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার এবং প্রায়শ্চিত্ত করে।

অত্যন্ত জায়গায় খুঁটান এবং পৌত্তলিক ধর্মমতের সংমিশ্রণোদ্ভূত প্রতীক চিত্র বহু বেদীতে দেখা গিয়াছে। চিচিক্যাসটোনগোর নিকট বনানীতে একটি অদ্ভুত বেদী আছে। সেখানে দুইটি আড়াআড়ি প্রস্তরের উপর কুইচি দেবতার পুত্তলিকা রহিয়াছে। ক্রুশের উপর কুইচি দেবতার প্রতিমা দেখিয়া খুঁটান এবং পৌত্তলিক ধর্মের সম্মেলন বলা যাইতে পারে। যাহার যাহা মানত থাকে, সে তাহা দিয়া ইহার পূজা দেয় এবং ইহার প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। ঘন অরন্যানী বেষ্টিত দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলেও গভীর সন্ধীর্ণ গিরিসঙ্কটে দেবতার বেদী আছে। এখানে শ্বেতাঙ্গগণ এখনও পদার্পণ করিতে পারেন নাই। এসব পবিত্র তীর্থস্থানে ইণ্ডিয়ানগণ অপর কাহাকেও লইয়া যাইতে পছন্দ করে না। এসব তীর্থে দেবতা নাকি অন্যজাতির পদার্পণ চাহেন না।

বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান নাগরিক অঞ্চলে সাময়িকভাবে পৌত্তলিক পর্বাছুষ্ঠান হয়। এসব অনুষ্ঠানে নৃত্য হয়। যখন গির্জার অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল, তখন এসব নৃত্যের অনেকগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। সেগুলি গুপ্তভাবে সংসাদিত হইত। গির্জার ক্ষমতা বর্জনের পর হইতে গ্রামে গ্রামে সর্বপ্রকার প্রাকযুগ নৃত্য হয়। কতিপয় নৃত্য অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ। সপ্তদশ শতাব্দীর স্পেনীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিহিত পুরুষেরা নৃত্য করিতে থাকে এবং ইহার সঙ্গে যে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা আছে, তাহা সম্পূর্ণ ইউরোপীয়।

গির্জায় যাজকেরা নিয়মিত ভজন ও প্রার্থনা করেন বটে কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা কদাচিৎ যাইয়া থাকে। গির্জার সমীকটস্থ সব শ্বেতাঙ্গ এবং অর্ধশিক্ষিত মোসটিজও আছে, তাহারাই যাজকদিগের সহিত সম্ভোপাসনা যোগ দেয়। বিবাহ বা অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময়ে ইণ্ডিয়ানরা ক্যাথলিক পুরোহিতে ভাঙে না। তাহার পৌত্তলিক রীত্যানুসারে এসব কাজ সম্বাহ করিয়া থাকে এবং তাহাদের মতে এই পৌত্তলিক রীতিই নাকি স্মন্দ। অথচ তাহার গির্জায় গিয়া ষষ্ঠার

পর ষষ্ঠা ধরিয়া ভক্তি গদ গদ চিতে ধ্যান ও প্রার্থনা করিতে কুষ্ঠা বোধ করে না—খুব চমৎকার বটে!

বিভিন্ন ধর্মভ্রাতৃত্ব সম্মেলনের অধিবেশন বহুস্থানে হইয়া থাকে। প্রত্যেক ধর্মভ্রাতৃত্বের মধ্যে একজন বৈশিষ্ট্য সেন্টের ধর্মমতের প্রতি অতুরক্তি বিদ্যমান। প্রত্যেক পল্লী গির্জায় সেই সেন্টের প্রতিমূর্তি রক্ষিত থাকে। বিশিষ্ট উৎসবের সময় সেই প্রতিমূর্তিকে শোভাযাত্রা পূর্বক গির্জা হইতে ধর্মভ্রাতার বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। প্রত্যেক উক্ত প্রতিমা কয়েক ঘণ্টা বা দিবস ব্যাপী থাকে। এই পুণ্যস্থান সেন্টকে লইয়া তাহার যে সব অনুষ্ঠান করে সেগুলি ভিতর যে কি অর্থ বা উল্লেখ আছে, তাহা বুঝা যায় না।



গভীর অরণ্যে দেবমূর্তি

অথচ তাহার নাম মাত্র সংশ্লিষ্ট। গুয়াতেমালার পল্লী অঞ্চলে সেন্টপিটারের আদর বেশী। এখানকার ধর্মভ্রাতৃত্বের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপগুলি দেখিয়া যদি নৃত্যবিদগণ নিমিত্ত গবেষণা করেন তাহা হইলে তাহার ইণ্ডিয়ান জাতির অন্তর্নিহিত রহস্যাদ্বাটন পূর্বক আমাদিগের কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে পারিবেন। মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা কিরূপভাবে ধর্মের আকাজক্ষা বা উচ্চ ভিত্তি পূর্ণ করিবার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তাহাই বর্তমান ক্যাথলিক চার্চের প্রকাণ্ড সমস্যা ও বিষম চিন্তা উপস্থিত করিয়াছে। 'এন্টিকারিকাল লেজিসলেশনের ফলে সমস্ত ইণ্ডিয়ান জগৎ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ ধর্মগুরুগণের চিন্ত আন্দোলিত হইতেছে। পৌত্তলিকযুগের পুণ্যস্থান ষষ্ঠাতে চিন্তারই কারণ বটে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে মন্তব্য

সাধারণ ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য, স্ফূর্তি, বৈচিত্র্য এবং কথাসুসরণ। মামুলী বাঙ্গালা গানের সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্য এই যে, সেকালে গান প্রচলিত হিন্দী রাগ-রাগিনী, অথবা প্রচলিত বাউল কীর্তনের সুরে রচিত হত। কথার চেয়ে সুরের উপরেই রচয়িতার নজর থাকত বেশি, বিশেষ রাগরাগিনীর ক্ষেত্রে। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীত-প্রতিভা রাগরাগিনীর বন্ধন মেনে নিয়েও কথার মধ্যদা অস্বীকার করেনি; সুর ভাল ও কথা মিলিয়ে প্রত্যেক গানকে একটা বিশেষরূপ দেবার চেষ্টা করেছে, রাগরাগিনীর শ্রেণীগত বা জাতিগত রূপ না ফুটিয়ে প্রতি গানের ব্যক্তিত্ব বিকাশে যত্নবান হয়েছে। প্রথম বয়স থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার অভিব্যক্তি দৃষ্টান্ত সহ দেখাতে পারলে সন্দেহ হয়; কিন্তু দেখানোর উপযুক্ত লোক ছিল। তিনি নিজে বলেন যে তাঁর আগেকার গান emotional, এখনকার গান esthetical; অথবা আগেকার গানে আছে expression। এখনকার গানে imagination।

তাঁর সঙ্গীতের টীকাকার দেখতে পারেন এই নির্দেশ থেকে কোন সাহায্য পান কিনা। খাঁটি হিন্দী ওস্তাদী সঙ্গীতের আবহাওয়া তিনি অল্পবয়স থেকেই পেয়েছেন, সেটা ভুললে চলবে না। আর খাঁটি বাঙ্গালা বাউল কীর্তনের প্রভাবও তাঁর সুরের উপর যে খুব বেশি তা তাঁর সঙ্গীতালুরাগীমাত্রেই জানেন। ইংরাজী সঙ্গীতের সঙ্গেও তাঁর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে;—তবে তার প্রভাব তিনি স্বীকার করেন না বা বিশেষ বোঝাও যায় না। তাঁর “সঙ্গীতের মুক্তি” নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর নিজের মত পাওয়া যায়। লোকের বিশ্বাস তিনি শুধু হালকা তিন চার মাত্রার তালে গান রচনা করেন, কিন্তু তিনি নিজে বলেছেন, এই ক’টা তাল গানে ব্যবহার করেছেন।—রূপক, রূপকড়া, ঝাঁপতাল, বস্পক, একতাল, কাওয়ালি ঠুংরি, আড়াঠেকা, দুই একটা চৌতাল, দাদরা, ষৎ, কাম্বীরী খেমটা, একাদশী ও নবতাল (নবমী) তান

শ্রীহিন্দ্রা দেবী চৌধুরাণী

তিনি তেমন ব্যবহার করেন না। মীড় বা খোঁচের দ্বারাই সুর অলঙ্কৃত করেন। সকলের গলায় সেগুলি ভাল আসে না বলে অনেক মনে করে তাঁর গান বেশি সহজ সরল। কিন্তু তান যে তিনি একেবারে ব্যবহার করেন না, তা নয়। (দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে) তবে সে তান সুরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; গায়কের ইচ্ছাধীন অলঙ্কার নয়।

এ স্থলে আলোচনা ও বিবেচনা করা যেতে পারে। এবং আমার মনে হয় করবার সময় এসেছে যে, তানের সঙ্গে বাঙ্গালা গানের সম্বন্ধ কি ও কতখানি। হিন্দী যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীতে তান বা বিস্তারের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। যন্ত্র সঙ্গীতে বিস্তারিত আভাবিকই, সেখানে সবই সুরের খেলা। আর কণ্ঠসঙ্গীতে কথাকে এত নীচে আসন দেওয়া হয় যে তাকে অতিক্রম করতে সুরের কিছু বাধে না। কিন্তু বাঙ্গালা গানে কথাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সেগুলি শুধু স্বরবর্ণ বোঝাবার অর্থহীন পেরেক স্বরূপ নয়; সেগুলি জীবন্ত অর্থযুক্ত শব্দ,—তার অর্থ কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছাবার জন্য আঁকুবাঁকু করে। সুর সেই পৌঁছে দেবার বাহন। সুতরাং কথাকে ফেলে বেশি দূরে বা বেশীক্ষণ চলে যাবার এজ্জিয়ার তার নেই; বড় জোর ‘কাঢ়াকাছি বসে’ একটু আধটু হাঁক ছাড়তে বা খেলা করতে পারে। কিম্বা বেশ ভূষা থেকে আর একটা উপমা নিয়ে বলা যেতে পারে যে, বেশের অঙ্গকে ভূষিত করাই যথার্থ ভূষণের কাজ; অর্থাৎ বোতাম বা কোমর-বন্ধ বা জেব বা কোন রকম প্রয়োজনীয় বসনাংশকে ভূষিত করাই আসল অলঙ্করণ—অনাবশ্যকে এখানে ওখানে কতক গুলি দামী পাথর বা সোনা রূপা ঝোলানো বর্করতারই রূপান্তর। কথা বা ভাবের টানে স্বভাবতঃ যেটুকু তান আসে, সেটুকু তানই বাঙ্গালা গানে মানায় ভাল। তা’ ভিন্ন গান খামিয়ে অকারণে গলার কসরৎ বা রাগের রূপ দেখাতে গেলে সে গানের রসভঙ্গ হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে এই ছোট খাটো মানান সই তানের সূচনা দেখা যায়।

কিশোর গৌরাঙ্গ

৪র্থ অঙ্ক

নন্দে, গঙ্গার ঘাটের সম্মিহিত.

উদ্যান

রত্নগর্ভ; গদাধর, বাসু ঘোষ ও রঘুনাথ।

রত্ন... নিম্ন হোল কি ?

রঘুনাথ...তার মাথার গোল হয়েছে।

বাসু...সে তো সকলেই বোঝে, কিন্তু একেবারে উন্মাদ নাকি ?

রত্ন...তাই বই আর কি ? গঙ্গার থেকে আসা অবধিই এই ভাব।

গদা—এসে কেন ? সেইখান থেকেই ঐ রকম হ'য়ে এসেছে। ওর সঙ্গে যারা গেছেলেন তাঁরা বলছেন—সারাটা পথ কেবল কঁদে কঁদে এসেছে, উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি; “কে এলো কে এলো” বলে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়—কেবল কান্না, সে কান্না ফুরায় না। “তোমরা দেখেছ না ?” সঙ্গীদের বলে “আমায় কেন ধরে রেখেছ ? আমি আর সংসারে যাব না, আমি বৃন্দাবনে যাব,” এই বলে দ্বিধাদিক্ জ্ঞান নেই, ছুটতে থাকে। তাকে যে ক'রে তাঁরা ধরে এনেছেন, তাঁরাই জানেন।

বাসু ঘোষ—আচ্ছা, ওর মাথের কি অবস্থা ?

গদা...সে আর বলবার নয়। তার উপর সত্তা বিয়ে করা নূতন বউ। তার তো ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। নিম্ন পেছন পেছন খুঁজছে, মাকেই সামলাবে, না, স্বামীকেই ধরবে ! ভগবান কার উপর যে কি বিধান করেন।

বাসু...রত্নগর্ভ তুমি ও গদাই তো সর্বদা তাঁর কাছে থাক, সে কি বলে ?

গদা...বলবে আর কি ছাই, মাথা মুণ্ড ! বলে কেবল “দেখছি দেখছি, তোরা দেখবি না, কি ছাইপাশ দেখছিস, ঐ দ্যাখ,—লাবঙ্গামৃত পান না ক'রে তোরা ঘোলা জল খেয়ে মরছিস।” আমি বল্লুম “তুমি কি দেখেছ বল না।” সে বলে “আমি পাদপদ্ম দেখতে গেলুম গঙ্গায় বাবার পিণ্ড দিতে, তখন

ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ডি ডি টি

ঐ আমায় দেখা দিলে”, “কি ভাই কি দেখলে” ? তখন ‘বলছি’, ‘বলছি’ বলে চোখের জলে ভেসে গেল। আমার কাঁধ ধ'রে এলিয়ে প'ল। রত্নগর্ভকে ধরে বসে “শোন ভাই আমি দেখছি, এই শত কোটি চন্দ্র সূর্য্য যাকে দেখাচ্ছে, তোরা দেখতে পাচ্ছিস না ? এমনি অন্ধ !” রত্নগর্ভ বকে “বল না কি দেখেছ, দেখেছো কি ? “এই যে”—এই পর্য্যন্ত বলে ভাবাবেশে ওর কাঁধের উপর চলে পড়ল ও চোখের জলে ভেসে যেতে লাগল। কত ভাকতে লাগলুম, সাড়া নেই। দেহনির্গম। জলে ভাসা চোখ দুটি আকাশের দিকে, কি দেখে যেন আপনা হারা হ'য়ে গেছে।

(পাড়ার দুইটি বৃদ্ধার প্রবেশ) কাণে দলসী, তাঁরা গঙ্গায় জল নিতে এসেছেন)

গদা...(প্রথম বৃদ্ধার প্রতি) মাগো, নিমাই এখন কোমন ? ১ম বৃদ্ধা...কেমন আর, দস্তর মত ক্ষেপে গেছে ! কোন কথা নেই, ঘরের কোনে বসে বসে কেবল কাঁদছে। শচী নূতন বউটিকে এনে ওর কাছে বসিয়ে রাখেন, একবার চোখের কোণে ও তার দিকে ফিরে চায় না। কি সকল শ্লোক পড়ে ও কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বেশ অবস্থায় বাদে।

দ্বিতীয়া বৃদ্ধা...সে কি কান্না ! এত জলও ওর চোখে ছিল। কোথায় গেছে সেই আমলকী দিয়ে ধোয়া মালতীর মালা ঘেরা কোকড়ানো কেশ—ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, এমন হৃন্দর চুলে জটা ধ'রে গেছে। কোথায় সেই কৃষ্ণ কেলী ধূতি, স্বগন্ধি অগুরু চন্দন ! হৃন্দর সোনাগ মত অঙ্গ ধুলো বালি মাখা ! আর এতবড় পণ্ডিত বামুনের ছেলে, নিজে একজন মস্তবড় পণ্ডিত, লেখা পড়া ছাড় কিছু জ্ঞান না; এখন আর পুঁথিটুথির ধার দিয়ে ও যায় না। শালগ্রাম পুজোটা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। সন্ধ্যা আহিক জপ ছেড়েছে। সাবিত্রী জপে না; তুলসীর শূজা করে না। দিনরাত কেবলই বলছে “এই হৃন্দান, তোমরা টের পাছ না। এই রূপ দেখলে না ? কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অছিড় খেয়ে এখনও মাদীতে পড়ে। একটা পিণ্ডের ঘড়ার উপর পড়ে সে দিন হাতটার কতকটা কেটে গেল, সে দিকে ভ্রক্ষেপ নেই।

প্রথম বৃদ্ধা...এই রকমই হয়, একটা না একটা বলে পাগলেরা ক্ষেপে যায়। আমার বোনপো রামতনু ক্ষেপেছিল একটা বিড়াল দেখে, যে দিকে চায় সে দিকেই বলে ঐ বিড়ালটা আমার কামড়ে দেবে। আমার মর, ঐ যে এল এই বলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল, ও ভয়ে কুকুড়ে কুকুড়ে যেতে লাগল, দাদা ও বউদি কত করে বুঝালেন; সব বেড়াল বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, ওখানে বেড়াল কোথায়! তুই ভাল করে দ্যাখ। সে বললে 'না, ওই যে মা তোমার আঁচলের নীচে লুকায়ে রেখেছ। ঐ যে কাল মুখটা হ'তে জলন্ত আঙ্গারের মত দুটি চোখ বিকট হাঁটার ভিতর থেকে দাঁত গুলি দেখা যাচ্ছে। আমি মলুম, আমাকে রক্ষা কর। পাগল হলে এইরূপই হয়। কিছু না কিছু বন্ধে ক্ষেপে উঠে।

(তৃতীয়া এক প্রোটা রমণীর প্রবেশ)

প্রথমা...এই যে রাণীদি আসছে (তার দিকে চেয়ে) নিম্ন এখন কি কচ্ছে ?

রাণী। আর করবে কি ছাই! ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর দুহাত বাড়িয়ে কানে যেন ধরতে চাচ্ছে। কতবার উছটু খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। আবার 'কোথায় তুমি গেলে' তোমা ছাড়া আমি এক তিলও বাঁচব না, দাদা তোমায় পেয়েছেন, আমি পাব না, ওই যে কি সুন্দর হাসি! কি পাগল করা চাউনি, কি সুন্দর তুমি।" এই সকল প্রলাপ বকছে, আর ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছা যাচ্ছে। আমি বল্লম, দেখছ কি শচীদিদি, ওকে বেঁধে রাখ, ভাল কবরেজ দিয়ে চিকিৎসা কর। তোমার তো আর এখন পয়সার কন্মতি নেই, তার পর নিম্নর শব্দ মিশ্র ঠাকুর তো পেছনে আছেন, তোমার ছেলের মত এমন ছেলে সারা নদেতে আর একটি নেই। ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। দেখছ না! খাওয়া দাওয়া একবারে ছেড়ে দিয়েছে, অনাহারে অনিদ্রায় ঘরের কোণে বসে বসে কাঁদলে এই ক্ষীণ দেহে তা' সহিবে কি ক'রে !

গদা। এখন কি কচ্ছে ?

রাণী। হি আর করবে, কবিরাজ এসে শিবাঙ্গি ঘি, নারায়ণ তেল ও ত্রিশূতি প্রসারণী তেল ব্যবস্থা করে

দিয়েছেন। কিন্তু শিবাঙ্গি ঘি তো নিম্ন মুখেই নিলে না। তেল-টেলে তো এখন তক্ কোন উপকার দেখা যাচ্ছে না। কবিরাজ মশায় বলেন, "হঃ, রোগের প্রথম অবস্থা, কয়েক দিন বায়ুর প্রকোপ জোর থাকবোই, এখন ওষুধ টস্কে কাম অইবো না, তবে হঃ কিছু দিন ব্যবহার করলে নিশ্চয় সফল পাওনের কথা!" নিম্নাইকে দেখতে ন'দের লোক ভেঙ্গে পড়ছে। শচীদির বাড়ীতে হাট বসেছে। কিন্তু সে কার সঙ্গ কথ্য বলছে না। বউমার দিকে ফিরেও তাকায় না। সে বেচারী না খেয়ে না নেয়ে পেছন পেছন ঘুরছে, তার চোখের জল শুকাচ্ছে না, মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আর শচীর কষ্ট তো বলবার নয়। নিম্ন মাঝে মাঝে মায়ের পায়ের উপর পড়ছে এবং বলছে 'মা আমার ক্ষমা ক'র, আমি তোমার অপরাধী ছেলে, তোমার ভাল ছেলেটিকে তিনি ঘরের বার করে নে গেছেন, আমার কেবল মিষ্টি হাসি দেখিয়ে ভুলিয়ে পাগল করে রেখেছেন; মা তুমি আশীর্বাদ কর, যেন আমি তাঁর প্রসাদ লাভ করতে পারি।

দৃশ্য পরিবর্তন

বাগান বাড়ী,—উদ্যান, সাজি হস্তে বামুনগণ।

প্রথম বামুন...এবে কত কুঁদ ফোটে তার ইয়ত্না নাই। নদেতে এমন কুঁদ ফুলের ঝাড় আর দ্বিতীয় নেই। সাঁঝে সকালে যে কত লোক সাজি ভরে ফুল তুলে নিয়ে যায়, তার সীমা সংখ্যা নেই। এই কুঁদের ঝাড়টি যেন কল্পতরু, যত নেও তত বাড়ে। এই তো খুব প্রত্যুষে কত লোক নে' গেছে। কিন্তু গাছের ঝাড় দেখলে কে বলবে যে কেউ ফুল নিয়েছে! যতগুলি ডাল, পাতা, তা' ফুলে ঢেকে রয়েছে... তাঁর পূজোর ব্যবস্থা তিনিই কছেন, এস ফুলগুলি এই বেলা তুলে নেওয়া যাক, উষার হাওয়া লেগে বেশ ফুটেছে, সূর্যের আঁচ লাগলে দুপুরবেলা ফুলগুলি শুকিয়ে যাবে।

(সকলে ফুল তোলা)

দ্বিতীয় বামুন...আচ্ছা নিমে ছোড়াটার ভাই কি হ'ল!

ত্রিবাণ—“কি হ'ল কে বলবে। কিন্তু লোকে যা বলছে, আমার তো মনে হয় না। ও পাগল হয়নি, মনে হয় ওর উপর মহাভাব এসেছে, ভাগবত পড়ে যে সকল লক্ষণ জানা যায়, ওর সঙ্গে সেগুলি বেশ মিলে যায়।

১ম বামুন...তুমি পাগল হ'লে নাকি? আমিও তো কতবার দেখেছি—একবারে ঘোর উন্মাদ। ওরূপ মহাভাব সকল উন্মাদের উপরই আসে, অকীরণে হাসি-কারাই তো এই রোগ! যা কেউ দেখে না, তা দেখে শুল্লে যুক্তি-কল্পনা, স্বগত কথাবার্তা বলা, এই তো উন্মাদের লক্ষণ! নিমের তাই হয়েছে, করবেজ্ঞও তাই বলেন।

শ্রীবাস...কিন্তু এই যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, তা' এত আবেশে এত কৈদে মিষ্ট স্বরে বলতে থাকে যে আমার তো রোমাঞ্চ হয়! মুখখানির শ্রী শতগুণ বেড়েছে...

২য় বামুন...তা পাগলেরা কোন একটা কিছু নিয়ে ক্ষেপে যায়, লোকে যা দেখে না তাই দ্যাখে। ওর মুখ খানি তো নিখুঁত স্বন্দর, ফুলের কুড়ির মত ঠোঁট দুটি যেন অহুরাগে কাঁপছে—এই রূপ দিয়েই ত ভগবান ওকে গড়ে ছিলেন, তাতে আর নূতন কি? তার উপর মাথায় রক্তের চাপ বেশী হলে মুখ উজ্জ্বল হয়, এ তো সকলেই জানে।

শ্রীবাস...একালে চোখের জলের মূল্য নাই, নাস্তিকতাময় যুগে যদি হরি কৃপা ক'রে তাঁর নাম জীবকে দেন, কি জানি ভাই কি? আমরা বুঝতে পারি না, ভাগবত প'ড়ে আমার যেন কি মনে হয়?

২য় বামুন...কি আর মনে হবে! তুমি দিনরাত হরির অবতার হবে কল্পনা কচ্ছ ও তোমার আঙ্গিনায় তাঁর ছুপূর-ধ্বনি শুন্ছ! এখন এই নদের পাগলটা দেখে ভাবছ কৃষ্ণ পাতকী তরাতে এসেছেন?

রত্নগর্ভের প্রবেশ।

১ম বামুন...আচ্ছা ভাই রতন, তোমায় নাকি নিমাই কি বলেছে!

রত্নগর্ভ...আমি অতিকাতরে তাকে বলেছিলাম, 'নিমাই, সোনার ভাই আমার, তুমি গয়ায় কি দেখে এসেছ, তা তো তুমি বলতে যেয়ে বলতে পাচ্ছ না—যখনই বলতে যাও, তখনই কৈদে কৈদে অজ্ঞান হয়ে পড়। আমাকে সে কথা বল', উত্তরে নিমু বলে—আমি আসছে বুধবার তোমায় সব কথা বলব, মাঝের দুইদিন আমি নিজকে সংবরণ করতে চেষ্টা করে দেখি।

১ম বামুন। আজই তো বুধবার।

সকলে একত্র "চল আজ আমরা সবাই মিলে বিকালের দিকে নিমাইদের বাড়ী যেয়ে সে কথা শুনে আসব।

ঈশানের ছুটতে ছুটতে প্রবেশ
ইশান...শ্রীবাস ঠাকুর, শ্রীবাস ঠাকুর, এখানে শ্রীবাস ঠাকুর আছেন? (শ্রীবাসকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালে।)
শ্রীবাস...এই যে আমি এখানে, ঈশান।

ঈশান...আমি আপনার বাড়ী ঘুরে এলুম, তাঁরা বল্লেন, আপনি বাগান-বাড়ীতে ফুল তোলার আড্ডায় গেছেন—নিমুদার অবস্থা বড় খারাপ। মা তো পাথরে মাথা ঠুকছেন, এই মাসাবধি তাঁর আহাং নিভ্রা নেই, আগে আজ তাঁকে বাচান, দেবী করবেন না আহুন! মা মালিনী তাঁর কাছে আছেন।

শ্রীবাস...চল, আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।
সকলে...বলত কি বিপদ! (প্রস্থান)

দৃশ্য পরিবর্তন, নিমায়ের বাড়ী,

শ্রীবাসের প্রবেশ,

শচী... (শ্রীবাসকে দেখে! কাঁদতে কাঁদতে) বাবা, আমার ছেলোটিকে রক্ষা করুন।

শ্রীবাস...নূতন কি হয়েছে?

শচী...দেখুন না কি হয়েছে, এতদিন মাঝে মাঝে হুস হত, কাল রাত থেকে একবারে বেহুস অট্টোত্ত, অঝোরে কাঁদছে, শতভাঙে কথা বলছেন। কি দেখে হাসছে, আর সর্বদে কাঁটা দিচ্ছে! কররেজ বল্লেন ঘোর উন্মাদের লক্ষণ!

শ্রীবাস...কোথায় আছে সে?

শচী...ওই যে বড় ঘরখানিতে খাটের পায়ার এক কোণে বসে কেবলই কাঁদছে।

শ্রীবাস...ঘরে আর কে আছে?

শচী...বিষ্ণুপ্রিয়া আছে, কেনই বা বিয়ে দিয়েছিলুম। সে নিমায়ের ভাব দেখে ভূমিশয়া নিয়েছে শুয়ে শুয়ে কেবলই কাঁদছে। স্বামীর কাছে কত কাতর ভাবে চেয়ে "তুমি কথা কও, তোমার মুখের দুটি কথা শুনে আমার প্রাণ জুড়োক" বলে হাত পায়ে ধোরে সাধছে, নিমু দৃষ্টিপাত ও করছেন। বোমা মাটিতে প'ড়ে কাঁদছেন এবং পায়ে ধরে মাকে বলছেন "বলুন কি হবে, আমার কপালে কত দুঃখ

আছে। আপনি যদি না খান আর এমন ধারা পাগলের মত হয়ে থাকেন, তবে তো আমি চারদিক অধার দেখছি।

শ্রীবাস...বউমাকে ও ঘর হতে বাইরে আসতে বলুন, আমি নিমুর সাথে খানিকটা একা থাকুব।

শচী...সবাই বলছে, নিমু ক্ষেপে গেছে, কবিরাজ ও তাই বলেন, কিন্তু আপনিই ছিলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু, তিনি চলে গিয়েছেন, এখন আপনিই আমার ও এই বালকের অভিভাবক! আপনি হরিভক্ত, পণ্ডিত ও আমাদের পরিবারের পরম অন্তরঙ্গ, সেই মালিনী ও আপনি, আপনাদের ছুজনের মুখের দিকে চেয়ে আমি বেঁচে আছি। নিমুকে ভাল করে দেখে বলুন, ওর কি হয়েছে; যদি সত্য সত্যই ও ভাল না হয়, আপনি বলেন, তবে আমি আমার পথ দেখব। বউতো কালই গঙ্গায় ডুবে মরতে গেছিলেন!

শ্রীবাস...আচ্ছা, যাও মা, আমি ওকে ভাল করে দেখছি। (শচী দেবীর বিষ্ণুপ্রিয়া'কে নিয়ে নিষ্ক্রামন)

অনেকটা সময় অতীত হয়ে গেল।

শচী... (স্বগত) এই তিন চার দণ্ড ঘরের কপাটে খিল দিয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত আমার নিমুর সঙ্গে আছেন, এখনও বের হচ্ছেন না কেন! এতক্ষণ কি দেখছেন; কি বলছেন?

শ্রীবাসের দরজা খুলে বাইরে আসা, হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে...

শচী... (উৎকর্ষার সহিত)...কি দেখলেন? কেমন দেখলেন! এতক্ষণ কি করলেন?

শ্রীবাস...কি দেখলুম (কান্নার স্বরে) বৈকঠ দেখলুম, না, অলকা দেখলুম, না শিবের কৈলাশ পুরি দেখলুম, তা তো বলতে পাচ্ছি না। যা দেখলুম, তা পৃথিবীতে জন্মে আর কখনও দেখি নি। এই দেখব বলে বোধ হয়—বেঁচে আছি। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, আমি প্রত্যক্ষ দেখব। আজ চক্ষু সার্থক হল, পুস্তকে নারদ—ঋষ প্রহ্লাদের কথা পড়েছিলুম, আজ যা শুনলুম, যা দেখলুম তাতে মনে হল, শত শত নারদের বীণাধারি শুনে পেলাম শত শত ঋষ—প্রহ্লাদের শ্রীমুর্তি ও ভক্তি যেন একাধারে। মুখ কবরেজ বলেছে, নিমাই পাগল হয়েছে, মুখ—পাড়াপড়সী আপনাকে চঞ্চল করে তুলেছে, আজ—আমি নিমুর জগৎ-পাবন রূপ দেখলুম, তার মুখের কথা শুনলুম।

আমি তো তার পিতার বন্ধু, কিন্তু মনে হল তার পায়ে পড়ে থাকি, ও সেই বাণী দিনরাত শুনি! (আঙ্গিনার ধূলি নিয়ে মাথায় মাখা)

শচী...কচ্ছেন কি? কচ্ছেন কি? এতে যে আমার নিমুর অকল্যাণ হবে।

শ্রীবাস...না মা, তিনি তোমার পুত্র নন আমার ও বন্ধু পুত্র নন, এই মায়িক বুদ্ধি ছাড়। ইনি এসেছেন জগৎ তরাতে। নাস্তিকতা-পীড়িত এই পৃথিবীকে ভক্তি দিয়ে উদ্ধার করতে। ওকে ছোট করে দেখনা মা, আমি চল্লুম, ও যা করে করুক, বাধা দিও না। সাহসনয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি ওকে কতকগুলি কবিরাজী গুলি খাইও না ও ওর গায়ে ঐ সকল তৈল মালিস করতে-যেও না। আমি চল্লুম! কিন্তু এবাড়ী আমার তীর্থ—এ তীর্থ আমি ছাড়তে পারব না, আমি সর্বদা এখানেই পড়ে থাকব। (প্রস্থান) শচী...একি শুনলুম, ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া! আয়, শ্রীবাসঠাকুর কি শুনালেন, আমার নিমাই নাকি এসেছে জগৎ তরাতে!

পটক্ষেপ

দৃশ্য-পরিবর্তন,

শ্রীবাসের আঙ্গিনা

কীর্তন ও নর্তন, মধ্যে নিমাই
নিমাই...হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।

সকলের সমকণ্ঠে গান ও নর্তন।

পট-সংকালনের পরে আঙ্গিনার অপর দিকের দৃশ্য

গান

“বহুদিন পরে বঁধুয়া এল
দেখা না হইত মরণ হল”

নিমাই, গানে যোগ দিয়া—গাও, গাও আবার বল
(নিমাই শেষ কলি গেয়ে পুনরায় সমবেত কণ্ঠে গান ও নর্তন।)

“আমি নিজ স্বথ দুঃখ কিছু না জানি
তোমার কুশলে কুশল মানি।”

অদৈত, ...নিমাই যে এলায়ে প'ল, মনে হচ্ছে যেন গানের
রেশ ওর বিদ্যায় লেগেল রয়েছে। চোখের তারা উজ্জ্বল, ও
কাকে দেখছে? (নিমায়ের কানে কানন) কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে—(নিমায়ের মুচ্ছাভঙ্গ, গান ও নর্তন সকলে
সমকণ্ঠে।)

“আমি নিজ হুংখ কিছু না জানি,

তোমার কুশলে কুশল মানি।

অভাগীর দিন দুঃখেতে গেল,

তুমি তো মথুরায় ছিলে হে ভাল”

শ্রীবাস। (অদৈতের কানে কানে) দেখছ না মুখ
খানির দিব্য জ্যোতি, এমুখ; এদৃষ্টি মান্নবের নয়—দেবতার।

পুনঃ গানে যোগ দেওয়া

(আমরা) এতেক সহিল অবলা বলে, ফাটিয়া যাইত পাষণ
হ'লে

এখন গগনে উদয় হউক চন্দ্র

মলয় পবন বহুক মন্দ,

কোকিলা আসিয়া করুক গান

ভ্রমরে ধরুক মধুর তান।

তোরা ডাক দেখি কোকিল পঞ্চম স্বরে।

আমি মদন-সোহনে পেয়েছি ঘরে।”

নিমায়ের পুনঃ মুচ্ছা,

শ্রীধর...উনি যে হরিনামের মূর্তি, হরিনাম যে এমন
মধুর তা তো জানতুম না।

(পার্শ্ববর্তী বৃক্ষাদি হ'তে কোকিল, বউ কথা কও ও কাকের
ডেকে উঠা)

শ্রীবাস...হায়! এখনি কীর্তন শেষ করতে হবে।

হায় সূর্য্য দেব, তুমি আর একটু দেরী করে আসতে
পারলে না। এ সঙ্গ আমরা ত্যাগ করব কি করে?

এমন মধুর নৃত্য ও কীর্তন—এ ছেড়ে সংসারের আবর্জনায়
যেয়ে আবার পড়ব! রাতটা উড়ে চলে গেল—মুহূর্তের
মত, আমরা কোথায় ছিলাম, কি শুনলাম, কি দেখলাম!

পুনশ্চ গান:

প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী

সুখনব ভৈ গেয় নিরাশা।

বাহিরে : কোলাহল।)

পট পরিবর্তন, শ্রীবাস-আদ্বিনার বহির্দ্বারে জনতা

১ম...বেটারা কি গায়, আমাদের ঢুকতে দেয় না,
গঙ্গাদাস পণ্ডিত দোর আগলে আছে! কিন্তু গানের যে
ধ্বনি আসছে তাতে স্বর্গের মাধুরী ভেসে আসছে,—
গায় কাঁটা দিচ্ছে।

২য়...রেখে যে তোর ভাবুকতা! ওরা সারারাত জেগে
কি কচ্ছে?

৩য়...শুনছি, ওরা মধুমতী পরী সাধনা কচ্ছে। দিস্ত হ
দিস্তায় মালপো খেয়ে শরীরে জোর করেছে। দ্যাখ
এক একটার কি কান্দি! নিমাই পণ্ডিতের কি তেজ! শরীর
থেকে জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে। মধুমতী সিদ্ধ হয়েছে
নতুবা দৈববল না পেলে মানুষ কি সারারাত্র—একটু বিশ্রাম
না করে এমন চীৎকার করে নাচতে পারে। আমাদের
ঢুকতে দিচ্ছে না; কিন্তু যে করে হ'ক আমরা একদিন ঢুকে
খোল চৌল ভেঙ্গে দেব ও মালপোগুলি খাব।

১ম...এই মাসাবধি এই ভাবে রোজ নাচ—গানের
হল্লা, একটি দিন বাদ নেই! বুড়ো অদৈতটা আগে এমন
ধারা ছিল না। ইনি জানী, কিন্তু এই বুড়োও মোত
উঠেছে—নিমাইয়ের সঙ্গে গায়, আগি বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দেখেছি, মুখটা হাঁ করে, আঙ্গুলের নানা ভঙ্গী করে ত
রাখে। সেদিন দেখলুম, ওর দশা দাড়ি বেয়ে চোখের বাল
পড়ছে, আর নিমাই পণ্ডিতের কাছে গড়ুর পক্ষীর মত
গদগদ হয়ে হাত জোড় করে বসে আছে, মন মিনে, য
হতচ্ছাড়া বুড়ো, ও যে তোর নাতির মত, ওর বাপ জগদা
মিশ্র ও তো তোকে সমীহ করতেন, একবারে মাথাটা খাপ
হ'ল নাকি?

পটক্ষেপ—দৃশ্য পরিবর্তন,

নদে, ভট্টাচার্য্য পাড়া

পণ্ডিতদের সভা

তর্করত্ন...না আর সছ হয় না, সারা রাত্রি-দিন রাতায়
এই হল্লা ও চীৎকার, কাজী সব শুনেছে। দরবারে নালিস
গিয়ে পৌছেবে। এমন দোরাগ্ন্য আমরা আর সহিতে
পারব না। ঢের সয়েছি, রাতে পড়াশুনা করতে পাচ্ছি
না, ঘুমতে পাচ্ছি না।

গ্রায় বাগীশ...ওগো তর্করত্ন মশাই। আমরা তো ভাগবৎ পড়েছি, এমন চীৎকার ক'রে নেচে কুঁদে দল জুটিয়ে শিয়ের মিছিলের মত রাস্তায় বের হওয়ার কথা তো ভাগবতে নাই, কোন শাস্ত্রে নাই।

বেদ পঞ্চানন...সাংখ্য মতে আমরাই ঈশ্বর—‘সোইহং’ তখন উপাসনা করে কাকে ডাকব? যাকে ডাকব সেও যে আমি।

স্মৃতি সিদ্ধান্ত...আর ও পাংগলের কথা নিয়ে বিচার টিচার কি? ছেলেট। ব্যাকরণে খুব ভাল ছিল। এখন লেখা পড়া ছেড়ে খেই খেই নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। ব্যাকরণটি এমন শাস্ত্র, যে রোজ রোজ চর্চা রাখতে হয়, নৈলে সব ভুলে যেতে হবে।

বিদ্যাবাগীশ...ভুলে আর যাবে কি? ভুলে গেছে! শুনিছ, টোলের ছেলেদের আর মনোযোগ দিয়ে পড়ায় না, বইএর পাতা খুলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কেদে ওঠে। ‘ব্যাকরণ পড়াতে যেয়ে ভক্তির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। যাক, ওর কথা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথার কি দরকার?

তর্করত্ন...না, ছেড়ে দেওয়ার বিষয় নেহে। জান তো, রাস্তায় এই উপদ্রবের কথা হুসেন সাহা'র কর্ণগোচর হয়েছে। অনেকে এ কথা জেনেছে। হুসেন সাহ এক নৌ-সৈন্তের বহর নাকি এই অঞ্চলে পাঠাচ্ছেন সকলকে শাস্ত্রশিক্ষা করে দেওয়ার মতলবে। তারা এসে উৎপাত করবে ও আমাদের ধর্মলোপ ক'রে ছাড়বে। শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনাটা হচ্ছে সমুদায় বিপদের মূলে, এদের বোধ নেই যে এদের এই সকল অত্যাচারের দরুণ নদেবাসী সকলকে ফল ভোগ করতে হবে। বছর ত্রিশেক আগে তো এইরূপ বিপদ একবার হয়েছিল, সে শিক্ষা কি নদেবাসী এত শীগ্গির ভুলে গেল? এখনি এর প্রতিকার করতে হবে, নৈলে আমরা ধনে প্রাণে মারা যাব।

পটক্ষেপ

দৃশ্য—গঙ্গাতীর,

নিমাই, রাজর্ষি চক্রবর্তী, নন্দ চাটুতি, মৃত্যুঞ্জয় গোসাঞি স্থরেন পাল, নিত্যনিরঞ্জন কাব্যতীর্থ প্রভৃতি স্নানার্থী—
রাজর্ষি...নিমাই, আহা কচ্ছ কি? কেন পা' ধ'রে

কাদছ। মুখখানি করুণায় ভরপুর, দেহে দিব্য জ্যোতি, পা ছেড়ে দাঁড়, কি হুংখ তোমার নিমাই।

আমরা যে তোমায় প্রাণের চাইতে ভালবাসি।

নিমাই—বাবা, পা ছুঁলে আমি স্বর্গ হুংখ পাই।
আশীর্বাদ করবেন যেন কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

নন্দ চাটুতি—রাজর্ষিকে ছেড়ে দিয়ে আমার ছাড়া ধূতিটা নিঙড়াচ্ছ কেন?

নিমাই—এই গঙ্গাতীরে আমি বহু অপরাধের অপরাধী। আমাকে আপনাদের সেবার অধিকার একটু দিন।

নিত্য নিরঞ্জন—কি হে, বিদ্যাবাগীশ! এতগুলি কাপড় ধূতি, নৈবেদ্যের চাল-কলা ভরা এত বড় একটা ঝাঁকা ব'য়ে নিয়ে ভূমি যাচ্ছ কি ক'রে, এখনি উছট খেয়ে হুমড়ি দিয়ে গড়বে, বয়সের দরুণ তো একেবারে কুজো হয়ে পড়েছ।

বিদ্যাবাগীশ—কি করব ভাই! এখানে মা বাবার ষাণ্মাসিকটা সেয়ে নিলুম, আমার মা তো সহমরণ গেছিলেন তা তোমরা জান স্মরণ একই তিথি, তা যেমন করে হয় নিতেই হবে, তা বোঝাটা তেমন কিছু ভারী নয়, আমি বুড়ো বলে যা! তবে কাকগুলি বড় বিরক্ত কচ্ছে!

নিমাই—বিদ্যাবাগীশ দাদা মহাশয়, এই ঝাঁকাটা আমায় দিন, আমি যে আপনাদের ঝাঁকা মুটে। (ঝাঁকা করে বৃদ্ধের কাছ থেকে ঝাঁকাটা তুলে নিয়ে তাঁদের বাড়ীর দিকে রওনা হওয়া, যেতে যেতে তাঁর দিকে চেয়ে)
“দাদামশায় আপনি ধীরে ধীরে বাড়ীতে আসুন, আমি এগুলি শীগ্গির আপনার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসছি।”

বিদ্যাবাগীশ—(হতভম্ব হয়ে)—দেখুন তো আপনারা, নিমু কি কচ্ছে, ওর মধ্যে আমার ভিজে কাপড় নূতন কাপড়, চালকলার নৈবিদ্য—ষোড়শ মাতৃকার পূজার এক রাশ উপকরণ, তা ছাড়া একটা নূতন খ্যাঙ্গড়া এনেছিলুম, বামুনের ছেলে এত বড় পণ্ডিত, আমার সমস্ত বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে চলে! ওর ভিতর কি আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে! গঙ্গার এই ঘাটে ওর উৎপাতে আগে লোকজন স্নান করতে আসতে চাইত না। এবার তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে? নিমুতো এখন ভগ্নবানের নাম বলতে কেঁদে অস্থির হয়। সেদিন কি মিষ্ট গলায় যে গঙ্গাতীরে

নাম কীর্তন ক'চ্ছিল, আমার চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল পড়ছিল ! ওকে দেখলে সাক্ষাৎ ভগবান দর্শনের পুণ্য হয় !

(নিমায়ের ফিরে আসা)

নিমাই—এই যে পালমশায় !

স্বরেশ পাল—“হরি ! হরি ! এ কি সোনার মাল্লম ! এমন রূপ তো ভগবান কাউকে দেন নাই ! ধৃত্য শচী ঠাকরুণ, হে কৃষ্ণ ! এ যেন তোমাকেই দেখছি ! (মালা জপ)

(নিমায়ের হঠাৎ যেয়ে তার পায়ে ধরা)

স্বরেশ পাল...হায় হায় ঠাকুর, এ কি কচ্ছেন, আমার সর্বনাশ কচ্ছেন ! আমার পায়ে ধরেছেন, আপনি বামুন, আমি শূদ্র, এ অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ? এ কচ্ছেন কি ? আমার পায়ের এক রাশ কাদা ধুয়ে নিজের গামছা দিয়ে মুচ্ছেন ! আমি গেছি, হায় আমি গেছি, এর চাইতে আমায় শত শত জুতোর বাড়ি মারলে আমার গতি হোত ! বামুনের হাতের আঁধাতে পাপ খণ্ডে যেত, এখন আমি কি করবো। —একবারে নরকে ঠেলে দিচ্ছেন।

নিমাই—আপনার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, এরা কি আপনার পা সেবা করে না, এরা কে ? ভগবান যে তাঁদের হাত দিয়ে স্বয়ং অষ্টপ্রহর সেবা কচ্ছেন, তা যদি না বুঝে থাকেন, তবে সেই দয়াময়ের দয়া বুঝবেন কি করে ? আপনি যে তার নাম কচ্ছিলেন,—আমার তখন জ্ঞান ছিল না, আমার সে নাম শুনেলে বামুন শূদ্র ভেদ মন হ'তে চলে যায়, আপনি জপ করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছিলেন, তখন যে আপনি বামুন হয়ে গেছিলেন, একবার কৃষ্ণ নাম যে করে, সে কি আর শূদ্র থাকে ! পাল ম'শায়, বহু অপরাধের অপরাধী আমি। আপনাদের সেবা কলে আমার শুকনো হৃদয় পন্ন হয়ে ফুটে উঠে। যখন কৃষ্ণ ছাড়া মনটা হাহাকার করে উঠে, তখন ছুটে আসি এই ঘাটে লোকসেবা করতে ! এই ঘাটে আমার অপরাধের মাত্রা বড় বেশী ছিল, এজন্য আপনাদের চরণ বেগুর লোভে আপনাদের সেবা ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করতে ছুটে আসি। পাল ম'শায়, চারদিক দিয়ে ত সেবা, যত প্রণাম পাচ্ছেন, কেউ ভৃত্য কেউ দারা পুত্র এরা যে এক একজন ছদ্মবেশী ভগবান ; তাদের অহেতুকী সেবার মধ্যে

জীবের একমাত্র অন্তরঙ্গ ভগবানের পরশ বুঝতে পাচ্ছেন না। হে কৃষ্ণ, আমার চোখের মায়ার ঠুলিটা খুলে দাও, তুমি সবখানে আছে, আমি সবখান থেকেই যেন তোমার ঐ পাগল-করা রূপ দেখতে পাই ! আমার চোখের আবরণ দূর কর (উর্ধ্বে দৃষ্টি করে) ঐ যে দেখতে পাচ্ছি ! আমি যে তোমার রূপ সাগরে ডুবে মলুম !
(কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান)

স্বরেশ পাল...এই সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার ভক্ত শিরোমণি আমার পা ধুয়ে দিয়ে নিজের বস্ত্রে মুছিয়ে দিয়ে গেলেন, তার পর আমি 'হা কৃষ্ণ' বলে আমার পায়ের ধুলো মাথায় দিলেন—আমি কি কলে এই ঘোর পাপ হতে নিস্তার পাব ? আমি তো শূদ্র, আমায় বলে দিন।

১ম বামুন...তা আর করবে কি, নিমাই তো ভগবৎ ভক্তিতে পাগল হয়ে গেছে। ওর কাজকর্ম—সংসারে বাইরে ! ওর মাকে যেয়ে প্রণাম করে সব কথা বলগে এবং যাতে খুশী হন, তাই কর, তবেই এই অপরাধ কেটে যাবে !

পাল...আমার ফলের বাগানে এবার খুব ভাল কলা ও ফজলী আম হয়েছে। যাই তাই নিয়ে, মা, বড় ঠাকরুণ ও নিমাই পণ্ডিত যদি তার কিছু দাঁতে কাটেন তবে আমার জীবন সার্থক হয়। আমার কি দূরদৃষ্ট ! নিমাই যখন আমার পায়ে হাত দিলেন, তখন মনে হয় যেন ভগবান আমার সর্বদেহে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন দিচ্ছেন। রোমাঞ্চ হয়েছে তা এখনও মিলায় নি। আম গাছগুলিতে খুব বড় বড় আম হয়েছে ! তাঁরা কি অধমের এই দান গ্রহণ করবেন ?

বামুন—ওহে ! এ ত আর দান গ্রহণ নয়, তাঁদের বাড়ীতে নারায়ণ শিলা আছেন, তুমি ফল দেবে নারায়ণ সেবার জন্ত। হা হে পাল, তোমার সেই ভাল ফজলী গাছটায় এবার কত আম হয়েছে।

পাল...আজ্ঞে, তা' দুহাজার হবে।

২য় বামুন...পালের পো, আমরা তিন জন এখানে উপস্থিত আছি, আমাদের এক এক টুকরি দিও। তুমি পাপ পাপ কচ্ছ, এতগুলি বামুনের সেবার ফলে তোমার সব পাপ কেটে যাবে।

বিদ্যা বাগীশ...না হে পাল, আমাকে দিও না, আমি চাই না।

১ম বামুন...তবে আমাদের দুজনকেই দিও।

পাল...যে আজ্ঞে, এতো আমার সৌভাগ্য, আমার স্ত্রী বলেছিল, এবারকার ফলগুলি খুব ভাল ও বড় হয়েছে। বামুনদের না দিয়ে নিজেরা খাব না। তার ব্যবস্থা তো ভগবান নিজে থেকেই করে দিলেন দেখছি। আমার কত পুণ্যের জোর যে অধর্মের উপর আপনার এত রূপা।

(বিদ্যা বাগীশের প্রস্থান)

২য় বামুন...দেখছি তো পাল, বিদ্যা বাগীশের ভারি দেমাক। ওরা তোমার দান নেবেন না, যে হেতু তোমরা শূদ্র, এদিকে ভিক্ষে—শিক্ষে করে কোনরূপে সংসার চালান।

পাল...তা' নয়, ওঁরা একান্ত নিলোভ এই সকল লৌকিকতায় পাছে খাবার লোভ জন্মে, এ জন্য ওঁরা এ সকল চান না, আর ভিক্ষা তো মুষ্টি ভিক্ষা মাত্র, সংকল্প করেন না।

১ম বামুন...তা না নেন, ভাল। হা হে পালের পো—তোমার গরুগুলি তো খুব ঝুট-পুট, তাঁদের ক'রটা দুধ দিচ্ছে?

পাল...আটটা নয়টার দুধ পাচ্ছি।

বামুন...কতটা দুধ রোজ হয়।

পাল...তা, আজ্ঞে, দু মণের কম নয়।

বামুন...তা' আমাকে দশ সের ও ভায়াকে দশ সের এই ফলের সঙ্গে পাঠিয়ে দিও।

পাল...যে আজ্ঞে।

বামুন...তা' ভুলবে না তো, জানতো আমরা গরীব বামুন, ছেলেরা সন্দেহ খেতে চায়। তা তুমি যদি দুধ দাও, তবে অনেক দিনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি!। দিবে তো, না ভুলে যাবে?

পাল...কি বলছেন ঠাকুর-দাদা, আপনাদের একটু দুধ দিয়ে সেবা করব, এতে ভুল হতে পারে?

পটক্ষেপ

নিমায়ের বাড়ী,

শচী ও নিমাই।

নিমাই...মা, তুমি কঁাদছ কেন, বল দেখি?

শচী...না, কিছু নয়, তুমি স্বখে থাক, ভাল থাক, আমার দুঃখের আর-কি কারণ থাকতে পারে!

নিমাই...কিন্তু কঁাদছ কেন তাত বলো না।

শচী...কঁাদতে কঁাদতে) সে কথা আমার মুখে আসছে না, আমি বড় ভয় পেয়েছি।

নিমাই...মা, তোমার ভয় কি'মা, কেন তুমি চোখের জলে ভেসে যাচ্ছ? মা, মা, তুমি মনের কথা খুলে বল।

শচী...বাবা, তুমি কেন এই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এত মেশ? ঈশ্বর পুরী এখানে এলে যেন তোমাতে আর তুমি থাক না, এই দেখে আমার বড় ভয় হয় বাবা! তুমি আমার পা ছুঁয়ে বল, তুমি সন্ন্যাসী হবে না। বিশু আমায় বড় দাগা দিয়ে গেছে, বল বাবা, তুমি ওদের সঙ্গে আর মিশবে না।

নিমাই...সন্ন্যাসীরা জগৎপূজ্য, তাঁদের কাছে থেকে হরি কথার আলোচনায় আমার মনে স্বর্গস্থ হয়। কে বলে আমি সন্ন্যাসী হব মা! সে কথা তো এ অবধি কেউ বলে নি। এ তোমার মিথ্যে ভয় দূর কর। যতদিন ভগবান রাখবেন, ততদিন ঘরে থাকব। শ্রীবাসের আশ্বিনায় আমরা হরির নাম করি, পুরী গোসাই এলে তাঁর কাছে একটু বৈশিষ্ট্য থাকি, এতে তোমায় ভয় কি? না, মা, আমি সন্ন্যাসী হব না।

শচী...বাছা, আমার কাণে অমৃত ঢেলে দিলি। আমি বুড়া হয়েছি। তার পর শোকে দুঃখে আচ্ছন্ন, আমার ভয় হয় তো অমূলক, তুমি কখনও সন্ন্যাসী হবে না, আমার গা ছুঁয়ে বল।

নিমাই...হ্যাঁ মা, আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, সেরূপ কোন ভাব ত এখনও পর্যন্ত আমার মনে নাই এবং পুরী গোসাই বা অন্ত কোন সন্ন্যাসীর কাছে আমি সন্ন্যাসী হব, এমন কথা তো বলি নি বা আলোচনা করিনি।

শচী...আমার মোনার নিমু, আমাকে বাঁচালে, কিন্তু আর একটা কথা, এই বুড়ো দৈত্যটার সঙ্গে বেশী মিলামিশি কর না।

নিমাই...দৈত্য কে?

শচী...জান না ! এই যে তোমরা যাকে 'অদৈত' বল, ও হচ্ছে সত্যি সত্যি একটা দৈত্য । আমার চাঁদের মত ঐক ছেলেকে ঘরের বার করে দিয়ে বুড়া নিরস্ত হয়নি, আবার তোমার পিছনে লেগেছে । বিস্ত্র যে ওর কাছেই পাঠ নিতে রোজ যেত ।

নিমাই...ছিঃ মা, তুমি এই শিবতুলা দেশের মুকুট-স্বরূপ বুড়া ও পরম পূজনীয় পণ্ডিত মশায়ের কথা এমন ভাবে বোল না, এতে প্রত্যব্যয় হয় ।

শ্রীবাসের প্রবেশ, (শচীর প্রস্থান)

শ্রীবাস...আজ নাকি রাত্তায় কীর্তন বার হতে কাজি নিষেধ ক'রে দিয়েছেন !

নিমাই...কে নিষেধ করেছেন ? আমরা ভগবানের নাম করব, এতে বাধা দিতে পারে কার সাধ্য ? সে যদি ঐরাবতও হয়, তবুও তাকে ভক্তিশ্রোতে ভেসে যেতে হবে ।

নিমাই (গান) “বাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ” ।

শ্রীবাসের সঙ্গে সঙ্গে গান ।

নিমাই...শ্রীবাস আবার বল ।

শ্রীবাসের পুনরায় গান করা ।

নিমাই...এ দেখছ না, তোমার স্মধাকর্ষের নাম কীর্তনে লোকেরা ভিড় করে আসছে ; এ নাম-গঙ্গার গতি রোধ করবে কে ?

(গান শুনে চার দিক লোকের সমাগম)

শ্রীবাস...প্রভু, এ তোমার স্বর ও মহিমা, আমরা নদীর মত হরিপদ-সাগর-সান্নিধ্যে ছুটেছি—কে আমাদের ঠেকাবে ?

নিমাই...আজ প্রচার ক'রে দাঁও যে, আমরা নাস্তিক আন্তিক সবাইকে আজ এক ক'রে ফেলব ? আজ অপরাহ্নে মহানগর সংকীর্ণন বের হবে, আজ নদে টলমল করবে তাঁরি কুপায় । ঘোষণা করে দাঁও, আজ শত শত মশাল জলবে, আজ নদের সব কথানি খোল একত্র বেজে উঠবে, আজ চাঁড়াল, শূদ্র, বামুন এক হয়ে যাবে, শ্রীবাস, আজ

আমি আবেশে উদ্ভূত হয়ে আছি । কে কথবে আমরা আমি সে মুরলীর রব শুন্ছি—(গান)—“আমায় যেতে হবে গো, রাই বলে বাজিলে বাঁশী—আমার যেতে যে হবে গো ।” যুদ্ধের বাঁজনা, জগবান্ধা, রণ-দামামা এ সকল ছেঁটে উঠবে বাঁশীর স্বর ; আমার চারিদিকে যে বাঁশী বাজছে, উর্দ্ধে, অধে, ডাইনে বামে—স্বর্গ, পাতাল, পর্বত-কানন ফুট উঠছে—সেই স্বর, আজ সেই স্বরের মহিমা—নামের মহিমা সকলে বুঝবে, অদৈতকে বলগে তিনি আজকার কীর্তনানের এক দলের প্রধান হ'বেন । আজকার এই হাটে আর কি বিকোবে না ।

(গান)

“বিকোয় নাক অস্ত্র স্ততো, বিনে তাঁতি নন্দের স্ততো

সে হাটের প্রধান তাঁতি, প্রজাপতি পশুপতি—

আর যত আছে তাঁতি,—তাদের শুধু যাতায়াত ।”

(শ্রীবাসের সঙ্গে সমকণ্ঠে) ।

নিমাই...শ্রীবাস, যিনি চতুর্দিকে নাম কীর্তন করে খেঁচ করতে পারেন না,—তাঁর নাম শুনে সৃষ্টি কর্ত্তে ভুলে যান, মহাকর্ষশীলের কর্ষ শেষ হয়, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আর যিনি নাম শুনে পাগল হয়ে বিষধর সাপকে প্রেমে জড়িয়ে ধরে কঠোর কঠহার করেন, ভাগ্যের কপালে আগুন ধরিয়ে বাঘছাল পরে তপস্শ্রা কচ্ছেন, সেই শিব—এই দুই জন সেই হাটের ব্যাপারী, তাঁরাই নামের স্তবের হাটের পাইকার । আর নারদাদি যারা আছেন—তাঁরা সে হাটে শুধু যাতায়াত করেন মাত্র । আজ আমরা সেই হাটে যাব । তৈরী হও, তৈরী হও শ্রীবাস, আজ ন'দেতে যে ঢেউ উঠবে, তা' জগতের শেষ সীমায় যেয়ে ঠেকবে, আজ যে খোল বাধবে, তা' থামবে না—হাজার হাজার বছর পরেও লোকে তা' শুনে পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়বে । আমি যে বাঁশী শুনেছি আজ ন'দে বাসীকে তা' শুনাব । আমি নিজের কানে শুনে পাইছি, সেই অনাগত হরিনামের কণোল, দেখছি যেন নাম-সমুদ্র মন্বন করে স্বয়ং লক্ষ্মী ভক্তি-ভাও হাতে করে পরিবেশন কচ্ছেন, এমন দৃশ্য ন'দে কেন, জগতে যার হ'বে না, প্রস্তুত হও । পর্বত ভাঙবে, সমুদ্র শুকাবে, ঘগ্নির পাহাড় শীতল হ'বে, তবুও এই নামের গতি কেউ রোধ

করতে পারবে না। আজ আমার এমন আবেশ আসছে, অসহ্য আনন্দের আবেশ, গয়ায় শ্রীপাদপদ্মের কাছে গিয়ে যে রূপ এসেছিল, সেই আবেশের মতো। আমি নাম বিলোব, জগৎবাসী ধর, আমি নামের বোঝা আর বইতে পারি না। (মুচ্ছা)

শ্রীবাস...নিমাই এত সুন্দর কিন্তু আজ ওর মুখে যে কি অপরূপ শ্রী এবং আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠেছে: এমন কোনদিন দেখি নি।

(শচীর প্রবেশ)

শচী...কৃষ্ণ নাম করলে ওর মুচ্ছা ভাঙবে। কিন্তু ঠাকুর একটা কথা বলি, আমি এখানে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। আজ নাকি মহানগর-সংকীর্তন হবে। ঠাকুর, আপনার পায়ে পড়ে বলছি। কতবার জানি মুচ্ছা যায় কঠিন শক্ত রাজপথের উপর পড়ে। কোমলাঙ্গে ব্যথা পাবে, ঠাকুর তুমি ওকে দেখ, আমার নয়নমণি কেন পাথরে পড়ে আঘাত না পায়।

শ্রীবাস...মা, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, ওর কিছু হবে না, ও যে জগৎ তরাতে এসেছে।

দৃষ্টান্ত

কাজির গৃহ

কাজি ও পণ্ডিতগণ

কাজি...আপনারা কি চান বলুন তো, একটু খানি একটা ছেলে, দবে, গোঁপের রেখা দেখা দিয়েছে। সে কি অশান্তি ঘটাবে তা বুঝতে পারছি না। আপনারা পূজা—পার্কণে তো কম হুলা করেন না, বিসর্জনের দিনে ঢাক ঢোল পিটিয়ে কাণে তাল লাগিয়ে ছাড়েন। এ ছাড়া আজ দোলযাত্রা, কাল রথ, তার পরে কার্তিক পূজা, সরস্বতী পূজা, শিবের গাজন, ধর্মের গাজন, এ তো বার মাস লেগেই আছে। এরা কয়েকজন ভাবের পাগল শুধু নাম কীর্তন করছে, তার মধ্যে পুতুল পূজাও করছে না, ষড়্ধে করে নানা রূপ মাটির মূর্তি নিয়ে গঙ্গায় হুলাও করছে

না। এদের উপর আপনারা—এত আক্রোশ কেন? বিশেষ নিমাই পণ্ডিত তো আপনারা কাছে বালক!

ভট্টাচার্য...রাতে ঘুমতে পারি না, কাণে তাল লেগে যায় ওদের মাদলের বাজনায়।

কাজি...যখন পাঠাবলি ও নরবলির বাদি বাজে, তখন কি নাক ডাকিয়ে ঘুমতে পারেন? তবে আপনারা এসেছেন, আপনারা অহুরোধে আমি নগর সংকীর্তন আজ নিষেধ করে দিব, কিন্তু আমি যতটা বুঝছি, ওরা নামে মেতে উঠেছে এখন বাধা দিলে যদি না মানে তবে আমি কঠোর দণ্ড দিতে পারব না। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যেতে পারে। তার ফল ভোগ করবেন আপনারা—যদি আমার ফৌজ লাগিয়ে দিই—তবে আপনারা ঘর-দরজা লুট হওয়ার আশঙ্কা আছে; ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে, তা আমি বলতে পারি না, শেষে আমাকে দোষ দিতে পারেন না।

(ভট্টাচার্য তর্কবত্বের দিকে চেয়ে টিকি নেড়ে আঙ্গুল দিয়ে কি বুঝালেন, ন্যায়পঞ্চানন মুহূর্ত্তে স্বরে পাশের বিদ্যাভূষণকে বলেন, দেখছো তো ভায়া, শেষে ফৌজ গিয়ে অন্তঃপুরে উৎপাৎ করতে পারে। বিদ্যাভূষণ, তোমার সহ-ধর্মিণীটি কিন্তু তারি সুন্দরী, কাজির কানে সে কথাও উঠতে পারে; বিদ্যাভূষণ, কাজি নেই আমাদের এর মধ্যে থেকে, কোন ঘাটের জল কোথায় গড়াবে তা তো জানি না, চলছে ভাই আমরা উঠে যাই—(কয়েক জনের উত্থান)

কাজি...আপনারা উঠছেন যে?

সার্কভৌম...হজুর যা ভাল বোধ করবেন, তাই করবেন, আমরা আপনার প্রজা, যাতে আমাদের বাড়ী ঘরের দিকে কোন বিপদ না আসে, মেহেরবাণী করে সেই ব্যবস্থা করবেন, চুলায় যাক নিমাই পণ্ডিত। তাতো ঠিক কথাই, সে ছেলেমানুষ, আহা জগদার হাতের নড়ি ছিল, আমাদের কি সে পর? কাজি সাহেব, জনাব, আমাদের রক্ষা করবেন, আমরা কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে নেই।

কাজি...তারপর জানেন, নিমাইয়ের কথা শুনে শুনিছি যে সকলে ভুলে যায়, তার কথায় তরুণদের দল ওঠে-বসে;

এই কীর্তনের দলে যে আপনাদের ছোট ছোট ছেলে ও নাতিরা থাকবে না তা কে বলতে পারে। আমি তাদেরে হুকুম ক'লে তারা বেপরোয়া লাঠি চালাবে, গুলিও করতে পারে, তখন আপনাদের বাড়ীর ছেলেরাও হয় তো বাদ পড়বে না,—এ অবস্থায় কি আপনারা এই দাঙ্গা উল্লিয়ে দিতে চান?

বিদ্যাবাগীশ—[চোখের তারা কপালে তুলে, হাত জোড় করে] জনাব, আমাদের মা বাপ, বাপ জান, আমাদের রক্ষা করুন। আমরা নালিস তুলে নিলুম।

কাজি...আপনারা ভয়ে কুঁড়ে মুকুড়ে যাচ্ছেন, নিজের বিপদের আশঙ্কায় তো এতটা ভীৰুতা দেখাচ্ছেন, অথচ জগদার ছেলেটিকে শূলে চড়াতে এসেছেন।

ব্রাহ্মণগণ—(মদলবচন পাঠ করতে করতে ও কুণ্ঠিত করতে,) তবে জনাব, হজুর আগরা যাই, বেয়াদবী মাপ করবেন, আমরা সকল কথা বুঝতে পারি না, ভগবানের অংশ হচ্ছেন আপনি—সহরের মালিক, আমাদের রক্ষার ভার, জনাবের উপর [কুণ্ঠিত করতে করতে প্রস্থান]

কাজি,...শুন আবহুল্লা, কীর্তন নিবেদন করে দিয়েছ তো।

আবহুল্লা...তা দিয়েছি, কিন্তু তারা সে নিবেদন শুনবে না। তাজ্জব ব্যাপার, দুলক্ষ লোক জমা হয়েছে, কুলের বোঁ-ঝিরা পর্যন্ত বের হয়ে পড়েছে, নিমাই পণ্ডিতকে দেখে মনে হচ্ছে যে সে এঞ্জিল, তার মুখ চোখ হাতে আগুনের হাঙ্গা বের হচ্ছে, খোদার নাম বলতে চক্ষে যেন গাঙ্গে বান আসছে—সে পানি যেন কোন সমুদ্র জোগান দিচ্ছে—

কাজি...আমি বুঝেছি—সে খোদার জানিত লোক; এর সঙ্গে কি ঝগড়া করে? এই দুই লাখ লোক খোদাকে ডেকে প্রাণ দেবে, এরা হটবার লোক নয়। নিবেদন করেছি, হুকুমটা থাক, কিন্তু সেপাই শাস্ত্রীদের বলে দাও যেন কোন বাড়াবাড়ি না করে।

আবহুল্লা...যে আজ্ঞে হজুর।

দৃষ্টান্ত

কাজির বাড়ীর কাছে এক গৃহস্থের ত্রিতল বাড়ী।

... (বৃদ্ধা গৃহস্থামিনী তাঁর পুত্র রমানাথ ও তাঁর দ্বাদশবর্ষীয়া নাতিনী কনকলতা)

রমানাথ...তা যা দেখে এলুম সেরূপ আর জগতে জন্মে দেখি না, এ নদেটা যেন জনসমুদ্র—চাষারা লাঙ্গল ফেলে, কামার কুমার স্মৃতোর তাদের যন্ত্র ফেলে, সৈনিকেরা হাতিয়ার ফেলে নিমাই পণ্ডিতের দলে জুটেছে। ভট্টাচার্য্য বামুন পণ্ডিত পুঁথি ফেলে এসেছে, এমন কি নদের গুপ্ত-চোরগুলি তাদের সিঁদ কাটি ফেলে এসেছে; সে মশাবের দীপ্তি! সমস্ত সহরটা রোসনাই হয়ে গেছে। সব এখনি সাঁঝ—রক্ষপক্ষ, রাত দিন হয়ে গেছে, ১২ খনি মাদল বাজছে, সহরে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে—অবৈত বুড়োর দাড়ী বেয়ে চোখের জল টপ টপ করে পড়ছে। খোলা-বেচা শ্রীধর, খোড়া খঞ্জন আচার্য্য, বামুন ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, শুক্লাধর—কত নাম করব? পোড়াগাছের জায়গা ঘুরে মিছিল চলেছে যেন শত শত স্বর্ঘ্যের আলোতে। গঙ্গার ঘাটে বুড়ীরা আত্মিক করতে করতে নিমাইয়ের মুখ দেখে আত্মিক ভুলে গেছে, গাইগুলি উর্দ্ধমুখে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে আছে, নৌকায় একব্যক্তি তামাক খাচ্ছিলেন, তিনি অবাধ হয়ে নিমাইকে দেখেছেন, তারও চখে জল পড়ছে, হাতে হুকুটা আছে, কল্কেটা খসে পড়েছে। কিন্তু তার হুকু নেই। মাঝিরা বৈঠা হাতে দাঁড়িয়ে কীর্তন দেখছে। নৌকা হাওয়ায় বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে—তা জ্ঞান নাই—সেই শত শত মশাবের আলোক মালায় উজ্জল সঙ্কীর্ণনদল গগনভেদী কীর্তনের রবে রাম-শিঙ্গা, ডঙ্কা ও মাদল বাজিয়ে আপনাদের বাড়ীর দিকে আসছে, যেন এক খণ্ড স্বর্গ হঠাৎ ভূমিতে পড়ে গেছে; এখার যা দেখলেম, শত জন্মেও তা দেখব না।

কনকলতা—ঐ যে সেই মিষ্ট কলরব শোনা যাচ্ছে, যেন শত শত সহস্র সহস্র ভ্রমর গুঞ্জন ও কোকিল কুঞ্জন, আকাশের যত পাখী ঘন ঘন ডেকে উঠছে,—ঐ যে নিমাইকে দেখতে পাচ্ছি।

বৃদ্ধা...আমার চোখ ও কান দুইই খুইয়ে বসেছি,

কনক, তুই আমাকে বল কি দেখছিস। কীর্তনীয়ারা তো কাজির বাড়ীর দিকেই আসবে শুনেছি।

রাম...তবে আমি যাই ঐ কীর্তনের মধ্যে যাপিয়ে পড়িগে।

বৃদ্ধা...তুই যে থাকবি না, তাতো আগেই জানি, কনক, বল মা কি দেখছিস।

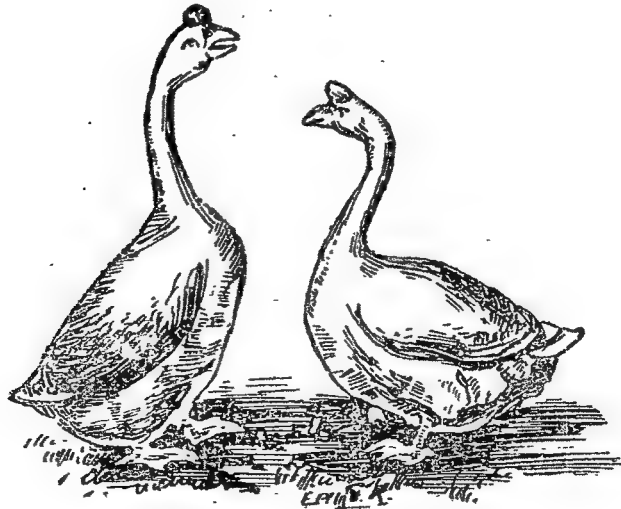
কনক...দিদিমা এই যে এসে পড়েছে—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! যে দিকে মাথা ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে তিনি হরি নাম গেয়ে যাচ্ছেন, সেদিকে শত শত মশাল এগিয়ে আসছে, তার মুখ দেখবার জন্য শত শত কালো চক্ষের তারা ভ্রমরের মত উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, ও কি পদ্মের মত চোখ জলে ভাসছে, যেন স্রোতে ফুল ভেসে যাচ্ছে! দিদিমা, তুই এমন রূপ দেখতে পেলি না, তোর চোখে দৃষ্টি নেই, দেখলে চোখ সার্থক হ'ত, ওকে দেখলে মনে হয়, ও স্বর্গের কথা বলতে এসেছে। কি নাম গান, মধু হতেও মধুর!

ঐ যে এবার কাজি নেমে এসেছেন, এই যে আমাদের

আঙ্গিনার কাছে, নিমাই যে কাজির গা জড়িয়ে ধরলেন, কাজি বলে, নিমাই আমি বারান্দা হতে তোমার রূপ দেখে ভুলেছি, তুমি ঝাঁকে-ডাকছ সে সমস্ত মানুষের অন্তরঙ্গ হতেও অন্তরঙ্গ। আমি যে তাঁকে পাঁচ ওকত ডেকে পাই না। তুমি তাঁকে পেয়েছ; তোমার চোখের জল বলছে, তুমি পেয়েছ, তোমার মুখের আনন্দচ্ছটা, তোমার শরীরের রোসনাই দেখে বুঝেছি তুমি পেয়েছ। আমার আলিঙ্গন দাও—তোমার পুণ্যে যদি আমার উপর খোদার মেহেরবাণী হয়। নিমাই তুমি আমার পর নও, জগন্নাথ আমার ভাইয়ের মত ছিল, তোমার দাদামশায় নীলাধরকে আমি চাচা বলে ডাকতুম, তোমার দাদা বিশ্বরূপ যেদিন পালিয়ে গেল তার পরদিন তোমার বাবা এসে আমার কাছে কত কাঁদলেন, আমরা দুই জনে একত্র বসে কাঁদলুম—নিমাই তোমার উপর আল্লার চোখ পড়েছে। তিনি কবে আমার উপর দয়া করবেন!

(দুই জনে আলিঙ্গন বন্ধ হওয়া)

যবনিকা পতন।



নূতন জগতের প্রতি কেশবচন্দ্রের বাণী *

ডাঃ শ্রীসত্যানন্দ রায় এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

কেশবচন্দ্র সেনের জন্মের শতবার্ষিকী উৎসবের প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির অর্বাং কলিকাতা ইউনিভার্সিটির আরম্ভের কথা মনে পড়ে। সেটি এখন আমাদের শিক্ষা-জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ হল শিক্ষার দ্বারা আমাদের তরুণদের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা। এই প্রতিষ্ঠানটিকে যিনি অল্পপ্রাণিত করেছিলেন তিনি হলেন কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত-রচয়িতা ও প্রিয় সহযোগীগিগের অগ্রতম প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ইনি যুবকদের উচ্চশিক্ষার জন্য এই শিক্ষা-সমিতিটি আরম্ভ করেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারই যে একমাত্র ছিলেন তাহা নহে, আরও অনেকে ছিলেন, তবে হয় ত তাঁরা তাঁর মত জন-পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু কেশবের ভালবাসা ও সেবাত্বের যাহুমন্ত্রের মোহন পরশ পেয়ে, যে-ভ্রাতৃসজ্জাটি গড়ে উঠেছিল এঁরা ছিলেন তারই অন্তর্গত। ভারতের জাগরণের যে কত বড় প্রয়োজন ছিল তা এঁরাই প্রথম বুঝেছিলেন। এঁরা দেশের জানা-অজানা নানা স্থানে ঘুরে ভ্রাতৃত্বের দাবিতে যাতে একের সঙ্গে অপরের মিলন হয় এই মহাবাণী প্রচার করেছিলেন। কলিকাতায় তাঁদের যে উপাসনা-মন্দির ছিল তাঁরা সেটিকে ভারত-প্রার্থনা-মন্দির (ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির) নাম দিয়েছিলেন। কেশবের নেতৃত্বে ভগবান ও ভারত—এই দুয়ের দাবী যে এঁদের কিরণ অটুট বাঁধনে বেঁধেছিল এ বিষয়টির দিকে সকলেরই লক্ষ্য করা কর্তব্য। পরস্পরের সহিত মিলনের প্রকৃত কেন্দ্রে আছে দুইটি এবং কেশবের বাণীর প্রাণের মূলে আছে প্রথমটি। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ও তাঁহারই জগতের অধিবাসী পুত্রকন্যাদের সঙ্গে মিলন—হ'ক সে পাপী—হ'ক সে গুণ্যবান—এই ছিল তাঁর বিশেষ বাণী। একরূপ মিলন হ'লে উইলিয়াম মরিস সাহেবের সঙ্গে সকলেই একমত হয়ে বলতে পারেন,—“মিলনই হল স্বর্গ, মিলনের

অভাবই হ'ল নরক এবং এ পৃথিবীতে যা কিছু করা যায় সবই করা হয় এই মিলনের জন্ত।” (জন বলের স্বপ্ন।)

যে জগৎ পরিবর্তনশীল, যে সভ্যতা বর্ধনশীল, সে নবজগতের প্রতি কেশবের যে বাণী তা' ভাল ক'র দেখলে, বোঝা যায় যে, যে পুণ্য-ভূমিতে তিনি জন্ম ছিলেন, যে গৌরবময় জাতির একজন ছিলেন তিনি, যে দেশ ও সেই জাতির প্রচলিত ধারার বাহিরে তিনি যাননি। ঈশ্বরের, সেই পরব্রহ্মের, সেই জগজ্জননীর পতাকার নীচে দেশের সব মানুষকে এক করার যে প্রয়োজনীয়তা এ কেশব বুঝেছিলেন বেশ স্পষ্ট করেই—তাঁর সময়ে সেই অবিশ্বাস, সেই নাস্তিকতা, সেই অজ্ঞতার মত তাঁর বাণী আমাদের দেশে এসেছিল অরণ্যে রেখে মত—“দেশের সন্তান, তোমরা এক হও, ভ্রাতৃ-জোরে তোমরা এক হও, এক মণ্ডলীভূক্ত ও তোমরা, তা হলে সব বিভেদ শুচে গিয়ে পূর্ণ মিলন স্থাপিত হবে। তবে এটা ঘটতে হলে ঈশ্বর ও মানুষকে জানতে হবে, তাঁদের ভালবাসতে হবে। ইটালির জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর লেওনার্দো দা ভিন্সিই বোধ হয় বলেছিলেন—“পূর্ণ ভালবাসা আসে পূর্ণ জ্ঞান হ'তে।” ভালবাসা ও জ্ঞান না থাকলে কেশবের বাণী বোঝা ও উপভোগ করা কঠিন। আজ পঞ্চাশ বছরেরও উপর হ'ল কেশবের মৃত্যু হ'ল কিন্তু জুংখের বিষয় এই যে এখনও দেশে ও বিদেশে অনেকে আছেন যাঁরা কেশবের বাণীর প্রকৃত মর্ম বোঝেন নি। বোঝাও শক্ত। পৃথিবী যে এখন তোলপাড় হ'ল বসেছে, ঈশ্বর ও মানুষের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছে এ হারাতে বসেছে সবাই।

* গত ১৬ই নভেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকীর উদ্বোধন উপলক্ষে অধ্যাপক সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতার প্রসঙ্গ লেখক কর্তৃক ইংরাজীতে পঠিত। শ্রীমতী দীপ্তি দেবী, বি, এ, বি, টি, কর্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত।

কেশব তাঁর “জীবন-বেদে” লিখেছেন যে সব জিনিষ-কেই তিনি সম্পূর্ণ দেখতে ভালবাসেন, নৈতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ নিখুঁত জিনিষই তাঁর প্রিয়। এক্সপ মাহুয্যে কচিনতে হলে তাঁর সঙ্গে মিলতে হবে, ভগবানের সঙ্গে মাহুয্যের সঙ্গে মিলতে হবে।

শেষাংশে তিনি যোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং যারা ছিলেন তাঁর অতি প্রিয়, অতি আপনাতার তাঁদের কাছে তিনি এ বিষয় বলবার বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্গভাষায় রচিত তাঁর “ব্রহ্মগীতোপনিষদে” তিনি যোগ সাধনের উপর যে ক্ষুদ্র মন্তব্যটি লিখেছিলেন তাতেও কেশব একটা নূতন আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তার ফলে ভগবানের নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র ভারত মিলিত হবে একদিন। “শুধু তাই নয়, ভারতের সঙ্গে বাকি জগতের মিল হবে, সব মাহুয্যের সঙ্গেই মিলবে সে। কেশবের যোগ সাধনা শুধু দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব প্রণালীতে আবদ্ধ নয় সেটি অনেকের মতের অঙ্কুলে। তাঁর যোগ সাধনা ছিল অন্তরের—যার বরে সহজ মাহুয্য অন্তর্দৃষ্টি পায়। নানা শাস্ত্রে এই সব “সহজ মানবের” উল্লেখও পাওয়া যায়। সৃষ্টির বিরাট রূপে ভগবান যখন নিজেকে দেখা দেন, যখন তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যকে বলেন “তুমি আমার অতি প্রিয়, তোমার প্রতি আমি বড়ই সন্তুষ্ট” এরাই হলেন ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র।

কেশব নিজেই বলেছেন যে আমাদের দেশের ঋষিরা সরল সহজ মানব, তাঁদের শিশুর মত মন নিয়ে তাঁরা আমাদের যুগের হাঙ্গুলি ও টিনডেলের চেয়েও অনেক দূরে গিয়েছিলেন এই অজানার অশ্বেষণে। এঁরা এ যুগের বিজ্ঞানের পথের তীর্থযাত্রীর মত, মৃত জড় পদার্থের বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা আরও এগিয়ে গিয়ে একেবারে সজীব ব্যক্তিত্বের শক্তির পরশ পেয়েছিলেন। শুধু জড় পদার্থ ও জড়ের শক্তি সর্বত্র দেখলে নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস জন্মায়। আদি কারণটি যার উপর নির্ভর করে আছে, সেই ব্যক্তিটিকে স্বাভাবিক প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে খুঁজে পাওয়াই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত অহুভূতি। বৈজ্ঞানিক যোগ সাধনার ইহাই অহুরমূল। এই আবিস্কারটি নির্ভর করে না কোন তর্কশাস্ত্রের উপর।

এই কর্মক্ষমতাই ব্যক্তিগত ক্ষমতা, এ দুইটিকে পর পর উপলব্ধি করা হয়। এ বিশ্বাস তর্কশাস্ত্র থেকে আসে না, এটা মাহুয্যের সহজাত জ্ঞান। এক বোধগম্য অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সে বোঝে এ দুইটিই এক। কেশবের যোগ-সাধনা নূতন, নূতন জগতেরই জন্ম। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন—“সে যোগী নয়, যে তাঁর ভগবানকে শুধু ধ্যানের মধ্যে পায় দেখতে।” সেই প্রকৃত যোগী যে তাঁকে তাঁর অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায় নিজের চাষ বাস, বেচা কেনা, প্রভৃতি সকল দৈনিক কাজের ভিতর।”

এরপর দেখা যায়, কেশব, যার জীবন আরম্ভ হয় সন্ন্যাসীর মত, পরে তাঁরই ব্যক্তিত্ব রীতিমত জাঁকাল হয়ে ফুটে ওঠে কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বটি আমাদের দেশের ধারণার সব কিছু ভাল নিয়েই গড়ে ওঠে। এম্বলেও দেখা যায় বেনব জগৎ অর্থাৎ আধুনিক জগতের আমাদের জন্মও কেশবের একটি বাণী আছে।

আজকাল কি ধর্মগত, কি পার্থিব নানা মতের নানারূপ বাদানুবাদ শোনা যায়। প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ আসন নেবার জন্তে ব্যস্ত। কিন্তু নিজেদের খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মতের দ্বারা একটি পূর্ণতম জীবন গড়ে তুলবার চেষ্টার মধ্যে তাঁরা পূর্ণত্বের ছবিটি হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা বিশেষ বিষয়টিকে করে ফেলেন বিখরানী। এঁরা এতগুলি মন্দিরের সৃষ্টি করেন যে তার ভিতর থেকে কোন একটিকে বিশেষ করে বেছে নেওয়া শক্ত। এজন্ত পৃথিবী যেন তোলাপাড় হ’তে থাকে। জগতের এ হচ্ছে একটা সঙ্কটাপন্ন সময়।

অনন্ত শৃঙ্খতার উপর অনন্ত শৃঙ্খতার চাপ পড়ছে। যারা কার্যতালিকা ও বক্তৃতামঞ্চের উপর তাঁদের বিশ্বাস রেখেছিলেন এখন তাঁরা বুঝছেন, তাঁদের বিশ্বাসের মিয়াদ ফুরিয়েছে। এই সময়েই এই নব যুগের নূতন সন্ন্যাসী কেশবচন্দ্র সেন আমাদের উদ্ধারের জন্ত এলেন। তিনি আমাদের চিরকালের জন্ত গেরুয়া পরতে বা ভিক্ষার ঝুলি হাতে করতে বলেন না, তিনি জনক, বশিষ্ঠ ও শুকদেবের প্রদর্শিত পথের পথিক হয়ে চলেন। তিনি আমাদের একটা নূতন সজ্জ গঠনের জন্ত ডাক দিয়েছেন। পুরাকালের সন্ন্যাসীদের মত এর জন্ত আমাদের অনেক

ত্যাগ করতে হবে—হয় ত অল্প সময়ের জন্ত সংসার থেকে সরে থাকতেও হতে পারে যদি সংসার আমাদের সম্পূর্ণরূপে মন কেড়ে নেয়। আমাদের পুরাকালের গুরু, আচার্য্য ও ষারা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা যে ভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন হয় ত আমাদের ও এইভাবে এক বিশ্বাসে ত্যাগের উষর মরুভূমির বুকের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এর জন্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ যেন হঠাৎ একটি নূতন আলোক ফুটে উঠছে। কেশবের মহামূল্য জীবন-চরিত পাঠ করে দেখি এই নূতন সন্ন্যাসী এই নূতন ভারতের নূতন আচার্য্য কোথাও থামেন নি—যেখানে থেমেছিলেন তাঁর উজ্জল পূর্বাধিকারী আচার্য্যগণ। তিনি আমাদের জীবনকে গ্রহণ করতে ডাকছেন, তাকে কাজ দিয়ে পরিপূর্ণ করতে বলছেন। স্বার্থের পাত্রটি উজাড় করলে পরে, সে পাত্র পূর্ণ হয় ভগবানের প্রসাদে। সত্য শিষ্য যিনি, তিনি কাজ বন্ধ ত করেন না, আরও বেশী

কাজ করেন কারণ ভগবানই তাঁর সারা জীবনটিকে ভরা রয়েছেন। এই ভাবে জীবন যখন ঈশ্বরের ভাবে ভরা হয় যখন ব্রহ্মে স্থিতি ব্রহ্মা সমষ্টি প্রাপ্ত হয় মানুষ, তখন তাকে এগিয়ে যেতেই হবে—কেশব যেমন এগিয়ে গিয়েছিলেন তার মাত্র অল্পদিনের পার্থিব জীবনে। ভগবান যেমত মত্ত ছিলেন তিনি। তিনি আমাদের কার্য্যকরী কর্ম্মী, বৈরাগী, ভক্ত ও জ্ঞানী হ'তে ডাক দিয়েছিলেন। যাতে সহজভাবে ঈশ্বরকেই জীবনে পরিপূর্ণ স্থান দিতে পারি। আমরা দৈনিক কাজ করে এগিয়ে যেতে পারি—ত্যাগের পথ ছেড়ে বা অতিক্রম করে। ভগবানের সন্তান আমরা। পূর্বের আদর্শ সামনে রেখে আমরা যেন যে যার নির্দিষ্ট কাজে কাজ করে যাই। এ ছিল তাঁর প্রেরণা এ ছিল তাঁর বাণী; ভগবান ও মানুষের নিঃস্বার্থ উৎসর্গ করে জীবন যাপন করতে আজ কেশবের আশ্রয় ডাকছেন আমাদের।

মন্দির

(গল্প)

গ্রামের নাম মাধবপুর। প্রকাণ্ড এক খরশ্রোতা নদী একেবেঁকে সেই গ্রামের চারিপাশ ঘুরে বয়ে গেছে। নদীর পশ্চিম পাড়ের অনেকটা জায়গা জুড়ে জঙ্গলময় গোড়ো একটা ভিটা আজও কোন্ দূর অতীতের লুপ্ত-প্রায় স্মৃতিচিহ্নগুলি বক্ষে ধারণ করে আশাহত, ভগ্ন-হৃদয় মল্লশূরার স্মার পড়ে আছে। সর্বত্রই শ্রীহীনতার কদর্য্যতা, একটা নিরাশ উদাস ভাব। দশ, বিংশ ঘর লোকের বসতি যা আছে নদীর এই পাড়েই। ও-পাড়টা যতদূর দৃষ্টি যায় একেবারে জনশূন্য, নির্জন—শুধুই ধূসর ফাঁকা মাঠ।

গেল বছর এমন সময় শেলী, কীটম্, সুনীলবার্ণ প্রভৃতির একসঙ্গে কাব্য গুঞ্জে আর মার্শেলের ইকুনমিক্সের বিরহ আবহাওয়ার মধ্যে যখন মগজটা গেছে বেজায় ফেপে, আর ক্ষণিক মুক্তির জন্ত, একটু ফাঁকা হাওয়ার জন্ত

শ্রীরাজেন্দ্রমোহন রায়, বি, এ

প্রাণটা করছে আঁকুপাঁকু সেই সময় বি, এ পরীক্ষার পরই বন্ধুর কাহ থেকে আমার মুক্তির ডাক এল এই অজানা গ্রামে।

আমরণ পাঠিয়ে বন্ধু লিখেছিল, এই স্থানর নিভৃত পল্লী তোমাকে মুগ্ধ করবে নিশ্চয়ই। তা করেছিল সত্যিই কিন্তু নদীর পাড়ের গোড়ো ভিটার সেই ভাটা চোরা পুরাণ মন্দিরটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল সবচেয়ে বেশী—বিস্মিত করেছিল তদপেক্ষাও অধিক।

মন্দিরটা হবে অনেক দিনের কিন্তু কতদিনের তা এ গ্রামের কেহই জানে না। সবাই জানে, এমন কি গ্রামের অতিবৃদ্ধ পাণ্ডেজী পর্যন্তও জানে যে ঐ গোড়ো ভিটার যাদের বাস্তুভিটা ছিল মন্দিরটা এককালে তারাই তৈরী করেছিল; কালের নিশ্বাস স্পর্শে সেটা ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু কেবল এইটুকু পরিচয়ে মন আমার কিছুতেই পরিভূপ্ত হয়নি। কতদিন সন্ধ্যাবেলাটাতে মন্দিরের

ভাঙ্গা সিড়ির উপর বসে বসে মন্দিরটার সম্বন্ধে কল্পনার কত রহস্যের জাল বুনেছি। কেবলি মনে হয়েছে হয়ত এইটাই মন্দির প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ নয়। যেই সে মন্দির প্রতিষ্ঠা করুক, যতদিনেরই হোক সেটা, মন্দিরের কারুতা দেখে কিন্তু বিস্মিত হ'তে হয়। যতই কথাশিল্পী হোক না কেন সে-স্বপ্না সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব।

ধ্বংসবহুল মন্দিরগাত্রে চিত্রিত বুদ্ধের অনেকগুলি ছবি এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। কোনটাতে বুদ্ধ গভীর রাজ্যে গৃহত্যাগ করে যাচ্ছেন; কোথায় লুপ্তনীর বনে বুদ্ধের জন্মের ছবি একে দেখান হয়েছে। কোনটাতে বুদ্ধের কঠোর তপস্যা-মূর্তি; আবার কোথাও বুদ্ধের মহান্নির্ব্বান লাভের সুন্দর ছবি। বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে আমার, কেবলি মনে হত এতগুলি বুদ্ধের ছবি মন্দির-গাত্রে—তবে কি এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধ ছিলেন? অথবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী না হয়েও তিনি বুদ্ধের অতুল্য, ভক্ত ছিলেন? যাহাই হোক মন্দিরটার প্রতি কেমন যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম আমি। আমার মনের সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি এইখানে একমুহূর্তেই কপূরের মত উবিয়ে যেত; একটা অভূতপূর্ব অল্পভূতিতে অন্তরটা উঠতো পরিপূর্ণ হয়ে—যেন সে এক কোন্ ঐজ্জ্বালিকের মায়া।

সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা।

রজত ধবল পূর্ণচন্দ্রের সত্ত্বগুণ হাসিতে স্বর্গের স্বপ্না ঝরে পড়ছে। ভিটার উপর সেই ভাঙ্গা মন্দিরের পিড়িতে বসে ভাবছি—এটা আজ জনশূন্য জঙ্গলময় পোড়ো ভিটা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দেড়শ বৎসর আগে কি তারও বেশী বছর আগে একদিন এখানে কোন মানব-পরিবারের সুখ-দুঃখের জীবনযাত্রা কেটে গিয়েছিল। তাদের হাসি-কান্না চাওয়া-পাওয়ার কোলাহল—সেই কত কালের পর থেকে ফিরে এসে আর এখন কোনই অভিযোগ করে না। সে আজ কোন্ সময়ের কথা কে জানে, যেদিন আরতির ঘণ্টাধ্বনি এখানে চিরকালের জ্ঞাত থেমে গিয়েছিল, প্রদীপশিখা শেষবারের মত দেবতার মুখ দেখে নিতে চেয়েছিল।

কেন জানি না কিসের একটা আচ্ছন্ন ভাবে ধীরে ধীরে কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। দেখলাম একটা

প্রদীপ জেলে কে একজন মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে স্পষ্ট দেখলাম লোকটা বৃদ্ধ, পরিধানে রক্তবর্ণ চেলীর-বস্ত্র, মস্তক মুণ্ডিত—পূজারী ঠাকুরের মত চেহারা; মন্দিরগর্ভে বেদীর সম্মুখে প্রদীপটা রেখে কতকগুলি সাদা ফুল বেদীর উপর ছড়িয়ে দিয়ে পূজারি ঠাকুর গড় হয়ে প্রণাম করলেন।

বললাম—এটা তো পোড়ো মন্দির তবে প্রদীপ জ্বাললেন কেন? আর প্রণামই বা করলেন কাকে, কোন বিগ্রহ ত নেই? পূজারি ঠাকুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর এত কাছে যে একটা লোক বসে আছে তা যেন তিনি দেখতেই পান নি। তারপর কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তিনি বললেন—দেখুন, আমরা হিন্দু জাতিটা ভাবের পূজারী, মন্দির বিগ্রহ এ সবই বাহ্যবস্তু মাত্র; আসলে কিন্তু আমরা করি এই ভাবের পূজাই। বিশ বছরের মত মাছুষের সমাধিস্থানে লোকে এখনও অর্ঘ্য দেয়, প্রদীপ জ্বালে; দিন রাজ্যে কত চোখের জল ফেলে। আর এই মন্দিরটা এখন ভেঙ্গে গেছে বলে একটা প্রদীপ জ্বালা যায় না? অন্তর্ধ্যায়ী ভগবান কি দূর থেকে ভক্তের একটা প্রণতি গ্রহণ করতে পারেন না? বেশ উত্তেজিতভাবে পূজারী ঠাকুর কথাগুলি বলে গেলেন।

বললাম—তবে এই মন্দির আর এই পোড়ো ভিটার ইতিবৃত্তটা বোধ হয় আপনার জানা আছে? কোতুল-ভরা দৃষ্টিতে পূজারী ঠাকুরের দিকে চেয়ে রইলাম। নীচের সিঁড়িটা বেড়ে-পরিষ্কার কবে নিয়ে বেশ আসন করে তিনি বসলেন। সেই চক্সালোকে দেখলাম, এই বৃদ্ধ বয়সেও পূজারী ঠাকুর বেশ সুপুরুষ আছেন। চোখে মুখে তাঁর কেমন একটা সৌম্য তেজঃপুঞ্জ ভাব। রক্তবর্ণ চেলীর কাপড়খানা গায়ে জড়িয়ে তিনি বলতে লাগলেন—সে সব অনেকদিনের কথা। তা এখন স্বপ্ন হয়ে গেছে। রাজা ওজলী ছিলেন তখন এই গ্রামের জমীদার আর ঐ পোড়ো ভিটার উপর ছিল তাঁর সুবিশাল অট্টালিকা। যৌবনে রাজা ওজলী ছিলেন যেমন শিকারপ্রিয় তেমনি কৌতুক-প্রিয়। একদিন চিরন্তন অভ্যাসমত রাজা গিয়েছেন শিকারে। সেই কোন্ সকালে তিনি বেরিয়েছিলেন, সারাটা দিন চললেন কেবল শিকারই করে। শিকার আর

শিকার। আর শিকারও সেদিন মিলে ছিল এত! রক্তে রক্তে রাজার তখন লেগে গেছে রক্ত নেশা। সংহার-পিশাচটা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তাই তিনি চললেন কেবল সংহারই করে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল; শিকার করা আর যায় না। কিন্তু রক্ত-পিশাচটা তখন গেছে ক্ষেপে। সে চায় রক্ত, চায় সংহার। উদ্ভ্রান্তের মত অবসন্ন দেহে রাজা এসে বসলেন একটা বিলের পাড়ে। রাশি রাশি রক্ত-দেহ পশুপক্ষী বোঝাট করে অনুচরবর্গ তাঁকে অনুসরণ করছিল। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে রাজা সেই শিকারগুলি দেখলেন। তারপর মাতালের মত টলতে টলতে তিনি এলেন বাড়ী ফিরে। সকলেই দেখে আশ্চর্য্য হল কিন্তু কারণ কেউই বুঝতে পারল না। উন্মাদের মত রাজা অস্থির ভাবে পাইচারী করতে লাগলেন। উঃ! উঃ! কী ভীষণ! কী ভয়ঙ্কর! শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, ক্রুর-দেহ প্রাণী যেন তাঁর দিকে ছুটে আসছে—ভয়ে রাজা চীৎকার করে উঠলেন। মনে হল যেন তারা তাঁকে আক্রমণ করছে, ভয়ঙ্কর ভাবে অভিযোগ করছে। আত্মহত্যা, চাট আত্ম-হত্যা—ভীষণ উত্তেজনায় রাজা উঠলেন চীৎকার করে।

পরদিন রাজাকে কেইই খুঁজে পেল না। তাঁর ছোট্ট ছুনিয়াটার মধ্যে তখন পড়ে গেল হাহাকার।

গল্পশ্রোতে বাধা দিয়ে বললাম—আচ্ছা, এত খবর আপনি জানলেন কি করে?

—সে কথা যে বলতেই হবে, মুক্তি যে আমার নেই,—বলে পূজারী ঠাকুর আবার বললেন—তারপর কি হয়েছিল জানেন? রাজা ওজশ্রী আবার ফিরে এসেছিলেন; সেই পাংগলের মত চেহারা নিয়ে নয়, প্রবল ঝটিকাবসানের পর সাগরের মত প্রশান্ত গম্ভীর মুক্তিতে। রাজ্যে ফিরে এনেই বিপুল অর্থব্যয়ে রাজা স্থাপন করলেন এই মন্দির আর প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর মধ্যে এক কষ্টি পাথরের ধ্যানরত বুদ্ধ-মূর্তি। রাজার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও সেখানেই হয়। তারপর তাঁর জীবন-যাত্রাটা হয়ে গেল খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজ। মন্দির আর বিগ্রহ এরই মধ্যে।

একদিন নিভুতে রাজা তাঁর একমাত্র সন্তান মেয়েকে

ডাকলেন—জয়ন্তী মা, শোন। তিনখানা ছবি জয়ন্তী হাতে দিয়ে রাজা বললেন—দেখেছিস—দেখ; বল ত কোনখানা ভাল?

সবিস্ময়ে জয়ন্তী চোখ মেলে দেখল, তিনখানা ছবিই সুন্দর। অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে জয়ন্তী বলল—এই ছবিখানাই সব চেয়ে ভাল বাবা।

অত্যন্ত খুসীর সহিত রাজা বললেন—ঠিক বলেছিস মা। এই হ'ল তোর পিতৃদেহ, তাকে আমি ছবিখান দিলাম।

পরদিন পট পরিবর্তন হল। রাজা ওজশ্রী হলেন আবার অদৃশ্য। আর জয়ন্তী—কে যেন তার অন্তরগটে একদিনের মধ্যেই নুতন করে গড়ে রেখে চলে গেছে নুতন যন্ত্রের নুতন ভাবে বেঁধে দিয়ে গেছে সম্পূর্ণ নুতন স্বর। তার ছুটি চোখে কে যেন দিয়ে গেছে মায়ের অঞ্জন মাখিয়ে। দূর হতে, বহু দূরের পার হতে ভেসে আসে সেখানে কোন্ এক দূর রহস্যপূরীর স্বপ্ন। * * *

জয়ন্তী নিল মন্দিরের খপরদারীর ভার আর তখন হতেই অবসান হল তার সেই পূর্ব জীবনের ধারার।

তার পর সেবার গ্রামে এল ভাদ্রের ভরা বর্ষা। যেন সেই ভরা বর্ষার সাথে ভেসে এল ভীষণ মড়ক। দেখতে দেখতে সমস্ত গ্রামটা পরিণত হল অশ্রানে। মৃত্যু রাঙ্গুনীটা তাতেও ভুগুত্ব হল না। একদিন তখন ওমাবস্তা রাতে উঠলো ভীষণ ঝড় আর বৃষ্টি। রক্ত চোখে প্রলয়ের দেবতা নেচে উঠলো অট্টহাসি হেসে। দুর্ভাগ্য অকাশ মণ্ডিত হল ঘন ঘন জীমূত-ধ্বনি। ভয়ানক বজ্র অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবীটা মসীলিপ্ত হয়ে গেল। হাত দূরের মাছ চেনা যায় না। বড় বড় গাছ পাণ্ডা উৎপাটিত হয়ে ছুটে চলল দূর হতে দূরান্তরে। নিম্নে মাঝে যেন কোথা থেকে কি হয়ে গেল। তার পর পৃথিবী উঠলো কঁপে। সে কী ভীষণ কম্পন! বুঝি এত প্রলয় না হয়ে আর যায় না। সব যাবে ধ্বংস হয়ে, যাবে সব রসাতলে। ভীত সন্ত্রস্ত পশু পক্ষীর কলকণ্ঠে বিলাপ যুব বুদ্ধের আর্তনাদে প্রবল বায়ু বনু বনু গর্জনে দিগন্ত বিদীর্ণ হতে লাগল। মনে হল আকাশের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেন লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণকায় দৈত্যদান।

সংহার মুর্তিতে ছুঁটাছুঁটি করে বেড়াচ্ছে—দাপাদাপি করছে।

সেই ঘুরঘুরে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে চলছিল এক সন্ন্যাসী, মস্তকে তার গৈরিক উষ্ণীয়। ছুঁতে ছুঁতে সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ান এই মন্দিরটার পাশে। হঠাৎ কি মনে হল, ছুটে চলল সে বাড়ীর মধ্যে। তারপর সেখান থেকে সে আবার বেরিয়ে এল ছুটে। মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত করতে লাগল। চীৎকার করে উঠল সন্ন্যাসী—জয়ন্তী মা, দরজা খোল, বেরিয়ে আয়, এফুনি বেরিয়ে আয়। ঝটিকা ক্ষুধা সেই বিরাট শূন্যতার মাঝে একটা হাহাকারের মত প্রতিধ্বনি হল। সন্ন্যাসী আবার চীৎকার করলো—জয়ন্তী মা, খোল, দরজা খোল এফুনি।

বহুদূর-হতে-ভেসে আসার মত একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কে বাবা. বাবা তুমি ডাকছ? ঠিক সেই মুহূর্তেই মন্দিরটা উঠলো ভয়ানক ঢুলে। তারপর শোনা গেল এক হড়মড় শব্দ।

পরদিন সকালে গ্রামবাসীরা দেখল, সেখানে মন্দির নেই। এক বিশাল ভগ্ন স্তূপ। জয়ন্তীর প্রাণহীন দেহ সেই ভগ্ন স্তূপের ভেতর হতেই বের করা হল। আর সেই সঙ্গে পাওয়া গেল একখানা ছবি—শ্বেত পদ্মের উপর সংস্থাপিত দুইখানি পাদপদ্মের সম্মুখে উপবিষ্ট পুষ্প-অর্ঘ্য দায়িনী এক নারীর মূর্তি।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে পূজারী ঠাকুর বললেন আর দুইখানা ছবির মধ্যে একখানা হল শিকার-প্রত্যাগত রাজ্য যে বিভীষিকা দেখেছিলেন তারই ছবি, অপরখানা হল এই মন্দিরের অভ্যন্তর প্রতিষ্ঠিত তথাগতের ছবি।

আমি বললাম—অজ্ঞ এই মন্দিরে প্রদীপ জেলে আপনি একটা পুণ্য কাজ করলেন। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা—মহাপুণ্য দিন। এই বৈশাখী পূর্ণিমাতে ভগবান তথাগত জন্মগ্রহণ করেন, নির্বাণ লাভ করেন, আবার মহাসমাধি লাভ করেন তিনি এই বৈশাখী পূর্ণিমাতেই।

পূজারী ঠাকুর বললেন, শুধু কি তাই, রাজার আদেশে জয়ন্তীকে যে এখানেই সমাহিত করা হয়েছিল। মন্দিরটা যে জয়ন্তীর সমাধি মন্দির ও। ঐ যে বেদীটা দেখছেন, ওই নীচে ত জয়ন্তী আমার গুয়ে আছে?

গল্প বলা শেষ হল। অকস্মাৎ পূজারী ঠাকুর 'জয়ন্তী জয়ন্তী মা আমাব', বলল একটা হাহাকার করে বেদীর উপর লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ধরতে গেলাম, অকস্মাৎ চমকে উঠে দেখি—স্বপ্ন। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছি! ধীরে বাড়ীর পথে চললাম, কিন্তু রক্তবর্ণ চেলীর কাপড় পরা শোকার্ত সেই পূজারী ঠাকুরের স্মৃতিটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। স্বপ্ন কি এমন করে বাস্তবের রূপে দেখা পারে পারে?

মৌর-পরিবারের জন্ম

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

সূর্য্যের বৃহৎ পরিবার। এই পরিবারের মধ্যে আছে নয়টি গ্রহ। আমাদের পৃথিবী তার মধ্যে একটি। গ্রহদের আছে আবার উপগ্রহ। কোন গ্রহের একটি কোন গ্রহের একাধিক। পৃথিবী ও নেপচুনের একটি করে, মঙ্গলগ্রহের দুটি, ইউরেনাসের চারটি, বুধ ও শনিগ্রহের ২টি করে উপগ্রহ।

উপগ্রহদের মধ্যে একমাত্র চাঁদের সঙ্গেই আমাদের বিশেষ পরিচয়। অন্য উপগ্রহদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় নেই। তাদের কোন কোনটিকে খালিচোখে

তারার এক ফুটকি আলোর মত দেখায় কিন্তু অধিকাংশ উপগ্রহকেই খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না।

গ্রহ ও উপগ্রহের সংখ্যা এই যে সব তা জোর করে বলা চলে না। কারণ প্রায় ২ বৎসর পূর্বেও একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে। সেই গ্রহটির নাম প্লুটো। বুধ ও শনির অনেকগুলি উপগ্রহকেই নূতন বলা যেতে পারে। কারণ বিশপচিশ বৎসর পূর্বেও তাদের কথা কেউ জানতো না। সুতরাং ভবিষ্যতে যে আরো গ্রহ উপগ্রহের আবিষ্কার হবে না তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া সৌরপরিবারে আর আছে ধূমকেতু ও উক্যপিণ্ডের দল। তাদের সংখ্যা অনিশ্চিত। এই সব নিয়ে সূর্যের পরিবার। এদের সূর্যের সন্তান সন্ততি বলা যেতে পারে। কারণ এদের সকলেরই জন্ম হয়েছে সূর্যের দেহ হ'তে।

সূর্যের দেহ হ'তে এদের কিরূপে জন্ম হ'ল? এ প্রশ্ন আজ নয়, আদি কাল থেকে মানুষ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এসেছে ও কোন না কোন উপায়ে তার উত্তর দেবারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজও এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া গেছে বলে দাবি করা চলে না।

বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহ নক্ষত্রদের সম্বন্ধে অনেক হুজুহ বিষয় ঠিক ঠিক জানতে পারলেও এ প্রশ্নটি এখনো তাদের নিকট অসীমায়িত রয়ে গেছে।

তার একটি প্রধান কারণ, আকাশ রাজ্যের কোটি কোটি তারার মধ্যে একমাত্র সূর্যকেই (সূর্যও একটি তারা) তাঁরা দেখেছেন এইরূপ একটি বৃহৎ পরিবারের দ্বারা পরিবৃত্ত হ'য়ে থাকতে। সূর্য ভিন্ন আকাশ-রাজ্যের অল্প কোন তারার চারিদিকে গ্রহ উপগ্রহের এইরূপ একটি চক্র তাঁরা আর দেখতে পান নাই। যদি থাকে তা এতদূরে যে আধুনিক যুগের সর্বাঙ্গপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণেও তা ধরা পড়ে নাই। সুতরাং তাঁরা মনে করেন, সৌরপরিবারের জন্ম আকাশরাজ্যের একটি আকস্মিক ঘটনা, এই আকস্মিক ঘটনাটির কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে। এ পর্যন্ত সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র বিশেষভাবে নীহারিকাদের সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার হয়েছে তার উপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিকগণ সূর্য পরিবারের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক মত প্রচার করেছেন।

তাঁদের একটি মতকে বলা হয় নীহারিকাবাদ। এ মতের খাঁরা প্রচারক তাঁরা বলেন একটি বিরাট বিশালকায় নীহারিকা হ'তে আমাদের সূর্য ও তার পরিবারের জন্ম হয়েছে। সে সময় এই নীহারিকাটি ছিল জলন্ত গ্যাসপুঞ্জের অবস্থায়। এই গ্যাসপুঞ্জটি তখন প্রচণ্ড বেগে আকাশে পাক খেতে ছিল। পাক খেতে খেতে সেই বেগ যখন একটা সীমাকে ছাড়িয়ে গেল তখন উহার উপরিভাগ হ'তে

যেখের ভায় হাক্কা টুকরো টুকরো জলন্ত গ্যাসীয় পদার্থ চারিদিকে ছিটকে পড়তে লাগলো। সেই এক একটি টুকরোই পরে জন্মে হ'ল এক একটি গ্রহ। মাঝের অবশিষ্ট গ্যাসপুঞ্জই পরে জন্মে সঙ্কুচিত হ'য়ে হ'ল সূর্য। জন্মের পর গ্রহগুলিও আকাশে তেমনি প্রচণ্ড গতিতে পাক খাচ্ছিল তাতে এদের দেহ হ'তে পুনরায় টুকরো টুকরো অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জন্ম হ'ল উপগ্রহদের।

এ ব্যাখ্যা খুবই সহজ। বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। আর একবারে অসম্ভবও নয়। কিন্তু ততদূর প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে এ মত আর টেকে না। সূর্য আকাশে এগিয়ে পাক খাচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রায় দু'শ'-তিন-শ' মাইল বেগে পাক খাচ্ছে। কিন্তু তবু সূর্যের এতটা গতি কখনো ছিল না। যার ফলে উহার দেহ হ'তে টুকরো টুকরো অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চারিদিকে ছিটকে পড়ে গ্রহদের জন্ম দিতে পারে। অন্ততঃ এখনো পর্যন্ত সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

নীহারিকাদের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। নীহারিকাদের একপাক ঘুরে আসতে লাগে কোটি কোটি বৎসর। অবশ্য এত সময় যে লাগে তার কারণ এই নয় যে তারা ছুটেতে জানে না। তাদের যে গতি পৃথিবীতে আমরা সে গতি কোথাও দেখতে পাইনে, এমন কি, সে গতি আমাদের কল্পনায় আনাও সম্ভব নয়। তবে যে তাদের ঘুরতে এত সময় লাগে তার কারণ তাদের বিরাট বিশাল আয়তন। কোটি কোটি বৎসরে একপাক ঘুরে আসবার যে বেগ তা কেটে যাবার, ভেঙ্গে চুরে যাবার বেগ নয়। অন্ততঃ আকাশরাজ্যে এখন পর্যন্ত যে প্রায় ২০ লক্ষ নীহারিকার ঘোঁজ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একরূপ কোন ঘটনাক্রম আভাসও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই মত পরিচালনা করতে হয়েছে।

অন্য একমত খুব আধুনিক। এই মত অনুসারেও সূর্য দেহ হ'তেই গ্রহ উপগ্রহদের জন্ম কিন্তু গতির বেগে টুকরো টুকরো অংশে ছিটকে পড়ে বা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নয়, টুকরো চোটে সূর্য-দেহের খানিকটা অংশ আলাগা হ'য়ে বা পড়ে। এ টান এসেছিল উহারই স্বজাতি আর একটি হ'তে।

সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হয়। দিনে রাত্রে ছুবার ক'রে সমুদ্রের জল ফেঁপে ফুলে ওঠে। সমুদ্রের জল যখন ফেঁপে ফুলে ওঠে তখন হয় জোয়ার, কিছুক্ষণ পর যখন সেই জল নেমে যায় তখন হয় ভাটা। সমুদ্রে জোয়ার ও ভাটা হবার কারণ পৃথিবীর উপর সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ। সূর্য ও বিশেষভাবে চাঁদের টানে সমুদ্রের জল ফুলে ওঠে। এই টানের নিয়ম প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন মহা মনীষী নিউটন সাহেব আপেল ফলের পতন দেখে। যে-টানের নিয়মে গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ে সেই টানের নিয়মে সমুদ্রের জলও ফেঁপে ফুলে ওঠে। এ টান শুধু পৃথিবী বা সূর্য-চন্দ্রেতেই আবদ্ধ নয়, এ টান বিশ্বব্যাপী। আকাশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারার মধ্যেও এই নিয়মের কাজ চলছে।

বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, সূর্য যখন জলন্ত গ্যাস-পুঞ্জের অবস্থায় ছিল তখন কোন শুভ কি অশুভ মুহূর্তে আকাশরাজ্যের অন্ত একটি তারার সঙ্গে উহার সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাৎ বলতে আমরা যা বুঝি, এ কিন্তু সে রকমের সাক্ষাৎ নয়। এ সাক্ষাৎ ঘটেছিল খুব কাছে হলেও কোটি কোটি মাইল দূর থেকে। আকাশরাজ্যে তারায় তারায় এরূপ সাক্ষাৎ হওয়া খুবই অভাবনীয় ঘটনা। কারণ খালি চোখে তারাগুলিকে নিতান্ত কাছাকাছি দেখা গেলেও কোনটিরই পরস্পরের দূরত্ব লক্ষ কোটি মাইলের কম নয়। এ অবস্থায় তারায় তারায় সাক্ষাৎ হওয়াকে অভাবনীয় ব্যাপারই বলতে হবে। কিন্তু যেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারা ভিড় ক'রে ছুটাছুটি ক'রে চলেছে যেমন ক'রে ছুটে চলে চাক-ভাঙ্গা মোমাছির ঝাঁক, আর যে চলা চলেছে কত যুগযুগান্তর ধরে, সেখানে কোনো স্বদূর অতীতে সে জায়গায় দুটি তারাতে এরূপ সাক্ষাৎ অভাবনীয় হলেও একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে।

এই সাক্ষাতের ফলে নবাগত তারার আকর্ষণে সূর্যের দেহেও লেগেছিল জোয়ারের টান। যে-টানে ফল মাটিতে পড়ে, যে-টানে সমুদ্রের জল ফেঁপে ফুলে ওঠে এও সেই বিশ্বব্যাপী মহাটান। এই টানের নাম দেওয়া হয়েছে মহাকর্ষণ।

এই টানে সূর্যের দেহও সমুদ্রের জলের স্তায় উঠেছিল ফেঁপে ফুলে।

মনে রাখতে হবে সূর্য ছিল তখন জলন্ত গ্যাসপুঞ্জের অবস্থায়। আর যে তারারটির সঙ্গে উহার সাক্ষাৎ হয় তারায় আয়তন ছিল সূর্যের আয়তন হতে অনেক বড়। গ্যাসপুঞ্জ জল হতে অনেক বেশী হালকা। সুতরাং নবাগত তারারটির টানে সূর্যের দেহ যখন ফেঁপে ফুলে উঠেছিল তখন উহার দেহ হতে টানের জোরে খানিকটা অংশ আলগা হ'য়ে বের হ'য়ে আসা কিছুই বিচিত্র নয়, ঘটেওছিল তাই।

নবাগত তারারটির আকর্ষণে প্রথমে সূর্যের দেহ উঠেছিল বিচলিত হয়ে। তারপর তারারটি যতই অগ্রসর হ'তে থাকে ততই সূর্যের এই বিচলিত ভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই টানে প্রথমে সূর্যের দেহ হ'তে বের হয়ে আসে একটি জলন্ত শিখা। টান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই শিখাটি ক্রমশঃই ফেঁপে ফুলে উঠতে থাকে এবং আয়তনেও বাড়তে থাকে। সেই শিখাটি সংচেয়ে বেশী ফুলে উঠেছিল নবাগত তারারটির যখন এসেছিল সূর্যের সবচেয়ে বেশী নিকটে।

নবাগত তারারটি দূরে সরতে আরম্ভ করলে সূর্যের উপর উহার টানের জোরও কমতে আরম্ভ হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদেহের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিখাটির ক্ষীতিও ক্রমশঃ কমে আসতে লাগলো। তারপর তারারটি এতদূরে চলে গেল যে উহার টানের প্রভাব সূর্যের উপর আর কিছুই রইল না।

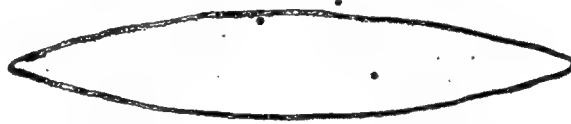
প্রভাব কিছু রইলনা কিন্তু টানের চিহ্ন রেখে গেল সূর্যের গায় বহু বহু যোজন বিস্তৃত একটি অগ্নিশিখা। এই শিখাটির চেহারা কেমন হ'তে পারে তা আমরা কল্পনা করে নিতে পারি।

অগ্নিশিখাটি সূর্যদেহ হ'তে নির্গত হ'য়েছিল নবাগত তারারটির টানে। সেই টানের জোর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিখাটিও ক্রমশঃ ক্ষীত হ'য়ে উঠেছিল। তারপর টানের জোর কমার সঙ্গে সঙ্গে শিখাটির ক্ষীতিও ক্রমশঃ কমে আসছিল। তাহ'লে মনে করা যেতে পারে শিখাটির চেহারা ছিল অনেকটা বাষ্পী সিগারের মত। ছুবার ছিল সুরু আর মাঝখানটা ছিল ফোলা। দেখতে ছিল অনেকটা পর পৃষ্ঠার প্রথম চিত্রের মত।

এই চিত্রটি নিতান্ত কাল্পনিক নয়। সূর্যের নয়টি

গ্রহ পর পর যেভাবে সাজানো আছে এই চিত্রটি তারই অনুরূপ। গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বুধ, তারপর শনি! এই দুটিই আছে মাঝখানে। এদের একদিকে আছে— পর্যায়ক্রমে ইউরেনাস, নেপচুন ও নবাবিস্কৃত গ্লুট; অল্পদূরে আছে যথাক্রমে মঙ্গল, পৃথিবী, শুক্র ও বৃহস্পতি। মঙ্গল, বুধের মাঝখানে আছে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র গ্রহের একটি দল বা বাঁক। এদের ইংরেজি নাম Asteroid বাংলায় গ্রহিকা নাম দেওয়া হয়েছে।

এখন এই কয়টি গ্রহের স্থানে সেই আয়তনের অনুপাতে ৯টি ছোট বৃত্ত পর্যায়ক্রমে অঙ্কিত করে তাদের চারিদিকে একটি রেখা টেনে দেওয়া যায় তাহলে সেই সীমাবদ্ধ রেখাটিকেও দেখাবে অনেকটা পূর্বোক্ত বাঁকা সিগারেরই



সূর্যের দেহে এইরূপ একটি অগ্নিশিখার জন্ম, এরূপ অনুমান করা খুব শক্ত নয়।

প্রথম চিত্র

মত। এই চিত্রের মাঝের অংশে বুধ ও শনিকে অনায়াসেই বসিয়ে দেওয়া যায়। এই স্থানেই ছিল শিখাটির বস্তুপুঞ্জ সব চেয়ে বেশী। কাজেই সেই বস্তুপুঞ্জ দিয়ে যে গ্রহ তৈরী হয়েছিল তাদের আয়তনও বড় হবে। বুধ ও শনির আয়তন তাই এত বড়। বুধ ও শনির দ্বারা যে কয়টি গ্রহ আছে তাদের আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট। নবাগত তারার আকর্ষণে যে ভাবে সূর্যের দেহে অগ্নিশিখাটির জন্ম হয়েছিল তাতে উহার দ্বারা ছোট গ্রহের জন্ম হবারই কথা। কারণ অগ্নিশিখাটির দ্বারাই ছিল স্রব। (দ্বিতীয় চিত্র) স্রব হবার কারণ নবাগত তারাটি তখন অপেক্ষাকৃত দূরে থাকায় উহার টানে সূর্যের দেহ হ'তে যে অগ্নি শিখা বের হয়ে এসেছিল তাতে তখন খুব বেশী বস্তুপুঞ্জ জমতে পারে নাই। সুতরাং গ্রহদের আকার ও সূর্যের দেহ হ'তে উহার পর্যায়ক্রমে পরে পরে যেভাবে সজ্জিত আছে তা দেখে একটি নবাগত তারার আবির্ভাব আর সেই আবির্ভাবে

সূর্যের দেহে এইরূপ একটি অগ্নিশিখার জন্ম, এরূপ অনুমান করা খুব শক্ত নয়।

তারপর আরম্ভ হল গ্রহ উপগ্রহের জন্মের পালা। এ অনেকটা বিশ্বস্থিতিরই কাহিনী। বিপুল, বিরাট আয়তনের এক একটি নীহারিকা হ'তে যেমন, করে এক একটি বিধোষ্টি হয়েছে সূর্য্যদেহ হ'তে উদ্ভিত অগ্নি-শিখাটি হ'তে তেমনি করেই গ্রহ উপগ্রহদের জন্ম হয়েছে।

অগ্নিশিখাটির ভিতর যে বস্তুপুঞ্জ ছিল তা ছিল অনেকটা নীহারিকাদের ভিতরের বস্তুপুঞ্জের মতই হালকা মেঘের মত। এই হালকা মেঘের অল্প পরমাত্র সমূহ পরস্পরের আকর্ষণে এক একস্থানে জটলা বেঁধেই ক্রমশঃ ঘন হ'য়ে জমে এক একটি গ্রহের জন্ম দিয়েছে। যেখানে বস্তুপুঞ্জ পরিমাণে ছিল

বেশী সেখানে জন্ম হয়েছে বড় গ্রহদের, যেখানে বস্তুপুঞ্জ পরিমাণে ছিল কম সেখানে জন্ম হয়েছে ছোট গ্রহদের। ছোট গ্রহদের মধ্যে আমাদের পৃথিবী একটি।

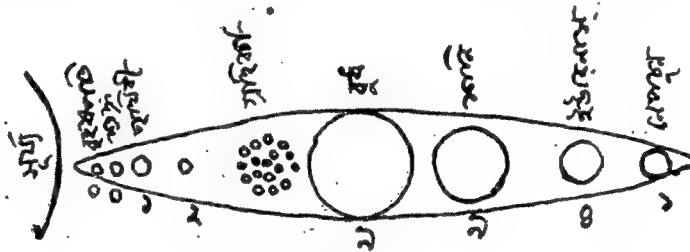
গ্রহের পর জন্ম হয় উপগ্রহদের। একটি নবাগত তারার আকর্ষণে সূর্যের দেহ হ'তে খসে পড়ে যেমন করে গ্রহের জন্ম হয়েছে তেমনি করে উপগ্রহদের জন্ম হয়েছে সূর্যের আকর্ষণে গ্রহদের দেহ হ'তে খসে পড়। গ্রহদের ঘন প্রথম জন্ম হয় তখন তাদের চলার পথ তেমন নির্দিষ্ট হ'তে পারে নাই। এখন যেমন তারা সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে তেমনি তখনো তারা সূর্যের চারিদিকে ঘুরছিল; কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে তখন এক একবার নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে দেই নবাগত তারাটির প্রভাবে উহার সূর্যের একটু বেশী কাছে এসে পড়ছিল। তারি ফলে সূর্যের আকর্ষণে তাদের দেহ হ'তে খানিকটা অংশ আলাগা হ'য়ে এক একটি চাঁদুনা উপগ্রহের জন্ম হয়েছে। বুধ ও শনিগ্রহের আয়তন বড়।

তাদের মধ্যে বস্তুপুঞ্জ ছিল বেশী। তাই সূর্যের আকর্ষণে তাদের দেহ হ'তে বস্তুপুঞ্জও বের হয়ে এসেছিল বেশী ক'রে। তাতেই তাদের চাঁদের সংখ্যা এত বেশী।

আমাদের চাঁদের জন্ম ঠিক এভাবে নাও হ'তে পারে। পৃথিবীর জন্মের পর পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপর পাক খাচ্ছিল আরো অনেক বেশী জোরে, প্রায় ছয় গুন বেশী জোরে। এই প্রচণ্ড পাকের দরুণই চাঁদের জন্ম।

বুধ ও শনির অপেক্ষা পৃথিবীর আয়তন ছিল অনেক ছোট। তাই শনি ও বুধের চেয়ে পৃথিবী অনেক পূর্বেই ঠাণ্ডা হ'য়ে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবী যখন তার মেরুদণ্ডের উপর প্রচণ্ড বেগে পাক খাচ্ছিল তখন সেই পাকের টানে ভিতরের তরল পদার্থের আলোড়নে উহার কটিদেশ (Equator) ফেঁপে ফুলে ওঠে। তখন সেই স্ফীত অংশে সূর্যের টানও পড়ে

মারের গ্রহটি সূর্যের চারিদিকে ঘুরবার সময় কোন কারণে তাল সামলাতে না পেরে নির্দিষ্ট পথ ত্যাগ ক'রে হয়তো বুধের দিকে একটু বেশী ঝুঁকে পড়েছিল। তারই ফলে বুধের প্রচণ্ড টানে গ্রহটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এরূপ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। যে টানে কতদূরে থেকেও সমুদ্রের জল ফেঁপে ফুলে ওঠে, যে টানে সূর্যের দেহ হ'তে ধানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চাঁদের জন্ম হ'তে পেরেছে সেইটানে একটা কঠিন দেহও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। আর সেই টান এসেছিল বুধের দ্বারা একটি বিরাট বিশাল গ্রহ হ'তে। শনির চারিদিকে দূরবীক্ষণে যে একটি চক্রাকার উজ্জল বলয় দেখতে পাওয়া যায় সেটিও এইরূপ একটি দুর্ঘটনারই ফল। এই বলয়টি ছিল এককালে শনিগ্রহের একটি চাঁদ বা উপগ্রহ। এই উপগ্রহটি শনিগ্রহের চারিদিকে ঘোরবার সময় পূর্বোক্ত



দ্বিতীয় চিত্র

একটু বেশী জোরে। ফলে সেই স্ফীত অংশে হতে চাঁদ খসে আসে। চাঁদ ও পৃথিবী এখন আর সেই তরল অবস্থায় নেই। পৃথিবীর ভিতরটা এখনো তরল আছে কিন্তু চাঁদের সবটাই এখন কঠিন—ভিতর ও বাহির দুই।

মঙ্গল ও বুধের মাঝখানে যে এক বাক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহিকার সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের জন্মকাহিনীর সহিত একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা জড়িত। এই ক্ষুদ্র গ্রহিকাগুলি এককালে ছিল একটি গ্রহ। সেই একটি গ্রহই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে এতগুলি গ্রহিকার জন্ম দিয়েছে। এ পর্যন্তও প্রায় দুহাজার এরূপ ক্ষুদ্র গ্রহিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। আরো যে কত আছে বলা শক্ত। এই দুর্ঘটনার জন্ত খুব সম্ভবতঃ বুধগ্রহ দায়ী।

গ্রহদের মধ্যে বুধ আয়তনে সর্বাপেক্ষা বড়। সূর্যের ওপর চাঁদের জোরও অল্প গ্রহদের চেয়ে বেশী। বুধ ও মঙ্গলের

গ্রহটির দ্বারা কোন কারণে তাল সামলাতে না পেরে নিজের নির্দিষ্ট পথ ত্যাগ ক'রে শনির রাস্তার দিকে একটু বেশী সরে গিয়েছিল। সে স্থান থেকে তার পূর্বস্থানে তাকে আর আস্ত ফিরে আসতে হয় নাই। শনির জোর টানে সেটি ভেঙ্গে শুধু টুকরো টুকরো নয়, একেবারে ধূলায় পরিণত হয়ে এখন বলয় আকারে এর (শনির) চারিদিকে ঘুরছে।

বাকি রইলো ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ডের দল। যে উপাদানে সৌর পরিবারের জন্ম হয়েছিল এ গুলিকে বলা যেতে পারে তারি পরিত্যক্ত আবর্জনা। সূর্য দেহের স্ফীত অগ্নিশিখা হ'তে গ্রহ উপগ্রহের জন্ম হবার পর কতক অংশ নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন আকারে শূন্যে পড়েছিল। সেই গুলিই এক এক জায়গায় জমে তৈরী হয়েছে ধূমকেতু ও উল্কার দল। দর্জির দোকানে জামা প্রভৃতি তৈরী হবার পর কতক কতক কাপড় টুকরো টুকরো আকারে দোকানে

ছাড়িয়ে পড়ে থাকে, ধূমকেতু ও উল্কার দলও তেমনি বিশ্ব-উপাদানের পরিত্যক্ত ছাড়িয়ে পড়া টুকরো। সূর্য্যের চারিদিকে এদের সংখ্যা অনিশ্চিত। উল্কার দল চলে সৌম্যাহির বাঁকের মত দল বেঁধে। ধূমকেতুর গতি অনিশ্চিত। এদের আবির্ভাব ও তিরোধানের মধ্যে কোন নিয়ম খুঁজে পাওয়া শক্ত। কয়েকটি ধূমকেতুর চলার নিয়ম আবিষ্কার করা হয়েছে। তারা একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে

সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। আকাশে যে কত ধূমকেতু আছে তা বলা শক্ত। কারণ অধিকাংশ ধূমকেতুকেই খাতি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না; তারা এত দ্রুত ছুটে চলে যে দূরবীক্ষণেও তারা সব সময় ধরা পড়ে না। সেইজন্যই হ'ল এদের আবির্ভাব ও তিরোধানকে অত্যন্ত রহস্যময় মনে হয়। তাই ধূমকেতু সম্বন্ধে লোকের মনে ভীতি এত বেশী।

বিজয়িনী

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

(৫)

হেমন্ত যখন গোড়োবাড়ীর দরজা ছাড়িয়ে রাস্তায় এল তখন সমরেশ ছিল পথে। সে বোড়া মাথায় ফিরছিলো গাঁয়ের মুন্সীর দোকান থেকে সওদা সেরে।

কলকাতাতে সেদিন একটা মোটা বকমের টাকার কাজ করে ওর মনটা হয়ে উঠেছিল খুশীতে ভরপুর। হাতে নতুন করকরে ছিল নগদ একশো বাইশ টাকা। তাই আসার সময় কিনে এনেছিল একটু মাংস, খাবে বলে। তারই আত্মসম্বন্ধ মসলাপাতি কেনার জন্তেও গিয়েছিল ঘরের দোর খোলাই রেখে। ও জানতো যে কোনও লোক ভুলেও পা দেয় না ওর বাড়ীতে। তাতেই ওর হয়েছিল সাহস। কিন্তু নিয়তি যে অকস্মাৎ নিদারুণ পরিহাস করে বাঘের ভয়ের পথেই দেবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে তা ও স্বপ্নেও পারে নি কল্পনা কর্তে।

পথশ্রমের শ্রান্তিতে পা আর চাইছিলো না চলত। কিন্তু মনের স্বাচ্ছন্দ্য আর উল্লাস এনে দিচ্ছিল আর একটা দ্বিতীয় শক্তি যা তাকে ক'রে মনে ভাবছিলো, আজকের রাতে আনন্দের খোরাক আছে ছুটো। এক স্তম্ভ দু মাংস, যার আনন্দন পায় নি প্রায় এক যুগ ধরে আর টাকার খলের ভারটাও বাড়বে আরও খানিকটা।

প্রতিদিনই রাতের খাবারের সময়ে আসতো একটা অপূর্ব সন্তোষ। মন হারিয়ে যেত এক না-জানা জগতে।

শ্রীনির্মলকুমার ভট্টাচার্য্য

স্নেহন থেকে পারতো ভুলতে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। সবই। নেশার মত আচ্ছন্ন হত মাতোয়ারা-স্বপ্নে যার নেই কোনই অস্তিত্ব অথচ দিতে পারে সাময়িক একটা ফাঁকা আরাম।

নিজের মনকে একা পাওয়ার তৃপ্তি অনেক। কেননা তখন তা ছাড়িয়ে চলে যায় ঘটন-অঘটন জীবনের সীমান থেকে অনেক দূরে। স্বপ্নে ভোজনের সময় সমরেশ প্রতি দিন একান্তে এই আরাগটুকু উপভোগ করত।

সওদা নিয়ে খুশী মনে ও গিয়ে ঢোক ঘরের ভেতর। চোখে ঠেকে না গোলমেলে কোন কিছুই। কেন। জিনিষগুলো উত্তরের কাছে বেখে দেয়। মনে ভাবে টাকাগুলোকে একবার দেখা যাক বের করে। ঠিক আগে কিনা দেখবার চেষ্টে নয়—প্রতি সন্ধ্যায় টাকাগুলোকে দেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল ওর নেশা।

বালি সরিয়ে ও তুলে ফেলে ইট ক'খানা। কিন্তু একি ওর বুকের স্পন্দন হয়ে পড়ে অনন্তব্রজ—গর্ত খালি একে-বারে? কে নিল, সত্যিই চুরী গেছে কিনা, সে সব যুক্তি এসে পৌছায় না ওর মাথায়। অতর্কিতে অভাবিত ঘটনায় সারা দেহ মনে জেগে ওঠে নিদারুণ ভ্রাস, ভয়াবহ আতঙ্ক।

সমস্ত দেহ ওর কাঁপতে থাকে থবু থবু করে। ত' স্বপ্নেও গর্তের ভিতর চালিয়ে দেয় হাত আবার। ভাবতে

চেষ্টা করে' ভুল দেখেই চোখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখে যে, না, চোখের হয়নি ভুল।

মনে করে, খেয়ালের বশে গত রাত্রে হয়তো রেখেছে অল্প কোন যায়গায়। খোঁজে ঘরের প্রত্যেকটি আনাচে কানাচে তন্ন তন্ন করে। বিছানা পত্র সব টেনে টুনে করে ফেলে একাকার। কিন্তু নিদারুণ সত্যের হাত থেকে পায় না মুহূর্তের জন্তেও রেহাই।

মাথাটা ছ'হাত দিয়ে ঘরে' চীৎকার করে ওঠে মর্শ্বস্তদ যাতনার বীভৎস কাতরতায়। হতাশা আর রিক্ততার ব্যাকুল বিস্তারে অল্পরপিত হয়ে ওঠে সে ধ্বনির ব্যঞ্জনা।...

কয়েক মুহূর্তের জন্তে হ'য়ে পড়ে নির্ঝাঁক। বিলাপের উত্তেজনা উন্নত আঘাতটাকে দিয়েছিল প্রাথমিক যতি। কিন্তু পায় না খুঁজে আর সেই বিস্মরণীয় গুহ, যন্ত্রচালিতের মত বসে' পড়ে চেয়ারটার ওপর।

ধীরে ধীরে মন থেকে মুছতে থাকে আঘাতের অবসাদ। নিঃসাড় চরণে চুপি চুপি এগিয়ে আসে চেতন রাজ্যে কোনরকম অপহরণের কথা।—যা ছাড়া আর কোন ঘটনাই পারে না ঘটতে এ সম্পর্কে।

...অন্ধকাের মধ্যে দেখা দেয় ক্ষীণ আলোকের রশ্মি-রেখা। চোর যদি হয় তা হলে তো ধরা পড়তেও পারে এবং টাকা ফিরত পাবার সম্ভাবনাও আছে। দেহে মনে সঞ্চারিত হতে থাকে নূতন শক্তি। চেয়ার ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ায় দরজার কাছে। বাইরে তখন চলেছে বর্ষণ অবিরাম ধারায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে—কখন চুরি গেছে? দিনের বেলায় নিশ্চয়ই নয় কারণ তখন দোর ছিল তালা বন্ধ। আর সন্ধ্যাবেলাও যা একটু বেরিয়েছিল তা ফিরে এসে দেখেছিল যে ঘরের সবই ঠিক ঠাক। তখন তখন কোন কিছু ঘটে যাওয়ার ছিল না চিহ্নমাত্রও।

এক বলকে ফেলতে থাকে সন্দেহের দৃষ্টি গ্রামের জানা অজানা সকলের ওপর। কে কবে কি রকম ভাবে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে, কি কথা বলেছিল, এই সব। ক্রমে ক্রমে সকলেরই ব্যবহার মনে হ'তে লাগলো ছুরভিসন্ধি-সজ্ঞাত। সবক্ষেত্রেই দিতে লাগলো প্রভূত সন্দেহের অবকাশ।

শেষ পর্যন্ত অধর নাপিতের ওপর সন্দেহটা গিয়ে পড়লো সবার চেয়ে বেশী। যখনই মাঠপারে কিংবা পথেরদ্বারে দেখা হ'য়েছে ওর সঙ্গে তখনই দৌতো হাসি। হেসে বলেছে—মহারাজ যে, কতদূর। মহারাজ কেন বলে জিজ্ঞেস করায় উত্তর দিয়েছে—ঘরে যে এদিকে গড়ে তুলেছেন জগৎ শেটের কোষাগার—এই রকম সব কথা।

...হ্যাঁ লোকটা কখনও ভুলেও টাকা ছাড়া আর কোন কিছুই কথা বলে নি। আবার একদিন বিড়ি ধরাবার অছিলায় দেশালাই চেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে অনেকক্ষণই।

...যাক বাঁচা গেল এবার। অধর নাপিতকে ধরা তো খুবই সোজা। অতএব টাকাটা পাবে ফিরে। ও চায় না তাকে দিতে সাজা। আইন আদালত, থানা এ সবের ওর নেই কোনই দরকার, খালি চায় টাকাটা।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে পড়ে সেই অঝোর-ঝরা বৃষ্টির মধ্যে খালি মাথায়। ঘরটা পড়ে থাকে খোলাই। কেননা হারাণোর মত আর কোন কিছু ছিল না সেখানে।

দৌড়োতে দৌড়োতে গিয়ে থামে জমিদার প্রসন্ন চৌধুরীর দরজায়। সেখানেই বসে প্রতি সন্ধ্যায় মাতব্বরদের মজলিস; স্বয়ং প্রসন্ন চৌধুরী মজলিসের কর্তা, তা' পাশা গড়গড়া এবং আরও কতকির সাহচর্য্যে। ওর আজ চাই এদের সকলের সহায়তা। মাতব্বররা মাথা না বামালে টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা বড়ই অল্প।

(৬)

সমরেশের পাতুর শীর্ণ দেহটিকে ঘরের মধ্যে আচম্বিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সকলেই গেল ভাবাচা'কা খেয়ে, কারণ ও যখন দরজা দিয়ে ঢোকে ঘরের মধ্যে তখন পড়েনি সেদিকে দৃষ্টি কান্নরই। তাই তাকে চারিদিকে বিস্ময়কর ভাবে এলোমেলো দৃষ্টি মেলতে দেখে সবাই আতঙ্কে হয়ে পড়লো হতভম্ব।

গ্রামের পুরোহিত বিষ্ণুভর ভট্টাচার্য বরাবরই বলে আসতেন, লোকটার ওপর আছে অপদেবতার ভর। সেই কথাটাই যুগপৎ পড়ে গেল সবার মনে।

এই আকস্মিক উৎকর্ষা অপনোদনের চেষ্টা করলেন জমীদার প্রসন্ন চৌধুরী স্বয়ং, মনে মনে তিনি ভেবে নিলেন

যে তাঁর দিক দিয়ে যখন লোকটার প্রতি কোন রকম খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে বলে তাঁর মনে হয় না, তখন ভূতই হোক আর প্রেতই হোক সে ঠা কব্বে না কোনই ক্ষতি। তাই একটু সহানুভূতিশূচক মোলায়েম স্বরে তিনি জিজ্ঞাস করলেন—আপনি কি চান?

হাঁপাতে হাঁপাতে সমরেশ উত্তর দিলে—চোর মশাই, চোর, আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে চুরি করে। আমি জমিদার বাবুর কাছে এসেছি সাহায্য চাইতে, তিনি যদি দয়াকরে পারেন চোর ধরে আমার টাকাগুলো উদ্ধার করে দিতে।

এবারে জমিদার বাবু বললেন—অধর, ঠিক ধরে বসিয়ে ভিজ জামা-কাপড়খানা ছাড়িয়ে দে, আমার মনে হয় ওঁর মাথার এখন ঠিক নেই।

জমিদার বাবুর মুখে অধরের নাম শুনেই সমরেশ কোথায় সে আছে তা জমিদার বাবুর দৃষ্টি অহুসরণ করে ডাকলে তার নাম ধরে। এ ডাক শুনে অধরের ধড়ে প্রাণ না থাকার যোগাড়। অমত্যা অমত্যা করে সে বললো—কেন? সমরেশ একটু অহুসরণের স্বরে বলে উঠলো—দয়া করে আমার টাকাগুলো ফিরিয়ে দাও। আমি তোমার কোন সাজাই দিতে চাই না। আইন-আদালতে কিছুই করবো না! এমন কি তোমায় একটা মোহর পর্যন্ত বখশীস দেবো।

—হায় অদৃষ্ট! আমি গেছি আপনার টাকা চুরি কর্তে, ও কথা বলবেন না বলছি তা হলে কিন্তু ভাল হবে না—অধর বলে উঠলো।

জমিদার বাবু বলে উঠলেন—আপনার যদি কোন কিছু থাকে নালিশ করবার তা হলে একটু ভাল করে শান্তভাবে বলুন, যাতে আমরা বুঝতে পারি ব্যাপারটা কী? তা না করে একে ওকে দোষ দিতে থাকলে আমরা বুঝবো কি করে? সমস্বরে সকলেই সে কথার প্রতিধ্বনি করে বলে উঠলো, তাই তো, তাই তো।

সমরেশ একরকম অনিচ্ছা স্ববেগে গায়ের জামাটা খুলে পড়লো বসে। তারপর জমিদার বাবুর দিকে ফিরে আত্মপূরিক সমস্ত ব্যাপারের কল্লি যথাযথ বর্ণনা। সকলের কাছেই তা ঠেকলো অদ্ভুত রহস্যময়। সকলেই করে

তুললো প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু কেহই পারলে না করতে কোন একটা কিনারা।

সমরেশেরও মন যদিও ছিল টাকার চিন্তায় কাতর, তবুও এতগুলো লোকের সঙ্গে নতুন করে সংস্পর্শে এসে পড়ায় অজ্ঞাতসারে তার মনের ওপর আরম্ভ হল এক অচেনা ভাবের প্রতিক্রিয়া; সে বাঁধা পড়ে গেল নিজের অগোচরে এদের মনের সঙ্গে! এরা সবাই চায় ওর বিপদের আশু প্রতিকার! দিতে চায় আশ্বাস, নির্ভরতার ইঙ্গিত, মুছিয়ে দিতে চায় ওর সব-হারানোর অশ্রু-রেখা।

চোরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই কবুতে থাকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ। স্বরেন ভট্টাচার্য পণ্ডিতের মত যুক্তি দিয়ে দিলেন বুঝিয়ে, এ চোর কোন মানুষ নয়। নিশ্চয়ই কোন অপদেবতা! তা না হলে চুরিটা হয় কি করে এত রহস্যময়!

জমিদার বাবু সব কথা শুনে একটু জোরে বললেন—দেখুন আপননি মিছি মিছি আর অধরের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন না কারণ যদিও ও সাধু সন্ন্যাসী নয় মোটেই, তবুও এ ব্যাপারটায় ও একেবারে নিদোষ, তার প্রধান প্রমাণ এই যে আপনি ঘর খুলে রেখে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই ও আছে এখানেই বসে।

স্বরেন ভট্টাচার্য ফস করে ফোড়ন দিয়ে বললেন—আর তা ছাড়া নিদোষীর ঘাড়ে দোষ চাপালে আপনার পাপের ভার বাড়বে বই কমবে না।—কথাটা বলার উদ্দেশ্য যেন সমরেশের অনেক পাপের ফলেই গেছে টাকাটা চুরি।

সমরেশ এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে অধরের হাত দুটো ধরলে নিজের হাতে, তারপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে যেন বুঝলে প্রকৃত পক্ষে সে নিদোষী, তারপর বলল, তুমি কিছু মনে কর না। টাকার শোকে আমরা মাথা গেছে খারাপ হয়ে। তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকিয়ে আর্ন্তের মতন বলে উঠলো—আচ্ছা, তা হলে আমার টাকা কোথায় গেল?

একথায় স্বরেন ভট্টাচার্য আর একবার দিয়ে উঠলো ফোড়ন—যেখানে যাবার সেখানেই।

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য হঠাৎ এই ফাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসলো, সব শুধু আপনার কত টাকা ছিল।

—দু'হাজার সাতশো বিরানব্বই টাকা সাড়ে তের আনা,

কাল রাতেও আমি রেখেছিলুম গুণে :—সমরেশের গলার স্বর শেষের দিকটায় একটু ধরে এসেছিল।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু সবে রবার্ট ব্লেকের বাংলা অনুবাদ পড়তে করেছিলেন আরম্ভ। তারই পরিচয় দিতে বুল্লেন—এ বিষয়ে আমার মত এই যে আমরা কয়েকজনে মিলে গিয়ে একবার আপনার বাড়ীটা পরীক্ষা করে দেখি, হয়তো অনুসন্ধানের কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

জমিদার বাবু ও কথায় দিলেন সায়। কিন্তু অত রাতে তায় আবার বিষ্টির মধ্যে, তাই নিজ চাইলেন না যেতে। বুল্লেন, সুরেন, তুমিই যাও আমার প্রতিনিধি হয়ে।

সুরেন ভট্টাচার্য করে উঠলো নাকি সুরে—হেঁ হেঁ হেঁ—

সমরেশ আবার নামলো পথে। সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় আর সুরেন ভট্টাচার্য। ঘনিয়ে আসা রাতের নির্জন মুহূর্তগুলি আনছিলো ওর পক্ষে অসহ্য যাতনা। গাঁয়ের আর সকলে তখন নির্ভর স্থবৃষ্টির কোলে দেহমনকে এলিয়ে দেবার ক'রুছিলো উদ্যোগ।

(৭)

পরের দিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে পড়ে' গেল মহা হুলস্থূল। চুরির খবরটা ঘরে ঘরে জাগিয়ে তুললো উত্তেজনা। মুগাক চৌধুরীও শুন্লো ব্যাপারটা কি? তাকেও একটু মাথা দিতে হ'ল অনুসন্ধান আর প্রতিকারের উপায় চিন্তায়।

রাত্রে বিষ্টি হওয়ার দরুণ পায়ের দাগ টাগ কোন কিছুই দেখতে পাওয়ার ছিল না উপায়। কিন্তু পুনরায় গভীর অনুসন্ধানের ফলে ধানক্ষেতের আলের মধ্যে পাওয়া গেল একটা ছোট গহনা রাখার বাস। আর কি—অনুসন্ধানকারীরা বিজয়োল্লাসে হ'য়ে পড়লো অসীম গর্বিত। কিন্তু সমরেশ বলল যে সেটা তার নয়। কিন্তু তা' হলে কি হবে, তাদের জোর ধারণা যে এর সঙ্গে চুরীর আছে কোন না কোন সূত্র।

সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হ'য়ে থাকতো সেই ধারারই অনুসরণ করে' এ বিষয়ে জমিদার বাবুকে চরম অভিমত দেওয়ার জগ্জ করা হ'ল আছবান। তিনিও অনেক

বিজ্ঞতা আর চিন্তার ভাব দেখিয়ে বুল্লেন—আমার বেশ মনে পড়ে, মাস তিনেক আগে গ্রামে একটা ফেরী-ওয়াল্লা এসেছিল তারই কাছে ছিল ঐ বাস। লোকটার কথাবার্তা ধরণধারণ সবই যেন কি রকম সন্দেহজনক বলেই হ'য়েছিল আমার মনে। আর তা ছাড়া চেহারাটাও ছিল তার একবারে চোর-ভাব-মাখানো।

সমরেশকে প্রণয় ক'রে জানা গেল যে একদিন মাত্র মিনিট খানেকের জন্তে লোকটা তার দরজার কাছে এসে পেড়েছিল হাঁক। কিন্তু ও বেরিয়ে এসে কিছু চায় না বলায় দ্বিধাক্তি না করে' চলে যায়।

কিন্তু বুল্লেন কি হবে সকলেরই ধারণা, কে বলতে পারে যে লোকটা ওখানেই ক'রতো না ঘোরাফেরা সারাদিন। কেউই তো আর ওখেনটায় দিত না পাহারা। আর তা ছাড়া সমরেশের যে টাকটা আছে সে কথাটাই তো ছিল অনেকের অজানা। একদিন হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়েই সে সাধু সাজবার জন্তে হাঁক পেড়েছিল। ঐ লোকটাই যদি চোর না হবে তা' হলে বাসটা আসে কেমন করে? খুব বরাত জোর যে সমরেশকেও রেখে যায়নি খুন করে। খুনী, ডাকাত সবই তো ও রকম এক এক সাজে বেড়ায়। তুলসী চক্কোত্তি ঐ কথার সমর্থন ক'রতে তার একটা জানা ঘটনার উল্লেখ করে' বল্ল, কবে একবার ঠিক ঐ ধরণের ফেরীওয়াল্লা কোন গ্রামে খুন করে' ধরা পড়ে' জেলে গিয়েছিল।

প্রমাণ না থাকা স্বত্তেও সমরেশ ভাবতে চায় ফেরী-ওয়াল্লাই করেছে টাকা চুরি। কেননা ও চায় যে-কোন একটা সূত্রপাত যাতে টাকটার সন্ধানস্থল সম্বন্ধে পাওয়া যেতে পারে ক্ষীণতম আভাসও। প্রথমে তাই ও ভেবেছিল, হয়তো কুড়িয়ে পাওয়া বাসটার মধ্যেই আছে ওর টাকা। সকলের সম্মতিক্রমে ঘটনাটা পৌছে দেওয়া হ'ল থানায় দারোগা বাবুর কাছে। কারণ পুলিশের লোকেরা নিশ্চয়ই কোন কিছু সূত্র না থাকলেও চোর ডাকাত ধরতে ওস্তাদ। বাস সমেত ফেরীওয়ালার এমন তথ্য হাতে গেলে নিশ্চয়ই তারা দেবে না ছেড়ে।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপার ঘটলো অল্প রকম। কালো যমদুতের মত চেহারা, রোগা ফরসা হাড় বের করা,

কৌকড়া-চুল, মাথা নেড়া ইত্যাদি উজ্জ্বল খানেক ফেরী-
ওয়ালায় অস্তিত্ব পাওয়া গেল, শেষ পর্যন্ত দারোগা বাবুর
জেরায়। অতএব বহুবারস্তে লঘুক্ৰিয়া। ঘটনায় পড়লো
এখানেই ইতি।

দারোগাবাবু বল্লেন—আচ্ছা ব্যাপারটা রইলো
আমাদের হাতে, উপযুক্ত স্ত্র পেলো ছেড়ে দোব না
সম্ভাবহার কর্তে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। গ্রামের লোকদের
উৎসাহ আর উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে ঘনিষে আসে শৈথিল্য।
শেষ পর্যন্ত ক্ষতি যার তারই থেকে যায়।

*
*
*

হেমন্ত চৌধুরীর আকস্মিক অন্তর্ধান কি বাড়ীতে
কি গ্রামে কোথায় জাগিয়ে তুললো না অল্পসন্ধান-

লিপ্সা। সবাই তার চরিত্রে এ রকম ঘটনাকে স্বা-
ভাবিক বলে' কর্তো মনে। এই তো সে দিনও
মাসখানেক আগে বাপের সঙ্গে বাগড়া করে' হয়েছিল উধাও
দিন সাতেকের জন্তে।

প্রসন্ন বাবুর কিন্তু এ দফায় তার ওপর রাগটা গিয়েছিল
সীমা ছাড়িয়ে। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন যে এবার
এলে সোজা দেখিয়ে দেবেন রাস্তা।

মৃগাক্ষ ধরে নিয়েছিল যে গাড়ীখানার মাথা খো-
মহাত্মা কোথায় কোন আড্ডায় গিয়ে চালাচ্ছে ফু-
হুয়া। তারপর যখন হাতে আর থাকবে না একটিও
আধলা তখন আবার কি এক নতুন মতলব ভাজতে
চালাবে বাড়ীর দিকে। কাজে কাজেই সমরেশের টা-
চুরির সঙ্গে তার যে কোনও যোগ থাকতে পারে তা কেউই
ক'লে না কল্পনা।

ক্রমশঃ

জল

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

পঞ্চ ভূতের মধ্যে অপেক্ষে যে জাতি “জীবন” বলে,
সে জাতীর জ্ঞানের তুলনা নাই। “ওয়া” “ওয়াখা,”
“ওয়াটার”, “জীবন”, “নার” শব্দের তুলনায় কিছুই নহে।
জল ভিন্ন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, দেব দানব,
মানবের বাঁচা চলে না ব'লেই জলের নাম এই জাতি রেখেছে
জীবন। জলকে শুধু ‘নার’ ব'লেই ও জাতি ক্ষান্ত হয় নাই।
বলছে—অপ নারায়ণ।’ জলের এমন নামকরণ কর্তে
পৃথিবীর আর কোনো জাতি পেরেছে কিনা সন্দেহ। সৃষ্টি,
স্থিতি ও লয় তিনই এই জলে। সেই কারণেই বুঝি অপো
নারায়ণ”।

জল ভিন্ন সৃষ্টি হ'তে পারেনা, সৃষ্টি জীব বাঁচতে পারেনা
—ধ্বংস হ'য়ে যায় সমস্ত। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে চন্দ্ৰের
দিকে চেয়ে দেখ—দেখা যা'বে, ও উপগ্রহ দূর থেকে দেখতে
যত সুন্দরই হোক, চন্দ্ৰের ক্ষেত্র সাহারার চেয়ে
ভীষণতর স্থান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এখন। এমনটা হয়েছে
কেবল জলের অভাবে। ওখানে পাহাড় রয়েছে, -দ-

নদীর বিচিত্র গর্ভ রয়েছে, নাই কেবল জল। জলের
অভাবে সেটা হ'য়ে গেছে বিরাট মরুভূমি। সাহারায় বৃহৎ
স্থানে স্থানে জল পাওয়া যায়—জল আছে ব'লেই
সাহারাতেও জন্মায় গাছ পালা—যাতে হয় মরু কানন—
“ওয়েসিস”। কিন্তু চন্দ্রলোকে নাই সে জলে ছিটে-
কোঁটাও। সেই কারণে সৃষ্টি সেখানে হয়েছে সৃষ্টিছাড়া।
চন্দ্র তাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে নরক বিশেষ। গাছ, পালা,
জীবজন্তু কিছুই সেখানে জন্মা'বার উপায় নাই। বাতাসের
অবস্থাও তথৈবচ। এক জলের অভাবে ধ্বংস-লীলা
সেখানে এমন প্রকট।

মঙ্গল গ্রহ, যেখানে অপূর্ব স্ত্রী-পুরুষ, অপূর্ব উদ্ভিদ-
রাজ্যের কথা আমরা এতদিন শুনে আসছিলাম, সেখানেও
জল শুকিয়ে আসছে ব'লে অনেক বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস।
যে পরিমাণ জল এখন আছে সেখানে, তার চেয়েও
বেশী থাকার দরকার ছিল, এমন কথাও কোনো কোনো
বৈজ্ঞানিক বলছেন। এমন বলার কি মূল্য, বৈজ্ঞানিকগণই

বলতে পারেন। কেননা, সৃষ্টি-তত্ত্বটা কারো মুখাপেক্ষী হ'য়ে কাষ করেনা আদৌ।

সে যাই হোক, যে জল আছে, তা'তেই সেখানকার সৌন্দর্য্য নাকি অপূর্ণ। কিন্তু জল যদি শুকিয়ে যায়, তবে সৌন্দর্য্য যা'বে কপূ'রের মত উপে। বৈজ্ঞানিকের দল ত কোমর বেঁধে মঙ্গল গ্রহের জ্বী-পুরুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করছেন, নবাবিকৃত যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গল গ্রহবাসীদের ইঙ্গীতের ভাষা ঠিক বুঝতে না পারলেও তা' ধরবার জন্ত সচেষ্ট। অগ্নিবাহণ অর্থাৎ হাউই হাওয়ায় নিষ্কেপ ক'রে সেখানকার অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়াস পাচ্ছেন। কিন্তু ও গ্রহটাও জলের অভাবে যদি সত্য সত্যই মরুভূমিতে পরিণত হ'য়ে পড়ে, তবে বৈজ্ঞানিক-গণের সকল চেষ্টা, সকল যত্ন পণ্ড হ'য়ে যাবে। থাকে বস্তু, নিয়ে কথা। দ্বিখিজরী বৈজ্ঞানিক লাইসন বহু গবেষণার পর স্থির করেছেন, মঙ্গল গ্রহের পরমাণু প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। আমাদের পৃথিবীতে জল আছে এখনো অনেক। তাই বোধ হয়, জলে পড়লে জীবের হয় অসাচ্ছন্দ্য—শেষে মৃত্যু। কিন্তু মঙ্গল গ্রহে লয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে জলের অভাব। কারণ সলিল মঙ্গল গ্রহে আর থাকবে কি না, খেয়ালী প্রকৃতিই জানে।

কিন্তু পৃথিবীতেই বা তেমন জল আর কৈ? প্রলয়-পয়োধির জল ত আর নাই। সে জলের এমন হ্রাস হয়েছে, যে তা'মেপে এখন পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞান বলে সকল সিদ্ধুরই মাপ্ যোপ্ হ'য়ে গেছে এখন। চার পাঁচ মাইলের অধিক গভীর সমুদ্র আর বড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা। অনন্ত সমুদ্রের সে জল গেল কোথায়? জল যদি এমন ভাবে কমতে থাকে, আমাদের পৃথিবীই বা টিকবে আর ক'দিন? এক জল বিহনে এত কাণ্ড। জলের মহিমা এমনই ব'লে আমরা ব'লে থাকি—অপো নারায়ণ।

নদ নদী, সমুদ্রের জলই যে শুধু ক'মে আসছে, তা নয়; পঙ্কজ দেবও বিরূপ, অবদান্য হয়েছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের পৌরাণিক বৃষ্টি-ধারার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমরাই যে বৃষ্টিপাত দেখেছি তার অধিকও দেখা যায় না এখন। স্ততরাং কেমন ক'রে অস্বীকার করা যায় যে বৃষ্টিপাত হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে না।

অনেক নদ নদীও যে শুকিয়ে যাচ্ছে, তা'র প্রমাণের অভাব নাই। অলকানন্দা, ভোগবতীর কি দুর্দশা হ'য়েছে এখন, সেটা ঠিক বলতে পারা যাচ্ছেনা, তবে ভাগিরথী ও অগ্নান্য নদনদীর যে পূর্ব ভাব নাই, সে কথা স্বীকার করতেই হ'বে। অতঃপর? উত্তর খুব সোজা। জল কমলেই সারা পৃথিবী হ'বে ভীষণ মরুভূমি।

মানুষ ত এখন উড়ছে আকাশে পক্ষা দ না থাকলেও। হিমালয়, আন্ প্ স প্রভৃতির তুঙ্গ শৃঙ্গও এখন অভিযান চলেছে। বিজ্ঞানের বাহাহুরী বটে! কিন্তু জল কমার সম্বন্ধে আলোচনাটা হচ্ছেনা কেন? “আবুহে সেন” নাটকে মহাকবি গিরীশচন্দ্র এক পাগলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন কি, পাঠকের সেটা মনে আছে বোধ হয়। পাগল, সোণার পৃথিবী গ'ড়ে দিবার আশা দিয়ে গেছে। ব্যঙ্গ কি শেষে বৈজ্ঞানিক যুগে সত্যে পরিণত হ'বে নাকি? বিজ্ঞানের শক্তিতে পৃথিবীতে তাল তাল সোণাও হয়ত যত্রতত্র পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু জলের ঢল ও শক্তিতে বাড়'বার উপায় আছে কিনা, তা'র একটা পরীক্ষাও ত হচ্ছেনা।

আচ্ছা, এত জল যে ছিল, সে জল এত শীঘ্র এত ক'মে গেল কি কারণে? এ প্রশ্নের উত্তর খুব বড় বৈজ্ঞানিকও কতটা দিতে পারেন, তা' বলা কঠিন। যদি বলা যায়, সূর্য্যতাপে জল ধারণ করছে বাষ্পের আকার, তা'তেই জল যাচ্ছে অত চটপট ক'মে, সেটা হবে অবিদ্যাস্য কথা। সূর্য্যের অনেকাংশ এখন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে ব'লে সূর্য্যের তাপ বরং হ্রাস পা'বারই কথা। আর হ্রাস বোধহয় হয়েওছে। স্ততরাং আমাদের পৃথিবীতে যেখানে তিনভাগ জল, এক ভাগ স্থল, সেখানে এমন ভাবে জল ক'মে যা'বার কথা নয় ত। দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হ'লেও, ব্যাপারটা বুঝতে পারা যেতো? এক সূর্য্যের রাজত্বে এমন হওয়ার কারণ ত বুঝে উঠা যাচ্ছেনা।

অনুমানটা আর এক রকমে করা যেতে পারে। সে অনুমান হচ্ছে—জলটা হয়ত মাটির মধ্যে প্রবেশ করছে। নির্বৃত আগ্নেয় গিরির গহ্বরও ত আছে অনেক। সিদ্ধু-প্রমাণ জল তা'র মধ্যেও প্রবেশ করেছে কিনা, সে কথাই বা বলতে পারে কে? এই অভিমতই যদি গ্রহণ করা যায়, তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, সে জলের পরিমাণই বা কত? এক

ভাগ স্থলের মধ্যে তিন ভাগ জলের কত অংশ আর প্রবেশ করবে? গ্রাহ্য করেও যদি লওয়া যায়, বিরাট পৃথিবীর প্রবল তৃষ্ণা মিটছে ঐ জলে, তাহলে বহুমতী শস্ত হরণ করছে কি কারণে? জলাভিষিক্তা বহুমতী যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে রস সংগ্রহ করতে পারত জল থেকে, তবে তা'র শস্ত প্রসব করা উচিত ছিল বর্তমানের অপেক্ষাও অনেক বেশী। কিন্তু সেটা হচ্ছেনা ত কোনো প্রকারে!

সুতরাং ও অহুমানটা ঠিকমত হ'লনা ব'লেই ধ'রে লওয়া চলে। সে যাই হোক একটা কিছু যে গোল হচ্ছে, সেটা খুব খাটা কথা। কথা ত খাটা, কিন্তু কথাটা কি? ধর্ম্মে ধীদের আস্থা আছে, তাঁ'রা হয়ত বলবেন—ওসব পাপের ফল। মানুষের পাপেই বহুমতী করছে শস্ত হরণ।

কথাটা হয়ত অবৈজ্ঞানিক কিন্তু জল যে এমন করে চটপট ক'মে যাচ্ছে, তা'র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটাই বা কি? ব্যাখ্যা শুনেই বা কি লাভ? ব্যাখ্যায় ত আর জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে না। তা'র অপেক্ষা বরং ধর্ম্মাশ্রয়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ। তা'তে আর কিছু না হোক, মনের তৃপ্তি বৃদ্ধি হ'বার সম্ভাবনা। শান্তি তা'তেই। পূর্বকালের মানুষ যাগযজ্ঞ ক'রে পর্জন্য দেবের প্রসাদ লাভ করত। একথা অবিস্থানের পক্ষে ডুবিয়ে দিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।

যাগযজ্ঞের দিন পূর্বের মত ফিরে এলে, মন্দ হয় না। ওট ত একটা চেষ্টা বটে।

চিন্তার ফলে অসাধ্যসাধন হয়, একথা বৈজ্ঞানিকের অকপটেই স্বীকার করেছেন। ধর্ম্মপালন ক'রেই মানুষ দেখুক না কেন, ধর্ম্মের সাহায্যে যাগযজ্ঞের শক্তিতে ধর্ম্মধারার গতি পরিবর্তিত হয় কিনা। কথাটায় হয়ত গোড়ানীর সঙ্গে অন্ধ বিশ্বাসটাও বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু অ-গোড়ানী, আর চোখ ওয়ংলা বিশ্বাস নিয়েই কোন্ জলের প্রসারত, গভীরতা বাড়তে পারা যাচ্ছে! ড্রেজার বসিয়ে সাগর পৃথিবীর জল প্রসার অসম্ভব। তা'র অপেক্ষা জলের আশা এখনকার মানুষ যদি সেকালের মানুষের মত জলদেবতাকে তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়, তবে তা'তে লাভের আশা থাকলেও থাকতে পারে। বিজ্ঞানের শক্তিতে মানুষের মদল গ্রাহ্য উপস্থিত হ'বার আকাঙ্ক্ষা যদি গঞ্জিকাসেবীর কল্পনা না হা, ধর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে যাগযজ্ঞের শক্তিতে বরুণ-দেবের বরলাভ করাও হয়ত কল্পনা না হ'লেও না হ'তে পারে। কারণ, ও জায়গাটাতেও আছে মহাবিজ্ঞান। ধর্ম্মটাও বিজ্ঞান—সাধনাও বিজ্ঞান আর সাধনাতেই শক্তি, সিদ্ধি। এ বিজ্ঞানের জোরে ভগবানকেও যখন প্রত্যক্ষ করা, ধরতে পারা যায়, তখন বরুণ-দেবের কুপালাভ ত সামান্য কথা। বিজ্ঞানের শক্তিতে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়, জলের সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য।



সেকালের কথা- - প্রাচীন সংবাদপত্র অবলম্বনে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত

কাঙাল হরিনাথের একটি রচনা

(‘সংবাদ প্রভাকর,’ ২১ অক্টোবর ১৮৫৭)

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রাঞ্জলিপূর্বক প্রণতি পরার্ক নিবেদন মিদং।

নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি পদ্য রচনা সংশোধন করত
ভবদীয় পৃথী প্রপূজ্য প্রভাকর পত্রিকা প্রান্তে প্রকটন করিয়া
জ্ঞান প্রপন্নকে জ্ঞান প্রদানে বাধিত করিবেন ইতি।

টাকা।

পদ্য।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে,
রক্তত কাঞ্চন ছিল,
অঙ্কিত হইয়া তারা,
তোমাকে করিল সৃষ্টি,
অসার হইয়া হোলে,
তোমার কারণে লোক,
কত শত জমীদারে,
তোমার কারণে ঘটে,
পুত্র হোয়ে জনকেরে,
সহোদর তুল্য প্রিয়,
তোমা হেতু কাটাকাটি,
তোমাতে মাতিয়া দেখ,
একেবারে হারিয়ে,
টাকা ধ্যান টাকা জ্ঞান,
কত লোক মোরে গেল,
অধার ঘণ্টে ধন,
শুকায়ে মরিছে লোক,
ইহার অধিক আর,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে,

ধিক্ ধিক্ ধিক্।
কি কব অধিক ॥
জগত রঞ্জিত।
হোলো কলঙ্কিত ॥
করিতে স্মার।
বিবাদের সার ॥
লাঠালাঠি করে।
গেল ছারখারে ॥
অঘট ঘটনা।
করে প্রবঞ্চনা ॥
ত্রিভুবনে নাই।
করে দুই ভাই ॥
যত মতর্লোক।
বসেছে পরলোক ॥
টাকা বুকে ধোরে।
টাকা টাকা কোরে ॥
চাবি দিয়া রেখে।
ফেণ মাজ চোখে ॥
কি আছে অধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥

তোমা হেতু কত জন,
অপরের প্রাণ ন্যশে,
নিঃশ্রম অতীত ক্ষেহ,
অকালে কালের গ্রাসে,
আত্মীয় স্বজন তেজি,
তোমা হেতু করিতেছে,
কত সন্ধিদাবান,
রাজদ্বারে দণ্ডনীয়,
কত বৃদ্ধ মহাশয়,
শাস্ত্রের মথর্ষ ভাব,
তোমার লোভেতে লোক,
পর ধন হরি পরে,
তুমি অর্থ একমাত্র,
চোকের পর্দা উল্টায়েছ,
তব গুণ বলতে প্রাণ,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে,
টাকা হে তোমার গুণে,
ব্যাধি হোতে মুক্ত হোয়ে,
তোমাকে তেজিতে মনে,
বৈদ্যরাজ ফাঁকি দেয়,
সমূহে রয়েছে ব্যাধি,
মিথ্যাবাদি হোয়ে থাকে,
তোমার কারণে টাকা,
ধনী হোয়ে ভাতারের,
একথা বলিতে মনে,
গেঁটে টাকা পেটে ক্ষুধা,
তোমার মায়ায় মুগ্ধ,
সন্তানের ব্যাধি রাখে,
টাকার কারণে আর,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে,

মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে।
ধর্ম্য কর্ম থেয়ে ॥
পরিশ্রম করে।
ভুক্ত হোয়ে মরে ॥
কত শত জন।
সমুদ্র লঙ্ঘন ॥
জ্ঞান হারাইয়ে।
উৎকোচ থেয়ে ॥
তোমার কারণ।
করিছে গোপন ॥
পাংলোর প্রায়।
বেড়ী পরে পায় ॥
অনর্থের হেতু।
ভেঙ্গে লজ্জা সেতু ॥
জলে ধিক্ ধিক্ ধিক্
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥
কত কাণ্ড হয়।
কত মহাশয় ॥
কষ্ট বোধ করি।
স্বয়ংক্রা ধরি ॥
এই কথা বলে।
স্বজন মণ্ডলে ॥
বিজ্ঞ ফটিক চাঁদে।
পায়ে পড়ে কাঁদে ॥
লজ্জা হয় ভারি।
বিড়ম্বনা ভারি ॥
হোয়ে কত জন।
করিয়ে গোপন ॥
পুত্র প্রাণাধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।

পরের দৃষ্টান্ত আগে
নিবেদন করি কিছু,
হই নাই যত দিন,
অচিন্ত্য কত স্থখে,
হুট পুট ছিল কায়,
তিলাকের হেতু স্থখ,
তোমার অধীন হোয়ে,
বপুরাজ্যে দুর্ভাবনা,
ইতিপূর্বে প্রিয়বন্ধু,
তোমার কারণ কটু,
সন্দেহ করিছে কত,
ইহা হোতে বরণ ভাল,
অল্পদিন হইয়াছি,
অসহ্য যাতনা দিয়া,
সকলি করছ তুমি,
বন্ধু বিচ্ছেদের স্থখ,
ইহা হোতে কষ্ট বল,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে,

দিয়ে এতক্ষণ।
আত্ম বিবরণ। সবিনয় নিবেদন মিদং।
তোমার অধীন। অদ্য বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে দীননাথ বিদ্যারত্ন
কাটায়েছি দিন। স্বাক্ষরিত যে প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহা কি
সবল অন্তর। আপনাদ্বারা বা আপনার পরামর্শে বা আপনার সম্মুখে
ছিল না অন্তর। লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার উত্তর পত্র দ্বারা
সে সব গিয়াছে। জ্ঞাত করিবেন।
রাজ্য হইয়াছে।
ভূষিত স্বভাষে।
কহিছে আভাষে।
আত্ম পরিজন।
এদেহ পতন।
তোমার অধীন
দেহ কর ক্ষণ।
বাকী কি রেখেছ।
স্বচেনা করেছ।
কি আছে অধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক্ ধিক্ ধিক্॥

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।
মাং কুমারখালি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

(‘সংবাদ প্রভাকর’ ৭ নবেম্বর ১৮৫৭)

শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের লিখিত পত্র
আমরা সমাদর পূর্বক নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

“৪ নবেম্বর দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে কোনো লোক
“দীননাথ বিদ্যারত্ন” স্বাক্ষর করিয়া প্রেরিত পত্রে
“বিক্রমোর্কশী” নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ তিনি নিজে
করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করেন, আমি এ ভয়ানক আত্ম
বিষয় পরিপূরিত পত্র পাঠানন্তর হিন্দু মেট্রোপলিটন
কালেজের প্রধান পণ্ডিত দীননাথ বিদ্যারত্নকে নিম্নলিখিত
পত্র প্রেরণ করি।

“যথা।

সবিনয় নিবেদন মিদং।
অদ্য বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে দীননাথ বিদ্যারত্ন
স্বাক্ষরিত যে প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহা কি
আপনাদ্বারা বা আপনার পরামর্শে বা আপনার সম্মুখে
লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার উত্তর পত্র দ্বারা
জ্ঞাত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

বিক্রমোর্কশী নাটক অনুবাদক।”

“এইক্ষেণে পাঠক মহাশয়গণ দীননাথ বিদ্যারত্নের উত্তর
পত্র পাঠ করত বিক্রমোর্কশী নাটকের যথার্থ অনুবাদক কে
তাহা অবগত হইবেন।”

“শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ

মহাশয় সমীপেযু।

আপনার লিখিত পত্র প্রাপ্তে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য-
যিত হইলাম, ইংলিসম্যান পত্রে আমার নাম স্বাক্ষরিত যে
প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমার স্বাক্ষরিত
নহে এবং আমি তাহার বাঙ্গালা জানি না, তাহা আমার
সম্মুখে বা আমার পরামর্শানুসারেও লিখিত হয় নাই।

শ্রীদীননাথ সিংহ।

হিন্দু মেট্রোপলিটন কালেজের প্রধান পণ্ডিত।”

“এক্ষেণে পাঠক মহাশয়গণ স্থির চিত্তে প্রাধিকান করুন,
ইংলিসম্যান পত্রের পত্রপ্রেরক কেমন ভদ্র সন্তান তিনি
দীননাথ বিদ্যারত্নের নাম জাল করিয়াছেন এবং আমাকেও
সংপূর্ণরূপে জনসমাজে উপহাসাস্পদ করিতে চেষ্টা
পাইয়াছিলেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।”

(‘সোমপ্রকাশ,’ ১ অক্টোবর ১৮৬০)

বিবিধ সম্বাদ।—.....আমরা শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন
সিংহের দানশীলতা প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা পরিপূর্ণ এক
খানি প্রেরিত পত্র পাইয়াছি। স্থানের অসম্ভাব প্রযুক্ত
অবিকল পত্রস্থ করিতে পারিলাম না। পত্র প্রেরক
মাডিকেল কালেজের বাঙ্গালা শ্রেণীর প্রথম বর্ষের ছাত্র।
তাহার এক্ষণ সঙ্গতি নাই যে, উপযুক্ত ব্যয় নির্বাহ

করিয়া কালেজে পাঠ করেন। উল্লিখিত সিংহ বাবু অনেক অংশে আত্মকৃত্য করিতে তাঁহার সেই অসঙ্গতি জ্ঞাত ক্রমে দুঃগত হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবুই অর্থের যথার্থ ব্যবহার করিতেছেন সন্দেহ নাই।

(‘সোমপ্রকাশ,’ ৬ জুন ১৮৬৪)

বিবিধ. সংবাদ।—... ২২এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।... টেরিটার বাজার অপরিষ্কৃত থাকিতে অবৈতনিক মার্জিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বর্দ্ধমানাধিপতির ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, যত দিন উহা পরিস্কৃত না হইতেছে প্রতিদিন তাঁহাকে ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

‘ক্যালকাটা সেমিনারী’

(‘সংবাদ সাধুরঞ্জন,’ ৩০ নবেম্বর ১৮৫৭)

আমরা আফ্লাদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে “কলিকাতা সেমিনারী” নামক অভিনব বিদ্যালয়ের কার্য বদান্ধবর শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিশেষাঙ্ক-কুল্যে অতি সূচরুপে নির্বাহ হইতেছে। উক্ত বিদ্যালয়-মন্দির গত ১৭ আগষ্ট দিবসে সংস্থাপিত হইয়া অল্পকালের মধ্যে শতাধিক ছাত্র অধ্যয়নার্থ আগমন করিতেছে।

সি ছুরিয়াপটীতে রামগোপাল মল্লিকের

বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেট্রাপলিটান কলেজ

(‘সংবাদ প্রভাকর,’ ৩০ জুন ১৮৫৮)

...মেট্রাপলিটান কলেজের প্রথম উন্নতি সময়েই রাজকর্তারা আটুনি দাঁটুনি করিয়া অল্প বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপন করেন, এবং “হিন্দুকলেজ” তুলিয়া দিয়া ন্যূন বেতনে “হিন্দুস্কুল” প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিয়ম প্রকাশ করিয়া তাহাতে অনেক প্রকার লোভের কথা উল্লেখ করেন, অদৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অস্থিরকল্প, অব্যবস্থিত-চিত্ত বাঙ্গালিরা সেই লোভে তুলিয়াই মেট্রাপলিটান কলেজ হইতে সন্তান দিগে উঠাইয়া গবর্নমেন্ট বিদ্যালয়ে অর্পণ করিলেন, ইহাতেই আমাদের এই নূতন কলেজের

আয়ে ব্যাঘাত হইল, এবং রাজ বিদ্যালয়ের আশুই উন্নতি হইল। তৎকালে মেট্রাপলিটানে কাপ্তেন রিচার্ডসন কাপ্তেন পামর, কাপ্তেন হেরিস, উইলিয়াম মাষ্টার, থোয়েটস, এবং কার্কাপট্রিক প্রভৃতি মহা মহোপাধ্যায় অদ্বিতীয় শিক্ষক সকল নিয়োজিত ছিলেন, যাহারদিগের একজনেই রক্ষা নাই, এমন ধারা দশ বারো জন পণ্ডিত ছিলেন, তখন হিন্দুকলেজে বিশেষ উপযুক্ত শিক্ষক প্রায় কেহই ছিলেন না,....

(‘সংবাদ প্রভাকর’ ১৭ জুলাই ১৮৫৮)

হিন্দু মেট্রাপলিটান কলেজ—“হিন্দু মেট্রাপলিটান কলেজ” যাহা হিন্দুজাতির কীর্তি-মন্দির স্বরূপ সেই বিদ্যালয়কে চিরস্থিত ও উন্নত করা হিন্দুজাতি যাত্রেয়ি সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য হইয়াছে...,।

সাধারণ কর্তৃক সম্ভাবিত সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়াতেই শুদ্ধ এই কলেজের এতদ্রূপ দুর্ব্বস্থা হইয়াছে, এতদিন ইহার স্থায়িত্ব সম্ভাবনাই ছিল না, কেবল দত্ত বাবুদিগের দত্ত মুদ্রায় অদ্যাপি সংহারমুদ্রা প্রাপ্ত হয় নাই,...

এই “মেট্রাপলিটান কলেজ” ১২৬০ সালের প্রথমেই ষৎকালে সংস্থাপিত হয়, তৎকালে ইহার সহিত “শীলস্ ফ্রি কলেজ” এবং সন্নিধান বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ দত্ত প্রণীত “ডেবিড হেয়ার একাডেমি” এই উভয় বিখ্যাত বিদ্যালয়কে মিলিত ও সংযুক্ত করিয়া কার্যারম্ভ করা যায় “শীলস্ ফ্রি কলেজে ২৫০ জন ছাত্র, এবং ডেবিড হেয়ার একাডেমিতে অন্যান ৩০০ জন বালক ছিল, এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ছাত্র অধ্যয়নার্থ বিদ্যাগারে আসিয়া প্রবেশ করে। কলেজের অবস্থা যত দূর পর্য্যন্ত উত্তম করিতে হয় তাহাই করা হইয়াছিল, কোনো বিষয়ের অগত্যা হয় নাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক সকল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে কোনো কারণে হউক, কিছু দিন পরে আর সে প্রতিভা রহিল না। রাজপুরুষদিগের প্রদত্ত লোভ জালে আচ্ছন্ন হইয়া এবং স্বদেশ মঙ্গলের অনিচ্ছা করিয়া অনেকেই তথায় আপনাপন বালকবৃন্দের পাঠ রহিত করিলেন, তাহাতে দেশের দুর্গাম সুনাম, এবং কি কর্তব্য, কি অকর্তব্য, তাহাও একবার বিবেচনা করিলেন না।.....

সংপ্রতি কয়েক দিবস হইল “শীলস্ ফ্রি কালেক্জের” অধ্যক্ষগণ “হিন্দু মেট্রোপলিটন” কালেক্জের সহিত সংযোগ-সম্বন্ধ সংচ্ছেদন পূর্বক আপনারা স্বতন্ত্র হইয়াছেন, ছাত্র এবং শিক্ষকাদি সহিত তাঁহারা আপনাদিগের কালেক্জ আপনারা তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। ঐ কালেক্জের অবস্থা পূর্বে যেরূপ ছিল, অর্থাৎ তথায় যদ্রূপ বিদ্যালয়শীলন হইত, তাহা কাহারো অবিদিত নাই, এইক্ষেণে মেট্রোপলিটন একক হইয়াছে, ইহাতে অনেক গোলযোগ নিবারণ হইয়াছে। শীলস্ ফ্রি কালেক্জের সহিত ইহার বিচ্ছেদ হওয়াতে উচ্ছেদের সম্ভাবনা মাত্রই নাই, বরং বিশেষরূপে উন্নতি হওনের সম্ভাবনা, কারণ আর সেই ছড়োগোল রহিল না, শীল বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক আছেন, তাঁহারা তাদৃশ উপযুক্ত নহেন, এজন্য সংযোগ থাকিতে তাঁহাদিগের উপদেশে ছাত্রদিগের সম্ভাবিত উপকারের সম্ভাবনা ছিল না, সংপ্রতি সেই বিষয়ের যথার্থরূপে স্ফুটন হইল, মেট্রোপলিটনে অত্যাধিক শিক্ষক সকল নিযুক্ত আছেন ও হইবেন, তাঁহাদিগের উপদেশে প্রকৃতরূপে স্বশিক্ষাই হইবে, তাহাতে সন্দেহাত্মক। বর্তমান সহকারী সম্পাদক ডেভিড্‌হেয়ার একাডিমির পূর্বতন সর্বাধ্যক্ষ বাবু গুরুচরণ দত্ত সমস্ত বিষয়ের কর্তৃত্ব এবং স্বয়ং অধ্যাপনার কার্যও নিরীহ করিবেন। ইনি বিদ্যালয়ের কর্মে অত্যন্তোপযুক্ত, ইনি অত্যন্তকালের মধ্যে ডেভিড্‌হেয়ার একাডিমির যদ্রূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তদ্রূপে তাবতেই আশ্চর্য্যজ্ঞানে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।...

আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্বক নিবেদন করি, হিন্দু মহাশ্রম অল্পরত হইয়া এই সময়ে মেট্রোপলিটনকে উন্নত করুন,...

হে স্বপাত্র ছাত্রগণ! তোমরা আপনারাও বিবেচনা কর, তোমাদের বোধাধিকার হইয়াছে, স্বতরাং হিতাহিত বিবেচনা করা কর্তব্য, স্বজাতীয় সম্মান রক্ষার্থে তোমাদের উৎসাহ পূর্বক এই বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করা উচিত, ইহাতে বিদেশীয়দিগের ব্যঙ্গবাণে আর ব্যথিত হইতে হইবে না, দেশের ও হিন্দু নামের কলঙ্ক মোচন হইবে,...

তোমাদিগের শিক্ষার জন্য ইহার দ্বিতীয় বিদ্যালয় আর নাই, গবর্ণমেন্ট বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যাবিতরণে নিদগ্ন হইয়াছেন, মিসেনরি সাহেবেরা খ্রীষ্টান করিবার ঈদ প্রাতিয়া জুজুড়ির দ্বারা ওং করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বালকপ্রদান ও চীলের বাসায় মংস্য সমর্পণ, এই দুই তুল্যই হইয়াছে। অতঃকোনা স্থলে উত্তমরূপ পড়া হয় না, কাজেই এখানে শিক্ষিত হওয়া তোমাদের পক্ষে

সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অধুনা আমরা তোমাদের উপর যত প্রত্যাশা করি, তত কিছু তোমাদের কর্তাদিগের উপরে করিতে পারি না, কারণ তাঁহারা তেমন হইলে এই কালেক্জের দশাই বা কেন এমন হইবে?

রানী রাসমণির বাটীতে গোরার উপদ্রব

(‘সংবাদ প্রভাকর’, ১১ আগষ্ট ১৮৫৮)

ভারতবর্ষীয় সভার মাসিক সভা! জুন মাসের পঞ্চ-বিংশতি দিবসে কসাইটোলা স্থানীয় কার্যালয়ে বর্ষীয় সভার মাসিক সভা হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ঐ বৈঠকে অধ্যক্ষেরা পূর্ব মাসের বিজ্ঞাপন পত্র সমর্পণ করিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল উল্লিখিত ছিল।

প্রথমতঃ গোরা-সেনারা কলিকাতা মধ্যে যেরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহাতে নগরবাসি প্রজারা অত্যন্ত ভয়াকুল হইয়াছেন, অতএব অধ্যক্ষেরা বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টকে তৎসমুদয় জ্ঞাপন করেন, তাহাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেন্যান্ট গবরনর বাহাদুর ঐ সকল জ্ঞাত হইয়া অনেক তুৎ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং প্রত্যুত্তরে লেখাইয়াছেন। জানবাজার নিবাসিনী মাগা, ধনাঢ্য শ্রীমতী রাসমণি দাসীর বাটীতে গোরা-সেনারা প্রকাশ্যরূপে অত্যাচার করিয়াছিল, কেবল দুরাচারদিগের আকার নিরূপণ দ্রুত হইয়াছিল, এই কারণ দণ্ড মুক্তি পাইয়াছে,...

বাঙালী-পরিচালিত ইংরেজী মাসিকপত্র

‘ক্যালকাটা মাসুলি রিভিউ’

(‘সংবাদ প্রভাকর’ ৮ জানুয়ারি ১৮৫৮)

কতিপয় এতদদেশীয় স্বশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী স্থলেখক যুবাপুরুষ “কলিকাতা মাসুলি রিভিউ” নামে ইংরাজী ভাষায় একখানি মাসিক পত্র প্রকটন করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পূর্বক পাঠ করত সান্ত্বনয় সন্তোষিত হইলাম,...

কৃতবিদ্য বাঙ্গালীগণ ইংরাজী পত্র প্রকাশের প্রাচুর্য্য করিয়া যতই কৃতকার্য হইবেন ততই অধিক স্থখের ঘটনা হইবেক। ছাপাষত্রের নূতন আইনের গুরুতর নিয়ম প্রতিপালনে সশঙ্কিত হইয়া “হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর” স্বীয় শরীর সংগোপন করিয়াছেন। “এক স্ফটিকের স্তম্ভের ভিতর ৭০০ সাত শত রাক্ষণীর প্রাণস্বরূপ” কেবল এক মাত্র “হিন্দু পেট্রিয়ার্ট” খানিই যথা উচিত কার্য সাধন করিতেছেন।...

লক্ষীর বাঁপি

“টি বি”র আক্রমণ অত্যাচার খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে এদেশে—মহিলা-মহলেই উপদ্রব অধিকতর। আমাদের দয়াল রাজ-রাজেশ্বরের হৃদয় তা’তে কৰুণা-বিগলিত হয়েছে। প্রজা-রক্ষায় সেটা হ’বারই কথা। টি বিকে দেশ-ছাড়া করবার জন্ত রাজরাজেশ্বরের নামে ফাণ্ড খোলা হয়েছে। অর্থও সংগৃহীত হচ্ছে ভাল। কিন্তু অর্থের আবশ্যক বিস্তর। কুবের ঋ’দের ভাণ্ডারী, তাঁ’রা এ বিষয়ে কতদূর কি করছেন, সাধা-রণের সেটা জানবার জন্ত উৎকর্ষা আছে। আতসবাজী, পুলিশ-প্যারেড্ ও মোটর গাড়ীর শোভাযাত্রা প্রভৃতি দেখিয়ে টাকা উঠবে আর কতই বা। কতৃপক্ষ যদি বিত্তশালী ব্যক্তিদের ভাণ্ডার দ্বার উন্মুক্ত করতে পারেন, তা’হ’লে টাকা গড়িয়ে আসতে পারে বর্ষা-শ্রোতের মত। কিন্তু এই স্বত্রে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে সপ্রতিভভাবে। “টি বি” মহাশয় এদেশের নরনারীকে এতটা অল্পগৃহীত করছেন কেন, অনিমজ্জিত হয়েও, তা’র অহুসন্ধান করাটা বিশেষ আবশ্যক নয় কি? পৌরসভার মন্ত্রীবর্গ বোধ হয় বরেন্দ্র-অহুসন্ধান সমিতির মত “টিবি” অহুসন্ধান সমিতি অনায়াসেই গঠন করতে পারেন। বলবার কথা থাকল অনেক। আগামী সংখ্যায় সে প্রশ্নের আলোচনা করা যাবে।

বিলাতে এ বৎসর শীতের প্রকোপ ভয়াবহ। বহু নর নারী তা’তে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। ইটালী, জার্মানী, জাপান, পরামর্শ করে এই Cold waveএর কল্ তৈরী করল নাকি? তা’দের অসাধ্য ত নাই কিছুই!

আমাদের একজন পাঠিকার অভিমত—ইজ্রায়েলের কঙ্গ-রস অর্থাৎ কংগ্রেসকে রসহীন—শক্তিহীন করবার জন্য মুসলমান লীগ ও হিন্দু মহাসভার সৃষ্টি ও অভিমত সম্বন্ধে

আমাদের মন্তব্য আপাততঃ আমরা প্রকাশ করলাম না। সিদ্ধান্ত কুববার ভারাপণ করলাম আমরা গরিয়সী মহিলা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর উপর। তবে এইটুকু অসঙ্কোচে বলতে পারা যায়, কংগ্রেস-কতৃপক্ষ, লীগ ও হিন্দু সভাকে উদারতা ও তাগের মহিমায় যদি স্বমতে আনতে পারেন, তবে কংগ্রেস হ’বে অসীম শক্তিশালী।

রাজার বর্তমান দ্বিতীয় রাজধানী কলিকাতা এই নীত-কালে হয়েছে উৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত। হৈ হৈ কাণ্ড চলেছে চতুর্দিকে। সেই হৈ হৈ কাণ্ডের মধ্যে সারা ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারটা বাঁশ দড়ি, টিন, ও হোগলায় ঘেরা হয়ে গেছে কোন্ মুহূর্তে, তা ঘেরা হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জানতে পারেন নাই অনেকেই। এমনটা-হওয়ায় বিশেষ অসুবিধা হয়েছে দশ, এগার ও চৌদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের বহু নরনারী। মুক্ত বাতাসে ঋ’রা তাঁ’দের সন্তান সন্ততিদের নিয়ে প্রাতঃ-সন্ধ্যায় এই স্কোয়ারে ভ্রমণ করবার সুযোগ পেতেন, তাঁ’রা বিনা অপরাধে ঐ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এমন ঘেরা-ঘেরা নাকি থাকবে অনেক দিন। এ ব্যবস্থায় বহু লোকেরই স্বাস্থ্যহানি হ’বার সম্ভাবনা। এর জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে?

নকলনবিশি ক’রে জী-শিক্ষা বিস্তার, জী-স্বাধীনতা সম-র্থন করবার পক্ষপাতী যা’রা, হিটলারী খেদটা তাঁ’রা শুনে-ছেন কি? শিক্ষা, স্বাধীনতা অর্থে যে যথেষ্টাচার নয়, এটা বুঝলে গাং কেটে কুমীর আনার বিপদ থেকে দেশের লোক পরিত্রাণ পায়। শাসনটা ক্রোধের মতই তীব্র, কিন্তু ঐ স্নেহের শাসনেই যে সর্বমঙ্গল, এদেশের লোক এখন কি তা ভুলে গেছে? ভুলে থাকে, সর্বনাশ অবশ্যস্বারী।

“দি আণ্ডার ওয়ার্লড্ অফ্ ইণ্ডিয়া” নামক পুস্তক খানির খান কত পাতা পাঠ করলেই বুঝা যায়, আৰ্য্য-সভ্যতা ও হিন্দুর নিন্দাবাদ করবার জন্তই মাদার ইণ্ডিয়ার ছাঁচে ও-খানা রচিত হয়েছে। গ্রন্থকার, লেঃ কর্ণেল সার্ জর্জ ম্যাকম্যান্ কে, সি, বি, কে ; সি, এস, আই ; ডি, এন্স ও। মন্ত নাম, কিন্তু হস্ত তাঁ’র কলুষিত হয়েছে, আৰ্য্য-সভ্যতা ও হিন্দু নরনারীর অযথা নিন্দা ঘোষণা করে। সকলের সকল কথা কাণে তুললে বাঁচাই হয় দায় ! সেই হিসাবে সার্ জর্জের অসার কথা আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এ দেশের কুষ্টি, কলাচার, সংস্কৃতি বুঝবার মত বিজ্ঞাবুদ্ধি সকলের কাছে আশা করা চলতেই পারে না। আৰ্য্য ঋষিদের কথা ছেড়েই দিই না হয়। গার্গী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতির কথাও বলতে চাই না। সে সব বহু প্রাচীন কালের কথা। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, গুরু মহারাজ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানগর, প্রমথ কুমার সর্মাধিকারী, সার্ গুরুদাস, সার্ আশু তোষ, সার্ রাসবিহারী, সার্ তারকনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সার্ ব্রজেন্দ্র নাথ, মহাত্মা গান্ধী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য সর্সপালি রাধাকৃষ্ণ, সার্ জগদীশ, সার্ পি, সি, রায় প্রভৃতি যে মূর্ত কুষ্টি, সংস্কৃতি, এটা জানা সার্ জর্জের পক্ষে হয়ত সম্ভবপর হয় নাই। ভারতের কুষ্টি, সংস্কৃতিই যে সারা বিশ্বকে আলো দেখিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেখাবে, এটা বুঝবার বুদ্ধি সভ্যতাভিমानी সার্ জর্জের মত লোকের বুঝা উচিত ছিল। তিনি সত্যই কুপার পাত্র।

—•—

বিগত ২২ শে ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। কুচবিহারের মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ্ বাহাদুর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। স্বর্গত আচার্য্য মনমথনাথ চক্রবর্তী এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীযুক্ত শ্রামলাল চক্রবর্তী স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ, নদীপুরের রাজা ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মল্লিক ইহার সম্পাদক। জনরবে শুনা যাচ্ছে, মহিলাদের চিত্রবিজ্ঞা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ অচিরেই করবেন। প্রতিষ্ঠানটির আমরা স্থায়ী কামনা করি। পারিতোষিক

বিতরণ সভায় কবি মুনীন্দ্রপ্রসাদ রচিত যে গীতটী গীত হ’য়েছিল, সাহিত্যে তা’র স্থান খুবই উচ্চ। গান খানি উদ্ধৃত করে আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাকে শোনাচ্ছি।

আলো—আলো—আলো !

কলা-ভবনের ঘুচা’তে আধার

দীপ্ দীপেন্দ্র আলো !

প্রীতি-ধূপে ভূপ করিগো বরণ

দাও গো শরণ দীপ-নারায়ণ

জগজন হিতে হে জনরঞ্জন

করণা তোমারি ঢালো !

• • মন্ত্রধের স্মৃতি যে লীলা-কমল

• শ্রাম-সায়রেতে রাখ তা’ অমল

—আলো ছায়ে শোভা ভালো !

• অচেতন বাহা কর সচেতন

বিপিনে নগরে উড়ুক্ কেতন,

চিরোজ্জ্বল হোক্ এ কলা-ভবন

লভিয়া ভূপেন্দ্র আলো !

—•—

বিজ্ঞায়তনের সম্পাদক কেমন লোকের হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমরা বহু আলোচনাই করে আসছি। যে সকল মতলব্বাজ ব্যক্তি স্বজনবর্গকে স্থূল কমিটির সদস্য করে, সেই সকল সদস্যের ভোটের জোরে সম্পাদকের আসনে উপবিষ্ট হ’বার মর্যাদা পেয়ে স্থূলের মর্যাদা, স্থায়ের মর্যাদা বিস্মৃত হ’য়ে নিজের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্ত ব্যাকুল হ’য়ে পড়ে, মানুষ্যের মত মানুষ্যকে কমিটি থেকে অপসারিত করে, স্থূলের মাষ্টার পণ্ডিত বিতাড়িত করে অকারণে, তেমন জীবকে বিজ্ঞায়তনের কর্মধার করা ত কোন ক্রমেই উচিত নয়। বিশ্ববিজ্ঞালয়ের কর্তৃপক্ষের কাণে এ সকল কথা উঠে কনা আমরা অবগত নই। কিন্তু জনরবের সহস্র জিহ্বায় সে সকল কলঙ্ক-কাহিনী নানাভাবে প্রচারিত হচ্ছে। যে সকল বিজ্ঞায়তনে মহিলা-ছাত্রী লওয়ার ব্যবস্থা আছে, সে সকল স্থানে এমন প্রকৃতির সম্পাদকপ্রবর যদি দৌলতখানা তৈরী করে থাকে, তবে বাবুদের বাস্তু ভাঙ্গার বিশেষ দরকার হ’য়ে পড়েছে। জনসাধারণের সে

বিষয়ে সচেতন হওয়া একান্ত কর্তব্য। জ্ঞানের মর্যাদা রক্ষিত হোক, এই হচ্ছে আমাদের আন্তরিক কামনা।

আমাদের পরমবন্ধু মিষ্টার ভে, সি. মুখার্জির অসহৃদতার সংবাদ পেয়ে আমরা উদ্ভিগ্ন হয়েছিলাম। সম্প্রতি তিনি আরোগ্য-পথে অগ্রসর হচ্ছেন শুনে আমরা স্তব্ধ হয়েছি। অচিরে তিনি নিরাময় হোন, এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত নির্মল চাঁদ বড়ালের দশমবর্ষীয় পুত্র শ্রীমান গণেশ চাঁদ বড়াল কবিতা-রস-মাধুর্য্য রসজ্ঞের মধ্যে বিতরণ করছে শুনে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রকৃতির খেলায় 'ইনফ্যান্ট ফিনমিন' অনেক ক্ষেত্রেই দেখা ও শুনা যায়। শ্রীমান শিশু গণেশও সম্ভবতঃ সেই থাকের। লাড্ডু সেবা প্রভৃতি ভোগ গ্রহণ করে শ্রীমান মুঠকলমে লিখতে থাকুক, কালে হয়ত ব্যাঙ্গদেবের মুদ্রা শ্রীমান হতে পারবে। "বঙ্গলক্ষ্মীর" ফাস্তুন-সংখ্যায় গণেশ-রচনা প্রকাশ করবার আমাদের ইচ্ছা থাকল।

ভারতের নরনারী টি বিবির আক্রমণে ভীষণভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। টি বিবির অত্যাচার উপদ্রব বন্ধ করবার প্রবল চেষ্টা চলছে অবশ্য। কিন্তু মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাসের পথ রোধ করলে, ভেজাল খাদ্যের প্রচলন বন্ধ করতে না পারলে, থিয়েটার, সিনেমা, রেস্তোরা, চা-খানা, কফি-খানা প্রভৃতির দ্বারগুলোয় চাবি না দিলে, স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর-পালনের রীতিমত ব্যবস্থা না করলে, পথে ঘাটে, ঘরে বাইরে ময়লা আবর্জনা, নিষ্টিবন নিক্ষেপ বন্ধ না করতে পারলে টিবিবির আক্রমণ থেকে রক্ষা পা'বার উপায় হ'বেনা যে, এটা মৃত্যুর মতই সত্য। এ উপায় ত দেশবাসীর হাতেই। আত্মনির্ভরতা থাকলে মানুষ নির্ভয় হ'তে পারে অনেক পরিমাণে।

শিশু-মড়কের হার ইদানীং খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে, শুনা যাচ্ছে। এর কারণ নির্ণয় করা স্বকঠিন নয়। খাটি গো-ছন্দের অভাব, শিশু পালনে কু-প্রথা, প্রসূতী ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় অনাস্থা ওদাসীন্য, অ-চিকিৎসা বা কুচিকিৎসা শিশু-মড়কের মূল কারণ। দেশব্যাপী দারিদ্র্যও এ-মড়কের জন্ম অল্প দায়ী নয়। দেশের ছেলে বাঁচাতে দেশের সহায়তা খুবই আবশ্যক। এই দেশের সঙ্গে সরকার-পক্ষ ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের যোগদান ও সহায়তা একান্ত আবশ্যক।

হাসপাতালে রোগী ভর্তি করা এখনকার দিনে খুব কঠিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। "স্থান নাই"—এই হ'ল

অজুহাত। এসম্বন্ধে বলবার কথা আছে অনেক। বারাস্তরে সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।

স্বহৃদর মিষ্টার ভি, সি ঘোষের পত্নী শ্রীমতী কমলাবালা লোকান্তরিতা হয়েছেন, শুনে আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হ'লাম। শ্রীমতী কমলাবালা চেংলার স্বনামধন্য স্বর্গত শ্রামাচরণ স্বহৃদ মহাশয়ের কন্যা এবং বঙ্গবিশ্রুত লোকান্তরিত রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্রবধূ। পিতৃকুল এবং স্বশ্রুত কুলের স্বশিক্ষায় শ্রীমতী যে প্রেরণা পেয়েছিলেন, তা'তে তাঁ'র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়েছিল—দান, ক্ষমা, উদারতা ও ধার্মিকতা। দেবঘর ও দেওঘরের সিদ্ধ



স্বর্গীয়া কমলাবালা ঘোষ

পুরুষ মহারাজা বালানন্দজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রীমতী কমলাবালা আদর্শ রমণা হ'য়ে ছিলেন ব'লেই শুনতে পাওয়া যায়। এমন পত্নীরত্নকে হারিয়ে বিপত্নীক যে মর্মান্বহ অহুভব করছেন, সে বাথা বেদনায় সামান্য দিতে পারে হয়ত "উত্তর রাম চরিতের" কাব্য-স্বধা। 'হা সীতায়' সীতাকে ফিরে পাওয়া গিছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে শোক ফিরিয়ে আনবে না শ্রীমতী কমলাবালাকে। পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা ও জামাতা ভাস্কর রুদ্রেন্দ্র কুমার পালকে রেখে সতীলক্ষ্মী সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। শোক-সন্তপ্ত ঘোষ মহাশয় এবং তাঁ'র পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও রেক্টর স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গলার শিক্ষা-জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল। তিনি “ভিক্টোরিয়ান” যুগের লোক ছিলেন। আধুনিক বাঙ্গলার স্রষ্টাদের তিনি অগ্রতন। তিনি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘ ও অধ্যাপক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাদেরও অগ্রতম। এ ছাড়া সহরের বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়েও বিলাতী আদব কায়দার মধ্যে আত্মবিস্তৃত হন নাই। ১৯১৫ সালে তিনিই সর্বপ্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের কলেজে ভর্তি করেন।

কলেজের শাসন কার্যে অধ্যক্ষ বসু সর্বদা জাতিবৃত্ত-বাদী আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হতেন। তিনি ছাত্রদের বিশেষতঃ দরিদ্র ছাত্রদের বন্ধু ছিলেন।

মহিলা-সমাচার

শ্রীযুক্তা গান্ধী ও বর্তমান শিক্ষানীতি

দেৱাচন নগরে জেল মহিলা সন্মেলনের সভানেত্রীর অভিভাষণে বর্তমান শিক্ষানীতির নানা ত্রুটির উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্তা গান্ধী বলেন, বর্তমান শিক্ষা প্রদান পদ্ধতির দোষে বালিকারা ধীসম্পন্ন ও পরিশ্রমী না হইয়া পোষাকী পুতুল হইয়া উঠে, প্রাচীন ও নূতন কতকগুলি ত্রুটি তিনি সংশোধন করিতে বলেন।

শ্রীযুক্তা রুক্মিণী দেবী ও ডাঃ বেশাস্তের শিক্ষাপদ্ধতি

বড়দিনের সময় আন্তর্জাতিক থিয়সফিক সন্মেলন বেনারসে হয়। শ্রীযুক্তা রুক্মিণী দেবী থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি অরাওল সাহেবের পত্নী, মাদ্রাজ মহিলা—বলেন যে অগ্রাগ্রত দেশ স্বাধীনতা অর্জনের সময় আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ও নৈতিক নীতির উপর দৃষ্টি দেয় না, কিন্তু ভারত ত্বার স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য। আমরা নিজেদের জিনিষ কিনিয়া স্বদেশী হইতেছি কিন্তু চিন্তা ও ভাবের দিক দিয়া বিদেশী হইয়া যাইতেছি। এখন এ্যানি বেশাস্তের শিক্ষাপদ্ধতি যেমন স্বদেশপ্রীতি জাগরিত করিয়া দেয় তেমনি নীতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রসারিত করিয়া দেয়। সেই পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্ত বেনারসে সেন্ট্রাল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সোসাইটির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সমর্থন করেন এবং ৫০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

সন্মেলনে নিউজিল্যান্ড অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইয়োরোপ হইতে বহু থিয়সফিক নর ও নারী সমবেত হইয়াছিল।

নিখিল ভারত মহিলা সন্মেলন

বড় দিনের সময় দিল্লির টাউন হলে রাণী লক্ষ্মীবাই রাজওয়াদের সভাপতিত্বে মহিলা সন্মেলন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে পাশ্চাত্যদেশ হইতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক অফিসের মিস সানথ হ্যারিসন ও ম্যাডাম হেজ, শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ কমিটির সভানেত্রী মিস্ এ ডিগনান প্রমুখ দশজন বিখ্যাত মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। সুরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃত কাউর, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাই রাজওয়াদে তাঁহার অভিভাষণে বলেন, আইন দ্বারা ভারতীয় নারীদের অক্ষমতা দূর ও তাহাদের অধিকার সংরক্ষণ করা যাইতে পারে না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করা, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবন ধারণের কলা-কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলেই ভারতীয় নারীর অবস্থাপ উন্নতি সাধন হইবে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিশু পালন বিদ্যালয় স্থাপন, পল্লী-সংস্কার ও রাজনৈতিক অধিকার লাভই প্রকৃত নারীর কল্যাণকর।

যুক্ত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত একটা যুক্তবিরতি প্রস্তাব করেন। রাজকুমারী অমৃত কাউর, বেনাম হামিদ আলি, মিসেস ফিরোজউদ্দিন, ও

মিস ডিনমেন এই প্রস্তাব নানাযুক্তির সহিত সমর্থন করিলে ইহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

নারীর কল্যাণকর নানা প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয়, উত্তর উত্তর সর্বমতের নারী এই সম্মেলনের সাফল্যের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গলার মহিলাদের এ সম্মেলনে বিশেষ প্রতিপত্তি দেখা যায় না। এই সম্মেলনের সম্পাদিকা ছিলেন মিসেস আসরফ আলি তিনি বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ে বটে!

মাণিপুরের নারীর শিক্ষা

মহাভারত যুগ হতে মনিপুরের নারীর শিক্ষার প্রচলনের কথা জানিয়া আসিতেছি। নানা ঐতিহ্যে বিধ্বস্ত হইয়াও মনিপুর তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আধুনিক শিক্ষার অগ্রগণ্য বৈশিষ্ট্য তাহাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছে। মনিপুর সহরে পাঁচটি আপার প্রাইমারী স্কুল আছে। রাজকুমারী টামপাসনাগীয়া হাই ইংলিশ স্কুলটিকে সম্প্রতি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে ছাত্রী পাঠাইবার ও পড়াইবার অধিকার কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় প্রদান করিয়াছেন। চব্বিশ, পঁচিশটি ছাত্রী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কয়েকটি ডাক্তারী, একজন বি এ পড়িতেছেন। নৃত্য, স্কুয়ার শিল্প, ও বস্ত্রবয়নে পারদর্শিতাও তাহাদের শিক্ষা ও কৃষ্টির সম্যক পরিচয় দেয়।

নারীর আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর উক্তি

কয়েকটি মহিলা শিক্ষিত পুরুষের অভ্য্রাচরণে ব্যথিত

হইয়া মহাত্মা গান্ধীকে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে অহরোধ করিয়াছেন। লাহোরে এক মহিলা নির্জন রাস্তা পার হইবার সময় জনৈক সাইকেলে আরোহী তাঁর সম্মানহানি করিবার চেষ্টা করে, তখন সেই মহিলা তাহার হাতের ভারী পুস্তকের দ্বারা তার মস্তকে আঘাত করিয়া তাহাকে নিরস্ত করে। এই বল প্রয়োগ দ্বারা আত্মরক্ষা করা অহিংসা নীতির বিরুদ্ধ কিনা তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মহাত্মা হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে নারী প্রকৃত অহিংসা নীতি পালন করিতে পারিলে তার মর্যাদা হানির ভয় থাকিতে পারে না। নিজের আচরণের দ্বারা পুরুষকে অসম্মানের কাণ্ড হইতে নিরস্ত করিবে। তাহাতে যদি আত্মসম্মান বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হয়, আত্মরক্ষা যে কোন উপায়ে করিতে নারীরা পারেন।

তিনি আরো লিখিয়াছেন নারীরা তাহাদের আচরণের দ্বারা পুরুষকে তাহাদের প্রতি অসম্মান ব্যবহার করিতে উৎসাহ প্রদান করে। যেমন আজকালকার যুবতীরা শীত-তাপ হইতে শরীর রক্ষা করিবার জন্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন না, তাঁরা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্ত এবং অস্ত্রের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত নানা প্রকার বিলাসপূর্ণ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই বিলাসিতা এবং নানা দুর্নীতি ত্যাগ করিতে পারিলে নারীর সম্মান ও মর্যাদা সদাই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ধূলার গান

শ্রীহেমলতা দেবী

আমি যে ধূলার মাংস
ধূলায় বাসা বেঁধেছি
ধূলা নিয়ে খেলবো বলে
পথে আঁচল পেতেছি।
প্রতিদিন প্রতি জনা
রেখে যায় ধূলার কণা
তা'দিয়ে আঁচল আমার
দিনের শেষে ভরেছি ;

কতবার সন্ধ্যাকালে
ঢেকেছে ধূলার জালে
আজ আমার আঁচলতলে
মুঠায় সোনা ভরেছি !
স্বদূরে গেছে শোনা
ধূলাপথ সোনায় বোনা,
মেলে তাই আঁচলখানা
পথে সোনা পেয়েছি।

কেন্দ্র সমিতির কথা

বড়লাটমহিষী লেডী লিনলিথগো কর্তৃক •

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি পরিদর্শন

গত ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) সকালবেলা ভারতবর্ষের বড়লাট-মহিষী মাননীয়া লেডী লিনলিথগো সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি ও কেন্দ্র সমিতি পরিচালিত শিল্প-শিক্ষালয় পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে সমিতির ভবনটি পত্র-পুষ্পে অতি সূচাঙ্করূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। লেডী লিনলিথগো এবং তাঁহার কন্যা লেডী জোয়ান হোপ মোটর হইতে অবতরণ করিলে দ্বারদেশে শিল্প-শিক্ষালয়ের কয়েকটি ব্রতচারী বালিকা ব্রতচারী-পদ্ধতিতে আবাহন সঙ্গীত দ্বারা অভ্যর্থনা করে। লেডী লিনলিথগো নির্বাচিত আসনে উপবেশন করিলে, তাঁহাকে প্রাচীন প্রথায় সপ্রদীপ বরণ-ডালা ও পুষ্প, চন্দন, ধাত্রী-দুর্বা দ্বারা সঙ্গীত ও নৃত্য-সহকারে বরণ করা হয় এবং দুইটি বালিকা কর্তৃক তাঁহাদিগকে দুইটি স্ববৃহৎ মনোহর পুষ্পস্তবক উপহার দেওয়া হয়। কেন্দ্র সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এই উপলক্ষে স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। তৎপর লেডী লিনলিথগো শিক্ষালয়ের বিভিন্ন ক্লাস এবং শিক্ষালয় ও মফঃস্বলস্থ শাখা মহিলা সমিতিসমূহের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য দ্বারা অলুপ্তিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। অতঃপর ব্রতচারী বালিকাগণ জারীনৃত্য ও কাঠিন্য এবং রায়বেশে নৃত্য প্রদর্শন করে।

পুনরায় বড়লাট-মহিষী আসন গ্রহণ করিলে কেন্দ্র সমিতির সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস শিল্পবিজ্ঞালয় ও মহিলা সমিতিসমূহের শিল্পদ্রব্য সকল পরিদর্শন করার জন্য সমিতির পক্ষ হইতে লেডী লিনলিথগোকে অভিনন্দিত করিয়া একটি স্বচিহ্নিত ও সমিতির উদ্দেশ্য, কার্য দ্বারা, কার্যাবলী সমন্বিত সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

অতঃপর অভিনন্দনের উত্তরদান-প্রসঙ্গে মাননীয়া লেডী লিনলিথগো নাতীর্ঘ অথচ সারগর্ভ একটি বক্তৃতা করেন; বক্তৃতায় তিনি বলেন যে,—“আমি এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। যে উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সফল করিতে হইলে নানা-বিধ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। শিক্ষা ভিন্ন দেশের জাতীয় জীবন কখনও উন্নত হয় না; সরোজনলিনী দত্ত ইহা বুঝিতে পারিয়া যে আদর্শে পরিচালিত হইয়া পল্লী-রমণীর উন্নতিকল্পে এই চেষ্টা স্বরূপ করিয়াছিলেন, তাহা যে অতি সুন্দর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুমাতা,

স্বভগিনী ও স্বগৃহিণী হইতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন আছে, ভারতের নারীদিগের আজ সেই শিক্ষালাভের স্বযোগ আসিয়াছে; তাঁহাদের সম্মুখে উজ্জল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাঁহারা যেন পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতার সঙ্গে চরিত্র-মাধুর্য, নম্রতা ও সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎকে উজ্জল ও সুসমৃদ্ধ করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকেন।”

অতঃপর মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় লেডী লিনলিথগোকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কেন্দ্র সমিতি হইতে লেডী লিনলিথগোকে ছাত্রীদের হস্তনির্মিত রেশমের উপর স্বচের কাজ করা একটি ব্যাগ, জয়পুরী কাজ করা একটি ট্রে, একটি সিন্দুরের কোঁটা ও একটি চন্দনের কোঁটা উপহার দেওয়া হয়। এই অলুপ্তানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

• ১৩শ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব (১৯৩৯)

কর্মসূচী

১। ১৪ই জানুয়ারী, শনিবার—মাননীয় ময়ূরভঞ্জের মহারাজী সূচাঙ্ক দেবী কর্তৃক অপরাহ্ন ৪টার সময় মহিলা শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

২। ১৫ই জানুয়ারী রবিবার—প্রদর্শনী—বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা।

৩। ১৬ই ও ১৭ই জানুয়ারী, সোমবার ও মঙ্গলবার—(১) লোটাস ডে (নলিনীদিবস), (২) প্রদর্শনী—৩টা হইতে ৮টা।

৪। ১৮ই জানুয়ারী—বুধবার—(১) “মহিলা সম্মেলন”—বেলা ৩টায়, সভানেত্রী—মাননীয়া নদীয়ার মহারাজী বাহাদুরা, (২) প্রদর্শনী—মহিলাদিবস, বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৮টা।

৫। ১৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার—(১) “প্রার্থনা সভা”, সকাল ৯টা, সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, (২) ১৪শ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব-সভা-অপরাহ্ন ৫টা; সভানেত্রী—বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরের পত্নী—মাননীয়া লেডী ব্রাবোর্ন।

৬। ২০শে জানুয়ারী শুক্রবার—(১) প্রদর্শনী—বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা, (২) মহিলা-সমিতি-প্রতিনিধি-সম্মেলন, সন্ধ্যা ৬টা।

৭। ২১শে জানুয়ারী শনিবার—(১) “শ্রীতিসম্মেলন”—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা। (২) “সরোজনলিনী বক্তৃতা” সন্ধ্যা ৬টা। বক্তা—রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।

আপনি না হয় আর কেউ

মাছের মধ্যে স্বভাবতই মতের বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়। তবে মোটামুটি জোর করেই বলা চলে যে যারা চায়ের ভক্ত তাদের মধ্যে অধিকাংশ চা ভালবাসে এই জন্য যে একান্ত প্রয়োজনের সময় চা তাদের দৈনিক ও মানসিক শক্তি যোগায়। চা-খাওয়ার এইটাই হচ্ছে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং এই জন্যই সবচেয়ে ভালো তাজা করা পানীয় বললে চায়ের খুব সঙ্গত বর্ণনাই দেওয়া হয়।

যখন শরীরটা ভালো লাগে না, কিম্বা যখন মনটা ঠিকমত কাজ করতে চায় না, তখন সাধারণত লোক চট করে চাড়া হয়ে ওঠবার কোনো উপায় খোঁজে। সে অবস্থায় চা অত্যন্ত পানীয়ের থেকে অনেক ভালো। কেন না, চা শরীরের কোনো অপকার করে না এবং চায়ের ভিতর মাদকদ্রব্য নেই। চা খেলে যে উৎসাহ পাওয়া যায় তা ক্ষণস্থায়ী নয়। ভালো এক পেয়াদা চা খেলে তা'র ফল কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে; খাওয়া মাত্রই মনটা খুসিতে ভরে ওঠে আর মন তা'র স্বাভাবিক ধৈর্য ফিরে পায়।

অস্থি বিস্থগ থেকে সেরে ওঠবার সময় অস্ত্রোপচারের পর সাধারণত রোগীদের চা দেওয়া হয়। তার কারণ, হ্রতশক্তি ফিরিয়ে আনবার শক্তি চায়ের খুব বেশি আছে; এবং চিকিৎসাবিদরা সেকথা আজ খুব ভালো করেই জানেন। চায়ের ভিতর যে সব জিনিস রয়েছে তা রোগ এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য থেকে সেরে ওঠবার সময় রোগীকে খুবই সাহায্য করে, অথচ তা'র শরীরের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করে না।

বিখ্যাত ডাক্তার কাল হেনরি ডেভিস, এম্ ডি; এক

এ, সি, এম্, অস্ত্রোপচারের পরবর্তী সেবা ও শুশ্রূষা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন :

“বড় বড় অস্ত্রোপচারের পর শক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রথম আর্টিচলিশ ঘণ্টা শুধু গরম জল অথবা নেবু দিয়ে গরম চা পেতে দেওয়া দরকার।”

আর একজন বড় অস্ত্র-চিকিৎসক এ-সম্বন্ধে বলেছেন :

“চিকিৎসা-শাস্ত্রে ক্রান্ত হৃদযন্ত্র অথবা অবসন্ন কোষ-গুলিকে নতুন করতে চা খুব বেশি ব্যবহার হয়। রক্তের চাপে চা উপকার করে, এবং খুব ক্রান্ত বা অবসন্ন অবস্থায় চা শক্তি ও উৎসাহ দেয়।”

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে-সব অস্ত্রোপচারের ফলে রোগী খুব বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে সে-সব ক্ষেত্রে চা দেওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত।

বিলেতের রয়েল প্রিন্স অ্যালফ্রেড হাম্পাতালের ডাক্তার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সি, গিফোর্ড এ-বিষয়ে বলেছেন :

“ভোর বেলা উঠে একপেয়াদা চা না পেয়ে থাকতে আমি কিছুতেই রাজী নই। তখন থেকে আরম্ভ করে রাত্রে ভালো ঘুম হবার জন্য যে একপেয়াদা চা খাই তখন পর্যন্ত সারাদিনই মনে হয় যেন চা খাচ্ছি অথবা চা-খাওয়া দেখছি। যখন আমি নিজে খাই তখন দেখি আর কেউ চা খাচ্ছে। অত্যন্ত হাম্পাতালের মত রয়েল প্রিন্স অ্যালফ্রেড হাম্পাতালেও আমরা প্রচুর চা খাই। রোগীর জ্ঞান ফিরে আসবার পর সবার আগে সে চাই খেতে চায় এবং তাকে তা দেওয়াও হয়। ডাক্তার আর নার্সদের যখনই খুব উৎকর্ষায় থাকতে হয়, আর শক্তি বজায় রাখবার জন্য কোন কিছুর দরকার হয়, তখন চা-ই তাদের কর্মক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখে।”

ভ্রম সংশোধন

গত পৌষ সংখ্যা “বঙ্গলক্ষ্মী”তে প্রকাশিত “আচার্য ব্রজেননাথের মহাপ্রয়াণ” শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত। প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত কার্তিক চন্দ্র দাশগুপ্তের মারফৎ আমাদের হস্তগত হওয়ায় লেখকের নাম ছাপায় ভুল হইয়াছে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন-গৌহাটি

শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ

বৈচিত্র্যময় নয়ন মনোহর প্রকৃতির লীলাভূমিতে, আত্মশক্তি কামাখ্যা দেবীর পবিত্র ক্ষেত্রে এক্সর প্রবাসী বাঙ্গালীদের মিলন-বাসর বসিয়াছিল। প্রবাসী বঙ্গ-নারীগণ বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, কুল, ভাষাভাষীদের মধ্যে থাকিয়া নিজ মাতৃভূমির স্বজাতি ভগ্নিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত সন্ধ্যা উৎকণ্ঠিত। গৌহাটি হইতে ডাক পাওয়াতে প্রবাসী ভগ্নিদের সহিত মিলিতে ছুটিলাম। এ মিলনে যে আনন্দ তাহা স্বদেশের শত শত উৎসবের মধ্যে পাওয়া যায় না। কামাখ্যা দেবীর পীঠস্থান স্পর্শ করার আগ্রহও গৌহাটি লইয়া যাইল। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের সময় প্রবাসী ভগ্নিদের সহিত পরিচয় হইবার পর হতেই তাঁহাদের সহিত মিলিবার লোভ সংবরণ করা যায় না—তাই দিল্লী, রাঁচি, পাটনা, গৌহাটি যাইবার জন্ত মন দোঁড়ায়। এবার মেয়েদের আর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল—মূল সভানেত্রী হইয়াছিলেন একজন প্রবাসেরই বাঙ্গালামায়ের মেয়ে। যে অনুরূপা দেবী বঙ্গ ললনার ও বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন তিনিই এই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত।

বড়দিনের দিন দুইটা চম্পিশ মিনিটে আসাম মেলে রওনা হইয়া প্রাতে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে আমিন গাঁওশেনে অবতীর্ণ হইলাম। পূর্বতর্মালা বেষ্টিত ব্রহ্মপুত্রের সৌন্দর্য্য মনে পরম আনন্দ প্রদান করিল। যখন ষ্টিমারে ব্রহ্মপুত্র পার হইতেছিলাম, নদের বক্ষস্থিত পাহাড়ের উমানন্দ দ্বীপ অপূর্ব মনোহর শোভা স্থপ্তি করিয়াছে, দেখিলাম। সেই দারুণ শীতে প্রভাতে গৌহাটি হইতে ব্রতী বালিকারা আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিল এবং মোটর বাসে করিয়া সাত মাইল দূরে গৌহাটিতে লইয়া গেল।

একলো বেঙ্গলী জুবিলী বিদ্যালয়টি গৌহাটিবাসী বাঙ্গালীদের নিজের গড়া প্রতিষ্ঠান। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, সুদৃশ্য গৃহ, স্বরম্য উদ্যান এই বিদ্যাগৃহটিকে স্বশোভিত

করিয়াছে। ইহার সমুখের প্রাঙ্গণে বাঙ্গলার আটচালার অনুরূপ মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে। বাঁশের কাঠামোর উপর বিচালীর ছাউনী এই মণ্ডপটি। জ্বলের ঘরে ঘরে প্রতি-নিধিদের বাসস্থান ঠিক হইয়াছে। একাংশে মহিলাদের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল।

এখানে গিয়া দেখিলাম জয়পুরের গৌরী গুপ্ত, কানপুরের সরোজিনী ভট্টাচার্য্য, এলাহাবাদের প্রতিভা মুর্শাজি ও মমতা চৌধুরী, মুম্বয়ের ইন্দুবালা মজুমদার, বুঁচীর প্রমীলা চাটার্জি, কল্যাণী সেন ও মিসেস এস, সি রায়, লালমণির হাটের অন্নপূর্ণা গোস্বামী আসিয়াছেন। এক-আত্মীয়-বাটিতে যেন আসিয়া পড়িলাম। কোন ভাবনা নাই, কোন অসুবিধা ভোগ করিবার কারণ নাই। জ্ঞানের সময় গরম জল, প্রাতে চা জলখাবার, মধ্যাহ্নে তুরিভোজন, বিকালে মিষ্টান্নভোগ, পোলাও কালিয়া—যেন রাজবাড়ীর অতিথি। নিত্য নূতন প্রকার খাওয়া—প্রচুর কমলা পরিবেশন। অনিমা, মীলিমা, মায়া, প্রতিমা প্রভৃতি ব্রতী বালিকারা সদাই আমাদের পরিচর্যা করিত। সকলেই কলেজের ছাত্রী, কেহ আই-এ, কেহ বা বি-এ পড়ে। তাহাদের অগ্নানবদনের সাগ্রহ সেবা পাইয়া আনন্দ হইত আবার স্নেহে মন বিগলিত হইত। এরাই দেশের স্বসন্তান-প্রসবিনী হইবে। ইহাদের সরল ব্যবহার সকলকেই তুষ্ট করিয়াছিল।

গৌহাটির মেয়েরা স্থললিত কর্তে বন্দেমাতরম সঙ্গীত গাহিয়া সভার উদ্বোধন করেন। আসাম সরকারের প্রধান মন্ত্রী সভার উদ্বোধন করেন। তিনি অসমিয়া ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন—কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন,—অসমিয়া ভাষা বাঙ্গলা ভাষার নিকট বহুলভাবে স্বাণী, তাহা স্বীকার করেন।

মূল সভানেত্রীর অভিভাষণ ক্ষুদ্র হইলেও নানা স্মৃতিস্তিত তথ্যে পরিপূর্ণ ছিল। অনুরূপা দেবী মহোদয়া সভানেত্রীর আসনের সর্বতোভাবে মর্যাদা রাখিয়াছিলেন।

বিষয় নির্বাচন সমিতিতে তিনি যুক্তি, স্ফুটতা ও দৃঢ়তার সমাক পরিচয় প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, “বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য ভাবে, বাকাবিভাগে, শব্দ-বাহুল্যে ভারতীয় অগ্রাগ্র ভাষা অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী এবং বাঙ্গলা ভাষা ভারতে সর্বাপেক্ষা সংখ্যা-গরিষ্ঠের কথাভাষা—সেইজন্ত বঙ্গভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত” ইহা দাবী করেন। এই প্রস্তাব আনয়ন করিলে তাহার খুবই বাদান্তবাদ হয়। সভানেত্রী মহাশয় নানা যুক্তি দিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করেন এবং সমান সমান ভোট হইলে নিজের ভোট দিয়া তাহা জয়যুক্ত করেন। মূল অধিবেশনের সময় তিনি গান্ধীর্ষ্য, মর্যাদা ও নিরপেক্ষতার সহিত কার্য পরিচালন করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। বাঙ্গলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবার সর্বতোভাবে উপযুক্ত তাহার সপক্ষে বৃহত্তর বঙ্গশাখার সভাপতি ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শ্রীযুক্ত দেবেশ চন্দ্র দাস আই-সি-এস মহাশয় নানা যুক্তি ও উদাহরণ প্রদান করিয়াছিলেন। মাননীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহার পক্ষে বাঙ্গলা ভাষার রাষ্ট্রভাষার দাবী সমর্থন করিয়াছেন।

প্রথম দিন সন্ধ্যার সময়ে লক্ষ্মীঘের সুরসিক সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় মেয়েদের গান গাহিবার সরল পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সভায় প্রায় চারিশত মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। শিলং, নওগা, তেজপুর, জোরহাট হইতে অনেক মহিলা আসিয়া ছিলেন।

জোরহাটের নীলিমা সেনগুপ্ত সেতার বাজাইয়া, শিলঙের অমলা দত্ত (ভূতপূর্ব মন্ত্রী প্রমদা দত্ত মহাশয়ের বঙ্গা) কীর্ত্তন গাহিয়া, কনক দাস (আই-সি-এস দেবেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের পত্নী) রবীন্দ্রনাথের গান গাহিয়া সকলকে

মুগ্ধ করেন। প্রতিদিন সভার অধিবেশনের প্রারম্ভে মেয়েরা স্প্রসিদ্ধ গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিত। ছেলেদের বন্দেমাতরম গানটি নবধরণের স্বরে গীত হয়।

সাহিত্য শাখার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়; তাহার অভিভাষণে সাহিত্যে নিখিলতা ও নীতির আদর্শের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু যুক্তি প্রদান করেন। সাহিত্য শাখায় শ্রীমতী অনূর্ণা দেবী ‘সাহিত্য সেবার সার্থকতা’ নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এলাহাবাদের প্রতিভা দেবী একটি সরস কবিতা পাঠ করেন। ইহা ব্যতীত মেয়েদের কোন লেখা না থাকাতে অল্পরূপা দেবী তাহার বিদায়-অভিভাষণে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এলাহাবাদের ডাঃ নীলরতন সরকার বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণে আন্তর্জাতিক বিবাহের কথা আলোচনা করিয়া অনেকের মনে চাঞ্চল্য আনয়ন করেন। তাহার খাণ্ড সম্বন্ধে বক্তৃতা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছিল।

রাঁচির প্রবীন নৃত্যবিদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় সমাজ বিজ্ঞান শাখার অভিভাষণে নানা সারগর্ভ, গভীর ও স্ফুটিত বিষয় আলোচনা করিয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছেন।

এবংসর এই সম্মেলনের মেলামেশার খুব স্ফুটন ছিল। বিশিষ্টাশ্রমে যখন যাওয়া গেল, প্রকৃতির অপূর্ব শোভায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পাহাড় হইতে অবতীর্ণ ঝরণার কল কল নিম্নাদে সেই নির্জন স্থানটি মুখরিত হইয়া বেশ তৃপ্তি প্রদান করিতেছিল।

কয়েকদিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম—যেই আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছি, এমনি বোধ হইতেছে।

দক্ষিণ ভারত-পথে

গোদাবরী

দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী প্রধান নদী। হিন্দুর সাতটি পবিত্র নদীর মধ্যে গোদাবরী অন্যতম—গঙ্গে যমুনেচৈব গোদাবরী সরস্বতী, নর্মদা সিন্ধু কাভেরী জলেহ-স্মিন সন্নিধং কুঙ্ক। রামায়নের যুগেও গোদাবরী প্রবহমান ছিল। গাং স্বর্গং দদাতীতি গোদা, তাসু বরী শ্রেষ্ঠা বলিয়া গোদাবরী নাম হইয়াছে। গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনেই রাম সীতা সহ বনবাস করিতেন। এখানেই রাবণ সীতা হরণ করিয়াছিলেন।

আরব্য সাগর হইতে পঞ্চাশ মাইল মাত্র দূরে নাসিক জিলার ত্রিশ্বক গ্রামের পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর এক গিরি গহ্বর হইতে গোদাবরী উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ পূর্বমুখে মাইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। গঙ্গাসাগর সঙ্গমের স্থায় গোদাবরী সাগর-সঙ্গমও হিন্দুর পুণ্য-তীর্থ। দৈর্ঘ্যে গোদাবরী ৮৯৮ মাইল, সঙ্গমের কিয়ৎদূর হইতে সপ্তমুখী হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে—তুল্যা, আজ্যেয়ী, ভারদ্বাজী, গৌতমী, বৃদ্ধ গৌতমী, কৌশকী ও বিশিষ্টা সপ্ত ধারার নাম। গৌতমী সঙ্গমই স্নানের প্রধান স্থান। গোদাবরী স্টেশনে উত্তীর্ণ হইয়া সেতুর পার্শ্বে স্নানের বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণী মুক্ত ঘাটে স্নানার্থীরা স্নানের সুবিধা পায়। গোদাবরী স্নানের পুণ্য যোগ বৎসরে কয়েকবার থাকে, তবে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর যে ‘পুষ্করম্’ যোগ হয় তাহা কুস্তযোগের স্নানের স্থায় পুণ্যযোগ। সেই যোগে সমগ্র ভারত হইতে লক্ষ লক্ষ নর-নারী গোদাবরীতে স্নান করিতে আসে। ১৯৩২ সালে ‘পুষ্করম্’ যোগ ছিল।

কাভেরী

গোদাবরী স্টেশনের ত্রিশ মাইল উত্তরে গোদাবরীর অববয়ব এক বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া অতি মনোরম দৃশ্য সৃজন করিয়াছে। গোদাবরী নদী সঙ্গম হইতে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

বহু মাইল পর্যন্ত প্রস্থে তার বক্ষস্থিত চর লইয়া, তিন মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এই স্থানে ক্রমশঃ সর হইয়া মাত্র দুইশত গজ প্রস্থে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষীণ জলধারা পর্বত ভেদ করিয়া আবার পার্শ্বের সমতল ক্ষেত্রে প্রবল ধারায় পতিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানটি অতি মনোরম! সীতার অছুরোধে রামচন্দ্র গোদাবরীকে সংকীর্ণায়তন করিয়াছিলেন।

গোদাবরী বক্ষের যে স্থানে রেল লাইন যাইবার জন্য সেতু নির্মিত হইয়াছে সেখানকার পরিসর পোনে দুই মাইল। ৫৬টা স্বদৃঢ় প্রস্তর-স্তম্ভের উপর স্বদৃশ



কাভেরী নদী

সেতুটি বিস্তৃত। প্রতি স্তম্ভের মধ্য বিন্দুর পরিসর ১৬০ ফিট, সেতুটি লম্বায় মোট ৮৯৬০ ফিট, ভারতের রেল সেতুর মধ্যে এই সেতু দ্বিতীয় দীর্ঘ সেতু। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম সেতু ডিহীরির সোন নদের সেতু। সেটি দীর্ঘে ১০,০৫২ ফিট।

গোদাবরী তীরে গগনচুম্বী পর্বত মালার গাত্রে বহু বাটী হইতে বিক্ষুরিত দীপাবলীর আলোক যখন গোদাবরী-নীরে প্রতিফলিত হয় তখন অপর তীর হইতে বড়-সুন্দর দেখায়। ইংরাজ আমলের অপূর্ব

কীর্তি গোদাবরী খাল, কত হাজার হাজার বিঘা শস্ত ক্ষেত্র এই মেচবারী দ্বারা উর্বরা হইয়া শস্ত উৎপাদন করে। গোদাবরী তীরেই ভদ্রচলম্, রাম এখানে বনবাসকালে ছিলেন। তাহায়েই স্মরণে বিশাল রামচন্দ্রজীর মন্দির। মূল মন্দির বেটন করিয়া চৌঘটি গোপুরম দণ্ডায়মান। দক্ষিণ ভারতের দেবস্থানের মধ্যে এই মন্দিরটী সর্বাঙ্গপেক্ষা বিস্তৃশালী।

ভদ্রচলমের মন্দির মধ্যে মহাভক্ত রামদাসের প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। তেলেগু ভাষায় রামদাস চরিতম্ গ্রন্থে তাঁহার মহিমার কথা বর্ণিত আছে। রামদাস নিজামের একজন খাজাকী, রাজকোষ হইতে ছয়

কিন্তু ঘুমও হয়, ক্ষিদেও পায়। সন্ধ্যার পরই ঘুমাইয়া পড়ি, কখন যে গোদাবরী হইতে কৃষ্ণানদীর তীরে আসিলাম তার খবর পাইলাম না। বেজওয়াদা ষ্টেশনের কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; বেজওয়াদা মাদ্রাজ প্রদেশের একটি বৃহৎ জনবহুল বাণিজ্য কেন্দ্র। মাদ্রাজ অঞ্চলে বহু সমৃদ্ধিশালী, জনপূর্ণ নগর ও বন্দর আছে। বাঙ্গালা দেশে উত্তর দক্ষিণ ভারতের ছায় প্রসিক্ সहर বা তীর্থস্থান বিরল। কলিকাতা ও চট্টগ্রাম ছাড়া বন্দর নাই; ঢাকা ছাড়া নামজাদা সहर নাই, নবদ্বীপ, কালীঘাট ও চন্দ্রনাথ ছাড়া তীর্থ নাই। মাদ্রাজ প্রদেশে ওয়াণ্টেশ্বর,



ময়লাপুরের মন্দির ও টেপাকুলাম

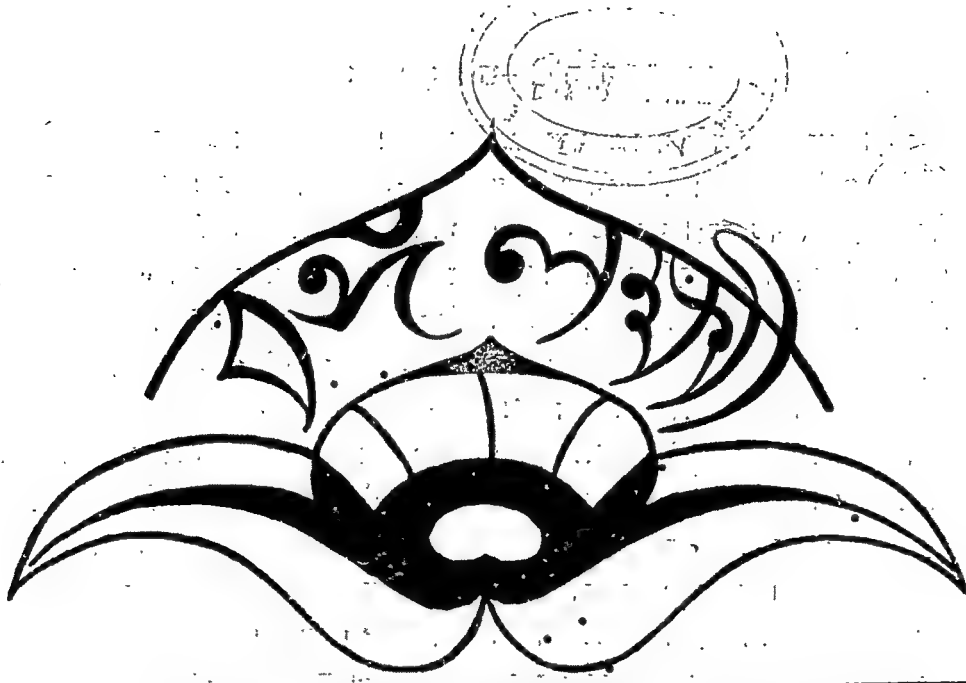
লক্ষ টাকা ভাঙ্গিয়া এই বিশাল মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিজাম রাজকোষের অর্থে তদ্রূপ করিবার অপরাধে তাঁহাকে দীর্ঘ কারাদণ্ড প্রদান করেন। শ্রীরামচন্দ্র রামদাসের ভৃত্য বেশে নিজামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অর্থের ক্ষতি পূরণ করিতে চাহেন। নিজাম দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া রামদাসের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন এবং দেবদেউলের খরচের জন্ত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বিপুল সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

•অনেকের ট্রেনের বাঁকানিতে ঘুম হয় না—আমার

ভিজিগাপাটম, কোকনাদা, রাজমঞ্জী, বেজওয়াদা, ইলোর, মসলিপাটাম, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, ট্যাঞ্জোর, ত্রিচীনপলি, চিদাম্বরম, কাঞ্চিভারম, কুন্তকনাম, মহাবলীপুরম, পক্ষী-তীর্থম, মাহুরা, টিনীভ্যালী, টিউটীকরণ, শ্রীরঙ্গম, কেদাই ক্যানাল, উটী পণ্ডিচারী, রামেশ্বরম, ধনুস্কোটি আদি তীর্থ, বন্দর ও নগরের খ্যাতি রহিয়াছে।

বেজওয়াদা কৃষ্ণা নদীর কূলে; কৃষ্ণা ও একটি বড় বেগবতী নদী। জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাতে দুই তীরস্থ পর্বতমালায় মধ্যে প্রবাহিত কৃষ্ণার জলরাশির শোভা যেমন সুন্দর তেমনিই মনোরম।

ক্রমশঃ



১৪শ বর্ষ

ফাল্গুন, - ১৩৪৫

চতুর্থ সংখ্যা

উৎসব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই উৎসব যাত্রীর উৎসব। আমরা বিশ্বযাত্রী, পথের ধারের কোনো পাছশালাতে আমরা বন্ধ নই। কোনো বাধা মতামতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসব হয় না—চলার পথে উৎসব, চলতে চলতে উৎসব। এ উৎসব কবে আরম্ভ হয়েছে? যেদিন এই পৃথিবীতে মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই দিন থেকে এই আনন্দ উৎসবের আমন্ত্রণ পৌঁছেছে—সেই আছান্নে সেই দিন থেকে পথে বেরিয়েছি। সেই যাত্রীর সঙ্গে সে দিন থেকে তুমি যে সহযাত্রী, তাইতো যাত্রীর উৎসব জমেছে। মনে হয়েছিল যে-পথে চলছি সে সংসারের পথ, তার মাঝে সংসার তার শেষে সংসার; তার লক্ষ্য ধনমান; তার অবমান; মৃত্যুতে; কিন্তু না, পথ তো কোথাও ঠেকে না, সমস্তকেই যে ছাড়িয়ে যায়। তুমি সহযাত্রী, তার দক্ষিণ হাত ধরে কত সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সংশয়ের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাকে পাশে নিয়ে চলেইছ; কোনো কিছুতে এসে থামতে দাওনি। সে বিদ্রোহ করেছে, বিরুদ্ধতা করেছে—কিন্তু তুমি তার দক্ষিণ হাত ছাড়োনি। তুমি সঙ্গে সঙ্গে চলেছ—তুমি তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছ সেই অনন্ত মঙ্গল-স্বের বিরাট রাজপথে, সেখানে সমস্ত যাত্রীর দল, চিরজীবনের তীর্থে চলেছে। ইতিহাসের সেই প্রশস্ত রাজপথে এই আনন্দকোলাহল, কী জয়ধ্বনি, সেই তো উৎসবের আনন্দধ্বনি! তুমি বন্ধ করোনি, তুমি বন্ধ হোতে দেবে না, তুমি কোনো মতের মধ্যে, প্রথার মধ্যে মানুষকে না বন্দী করে রাখবে না। তুমি বলেছ মাঠে—যাত্রীর পথ বেরিয়ে পড়ে। কেন ভয় নেই, কিসে নির্ভর? তুমি যে-সঙ্গে সঙ্গে চলছ। তাই তো যে-চলছে সে কেবলই তোমাকে পাচ্ছে! যে-চলছে না সে আপনাকেই পাচ্ছে, আপনায় সম্প্রদায়কেই পাচ্ছে।

অনন্তকাল যিনি আকাশে পথ দেখিয়ে চলেছেন, তিনি কবে চলবে বলে কারো জন্তে অপেক্ষা করবেন না। এ বসে রয়েছে, সে কি দেখতে পাচ্ছে না আপন বন্ধন—সে জানে না যে, এই বন্ধন না খুলে ফেললে সে মুক্ত হবে না,

সে সত্যকে পাবে না ? সত্যকে বেঁধেছি, সত্যকে সম্প্রদায়ের কারাগারে বন্দী করেছি, এমন কথা কে বলে ? অনন্ত সত্যকে বন্দী করবে ? তুমি যত বড়ো মুগ্ধ হও না কেন তোমার মোহ অন্ধকারের জাল বুনিয়ে বুনিয়ে অনন্ত সত্যকে ঘিরে ফেলবে এত বড়ো স্পর্ধার কথা কোন্ সম্প্রদায় উচ্চারণ করতে পারে ?

সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি। সত্যকে পথ চলতে বাধা দিয়েছি—তাকে বলেছি, তোমার আসন এইটুকুর মধ্যে, এর বাহিরে নয়, তুমি গণ্ডি ডিঙিয়ে না, তুমি সমুদ্র পেরিয়ে না। বলচে সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখব। মুগ্ধদের জ্ঞান সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমানে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর। এমন সব স্পর্ধাবাক্য আমরা এতদিন বলে এসেছি। ইতিহাস-বিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না ? মাহুষ অন্ধ জড়প্রাণের কারাগারী যেকোনো অজ্ঞান ক'রে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতিষকে প্রতিহত করবে—সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না ? তিনি এ কেমন করে সহ্য করবেন ? তিনি কি বলতে পারেন যে তিনি বন্দী ? তিনি এ কথা বললে সংসারকে কে বাঁচাবে ? তিনি বলেছেন—সত্য মুক্ত, আমি মুক্ত, সত্যের পথিক তোমরা মুক্ত। এই উদ্বোধনের মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র—এখনি নক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে, সেই জ্যোতির্ময় মন্ত্র, জপ করছে এই মন্ত্র চিরজাগ্রত তপস্বীরা : জাগ্রত হও, জাগ্রত হও—প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রাখবার চেষ্টা করোনা। সত্য তা হোলে নিদারুণ হয়ে উঠবে—যে লোহার শৃঙ্খল তার হাতকে বাঁধবে, সেই শৃঙ্খল দিয়ে তোমার মস্তকে সে করাঘাত করবে।

রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়েনি ? সত্যকে ফাঁস পরাতে চেয়েছে—যে দেশ, সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মুগ্ধিত হয়নি ? অপমানে মাথা হেঁট হয়নি ? সেইবেনা বন্ধন—বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে

ভাঙবে। সেই উদ্বোধনের প্রলয়মত্ত পৃথিবীতে জেগেছে—সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে। বসে থাকবার নয়, কোনের মধ্যে তামসিকতায় আকর্ষিত নিমজ্জিত হয়ে থাকবার নয়—চলবার, ভাঙবার ডাক আজ এসেছে। আজকের সেই উৎসব—সেই সত্যের মধ্যে উদ্বোধিত হবার উৎসব।

আমরা সেই মুক্তির মন্ত্র পেয়েছি, কালের স্রোতে ডুবল না সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম—অন্তহীন সত্য, অন্তহীন ব্রহ্মের মন্ত্র। কবে ভারতবর্ষের তপোবনে কোন স্বপ্ন প্রাচীন কালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল—অন্ত নেই, তার অন্ত নেই—অন্তহীন যাত্রাপথে সত্যকে পেতে হবে, জ্ঞানকে পেতে হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের বাইরে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের তলে একদিন আমাদের পিতামহ এই মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—সেই যে মুক্তির আনন্দ-বোধগার উৎসব সে কি এই ঘরের কোণে বসে আমরা ক'জনে সম্পন্ন করব ? এই কলকাতা সহরের এক প্রান্তে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অগ্র প্রান্ত পর্যন্ত এই মুক্তির উৎসবের আনন্দ-ধ্বনি বেজে উঠবে না ? এই মুক্তির বাণীকে আমাদের পিতামহ কোথা থেকে পেয়েছিলেন ? এই অনন্ত আকাশের জ্যোতির ভিতর থেকে একে তিনি পেয়েছেন, বিশ্বের মর্মকুহর থেকে এই মুক্তিমন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। এই যে মুক্তির মন্ত্র আগুনের ভাষায় আকাশে গীত হচ্ছে—সেই আগুনকে তাঁরা এই কটি সহজ বাণীর মধ্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। সেই বাণী আমরা ভুলব ? আর বলব, সত্য পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ইতিহাসের জীর্ণ দেয়ালে ভাঙাঘড়ির কাঁটার মতো চিরদিনের জ্ঞান থেকে গেছে ? এই গৌরব করে বলবার কথা যে আমাদেরই দেশে সচল সত্য অচল পাথর হয়ে গেছে—বুকের উপরে সেই জগদল পাথরের ভার আমরা বইছি ?—না কখনই না। উদ্বোধনের মন্ত্র আজ জগৎ জুড়ে বাজছে—যাত্রী, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। ভেঙে ফেলো—তোমার নিজের হাতের রচিত কারাগার। সেই যাত্রীদের সঙ্গে চলো, যারা চন্দ্র, সূর্য, তারার সঙ্গে এক তালে পা ফেলে ফেলে চলছে।

চিত্ত-বাসন্তী

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জীবনের ব্যর্থতার দিনগুলি ভুলতে চাই,
ভুলতে চাই আজ সংকোচভীরু আত্মপরাভবের
মুহূর্তগুলি।

‘সম্ভাবনীয়ে’র দিগন্তে বিলীয়মান স্নান ধূসর ছায়া,
মুক্ত হও, মন আমার, সে মোহপাশ থেকে।
দৃষ্টি নিবন্ধ হোক, স্থির দৃষ্টি,
উদয়াচলের অরুণ-শিখরের উর্দ্ধে
যেখানে চির নৃতনের বন্দনা
উদাত্ত কণ্ঠে নিয়ত উৎসারিত হচ্ছে।

তোমার জীবনের সঙ্গে
বহর জীবন, জগতের জীবন জড়িত জেনো।
তোমার জড়তা

জগতের গতিমান্দের কারণ হবে।
স্নেহের বন্ধন, প্রেমের বন্ধন
সে বন্ধন নদীতটের বন্ধন,
প্রাণধারার পথ নির্দেশ করে মহাসিন্ধুর দিকে
অনন্ত জীবনের দেশে।
মোহের বন্ধন, সংকীর্ণ কামনার বন্ধন
সুদূরের যাত্রাপথে
সৃষ্টিকরে অগণিত পক্ষিল আবর্তের,
কণ্ঠরোধ করে

হৃদয়ের অমৃত-পিপাসার।
আজ ধরণীর অঙ্গনে
আনন্দের আনন্দ উৎসব,
বসন্ত সমাগত।

চূত-মঞ্জরীর সৌরভে বাতাস মস্তুর-মদির,
পলাশ-অশোকের রক্তাক্ষরে
এল আজ

অনুরাগ-লিপি লেখার ছলভ লগ্ন।

ভাষা চিনেছি, লিপি পড়েছি,
উৎসবের নিমন্ত্রণে বঞ্চিত করবে কে আমাকে!
বসন্ত বাতাসের ছকুল-প্লাবী শ্রোতে
অবগাহন করে আছে আমার সম্পূর্ণ দেহ,
শিরায় উপশিরায়,
প্রতি ধমনীতে
সেই প্রবাহ, নবজীবন-প্রবাহ সঞ্চারিত।

তোমার দেশেও কি ফাল্গুন
আজ এমনি ফুল-উৎসব এনেছে;
মস্তুর বাতাসে এমনি মাদকতা বিস্তার করেছে?
তুমিও কি এমনি আকুল আবেগে
অবগাহন করেছ

সেই সৌরভ-শ্রোতে?
রক্ত কণার প্রতি অল্পরণে
তোমার প্রাণের গভীরেও কি বেজেছে
সেই অনাদি কালের
চির নবীন প্রাণধারার
তীব্র মধুর ছন্দ?
সে সংবাদ জানার পথ আজ অবরুদ্ধ
চির দিবসের মত!
শুধু জেনেছি
পিছনে চাইবার অবসর
জীবনে যথেষ্ট নয়।

পিছনের টানে
জীবন যে হয় আপনাতে আপনি ব্যর্থ।
মৃত প্রেমের বিস্মরণের উপর
নূতন প্রেমের প্রতিষ্ঠা।
মৃত বসন্তের বঙ্কলাবশেষ অবলুপ্ত করে
নিখিলের কাননে এল ওই
নূতনের সমারোহ।

নারীত্বের আদর্শ

(সরোজনলিনীর জীবনী অবলম্বনে)

শ্রীসরলা লাহিড়ী

সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে যে বিরাট শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া অসহায়, বর্বর ও জ্ঞানহীন মানবজাতি ক্রমবিস্তারিত মধ্য দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া সভ্যতার পথে জয়যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে সেই অনন্ত শক্তির আধার নারীজাতি। যে গুরু দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া ভগবান নারীজাতিকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন তাহার উপযুক্ত করিয়া নিজে কৈরী করাই ভারতীর নারীত্বের আদর্শ। জ্ঞান, ধর্ম, সেবার, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজের অন্তর্নিহিত বিরাট শক্তিকে বিকশিত করিয়া চিরকল্যাণময়ীরূপে দিকে দিকে নিজেকে নিঃশেষ বিলাইয়া দেওয়াই ভারত রমণীর আদর্শ।

এই আদর্শ একদিন ভারতের বৃক অতি সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যুগধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের ভাবধারারও অনেক পরিবর্তন ঘটে তাই বর্তমানে অতীতের অনেকখানিই আমাদের মনে হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু আদর্শের যাহা গ্রন্থ যাহা চিরন্তন তাহা সকল যুগে সকল দেশেই সমান সত্য। সেই মূল আদর্শের স্বরূপটি আমাদের দেশের প্রত্নরমণীর আকাজক্ষার বস্তু। সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ যাহা প্রাচীন ভারতে রাজকন্যা ও আশ্রমমুহিতা সকলের নিকটই সমভাবে সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল প্রকৃতই তাহা আমাদের কল্যাণকর ও বরণ্য,— কিন্তু তাহার পরবর্তী যুগেই দেখিতে পাই লোকাচার ও দেশাচার স্বচিত ও সমাজরচিত বহু কৃত্রিমতার আবরণে সেই সহজ সরল সত্যটিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অতীতের আদর্শ ও জ্ঞানসম্পদের দীপবস্তিকাকে মধ্য যুগের অজ্ঞানতার রূপ অন্ধকার সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

বেদ ও উপনিষদের যুগে স্ত্রীজাতি সমাজে সকলের পূজনীয় ছিলেন। উদার শিক্ষালাভ ও কর্মের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দিয়া আত্মাভিমান ও স্বার্থপরতা বিস্মৃত হইয়া স্বীয় জীবনে পরমমঙ্গলময়ের সাহচর্য লাভ তাঁহাদের একান্ত কাম্য ছিল। গৃহবর্ষ ও সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহাদের ছিল একচ্ছত্র অধিকার

এবং তাঁহারা আনন্দের প্রতিমূর্তিরূপ পরম সন্তুষ্ট চিত্তে কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। দেব, ব্রাহ্মণ ও অতিথি সম্বন্ধে সেবা করিবার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। স্বখে দুঃখে ছায়ার ন্যায় স্বামীীর অনুবর্তিনী হইবার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা স্বামীগৃহে গমন করিতেন এবং আমরণ নিজের সকল শক্তি ও জীবন পতির সন্তুষ্টি ও আনন্দ বিধানার্থ নিয়োজিত করিতেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, খনা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, মদনলসা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি মহীয়সী নারী জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই কি মহান প্রেমের আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ, ধর্মের ও কর্মের আদর্শ তাঁহাদের ছিল। অন্তরের অনির্বাক্য প্রেমের দ্বারা তাঁহারা মৃত্যুর মধ্য হইতেও অমৃতকে আহরণ করিয়াছেন। সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের স্বর কখনও বেহুলা হইয়া বাঞ্ছিত না। তাঁহারা ছিলেন মূর্তিমতী শক্তিরূপিণী—যে শক্তি যে কোন বিপদকে হাসিমুখে বরণ করিতে পারে।

সেবাবর্ষ নারীজীবনের যে একটি প্রধান ধর্ম তাহা এই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল। সে সেবা যে কেবল নিজ সঙ্গীর্ষ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তাহা নহে— যেখানেই দুঃখ কষ্ট, রোগ যন্ত্রণা ও হাহাকার সেখানেই বরণ্য প্রতিমূর্তি নারীজাতির মঙ্গলজ্যোতি সকল যন্ত্রণা মুহূর্তে দূরীভূত করিয়া দিত। অপরের বিপদে সাহায্য করা, দুঃখ সহ্যভূতি ও দর্শন করা, স্বার্থশূন্য হইয়া সকলের সেবা করা—সমাজস্বাক্ষরের এই যে মূলমন্ত্র এই মন্ত্রে নারীই মানবজাতির পথপ্রদর্শিকা। গৃহে নিজের কর্তব্য হইতে এতদূর বিচ্যুত না হইয়া সমাজসেবার ভার তাঁহারা নিজ হস্তে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন উদার মতাবলম্বিনী। বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া যাহা শুভ ও কল্যাণকর তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না শিক্ষার সহিত গৌন্দর্য্য সমাবেশের অপূর্ণ পরিকল্পনা তাঁহাদের ছিল।

যে সবল মহাপুরুষ এই ভারতবর্ষে প্রগ্রহণ করিয়া

ভারতভূমিকে ধত্তা করিয়াছেন তাঁহাদের কথা মনে করিলে সর্বপ্রথমে তাঁহাদের জননী—ঈশ্বারের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা এত বড় হইয়াছেন—সেই আদর্শ মাতার ও তাঁহাদের মাতৃত্বের আদর্শের কথা মনে পড়িয়া যায়। প্রথম নয়ন উন্মেষ হইতে মাতৃস্নেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরস্থিত আদর্শের সহিতও তাঁহাদের নিবিড় পরিচয় ঘটে। সন্তান-চরিত্রে জননীর প্রভাব অবশুস্বাভাবিক ও সার্বজনীন। স্নেহ, দয়া, মায়া, শৌর্য, বীর্য, কর্মের আদর্শ ও ধর্মের পথ জননীই সম্মুখে সন্তানের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলেন। পুত্রকন্যাাদিগকে নৈতিক ও মানসিক বলে বলীমান করিয়া, জীবনের সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়া জগতের চোখে তাহাদিগকে বড় করিয়া তুলিবার সাধনা তাঁহাদের। অন্তঃপুংকে তাঁহারা একটি আদর্শ শিক্ষালয় করিয়া তুলেন—যেখানে ধর্ম, কর্ম, ত্যাগ, প্রেম ও সেরার আদর্শ চির বিরাজিত।

এই সুমহান আদর্শ ভিত্তি করিয়া ভারতীয় নারী-জাতি একদিন সভ্যতা ও মানসিক উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহারা এই আদর্শভ্রষ্টা হইয়া ক্রীতদাসীর জীবন বরণ করিয়া লইয়া ছিলেন। ভারতের সে এক ঘোর দুর্দিন। সমাজের হৃদয়-স্বরূপিনী স্ত্রীজাতি তাঁহাদের স্বাভাবিক মর্যাদার আসন হইতে বহু নিম্নে নামিয়া আসিয়াছিলেন। যেখানে তাঁহারা পুরুষের সহধর্মিণী, সহধর্মিণী ও উৎসাহদাত্রী ছিলেন সেই গৌরবময় পদমর্যাদা তাঁহাদের নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া গেল। নারীর আদর্শের মূল তথ্যটি তখন সকলে ভুলিতে বসিয়াছিল। নারীত্বের ভাষ্যাকাশে, তাঁহাদের আদর্শের হুউচ্চ শিখরে যখন অজ্ঞানতার দুর্ভাগ্য তমিশ্রা স্থায়ী আসন করিয়া লইতেছিল, তখন দুর্ভাগ্য নারী জাতির হৃৎপথে, তাহাদের অবমাননায় ব্যথিত হইয়া ঈশ্বার সেই গাঢ় অন্ধকার রাশি দূর করিবার ভার লইয়াছিলেন অদ্বৈত সুরোজ নলিনী তাঁহাদের অন্তর্যামী।

বিশেষ করিয়া তাঁহারই কথা সকলের মনে পড়ে যেহেতু তিনি এই সোনার বাংলারই মেয়ে; দুর্ভাগিনী স্ত্রীজাতিরই

একটি স্নেহশীলা ভগিনী। সকল দুর্দশার মূলে সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে দেশব্যাপী যে অশিক্ষা রহিয়াছে সেই অশিক্ষাই যে নারীমহিমার সকল অধিকারকে গ্রাস করিয়াছে—তিনি অন্তরের সহায়ত্বের আলোয় তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিশ্বত সেই অতীতের আদর্শকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্ত তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন নিয়োজিত করিয়া ছিলেন। ভারতীয় নারীর আদর্শের পূর্ণ বিকাশ তাঁহার জীবনে স্বন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কল্যাণী গৃহস্থায়ী কর্মনীমত্ব ও দৃঢ়তা, মাধুর্য ও কর্মকুশলতা, সরলতা ও বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্য বোধ ও নিপুণতার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। দেবতার আশীর্বাদের ত্রায় তাঁহার পুণ্য জীবন-ধারা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছিল,—জ্ঞাতি ধর্ম নিবিন্ধে যে বাংলার সকল নারী তাঁহার প্রীতি ও করুণার প্রসবনে অবগাহন করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছে।

সকল কুসংস্কারের বেড়াঙ্কল ভাঙিয়া সহজ, সরল সবল শিক্ষায় অবহেলিত স্ত্রীজাতির মানসিক উন্নতি সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। শিক্ষায়, দীক্ষায়, রিত্র-সৌন্দর্যে, প্রতিদিনের ব্যবহারে যেন তাহারা উন্নত হইয়া উঠে এই উচ্চ আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন। সঙ্গীর্ণতা ও পারিপাশ্বিক আবহাওয়ার বহু উর্দ্ধে তাঁহার নারীত্বের অভিধান পৌঁছিয়াছিল। প্রত্যাহের তুচ্ছতা; খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যেও অনাবিল আনন্দধারার সন্ধান তিনি লাভ করিয়াছিলেন; দৈনন্দিন ধূলিকণা ও মলিনতা তাহাদের অহুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। কোমলতা ও নির্ভীকতার একপ অপর মিলন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াও মনে প্রাণে তিনি ছিলেন বাংলার মেয়ে—বাংলাইই বধু, যে এ দেশের স্ত্রী-জাতির আদর্শ উদার শিক্ষা সপ্রতিভতার সহিত লজ্জা নয় ব্যবহার ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলা। শব্দ সিন্দুর শোভিত বঙ্গ নারীর অপূর্ব সৌন্দর্য্যকে সুরোজনলিনী অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং সেই বেশে নিজেকে সজ্জিত করিতে ভালবাসিতেন।

তিনি ছিলেন আদর্শ কন্যা, আদর্শ বধু ও আদর্শ মাতা। নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া পহিপ্রথমে তিনি আপনাকে লীন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রেমের মধ্য দিয়া

তিনি প্রেমময়ের চরণস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন,—তাই আজ তিনি সকলের অন্তরে প্রেমের আসনে চির প্রতিষ্ঠিত। স্বামীর জীবনে তিনি একান্ত অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে পত্নী, কৰ্ম্মসচিব, প্রিয়-সখী, ও শিষ্যা। তাঁহার স্বামীর প্রতি কার্য্যে সরোজ-নলিনীর সহাহুভূতি ও সাহায্য ছিল। কোনরূপ যুক্তিতর্কের মধ্যে না যাইয়া তাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত প্রেমের দ্বারা সকল সমস্তার তিনি মুহূর্ত্তে সমাধান করিতেন।

তিনি ছিলেন আদর্শ-গৃহিণী। তাঁহার হস্ত ছুটি কখনই কৰ্ম্মবিরত থাকিত না, প্রত্যেক কৰ্ম্মে যেন তাঁহার অন্তরের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও আনন্দ ফুটিয়া উঠিত। লোককে খাওয়াইয়া তিনি অত্যন্ত তৃপ্তি পাইতেন। অতিথি সংহারে তিনি ছিলেন রমণীকুলের গৌরব। সাংসারিক খুঁটিনাটি কোন বিষয়েও তাঁহার এতটুকু অবহেলা দেখা যাইত না।

আদর্শ জননীর সমুদয় গুণে তিনি ভূষিতা ছিলেন। অয়ং শিশুর পরিচর্যা না করিয়া অন্য কাহারও হস্তে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। সন্তানের খাদ্য ও বেশভূষা হইতে আরম্ভ করিয়া শারীরিক ও মানসিক সকল বিষয়ে উন্নতির দিকে তাঁহার প্রথম দৃষ্টি ছিল এবং জীবনের শত বাধা বিপত্তিতেও তাহার অন্যথা হইতে দেন নাই। পুত্রের শিক্ষার ভার সর্ব্বদা তিনি নিজে গ্রহণ করিতেন ও স্বামী বা পুত্র কাহারও অস্থখ হইলে সেবা ও পরিচর্য্যানৈপুণ্যে সকলকে বিস্মিত করিয়া দিতেন। প্রাচীন ভারতের নারী-ত্বের এই সমগ্র আদর্শ সরোজনলিনীর জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রেমের রাজ্যে, সেবার ক্ষেত্রে ও স্নেহের দুয়ারে তাঁহার ছোট বড়, ধনী নিধন, ও জাতিগত বা দেশগত বৈষম্য ছিল না। অতি সহজেই তিনি সকলকে আপন করিয়া লইতেন। বস্তুতঃ তিনি যেন বিশ্ব মানবের প্রেম ও প্রীতির মালা গাঁথিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। এই যে নির্ব্বিশেষ প্রেম, নির্ব্বিকার আনন্দ ও নিরাসক্ত আত্ম-নিবেদন ইহাই হিন্দু নারীর আদর্শ এবং এই আদর্শ আপনাই তাঁহার জীবনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন বা কিছু স্মন্দর ও তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা তিনি সযত্নে আপন জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই কথা জাগরুক থাকিত যে তিনি সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়ে। ভারত নারীর চরিত্র শ্রী, ধী ও হ্রীমুণ্ডিত হইয়া এমন হওয়া উচিত যাহা অন্য দেশের মেয়েদেরও অনুকরণযোগ্য। চরিত্রের নির্ম্মলতা, সচ্চরিত্রতা ও পাত্তিত্ব্যকে তিনি নারীজীবনের অলঙ্কার স্বরূপ জ্ঞান করিতেন।

সমগ্র জীবন তাঁহার আনন্দের উৎস ছিল। বহির্জীবন যেমন কৰ্ম্মপ্রবাহ ও জনসেবার বৈচিত্র্য পূর্ণ ছিল, গৃহ ও তাঁহার তেমনি কর্তব্যকর্মে, প্রেমে, মধুর্য্যে ও স্বশৃঙ্খলায় পূর্ণ ছিল এবং একই প্রেমের স্ত্রে এই দুই জীবন সামঞ্জস্যের সুরে বাঁধা থাকিত। তাঁহার কল্যাণহস্ত দুটি দিকে দিকে প্রসারিত ছিল। যেখানেই নিরাশার ক্রন্দন, আর্ন্তের হাহা-কার ও দুঃখ যজ্ঞনা সেখানেই তাঁহার স্নিগ্ধ স্পর্শ সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাইয়া দিত। তাঁহার শুভ্র হাসির আলো জগতের সকল লোকের আনন্দের সহিত মিলিত হইয়া সেই আনন্দকে আরো উজ্জল করিয়া তুলিত, প্রতি দুঃখ তাঁহার অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া বলমল করিত; দিন ও রাত্রি তাঁহার মধুর্য্যে আরো মধুর হইয়া উঠিত। তিনি নিজ অন্তঃপুরে যে মঙ্গল দীপ জ্বালাইয়াছিলেন। সেই শুভ স্মন্দর হস্তের প্রজ্বলিত দীপশিখা অন্তরবাহিরকে পূর্ণ করিয়া আপন গৌরবে সকল সঙ্কীর্ণ সীমানাকে ছাড়িয়া পড়িয়াছে। তাঁহার দাক্ষিণ্যের ভাণ্ডারে সকলেরই অব্যাহত প্রবেশাধিকার ছিল। ভারত-রমণীর যে আদর্শ—ক্ষমা ধৈর্য্যশীলতা, সহিষ্ণুতা, সন্তুষ্টি, নিরহঙ্কার ও সহজ সরল নব্রতা—তাহা তাঁহার জীবনের সহিত অঙ্গাদ্বীভাবে যুক্ত ছিল।

ঈশ্বরে তাঁহার প্রগাঢ় অহুরাগ-ছিল। জীবনের পবিত্রতা সংলতা, নির্ম্মলতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাঁহার স্বাভাবিক বিশ্বাসই তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের পাথর ছিল, তাই তিনি এত স্মন্দর, এত কোমল অথচ চরিত্রে এত দৃঢ় হইতে পারিয়া-ছিলেন। জীবন-দিয়া তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে নারীর ধর্ম্ম স্বধু আপনাকে লইয়া থাকা নহে,—এই পরম সত্যটি তিনি সকল জীজাতির মধ্যে বিস্তার করিবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সেবিকা এই

কথা বলিতে পারিয়া যে দেশের নারীগণ ধৃত হইয়া যান সেই দেশের নারীগণের মধ্যে আদর্শের সন্নিবিষ্টতা দেখিয়া সরোজনলিনীর কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। অন্তঃপুরের চারি দেয়ালের বাহিরে যে বৃহত্তম দেশ পড়িয়া আছে সেখানে অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা ও ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে; নারীর কর্তব্য সেই সেবা-যজ্ঞে অন্ধান বদনে আত্মদান করা। তাই তিনি হৃদয়ের সকল প্রেম ও সেবা লইয়া সেবা-ত্রিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দেশকে তিনি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিতেন—তাই যে শিক্ষার অভাবে দেশে নারীত্বের অবমাননা ঘটিয়াছে,—নারীর আত্মবোধ লোপ পাইয়াছে সেই শিক্ষার ব্যবস্থা ও ঘরে ঘরে সমাজসেবার জীবন্ত আদর্শ জাগাইয়া তুলিবার জন্য জীবনপাত করিয়াছিলেন। নিজ জীবনের সকল বিশিষ্টতা তিনি বঙ্গ-রমণীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন। শহরে শত কর্ম কোলাহলের মধ্যে নিয়ত বাস করিয়াও স্বদূর পল্লীর অবজ্ঞাত ভগ্নি-

গণের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকিত, তাই তিনি কুসংস্কার ও অশিক্ষার পায়ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া বহির্জগতের মুক্ত আলোয়—মানবতার উদার রাজপথে ও বৃহত্তর জগতের চিন্তা ও কর্মধারার মধ্যে তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছিলেন।

ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের পূর্ণ স্বরূপ লইয়া সরোজনলিনী একদিন আমাদেরই মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কুসংস্কারের আচ্ছাদিত তাঁহার জীবনধূপ নিঃশেষিত হইলেও স্মৃতি আজো মিলাইয়া যায় নাই। অতীতের সেই পবিত্র ভাবধারায় অবগাহন করিয়া শুচি-শুদ্ধ চিত্ত লইয়া তিনি বাংলার তথা ভারতের নারীজাতির অজ্ঞতার পঙ্কিল সরোবরে নলিনীর মতই ফুটিয়া উঠিয়া ছিলেন। তাঁহার ‘সরোজনলিনী’ নাম তিনি তাঁহার জীবন দিয়া সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাই সেই দেবার চরণেশ্রবায়, সম্মুখে আমাদের মস্তক বার বার নত হয়।

মূলধন

শ্রী হেমলতা দেবী

সবাই জুটে নিল লুটে

বাহির ও অন্তর,

“আমি”র আলোয় প্রভু তুমি

তবু কি সুন্দর!

‘আমি’র কথায় ‘আমি’র ব্যথায়

যেটি চিরন্তন,

দিনে দিনে দিন কাটাবার

সেটি যে মূল ধন!

অন্ত কিছুর প্রত্যাশী নই

নহি সে ভিক্ষুক,

আপন ধনের মালিক ‘আমি’র

তোমায়-ভরা বুক।

বিউশ্বনা

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

কয়েকদিন হইতে পানিবসন্ত ও জর চলিতেছিল, এখন ভাল আছি অথচ বাহির হইতে পারি না—দুর্বল। কি করিব ভাবিতেছি হঠাৎ সম্পাদিকার নিকট হইতে স্নেহের আদেশ আসিল, একটা জম্জমাট গল্প লিখে দাও—এই মাসেই ছাপতে হবে।

মাথা ঘুরিয়া উঠিল। লিখিব কি? বিছানায় শুইয়া শুইয়া গল্পের প্লট মাথায় গজায় না—অথচ বাহিরে একটু বেড়াইয়া আসিব তাহার উপায় নাই, ডাক্তারের মাশ। ভাল করিয়া ছই কাপ চা পর্যন্ত খাইতে পাওয়া যায় না এমনি অস্থ—তবু গল্প একখান লিখিয়া দিতে হইবে এবং ত হা জম্জমাট হওয়া চাই! মুস্থিল।

দু-একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, লেখা আসিল না। হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম। বাহিরে বাদলা চলিতেছে। চৈত্র মাসে বাদলা নেহাৎ মন্দ লাগিতেছে না—বাদলকে আমি বড়ই ভালবাসি, বর্ষা আমার জীবনে প্রিয়তম; মেঘদূতের কথা মনে পড়িয়া গেল—এমন দিনে কিন্তু মেঘদূত পড়া যায় না। সেই আষাঢ় মাসের বাদল না হইলে মেঘদূত কি মানায়!

আবোলতাবোল কত কি ভাবিতেছি—সকল ভাবনার মধ্যেই গল্প লিখিবার-উপকরণ-সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা যেন নিজের অজ্ঞাতসারে জড়াইয়া যাইতেছে। ভাবনার মধ্যেও একটু স্বাধীনতা পাইতেছি না—মহাবিপদে পড়িলাম তো! না, গল্প আজ কিছুতেই লিখিব না—আজ শুধু এমনি যা খুসী ভাবিয়া চলিব। মাথা নাই মুণ্ড নাই—অথচ ভাবনা ঠিক চলিবে একটানা শ্রোতের মত।

চাকরটা কয়েকখান চিঠি দিয়া গেল। একখান দেশের বাড়ীর অগ্র একখান একজন বন্ধু লিখিয়াছেন। তৃতীয়খানি কার। খাম না খুলিয়াই ঠিকানাটার দিকে চাহিয়া রহিলাম। বেশ পরিচিত হস্তাক্ষর অথচ বুঝিতে পারিতেছি না—অর্থাৎ মনে পড়িতেছে না লেখাটা কার। সুন্দর মেয়েলি হাতের লেখা। পোষ্ট অফিসের ছাপ দেখিলাম,

নিউ দিল্লী। তবে আর কি; নিশ্চয় বৌদি লিখিয়াছেন। কিন্তু কেন? এতদিন পরে বৌদি কেন আজ চিঠি লিখিলেন? চিঠি না খুলিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ মনে হইল আজ ১লা এপ্রিল। তবে কি বৌদি আমাকে ‘এপ্রিল ফুল’ বানাইতে এই চিঠি লিখিয়াছেন! দীর্ঘ ছই বৎসর যিনি আমার কোন সংবাদ রাখেন না, আজ এই পহেলা এপ্রিল তাহার চিঠি আসিবার অগ্র আর কি কারণ থাকিতে পারে! নিশ্চয়ই ‘এপ্রিল ফুল’ বানাইবার মতলব। বৌদির রসস্বপ্নপ্রিয়তা আবার হয়ত চাগিয়া উঠিয়াছে। চিঠিখানা না খুলিয়া বৌদির কথাই ভাবিতে লাগিলাম। জানি উহা খুলিলেই একরাশি আবির্ভাব। ঐরূপ কিছু বাহির হইয়া আমাকাপড় রঞ্জিত করিবে।

এই বৌদিটি আমার নিজের বৌদি নহেন, জাঠতুতো কিন্তু নিজের বৌদি না থাকায় ইহাকেই একমাত্র বৌদি বলিয়া জানিতাম এবং ইনিও শিশুকাল হইতে আমাকে পরম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

সেবার তাঁর মায়ের অস্থ, দাদা বাড়ীতে ছিলেন না। বৌদি বাপের বাড়ী যাইবার জন্ত কান্না জুড়িয়া দিলেন। কাজকর্ম কামাই করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলাম তাঁহার বাপের বাড়ী, দেখিলাম তাঁর মা ভালই আছেন। ফিরিতে চাহিলাম সেই দিনই কিন্তু বৌদির ছোট বোন মীনাক্ষী আসিয়া বাধা দিল। ছই চোক পাকাইয়া বলিল, অসম্ভব! যাওয়া হতে পারে না আজ। কি দুরন্ত মেয়ে এই মীনা! এখন কেমন আছে কে জানে! আমি যখন তাহাকে দেখি, তখন তার বয়স চোদ্দর বেশী নয়। কি একটা অস্থখে মাথার চুল উঠিয়া গিয়া নবকেশদাম উদ্গত হইতেছিল। বাকড়া বাকড়া একমাথা চুলের মধ্য হইতে তাহার শ্রামল মুখখানি ও দীর্ঘায়ত চক্ষুটি যেন পত্রান্তরালে পুষ্পের মতো মনে হইত। কত যে দুরন্তপনা ঐ ছই দিনেই তাহার সঙ্গে

করিয়ছিলাম তাহা। আজ স্মরণ করিতেও আনন্দ বোধ হইতেছে।

বৌদির বাপের বাড়ীর স্মৃতি যে বাঁধা ঘাটওয়ালা প্রকাণ্ড পুকুরটা তাহার ওপাশের পাড়ে একটা ভাস্কর মন্দির। শিবমন্দির নহে, সঙ্গলচণ্ডীর মন্দির। মন্দির ভাস্কর্য্য গিয়াছে কিন্তু এখনো দেবীমূর্তি নাকি সেখানে বিরাজমান। দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় কাহাকেও কিছু না বলিয়া ছুপুর বেলা মন্দিরের দিকে গেলাম। লাল এবং সাদা কববী ফুলের জঙ্গলের মধ্য দিয়া মন্দির পর্যন্ত যাওয়া বড়ই কষ্টকর। বহুদিন বোধহয় এমিকে কেহ আসে নাই।

চারিদিকে রোদ রাঁ—রাঁ করিতেছিল। একেলা কেমন ভয়-ভয়ও করিতে লাগিল। ভাবিলাম, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া আসিলে ভাল করিতাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল, আচ্ছা ভীতু তো আমি! দিনের বেলা, ভয় কি! ঐ তো বৌদিদের বাড়ী পুকুরের ওপারে দেখা যাইতেছে। সাহসে ভর করিয়া কববী গাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিলাম। প্রায় মন্দিরের কাছে পৌঁছিয়াছি, হঠাৎ টুং টুং—টুং টুং শব্দ হইল। কেহ যেন কোন ধাতুপাত্র বাজাইতেছে। ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া পলাইয়া যাইব কি না ভাবিতেছি, কে কোথায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, আর কোনদিকে না-চাহিয়া ছুটিতেছিলাম, কিন্তু সম্মুখে মীনা। সে গাছের আড়াল হইতে একটা পিতলের থালি কলসী লইয়া উঠিতেছে। আমার ভয় দেখিয়া তাহার হাসি আর কিছুতেই থামে না। লজ্জায় আমি লাল হইয়া উঠিলাম। বলিলাম—তুমি আমায় ভয় দেখালে কেন?

মীনা বলিল—মাগো, এতো ভীতু! ছিঃ!

মুখ লুকাইয়া চলিয়া আসিতেছি,—মীনা হাতখানা ধরিয়া বলিল—মন্দির দেখবে না?

—না—

—হা—দেখবে, এস, বলিয়া সে আমাকে মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

মন্দির ভাস্কর্য্য গিয়াছে, তথাপি তাহার প্রতিটি স্তম্ভে, প্রতিটি দরজায় এবং থিলানে যে শিল্পকার্য্য দেখিলাম তাহা

বর্ণনাতীত। কতদিনের পূর্ব্বাণে এই মন্দির, কে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন, জানি না, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হইয়া আসিল। মীনা তাহার কলসীটা নামাইয়া কববী গাছের পাতায় প্রজাপতির ডিম খুঁজিতে লাগিয়া গেল। প্রজাপতির ডিম,—সুন্দর স্বর্ণোজ্জ্বল তাহার বর্ণচ্ছটা—কয়েকটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাকে বলিল,—যাবে, না বসে বসে তপস্তু করবে।

তপস্তু করিবার কোনরূপ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মনে হইতেছিল আর একটু বসিয়া যাই। মন্দিরটি ঘিরিয়া যে কববী বন রহিয়াছে তাহা যেন আমাকে কেমন অভিভূত করিয়া দিল। লাল লাল ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের অলিন্দ হইতে দেখা যায়, পুকুরের পাড় হইতে সেই রক্তাভা ক্রমনিয় হইয়া নীচে পুকুরের জলের কাছে আসিয়া থামিয়াছে। শান্ত নিস্তব্ধ ছপুণে বেশ লাগিতেছিল।

মীনা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল—বেশীক্ষণ এখানে থাকতে নাই—চলো।

—কেন? প্রশ্ন করিলাম।

—চলো—ওখানে গিয়ে বলবো, বলিয়া মীনা আগাইয়া চলিল।

এ পাড়ে আসিয়া একটা প্রকাণ্ড অশ্বখ গাছের তলায় দুজনে বসিলাম। তাঁর পর মীনা আরম্ভ করিল এই পুকুরের সহিত বিজড়িত এক করুণ কাহিনী বলিতে।

কবে কোন এক বিবাহের শোভাযাত্রা এই পথ দিয়া যাইতেছিল। নববধূ জলপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ায় এই পুকুরের ঘাটে পাকী নামাইয়া তাহাকে জল পান করিতে বলা হয়। দারুণ গ্রীষ্মে বধূটির সর্কাদ জ্বালা করিতেছিল—জুড়াইবার জন্য সে একটু একটু করিয়া খানিকটা বেশী জলে চলিয়া যায়। ঘাটের উপর-রাখা পাকী হইতে তাহার স্বামীর অকস্মাৎ সেই দিকে নজর পড়ায় সে চীৎকার করিয়া উঠিল—‘উঠে এস শীঘ্র, এ পুকুরটা ভাল নয় শুনেছি।’ কিন্তু বধূটি আর উঠিতে পারিল না, কে যেন তাহার পা আটকাইয়া দিয়াছে। সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে লোকজন তৎক্ষণাৎ তাহাকে টানিয়া তুলিল কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,

বধূটির দুই পায়ে স্বদৃঢ় শৃঙ্খল পরান রহিয়াছে। বধূটিকে টানিয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে শিকলও উঠিয়া আসিতে লাগিল। বধূটিকে যতদূর লইয়া যাওয়া হইল শিকলও ততদূর বাড়িয়া চলিল, যেন সেই স্বদীর্ঘ শৃঙ্খলের আর শেষ নাই। কিছুতেই সেই নিদারুণ শৃঙ্খল হইতে অব্যাহতি নাই জানিয়াও চতুর্দিকের সমস্ত কর্মকারদিগকে আহ্বান করা হইল শিকলটা ছেঁনি দিয়া কাটিয়া দিবার জন্ত। ঐশান্ত পরিশ্রম চলিল কিন্তু শিকলের একটুকু অংশও কাটিল না।

ওদিকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের দিক হইতে বান্ বান্ বানাৎ শব্দে শিকলে টান পড়িল; কাঁদিয়া কাঁদিয়া বধূটি তখন থামিয়া গিয়াছে, অসহায় করুণ ছুটি চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে তাহার স্বামীর দিকে। শিকলের টানে বধূটি একপা একপা করিয়া গভীর জলে চলিয়া গেল এবং শেষবারের মত তাহার স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুত্রের নীল জলে অদৃশ্য হইল।

বধূটি নাকি আজও এই জলতলে বন্দি নী। গভীর রাত্রি এখনো নাকি তাহার পায়ে শিকলের বান্ বানা শুনিতে পাওয়া যায়।

মীনার গল্পের হয়তো কিছুই সত্য নয় তথাপি সেদিন সেই নিস্তর পুত্রপাড়ে এই কাহিনী শুনিয়া আমার যুক্তি-বাদী মনও বধূটির ভ্রূত দুঃখে বেদনায় আর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মীনার গল্প বলার শক্তি দেখিয়া হয়ত একবার ভাবিয়াছিলাম, আমি আরব্য উপন্যাসের রাজা হারুণ-অল-রসিদ আর মীনা সাহাজাদি।

মীনাকে সেদিন আমার কল্পলোকের রাণী ভাবিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, আজ তাহা ভাবিতেও আনন্দ বোধ হইতেছে।

পরদিন বাড়ী চলিয়া আসিলাম। বৌদি ইহার পর মীনাকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। সে স্থান যিনি অধিকার করিয়াছেন তাহার প্রতাপে আজ আমার রোগশয্যার কাছে মাছিটিরও প্রবেশাধিকার নাই।

হুদিন পূর্বে একবার তাঁকে বলিয়াছিলাম,—তোমার কষ্ট হচ্ছে, একটা নাস রাখবো?

বন্ধার দিয়া তিনি বলিলেন—তাহলে খুব মজা হয়; না? বেশ গল্প করবার লোক পাও...!

আসলে তিনি আমায় বিশ্বাস করেন না।

ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্তিতে কখন চোখ বুঝিয়া আসিয়াছিল। তন্ময় যেন মীনার মুখ চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। অকস্মাৎ জী প্রবেশ করিলেন। বৌদির চিঠিটা বুকের উপরেই পড়িয়া ছিল। ছোমারিয়া তুলিয়া লইয়া বিশ্বয়ের স্বরে কহিলেন,

—মেয়েমানুষের হাতের লেখা, কার চিঠি গো—কে লিখেছে!

•—জানিনা, হয়তো বৌদি লিখেছেন।—
হাঁ, উনি জানেন না—তাকা! চিঠি বুকে নিয়ে ঘুমানো হচ্ছে, আর কার চিঠি জানেন না!—বলিয়া গভীরমুখে চিঠিখানা তিনিই খুলিয়া ফেলিলেন। বাহির হইল, একটাকায়-আটখানা-সাইজের একটি ফটো; ফটোটি জীলোকের। আর কিছু খামের মধ্যে আছে কিনা দেখিবার প্রয়োজন হইল না। রাগে গস্গস্ করিতে করিতে তিনি খামখানা ও ফটো আমার মুখের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। ইহার পর অদৃষ্টে যাহা আছে, ভাবিয়া আমার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

খামটা কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম, একটা চিঠি রহিয়াছে, বৌদিই লিখিয়াছেন,

“ভাই ঠাকুরপো,

বহুদিন পরে তোমার চিঠি লিখছি। গত ২০ শে মীনা মারা গেছে। তার একটা ফটো এই সঙ্গে পাঠালাম—এনলাজ করিয়ে দিও—ওর আত্মের পূর্বেই যেন পাই...”

বৌদি তো রসিকতা করিতে চাহেন নাই কিন্তু আমার ভাগ্যবিড়ম্বনাটা যাইবে কোথায়!

সাহিত্য সেবার সার্থকতা

শ্রীমতী অনূর্ণা গোস্বামী

সাহিত্য সেবার সার্থকতা কোথায়—সাহিত্যের এই গুরুতর প্রশ্নটির উত্তর বড়ই সূক্ষ্ম ও জটিল। সাহিত্য অনাদিকালের, সাহিত্য সমগ্র জগতের, বিশ্ব মানবের। যুগে যুগে এর মহনীয় সৃষ্টি চির অমরত্ব লাভ করে এসেছে, কিন্তু এর সমাধান আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অতএব আমার এ প্রবন্ধটিও এ বিষয় সাফল্য লাভ না করলেও—আমার মনে হয় সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার অর্থ-রহস্যের বিশ্লেষণ সাহিত্য সেবার সাফল্যের ইঙ্গিতকে আংশিক সম্পূর্ণ করে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“বহিঃ প্রকৃতি ও মানবচরিত্র মানবমনে অল্পক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষায় রচিত সেই গান, সেই চিত্রই সাহিত্য”। অর্থাৎ মানব মনে যে ভাব, যে সৌন্দর্য স্বতই উদ্ভূত হয়ে ওঠে—সেই ভাব ও সৌন্দর্যের উৎস হতেই সাহিত্যের সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রেরণা ও তার বিকাশ; এবং সেই সৃষ্টি দ্বারা অপরকে প্রভাবান্বিত করবার আকুলতা হতেই সাহিত্যের প্রচার। যে প্রচারই জাতির জাতীয় জীবনে সম্পদতুল্য পুরম সৃষ্টি হবে, জাতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করবে; আনন্দ দেবে, সহায়তাকারী স্বরূপ জাতির পথ প্রদর্শক হবে, সেই সাহিত্যই তার সৃষ্টিকার্যে সার্থক হয়ে উঠবে। তবে সাহিত্য কি পন্থায় একটি রূপ ধারণ করলে সাহিত্যমোদীরা প্রকৃত ভূপ্ত হবেন, সে কথা বলা কঠিন। কারণ মানব-মনের রুচির অন্ত নেই—“ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ”। কেউ বলেন একটা উচ্চ আদর্শকে সম্মুখে রেখে শিক্ষামূলক সাহিত্য সৃষ্টির ভেতর দিয়ে নীতি ও জ্ঞান প্রচারে জাতিকে উন্নত করাই সাহিত্য-সেবার সার্থকতা। কেউ বলেন বাস্তব সাহিত্য দ্বারা রস ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি সাহিত্যকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। কিন্তু আমার মনে হয় সাহিত্য সৃষ্টির মূলে—সাহিত্যে বাস্তবতা—ও আদর্শবাদ দুএর অপূর্ব সামঞ্জস্য,—অঙ্গাদী যোগই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করবে। সাহিত্য শব্দের বুৎপত্তি হতে সম্যক প্রতীয়মান হয়, সাহিত্যের সঙ্গে আদর্শবাদের নিবিড় একটি

যোগ রয়েছে—সখ্যতা আছে। অর্থাৎ স—হিত=সাহিত্য। সাহিত্যের সহিত বর্তমান রয়েছে, তাকেই বলে সাহিত্য। সাহিত্যের এই বুৎপত্তি হতেই সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়, নিখিঃ এবং বিশ্ব মানবের হিতসাধন করাই সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এবং আদর্শবাদী সাহিত্য ব্যতীত, সাহিত্য দ্বারা মানবের হিত সাধন কোন প্রকারেই যে সম্ভব নয় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে আদর্শবাদী সাহিত্যই পারবে জাতিকে সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধ করতে, একটি স্তরের ও স্তর জাতি গঠন করতে, বিশ্ব শ্রমের সৃষ্টি মাধুর্যের গোপন দ্বারটা উন্মুক্ত করতে, অশ্রুজল মুছিয়ে দিতে, হাসির বর্ণা ফুটিয়ে দিতে, এবং এই আদর্শবাদী সাহিত্যই মনের কাননের অজ্ঞতার গন্ধবিহীন ফুলগুলিকে নিমূল করে গন্ধভরা জ্ঞান-ফুলে সে বাগানকে সৌন্দর্য্যে শ্রীময় করে তুলতে পারবে। তাই বুঝি সাহিত্যের মহনীয় আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ফরাসী দার্শনিক সাহিত্যিক মন্টেস্কি বলেছেন “The love of study is in us almost the only eternal passion” বাস্তবিক আদর্শ সাহিত্য বড়ই সূক্ষ্ম। তাই বলে সাহিত্যবেদীর উচ্চতম আসনে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে বেয়ে সাহিত্য যেন নিছক শিক্ষাগ্রন্থ বা নীতি প্রচার না হয় সে দিকে সচকিত দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ আদর্শের পরিপূর্ণতা দ্বারা প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। বার্তাভাষার The Statue এর ভাষায় বলা চলে—“Heaven is the most angelically dull place in all creation.” অতএব যে সাহিত্যের আদর্শ,—রস ও সৌন্দর্যের অমৃতধারা আনন্দ সাগরের রূপ ধরে মিশবে এসে সামঞ্জস্য, বাস্তবতার প্রতীক হবে, সেই সাহিত্যই সাফল্যের জয়মাল্যে দোহুল্যমান হয়ে উঠবে। যেমন সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির মুখ্য আদর্শ শিক্ষাদান হলেও, তিনি, সাহিত্যের মাধুরী যে সৌন্দর্য ও শিল্পকলা,—সেই সৌন্দর্য ও শিল্পকলাকে স্মরণ করেননি। তিনি সূক্ষ্ম

অল্পভূতি দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন নিছক শুষ্ক আদর্শবাদী সাহিত্যের মানবমনে তৃপ্তি সাধন করা সম্ভব নয়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ—তঁার সাহিত্যে আয়েষা জগৎসিংহ ইন্দিরা, রোহিনী, ভ্রমর, শৈবলিনী, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির আলেখ্যগুলি কি অভিনব পন্থার সম্মিলনে বাস্তব ও আদর্শের জীবন্ত প্রতিমা হয়ে আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। ইয়োরোপিয় সাহিত্যে ডিকেন্স, জর্জইলিয়ট, ডিক্টর হিউগের সাহিত্যও এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই প্রমাণ হতেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় বাস্তব ও আদর্শের অপূর্ব সম্মিশ্রণেই সাহিত্য প্রকৃত সার্থক। সাহিত্যে নিছক আদর্শবাদ হয় জ্ঞান ও নীতি প্রচার—বাস্তবতা হয় কুস্ত্রী ও অশ্লীলতার মূর্তিমান এক নয়া রূপ। পূর্বেই বলেছি, সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই হোল সাহিত্যের প্রকৃত মাধ্যম। সত্যম শিবম সুন্দরম—এবং A thing of beauty joy for ever. এই সৌন্দর্য্য ও মহৎ রসের সৃষ্টি দ্বারা মানব মন আনন্দে আপ্ত করাই বাস্তব সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। জাতির পথ চলার অন্তরঙ্গ স্বপ্নদের মতই বাস্তব সাহিত্য পারবে আমাদের দুঃখ দুর্দশার আলেখ্য তার সৃষ্টির মূলে মূর্ত করে তুলতে, সুসংস্কৃত ও সুন্দর সমাজের পরিকল্পনা হয়ে জাতির বেদনা-অশ্রুজল মুছিয়ে দিতে, এবং এই বাস্তব সাহিত্যই তার লেখনীর তীব্র আঘাতে অত্যাশ্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করবে। যেমন টেকচাঁদ করেছিলেন একদিন তাঁর আলালের ঘরের দুলালে। সাহিত্যের এক অতুল সম্পদ শরৎ সাহিত্য এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে। এ বিষয় বর্তমান সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান আকাশস্পর্শী। সাহিত্যের ভাব যদি গভীরতা পূর্ণ—উচ্চ স্তরের ও সুক্ষ্ম চিন্তানিবিড় না হয়, তাহলে সে সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করতে পারে না—নিতান্তই হালকা দরের সে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। অতএব সাহিত্যের এই তোরণকে গঠননৈপুণ্যে অভিনব করতে হবে এবং লীলাময় ভাষা তার সুন্দর রঙের তুলিকায় সে সাহিত্যসৌধকে প্রাণবন্ত করে তুলবে, সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু ভাষার আড়ম্বরে ভাব যেন চাপা না পড়ে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে,— অর্থাৎ ভাষা হবে অনাড়ম্বর, স্বচ্ছ—বর্ণার মত নেচে নেচে বেয়ে যাবে, ছন্দে সুসমায় হবে। যে সাহিত্যে ভাষা

নিতান্ত শুষ্ক, নীরস এবং কঠিন হয়—সে সাহিত্য মানবমনে সাড়া তুলতে পারে না।

সাহিত্য অনাদি অনন্ত কালের, সাহিত্য বিশ্বজগতের, বিশ্বমানবের। যুগের ভাঙ্গন ধরে, মানুষ মরে কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য চির অমরতা লাভ করে। জাতির জাতীয় জীবনে তার প্রভাব বিস্তারে জাতিকে তার উত্থান পতনের মূলে সহযোগিতা করে। সাহিত্যের এই প্রভাব একাধারে যেমন জাতির শত্রু তেমনি সে পরম মিত্র। অতএব সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি হতে সাহিত্যের যে অর্থ উপলব্ধি হয়, সেই অর্থকে সাহিত্যসেবার মূল করে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় সেই সাহিত্য জাতির পরম বন্ধু হবে তার পথ চলায়, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এবং সেই বন্ধুরূপী সাহিত্যের প্রভাবই গভীর অল্পভূতি দ্বারা অল্পভব করতে শিখিয়ে দেবে জাতির বেদনার অশ্রুজল, প্রেরণা দেবে, অত্যাশ্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করবে—সহায়তাকারী স্বরূপ জাতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তুলবে। ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাবই জাতিকে পথ চলবার একটা ধারা নির্ণয় করে দিয়েছে। সেই সাহিত্যের ধর্ম ও আদর্শের একটা নরবচ্ছিন্ন সুর আজও জাতির অস্থঃহলে ওতপ্রোতে জড়িত আছে। মহামানব শ্রীকৃষ্ণের আদর্শই হিন্দু ধর্মের দীক্ষা স্বরূপ। এই প্রমাণ হতেই সম্যক উপলব্ধি হয় সাহিত্যের এই প্রভাব মানবের কি এক বিরাট সম্পদ। অতএব যে সাহিত্য পারবে দেশপ্রীতিতে জাতিকে উদ্বোধিত করে তুলতে, সভ্যতায় সমৃদ্ধ করতে, সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে শিশু গঠন করতে সেই সাহিত্যের সৃষ্টি এবং প্রভাবই প্রকৃত সার্থক হবে। তবে সাহিত্যের এ প্রভাব বিস্তারের মূলে যদি সাহিত্যে সংঘম, দায়িত্ব ও শিক্ষার সুক্ষ্ম সম্মিশ্রণ না হয় তাহলে সাহিত্যের সে প্রভাব একান্তই ব্যর্থ হবে। সাহিত্যের এই শিক্ষা—অর্থাৎ সাহিত্য দ্বারা শিক্ষা প্রচার—এই পন্থাটা সাহিত্যমোদীদের যে তৃপ্তি সাধন করতে পারবে না, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যারা অশিক্ষিত, নিরক্ষর তাদের ভিতর লোকশিক্ষা দ্বারা, জ্ঞান ও আনন্দ বিস্তার সাহিত্য প্রীতি জাগ্রত করাই সাহিত্যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে। কবিগান, পাঁচালী, কীর্তন, বাউল;

নাট্যাভিনয় প্রভৃতি লোকশিক্ষা এ কার্যে সহায়তা করতে পারবে এবং সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সাফল্যে জয়গুণিত করে তুলবে। তবে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শিক্ষা প্রচার যে সাহিত্যরস-পিয়াসীদের আনন্দে আপ্ত করতে পারবে না এমন কথাও বলা চলে না। শিক্ষাদান বন্ধিম-সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অসাধারণ প্রতিভা—সে সাহিত্যকে অভিনব করে তুলেছে। এই প্রমাণ হতেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়, সাহিত্য সৃষ্টির দায়িত্ব কি নিবিড় গুরুতর। যেন রাজার রাজ্য পরিচালনার মতই। যে সাহিত্য পারবে তার স্বল্প প্রকাশ ভঙ্গিতে সাহিত্য গঠন কার্যে সহায়তা করতে, সেই সাহিত্যই তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম ও সার্থক হবে। সাহিত্যের শিক্ষা যেমন সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে, সেইরূপ সাহিত্যিকের সংস্কৃত ব্যক্তিত্ব প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। যে সাহিত্যে সংস্কৃতির অভাব—সে সৃষ্টিতে কুৎসিৎ ও বিভৎস আলেখ্যই মূর্ত হয়ে ওঠে, নগ্নতার প্রতিমূর্তি হয়। সংস্কৃত স্বয়মাই সাহিত্যের মাধুরী। সংস্কৃত হীন সাহিত্যের কুৎসিৎ রস পরিবেশনে মানব মন ক্ষণিক উত্তেজনায় প্রকুল্ল করে তুললেও—সে সাহিত্য সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠার আসন দাবী করতে পারে না, সাহিত্যের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় না। যে দেশ যত উন্নতি লাভ করেছে তার মূলে আছে সংস্কৃত-সুন্দর সাহিত্য এবং সভ্যতাই সে সাহিত্যের মাপকাঠি। সভ্যজাতি মাত্রেরই সাহিত্য আছে, সাহিত্যের কল্যাণেই সভ্যতা সমৃদ্ধিলাভ করতে পেরেছে। অতএব সাহিত্য যদি সংস্কৃত হই, অসুন্দর আলেখ্যের প্রতীক হয়, নিকৃষ্টতম তার সৃষ্টি হয় তাহলে সভ্যতা হবে পঙ্গু, জাতি হবে অবনত, হীন। এই প্রমাণ হতেই সত্যিক প্রতীয়মান হয় সাহিত্যের প্রভাব কি দীপ্তিময়।

যেমন করে নিশীথের কালো আবরণখানি উন্মোচিত করে পূর্ব আকাশের রবির আলো বিশ্বজগৎকে আলোয় আলোয় ঝলমলায়মান করে তোলে, সেইরূপ সাহিত্যের তীব্রতম প্রভাবও জাতীয় জীবনের দুঃখবেদনা অজ্ঞতার অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে জাতিকে জ্ঞান ও আনন্দের আলোকে আলোকময় করে তুলবে। মানবের হিতসাধন করবে। এবং এই প্রভাবিত সাহিত্যই পারবে—জাতির ভবিষ্যৎ

আশা আকাঙ্ক্ষাকে একটি মহৎ আদর্শের প্রতীক স্বরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে গঠিত করে তুলতে। শিশু শৈশব হতে গল্পপিয়াসী বড়ই, এবং তারা ভয়ানক কল্পনা প্রবণ হয়। সাহিত্যের স্নিগ্ধ প্রভাবই পারবে তাদের কল্পনা প্রবণ কঁচা মনের পটে হাল্কা ধরণের গল্প, কবিতা, ছড়া, শিক্ষা বীরত্ব এবং আড়ভেকার মূলক গল্প, মহৎলোকের জীবন কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা রেখাপাত করে সুনিয়ন্ত্রণে গঠিত করে তুলতে। পরবর্তী জীবনে সেই সাহিত্যের বিকাশই তাদের প্রকৃত মানুষ করবে, বিশ্ব মানবকে—বিশ্বজগৎকে ভালোবাসতে শেখাবে, জাতীয়তা প্রীতি দেশোন্মবোধে সচকিত করে তুলবে, জাগ্রত বীরত্বের প্রতীক করবে, এবং তার জীবনতন্ত্রে একটি নিরবচ্ছিন্ন আদর্শের স্রু নিরন্তর বাক্ত হবে। এই জাতীয়তা প্রীতি ও দেশোন্মবোধ যে জাতির প্রাণে সাড়া তুলেছে—সেই জাতি উপলব্ধি করেছে—হীনতা ও দীনতার মূর্তিমান রূপ, সেইক্ষেণে সে চেয়েছে এই বন্ধন হতে মুক্তি পেতে—এবং দীপ্তিমান সাহিত্যের প্রভাবই পেরেছে জাতিকে এ কার্যে সহায়তা করতে। অতএব জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করাই সং-সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হবে। যেমন করেছিলেন একদিন যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ। স্বাধীনতা আর ধর্মের স্রু বাক্ত হোল হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র, ও গোবিন্দলালের কাব্যতন্ত্রে; বন্ধিম এলেন পরিপূর্ণ আদর্শের সম্ভার হাতে নিয়ে, সমগ্র ভারতবাসীকে বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন,—বীরত্বের কাহিনী শুনিতে দিলেন। আজ বিশ্বকবির সাহিত্যচ্ছটায়, সাহিত্য-আকাশ প্রভাবিত।

তারপর এলেন নারীর দরদী বন্ধু শরৎচন্দ্র? নারীর বেদনা ও অশ্রুজলের ভালা সাজিয়ে নিয়ে। এমন করে পারবে যে সাহিত্য মানব মনে রেখাপাত করতে সাহিত্যের সেই সৃষ্টিকে বলতে হবে, সার্থক।

প্রত্যেক জাতির জাতিগত বিভিন্নতার মূলে তার সাহিত্যে একটি নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। ধর্মের সনে অঙ্গঙ্গী যোগই ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। অত্যাশ্রয় দেশ ধর্মতন্ত্রে সমৃদ্ধি লাভ করলেও, ধর্মই ভারতীয় সভ্যতারও কৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ বলেই ভারতীয় সাহিত্য এ বিষয় বিশেষ-

ভাবে উন্নত তার সাহিত্যের দীপ্তিমানচ্ছটায়, তার সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যে। সাহিত্যে ভারতীয় এই ধর্মতত্ত্বকে দর্শন ও সাধন এই দুইটি রূপভেদে বিভক্ত করা হয়েছে এই সাধনরূপকে কেন্দ্র করে ভজন সঙ্গীত, প্রার্থনী সঙ্গীত, কীর্তন, পাঁচালী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যে লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, সেই লোকসাহিত্যে দার্শনিক তত্ত্বের নিবিড় যোগ এমন মধুর ভাবে জড়িত যে তার স্বচ্ছ ও সাবলীল প্রচার সহজেই মানবমনে সাড়া তুলতে পারে, এবং এই মিষ্ট যোগটুকু সাহিত্যকে একান্ত সার্থক করে তোলে। এবং এই দার্শনিক ভিত্তির পরে ধর্মের প্রতিষ্ঠা বলে ভারতের ধর্ম চিরন্তন যুগ ধরে অমরতা লাভ করেছে, মানবকে তৃপ্তি ও আনন্দ দান করেছে এবং তার প্রভাব সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেছে। প্রাচীন সাহিত্যেই এর প্রমাণ প্রত্যক্ষ। ভারতবর্ষ অবতারের দেশ—যুগে যুগে মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তাদের লীলাসঙ্গীতের পরই এক একটি সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। যেমন দেবী মহামায়ার লীলাময় প্রভাবেই মহাকাব্য চণ্ডী এবং রামপ্রসাদের অতুলনীয় দানে শাক্ত সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে; বৌদ্ধ ধর্মের পর বৌদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ক্রীতচৈতন্যের প্রেম ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সাহিত্যের এক নূতন অধ্যায় স্বরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্যক উপলব্ধি হয় সাহিত্য ও ধর্মে কোনও পার্থক্য নাই। তাইলেই বোঝা যাচ্ছে, সাহিত্যে ধর্মের আসন মহনীয়। যে সাহিত্যে দর্শনের ভিত্তির পরে হবে ধর্মের প্রতিষ্ঠা, সেই সাহিত্যের প্রভাবেই মানবমনে রেখাপাত করতে পারবে, সাহিত্য প্রকৃত সার্থক হবে।

প্রাচীন সাহিত্যে ছিল নিবিড়তম ধর্মের প্রভাব— আধুনিক সাহিত্যে সে ধর্মের বাতি নিবে গেছে আধুনিক যুগের নূতন আলোর প্রভাবে; কারণ সাহিত্য জাতীয় জীবনের একখানি মুকুরের মতই, তার পরিষ্কার কাচে চলতি যুগের পারিপার্শ্বিকের ছবি পরিষ্কৃত হয়ে উঠবে, এবং সেই সাহিত্যের মুকুরখানি মানবমনকে আনন্দাপ্লুত এবং হৃৎথে অভিভূত করবে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই দর্শনের নিবিড়তম যোগ রয়েছে। বঙ্কিম ও রবীন্দ্র সাহিত্যে এবং আধুনিক সাহিত্যে বৈদেশিক সাহিত্যের প্রভাবের পার্থক্য এইখানেই। কতক গুলি বঙ্কিম-রবীন্দ্র সাহিত্যে ভাবের দিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই রক্ষিমান হলেও, বাঙলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যকে খর্ব করা হয়নি, সেখানে নারীর প্রকৃত আদর্শ—নারীর মহনীয় রূপের যোগ্য আসন তারা অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক সাহিত্যে প্রভাবান্বিত আধুনিক সাহিত্যে নারী যেমন ভোগের বস্তু, এবং বিলাসের বস্তু এরই আলেখ্য সম্পূর্ণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে এ কথাও সত্য, চলতি যুগের আবহাওয়াতেই সাহিত্যের সৃষ্টি, বোধ করি সেইজন্ম বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য প্রভাব প্রভাবান্বিত আধুনিক সমাজের চিত্রই আধুনিক সাহিত্যে পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার মতে সাহিত্য যখন মানবের সম্পদ তুল্য—অন্তরঙ্গ হৃদয়, তখন অস্ত্রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান করা, সমাজের ক্রটিগুলি তার বুকে প্রতিফলিত করাই, সাহিত্যে প্রধান উদ্দেশ্য, এবং যে সাহিত্য পারবে আপন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রভাব দ্বারা সমাজকে স্তনিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করতে সেই আধুনিক সাহিত্য সার্থকতার জয়মাল্যে বিভূষিত হয়ে উঠতে পারবে।



শ্রীবটুকপ্রসাদ গাঙ্গুলীর ভাবের অভিব্যক্তি—বিভিন্ন চিন্তাধারার মুখভঙ্গিমা

১। ট্যাক খালি ২। এই কি ভালোবাসা? ৩। বাবার মরণ ভাল ৪। অভাবের তাড়নায় মাতাল ৫। বিত্তই বন্ধু

বিরহের ভূমিকা

শ্রীসমর গুহ

ঘুম ভাঙিতেই সতীছায়া তাঁকাইয়া দেখিল তখনও ভোর হয় নাই। শীতকাল, লেপটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া পুনরায় সে সুমাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু ঘুম আসিল না। আসিল চিন্তা; আজ তাহাকে দেখিতে আসিবে। অন্ধকারে নির্জন ঘরে একা খাটে শুইয়া অর্দ্ধদ্বাগ্রত অবস্থায় সতীছায়ার মনে পড়িল, আজ তাহাকে দেখিতে আসিবে। ইহার পূর্বে তাহাকে এ-পরীক্ষা কখনও দিতে হয় নাই; ম্যাটিক পাশ করার পর হইতেই মা তাহাকে পাকড়া করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং বাড়ীর কর্তৃপক্ষদের সেই প্রচেষ্টার ফলে আজ একদল আসিবেন যাহারা তাহাদের সাধ্যানুসারে পরীক্ষা করিয়া বুঝিবেন সতীছায়া তাহাদের সংসারে প্রবেশের উপযুক্ত কিনা। সতীছায়ার অনভিজ্ঞ মনে নানা ধরণের চিন্তা ক্রমেই জট পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। কি জানি, কেমন-বা তাহাদের কচি। হয়ত-বা খোপাটা খুলিয়া চুলের মাপ লইবে। আচ্ছা চুল প্রথম হইতে খোলা রাখিলেই ত' হয়? হয়ত-বা কয়েকবার ইটাইয়া গমনের ভঙ্গীমাটা নিরীক্ষণ করিবে। গান নিশ্চয়ই গাহিতে বলিবে? আচ্ছা, কোন ধরণের গানটা গাওয়া যায়? রাবীন্দ্রিক না অতুল সেনের? একটু প্রাচীন যে'না হইলে হয়ত কীর্ত্তন পছন্দ করিবেন? —সে যা হোক সময় বুঝিয়া একটা করা যাইবে। কিন্তু গান গাহিবার সময় অঙ্গভঙ্গিগুলি আবার নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। কারণ তাহারা কেবল শ্রোতাই নন দর্শকও বটেন! কি বিক্রী ব্যাপারটা; কয়েক জোড়া চোখকে তাহার দেহগত, প্রকৃতিগত সমস্ত দোষ ফাঁকি দিতে হইবে!

ভাবিতে ভাবিতে সতীছায়া ক্রমেই অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। মনে হইল যেন অন্ধকারের মধ্যে কয়েক জোড়া চোখ তাহাকে দেখিতেছে—তাহার মনের

অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখিতেছে আর তাহার চিন্তার ধার দেখিয়া ব্যঙ্গহাস্য করিতেছে। সতীছায়া বেড় সুইচ টিপিয়া আলো জালিল।

এক কোনে একটা টেবিলের ওপর সুন্দর একটি ঘড়ি। তাহা দেখিয়া বুঝা যায় ভোর হইতে তখনও কিছু দেরী। শয্যার একধারে দুখানা বই ছিল—সময় কাটাইবার জন্ত। সতীছায়া একখানা তুলিয়া লইল। জ্যোতান বোয়ারের “মুহাব্বুফা”—বইখানা তাহার বড় প্রিয়, শেষ চিঠিখানা তাহার প্রিয় মুখস্ত হইয়া গিয়াছে। সেই শেষের দিকটাই খুলিয়া লইল কিন্তু চিন্তার হাত হইতে রক্ষা নাই। আচ্ছা; যদি তাহারা বই পড়িতে বলেন? ধ্যান, কলেজে পড়া মেয়ে সে, তাহাকে বই পড়িতে বলা—কিন্তু এমনও ত' হইতে পারে ইংরাজি উচ্চারণের নিভুলতা দেখিবার জন্ত? পাগল, শশুর বাড়ী গিয়া নিভুল ইংরাজি খুইয়া কি জল খাইবে?

সতীছায়া বই রাখিয়া দিল। আচ্ছা, যদি রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করে? এখানেই তাহার যত ভয়। চাটনি আগে রাখিতে হয় না ভাত আগে এই ধরণের কয়েকটা মাত্র প্রশ্নের উত্তর সে প্রস্তুত করিয়াছে। রান্নাঘরের চৌকাট মাড়ায় নাই সে কখনও। যাকে গতরাত্রে মিষ্টি তৈয়ারী করিতে দেখিয়াছে; মা হয়ত শিখাইয়া দিবেন, সেগুলি সতীছায়ার স্বহস্তে প্রস্তুত বলিতে। কিন্তু প্রস্তুত-প্রণালী জিজ্ঞাসা করিলেই গিয়াছে সে।

অসহ নির্জন লাগিতে লাগিল ঘরটা।

সতীছায়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। বিশ্বৃঙ্খল বেশ বিস্তৃত করিয়া লইল। তারপর পাশের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে মা নিদ্রা যাইতেছেন। সমস্ত দিন সংসারের বিবিধ অভিযোগ মিটাইয়া স্বগভীর তাহার নিদ্রা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লুইয়া প্রকাণ্ড ঢালা বিছানায় তাহাকে শুইতে হয়; ঘরে সমস্ত রাত অল্প

দীপ্তিতে একটি লণ্ঠন জ্বল কারণ ঘুম ভাঙ্গিয়া আলো না দেখিলে ছোট মেয়েটি বড় কাঁদে।

সতীছায়া কয়েক বছর যাবৎ একাকী ঘরেই শোয়। মার ঘরে আসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে মার বিছানার দিকে তাকাইল। কতকাল মার সহিত সে ঘুমায়ে না! ছোট ভাইটি মায়ের গায়ের সঙ্গে জড়াইয়া ঘুমাইতেছে। কি ভালই না লাগে এমনি করিয়া মায়ের গায়ে জড়াইয়া শুইতে। কী তৃপ্তিদায়ক মায়ের অঙ্গস্বাস! সতীছায়া এক পা ছুঁপা করিয়া আসিয়া ভাইবোনদের মধ্যেই স্থান করিয়া মায়ের পাশে শুইয়া পড়িল।

ছেলেমেয়ের প্রয়োজনে রাত্রে বহবার উঠিতে মা অভ্যস্তা; সতীছায়া পাশে আসিয়া শুইতেই সামান্য ঝুঁকুটু সজাগ হইয়া তন্দ্রাবিজড়িত স্বরে কহিলেন, ‘কে টুহু? কী হয়েছে?’

সতীছায়া সাড়া দিল, ‘না মা আমি।’ ‘কে মা সতী’, চোখ না মেলিয়াই মা বলিলেন, ‘ঘুম হচ্ছিল না বুঝি মা?’ ‘হ্যাঁ মা, তোমার কাছে শুতে ভারি ইচ্ছে কচ্ছিল, তুমিত’ টুহু, সাতুকে নিয়েই আছ, আমার খোজও নাও না,’ একটু অভিমানের স্বরে সতীছায়া কহিল।

ঘুমের ঘোরে মা এত কথা শুনিতে পাইলেন না, সেই অর্ধ জাগ্রত অবস্থাতেই পরম স্নেহে সতীছায়ার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মায়ের গা বেঁসিয়া থাকিতে থাকিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সতীছায়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিতে সতীছায়া দেখিল উন্মুক্ত জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া ঘর ভরিয়া গিয়াছে, ভাইবোনরা যে বাহার পড়া স্বর করিয়া দিয়াছে; তাহাদের গলা পাওয়া গেল। মা নিশ্চয়ই বহুক্ষণ শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন।

বিলম্বে উঠার জন্ত সতীছায়া লজ্জিত হইল। তাড়া-তাড়ি বিছানা ঝাড়িয়া রাখিল। তারপর নিজের ঘরে আসিয়া পড়িল—তাহার পরিত্যক্ত বিছানা মা কোন সকালে জাগিয়া পরিস্কার করিয়া গুছাইয়াছেন। এইজন্তই ত’ মার উপর রাগ হয়—কেন, তাহাকে ডাকিলেই ত’ হইত। তাহারা, ভাইবোনরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজ না করিলে মা স্বয়ং তাহা সমাধা করিবেন কাহাকেও কিছু

অহরোধ বা আদেশ না দিয়া। কোথায় মার কাজে সাহায্য করিবে না মা তাহার কাজ করিয়া দেন, মনে করিতেও সতীছায়ার ভারী লজ্জা হইল।

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পা ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া নিজে আসিয়া দেখিল—মা ময়দা মাখিতেছেন, আর ঝি সাহায্য করিতেছে।

ভাইবোনরা সকালে সাধারণতঃ দুধ পাউকটী খায়, তাই মাকে ময়দা মাখিতে দেখিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে করিতে সতীছায়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘আজ বুঝি টুহুদের সকালে লুচির ব্যবস্থা করছ মা?’

মা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ‘ওদের ত’ খাওয়া হয়ে গেছে মা।

অহুযোগের স্বরে সতীছায়া কহিল, ‘বাবা, কত বেলা পর্যন্ত আমি ঘুমিয়েছি, আমার ডাকনি কেন মা?’

মা উত্তর দিলেন, ‘কাল শেষ রাত্রে কখন যে আমার পাশটাতে এসে শুলি, মনেও নেই; ভোর বেলা উঠে দেখি আমার জড়িয়ে খুব ঘুমুচ্ছিল। মনটা যেন কেমন যেন নিল যে কাল রাত্রে ভোর ঘুম হয়নি ভাল।’

মায়ের পাশে বসিয়া দুই হাতে তাহাকে বেঁটন করিয়া সতীছায়া নিরন্তরে কহিল, ‘হ্যাঁ মা, কাল রাত্রে বড় ভয় কচ্ছিল।’ ভয়ের উৎসটা কোথায় মা সহজেই অহুমান করিয়া লইয়া মমতামাখা কণ্ঠে কহিলেন, ‘ভয় কি মা? মেয়েমানুষের জীবনে এমনি দিন সবারই আসে। আমি আশীর্বাদ করি মা—এর পরিণতি শুভ হোক।’

কথাটা শুনিয়া সতীছায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মায়ের সঙ্গে মিলাইয়া রহিল, তারপর সহসা আলোচনার গতি পরিবর্তন করিবার জন্ত কহিল, ‘তুমি ওঠ মা, ময়দাটা আমিই মেখে ফেলি।’

মা হাসিয়া স্নেহে বলিলেন, ‘তাহলেই হয়েছে পাগলী!’ একটু ব্যস্তভাবে পুনরায় কহিলেন, ‘তুই যা মা, ভাল করে চান করে আয়, তারপর আবার নটার সময় এসে পড়বেন। আমি এদিককার কাজ সেয়েই যাচ্ছি—আর স্বরমাকে ত’ আসতে বলে দিয়েছি তোকে একটু সাজিয়ে দেবার জন্ত...’

অগুদিন হইলে সতীছায়া বলিত, ‘মার যেমন কথা, আমি যেন কাপড় জামাটা নিজেই পরতে জানি না—

এই জন্তে সুরমাকে আসতে বলা।' আজ কিন্তু কোন কথা কহিল না; নিঃশব্দে মায়ের পাশটীতে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার উঠিবার লক্ষণ না দেখিয়া মা তাহার দিকে তাকাইয়া দেখেন সতীছায়ায় দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুর ধারা নামিয়াছে। তাড়াতাড়ি তিনি কল্যাণকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন; সতীছায়ায় মস্তকের উপর চিবুকটী রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, 'ছিঃ মা কাদে না... আজকের দিনে কাদতে নেই মা...'

মায়ের বক্ষে মুখ লুকাইয়া অশ্রুটস্বরে সতীছায়া উত্তর দিল, 'আমার যে বড্ড ভয় করছে মা... আমি বিয়ে করবো না... তুমি আমার বিয়ে দিও না মা...'

ক্রন্দনের আবেগে সতীছায়ায় সারাদেহ কাঁপিতে লাগিল। মা সেই চিরন্তন কথা কহিলেন, 'তাও কি হয় মা, লেখাপড়া শিখেছ তুমি... তুমিও বোঝ মা, মেয়ে-মালুমের জীবন সার্থক হয়ে ওঠে, বিবাহিতা হয়ে কল্যাণ-স্থিতিতে। যাও মা চান করতে যাও।'

মা স্বয়ং উঠিয়া তাহাকে স্নানাগারে লইয়া গেলেন।

স্নান সমাপন করিয়া সতীছায়া ঘরে গেল প্রসাধনপর্ক উৎসাপন করিতে। সুরমা তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। সতীছায়া বাঁক খুলিল, নানা রঙ্গের পোষাকী শাড়ী আঙ্গোপন করিয়াছিল। সতীছায়া একটীর পর একটী বাহির করিয়া খাটের উপর স্তপাকার করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে মা দুই হাত পূর্ণ করিয়া গহনা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। মাকে দেখিয়া সতীছায়া কহিল, 'এ কি মা, তোমার গহনা বা'র করলে কেন?'

'তুই পরবি বলে মা' টেবিলের উপর গহনা রাখিতে রাখিতে মা কহিলেন।

'কেন মা, এই ত আমার গয়না রয়েছে—তোমার গয়না

আবার কেন,' সতীছায়া প্রতিবাদ করিল।

মা তাহার চিবুকে হাত রাখিয়া কহিলেন, 'আমার গয়না কি তো'র নয় মা? আজকে ভাল গয়না পরতে হয় যে মা। তো'র হার চুড়ি খুলে রেখে এগুলো পর মা।'

মা চলিয়া গেলেন।

সতীছায়া আর কিছু বলিল না। আজকের এই বিশেষ দিনটিতে কী কী করিতে হয় তাহার কোন অভিজ্ঞতাই নাই তাই মার যত নির্দেশ নিরুত্তরে সে মানিয়া লইল।

পুনরায় কাপড় সাজাইতে সাজাইতে সতীছায়া সুরমার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় বাবার গলা পাইল।

'ওগো শুনচো—'

মা পাশের ঘরটা গুছাইতেছিলেন; সাড়া দিলেন, 'কী বলে যাও; আমার হাত জোড়া—'

পাশের ঘরে বাবার প্রবেশের শব্দ সতীছায়া কান পাতিয়া শুনিল। বাবা বলিতেছেন, 'এদিকে তাদের এক সর্বমাশ হয়ে গেছে...'

এ ঘরে সতীছায়া উৎকণ্ঠায় শুক হইয়া গেল।

বাবা বলিয়া যাইতেছেন তখনও... সন্ধ্যা বেলা পড়ে গিয়ে মিত্রের মশাইর ছোট ছেলেটির হাত ভেঙ্গে গেছে, আজ আর তারা আসতে পারবেন না,—লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন... সবই আমার অদৃষ্ট...'

মা অশ্রুটস্বরে কি বলিলেন এ ঘরে সতীছায়া শুনিতে পাইল না।

আজ আর তাহাকে পরীক্ষা দিতে হইবে না—সতীছায়া ভাবিতে চেষ্টা করিল, কী তৃপ্তি... এক কষ্টকর অধ্যায় হইতে কী সহজে মুক্তি! কিন্তু চেষ্টা করিল বটে, মনে তৃপ্তি আসিল না সতীছায়ায়।

টেবিলের উপর গহনাগুলি রহিয়াছে, খাটের উপর একরাশি শাড়ী শু পিক্ত, ঘরময় প্রসাধন সামগ্রী ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে অনহততপূর্ব্ব এক হতাশায় সতীছায়ায় মন বিকল হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে খাটে কাপড়ের রাশির উপর মুখ গুজিয়া সতীছায়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রান্নাঘরে মায়ের গায়ে লীন হইয়া সে ক্রন্দনের সহিত ইহার প্রভেদ অনেক।

অভিভাষণ

মাননীয়া ভগিনীগণ!

আজ এই মহিলা সম্মেলনে নেতৃত্ব করিবার জন্ত আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্ত আমি আপনাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি জানি এই সম্মান পাইবার আমি যোগ্য নছি, তথাপি আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষমতামুসারে আমার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব। বর্তমান যুগ প্রগতির যুগ, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন দেশাচার এবং চারিদিকে পরিবর্তনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার চেউ ভারতের কুলে আসিয়া ধাক্কা দিতেছে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা পাইতেছে এবং আমরা এক কঠিন এবং জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি যে সমস্যা হইতেছে “ভারতের নারীর আদর্শ কি প্রকার হইবে?” এ সম্বন্ধে ভারতের মনিষীগণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দ্বিমত পোষণ করেন। একদল বলেন যে ভারতের নারীর আদর্শ প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার অমূল্য হওয়া উচিত কেননা তাহাতে নারীর শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে এবং সেই মহান আদর্শকে পদদলিত করিয়া বর্তমান প্রাণহীন ও চাকচিক্যময় সভ্যতাকে গ্রহণ করা একেবারেই অস্বাভাবিক। বর্তমান সভ্যতা আড়ম্বরপূর্ণ ও হৃদয়হীন। প্রাচীন যুগের সভ্যতার আদর্শ নারীগণ বিদূষী লীলাবতী, সীতা, ক্ষণা ও মদালসা প্রভৃতি যেরূপ-ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন এবং যেভাবে বিচার্য্যধনা করিয়াছেন আমাদের নারীরও তাহাদিগকে আলোক-স্তম্ভ স্বরূপ সম্মুখে স্থাপন করিয়া আধার পথে অগ্রসর হওয়া উচিত, নচেৎ দেশ সমাজ সব নষ্ট ও ধ্বংস হইবে। আর এক দল বলেন যে, বর্তমান যুগ পরিবর্তনের যুগ। সারা বিশ্বে পরিবর্তনের ও জাগরণের জয়ডঙ্কা নির্দ্বিগত হইতেছে এবং তাহার স্পন্দন হৃদয়ে অনুভব করিয়া প্রত্যেকে আজ সেই দিকেই আত্মহারা হইয়া ছুটিতেছে। তারা-চায় জীর্ণসমাজ ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবে এবং সংকীর্ণতা ও

মাননীয়া মহারাণী বাহাদুর, নদীয়া

মলিনতা অপসারণ করিয়া এক নূতন আলোকে চারিদিক উজ্জ্বলিত করিবে। তাহারা বলেন বর্তমান ভারত ভগ্নগৃহের স্থায় এবং ইহার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক নচেৎ ভারত আজ সবার পশ্চাতে থাকিয়া শুধু এই অভ্যুত্থানে নীরব থাকিয়া চাহিয়া রহিবে। ভারতে নারীর আদর্শ পাশ্চাত্য দেশের নারীর আদর্শে গঠিত হইবে। তাহারা বলেন বর্তমান জাপান, তুরস্ক নারীর আদর্শ আমূল পরিবর্তন করিয়া বিশ্বের দরবারে এবং সভ্যসমাজে পরিচিত, সমাদৃত ও সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত। ভারতেরও সেই ভাবে অমূল-প্রাণীত হইয়া এই দীন ও জীর্ণ সমাজকে সংস্কার না করিয়া সম্পূর্ণভাবে নূতন আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমি এই জটিল সমস্যার অনেক চিন্তা করিয়া এই দলের সমর্থক নারীগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া এই মনে করিয়াছি যে এই দুই মতই ভারতের পক্ষে হিতকারী ও শুভদায়ক হইবে না কেননা তাহারা আত্মঘাতী—চরমপন্থা অবলম্বন করিলে কোন বিষয় সফল পাওয়া যায় না। ভারতে প্রাচীন কালের নারীর আদর্শকে যেরূপে ও স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তৎসহিত পাশ্চাত্য সমাজের স্তম্ভহীন আদর্শ লইয়া একটি নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিতে হইবে। ভারতের ত্যাগী, সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন “হে ভারত, তুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী”। প্রাচীনকালেও কন্যা-গণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত ছিল কেননা “কন্যাপোষ পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।” শিক্ষা মানবের মনের অন্ধকার দূর করে এবং হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষার সহিত তাহাদের শারীরিক চর্চা গৃহস্থালীর কাজ ধর্মকাৰ্য্যানুষ্ঠান, এবং দেশের ও সমাজের সেবা করাও কর্তব্য। আজ যে প্রতিষ্ঠানে আমরা সমবেত তাহার শ্রুতি সুরোজনলিনী একজন বিদূষী এবং উচ্চশিক্ষিতা নারী তাই বলিয়া তিনি দৈনন্দিন কাৰ্য্যও সমাধা করিয়া সমাজের ও দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাহার জীবনের আদর্শ

হইতে আমরা অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। বিশ্বের জাগরণে আমাদেরও সাড়া দিতে হইবে কিন্তু আত্মসম্মতি করিয়া, আত্মসমর্পণ নহে, তাই কবি বলিয়াছেন “না জাগিলে ভারত ললনা ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা”। মা নিজিত থাকিলে সন্তানগণ স্তম্ভ থাকিবে বিশ্বের আলোক তাহাদের অন্ধকার বিদূরিত করিবে না। নারীর জাগরণ অত্যাবশ্যক। ভারতের ভবিষ্যৎ জননীগণের মানসিক ও দৈহিক উন্নতি না হইলে চিরদিনের জন্ত অন্ধকার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিবে; সেই জন্ত যাহা ভারতের পক্ষে হিতকারী ও বরণীয় তাহাই নারীগণের আদর্শ হইবে। আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়ত আমার সহিত

একমত হইবেন না কিন্তু তথাপি আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে আমাদের নারীগণের আদর্শ সৃজন হইবে। সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা নববলে ও শক্তিতে গড়িয়া উঠিবে এবং সারা বিশ্ব ভারতের নারী-জাগরণ পুনর্কিত নেত্রে চাহিয়া দেখিবে এবং তাহার জয়গান ভারতের নারীগণ গাহিয়া, আনন্দ সলিলে নিমগ্ন হইয়া তাহার জয়মাল্য ভারতমাতাকে পরাইয়া দিবে। *

* সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব-সভায়-মহিলা সম্মিলনীর সভানেত্রীর অভিভাষণ।

সেকালের কথা - প্রাচীন সংবাদপত্র হইতে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী রচিত ‘স্বপ্নদর্শন’

(‘সংবাদ প্রভাকর’, ৩ আগষ্ট ১৮৫৮)

আমরা “স্বপ্নদর্শন” ইত্যাদিধেয় একখানি অভিনব পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আনুপূর্বিক পাঠ করত অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি, শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ...গ্রন্থকর্তা সংস্কৃত কালজের অলঙ্কার ঘরের ছাত্র, অতাপি পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, এই ভুল বয়সেই যে প্রকার লিপিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, এই সুপাত্র ছাত্র মহোদয় এরজন প্রধান লেখকরূপে পরিণত হইবেন।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-কর্তৃক নাট্যকারে অনুদিত

‘মালবিকাগ্নিমিত্র’

(‘সোমপ্রকাশ’, ২ জুলাই ১৮৬০)

নূতন গ্রন্থ—সম্প্রতি মহাকবি কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের মর্ম বাঙ্গালা ভাষায় নাট্যকারে অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদক শঙ্কা ক্রমে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাহার শঙ্কার তাদৃশ কারণ নাই। এক্ষণে যত নাটক ও নাটকের অনুবাদ প্রচারিত

হইতেছে এ অনুবাদ তাহার অনেকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শরীর সাধনী বিচার গুণোৎকর্ষন’

(‘সোমপ্রকাশ’, ২০ আগষ্ট ১৮৬০)

নূতন গ্রন্থ—শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শরীর-সাধনীবিচার গুণোৎকর্ষন নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ হেম্বর বার্ষিক সমাজের পুরস্কার ফল। গ্রন্থ খানি অধিকতর আয়ত হয় নাই, কিন্তু পাঠ করিলে গ্রন্থকারের অধিকতর আয়ত পরিশ্রম লক্ষিত হয়। ...*

জনহিতকর কার্যে বাঙালীর দান

(‘সোমপ্রকাশ’, ২৭ আগষ্ট ১৮৬০)

সাহেবদিগের মধ্যে অনেকেরই একরূপ সংস্কার আছে যে

* এই পুস্তকের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকালের কোন উল্লেখ নাই। ‘সোমপ্রকাশ’ের সমালোচনা হইতে মনে বরা অসঙ্গত হইবে না যে, পুস্তকখানি ১৮৬০ সনের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। মনে রাখিতে হইবে, পুস্তককারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে প্রবন্ধটি ১ জুন ১৮৬০ তারিখে হোয়ার বার্ষিক সমাজে পঠিত হয়।

অত্রত্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই ব্যয়কুষ্ঠ এবং সর্বসাধারণের হিতকর কার্যে পরাঙ্মুখ। এই সংস্কারের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান ফিল্ড পত্র হইতে যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতেই ঐ কুসংস্কার এককালে তিরোহিত হইবে। রাজা বৈদ্যনাথ এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা গরাণহাটা চিকিৎসা ও ঔষধালয়ের জন্য প্রত্যেকে ৫০০০০ মূদ্রা দান করেন। আশুতোষ দেবের পিতা রামচন্দ্রলাল সরকার কলিকাতার নিকটস্থ আম হাউসে ২০০০০০ লক্ষ টাকা দান করেন। বাবু মতিলাল শীলও কেমন মহৎ কার্যে ঐরূপ দান করেন। খ্রীষ্টিয়ানদিগের গোর-স্থানের নিমিত্ত রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ১০০০০০ মূদ্রা দান করেন এবং নিজ ব্যয়ে রাজবাড়ীর এবং ডায়ামণ্ড হারবরের রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। সাম-বাজারের সুদীর্ঘ রথ্যা বাবু রাজকুমার দাস নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করান। এতদ্ব্যতীত মল্লিক ও ঠাকুর বংশদ্বয়ের দ্বারা বহু সংখ্যক রাস্তা ও ঘাট নির্মিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ নির্মাণের নিমিত্ত যে মহাত্মা অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহার কীর্তিও সামান্য নহে।

বড়লোকের ছেলেদের জন্য বিদ্যাসাগর কর্তৃক স্কুল প্রতিষ্ঠা

(‘স্বল্প সমাচার’, ১০ এপ্রিল ১৮৭৭)

খ্রীষ্ট বাবু গোপাললাল ঠাকুরের বাটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটা নূতন স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। পঞ্চাশ টাকা করিয়া ছাত্রদিগকে মাসে বেতন দিতে হইবে। দুইটি ছেলে পড়িতেছে। বড় লোকের ছেলেদের জন্য ইহা হইয়াছে। যার যাহা ইচ্ছা সে তাহা পড়িতে পারিবে।

রামকমল ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু

(‘সোমপ্রকাশ’ ১৬ জুলাই ১৮৬০)

আমরা অতিশয় শোকার্ত হইয়া লিখিতেছি, কলিকাতা নর্মাল স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক রামকমল ভট্টাচার্য্য গত বুধবারে [১১ জুলাই] উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিয়াছেন।*

* রামকমল সপ্তম ১ জুন ১৮৬১ তারিখে ডি. পি. আই-কে প্রেরিত ইন্সপেক্টর হেনরী উড্রোর রিপোর্ট হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

(‘সোমপ্রকাশ’ ১৮ জুন ১৮৬০ আষাঢ় ১২৬৭)

খানাকুল কৃষ্ণনগর সংস্কৃত-ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা

খানাকুল কৃষ্ণনগর সংস্কৃত ইংরেজী বিদ্যালয়।—১৪ই জ্যৈষ্ঠ উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ...খ্রীষ্ট বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী উক্ত

“Pundit Ramkamal Bhattacharjee, the late Head Master of the Calcutta Normal School, died, unhappily, on the 11th July 1860. He was one of the most profound Sanskrit scholars of Bengal. To natural gifts of the highest order, he added the information obtained by laborious study. He had, in a pre-eminent degree, the inclination as well as the ability to exhibit European knowledge in the Bengali Language. His sketch of English History, his translation of some of Bacon's Essays, and his short and original Treatise on Geometry, indicate the powers he possess of enriching his mother tongue with valuable contributions in literature and science. But just when he was commencing a career of usefulness in unfolding to his countrymen the treasures of Western learning, with which his own mind was stored, a deep gloom fell suddenly upon him, and he perished by an untimely end. His genius fitted him for high employment as a Professor of Sanscrit or Bengali, rather than for a Teacher of a Vernacular Normal School.....” (Genl. Rep. on Pub. Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1860-61. Appendix A, p. 78)

১৮৬০ সনে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা “রামকমলের জীবনবৃত্ত” লিখিয়া ‘বেকন’ পুস্তকের ২য় সংস্করণের ভূমিকা-স্বরূপ প্রকাশ করেন। এই জীবনবৃত্তে রামকমলের মৃত্যুর তারিখ ভুলক্রমে “১১ই জুলাই” স্থলে “১১ই জুন” মুদ্রিত হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট ও নিম্নলিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন।

* * *

...আমাদের এই বিদ্যালয়ে কেবল ইংরেজী ভাষার চর্চা না হইয়া ইংরেজী সংস্কৃত ও বাঙ্গালা তিন ভাষারই শিক্ষা হইয়া থাকে।...দুই বৎসর হইল [১২৬৫ বৈশাখ] এই স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে।...বিদ্যালয়টি সংস্থাপিত হইলেই গিরিশচন্দ্র গুপ্ত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।...এখানে দেড় বৎসরকাল বাস করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।...গিরিশ বাবুর মৃত্যুর পর অবধি দুইজন শিক্ষকের আশ্রয় হয়। শিক্ষক মহাশয়দিগের কলিকাতা হইতে যতদিন না আসা হইয়াছিল কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরী বিনা বেতনে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাকার্য্য নির্বাহ করেন।...কালীনাথ বাবু কিছুদিন কর্ম্ম করিলে পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রধান শিক্ষকের পদ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।...কৃষ্ণকমল অল্প দিন হইল নিজের কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল আর কিছুদিন আমাদের এখানে থাকিলে অত্যন্ত আফ্রাদের বিষয় হইত। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান অতি অল্পলোক সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে তিনি বিলক্ষণ অধিকারী হইয়াছেন। বালকদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল।...কৃষ্ণকমলের পরিবর্তে শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

এ বৎসরও ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে। পরীক্ষাকার্য্য কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য এবং এখানকার তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহারা দুই জনে সম্পাদন করেন।...

* * *

ইতিপূর্বে তোমাদের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত শাস্ত্রে সম্যক বুৎপন্ন হইয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ও সংস্কৃত প্রভৃতির পরীক্ষা দানান্তে বি এ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদপ্রাপ্তি
• ('সোমপ্রকাশ', ২৭ আগষ্ট ১৮৬০)

এডুকেশন গেজেট হইতে গৃহীত। নিয়োগ। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের অফিসিএটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কলিকাতার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর হইবেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য—'ত্রৈমাসিক সমালোচক'

প্রকাশের সঙ্কল্প

• ('অমৃতবাজার পত্রিকা' ৩ অগ্রহায়ণ ১২৮২)

বিজ্ঞাপন।

• ত্রৈমাসিক সমালোচক।

সর্ব্বশাস্ত্র-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র ও সমালোচন।

কলেবর ১৬ কর্ম্ম।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য—৩।০ ডাকমাণ্ডল ৥০

আগামী ১লা মাঘ হইতে প্রকাশিত হইবে।

লেখক।

সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রবন্ধ লেখকের নাম প্রকাশ থাকিবে।

শ্রীযুক্ত রামগতি ত্রায়রঙ্গ। শ্রীযুক্ত রামদাস সেন।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বলদেব পালিত।

F. H. Skrine Esq. C. S.

এতদ্ব্যতীত জ্ঞানাসুর পত্রের অধিকাংশ লেখকগণ।

সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

এ পত্রে কখন কখন ইংরাজি প্রবন্ধাদিও লেখা হইবে।

কার্য্যসম্বন্ধীয় পত্র ও মূল্য আমি গ্রহণ করির।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস (ভূতপূর্ব্ব জ্ঞানাসুর সম্পাদক।)

সহকারী সম্পাদক।

১০৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

* 'ত্রৈমাসিক সমালোচক' শেষ-পর্য্যন্ত বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য রচিত কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক
('হিতবাদী', ১ম ভাগ, ১১শ সংখ্যা—৮ আগষ্ট ১৮৯১)

Important Books for Students.

By Babu Krishna Kamal Bhattacharjya, B.L.
Principal, Ripon College.

For B. L. Examination.

Lecture-notes on Mahomedan Law together with the text, Rs. 1-3

('হিতবাদী' ১০ই অক্টোবর ১৮৯১)

For the Students appearing at the B.A.
Examination of 1892—

An English Translation of Sakuntala,
by Krishna Kamal Bhattacharya is out...

('হিতবাদী' ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২)

১৮৯৪ সালের প্রবেশিকার সংস্কৃত কোর্স

রাজুপাঠের অর্থপুস্তক ।

রিপন কলেজের অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল কর্তৃক অল্পবাদিত-ও
পণ্ডিত সংস্কৃতাদ্যাপক পণ্ডিত উমাচরণ তর্করত্ন ও যজ্ঞেশ্বর
বিদ্যারত্ন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া...বিক্রয় হইতেছে। মূল্য
১।০।

[বাহারা অাচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের জীবনী পাঠ
করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ১৩৪৫ সালের প্রথম সংখ্যা
'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' পাঠ করিতে পারেন]

বিজয়িনী

তৃতীয় খণ্ড

(১)

গ্রামের লোকেরা কর্তৃত্ব থাকে সমরেশের টাকা চুরীর
কাহিনীর আলাপ-আলোচনা অতি স্বচ্ছন্দে। তার কিন্তু
একে একে জীবনের যা কিছু আকর্ষণ সবই হয়ে পড়ে
বিচ্ছিন্ন। একটা বিরাট শূন্যতার আশে পাশে জীবনটা
তার ঘুরে বেড়ায় ছছ শব্দে।

প্রকৃতপক্ষে তার জীবনে প্রয়োজন ছিল কোন একটা
অবলম্বন। যার আশ্রয়ে সে হয়তো ভুলতে পারতো তার
বিগতদিনের ব্যথা। পারতো ক'রে বেদনার উপশম।
প্রাণহীন কতকগুলো মুদ্রা কিয়দংশে করছিলো তার দুঃখের
লাঘব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও গেল।

ঘর, বাগান, নির্জনতা আর পার্বে না তাঁকে দিতে
পরিতৃপ্তি। সন্ধ্যা আনবে না আর সেই মাদকতা।
পারবে না আর আত্মবিস্মৃত হয়ে খেয়ালের রসে মনকে
সরস করে 'তুলতে'। ওর কাছে মনে হয় সব কিছুই
নিরর্থক, বুথা।

এখন থেকে রাহের ঘন আধারে গুম্বরে উঠবে ওর
হারাগো-রতনের বেদনা। আবার যে নতুন করে জমিয়ে

শ্রীনির্মলকুমার ভট্টাচার্য্য

তুলবে টাকার স্তূপ সে ধৈর্য্যও ছিল না বুকে। আর তা
ছাড়া আগেকার জমানো প্রত্যেকটির ওপর ওর জন্মেছিল
মমতা—তাদের তো আর পাবে না ফিরে।

দুটি হাত দিয়ে মাথাটাকে চেপে ধরে ও সারারাত
জেগেই দেয় কাটিয়ে। মাঝে বুকের প্রতিটি কন্দরকে
বিক্ষোভিত করে বেরিয়ে আসে মর্ম্মঘাতী দীর্ঘশ্বাস।

কিন্তু এই হারাগোর বেদনার আবছায়ে চুপি চুপি পা
ফেলে এগিয়ে আসছিলো আর একটা নতুন পওয়া যেটা
ভোলাবে ওর সব কিছু অশ্রু-মালিন্য। জাগিয়ে তুলবে
বিজয়কেতন মর্ম্মস্থলর কোমল রাজ্যে।

*
*
*

সমরেশের নির্মূল্য অবস্থা গ্রামের লোকের মনে জাগিয়ে
তুলছিলো অল্পস্পর্শে একটু একটু করে। সবাই-ই ভাবে
লোকটা নেই—ই গোবেচারা—তা না হ'লে এমন করে
কেউ হারায় নিজের সর্ব্বস্ব। তার লোকসম্পর্ক-বর্জনের
কারণটা এখন সঁকলে ধরে মাথার ভিট্ট বঁলে।

তাদের সহানুভূতিটা বেশ প্রকট হয়ে দেখা দিল
শ্রীপঞ্চমীর দিনে। জমীদার বাড়ীতে মা সারারাত পূজার্তন

হয় খুবই ধুমধামের সঙ্গে। ছেলে-বুড়ো, ইতর-ভদ্র নির্বি-
শেষে জোটে সকলেই।

গ্রামের মধ্যে অপূর্ণ দত্তের স্ত্রী ছেলে-বুড়ো সবাইই
জ্যাঠাইমা বলে' পরিচিত। পাল-পার্কণ, বিঃ, রোগ,
মৃত্যু যা কিছু ঘটুক না গ্রামে, এই জ্যাঠাইমা হন ঠিক
সেখানে হাজির সব বুঁকি পোহাতে। সকলেও তাঁর হাতে
কাষকষের ভার দিয়ে থাকে নিশ্চিত।

মানুষটিও তিনি সব বিষয়েই দড়। ব্যবহারে তাঁর
লোফে শোক হুংখ সব কিছুই যায় তুলে। অতএব
শ্রীপঞ্চমীরও সব কিছু খবরদারীর দায়ীত্ব যে তাঁর এ কথাটা
সকলেরই জানা।

পূজো শেষ হয়ে গেল' বেলা বারোটার মধ্যে। খাওয়া-
দাওয়া চুকতে প্রায় বাজলো তিনটে। সবাই চলে গেল
যে যার বাড়ীর দিকে। দত্তগিন্নী পেলেন এবার একটু
অবসর। কিন্তু এবারে তাঁর আরও একটা কাজ মনে মনে
হিল আঁচ করা। তাই একটা মাটির থালায় মায়ের প্রসাদ
— নিয়ে বেরোলেন জমীদার বাড়ীর ফটক পার হয়ে। তাঁর
ছোট ছেলে শচীও চললো সঙ্গে সঙ্গে।

সমরেশ তখন ঘরের দোরে থিল এঁটে ছিল বসে'।
টাকার কথাটাই ভাবছিলো নিরন্তর। দত্তগিন্নীর বার
পাঁচেক ধাক্কার আওয়াজে ভাজলো ওর চমক। উঠ গিয়ে
দিলে দরজাটা খুলে'। আগে হ'লে এ রকম ব্যাপারেও
সে হয়ে পড়তো নিদারুণ অসন্তুষ্ট। কিন্তু আজকাল
রিক্ততা এনে দিচ্ছিল ওকে বারে বারে বাইরের ডাক।
আরও একটা কারণ ওর উত্তেজিত মস্তিষ্কে এ ছাড়া ছিল
জমা হয়ে যে বাইরে থেকেই বুঝি বা আসবে ওর লুপ্ত
ধনের প্রকৃত ঠিকানা।

ঘরে ঢুকেই দত্তগিন্নী প্রসাদের থালাটা রাখলেন
টেবিলের ওপর। তারপর অল্পকম্পার সঙ্গে বলে' উঠ-
লেন—ছিঃ বাবা, আজকের দিনে কি এ রকম হুংখ কর্তে
আছে। দেবতার অর্চনার লগ্নে মানুষের উচিত হাজার
হুংখের মাঝেও মনকে প্রফুল্ল করা। নাও এইটুকু মায়ের
প্রসাদ আজকের দিনে মাথায় ছুঁইয়ে। সব হুংখ, সব কষ্ট,
যাবে ধুয়ে মুছে।

সমরেশ ঠিক কলের পুতুলেরই মত প্রসাদের থালাটা

ঠেকালে মাথার 'পরে। এই মহিমময়ী নারীর কথায় যেন
কোন মন্ত্রশক্তি আছে বলে মনে হ'ল ওর। পারলে না যে
উপেক্ষা করে তাঁর কথা।

শচী ইতিমধ্যে ঘন ঘন তাকাতে আরম্ভ করলে থালায়
সন্দেশগুলোর দিকে। সমরেশও তা' করলো লক্ষ্য। সে
একখানা সন্দেশ তুলে নিয়ে বল্ল—খোকা, তুমি এখানা
নাও।

আর কোথায় যায়, খোকা তো ভয়ে একেবারে জড়সড়
হয়ে মার পিছনে গিয়ে লুকোল। অল্প সময়ে ও এদিক
মাড়ায় না। আজ নেহাৎ মার সঙ্গে এসেছিল বলেই করে-
ছিল একটু সাহস।

দত্তগিন্নী বল্লেন—শচী, অসভ্যতা কোরো না—দিচ্চেন
নাও।

মায়ের কথায় শচী কিন্তু এগিয়ে গেল না। সেইখান
থেকেই শুধু দিলে হাতখানা বাড়িয়ে।

সমরেশ উঠে এসে তার হাতে-সন্দেশখানা দিলে।
তারপর কোলে তুলে নিয়ে বল্ল—ভয় কি, আমি ভুতও মই,
বাঘও নই। খোকার কিন্তু মুখ হ'য়ে গেল ফ্যাকাশে—
কৈদে ফেলে আর কী।

সমরেশ বুঝলো এতে করে খোকার মুখে হাসি তে
ফুটেবেই না বরং কান্না থামানো একটা দায় হয়ে দাঁড়াবে।
তাই দিলে নাগিয়ে তাড়াতাড়ি। সেও গিয়ে আবার
লুকালো মায়ের পিছনে।

দত্তগিন্নী বলে উঠলেন—ছেলেটি আমার বড় ভীতু।
কিন্তু আর সবই ভালো। লেখাপড়া, গান—গলাটাও
ওর ভারী মিষ্টি। তারপর শচীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন—
দাও তো বাবা ওকে একখানা গান শুনিয়ে।

শচীর তখনো ভয়ের জড়তা যায় নি' একেবারে কেটে।
হাত দিয়ে সে দিলে মুখখানা ঢাকা। তারপর হাতের
সন্দেশখানার দিকে একটু আড়চোখে নিলে তাকিয়ে।
ভাবলো গান না গাইলে যদি নেয় কেড়ে। তারপর
কচি গলায় ধরলো গান—

স্বর তালের বিশেষ ঠিক ঠিকানা না থাকাতো
সমরেশের কাছে গানটা মন্দ ঠেকলো না। দত্তগিন্নী

কিন্তু এতক্ষণ লক্ষ্য করুছিলেন গান শুনে সমরেশের মুখের ওপর কি রকম ভাবান্তরের পড়ে ছাপ।

গান থামতেই সমর বলে উঠলো—সুন্দর। আনন্দের সঙ্গে দত্ত গিন্নী এবার বলে উঠলেন—আমি কিন্তু ঠাকুর দেবতার ছাড়া আর কোন গান ওকে দিই না ক’র্তে, কেননা ঠাকুর দেবতার যা কিছু সবতাতেই আমাদের ছাড়া এই জগতেই তো পূজো পার্শ্বণ করা। তুমি তো আর বাপু মন দেবে না ওদিকে একটু ও।

সমর একটু হাসলো। কোনও উত্তর দিল না।

দত্ত গিন্নী আবার বললেন—আমার কি মনে হয় জান? ঠাকুর দেবতার ওপর ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকাতোই তোমার এই দশা। এবার থেকে একটু আধটু এসব মন দাও দিকিনি। দেখি কেমন তোমার ভালো না হয়।—আচ্ছা আজ তা’ হলে উঠি।

সমরেশ মনে মনে ভাবে তা হবেও বা। কিন্তু তবুও দত্ত গিন্নী চলে যাবার পর ও যেমন-কে-তেমন বসেই রইলো। প্রসাদ রইলো পড়ে অভুক্ত।

প্রকৃত রাণীর সেই মনে আগুন লাগিয়ে এগিয়ে আসে রত্নীন ফাগুন। শীর্ণ গাছপালা হয়ে ওঠে আবার সজীব নূতন ফুল পাতার সমারোহে। পাখীদের কলকাকলীতে জাগিয়ে দেয় বাতাসের স্তরে স্তরে বাঁচনের অভিনব তান।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকের মনে রঙের পরশ বুলিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে আর একটা মধুর ক্ষণ। সে দিন সবারই মুখে ফুটবে হাসি নূতন উৎসবের বাদ্যভাণ্ডে। মৃগাক্ষ চৌধুরীর সঙ্গে গৌরীরাণীর বিয়ের বাকী আছে মোটে আর দশটি দিন।

জমীদার বাড়ীর বিয়ে অতএব ধুমধামের উত্তোগ আয়োজন সবই লেগেছে তাতে আরম্ভ। হেঁজী পেঁজী থেকে আরম্ভ করে মাহবুব পর্যন্ত সকলেই এখন ব্যস্ত। এ উৎসবে সবাই পেয়েছে এক একটা কাজ নিজের মতন।

আয়োজন হয়েছে অনেক কিছুই। খাওয়া দাওয়া চলবে তো দিন-সাতেক ধরে ছুরেলাই। মাছ, মাংস, তরিতরকারী সমস্তেরই বায়না দেওয়া হয়েছে নানান

দিকে। কারণ এক জায়গা থেকে অত প্রচুর জিনিষ যোগানো অসম্ভব।

জমীদারী সেরস্তার অধীনে আছে যে কটা পুকুর শুধু তার মাছে ভরতে পারে না এতগুলো লোকের পেট। তাই কলকাতা থেকে আসবে অনেক। মাংসেরও ব্যবস্থা আছে বিশেষ।

আনন্দ উৎসবকে কোলাহল মুখর করে তোলার জন্তে কলকাতা থেকে আসছে থিয়েটার, গান এই সবেদ দল। শোভাযাত্রার জন্তে বাজনার দলও আসবে গোটা পাঁচশেক।

এই আনন্দের মাঝখানে কিন্তু কেউ একবারও করে না হেমন্তের নাম। তার দীর্ঘ অস্থিতিতে এখনও নয় কেউই চিন্তাশ্রিত। সকলেই মনে করে বিয়ের সময় সে ঠিকই হবে হাজির।

মৃগাক্ষের মনে কিন্তু আগে অল্প রকম চিন্তা। ও ভাবে সে এসে পড়লো বলে। ভয়ে শিউরে ওঠে তাই তো কি করে করবো তার মুখ বন্ধ। এমন মাহেজ্ঞক্ষেণে সে নিশ্চয়ই আরও ক্লিষ্ট দাঁও মারবার আশায় চালবে সর্ব-নেশে চাল। মনে মনে বলে—হে ভগবান; যেন অন্ততঃ পনেরটা দিন পরে সে ফিরে আসে। তা’ হলে আর বিয়েতে ঘটবে না কোনই ব্যাঘাত। ও আর পারে না ভাবতে—যা হয় হবে এখন তো করা যাক আনন্দ। ভবিষ্যৎ স্বথের কল্পনায় হতে থাকে মদির।

*

*

*

ঠিক সেই সময়েই এক রিক্তা নারী তার ক্ষীণ দেহটিকে টেনে নিয়ে এগোতে থাকে রাধাবল্লভপুরের পথে। তার কোলে একটি শিশু। কয়েক বছর আগেকার কথা। কলকাতায় এক মাধবী রাতে মৃগাক্ষ ওকেই ধরতে চেয়েছিল নিজের করে। ও-ও দিয়েছিল আত্মবিস্মৃত হয়ে তাতেই সায়। জমীদারের ছেলে তায় গাড়ী—বাড়ী সবই আছে। কাজে কাজেই একটা মেয়েকে ভালো আর কতই কষ্টকর।

মেয়েটির আপনার জন বলতে কেউই ছিল না তেমন এক দূরসম্পর্কীয় পিস্তুত ভাই ছাড়া। মৃগাক্ষের টাকার

বহর দেখে ও নিজে কিছু টাকা বাগিয়ে সে অগ্রপশ্চাত না ভেবে মেয়েটিকে মৃগাক্ষের হাতে দিয়ে দিল এক কথায়।
বিয়ে হ'ল শাস্ত্রমতে কিন্তু জান্নল না দ্বিতীয় প্রাণী। কিছু দিন কাটল খুবই সুখে।

ক্রমে সময় হল মৃগাক্ষের দেশে ফিরবার। তখনই ঘটলো মুন্সিল! প্রসন্ন চৌধুরী জানতে পারলে ঘটবে মহা বিপদ। মেয়েটির পক্ষ সমর্থন করার একমাত্র সম্পদ ছিল তার অসামান্য রূপ। কিন্তু বর্ষায়ান্ পিতার চোখে তা জাগাতে পারবে না কোনই অলুকা। তাঁর দেখতে হবে জাত, কুল, খ্যাতি, ধর্ম, সমাজ এবং আরও কত কী। কাজে কাজেই শেষ পর্যন্ত তাকে রেখেই হ'ল ওকে ফিরতে। এক হেমন্ত বাদে আর সকলের কাছেই ব্যাপারটা রইলো অজ্ঞাত।

প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশই মাসহারা চল পাঠানো। কিন্তু অদর্শনে ধীরে ধীরে আসতে থাকে বিস্মৃতি। খেয়ালী চঞ্চল ধনীর আদরের তুল্যদের মন সব সময়েই ছোট্টে একটা নতুন দিকে। পলে পরে কিন্তু আর থাকে না সেটার কোনই প্রয়োজন। ফিরে তাকাবারও পায় না অবসর সে দিকে। আবার চাই আর একটা কিছু।

বছর দেড়েক অতিকটে কাটিয়ে মেয়েটি ঠিক করে সে এবার গিয়ে হবে পতিদেবতার জন্মদাতার শরণাগত। তাতে করে আর কিছু উপায় নাই হোক অন্ততঃ দু'ধর বাচ্চাটাকে দিয়ে আসতে পারবে তার বাবার কাছে।

উত্তেজনার মাঝে মেয়েটি এসে পৌঁছায় ওখানকার ষ্টেশনে। তখন রাত প্রায় নটা। এর পরে হাঁটতেও হবে অনেকখানি।

এই অসময়ে ভয়াবহ বিপদের রাজ্যে পা বাড়াতে তার একটুও করে না ভয়। জন্তু জানোয়ারের হাত হয়তো যেতে ও পারে এড়িয়ে, কিন্তু পশু-প্রকৃতি মাঝবের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যে মোটেই নয় সহজ—সে সব কথা পড়ে না একটুও মনে।

চলতে চলতে হঠাৎ পায়ে যেন কি কামড়ালো বলে হয় মনে। তবে তীক্ষ্ণতাটা যেন একটু অত্যধিক। টপ করে' পা টা তুলে; সর সর করে সরে যায় একটা প্রাণী— যা দেখে তাতে আর থাকে না আতঙ্ক প্রকাশের বা চিন্তা

করার অবসর। প্রাণীটি বাংলা মায়ের প্রিয় সন্তান অজগর।

ওর মনে আসে এক নতুনতর চিন্তা; মনে মনে বোধ করে হুঁত। ভাবে ভগবান বুঝি চাইলেন মুখ তুলে এতদিন পরে। সব কষ্টের এবার হবে শেষ সেই আনন্দেই ও চাইলে না লোকজন ডেকে বাঁচবার কস্মতে কোন রকমই চেষ্টা।

হঠাৎ আবার দমে যায়—তাইতো পারবো কি শেষ পর্যন্ত সন্তানকে তার বাপের কোলে তুলে দিতে। জোরে জোরে চালাতে থাকে পা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে।

ক্রমে আসে চেতনাশক্তি হয়ে শিথিল। সর্বদা কঁপুতে থাকে থবু থবু করে'। হাত পায়ের আঙ্গুলগুলো হয় অসাড়, প্রত্যেক খাঁজে খাঁজে ধরে খিল। শক্তি থাকে না সন্তানকে আঁকড়িয়ে রাখে কোলের পরে।

শিশুর ছোট্ট মাথাটা মায়ের বুকের থেকে বুলে পড়ে মাটির দিকে। তজ্জা তার যায় টুটে। প্রাণপণে চেঁচা করে মায়ের দেহের সঙ্গে থাকতে সংলগ্ন। ছোট্ট ছোট্ট চোখ তুলে তাকায় মায়ের মুখের পানে। ডেকে ওঠে ভীতি-বিহ্বল স্বরে—মা যা। কিন্তু মার তখন হ'য়ে গেছে বাকুশক্তি রোধ।

ধপ করে মেয়েটির দেহ পড়ে যায় পথের ওপর। তাতে শিশুটিরও লাগে চোট। সে হয়ে পড়ে অবাহ। মায়ের সারা দেহের ওপর ছোট্টোছুটি করে'ও পায় না বিদ্ধ মাত্র সাড়া। স্তব্ধ করে দেয় কারা।

হঠাৎ তার চোখে পড়ে যায় দূরের আলো। শিশুর মনের পরিবর্তনশীল আকর্ষণের আবেগে সেদিকেই করতে থাকে লক্ষ্য। মায়ের কথা যায় তুলে।

মনে করে বুঝি আলোটা এসে পড়বে ওর কাছে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল তবুও কেন আসে না। ঠিক করে হাত দিয়ে ধরবে। এগোয় হামাগুড়ি দিয়ে।

যতই এগোতে থাকে ততই আলোটাকে দেখে আরও বড়, আরও উজ্জল। গায়ে যে গরম কাপড়টা আসার সময় মা দিয়েছিল জড়িয়ে, সেটা যায় খসে'। সেদিকে কোনো লক্ষ্যপ, আলোটাকে চাই ধরা।

ক্রমে ক্রমে এসে পৌঁছায় একটা দরজার সামনে। তারই

ভেতরে জলছে আলোটা। সটান চুকে পড়ে ভেতরে।
খুদিতে বাড়ায় হাত ধরবে ঐ জলন্ত শিখাকে। কিন্তু পারে
না মোটেই। কারণ আলোটা ছিল একটা উচু জায়গায়।
উচ্চারণ কর্তে থাকে কতকগুলো অক্ষুট শব্দ। ভাব্য আলো
বুঝি বা পারবে তা বুঝতে।

(৩)

ইদানীং সমরেশের আচরণে এক অদ্ভুত খেয়াল দিয়েছিল
দেখা। সে রোজই রাতে বারে বারে দরজা খুলে গিয়ে
দাঁড়াতে খোলা আকাশের তলায়। চারিদিকে কাণ পেতে
চাইতো কি যেন শুনতে। নির্জনতার অসীম বিস্তারে চোখ
মেলে দেখতে চাইতো কিসের আশায়।

অমনিই এক উন্মাদনার বশে সে বেরিয়ে গিয়েছিল
ঘরের দরজা খুলে রেখেই। দাঁড়িয়েও ছিল অনেকক্ষণ
থরেই। তারপর নিরর্থকতার ইঙ্গিতে গুটি গুটি পা চালিয়ে
দিয়েছিল ঘরের দিকে।

ভেতরে চুকেই ও যাচ্ছিল দরজাটা দিতে বন্ধ করে।
কিন্তু আলোটার দিকে চোখ পড়াতে আর পারেন না কয়েক
মুহূর্ত কোনও কিছুই করতে।

একটু পরে সামলে উঠে ছ'হাত বাড়িয়ে তুলে দেখলো
এক শিশু। মনে ভাবলে বুঝিরা দেখছে এক স্বপ্ন। শিশু
হঠাৎ কেঁদে উঠে ছ'হাত জড়িয়ে ধরে ওর গলা। ক্রন্দন-
বিজড়িত আধ ফোটা 'মা মা' রব করতে থাকে ওর দেহ
মন বিচলিত।

তাকে বুকে চেপে ধরে থাকে চাপড়াতে আস্তে আস্তে।
ভাবে তাতেই বোধ হয় থামবে কান্না। কিন্তু যখন কোনই
ফল হয় না ভাবে যে থিদে পেয়েছে বোধ হয়। কিন্তু ছোট
ছেলের খাবার তো নেই কোন কিছুই। হঠাৎ মনে করে
একটু চিনি দিলে হয়তো কান্না পারে থামতে। এ কল্পনা
ওর হয় কার্যকরী। শিশুটি বসে বসে খেতে থাকে।

খাওয়া শেষ হলে আবার আশ্রয় করে কান্না। সমরেশের
কোণ থেকে খালি দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে যেতে
চায়।

ওর মাথায় গজায় একটু বুদ্ধি। শিশুকে কোলে করে

রেবিয়ে পড়ে রাস্তায়। মনে ভাবে নিশ্চয়ই হবে আবিষ্কার
কোন রহস্যময় স্রবের।

* * *

জমিদার বাড়ীতে সকলে বসেছে খেতে। বিয়ের যদিও
ছিল কয়েকদিন দেৱী, তবুও আত্মীয় কুটুম্ব এসে জমা
হওয়ার দরুণ পাত নেহাৎ পড়েনি কম। পুরুষ আর মেয়ে-
দের আসন পাতা হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়।

স্বয়ং প্রায় চৌধুরীই করছিলেন সব দিকের তত্ত্বাবধান ;
তাঁর ছোট ছেলে প্রশান্ত মালখোঁচা মেয়ে লেগে গেছে
পরিবেশনের কাজে। তার কর্মতৎপরতা আর ব্যস্ততা
দেখে জমিদার বাবু মনে জাগ ছিলো অপরিণীত আলো।
মনে মনে ভাবছিলেন, 'ই ছেলেই রাখবে নাম। কারণ
লেখাপড়া ভদ্রব্যবহার সব দিক দিয়েই সে ইতিমধ্যে অর্জন
করেছিল বেশই খ্যাতি।

মৃগাক্ষও এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। নিজেরই বিয়ে
অতএব একটু আধটু এসব দিকে মন দিতে হবে বৈকী।
হঠাৎ এক অভাবনীয় ব্যাপার গেল ঘটে। সমরেশকে এক
শিশু কোলে করে হস্তান্তর হয়ে এসে দাঁড়াতে দেখে সবারই
গেল তাক লেগে। স্বরেন ভট্টাচার্য আদি মাতবরেরা
এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে তাকে ঘিরে, কোতুল বশতঃ মৃগাক্ষও
গেল সেখানে।

প্রসন্ন বাবু একটু রাগতঃস্বরেই যেন বলেন—কি ব্যাপার
আবার এত রাতে ?

এ কথায় সমরেশ বলে উঠলো—আমি এসেছি ডাক্তার
বাবুর জন্তে। তিনি কি এখানে আছেন ?

ডাক্তার হরেন সরকারেরও ছিল নেমন্তন্ন এ বাড়ীতে।
তিনি এতে খেতেই নিজের নাম শুনে বলে উঠলেন—কি
হ'য়েছে, এই যে আমি এখানে।

সমর একটু উত্তেজিতভাবে বলে উঠলো—ধানক্ষেতের
পাশে একটা স্ত্রীলোকের দেহ রয়েছে পড়ে। আমার মনে
হয় সেটা মৃতদেহ। আপনি যদি একবার দয়া করে
দেখেন।

একথা শোনবামাত্রই মৃগাক্ষের বুকের ভেতরটা উঠলো
ছ্যাৎ করে। মনের মধ্যে এসে জুটতে লাগলো যত

বাজ্যের আতঙ্ক!.....সে-ই নাকি! বাচ্চাটার তো তারই মত গায়ের রং!.....কি সর্বনাশ—বুদ্বি বেঁচে থাকে!...

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—চুপ চুপ এখানে আর ও কথা নয় চলো বৈঠকখানায় সব শুনবো। আর ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবুরও হয়ে যাবে খাওয়া শেষ। খাওয়ার সময়ে এখানে এ কথাটা মোটেই উচিত নয় পড়া। আর মেয়েরা যদি পায় শুনতে তাহলে বাধাবে একটা মহা হৈ চৈ।

একজনে অনেক আগেই মেয়ে মহলে আরম্ভ হয়েছে উদ্বেজন। কেউ কেউ এমন কি ব্যাপারটা জানবার জন্তে অনেকটা এগিয়ে ও গিয়েছিল। পোড়োবাড়ীর অধিবাসীর এ রকম অসময়ে আবির্ভাব—তায় আবার কোলে পরীর বাচ্চা মত একটি শিশু এ খবরটা এখুনি না জানলে তাদের আর হবে না খুম সে রাতে।

দত্তগিন্নী ছিলেন রান্নামহলে। কথাটা তাঁর কাছে পৌঁছবামাত্র হাজির হলেন গিয়ে একেবারে সকলের সামনে। সব কথা শোনার পর সমরেশকে বলেন—বাবা, খুকীকে এখানেই রেখে যাও আমাদের কাছে। এই রাতে আবার বাইরে নিয়ে গেলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। আর তা ছাড়া ব'ল্ছো যখন যে একজন মেয়েমানুষ মরে পড়ে আছে, আর সে যদি ওর মা-ই হয় সত্যিসত্যি—তাহলে আর কোনও মতে ওকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে না উচিত।

প্রবল আপত্তির সঙ্গে বলে' ওঠে—না, না, না, একে আমি রেখে যেতে পারবো না। শিশুটিকে যে কেউ এর কাছ থেকে আবার চাইবে সেটা ও পারে না ভাবতে।

মৃত্যুঞ্জয় স্বরেন ভট্টাচার্য্যকে একটু আশ্বস্ত বল্ল—এ কি শুনি! এই লোকটাই না থাকতো একালসেঁড়ে হয়ে।

জমিদার বাবু বলেন, আর দেবী নয়, দেখ, দেখ, জামায়ের খাওয়া হ'ল কিনা শেষ।

দত্তগিন্নী মৃগাক্ষকে দেখে বলে উঠলো—কি ভূমি কি যেতে চও নাকি?

—হ্যাঁ, মৃগাক্ষ উত্তর দেয়।

—না, না, এইরাতে অন্ধকার, ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে

তোমার আর গিয়ে কাজ নেই বাপু। আমরা তো এতগুলো লোক যাচ্ছিই—লোকের তো আর অভাব নেই।

—না, না, আমরা একবার যেতেই হবে। কিছুদিন আগে আমি এ অঞ্চলে একটা মেয়েলোককে দেখেছিলুম ঘুরে বেড়াতে। দেখতে চাই সে-ই কিনা। —মৃগাক্ষের মন চায় একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে' নিঃসন্দেহ হতে।

শিশুটি আবার অ'রম্ভ করে' দেয় 'মা মা' বলে কান্না। মৃগাক্ষ যায় নিজের ঘরে জুতো প'বুতে।

(৪)

•দিব্বিদিব্ব জ্ঞানশূন্য হ'য়ে মৃগাক্ষ চলতে থাকে পথে। ধানক্ষেত, কাদা, চোরকাটা এবে নেই একটুও অক্ষিপ। দামী জুতোটার কি দশা হ'ল সেদিকে নেই খেয়াল।

মনে ওর তীব্র উৎকর্ষ। ভাবে যাক—এবার বোধ হয় গেল' মুক্ত হওয়া। 'যদি সেই হয় আর যদি মারাই গিয়ে থাকে তাহলে তো তার চেয়ে শুভক্ষণ নেইকো জীবনে। কিন্তু এক একবার বিবেক করে' দংশন। তখন আত্মপ্রসাদ লাভ করে' এই মনে করে' বাচ্চাটার ক'রে দেব একটা স্ববন্দোবস্ত। যাতে তার মানুষ হতে' না হয় কোনই কষ্ট, তা' হলেই তো হবে কর্তব্য সম্পাদন। কিন্তু, কিন্তু যদি সে-ই হয় আর ওঠে বেঁচে কোন রকমে!—তাহলে উপায়—

সমরেশের ঘরে পৌঁছে দেখে যে ইতিমধ্যে দেহটাকে নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে। হরণ ডাক্তার বলে' উঠলো মারা তো গেছে অনেকক্ষণই। একটা কিসের কামড়ের মতন রয়েছে দাগ। খুব সম্ভব সাপেরই হবে।

মৃগাক্ষ একবার সেই মৃতের নিশ্চল মুখখানার দিকে দেয় দৃষ্টি। হ্যাঁ, সে-ই। যেদিন ও চলে' এসেছিল সেদিন যে রকমভাবে তাকিয়ে ছিল মনে হ'ল আজও যেন ঠিক তেমনিই আছে তাকিয়ে—পৃথিবীকে দিচ্ছে বিদায়।

ও আর পাবে না তাকাতে। ক্ষণিকের জন্তে আসে আবার দুর্বলতা। কোন রকমে নেয় তা' সামলিয়ে। চোঁয় দেখে শিশুটি তখন সমরেশের কোলের ওপর বসে' অসীম তৃপ্তির সঙ্গে থাচ্ছে দুধ। বুঝতে একটুও কষ্ট হ'ল

না যে এই অসময়ে ছুধ এঁন দেওয়া দত্তগিন্নী ছাড়া আর কারুরই নয় কাজ।

শিশুটি একবার তাকালে ওর দিকে। সে দৃষ্টিতে নেই কোনই অসচ্ছন্দ্য। আপনমনে সে পাবে না চিন্তে। ওর মনে আবার দুঃখ এসে হয় জড়।

বলে ওঠে, সমরেশ বাবু, ওটিকে এখন কিছুদিন আমাদের বাড়ীতেই রাখা যাক। তারপর দেখে শুনে আমিই একটা ভাল অনাথ আশ্রমে ক'রবো ওর থাকার বন্দোবস্ত।

—অনাথ আশ্রমই বা কেন, অ'র আপনার বাড়ীই বা কেন? আমার কি নাই রাখবার কোনই সম্ভাবনা—সমরেশ উত্তর দেয়।

—না-না আমি সে কথা বলছি না। বলছি এই যে আপনার মতন একজন অবিবাহিত নিঃসঙ্গ লোকের পক্ষে ওকে রাখার তো তত সুবিধে হবে না।

—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আইনের বলে ওকে কেউ না নিয়ে যায় ততক্ষণ ওকে আমি এখেন থেকে এক পাও নড়াব না।

—বেশ, বেশ, সে তো খুবই ভালো কথা। আপনার যে এই মা-হারী শিশুর প্রতি এত মমতা পড়েছে তাতে আমি আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না থাকতে।

মৃগাক্ষ এবার ঘর ছেড়ে গেল বেরিয়ে। একা পথ চলবার সময়ে কিন্তু মনে অল্পভব করলে অসহ্য যন্ত্রণা। সবার সামনে বেশই আত্মগোপন করা চললো। কিন্তু মনের ঘরে চুরি করা যে বড়ই কষ্টকর।

শোবার ঘরে ঢুকে আবার বোধ করে আনন্দ—আমার যে আর একবার বিয়ে হয়েছিল সেটা তো আর জানবে না কেউ। এক হেমন্ত, তা ওকে টাকা দিলেই হবে ওর মুখবন্দ।

ভাবে, সন্তানের প্রতি কর্তব্য। তা পিতৃস্ব স্বীকার না করেও করা যায়। আমি দেখবো যাতে ওর ভরণ-পোষণের না হয় অভাব। যাতে ওর জীবন ধারণে কষ্টে পারি সহায়তা।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা দারোগা বাবুর প্রয়োজনীয় লেখালেখি শেষ হলে পর লাস গেল চালান কলকাতায়।

সেখানে আবশ্যকীয় কাটাকুটির পর নিশ্চয়ই তা দেওয়া হয়েছিল জালিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনীর এ পৃথিবীর অস্তিত্ব যায় মুছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

হয়তো সে সময়টাও মৃগাক্ষ ত্যাগ করেছিল একটু দীর্ঘশ্বাস।

(৫)

সারা গ্রামে আবার পড়ে গেল হৈ চৈ। সমরের টাকা চুরি যাওয়ার চেয়ে তার এই ছোট্ট মেয়েটির প্রতি মমতায় সকলে আশ্চর্য্য হল আরও বেশী। কেউই চাইলো না ওকে এড়িয়ে চলতে আর। দরদ আর সহানুভূতিতে সবাই করুণে লাগলো ঘনিষ্ঠতা।

বিশেষ করে মে'র মহলেই এদিক দিয়ে উৎসাহটা দেখা দিল বৈশী করে'। যারা সুগৃহিণী বলে' ছিলেন খাতা তাঁরা এসে দিয়ে গেলেন কি কি করুণে হবে তারই উপদেশ। আর লক্ষ্মীছাড়া বলেও ষাঁদের ছিল বদনাম তাঁরাও কেউ রইলেন না ছেড়ে কক্ষ। ঝুড়িগ্রমাণ বক্তৃতা দিয়ে গেলেন কি কি হতে পারে না তারই।

সমরেশের কাছে এ দুই-ই সমান। দিলে সে দু'দিকেই মনোযোগ।

দত্তগিন্নীর সাহায্য কিন্তু ছাড়িয়ে গেল সব কিছুকেই। তিনি এসে উপদেশ দেওয়ার আগেই কল্লের হাতে হাতে কাজ আরম্ভ। বলেন—দেখ বাবা সমর, আমি বলি কি ওর জন্তে এখন দরকার নেই তোমার কোনো জামা কেনার। শরীর অনেক জামা গেছে ছোট্ট হয়ে, সেগুলো দিয়েই আপাততঃ বেশ কিছুদিন চলবে কাজ। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতের পুঁটলিটা খুলে বের করলেন, লাল, নীল, সাদা আরও কত রকমের জামা। তারপর বলেন—বাড়ীতে দিয়ে এসেছি জল গরম কর্তে। একবার দিতে হবে ওকে সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে, অতএব দাঁও একবার নিয়ে যাই।

অল্প কেউ হলে হয়তো সমরেশ চাইতো না তার হাতে খুঁকীকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু দত্তগিন্নীর ব্যবহারে ওর তাঁর ওপর জন্মে গিয়েছিল একটা বিশ্বাস। তাই কোন কথা না বলে ছেড়ে দিলো তাঁর কাছে।

খুঁয়ে মুছিয়ে খুকীকে নিয়ে যখন দত্তগিন্নী আবার এসে ঢুকলেন ঘরের ভেতর, তখন সমরেশ দৌড়ে গিয়ে তাকে নিল নিজের কোলে। খুকী এবার দুহাতে তালি বাজিয়ে করতে লাগলো কতকগুলো অসংলগ্ন আওয়াজ। সমরেশের আনন্দ আর বাধা মানতে চায় না। সেও করতে আরম্ভ করল আদর।

দত্তগিন্নী এবার বলতে আরম্ভ করলেন—ছেলেমেয়ে মানুষ করা তো আর বাপু ব্যাটাছেলের কর্ম নয়। স্ত্রীরা সব সময়ে আমার নিও পরামর্শ। তা না হলে কোন দিন ফেলবে একটা কি বাধিয়ে।

সমরেশ এ কথায় একটু হাসলো মাত্র।

দত্তগিন্নী বলেই চললেন—সময়ে সময়ে ব্যাজারও হবে হ'তে। কিন্তু তাতে অর্ধেক হ'লে চলবে না একটুও। মাঝে মাঝে একটু আধটু শাসনও হবে কর্তে। নয়তো খালি আস্কারা পেলে পরে সামলানোও হবে দায়—আর যখন তোমার থাকবে কাজকর্ম তখন ওকে চেয়ারের পায়া-টায়ার সঙ্গে রাখো বেঁধে। তা না হ'লে জালাতন করে দেবে সবই করে পণ্ড করে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা করবো—সমরেশ দেয় উত্তর।

আচ্ছা, বাবা, ভালো মনে পড়েছে, ওর ত একটা নাম চাই—

—আমি দিয়ে দিয়েছি।

—কী?

—বিজয়িনী।—ও এস নিয়েছে আমার সব দৈন্ত সব হতাশা করে' জয়। হেরেচি বলে আমার আর হয় না মনে। ভাবি সব কিছুই বদলে পেয়েছি ওকে এইটাই আমার বিজয়ের গর্ব—সমরেশ বলে।

—তা ভাল, তা ভাল। কিন্তু আমি বলছিলাম যে তোমার দেওয়া নাম থাকুক। কিন্তু আমি একে কোন একটা ঠাকুর দেবতার নামে যদি ডাকি তাহলে কি তোমার আছে কোন আপত্তি? মেয়েছেলের নাম অমন খটমট গোছের আমার ঠিক ধাতে সহাবে না। আমি চাই ওকে 'লক্ষ্মী' বলে ডাকতে।—দত্তগিন্নী বলেন।

—যিনি যা বলেই ডাকুন না কেন, আমার তাতে

কোনই আপত্তি নেই। কেবল আমার কাছে থাকবে ওর ঐ নামটা,—সমরেশ উত্তর দেয়।

একটু থেমে দত্তগিন্নী আবার বলেন—দেখ বাবা, তোমাকে আগেও বলেছি, আজ আবার বলছি, এখন থেকে ঠাকুর দেবতা ধর্মকর্ম এসব দিকে একটু মন দাও। বয়েস তো চলেছে এগিয়ে—চিরকালের জন্তে আসনি' এখানে। পরকালের পথে যাতে থাকে না কোন বিষ় সেটা তো দেখতেই হবে আর তা'ছাড়া নিজের কথা যদি না-ই ধর, সেকথা না হয় দিলুম ছেড়ে কিন্তু বাচ্চাটার যখন নিয়েছ ভার তখন দেখতে হবে তো যাতে তার কিছু না হয় ভালোমন্দ। বুঝল—আমার কথাটা একটু তলিয়ে বুঝে দেখ'। আর দেখ' শচীকে পাঠিয়ে দোব'খন তোমার এথেনে। খুকীর তো একজন খেলার সাথী দরকার। তা না হলে আবার একটা অস্থখ বিষখও পারে হয়ে পড়তে।

দত্তগিন্নী চলে গেলে পর সমরেশ বসে বসে কর্তে লাগলো খুকীর সঙ্গে খেলা।

(৬)

বিজয়িনীর সংস্পর্শ এসে সমরেশকে আর একবার হতে হয় বের নিজের নিভৃত জীবন থেকে। মাহুষের সঙ্গে সঙ্গে দিনে দিনে হতে' থাকে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন। যখন সে জমিয়েছিল সোনার কাড়ি তখন তার প্রয়োজন হয়েছিল নিরঞ্জনতার। কেননা দিনের আলোয় টীকাগুলায় পারতো না দেখতে মুখ। পাখীর গান, মাহুষের ভাষা, সারা প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে পারতো না তাদের মুখে ভাষা।

কিন্তু খুকীর জীবনের প্রতিটি ছন্দে অল্পবর্ণিত হতে ওঠে কামনার উজ্জল বহ্না। সব কিছুতেই আছে তার সাড়া। দিনের আলো, মাসীর টান, এ সবের প্রত্যেকটির কলতানে জাগিয়ে তুলতে নতুন নতুন আনন্দের আশ্বাস।

আগে সমরেশের চিন্তাধারা ঘুরতো ফিরতো একই আবর্তে, পড়তে গিয়ে সেই একই অর্থের পারাবারে যেখানে মেলে না কোনই কুল। কিন্তু বিজয়িনীর পরিবর্তনশীল

মনের হরষে সে প্রতিমুহূর্তে পরিচয় পেতে লাগলো নব নব বিকাশের।

ও জানতো খালি কাজ আর কাজ। নিজের মনো-বৃত্তিকে করে তুলেছিল অন্ধ স্বাদবিহীন, কিন্তু এখন যেন দরকার হয় অবকাশের, চায় সেই অবসরকে কর্তে নতুন রূপে সজীবিত।

প্রায়ই দেখা যায় সে বিজয়িনীকে নিয়ে মাঠে, বোপের ধারে, ফুল গাছের আশে পাশে নদীর তীরে বেড়ায় ঘুরে। মাঝে মাঝে দেয় খুকীকে ছেড়ে। সেও এ গাছের ছেঁড়ে পাতা, ও গাছের তোলৈ ফুল, প্রজ্ঞাপতিকে ধরবার জন্তে ছোট্টে তার পিছনে। মুখে অফুরন্ত হাসির কলতান। যদি ডেকে ওঠে একটা পাখী ও অমনি করে তার অঙ্ককরণ। তারপর দৌড়ে গিয়ে সমরেশের কোলে দেয় গড়গড়।

দুরন্তেরে যাবার সময় সমরেশ খুকীকে কোলে করেই পড়তো বেরিয়ে। গ্রামে কারুরই বাড়ীতে চাই তো না রেখে যেতে। এমন কি দত্তগিন্নীর অতিরিক্ত গীড়াগীড়ি সত্ত্বেও আশপাশের গ্রামগুলোতে সমরেশ আর খুকী হয়ে

পড়ে বিশেষ পরিচিত। পথে ঘাটে যেই পড়তো সাম্নে সেই করতো খুকীকে আদর। হয়তো দিতো কিছু খাবার নয়তো খেলনা। এতে করে মাল্লুষের সঙ্গে যোগসূত্র বাড়তে থাকে সমরেশের। সময়ে সময়ে কোন কোন গাঁয়ে গিয়ে বসেও কারও বাড়ীতে রুত ছচারটে কথাবার্তার আদান প্রদান।

আজকাল জগৎটা আবার ওর কাছে ঠেকে মধুময়; এখন চেষ্টা করে কোথায় কি ভালো আছে তাই করতে নংগ্রহ। বিজয়িনী যেন তার চোখের আঁধার কাটিয়ে এনে দেয় নতুন আলো।

প্রাচীন যুগের কথা-সাহিত্যে মাল্লুষকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করার জন্তে দেবদূতের আগমনের পাওয়া যায় উল্লেখ। আধুনিক কালেও আমরা দেখি মাল্লুষ বেঁচে ওঠে নতুন ভাবে আত্মার মরণ হতে। কিন্তু দেবদূতের আগমন-বার্তার হয় না কোনই ঘোষণা। সমরেশের জীবনে শিশুর স্বর্গীয় হাসির মধ্যে দিয়েই যে দেবদূত করেছিলেন পদার্পণ এটা একেবারে নিঃসন্দেহ। (ক্রমশঃ)

দুঃখী সংসার

শ্রীমতী কমলা দেবী

দুখ ভরা এই সংসার বলে

তাই কি আমরা হাসব না,

কুটিলতা-হল-প্রতারণা আছে

বলিয়া কি ভাল বাসবো না।

ক্ষণিক বলিয়া এ জীবন মোর

কাটাবো কি শুধু ফেলি আঁখি লোর?

প্রতিপদ চাঁদ বলে' কি বারেক

সুনীল আকাশে ভাসবোনা?

কাঁটার মাঝে মিত্য ফোটে

রঙ্গিন গোলাপ ফুল

তাই কি মোদের ভাবতে হবে

গোলাপ বিধির ভুল?

রৌদ্র এবং মেঘের মাঝে

ইন্দ্রধনু বেশ ত রাজে,

ঝঞ্ঝা-ঝড়ের মধ্যে বিধির

সৃষ্টি কি অতুল।

“মা”

স্বর্গীয়া নির্মলা বালা সোম

(কত্তার অঞ্জলি)

লোকে বলে “যার মা নাই তার কেউ নাই”। আমাদের মা বিগত ৮ই জানুয়ারী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের “মা নাই” একথা আমরা একবারও মনে করি না। এ ছুটি চর্মচক্ষে আর তাঁকে দেখিতে পাই না বটে কিন্তু তিনি অতি নিকটেই আছেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। এ বিশ্বাস আছে বলিয়াই অশ্রুজলের মধ্যে আমাদের সাহসনার অভাব নাই। “ঈশ্বর দিয়াছিলেন, ঈশ্বর লইয়াছেন, ঈশ্বরের নাম ধরা হউক”।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল নির্মলা বালা মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তিনি তাঁহার পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা স্বর্গীয়া কালীতারা দেবীর হিন্দুগৃহে জন্ম। সতের বৎসর বয়সক্রমকালে উমেশবাবু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। সে কালে উচ্চবংশের উচ্চকুলের সন্তানের পক্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম অবলম্বন করার বাড়া অপমান আর কিছু ছিল না। বহু ক্রেশ, তাড়না ও কষ্ট উপেক্ষা করিয়া উমেশচন্দ্র খ্রীষ্টকে বরণ করেন। ধন, কুল, আত্মীয়-স্বজন, পৈতৃক সম্পত্তি সকলি অবাধে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। খ্রীষ্ট-প্রেমের নিকট এ সব অতি তুচ্ছ বিবেচনা করেন। একা তিনি আত্মীয় স্বজন সব ছাড়িয়া গৃহত্যাগ করেন। তাঁর খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইবার তিন বৎসর পরে তাঁর নিজের মা তাঁর স্ত্রী কালী তারা দেবীকে তাঁর কাছে দিয়া যান। তারপর তাঁদের ছয়টা সন্তান জন্মে। নির্মলার জন্মের পূর্বে আরো দুইটা কন্যা মারা যান, এজন্য নির্মলা মা-বাপের বড় আদরের ছিলেন। শৈশব হইতে লেখাপড়ার প্রতি তাঁর এত বেশি টান ছিল যে পিতা মাতা শিশু কন্যার পড়াশুনা করার বিরোধী হওয়ায় নির্মলা তাঁদের অগোচরে টালীর উপর খোলার কুচি দিয়া লিখিয়া অক্ষর পরিচয় করিতেন; মা “নিরী” বলিয়া হাঁকিলেই জল দিয়া টালি মুছিয়া খোলার কুচি ফেলিয়া দিয়া মা’র সামনে হাজির হইতেন। বাবাকে অনেক বুঝাইয়া “বর্ণ পরিচয়” পাইয়া নিজেই তাহা পাঠ

শেষ করিয়া ফেলিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁদের বাবা ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহাদের ছাড়িয়া প্রভুর চরণে স্থান পাইলেন। জমিদারের সন্তান সামান্য প্রচারকের কাজ করিতেন। উপাঞ্জিত সামান্য অর্থে স্ত্রী ও চারিটা পুত্রকন্যা লইয়া দারিদ্রের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেন। নির্মলার বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর। সে দুর্দিনের ইতিহাস এ কাহিনীতে স্থান পাইবে না। সে বড় করুণ কাহিনী, সে আর এক রমণীর—কালীতারার ধৈর্য, বিশ্বাস ও ভালবাসার কাহিনী। নির্মলার বাবার মৃত্যুর পর লণ্ডন মিশনের বালিকা বিদ্যালয়ে কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে পাঠান হয়। সেখানে তিনি ‘মাইনর’ পরীক্ষায় সম্মানো সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দুই টাকা বৃত্তি পাইলেন। তারপর নয় বৎসরের সময় তাঁহাকে স্ত্রী চার্জের বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ ভর্তি করা হইল। তাঁহার বিধবা মায়ের এমন সঙ্গতি ছিল না যে বিদ্যালয়ের বেতন দিয়া নির্মলাকে পড়াইতে পারেন। তাই নির্মলা পিতৃমাতৃহীন বালিকা-দিগের তালিকাভুক্ত হইলেন। মায়ের কাছ ছাড়া হইয়া শিশু কন্যা অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়িলেন। বিদ্যালয়ে অনেক কাজ কর্ম বালিকাদিগকে নিজহস্তে করিতে হইত—বাসন মাজা, তেল বাতি সাজান, রান্নাঘরের কাজ করা, আসবাব পত্র ঝাড়া মোছা ইত্যাদি সকল কাজই নির্মলার ভাগ্যে জুটিল। বালিকা এ সকল কাজ করিতে, অনভ্যস্ত, সময়ে অসময়ে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। কিন্তু কখনও প্রতিবাদ করিতেন না। অন্যান্য বালিকারা দয়াপরবশ হইয়া শীর্ণ বালিকার এই সকল কাজ কিছু কিছু করিয়া দিতেন, নির্মলা তাঁর বদলে তাদের পড়া বলিয়া দিতেন। বিধবা মা কেবলমাত্র ১০ আট আনা পয়সা মাসে জল খাবারের জন্য দিতে পারিতেন, অর্থাৎ দৈনিক এক পয়সা মাত্র। পাঠক পাঠিকা একবার এই অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখুন, ঐ বাৎ একদিন যদি দুই পয়সার খাবার খাইয়া ফেলিয়াছেন তো তার পরদিন জলখাবার আর জোটে নাই। বিদ্যালয়ের আহাৰ্য্য অনেক সময়ে বড়ই খারাপভাবে তৈয়ারী

হইত, বালিকা তাহা খাইতে পারিতেন না। অনাহারে মাঠের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন। এত কষ্টের মধ্যেও তাঁর লেখা পড়ায় একদিনের জন্য শৈথিল্য প্রকাশ পায় নাই, একদিনের জন্য মায়ের কাছে 'চোখের জল ফেলেন নাই, পাছে মা কষ্টের কথা শুনিয়া বিদ্যালয় হইতে লইয়া যান।

প্রতি বৎসর প্রতি শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি প্রথম পুরস্কার পাইতেন। এই সব কারণে দিন দিন তাঁর দুঃখের অবসান হইতে লাগিল। তিনি সকলের প্রিয় সকলের আদরণীয় হইলেন। ১৮৮১ সালে ১৫ বৎসর বয়সের পূর্বেই 'এনট্রান্স' পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ১০৮ টাকা বৃত্তি পাইলেন। ১৮৮৩ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয়ের ২৫৮ টাকা, আর তাঁর নিজের বিদ্যালয়ের ১০৮ টাকা বৃত্তি অর্জন করিলেন। মায়ের, মেয়ের মুখে হান্তরেখা ফুটিয়া উঠিল। ১৮৮৫ সালে বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তখন তাঁহার বিবাহের কথা চলিতেছিল। তাঁর ভাবী স্বামী তখনও বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না থাকায় তিনি তাঁর নিজের পরীক্ষা দেওয়া সে বৎসর বন্ধ রাখিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর স্বর্গীয় যত্ননাথ সোমের সহিত তাঁর বিবাহ হইল। বিবাহের মাত্র ২০ দিন পূর্বে তিনি সুদীর্ঘ দশবৎসর পর তাঁর সাধের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন।

১৮৮৬, ১৮৮৮, ১৮৯০ সালে নির্মলার দুই কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা জন্মবার তিনমাস পরে এক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভার তিনি নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। সংসারের কাজকর্ম, নিজ পুত্র-কন্যার সকল দায়িত্ব, বিদ্যালয়ের সকল কর্তব্যের বোঝার চাপে আর অন্য কাজ করা কতদূর সম্ভব তা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, কিন্তু নির্মলা এ সবের মধ্যেও তাঁর অধ্যয়ন একদিনের জন্যও স্থগিত রাখেন নাই। ১৮৮৭ সালে স্বামী জী এক সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। স্বামী, জী একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কন্ভোকেশনে, বি. এর ডিগ্রী পাইলেন। এ অভিনব দৃশ্য সে যুগে একেবারে নূতন। অনেকে ধন্য ধন্য করিলেন। তারপর?

তারপর কি লেখা পড়া শেষ হইল? না, তাহা হইবার নয়। ষাঁর হৃদয়ে জ্ঞান-পিপাসা পর্বত-প্রবাহিনী নদীর ন্যায় প্রবাহিত তার গতিরোধ করার সাধ্য কাহারও নাই। ১৮৯১ সালে ইংরাজী সাহিত্য ও ১৮৯৪ দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। ভারতীয় রমণীর মধ্যে সর্বপ্রথম নির্মলাবালাই দুই বিষয়ে এম. এ. উপাধি লাভ করিলেন। তাঁর জন্মতিথিতে ভারতীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে একটি উপহার দিয়া লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবন "Was an object lesson of her Indian Sisters of the pursuit of knowledge under difficulties (অর্থাৎ বিধ্বাবাহার মধ্যে জ্ঞানার্বেষণী ভারতীয় ভগিনীগণের নিকট একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত)। আরো কত কি বলিয়া লোকে তাঁর প্রশংসাবাদ করিয়া লিখিয়াছে, সে সব তিনি কখনও কাহাকে জানাইতেন না। দৈবাৎ কাহারও চোখে পড়িলে সরাইয়া লইয়া বলিতেন "ও সব আলোচনা ক'রো না, গৌরব আমার কিছু নয়, সব ঈশ্বরের"।

যে বিদ্যালয়ের চালনার ভার সম্পূর্ণ তাঁর হস্তেছিল বিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সেই বিদ্যালয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম শ্রেণীর 'কলেজে' পরিণত হইল। যে শিশু-কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া সেই বিদ্যালয়ে তিনি প্রবেশ করেন, বিশ বৎসর পরে সেই কন্যা মায়ের সকল পরিশ্রম সার্থক করিয়া তাঁর নিজের কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। মায়ের জাহ্নতে হাত রাখিয়া "ক" "খ" উচ্চারণ শিক্ষা করিয়া মায়ের তত্ত্বাবধানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সব শিক্ষা লাভ করিয়া বি. এ. পরীক্ষা সেই মায়ের কলেজে, সেই মায়ের সাহায্যে শেষ করিল। ধন্য মাতা, ধন্য কন্যা! আর শুধু এই কন্যা নয় অন্য কন্যা ও একমাত্র পুত্রের লেখা পড়ার সকল ভার শুধু তাঁর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তারিও বি. এ. এম. এ. পড়ার সব সাহায্য শুধু তাঁর কাছে পাইয়া নিজেদের লেখাপড়া শেষ করিয়াছে।

এই সকল কঠিন পরিশ্রমের ফলে ৪০ বৎসর বয়সের পরেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বিদ্যালয়ের কাজ বা সামাজিক অন্যান্য সকল কাজ হইতেই তখন তাঁকে অবসর গ্রহণ

করিতে হয়। তখন নিজের পুত্রকন্ঠার সংসারের মধ্যে আসীন হন। সংসারের ছোটবড় সকল কাজে তাঁর স্থনিপুণ হস্তের রেখাপাত হইত। কখনও কোনও কাজকে তিনি ছোট কাজ বলিয়া অবহেলা করেন নাই। রান্নাঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার তত্ত্বাবধান, দৈনিক হিসাব-পত্র নিয়মিত রূপে রাখা, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্যা ইত্যাদি সকল কাজে তাঁর স্থনিপুণতা ও বুদ্ধির প্রখরতা প্রকাশ পাইত। শরীর নিতান্ত অস্থূল থাকা সত্ত্বেও মানসিক বল ও ধৈর্যের গুণে অলসভাবে বসিয়া বা অথবা গল্পগুজব করিয়া কখনও সময় কাটাইতেন না। তাঁর পুত্র কৃষ্ণাঘর কার্যস্থান হইতে গৃহে ফিরিয়া মাকে নিত্য তাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত দেখিত। নিজে বসিয়া তাহাদিগকে আহাৰ না করাইলে তাঁর তৃপ্তি হইত না। শত কর্তব্যের মধ্যেও এই কাজটি তিনি শেষ পর্যন্ত করিয়াছেন। আহাৰ্যের সকল বস্তুর প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল, পাছে দাস দাসীরা অবহেলা করিয়া কিছু নষ্ট করিয়া কাহারও স্বাস্থ্যের বিষয় ঘটায়।

সংসারের এত পরিশ্রমের মধ্যেও তিনি লেখাপড়ার অগ্রসর হইয়া আসেন নাই। তাঁহার রচিত ছয়খানি বাংলা গ্রন্থ তাঁর মনোভাব ও মনের গতির পরিচায়ক। এই গ্রন্থগুলিতে গল্পছলে বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে ধর্ম শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা প্রচার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর শুধু বাংলা গ্রন্থ নয় কলেজের ছাত্রদের শিক্ষার সাহায্য-কল্পে দুইখানি ইংরাজী কবিতার (Scott's lady of the lake, Palgrave's selection from Tennyson) অর্থবিশ্লেষণ পুস্তক (avnotation) তাঁর ভাই সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে রচনা করিয়া ছাত্রমহলে খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর যখন চোখের দৃষ্টি বড়ই ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তখন নিজের লেখাপড়া স্থগিত রাখিয়া তাঁর একমাত্র পৌত্র ও একমাত্র পৌত্রীর লেখাপড়ার ভার লইলেন। তাদের অক্ষর পরিচয় হইতে শুরু করিয়া নিজেই সব তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ১৯৩৮ সালে সেই পৌত্র এবং পৌত্রী তাঁহার সকল পরিশ্রম সার্থক করিয়া সম্মানের সহিত বি. এ. ও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তিনি বলিলেন “আমার কাজ শেষ হলো।” সত্যই ঈশ্বর তাঁর কথামত তাঁর কাজ শেষ হইতে দিলেন। কয়েকমাস পরই নিজের দাসীকে নিজের ক্রোড়ে বিশ্রাম দিলেন।

এই তো গেল তাঁর প্রতিভা, তাঁর মনীষা, তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি পরিশ্রমের তালিকা। কিন্তু সবে উপরে সবে বাহিরে তাঁর যে নিহৃত জীবন যে আধ্যাত্মিকতা তার খোঁজ তো কেউ পায় নাই। নানা, একথা বলায় সত্যের অপলাপ হয়। যে তাঁর সংসর্গে আসিয়াছে, যে তাঁর স্পর্শ অনুভব করিয়াছে নিজের জীবনে, সেই তাঁর সে জীবনের সার্থকতা ও গভীর ধর্মভাবের সঙ্কেত সাক্ষ্য দিতে পারে। সংসারে এমন কোনও কোনও পুরুষ ও রমণী জন্মগ্রহণ করেন যাদের সংস্পর্শে অল্প জীবন স্বতঃই উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে। যাদের পুণ্যস্পর্শ অন্তরে ভগবানের আরো নিকটবর্তী করে। যাদের সহবাসে মানুষ মানুষ হয়। নির্মলাবালা সেই শ্রেণীর নারী ছিলেন; তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, তাঁর নাম যশ, তাঁর অর্থসামর্থ্য তিনি কখনও নিজের বলিয়া ভাবিতেন না। ঈশ্বর সে সব পরার্থে শুধু তাঁর নিকটে গচ্ছিত রাখিয়াছেন এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের বলে সব সময়ে নিজের জীবনের প্রভাব অপরকে ঈশ্বরের নিকট টানিতে পারিতেন। এই তাঁর জীবনের বিশেষত্ব ছিল। ভগবানে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। ভগবান তাঁহার নিকট স্বদূর প্রবাসীর স্নায় শুধু সময় বিশেষের অতিথি ছিলেন না কিন্তু নিত্য বর্তমান, নিত্য পূজনীয় জীবনের কর্তব্যরূপে তাঁর জীবন-তরীর হাল ধরিয়া ছিলেন। সেই কর্তব্যের চালনা ব্যতীত একহাতও সে নৌকা চালিত হইত না। জীবনের সকল কাজে, সকল সমস্তায়, সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে নির্মলাবালা তাঁর প্রভুর আদেশ ব্যতীত একপদও অগ্রসর হইতেন না। তাঁর পুত্র কন্ঠা তাঁর নিকট পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিতেন, “দাড়াও, আমি আমার প্রভুর সঙ্গে পরামর্শ করে তবে তোমাদের জানাব।” তারপর যা আদেশ দিতেন ছেলে মেয়েরা সেই আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইত। প্রত্যহ সকল কাজের আগে তাঁর ধর্মালোচনের সময় নিরূপিত থাকিত। কোনও কিছুতেই সেই সময়ে তাঁকে পাওয়া যাইত না। তিনি বলিতেন, এই তাঁর সারাদিনের বদ-সঞ্চয়ের সময়, এই তাঁর দৈনিক কাজের ধারা নির্ণয়ের অবসর। এ অবসর খাটো করিলে সব কাজ খাপছাড়া এলোমেলো হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। এ সময়টুকু হেঁট

তাকে বিরক্ত বা ব্যস্ত করিত না। এইটুকুর পর প্রসন্ন-বদনে তিনি সকলের সেবা করিতেন। দীন দুঃখী, দাস, দাসী, আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকে তিনি স্নেহশীলা জননীর আশ্রয় পালন করিতেন। ধনী বা বিশিষ্ট ব্যক্তির আরাধনা ও দরিদ্রের প্রতি উপেক্ষা এ তাঁর নিকট বিষময় বোধ হইত। তিনি বরং দীন দুঃখীর প্রতি অধিকতর স্নেহপরবশ ছিলেন। কেহ ভিক্ষা করিতে আসিলে প্রতারণিত হইয়াও তাহাদের সাহায্য করিতেন। এ বিষয়ে কাহারও মানা শুনিতেন না। তিনি জীবনের পথ যতই অতিক্রম করিতে লাগিলেন, পার্থিব বাসনা তাঁর ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর রেখায় বিলীন হইতে লাগিল। তখন ভগবৎ চিন্তা ও ভগবৎ ভাবনাই তাঁর জীবনের সার হইয়া দাঁড়াইল। তখন জীবন হইতে যেন তাঁর আরাধ্য ঐশ্বরের জ্যোতিঃ বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। সকলে আবেগে বিমোহিত হইতে লাগিল। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর কত লোকের মুখে শুনিয়াছি “আপনার মার সঙ্গে কথা ক’য়ে কেমন নূতনভাব যেন মনে এসেছে। তাঁর ঈশ্বরভক্তি শ্রীতি এত স্বন্দর যে সে ভাব আমাকে বড়ই স্পর্শ করেছে। আবার শীঘ্র তাঁর কাছে আসবো, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো।”

তাঁর সংসার-প্রবাসের দিন সাক্ষ হইয়াছে। বহু প্রয়াসেও সে দিন আর একদণ্ডও বৃদ্ধি করা গেল না। এই ডিসেম্বর তিনি সামান্য সর্দি জরে শয্যাগ্রহণ করিলেন। সেই সামান্য পীড়া ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতর রূপ ধারণ করিল। শত চিকিৎসা, দিবারাত্রি প্রাণপণ পরিশ্রম সকলি ব্যর্থ করিয়া চাই জাহ্নবীর তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। হিন্দু চিকিৎসক যিনি এই রোগশয্যায় দিবারাত্রি তাঁর চিকিৎসা করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন “কাদেন কেন, মা তো এক পলকের মধ্যে স্বর্গে চলে গেছেন। শত সহস্র মৃত্যু আমি স্বদেশে বিদেশে দেখেছি কিন্তু এমন ভগবৎ প্রেমিক আর দেখি নাই, এমন saturated with religion (ধর্মে নিমজ্জিত) আর কাউকে দেখি নাই।” তাই বলি তিনি এখন প্রভুসঙ্গ লাভ করিয়াছেন। যাদের রাখিয়া গিয়াছেন তাদের হৃদয়াকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু মেঘের অন্তরালে ঐশ্ব আছেন, দীপ্তি আছে, মা আছেন এ বিশ্বাস তাদের আছে। এ বিশ্বাস পাথের করিয়া তারা যেন জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি চলিতে পারে, এ আশীর্বাদ বন্ধু-বান্ধব করিবেন, এই তাদের দুর্দিনের ভিক্ষা। ইতি—

নীরজবাসিনী সোম



আবজ্ঞনা ও সংক্রামক ব্যাধি

প্রথমেই বলা ভাল যে একদিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলবার প্রতিশ্রুতি দানের পর থেকে আমি বেশ সহজ বোধ করিনি, প্রথমতঃ আমি যে বিষয় নিয়ে আপনাদের কাছে দাঁড়িয়েছি, সে সম্বন্ধে সাধারণের ধারণার বিষয় কিছু না বলাই ভাল। আরও এক-কথা—রেল, আদালত, পুলিশ ও কর্পোরেশন সাধারণের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত; এই কয়টা বিভাগের কোনটিই লোকে ভাল চোখে দেখে না, কিন্তু পুলিশ বা আদালত সম্বন্ধে কিছু বলা নিরাপদ নয় বলেই হয়ত কর্পোরেশনের বিষয়ে লোকের যা ধারণা তা হাটে মাঠে সেকথা প্রায়ই শোনা যায় এবং তা শুনে আমাদের উৎফুল্ল হবার কথা নয়। কর্পোরেশন আমরা অর্থাৎ দেণবাসীরাই চালাই এবং এর ক্রটির জন্ত কারও দায়িত্ব কম নয়; তারপর আমার লেখবার বিষয় ভাল হয়েছে তাও মনে হয় না। পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানস্পদ বহু ব্যক্তি আছেন, যাদের কাছে শিক্ষা লাভ করতে পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। অতএব আপনাদের কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তথাপি আমি আজ আপনাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি তার কারণ শুধু এই যে, আমার ধারণা নগর-শাসন সম্পর্কীয় বহু সামান্য বিষয়ে, অনেক বোধ করি তুচ্ছ বিষয় মনে করেই ও তাহার গুরুত্ব জানেন না বলেই তা জানবার চেষ্টা করেন না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি—ধরুন আপনাদের বাটীর আবজ্ঞনা। দাসদাসী কোথায় আপনার বাড়ীর আবজ্ঞনা ফেলে, তদ্বারা আপনার প্রতিবেশীর অসুবিধা বা অনিষ্টের কিছু আছে কিনা, বিশেষ কারণের পর যথা গৃহে রোগী—এমন কি বসন্ত, কলেরা-রোগী বা প্রসূতি থাকলে, বাড়ীর দূষিত আবজ্ঞনার কি ব্যবস্থা হয়, আপনি সম্ভবতঃ সে সংবাদ রাখেন না। বিশেষ কারণ ঘটলে কর্পোরেশন-কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দ্বারা বহু বিষয় যেমন সংক্রামক রোগের সময় সতর্ক করা বা পানীয় জল সম্বন্ধীয় অনেক আবশ্যকীয় সংবাদ নগর-

ডাঃ শচীচন্দ্রনাথ দাস এম বি, ডি, পি, এইচ.

বাসীদের জানিয়ে দেন। আমরা কয়জন উহা জানবার চেষ্টা করি। এবং জানলেও আমরা কয়জন আমাদের বাটীর মহিলা ও পরিজনদের তাহা জানাই। অস্বীকার করবার উপায় নাই, আমরা কোনটাই করি না। করি না তার কারণ এই যে আমরা তার প্রয়োজন বোধ করি না। কেন করি না—কথার উত্তর দিতে গেলে হয়ত অপ্রিয় কথা বলতে হবে। আসল কথা কি জানেন, আমরা ভারতীয় ক্ষুদ্র বা সংস্কৃতি সভ্যতা বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি যে সব গাল-ভরা কথা বলে থাকি সেগুলির কাজের সময় কোন মূল্য আছে বলে আমরা মনে করি না, আমরা যে প্রাচ্য ও প্রাচ্যের মিশ্রণে আমাদের নৃতন করে গড়ছি তা যে কোন শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালীর সহিত কথা কইলেই বুঝা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন ধারা আমরা বেশী নিয়েছি তাহা আপনারা সকলেই জানেন। আমি এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে আমরা যে জীবন-যাত্রায় কখনও অভ্যস্ত ছিলাম না—আজ তাই আমাদের অভ্যাস করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বড় সহরগুলি যে প্রথায় শাসিত হয়, এ দেশে সেই সমস্ত প্রথা আমরা চালাচ্ছি। যাদের দেশ থেকে এই প্রথা আমরা পেয়েছি, তাঁরা নিজেদের শিক্ষা, সংস্কার, অভ্যাস এবং তাদের দেশের অবস্থা বিবেচনায় যে সব প্রথা সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মনে করেছেন সেই সকলই ভাল আদর্শ হিসাবে আমরা নিয়েছি, নিয়ে ভাল করেছি সন্দেহ নাই, কিন্তু এর সঙ্গে এর সাফল্যের জন্ত যে যোগ্যতা বা নাগরিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তা আমাদের অর্জন কর্তে হবে। সহর-বাসীরা নগর শাসনে কর্পোরেশনকে সাহায্য করবেন—“মিউনিসিপেল আইনের ধারাগুলি নিজেরা পালন করেও কোনও অনিয়ম হলে আমাদের তা জানিয়ে দিবেন।”

কারণ এই অল্পমান বা ভরসার উপর এই মিউনিসিপাল আইন রচিত। কর্পোরেশন বহু অর্থ ব্যয়ে ড্রেন পাইথানার জন্ত গঙ্গার জলের ব্যবস্থা করেছেন। এই ভরসায় যে

সহর বাসীরা এর দ্বারা পায়খানা এমন ভাবে রাখতে পারবেন যাতে অনেক সংক্রামক রোগের হাত থেকে পরিভ্রাণ পাওয়া যেতে পারবে। কিন্তু আমরা যদি তার ধোলাই যন্ত্রটাকে ভাঙা অবস্থায় ফেলে রাখি, তবে আমরাই আমাদের প্রাপ্ত ও প্রাপ্য স্বযোগ নিলাম না। এই কারণেই সহরের ব্যবস্থা বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি জানা আমাদের প্রয়োজন।

কর্পোরেশন আমার কাছে কতটুকু দাবী করতে পারেন ও আমার কোন অভ্যাস বা কার্যের উপর আমার নিজের ও আমার পাড়ার লোকের স্বাস্থ্য কতটা নির্ভর করে, এ সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু সহরবাসীদের এ বিষয়ে তৈরী করে বড় সহরে বসবাসের যোগ্য নাগরিক করে তোলার দায়িত্ব কর্পোরেশনও অস্বীকার করতে পারেন না। নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা ও

জ্ঞানে যারা শ্রেষ্ঠ অঙ্গলোকের সামান্য দোষে একটি পল্লী বা সহরের এক অংশের স্বাস্থ্য বিপন্ন হতে পারে, এ কথা প্রয়োজন মত তাঁরা তাঁদের বুঝিয়ে দিলে, অথবা সে বিষয়ে কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিশেষ সাহায্য করা হবে। কর্পোরেশনের সঙ্গে প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যক্ষ যোগ সাধন করবার জন্য প্রত্যেক পল্লীতে একটি স্বাস্থ্য-সংজ্ঞ প্রতীষ্ঠার ব্যবস্থা করে, কংগ্রেস কর্পোরেশন নাগরীকদের বিশেষ ধন্যবাদার্থ হয়েছেন। প্রত্যেক পল্লীর শিক্ষিত ও অগ্রণী যারা তাঁরা যদি তাঁদের পল্লীতে এই নাগরীক তত্ত্ব স্বযোগ ও সুবিধা মত প্রকাশ করেন ও সংক্রামক ব্যাধির প্রসার ঘটলে, পল্লীবাসী যাতে, কর্পোরেশন-বহু ব্যায়ে যে সব প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করেন সেগুলির স্বযোগ নিতে লোককে উৎসাহিত করেন, কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের সংক্রমণ রোধের চেষ্টা ও রোগরোধ করবার চেষ্টা তবেই সফল হতে পারে ॥

উৎকেন্দ্রিক

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম, এ

চলতি পথে সবাই চলে—

ভিনপথে ভাই, চ'লবো আজি,

মনের মাঝে কোন সে ক্ষাপার

একতারাটি উঠছে বাজি'।

সবাই চলল জলের মত

একটি দিকেই ধায় নিয়ত,

এমনি সোজা রাস্তা ধ'রে

নইকো যেতে মোটেই রাজি।

তোমরা যখন হিসাব দেখ

তখন আমি কাব্য লিখি,

তোমরা চালাক? অবোধ আমি?

হয়ত এটা বলছ ঠিক-ই!

নধর দেহে ছুলিয়ে ভুঁড়ি

তোমরা হাঁকাও মোটর 'জুড়ী',

রমার আশিস তোমরা কুড়াও

আমি তাহার পাইনা সিকি।

তবু আমার প্রাণের খুশী

কানায় কানায় উপচে পড়ে,

একটু হাসি একটু দরদ—

তাতেই আমায় তৃপ্ত করে।

রূপার চেয়ে ফুলের মালা

তাতেই আমার জুড়ায় জ্বালা;

আমার বিভব ছড়িয়ে আছে

প্রকৃতির এই খেলার ঘরে।

করবে। সজ্জের সদস্যগণ এ কারণে অশেষ প্রাণসাহস, ও ধন্যবাদার্থ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা চলতে পাবে, কোন নীতি-যুক্তির বলে, কোন ভাব-ধাধায় জলমগ্ন-পরিভ্রাণের অচ্যুতানে শুকনো ডাঙ্গার উপর “বন্ বন্ সন্ সন্ চোঁ-চোঁ দোঁ-দোঁ” — স্পোর্টস প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেছেন কর্তৃপক্ষ? অজুহাত হয়ত যা-ই-একটা কিছু হ’তে পারে। স্পোর্ট গের আবশ্যকতা, সার্থকতাও হয়ত স্বীকার্য নয়। কিন্তু জলমগ্নকে রক্ষা-কল্পে, সঙ্কটভ্রাণের উপায় নির্ধারণে যে সজ্জের প্রতিষ্ঠা, সে সজ্জের মানুষ-দোঁড়টা যে অমূলক অবস্থা নয়—প্রতিকূল অবস্থাই, এটা বুঝতে পারা অত্যন্ত সহজ। কর্তৃপক্ষ ভাগীরথীগর্ভে মগ্ন মজ্জমান প্রাণীকে রক্ষা করবার কৌশল দেখাবার যদি ব্যবস্থা করতেন, জাল ফেলে টেনে তোলা, স্প্যানিয়েল প্রভৃতি কুকুর ছেড়ে থেলা দেখাতেন, লাইফ-বয়া, লাইফ-বোট প্রভৃতির সাহায্যে জলমগ্নকে উদ্ধারের দৃষ্ট দেখাতে উদ্যোগী হ’তেন, জলে উল্লফন, সন্তরণ, ফাষ্ট এন্ড এফ্ এই সম্পর্কীয় নানা বিষয় দর্শকগণের চক্ষুর উপর ধরে দিতে পারতেন, তবে এত বড় জিনিসটার গুরুত্ব অধিকতর উপলব্ধি করত সমবেত জনসভ্য। শোভনও হ’ত সে সব, আর বহুলোকের মন ও দৃষ্টি আকর্ষিত হ’ত তা’তে। সেই সঙ্গে ঐ মানুষ-দোঁড় ও তথাকথিত স্পোর্টস থাকত যদি, সেটা রকম হিসাবে না হয় ধরে লওয়া যেতে পারত। ওটায় কারা আপত্তির কারণ হ’তনা বোধ হয়। শরীর, স্বাস্থ্য গ’ড়ে তোলবার জন্ত স্পোর্টস এর বিরুদ্ধে বিজোহ ঘোষণা করা চলে না আদৌ। কিন্তু থান্ ভান্তে শিবের গীতের মত সজ্জ-কর্তৃপক্ষের এ কি ব্যবস্থা? নানা জনপদ হ’তে নানা শ্রেণীর নরনারী রাজার বিলীয় ধানীতে আসে পর্কে-অপর্কে-গন্ধা-স্নান করুতে। ত’তে দৈনন্দিন দৈব দুর্কিপাক-ঘটনা খুব সম্ভবপর আর ঘটেও থাকে। একপক্ষে ভাগিরথী-সজ্জের প্রতিষ্ঠায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচাটা খুবই স্বাভাবিক। এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি যা’তে হৃদয় হয়, সেটা আমাদের ঐকান্তিক কামনা। বার্ষিক অধিবেশনে কলিকাতার জনপ্রিয় প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত রঞ্জিত গুপ্ত সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। স্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণ করুতে স্বীকার করেছেন বহুমানভাজন

শ্রাব্ মন্থনান্থ যুগোপাধ্যায়। বহু অক্লান্ত কর্মী জনসেবক এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন শুনে আমাদের আশা ও ভরসা বৃদ্ধি হ’ল। বার্ষিক অধিবেশনে একটা স্বকল্পী বালিকা যে হৃন্দর গানটা গেয়েছিল, আমরা তা উদ্ধৃত করি :—

ছালোকে অলকানন্দা তুলোকে ভীষ্ম-জমনী,
মহাকালের জটাজালে তুমি শিব-সিমন্তিনী।
ভাগিরথী, ভোগবতী

জাহ্নবী পরমাগতি
রিষু-পাদোদ্ভবা গঙ্গে মুক্তি-ধারা প্রবাহিনী।
জবময়ী তব কোলে

• • • মরণের দোলা দোলে
মত্তকরী জনপদে ভাঙ্গাও গো তরঙ্গিনী।
ভাগিরথী-সম্মু আজি—

• • • রঞ্জিত কুহুম-সাজি—
আনিয়াছে তুঁষিবারে তোমারে গো স্রোতস্বিনী—
গুপ্ত-বাণী বাক্ত পদে প্রসীদ বরদায়িনী।

—•—

কোলে আমাদের দেশে বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে দেশীয় শিল্প ও রক্ষন বিচার আদর ছিল খুবই বেশী। বধু নির্বাচিত হ’ত অশ্রান্ত গুণের সঙ্গে ঐ দুই বিচার পরিচয় ও পরীক্ষা দিয়ে। একালে যুগধর্ম্য ক’রে দিয়েছে সব ওলটু পাগট। তা’র ফল হয়েছে সকল দিক দিয়েই মন্দ। প্রতীচ্য শিল্পের প্রভাবে দেশীয় শিল্প এক প্রকার উপেক্ষার বস্ত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও সে শিল্প প্রতীচ্য ছাঁচের অপেক্ষা কোন অংশেই অ-গৌরবের নয়। অনেক গৃহস্থ-পরিবারে অমূল্যবস্তুর ফলে হীন বিলাসিতা প্রাশ্রয় পেয়ে মেয়েদের ক’রে তুলেছে অসঙ্গ, অকর্মণ্য অসুখ-ভাবাপন্ন স্বার্থান্ধ এবং কলহপ্রিয়া। রক্ষন-বিচার অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত; কাষেই হোটেল, রেস্তোরা, ময়রার দোকানে ভিড় জমে অসম্ভব রকমের। অন্ন-পাণে দেশে হচ্ছে লক্ষ্মীর অকুপা আর ছড়িয়ে পড়েছে নানা অসাধ্য রোগ। যা’রা ও পাগ থেকে মুক্ত, তাঁদের সংসার শান্তি-সুখের। আমাদের পুরাতন বন্ধু স্বর্গত রায় বাহাদুর গোকুল চাঁদ বড়ালের পুত্র শ্রীমান নিখিল চাঁদ বড়াল পুরাতন আদর্শ-

বাদের প্রবর্তনে সূচষ্ট হয়েছেন শুনে অমরা নিরতিশয় আনন্দলাভ করলাম। বড়ালের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক, ইহাই আমাদের কামনা।

—০—

স্বর্গত আচার্য্যপ্রবর গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আদ্য-শ্রাদ্ধ মহাসমারোহেই হ'য়ে গেছে বিগত ৩১এ জাহ্নবীরী তারিখে। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত হ'য়ে শ্রাদ্ধাঙ্গলী অর্পণ ক'রেছিলেন। ইটালী-চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ শ্রাদ্ধাবশে শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী রচিত যে “স্মৃতি-তর্পণ” শীর্ষক কবিতা শ্রাদ্ধ-সভায় বিতরণ ক'রেছিলেন, বহু বন্ধু বান্ধবের অল্পরোধে তা' উদ্ধৃত করি। কবিতাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু তা'র ভাব ও ভাষা সম্পদ কিরণ, পাঠক-পাঠিকা তা'র বিচার করুন।

জাতক-দ্যোতক তুমি ভারতের হে কৃত্তী সন্তান
সার্থক গিরিশ নাম, মূর্ত্ত-ত্যাগ, জ্ঞানী ও মহাত্ম।
বহুধারা প্রচারিছে—তুমি নাই—আছ বহুধায়,
কর্ম্মী, ধর্ম্মী, মৃত্যুঞ্জয় নিত্য রাজ স্মৃতি-মহিমায়।

—০—

সামান্য যে কেমন অসামান্যে দাঁড় করা'তে পারা যায়,

ডাক্তার রাম কিঙ্কর চক্রবর্তী'র পুত্র শ্রীমান অসীম প্রকাশের-উপনয়ন উপলক্ষে একটা ক্ষুদ্র কবিতায় তা দেখিয়েছেন বনফুলের মত একজন কবি। বিরাটকে তিনি কতটুকু পরিসরের মধ্যে প্রকাশ করেছেন, পাঠক-পাঠিকা তা'র পরিচয় লউন। কবি বলছেন—

ব্রহ্ময় ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা
যপ্ তপ্ সাধনায় ব্রহ্মের সন্ধান,
অমীরের নিদর্শন যজ্ঞস্থলে হে ব্রাহ্মণ
সদীম ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে তুমিই মহান।
স্বব্রহ্মক দ্বিজরাজ চক্রবর্তী তুমি,
জয়গানে প্রসূরিত স্বর্গ মর্ত্ত্যভূমি।

—০—

কলিকাতা-মিউনিসিপ্যাল আইনের যে একটা ওলট-পালট হ'বে, এ কথা আমরা ব'লেছিলাম বহুপূর্বেই। ও প্রায়শ্চিত্ত কোন্ পাপে, তা' কে বলবে? দেশ-প্রাণ স্যাব্ব স্বরেন্দ্রনাথ নানাভারে লাজিত হয়েও দেশ ও দেশের হিতে যে জিনিষ দান ক'রে অমর হয়েছেন, আজ আমরা তা' হারা'তে বসেছি যে কারণে, তার কৈফিয়ৎ দিবে কে?

—০—

দক্ষিণ ভারত পথে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

মাদ্রাজ

অরুণ আলোকের উদয়ের সহিত মাদ্রাজ সহরের গগন-লগন প্রাসাদ ও গির্জার চূড়া আমাদের চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। মাদ্রাজ সহরের মধ্যস্থলে মাদ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলের সেন্টাল ষ্টেশনে ডাকগাড়ী থামিল। প্লাটফর্মে অবতীর্ণ হইয়া গন্তব্য স্থানের কিঞ্চিৎ অল্পসন্ধান করিতেছি এমন সময় হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এক বাঙ্গালী যুবক কক্ষচারী আমাদের সহিত আলাপ করিলেন। আমাদের গন্তব্য স্থান প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ বিমান বিহারী দেব'র আবাস প্রায় ৪ মাইল দূরে সহরতলীতে গুনিয়া হতাশ হইলাম। তখন তাঁহার উপদেশ মত ষ্টেশনের সন্নিকটে নবনির্মিত ‘অধিকা ভবনে’ আশ্রয় লইলাম। সহরের মধ্যে মিণ্ট স্ট্রীটে একাধরনাথ স্বামী'র মন্দিরের সম্মুখে জিতল পরিস্কার

বাটী, বিজলী বাতি ও ঘরের সংলগ্ন স্নানাগার আছে; বাসা ও আহা'রের জন্ত প্রতিদিন ২২ দুইটাকা করিয়া প্রতিজনকে দিতে হয়।

মাদ্রাজ ইংরাজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক মহানগরী, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ তিনটি প্রেসিডেন্সীর রাজধানী। মাদ্রাজের লোকসংখ্যা ছয়লক্ষেরও অধিক। সম্বন্ধিতে, লোক সংখ্যায়, ও প্রতিষ্ঠায় কলিকাতা ও বোম্বাই দুইটি নগরের পরেই মাদ্রাজের স্থান। মাদ্রাজ ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক প্রাচীনতম কেন্দ্র। ১৬৩৯ সালে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে মিঃ ফ্রান্সিস সাহেব ফ্যাকটরী করিবার জন্য ৪০০ গজ লম্বা ও ১০০ গজ প্রস্থ একখণ্ড জমি খরিদ করেন। মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জ এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম, বোম্বাইয়ের ফোর্ট

মরণের রূপ

শ্রীঅমিয়চাঁদ বড়াল

মরণের যে রূপ থাকতে পারে, ছ' বছর আগে পর্যন্ত আমার তা ধারণা ছিল না। আমাদের দেহ যখন প্রাণ-হীন হয়, তখনই হয় মৃত্যু। পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশ গলে দেহটাকে হয় দাহ করা। প'ড়ে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি, ভস্ম ও পোড়া কাঠ কয়লা, কিরূপে যে তা' আবার রূপান্ত-রিত হয়, সেটা ছিল আমার কল্পনার অতীত। তখন ভাবতুম কবির কথাই সত্য, ভাষাই শাশ্বত।

“রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে....।

কিন্তু সহসা আমার সে ধারণা পাল্টে গেল কি ক'রে সেই কথাই বলি। দিনটা বোধ হয় ২০শে জানুয়ারী। বেলা হ'বে ১০টা ১১টা—বাবার সঙ্গে মায়ের কথা হচ্ছিল পশ্চিম-যাত্রার। যাওয়াটা এক প্রকার ঠিক হ'ল; কিন্তু আমার পড়ার ক্ষতি হ'তে পারে ভেবে তাঁরা একটু ভাবিতই হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে পড়াটা যে জ'মই উঠ'তে পারে না এই অজুহাতে আমাদের যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। শুধু ঠিক নয়, আমরা বেরিয়ে পড়লাম ৩০এ জানুয়ারী। যাত্রী হ'লেন দাদা মহাশয়, বাবা, মা, ভাই বোনেরা, সঙ্গ নিল একটা বাস্ত্র ঘুঘু। ঘুঘুটির প্রসিদ্ধি পদ্ম ঠাকুর ব'লে। গেলাম আমরা সাঁওতাল পরগণার এক পল্লীতে, নাম জামতাড়া। সেখানে ৪ দিন কাটিয়ে গেলাম আমরা শ্রীশ্রীকাশীধামে।

কাশী যাত্রার বর্ণনা একটু ছোট ক'রে বলার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। গাড়ী যখন মোকামা ছাড়ে তখন তিনজন রেল কর্মচারী কম্পার্টমেন্টের ভিতর প্রবেশ ক'র-লেন। তিন জনই ছিলেন different Nationality-এর লোক। তাঁদের মধ্যে একজনের মুখ দেখে পদ্মঠাকুর বলল “Mr. are you a widower?” কথাটা কেমন সত্য হ'য়ে গেল। আর যায় কোথায়—হাত দেখানর হিড়িক পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গাড়ী তখন পৌছে গেছে মোগল-সরাই জংশনে, রাত তখন ২১টা। রেল কর্মচারী তিনটা নেমে গেল মোগলসরাইয়ে আমরা নামলাম বেনারস ক্যান্টনমেন্টে। বাকী রাতটুকু রেলওয়ে বিশ্রামা-

গারে কুটিয়ে ভোর ৬টার আমরা উঠলাম গিয়ে গ্রাও হোটেলে।

বহুদিনের সাধ পূর্ণ হল, হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ পুরাণ-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বারণসী ধামে এসে। মনে পড়তে লাগল, রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা; হর হর ব্যোম ব্যোম শ.ব. মারাঠা সেনাপতি রঘুনাথজী ভোঙ্গলার-চুলক্ষ সৈন্যসহ দেবাদি-দেবকে পূজা করতে আসার কাহিনী। হিন্দু রাজা ও অন্যান্য কতজনের কত কীর্তিই।

তাঁড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ক'রে স্নানার্থে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাওয়া গেল। সেখানে গিয়ে লোকমুখে শুন্লাম, যদি কোনও লোক এই ঘাটে স্নান করেন এবং স্নানের পর দান করেন, তবে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। এ লোভ সম্বরণ ক'তে পারা গেল না। বাবার ছকুম নিয়ে দাদা মহাশয়ের হাত ধ'রে স্নান ক'রতে গেলাম। কাশীর গঙ্গার কি সুন্দর দৃশ্য! উত্তর বাহিনী, তা'র স্রোত। গঙ্গার দিকে পিছন ক'রলে কাশীর যে সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়, তা কবির কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার অতীত। শ্রীশ্রীকাশীধামকে অর্ধ চন্দ্রাকারে বেষ্টন করে গঙ্গা প্রবাহিতা এবং উহার তটের উপর সমগ্র সৌদ্রশ্রেণী মালার আকারে বিজ্ঞান। এই সব দেখতে দেখতে স্নান সাব্লাম আর কিছু দানও করলাম। তারপর দেবাদিদেবের দর্শনার্থী হ'য়ে গেলাম। একটা প্রবাদ আছে ‘গলি যেন কাশীর গলি’। এ কথা মানে আগে বুঝতে পারতাম না। মেয়েলী প্রবাদের অর্থটা এখন বুঝলাম। পথবাহীদের সদাই ভয়, কখন যে পকেট মারে, কখন গুণ্ডাম গুণ্ডামী, বিশ্বনাথের ঘণ্ডের ঘণ্ডামী পথিককে ক'রে তুঙ্গে বিপন্ন।

তারপর অগ্রসর হ'লাম মন্দিরপথে। মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মন ভ'রে উঠল অব্যক্ত আনন্দে। মন্দিরের মেঝেতে টাকা বিছান দেখেই আমার মনে হল, যোগীন্দ্র মুনিজ্ঞকে দর্শন করতে হলে হ'তে হ'বে নিরহঙ্কার; ধন দৌলত দিতে হ'বে লুটিয়ে, হ'তে হ'বে ত্যাগী। নতুবা

মুক্তি-মণ্ডপে স্থান হ'বে না, দেবাদিদেবের পূজা করা হ'বে ব্যর্থ, নিষ্ফল। কবির ভাষা আমার মনে পড়ে গেল :—

“অঙ্কুর ত পায়নাগাল যেথায় তুমি ফের

রিত ভূষণ দীন দরিক্র সাজে।”

সবার পিছে, সবার নীচে, সব হারাদের মাঝে”

শিব পূজা সেরে শিবানী অন্নপূর্ণার মন্দিরে গেলাম। তখন সবে মাত্র মায়ের আরতি শেষ হয়েছে। মায়ের প্রসাদ কিছু গ্রহণ করে গেলাম শ্রীশ্রীহর্গা মন্দিরে। তারপর ফিরলাম হোটেলে। পথে মা বাবার ছোট্ট রকটমর একটু ঝগড়া হ'ল, সেটা হচ্ছে বাজারে খেলনা প্রভৃতি কেনা ও বাজার বেড়ান নিয়ে। বাবা বললেন—“তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে যাচ্ছ, চুক্তি ছিল কোনও জিনিষ পত্র কেনার জন্য তুমি আমাকে পীড়াপীড়ি করবে না। চুক্তি অঙ্গীকার দেখছি ভঙ্গ করলে।” ঝগড়াটা অদূরেই বিনষ্ট হল। ভাবলাম বাঁচা গেল।

হোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, সারনাথ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত ভবন দর্শনে। প্রথমে গেলাম সারনাথ দর্শনে।

এই সারনাথ, যেখানে একদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ-সম্রাট তঁার নির্বাণ-ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। সারনাথের কাছে আরও কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার দর্শন করে আমরা ভিখারী রাজর্জয়ীর উদ্দেশে কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় প্রশংসা করলাম :—

“হে বোধিসত্ত্ব হে, মাগিছে মর্ত্য যে

ও পদ পঙ্কজে স্মরণ পুনরায়।”

তারপর গেলাম আমরা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নখর মানবের এক অবিদ্যমান কীর্তি। বৌদ্ধ যুগের নালান্দা দেখি নাই কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যে সে যুগের নালান্দার অপেক্ষা কম নয়, এটা যেন মনে হল। তারপর ভারত-ভবন দর্শন করে হোটেলে ফিরলাম। রাতটুকু বিশ্রামে কাটিয়ে পরদিন আগ্রার দিকে যাত্রা করলাম।

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য্য এই আগ্রায়। আগ্রাফোর্টে প্রবেশ করে একটীর পর একটা প্রাসাদ শ্রেণী পরিদর্শন করতে করতে কত স্থিতিই ভেসে উঠল

বিশ্বতির মাঝে। দেখলাম ইতমতউদৌল্লা—সেখানে গিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলাম :—

“আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগত-আলো নূরজাহান
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান
বাঙ্গলা থেকে দেখতে এলাম মক্কাভূমির গোলাপ ফুল
ইরাণ দেশের শকুন্তলা।—কই সে তোমার-রূপ-অতুল?”

তারপর গেলাম ফতেপুর শিকরী দর্শনে। লাল প্রস্তর নির্মিত ইহা এক পরিত্যক্ত সहर। ইহার বুলান্দ দরজা আজও বিজয়ী সন্ন্যাসী আকবরের জয় ঘোষণা করছে। ইহার মধ্যস্থ এক ফকিরের সমাধি-মন্দির অপেক্ষাকৃত সুসজ্জিত।



তিন বৎসর বয়সের লেখক

এর মধ্যে নবরত্নের সভামণ্ডপের শিল্প-মাদুর্য্য আজও শিল্পীদের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। প্রবাদ, জলের অনটন বশতঃ সন্ন্যাসী কর্তৃক এই সहर পরিত্যক্ত হয়।

তারপর এলাম আমরা তাজমহলে। কতদিনের সাধ, কত দিনের আশা আজ হ'ল সফল। কিন্তু আশ্চর্য্য পূর্বদিকের দরজা পার হ'য়ে আমার শ্রীচরণ আর অগ্রদূত হ'তে চাইল না। তাদের বিদ্রোহ দেখে আমি বিশ্বাসে নির্বাক হয়ে থাকলাম। কবির কত কত কাহিনী,

কত এলোমেলো ভাবই যে আমার মনে পড়তে লাগল
তার আর ইয়ত্তা নাই। মনে মনে স্থির করলাম অগে
সবটা বেড়িয়ে দেখে আসি তারপর এক জায়গায় বসে এর
রূপ নিরীক্ষণ করব। ফিরে এসে বাগানের কোণ
একখানা বেঞ্চের উপর বসে মনে পড়ল সত্যেন্দ্রনাথের
কয়টি লাইন :—

“বাদশাহী উবে গেছে, ডুবেছে বিলাস,
ভালবাসা জাগে শুধু আজ;
জেগে আছে দম্পতির প্রেম অবিনাশ—
জেগে আছে দেহী-প্রেম-তাজ।”

*

*

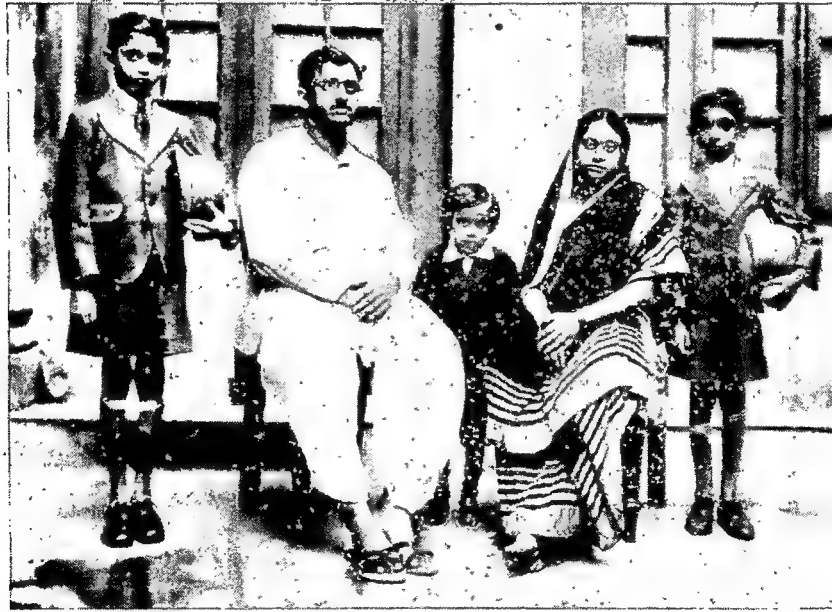
*

তারপর—

“সাধক পাইল ফিরে সাধনার ধন,
প্রেমিক পাইল প্রেমিকায়
হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন
কবরে মিলিল, কায় কায়;
ঘটাইল বারে বারে নিয়তি মিলন
জীবনে,—মরণে,—পুনরায়।”

সর্বজয়ী মরণকে আজ এখানে পরাজিত দেখলাম।
মরণের পরে যে মানুষকে অমর করে রাখা যায় এবং
তাকে এমন রূপও যে দেওয়া যায়, তাও আজ মর্মে মর্মে
উপলব্ধি করলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, জীবিত
মমতাজের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন এক সম্রাট সাজাহান
কিন্তু মৃত মমতাজের রূপে আকৃষ্ট বহুজন। *

•• দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালকের রচনা।



সুখী পরিবার

যুদ্ধ

ইতিহাসে পড়া গেছে, আমরা আর্ঘ্য। এসেছি মধ্য এশিয়া বা পশ্চিম এশিয়া থেকে। কতক বা চ'লে গিচ্ছল ইউরোপের দিকে। এ কাহিনী সত্য কি মিথ্যা, সেটার বিচার অপাততঃ না হয় নাই করা গেল। এইটুকুই শুধু বুঝতে হচ্ছে, সারা জগৎটার আমাদেরই আপনার জন ছড়িয়ে পড়েছে আশ্চর্য্য রকমে। তা' পারন্তেই হোক; রোম, গ্রীস, জার্মানী ফ্রান্স, ইংলণ্ডেই হোক, আর পাঞ্জাবের ভিতর দিয়ে এসে ব্রহ্মার্ত্ত, আর্ঘ্যাবর্ত্ত, দক্ষিণাপথেই ছোক। আমেরিকার নামটা পূর্বে বড় একটা কেউ কব্বত না। তবে প্রবাদ—ওটা মহীরাবণের দেশ। কুম্ভকর্ণের দেশ বললে মন্দ হ'ত না—“যুগের দেশ” প্রসিদ্ধিতে। সে যাই হোক, কলম্বস যে ও দেশটা আবিষ্কার করেছেন, সেটা ইতিহাস-পাঠী মাজেই অবগত আছেন। ইংলণ্ডের সভ্য ভব্য মানুষেরা সেখানে গিয়ে ঘর ঘর ত প্রথম বেঁধেছিলেন ভাল; কিন্তু পরে স্থানীয় লোক শাবালক হ'য়ে “আয় তবে যুদ্ধ করি” ব'লে কর্তাদের দেখা'ল বুদ্ধান্ত। কর্তাদের হা-ছতাশ এখনো ফুলিয়ে তুলছে রাষ্ট্রনীতির ইতিহাস। স্মরণ্য বলতে কোনো দ্বিধাই হয় না যে সারা পৃথিবী জুড়ে আমি আছি, আর আমার বলতে যা ‘কিছু, তা’ সবই আছে।

তবেই কথা হ'ল—এক আমি বহু হয়েছি। আর সেটা হ'তে হয়েছে প্রয়োজন মতে—এশিয়ার বাস্তু-ভিটার বসবাসের স্থান সঙ্কুলান করতে না পেরে। নতুন বস্তু করতে, দুঃখকষ্ট বড় অল্প হয় নাই। পাঞ্জাবে প্রবেশ ক'রে লড়াই করতে হ'য়েছিল ভীষণভাবে। যেখানেই আমাদের অন্তরঙ্গগণ গেছেন, সেইখানেই ধ্বংস হয়েছিল হাতীয়ার। তখনকার দিনে ত্রিশ বত্রিশ মাইল দূর থেকে কামান দেগে লড়াই ফতে করা চলত না। আর চন্দ্র-সূর্য্য-তারকার দেশ থেকে চোরা গোপ্তা মেয়ে আগুন বৃষ্টি করা সম্ভব হ'ত না ইন্দ্রের বজ্রাগ্নি ছাড়া। তখন হ'ত বীরের মত লড়াই। সে লড়ায়ে শত্রুকে কখনো ধ্বংস করেছি,

শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

আর কখনো বা শত্রুকে মিত্র করেছি। এমনটা করতে কব্বতে কেটে গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। কালের ব্যবধানে আমার বহুত্ব কোন্‌খানে যে হারিয়ে গিচ্ছল, তা'র সন্ধান রাখতে পারা যায় নাই, খুটি-নাটির ইতিহাস রাখটাকে অগ্রাহ্য করা হ'ত ব'লে। নৃতাত্ত্বিক, প্রত্ন-তাত্ত্বিক ষাঁ'রা, তাঁ'রা জিমন্যাষ্টিক ক'রে বহু টানটানিতে পুরাতন কথা ও কাহিনীগুলি বাহির কব্বার চেষ্টা কব্বছেন বটে, কিন্তু তাঁ'দের বিজ্ঞান চলেছে অহুমানের হাত ধ'রে। সেই কারণে তাঁ'দের কৃত কাল-নিরূপণ কম অ'না রকমের ঠিক, তা' বলা কঠিন। তবে চেষ্টার একটা মূল্য আছে; সেই হিসাবে ও চেষ্টাটাও খুব বাহাদুরী।

বহু বিস্তার করতে গিয়ে মানুষকে ঘুরতে হয়েছে বহু স্থানে আর যুদ্ধ করতে হয়েছে প্রাণটাকে ফিরে পাওয়ার আশা না রেখে লড়াই করতে গেলেই সজ্ঞানে দেহের মায়া, প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হয়। যা'দের সে মুরাদ নাই, তা'রা জবরদস্তিতে প'ড়ে “খাঁটি” খেয়ে হয়ত যুদ্ধ করতে যায়। কিন্তু সে উত্তেজনা সাময়িক—খাঁটির জোরে। “খাঁটি” অনেক সময়ে সব ক'রে দেয় মাটি।

বলেছি, আর্ঘ্যগণ যখন প্রথম দেশ বিদেশে ছাড়িয়ে প'ড়েছিলেন, তখন তাঁ'দের ছড়িয়ে পড়বার ছিল প্রয়োজন। সে প্রয়োজন-সিদ্ধির আশায় তাঁ'রা উদ্ধার মত ছুটে চ'লেছিলেন নানা স্থানে। তা'তে কিন্তু তাঁ'দের আত্মহারা হ'বার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় নাই এত টুকুও। তেমনটা হ'লে বেদগান করতে করতে পথ চ'লতে পারতেন না তাঁ'রা কোনো মতেই। নির্ধর্ম হ'য়ে জয়-যাত্রার পথে বাহির হ'ন নাই তাঁ'রা। ঘর ছেড়েছিলেন সে সব মানুষ ঘরে জায়গা পান্ নাই ব'লে। কোন্‌ অচিন্ পথে, অচিন্ দেশে চ'লেছিলেন তাঁ'রা, সে কথাও সম্ভবতঃ তাঁ'দের ঠিক জানা ছিল না। মাথা

রাখবার স্থান সংগ্রহের জন্তই বেদ সম্বল করে তাঁরা বাহির হয়েছিলেন অনিশ্চিতের পথে। ষাঁদের যেদিকে যা'বার সুবিধা হয়েছিল, তাঁরা গিয়েছিলেন সেই দিকেই।

পৃথিবীতে তখন খালি জায়গা পুড়েছিল বিস্তর।

উদর-জালা নিবারণের জন্ত যখন ভাত চড়ান হয়, তখন চাউলগুলো ফুটে ফুটে ফেঁপে উঠতে থাকে; কাজেই বদ্ধ হাঁড়ির মধ্যে তা'র আর সম্বলান হয় না। তাপের ধর্মই হচ্ছে বিস্তৃতি। সেই বিস্তৃতির ফলে সাদা জনটা ভাতের ফ্যান হয়ে ফুলে উঠে হাঁড়ি উপচে পড়ে। খানিকটা ওপুচা-উপুচি হয়ে গেলে হাঁড়ির জিনিস হাঁড়িতে থাকে শান্তিতে, ফোলাফুলি দাপাদাপি থেমে যায় আপনাআপনিই। বসতি-বিস্তারের জন্ত পৃথিবীর নানাস্থানে ষাঁরা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের হয়ে গেল সংঘর্ষ। কাজেই লাঠালাঠি—কাটাকাটি। খুন জখম হ'ল বিস্তর। তারপর খানিকটা বেরিয়ে যেতেই আদিম অধিবাসীদের এলাকা ক্রমে হয়ে গেল ঠাণ্ডা। আর্ধ্য-অনার্যদের মধ্যে তখন হ'ল কতকটা আপোষ; আর কতক লোক তা'দের পুরাতন এলাকা ছেড়ে গা-ঢাকা দিল বন-জঙ্গলে—স্বাধীন মনোবৃত্তিতে।

এমনটা শুধু যে “অজ্ঞানভিত্তি” হয়েছে, তা'নয়; সাগর-পারেও ঐ অবস্থা। জোর ছিল যা'দের, মূলুক হ'ল তা'দের। যুদ্ধ-বিগ্রহের মজাই ঐ। “ওগো, মাগো, ঠাকুরমাগো, দেখ আমায় মারলে গো” ব'লে চীৎকার করলে দয়া করেনা কেহই। ও সব জায়গায় হয় গলা টিপে ধরতে হয়, না হয় গলা-টিপুনি সহ্য করতে হয়। ও বিবাহের ঐ হ'ল মন্ত্র।

এই সব কাণ্ড হ'য়ে যা'বার পর, দেশের ষাঁরা সেরা, তাঁরা দেশে দেশের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন প্রাণপণে। অত্যান্ত দেশের অপেক্ষা এদেশে জ্ঞান-বিস্তার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাটা হয়েছিল খুব বেশী। কর্তারা যত কথাই বলুন এখন, যত ইতিহাসই রচনা করুন, আর বিজ্ঞানের অল্পশীলন নিয়ে যত হা-মা-কাই করুন, বেদ যে এই পারেরই, সে কথা অস্বীকার করতে পারছেন না ওঁরা। মূল পেয়ে এদেশের লোক পেয়ে গেছে সব। আমাদের বিশ্বাসে বেদ

অপৌরুষেয়। এই বেদ, এই দেশের মানুষকে যা' গ'ড়ে তুলেছে, তেমন গড়ন অন্য কোনো দেশের সাহিত্য-বিজ্ঞান গুড়তে পারুল না এই বিজ্ঞানের যুগেও। কল্প-সূত্র দিতে পেরেছে ভারত ছাড়া কোন্ দেশ? ও সূত্র মানুষের জীবনে যেমন শৃঙ্খলা এনে দেয়, তেমনটা আর দিতে পারে না কোনো জিনিষই। শ্রোত-সূত্র, গৃহ্য-সূত্র ও ধর্ম-সূত্র এখানকার মানব-সমাজকে সেই কারণে গ'ড়ে তুলেছিল আশ্চর্য রকমে। এর পর আরম্ভ হ'ল অনেক কিছু। সেই অনেক কিছুর মধ্যে আমরা পেয়েছি ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণরূপী ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যোতিষ, যোগ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ধর্ম-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, রাষ্ট্র-নীতি; ন্যায়, দর্শনও বাদ পড়ে নাই। দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকলে, এ সকল বিজ্ঞান কৃষ্টি অল্পশীলন হওয়া সম্ভবপর নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি বর্ধিত করতে হ'লেই চাই শান্তি। অশান্তির মাঝখানে—রক্তারক্তির তৎক্ষণাত্তে সৃষ্টির মুক্তা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সারস্বত-কুঞ্জের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায় না কোনোমতেই। কমলার রূপা খেঁকেও মানুষ তখন হয় বঞ্চিত। মানুষ যদি লক্ষ্মী সরস্বতীকে অসি ও ঘুসী দেখিয়ে দূরে রাখবে, তবে মানুষের গর্ব্ব করবার আর থাকে কি? সিংহও ত পশুরাজ—মুক্ত স্বাধীন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি-বলে সে হয় পিঞ্জরাবদ্ধ। অত বড় বিক্রমী সিংহ-ব্যাঘ্র মানুষের হয় ক্রীড়নক।

এ কথাটা এদেশেও যেমন, অন্যান্য মহাদেশেও তেমনি। যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হ'য়ে ষাঁরা যাত্রা করেছিলেন, যুদ্ধ জয় করে, অথবা বিজিত হ'য়ে ত্যাগের পথই যে মানুষের পক্ষে অশেষ কল্যাণপ্রদ, একথা শেষ-জীবনে স্বীকার করতে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কুষ্ঠাবোধ হয় নাই। নবীনতার দর্পে, জিদ ও খেয়ালের বশে মানুষ যা' করে, প্রবীণতার অন্তরালে সেই মানুষকেই আবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়—মনের মধ্যে অশান্তির ঝড়ঝাপটা যে চলতে থাকে, সেটা কি উপায়ে শান্ত করতে পারা যায়, তা'র জন্য চিন্তা তা'কে করতেই হয়। যুদ্ধ-জয়ের আনন্দ, নিরানন্দে পরিণত হয় সেইখানেই।

এখন দেখা যাক, যুদ্ধ, লড়াই, বগড়া মানুষ করে কেন। ও লড়াই বগড়া হয় কতকটা দরকারে, কতকটা বা অ-দরকারে—লোভে, হিংসা-বশে, প্রভৃতির দোষে। সিংহ, জীবজন্তু বধ করে ক্ষুধার তাড়নায়—ক্ষুধিবৃত্তি করা তা'র একান্ত প্রয়োজন। উদর পূরণ হ'লে সে আর বড় জীব-হিংসা করে না। কিন্তু বাঘ-মহাশয় সে প্রকৃতির জীব নয়। ক্ষুধা থাকে, আর নাই থাকে, শীকার পেলেই মানুষের সে চোরা-গোষ্ঠায় মানুষ হ'লে, তা'র কাঁধ ম'লে দেওয়া যেতে পারত—বেত লাগালেও অগ্রায় হ'ত না। মানুষ যদি ব্যাভ্র-ধর্মী হয়, সে ত বড় লজ্জার কথা।

যুদ্ধ অবশ্য চ'লে অসুছে অনাদিকাল থেকে, আর চলবেও ভবিষ্যতে। এ দেশে ও অন্যান্য দেশে এ একই কথা। দেবাসুরে ও দেবতা-দেবতায় যে কত যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, তা'র প্রমাণ দিচ্ছে সকল দেশেরই পৌরাণিক কাহিনী। মহাসিদ্ধুর এপারে, ওপারে সে সকল কাহিনী ভাবের “ইথার” হ'য়ে মানুষের হৃদয়াকাশ ছেয়ে আছে। ইথার যেমন অবিনাশী, এ সকল কাহিনীরও তেমনি বিনাশ নাই। এখনকার সভ্যতার যুগে স্কুল-কলেজের ছেলেরা পর্যন্ত এ সকল কাহিনী সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু তা'রাই আবার এই সকল “রচা” কথা খুব মনোযোগসহকারে পাঠ করে, মুখোস্ত করে,—যা' পাঠ করেছে, তা'র পরীক্ষা দেয়। গঞ্জিকাসেবীর উর্কর মস্তিষ্কগ্রস্ত ব'লে ও কাহিনীগুলি স্মরণে উড়িয়ে দেবার পথ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষণে ক্ষেত্রে পৌরাণিক-যুদ্ধের কথা অমূলকই হোক, আর সমূলকই হোক, তা' অবনতমস্তকেই মেনে নিতে হচ্ছে তাঁ'দেরই, যা'রা ওগুলা-মান্তে নারাজ।

ঐতিহাসিক যুদ্ধের বাহিনীও পাঠ করা গেছে অনেক। সেদিন ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ হ'য়ে গেছে, তা'র ফলাফল ত এখনকার দিনের সকল মানুষই প্রত্যক্ষ করছেন। ভবিষ্যতে যে আরও অনেক যুদ্ধ হ'বে, তা'র ইঙ্গিত ও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে নানাভাবেই। অতএব কেমন ক'রে বলা যেতে পারে, বিশ্বের শান্তি আর কোনো-রকমেই নষ্ট হ'বে না। “যুদ্ধ বন্ধ কর”—বললেই যুদ্ধ বন্ধ

হয় না। যুদ্ধ-প্রিয়-জাতি ত যুদ্ধ বন্ধ করবে না কিছুতেই। রাজনীতি ও স্বার্থ নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে যুদ্ধ বন্ধ হ'তে পারে না। সম্মুখসামরিক বৈরাগীর সহস্র উপদেশ-বাণীতেও।

সেটা হয় না, হ'তেও পারেনা, হওয়াও বোধ হয় সমীচীন নয়। কারণ, এই যুদ্ধ লয়ও যেমন, সৃষ্টিও তেমনি। বহুত্বকে ধ্বংস করে এই যুদ্ধ; আবার বহুত্ব সৃষ্টিও এই যুদ্ধ থেকে। বাহিরের যুদ্ধ চলে বরং কালবিশেষে—ঘটনা-শ্রোতে; অন্তরের যুদ্ধ চলছে অহোরহ। তা'তেই নৃতনের সৃষ্টি। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতির ত্রী-সম্পদ যা' আমরা উপভোগ করছি, তা' এই যুদ্ধেরই কল্যাণ-মন্ত্রে। এমন যুদ্ধ যেদিন বন্ধ হ'বে, সেদিন বিশ্ব-কল্যাণের কল্যাণ-স্বর আর শুনে পাওয়া যাবে না। সেইদিন হ'বে সৃষ্টির মৃত্যু।

কিন্তু তা'ই ব'লে যুদ্ধ যুগামী ব. গুগামী নয়—চোরের ব্যবসায় নয়। স্বার্থে আঘাত লাগলেই—“আয় তবে যুদ্ধ করি”—বলতে হ'বে যে, এমন কিছু কথা নাই। হিংসা বা লোভের বশে মানুষ যদি মানুষকে আক্রমণ করে, নিন্দা-প্রাণি করে, তাই ভায়ের ম'থা ভাংবার ব্যবস্থা করে, সেটা হবে না যুদ্ধ, তা'কে বলব পশু বৃত্তি। মানুষের চোখে ধূলি নিক্ষেপ ক'রে কয়দিনের জন্তু অপরাধের দণ্ড থেকে হয়ত পরিজ্ঞান পাওয়া যায়; কিন্তু অনন্তের অলজ্জা বিধান এমনই মজার জিনিষ যে সেই অপরাধের বিচার করতে বসবে আগামীগণ কিম্বা তা'রাই যা'দের উপর হ'রা হয় অত্যাচার। যা'র ইচ্ছা ভিন্ন গাছের পাতাটা পর্যন্ত নড়বার উপায় নাই তাঁ'র জায় বিচার চলছে অহোরহ। সেই বিচার-ফলে অপরাধীর উত্তরাধিকারীর শাস্তি অনিবার্য। এ কথার সত্যাসত্য প্রমাণ করছে বহু প্রাচীন কাহিনী। টাইরান্ট মা'ত্রই কাপুরুষ। সুবিধা-সুযোগে অস্ত্রের সর্বনাশ করা, তা'দের ব্যবসায়। কিন্তু কোনো দেশ, কোনো জাতি, কোনো সমাজ সে ব্যবসায় লাভবান হ'তে পারে নাই কোনো দিন। প্রায়শ্চিত্তের কড়ি এক রকমে না এক রকমে গণে দিতে হয়েছে সকলকেই। সে শাস্তি অতি ভীষণ। সে শাস্তিতে জাতি, সমাজ, রাজ্যপট উড়ে যায় এক দম্কা হাওয়ায়। আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে জায় যুদ্ধের মধ্য

দিয়ে। তা'তে জয়-পরাজয় দুইই লাভের জিনিষ।
লাভালাভ তা'তে খতিয়ে দেখতে হয় না আদৌ। মানুষ
যদি করে এমন যুদ্ধ, তবে অসুখ-বশে যুদ্ধ, লোভ-বশে
যুদ্ধ বন্ধ হ'য়ে যায় এক কথায়। মানুষ-মারার কল ঘাড়ে
ক'রে রক্তারক্তি করলেই যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধ দুকৃত দমনের
জন্ত, শিষ্টর পালন জন্ত আর ধর্ম সংরক্ষণ ও সংস্থাপনের
জন্ত। যুদ্ধে থাকা চাই মর্যাদা-জ্ঞান। সে মর্যাদা
পরেরও বটে, আর নিজেরও বটে। শত্রু-কণ্ঠ দান কর্তে
হয় তা'র প্রাপ্য মর্যাদা। না-করাটা অ-বীরোচিত কাণ্ড।

যুদ্ধ গৌরবের জিনিষ—কেননা যুদ্ধ হ'ল অন্যায়ের
প্রতীকার-চেষ্টা। লোভ বা হিংসা বশে রক্তারক্তি কাণ্ডে
সভ্যতার পরিচিতি নাই। সেটাকে অ-মানবতা বুলেও
বোধ হয় অন্যায় হয় না। এই জ্ঞানটুকু মানুষের যেদিন
হ'বে, সেদিন পৃথিবীতে যুদ্ধোদ্যম হ্রাস পাবে আশ্চর্য
রকমে। গোলাগুলি, গ্যাস-বোমা নিয়ে যুদ্ধ হয়ত
করতেই হ'বে না ভবিষ্যতে। কারণ, মানুষ তখন করবে
না আর কোনই অন্যায়। মানুষ তখন যুদ্ধ করবে ন্যায়-
বিজ্ঞানের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনে। চির-শান্তি সেইখানেই।

শরৎ-স্মৃতি-পূজা

শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায়

কবে এসেছিলে নামি দেবতার স্নেহের দুলাল
এ বন্ধের স্মৃতিফাতে, নিত্য যেথা শতেক জঞ্জাল,
অভাবের হাহাকার, প্রেমের নিষ্ঠুর অচয়,
পরাদীনতার ব্যথা, মহত্বের মিথ্যা অভিনয়,
কলঙ্কিত সমাজের নারীত্বের করুণ লাজনা,
অস্পৃশ্যের বুক দলি শ্রেষ্ঠত্বের অদম্য কামন',
সহস্র গ্লানির মাঝে আনন্দের গান মুছে যায়
জীবনের নিষ্পেষণে? তাই বুঝি তুমিও ধরায়
সর্বহারী জননীর বক্ষে এসে পাওনি নিষ্কৃতি
দারিদ্র্যের জালা হতে। বাংলার সনাতন রীতি
পারে নাই কিন্তু তব প্রতিভারে লইতে জিনিষা;
সর্ব দুঃখ, সর্ব গ্লানি হাসিমুখে ছুপায়ে ঠেলিয়া
উঠেছিলে হে দরদী, রচিত দারিদ্র্য-ইতিহাস,
জাতির সারথি সাজি মুক্তিপথ করিতে প্রকাশ।

সভা জুটী তুমি—তব সতর্ক নয়নে প'ল ধরা
সমাজের অন্তরের অভিযোগ, দুঃখ, দৈন্ত জরা;
শত বরষের ক্রটি, ক্ষতভরা জীর্ণ লোকাচার
দেখাইলে সমাজের, চাহিলে আমূল সংস্কার।
শিল্পী তুমি বসাইলে সিংহাসনে প্রেমের মহান,
সার্থক করিয়া প্রেমে পতিতারে দিলে উচ্চস্থান
সংসারের উর্মিমাবে। নারীর গোপন যত ব্যথা
স্থানপুণ হাতে মুক্তি দিলে বিশ্বে ছড়তে বারতা।
তুমি কবি—কাব্য তব রঙীন স্বপনহারী হয়ে
ফুটিয়াছে মূর্তরূপে। অন্তরের অন্তঃস্থলে বয়ে
চলিয়াছে চিরদিন প্রেমিকার প্রেমময় গান,
সংসারের আবর্তেও সত্যেরে করিলে অর্ঘ্যদান।
কথার মালায় তব রচিলে দেশের পূজা প্রীতি,
পূজারী করিলে পূজা প্রেম, সত্য, স্বন্দরের নীতি।
মানব জীবন ছ ডি গেলে চলি গৌরব বাংলার,
মর্ত্য হতে নিবেদন করিলাম প্রণতি আমার।

আধুনিক জীবনে রসায়নের স্থান

অধ্যাপক শ্রীমূৰ্গ কমল রায়

স্কুল জীবনের মাঝখানে একদিন একখানা জগন্নাথ কলেজ ম্যাগাজিন হস্তগত হয়। কোঁতুলী মন নিয়ে তৎক্ষণাৎ উহার আগাগোড়া পাঠ করিয়া ফেলি। আমার মাতুল জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক, এজন্য আগ্রহের মাত্রা একটু চড়া ছিল। অধ্যাপকদিগের নামের তালিকায় দেখিলাম আমার অধ্যাপনার বিষয় কেমিস্ট্রী বা রসায়ন। অঙ্ক, ইংরেজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, বাংলা ইত্যাদি এতগুলি বিষয় থাকিতে মাগা একটা কিছুত বিষয় পড়াইতেছেন। গ্রাম্য ছেলে, সাধারণ বুদ্ধি প্রথর নয়, কেমিস্ট্রী কি তাহা ভাবিতে যাইয়া হতাশ হইলাম এবং মামা কত বড় পণ্ডিত কল্পনা করিতে যাইয়া একটু বিষয়মাখা পুলকে আগ্রহিত হইলাম।

কেমিস্ট্রী বা রসায়ন শাস্ত্রটার পরিচয় আমাদের দেশে কত সঙ্গীর্ণ তাহা সেদিন ততটা ভাবি নাই, আজ ভাবিয়া দুঃখ বোধ করিতেছি। যে শাস্ত্রটির ব্যবহারিক সম্ভা এত বিস্তীর্ণ যে মানুষ মাত্রই উহার নিকট কোন না কোন প্রকারে ঋণা সেই বিষয়টাকে আমরা আজও ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ পাই নাই। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় এসম্বন্ধে কতকটা সচেতন হওয়াতে স্কুলে রসায়ন পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত হইয়াছে। এখন আশা করা যায় অতি শীঘ্রই ইহা ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের আদরণীয় ও পূজনীয় পঠিতব্য বিষয় হইবে।

রসায়নের রাজত্ব যে বিশ্ব জুড়িয়া একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। বিশ্ব-প্রকৃতি একখানা প্রকাণ্ড রাসায়নিক পুস্তক। সেখানে চিরন্তন রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিয়াছে। বুদ্ধিমান মানুষ ক্রমে, ক্রমে সেখান হইতে নানাবিধ ক্রিয়া পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া নিজেদের ঘরে তাহার অনুকরণ করিতেছে।

আমাদের ঘরে ঘরে আজ নানাভাবে রসায়নের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আহাৰ করি রাসায়নিক চিনি, রাসায়নিক গুন, রাসায়নিক দুধ, রাসায়নিক চা ইত্যাদি।

ঔষধের বাজারে রাসায়নিকের বুদ্ধি বিবেচনা সর্বত্র প্রতিফলিত।—প্রত্যেকটি ঔষধ উহাদেরই চেষ্টার ফল। আধুনিক ভাইটামিন যুগের প্রতিষ্ঠা করিল রসায়ন। কোন খাদ্যটা কেমন, কোন আহারীয় পদার্থে কতটা পরিমাণ পুষ্টিকর পদার্থ আছে সকলই ঐ রসায়ণ নির্দ্ধারণ করে। হয়ত এমন দিন অতি নিকট যেদিন রাসায়নিকের গবেষণাগার হইতে দুই চারিটি বটিকা আহাৰ করিয়া ক্ষুধা মিটাইতে হইবে।

• আমাদের পরিবেশ পোষাক পরিচ্ছদ সবই রাসায়নিকের হাতের বৈশিষ্ট্য পাইয়া আধুনিক বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আজকাল রেশম তৈয়ারী হয় রসায়নাগার হইতে। গুটিপোকা হইতে রেশম সংগ্রহ করা উঠিয়াই যাইবে। জামা কাপড়ের রং সরবরাহ করে রাসায়নিক, ধৌত করিবার মোসলা জোগায় রসায়ন। এক কথায় বর্তমান সভ্যতার মান সম্মান রক্ষা করে এই রসায়ন।

আমাদের আবাস গৃহের প্রধান সামগ্রী প্রবীন রসায়নের হাতে তৈয়ারী। গরীবদের চালের টিন, ধনীদের দালানের মাল মশলা—চুণ, সিমেন্ট ইত্যাদি রাসায়নিকই প্রস্তুত করেন। যে বিশাল সৌন্দর্য্য নিয়া রাজপ্রাসাদ দণ্ডায়মান উহার প্রত্যেকটা উপকরণের জন্য দায়ী রাসায়নিক।

আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে রাসায়নিক আমাদের স্বরণীয়। চশমা চোখে দিতে হইলে কাচ টুকরা বা চশমা-ফ্রেমের জন্য নিশ্চয়ই রাসায়নিককে ধন্যবাদ দিতে হয়। আয়নায় মুখ দেখিয়া কত আনন্দানুভব করি, রাসায়নিক পেছনে দাঁড়াইয়া হাসেন—এ যে তাঁহারই সন্তোষের ব্যাপার। বাসনপত্র, খালা, বাটি ইত্যাদি উহারই কীর্তি ঘোষণা করে। তাম্র, দস্তা, লৌহ প্রভৃতি ধাতুপদার্থদের সংগ্রহ করিতে রাসায়নিককে যে রক্ত জল করিতে হয় আমরা কি তাহার কোন খবর রাখি? হয়তো কাছে স্বন্দর পাত্রটি পাইয়া সানন্দে আত্মহারা হই, কিন্তু কীর্তিমান স্রষ্টিকর্তাকে একবারও স্বরণ করি না। লৌহের

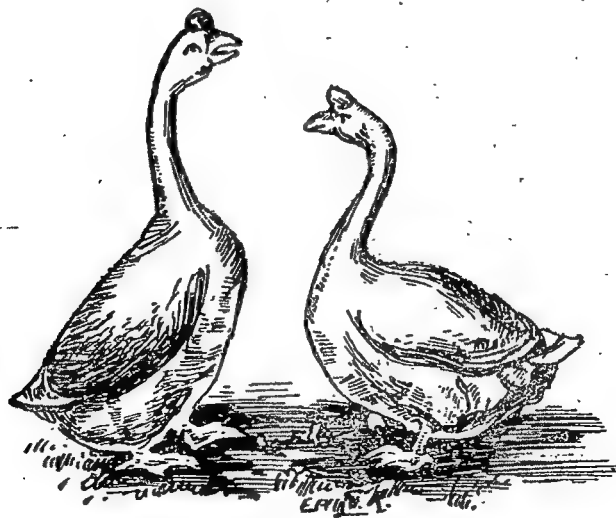
ব্যবহার আমরা আরো করিয়া থাকি। দাঁ, কাচি, সূচ, পেরেক, কল, গাড়ী ইত্যাদি সমস্ত যন্ত্রপাতিতে লৌহ বর্তমান। প্রকৃত পক্ষে লৌহযুগ বলিতে এ যুগকেই বলা চলে, কাজেই এযুগের প্রণেতা রাসায়নিক। প্রত্যেকটি ধাতু পদার্থ যে রাসায়নিকের সেবা-পরিচয় একথা কাহাকে শুনাইব? এদেশে যে অনেক পেছনে!

আধুনিক সভ্যতার ছন্দুভী এত জোরে বাজিত না যদি রাসায়নিক তাহার মাল মোসল্লা নিয়া কাগজ তৈয়ারে লাগিয়া না যাইতেন। কাগজ ও কালী সম্পূর্ণ ই রাসায়নিক পদার্থ। এত শত যন্ত্রপাতি জ্ঞান-ভাণ্ডার কোথায় শুকাইয়া যাইত যদি রাসায়নিক তাহার বুদ্ধির ডালা সদাসর্বদা খুলিয়া না রাখিতেন। ঝরণা কলমের বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া আশ্চর্য নয়—উহাদের প্লাটিনাম যুক্ত নিব কত সুন্দর। স্বর্ণকি আতর, এসেন্স, এবং তৈল সমস্ত রাসায়নিকের হাতের জিনিষ। প্রকৃতি অবশ্য অনেক কিছু সরবরাহ করেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পেছনে থাকিবার পাত্র নন, তিনিও প্রকৃতির সঙ্গে তাল রাখিয়া ধাপে ধাপে উপরে উঠিতেছেন। আজ কাল প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে রাসায়নিককে মনে না রাখিয়া উপায় নাই। এমন স্থান নাই, এমন জিনিষ নাই

যেখানে রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিপত্তি মিলে না। এত কাচের ছড়াছড়ি—কাচের গ্লাস, কাচের জানালা, কাচের বোতল—সবই রসায়নের অল্পপ্রেরণা। ঐ যে রাবার—রাবার টামার, রাবার টিউব, রাবার জুতা এ পর্যন্ত সকলই রসায়নের একান্ত নিজস্ব সামগ্রী। প্রকৃতিজাত রাবার, নীল, রেশম সবই আজ সভ্যতার দৌড়ে হার মানিয়া যাইতেছে।

কালো আলুকাতরা ঘাঁটিয়া রসায়ণ যখন সুন্দর সুন্দর বর্ণ, সুমিষ্ট পদার্থ, নানাবিধ স্বর্ণকি দ্রব্য এবং বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারেন তখন রাসায়নিকের অসাধ্য কি?

বড়ই ছুংখের বিষয়, এখনও আমরা রসায়ণ শাস্ত্রের আদর বুঝি না। রসায়নের চিনি, লবন খাই কিন্তু একবার স্মরণ করিয়া কৃজ্ঞতা দেখাইতে পারি না। এখন দিন আসিয়াছে—প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে রসায়নের সঙ্গে ভাব করিতে হইবে। আমাদের মত শাস্ত্রের নাম জানে না একরূপ গোমুখ যেন আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে না হয়। রসায়নের সঙ্গে প্রকৃতির যে যোগাযোগ এ বন্ধন খুবই উচ্চস্তরের। আশা করি আমাদের ছেলেমেয়েরা এ যোগাযোগের গোপন-রহস্য ভেদ করিতে পারিবে।



লক্ষ্মীর বাঁপি

সরোজনলিনী প্রতিষ্ঠানের এবারকার বাৎসরিক অঙ্কঠানে সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন লেডী ব্রেবার্ণ। সভা-ক্ষেত্রে বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও বহুমানভাজন ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রীর সরলতা, সদাশয়তা, সহানুভূতি ও উৎসাহ দানের অভয়বাণী শুনে শ্রোতৃবর্গ যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হ'য়েছিলেন। সভার কার্য স্বচাৰুৰূপে সম্পন্ন হ'য়েছিল কর্তৃপক্ষ ও স্থায়ী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত চার্লচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের যত্ন ও প্রাণপাত পরিশ্রমে। সরোজনলিনী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশনের শিল্প-প্রদর্শনীতে এ বৎসর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিই উপস্থিত হ'য়েছিলেন এবং সকলই সে প্রদর্শনীর প্রশংসাবাদ ক'রেছিলেন। সপ্তাহব্যাপী উৎসবান্তে শেষ দিনে প্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা হ'য়েছিল। সম্মেলন-ক্ষেত্রে রায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—“বাংলার আধ্যাত্মিক অবদান।” রায় বাহাদুরের ভাব ও ভাষা-সম্পদ অতুলনীয়। বিষয়-বস্তু শ্রীমণ্ডিত হ'য়েছিল সেই সম্পদে। তাঁর ভাব-গঙ্গার অভিনব অভিমত-তরঙ্গ প্রগতির নামে অনাচাররূপী মত্ত করীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক্, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। আর প্রার্থনা, মাহু-মর মন-মুখ এক হোক্ মানবতার নামে। ও একতার অভাব হ'য়ে পড়েছে ইদানীং খুবই বেশী। তা'র ফলট বিদ্যা দূরায়িত হচ্ছে অবিজ্ঞায়। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বিচারের এই ত উপযুক্ত কাল। মিত্রের মিত্রতা ও বিচারণা জয়যুক্ত হোক্।

অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র বসুর সাহিত্যাকাশ ঘনাক্ষরাকারিত ক'রে কোন্ আকাশে, কোন্ লোকে উদ্ভিত হ'য়েছেন, তা'র সন্ধান করা বিড়ম্বনা। তাঁর ঘোষণাই দিচ্ছে বিরহ-কাতরকে সাধনা। শরৎচন্দ্রের অদর্শনেও জ্যোৎস্না-স্নাত ভক্তবৃন্দ তাঁর প্রথম বার্ষিক-স্মৃতি-তর্পণ সমাধা করুলেন ব্যথা-বেদনার শব্দ-চন্দন। শাস্ত পথবাহী কবীজ

ববীজ ও অজ্ঞাত মহাজনগণের সহায়তায় প্রাভঃসরগীয় ঋষি-কল্প স্যার আশুতোষের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় অমর কথা-শিল্পীর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টি করছেন শুনে আমরা তাঁর সাধু প্রচেষ্টার প্রশংসাবাদ করি। এই প্রসঙ্গে “প্রসাদ কবি” রচিত শরৎচন্দ্রের স্মৃতি গীতি উল্লেখযোগ্য। উদ্ধৃত করি—

“শ্রীকান্তে যে শ্রী দিয়েছে

খুঁজে তা'রে পাই কোথায়,

বামুন-মেয়ে, পল্লী-সমাজ

নিষ্কৃতি পায় তা'র কথায়।

বিশ্ব, বিরাজ, দত্তা কত

সেই বাণীতে অন্ধানত

স্মৃতি রাম পেয়ে গেছে

—চরিত্রহীন নয় জানায়!

বিপ্রদামের কাণ্যকানি

পুত্রের দাবীর হানাহানি

গৃহদাহে, চন্দ্রনাথে

মূর্ত্ত দয়া সে ব্যাধায়।

দরদে তা'র মধুর ধরা

মরায় করে সে অ-মরা

সাহিত্যাকাশ জ্যোৎস্না ভরা

শরৎ-স্মৃতির ঘোষণায়।

কলিকাতা বাবুঘাটে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে —তা'র নাম ভাগীরথী সঙ্ঘ। প্রকাশ—এই সঙ্ঘ জলময়ী মহিলা, পুরুষ, বালক ও বালিকাগণকে জল-সমাধি থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবে। বাইস্ তেইশ বৎসর পূর্বে “জলপ্লাবন” নামক উপন্যাসে এমনই একটি প্রস্তাব আমরা পাঠ ক'রেছিলাম। প্রস্তাব এতদিনে কার্যে পরিণত হ'য়েছে জেনে দেশের মঙ্গলে দেশের লোক ভাষাতীত আনন্দলাভ

এলেক্জেণ্ডার এবং মাল্দাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জ একই আকার ও পদ্ধতিতে নির্মিত হইয়াছিল। এই তিনটি কেল্লাই ভাবতে ব্রিটিশ রাজ্য বিস্তারের প্রাচীন ও প্রধান কেন্দ্র।

এই স্থানটি ক্রমশঃ ক্রমশঃ উন্নত ও পরিবর্তিত হইয়া ১৭৮৭ খৃঃ এক মহানগরীতে পরিণত হয়। ফরাসী সেনাপতি লালীর হস্ত হইতে উদ্ধারের পর ইহার খ্যাতি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে সেই সামান্য শস্যক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র পল্লীটি বিশাল নগরে পরিণত হইয়াছে। ফোর্ট সেন্ট জর্জের ভিতর একটি প্রাচীন গির্জা আছে তাহার নাম সেন্ট মেরী। ১৬৩০ খৃঃ ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম ইংলিশ চার্চ এইটি স্থাপিত হয়। এই গির্জায় লর্ড ক্লাইভের বিবাহ হয়।

কেল্লার চারিদিকে অর্ধ মাইল বিস্তৃত কলিকাতার গড়ের মাঠের মতন ময়দান আছে। সমুদ্রকূলে প্রায় ৪ মাইল বহু বিভবশালী হ্রদাবলী শোভিত রহিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে পরিচ্ছন্ন সুবিস্তৃত 'মেরিণা' পথটি মাল্দাজের বায়ু সেবনের স্থান। ভ্রমণে তৃপ্তি পাওয়া যায়—এই 'মেরিণা' কুম্ নদীর উপরের সেতু দিয়া কেল্লার দক্ষিণ তোরণ পর্যন্ত গিয়াছে।

কেল্লারই দক্ষিণে কিছুদূর বাইলে সুদৃশ্য হাইকোর্টের অট্টালিকা দেখা যায়, ইহারই একটি উচ্চ গম্বুজ লাইট হাউস রূপে ব্যবহার করা হইতেছে। কেল্লার দক্ষিণ হইতে সেন্ট টম্‌স্‌ মাউন্ট পর্যন্ত যে বিস্তৃত তিন মাইল ব্যাপী রাজপথ গিয়াছে তাহার নাম মাউন্ট রোড। এই রাস্তার দুই ধারে ইংরাজ, দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিপনী সমূহ অবস্থিত। এই রাস্তার এক সংযোগস্থলে লর্ড পিনের ব্রোঞ্জ মূর্তি বিরাজ করিতেছে।

প্রসিদ্ধ "হিন্দু" খবরের কাগজের কার্যালয় এই মাউন্ট রোডের উপর, ইহার মূদ্রণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চলিতেছে। কলে কাগজ কাটা, কাগজ ভাঁজ, ও মোড়াই পর্যন্ত হয়। হিন্দু কাগজের দৈনিক মূদ্রণ অর্ধলক্ষ সংখ্যা। ষ্টেটসম্যান কাগজের তুল্য ইহার গ্রাহক ও প্রাপ্তপত্তি।

পার্শ্ব সারথি-মন্দির

বৈষ্ণবদের এই বিষ্ণু মন্দির খুবই পূজ্য—ইহার গঠন ও কারুকার্য দ্রাবিড় স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দক্ষিণ দেশের মন্দিরগুলির পরিকল্পনা প্রায় একই প্রণালীর। হুউচ্চ গোপুরাম (তোরণ), প্রাঙ্গণে বৃহৎ টেপাকুলাম (সরোবর ও তদুপরে বিহার মন্দির) ও স্বর্ণবিমণ্ডিত ধ্বজ-স্তম্ভ (সোনার তাল পাছ) মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য। তিনটি বৃহৎ বৃহৎ কারুকার্য খচিত মণ্ডপের পুর অক্ষকারাচ্ছন্ন গভ-মন্দিরে পার্শ্ব সারথীর চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি বিরাজিত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভিত ভগবানের এ মূর্তি যেমন মনোরম তেমনই মনোহারী। প্রাঙ্গণের এক অলিন্দায় বহু ভক্ত ও সাধকের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দক্ষিণ দেশের বহু মন্দিরে সাধকদের মূর্তি স্থাপিত দেখা যায়। ভগবানের নিকট ভক্তের পূজা পরম প্রিয় তাহাই প্রমাণ করে। ভক্ত-মানবকে পূজা করিলে সৃষ্টিকর্তা তার পূজা অপেক্ষা সন্তোষ পান। একটা মণ্ডপের একাংশে রবি, শশী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, ও কেতু নবগ্রহের প্রতিমূর্তি মণ্ডলাকারে স্থাপিত রহিয়াছে। যাত্রীরা গ্রহমণ্ডলী সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া দেব দর্শনে যান। গ্রহের ফেরনা কাটিলে কোন শুভকার্য হয় না।

মন্দিরটি গ্রেনাইট পাথর দিয়া নির্মিত, চারিদিকে চারিটা গোপুরাম পর্বত শিখরের স্তায় দণ্ডায়মান। ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে চতুষ্কোণাকৃতি নবতলার এই গোপুরাম গুলি। প্রত্যেকগুলি নীচের তল অপেক্ষা পরিসরে ছোট হইয়া গিয়াছে। সর্বোচ্চ তলের শিরে সাতটি স্বর্ণবিমণ্ডিত কলস গগনভিমুখে স্থাপিত। প্রায় ২০ ফিট উচ্চ এই গোপুরামগুলি। তাহাদের গাত্রে নানা ভঙ্গিমায় দেবদেবীর লীলা-মূর্তি খোদিত আছে।

প্রতি শনিবার ও নানা পার্বনে মহা সমারোহে পূজা উৎসব হয়, সেই সময়ে কনক ভোগমূর্তি বাহির হইয়া নানা সাজসজ্জায় শোভাযাত্রা করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ এবং টেপাকুলম মধ্যস্থিত বিহার মন্দিরে নৌকায় গমন করে এবং সরোবরের চারিটা তীর আলোকসাজে সজ্জিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। মন্দিরে বহুমূল্যবান অলঙ্কার, সোনা

রূপার আসবাব, রথ, মহাপায়া আদি যান ও হাতী এখনও আছে। এখনও ধনী ও ভক্তরা তাহাদের চিত্ত দেব সেবায় যে অর্পিত করে, তাহারই নিদর্শন দেব মন্দিরের বিভব মন্দিরের সম্মুখে স্থবিস্তৃত চতুষ্কোণ স্থগভীর সরোবরটী প্রস্তর দ্বারা বাঁধান।

কপালেশ্বরম মন্দির .

ময়লাপুর পল্লীতে এই শিব মন্দির অবস্থিত, ইহা শ্রীমদ্ভক্তিগের বিখ্যাত মন্দির। আকারে প্রকারে পার্থ সারথি মন্দিরের স্তায় হইলেও বৈষ্ণব ও শ্রীমদ্ভক্ত মতের গরমিল অনেক, দক্ষিণে শিব মন্দিরেরই প্রাচুর্য। এই স্থানে বেদপাঠ শুনিয়া পরম তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাদলায় বেদ পাঠ বা বেদগান চর্চা উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু দক্ষিণে তাহার প্রচলন এখনও আছে। এখানকার মাতৃভাষা তামিল হইলেও দেবভাষা সংস্কৃত ব্রাহ্মণেরা আদর ও সম্মানের সহিত অধ্যয়ন করেন। আৰ্য্য সভ্যতার জয়পতাকা জ্রাবিড় সভ্যতার উপর স্ফুটরূপে প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের শ্রোত্রীয়মন্দির বলিয়া খ্যাত—বেদপাঠ করিতেন বলিয়া ইহাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুরাজাদিগের নিকট হইতে নিষ্কর ভূসম্পত্তি পাইয়া ছিলেন। তাহাদের বংশধরেরা এখনও সেই স্থবিধা পাইয়া থাকেন। এখানে হিন্দুরা মাত্র একশত বৎসর পরাধীন হইয়াছে। উত্তর ভারতের মতন সাত শত বৎসর মুসলমান দ্বারা পীড়িত ও বিধ্বস্ত হইয়া সর্বস্ব হারা হয় নাই। এখনও তাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্ফুট মন্দির ও তার শিল্পচাতুর্য্য অন্মান ও অটুট রহিয়াছে। এখনও আৰ্য্য সভ্যতার ধারা এই জ্রাবিড় সভ্যতার মধ্যে পরিস্ফুটিত হইয়া আছে।

কিল্লার উত্তর দিকে জর্জটাউনে বড় বড় সওদাগরী ও পোট অফিস। বড় রাস্তার উপর অনেক বৃহৎ বৃহৎ স্ফুট অট্টালিকায় গ্রাসনেল ব্যাঙ্ক, টমাসকুক, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক, জি, পি, ও, কালেকটরেট্ট, কাষ্টম হাউস, আদি ব্যাঙ্ক, সওদাগরী অফিস অবস্থিত। তাহার অপর দিকে মাদ্রাজ বন্দর বা হারবার সমুদ্র গর্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত।

হারবার দেখিতে হইলে কোম্পানির নিকট হইতে পাশ লইতে হয়। হারবারটী অতি মনোরম।

তাহার নিখর গভীর জলরাশীর চারিদিক স্ফুট পোস্তা ও সোপান দ্বারা বাঁধন। একটা 'কোয়ে' হইতে অগ্ৰগতি যাইতে হইলে লক দ্বারা বিভক্ত। সমুদ্র হইতে এই ডকের ও কোয়ের মধ্যে প্রবেশের পথে বিশাল লকগেট। তাহা যখন খুলিয়া যায় দেখিতে চমৎকার। সমুদ্রের সহিত সংযোগ হইলে বোটে করিয়া গিয়া আমরা আনন্দ পাইলাম। এখানে মাদ্রাজ yact club—সাহেবদের এক পরম আনন্দ দায়ক খেলা yact race।

পার্ক টাউনে রেলের সেনট্রাল স্টেশনের হর্মের সম্মুখ ভাগের দৃশ্য পরম সুন্দর। ১৮৭৩ সালে ইহা প্রথম নিৰ্ম্মিত হয়। এখন সুসংস্কৃত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহার গম্বুজটী ১৩৬ ফুট উচু। গম্বুজে রক্ষিত প্রকাণ্ড ঘড়ির সময় চারিদিকের অনেক দূরস্থান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পার্শ্বে এম এণ্ড এস্ এম্ রেলের প্রধান দপ্তরটী পোরবন্দর পাথর দ্বারা নিৰ্ম্মিত। ইহার স্থাপত্য কৌশল মাদ্রাজের গোরব জ্রাবিড় স্থাপত্যের অদর্শে। রেল স্টেশনের অপর দিকে স্তর রাসেশ্বর মূদলেয়ারের চৌলট্রী ভ্রমণকারীর থাকিবার স্থবিধাজনক স্থান। উত্তর ভারতের ধর্মশালার স্তায় এই সব চৌলট্রী অপরিচ্ছন্ন নহে। এখানে ভদ্রলোকেরা আরামে থাকিতে পারে। কলিকাতায় ভ্রমণকারীর থাকিবার একরূপ সুব্যবস্থার স্থানের বড় অভাব।

সেন্ট্রাল স্টেশনের অনতিদূরে সাদা বৃহৎ স্ফুট রিপন অট্টালিকাই কর্পোরেশনের দপ্তরখানা। তাহার পার্শ্বে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট "মুর মার্কেট" নামে অভিহিত হইয়াছে। কলিকাতার হগ মার্কেটের তুলনায় ইহা সর্বাংশে ক্ষুদ্র। ফলের ও ফুলের দোকানই সর্বাধিক। মহিলাদের খোপা ও বেণীতে গুজিবার ফুলের কাঁটা ও দাম দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

প্যানথ্যান রোডে মিউজিয়াম ও CANNAMERA লাইব্রেরীর প্রকাণ্ড তিন পক্ষ বিভক্ত দ্বিতল স্ফুট স্ফুট গম্বুজ সংযুক্ত হর্ম্য। মধ্য ভাগেই লাইব্রেরী গৃহটীর উচু হল, চিত্রিত শার্শী কাককাব্য খাঁচত পুস্তকাধার দেখিলেই পুস্তক পাঠে মনঃসংযোগ করিতে আপনা হইতে ইচ্ছা হয়। এমন সুব্যবস্থার লাইব্রেরী বাঙ্গালা দেশে নাই। লাইব্রেরী হলে

প্রকাণ্ড ধাত প্রস্তরের লভ্য কর্ণওয়ালিসের মূর্তি রহিয়াছে। পুরাণ মাদ্রাজের প্রতিকৃতি (model) দেখিতে কৌতুক হয়। লাইব্রেরীয়ান M. Jannardan বহু সহকারে লাইব্রেরী পরিদর্শন করাইলেন। মিউজিয়ামে সেনাপতি নীলের স্মরণ মূর্তি প্রকাশ্য রাজপথ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অপর দুইটি পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃত্তিক, জীবতত্ত্ব, দক্ষিণ দেশীয় শিল্প, সামুদ্রিক জীব, নানা মূর্তি, ঐতিহাসিক চিত্রাবলী সংরক্ষিত রহিয়াছে। এই মিউজিয়ামটি দেখিলে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্টির সম্যক পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায়। মিউজিয়াম বাটার স্থাপত্য কিন্তু গ্রীক আদর্শে।

এর পরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ও টোকনিক্যাল ইনঃ, নারী ও শিশুদের প্রকাণ্ড হাটপাতাল। মাদ্রাজে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব আজ তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া বিস্তারিত। যে দিকে যাওয়া যায় বৃহৎ বৃহৎ গির্জার মুড়া দেখিতে পাওয়া যায়। মাউন্ট রোডের টারগাপেট মহলের সেন্ট জর্জ ক্যাথিড্রেল, পুন্ডামালী রোডে সেন্ট এণ্ড্রু, আর্মোনিয়ান ষ্ট্রীটে রোমান ক্যাথলিক গির্জা, সেন্ট টমাস মাউন্ট চার্চ গির্জাগুলি প্রাচীন ও বৃহৎ।

মাদ্রাজের যান বাহনের খুব স্ববিধা ট্রাম, ব্যাস,

ইলেকট্রিক রেল, মোটরকার প্রচুর ও ভাড়া সস্তা। বাসে ১০, ১৫, ২০ ভাড়ায় ৪।৫ মাইল পথ যাওয়া যায়। সাউথ ইণ্ডিয়া রেলের প্রধান ষ্টেশন এম্বর হইতে মাদ্রাজ বীচ ও হারবার পর্যন্ত প্রতি ১০ মিনিটে ইলেকট্রিক ট্রেন যায়। এই ইলেকট্রিক ট্রেন মাদ্রাজের সহরতলীর প্রায় বিংশ মাইল দূর হইতে যাত্রী বহনে খুব স্ববিধা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে পুনা পর্যন্ত ও ইলেকট্রিক ট্রেনপথ আছে। ইহাতে ধুম নাই শব্দও কম। কলিকাতায় এ স্ববিধা নাই এ বিষয়ে কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইতে পশ্চাতে রহিয়াছে।

পরিচিত ব্যক্তি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বিমান বিহারী দে ও মাদ্রাজ স্কুল অব আর্টসএর অধ্যাপক খ্যাতনামা শিল্পী দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরীর সন্মানে বহির্গত হইলাম। মাদ্রাজের রাস্তার নাম বা পল্লীর সন্ধান কিছুই জানি নাই। মাদ্রাজের লোক হিন্দী আদৌ বোঝে না কিন্তু ভাষা ইংরাজি সকলে বুঝিতে পারে। কথা বলার অস্ববিধা দক্ষিণ অঞ্চলে ভোগ করিতে হয়। কংগ্রেসের জোর করিয়া হিন্দী ভাষা প্রচলন করা অশ্রায় ও জুলুম, প্রাদেশিক ভাষার ক্ষতিকর। ইংরাজিতে আলাপ করিয়াই প্রথমে আর্ট স্কুলে যাওয়া গেল। ক্রমশঃ

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

আন্তর্কলেজের ছাত্রীদের দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা

ব্যায়ামশীলন মানব মানবীকে সুস্থী, সুস্থাম ও সুন্দর করে। সহরের মেয়েদের মধ্যে ডিল, লাঠিখেলা, ছুরীখেলা, যুযুৎস, লাক্সামনৃত্য, ব্রতচারী নৃত্য, টেনিস, বাণ্ডমিটন, নৌচালন, সস্তরণ, দৌড়-ঝাঁপ প্রভৃতি খেলার উৎসাহ দেখিয়া আনন্দ ও আশা হয়। কলিকাতায় মার্কার্স স্কোয়ারে ভিক্টোরিয়া, বেথুন, স্কটিশ চার্চ, আশুতোষ, বিজ্ঞানাগর মেডিক্যাল ও ল কলেজের ছাত্রীদের দৌড়-ঝাঁপ খেলার প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে।

খেলার উৎকর্ষতা ও উৎসাহ বেশ হইয়াছিল। সর্বপ্রকার খেলার প্রতিযোগিতায় স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রীরা চরম উৎকর্ষতা দেখাইয়া দলগত চ্যাম্পিয়ান শিপ “শ্রেষ্ঠ সম্মান” লাভ করিয়াছেন। এই কলেজের ছাত্রী

কনক গাঙ্গুলী ব্যক্তিগত “শ্রেষ্ঠ সম্মান পদ” পাইয়াছেন। গত বর্ষ এই সম্মান ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী কৃষ্ণা সেন পাইয়াছেন।

শত গজ দৌড়ে বিয়াটিস মর্গান (স্কটিশ) ও অপিতা দাস (আন্ত), লক্ষা ঝাঁপে সুসী পান্না (স্কটি) ও শোভা বসু (ভিক), দুই শত গজ দৌড়ে প্রীতি বসু (ভিক) ও কনক গাঙ্গুলী (স্কটি), বর্ষা ক্ষেপনে অর্পণা সেন (আন্ত) রমা নিগুণী (ভিক), চামচ মুখে দৌড়ে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (স্কটিশ) ও কনক গাঙ্গুলী, সটপুটে কনক গাঙ্গুলী ও কৃষ্ণা সেন, অন্তরায় দৌড়ে কনক গাঙ্গুলী ও কৃষ্ণা সেন, কলসী মাথায় দৌড়ে নীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (স্কটি) ও বাদল রাণী রায় (ভিক), দৈর্ঘ্য পূর্ণ দৌড়ে কৃষ্ণা সেন ও স্বর্ণ বসু (ভিক), চোখ বাঁধা দৌড়ে আরতি রায় (ভিক) ও বেঞ্জা-

গিন্ (স্ফটি) প্রথম ও দ্বিতীয় হইয়াছে। নন্দগাঁৱ মহারানী পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই অস্থায়ীনের সভানেত্রী শ্রীমতী ব্রজাকুমারী রায় এবং খেলার ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়িকা বিল শ্রীমতী ডাঃ স্ববর্ণা মিত্র ও গিন্ বহু।

ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকা কলেজে লেডী লিনলিথগো

দিল্লির আলিপুর রোডে ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজের নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন করিয়াছেন বড়লাট পত্নী। তিনি উৎসবে কয়েকটা সারবান কথা বলিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে যখন তাঁহার সঙ্গে মহিলাদের ভোট দিবার কথা আলোচনা হয় তখন তিনি তাহার পক্ষ-পাতী ছিলেন না। বর্তমানে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে ভোটাধিকার নাগরিক জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে এবং নারীত্বের আদর্শের সহিত ইহার একত্র রহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়।

তিনি মনে করেন ভারতীয় নারীদের মধ্যে স্বভাবতঃই মেয়েলীপনা অধিক পরিমাণ রহিয়াছে। ভারতীয় নারী অধিক নির্ভরশীল। তিনি বলেন ভারত নারীকে এখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণে তাহাদের জীবনের আদর্শ গঠিত করিতে হইবে।

ঠিক কথা! তাহা হইলে ভারত নারী দেবী না হইয়া মহামানবী হইবে। আজকাল নারীরা দেবীত্ব চাহেন না মানবীত্ব চাহেন। তবে মানবীরা দেবীর ষড়ঐশ্বর্যের দাবীও করেন।

পরলোকে স্ত্রীশ্রমী সেন গুপ্ত

নারায়ণ, মানসী ও মর্শ্ববাণী ও অমৃতর লেখিকা শ্রীমতী স্ত্রীশ্রমী সেনগুপ্ত গত ২৪শে মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি বহু বৎসর নীরবে সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

নারীর সামরিক শিক্ষা

এয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের ব্যায়াম মন্দিরের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ছাত্রীরা ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিয়া সকল দর্শককে মুগ্ধ করিয়া দেয়। উৎসব সভায় সভাপতি শ্রীমন্ত সঙ্গম লাল মেয়েদের সামরিক শিক্ষা প্রদান করিবার জন্ত বহু তর্ক ও যুক্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন শারীরিক দুর্বলতাই আজ নারীর লাজনার হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহিলাগণ কাহারও “অস্থাবর সম্পত্তি” নহে এবং তাহাদিগকে লুণ্ঠনের দ্রব্য বলিয়া আর কোন জাতি মনে করে না। পৃথিবীর অন্ত কোন দেশই পর নারীকে এমন লালসার দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করে না। মহিলাদের

সর্বপ্রকার শঙ্কা ও ভয় দূর করিতে হইলে তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে।

আত্ম-রক্ষায় সক্ষম মহিলাই দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ। তিনি আরো বলিয়াছেন বিশ্ব বিভাগয়ের টেনিং কোরে ছাত্রদের যেমন সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয় তেমনি সামরিক শিক্ষার কৌশল ও প্রথা শিখাইবার ব্যবস্থা ছাত্রীদেরও করা কর্তব্য। বর্তমানে মহিলাদিগকে বন্দুক ব্যবহার করিতে দেওয়ার অনেক বাধা ও বিপত্তি থাকিতে পারে। তাহাদিগকে আপাততঃ এয়ার গ্যান সাহায্যে সামরিক কৌশল শিক্ষা দান করা চলিতে পারে। সময়গণনে সাফাৎভাবে না যাইলেও দেশ-রক্ষায় পুরুষকে নানাভাবে সাহায্য করিতে পারিবে।

ইহাতে আর কিছু না হউক সহজে নিজেদের মান-সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। ভারতে বীরাদনা ও বীর জনুনার নিদর্শন ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। এক শত বৎসর পূর্বেও ঝান্সীর রাণীর স্ত্রায় বীরাদনার কীষ্টি স্মৃতিতে রহিয়াছে। বঙ্গনারীর সম্মান ও মর্যাদা রাখিবার ইহাই প্রধান পথ।

মহিলা ব্রতচারী উপশীলন শ্রেণী

২৬শে মাঘ হইতে দেড় মাস কাল ব্রতচারী সজ্জা সরোজনলিনী দত্ত মহিলা বিদ্যাভবনে ব্রতচারীর পণ, প্রথা, নৃত্য ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্ত একটি কেন্দ্র খুলিয়াছেন। অনেক মহিলা শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী এই শিক্ষার ক্লাসে ভর্তি হইয়াছেন। প্রবর্তক মাস্তবর গুরুসদয় দত্তজী এই শিক্ষা কেন্দ্রটি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সরকারী শরীর শিক্ষা-নেত্রী মিস্ মায়ায় পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

স্কুলে স্কুলে বালিকাদের ব্রতচারী প্রথা ব্যায়াম শিক্ষা দিলে এবং ব্রতচারী ব্রতে ভুক্তি নিলে ছাত্রীদের শরীর সুন্দর, সুঠাম, সুশ্রী এবং মন সুনির্মল হইবে। দত্তজীর এ প্রচেষ্টা বাঙ্গালীর বিশিষ্টতায় পূর্ণ; এই প্রথা বাঙ্গালীকে প্রকৃত বঙ্গসন্তান করিয়া তুলিবে।

বালিকা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের স্ব স্ব স্কুল হইতে অন্ততঃ একটা কমিয়া শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা গ্রহণের জন্ত পাঠাইলে দেশ উপকৃত হইবে।

কস্তুরীবাঈ গান্ধীর কারাবরণ

জননী কস্তুরীবাঈ বুদ্ধ বয়সে যে বন্দিত্ব বরণ করিয়াছেন তাহা কোন সাময়িক উত্তেজনার বা উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে নহে। তাঁহার এই ত্যাগ ও কষ্টকে বরণ যুগ যুগ সঞ্চিত অনাচার ও স্বৈরাচার পীড়িত ব্যক্তিদের বেদনার ফলে। তাঁহার এই ত্যাগ ও পর বেদনার প্রভাবে অচিরে দেশীয় সামন্ত রাজ্য হইতে সকল প্রকার দুঃখ দৈন্য বিদূরিত হইলেই মঙ্গল। বিভূ কস্তুরীবাঈয়ের মঙ্গল কখন।

কেন্দ্র সমিতির কথা

চতুর্দশ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব

প্রদর্শনী:—প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও কেন্দ্র সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক সপ্তাহব্যাপী মহিলা শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়; ১৪ই জাহুয়ারী তারিখে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী মাননীয়া সূচাকদেবী প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। দ্বারোদ্ঘাটনের পূর্বে সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রীস্বন্দ্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী কর্তৃক এতদুপলক্ষে রচিত একটি সঙ্গীত দ্বারা মাননীয়া মহারাণীকে অভিনন্দিত করেন। অতঃপর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সরোজনলিনী নারীমঞ্জল সমিতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

দ্বারোদ্ঘাটন প্রসঙ্গে মাননীয়া মহারাণী বাঙ্গালা দেশের মৃত কুটীর-শিল্পের উন্নতি বিধানার্থে সমিতির কার্যাবলীর প্রশংসা করিয়া বলেন যে প্রত্যেক স্বদেশ প্রেমিকেরই এই সমিতিকে সাহায্য করা ও সহায়ত্ব প্রদর্শন করা উচিত।

প্রদর্শনীতে বাঙ্গালা ও আসামের বিভিন্ন শাখাসমিতি-গুলির শিল্পদ্রব্য ব্যতীত কলিকাতার বিভিন্ন মহিলা-প্রতিষ্ঠানগুলিও তাহাদের শিল্পদ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন।

মহিলা সম্মিলন—১৮ই তারিখে মাননীয়া নদীয়ার মহারাণীর নেতৃত্বে একটি মহিলা সম্মিলনের অধিবেশন হয়, এই অধিবেশনে বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মফঃস্বল সমিতির অনেক প্রতিনিধি এই সম্মিলনে যোগদান করেন। এই সভায় ভারত নারীর আদর্শ ও উন্নতি সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা হয়; মহারাণী বাহাদুরা সম্মেলন-যোগী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রার্থনা সভা—১৯শে জাহুয়ারী প্রাতে স্বর্গগতা সরোজনলিনী মন্তের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানার্থে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী একটি প্রার্থনা সভা পরিচালনা করেন।

স্মৃতি সভা—১৯শে জাহুয়ারী অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় চতুর্দশ বার্ষিক স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়, বঙ্গের গভর্ণর-পত্নী মাননীয়া লেডী ব্রাবোর্ণ সভানেত্রী আসন অলঙ্কৃত করিয়া পুরস্কারাদি বিতরণ করেন। মাননীয়া লেডী ব্রাবোর্ণ সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয় ও বিভিন্ন মহিলা সমিতির শিল্প দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মহিলা সমিতি-প্রতিনিধি সভা—২০শে জাহুয়ারী মফঃস্বল সমিতির প্রতিনিধি এবং সমিতির কতিপয়

সদস্য লইয়া একটি আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি বহু প্রতিনিধি স্ব স্ব স্থানের মহিলা সমিতি পরিচালনে কি কি অসুবিধা অর্ভব করেন এবং কি ভাবে সেই অসুবিধা দূর হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐ দিনই মফঃস্বলের প্রতিনিধিগণকে কলিকাতার বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহ প্রদর্শন করা হয়।

নলিনী-দিবস—বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এবারও নলিনী-দিবস পালন করা হয়। নলিনী দিবসে সমিতির সাহায্যার্থে সাধারণের কাছে “নলিনী-পতাকা” বিক্রয় করা হয়। যে সমস্ত কর্মী এই নলিনী-দিবসে “পতাকা” বিক্রয় করিয়া এবং যে সমস্ত সহায় ব্যক্তি এই পতাকা ক্রয় করিয়া সমিতিকে সাহায্য করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রীতি সম্মেলন—২১শে জাহুয়ারী একটি প্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। সমিতির প্রধান সম্পাদক রায় বাহাদুর ইন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিথিদের অভ্যর্থনা করেন। প্রায় ২ শত অতিথি এই সম্মেলনে যোগদান করেন, তাহাদের প্রত্যেককে সামান্য জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

সরোজনলিনী বক্তৃতা—২১শে জাহুয়ারী রায় বাহাদুর থংগেনাথ গিঞ্জ “বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক অবদান” সম্বন্ধে ৫ম সরোজনলিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটি বেশ মনোরম ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

প্রচার কার্য—আলোচ্য মাসে কেন্দ্র সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত হুদীর লাল সরকার ও মহিলা কর্মী আসান-সোল মহিলা সমিতির বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করিয়া মহিলাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে তথায় ম্যাজিক লঠনের সাহায্যে বিভিন্ন সমিতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হয়।

নদীয়ার অন্তর্গত শান্তিপুুরের পুরাণ পরিষদের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্তা স্ববোধবালা ঘোষ মহিলাদের আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

মুখ্য ও গৌণ

প্রথমে সূর্যের অসহ্য তাপের নিচে চলছে আমাদের চাষীদের জীবন —সংগ্রাম। যে-অবস্থার মধ্যে তা'রা বাস করে তা মোটেই স্বাস্থ্যের পক্ষে অস্বস্তিকর নয়; এমনকি জীবনের অতি সাধারণ অনেক আনন্দ ও তাদের কাছে ছলভ। কিন্তু সব চেয়ে বেশী দুঃখের কথা এই যে, সারা বছর ধরে খেটে যে জীবনী শক্তিও কক্ষক্ষমতা এরা হারায় তা পরিপূরণ করবার সুযোগ খুব কমই এরা পেয়ে থাকে। সেই জন্যই এ-দেশের চাষীদের এত সহজে নানারকম রোগে আক্রান্ত হ'তে দেখা যায়। তা ছাড়া এদেশের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয়, যে, এরা না পায় দু'বেলা পেট ভরে খেতে, আর যা খায় তাতে না হয় এদের শরীরের উপযুক্ত পুষ্টি।

যখন ভারতীয় চাষীদের মধ্যে চা পানের প্রচলন ছিল না তখন এদের জীবন ছিল আরো দুর্কিম্বহ। তখন এদের সকালে আনন্দ দেবার এবং দুপুরে বিকেলে ক্লান্তি দূর করে নতুন শক্তি জোগাবার কোন কিছুই ছিল না। চা এসে তাদের এই অভাব খানিকটা মিটিয়েছে, কেন না, অতি সামান্য খরচায় আজ তারা এমন একটা পানীয় পাচ্ছে যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

পল্লীর উন্নতির কথা আজ সবার মুখে। অথচ পল্লীজীবন আজও চলেছে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সেই বাঁধা রাস্তা ধরে। আজ ও আমাদের পল্লীবাসী ভাগ্যের উপর নির্ভর করে নিরানন্দময় জীবন যাপন করছে। শিক্ষাব্রতী কল্যাণকর্মীদের উপর আজ এদের মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দেবার ভার পড়েছে। তাঁদের সেই কাজে মুখ্য ও গৌণভাবে কি কম সাহায্য করছে চা-প্রচারকের দল? চা প্রচারকেরা যে কেবল “আনন্দময় পাত্রের” বাণীই বহন করে নিয়ে চলেছে তা নয়, তা'র সঙ্গে তা'রা নিয়ে চলেছে পরিচ্ছন্নতার, আরামের আর আনন্দের বাণী। পল্লীবাসী অসংখ্য জনগণের মধ্যে এই আনন্দ-সঞ্চারের আয়োজন আমাদের দেশের লোকের পক্ষে যে একান্ত দরকার তা সবাই স্বীকার করবেন।

চাষীদের জীবন-যাত্রাকে উন্নত করে তোলা সহজ

কাজ নয়। এদের মধ্যে চা-পানের প্রসার হলে যে খানিকটা পরিমাণে তা উন্নত হবে তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

যে কোন দিক থেকেই দেখা যাক, এ-দেশের অসংখ্য জনসাধারণের পক্ষে চা বিশেষ উপযোগী। যে সব গুণে আজ চা সারা জগতের সবচেয়ে প্রিয় পানীয় হয়ে উঠেছে, সে গুলোকে ভাল করে উপলব্ধি করতে হলে চায়ের প্রকৃতিটাকেই ভালোভাবে জানা দরকার। চায়ের জনপ্রিয়তার কারণ সম্বন্ধে উইলিয়াম ইউকার্স তাঁর “অল এবাউট টি” নামক বিখ্যাত বইয়ে লিখেছেন:

চা লোক পান করে কেন? কারণ চা লঘু ও সাধারণত সহজ পাচ্য; চা উষ্ণ অথচ গরমের সময় শ্বৈদ নিশ্বাসের দ্রবণ এর উষ্ণতা শীতলতাই এনে দেয়? এর স্বাদ ও গন্ধ চমৎকার; এবং সকলের চেয়ে বড় কারণ এই যে চা স্নায়ু ও মাংশপেশীর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে—যার ফলে মনের এমন একটা অবস্থা হয় যাকে মৃদু উত্তেজনা এবং সহজ আরামের অল্পভূতির মাঝ মাঝি একটা অবস্থা বলা যেতে পারে।”

এ-সব কারণে, এমন আর কোন পানীয় আছে যা এই চায়ের স্থান অধিকার করতে পারে? সারা পৃথিবীর সমস্তদার লোক চায়ের এ-সব গুণ আবিষ্কার করেছে বলেই আজ সর্বত্র চায়ের এত আদর। চা হচ্ছে সর্বত্র পানীয়। গরমের সময় চা খেলে দেহ শীতল থাকে; শীতের সময় চা শরীর উষ্ণ করে তোলে।

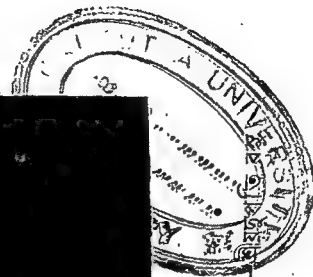
কখনো কখনো এরকম মন্তব্য শোনা যায় যে, চা হচ্ছে একটা বিলাস। হ্যাঁ, বিলাসই বটে; তবে এ বিলাস দরিদ্রতম ব্যক্তিও উপভোগ করতে পারে। এ দেশে যারা নতুন চা খেতে শিখেছে তাদের মধ্যে অনেক অতি-দরিদ্র ব্যক্তিই সাক্ষ্য দেবে যে এই ‘বিলাস’ কিন্তে তাদের বলতে গেলে প্রায় কিছুই খরচ হয় না।

এর অন্তর্নিহিত গুণ, এর স্বলভতা এবং এর যোগ-প্রতিষেধক শক্তির দ্রবণই চা আজ ভারতের জাতীয় পানীয় বলে খ্যাতি লাভ করেছে।

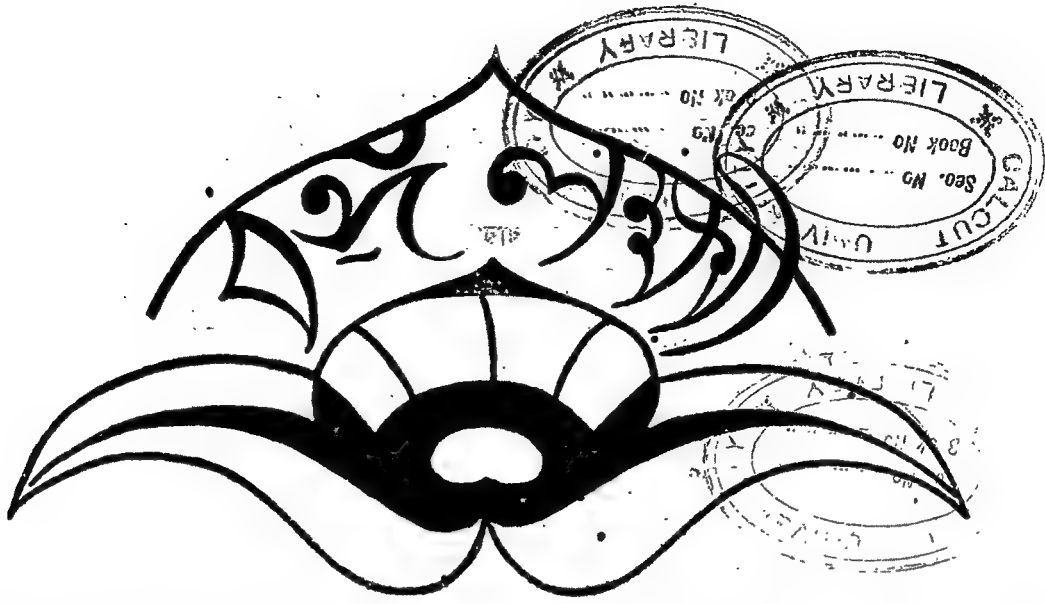
বঙ্গলক্ষ্মী—



বিশাখ (উড়কটি)



শিল্পী



চতুর্দশ বর্ষ

চৈত্র, - ১৩৪৫

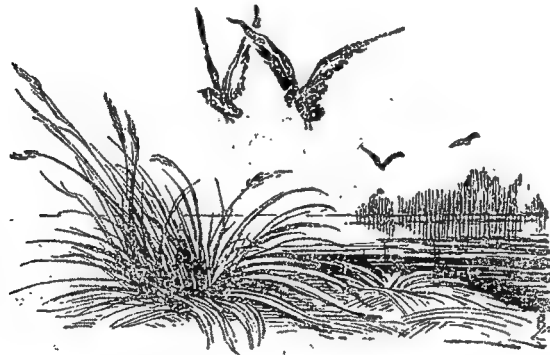
৫ম সংখ্যা

লর্ড ব্রাবোর্ণ

গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী বেল। এগারটার পর কলিকাতা সহরময়
একটি সাম্প্রতিক সংবাদ প্রচারিত হল, বাংলার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ
মাই; রোগমুক্তির জন্য তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয় কিন্তু সুফল
পাওয়া গেল না। মানুষ আজ আছে কাল নাই—প্রত্যহই এ ঘটনা
ঘরে ঘরে প্রত্যক্ষ কিন্তু লর্ড ব্রাবোর্ণের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে সহরবাসী
পুরুষ নারী সকলকেই ব্যথা দিয়েছে আত্মীয়-বিচ্ছেদের মত। দেশ
শাসন করতে এসে তিনি দেশবাসীর সঙ্গে অনেকটা আত্মীয়ের মত
ব্যবহার করছিলেন;—লেডি ব্রাবোর্ণকেও আমরা কম আত্মীয়ার
মত নিজের কাছে পাই নাই। বাংলার প্রায় সকল নারী-প্রতিষ্ঠানেই
তিনি নিজে এসে আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়ে গেছেন নারী-উন্নতির
প্রতি। বলতে গেলে সেদিন, ১৯শে জানুয়ারী আমাদের পাশে
দাঁড়িয়ে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতির ও শিল্প-শিক্ষালয়ের
পারিতোষিকগুলি বিলিয়ে গেলেন কত শ্রীতির সঙ্গে কি সুন্দর ভাবে।

তখন কে জানতো, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর বৃকে এমন নিদারুণ বজ্রাঘাত হবে !

যাঁর স্বামী গিয়েছেন তিনিই জানেন এই শোকের,—প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের অসহ্য বেদনা কি ! এর উপরে প্রলেপ দেওয়া সহজসাধ্য নয় সামান্য মানুষের পক্ষে । আমাদের ভাষা নাই সাস্তুনা দেওয়ার, তাঁকে সুস্থ করবার ! কী সুন্দর রূপবান, গুণবান স্বামী তিনি হারালেন, তিনি ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারবে না সহজে । তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেন নিজের দেশে অভাবনীয়-অকথনীয় বেদনা নিয়ে । রেখে গেলেন নিজের প্রিয়তমকে ভারতের মাটিতে শুইয়ে । এই স্বপ্নে ভারত তাঁর কাছে চিরদিন অন্তরের সামগ্রী হয়ে রইল । ওই মাটিতে তাঁর স্বামী রয়েছে, এ কথা তিনি কোন দিনও ভুলতে পারবেন না । আমরা, ভারতের সকল নারী আজ তাঁর মর্মবেদনার ভাগ নিচ্ছি । তাঁকে জানাচ্ছি, ভারত ও ইংলণ্ড তাঁর কাছে আজ এক । তাঁর প্রতি অন্তরের প্রেম পাঠাচ্ছি, ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন ।



লক্ষ্মী

(গল্প)

মণিকার বিমাতা সরযু, ভাতুস্পুত্রীর সান্নিধ্য নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া একেবারে শয্যা লইল। মণিকার পিতা সতীশ বাবু কাচারী হইতে ফিরিয়া ক্লাবে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন রাত্রি সওয়া নটা। ক্লাবে তিনি বড় একটা যাইতেন না, নেহাত্ যেদিন মজ্জেলরা আসিয়া না পৌঁছিত, সেদিন বাহির হইয়া পড়িতেন।

ক্লাব হইতে ফিরিয়া সম্মুখে মণিকার বৈমাত্রেয় ছোট ভগিনী, তনিমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—

—তুমি-মা! তোমরা বাড়ী ফিরলে কখন?

তনিমা পিতার প্রতি চাহিয়া বলিল—সন্ধ্যার পর।

—তোমার মা কোথায়?

—শুয়ে আছেন।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে সতীশবাবু বলিলেন—এখন শুয়ে! শরীর ভাল আছে ত?

—তা তো কিছুই বলেন নি! শুধু বললেন, আমাকে কেউ বিরক্ত করিসনে।

কত্থাকে আর কিছু না বলিয়া সতীশবাবু উপরে যাইলেন। শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দেখেন—ঘর অন্ধকার। ইলেকট্রিকের সুইচ টিপিতেই দেখিতে পাইলেন, দেওয়ালের দিকে মুখ রাখিয়া শয্যায় সরযু শুইয়া আছে।

হাতের লাঠিগাছটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া খাটের কাছে গিয়া বলিলেন—সরযু! এখন শুয়ে যে?

কোন জবাব না পাইয়া স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—গা তো ঠাণ্ডা দেখছি! মাথা ধরেছে কি?

তথাপিও অপর পক্ষের কোন সাড়া না পাইয়া, সতীশ বাবু স্ত্রীর পাশে বসিয়া তার ললাটে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

বিরক্তিরে সরযু স্বামীর হাত ঠেলিয়া দিল।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

সতীশবাবু বলিলেন—মাথাটা একটু টিপে দি, ছেড়ে যাবে..

—থাক! আর আদিখ্যেতা ক'র নেই, খুব হয়েছে!

—স্ত্রীর কণ্ঠে সতীশবাবু বুঝিতে পারিলেন যে তার রাগ হইয়াছে। একপ কণ্ঠের সহিত তাঁর পরিচয় আছে। স্ত্রীবে শান্ত করিবার জন্য তিনি বলিলেন—আদিখ্যেতা কেন সরযু! তোমার কষ্ট কি আমি দূর করতে চাইনে?

সরযু শয্যায় উঠিয়া বসিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—তা হ'লে আর আমার দুঃখ কি! আমার যেমন মরণ ছিল না—তাই দোজবেবে এঁটোপাত কুড়ুতে এসেছিলাম!

সতীশবাবু মুহূ হাসিয়া বলিলেন—সে জন্তে আর এখন আপশোষ ক'রে লাভ কি বল! আজ হঠাৎ তোমার এত রাগ হলো কিসে? জ্ঞানতঃ আমি তোমার চরণে কোন অপরাধ করেছি বোলে ত মনে হচ্ছে না!

—তোমার আর দোষ কি! যত দোষ আমার!

—তোমার দোষই বা কে বলেছে!

—কেন বলবে না! ছুনিয়া শুদ্ধ লোকই বলেছে!

—হাসিয়া সতীশবাবু বলিলেন—ছুনিয়াটা এর মধ্যে ঘুরে এলে না কি?

সরযু ব্র কুঁচকাইয়া বলিল—দেখ, তোমার হাসি দেখলে আমার গা জলে যায়!

—আচ্ছা আর হাসবো না—কিসে তোমার গা ঠাণ্ডা হয়, তাই না হয় বল?

—তোমার আর কি—এক কাচারী, আর বাড়ী। এ ছাড়া আমার মত ত সব যায়গায় যেতে হয় না!—কাজেই হাসি ঠাট্টা নিয়ে থাকতে পার...

—তুমি গেলে ভাইবির সাথে নেমন্ত্রণ খেতে—তখন ত বেশ হাসি খুশীই দেখেছিলাম—ফিরে এসেই বা এত গা জলুনি কিসের—তা শুনি ত আগে?

—তুমি ত আর মেয়ের বিয়ে দেবে না! লোকের খোঁচা আমাকেই সহ্যে হয়।

—তার জন্তে তোমাকে কেন খোঁচা সহ্যে হবে!

—কেন হবে—তা ত জানিনে! মণিকে দিগেই হয়েছে আমার জালা!

—মণি আবার কি অপরাধ করল! সে অতি ভাল মানুষ। তার স্বভাব, তার মার মত হয়েছে!

—বেশ গো বেশ! তোমার বোঁ, মেয়ে সব ভাল! যত মন্দ আমরা, তুমিই যদি এমন বলবে তবে পরে বলবে না কেন! বলিয়া সরষু মুখ খানা হাঁড়ী করিয়া লইল।

সতীশ বাবু বলিলেন, কি মুন্সিল! আমি কি তাই বলেছি—তোমরা মন্দ কেন হবে! আমি বললাম, মণি ত বোকা নয়, যে তাকে নিয়ে তুমি দুঃখ পাবে। সে তো কোন দিনই তোমার অবাধ্য হয় নি! তিন বছরের মেয়ে, তুমিই তাকে মানুষ করেছ, সে তো তোমাকেই মা বোলে জানে! তুমিও তাকে কম ভাল বাস না!

স্বামীর কথায় সরষুর রাগ শান্ত হইয়া আসিল। সে বলিল—বলত তুমি? আমার কি ইচ্ছা যে মণির বিয়ে না হয়!

—কে বললে অসাধ!

—ঐ যে গো, তোমার নদিদি! উনি আবার দাদার মেয়ে খুকীর মামী-স্বাণ্ডী কি না!

—তিনি কি বললেন?

—বললেন, কি গো বোঁ! বড় মেয়ের বিয়ে না দিয়ে গুনছি ছোট মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করছ? আজ যদি মণির মা বেঁচে থাকতো তা হলে কি একুশ বছরের আই বুড়ো মেয়ে নিয়ে নাকে তেল দিয়ে তোমার মত ঘুমতো! অমুককে বোলে যে তনীর বিয়ে বন্ধ রেখে, ঐ পাত্রে মণির বিয়ে দিক তার নদিদি বলেছে।

—সতীশ বাবু বলিলেন, নদিদি, ওবাড়ীর শ্যামা পিসির মেয়ে না?

—হ্যাঁ।

—কথাটা কিন্তু সে মন্দ বলেনি সরষু! তবু এখন এই সতের বছরের হলো। ওকে আরও দু এক বছর রাখা

যাবে। পাত্র পক্ষেরা মণিকে দেখেছে। তাদের তবু চেষ্টে মণিকেই বেশী পছন্দ হয়েছে।

স্বামীর কথায় সরষুর রাগে মুখ খানা লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, ঐ পাত্রের আমি তনিকে দেব, মণির জন্তে তুমি অন্য ছেলে দেখ!

—এখন আবার আমি অন্য ছেলে কোথায় পাবো?

—তা—আমি কি জানি!

—ও সব কথায় কাণ দিও না। তবু বিয়েটা হোক... পরে ছেলে পেল, মণির বিয়ে দেব।

—তা হবে না...তনীর আগে মণির বিয়ে দিতেই হবে।

—কি অবুঝের মত বলছ, সরষু! বাংলা দেশে পাত্র পাওয়া কি সোজা কথা!

—সে আমি জানিনে! এ যদি না হয়, ত আমি আফিং খেয়ে মরব! লোকের কথা আর আমি গুনতে পারব না!

—আচ্ছা বিপদ! এখন পাত্রের আমি কোথা থেকে আনি বল দেখি?

—খোঁজ কর...

—খোঁজ করলেই ত আর হবে না! টাকাও ত চাই...

—টাকা আর বেশী কি লাগবে!

আশ্চর্য হইয়া জ্বীর পানে চাহিয়া সতীশ বাবু বলিলেন—বেশী লাগবে না!

—কেন লাগবে! এমন ছেলে দেখ, যাতে কম খরচে হয়!

—হুঁ! আজকালকার দিনে, মেয়ের বিয়ে কোন ছেলেতেই কম পয়সায় হয় না!

—হয় গো...হয়!

বিরক্ত হইয়া সতীশ বাবু বলিলেন—হয় ত তুমি পাত্রের আন!

—হ্যাঁ আনব।

—বেশ, আমারও বিয়ে দিতে অমত নেই! তবে মেয়েটা দুটো খেতে পরতে পায় যেন!

—তা পাবে না কেন!

—পাতরটি কে শুনি?

—আমার মানতুতো বোনের ছেলে...হেমন্ত!

—আরে রাম! সে একটা ভ্যাগাব্যাণ্ড! বলিয়া

সতীশ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাগভরে স্বামীর পানে চাহিয়া সরষু বলিল—তবে তোমার পেয়ারের মেয়ে নিয়ে তুমি থেকো...আমি যদি কালই আফিং না খাই তো আমার নাম নয়!

মণিকা তার ছোট ভাই অচিন্তকে কোলে লইয়া আসিয়া বলিল—মা! অচিন্তে এবার তুমি নাও। তারপর পিতার পানে ফিরিয়া বলিল—বাবা! চল, তোমার খাবার দি...।

কত্থার শাস্ত মুখখানির প্রতি চাহিয়া সতীশ বাবু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—চলো মা।

* * *

মণিকার বিবাহের দশ বছর পরের কথা—মণিকার দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। ব্যারাকপুরে হেমন্তর মস্ত বড় দোকান, নাম তার লক্ষ্মী ষ্টোরস। তার ষ্টোরে পেটেট ওয়ুধ হইতে, জামা কাপড়, মনিহারী কিছুই অভাব ছিল না।

একদিন বন্ধু তপতি, মণিকার ঘর দেখিয়া তাকে দরিদ্রতার ইঙ্গিত করিয়াছিল, তা মণিকা গায়ে লয় নাই—আজ তার গৃহসজ্জা কোন ধনী পরিবার হইতে কম নয়।

প্রথম যেদিন স্বামীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়, তখনই মণিকা হেমন্তকে অন্তর দিয়া ভালবাসে। সে বুঝিতে পারে, হেমন্তর মধ্যে মনুষ্যত্ব এখনও মরিয়া যায় নাই—সঙ্গদোষই তার ভাল পথের অন্তরায় হইয়াছে। বিবাহের পর প্রথম যেদিন হেমন্ত তার অসং উপায়ের অর্থ দিয়া প্রসাধনের জিনিষ আনিয়া মণিকার হাতে দিল, সেদিন মণিকার অন্তর দুঃখে ফাটিয়া যাইবার মত হইয়াছিল—কিন্তু সে তাহা প্রত্যাহ্বান করে নাই। যত ব্যথাই পাক, স্বামীর প্রথম প্রেম-উপহার সে হাত পাতিয়া লইয়াছিল, কিন্তু ব্যবহার করিতে পারে নাই।

হেমন্ত স্ত্রীকে যাহা বলিত, যেক্রপ সে ভালবাসিত, মনে শত বাধা উঠিলেও, মণিকা কোন দিন তাহা বাহিরে প্রকাশ করে নাই... এইভাবে ছয়মাস গত হওয়ার পর

একদিন সে স্বামীর কাজে বাধা দিল। হেমন্ত অনেক রকম নেশা করিত। মণিকা মৃদু শাস্তকণ্ঠে বলে—আমার একটা কথা শুনবে?

মণিকা দেখিতে সুন্দরী ছিল, তা ছাড়া হেমন্তর মনের মত সকল কাজ করায়, স্ত্রীর উপর সে খুসীই ছিল। মণিকার স্বভাব ও দৌন্দর্য্যে হেমন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্বের তায় সে আর বাড়ী ছাড়িয়া বাহিরে থাকিত না। ইহাতে বন্ধুমহলে তাহাকে বিদ্রোহী সন্থ করিতে হইত।

মণিকার কথার উত্তরে হেমন্ত তার নেশাভরা চোখ দুটি তুলিয়া বলে—কি বল?

—তুমি এ সব ছেড়ে দাও

—কি সব?

—এই যেখানে যাও!

একটু হাসিয়া হেমন্ত বলে, না গেলে পেট চলবে কি কোরে??

—এত লোকের চলছে যেমন কোরে!

—কার কেমন করে চল, তাত আমার জানা নেই, মণি?

মণিকা বলে, সবাই কাজ কর্তব্য করে।

—আমি ও ত কাজ করি

—ও কাজ ভদ্র লোকের নয়

—কি কাজ?

স্বামীর মুখের ওপর তার বড় বড় চোখ দুটি মেনিয়া মণিকা বলিল—আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা যে উপায়ে টাকা রোজগার কর!

—বুঝলে আর কি করব বল! লেখা পড়া যখন জানিনে আর টাকারও যখন দরকার, তখন এ ছাড়া আর উপায় কি!

—উপায় কিছু হবেই! আমি তোমাকে এ কাজ করতে দেব না!

হাসিয়া হেমন্ত বলিল, উপায়ের ভরসায় থাকতে হলে ডান হাত বন্ধ হবে—পথ ছাড়, আমি যাই

মণিকা বলে, উপোষ করে থাকব সেও ভাল, তবুও আমি তোমাকে এমন করে পয়সা আনতে কিছুতেই দেব না।

—তুমি উপোষ করে থাকতে পার কিন্তু আমার নেশার জিনিষ না হলে একটি দিন ও চলে না!

স্বামীর একখানি হাত ধরিয়া মণিকা বলে, তোমাকে আমি জোর করতে চাইনে, শুধু এইটুকু তোমার কাছে আমার ভিক্ষে। আমার ভয় করে কোনদিন হয়ত শুনব তুমি জেলে গেছ! মণিকার দুটি চোখে জল ভরিয়া আসে।

তার চোখে জল দেখিয়া হেমন্তর মনে আঘাত লাগে। সে যত মন্দই হোক, নারীর সহিত তার কোনদিন পরিচয় ছিল না। মণিকাই তার হৃদয়ের প্রথম প্রেম-স্বর্ঘ্য পাইয়াছিল। স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইয়া সে বলিল

—কেন্দ না মণি! আমি চেষ্টা করব এ সব ত্যাগ করবার...তবে এতদিনের অভ্যাস ছাড়া বড় কঠিন।

মণিকা বলে—তুমি আমাকে ছুঁয়ে বল...আজ থেকে ওখানে আর যাবে না?

—তা হয় না মণি! কাল আমাদের মন্ত একটা ফিষ্ট আছে...আজ আমাকে যেতেই হবে! হেমন্ত বাহির হইয়া যায়। পিছনে চাহিয়া দেখে, মণিকা দাঁড়াইয়া আছে জানালার ধারে, তার দুটি চোখে অশ্রু। মনে কেমন একটা বেদনা লইয়া সে আড্ডায় যায়...সেখানে গিয়া শোনে, পুলিশ তাদের সন্ধান পাইয়াছে, আড্ডা অগ্নজ উঠিয়া যাইবে।

সে বলে—ভাই! আজ থেকে আমি এ পথ ছাড়লাম। এ লুকোচুরী আমার আর ভাল লাগে না।

একসঙ্গে সকলেই তার মুখের পানে চায়।

আড্ডার একজন বলে—হঠাৎ আজ হলো কিহে?

অপর একজন বলে—জানিস নে! আজকাল যে চাঁদমুখ ছেড়ে হেমার আর আসতে ইচ্ছে হয় না! তিনি হয়ত মন্তর পড়েছেন! শুনিছি তিনি লেখাপড়াও জানেন!

বিরক্ত হইয়া হেমন্ত বলে—মেয়েদের কথা নিয়ে টানিসনে বলছি!

—ইস! বড্ড যে টান দেখছি! একবার যদি স্ত্রীধর দর্শন মেলে, তখন বোয়ের মুখ আপনিই ভুলে যাবে!

রাগিয়া হেমন্ত বলে—যত সব হতভাগা! মুখের কোন আগ-চাকু নেই!

—করি ত বাবা! গুণামি আর বাটপাড়ি! তাতেও আবার মুখে ঢাকন দিতে হবে!

আজ ইহাদের সঙ্গ হেমন্তর খুব বিশ্রী লাগিতেছিল। একটি ছেলে গাঁজার কলিকাটি তার সম্মুখে ধরিয়া বলিল,

—নে! দুটো টান দে! তখন আর এসব কথা কানে খারাপ লাগবে না।

হাত দিয়া কলিকাটি ঠেলিয়া দিয়া হেমন্ত আড্ডা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। তার চোখের সামনে ভাসিতেছিল স্ত্রীর অশ্রু-সজল মুখখানি।

এত সম্বর স্বামীকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া মণিকা বিস্মিত হইয়া চাহে।

হেমন্ত বলে—মণি! আজ থেকে সব ছাড়লুম! এখন তুমি যে পথে চালাবে সেই পথে যাব!

আনন্দে মণিকা স্বামীর পায়ের ধুলো নেয়! প্রতি বৎসর এই দিনটিতে মণিকা সত্যনারায়ণের পূজা খুব যত্ন করিয়া করিত, আর দরিদ্রদের দান করিত।

মণিকার পরামর্শে হেমন্ত তার গহনা বিক্রয়ের টাকা দিয়া কলিকাতা হইতে মনিহারী জিনিষ অল্প মূল্যে কিনিয়া আনিয়া পাড়ায় পাড়ায় এবং নিকটবর্তী গ্রামে ফেরী করিত। ইহার জন্য মণিকা স্বামীকে একখানি বাইসিকেল কিনিয়া দিয়াছিল। হেমন্ত বুদ্ধিমান ছিল। শীঘ্রই সে ব্যবসা বৃদ্ধিতে পারিল। বহুকষ্টে সে নেশা গুলি ত্যাগ করিয়াছিল।

বছর তিন লাভের অংশ মণিকা জমাইয়া রাখিয়াছে। তাহা হইতে একখানি ছোট দোকান খোলে। স্থলভে জিনিষগুলি পাওয়ায় গ্রামবাসীদের বড় সুবিধা হইয়াছিল। সপ্তাহে দুইদিন হেমন্তর দোকান সকাল হইতে বেলা বারটা পর্যন্ত খোলা থাকিত। তারপর নিকটবর্তী গ্রামে সে ফেরীর জিনিষপত্র লইয়া যাইত। অতি সম্বরই হেমন্তর উপর মা.লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টি হওয়ায় ক্রমেই মণিকা দোকানের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। তাহাদের পাড়ার শিক্ষিত দু'টি ছেলেকে দোকানের কাজের জন্য মাহিনা দিয়া রাখিল। হেমন্তর সংপথে আসায় গ্রামের সকলে খুশী হইয়াছিল। তার জননীকে সকলেই ভালবাসিত।

হেমন্তর লক্ষ্মীভাগ্য দেখিয়া প্রতিবাসিনীরা বলিত—“হেমুর মা! তোমার বোটি বড় পয়মন্ত!

আনন্দভরা কণ্ঠে হেমন্তর জননী বলিতেন—হ্যাঁ দিদি! বোমাই যে আমার হেমুর লক্ষ্মী.....

হেমন্ত সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ার পর স্কুল ছাড়িয়া দিয়া গ্রামের যত বখাটে ছেলেদের সহিত মিশিয়া এক নম্বরের গুণ্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিতাকে সে দেখে নাই। বিধবা জননীকে কোনদিনই ভয় করিত না। অতি কষ্টেই তার মা, নিজের এবং ছেলের আহ্বারের জোঁগাড় করিতেন।

মাঝে মাঝে হেমন্ত ছু'একদিন বাড়ী আসিত না, কিন্তু যখন ফিরিত, তখন জননীর হাতে কিছু কিছু অর্থ আনিয়া দিত। সে কোথা হইতে পরসা পাইল—তার মা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত—তোমার অত খোঁজে কাজ কি বাপু! এনে দিলাম...নাও।

মধ্যে একবার হেমন্তের জননী ঐ অর্থের পরিচয় পাইয়া জলভরা ছুটি চোখে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া, তার ছুটি হাত ধরিয়া বলিলেন—লক্ষ্মী বাবা আমার! এমন ক'রে লোকের পকেট কেটে টাকা এনো না—টাকায় আমার কাজ নেই।

বিরক্ত হইয়া হেমন্ত বলে—তবে খাবে কি?

না খেয়ে কেউ মরেনা হেমু! ভিক্ষে ভাল, তবু চুরি ভাল নয়। তোর বাপ ঠাকুরদা কত পুণ্য আত্মা ছিলেন, তুই যে তাঁদের বংশধর! হেমন্তর মায়ের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু বরিয়া পড়ে।

হেমন্ত বলে—আচ্ছা, আচ্ছা...তাই হবে, তুমি কেঁদোনা।

ছেলেকে যখন কিছুতেই থরমুখো করা যায় না, তখন হেমন্তর মা ভাবিলেন, একটি ভাগর দেখে মেয়ে বিয়ে দিয়া আনিলে, ছেলের তাঁর ঘরে মন বসিবে। প্রতিবেশিনীরাও তাঁকে এই পরামর্শ দিল। তাই তিনি আত্মীয় কুটুম্ব সকলকেই পুত্রের বিবাহের জন্ত জানাইয়াছিলেন।

বিবাহের সময়, মণিকা যখন হেমন্তের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া শশকে আসিয়া প্রণাম করিল, তিনি তখন দুহাতে পুত্রবধূকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন—মা! লক্ষ্মীছাড়া ঘরে তুমি আমার হেমন্তর ‘লক্ষ্মী’ হোয়ে পাকা মাথায় সিঁদুর পর।

মণিকার খোকার অন্তপ্রাণনে তার শাণ্ডভী—পুত্রকণ্ঠা সঙ্গে লইয়া, সরযুকে বার-বার আসিতে নিমন্ত্রণ করায়, পুত্রকণ্ঠা সঙ্গে লইয়া সরযু ভগিনীর বাড়ী আসিয়াছিল। তনিমা আসিয়া মণিকার কোল হইতে তার পুত্রকে লইয়া বলিল—বাং! খোকা ভারি সুন্দর হয়েছে ত!

হেমন্তর মা হাসিমুখে বলিলেন—হেমুও আমার, ছোটতে ঠিক এমনিটি ছিল!

সরযু বলিল—হেমন্ত মণিকা দু'জনেই সুন্দর...তাদের ছেলে দেখতে ভাল হবেই ত!

তনিমার একটি কন্যা হইয়াছে, তবে—রং কাল, তত ভাল হয় নাই। তনিমার স্বামীর রং কাল, তনিমার রং ফরসা হইলেও স্ত্রী ছিল না, তার মেয়ে পিতার রং পাইয়াছিল।

তনিমাদের সহিত তার বড় মামার মেয়ে তপতীর বন্ধুত্ব খুব বেশী। তার ছেলে মেয়ে কিছুই হয় নাই। স্বামী পশ্চিমে পুলিশ ইন্সপেক্টর। পূজার সময় সে বাপের বাড়ী আসিয়াছিল। মণিকার শাণ্ডভী পৌত্রের অন্তপ্রাণনে উপলক্ষে তপতীর পিতামাতাকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁরা আসেন নাই; আসিয়াছে তপতী, বন্ধু—মণিকার সংসার দেখিতে। সে জানিত যে, হেমন্ত কিরূপ পাত্র।

সকলে ঘর হইতে বাহিরে গেলে, তপতী বলিল, —মণি! শ্বশুর বাড়ী কেমন লাগছে?

পুত্রের জামা বদলাইয়া দিয়া মণিকা বলিল, —বেশ!

ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া তপতী বলিল—বেশ যা.....তা তো দেখতেই পাচ্ছি!

তার পানে চাহিয়া মণিকা বলিল—কেন?

ঘরে তো একটিও আসবাব নেই। তার ওপর হেমুনার যা স্বভাব তাও জানি।

সখির এই কথায় মণিকার মুখে বিরক্তির ছায়া পড়িল! আজ যদি তপতী তার অতিথি না হইত, তাহা হইলে মণিকা তাহাকে ইহার পাঁচটা উত্তর শুনাইয়া দিত। তপতীর স্বামীর চাকরীতে যে চুরির পরসাই ‘উপরি’ নাম লইয়া আসে, আর আহ্বারের পর রাঙে বিনাতি জলপান না করিলে, তাঁর যে নিজা হয় না,—ইহা তপতী গর্ভের সঙ্গেই তার নিকট গল্প করিয়াছে।

হেমন্ত আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

মণিকা পুত্রকে দোলনায় শোয়াইয়া, স্বামীর চটি এবং গামছা আনিয়া, তার হাত হইতে কামিজটি লইয়া আলনায় রাখিয়া দিল।

তপতি বলিল—হেমুদা! চিন্তে পার?

তার পানে চাহিয়া হেমন্ত বলিল—কে? তপু! চিন্তে পারব না, কি রকম!

হাসিয়া তপতি বলিল—মণি যে আমার বন্ধু!

—ও! তাই বুঝি!

—হ্যাঁ! তাই তো ওর ছেলে দেখতে পিসিমার সঙ্গে এলুম!

—হাসিয়া হেমন্ত বলিল—ও! মণি বন্ধু বোলে এসেছে! আর আমি বুঝি কেউ নই?

—বাঃ! তুমি যে এখন বন্ধুর বর! বলিয়া তপতি হাসিতে লাগিল।

—বটে! বলিয়া হেমন্তও হাসিতে লাগিল।

মণিকা বলিল—তোমার জলখাবার আনব?

—না—

তপতি হাসিয়া বলিল—মণিকা খুব স্বামী-সেবা করে দেখছি!

হেমন্ত বলিল—খুব!

—আজকাল কি করছ, হেমুদা? সেই গুণ্ডামী!

—সে সব বিয়ের বছরেই গেছে! মা যে তাঁর লক্ষ্মীছাড়া ছেলেকে লক্ষ্মী দিয়ে ঘরে বেঁধেছেন!

—তবে মণিকার আঁচল ধরে ঘরের মধ্যে বসে থাক বুঝি?

—তা হ'লে ত বাঁচতাম! তাই বা পাই কই! বলিয়া হেমন্ত মণিকার পানে চাহিয়া একটু হাসিল।

মণিকা বলিল—মা এসেছেন ও ঘরে—

ও! এই যে যাই! তোমার রান্না হ'য়ে গেছে? আমাকে আজ এক্ষণি বেরুতে হবে।

—হ্যাঁ।

হেমন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে, তপতি মণিকার পানে চাহিয়া বলিল—এই জংলি জন্তটিকে পোষ মানালি কি কোরে রে মণি?

—মানুষ কখন জন্ত হয় না, তপু!

—তাইত আশ্চর্য্য হচ্ছি তাই—তোর গুণ আছে!

হেমুদার মত একটা চরম খোর লক্ষ্মী ছাড়া—শুনে ছিলাম মধ্যে পকেট কাটা বিজ্ঞেও হয়েছিল!—তাকে তুই পোষ মানিয়েছিস! তোঁর সেবা যত্ন দেখেও আমি অবাক হচ্ছি! আমি হোলে কক্ষণে পারতাম না!

—কেন পারতিস্ নে?

—কই পারি! উনি ত রয়েছেন! আমার অতো

সেবা-টেবা-করা আসে না ভাই! আর অতো ক'রে মন জুগিয়েই বা চলতে যাব কেন!

—কি বলচিস্, তপু! স্বামীর যত্ন করলে, কি তার মন যোগান হয়!

—নিশ্চয় হয়! তুই ত দাসীর মত হেমুদার খোসামন্দ করিস্ দেখ্ছি!

—তপু!

—কি?

—তোঁর জন্তে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, ভাই—

—কেন?

—স্বামীর যত্ন করাকে, তুই বলচিস্ দাসীত্ব!

—হ্যাঁ! বলচিই তো! তোঁদের মত কতকগুলো মেয়ের জন্তেই ত আমরা আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পাচ্ছি নে!

—মাথা তুলে দাঁড়াবার আমাদের দরকারই বা কি ভাই!

—বা! চিরদিন ওরা আমাদের দাবিয়ে ঘরের কাজ নেবে, আর আমরা তাই মাথা পেতে সয়ে যাব! সে দিন আর নেই, মণি!

—সে দিন যেন আবার ফিরে আসে, তপু! আমি সেই কামনাই করি! যে দিন নারী তার অন্তঃপুর নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে!

বিজ্ঞপের স্বরে তপতি বলিল—হ্যাঁ! তোঁর কাছে সেই শিক্ষা নিতে সকলকে ডেকে আনিস—বলিস্—ওগো! আমরা দাসীর জাত, গোলামী ক'রেই সন্তুষ্ট থাকব!

দুঃখীত কর্তে মণিকা বলিল—তুই ঠাট্টা করচিস্ তপু! কিন্তু এ দাসত্ব ক'রে কত সুখ তা যদি বুঝতিস্!

—দাসত্বে সুখ?

—হ্যাঁ, তপু!

—কি রকম?

—রজনীবাবুকে তুই ভালবাসিস্?

—এ কথা কেন?

—দরকার আছে—বল্ না?

—স্বামীকে আবার ভাল কে না বাসে!

—তবে যাকে ভালবাসা যায়, নিজে হাতে তার সেবা করতে ইচ্ছে হয় না?

—তা তো কোনদিন মনে হয়নি, মণি!

—ভালবাসাতে আপনিই দাসী করে, তপু!—স্বামী-পুত্রকে ভালবেসে, আমরা যে চিরদিনই নিজেকে বিলিয়ে দিই, ভাই! এই ত আমাদের মেয়ে-জন্মের সুখ!

মণিকার কথাগুলি তপতির মনে আসন বিছাইয়াছিল। সে অভিভূতের স্তায় তার পানে চাহিয়া রহিল।

এপ্রিলের ফুল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসন্তের ফুল তোর-ই

সুখাস্পর্শে ল্যাপা

আমারে করিল আজি

এপ্রিলের খ্যাপা।

পাকা চুল কেঁচে গেল,

বুদ্ধি গেল ফেঁসে

যে দেখে আমার দশা

সেই যায় হেসে।

বিনা বাক্যে ঘটাইলি

এমন প্রমাদ,

তারি সঙ্গে আছে আরো

বচনের ফাঁদ।

আমি যে মেনেছি হার

নিজেরেই ছলি',

অবোধ সেজেছি কেন

কারণটা বলি।

বিপাকের সেতু একা

নহে তরিবার,

পাশে এসে ধরো হাত

জোড়ে হব পার ॥

প্রায় ২৫ বছর আগে সঙ্গীতবিদ
স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট বোন
স্বর্গীয়া নলিনী দেবী রহস্ত ছলে পয়লা
এপ্রিলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে একটি
কবিতা লিখে পাঠান—খামে ভরে
কতকগুলি স্বর্গদ্বন্দ্ব রুরো ফুলসহ।
নলিনী দেবীর কবিতা ও কবির
উত্তর আনন্দের সঙ্গে আমরা বঙ্গলক্ষ্মীর
পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি।

পয়লা এপ্রিলে

৩নলিনী দেবী

দাদামহাশয়গণ

বড় সূচতুর,

কাণায় কাণায় বুদ্ধি

আছে ভরপুর

চিরদিন এই কথা

আসিয়াছি শুনি

বুঝিয়া লইব আজি

কত বড় গুণী

বচনের ফাঁস শুধু

বিপাকের হেতু

তরিতে পারিলে বুঝি

দুর্বিবপাক সেতু।

জাতি গঠনে নারীর স্থান

শ্রীরেণু লাহিড়ী

বর্তমানে পুরুষ ও নারীর শিক্ষা প্রায় সকল দেশেই একধারায় প্রচলিত হইতেছে। নারীর শিক্ষা যে পুরুষের শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত এ বিষয়ে চিন্তা হয়তো অনেকেই করিয়া থাকেন এবং কাগজ কলমে লিখিয়াও থাকেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না। বস্তুতঃ মেয়েদের এ শিক্ষার সার্থকতা কী? অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাহাদের জীবনে এমন দিন আসিয়া উপস্থিত হয়—যখন বিবাহ নামক বস্তুটির নিকট সকলকেই আত্মসমর্পণ করিতে হয়—এবং তাহার পরে সংসারের নানা জটিলতার মধ্যে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিলে কেহই আর সে পূর্ব শিক্ষার চর্চা রাখিতে পারেন না। বরং আপন আপন পুত্রকন্টার প্রাথমিক শিক্ষার ভার বিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু মেয়েদের কাজ ত এ নয়—তাহার শিক্ষার সার্থকতা ত এখানে নয়। নারী শক্তিরূপিনী এ কথা সর্বাঙ্গসম্মত এবং দেশের, জাতির, সমাজের ও সংসারের তাহারা যে শীর্ষস্থানীয় সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাহাদের জীবনের প্রধানতম ধর্ম ও কর্ম হইতেছে জননীও ভাষ্যরূপে পুরুষের আদর্শ সহকর্মী হওয়া এবং এরই মধ্য দিয়ে জাতিকে গড়িয়া তুলি—উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা। এইখানেই নারীর জীবনের চরম সার্থকতা ও তাহার শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ। আমাদের বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষা পরিবর্তন করিবার জন্ত চতুর্দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং অধিকাংশ লোকই এ বিষয়টি সমর্থন করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে প্রচার করিয়া আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন এবং বর্তমানে তাহারা বানান সমগ্রা লইয়া ব্যস্ত আছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে আমরা তাহাদের কাছে পূর্বলিখিত সমগ্রাটির সুসমাধান আশা করিতে পারি। এ শুধু আমাদের দেশে নয়, সকল দেশেই এই শিক্ষার আমূল পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক।

পুরাতন শিক্ষার বিনিময়ে যে নূতন শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে তাহার প্রধানতম কাজ এই যে নারীকে সর্বোচ্চ দেশের উপযুক্ত জননী করিয়া গড়িয়া তুলি। কারণ জাতির উজ্জল ভবিষ্যৎ এবং উত্থান পতন সমস্তই নির্ভর করিতেছে দেশের সুসন্তানগঠনের উপর। সুতরাং জাতি গঠনের জন্ত সন্তান গঠন করা একান্ত প্রয়োজন, এবং সেই সন্তানকে গড়িয়া তুলিতে পারেন একমাত্র জননী। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে—“A hand that rocks the cradle rules the world.”

জননী সন্তানকে যেমন অলৌকিক বলে তাহার সমগ্র জীবন উজ্জলরূপে প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিতে পারেন তেমনটাই এ সংসারে আর কাহারো দ্বারা সম্ভব নয়, এই কথা অনায়াসে বলা যায়। ভূবনবিখ্যাত নেপোলিয়ন বলিয়াছে:—“Future of child good or evil entirely depends upon its mother.” সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ যেমন নির্ভর করিতেছে দেশের সন্তানের উপর—সেই রকম—সন্তানেরও উজ্জল ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে জননীর হস্তে—সুতরাং এইখানেই দেখা যাইতেছে জাতিগঠন কার্যে নারীর স্থান কোথায় এবং সেই কার্যের দায়িত্ব কি গুরুতর। গাছের মূলই যদি খারাপ হয় তবে আগায় যত জল ঢালা যাক না কেন—তাহার নিকট হইতে সফল কিছুতেই আশা করা যাইতে পারেনা। গাছে শুধু সফল ফলিলেই চলিবে না সেই ফল যদি ক্ষুধার্তকে ষথার্থ তৃপ্তিদান করিতে সমর্থ হয় তবেই তাহার মাটির বুকে জন্ম সার্থক। অর্থাৎ শুধু উপযুক্ত সন্তান গড়িয়া তুলিলেই আমাদের কর্তব্যের শেষ হইবে না, আমাদের কর্তব্যের সমাপ্তি ঘটবে তখন যখন তাহারা রাজা রামমোহন রায়—মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি দেশের সুসন্তানগণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিতে শিখে এবং সেই স্বপ্ন ঘন বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য জীবন মরণ পণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে।

শৈশবে শিশুদের চিত্ত স্বাভাবিকই অতি কোমল ও অনুকরণপ্রিয় থাকে। এই সময়ে তাহার মনে অতি সহজে যে রেখা অঙ্কিত হয় জীবনে সে রেখা কোনও দিন অপসারিত হয় না। এই বয়সে সে এক ঘণ্টার মধ্যে যাহা জ্ঞদয়ঙ্গম করিতে পারে তাহা একজন রয়ঃ প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে একদিনেও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। শিশুর নবজীবনের এই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়টী অতিবাহিত হয় জননীর সাহচর্যে। তাঁহার অগাধ স্নেহ—ভালোবাসা, শাসন ও উপদেশের অভ্যস্ততার মধ্য দিয়া স্ফূর্ত হয় তাহার শিক্ষার পাল। যদিও জানি “Example is better than precept.” তথাপি উপদেশের ছলে শিশুকে বড় বড় মহাপুরুষ ও দেশেনেতাদিগের বিষয় বলিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদের সম্বন্ধে জানিবার জন্য আগ্রহ ও কৌতুহল তাহাদের মনে উন্মূখ হইয়া থাকে এবং তাহারা যেন দেশকে নিজের অন্তরের সমস্ত ভক্তি প্রকার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ আসনখানি দান করিয়া—জাতিকে সমগ্র মন প্রাণ দিয়া ভালোবাসিতে পারে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যতক্ষণ নিজের জন্মভূমির স্বখে স্বখ দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবার চেতনা না জাগে ততক্ষণ সে জগতের কোনও মহৎ কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহাদের কর্মক্ষেত্রে যতই বিস্তৃত ও প্রশস্ত এবং উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক না কেন কার্যক্ষেত্রে তাহা কখনই সফলতা লাভ করিতে পারে না। তাই জননীর কর্তব্য শিশুর মনে দেশপ্রেম এবং দেশপ্ৰীতি জাগাইয়া তুলি।

বর্তমানে কতকগুলি দেশ রাজ্যভাঙের আশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। জার্মানী হয়তো পৃথিবীর অধিশ্বর হইবার স্বপ্ন দেখিতেছে এবং ইটালী হয়তো ভাবিতেছে আফ্রিকাসিনিয়াত নেওয়া গিয়াছে এখন অস্ত্র কোনও দেশ লইলে কেমন হয় অর্থাৎ সকলেই আপন আপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। জননীর প্রচেষ্টায় কত জাতি যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছে এবং জগতের বুকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—ইতিহাসের পাতায় তাহাদের সংখ্যা কিছু অল্প নয়। নৃপতিলক—নেপোলিয়ন বলিয়াছেন—“আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা

জননীর নিকট পাইয়াছি।” মাতৃভক্তির প্রেরণায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন। সুভদ্রা আপন প্রাণাধিক পুত্রকে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সমরাদ্রুপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাই ষোড়শ বর্ষীয় বালক অভিমত্ম্য সপ্তরথীকে সপ্তবার পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন—এবং যদি না কোরবগণ চক্রবাহ রচনা করিয়া অধর্ম যুদ্ধ করিতেন তাহা হইলে বীর অভিমত্ম্যকে অকালে প্রাণ দিতে হইত না।

যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্নদেশের নারীগণ নিজ নিজ সন্তান দ্বারা এমনি করিয়া—দেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া জাতিগঠন কার্যে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। জাতির ইতিহাসের পাতায় আমাদের দেশের রাজপুত্রমণীগণের বিচিত্র বীরত্বের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। চাঁদ সুলতান, রাণী দুর্গাবতীর কথ ভারতবর্ষের কাহারও নিকট অবিলম্বিত নাই। দেশে শুধু স্বসন্তান উপহার দিলেই নারীর কর্তব্যের শেষ হইত না—তাহারা নিজেরাও যাহাতে দেশের কর্ম্মিণীর আসন গ্রহণ করিতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর হওয়া উচিত। সকলের পক্ষে সরোজিনী নাইডু অথবা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত হওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু প্রত্যেকে যাহাতে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এবং সেই মন্ত্র বক্ষে রাখিয়া যাত্রা তত্ব করে সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমাদের শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা হইবে তখন যখন আমাদের অশিক্ষিত পল্লীবাসীর চিত্তে জ্ঞানের আলোক জ্বলিয়া দিতে পারিব। যতদিন আমাদের দেশের নিরাকর পল্লীবাসীগণের অন্তরে এ শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিব ততদিন আমাদের দেশের উন্নতি সমুদ্র পরাহত। পল্লীগ্রামে যাহারা বাস করিয়াছেন, এবং তাহাদের রীতি নীতি অভাব অভিযোগ স্বক্ষে দেখিবার সুযোগ যাহাদের ঘটিয়াছে—তাঁহারা জানেন অন্য সভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের জাগরণের প্রসারতা আশ্চর্য কত পিছাইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ সে সকল দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বহুনারী এখনও স্থপ্ত রহিয়াছেন। আমরা যদি দেশের উপযুক্ত কর্ম্মিণী হইতে চাই—তাহা হইলে সর্বপ্রথম আমাদের দেশের

মানুষ হইতে হইবে এবং সমগ্র অন্তর দিয়া দেশকে ভালো-বাসিতে হইবে। শংকর চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন “শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকিলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। যাদের ভালো করবে তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই—বুজি বিবেচনায়, ধর্মে এগিয়ে গেলে তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না।” সেইজন্য প্রত্যেককে যে বি. এ. এম. এ পাশ করিতেই হইবে এমন কোন কথা বলা যায় না। একটি সাধারণ শিক্ষা সকলের পক্ষেই যথেষ্ট। যাহাতে তাহার শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী এবং তাহার সার্থকতা কোথায় এ কথা মন প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিতে পারে।

এ সংসারে নারীর প্রকৃত স্থান সংসারপ্রাঙ্গণে এবং তাহার শ্রেষ্ঠ অধিকার এবং তাহার প্রধানতম কর্তব্য পুরুষের পাশে পাশে থাকিয়া তাহার সকল কার্যে সহায়তা করা। ঋষি বঙ্কিম বলিয়াছেন—“কঠিন ধর্ম এই সংসার ধর্ম। ইহাপেক্ষা কোনও যোগই কঠিন নহে। নারীর শিক্ষাও সর্বতোমুখী বিদ্যার অনুশীলন, কিন্তু তাহার কার্য সংসারধর্ম।” নারী যদি একান্তই মুখ্যরূপে জাতির হিতসাধনে নিযুক্ত না হইতে পারে তবে যেন সে চিরদিন পুরুষের সহকর্মীরূপে সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। পুরুষ আপনার দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে গমন করে কিন্তু তাহার মূলে থাকে নারীর প্রেরণা—পুরুষ দেশের কত শত রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করে কিন্তু তাহার আগে থাকে নারীর উৎসাহ এবং পুরুষের প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করাইতে যিনি পারেন তিনিও একমাত্র নারী। সাধারণতঃ দেখা যায় পুরুষের প্রবৃত্তি কিছু বহির্মুখী। এইখানেই নারীকে বিশেষ প্রয়োজন। তাহার কর্তব্য ঘরে থাকিয়া—পুরুষের সেই প্রবৃত্তিটিকে অন্তর মুখী

করা এবং তাহাকে দিয়া দেশের ও দেশের কাজ করানো। সেইজন্যই বোধ করি ইংরাজীতে বলে—“They are not Kings but the King-makers.” পৃথিবীর ইতিহাস খুলিলে দেখা যায় সেই আবহমান কাল হইতে নারী পুরুষের সহকর্মীরূপে নয় সহকর্মীরূপেও সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। প্রসিদ্ধ মরাথানের যুদ্ধে গ্রীক রমণীগণ পারস্যের হাত হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিবার জন্য নিজেদের কেশ কঙ্কিত করিয়া স্বামীপুত্রকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আর রাজপুত্ররমণীর বীরত্বগাথা ত বিশ্ববিশ্রুত।—কবি বলিয়াছেন—

“কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাহি ইতিহাসে।”
সুভদ্রা হরণকালে সেই কৃষ্ণ মহোদর। যদি অজ্ঞানের পাশে না থাকিতেন তবে কুন্তীনন্দন বলরামের সৈন্তের হাত হইতে রক্ষা পাইতেন কি না সন্দেহ। নারী আজ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং সে তাহার ব্যক্তিগত স্বাভাব্য উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং প্রকৃতিগত স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবন-মরণ পণ করিয়া তিল তিল করিয়া চলিয়াছে। সযাজ ও রাষ্ট্রে সে নিজের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং দেশ ও জাতি তাহাকে সম্মানে তাহার কার্যে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। বর্তমানে নারী সে আহ্বান উপেক্ষা করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিবে না—একথা বলাই বাহুল্য। জাতি গঠন কার্যে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার। পৃথিবীর কোনও দেশের নারী যেন আপনার সেই অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া না পড়েন—হইলেই জাতির অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ নিশ্চিত—এবং কোন দিন হয়তো সে জাতি ধীরে ধীরে অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে ॥

মীরাবাঈ

শ্রীহেমলতা দেবী

মীরা, তুমি নহ তো মানবী !

যদিও এ মর্ত্যালোকে করিয়াছ বাস
তবু তব অতুলন প্রেমের পিয়াস,
মিটাইতে পারে নাই কোন মর্ত্যবাসী
বক্ষে কেহ ধরে নাই সে সৌন্দর্যরাশি ;
সুন্দরে তোমার প্রেম স্বতঃ উথলয়,
লুটায় লুটায় যায় সারা বিশ্বময় !

• মীরা,—তব প্রেমরূপ ছবি,
কেমনে আঁকিল শিল্পী কী তুলি বুলায়ে,
তোমার নয়ন মন নিল সে ভুলায়ে,
নাগিয়া আসিল প্রেম প্রাবনের ধারে
ভাঙিয়া পড়িল মর্ত্যে সৌন্দর্যের ভারে ।
অমৃত ঝরিয়া পড়ে ভরিয়া চৈতন্য
মর্ত্যবাসী মর্ত্যে রহি পান করি ধন্য ।

বাংলার কীর্তন গান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস বি-এ

বাংলার পল্লী-সঙ্গীতগুলির মধ্যে কীর্তন গানই সর্বাঙ্গাঙ্গী
শ্রেষ্ঠ। বিশ্ব সঙ্গীতের কলা ও বিজ্ঞানে এই গানগুলি
বাংলার অপূর্ব দান। বাংলার বৈষ্ণব সাধনায় এই
গানগুলি একটি বিশিষ্ট গৌরবময় স্থান লাভ করিয়াছে।
এই গভীর ভাবগোতক নৃত্য ও গানগুলি সার্বজনীন।
কীর্তনগানের সহিত আত্মসঙ্গিক নৃত্যগুলির ভিতর ভারতীয়
অধ্যাত্মসাধনা ওতঃপ্রোতভাবে রূপায়িত হইয়া আছে।
বাংলার নরনারী এই কীর্তনগানে যে অনাবিল অফুরন্ত
আনন্দ লাভ করে, তাহা অন্তহীন। আজও বাংলার
মাঠ, ঘাট, পল্লী ও জনপদে কীর্তন গানের অভাব নাই।

এখন কীর্তন গানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিবার চেষ্টা
করিব। শ্রীচৈতন্য প্রভুর জন্মের বহু পূর্বে হইতেই বাংলা
দেশে কীর্তন গানের উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি এবং
তাঁহার শিষ্যগণ এইগুলিকে নূতন রূপ দিয়া জনসমাজে
প্রচার করেন। কীর্তন বিশারদগণ এই সঙ্গীতকে চারি
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—গড়েন হাটী, মনোহর সাহী,
মানহারিণী ও বায়খান্দী। শেষোক্ত দুই প্রকারের কীর্তন
বর্তমানে দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজসাহী জেলার
গড়েন হাটী পরগণার খেজুরী গ্রামের ঠাকুর নরোত্তম

দাসের নামের সহিত প্রথমোক্ত প্রকারের কীর্তনগুলি
সংশ্লিষ্ট। এইখানেই বৈষ্ণব ধর্মের এই ধাতনাম
প্রচারকের জন্মস্থান। ঠাকুর নরোত্তম এই গানগুলিতে
যে মৌলিক স্বর দিয়াছিলেন তাহা হইতেই দ্বিতীয় প্রকারের
কীর্তনগুলির উৎপত্তি। তাঁহার দৃষ্টান্তই প্রাচীন কীর্তন
গুলিকে নূতনরূপে দান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের শিষ্যগণের
অন্যতম আচার্য্য শ্রীনিবাস এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী
ছিলেন। এই কার্য্যে সহায়তা করার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য
ঠাকুর রঘুনন্দনকে নিমন্ত্রণ করেন। মনোহরসাহী পরগণার
কালী গ্রামে জ্ঞানদাস, বদন এবং অপরাপর গায়ক ও
কবিরূপে বাস করিতেন। তাঁহারা সকলেই ঠাকুর
রঘুনন্দনের নেতৃত্বে কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে বদনের
বংশধর মঙ্গলঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহ প্রসাদ এই প্রক্রিয়াতে
কীর্তনের যথেষ্ট উন্নতি করেন। তিনি বীরভূম জেলার
ময়নাডালে বাসস্থান পরিবর্তন করেন। চারি শত বৎসর
পূর্বের সেই সময় হইতে এই গ্রামটি মনোহরসাহী কীর্তনের
কেন্দ্রস্থল হইয়া আছে। এই শ্রেণীর বর্তমান কালের
কীর্তনীয়াগণের শ্রেষ্ঠ গণেশ দাস কয়েকমাস পূর্বে ইহালাক
ত্যাগ করিয়াছেন।

কয়েকটি কীর্তনগানের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ
করিব। এই কীর্তন কয়েকটি রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদ
জেলার পল্লী-অঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

(১)

ও ভাই জীবন কানাই
আয়রে গোচারণে।

এখন ত চিকণ কালা,
মায়ের কোলে করুছ খেলা,
ভাইরে হয়েছে অনেক বেলা,

চেষ্টে দেখ গগনে।

তপ্ত হ'ল পথরেণু,
চলিতে না পারিবি কানু,
ও তোর ঘামিবে নীল কমল তনু,
ভালুর কিরণে।

কটিতটে পীতধড়া,
মস্তকে মোহন চুড়া,
অলকা ধর ললাটে,
নুপুর চরণে।

কুশাকুর চলতে নারে
বাজ্বে চরণে।

(২)

শুন গো আয়ান দাদা,
জলে যেতে করি বাধা,
এমন অবাধ্য রাধা,
তবু জলে যায়।

তোমার রাধার এমনি আশা,
কদমতলায় করে বাসা,
লোকে দেখে যায়।

লোকের অপবাদে,
পরাণ সদাই কাঁদে,
সাধে কি আমি দাদা,
বলি হে তোমায়।

দেশকুড়ানী রাজার মেয়ে,
দাদা তুমি করলে বিয়ে,
ভাগনে এসে কুল মজালো,
জাতি রাখা দায়।

বৃষভানু নন্দিনী,
আয়ানের গৃহিণী,
অক্ষয়চাঁদ ভেবে কয়
জাতি রাখা দায়।

(৩)

বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও দেখি
ওরে আমার বাঁকা ঠাকুর।
প্রাণভরে শুনব আমি
বাজাও তোমার বাজের নুপুর।

যেমন ক'রে দাঁড়ায়ে ছিলে
ব্রজে বংশী বটের তলে।
তেমনি ক'রে হৃদ-মন্দিরে
দাঁড়াও এসে প্রেমের ঠাকুর।

দ্বিজ কুলে জন্ম নিলে
ব্রজের রাধারাগী ভাব ধরিলে।
ভাবে ধুলায় গড়ি দিলে
ওরে আমার ভাবের ঠাকুর

যত সব লৌহ ছিল
পরশ মণিতে পরশ পাইল,
গোলকেতে দর বাড়িল
ওরে আমার প্রাণের ঠাকুর।

দ্বিজ-কুলে জন্ম নিলে
গৌর হরি নাম ধরিলে
হরিনামে পাপী ভরায়
ওরে আমার পারের ঠাকুর।

কেউ তোমায় রাজা বলে
কেউ বলে গোয়ালার ছেলে,
শ্যামাদাস কান্দাল বলে
ভূমিত কান্দালের ঠাকুর।

শক্তি-সাধনা

আমাদের মাতা জগজ্জননী কেবল স্নেহময়ী নবনীত-কোমল নহেন ; তিনি শক্তিগতি অনুরনাশিনী ।

শক্তিমতী নারী

ঐশ্বর্যশালিনী মাতা তাঁর সন্তানদের ঐশ্বৰ্য্যে মগ্নিত করিয়াই সৃষ্টি করেন । প্রত্যেক মানুষের ভিতর যে শক্তি সম্পদ নিহিত থাকে, তা' প্রকাশিত হবার সুযোগ সকল সময় ঘটে না । সেই শক্তির বিকাশের জন্য সাধনার দরকার । সাধনা করিতে করিতে নিজের ভিতরকার শক্তি উপলব্ধি করা যায় ; ক্রমশঃই শক্তি বাড়িতে থাকে ।

এই সাধনা, এই উপলব্ধির অভাবে মানুষ নিজেকে দুর্বল বলিয়া মনে করে—ধীরে ধীরে প্রকৃতই দুর্বল হইয়া যায় । তখন সে মনে করে অ'মা দ্বারা কি একাজ সম্ভব ? একজন লোকের পক্ষে এত দিকে দৃষ্টি দেওয়া কি চলে" ইত্যাদি ।

শারীরিক শক্তি

শক্তি বলিতে শারীরিক ও মানসিক শক্তি দুইই বুঝায় । বস্তুত জগৎমাতার যে রূপ কল্পনা হয়, তা'তে তিনি ত ক্ষীণাঙ্গী অলা নহেন । তিনি বীৰ্য্যবতী ।

সেই মায়েব যথার্থ কথা—যে নারী, তাহাকেও অবলা থাকা সাজে না । দেহের বলবীৰ্য্যের সাধনা তুচ্ছ করিবার জিনিস নয় । বিশেষ করিয়া নারী মা'য়ের জাত । নিজের দেহের বলবীৰ্য্য দিয়া সে সন্তানকে পুষ্ট করিয়া সংসারে আনয়ন করে । কেবল কি তাই ? সমস্ত সংসারের মঙ্গল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে । সে দেহের শক্তি, মনের শক্তি হারাইয়া নিঃশব্দ হইয়া বসিয়া থাকিলে যে দশা হয় সংসারের, তা' আর কাহাকে বলিয়া দিতে হয় ?

—আজ ঘরে ঘরে গোগ শোকের যে কালিমা বিরাজমান তাঁর জন্য আমরা কি ভাগ্যকেই দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি ? জীবনীশক্তিহীনা গৃহিণী রোগ-

শ্রীস্বধাময়ী দেবী

শোকের সঙ্গে যুঝিয়া ক্লান্ত—কেমন করিয়া যুঝিতে হইবে তাহা তাহার সম্যক জানা নাই—প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া রোগ-শত্রুর মূলোচ্ছেদ করিবার মত ভিতরে ও বাহিরে শক্তি নাই ।

শক্তি কি যথার্থ নাই ? নিজের ভিতরের শক্তি উপলব্ধি করিতে হইবে । তাঁর জন্য প্রথমে চাই—নিজের শারীরিক বললাভের সাধনা । বাস্তবিক নারী নিত্যের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া লজ্জার বিষয় মনে করে ; কিন্তু এই মারাত্মক ভুল ধারণা থেকে তাহা মুক্ত হওয়া চাই । যেমন সংসারের সকলের স্বস্ত্র করা কর্তব্য, তেমনি তাহার নিজের স্বস্ত্র তাহাকেই করিতে হইবে । অবশ্য অভাবের সংসারে নিজের জন্য প্রয়োজন মত ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় । কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে তাহার মধ্যেও শারীরিক নিয়ম পালন করা যায় । পরিমিত ও নিয়মিত আহার, উপযুক্ত পরিশ্রম, যথাযথ বিশ্রাম ও নিদ্রা পরিচ্ছন্নতা, এবং প্রচুর মনের আনন্দ—এই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের নিয়মপালন দরিদ্রের সংসারেও একবারে অসম্ভব নয় । প্রচুর আনন্দ পাবার জন্য নানাবিধ উপকরণের বিশেষ দরকার হয় না । তবে জ্ঞান, তেজ ও বীৰ্য্যের ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন ।

জ্ঞান

জ্ঞানের অভাবই দুঃখের মূল, মহাপুরুষগণ এ কথা যুগে যুগে বলিয়া গেছেন ও বলিতেছেন ।

বাস্তবিক মেয়েদের এই জ্ঞানলাভের প্রয়োজন কতখানি আছে তা এখনো আমরা বোধহয় সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই । মানুষের প্রাণ লইয়া মেয়েদের কাণ্ডবার । ভগবান মেয়েদের কোলেই প্রাণান্ত অসহায় শিশুদের প্রেরণ করেন ; তাদের মানুষ করিয়া তুলিবার ভার বিশেষ করিয়া মেয়েদের উপরই । এই ভার কি এমনই হাল্কা জিনিস যে কোন রকম শিক্ষালাভ না করিয়াই এই ভারটি গ্রহণ করা যায় ?

পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাণীর একস্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—মায়াদের অজ্ঞতায় যে শিশুকে মারে তাঁদের স্নেহে তাকে বাঁচাইতে পারে না।

মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন নাই •

এই ভুল ধারণার জন্মই না আজ ঘরে ঘরে রক্ত, জীব, বঙ্গালমার শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, গৃহ, সমাজ, দেশ নিরানন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। শক্তিমতী ঐশ্বর্যশালিনী মায়ের পূজার আনন্দের উপর রোগ শোকের গভীর ব্যাধি হইয়া রহিয়াছে—সংসারের গৃহিণীকে সংসারের সকলের খাওচা, শোওয়া, গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। কেবল রাধিয়া খাওয়াইলেই সে কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। পরিচ্ছন্ন, পুষ্টিকর অথচ স্বাস্থ্যত খাদ্যের দ্বারা পরিবারস্থ সকলের শক্তিবৃদ্ধি করিবার ভার গৃহিণীর উপর।

রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি তাঁহার আয়ত্ত করা প্রয়োজন। সামান্য অসুখ বিস্ময় আরোপ করিবার মত জ্ঞানও তাঁহার থাকা চাই। শিশুর কোঁহুলী মনের খোরাক যোগাইবার মত যথেষ্ট জ্ঞান মায়ের থাকা চাই। আর চাই অভাবের সংসারের কিঞ্চিৎ অভাব মিটাইয়া পরিবার প্রতিপালনের কাজে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবার মত জ্ঞান। যে লক্ষ্মীর সংসারে অভাবের তাড়না নাই, তাঁহাকেও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। সংসার যথাযথভাবে চালাইবার মত বিবেচনা ও দৃষ্টি তাঁহার না থাকিলে চলে না।

অশুভ যাহা কিছু তাহা ঠেকাইয়া রাখিবার মত দূরদৃষ্টি তেজ ও বীর্ঘ্য তাঁহার থাকা চাই।

তেজ ও বীর্ঘ্য

যথার্থ জ্ঞান, যথার্থ দৃষ্টি লাভ না করিতে পারিলে যথার্থ তেজ ও বীর্ঘ্য লাভ করা অসম্ভব। কোন্ কক্ষের পরিণাম কি, স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করার ফল কি, স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পার্থক্য কি—সংযম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন কি এই সব যথাযথ বিচারের ক্ষমতা জন্মিলেই অশুভ যাহা তাহা ঠেকাইয়া রাখা ও বিনাশ করিবার মত, ও শুভকে বরণ করিয়া লইবার মত তেজ ও বীর্ঘ্য লাভ করা যায়।

গৃহিণী যদি সংসারের সকল কাজের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলার প্রয়োজন যথার্থ বোঝেন, এবং তাহার অভাবে সকলের যে দুঃখ পাইতে হয় তা সম্যক বুঝিতে পারেন তবে কঠোর হস্তে সে সকল বিশৃঙ্খলা অপসারণ করিতে তাঁহার দ্বিধা না থাকাই স্বাভাবিক।

শিক্ষায় যে সব দেশ অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হইয়াছে, সেখানকার মেয়েরা সংসারের যাবতীয় কাজ নিজে হাতে করিয়াও সংসারের সকলের স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়াও জ্ঞান চর্চা, শিল্প চর্চার সময় করিতে পারে, তাহার কারণ শৃঙ্খলার সহিত সংসার চালাইবার মত জ্ঞান তাহাদের আছে এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াই অস্ত্রের উপর সেই শৃঙ্খলার চাপ আরোপ করিতে তাহাদের দ্বিধা নাই।—সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সকলেরই অমঙ্গল, এ কথা জানিয়াই অমঙ্গল ঘটিতে না দিবার মত তেজের সঙ্গে তাহারা আপনাদের মত ব্যক্ত করিতে পারে ও তদন্তসারে চলিতে পারে।

—যথার্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি যার আছে অন্ডায় ও অশুচিভাও ঠেকাইয়া রাখিবার মত শক্তি তার জন্মে। মেয়েদের অন্ডায় ও অশুচিভাও হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কত ব্যবস্থাই না সমাজে করিতে হইয়াছে। তবুও কি সমাজ নারীহরণ ও নারীর প্রতি অত্যাচার ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে?

এই অত্যাচার ঠেকাইবার ভার নারীকে নিজেই লইতে হইবে। ইহার জন্ত শারীরিক শক্তির প্রয়োজন ত আছেই; তাংব চেয়ে প্রয়োজন আছে মানসিক তেজ ও বীর্ঘ্যের। যে সব কাপুরুষ নারীর প্রতি অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের কাহারও সাধ্য নাই, যথার্থ মানসিক শক্তিসম্পন্ন নারীর তেজোদৃগ্ধ শক্তির নিকট দাঁড়াইবার—

“যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্ডায়-ভীক তোমা চেয়ে,

যখন জাগিবে তুমি তখন সে পলাইবে ধৈর্যে।

যখন দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখন সে

পথ কুকুরের মত সঙ্কোচে সজ্ঞাসে যাবে মিশে।

দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,

মুখে করে আশ্বালন, জানে সে হীনতা আপনার

মনে মনে।”

—এ কথা কেবল ভাবুকতার কথা নয়, পূর্ণ সত্য। আমাদের মাতা জগৎমাতা; অস্বপ্নাশনী। তবে কেন আমাদের শক্তিহীন বলিয়া অপবাদ ?

জানমণ্ডিত এই শক্তিনাভ করিতে হইলে যে সাধনা চাই তাহা কি আমরা করিতে প্রস্তুত ?—হিংসা, বিদ্বেষ; ক্ষুদ্র সন্ধীর্ণতা লইয়া বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন না করিয়া শক্তি অর্জনের সাধনায় সমবেতভাবে কবে আমরা প্রবৃত্ত হইব ? সেই শুভ লগ্নের ত বিলম্ব নাই। তাহার সূচনা ত হইয়াছে, আমরা দেখিতেছি। আত্মবিশ্বস্ত হইয়া থাকিবার আর উপায় নাই। চারিদিকের প্রাণের ঢেউ আসিয়া আমাদের জাগাইয়া তুলিতেছে।

এই জাগরণের সন্ধিক্ষণে কিন্তু আমাদেরকে এ কথা ভুলিলে চলিবে না—প্রাণের আবেগের, শক্তির চাকল্যের মধ্যে মনের ধীরতা, স্থিরতা রক্ষা করা চাই।

এই ধৈর্য ও সমতা রক্ষার জন্য আত্মগরিমার ভাব লুপ্ত করিয়া দিয়া জগৎমাতারই ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে

হয়। আমার ভিতরের যা কিছু শক্তি সম্পদ সবই সেই মায়েরই দান—আমার নিজের কৃতিত্ব কিছু নাই—এই ভাবটী রক্ষা করিতে না পারিলে শান্ত ভাব রক্ষা করা অসম্ভব। তাই আমাদের দেশে সকল কর্মের উৎস যে ধর্ম তাই বার বার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ধর্ম অবশ্য বৈশীর্ভ ভাগ লোকাচারে আসিয়া ঠেকিয়াছে, অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না; কিন্তু ধর্মকে দূরে সরাইয়া রাখিলে কোন কাজই প্রাণের সঙ্গে করা যায় না। কেবল কর্তব্যবোধ বৈশীর্ভ দিন মানুষকে কোনও মন উদ্দেশ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

জগৎমাতার সন্তান আমরা সবাই; মানুষের মতো মায়েরই স্বেবা। মানুষকে অবজ্ঞা করিলে, মাকেই অবজ্ঞা করা হয়; অত্যাচার করিলে মায়ের গায়ে গিয়া তা লাগে, এই অহুত্ব হওয়া অবশ্য বড়ই কঠিন। কিন্তু ইহাই আমাদের সাধনার লক্ষ্য হউক।

শিক্ষার প্রবাহ

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

যে সব পুরাতন সভ্য জাতি, তাহার একটা স্বাতন্ত্র্য রুচি প্রকৃতি সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইল ভারতবর্ষ।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সময়ে সেই সব জাতি, তাহা অপেক্ষা উন্নত নবরলে বলীয়ান জাতিদ্বারা পরাজিত হইয়া, শাসিত হইবার ফলে, অনেকেই তাহার স্বাতন্ত্র্যকে ভুলিয়া বিজিত জাতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার

ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় একমাত্র ভারতবর্ষে। যুগের পর যুগে কত নব বলে বলীয়ান জাতি শক্তির আফালন, শক্তিদীপ্ত বালক ছুটাইয়া, এই ভারতবর্ষের উপর দিয়া বহিয়া গেল, শাসন করিয়া রাখিল সত্য, কিন্তু তাহার স্বাতন্ত্র্যকে লোপ করিয়া বিজিত জাতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলাইয়া লইতে পারিল না।

কেন পারিল না, তাহার কারণটি অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহার সমাজদেহে অন্তঃসন্নিবিষ্ট ন্যায়, এমন এক প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, যে-প্রবাহের বিনিময়ে বিজিত জাতের শিক্ষা দীক্ষা তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারিল না। বাহ্যিক শক্তির অভাবে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল বটে, কিন্তু মনোবাজ্যে রহিয়া গেল সে স্বাধীন। তাহার স্বাতন্ত্র্যটি হইল কুঁড়ে ঘরে পুরানো কাঁধায় ঢাকা রত্নের মত।

সমাজদেহে এই যে ভাব রসের প্রবাহ, যাহাতে সে তৃপ্ত, অন্তঃস্থ, তাহার মূল উৎসটি হইল বেদ বেদান্ত। তাহাই নানা ভাবে রসে মূর্তি ধরিয়া উঠিয়াছে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ উপাখ্যানের মধ্যে, স্বরে রূপ লইয়াছে; তাহার বাহন হইল বাউল ভাটিয়াল ভজন কীর্তন দাত্রা কবি কথকতা প্রভৃতি। এই আনন্দ উপভোগের দ্বারাই

সমাজদেহে বহিয়া চলিয়াছে ভাব-রস-শিক্ষা-দীক্ষার প্রবাহ ; আজ অশিক্ষিত জন সাধারণও এই ভাব রসে একেবারে অনুপ্রাণিত ।

তাহার ফলে সমাজজীবনে উদ্যম উশ্জ্বলতা ঢুকিতে পারে নাই । যাহা অন্যান্য অনেক স্বাধীন দেশের সমাজ-জীবনে ঢুকিয়াছে । কারণ রামায়ণ, মহাভারত, পুৰাণ ও উপকথার ভিতর যে সব উদার মহান চরিত্র চিত্র, তাগ তপস্বী, ভাল মন্দ, পাপপুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই ছাপ-ছায়ায় আবৃত ভারতীয় সমাজ-জীবন । তাহার ফলেই সমাজ জীবন এমন সুনিয়ন্ত্রিত সুপ্রতিষ্ঠিত যে বিজিত জাতের এত ঘাত প্রতিঘাতে, প্রভাব প্ররোচনায়ও তাহাকে টলাইয়া তুলিতে পারে নাই ।

পাশ্চাত্য প্রবাসী পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়াছি যে সে সব দেশের অজ্ঞ অশিক্ষিতের সমাজজীবন-যাত্রা প্রণালী, আমাদের দেশের অজ্ঞ অশিক্ষিতদের সমাজ জীবনযাত্রা প্রণালী হইতে অনেকটা পরিমাণে নিম্নতর । আমাদের মত পারিবারিক সামাজিক বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ নয় । প্রবৃত্তির তাড়ণায় জীবনযাত্রা প্রণালী উদ্যম, চঞ্চল, অস্থির । তাহার ফলে সমাজের মূল ভিত্তি হইয়া যায় শিথিল ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দর্শন সভার সভাপতির যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার একস্থানে বলিয়া-ছিলেন,—“আমাদের দেশের ধূলিকণায় আকাশে বাতাসেই যেন দর্শনতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে—পথপ্রান্তর নদীতে মজুর, মাঝি, যেসব বাউল ভাইটাল ভজন গাহিয়া থাকে তাহার মধ্যে এমন সব দর্শনতত্ত্ব নিহিত থাকে, যাহা অনেক সময় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বোধগম্য-হওয়া হইয়া উঠে দুষ্কর ।”

এ হেন নিরক্ষর জনসাধারণকে অজ্ঞ অশিক্ষিতের অমর্যাদায় ফেলিয়া রাখিবার পূর্বে কয়েকটি কথা ভাবিয়া দেখা দরকার ।

বর্তমান যুগে শিক্ষার মানদণ্ডই হইল প্রধানতঃ রাজনীতি ও বিজ্ঞান—জীবনসংগ্রামে প্রতিযোগিতার পথে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহার অনেক তত্ত্বই আমরা পাইতে পারি মহাভারতে । মহাভারত কুট উদার রাজনীতিতে

পরিপূর্ণ । সে গ্রন্থাগারে যুগোপযোগী ঘটনার সাদৃশ্যের অভাব নাই । যাহা নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরিতে পারিলে, তাঁহারাও তাঁহাদের বর্তমান অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিবেন ।

কথাটাকে পরিষ্কার করিবার জন্ত একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিব ।

গত আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় কোনও ব্যবসা-প্রধান ছোট বন্দরে জনসাধারণের এক সভায় যোগ দেওয়ার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল । বক্তারা ছিলেন কলেজ-ছাড়া ছাত্রের দল । তাঁহারা বর্তমান অবস্থা এবং মহাত্মাজীর অহিংস নীতি নিরক্ষর অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝাইবার সময় রাশিয়া এবং ইতিহাসের নজীর তুলিয়া যাইতেছিলেন, যাহার সঙ্গে জনসাধারণ আদৌ পরিচিত নহে—সভাস্থ সকলে বক্তৃতার মর্ম্ম কে কতটা বুঝিতে পারিল তাহা বলিতে পারি না । তবে আমার কাছে বসিয়াছিলেন এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব ব্যবসায়ী, তিনি বক্তৃতা শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা বাবু, এই যে সব ছাত্র বাবুরা এদের কত কি বোঝাচ্ছে এর মানে কি ?” লক্ষ্য করিলাম তাঁহার এই বিস্ময় জন্মিয়াছিল যে ছাত্রেরা তো কোন কিছু সহ্য করিবার পাত্র নয়, আরও বুঝিলাম, বক্তৃতার মর্ম্ম তিনি কিছুই বোঝেন নাই । তখন তাঁহাকে বলিলাম “চৈতন্য মহাপ্রভু জাতিধর্ম্ম বিচার না করিয়া, সকলকেই প্রেমধর্ম্মে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেছেন দেখিয়া, জগাই মাধাই এই দুই ভাইয়ের হইয়া উঠিল তাহা একেবারে অসহ্য । তাই মহাপ্রভুকে কলসীর কান্দায় আঘাত করিয়া, নবদ্বীপের রাজপথে রক্ত ঢালিয়াছিলেন । তাহার জন্ত মহাপ্রভু কোন প্রতিশোধও নিলেন না, অভিশাপও দিলেন না, প্রেমালিঙ্গনে তাহাদের বুকে জড়াইয়া ধরিলেন—পরে এই জগাই মাধাই-ই অনুতাপ অনুশোচনায় মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্ত হইলেন—মহাত্মাজীর অহিংসনীতির মর্ম্ম-কথাও হইল ইহাই, এই ছাত্র বাবুরা তাঁহার নীতিকে অনুসরণ করিয়াই আন্দোলনে নামিয়াছে । তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, যে অধিকার লাভের জন্ত তাহারা এই সব নিষ্ঠ্যাতন বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিয়া যাইতেছেন, একদিন

এই নিখাতনকারীই অমৃতপ্ত অমুশোচনায়, তাঁহাদের
ত্ৰায়া অধিকারকে মানিয়া লইবে—মহাত্মাজীর অহিংস
সংগ্রামের মৰ্ম্মকথা এই। তিনি অশ্রুসিক্তকণ্ঠে বলিয়া
উঠিলেন—“হরি হরি”—পরে শুনিয়াছি সেই বৃদ্ধ ব্যবসায়ী
ভদ্রলোকই শিবিরে যে সব সত্যগ্রহী থাকিতেন তাঁহাদের
আহাৱাদির ব্যয় বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষিত সমাজে ঝাঁপাৱা রাজনীতিক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে
যোগ না রাখিয়া তাহাৱ গতি পরিণতির কথা চিন্তা ও
আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই
রাজনীতি চিন্তায় অনভ্যস্ত বৃদ্ধ ব্যবসায়ীটির মত মহাত্মাজীর
অহিংস নীতি উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন কিনা
সন্দেহ।

বৰ্ত্তমান জীবনযাত্রাপ্রণালীতে যে সব নিত্য নূতন

ভাব ও চিন্তাধাৱাৱ ঘাত প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে তাহাৱ
মৰ্ম্ম উপলব্ধি করিবাৱ মত অজ্ঞ অশিক্ষিত সমাজেৱও মনের
জমি প্রস্তুতই আছে সংস্কৃতি শিক্ষাৱ প্রবাহে। তবে তাহাৱা
তাহা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে গ্রহণ করিবে। আনকোৱা ভাব
চিন্তা নয়। এই যুগবাণী লইয়া তাঁহাদের দ্বাৱে উপস্থিত
হইবাৱ দুই পথ আছে। অক্ষরজ্ঞানে পরিচিত করিয়া, পঠন
পাঠন সাহিত্যেৱ ভিতর দিয়া। অপর হইল আমাদেৱ দেশে
যে লোকশিক্ষাৱ রাহন ছিল যাত্রা কবি কথকতা পাঁচালি
তাহাকেই যুগোপযোগী করিয়া। শক্তিতে অবিশ্বাসই
হইল দাসত্ব ও দুৰ্গতির মূল কাৱণ। তাই কবি মৰ্ম্মান্তিক
ক্ষেদে গাহিয়াছেন :—

• “নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুৰ্বল
বাঁড়ায়েছ মায়েৱ যাতনা কেবল।”

গায়ত্রী তত্ত্ব

ত্ৰীসত্যহরি দাস

গায়ত্রী অতি প্রাচীন বৈদিক যুগেৱ মুক্তিমন্ত্র ;
সাধনরাজ্যে মোক্ষাভিলাষিগণেৱ জন্ম আৰ্ধ্যাধাৱিৱ এক
শ্রেষ্ঠতম দান। বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত এই
মহামন্ত্রেৱ সাধনই ভারতেৱ জ্ঞানভূমিকে আলোকিত ও
উজ্জ্বল করিয়া মানবেৱ ব্রহ্মোপাসনাৱ সৰ্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বনরূপে
আদৃত হইয়া আসিতেছে।

এই মহামন্ত্রেৱ দ্রষ্টা কোন ব্রাহ্মণ বা মহৰ্ষি নহেন, তিনি
ক্ষত্ৰিয়কুলচূড়াগণি রাজর্ষি বিশ্বামিত্ৰ, রাজর্ষি বিশ্বামিত্ৰ
একনিষ্ঠভাবে সূৰ্য্যনারায়ণেৱ স্তুতি করিতে করিতে এই
গায়ত্রী মহাসত্যেৱ সাক্ষাৎকাৱ লাভ করিয়াছিলেন এবং
আজ পর্যন্ত মোক্ষাভিলাষিগণেৱ সাধনপথে অগ্রসর হইবাৱ
পক্ষে সৰ্বশ্রেষ্ঠ উপায়রূপে এই মহান মন্ত্র আৰ্ধ্য (হিন্দু)
জাতিৱ পরম সম্পদরূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।
বৰ্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণগণ এই গায়ত্রী মহামন্ত্র কেবলমাত্র
ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণেৱ একমাত্র সাধনীয় বলিয়া প্রচাৱ করিয়া
ব্রাহ্মণেতর জাতিৱ উচ্চ ধৰ্ম্মকৰ্ম্মেৱ পথ ক্লান্ত করিয়াছেন।
যজুৰ্বেদ বলিতেছেন—“যথৈমাংবাচ্ কল্যাণী মাৱদানি

জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজ্ঞাভ্যাং শূদ্রায় চৰ্য্যায় চ স্বায়চাৱণায়।”
২৬২১ অৰ্থাৎ এই বেদরূপা কল্যাণী বাণী আমি বেদে
জনসাধাৱণেৱ জন্ম প্রকাশ করিলাম তোমরাও (সেইরূপ)
ব্রাহ্মণ ক্ষত্ৰিয়েৱ নিকটে শূদ্র ও আৰ্যেৱ (বৈশ্যে)
নিকটে, আত্মীয় অনাত্মীয়েৱ অথবা অস্পৃশ্য সকলেৱ
নিকটে প্রকাশ কর।

ব্রাহ্মণযুগে বিদ্যাচর্চা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদেৱ মাধ্য
প্রচলিত থাকিলেও ক্ষত্ৰিয়রাজগণই যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ
অধিকাৱী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণেৱা যে, এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ
করিবাৱ নিমিত্ত তাঁহাদেৱ শিষ্যত্ব স্বীকাৱ করিয়াছিলেন,
তাহাৱ বহু দৃষ্টান্ত ছান্দগ্য, শতপথ, বৃহদাৱণ্যক, কোষিতহী
প্রভৃতি উপনিষদে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে আৱও পাওয়া
যায় যে, এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মা প্রথম ইন্দ্ৰকে দিয়াছিলেন,
সেই অবধি এই বিদ্যা ক্ষত্ৰিয়রাজগণেৱ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।
বেদেৱ ব্রাহ্মণভাগে দেখা যায়, যাগ যজ্ঞাদি ক্ৰিয়া কলাপেৱ
অশেষ বিধান, গুণকীৰ্ত্তন ও ফলশ্ৰুতি রহিয়াছে। ব্রাহ্মাণ
সম্ভবতঃ সেই সময় যাগ যজ্ঞাদিৱ নানাপ্রকাৱ কৰ্ম্মকাণ্ডেৱ

যজন যাজনের প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া তাহারই মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় নরপতিগণ আত্মতত্ত্ব চর্চায় সমধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম গায়ত্রীর অর্থ নানা প্রকার করিয়াছেন, কিন্তু বাঁহারা ইহার অর্থ করেন, সে শক্তির উৎস কোথায় আছে তাহার ঠিকানা নাই। এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে গায়ত্রীতত্ত্ব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

ঋষিগণ গায়ত্রী মহামন্ত্রকে বেদমাতা বলিয়াছেন। এই মন্ত্রটি চতুর্বিংশতি অক্ষরযুক্ত ত্রিপাদবিশিষ্ট যথা—

“তৎসবিতুর্বরেণ্যং

ভর্গো দেবশ্রীমহি

ধীয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ ॥”

গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপাদবিশিষ্ট এবং তাহার প্রত্যেক পদে আটটি অক্ষর থাকা চাই কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথম পাদে মাত্র সাতটি অক্ষর রহিয়াছে। তৎ শব্দকে একটা অক্ষরই ধরিতে হয়, কারণ ছন্দে স্বর সংযুক্ত না থাকিলে ব্যঞ্জনবর্ণের গণনা হয় না। ‘ণ’ স্থলে নিয় পাঠ করিয়া এই ছন্দপাত দোষ নিবারণের বিধান রহিয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের আবৃত্তি এইরূপ,—

“তৎসবিতুর্বরেণ্যং

ভর্গো দেবশ্রীমহি

ধীয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ ॥”

ঋক, যজু ও সাম এই তিন বেদে না থাকিলেও পরবর্তীকালে অথর্ব বেদে ব্যাহতি ও শির সহকারে ইহার পাঠের বিধি দৃষ্ট হয়। যথা—

ওঁভূঃ, ওঁভুবঃ, ওঁস্বঃ, ওঁমহঃ, ওঁজনঃ, ওঁতপঃ, ওঁ সত্যং এই সাতটিকে ব্যাহতি বলে। আর ইহাদিগের মধ্যে ওঁভূঃ, ওঁভুবঃ, ওঁস্বকে মহাব্যাহতি বলে, এবং ওঁ আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতব্রহ্ম, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ওঁ, ইহাদিগকে গায়ত্রীর শির বলে। পণ্ডিতগণ প্রণবাদ্য সপ্তব্যাহতিযুক্ত শিরঃসমন্বিত গায়ত্রীকে সর্ব বেদের সার বলিয়াছেন। গায়ত্রী পাঠ বা জপ করিবার পূর্বে গায়ত্রীকে আবাহন করিবার মন্ত্র ও বিধি দৃষ্ট হয়; আবাহন মন্ত্র যথা—

“ওঁ আয়াহি বরদে দেবী ব্রহ্মণে ব্রহ্মবাদিনী।

গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্ততে।”

ব্যাখ্যা—হে জগৎ জননী, আগমন করিয়া আমার হৃদয়ে বাস করুন, হে মাতঃ সত্ত্ব, রজঃ, তমগুণ জগৎভাবে বিরাজমান আজ; তুমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে প্রতিপাদন কর; হে মাতঃ তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও তোমাতেই স্থিতি আছে, তোমাকে নমস্কার করি। আমরা যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

মন্ত্র বলিতেছেন—ওঁকার ও ব্যাহতির সহিত এই গায়ত্রী মন্ত্র দুই সন্ধ্যায় জপ করিলে বেদপাঠের পুণ্য হয়। প্রণবাদি সপ্তব্যাহতিযুক্ত ও শিরঃসমেত গায়ত্রীকে ঋষিগণ সর্ব বেদের সার বলেন বলিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রশংসা করিয়াছেন তাহা এই—ওঁভূঃ, ওঁভুবঃ, ওঁস্বঃ, ওঁমহঃ, ওঁজনঃ, ওঁতপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁতৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবশ্রীমহি ধীয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ; ওঁআলাজ্যোতীরসোহিমুতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরোম্। এইরূপ বিশিষ্ট প্রাণায়াম সহযোগে উপাসনা করিতে হয়, ইহা তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ জপকালে সপ্তব্যাহতির পরিবর্তে মহাব্যাহতি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ উচ্চারণপূর্বক গায়ত্রী মন্ত্র পাঠের বিধি।

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

“ওঁকারং পূর্বমুচ্চাৰ্য্য রুভুবঃ স্বরনন্তরম।

গায়ত্রী প্রবশ্বান্তে জপ হোব মুদাহতা ॥”

সুতরাং সাধারণ জপকালে সপ্তব্যাহতিক গায়ত্রী মন্ত্রের পাঠ এইরূপ—

“ওম্ ॥ ভূভুবঃস্বতৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবশ্রীমহি

ধীমহি ধীয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওম্ ॥”

প্রাচীন টীকাকারগণ এই বিখ্যাত মন্ত্রের অনেকপ্রকার আলোচনা করিয়াছেন, তাহারই কিছু এখানে আলোচনা করিব। যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পণ্ডিতগণ “তৎ” শব্দ উল্লেখ করিলেই যৎ শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে ধরিয়া থাকেন। গায়ত্রীর এই ‘তৎ’ শব্দও সেইরূপ ভর্গের নির্দেশবাচক। (সবিতা) সবিতা সকল ভূতের সর্বপ্রকার ভাব প্রসব করেন। প্রসব করেন এবং পবিত্র করেন এইজন্ত তাঁহাকে সবিতা বলা হইয়া থাকে। (বরেণ্যং) জন্ম-সংসার-ভীত মোক্ষকামিগণ আদিত্যাস্তর্গত বরেণ্য ও বরণীয় (প্রার্থনীয়) যে ভর্গের উপাসনা করেন—জন্ম-মৃত্যু এবং ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ জন্ত

ধ্যানের দ্বারা সেই পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলে দ্রষ্টব্য। পরমার্থ ভাবনায় সবিত্রী ভর্গ এবং আদিত্যভর্গের কিছুমাত্র ভেদ নাই। আ। যিনি আদিত্য তিনিই ভর্গ এবং যিনি ভর্গ তিনিই আদিত্য। ভর্গ এবং আদিত্য অদ্বৈতভাবে অবস্থিত।

(ভর্গঃ) ভ্রসজ্ ধাতুর অর্থ পরিপাক করা; যেহেতু তিনি পরিপাক করেন, জ্যোতিঃপ্রকাশ করেন এবং প্রদীপিত করেন এবং অশ্বে কালাগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সপ্তরথি ও সপ্ত কিরণ দ্বারা এই জগৎকে সংহার করেন এবং তাঁহার নিজ স্বরূপ দ্বারা জ্যোতিমান করেন এই জন্ত তাঁহাকে ভর্গ বলা হয়।

যিনি কর্ম্মানুসারে লোক বিভাগ করিয়া দেন এবং প্রজাগণের রঞ্জন করেন এবং নিরন্তর এইভাবে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেন, তিনিও ভর্গশব্দবাচ্য। ঈশ্বর, পুরুষ, সত্যধর্ম, অচ্যুত, ভর্গ এ সমস্তই বিষ্ণুর নামান্তর মাত্র। তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। সাধকগণ অন্তরাকাশে যে জীবের বর্ণনা করেন তিনিই আদিত্যরূপে বাহির আকাশে দীপ্তি পাইতেছেন। এ সমস্তই ভর্গ।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য মধ্যের অবস্থা বেশ স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভর্গ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন সেই জ্যোতিঃ। “পাষাণ মণিধাতুনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতং।” অর্থাৎ সেই ভর্গ পাষাণ মণি ধাতুতে তেজোরূপে অবস্থিত। অতঃপর রস এবং “বৃক্ষোষধি তৃণানাম্ রসরূপেণ তিষ্ঠতি।” অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ ভর্গ তৃণ বৃক্ষ ওষধিদি স্থাবরের রসরূপে অবস্থিত। এইরূপে অখিল জগৎ স্থাবরজঙ্গম ও তদতিরিক্ত সর্বস্থানই সেই ভর্গ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই ভর্গ কেবল যে পরমাত্মারূপে প্রাণিনিচয়ের মধ্যে রহিয়াছেন তাহা নহে। জঙ্গম মধ্যে তিনি অমৃতনাগা চেতনাক্রমেও অবস্থিত। অমৃত অর্থে প্রাণিগণের হৃদয়ে জ্যোতির্ময় চেতনাক্রমে বাস করেন যিনি—তিনিই ভর্গ। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রথম হইতে আপ অর্থাৎ মহত্বাদিরূপে তৎপরে ব্যক্ত জগতে ধাতু পাষাণ মধ্যে তাহাদের অন্তরাগ্না তেজরূপ, এবং উদ্ভিদ জগতে রস রূপে এবং প্রাণি জগতে অমৃতরূপে নিরন্তর ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। গায়ত্রীর সহিত

পুনর্ভাবে ধারণার জন্ত এই আপো জ্যোতিরদোষ ও ব্রহ্ম (শব্দ) মাত্র একত্র যুক্ত হইয়াছে।

দেবশ্রু শব্দে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছেন—যিনি দীপ্তিমান ক্রীড়া করেন, যাহা হইতে ছালোক শোভা পায়, সেই হেতু তাঁহাকে দেব বলিয়া কথিত হয়, তিনি সর্ব দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া থাকেন।

ধীমহি—ধ্যান করি—যিনি পুনঃ পুনঃ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ নিয়োগ করিতেছেন—সেই ভর্গকে আমরা চিন্তা করি।

ঋক্ ও সামভাষ্যে সারণাচার্য্য এই মহামন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যে সবিত্রী দেব আমাদের কৰ্ম্ম-সমূহকে অথবা ধর্ম্মাদি বিষয়ক বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করিতেছেন, সেই স্বতঃপ্রকাশ এবং সর্বান্তর্য্যামী বলিয়া প্রেরক জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের আশ্রভূত (অর্থাৎ তাঁহা হইতে অভিন্ন) এবং সকলের উপাসনীয় ও জ্ঞেয় বলিয়া সম্ভাবনীয় যে ভর্গঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমাত্মক স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ তাহা আমরা ধ্যান করি, অর্থাৎ আমিও যে তিনিও সেই; তিনিও যে আমিও সেই; এইভাবে আমরা চিন্তা করি (?)

বৃহদারণ্যক শ্রুতিমতে, গায়ত্রীর অর্থ—যিনি প্রায় অর্থাৎ প্রাণ সকলকে ত্রাণ করেন, তিনি গায়ত্রী। প্রায় শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ প্রত্যয় দ্বারা গায় শব্দ নিপন্ন হইয়াছে, এবং গায় শব্দ পূর্ব্বক হৈ ধাতু হইতে গায়ত্রী পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

শাঙ্খ্য বলিতেছেন—গায়ত্রী জপের দ্বারা সর্ব পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু অর্থ ভাবনা ব্যতীত শুধু উচ্চারণ দ্বারা কোন ফল হয় না। নিরুক্তকার ষাঙ্ক বলেন—যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অধীত বিষয়ের অর্থ পরিজ্ঞাত নহেন, তিনি নিশ্চয়ই স্থাপুসদৃশ অর্থাৎ ছিন্নশাখ শুষ্ক বৃক্ষমূলের দ্যায় এবং মাত্র দেহভার বহনকারী, যিনি অর্থজ্ঞ তিনিই (ইহলোকে) সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হন এবং ঐ অস্ত্রান দ্বারা বিধৌতপাপ হইয়া দেহান্তে মুক্তিপ্রাপ্ত হন।

গায়ত্রী মন্ত্রে যে “ধীমহি” শব্দ আছে, তাহা দ্বারা অর্থ ভাবনাসহকারে এই মন্ত্র জপের আবশ্যকতা বুঝাইতেছে।

জাতিবর্ণনির্কিশেষে প্রত্যেক নরনারী ভক্তিপূর্বক সূর্যনারায়ণ জ্যোতির সম্মুখে প্রার্থনা করিবেন যে, হে ভগ্ন দেবশ্রু হে দেব জ্যোতিস্বরূপ জগৎপিতা, জগন্মাতা, জগদগুরু, জগদাত্মা। আমার বুদ্ধিতে অন্ধর হইতে প্রেরণ করিয়া সত্য তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করুন,—বাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সকল নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন করিতে পারি, এবং জ্ঞানপথে বিচরণ করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারি।

বৈদিক যুগে স্বাধীন আধ্যাত্মানুগম এই সত্যধর্ম পালন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীৰ্য্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঋষিদের পরিসমাপ্তি মন্ত্রে, ঋষি

যজ্ঞস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন—তোমাদের মন্ত্রোচ্চারণ একপ্রকার হউক, তোমরা একসঙ্গে সমাগত হও, তোমাদের মন, চিত্ত সকলই একপ্রকার হউক, আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, একই হবি দ্বারা তোমাদের হোম করিতেছি। তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও।

যেদিন হইতে ঋষিদিগের একার্থ ভাবের উপদেশ আমাদের হৃদয় হইতে অতর্কিত হইয়াছে, সেইদিন হইতে আমরা তাঁহাদের আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছি।

গীতায় পুনরুক্তি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন

‘মাম্’ শব্দ গীতায় ৭৬ বার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

১৪৫ ; ২৭ ; ৩১ ; ৪৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪ ; ৫১২৯ ; ৬১০ ৩১, ৪৭ ; ৭১, ৩, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০ ; ৮৫, ৭, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ; ৯৩, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪ ; ১০১৩, ৮, ৯, ১০, ১৪, ২৪, ২৭ ; ১১১৮, ৫৩, ৫৫ ; ১২১২, ৪, ৬, ৯ ; ১৩১২ ; ১৪১২৬ ; ১৫১২৯ ; ১৬১ ১৮, ২০ ; ১৭১৩ ; ১৮১৫৫, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে শ্রীভগবান অজ্ঞানকে তাঁহার অলৌকিক জন্ম ও অলৌকিক কর্মের কথা বলিলেন।

শ্রীভগবান যোগবলে সর্বদা দম্ভমোহরহিত ধীর থাকেন বলিয়া দেহান্তর প্রাপ্তিতে তাঁহার মোহ হয় না এবং স্মৃতিও লোপ পায় না। তিনি অজ্ঞানকে বলিলেন যে আমাকে তুমি কেবল ‘মাম্বুধীং তত্ত্বমাসিতং’ বসুদেব পুত্র মনে করিও না। প্রকৃতিই আমার অধিষ্ঠান বা শরীর ও আত্মমায়ী বা যোগমায়ী আমার জন্মের হেতু,—প্রাকৃত গুণজনিত

কর্ম নহে। অনাদি, জন্মরহিত, অবিনাশী জীবগণের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা হইয়াও আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া লীলার জগৎ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

‘স্বাং প্রকৃতিং’ অর্থাৎ শ্রীভগবানের জীবভূতা পরা প্রকৃতি। মায়ী অর্থাৎ গুণময়ী প্রকৃতি।

ধর্ম সংস্থাপনের জগৎ ভগবানের জন্ম। ধর্ম অর্থাৎ জগদ্ধারণ শক্তি, ‘যয়েদং ধার্যতে জগৎ’।

সাধুদিগের পরিভ্রাণের জগৎও তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই তাঁহাদিগের যোগক্ষেম বহন করেন। গ্নানিগ্রস্ত ধর্মের সংস্থাপনই তাঁহার অলৌকিক জন্মের কর্ম। যুগে যুগে যখনই আবশ্যক হয়, তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সৃষ্ট জগতকে তিনিই রক্ষা করেন, পবিত্র (purify) করেন, অর্থাৎ দোষমুক্ত করেন। শ্রীভগবানের স্বীয় প্রকৃতি ও আত্মমায়ী এই উভয়েরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ ক্রীড়া চলিতেছে এবং এই দু’এরই অবশ্যক হইয়াও তিনি অকর্তা, এই তত্ত্বজ্ঞান হইলেই ব্রহ্মভাব-ফল-প্রাপ্তি হয়।

প্রকৃতপক্ষে অর্জুনকে ইঙ্গিতের দ্বারা শ্রীভগবান বুঝাইতেছেন যে, আমি তোমাকে যোগোপদেশ দিয়া তোমার আত্ম-ভাবস্থ হইয়া, তোমাকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া, তোমারই দ্বারা সাধুপরিভ্রাণাদি কার্য্য করাইতেছি। আমিই “পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ”। ‘মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে’—শ্রীভগবানই সমস্ত জগতের উৎপত্তির মূল কারণ, তাঁহা হইতেই সমস্ত প্রবর্তিত হইতেছে, ইহা জানিয়া তাঁহাতেই প্রীতিযুক্ত হইয়া জ্ঞানিগণ একমাত্র তাঁহাকেই জ্ঞান করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান অর্জুনকে ইঙ্গিত করিতেছেন যে, হে অর্জুন, তুমিই আমি, তোমার কর্ম্মই আমার কর্ম্ম। তুমি এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ম্মসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার কর্ম্মের নিমিত্তমাত্র হও; তাহা হইলে তোমার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া, তুমি জ্ঞানের দ্বার মুক্ত হইবে। তুমি ‘জ্ঞান তপসা পূতা মন্ডাবমাগতাঃ’—এই জ্ঞানই তোমার তপস্যা হইবে এবং তুমি পূত হইয়া, আমার ভাব প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ, ইহাই তাৎপর্য্য। সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে “কশিচ্ছাং বেত্তি তত্ত্বতঃ” পদ আছে। সপ্তম অধ্যায় বিজ্ঞান যোগ, এখানে ভগবৎ বিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান অল্পভব সহ তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন। যদিও তিনি Yoga of Wisdom and self Realization সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত করিলেন, তথাপিও আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না কেন? তাহার কারণ এই সহস্র মাস্তুষ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত চেষ্টা বা যত্ন করে, ঐ যত্ন শীল আত্মজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে আবার কোন এক ব্যক্তি পরমাত্মাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে। যে সকল পুণ্যাখ্যাদিগের পাপ বিনষ্ট হইয়া দ্বন্দ্বমোহ অপগত হইয়াছে, তাঁহারা ইদৃশ্য হইয়া শ্রীভগবানকে ভজনা করেন। শ্রীভগবান সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান হন না, কারণ যোগমায়া (সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণের যোগ স্বরূপ মায়া) দ্বারা তিনি প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, এইজন্ত মূঢ়েরা তাঁহাকে আজও অব্যয় বলিয়া জানিতে পারে না।

ঈশ্বর গুণাতিত। গুণাতীতের ধ্যান কি করিয়া হইবে? দিব্য বিভূতিরই ধ্যান করা কর্তব্য। এই বিষয়ের বিজ্ঞান চতুর্দশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায় বিজ্ঞানযোগ। আত্মার ভাগবত বিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, এই অধ্যায়ের নাম বিজ্ঞানযোগ। সর্বভূতের মূল কারণ শ্রীভগবান। বীজস্বরূপ পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি পরিচালিত কুরিয়া, সেই শক্তিকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহারই ভিতর দিয়া, তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তিনিই সর্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদিগের তেজ।

বাসুদেবই সমস্ত, ইহাই মূল ব্রহ্মবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, জীব কৃতকৃত্যার্থ হয়, ইহার অধিক আর বিজ্ঞান নাই। এই জ্ঞান শুধু বাচনিক হইলে হইবে না, তদ্ব্যতীত ইহাকে জানা চাই ও সমস্ত সত্ত্বা দিয়া অহুভব করা চাই। এই বিজ্ঞানে আরুঢ় হইতে পারা অতীব সৌভাগ্যের ফল; যিনি পারেন, তিনি সুদুর্লভ, তিনি মহাত্মা।

অষ্টম অধ্যায়ের ৬ স্থানে ‘মাং’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—৫, ৭, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ শ্লোকে। এই অধ্যায়ের নাম তারকব্রহ্ম যোগ।

আত্মাই শ্রীভগবান অর্থাৎ তিনিই জীব জীব আত্মারূপে অল্পপ্রবিষ্ট। তাঁহাকে সমগ্রভাবে জানিতে হইলে, তাঁহাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ, এই তিন ভাবের সহিত একত্রে জানিতে হয়। বাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই সকল সমাহিতচিত্ত মহাত্মাগণ মৃত্যুকালেও তাঁহাকে বিস্মৃত হন না। যিনি একই ক্ষণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও কাল-প্রবাহ রচনা করিয়াও নিজে পূর্ণ থাকেন, তিনিই তারকব্রহ্ম। তিনিই অব্যক্ত অক্ষরব্রহ্ম, ভূতগ্রাম তাঁহারই বন্দে পুনঃ পুনঃ জাত ও প্রলীন হয়। পুরে পুরে তিনিই হর-ভাবময় বহুজীব এবং মূলে অক্ষররূপে অবস্থান করেন। তিনি কবি অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, পুরাণ, বিশ্বনিয়ন্তা, সৃষ্ট হইতে সৃষ্ট, সর্বজীব বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ ও আদিত্যের হায় স্বপ্রকাশ।

একদিকে ইনি স্রবভাবময় জীব এবং সেই স্রবশক্তির উপর অধিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম অধিভূত পুরুষ। তিনিই স্রব জীবরাশির আধারস্বরূপ জড় জগতের শক্তিকেন্দ্র

সূর্যাদিরূপে, অধিদৈব নামে খ্যাত। ব্যাটী জীবে ইনি অধিভূত এবং সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে ইনিই অধিদৈব পুরুষ। আবার তিনিই কূটস্থ অর্থাৎ সমগ্র জীব ও জগৎসৃষ্টির কেন্দ্র-রূপে অক্ষর পুরুষ। তিনি ক্ষরস্বভাব জগৎকে অতিক্রম করিয়া আছেন এবং অক্ষরস্বভাব জীব হইতে উত্তম, এই নিমিত্ত তিনি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলিয়া সম্বোধন করিলেন। পুরুষোত্তম শব্দটি গীতায় এই প্রথম ব্যবহৃত হইল। পুরুষোত্তম ও পরমপুরুষ একই অর্থে পরে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—১৫, ১৭, ১৮, ১৯।

শ্রীভগবান ব্যাটী জীবের ক্ষরভাবে অধিভূত বা জীবত্বের ধর্তারূপে বর্তমান ও তাঁহার সংস্কার গ্রন্থিতে অক্ষর পুরুষরূপে ও তাঁহার ব্যক্তশক্তিতে অধিদৈবরূপে অবস্থিত। জীব ক্ষরস্বভাবযুক্ত, ক্ষরভাবেই জীব সদাই লিপ্ত, তাহাই। তাহার পুনর্জন্মের কারণ। এই ক্ষরভাব হইতে অক্ষরভাবে প্রবেশ করাই অপুনরাবৃত্তি লাভের উপায়। গুরু শিষ্যকে এই উপায়টি বলিয়া দেন। ইহাই গুরুর গুরুত্ব।

অক্ষর পুরুষই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ঈশ্বর; তিনিই জীবকে ব্যক্ত করিয়া, তাহার অন্তরে ও বাহিরে অধিভূতাদি ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তাহাকে স্বীয় অক্ষরত্ব উন্নয়ন করেন, তাই তিনি তারকব্রহ্ম। জীবের পরিভ্রাণই তাঁহার স্ব-ভাব। এই তারকব্রহ্মই জীবের একমাত্র স্মরণীয়। যিনি প্রয়াণ-কালে অবিচলিতচিত্তে ভক্তিশ্রুত হইয়া, যোগবলে মনকে স্থির করিয়া, সেই পরমপুরুষকে চিন্তা করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ভগবৎলাভে পুনর্জন্ম হয় না, জীব মহাত্মা হইয়া যায়, জীব পরম সিদ্ধিলাভ করে। ভূমি পুরুষ তুল্য ধীর আত্মা, তিনিই মহাত্মা। শুষ্ক উপাধি লাভ করিলেই 'মাছুষ মহাত্মা' হয় না। যিনি সত্য সত্যই মহাত্মা, তাঁহাকে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না— 'মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ' (৮।১৫) অর্থাৎ মহাত্মাগণ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া, পরম সিদ্ধিরূপ মোক্ষকে লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোক হইতেও জীব সকল সংসার-বর্তনে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয়, কিন্তু শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মাগণের আর পুনরায় জন্ম হয় না।

কর্মশঃ

নিবেদন

মনের গোপন কক্ষে জন্মে ওঠে বাসনার রাশি,
অধরে ফুটিয়ে তোলে শুচিতার সুবিমল হাসি।
কামনার ব্যর্থতায় অন্তঃস্থল ক্ষিপ্ত জ্বালাময়।
প্রতি অঙ্গ দিবারাত্র করিতেছে শান্তি অভিনয়।
নিশার আঁধার বক্ষে ঢালি দেয় বেদনা-আসার
প্রভাতের শুভ্রালোকে সে বয়ান তৃপ্তির ভাণ্ডার।
নিরমম নিয়তির সুকঠোর লাজনার দানে
সুকোমল প্রেম-সুখ-গরল ভরিয়া ওঠে প্রাণে।
মিথ্যাকে আঁকড়ি বুকে, পথে তবু চলিছে সমান।

শ্রীসুখাঙ্ক সেনগুপ্তা

সমাজের, সংসারের, মানবের করিতে কল্যাণ।
যে ফুল জন্মিয়াছিল—ঝরে যাবে ধরনীতে হায়,
পুষ্পের জীবনে কভু পৌঁছিবনা সুন্দরের পায়,
তাহার এ মিথ্যা জন্ম, মিথ্যা জাগরণ, হে সুন্দর,
তোমার এ দান-যজ্ঞে, কোন লীলা ওগো মনোহর?
দেবকুল রক্ষা হেতু হলাহল লইলে সম্বর—
নীলকণ্ঠ! দয়াময়, আজ তুমি এসো ব্যথা-হারী!
জীবনে জাগ হে শিব, আনন্দের পূর্ণ জ্যোতির্ময়,
ছাঃখিনীর ব্যথা-পুষ্প-অর্ঘ্য হোক সুন্দরেতে লয়।

বিজয়িনী

চতুর্থ খণ্ড

আরও সতের বৎসর পরে—

শরৎকাল, মহাষ্টমীর দিন। জমীদার-বাড়ীতে পূজোর বড় ঘট। বেলা প্রায় বাজে দু'টো। সবে সন্ধিপূজা হয়েছে শেষ। সকলেই যাচ্ছে বাড়ী হুট মনে। মায়ের প্রসাদ নিতে ভোলে নি কেউই।

ভিয়েনঘরে তখনও চলেছে রান্না ঘটা করে'। পাতা পড়তে আছে দেবী আরও কিছুক্ষণ। তাই আত্মীয় কুটুম আর নেহাৎ যারা কাজ কচ্ছে এমন লোক ছাড়া সকলেই একবার চলেছে বাড়ীর দিকে।

পথে দেখা যায় এক প্রোটর সঙ্গে একটি উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী কুমারী। রূপ তার দেহের প্রতি অগুপরমাণুতে হয়ে উঠেছে মূর্ত—উজ্জ্বল। বাতাসের সঙ্গে তার কোঁকড়া চুল-গুলো করছে খেলা। তারই উদ্ধামতায় সে ক্ষণ ক্ষণে হয়ে পড়ছে অস্থির। চোখমুখ সবই যায় ঢাকা পড়ে। তারই হাত এড়াতে ওকে হ'তে হয় ব্যস্ত।

মেয়েটির পরণে একখানি চওড়া লালপেড়ে সাড়ী।

স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্য্য তাকে হতে দেয়নি অলঙ্কার-ভার-প্রপীড়িত। সরল আড়ম্বরহীন সে রূপখানিকে দেখে সকলেরই মনে হয় যে থাক তা চির-অক্ষয় হয়ে তাদের সাম্নে।

খুব কাছে কাছে চলে একজন সুদর্শন যুব। কিসের একটা লজ্জা যেন তাকে প্রতিরোধ করে একবারে পাশে পাশে চলতে। মেয়েটা কয় একথা-সেকথা প্রোটের সঙ্গে। আর মাঝে মাঝে এক আধ ঝলক তাকিয়ে নেয় যুবর-দিকে। হটাৎ আবদারের সুরে বলে উঠে—বাবা, আমাদের একটা ভালো ফুলের বাগান চাই। দেশবিদেশের নানান ফুলের বসবে তাতে মেলা। তা বলে তোমায় কিন্তু খাটতে দেবো না একটুও।

এবার যুবকটি এগিয়ে আসে সাম্নে। বলে, আমিও খুব ভালবাসি বাগানের কাজ কর্তে।

শ্রীনির্মলকুমার ভট্টাচার্য্য

প্রোট উত্তর দেয়—না, না, তাতে তোমাদের দু'জনেরই হবে পড়ার ক্ষতি। আমি একাই করে দোব।

মেয়েটা প্রবল অসম্মতি জানিয়ে বলে' উঠে—না, না, তা হলে বাগান চাই না। লেখাপড়া করে থাকবে আমাদের যতটুকু সময় তার মধ্যেই পার্ব্বো শেষ করে ফেলতে। কোন ক্ষতিই হবে না আমাদের। তারপর যুবকটিকে বলল তা' হলে শচীদা আজ থেকেই লাগা যাক কাজে। আজ বিকেলের দিকেই আরম্ভ ক'রবো। আর দেখ, আমার সময় জ্যাঠাইমাকেও এনো সঙ্গে করে। তিনি যদি গোড়ার দিকটার একটু দেন দেখিয়ে শুনিয়ে তাহলে জিনিসটা হবে খুবই ভালো।

যুবকটি চলে যায় 'আচ্ছা' বলে।

প্রোট ভঙ্গলোকটি সমরেশ, মেয়েটি বিজয়িনী—আর যুবকটি দত্তগিমির ছেলে শচী।

বিজয়িনী থাকে এখন কলকাতাতে। ম্যাট্রিক পাশ করে সে এখন পড়ে আই, এ, শচীও পড়ে বি, এ ক্লাসে। প্রতি ছুটিতেই ওরা আসে দেশে। তাই এসেছে পূজোতে।

দত্তগিমি আর সমরেশ দু'জনেরই মনের ইচ্ছে যে ওদের ছুটিতে হোক বিয়ে। কিন্তু মনের ইচ্ছে রাখেন মনের গোপন। সমাজ সম্মানিবোধ এই সবের বেড়া সে পথে মাঝে অনড়।

সবচেয়ে বেশী বুকখানা খাঁ খাঁ করে সমরেশের। মাঝে মাঝে ও নিজেকে দোর দেয় ভয়ানক। কেনই বা গিয়ে-ছিলুম মনুষ্য কর্তে, যখন চোখ বুজবো তখন ওকে দেখবে কে? আবার আসে আর একরকম চিন্তা—যে একদিন করেছিল ওকে সর্বস্বারা, আবার যে এনে দিয়েছিল এই পরম রত্ন—সেই ভগবানের ওপর নির্ভর কবে যার একান্তভাবে।

বাড়ীর দরজায় পা দেবামাত্র ছোট কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে' এসে লুটোর ওদের পায়ের আশে পাশে। কুকুরটা যুগাক চৌধুরীর স্ত্রী গৌরী দেবীই দিয়েছেন বিজয়িনীকে।

এবাড়ীর অধিবাসীদের ওপর যুগাক চৌধুরীর দরদ বড়

বেশী। গ্রামশুদ্ধ সকলেই হয় এতে আশ্চর্য। অনেকে ভাবতো যে তাঁর কোন ছেলেপুলে না থাকার জন্তেই বোধ হয় বিজয়িনীর ওপর পড়েছে এতটা মমতা।

স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর যে বিজয়িনীর উপর স্নেহটা পড়েছে কত বেশী করে তার আর করা যায় না পরিমাপ। তিনি ওকে দেখেন ঠিক নিজের মেয়ের মতন।

বিজয়িনীকে সমরেশ যেদিন থেকে নেয় প্রতিপালন করার জন্তে সেইদিন থেকেই যুগান্ত চৌধুরী তাকে করে আসছে সাহায্য ক্রমাগত। গ্রামের লোকদের বলতো একজন নিঃস্ব লোক যখন কবুতে পারে এত বড় একটা মহৎ প্রেরণার কাজ, তখন আমাদের উচিত নয় কি তার একটুও অংশ নেওয়া—আর তা ছাড়া আমি যখন এত বড়লোক তখন এ না করলে আমার অপমানই হবে।

জমীদার বাবুর বড়ছেলে, ভবিষ্যৎ জমীদার নিজেই যখন হুঁকে পড়লেন এদিকে এতটা তখন অনেকে সন্ততঃ তাঁর খোসামোদের জন্তেও আরম্ভ করল সমরেশকে সাহায্য সহায়ভূতি দেখাতে।

এতে করে সমরেশের হ'ল অনেকই সুবিধা, সে পারলো স্বথের সঙ্গে বিজয়িনীর সব খরচই চালিয়ে আসতে।

(২)

সমরেশের বাড়ীতে বিকেলবেলায় শচী দত্তগিন্নীকে সঙ্গে নিয়ে হ'ল হাজির। চললো মহা-উৎসাহে বাগান তৈরীর কাজ। আসবার সময় দত্তগিন্নী জমীদার-বাড়ীর মালী ভজুয়াকে বলে এসেছিলেন যে ও-বাড়ীর “বিজু”র বাগানের জন্তে যেন সে সেরা সেরা বীজ আর চারা নিয়ে হয় হাজির। সেও তাই অল্প সব কাজ ফেলে গিয়ে হ'ল হাজির। কারণ জানতো যে এতে করে প্রভুকে খুশী করা হবে আরও বেশী।

গোড়া থেকে বিজয়িনী নিজে লেগে গেল পছন্দমত জায়গায় মনের মত গাছগুলোকে পুঁততে। দত্তগিন্নীর উপদেশমত ছোট ছোট চারা গুলোকে দিলে বেড়া দিয়ে ঘিরে। কারণ তা না হ'লে ছাগল গরুতে খাওয়ার বা মাড়িয়ে যাবার আশঙ্কা ভয়।

সারা বিকেলটা জল-কাদা আর মাটি ঘাটাঘাটি করে সন্ধ্যার মুখে সকলে গিয়ে বসলো ঘরে। দত্তগিন্নী গেলেন রান্নাঘরে চা তৈরী করে আনতে। তারপর চা এলে সমরেশ, শচী, আর বিজু আরম্ভ করল খেতে। দত্তগিন্নী চা খান না, তাই পানের বাটা থেকে একটা পান মুখে পুরে বলতে আরম্ভ করলেন—

—একটা খবর শুনেছ বাবা, ঐ উত্তর কোণের কুয়োটার জমীদার বাবু করছেন সংস্কার। জানোই তো, অনেকদিন আগে একবার কি দুর্গন্ধই না বেরোতে আরম্ভ করেছিল ওটার থেকে। আর সেই থেকে সবাই-ই দেয় জল নেওয়া বন্ধ করে। আর সেই থেকেই হ'য়ে পড়ল ওটা একেবারে শুকনো।—এই পূজো বাদেই ওটাতে দেওয়া হবে হাত।

বিজয়িনী বলে উঠলো—তা'হলে তো খুবই হবে ভালো। বাগানের জন্তে জল আনতে আর যেতে হবে না বেশী দূরে।

তারপর নানান রকম হ'ল কথা। শেষে উঠলেন দত্তগিন্নী বাড়ী যাবার জন্তে। বার বার করে সমরেশকে বললেন যে আরতির সময় ঠিক যেও কিন্তু পূজোর দালানে।

অনেকদিন আগেই সমরেশকে স্বীকার কর্তে হয়েছিল বিজয়িনীর কাছে যে, সে তার বাবা নয়। তারপর বলে যেতে হয়েছিল কি ভাবে কুড়িয়ে পাওয়া যায় তাকে আর তার মাতার মৃতদেহকে সমস্তই আলুপুর্কিক। তার মায়ের গলায় যে একটা সোনার হার পাওয়া গিয়েছিল, সেটাও দিয়ে দিতে হয়।

এর প্রধান কারণ এই যে গ্রামের লোকে বিজয়িনী বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব কথা ঢুকিয়ে দিতে থাকে তার কাণে। সমরেশ কিন্তু চেষ্টা করেছিল বরাবরই ঘটনাটা চেপে রাখবার। কিন্তু বিজয়িনীর অতিরিক্ত পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাকে মানতে হ'ল হার।

সেই থেকে বিজয়িনী ভেবেছিল অনেকবারই তার প্রকৃত বাবা, ঘরবাড়ী আত্মীয়-স্বজন সকলেরই কথা। কিন্তু পায়নি একটুও কূল সে চিন্তার। মনে মনে অহুভব করেছিল এক তীব্র যাতনা। তারপর এই নিঃস্ব

স্নেহশীল লোকটির মহান্ হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল
নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী। ভগবানকে দিয়েছিল
অশেষ ধন্যবাদ তাকে এই সংস্পর্শে এনে ফেলার জন্যে।

ও খানিক ভাবে সেই কথা। তাবপর নীরবতা ভঙ্গ

করে' বলে' ওঠে—বাবা, একটা কথা—

—কি, বলো—সমরেশ উত্তর দেয়।

—গেল হুগো থেকে শচীদা ক্রমাগত বলছে—ওঁর চোখ
মুখ হয়ে' পড়ে রাক্ষ। কথা আর পারে না বলতে।

—কি বলছে—বিয়ের কথা তো!

—হ্যাঁ, কিন্তু আমার পিতৃকুলের পরিচয় না থাকতে
তো জ্যাঠাইমার মত হবে না—

—শচী তো সে কথা জানে। তবে সে তোমাকে
জেনে শুনে কেন দেয় কষ্ট এমন করে?—

—তিনি মা-বাপের অমতেও রাজী আছেন—

—কিন্তু তার পরিণামটা কি ভালো হবে?

—কি জানি—বিজয়িনী উত্তর দেয়।

(৩)

বস' গৌরী, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।—মৃগাঙ্ক
বলে।

—কি কথা—গৌরী উত্তর দেয়।

—আমি চাই না সে কথাটা আমি ছাড়া তোমায়
শোনায় আর কেউ। তাই-ই এসেছি তাড়াতাড়ি ছুটে।
আজ আমি পেয়েছি একটা নিদারুণ আঘাত। সম্ভবতঃ
তোমাকেও তা বাজবে খুবই বেশী করে'।

—কি ব্যাপার। কোন কিছু মন্দ খবর কি, আমার
বাপের বাড়ীর—গৌরী আর বলতে পারে না।

—না, না, বেঁচে আছে এমন কাকুরই বিষয়ে কিছু
নয়। আমার নিরুদ্দেশ-হওয়া ভাই হেমন্তের খবর।

—তাকে পাওয়া গেছে, কোথায়—তুমি দেখেছ, না
কেউ চিঠি লিখেছে—উল্লাসিত হয়ে' গৌরী শুধায়।

—পাওয়া গেছে একখাটা সত্য। তবে তাকে নয়
তার দেহের খানকতক হাড়কে।

—আঁ,—আতঙ্কে গৌরীর মুখে আর জোঁগায়না কথা;
মৃগাঙ্ক বলে' যায়—সমরেশের বাড়ীর উত্তরের কুয়োটার

লোক নামানো হয়েছিল। তারাই তা বার করেছে। যদি
আমার ঘড়িটা আর তার আংটিটা না পাওয়া যেত' তা'হলে
মোটাই ধরা যেত না যে হাড়গুলো তারই দেহের।—মৃগাঙ্ক
বলে।

—সে কি আত্মহত্যা করেছিল—না কেউ তাকে ফেলে
দিয়েছিল—গৌরী শুধায়।

—সে কথা বলা শক্ত।—তারপর মৃগাঙ্ক বলে' যায় ভাঃ
গাড়ী বেচতে যাওয়ার কথা।

ওরা দু'জনেই থাকে খানিক চুপ। তার পরে সা
করে' মৃগাঙ্ক বলে ফেলে—সে-ই করেছিল সমরেশে
টাকা চুরি কারণ কুয়োঁর মধ্যে টাকা বোঝাই যেমন-
তেমনি খলে' দুটো গেছে পাওয়া।

এ কথা শোনামাত্র গৌরীর চোখ-মুখ হয়ে উঠে
লাল। বিন্দুমাত্র অপমানজনক আচরণ তার মনকে ক
তোলে বিষম বিভ্রান্ত।—সে বলে' ওঠে—সে কি?

—হ্যাঁ, তাই-ই—জানোই তো—ধর্মের ঢাক বাতাই
বাজে আর হকের ধন যায় না খোঁয়া।

মৃগাঙ্ক খানিক হয় চুপ। গৌরী ভাবে এবার তা
দেবে কোন সাঙ্ঘনা। কিন্তু তা আর হয় না; কথা আ
করার আগেই মৃগাঙ্ক আবার বলে—শোনো গৌরী,
ভগবানের রাজ্যে কোন কিছুই থাকতে পারে না গোপন।
একদিন না একদিন লোক জানতে পারে সবই। অতএব
জীবনেও এই কথার সত্যতা গেছে প্রমাণ হয়ে'। তাই
আর চাই না রাখতে কোন কিছুই লুকিয়ে।

এতদিন ধরে' অনবরত একটা কথা আমি গোপন
রাখবার চেষ্টা করে এসেছি। সফলও হয়ে ছিলুম। কিন্তু
এখন বুঝতে পারছি বেশ যে একদিন না একদিন তা
দেখা দেবে সকলের চোখের সামনে বিকট আকার
ধারণ করে'। হয়তো তখন তুমি শুনবে সব অশ্রু লো
কাছ-থেকে বা আমার মৃত্যুরও পরে। অতএব সে
পথ আমি নিজেই চাই পরিষ্কার করে দিতে। আমি
নিজেই তোমাকে তা বলবো এখনই।

গৌরীর অপসম্মান ভীতি-বিহ্বলতা আবার বেগে এসে
আশ্রয় করে তার মনকে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই

ভয়ানক দৃষ্টি মিলিত হয় একযোগে কিসের একটা অজানা শোচনীয়তার উৎকর্ষায়।

মৃগাক বলে—বিয়ের আগেই আমার উচিত ছিল একথাটা তোমাদের জানানো। কিন্তু পারিনি একান্ত লোভাতুর মনেরই জন্তে। যে মরা মেয়ে মানুষটিকে একদিন সমরেশ কুড়িয়ে পায় সে ছিল আমারই স্ত্রী—তাকে আমি বিবাহ করেছিলুম—আর ঐ বিজয়িনী, ও আমার সন্তান—আমিই ওর জন্মদাতা পিতা।

মৃগাক খেমে পড়ে, ভাবে একথা শুনে গৌরীর মনে জাগতে পারে কি পরিমাণ হতাশা আর ঘৃণা।

কিন্তু গৌরীর মুখে কোঁটে না একটিও রা। শুধু ঝরে পড়ে জল চোখ বেয়ে ছু শব্দে।

—মনে হয় এ দোষের জন্তে আমার পক্ষে চাইবার মত নেই কোন ক্ষমা—মৃগাক বলে।

গৌরী নিরুত্তর।

—আমার উচিত ছিল তাকে তখনই গ্রহণ করা। কিন্তু তাহলে পেতুম না তোমাকে—

এখনও গৌরী দিল না একটাও উত্তর।

মৃগাকের মনে ভয় হয়—এই বুঝি বলে—চললুম এখন থেকে, তোমার মত হীনলোকের সংস্পর্শে আর নয়।

কিন্তু না, অতদূর আর গড়ালো না—গৌরী আস্তে আস্তে মাথা তুলে বসে—অন্ততঃ আরও কয়েকটা বছর আগে যদি আমাকে বলতে এসব কথা, তাহলে' চেষ্টা করে' দেখতুম “বিজয়” প্রতি কোন কর্তব্য আমরা কর্তে পারতুম কিনা? তুমি কি মনে কর যে আমি এতই নীচ যে ‘তোমার সন্তান’ একথা জেনেও তাকে করতুম অবহেলা?

মৃগাক ভাবে যে এতদিন ধরে ‘স্বামী-স্ত্রী হয়ে’ বসবাস করেছে ও পারেনি চিনতে গৌরীকে।

গৌরী বলে যায়—যদি প্রথম দিন থেকে পেতুম আমি ওকে মানুষ কর্তে তাহলে আজ আর আমাকে এই নিরর্থক জীবন বয়ে' হত না বেড়াতে। আমার বুকখানা থাকতো ভরে। হতে' পেতুম ‘মা’—যা না হলে' নারীর জন্ম নেওয়াই বুঝা।

মৃগাক বলে ওঠে—কিন্তু আমি ভেবে লুম তা'হলে পেতুম তোমার অপরিণীত ঘৃণা।

—কি পেতে সে প্রাণের নেই কোনই দরকার। যে অজ্ঞাটাই হয়ে গেছে সেটাই এখন প্রধান আলোচনার বিষয়। আমাকে পাবার জন্তে যে তুমি একটা করবে গহিত কাঁদ এর স্বপক্ষে নেই কোনই যুক্তি। গৌরী উত্তর দেয়।

আবেগের সঙ্গে মৃগাক বলে—সত্যি, আমি খুবই হীন তুমি কি পারবে আমার দোষ ক্ষমা করতে?

—আমার কাছে তুমি তো কোনই অপরাধ করনি। এতদিন' ধরে তোমার কাছ থেকে পেয়ে এসেছি প্রাণঢালা ভালবাসা। তার জন্তে বরং আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। অপরাধটা তুমি করেছ' যাদের কাছে তারা যে কখনও পারবে ক্ষমা করতে তোমাকে তা তো আমার হয় না বিশ্বাস,—কিন্তু বিজয়িনীকে তো আমরা পারি এখন থেকে আপন বলে স্বীকার করে' নিতে। লোকে নিন্দে করবে সে ভয় আমি করি না। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তে জীবনকে গড়ে' তুলবো সার্থক করে'। তাতেই আসবে আমার জীবনের শান্তি।

—কিন্তু এখন সে আসাটা হবে আর এক রকমের। যাই হোক চেষ্টা করে' তো দেখা যাক—যেন থাকেনা আমাদের দিক দিয়ে কোন ক্রটি বিচ্যুতিই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সে যেন পারে আমাদের ভালবাসতে।

—তা হলে চলো আমরা এখনি যাই সমরেশের কাছে। —মৃগাক গৌরীর হাত ধরে' এগোয়।

[৪]

সমরেশ আর বিজয়িনী ঘরের ভিতর বসেছিল স্নান-সান্নি। কেউই কাকুর সঙ্গে কইছিল না একটিও কথা। সমরেশের মুখের ভাবের হচ্ছিল ঘন ঘন পরিবর্তন। বিজয়িনী তাকিয়েছিল একদৃষ্টে বাপের মুখের পানে। টেবিলের ওপর রয়েছে রাশীকৃত মোহর, টাকা, সব ঢালা। আলোতে সেগুলো করছিল ঝকঝক।

অতর্কিতে সমর বলে' ওঠে—জানো মা, তোমাকে পাবার আগে ঐ সোনার পাহাড়ের দিকে তাকিয়েই হত'

আমার রাত ভোর। তারপর ওগুলো হারানোর পর যখন পেলুম তোমায়, বড় ভয় হ'ত—যদি আবার হারাই। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখ' যেন ওগুলোকে কোন এক অদৃশ্য শক্তি পাঠিয়েছেন আবার তোমারই জন্তে।
—কেননা আমার নিজের আর নেই ওতে কোনই প্রয়োজন। ওতে হবে না আমার আত্মার নবজীবন, ওতে করে' আমি হারাতে দ্বিধা নেই।

হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় কে যেন মারে ধাক্কা। বিজয়িনী উঠে গিয়ে দেখ-খুলে। তার মুখ চোখ উত্তেজনায ছিল বেশই রাঙা হয়ে, আগন্তুক মুগাক চৌধুরী আর গৌরীকে দেখে তা গেল আরও বেড়ে। সে একটু নত হয়ে অভিবাদন করে ওদের নিয়ে এল ঘরের ভেতর।

ঘরে ঢুকবার সময় গৌরী নেয় একখানা হাত স্নেহভরে নিজের হাতের ভেতর। তার মুখে চোখে ফুটে ওঠে একটা ওৎসুক্যের ভাব।

না-বসেই মুগাক সমরেশকে উদ্দেশ্য করে' বলতে আরম্ভ করলে—সমরেশ বাবু আপনাকে হৃত ত সম্পত্তি ফিরে পেতে দেখে সত্যিই আমার বড় আনন্দ হয়েছে। কিন্তু আমারই ভাইয়ের ঘারা যে এই অত্যাচার কাজ ঘটেছিল তারই জন্তে আজ আমি চাই আপনার ক্ষমা। আমার প্রার্থনা, স্নেহে আপনি যেন আমাদের পরিবারের ওপর কোন বিরুদ্ধভাব পোষণ না করেন।

গৌরী মুগাককে পরামর্শই দিয়েছিল যে আসল কথাটা যেন বট করে বলে ফেলা না হয়। ওদের দুজনের মনের অবস্থাটা কিরকম আছে সেইটে বুঝেই কথাটা হবে পাড়তে। যদি এমন বোঝা যায় যে তাতে ক'রে হ'তে পারে কোন কুফল তাহলে উপস্থিত মত রাখা যেতে পারে স্থগিতও।

মুগাক আবার বলে—না, আপনি ক্ষমা করলে তো কেবল হলো আপনারই কর্তব্য করা। কিন্তু আমার দিক দিয়ে ও অপরাধ স্থানন করবার আছে অনেক কিছুই। এবার সমরেশ দিল উত্তর ধীরে—আজ পর্যন্ত আপনার কাছে আমি এসেছি সাহায্য পেয়ে যে ভাবে তাতে আমার ঋণের ভারী বেড়ে গেছে অনেকখানি। অতএব আর আমার বেশী উপকার করে সেটাকে বাড়তে দেবেন না।

আর টাকা চুরির কথা যে বলছেন ওটাকে এখন আমি ক্ষতি বলেই করিনা মনে। উপরন্তু আপনি তার জন্তে নন বিন্দুমাত্র দায়ী।

—আপনি তা পারেন বলতে; সেটা আপনার ওদার্থ্য্যেরই হ'ল নিদর্শন—কিন্তু এটাও আপনার নয় কর্তব্য যে আমার ত্রায়সঙ্গত কাজে দেওয়া বাধা, সারাজীবন ধরে আপনি করে এসেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। আপনার কর্মোৎসাহ আর সরল জীবনের পরাকাষ্ঠা দেখে আমরা হয়েছি অনবরতই আশ্চর্য। কিন্তু, কিন্তু আর আপনার উচিত নয় এই বয়সেও পরিশ্রম করা। এখন আহার ও বিশ্রামের আছে প্রয়োজন—মুগাক এবার একটু থামলো।

সমরেশ সলজ্জ ভাবেই ওঠে বলে—কাজ না কর্তব্যে পলে আমি কিছুতেই পারি না থাকতে বেঁচে। কিন্তু তা বলে মনে করবেন না যে আমি চাই প্রভূত ধন—মোটেরই তা নয়।... অভাবের জন্তে আমি নইকো মোটেই কাতর বা ভীত, বিজয়িনীকে কাছে পেলে আমার দিনগুলো হয়ে থাকে স্বর্গের চেয়ে সুখকর।

মুগাকের মনে জাগে আতঙ্ক। তাইতো, বোধহয় ফল হব না। —তা হলে কি হবে—ও আবার বলে তলে —আপনি এতদিন ধরে' বিজয়িনীর প্রতি সব কর্তব্যই করে' এসেছেন পালন। তার জীবনটা গড়ে' তুলতে দেননি কোন কিছুই ক্রটি হতে। কিন্তু আজ ও হয়েছে বড়। ওর মত সুন্দরীও এজকালে নেই দুটি। অতএব এখন দেওতে হবে, ওর জীবন যাতে হতে' থাকে আরও মধুময় আরও স্বাচ্ছন্দ্য ভরপুর।

সমরেশ আর বিজয়িনী দু'জনেরই কাছে কথাগুলো ঠেকে বড় অদ্ভুত, বড় বিসদৃশ। তাই তো, মুগাকবাবু কি সব অদ্ভুত বিষয়ে ঘামাচ্ছেন মাথা।

সমরেশ সোজা জিজ্ঞাসা করে—আমি পাচ্ছি না আপনার কথার কিছুই বুঝতে।

এবার মুগাক সরাসরি পৌঁছে গেল নিজের বক্তব্য-বিষয়ে—সে বলল—আমার কথার মানে হচ্ছে এই যে আপনি তো জানেনই যে আমার কোন ছেলেপুলে নেই। আমার এত ঐশ্বর্য্য সব কে যে ভবিষ্যতে করবে ভোগ তার নেই কোনই ঠিক। তাই চাইছি বিজয়িনীকে আপনার

কাছ থেকে নিজের সন্তান হিসেবে পালন করো বলে।
—মনে হয় তাতে আপনার স্থখ বাড়বে বই কমবে না।

একথা শুনে সমরেশের বাক-শক্তি হ'য়ে গেল রহিত।
কিছুক্ষণ পরে বলল আস্তে আস্তে—বিজু, মা আমার,
এ বিষয়ে তুমি নিজেই বল কথা ওঁদের সঙ্গে।

বিজয়িনী এবার স্বভাবস্বলভ লজ্জাকে করলে পরিত্যাগ,
ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল—আপনাদের এই সদয়
প্রস্তাবের জন্তে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পাশুছি না থাকতে।
কিন্তু আমি পারবো না আমার বাবাকে ছেড়ে কোথাও
যেতে। আর তা ছাড়া ধনীর সংস্পর্শে গিয়ে ধনী হ'য়ে
আমি আমার সমশ্রেণীর লোকদের পারবো না ভুলতে।

এ কথায় যুগাক্ষের মনের ভেতর জেগে উঠলো তুমুল
ঝড়। ওর সাধুসংকল্পে যে-কেউ দিতে আসবে বাধা
এটায় ও আর পারলো না শাস্ত থাকতে। রাগে
অভিমানে বলে ফেলল—কিন্তু জানো কি, তোমার ওপর
আমার অধিকার আছে—সব চেয়ে বড় অধিকার,
আমার স্মারসঙ্গত কর্তব্যই হ'চ্ছে তোমাকে দাবী করা—
কারণ তুমি, তুমি আমারই সন্তান, তোমার মা ছিলো
আমারই স্ত্রী।

এ কথায় বিজয়িনী উঠলো চমকে। মুহূর্তে মুখখানা
তার হ'য়ে গেল ফ্যাকাসে। সমর কিন্তু কল্পে মনে শক্তি-
সঞ্চয়। সে আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করল—তা হ'লে
আপনি এতদিন ধরে এ বিষয়ে নীরব রইলেন কেন?—কেন
আমার সব মমতা, সব স্নেহ ওর ওপর জন্মানোর আগে
আপনি দাবী করেন নি? আজ একে আমার কাছ থেকে
নিয়ে যাওয়া মানে সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়স্রষ্টাও উপড়ে
নেওয়া। আপনি ওর দিকে পেছন ফিরে ছিলেন বলেই
না ভগবান ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং
আমারই বলে চিনিয়ে ছিলেন জগতে।

—তা জানি সমর বাবু, আমার হয়েছে বিষম অশ্রায়
আর সে জন্তে আমাকে শাস্তি পেতে হয়েছেও নিরন্তর,
আজ আমার অহুতাপের নেই কোনই শেষ।

—কিন্তু এক যুগেরও বেশী দিন ধরে' যে অশ্রায়টা হয়ে
এসেছে কেবল অহুতাপেই করা যায় না তার প্রতিকার।

আপনার এই পিতৃহ্রদের নজীরে আমাদের মধ্যে বাপ-মেয়ের
সম্পর্কের হতে চায় না একটুও অদল-বদল।

—আমি বলছি না যে বিজুকে আপনার কাছ থেকে
নেওয়া হবে কেড়ে একেবারে। আমি তাকে আপনার খুবই
কাছে কাছে রাখবো। প্রতিদিন পাবেন তাকে দেখতে।
বিন্দুমাত্রও ভালবাসা কমবে না তার আপনার প্রতি।

—আপনার কথার কোন মানে হয় না। আপনি
বলছেন ভালবাসা কমে যাবে না। কি করে তা সম্ভব হবে।
এখন আমরা দু'জনে খাই একটুকরো খাবার ভাগাভাগি
করে। আমাদের চিন্তা কাষকর্ষ সবই আছে একসূত্রে
গ্রথিত। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন হব বিথগ্নিত তখন কি
করে সেই যোগসূত্র থাকতে পারে অক্ষুর?

যুগাক্ষ এবার ওঠে রেগে। জীবনে নিজে কখনও
করতে শেখেনি স্বার্থত্যাগ, কাজে কাজেই ভাবতে থাকে,
সমরেশ নিদারুণ স্বার্থপর। গলার স্বরে যথাসম্ভব গাঙ্গীর্ঘ্য
এনে বলে—আমার ধরনা ছিল যে বিজুর প্রতি মমতা
খাঁকার দরুণ তার স্বখের জন্তে আপনাকে যদি কিছু
স্বার্থত্যাগও করতে হয় তাও হয়তো আপনি করেন।
আপনার জীবন এখন এগিয়ে চলেচে সীমানার পানে।
অতএব ওর ভবিষ্যৎটা গড়ে দেওয়া দরকার এখনই। আজ
যদি ও আপনার কাছেই থাকে প্রতিপালিত হ'তে তা
হলে ওর বিয়ে হওয়াটাই দায় হবে। কিন্তু আমার
আছে টাকা আর প্রতিপত্তি দুই-ই, কাজে কাজেই আমার
পক্ষে ওকে কোন স্থপাত্রের হাতে দেওয়া হবে না মোটেই
অসুবিধের। অতএব ভেবে দেখুন, আপনি ওর পক্ষে
সৃষ্টি করছেন কতদূর প্রতিবন্ধক।—আপনি এতদিন ধরে'
এর জন্তে করে এসেছেন যা তার জন্তে আমি কৃতজ্ঞ।
কিন্তু মাহুষের উচিত কর্তব্যজ্ঞানকে সবকিছুর ওপরে
স্থান দেওয়া। তাই চাই, কি করে পারি আমার মেয়ের
ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করতে।

বহুদিনের পরিচিত স্নেহময় বাবা আর যে অজ্ঞাত
হৃদয়হীন অস্তিত্বকে বাবা বলে ভেবে এসেছিল তাদের
দু'জনের মধ্যের এই দ্বন্দ্ব বিজয়িনীর চিন্তার প্রবাহ বড়
দ্রুত হয়ে পড়ল। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কোন্ এক

অজ্ঞাতশক্তি দিলে একটা প্রবল অশ্রদ্ধা আর বীতরাগের ভাবকে জাগিয়ে।

সমরের বিবেকবুদ্ধিতে পড়লো আরেক রকম ধা। অন্তরাআয় জাগলো বিষম পীড়া। ভাবলো মৃগাক্ষের কথাটা যদি হয় সত্যি—সে .বিজয়িনীর ওপর অত্যাচার করছেন তো। তার জীবনের সৌষ্ঠব আহরণে দিচ্ছে না তো কোন বাধা? মনের মধ্যে চলতে থাকে দ্বন্দ্ব। অতিকষ্টে উচ্চারণ করে—মৃগাক্ষ বাবু এ বিষয়েও আমি নিজেকে দিতে চাই না কোন মত। বিজুর সঙ্গেই আপনি বলুন কথা—ওর মতই আমার মত।

গৌরীরও মনে হয়েছিল সমরের অভিমত যুক্তিহীন। যখন সন্তানের প্রকৃত পিতা জানায় তার দাবী সন্তানকে ফিরে পেতে, তখনই তা অস্বীকার করা সম্পূর্ণ অত্যাচার। বলা বাহুল্য তার এই ধারণার মূলে স্বামী প্রীতি সহায়ত্ব আর পক্ষপাতীত্বের ভাবটাই ছিল প্রবল।

মৃগাক্ষ বলে—মা, বিজু, আমাদের অনুরোধ এই যে তুমি এতদিন ধরে যাকে নিজের বাবা বলে জেনে এসেছ, যার প্রাণের সঙ্গে তোমার প্রাণের হয়ে গেছে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন তাকে স্থগী করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার যে আপন বাবা তাকেও উপেক্ষা করে না। এতদিন যদিও আমি করিনি বাপের কর্তব্য তবুও এটা জেনে! যে এখন থেকে আর আমার হবে না কোন্‌ই ভুল। বাকী জীবনটা চাই আমরা একমাত্র সন্তান হিসেবে তোমাকে কর্তে পালন। আমার স্ত্রী যে তোমাকে পেতে কতটা আকুল তা তুমি পারবে না বুঝতে—

একথায় গৌরী বলে উঠলো—মা বিজু, তুমি হবে আমার কাছে সাত রাজার ধন—এক মাণিক। তোমাকে পেলে এ জগতে আর আমার দরকার হবে না কোন কিছুই।

এই সব কথায় বিজয়িনীর হ'ল না একটুও ভাব-পরিবর্তন। সে সমরের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আরম্ভ করলো দৃঢ়তা-ব্যঙ্গক স্বরে—

—বাবা, মা, আপনাদের এই মহৎ মনোভাবের নেই কোনই ভুলনা। আজ আপনারা আমাকে দিতে এসেছেন যা তা আমার কামনার বাইরে। কিন্তু আমি আমার এই

সর্বস্বাধীন পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যে অধিকারী হতে' যেতে পারবো না এতদিন ধরে' আমাদের দু'জনের দুঃখ দুঃখ সবই হয়ে এসেছে এক। এ জগতে তাঁর যা কিছু ছিল সবই তিনি হারিয়েছেন। অতএব আজ যদি আমাকেও যেতে হয় এখান থেকে তা হলে তাঁর আর থাকবে না কোনই অবলম্বন। আমার স্থির সংকল্প এই যে যতদিন তিনি থাকবেন বেঁচে আছেন ততদিন আর কোন জায়গায় যাব না চলে'।—

উত্তেজিত ভাবে মৃগাক্ষ বলে ওঠে—কিন্তু, কিন্তু, তুমি কি ব্যাপারটা পাচ্ছে! খুব ভালোভাবে তলিয়ে বুঝতে জানো তুমি কি কচ্ছ। স্বইচ্ছায় নিচ্ছ আজীবন দুঃখ বাকবে'। অথচ তোমার রয়েছে অসীম ঐশ্বর্য্য?

—না বাবা, দুঃখ আমার কোথায়? বরং যদি অনাড়র সরল জীবন থেকে হই বঞ্চিত তাতেই আসবে কাতরতা। দামী জামা কাপড়ে, সুস্বাদু ভোজ্যে প্রাণ আমার উড়ে হাঁপিয়ে। ক্লান্ত হয়ে' পড়বো শান্ত জীবনযাত্রা প্রণালীর অভাবে।—বিজয়িনী দিলে উত্তর।

ইসারায় মৃগাক্ষকে চুপ কর্তে বলে গৌরী আরম্ভ করে—নিজের—তুমি যা বলে মা তা খুবই সত্যি, কিন্তু আমার দিক দিয়ে তোমার প্রকৃত বাপের প্রতি নেই কি বে-বই কর্তব্য?

অভিমান দুঃখে বিজয়িনীর চোখে এবার এল জ্বলন্ত ভাঙ্গা গলায় সে বলে উঠলো—এখন আমার পক্ষে অন্য কাউকে বাবার আসনে বসানো অসম্ভব—তা হোন না কেন তিনি আমার জন্মদাতা। আমার জীবন সম্রাস্ত দাঁড়ায় পথ বেয়ে উঠে নি গড়ে, কাজেকাজেই তাতে আগুন নয়কো আকুষ্ট, যারা অতি সাধারণ লোক—দিন আনে দিন যায়—তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে আমার জীবন ব্যাধ-বন্ধনে—আর—আর—তাদেরই একজনকে আমি বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—ও কথার মাঝখানেই যায় থেমে

মৃগাক্ষ অপমানে এবং লজ্জায় হয়ে ওঠে লাল সে আর পারে না কোন কথাই বলতে।

গৌরী একটু চুপ করে' থেকে বলে ওঠে, আচ্ছা যাচ্ছ আর নয়—তুমি কথাটা একটু ভেবো।

সাগর-মেঘলা ধরণীর বুকে কত পুষ্পিত জীবন চেউয়ের
প্রাবনে একান্ত নিরালয় হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন। রাখতে
পারে না কেউই তার খবর। কেনই বা এল আর কেনই
বা গেল এর হিসেব নিকেশ পৃথিবীর যেন প্রয়োজন হয় না
কাকর কাছেই দেওয়ার।

পরিপূর্ণতা পাবার আগে সব জীবনই এক একটা
নিশানা অভিমুখে থাকে ছুটেতে। শেষ পর্যন্ত গিয়ে
পৌছায় কি না তাও দিতে পারে না জানিয়ে। হয়তো
জগতও থাকে না তার জন্মে হয়ে উন্মুখ, সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেন
সৃষ্টি করেই খালাস।

সমর, বিজয়িনী আর শতীর জীবনের সঙ্গে গ্রামের
জীবনের পড়েছিল ছেদ। তারা চলে যায় সম্ভবতঃ
ক'লকাতার দিকে। সেখানে নাকি শতীর সঙ্গে বিজয়িনীর
হয় বিয়োগ। তারপর তাদের জীবনে আর কি হল বা
না হ'ল তা আর এ কাহিনীর পর্যায়ে এসে পারেনি
পৌছাতে। তবে কেবল এইটুকু মাত্র পারা যায় কভে
অসুস্থমান যে সময় যে দিন ফেলেছিল শেষ নিঃশ্বাস এ ধরার
বুকে তখন তার অন্তরে জেগেছিল অসীম পুলক, গভীর
শান্তি। *

* ইংরাজি হইতে

সমাপ্ত

স্মৃতির কাঁটা

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

তোলা পাড়া অনেক ক'রে,
মনে মনে অনেক পড়া বোঝা
কোন্নগরে গেলেম চ'লে রাস্তা ধরে সোজা।
কারণ? কারণ মিছে খোঁজা।
বেশী তো দূর নয় কো মোটে
গ্রাম্য গোষ্ঠে সন্ধ্যা নামে-নামে,
পল্লী বালা পথের বাঁকে
থাকে থাকে
পিছন ফিরে থামে;
সাথের শিশু পিছিয়ে পড়ে পাছে;
দিনের আলো আর কিছু কি আছে?
ঝোঁপে ঝাড়ে
আঁধার বাড়ে
অস্ত্র মেঘে একটু শুধু রাঙা
সন্ধ্যাভরা অন্ধকারে ভাস্তি ভুল ভাঙ্গা।
একটী শুধু রাতি---
রাত পোহালেই ফিরতে হ'বে---
কিন্মা রাতারাতি।

রাত কাটিয়ে কোনরূপে
পাশ কাটিয়ে চুপে চুপে
এলেম ফিরে ধীরে
উষার আলো---
যেই ফুটালো সূর্য্যমুখীটারে।
সেই আলোকে দেখল যারা
আত্মহারী
চেয়ে মুখের পানে
বল্লো কানে কানে
“কোন জহুরী গলিয়ে মরি
গড়লো রে তোর সোনা,
কোন পথে বা তাহার আনাগোনা
যার পরশে দৃষ্টি ভর ভর
যাহার সোহাগ সোহাগেতে
গলিয়ে দিল, রাত পোহাতে
যায়না মানুষ চেনা এমনিতির।”
এখনও সেই কোন্নগরে
ঘরের কোণে চিত্ত মাখা কোটে
স্মৃতির কাঁটা রাত্রি দিনে
বক্ষে শুধু ফোটে।

স্বর্গত কবি রাধাচরণ

“বঙ্গলক্ষ্মী”র সম্পাদক এম. রাধাচরণবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। ক্রমে তাঁর মধুর স্বভাবের জন্তেই সেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সে আজ প্রায় দশ বার বছর আগেকার কথা। সে সময় আমাদের এ্যাসোসিয়েসনে বেশ একটা ক্ষুদ্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

লেখালেখির ব্যাপারে, সাহিত্য আলোচনায়, টিপটি ইত্যাদিতে স্বর্গীয় কবি, বন্ধুবর পঞ্চানন ও আমি তিনজনে একত্র হতাম ও আলাপ ইত্যাদিতে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত বোঝা যেত না। সে সময় ছিল আমাদের তরুণ বয়স, পৃথিবীর সব কিছুই ছিল অপরিচিত রূপের মধুর। তাই ভালো লাগত আমাদের পরস্পরের সঙ্গে।

কোন নতুন বই কিনলে বা পড়লে তারই আলোচনা হ'ত দিনের পর দিন। যেবারে প্রাণসিয়া দেলেক্টা নোবেল প্রাইজ পান সেবারে তাঁর “মাদার” বইখানা আমি কিনি। রাধাচরণবাবুর এত ভালো লেগেছিল বইখানা যে তিনি অনেকদিন ধরে বেশ মন দিয়ে পড়েছিলেন এবং বাঙ্গলায় অনুবাদ করবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেছিলেন।

রাধাচরণবাবু কবিতা, বিশেষ করে ছোট কবিতা খুব বেশী লিখতেন। পুরোপুরি প্রবাসী খুললে দেখতে পাওয়া যাবে, কত ভালো সেই ছোট ছোট যুইএর মত কবিতাগুলি। দু-একটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি এখানে;—

জীবন ও মরণ

জীবন হচ্ছে কর্মশালা

কাজ করে যাই কাজের ক্ষণে

মরণ—সে যে প্রিয় চুমা

এলিয়ে পড়ি আলিঙ্গনে।

শ্রীকালিদাস ঘোষাল

ভাঙ্গলক্ষ্মী

কালও সারারাত শূন্যসিন্ধু

মস্থিল দেবাসুর..

মেঘ ‘সুন্দরে’ বিজুরী বাসুকী

মস্থন রজ্জুর..

বিজড়ি বন্ধ আঁকড়ি প্রান্ত

সেকি আলোড়ন অবিশ্রান্ত;

বারিমিফোড শ্রাবণ প্রাবনে

হাপিল দিক স্তূর।

মস্থন শেষ প্রত্যয়ে আজি

শ্রান্ত অসীমাকুল

সেখায় ফুটেছে গুচি হৃৎকল

ভাঙ্গ-পদ্মফুল।

কক্ষে অমৃত আলোক-গাগরী

চক্ষে নবীন জীবন-জাগরি

লক্ষ্মী দাঁড়াল পদ্মদলে যে

পরশি শ্রীপদমূল।

অকালবত্তা শীর্ষক কবিতাটি বহুদিন আগেকার কথা; কিন্তু এবারকার দেশের অবস্থার সঙ্গে বর্ণনার কি যবহ মিল দেখুন:—

“পথ ভুলে আজ আশ্বিনে কোন

শ্রাবণ এল সর্বনাশী;—

ঘোর প্রাবনে ভাসিয়ে দিল

সুখ শরতের সকল হাসি।

অপরাজিতার নাই নিশানা

শিউলীতলায় সঁতার অথই

বোধন দিনে দেশাত্ম অই

রোদন করে বাথায় কতই;

ধানের দেশের ধানের ক্ষেতে

একটা ধানের গাছ দেখিনা,

‘প্রবাসী’তে বেরিয়েছিল। মনে হয় সব লেখার ভেতর
এটি তাঁর প্রেষ্ঠ রচনা। কিছু আভাস দিচ্ছি কি সুন্দর
এই কবিতাটি :—
“আকাশের মেঘরন্ধ্রে অন্ধকারে তুমি চেয়ে থাকো।

তারা হ’য়ে,

আখির পলকহারী হয়ে

তুমি মোরে ডাকো।

আভাসে, ইঙ্গিতে, শত ডাকৈ :—

আমি থাকি ক্ষুদ্রতার শত নাগপাশে

ধরণীর এক পাশে।

বাঁধা শত পাকে—

* * *

চারিদিকে কামনা অঙ্গুরী

খেলে লুকোচুরী খেলা করতলে মোর ছটা চক্ষু চেপে ধরি’

দৃষ্টি রোধ করি’

তবু মাঝে মাঝে ঘেন অঙ্গুলির ফাঁকে

আখির কিরণ তব আসি মোর লাগে

নয়নের আগে

আলৌহিত্য রাগে ;

সে কিরণে ফুটে ওঠে অন্তরের ফুল—

উর্ধ্বপানে, মেলি বাহু আরো উর্ধ্বে উঠিতে ব্যাকুল ;

ডাকো, তুমি ডাকো।

হে প্রমুক্ত বায়ুর প্রবাহ, বাহিরের হে মুক্তি বৃহৎ,

অবকাশ, হে শূন্য মহৎ

বন্ধ পিঞ্জরের পানে তুমি চেয়ে থাকো—

আমি পিঞ্জরের পাখি,

ক্ষুদ্র পায়ে বন্ধ বারি, ক্ষুদ্র খাদ্যে তৃপ্ত হয়ে থাকি।

যাবো, যাবো, তবু আমি যাবো

হে অনন্ত, বলো বলো আমি তোমা পাবো ?”

জানি না তাঁর এই আকুল প্রার্থনা সার্থক হয়েছে
কিনা।

“বঙ্গলক্ষ্মী”তে কাজ করা ছাড়া ‘কেয়া’ ‘পঞ্চপ্রদীপ’

‘অত্রি’ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করে গেছেন তিনি।

দু’বছরের ‘কিছু ওপর হ’ল ‘জলছবি’ বের করেছিলেন।

‘হোয়াইট কেবিন’, ‘মৃগয়া’, ‘কো-এডুকেশন’ ইত্যাদি

পাঁচখানি উপন্যাস, দু’খানি গল্পের বই ও তিনখানি

কবিতার বই তিনি লিখে গেছেন। গল্প, উপন্যাস

লিখলেও কবি হিসেবেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

গত আশ্বিনের প্রথমই তিনি বেরিবেরিতে পড়েন ; ঐ

মাসের শেষেই ৪৫ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

বন্ধুরা তাঁর অকৃত্রিম দৌহাঙ্গের স্মৃতি সম্বল ক’রে পিছনে

প’ড়ে রইলেন। কবি কুমুদরঞ্জন স্বর্গীয় বন্ধুকে স্মরণ করে

লিখেছেন ;—

এমনি আসর হয় ভঙ্গ—

চকিতে ছাড়িয়া যায় সঙ্গ।

খেমে যায় মনোরথ,

কাঁদে রে স্বদূর পথ

থাকে যারা রয় পিছু ডাক্তে

* *

তাহারে আবার হবে আসতে

এ ধরারে হবে ভালোবাসতে।

সবে বেঃসহিস্রু ভালো

বেদনা যে দিয়ে গেলো

সে বেদনা তারে হবে ঢাক্তে।”



স্বর্গত কবি রাধাচরণ

“বঙ্গলক্ষ্মী”র সম্পর্শে এসে রাধাচরণবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। ক্রমে তাঁর মধুর স্বভাবের জন্তেই সেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সে আজ প্রায় দশ বার বছর আগেকার কথা। সে সময় আমাদের এ্যাসোসিয়েসনে বেশ একটা স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

লেখালেখির ব্যাপারে, সাহিত্য আলোচনায়, টিপারটি ইত্যাদিতে স্বর্গীয় কবি, বন্ধুবর পঞ্চানন ও আমি তিনজনে একত্র হতাম ও আলাপ ইত্যাদিতে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত বোঝা যেত না। সে সময় ছিল আমাদের তরুণ বয়স, পৃথিবীর সব কিছুই ছিল অপরূপ রূপরসে মধুর। তাই ভালো লাগত আমাদের পরস্পরের সঙ্গ।

কোন নূতন বই কিনলে বা পড়লে তারই আলোচনা হ’ত দিনের পর দিন। ঘেবারে গ্রাংসিয়া দেলেন্দা নোবেল প্রাইজ পান সেবারে তাঁর “মাদার” বইখানা আমি কিনি। রাধাচরণবাবুর এত ভালো লেগেছিল বইখানা যে তিনি অনেকদিন ধরে বেশ মন দিয়ে পড়েছিলেন এবং বাঙ্গলায় অনুবাদ করবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেছিলেন।

রাধাচরণবাবু কবিতা, বিশেষ করে ছোট কবিতা খুব বেশী লিখতেন। পুরো গো প্রবাসী খুললে দেখতে পাওয়া যাবে, কত ভালো সেই ছোট্ট ছোট্ট যুইএর মত কবিতাগুলি। দু-একটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি এখানে ;—

জীবন ও মরণ

জীবন হচ্ছে কর্মশালা

কাজ করে যাই কাজের ক্ষণে ;

মরণ—সে যে প্রিয়ার চুমা

এলিয়ে পড়ি আলিঙ্গনে।

ত্ৰীকালিদাস ঘোষাল

ভাজলক্ষ্মী

কালও সারারাত শূণ্যসিন্ধু

ময়িল দেবাহর

মেঘ ‘মন্দরে’ বিজুরী ‘বাসুকী’

মহন রজ্জুর।

বিজড়ি’ বন্ধ আঁকড়ি’ প্রান্ত

সেকি আলোড়ন অবিশ্রান্ত ;

বারিধিক্ষোভ আবণ প্রাবনে

ছাপিল দিক সূর্য।

মহন শেষ প্রত্যয়ে আজি

শান্ত অসীমাকূব

সেখায় ফুটেছে শুচি স্তম্ভ

ভাজ-পদ্মফুল।

কক্ষে অমৃত আলোক-গাগরী

চক্ষে নবীন জীবন-জাগরি’

লক্ষ্মী দাঁড়াল পদ্মদলে’ যে

পরলি’ ত্রীপদমূল।

অকালবন্তা শীর্ষক কবিতাটি বহুদিন আগেকার লেখা ; কিন্তু এবারকার দেশের অবস্থার সঙ্গে বর্ণনার কি ছবত মিল দেখুন :—

“পথ ভুলে আজ আশ্বিনে কোন

আবণ এল সর্বনাশী ;—

ঘোর প্রাবনে ভাসিয়ে দিল

স্বথ শরতের সকল হাসি।

অপরাজিতার নাই নিশানা

শিউলীতলায় সাতার অথই

বোধন দিনে দেশাত্মা অই

রোদন করে ব্যাথায় কতই ;

ধানের দেশের ধানের ক্ষেতে

একটা ধানের গাছ দেখিনা,

‘প্রবাসী’তে বেরিয়েছিল। মনে হয় সব লেখার ভেতর
এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। কিছু আভাস দিচ্ছি কি স্থলর
এই কবিতাটি —
“আকাশের মেঘরন্ধ্রে অন্ধকারে তুমি চেয়ে থাকো

তারাই হৈছে, বাহু

আখির পলকহার হুহু—

তুমি আমারে ডাকো

আভাসে, ইঙ্গিতে, স্বত ডাকে,—

আমি ফুটুকি ক্ষুদ্রতার শত নাগপাশে

ধরণীর এক পাশে

বাধা শত পাকে—

* * *

চারিদিকে কায়না অপসরী

খেলে লুকোচুরী খেলা করতলে মোর। ছুটি চক্ষু চেপে ধরি’

দৃষ্টি ঘোষ করি’

তবু মাঝে মাঝে মেন অজুতির ফাঁকে

আখির কিরণ তব আসি মোর লাগে

নয়নের আগে

আলোহিত রাগে ;

সে কিরণে ফুটে ওঠে অস্তরের ফুল—

উর্ধ্বপাদে মেলি বাহু আরো উর্ধ্বে উঠিতে ব্যাকুল ;

ডাকো, তুমি ডাকো

হে প্রমত্ত বায়ুর প্রবাহ, বাহিরের হে মুক্তি রং,

অবকাশ, হে শূন্য মহৎ

বন্ধ পিঞ্জরের পানে তুমি চেয়ে থাকো—

আমি পিঞ্জরের পাখি,

ক্ষুদ্র পাত্রে বন্ধ বারি, ক্ষুদ্র খাদ্যে তৃপ্ত হয়ে থাকি।

যাবো, যাবো, তবু আমি যাবো

হে অনন্ত, বলো বলো আমি তোমা পাবো ?”

জানি না তাঁর এই আঁকুল প্রাণিনা সার্থক হয়েছে

কিনা।

“বঙ্গলক্ষ্মী”তে কাজ করা ছাড়া ‘কেয়া’ ‘পঞ্চপ্রদীপ’

‘অত্রি’ প্রতিপত্তি পত্রিকার সম্পাদনা করে গেছেন তিনি।

‘ছ’বছরের কিছু ওপর হ’ল ‘জলছবি’ বের করেছিলেন।

‘হোয়াইট কেবিন’, ‘মৃগয়া’, ‘কো-এডুকেশন’ ইত্যাদি

পাঁচখামি উপস্থাপি, দু’খানি গল্পের বই ও তিনখানি

কবিতার বই তিনি লিখে গেছেন। গল্প উপস্থাপি

লিখলেও কবি হিসেবেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

গুণত আবেগের প্রথমই তিনি বেরিবেরিতে পড়েন ;

মাসের শেষেই ৪৫ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

বঙ্গুরা তাঁর অন্তিম সৌহারদের স্মৃতি মঞ্চল করে পিছনে

পড়ে রইলেন। কবি কুমুদরঞ্জন স্বর্গীয় বন্ধুকে স্মরণ করে

লিখেছেন ;—

এমনি আসর হয় ভঙ্গ—

চকিতে ছাড়িয়া যায় সঙ্গ।

থেমে যায় মনোরথ,

কাঁদে রে স্বদূর পথ

থাকে যার রয় পিছু ডাকতে

* * *

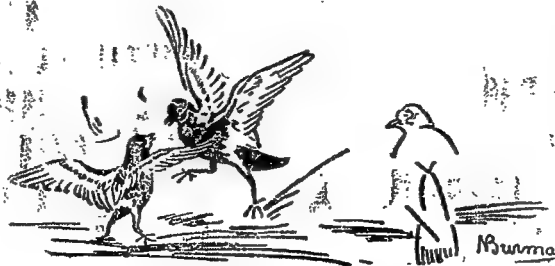
তাহারে আবার হবে আসতে

এ ধরারে হবে ভালোবাসতে।

পবে বেসেছিহু ভালো

বেদনা ঘে দিয়ে গেলো

সেবেদনা তারে হবে ঢাকতো”



দক্ষিণ-ভারত পথে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

মাদ্রাজ আর্ট স্কুল

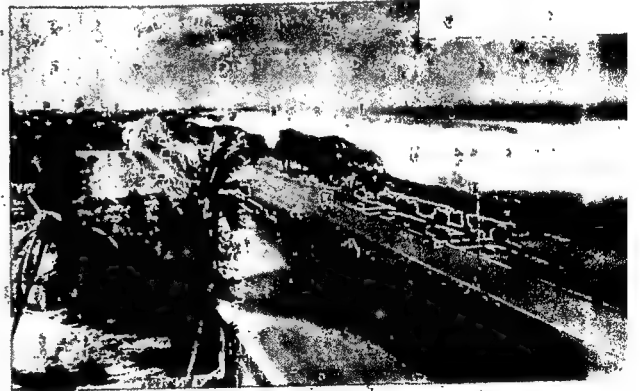
মনিষী অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ভারতের শিল্প সাধনার নব অধ্যায় স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে বাঙ্গালী শিল্পীর স্থান শিল্প জগতে অনেক উচ্ছে। সেইজন্য লাহোর আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল সমরেন্দ্র গুপ্ত, লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল অসিত হালদার, কলিকাতার আর্ট স্কুলে প্রিন্সিপ্যাল মুকুল দে, ও মাদ্রাজের আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে দেখিতে পাই। 'মাদ্রাজ আর্ট স্কুল' প্রায় ৩০০ ছাত্র ও ১৩০টি ছাত্রী আছে। বাঙ্গালী ছাত্রও কয়েক জন আছে, মিস্ 'ইরিশ' ষা, 'বি এ, এক' বঙ্গবালাও এই স্কুলের মাদ্রাজে গিয়া শিল্প শিখিতেছেন, 'দেবী' প্রসাদের গুণের আকর্ষণে। গুনিলাম কলিকাতার আর্ট স্কুলে মহিলাদের 'শিল্প' শিখিবার সুবিধা নাই। এখানেও 'কলিকাতা মাদ্রাজের পশ্চাতে'। 'দেবী' প্রসাদ সাধারণ কারিগরের স্থায় ঘরোয়া কলেবরে মূর্তি নির্মাণশালায় 'স্বহস্তে' ছাত্রগণ সহ আঠার ফুট উচু ত্রিবাঙ্কুরের রাজার মূর্তির ছাচ প্রস্তুত করিতেছেন। দেখিয়া আনন্দ হইল। তাহার গৃহে অপরাহ্নে তিনি সাদরে আহ্বান করিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের হৃদিস এখান হইতে লইয়া ট্রীপ্লিক্যানের কাসে চড়িয়া সমুদ্রকূলে মেরিণার উপর স্বেচ্ছা প্রেসিডেন্সী কলেজে উপস্থিত হইলাম। গুনিলাম ভাঃ দে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছেন। তিনিই প্রথম ভারতবাসী এই পদ পাইলেন। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে পরম গৌরব। তিনি সাদরে তাহার বাটীতে আহ্বান করিলেন।

একুইরিয়াম

একখানি প্রাইভেট মোটার প্রাতে ৭।০টা হইতে সন্ধ্যা ৭।০ পর্যন্ত ৫২ ভাড়ায় স্থির করা হইয়াছিল। যত ইচ্ছা ঘুরিতে পারিব, ভাড়া ব্যতীত পেট্রলের দাম দিতে হইবে। প্রথমে ব্রডওয়েতে ল কলেজ, কমাস

কলেজ, হাইকোর্ট, চায়না বাজার দেখিয়া ফ্লাউয়ার বাজারের 'মোড়ে' সম্রাট পঞ্চম জর্জের ব্রোঞ্জমূর্তি দেখিতে পাওয়া গেল। তৎপরে 'ম্যারিণা' দিয়া মোটরকার ছুটিল। প্রাতে ৮টার সময় (aquarium) মৎস্য-জলাধার দেখিতে গেলাম। সমুদ্রের নানা প্রকার মৎস্য ও জীব জলাধারে বিচরণ করিতে দেখিয়া মন পুলকিত হইল। 'বাসন্তী' রন্ধের chaitodon (ভেঁগাবন) মৎস্যের সৌন্দর্য্য, 'নানা' বিচিত্র আকারের ও রঙের মৎস্যগুলির খেলা দেখিতে বড়ই মনোরম। এই মাছগুলির সাধারণ গায়ের রঙ্গ দেখিয়া চিত্রাঙ্কণের বা স্কেচের কাজের রং ফলান সুবিধা হয়। Globe fish (ভুলোক মৎস্য) একটা কৌতুকপূর্ণ মৎস্য, আকারে সাধারণ মৎস্যের মতন। জলে খেলিয়া বেড়াইতেছে। যদি তাহার কোন



"ম্যারিণা, মাদ্রাজ"

অংশে একটু টেপা যায় অমনি তাহার অপর অংশ বেলুনের তায় ফুলিয়া বুড়াকার হইয়া উঠে। সমুদ্রতীরে এই মৎস্য সংগ্রহ, জলাধারে সমুদ্র অভ্যন্তরের নানা জীব, শামুক, শাঁখ, সর্প, ঘোটক আদিও দর্শকের কৌতুক উৎপাদন করে। একুইরিয়ানে এক আনা প্রবেশিকা দিয়া চরকি কলে ঘুরপাক খাইতে হয়।

খুব বেশী। ছপুর বেলায় দেখিলাম সজ্জীক একজন চোটি (ব্যবসায়ী ধনী বেণে) আসিয়াছেন মঠ কিছু সম্পত্তি অযাচিতভাবে দান করিবেন তার বন্দোবস্তের নিমিত্ত।

মঠের কিঞ্চিৎ দূরেই ময়লাপুরের বড় রাস্তার উপর রামকৃষ্ণ ইন্ডেন্ট হোম। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বৃহৎ প্রাঙ্গণ, শিল্প-বিদ্যালয়, মোটর মেরামত করিবার কারখানা, এক বিরাট কক্ষশক্তির কেন্দ্র। বাঙ্গালীর এই বিরাট কীর্তি দেখিয়া প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। দ্বিতলে বিরাট হলে স্মরণীয় প্রতিমা বিরাজ করিতেছে। কত স্বার্থ-ত্যাগী ব্যক্তি জাতিরও মানবের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেছেন। কত শত বালক ও যুবক মানুষ হইয়া যাইতেছে সেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাবে। ১৯০৫ সালে সামান্য ভাবে বাঙ্গালীর দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া স্বামীজীর এক মাস্তাজী সন্ন্যাসী শিষ্যের চেষ্টায় এক বিরাট পরম উপযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই হোমে সর্বসমেত ১৭৬ ছাত্র শিক্ষা পায় এবং ১০৭টি ছাত্র বসবাস করে। বাৎসরিক খরচ হয় ৪৭,০২৪ সমস্ত ব্যয় প্রায় মাস্তাজ প্রদেশের লোকের দানের উপর নির্ভর করে। গভর্ণমেন্ট মাত্র বাৎসরিক—৯৭০০—দান করেন, বাকী স্থানীয় লোকের দানের দ্বারা চলে। বর্তমানে বাঙ্গালী সন্ন্যাসী স্বামী শান্তানন্দ সভাপতি এবং আশ্রম-অধ্যক্ষ কিরণ মহারাজ (স্বামী অশেষানন্দ), ইহার সম্পাদক রাও বাহাদুর সি, রামানুজসরীয়া। হোম মাস্তাজের পৌর-বাসিনীর মোটর মেরামত করিবার কারখানা স্থাপন করিয়া শিক্ষার ও আয়ের একটি সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটী মাস্তাজ ও উক্ত প্রদেশের নানা স্থানে সর্বজাতি ও ধর্মের লোকের আকর্ষণ করিয়াছে। দানের তালিকা হইতেই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। ‘আবদুল হাকিম’ ছাত্রাবাসটী ইহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হোম ব্যতীত মিশনের পরিচালনায় ত্যাগুরিয়া-নগরে পাঁচ বৎসর হইল একটি শ্রীমন্তকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে ইতিমধ্যে ৫৩২ ছাত্র অধ্যয়ন করে।

পানাজল পার্ক-এ করপোরেশন ও সরকারের দানে ইহার নিজ গৃহ নির্মাণ হইতেছে। ইহার বালিকা বিদ্যালয় শাখাতে ৭৬টী বালিকা পাঠ করে। মাস্তাজ প্রদেশে আরকট, ওটকামণ্ড, কুর্গ, সালেম, কাজিভারাম ও ভাঙ্কেটারামে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত আছে।

গৌড়ীয় মঠ

এই হোমের অনতিদূরে বাঙ্গালীর আর একটি কীর্তি দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। গৌড়ীয় মঠের বৃহৎ গৌড়ীয় স্থা-ত্যাগী রীতিতে জয়পুরের রাজার অর্থে নবরত্ন মন্দির। তাহার সম্মুখে বিরাট নাট্যমন্দিরে পাঠ ও কীর্তন হয়। মন্দিরে চৈতন্য মহাপ্রভুর ও বাধাক্ষেপের যুগলমূর্তি স্থাপিত আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রভাব চৈতন্যদেবের আগমনের সময় হইতে মাস্তাজবাসীর হৃদয়ে প্রবাহিত রহিয়াছে। গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা বিদেহী ভক্ত-সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়ের উদ্যোগে এই বিরাট মঠ স্থাপিত হইয়াছে। এখন এই মঠ সুপরিচালিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রধান গৌরব চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা প্রচার হইলে বাঙ্গালী মাত্রেই ধন্য হইবে। ‘কলৌ নাম এব কেবলম’ আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ মহাপ্রভুর এই মন্ত্র ব্যতীত জীবের আর গতি নাই।

তথা হইতে মিউজিয়াম দেখিয়া এগম্বর ষ্টেশনে এস, আই, রেলের রাউণ্ড টুর টিকিট খরিদ করিলাম। ৪২।। টাকাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ১৩।। টাকাতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যায়। এই টিকিটে চিঙ্গলীপুট (পক্ষীতীর্থ ও মহাবালিপুলাম), কাজিভারাম, ভেলুপুলাম, চিদাম্বরম, মায়ান্ডারাম, কুশোকনাম, টাজোর, ত্রিচিনাপলী, মাদুরা, টিনিভালী, কেপ কমরিন, রামনাদ (তুর্কাসনা) রামেশ্বরম, ধনকোটা, পাছুকোটাই, শ্রীরঙ্গম, বৃন্দাচলম এ অবতীর্ণ হইয়া এক মাসের মধ্যে মাস্তাজ আসিতে পারা যায়। পরদিন প্রাতে মাস্তাজ ত্যাগ করা হইল।

দক্ষিণ-ভারত পথে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

মাদ্রাজ আর্ট স্কুল

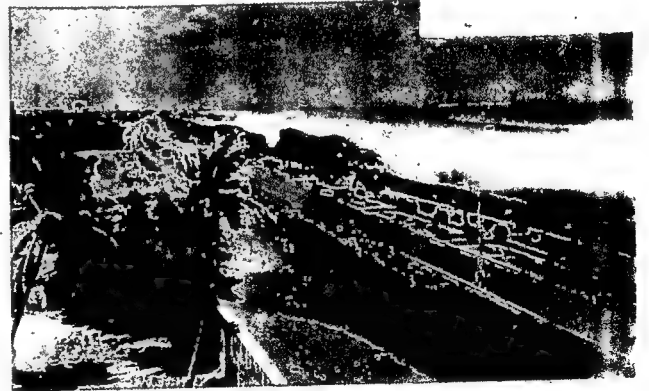
মনিষী অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ভারতের শিল্প সাধনার নব অধ্যায় স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে বাঙালী শিল্পীর স্থান শিল্প জগতে অনেক উচ্ছে। সেইজন্য নাহোর আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল সমরেন্দ্র গুপ্ত, লক্ষ্মী আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল অসিত হালদার, কলিকাতার আর্ট স্কুলে প্রিন্সিপ্যাল মুকুল দে, ও মাদ্রাজের আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে দেখিতে পাই। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে প্রায় ৩০০ ছাত্র ও ১৩০ ছাত্রী আছে। বাঙালী ছাত্রও কয়েক জন আছে, মিস ইরিশ খাঁ, বি এ, এক বঙ্গবালীও এই স্বদূর মাদ্রাজে গিয়া শিল্প শিখিতেছেন, দেবী প্রসাদের গুণের আকর্ষণে। শুনিলাম কলিকাতা আর্ট স্কুলে মহিলাদের শিল্প শিখিবার সুবিধা নাই। এখানেও কলিকাতা মাদ্রাজের পশ্চাতে। দেবী প্রসাদ সাধারণ কারিগরের জায় বন্দী কলেবরে মূর্তি নির্মাণশালায় স্বহস্তে ছাত্রগণ সহ আঠার ফুট উচু দ্বিবাঙ্কুরের রাজার মূর্তির ছাঁচ প্রস্তুত করিতেছেন। দেখিয়া আনন্দ হইল। তাঁহার গৃহে অপরাহ্নে তিনি সাদরে আহ্বান করিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু এখান হইতে লইয়া ট্রীপ্লিক্যানের বাসে চড়িয়া সমুদ্রকূলে মেরিণার উপর স্বদৃশ্য প্রেসিডেন্সী কলেজে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম ডাঃ দে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছেন। তিনিই প্রথম ভারতবাসী এই পদ পাইলেন। ইহা বাঙালীর পক্ষে পরম গৌরব। তিনি সাদরে তাঁহার বাটীতে আহ্বান করিলেন।

একুইরিয়াম

একখানি প্রাইভেট মোটার প্রাতে ৭১০টা হইতে সন্ধ্যা ৭১০ পর্যন্ত ৫- ভাড়ায় স্থির করা হইয়াছিল। যত ইচ্ছা ঘুরিতে পারিব, ভাড়া ব্যতীত পেট্রোলের দাম দিতে হইবে। প্রথমে ব্রডওয়েতে ল কলেজ, কমাস

কলেজ, হাইকোর্ট, চায়না বাজার দেখিয়া ক্লাউয়ার বাজারের মোড়ে সম্রাট পক্ষম জর্জের ত্রেণ্ডমুণ্ডি দেখিতে পাওয়া গেল। তৎপরে 'ম্যারিণা' দিয়া মোটরকার ছুটিল। প্রাতে ৮টার সময় (aquarium) মৎস্য-জলাধার দেখিতে গেলাম। সমুদ্রের নানা প্রকার মৎস্য ও জীব জলাধারে বিচরণ করিতে দেখিয়া মন পুলকিত হইল। বাসন্তী রঙ্গের chaitodon (ভেগাবন) মৎস্যের সৌন্দর্য, নানা বিচিত্র আকারের ও রঙ্গের মৎস্যগুলির খেলা দেখিতে বড়ই মনোরম। এই মাছগুলির সাধারণ গায়ের রঙ্গ দেখিয়া চিত্রাঙ্কণের বা স্থচের কাজের রং কলান সুবিধা হয়। Globe fish (ভুলোক মৎস্য) একটা কৌতুকপূর্ণ মৎস্য, আকারে সাধারণ মৎস্যের মতন জলে খেলিয়া বেড়াইতেছে। যদি তাহার কোন



“ম্যারিণা, মাদ্রাজ”

অংশে একটু টেপা যায় অমনি তাহার অপর অংশ বেলুনের জায় ফুলিয়া বৃত্তাকার হইয়া উঠে। সমুদ্রতীরে এই মৎস্য সংগ্রহ, জলাধারে সমুদ্র অভ্যন্তরের নানা জীব, শামুক, শাঁখ, সর্প, ঘোটক আদিও দর্শকের কৌতুক উৎপাদন করে। অ্যাকুইরিয়ানে এক আনা প্রবেশিকা দিয়া চরকি কলে ঘুরপাক খাইতে হয়।

খুব বেশী। দুপুর বেলায় দেখিলাম সস্ত্রীক একজন চেটি (ব্যবসায়ী ধনী বেণে) আসিয়াছেন মঠে কিছু সম্পত্তি অর্থাৎ ভাবে দান করিবেন তার বন্দোবস্তের নিমিত্ত।

মঠের কিঞ্চিৎ দূরেই ময়লাপুরের বড় রাস্তার উপর রামকৃষ্ণ ষ্টুডেন্ট হোম। প্রকাণ্ড অটালিকা, বৃহৎ প্রাঙ্গণ, শিল্পবিদ্যালয়, মোটর মেরামত, করিবার কারখানা, এক বিরাট কক্ষাক্রমের কেন্দ্র। বঙ্গালীর এই বিরাট কীর্তি দেখিয়া প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। দিক্‌তে বিরাট হলে স্বন্দর সরস্বতী প্রতিমা বিরাজ করিতেছে। কত স্বার্থ-ত্যাগী ব্যক্তি জাতির ও মানবের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেছেন। কত শত বালক ও যুবক মানুষ হইয়া যাঁহাতে সেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাবে। ১৯০৫ সালে সামান্য ভাবে বঙ্গালীর দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া স্বামীজীর এক মাস্তাজী সন্ন্যাসী শিবোর চেষ্টায় এক বিরাট পরম-উপযোগী প্রতিষ্ঠান পরিণত হইয়াছে। এই হোমে সর্বসমেত ১৭৬ ছাত্র শিক্ষা পায় এবং ১০৭টি ছাত্র বসবাস করে। বাৎসরিক খরচ হয় ৪৭,০২৪ সমস্ত ব্যয় প্রায় মাস্তাজ প্রদেশের লোকের দানের উপর নির্ভর করে। গভর্ণমেন্ট মাত্র বাৎসরিক—২৭০০০ দান করেন, বাকী স্থানীয় লোকের দানের দ্বারা চলে। বর্তমানে বঙ্গালী সন্ন্যাসী স্বামী শান্তানন্দ সভাপতি এবং আশ্রম-অধ্যক্ষ কিরণ মহারাজ (স্বামী অশেষানন্দ) ইহার সম্পাদক রাও বাহাদুর সি. রায়চৌধুরী। হোম মাস্তাজের পোর-বানীর মোটার মেরামত করিবার কারখানা স্থাপন করিয়া শিক্ষার ও আয়ের একটি স্বব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটী মাস্তাজ ও উক্ত প্রদেশের নানা স্থানে সর্বজাতি ও ধর্মের লোকের আকর্ষণ করিয়াছে। দানের তালিকা হইতেই তাহা জাত হওয়া যায়। ‘আবদুল হাকিম’ ছাত্রাবাসটী ইহার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হোম ব্যতীত মিশনের পরিচালনায় ত্যাগরিয়া-নগরে পাঁচ বৎসর হইল একটা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে ইতিমধ্যে ৫৩২ ছাত্র অধ্যয়ন করে।

পানাজল পার্ক-এ করপোরেশন ও সরকারের দানে ইহার নিজ গৃহ নির্মাণ হইতেছে। ইহার বালিকা বিদ্যালয় শাখাতে ৭৬টা বালিকা গৃহীত করেন। মাস্তাজ প্রদেশে আরকট, ওটকামণ্ড, কুর্গ, সালেম, কাজিভারাম ও ভাস্কটোরামে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত আছে।

গৌড়ীয় মঠ

এই হোমের অনতিদূরে বঙ্গালীর আর একটা কীর্তি দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। গৌড়ীয় মঠের বৃহৎ গৌড়ীয় স্থাপত্য রীতিতে জয়পুরের রাজার অর্থে নবরত্ন মন্দির। তাহার সম্মুখে বিরাট নাট্যমন্দিরে পাঠ ও কীর্তন হয়। মন্দিরে চৈতন্য মহাপ্রভুর ও রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি স্থাপিত আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রভাব চৈতন্যদেবের আগমনের সময় হইতে মাস্তাজবাসীর হৃদয়ে প্রাবাহিত রহিয়াছে। গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা বিদেহী ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়ের উত্তোগে এই বিরাট মঠ স্থাপিত হইয়াছে। এখন এই মঠ সুপরিচালিত হইয়া বঙ্গালীর প্রধান গৌরব চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা প্রচার হইলে বঙ্গালী মাঝেই ধন্য হইবে। ‘কলৌ নাম এর কেবলম’ আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ মহাপ্রভুর এই মন্ত্র ব্যতীত জীবের আর গতি নাই।

তথা হইতে মিউজিয়াম দেখিয়া এগম্বর ষ্টেশনে এস, আই, রেলের রাউণ্ড টুর টিকিট খরিদ করিলাম। ৪২০ টাকাতো দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ১৩০ টাকাতো তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যায়। এই টিকিটে চিঙ্গলীপুট (পক্ষীতীর্থ ও মহাবালিপুুরাম), কাজিভারাম, ভেলুপুরাম, চিদাম্বরম, মায়ান্ডরাম, কুছোকনাম, টাঙ্গোর, ত্রিচিনাপলী, মাছুরা, টিনিভালী, কেপ কমরিন, রামনাদ (দুর্গাসনা) রামেশ্বরম, ধনকোটী, পাজুকোটাই, শ্রীরঙ্গম, বৃন্দাবনম এ অবতীর্ণ হইয়া এক মাসের মধ্যে মাস্তাজ আসিতে পারা যায়। পরদিন প্রাতে মাস্তাজ ত্যাগ করা হইল।

মূলত

(গল্প)

একখানা স্যাঁতসেঁতে ঘর।

তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে থেমে থেমে কেবল কাশির আওয়াজ—ঘঙ, ঘঙ, ঘঙ। মনে হয় যেন নির্জন পাহাড়ের গুহার ভিতর থেকে ডেকে ওঠে কোন্‌ একটা অসুস্থ জানোয়ার। গলার আওয়াজে বেশ বোঝা যায়, একটা মেয়ে। ঘরখানি এই সুখ-ঐশ্বর্য-ভরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীরই একটা অবনমিত পল্লীর স্থগত্যম কন্দরে। স্বাস্থ্যের যেন ঘটেছে সেখান থেকে চির নির্বাসন। স্বর্ঘ্য আর বাতাসও করেছে সেখানকার সাথে অসংযোগ সম্পর্ক স্থাপন।

মেয়েটি আজ কয়েক মাস থেকে জরে ভুগছে। চিকিৎসা—তা কেমন করে হবে। ডাক্তাররা তো আর তাদের পিতৃপুরুষের সঞ্চিত টাকা খরচ করার আনন্দ পেতে জয়গ্রহণ করে নি। তাদের ফিরে পেতে হবে তার লক্ষ লক্ষ গুণ যা দিয়ে পেয়েছে জানদেবীর প্রদীপশলাকাগুলির একটা শিখা।

হঠাৎ কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসে খানিকটা রক্ত। মেয়েটি টেঁচিয়ে উঠে—‘মা’। মা ছিলেন রান্নাঘরে। দ্র্যস্তপদে গিয়ে সেখানে ঢোকেন। থমকে দাঁড়িয়ে টেঁচিয়ে ওঠেন, একি যক্ষ্মা! ফুঁপিয়ে তিনি কৈঁদে ওঠেন। মেয়েটির মুখে কিন্তু ফুটে ওঠে একটুকরো ম্লান হাসি।

গলিটা যেখানে গিয়ে মিশেছে একটা অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তার সঙ্গে, সেখানে ছিল এক আদ্যিকালের ক্যাম্বেলের পাশ ডাক্তার। জল মিশিয়ে উৎকট স্বাদের দু’একটা এ-ও-তা ওষুদ বস্তীর লোকেদের থাইয়ে থাইয়ে লোকটা কলকাতায় খান তিনেক বাড়ী হাঁকিয়েছে। দয়া মায়া বলে কিছুই তার মনে থাকতে পারে না, সেটা খুবই স্বাভাবিক। মেয়েটির ভাই গিয়ে হাতে পায়ে ধরে তাকেই হুটাকা ভিজিট দিয়ে ডেকে আনে।

শ্রীশুকুমার মুখোপাধ্যায়

মেয়েটি এতে একান্তভাবে আপত্তি জানায়। এভাবে টাকার অপব্যয় করলে পনেরদিনের সংসারযাত্রা অচল হয়ে পড়বে।

ডাক্তার এসে ফিরিস্তি দেয় অনেক কিছুই। তাঁর ধারাবাহিক ভাবে গতায়াত্রটি তো অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। উপরন্তু এ রোগের পক্ষে যা নিত্যসুস্থই দরকারি। তারও প্রয়োজনবোধ তাঁকে এ বিষয়ে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করলে।

ক্রমেক্রমে পনেরটি দিন কেটে গেল। রোগ ত কমেই না বরং বেড়ে চলতে থাকে অনিশ্চিত ভয়াবহ পরিণতির দিকে। ঘরের নগর টাকাও ফুরিয়ে আসে। ডাক্তারটির হঠাৎ সুবুদ্ধি হয় কি কারণে তা ঠিক বলা যায় না। নয়তো তাঁর মতন লোক তো অবিরাম প্রবঞ্চনা করেছে। এ রকম রক্ত শত মরণের দুয়ারের যাত্রী দেখে তাদের আত্মীয়দের আশ্বাস দিয়েছে “এই সেরে গেল বলে।” তিনি বললেন আমার দ্বারা আর হয় না, আপনারা এ বিষয়ের কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে ডাকুন।

একথা শুনে মা আর স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না। এ মেয়ে তো শুধু তাঁর মেয়ে নয়—ছেলেরও বাড়া। কয়েক বৎসর ধরে তারই উপার্জনে চলে আসছে এ সংসারের যাবৎ কিছু। তারই যদি ভালমন্দ কিছু একটা ঘটে তা হলে.....ভাবতেও মার প্রাণ উঠে শিউরে।

বাপ মায়ের প্রথম সন্তান সে। তারপর দুটি ছোট ভাই। একজনের বয়স ষোল আর একজনের এগার। তার নিজের বয়স বাইশ। একটি ছোট নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে সে সংসার চালায়।

তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। পনের বছর বয়সের সময় হঠাৎ বাবা গেলেন মারা। পাড়াগায়ে কোনই মিল্লো না সাহায্য, কাজেই মা কলকাতায় তাঁর ভাইয়ের বাসায় তিনটি অসহায় জীবের হাত ধরে এসে উঠলেন।

ভাই আপন মায়ের পেটের বোনকে দূর কর্তে পারে না, বলে, এসেছি ভুলই করেছি। দুঃখের ভাত স্থ করে খাওয়া যাবে। ভাইএর বউটি কিন্তু এতে বেজায় অসন্তুষ্ট। তার স্থখের সংসারে আবার এসে জুটলো এক আশ্রয়।

যাই হোক অবিরত লাঞ্ছনা আর অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে তো কোনক্রমে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর একটা ছাতের তলায় আশ্রয় মিললো।

* * * . *

পাশের বাড়ীর একটা মেয়ের সঙ্গে এ মেয়েটির বন্ধুত্ব হ'লো। সে সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয়ে পড়তো। তার বাবা ছিলেন সেখানকার পরিচালক-সমিতির সভ্য। সে বলে, স্থলতাদি, তুমি আমাদের স্থলে ভর্তি হও। তোমার মত মেয়ে নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে। মেয়েটা প্রথমে এ কথায় মোটেই কাণ দেয় না। প্রথমতঃ টাকা কোথায়? আর মামীমাই বা অনুমতি দেবেন কেন?

বন্ধুটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে তার বাবাকে বলে স্থলতার যাতে এক পয়সাও খরচ না লাগে তারই ব্যবস্থা করলে, তারপর তাঁকে দিয়েই স্থলতার মামা, মামীমাকে অনুরোধ করলে। অতবড় লোক বলায় মামীমা আর আপত্তি করার কোনই স্থযোগ পেলেন না। কারণ ধনী প্রতিবেশীকে সন্তুষ্ট করার কোন স্থযোগই তিনি ছাড়তে চান না। স্থলতা আর ললিতা দুই বোনের মতই আরম্ভ করে পড়াশুনা সেলাই, এবং আরও নানান রকম কাজ।

চার বছরের মধ্যেই স্থলতা শিক্ষালয়ের শেষ পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে পাশ করলো। ইতিমধ্যেই সে আপন স্বভাব-মাধুর্য্যে আর কর্মদক্ষতায় অধ্যক্ষ মহাশয়ের সদয় হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনিই তাকে একটা ভাল চাকুরী জুটিয়ে দিলেন।

এবার স্থলতা একখানা আলাদা বাসা ভাড়া করলে। এখন তার প্রধান লক্ষ্য হল ছোট ভাই দুটাকে মনের মতন করে মানুষ করে তোলা। কিন্তু ঐ সামান্য আয়ে এত খরচ তো আর চলে না। কাজেকাজেই সে কয়েকটি প্রাইভেট টিউশনি জুটিয়ে নিল।

* * *

স্থলতার প্রথম ভাইটি আই, এ, ক্লাসে পড়ে। সতের সীমা অতিক্রম করে পরিশ্রম করায় স্থলতার শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে আসতে থাকে। তবুও সে সেদিকে নজর দেয় না।

দুমাস কেটে যায় ক্রমে ক্রমে। তাকে বিছানার আশ্রয় নিতে হয়। বাধ্য হয়ে দরখাস্ত করে ছুটির জ্ঞাত। ছুটি মেলে কিন্তু বিনা মাইনেতে। প্রাইভেট টিউশনিও হয়ে যায় বন্ধ। সংসার একেবারে অচল

* * *

মাঝ রাত্রে স্থলতার অবস্থা আরও খারাপ হয়। বলকে বলকে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। মা ভয় পেয়ে ডেকে উঠেন—শিশির—

ছেলে দৌড়ে এসে সেখানে দাঁড়ায়, মা বলেন, বাও শিশির একজন বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনো। ছেলে চলে সেই রাতে ডাক্তার এস, এন্, মুখার্জীর বাড়ীতে। ডাক্তার বাবুর চাকর কিছুতেই তার মনিবকে এতরাজে ডাকতে চায় না।

অনেক অত্ননয়ের ফলে শেষে ওপরে যায়। শিশির অপেক্ষা ক'রতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে তার ডাক হয় ওপরে যাবার।

ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে ডাক্তার বসেন বারান্দায়। জিজ্ঞাসা করেন, কি দরকার? শিশির একেবারে জড়িয়ে ধরে তাঁর পা দু'খানি। বলে ওঠে—বাঁচান, বাঁচান ডাক্তার বাবু, দয়া করে আমার দিদিকে বাঁচান।

গম্ভীরভাবে ডাক্তার উত্তর দেন—চেষ্টা করে দেখা যাবে। কিন্তু কি হয়েছে তাই বল না।

“আস্থন আমার সঙ্গে” উত্তর দেয় শিশির।

“কিন্তু আমার ভিজিট—জানতো, রাজে আমি দ্বিগুণ নিয়ে থাকি অর্থাৎ চৌষটি টাকা”। শিশির তার দয়া ভিক্ষা করে।

বিরক্ত হ'য়ে ডাক্তারবাবু উঠে ঘরের ভেতরে চলে যান। এবার শিশির চেষ্টায়ে ওঠে—আনছি—আনছি,—এখন নিয়ে আসবো এক দৌড়ে—সে নীচে চলে আসে, দাঁড়ায় রাস্তার উপর।

একখানা খালী ট্যাক্সী চলছিল' মন্থর গতিতে। হাত উচিয়ে সেইখানাকেই খামায়। তারপর বলে ওঠে, চালাও জোরসে। এসে উপস্থিত হয় বাড়ীর দরজায়। উর্দ্ধ্বাসে ভিতরে ঢুকে গিয়ে বাস্ক্স খোলে। খুচরো টাকা কড়ি যা কিছু ছিল সবই নিয়ে নেয়। তারপর খোলে গহনার বাস্ক্সটা। তার মধ্যে ছিল এক ছড়া সোণার হার, মা সেটা বিয়ের সময় পেয়েছিলেন। তারপর বরাবর সেটা 'স্বলতার'ই গলায় ছিল। কিন্তু অসুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে রাখে, এই বলে' যে—শিশিরের বউ এসে পরবে।

শিশির কয়েক মিনিট ধরে হারটার দিকে চেয়ে থাকে। নিতে আর হাত ওঠে না। বাইরে থেকে হঠাৎ মোটরের হর্ণ বুঝিয়ে দেয় যে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে। কাঁপতে কাঁপতে সেটাকে তুলে নেয়। তারপর আর কোন দিকে না তাকিয়ে মোটরের ভেতর গিয়ে বসে পড়ে।

ড্রাইভার ষ্টার্ট দেয় আবার।

* * *

ডাক্তার এস, এন, মুখার্জীর বয়স অল্প। প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। কিন্তু এরই মধ্যে চিকিৎসানৈপুণ্যে তাঁর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিলেত থেকে তিনি যক্ষ্মা চিকিৎসায় বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। বহু হতাশ রোগী তাঁর হাতে নিরাময় হয়ে উঠেছে। অতি অল্প পরীক্ষাতেই তিনি রোগীর রোগ নির্ণয় কর্তে পারেন। কিন্তু এত যশ থাকা সত্ত্বেও নির্দয় ও মমতাহীন বলে তাঁর দুর্গাম সর্বত্র। তাঁর মতন অর্থ-পিশাচ নাকি এর আগে কেউই দেখেনি।

প্রকৃতিটাও তাঁর অহরুপ। চলন বলন সবই রুক্ষ। কোথাও একটু মিষ্টতার গন্ধ নেই। কোন সামাজিক অহুষ্ঠানেই তাঁর যাতায়াত ছিল না। অত বড় বাড়ীতে থাকেন কেবল একা। কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে তাঁর কোন যোগ ছিল না। ভিখিরী দুখী কখনও পেত না একটাও আধলা পয়সা তাঁর কাছে থেকে। জনসাধারণ তাঁর বিষয়ে অনেক কিছুই নিন্দাবাদ রচনা করেছিল।

ডাক্তার মুখার্জী ঘরে গিয়ে বসে পড়লেন ইজি চেয়ারে। এই ছেলেটির মুখ যেন তাঁর চেনা চেনা মনে হয়। বহু চেষ্টা করেও ধারণা কর্তে পারেন না—কার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে—ইয়া; একজনের মুখের ছাপ যেন তার মুখে আঁকা

রয়েছে—কিন্তু না, অসম্ভব, তা হ'তে পারে না।..... অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে আসে তাঁর সমস্ত বুকখানাকে অস্থির করে একটা দীর্ঘশ্বাস। অনেকদিনের পুরাণো ভুলে-বাওয়া একটা গল্প ভেসে ওঠে তাঁর মনের চোখে.....

একটা ছোট ছেলের সদ্যবিধবা মা, পেটের ভাতের জন্তে গ্রামে একজনের বাড়ীতে পাচিকা বৃত্তি গ্রহণ করলেন। ছোট ছেলেটিকে নিয়ে কাজ করার বড়ই অসুবিধা হ'ত। তাই রেখে যেতেন সেটিকে আর এক পাশের বাড়ীতে। সে বাড়ীরও তখন অবস্থা খুবই খারাপ। কয়েক ঘর জজমানের উপর নির্ভর করে তাদের সংসার চলত। তাদেরই ছিল একটা ছোট্ট মেয়ে, 'স্বলি' বলে সবাই তাকে ডাকতো। ছেলেটা আর মেয়েটির মধ্যে বড়ভাব হয়। তারা মাত্র তিন বছরের ছোট বড়।

ক্রমে ছেলেটা যখন বড় হ'ল। তার পাঠশালার পড়া হ'ল শেষ। তখন গুরু মশায় তার মেধা দেখে জমিদার বাবুদের ধরে তাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

বোল বছর বয়স পেরুতে প্রবেশিকার প্রাচীর ডিক্রিয়ে তার কলেজে পড়ারও কোন বাধা হ'ল না, কাজেই যথাযথ ভাবে সে ক'লকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হ'ল। সেখানেও পাঠ শিক্ষা হয় বিনা রেতনে আর আত্মসম্মতি খরচ চলে বৃত্তির টাকায়। পাঠ্যাবস্থায় আর তার দেশে যাওয়া ঘটে উঠে না। একেবারে আই, এস, সি পরীক্ষা শেষ করে যায়। দেখে ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিশেষ করে স্বলতার। সে আর আসে না আগের মতন করে। নেহাৎ দরকারী ছাড়া আর কোন কথাই তার সঙ্গে বলতে চায় না—তাও অতি ধীরে নম্রভাবে।

হু' একদিনের মধ্যে তার কানে এসে পৌঁছল যে সব কথা তাতে তার প্রাণ উল্লাসিত হয়ে উঠলো। স্বলতার সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে।

পরের দিন স্বলতা যখন ঘাট থেকে ফিরছিলো, তখন ওর সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল।

ছেলেটি ডাকলে—শোন।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালে।

—স্বলতা, শুনেছ আমার আর তোমার মা'র কি হচ্ছে, ছেলেটি শুধায়।

স্বলতা চুপ করে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েই থাকে, কোন উত্তর দেয় না।

—“চুপ করে থেক না, উত্তর দাও স্বলতা। আমি তোমার মুখ থেকে এ বিষয়ে কোন অভিমত না শুনে কোন কিছুতেই যে এগোতে পারবো না”—ছেলেটি আবার শুধোল।

‘যাও, তুমি ভারী ছষ্টু হ’য়েছ’—বলেই স্বলতা ছুটে পালালো।

তার কিছুদিন পরে ছেলেটিকে আবার কলকাতায় ফিরে আসতে হ’ল। আবার কলেজে ভর্তি হতে হবে। সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার মনে একটা অজানা পুলকের ঢেউ দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। সে একান্তে শ্রাবুতো তার সেই দিনটিরই কথা, যেদিনে বালের সাথীটিকে পাবে আজীবনের সাথীরূপে একেবারে নিজের ক’রে।

ছেলেটি কলকাতায় এসে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হ’ল। নিত্য নূতন জিনিষ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে এই ভেবে আনন্দ পেত যে এ সব কথা বলে সে স্বলতাকে অবাক করে দেবে। রঙ্গীন ভবিষ্যৎ জীবনের একটি মদির স্বপ্ন তার মনকে থেকে থেকে করে তুলছিল মাতোয়ারা।

হঠাৎ একদিন মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল। স্বলতার বাবা মারা গেছেন। খবরটিতে সে মনে নিদারুণ আঘাত পেল। প্রাণটি তার ছটফট করে উঠল স্বলতার কাছে যাবার জন্যে। কিন্তু সে সময় তার কাছে খরচ করার মত টাকা ছিল না। কাজে কাজেই ভাবলে যে শ্রদ্ধা-শ্রাস্তি চুকে যাক, তারপর শীগ্গিরই একবার দেশের দিকে পা বাড়ানো যাবে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার এল মার কাছ থেকে আর একখানা চিঠি। স্বলতাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ান’র জন্যে তারা কলকাতায় মামার বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মা আরো জানিয়েছেন যে, যে বাড়ীতে তিনি কাজ করেন সেখানকার কর্তা মাস্তাজ চলে যাচ্ছেন। রাধুনী হিসাবে তাঁকেও নিয়ে যাচ্ছেন। ছেলে যেন ইতিমধ্যে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসে।

* * *

মাকে একলা অত দূরদেশে পাঠিয়ে ছেলেটা একা

থাকতে পারলো না। সে কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে ধরে মাস্তাজের ম্যাডিক্যাল কলেজে ভর্তি হ’ল। মার কাছে সে থাকতে চায়—তা যতই কষ্ট হোক না কেন।

মা যে বাড়ীতে রাধতেন, সেইখানেই ছেলেদের পড়ার ভার নিয়ে সে নিজের খাওয়ার ও থাকবার বন্দোবস্ত করল। চার বছর পরে সে ডাক্তার হ’য়ে বেরিয়ে এল। কৃতকার্য ছাত্রদের নামের তালিকায় তার নাম অবিশ্যি ছিল একেবারে প্রথমে। কাজে কাজেই সরকারী বৃত্তি নিয়ে সে সাগরপারের দেশে গেল।

ছ’বছরের মধ্যে সেখানকার সেবা ডিগ্রি নিয়ে আবার দেশে ফিরলো।

মার মুখে ছোটবেলা থেকেই সে শুনে এসেছিল যে তাঁর বাবার মৃত্যু হয় কাল ব্যাধি যক্ষ্মায়। তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা হয় নি। যত্ন, পথ্য, ওষুধ এসব ঠিকভাবে পেলো যে তিনি বাঁচতেন না একথা জোর করে বলা চলে না। এ বেদনা প্রায়ই থেকে থেকে তার বুকের ভেতরে গুমরে উঠতো। তাই সে যত্নের সঙ্গে শিখে এসেছিল যক্ষ্মার চিকিৎসা।

দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সরকারী চাকরী গেল জুটে। মাকে নিয়ে সে আবার এল কলকাতায় তার কর্মস্থানে। মার কিন্তু বরাবরই ইচ্ছে কাশীবাস করেন। ছেলের বৌ এনে তার হাতে তিনি সন্সার তুলে দিতে চান। ছেলের-কিন্তু বিয়েতে তখন একেবারেই অমত। মাকে বলল, হ’বে’খন। মা বললেন—তা তোর যা ইচ্ছে তাই-ই কর। আপাততঃ আমায় তো কাশীতে রেখে আয়। তা না হলে এই একলা ঘরে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। ছেলে মার ইচ্ছা পূরণ করে তাঁকে কাশীতে রেখে আসে। এবার আরম্ভ হয় বসবাস সম্পূর্ণভাবে একলা। এতদিন সে স্বলতার কোনই খবর পায় নি।

সন্সারে চাকর চাকুর আর দরওয়ান ছাড়া আপনার বলতে তার আর কেউই রইল না। অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অনেকেই আত্মীয়তা জানিয়ে ছিলেন কিন্তু বিপদের দিনের ব্যবহারের কথা মনে করে তাদের ওপর তাঁর নিদারুণ ঘৃণা জন্মেছিল। তার উপর যৌবনের

রঙ্গীন স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ায় সে আর জনসমাজে মাথামাখি ক'র্তে চাইতো না।

অনেক সমাজেরই কল্যাণ এবং স্থল বিশেষে তাদের পিতামাতা বা অন্যান্য আত্মীয়েরা তার সংসারের পরিপূর্ণতা এনে দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখনও স্থলতার প্রতি তার প্রেমের জ্যোতি একটুও স্নান হয় নি। চিকিৎসা আর কলেজের কাজ ছাড়া বেশীর ভাগ সময়ই সে বই নিয়ে পড়ে থাকতো, সময়ে সময়ে একা মোটর চালিয়ে ঘুরে বেড়াত মাঠের চারিদিকে।

অল্পদিনের মধ্যেই তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে প'ল। যক্ষা চিকিৎসার এক নতুন ধারার সে প্রবর্তন ক'রলে। হ'তে লাগলো প্রভূত অর্থাগম। দু'দিনে সংসার থেকে পেয়েছিল যে সব রুচ ব্যবহার এখন শুরু হ'তে থাকে তারই প্রতিক্রিয়া। মন থেকে দয়া, দাক্ষিণ্য পরোপকার সবই মুছে ফেলে। কেবল ধক্ ধক্ করে জলতে থাকে প্রতিহিংসার দাবানল শিখা। মনের দুঃখকে চাপা দিয়ে ভুলতে আরম্ভ করে অত্যাশ্রিতাবে অর্থের উপাসনায়। বাজারে নাম ছড়ালো অর্থপিপাচ!.....ভাঃ এস, এন, মুখার্জির মাথার ভেতর বিস্ময়মু করে উঠে।

বেরা এনে দরজায় ধাক্কা দেয়। চমক ভেঙ্গে উঠে গিয়ে ডাক্তার এস, এন, খুলে দেন, দেখেন সেই ছেলেটি আবার এসেছে। বলছে—আপনার ভিজিট এনেছি, দয়া করে এবার চলুন।

—‘কৈ, দাও’—বলে ডাক্তার হাতখানা বাড়ালেন।

ঝপ করে হাতে একটা সোনার নেকলেস এসে প'ড়লো।

—‘একি!—ডাক্তার চমকে ওঠেন।

—‘আপনার ভিজিট’—ছেলেটির স্বর খুব সংযত।

—‘ভিজিট!—কিন্তু টাকা কৈ?’

—‘নগদ টাকা তো কিছুই নেই ডাক্তার বাবু, তবে হারটার দাম চৌষট্টিরও বেশী।’

—‘একটু দাঁড়াও আমি আসছি’ বলে ডাক্তার ঘরের ভেতর গেলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে পোষাক বদলে হাত ব্যাল্কেট নিয়ে বেরিয়ে এসে বলেন—‘চলো’।

টাক্সী আবার ছুটে থাকে দৈত্যের মত বেগে। রাত প্রায় আড়াইটে। সারা সন্ধ্যা যেন ঘুমে অচেতন। ছেলেটি ও ডাক্তার দু'জনেই নির্বাক। ডাক্তার যেন কি ভেবেই চলেছে। ছেলেটি দেখছে বাড়ী আর কতদূর। হঠাৎ ক্যাচ করে টাক্সী থামে। ছেলেটি বলে উঠে ডাক্তারবাবু নামুন। দৌড়ে গিয়ে গলির ভেতর থেকে লণ্ঠন বের করে আনে।

ডাক্তারবাবু এবারে এগিয়ে চ'ললেন। টাক্সী দাঁড়িয়েই রইলো। ডাক্তারকে দেখেই মা কঁদে উঠলেন।

‘ভয় নেই মা, ওতে রোগীর অনিষ্ট হয় বলে’ ডাক্তার রোগী দেখতে গিয়ে বসলেন বিছানার পাশে।

লণ্ঠনে রোগীর মুখ দেখেই ডাক্তারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল’ অস্বাভাবিক আত্মনিবেদন ‘স্থলতা!!!’—ব্যস্ত হয়ে নাড়ী দেখতে গিয়েই চোখে পড়লো—কবেকার সেই উদ্বীর্ণ দাগ। একবার গায়ে বাজী দেখাতে বেদেরা এসেছিল। তাদের কাছ থেকেই দু'জনে একসঙ্গে আঁকিয়েছিল গুটী।

ডাক্তারের হাত অবশ হয়ে আসে। রোগীর হাতখানা খসে পড়ে যায়। মা আর ছেলে ব্যস্ত হয়ে ‘কি হ'ল কি হ'ল’ করায় তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হন। ধীরে ধীরে তিনি স্থলতাকে ইন্সপেকশন দেন। সে তখনও সংজ্ঞাহীন।

বাকী রাতটুকু ডাক্তার কাটালেন তাঁর সকল শিক্ষা অর্পণ করে স্থলতার চিকিৎসায়। ভোরের দিকে একটু একটু করে স্থলতার জ্ঞান ফেরে। ডাক্তার এস, এন, তার মাথায় হাত বুলান। ক্রমে যখন বুঝলেন যে তার অবস্থা বেশ ভালো তখন আস্তে আস্তে ডাক দিলেন—‘স্থলতা কেমন আছ?’

একি!—অতি পুরাতন ডাক। এ ডাক তো সে বহুদিন শোনে নি—‘স্থলতা চমকে উঠে চোখ মেলে তাকায়।

যক্ষা রোগীদের সাধারণতঃ চোখের জ্যোতি অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। তা ছাড়া এ মুখ যে স্থলতার মনের প্রতি কন্দরে আঁকা রয়েছে। সে চঞ্চল হয়ে ব'লে উঠলো—‘সৌরেনবাবু সৌরেনবাবু এতদিনে তোমার মনে প'ড়লো আমাকে—আমি তো চলেছি এখন পরপারে—’

—‘না, না স্থলতা, তা হ’তে পারে না—তোমাকে
বাঁচতেই হবে’—সৌরেন চীৎকার করে উঠে—

স্থলতার মুখে একটু ম্লান হাসি—‘ভগবানের ইচ্ছার
প্রতিকূলে তো কেউই কিছু করতে পারে না। ভগবান যদি
মারেন—তা হ’লে আর কি করে তুমি বাঁচাবে?’

‘স্থলতা, ভগবানকে কোনদিনই আমি মানি নি’।
কিন্তু আজ আমি তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা করছি; তিনি
পরম কারুণিক—এভাবে আমায় তোমার কাছে এনে তিনি
কখনও আমাকে বঞ্চিত ক’র্তে পারেন না।’—ডাক্তার বলে
ফেলেন উত্তেজিত ভাবে।

ডাক্তার এস, এন তাঁর সকল শিক্ষা সকল পাণ্ডিত্য
অর্পণ করে আরম্ভ করলেন চিকিৎসা। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে
পরীক্ষা করে দেখলেন, বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু চাই অতি
বিশেষভাবে চিকিৎসা ও দীর্ঘ সময়।

কিছুদিন পরে একটু স্বস্থ হলে ডাক্তার এস, এন,
স্থলতাকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে। খবর পেয়ে
তাঁর মা ইতিমধ্যে কাশী থেকে ফিরে এলেন কলকাতায়।
ঠিক একবছর লাগলো স্থলতাকে রোগমুক্ত করতে।

আরো দু’বছর পরে খবরের কাগজে দেখা গেল বিখ্যাত
চিকিৎসক এস্ এন্ মুখার্জির সঙ্গে শ্রীমতী স্থলতা দেবীর
শুভ পরিণয় কার্য সমাধা হইয়া গিয়াছে।

* * *

তারই কিছুদিন পরের কথা—

সকাল বেলায় সৌরেন আর স্থলতা কথা বলাবলি
কচ্ছিল। স্থলতা বলেছে—‘ছেলেবেলায় বলেছিলে যে
তোমার পরম আনন্দের দিনে যা চাইব তাই আমকে দেবে,
—মনে পড়ে?’

—‘ছেলেবেলার কোন কথাই আমি ভুলিনি স্থলতা,
সৌরেন বলে।

—‘আজ তোমার কাছে আমার কিছু চাইবার আছে—
চাইলে পাব কি?’

—‘স্থলতা’—সৌরেন বলে উঠে—তার মুখ চোখ
উদ্ভাসিত হ’য়ে উঠে স্থলতার এই কথায়।

—‘আমার কাছে তোমার কি চাইবার আছে?’

—‘আছে, আগে বল, দেবে।’

—‘দেব।’

—‘আমার গা ছুঁয়ে সত্যি কর।’

—‘করছি।’

—‘শোন, আমার শরীরে অতি সামান্যই যক্ষ্মাবীজাণু
চুকেছিল—তাতেই না তোমায় কি অসাধারণ চিকিৎসা
করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে’—স্থলতার স্বর করুণ।

—‘এ কথার মানে?’—বিস্ময়ের সঙ্গে শুধায় সৌরেন।

—‘তা না হ’লে আমাকেও হয়তো এতদিনে লক্ষ লক্ষ
নিঃসহায় দুর্গতদেরই মত.....

সৌরেন তার মুখে হাত চাপা দেয়। বাকী কথাগুলো
আর সে বলতে দেবে না। হাত ছাড়িয়ে স্থলতা বলে—
‘আচ্ছা ও কথা যাক কিন্তু এই যে আমাদের দেশে এত
গরীব লোক যারা দু’বেলা পেট ভরে খেতে পায় না তাদের
জন্যে তুমি কি করছ?’

—‘না স্থলতা, ও আমি পার্কে না’—সৌরেন টেচিয়ে
ওঠে—‘আমাদের বিপদের দিনে যারা একটুও ফিরে
তাকাবার সময় পায়নি, তাদের আমি কোনই উপকার
কর্তে পার্কে না।

—‘ওগো শোন, শোন, এ ভুল তুমিও আর করোনা,
তোমার চেয়ে বেশী দুঃখ পেতে হয়েছে আমাকে। বহু
দিনই ছিলাম ওদেরই মধ্যে, ওরা কত অসহায় কত নিঃস্ব
তা তুমি ধারণা কর্তে পার্কে না.....আমার জীবনের এই
একটিমাত্র সাধ—তা কি তুমি অপূর্ণ রাখবে?’

সৌরেন গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। কোনই উত্তর
দেয় না।

কয়েকদিন বাদে সকলকে অবাক ক’রে দিয়ে কাগজে
দেখা গেল, যক্ষ্মা রোগের প্রতিবিধান-উদ্দেশ্যে ডাক্তার
এস্, এন, মুখার্জি তাঁর বিষয়ের বারো আনা অংশ দান করে,
গরীবদের জন্যে বিনা পয়সায় এক যক্ষ্মা চিকিৎসালয়
স্থাপনের বন্দোবস্ত ক’রছেন।

* * *

শিলং যক্ষ্মা চিকিৎসালয়। বছরে শত শত যক্ষ্মারোগী
এখান থেকে নিরাময় হয়ে ফিরে যায় নিজেদের ঘরে।
রোগ সম্বন্ধে দেশের লোকও সাবধান হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।
কারণ চিকিৎসালয় থেকে বহুবিধ উপায়ে যক্ষ্মা নিবারণী
প্রচার কার্যের আয়োজন হয়েছে। স্থলতার মনে আজ
আর আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই।

জ্যোতিষীর সত্য পরিচয়

(সর্ব সাধারণের জন্য লিখিত)

শ্রীতিলক

সামান্য কয়েকটা কথাতে ভবিষ্যদ্বাণী করবার আধ্যাত্মিক প্রশংসা আমি এই প্রবন্ধে বাক্ত করব। জ্যোতিষ জিনিষটার প্রতি, তথা তার দ্বারা মানবজীবনের ভাগ্য অথবা দেশভাগ্য সম্বন্ধে যে সত্য ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারা যায় পাঠক পাঠিকাদের ইহা পড়ে সে বিষয়ে কিছু না কিছু উপলব্ধি হবে। এই স্বকণ্ঠি অথচ জ্ঞানগর্ভ বস্তু প্রকাশ করতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা ভিন্ন কিছুই নয়; তবু যেটুকু আমি আমার জ্ঞানে উপলব্ধি করেছি, সেই টুকুই বলতে চাই।

ইহা সত্য কথা যে জ্যোতিষ একটি বিজ্ঞান এবং সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। সহজ বিজ্ঞানানুসারে এর গবেষণা করা চলে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সাহায্য না নিলে বিজ্ঞানটির সত্য পরিচয় দিতে পারা যায় না। জ্যোতিষের সাহায্যে ভবিষ্যৎ বলাটা আর কিছুই নয় আকাশে যে সব গ্রহ, তারা, প্রভৃতি জ্যোতিষ্ময় পদার্থ আছে, তাদের সঞ্চারণ, স্থিতি ও ক্ষয়ের কারণ গুলি জেনে অক্ষপাত করে পরস্পরের সমন্বয়ে ফলাফল প্রকাশ করা।

এই জ্যোতিষ্ময় পদার্থগুলি কি বস্তু তা আমরা জানি না; শুধু জানি এদের নাম, এদের গুণ ও এদের স্থান যা আন্দাজের উপর ঠিক করা। আরো জান যে আমাদের পৃথিবীর উপর তাদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই পৃথিবীর বাবতীয় জীব ও জড় পদার্থের উপর ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুত্বও আছে। আবার আমাদের থেকে আরম্ভ করে যত অতীতে যাব ততই দেখব এদের খেলা। পৃথিবীর জন্ম থেকে আরম্ভ করে (পৃথিবীরও নাকি বহু জন্ম হয়েছে আবার হবে) আমাদের কালকে মধ্যে রেখে ইহার ক্ষয় পর্যন্ত শুনেছি, শুনছি ও শুনব এই জ্যোতিষ্ময়দেরই নিরন্তর খেলা। সত্য যুগের পর ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির রূপান্তরে দেবতাদের রাজ্য, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের লীলা,

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার সম্ভব হয়েছে ইহাদেরই দ্বারা। ক্ষুদ্র মানবের এই জ্ঞানের আলোচনা করা মুর্থতা, কিন্তু এই মুর্থতার ভিতর পরিপূর্ণ স্বার্থ ও স্বার্থকতা রয়েছে মানবের; কারণ শ্রীশ্রীভগবানের পূর্ণ প্রভাবে শক্তিমান এই গ্রহ-নক্ষত্রের জ্ঞান আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপাদৃষ্টির অনেকটুকু অংশ মনুষ্যের উপর প্রকটিত হয়। ইহাই মানবের পরম লাভ।

জ্যোতিষীর সত্য পরিচয়ের বাইরে চলে যাচ্ছি বোধ হয়, কিন্তু ঠিক তা নয়; ভূমিকায় এইটুকু না বললে চলবে না তাই বলে নিলাম।

উপরে ঐ যে বললাম, গ্রহ-নক্ষত্রেরা ভগবানের প্রভাবে প্রভাবিত, এবং তাদের আলোচনাতে ভগবৎ দৃষ্টি লাভ হয়; ইহাতে বোঝা যায় যে জড় পদার্থের জটিল মীমাংসায় যে অক্ষপাতের দরকার হয়, জ্যোতিষ বিচারের অক্ষপাতকে সেইরূপ ভাবে নিলে বিচার ঠিক হবে না। জড় ও অধ্যাত্ম এই দুটির ভিতর পূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। জড় বিজ্ঞানের মত বিচার করতে গেলে সহজ ভুল থেকে যেতে পারে এবং তা শোধরাবার উপায় থাকে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ভেবে বিচার করতে গেলে, আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই ভুল আপনা আপনি সংশোধিত হয়ে যেতে পারে। কথটা একটু গোলমালে হোল।

ধরা যাক একটা কোষ্টি বিচার করা হচ্ছে। জাতক সিংহ লগ্নে জন্মেছে লেখা আছে কোষ্টিতে। লগ্নের কোন অংশে জন্ম তা জানা নাই অথবা সময় ঠিক নাই, এখানে জ্যোতিষী কি করবেন? অনেকেই উত্তর দিবেন তৎকালিক লাগ্নিক বিচারে জাতকের মুখাবয়ব ও অন্তঃপ্রত্যঙ্গ, আচার ব্যবহার দেখে ঠিক করতে হবে। ফলতঃ তাতেও ভুল হবে; কারণ একজন জ্যোতিষী কম পক্ষে কুড়ি হাজার লোককে সামনে রেখে যদি কোষ্টি বিচার করে, তবে ইহা কতকটা সম্ভব হতে পারে।

নতুবা নয়। তাহলে এই যে কোঞ্জীর অসম্ভব বিচার ও স্বাভাবিক ভুল ইহা কি করে সেরে নিতে পারা যায়? উত্তরে আমাকে বলতে হবে যে, জ্যোতিষীর সত্যপরিচয় সেইখানেই। জ্ঞান, চিত্ত, দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার উপরেই এই সত্য পরিচয়ের ভিত্তি সংস্থাপিত।

এই শাস্ত্রকে ভালবেসে জানতে যেয়ে সকলের চেয়ে প্রিয়তম বস্তু বলে যে হৃদয়ে প্রথিত করে, সে অসংখ্য শ্রৌক কঠিন ও বিচার করিতে না পারলেও ইহাতে সহজ জ্ঞান লাভ যে করবে তাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রটিকে ভাল বাসলেই চিত্ত যে তাতে এবং তার দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তুটির সারাংশে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং ভাল মন্দ বিচার টুকু করবার জন্য অপর শক্তির সাহায্য লাভ করবে তাতে সন্দেহ নাই। আবার এই স্বল্প বিচারফলটি চিন্তে পারার দৃষ্টিও যে সে পায় তার ত কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং যেখানে ভালবাসা, তার আন্তরিক প্রয়োজনে চিত্ত যেখানে বাঁধা এবং দৃষ্টি যার ভিতর নিবদ্ধ, সেখানে বুদ্ধিমত্তা আপনা-আপনিই জাগাব।

জ্যোতিষী হতে হলে, জ্যোতির ভিতর নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। জ্যোতিষ থেকে শুধু জ্যোতিঃই পাওয়া যেতে পারে। আর কিছু সেখানে মিলবে না।

যে জ্যোতিষী সে জ্যোতিঃ দান করতেই পারে, বিনিময়ে আত্মপ্রসাদ ভিন্ন কিছু পায় না। চিত্ত তার বিচরণ করবে সেইখানে, যেখানে আছে শুধু মধুময় স্বাক্ষর। তার নিশ্চল দৃষ্টির মাঝে থাকবে শুধু নিশ্চিততার লক্ষ্য। দেহ ও প্রাণের যুদ্ধে তার আঁখিতারা শুধু চাইবে ভালবাসা, যার আকর্ষণে জগতের বস্তু বাঁধা পড়বে। স্পর্শে তার সমস্ত মলিনতা দূর হয়ে যাবে। এই সমস্ত গুণের অধিকারী যে নয়, এই শাস্ত্রে তার কোন অধিকার নাই।

এই শাস্ত্রের সাহায্যে মানুষ মানুষের ভাগ্য বলতে পারে; শুধুই কি তাই? মানুষ মানুষের ভাগ্য গড়তেও পারে এই শাস্ত্রের সাধনায়। আমি ইহা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। বিধাতার গড়া জীবের ভাগ্য, বিধাতারই কাজ তার শেষ করা। মানুষ কোন সাহসে তা বলতে যায়, কেনই বা মানুষ ইহা অধ্যয়ন করে? ভাগ্য,

যে বস্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পৃথটির পরম বন্ধু, মানুষের কি অধিকার আছে তাকে আবিষ্কার করা বা তা নিয়ে গবেষণা করা। জীবনের কর্ম ভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত করে, পৃথকভাবে দেখে সে পথে গমন করা তার চলে না।

কর্মের ক্ষয় হবার সঙ্গে ভাগ্যের ক্ষয় হয়ে চলে। কর্ম ও ভাগ্য পরস্পর বন্ধু। মানুষের জড় দেহের সঙ্গে সংযুক্ত মস্তিষ্কস্থিত বুদ্ধিচাতুর্য্য তার আবিষ্কার করতে পারে না। আত্মারূপী জ্ঞান হৃদয় ও ভাগ্যের পরিচালনা-কার্য লক্ষ্য করে যায়; পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। আত্মারূপী জ্ঞানই মুক্তিদাতা ঈশ্বরের অংশ। দেহ তৎস্থিত প্রাণ ও হৃদয়কে গঠন ও চালনা করেন ঈশ্বর। তখন দেহ-স্থিত সমস্ত অঙ্গগুলি অন্তরূপ ধারণ করে। সে (মানুষ) তখন পরম শান্তিময়। সে ভিন্ন ইহার সঞ্চরণ কেহ জানতে বা লক্ষ্য করতে পারে না। তখন যদি লক্ষ্য করা যায় তার দৃষ্টির দিকে তবে কিছু না কিছু অনুধাবণ করা যেতে পারে। নিখর নিশ্চল মমতাভরা দৃষ্টি, জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়। পরমেশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান পরমানন্দ তখন সেই একমাত্র ভোগ করে।

সহজেই তবে অনুমান করা যাবে এই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে জ্যোতিষী জ্যোতিষ শিক্ষা করবে কেন? প্রেরণা জেগেছে বলে সে অল্প-বিস্তর ইহা আলোচনা করছে।

জ্যোতিষীর অন্তর স্নেহময়। মন্দ অথবা ভাল প্রত্যেক-টির জন্য বুক তার সমতায় ভরে উঠে। সে পরম শত্রুর শাস্তি দেখে অশ্রু বিসর্জন করে। শত্রু যে, তারও বিরহে প্রাণে তার সাড়া জাগে। শত্রু ও মিত্র উভয় তার কাছে একই বস্তু।

জ্যোতিষ সত্য একথা সমস্তেরই লোকে বলে। মিথ্যা শুধু যে জ্যোতিষী সেই। ঠিক তাও নয়। জ্যোতিষীর জ্যোতিষটাই আজ মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ কি? জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিতর স্বার্থ জড়িয়ে গেছে, সেই-টাই একমাত্র কারণ; প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে যে ভাবটা জ্ঞাপন করছি তার অর্থ বুঝতে পারলে, বুঝবেন, স্বার্থ এই শাস্ত্র আলোচনায় আদৌ স্থান পায় না। অধিকাংশ স্থল দেখা যাচ্ছে, অর্থ রোজগার এই শাস্ত্র অধ্যয়নেরও পথ

হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থের স্বার্থে অথবা স্বার্থ ও অর্থের আর্জ আমাদের দেশে সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্রটার অনর্থ ঘটিয়ে দিচ্ছে—। ফলে লোপ পেতে বসেছে এই শাস্ত্র। পথের ভিখারীকে জ্যোতিষী রাজা করে দিচ্ছে; রাজাকে সম্রাট করে দিচ্ছে এবং প্রচণ্ড স্বার্থের, চরম পরিপোষণ করে নিচ্ছে; স্বতরাং জ্যোতিষী যে মিথ্যা ইহাই সত্য পরিণত হতে চলেছে।

সর্বাস্তরূপে আমি স্বীকার করি যে, বিশেষ প্রয়োজনীয় অগ্ৰাণ্ড বিজ্ঞানের মত এই মহাবিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করতে হলে সহস্র সহস্র অর্থ ব্যয় করতে হয়। দেহে, মনে, উৎসাহে, প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। অগ্ৰাণ্ড শাস্ত্রের মত এই শাস্ত্রের বাহ্যিক ব্যবহারিক অর্থ নেওয়া অসঙ্গত নয়। নিজেকে পোষণ করবার প্রয়োজনে, যতটুকু দরকার, অন্ততঃ সেইটুকু নিতে অনেকেই বাধ্য হন। আজকাল দেখা যায় এবং শোনা যায়, জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করে অধিকাংশ লোক ভাতারের মত ব্যবসা আরম্ভ করেছে। রোগী ভাল হোক আর না হোক ভাতারের ভিজিট দিতেই হবে; জ্যোতিষীর দ্বারে যেয়ে প্রশ্ন করবার পূর্বে টাকা জমা দিতে হবে। অগ্রে জমা না দিলে ভাগ্য বিচার করা হয় না। সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, যেন জ্যোতিষী টাকার জগুই দোকানে

বসে থাকে এবং অগ্রে রসদ না দিলে মন তার বিরস থেকে যায়, স্বতরাং ভাগ্য বিচারের প্রতি মন যুক্ত থাকেনা, অথবা টাকা দিবে কি না দিবে বা কত দিবে, সেই দিকে চিন্তা ও বুদ্ধি যুক্ত থাকে—বোঝা শক্ত। অর্থ-লোভ টাই সেইখানে জয় করে ইহা সহজে অবধারণ করা যায়। অতি সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক পরীক্ষার উত্তর দেওয়ার মত মনের দৈর্ঘ্য হারিয়ে যায়; ফলে বিচার ভুল হয়। নানারূপ তর্ক বিতর্কের পরে এইটুকুই ঠিক করতে পারা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মনকে অন্য কামনার মধ্যে থেকে সরিয়ে সহজ অবস্থায় (অনাসক্ত) আনবার শক্তি না হয়, অর্থাৎ লোভ সংবরণ করবার ক্ষমতা অর্জন না করা যায় ততক্ষণ জ্যোতিষীর ভাগ্য গণনা দ্বারা অর্থোপার্জন করা আরো উচিত নয়। এই অতি সূক্ষ্ম পরম মাত্তিক তত্ত্ব গবেষণার মূলে কোনরূপ কামনার বস্তু না রাখাই ভাল। যদি অবস্থার বিপর্যয়ে সকলেরই পক্ষে ইহা সম্ভব না হয়, তবে যাতে ইহার পক্ষে দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ না রেখে মনকে স্বাধীন ভাবে পরিচালনা করে ফলাফল বলতে পারা যায় সেইরূপ ভাবে নিজেকে গঠিত করতে হয়; ফলে যাতে এই সত্য শাস্ত্রের বিচার সর্ববাদীসম্মত সত্য বলে সকলেরই কাছে প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয় তার চেষ্টা করাই প্রয়োজন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

আমার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা। আমার মনে হয়, বিদেশে গেলে নিজেদের রীতিনীতি প্রভৃতির সঙ্গে মেথানকার রীতিনীতি ইত্যাদি তুলনা করে বাইরের যা ভাল—সংস্কারহীন হয়ে তাকে গ্রহণ করা এবং নিজেদের যা মন্দ অনায়াসে তাকে বর্জন করতে শেখাটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তুলনা করতে গিয়ে সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে আমাদের সঙ্গে ওদের জীবনযাত্রা-নির্বাহ প্রণালীর বৈষম্য।

ডাঃ শ্রীমতী ফুলরেণু দত্ত এম, এ, ডি, লেট (প্যারিস)

সাধারণ খাওয়া, পরা, থাকা ইত্যাদি ব্যাপারে ওরা যেন আমাদের থেকে অনেকটা ভিন্ন ধরনের। অর্থাৎ আমরা যেমন অন্ন খেয়ে, পরে, খুদী থাকতে পারি ওরা তা পারে না। ওদের ভিতরে অভাববোধটা খুব বেশী, জীবন-যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্যটা ওরা খুব বেশী চায়। এই জগুই হয়তো আমাদের চেয়ে ওরা দারিদ্র্যের দুঃখ ভোগ করে বেশী। কিন্তু এর মধ্যে একটা ভাববার বিষয় হচ্ছে এই যে ওদের ঐ অভাব বোধটা তাহলে সামাজিক দিক থেকে তাদের উন্নত কি অবনত করছে। মূল খুঁজতে গেলে আমরা দেখি, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষাই তাদের জীবন

সম্বন্ধে এতটা সচেতন করে তুলেছে। আমাদের সনাতন ভারতও যে এদিক থেকে একেবারেই পশ্চাৎপদ তা নয় তবে গতিটা কিছু মন্দ। কিন্তু এই অভাব বোধটাই যে তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলছে এবং জীবনযাত্রার ধারা বদলে দিয়েছে এ কথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

উন্নতির শ্রেষ্ঠ কারণই হচ্ছে ওদেশের শিক্ষার বিস্তার। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাটাকে স্থলভ করে দিয়ে ওরা সব দিক থেকেই স্বাস্থ্যবান জনসমাজ পাচ্ছে আর অভাব আমাদের দেশে খুব বেশী। শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষার উপরেই ওরা নির্ভর করে না। লাইব্রেরী, রিডিংরুম এ সব প্রায় রাস্তায় রাস্তায় আছে, হাটে বাজারে গিয়ে পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা বইওয়ালার কাছে পয়সা গচ্ছিত রেখে বই নিয়ে আসে, আবার পড়া হয়ে গেলে বই ফিরিয়ে দিয়ে পয়সাটা নিয়ে আসে। স্বাধীন মতবাদ প্রত্যেকের মধ্যে তৈরী হতে দেওয়াটাকে ওরা খুব বড় স্থান দেয়। বাবা মা এজ্ঞ সকলের বড় বন্ধু। তাঁরা কখনও নিজেদের মতটাই ছেলে মেয়েদের স্বন্ধে জোর করে চাপিয়ে দেন না, বরং যার যার আলাদা স্বাধীন চিন্তাধারাকে পরিস্ফুট করবার সহায়তা করেন।

পারিবারিক জীবনে ওরা ভারি স্বশৃঙ্খলাবদ্ধ। বি চাকর রাখা অনেকেই পোষায় না। কাজেই ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে একটা বাড়ীর সবগুলো কাজ মায় পায়খানা সাফ করা পর্যন্ত—নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই সহযোগিতার ফলে পরিশ্রম কাউকেই বেশী করতে হয় না, অথচ শৃঙ্খলামত সব কাজই হয়। এদিকে সবচেয়ে লক্ষ্য করবার জিনিষ হচ্ছে ওদের পরিচ্ছন্নতাবোধ। এই রুচিটা ওদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অনেক সাহায্য করে। অস্থ বিস্ময়গুলোকে তো যেন ওরা দেশ থেকে এক রকম তাড়িয়েই দিয়েছে। নেহাৎ যেগুলো এড়ানো যায় না তার জন্ত ভাল ভাল হাসপাতাল রয়েছে। সবাইকে নিয়ে রোগে ভোগার চেয়ে ওরা অস্থ করলে হাসপাতালে গিয়ে স্থ হয়। আসাটাকে বেশী পছন্দ করে। তারপরে লক্ষ্য করবার জিনিষ হচ্ছে ওদের পরস্পরের স্ববিধা অস্ববিধা

বিবেচনা করে চলা। পাশের বাড়ীর লোকের অস্ববিধা হবে ভেবে ওরা নিজের বাড়ীতে বসেও কখনও খুব হৈচৈ করে না। এমন কি এক বাড়ীতে একটা ছেলে সমানে দুই তিন দিন টেচাতে থাকলে পুলিশ এসে হাজির হবে কি হয়েছে জানবার জন্ত।

আমাদের দেশের মত যৌথ পরিবার ওখানে নেই, তার কারণ অর্থনৈতিক। ছেলে মেয়ে উপার্জনক্ষম হলে যার যার সংসার নিয়ে ওরা এমন কি মা বাবার সঙ্গে পর্যন্ত পৃথক হয়ে যায়। এটা আমাদের চোখে খুব খারাপ লাগে কিন্তু একের উপার্জিত অর্থে বহুকে পোষণ করা শক্ত অথবা অসম্ভব বলেই ওদের এ ব্যবস্থা। এতে পিতামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ ওদের কিছু ক্ষুণ্ণ হয় না। পিতামাতার নিজস্ব আর্থিক সংস্থান না থাকলে সে ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েরা তাঁদের সাহায্য করে না এমন বড় হয় না।

রাজনৈতিক চেতনা ওদেশে অল্প বিস্তার সকলের মধ্যেই দেখা যায়। শিক্ষার বিস্তারই এর কারণ। এ ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েতে কোন তফাৎ নেই। রাষ্ট্র সেবা, সমাজ সেবা প্রভৃতিতে অনেক স্থলে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দানই বেশী দেখা যায়। ফ্রান্সে মেয়েরা এখনও ভোটাধিকার পায় নি। সেখানকার শিক্ষিতা মেয়েরা কিন্তু ভোটের জন্ত সোজা চেষ্টা না করে আগে জনমতকে গণতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষিত করতে চেষ্টা করছে। তারা জানে, এভাবে শিক্ষিত হবার আগে ভোটাধিকার পেলে তারা সে অধিকারকে গণ-সাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত করবে না। ওদেশের লোকেদের অভাববোধটাই ওদের রাষ্ট্রীয় চেতনাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সব রকমে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রতি দাবী ওদের শেষ হবে না এটা জানে বলেই ওদের মেয়েরাও অনেক সময় ঘর ফেলে বাহিরের কাজ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। পরিবার এতে একটু অস্ববিধাগ্রস্ত হয় বটে কিন্তু সেটা ওরা গ্রাহ্য করে না।

এ রকম আলোচনা করলে দেখা যায় সব দিকেরই আমাদের চেয়ে ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। যে যুগ বর্তমানে এসে পড়েছে তাতে আমাদেরও এখন সমস্ত রকম চেতনা ও ধারণায় দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে নতুবা আমরা চলতি দুনিয়ার সঙ্গে সমান তালে চলতে পারবো কেন?

ব্রেবার্ণ-স্মৃতি

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

ব্রেবার্ণ, তোমার ধন্য বংশ, ধন্য জন্মভূমি,
লগ্ন-চন্দ্র-জাতক যদিও যোদ্ধা হইলে তুমি !
স্বজাতি-স্বদেশ গরবে তোমায় দানিল বীরের মান,
রাজ-করণায় রাজ-পরিষদে হইল তোমার স্থান।
কর্মই তব জীবন-ধর্ম সত্যেই তব শুদ্ধি,
পরের মর্ম বুঝিয়া দরদী সাধনে লভিলে সিদ্ধি।
কায়া-ছায়া সম পেয়েছিলে জায়া, তুমি হে ভাগ্যবন্ত,
ঘর ও বাহিরে আনন্দ-সুখের ছিল না জীবনে অন্ত।
বিভ্র-বিদ্যা করেনি তোমায় বিমুখ দীনের প্রতি,
মানবতা ছিল ধর্ম তোমার, অগতির তুমি গতি !
নবীন বয়সে প্রবীণ শাসক বোম্বায়ে এলে, তুমি,—
রাষ্ট্র-নীতিতে বিশারদ ব'লে চিনিল ভারতভূমি।
বঙ্গের তুমি ভাগ্যবিধাতা দারুণ সঙ্কট কালে,
সঙ্কটত্রাণ হ'ল তব নাম—কীর্তি-চন্দ্রভালে।
রাজ-প্রতিনিধি-আসন তোমার উচ্চ করিল শির,
মর্যাদা তা'র করিলে রক্ষা কর্ম-কুশল বীর।
তোমার প্রেরণা অভাগার দেশে দানিল নবীন আশা,
কত অনুরোধে দিতেছে বঙ্কার এখনো সে ভাব-ভাষা !
শাসন-নীতিতে তোমার প্রভাব অপরূপ অভিনব,
তোমারি জয়ের যাত্রা-পথে ধ্বনিত আজি সে রব্।
কী কাল-ব্যাধিতে লইলে শয্যা, অকাল মরণ তা'য়,
বাংলা তথা ভারতের লোক মগ্ন সে শোক-ছায় !
প্রিয় গভায়ুর বিরহ-ব্যাথায় কেমনে কাঁদে এ দেশ,
বিশ্ব দেখিয়া বিস্মিত আজি—কাঁদার নাহিক শেষ !
প্রাচী ও প্রতীচি কাঁদিতেছে শোকে মহতের তিরোধানে,
এমন মরণ বরিল যে জন বাঁচে সে কীর্তি-গানে !
প্রেম ও করুণা করে পরাজয় শাসনের অধিকার,
জীবন দানিয়া মরণে মহান্ করিলে প্রমাণ তা'র !
বিশ্বপ্রাণারাম, নয়নাভিরাম তুমি হে মৃত্যুঞ্জয়,
স্মৃতি-বন্দনায় অনাগত কাল গাহিবে তোমারি জয় !

ছোট-বড়

সকল জিনিসই ভাবকের ভাব-ধারায় ফুটে উঠে স্বন্দর হ'য়ে; কারণ, ভাব-রাজ্যে অস্বন্দর নাই একেবারেই। এই অস্বন্দরের সৃষ্টি, আমার মনে হয়, হিংসা থেকেই। যে জিনিসটা যা'র মনের মত না হয়, সেই জিনিসটাকেই সে দেখে, সে ভাবে কুৎসিত। কুৎসিতের যে কুৎসা, মানুষ যা' ক'রে থাকে কতকটা অজ্ঞাতসারেই, সেটার জন্য হিংসায়। হিংসা শব্দটা এখানে ব্যাপকভাবেই ব্যবহৃত।

এ হিংসা বড়রও আছে, ছোটরও আছে। স্বার্থ জিনিসটা বুঝতে শিখে বড়রা না হয় হিংসা করে; এটা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু ছোট যা'রা, স্বার্থসিদ্ধির অভিজ্ঞতা যা'দের এতটুকুও নাই, তা'রাও হিংসা-ভাব পোষণ করে কেন, সেটা বুঝা ভারী শক্ত—ভাববার বিষয়। বড় হওয়ার জন্য ছোটদের স্বাভাবিক হিংসার কথা বলি তবে।

কচি শিশু, যা'র কুড়িটা দাঁতও গজায় নাই, বড় জুতা সংগ্রহ করতে পারলেই সেটা দখল ক'রে রাজ্য দখলের আনন্দ প্রকাশ করে সে। সেই বড় জুতা কখনো রাখবে সে নিজের কোলের উপর, কখনো মাখায়, আর কখনো বা ঐ জুতার মধ্যে তা'র ক্ষুদ্র চরণ প্রবেশ করিয়ে চলবার চেষ্টা করবে টলতে টলতে। বড় কাপড়, বড় জামা, বড় বিছানা পেলেই অধিকার ক'রে বসবে ঐ অদ্ভুত-চরিত্র শিশু। চশমা, যা' বড় এবং বড়ো লোক ব্যবহার করে, সেটা চোখে দিবার স্বযোগ ও সুবিধা পেলে শিশুর আনন্দের আর সীমা থাকে না। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা ও বুঝা যা'বে, ঐ আনন্দের মধ্যে তা'র বড় হ'বার আকাঙ্ক্ষাটা খুবই প্রবল। আকাঙ্ক্ষা থাকলেই হিংসা গজিয়ে উঠবে স্বাভাবিক নিয়মে। তবে সে হিংসায় বিষ নাই। সে হিংসায় বড় হ'বার চেষ্টা বাড়ে—সাধনা চলে। নকল করতে করতেই আসল জিনিসটা পেয়ে যায় নকলনবীশ একদিন। সুতরাং এ হিংসা বিতরণ করে আনন্দ।

ছোট ছোট মেয়েরা যে বোঁ বোঁ খেলে, সেটাও ঐ বড় হ'বার নকলনবীশ। ধুলার অন্ন, খড়ের চচ্চড়ী, স্বরুকীর

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

ঝোল-ডালনা, তা'রা শৈশবে যে রাঁধা-বাড়া করে, সে সব হ'ল ভবিষ্যতে সংসার পাতা ও গুছিয়ে তোলবার উপক্রমণিকা—প্রস্তাবনা। ছেলেদের পণ্ডিতী, মাষ্টারী, ওকালতী, ডাক্তারী, জজিয়তী প্রভৃতি করার অভিনয়, আর ছোট ছোট মেয়েদের গৃহিণীপণ্য করার মুসোবিদা ঐ একই জাতের। কারো কারো মত হয়ত—ছেলে-মেয়েরা খুব অল্প বয়সে যে সব জ্যাঠামী করে, সে সব তা'দের খেলা, মজা করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মজা হয় হোক, কিন্তু তা'র মধ্যে বড় হ'বার যে একটা সরল বড়মজা চলে, মনস্তত্ত্বের সূত্র দিয়ে তা' ধরতে পারা যায়। গান্-বাজনার-তাল ঠিক হচ্ছে কিনা, সেটা ধরবার জন্য যেমন একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, শোণিত-চাপ শরীরের মধ্যে কি ভাবে আছে, তা' নির্ণয় করার জন্য বাজারে যন্ত্র প্রকার যন্ত্র পাওয়া যায়, ছোট থেকে বড় হ'বার আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে শিশুর মাতিয়ে তুলে, সেটা স্থির করার জন্য এই যন্ত্র-যুগে যদি কখনো কোনো প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার হয়, তখন নিশ্চিত ভাবেই প্রমাণ করা যা'বে—এমন যন্ত্রব্যৱত্তি ভিত্তি আছে কিনা।

এ কথায় কিন্তু বলা হচ্ছে না, বড় হ'বার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে পোষণ করা একটা অপরাধ। বরং বলব—এমন আকাঙ্ক্ষা খুব স্বাভাবিক, আর হওয়াই উচিত। যা'র সেটা না হয়, সে বড় হ'তে পারে না কোনো কালে। গাছ-পালা, পাথর পর্যন্ত ছোট থেকে বড় হ'য়ে উঠে, ভাব-ধারা, চিন্তা-শক্তি যা'দের মধ্যে ক্ষুদ্র মত অহোরহ চলছে, তা'রা যেমনটা জন্মেছে, তেমনিটাই থাকবে, এটা ত হ'তে পারে না। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদের মত শরীরী বাঙালেই চলে না। বাড়াতে হ'বে মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞা, কর্ম-শক্তি; তবেই হ'তে পারা যা'বে মানুষ। ছোট থেকে বড় হয় সেই মানুষই।

হিংসা-বলে মানুষকে ছোট করবার যেখানে চেষ্টা, মানুষের ক্ষতি করবার, লাঞ্ছিত অপমানিত করার যেখানে

প্রয়াস, সেইখানেই হ'ল অপরাধ। কু-শিক্ষা, কু-সঙ্গ, কু-বুদ্ধি মানুষকে ক'রে তোলে পশুরও অধম। এমন অধমই হয় সকল রকমে রিক্ত। অত্যাচার করলেই কি একটা অজ্ঞাত কারণে তা'র ফল ভোগ অনিবার্য—কেহ বিশ্বাস করুক, আর নাই করুক। এমন ফল দেখা গেছে বহু ক্ষেত্রেই। সেইটাকেই আমি বলতে চাচ্ছি—কর্মফল। সে কর্মফল খণ্ডন হয় কর্মের দ্বারাই। কর্মফল খণ্ডিত হ'লেই ছোটই হয় নিজ গুণে বড়।

ছোট থেকে বড় হওয়ার বাধা বিপত্তি অনেক। গরু-ছাগলের গ্রাস থেকে কিছা নির্কোষ নির্দয় বালকের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্ত গাছপালাকে যেমন বেড়ার মধ্যে রাখতে হয়, ছোট মানুষেরও তেমনি বড় হ'বার জন্ত বেষ্টনীর মধ্যে কিছুকাল থাকার খুবই প্রয়োজন। এ বেষ্টনী হচ্ছে গুরুজনের শাসন। এ শাসন-বেষ্টনী যা'র না থাকবে, কিছা বেষ্টনী সত্ত্বেও বেষ্টনীর বাহিরে যে লাফিয়ে পড়বে, তা'র অনিষ্ট হওয়া অবশ্যস্বাবী। মতি স্থির হয় নাই যা'দের, যথেষ্টাচারটাকে তা'রা ভাবে স্বাধীনতা। এমন স্বাধীন মত পোষণ করতে গিয়ে অনেকেরই পথে প'ড়ে গেছে কাঁটা। বড় হ'তে হ'লে ঠিক পথে সাধনা চাই। বিপথে গেলে ছোট শুধু ছোটই থাকে না, ছোট'র অপেক্ষা আরো ছোট হ'য়ে যায়। সূর্যের তাপ মানুষ সহ্য করতে পারে—ক'রেও থাকে; কিন্তু বালির তাপ অসহ্য। ছোট যখন বালির মত উত্তপ্ত হয় বৃথা গর্বে, বৃথা আশ্ফালনে, মানুষ তখন তা'কে ঠাণ্ডা ক'রে দেয় আচ্ছা ক'রে উত্তম মধ্যম দিয়ে। যথার্থ বড় যে মানুষ হ'ন, তাঁ'র তাপ হ'য়ে যায় শীতল, ক্ষমা, প্রীতি, উদারতায়। শক্তিমান হ'য়ে তিনি হ'ন ক্ষমাবান, ত্যাগে হয় তাঁ'র স্নান-বিপর্যয়। কর্ম-শক্তিতে যে মানুষ বড় হ'য়ে থাকেন, অত্যাচার করেন না তিনি কোনো মতেই—করা স্বাভাবিক নয়। সে স্বভাব যদি কোনো কারণে বৈপরীত্য ভাব ধারণ করে, মানুষ সে অত্যাচার হজম করতে পারে—ক'রেও থাকে। কিন্তু বড়'র মত ছোট'র চাল-চলন, বলার ভঙ্গী প্রভৃতিকে বেয়াদবী ভেবে তা'কে করে ঘৃণা, তা'কে দেয় শাস্তি। শত্রু সৃষ্টি করে সে অকারণে। এমন ভাবে শত্রু সৃষ্টি করলে শেষে হয় তা'র বাঁচাই দায়। সে ভাব ক্রমাগত চলতে থাকলে

ভেঙ্গে পড়ে তা'র মেরুদণ্ড। কাষেই কোনোদিন বড় হওয়া তার হয়ে উঠে না নিজ কর্মদোষে। শক্তি সঞ্চয় করতে না পারলে বড় হওয়া ছোট'র পক্ষে অসম্ভব। এ শক্তি সঞ্চয় করতে হ'লে বড়'র কাছে করতে হয় সাক্ষরদি। যে পাঁকা সাক্ষরদি, সেই হয় একদিন ওস্তাদ। ওটা সাধনা'র জিনিস। চট্ট ক'রে ওস্তাদ হওয়া চলে না—হ'লে বে ওস্তাদি খাটেনা।

বড়'র কাজ কিন্তু ছোটকে সকল রকমে বড় করা। ছোটকে মারবার চেষ্টা করে কাপুরুষ—টাইর্যান্ট। বহু স্থানে বহু প্রতিষ্ঠানে, বহু সমাজে এমন কাপুরুষ দেখে থাকেন অনেক। বড়কে তোষামোদ ক'রে টাইর্যান্ট যদি বড় হ'য়ে থাকে, তবে যা'রা সেই টাইর্যান্টকে আশ্রয় এবং প্রশংসা দেন, তাঁ'রাও ত্রায়, নীতি ও ধর্মের চক্ষে হন অপরাধী। সে অপরাধের যে একদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, সে কাহিনী ইতিহাসেও পড়া গেছে আর তা' প্রত্যক্ষও হয় প্রায়শঃ।

ছোট থেকে বড় হ'য়ে অথবা ছোট'র সহায়তায় বড় হ'য়ে ছোটকেই যা'রা গলা টিপে মারবার চেষ্টা করে, তারা বড় হওয়ার যোগ্য নয় কিছুতেই, সেই কারণে বড় হ'য়েও বড় থাকতে পারেনা সে সকল মানুষ অধিকাল। বড় হ'তে গেলে কর্মশক্তি ত চাই-ই, তা'র সঙ্গে চাই বিজ্ঞা, বোধ-শক্তি ও মিষ্টস্বভাব। ভাগ্যও স্বপ্রসন্ন হওয়া চাই অবশ্য। দৈব ও পুরুষকারে মানুষ যত বড় হয়, এত বড় করতেও পারেনা অত্ন কিছু। প্রোপাগান্ডা ক'রে হয়ত কেউ বড় হওয়ার পথে কতকটা অগ্রসর হয়। কিন্তু সত্যকার বড় হওয়ার উপায় নাই তা'দের। মানুষ বড় হয় সাধনায় আরাধনায়—নিজের গুণে। মানুষের উপর জুলুম চালালে অত্যাচারস্রোতে ভাঁটা পড়ে অচিরে। এটা শুধু এখানকার শাস্ত্র-কথা নয়, যেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের নূতন ভাব-ধারা এনে দিয়েছে, সেখানকার বৈজ্ঞানিক-বাণীও এইরূপ। মানুষের প্রাণভরা আশীর্বাদ মানুষকে যে শক্তিমান করে, একথা প্রতীচ্যও বলছে এখন।

ছোটকে আরও ছোট করবার চেষ্টায় জুলুমবাজী চালাতে হয় অনেক। এমন জুলুম চালালে ছোটদের

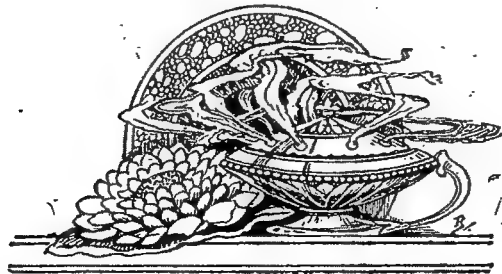
সজ্জ-শক্তি অত্যাচারের বিরুদ্ধে একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করবেই। তা'রফলে বড়র পতন অনিবার্য।

সংসারে থাকতে হ'বে যখন ছোট, বড় দুজনকেই, পরস্পরের মধ্যে একটা ঐক্য থাকার বিশেষ প্রয়োজন। ছোটরা যদি বড়দের অবাধ্য হয়, বড়দের উপদেশ যদি না মেনে চলে, বড় হ'বার অভিজ্ঞতা তা'রা লাভ করতে পারবেনা কিছুতেই। গাছপালা ভাল মাটি, আলো-বাতাস না পেলে যেমন পুষ্ট হয় না, বড়দের ভালবাসা, সহানুভূতি শিক্ষা উপদেশ না পেলে ছোটরা তেমনি বড় হ'বার সুবিধা-সুযোগ পেতে পারে না। হজুগে মেতে, যথেষ্টাচার ক'রে নিরুদ্ভিতা বশে আপন মতকে অশ্রান্ত ভেবে পরের আচার ব্যবহার নকল ক'রে ছোট কোনো কালেই বড় হ'তে পারে নাই, আর দেশকেও বড় করতে পারে নাই। এমনটা করেছে যা'রা, তা'রাই হ'য়ে গেছে ভিন্ন সমাজের লোক। নিজস্ব হারিয়ে ফেলে তা'রা হীন নকল করতে করতে। তা'তে লাভও নাই, গৌরবও নাই। আমি যদি আমি না থাকতে পারলাম, আমার আপন জনের যদি আপন হ'তে না পারলাম, তবে যত বড়ই আমি হই না কেন, আমার আমিত্ব ডুবে যাবে বিদেশী-তুমিত্বের গভীর হ্রদে। এটাকে ত বড় হওয়া বলে না—এটা হ'ল নিজেকে ছোট ক'রে ডুবিয়ে দেওয়া। গীতার উক্তি—“স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ” যে দেশের গীতা, সে দেশের মানুষ যদি সে উক্তি না মানে এখন, তবে দেশ যা'বে অধঃপাতে।

কিন্তু তা' যেতে দিলে চলবেনা কোন মতেই। হাওয়া

ফিরা'তে হ'বে ছোটদের দিয়েই। কারণ ছোটরাই হ'বে একদিন বড়। তা'রা যদি খুব বড় শিক্ষায় আপনাদের শিক্ষিত করে, তা'হলে ভয় থাকেনা আপদ-বালায়ের। দেশের লোক তখন হ'বে স্বস্থদেহ, স্বস্থ-মন ও স্থিরবুদ্ধি। দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলবার সেই সময়েই সুযোগ। ছোটদের তরফ থেকেই এমন হাওয়া বহাবার দরকার। কেননা, তা'রাই হ'ল ভবিষ্যতের আশার স্থল। তা'রা নির্বোধের মত পরের জমীতে পরের অল্পকরণে কুণ্ঠিত বীজ উত্তর করলে, সে আবাদে দেশে সোণা ফলা'বার আশা ছুরাশা। এমন আবাদে ঘরে-বাইরে অশান্তি। এই কথাটা বুঝলেই হাওয়া ফিরে যা'বে আবার।

আর বড়র আসন ভাগ্যবলে পায় যা'রা, বড়র পদ রক্ষা করতে হ'বে তাদের খুব সাবধানে। অহং জ্ঞানশূণ্য হ'য়ে, স্বার্থ জিনিষটাকে মুছে ফেলে, বড়র অভিমান ত্যাগ ক'রে ছোটদের আপন ক'রে তাদের বড় হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে মনে জানে ঐকান্তিকতায়। টাকার থলি, জ্ঞানের খনি দেখিয়ে অববুদ্ধিতে বড়র মান-খাজনা আদায় করার যুগ নয় এটা। বড়ত্ব বজায় রাখতে হ'বে ছোটদের সঙ্গে মিলে মিশে, তা'দের একান্ত আপনার ক'রে নিয়ে। তা'দের সুপথে চালা'তে পারলে বড় ত বড় থাকবেই; পরন্তু দেশ ও সমাজ বড় হয়ে উঠবে আশ্চর্য্য রকমে। ছোট-বড়র মধ্যে প্রগাঢ় সহানুভূতি চাই এই কারণেই। জাতি, সমাজ, দেশকে বড় করতে হ'লে, বড় রাখতে হলে, ছোট-বড়র মিলন চাই আন্তরিকতায়। সেই আন্তরিক-তাই সত্য প্রার্থনীয়।



লক্ষীর বাঁপি

হিংসা বৃত্তিটা পশুধর্ম, মানুষের পক্ষে ওটা মস্ত পাপ। কিন্তু ঐ পাপটাই শাস্ত্র করে খুব বেশী। ও পাপ আনে সংসারে ঘোর অশান্তি। সে অশান্তি পাপী-কেও ক'রে তোলে অশান্ত—জলে পুড়ে মরতে হয় তা'কে মনে মনে। এমন হিংসা চলে আসছে অবশ্য পৌরাণিক যুগ থেকে, আর চলবেও যাবচ্ছত্র দিবাকরো। কিন্তু মাত্রা ছাড়লেই সর্বনাশ। এ সর্বনাশটা পোড়া বাংলা দেশে কি ভাবে হচ্ছে, বাংলার লোক কি এখনও বুঝে উঠতে পারছেননা? ধর্ম-নীতি, সমাজ-নীতি গার্হস্থ্য নীতি, অর্থ-নীতি, রাষ্ট্র-নীতি প্রভৃতি সকল নীতিই যে কুনীতি হ'য়ে পড়ছে, তা'র মূলে রয়েছে ঐ হিংসা। গুরু হ'তে চাচ্ছেন, নেতা হ'তে চাচ্ছেন, কর্তা হ'তে চাচ্ছেন যাঁরা দলস্থিতি ক'রে, তাঁদের সকলের একগুঁয়ে কর্তা হওয়া তা' সম্ভবপর নয়।

বাংলা দেশে মহিলাগণের স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, সৌন্দর্য্য নষ্ট হচ্ছে, আয়ু ক্ষয় হচ্ছে, প্রভৃতি ব'লে অভিযোগ করছেন যাঁরা, তাঁরা তা'র প্রতীকার করবার চেষ্টা করছেন না কেন, এ প্রশ্ন করলে, তা'র উত্তর কি? সকাল-বৈকালে চা-পান, অসময়ে অনিয়মিত আহার, দোকান, জরুদা, কিমাম্ প্রভৃতির ব্যবহার, থিয়েটার সিনেমায় যাতায়াত, যা-তা কেশ-তৈল ব্যবহার, ঘর-সংসারের কায়-কর্ষ্য তেমন ভাবে না-করা, শরীর চালনার অভাব, বিলাসিতার অত্যাচার, আহার ও নিদ্রায় অবিমূঢ়্যকারিতা বন্ধ হয় যদি, স্বাস্থ্যোন্নতি হ'তে বড় বেশী বিলম্ব হয় না। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, ভেজাল খাদ্যাদি এবং অস্বাস্থ্য অনেক জিনিষ দেশে বাড়িয়ে দিচ্ছে টা'বর উপদ্রব। পৌর-সভা বা রাজ-দরবারে অভিযোগ করলেই স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া যা'বে না যে, একথা খুব সত্য। কেউ দয়া ক'রে কিছু করেন, ভালই। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল রাখা'র বার-আনা উপায় যে আমাদের নিজেদের হাতে, সে কথা ভুললে

চলবে না তা!। সহর, সহরতলী, স্থূর পরীয়াংমা ভাগ্য এক সূত্রেই গাঁথা।

যে সকল স্বস্তর-শান্ত্রী অস্বাস্থ্যরূপে বধু নির্ধাতন করেন, যাঁরা কল্পাপক্ষকে লাজিত, অপমানিত করবার নিত্যমুতন কৌশল উদ্ভাবনে নিয়ত রত, তাঁদের রীতিমত শিখা দেওয়া এবং শাসন করবার ভার গ্রহণ করবে কে, সেই কথাটা খুব জোরের সহিতই আমরা জিজ্ঞাসা করি। এ শাসনের জন্ত আইন আছে অবশ্য। কিন্তু সমাজ-শাসন তা'র উপর। সে শাসনের শৈথিল্য হয়েছে ব'লেই এ বিংশ শতাব্দীতেও অনেক সংসারে এই অত্যাচার চলছে। এ অত্যাচার বন্ধ না হ'লে দেশের মঙ্গল হ'তে পারেনা কিছুতেই। এই কথাটা মনে রেখে দেশের লোককেই এর উপায় নির্ধারণ করতে হ'বে। পাষণ্ড-দলনের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে খুবই।

বড়বাজার, হারিসন্ রোড, মেছুয়াবাজার, চীৎপুর, ক্যানিং ষ্ট্রিট, বহুবাজার, শিয়ালদহ প্রভৃতি স্থানে ফুটপাথে চলাই একপ্রকার দায় হ'য়ে উঠেছে। কোন্ অধিকারে কাদের হুকুমে ফুটপাথের উপর বাজার বসে, ক্রয়-বিক্রয় হয়, অসম্ভব রকমের ভীড় জমে, তা'র উত্তর দিবে কে? রাস্তাবন্দী করার অজুহাতে ঠেলাগাড়ী, রিক্সাওয়াল প্রভৃতি ত প্রায় নিত্যই পুলিশ-আদালতে জরিমানা দিয়ে আসে; কিন্তু এই ফুটপাথের উপর ব'সে সওদা বিক্রয়ের অভিযোগে যাঁদের বিশেষ দণ্ড হওয়া উচিত, তাঁরা কোন্ মন্ত্র জপ ক'রে তা থেকে অব্যাহতি পায়। কোলের বাজারের সম্মুখে সেদিন সন্ধ্যার পর একটা ভীষণ দৈব-দুর্ভিক্ষক হবার উপক্রম হয়েছিল। তিনজন মুটের ঘাড়ে ছিল একটা মন-আড়াই ওজনের প্রকাণ্ড বোঝা। একজন মহিলা যাচ্ছিলেন সেই পথ দিয়ে। মুটের দল সেই মোট মহিলাটির ঘাড়ের উপর ফেলেছিল আর কি? বাজার-

কর্তৃপক্ষ, পুলিশ-কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপ্যাল-কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে কি বলতে চান, সেটা শুনবার জন্ত সাধারণের বেশ একটু কৌতুহল আছে। ভো ত্রিপক্ষ, কৌতুহল নিবারণের আজ্ঞা হয়।

গঙ্গায় ষাঁড়াষাড়ির বান ডাকে ভাদ্রমাসে; কিন্তু কলিকাতার পথে ষণ্ড দলের দম্ভ চলে নিত্য, তাদের দণ্ড দিবার উপায় নাই। এই অভিভাবকহীন বেওয়ারিস ষণ্ডবৃন্দ শঙ্কাহীন হয়ে রাজপথে বিচরণ করেন অবাধে। অমরক উপস্থিত হ'লেই প্রহ্লাদ চরিত্রের অভিনয়। এমনটা চলতে পারে না রাজপথে। এ অভিনয় “প্রসক্রাইব” করার বিশেষ আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। না করলে পথবাহীদের পথ চলায় বিপদ যে অনেক।

কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরল এইবার। বড় বড় কথা ব'লে দলগড়া হয়ত সহজ, কিন্তু সেটাকে রক্ষা করা ভারী কঠিন। স্মার স্বরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত দেশাত্মবোধের ঋষিকে অপমানিত লাজিত ক'রে ষাঁরা গর্বি অহুভব করেছিলেন, তাঁদের অহুতাপ করবার দিন আগত প্রায়। প্রায়শ্চিত্তের কড়ি গ'ণে দিতে হ'বে এইবার। দেশের দুর্ভাগ্য এবং দুর্দিন।

বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা জনপ্রিয়, প্রিয়দর্শন লড ব্রোবর্গ মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে মরণাম ত্যাগ করেছেন। আটত্রিশ বৎসর বয়সে বোম্বাইয়ের গভর্ণর হয়েছিলেন তিনি। রাজ-প্রতিনিধি লড লিনলিথগাউ কিছুদিনের জন্ত যখন বিলাত যাত্রা করেন, লড ব্রোবর্গ তখন অস্থায়ীভাবে রাজ-প্রতিনিধির কার্যনির্বাহ ক'রেছিলেন স্বেচ্ছাক্রমেই। তিনি ছিলেন দরদী, কর্মক্ষম, রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ রাজপুরুষ। সহৃদয়তা ও মানবতার শক্তিতে তিনি হ'য়েছিলেন আদর্শ শাসন-কর্তা। ঋায়-ধর্ম্যে প্রজাস্ব স্ব রক্ষা করার চেষ্টাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর মিষ্ট ব্যবহারে প্রজাপুঞ্জ সন্তির নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেয়েছিল। এমন মহামানবকে হারিয়ে ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ শোকে মুহমান। সরোজ-নলিনী-এসোসিয়েশনকে লেডী ব্রোবর্গ অত্যন্ত স্নেহের

চক্ষেই দেখে থাকেন। এই সেদিন মাত্র লেডী ব্রোবর্গ আমাদের বাৎসরিক সম্মেলনে কত আশার বাণীই দিয়ে গেছেন। আজ তাঁকে সান্তনা দিবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। শোক-সন্তপ্তা লেডী ব্রোবর্গ এবং তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি আমাদের সম্রদ্ধ সহানুভূতি জ্ঞাপন করি; “মানস-কুঞ্জের” কবির ভাষায়—

মহানু দৈব যদি কভু লোপ পায়,

তবেই মরণ, নহে মরণ কোথায়।

বাংলার লোক হে কেমন গুণগ্রাহী, স্নেহ-প্রীতি-সদাশয়তা ও মহানুভবতায় কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ হয়, তা'রা তা'র পরিচয় দিয়েছে বাংলার শাসন-কর্তা লড ব্রোবর্গের অকাল মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হ'য়ে এবং মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রায় দলে দলে যোগদান ক'রে। সেন্টপল ক্যাথিড্রালে বিগতপ্রাণ রাজপুরুষের দেহ যখন রাজ-সম্মানে শয়ান ছিল, বাংলার সহস্র সহস্র ধনী-নিধন শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ মরণ-রথের রথীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ক'রে এসেছে। শহরের স্কুল, কলেজ, আফিস-আদালত, ব্যবসায়-ক্ষেত্র, দোকান-পাট প্রভৃতি বন্ধ হ'য়ে গিয়াছিল শ্রেষ্ঠ মানবের পরপারের যাত্রী হ'বার সংবাদ পাওয়া মাত্রই। বাঙ্গালীর মনস্তত্ত্ব রাজার জাতি অনবগত নয়। সকল রাজপুরুষ যদি ব্রোবর্গের প্রদর্শিত-পথ অনুসরণ করেন, তবে বাংলার প্রীতি, বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা তাঁদের অর্জন করতে বিলম্ব হয়না এত-টুকুও। এই আদর্শ ও প্রেরণাতে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায় আগামীকালে অহুপ্রাপিত-হোন, দেশ ও দেশের কল্যাণে এই আমাদের প্রার্থনা।

নাথ-ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দালাল স্বনামধন্য পুরুষ। সামান্য থেকে আরম্ভ ক'রে নাথ-ব্যাঙ্কে তিনি অসামান্যে দাঁড় করিয়েছেন বহু পরিশ্রম ও বুদ্ধি-বিবেচনার ফলে। চাকুরী না পেয়ে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে অথবা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে অক্ষম হ'য়ে, ষাঁরা হতাশ হ'ন, আমাদের পরম স্নেহভাজন ক্ষেত্রনাথের কাছে তাঁদের শেখবার জিনিস অনেক আছে। বন্ধু-



বাংলার সর্বজনপ্রিয় গভর্ণর পরলোকগত লর্ড ব্রাবোর্ণ

বাংসল্যও ক্ষেত্রনাথের অসাধারণ। দুহকে “সিন্ভার টনিকে” হুহু করার হাত-বশও ক্ষেত্রনাথের অসামান্য। এমন ক্ষেত্রনাথের কথা সবিতার সেদিন বিবাহ হ’য়ে গেল মহাসমারোহে। কলিকাতা শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই বিবাহ-বাসরে উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের কবিতাটা হুহুর উপভোগ্য ব’লেই সকলে গ্রহণ ক’রে-
ছিলেন। সে কবিতায় নাথ-ব্যাঙ্কের পাউণ্ড শিলিং পেমেন্টের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। ৬পুঁরীধামের বসন্তুফুমারী বিশ্বব্রহ্মে পাউণ্ড না হ’ক্ পেমেন্ট যদি বা দান করুবাবু ব্যবস্থা হ’ত, তবে বুঝ্তাম—কবিও ধন্য আর নাথ-ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং প্রোপাইটারও ধন্য। ঝাঁদের ঘরে নিত্য চলে কালিয়া-পোলাও, তাঁদের বেরিয়াল্ গ্রাউণ্ড অর্থাৎ উদর নামক গহ্বরে ও সকল জিনিস দিয়ে কিছু লাভ নাই। অনাথ অনাথারা কালিয়া-পোলাওয়ের আকাঙ্ক্ষা করে না, তাঁরা চায় কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার জন্ত সামান্য আহার, আর লক্ষ্মী নিবারণের জন্ত মোটা বস্ত্র। ক্ষেত্র ভায়া বিবাহ-ক্ষেত্রে শ্রীক্ষেত্র বসালেন, আর আসল্ শ্রীক্ষেত্রের কথাটা ভুলেই গেলেন! ইস, বেজায় ভুল! ভুল শোধরাবার মতি হোক ক্ষেত্র ভায়ার, এইটুকু ভগবানের কাছে প্রার্থনা। শুভকর্মে সদা পশ্চের জয় হোক, একথাটাও এই সঙ্গে ব’লে রাখি আমরা।

রায় বাহাদুর গোকুলচাঁদ বড়াল স্বর্গত হয়েছেন বহুকাল, কিন্তু তাঁর কীত্তির ঘোষণা আছে এখনো আর

থাকবেও সম্ভবতঃ আগামী কালে। বালিগঞ্জ লেকের ধারে “এণ্ডার্সন্ হাউসে” সেদিন আমরা তাঁর নাম প্রস্তব-কলকে খোদিত দেখে এলাম। গোকুল-ক্ষেত্রের বর্তমান অধিকারী পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ নির্মলচাঁদ বড়াল, ইচ্ছা করলে, পিতৃ-পদাঙ্ক অহুসরণ ক’রে পিতৃনাম অধিকতর উজ্জল কর্তে পারেন। সরোজনলিনী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বর্গত গোকুলচাঁদের যে যোগসূত্র ছিল, “বঙ্গলক্ষ্মী”কে তিনি যে প্রকার চক্ষে দেখতেন, সেই কথা আজ স্মরণ ক’রে নির্মলচাঁদকে আশীর্বাদ করি, পিতৃ-বশ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনিও যেন লোক-সমাজে সমাদৃত হ’ন। এই প্রসঙ্গে এণ্ডার্সন্ হাউসের একটু পরিচয় দাই। ইহা সস্তরণ-শিক্ষার স্থান। লেকের জল ও ফুলের ফসল স্থানটির সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করেছে। জলমগ্ন হওয়ার দায় থেকে রক্ষা পাওয়া ও জলমগ্নদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। এ সৃষ্টিতে খুব বেশী হাত, লেফটেনেন্ট কর্বেল কে, কে, চ্যাটার্জীর। বড়ালের হস্তও অল্প কর্মঠ ছিল না। এখন এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন অনেকেই। মহিলাগণের জন্ত এ প্রতিষ্ঠানে প্রকার আসন আছে, কিন্তু সস্তরণ-শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয় না নানা কারণে। এ প্রথা প্রশংসনীয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে লেফটেনেন্ট কর্বেল চ্যাটার্জী “জল-প্রাবন” উপন্যাসখানি পাঠ ক’রেছিলেন বোধ হয়। কবিও সাহিত্য-স্রষ্টা ঋষি বিশেষ। দূরদৃষ্টি তাঁদের অসাধারণ!



ডাঃ শ্রীমতী ফুলরেণু দত্ত ডি, লেট, (প্যারিস)

কেন্দ্র সমিতির কথা

প্রচার কার্য :—

আলোচ্য মাসে কেন্দ্র সমিতির মহিলাকর্মী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ খিদিরপুর ২৫ নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী উপলক্ষে মহিলা দিবসে বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই মাসেই প্রচারক শ্রীযুক্ত স্বধীরলাল সরকার কেন্দ্র সমিতি হইতে কিছু শিল্প দ্রব্য লইয়া হেতমপুর প্রদর্শনীতে গমন করেন।

আরামবাগে একটি প্রদর্শনী উপলক্ষে আহুত হইয়া শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ তথায় গমন করেন, মহিলা দিবসে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া—সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যধারা এবং সম্ভবত্ব ভাবে মহিলাদের কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী এই মাসে মেদিনীপুর জিলার মুগবেড়িয়া এবং চন্দ্রকোণা গমন করেন। এই দুই জায়গায়ই ২টা প্রদর্শনীতে বোগদান করিয়া কুটীর শিল্প ও সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। মুগবেড়িয়ার ‘বেবিশোর’ পুরস্কার বিতরণ সভার সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

এতদ্ভিন্ন মালদহ জেলার চাঁচল গ্রামে একটি প্রদর্শনীতে কেন্দ্র সমিতি হইতে নানাবিধ শিল্প দ্রব্য পাঠান হয়।

বিবিধ :—

স্বরমা ভ্যালি মহিলাসমিতি—সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির স্বরমা উপত্যকাস্থিত মহিলাসমিতি সমূহের অরগানাইসিং সেক্রেটারী শ্রীযুক্তা শৈলবালা বিশ্বাস জানাইয়াছেন যে আসাম গভর্নমেন্ট মহিলাসমিতির প্রচার কার্যের জন্য ৫০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন; সম্প্রতি জগদীশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে উক্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি প্রদর্শনী হইবে। মাননীয় লেডী রিডকে উক্ত প্রদর্শনীর

দারোদ্রাটন করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। উক্ত সাহায্য প্রদর্শনী কমিটির হস্তে গ্রাস্ত করা হইয়াছে।

সৈয়দপুর মহিলা সমিতিতে ব্রতচারী প্রতিষ্ঠা দিবস

১২ই ফেব্রুয়ারী সৈয়দপুর মহিলা সমিতিতে ব্রতচারী প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান হয়।

১। পূর্বাঙ্কে :—

- সঙ্গীত { (১) আগুয়ান বাংলা
(২) শা—খ—বা
(৩) নৃত্যালি।
(৪) সমিতির প্রাঙ্গণের দুর্কীঘাস ইত্যাদি যথাসম্ভব ঝাড়ু দেওয়া।

২। অপরাঙ্কে—মহিলা সম্মেলন :—

- ১। প্রার্থনা-গীতালি—“হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রে বাজিল কোন্ স্বর”—কোরণ গান।
২। গুরুজীর চিঠিপাঠ।
৩। গুরুজীর প্রবন্ধ পাঠ।
৪। ব্রতচারী নৃত্য ও গীত—চল, আয় থেলি
“ ” —জারি
“ ” —মায়ের জাতির মুক্তি দেবে।
“ ” —তারার মোদের সবার প্রিয়।

৮। শেষ সঙ্গীত—সভা যখন ভাঙবে তখন ইত্যাদি।

৯। বালিকাদের অগ্রাহ্য নিয়োগ—

অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ বালিকা ও মহিলা সমিতির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদিকার জন্মপনা

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত স্বভাব চন্দ্র বসুর অস্থিত্যের সংবাদে আমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছি। এই সকল সন্তান ছাড়া আমাদের সম্বল আর কি আছে! ভগবান তাঁকে রোগমুক্ত করুন, সুস্থ করুন ও দীর্ঘ জীবন দিন, একমনে এই প্রার্থনা করছি।

অন্ধ শিক্ষালয়

গত ১১ই মার্চ, শনিবার, অন্ধ শিক্ষালয়ের বাৎসরিক উৎসব দেখতে গিয়ে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করে এসেছি। প্রকৃতির প্রসাদে বঞ্চিত চক্ষুহীনরা এই সব সন্তানদের বেদনায় ব্যথিত না হয়ে থাকতে পারে কে! চক্ষু দিতে কেউ পারবে না কিন্তু ভালবাসা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে এদের জীবনকে যথাসম্ভব সহজ, সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলার জন্য এই শিক্ষালয়ের চেষ্টা, উদ্যোগ, মনুষ্যোচিত ধর্মপালনের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই কর্মের সঙ্গে ধর্ম জড়িত আছে বিশেষভাবে। এই প্রতিষ্ঠানের

কর্মীগণ ও দাতাগণের মহাপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্ধ বালকদের নাচ, গান, আবৃত্তি, ব্যায়ামকৌশল সুন্দর হয়েছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নূতন সঙ্গীত

পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে সম্প্রতি অল্প নূতন গান রচনা করছেন। তাঁর গানের পরিচয় জগৎবিখ্যাত, তবুও এই নূতন গানগুলিতে যেন নূতন প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। নূতন রসের বহু প্রবাহিত হয়েছে। দেশবাসী নূতন রূপে নূতন রসে সুন্দরের সাক্ষাৎ পাবেন অবিলম্বে।

ব্রতচারী-সংবাদ

ব্রতচারীর চর্চা দিনে দিনে গ্রাম সহর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই এখন ব্রতচারী শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। সহরের নানাহান থেকে ব্রতচারী শিক্ষার জন্য মেয়েরা এসে ব্রতচারী শিবিরে ভর্তি হচ্ছে। সকলের মধ্যে ব্রতচারী আনন্দ জাগাচ্ছে—এটি সুসংবাদ।

মহিলা-সমাচার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক প্রাপ্তা ছাত্রী

এই বৎসরের সমাবর্তন উৎসবে এগারটি মহিলা গ্র্যাজুয়েট পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ বৎসরই “ভূবন মোহিনী” পদক প্রদত্ত হইবার কথা ছিল। নির্বাচন মণ্ডলী কোন মহিলাকে এই জন্য নির্বাচন করেন নাই।

কুমারী কমলা দেবী (বাগচী) বিএ মহিলা গ্র্যাজুয়েট দ্বারা বঙ্গভাষায় লিখিত সর্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য ‘মোক্ষদা’ সুন্দরী স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইলেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সরকারী কনট্রাক্টার মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী নীহার দাস গুপ্ত বিএ গৃহিণীর কর্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া ‘নগেন্দ্র নন্দিনী স্বর্ণ’ পদকটি পাইলেন।

এম, এ পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হিন্দু ছাত্রী শ্রীমতী বিন্দু বাসিনী দেব এম একে “কমল রাণী” স্বর্ণ পদক প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি ‘চন্দ্রনাথ’ ও “অন্নপূর্ণা” স্বর্ণ পদকদ্বয় ও লাভ করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

শ্রীমতী অসিমা মুখার্জী এম এস সি বর্তমান বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রী বলিয়া ‘যোগমায়া’ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উনিভার্সিটী হইতে প্রদত্ত স্বর্ণ পদক, দর্শনে নলিনী চক্রবর্তী ও ইতিহাসে জ্যোতিষ্ময়ী বসুকে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গলা রচনা লেখাতে ‘বন্ধিম চন্দ্র স্বর্ণ পদক’ শ্রীমতী মলিনা দস্তিদার বিএ চট্টগ্রামকে প্রদত্ত হইল।

বিএ পরীক্ষায় বঙ্গদেশবাসী সর্বশ্রেষ্ঠা বাঙ্গালী ছাত্রী আশা গদ্বোপাধ্যায়কে (আশুতোষ) “পদ্মাবতী” স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত আশুতোষ কলেজের ছাত্রী মণিকা চক্রবর্তী বিএ দর্শনশাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠা ছাত্রী হিসাবে ‘গঙ্গামণি’ স্বর্ণ পদক পাইলেন।

বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা ছাত্রী শ্রীমতী রমা সরকার বিএস সি (স্কটিস) স্বর্ণখচিত রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইলা গুপ্ত বিএ “সুজাতা” পদক পাইলেন।

রাঁচী নারী সমিতির বার্ষিক উৎসব

“সরোজনলিনী স্মৃতিদিবসে”

বাঁচী স্মৃতি-বাসরে আজ আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্ত সমবেত হয়েছি, সেই পুণ্যময়ী স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দেবীর নাম আজ কেবল বাংলা দেশেই আবদ্ধ নয়, বাংলার বাইরেও এই মহীয়সী মহিলার চিন্তাধারা মহিলা-দিগের কাঁধাধারার মধ্যে বিকাশ লাভ করে সফলতাব পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং সরোজনলিনীর নামে সর্ব্বলোকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করে ধৃত হচ্ছেন। শিক্ষিতা ভগিনীগণ, তাঁর বাণী, তাঁর কর্ম্মপ্রেরণা গ্রামে গ্রামে প্রচারের ভার নিয়ে, মহৎ উপকার করেছেন।

সরোজনলিনী জন্ম নিয়েছিলেন বাংলা দেশে, যেমন আমরা দশজন জন্মগ্রহণ করেছি, তেমনই করেই। কিন্তু অতুলনীয় চরিত্র-গরিমায় বিকশিত যশঃসৌরভে, তিনি আমাদের দশজনকে অতিক্রম করে, শত শত, সহস্র সহস্র নারীর বহু উর্দ্ধে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং আজ মৃত্যুর পরপারে থেকে আমাদের অন্তর্লোকে কল্যাণী দেবীর মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

মনে পড়ছে—

“জীবনটি তো নয়কো শুধু ফুলের মত ফোটা,

ফলের সঙ্গে নিত্য তাহার যুক্ত থাকে বোঁটা।”

এই সৌরভযুক্ত ফুলটি কেবল ফণিকের বিকশিত শোভায় দর্শকের চক্ষু মনের তৃপ্তি সাধন করেই বারে পড়েনি, তাঁর অন্তরে জ্বললাভ করেছিল সেই ফল, যা কল্যাণ-প্রসারী।

তিনি দেখে যেতে পারেননি, তাঁর সেই স্বহস্ত রোপিত গাছটি আজ শাখাপ্রশাখা মেলে বাংলার গ্রামে গ্রামে আত্মবিস্মৃতা অসহায় অবিচার-প্রপীড়িতা নারীজাতিকে কি স্বাবলম্বী করেছে, কিভাবে আত্মশক্তিতে সচেতন করে তুলেছে, কেমন করে তাঁদের শান্তি ও তৃপ্তির ছায়াপথ নির্দেশ করছে।

আমরা বখন সামান্য পদগৌরবের আভিজাত্যে দরিদ্র

আত্মীয় স্বজনকেও তুলে থাকবার চেষ্টা করি, তখন যদি আমরা এই দরদী নারীর জীবনী আলোচনা করি, কি দেখতে পাব? উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর কত্যা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর পত্নী সরোজনলিনী; আপনার দরিদ্র প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে ঘুরছেন। ঘরে চেয়ার নাই, আসন নাই, দাওয়ায় ধুলার মাঝে বসে তাদের সাংসারিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন, তাদের ধূলো মাটি মাখা ছেলেগুলিকে আদর করে কোলে তুলে নিচ্ছেন, স্বহস্তে স্নান করিয়ে দিয়ে আসছেন। গৃহিণী সঙ্কুচিত, কুণ্ঠিত, ভীত, সরোজনলিনী হাসিমুখে সহজ আলাপে সে কুণ্ঠা দূর করছেন।

অথচ সেই গল্প বলার ছলে, শিক্ষার বীজ তাদের অন্তরে রোপণ করছেন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে যে নারী আপনার প্রয়োজন বিহীন জীবন যাপন করে, মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁদের মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয় করছেন।

এই ভাবেই ধীরে ধীরে তাঁরা নূতন আলোর রশ্মি দেখে, নূতন আশায় উৎফুল্ল হয়ে উন্মুখ হয়ে দাঁড়ালেন নিজেদের উন্নতির চিন্তায়। তাই আজ আমরা দেখতে পাই, আপনার শক্তি অর্জন করবার, আপনাকে জাগ্রত করবার যে শিক্ষা তিনি দিতে চেয়েছিলেন, বাংলার মেয়ে তাকে পূর্ণভাবে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন।

মনে পড়ে, সরোজনলিনীর স্বামী শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম “আপনি যে বলেন প্রতি কাজেই আপনার স্ত্রীর ইঙ্গিত পান, আপনি কি ভাবে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেন!” তিনি উত্তর দেন, “আপনি আমার চোখের সামনে বসে আছেন, তিনি পরপারে—তথাপি এই মুহূর্তেও আমি আপনার চেয়েও তাঁকে বেশী প্রত্যক্ষ করছি।”

তখন এই কল্যাণময়ী নারীর উদ্দেশে মাথা নত করলাম, মনে হলো সার্থক জীবনলাভ করেছিলেন সতী! তাই

ওপারে থেকেও এপারের কল্যাণ কামনা ভোলনি, এমনি করে ইচ্ছিত পাঠাও জগতের কল্যাণ কামনায়।

আমরা বলি তিনি দেখে যাননি, কিন্তু মনে হয়, বলি যে তিনি অবশ্যই দেখেছেন তাঁর সাধনাকে সফল করে তুলতে, নানাবিধ নারী কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করে মেয়েদের অধ্যাত জীবনকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দিতে এই মহাপ্রাণ, প্রেমময় স্বামীর কি আগ্রাণ চেষ্টা, কি স্বার্থ-ত্যাগ!

তাইতো বলতে ইচ্ছা হয়—

“এনেছিলে সাথে করে

মৃত্যুহীন প্রাণ—

মরণে তাহাই তুমি

করে গেলে দান।”

এই অমর আত্মার আশীর্বাদধারা নেমে আসুক আমাদের মধ্যে, আমাদের জীবনের সামনে রয়েছে অনেক সমস্যা, তার সমাধান আমাদেরই করতে হবে, অনেক কর্তব্য পালন করতে হবে, আমাদের বাঁচতে হবে আনন্দ সম্ভোগের মধ্যে, উঠে দাঁড়াতে হবে আত্মশক্তি নিয়ে, নিজের মহিমায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দেশের নারী-শক্তিকে জাগ্রত করবার আহ্বান এসেছে আমাদের।* পিছনে পড়ে থেকে দেশকে, সমাজকে পছুরাধার লজ্জা আর আমরা বহন করব না, এই হোক আমাদের সাধনা।

মাণিকগঞ্জ মহিলা সমিতি

স্বথের বিষয় কেন্দ্র সমিতির অল্পমোদনানুসারে মাণিকগঞ্জ মহিলা সমিতিতে ১১ই জানুয়ারী হইতে প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত ১০টি পেশাদারী ধাত্রী নিয়া দাই-ট্রেণিং ক্লাস খুলিয়াছেন, প্রত্যেক ধাত্রী নিয়মিত তারিখে উপস্থিত হইয়া আগ্রহের সহিত ডাক্তারের লেকচার শুনিতেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে কঠিন ডেলিভারী কেসেও ধাত্রীরা যোগ দিতেছেন ও অনেক ভদ্রমহিলা ক্লাশে আসিয়া ডাক্তারের উপদেশ শুনিতেন।

১৭ই জানুয়ারী মাণিকগঞ্জ মহিলা সমিতির নিজস্ব একখানা গৃহের জন্ত সমিতির মেয়েরা টিকিট করিয়া ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ অভিনয় করিয়াছে। অভিনয়টি এত সুন্দর হইয়াছে যে স্থানীয় লোক কেহই আশা করিতে পারে নাই যে ষ্টেজে পাঁচ ছয়শত লোকের মধ্যে ছোট ছোট মেয়েরা এমন এ্যাক্টিং করিতে পারিবে। অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া আই, সি, এস, মেমোন সাহেব মহোদয় ৬টি প্রাইজ, সম্পাদিকা ১টি প্রাইজ, ৪টি মেয়েকে দান করেন। টিকিট ৬৩ টাকা বিক্রয় হইয়াছে। তন্মধ্যে খরচ বাবদ ৩০ টাকা গৃহের জন্য রাখা হইয়াছে।

আই, সি, এস মেমোন সাহেব মহোদয় মাণিকগঞ্জ মহিলা সমিতির একখানা গৃহ তৈয়ার করিয়া দিবার জন্য

প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সমিতি ও তাঁহার কাছে অনেক আশা করিতেছিল কিন্তু সমিতির নিতান্ত দুরবস্থা হইয়াছিল। তিনি হঠাৎ বদলী হইয়া গেলেন। দায়িত্ব সমিতির গৃহের জন্য তিনি ৭০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এ দান উল্লেখযোগ্য। সমিতির দুরবস্থা কৃতজ্ঞ।

৩০ শে জানুয়ারী স্থানীয় একজিবিশনে মহিলা সমিতির একটি শিল্পের ষ্টল খোলা হইয়াছিল। ষ্টলে কলার, মেয়েরা সিকা, কামা, আচারও দিয়াছিল। সমিতির ষ্টল, অন্যান্য ষ্টল হইতে অনেক সুন্দর বস্তু কেনা। এগজিবিশন কমিটি হইতে প্রাইজ মেডেল, সার্টিফিকেট অনেক পাইয়াছে।

৩রা ফেব্রুয়ারী মহিলা সমিতির আনন্দ মেলা অনুষ্ঠিত হয়; এবারকার মেলা অন্যান্য বার হইতে কিছু বেশী হইয়াছে, স্বথের বিষয় ভদ্র জমিদার গৃহিণী ও তাঁহার পরিবার একই সঙ্গে মিলিয়া দোকান করিয়াছেন। মেলায় অভিনব দৃশ্য হইয়াছিল, বেচাকেনাও যথেষ্ট চলিয়াছে। তেওঁথার জমিদার শ্রীযুক্ত হেমশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের পত্নীর খাবার বাহা বিক্রয় হইয়াছিল সমস্তই মহিলা সমিতিতে তিনি দান করিয়া গিয়াছেন, এজন্য সমিতি কৃতজ্ঞ।

সন্মিলনীর টান

শ্রীপ্রতিভা দেবী

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে;
অতুলনা কবিতায় তাঁর কবিগুরু স্নর্কোশলে
যৌবনেতেই প্রশস্ত তা, জানিয়ে দেছেন ছন্দে নানা;
চাল্লিশোর্ধ্বে কি করিবে এটা কিন্তু যায় না জানা।
সম্প্রতি যে সেই কথাটা মনের মাঝে দিচ্ছে উষ্ণ,
জমার অন্ধে শূণ্য বেশী, বেশী দিন আর নেইক বাকী;
যাচ্ছে দেখা নেইক দেবী শাস্ত্রমতেও বনে যাবার,
উচিত তো হয় তার আগেতেই মনের বাতিক মিটিয়ে নেবার
কি জানি কি ভাগ্যে আছে? আমার তরে চক্রে পাক্কে
যদিই সেধা বনের কোকিল মূর্ছ'মূর্ছ' নাই বা ডাকে,
চাঁদের আলো না দেয় ধরা, বকুল যদি নাই বা ফুটে,
দখিণ হাওয়ায় কানাকানি শিউরে যদি নাই বা উঠে।
মন-বিহগী উড়ু উড়ু পিঁজরা মাঝে,—ভাগ্যে তখন
সন্মিলনীর পক্ষ হতে, গোঁহাটীতে এ নিমন্ত্রণ,
ধুমায়িত বহ্নিকুণ্ডে ইক্ষন সে জুগিয়েছিল;
সাতশো মাইল দূরের নেশা রূপ ধরিয়ে মুষ্টি নিল।
কিন্তু তবু থাকে বাধা, পথের সাথী আছেন দূরে,
কাজেই ঐ সাধ রইবে চাপা, মনের গহন অন্তঃপুরে
নব যুগের তরুণী নই, —সাবেক কালের নারীর মরণ,
চল্লিশেই হোক, পঞ্চাশেই হোক, একা হলেই অচল চরণ।
হল না আর নেইক উপায়,—এমন সময় ভাগ্য বশে,
আধুনিকা নব্যানারী হঠাৎ সেদিন উদয় এসে
চলুন, চলুন, যাচ্ছি আমি, যেতেই হবে, যাবেন নাকি?
লোভে পাপ ও পাপে মৃত্যু জানতে কারও নেইক বাকী
আমার কিন্তু ভ্রমনের সাধ — ভিন্ন তাহার পরিণতি,
সন্মিলনী সন্মোহিনী দুর্গিবার যে তাহার গতি।

বাঁধন বরফ গেল গলে, — শোনাগেল যখন শেষে
পারের কাণ্ডারী হতে, দেবনারায়ণ দেবতা সে,
স্বয়ং রাজী; —তখন কে কার রুদ্ধ করে আসাম পাহাড়,
সন্মিলনীর সাথে সাথে, দেবী কামাখ্যা আছেন আবার,
সাতশো মাইল যেতে যেতে উপরি পাওনা আর ও আছে,
পথের মাঝে পথিক বন্ধু হয়তো এসে মিলবে কাছে।
এতগুলি মধুর আশা, হাত ছানি দেয় পথের বাঁকে,
ঘরের বাধা আর কি তখন ঘরের কোনে বাঁধা থাকে?
তারই ফলে সাতশো সাতাশ, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল;
প্রয়াগ তীর্থ কামাখ্যাতে, কোলা কুল করতে এল।
এইতো আমার আসাম আসার ব্যাকুলতার ইতিহাস
যেতেই হবে দুদিন পরে, ফুরিয়ে যাবে আসাম বাস;
তবু যে এই প্রবাসী বোন ছুটে আসি বারে বারে;
দেশে দেশে বছর বছর; প্রবাসী ভাই-বোনের দ্বারে
মিলন মেলায় স্রীতির বাঁধন এমন করেই নিবিড় হয়,
মিলব আবার বছর পরে, মনে আশা জেগে রয়।
সাহিত্যের এ তীর্থ যাত্রা, ভাগ্য দেবের পরম দান,
দূরকে যে ভাই নিকট করে খুঁটিয়ে দেয় যে ব্যবধান।
সাহিত্যকে কেন্দ্র করে এই যে মোদের আনা গোনা,
সকলকারে আপন করি সন্মিলনীর এই সাধনা;
বিশ্বদেবের রহস্য সব এরই মাঝে লুকিয়ে আছে
তখনই হয় জীবন সফল; —বিশ্ব যখন মনের কাছে।
আজ আমরা পেয়ে গেলাম যে অমৃতের রসাস্বাদ,
বাঁধালীর মন জীবন ভরে, এ আনন্দ বজায় থাকে।*

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সন্মিলনে পঠিত।

বঙ্গলক্ষ্মী —



হিচিনপল্লী—গণপতি-মন্দির





চতুর্দশ বর্ষ

{ বৈশাখ, - ১৩৪৬ . }

৬ষ্ঠ সংখ্যা

গান

অসহন আমার অসহন
 এতদিন তারে বুঝিলে নাহি কি,
 দিন চল মোহে মূগ্ধতা।
 শুধু যার কাছে থাকিলে,
 অসহন আমার চাকিলে,
 তোমার মোহেই বুঝিলে।
 যে মোহে ফিরে আসিবার
 যে মোহে থাকিবে কাছে,
 তাহার প্রাণে বেদনার আর
 আমার মনে আছে
 এ বিহীন অসহন আর
 নাহি না কেমনে বুঝিলে,
 তোমারই শুধু মত/মোহেই বুঝিলে।

বিস্ময়ান্বিত

শঙ্কর-বেদান্তে 'বিজ্ঞানবাদ

শ্রীহীরেঙ্গনাথ দত্ত

দার্শনিক দৃষ্টি বিবিধ—এক বাস্তববাদীর দৃষ্টি, অন্য বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টি। পাশ্চাত্যে বাস্তববাদের নাম Realism ও বিজ্ঞানবাদের নাম Idealism.

Realism in metaphysics, as opposed to Idealism, is the doctrine that there is an immediate or intuitive cognition of external objects; while according to idealism all we are conscious of is our ideas. According to Realism, external objects exist independently of our sensations or conceptions; according to Idealism, they have no such independent existence.—The Modern Cyclopaedia, vol. vii, p. 143.

এই বিবাদস্থলে মোট কথাটা এইরূপ:—এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব প্রতিক্ষণ আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে, ইহা কি সত্য না অলীক—ইহার কি বাস্তবিক সত্তা আছে কিহা ইহা 'বিজ্ঞান' বা Idea মাত্র? যাহারা বাস্তববাদী—Realists, তাঁহারা বলেন—জগতের যেকোন ভাগ হয়, উহা ঠিক সেই প্রকারই।

কিন্তু এ মত কি যুক্তিসহ? আমরা জবাফুল লাল দেখি—আকাশ নীল দেখি—কিন্তু তাহারা বস্তুতঃ কি তাই? সেইজন্ত পাশ্চাত্য দর্শন 'Primary' ও 'Secondary' qualities—মুখ্য ও গৌণ গুণের প্রভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। বর্ণ, গন্ধ, শব্দ—এ সকল গৌণ গুণ এবং আকার, সংস্থান প্রভৃতি মুখ্য গুণ। বুঝিয়া দেখিলে কিন্তু এই মুখ্য-গৌণের প্রভেদ আপেক্ষিক মাত্র—মৌলিক নহে। অতএব পশ্চিমের দার্শনিকেরা Phenomenon ও Noumenon এর ভেদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। Phenomenon—ব্যাবর্ত—উহা appearance মাত্র—উহার তাত্ত্বিক সত্তা নাই।

ব্যাবর্তের পশ্চাতে পরমার্থ—যাহাকে দার্শনিকপ্রবর কান্ট (Kant) 'Thing in itself' (Ding an sich) বলিতেন।

হারবার্ট স্পেন্সরের বিখ্যাত 'Transfigured Realism' এই মতের অল্পরূপ। তাহার সারকথা এই যে, জ্ঞান যেকোন আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সে তাহার প্রকৃত রূপ নহে। জ্ঞানের স্ব-রূপ পরিবর্তিত (transfigured) হইয়া phenomena রূপে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাহার পশ্চাতের noumenon সর্বদা আমাদের অজ্ঞাত থাকে। ইহাও বাস্তববাদ—তবে বিশিষ্ট বাস্তববাদ।

আর বিজ্ঞানবাদ কি? বিজ্ঞানবাদের সার কথা এই যে—'নাতি অর্থঃ বিজ্ঞানবিসহচরঃ' অর্থাৎ বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব নাই। এক কথায় স্বাতন্ত্র্যং বৎ প্রতীয়ত (ভাগবত), অর্থাৎ বস্তু নাই—অথচ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে—'It is a matter of seeming'—'প্রতীতিমাত্রমেবৈতদ্ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্ × ×' অর্থাৎ 'Its esse is its percepi'।

সূর্য্যরশ্মিতে জলভ্রম—ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রশ্মিতে ত আর জল নাই—অথচ ঐ স্থলে জলের ভাণ হয়। এইরূপ জলভ্রমকে মরীচিকা বলে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেন—

যথা চ মৃগতৃক্ষিকোদকাদীনাং উষাদিত্যোহনন্তঃ দৃষ্টনষ্টস্বরূপাঃ স্বরূপেণাহুপাখ্যাতাঃ।

ইয়ুরোপে এই মরীচিকার নাম Mirage বা Fata Morgana.

এ সম্পর্কে Tissandar তাঁহার 'Popular Scientific Recreations' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন, —The mirage or Fata Morgana is a very curious but sufficiently common phenomenon and in the Asiatic and

African plains it is frequently observed.

* * The Fata Morgana and the inverted images of ships at sea are not uncommon on European coasts. Between Sicily and Italy, this effect is seen in the sea of Riggio with fine effect. Palaces, towers, fertile plains with cattle grazing on them, are seen with many other terrestrial objects upon the sea—The Palaces of Fairy Morgana, p. 649.

অন্ধকারে রজুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, আলোকে শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়,—মরীচি বা স্ব্যারশ্মিতে সেইরূপ ঐ মরীচিকাত্মক। ইহার দার্শনিক নাম ‘অধ্যাস’—অধ্যাসো নাম অতশ্মিন্ তদ্বৃদ্ধিঃ (শঙ্কর)। উহা মিথ্যা-জ্ঞান-বিজুষ্টিত। এই অধ্যাসের নামান্তর ‘বিবর্ত্ত’।

অতঃপরে ইত্থা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যাদ্যন্তঃ।

‘বস্তুর স্বরূপের প্রচ্যুতি না হইয়া অতঃপরে যে ভাণ, তাহাকেই বিবর্ত্ত বলে।’

যাহাকে হিপনটিজম (Hypnotism) বলে, সেখানেও আমরা এই অধ্যাসের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কোন ব্যক্তিকে হিপনটিক্—নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া হিপনটিষ্ট সঙ্কল্প শক্তিদ্বারা (by mere suggestion) সহজেই তাহার নানাভ্রম (Hallucinations) উৎপাদন করেন। দেখা গিয়াছে, তিনি ঐরূপ নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলিলেন—‘একটা প্রকাণ্ড সিংহ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে’—সে অমনি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অতি রৌদ্রের সময় বলিলেন,—‘আজ বড় শীত’,—সংকল্পমাত্রে সে অমনি শীতে কাঁপিতে লাগিল। আকাশে মেঘের সম্পর্ক নাই, তিনি বলিলেন—‘মুহুরধারে বৃষ্টি পড়িতেছে,’ সে অমনি ধারাহতের অভিনয় করিতে লাগিল। এ সকলই সংকল্প-শক্তির অঘটন-ঘটন-পটুত্ব। ঐ স্থলে হিপনটাইজম্ ব্যক্তি যাহা দেখে বা শুনে তাহা বিজ্ঞানমাত্র। লক্ষ্য করা উচিত যে, যে সমর্থ যাদুকর সে দর্শককে hypnotic নিদ্রাচ্ছন্ন না করিয়াও তাহার মনে ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে। শুধু একজন নয়, সমবেত দর্শকমণ্ডলীর

সকলেরই মনে একটা সর্ব-সাধারণ ভ্রম বা collective hallucination উৎপাদন করিবার দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নহে।

বান্দালা হইতে, একদল যাদুকর একবার দিল্লীতে গিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ ও তাঁহার পরিষদবর্গের এইরূপ ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর আত্মজীবনচরিতে সে ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

They produced a man whom they divided limb from limb, actually severing his head from the body. They scattered these mutilated members along the ground and in this state they lay for some time. They then extended a sheet or curtain over the spot, and one of the men putting himself under the sheet, in a few minutes came from below, followed by the individual supposed to have been cut into joints, in perfect health and condition, and one might have safely sworn that he had never received any wound or injury what ever—Memoirs of the Emperor Jahangir by Major David Price.

যাহাকে Rope-trick বা শূন্তমার্গে সূত্রকৌড়ী বলে, উহা ঐ ধরণের যাদুকরী। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ১১১১৭ ব্রহ্ম সূত্রেব ভাষ্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—

যথা মায়াবিনঃ চর্য্যভঙ্গধরাং সূত্রেণ আকাশম্ অধি-
রোহতঃ স এব মায়াবী পরমার্থরূপো ভূমিষ্ঠোহস্তঃ।

এই বাজী এখনও ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হয় নাই। সঙ্কল্পশক্তির দ্বারা কিরূপে অঘটন ঘটাইতে পারা যায়, এষ্ট বাজী তাহার চরম দৃষ্টান্ত—It is the ‘acme of conjuring.’

এইরূপ বাজীকরীকে পাশ্চাত্যদেশে Glamour বলে। Glamour এর এদেশীয় নাম ‘মায়া’ বা ‘ইন্দ্রজ্ঞান’ এবং যিনি Magician তাঁহার নাম মায়াবী। শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

লোকেইলি দেবাদিষ্ মায়াবাদিষ্ চ স্বরূপাহুপমদে নৈব
বিচিত্রা হস্তাখাদিস্থৈয়ো দৃশ্যন্তে ।

Sir Walter Scott তাঁহার বিখ্যাত কাব্য 'Lay
of the Last Minstret'এ (Canto, III.) gla-
mour বা ইন্দ্রজালের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

It had much of glamour-might,
Could make a Ladye seem a knight ;
The cob-webs on a dungeon-wall
Seem tapestry in lordly hall ;
A nut-seell seem a gilded barge,
A sheeling * seem a palace large
And youth seem age, and age seem youth
—All was delusion, naught a truth.

সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে এই ইন্দ্রজালের উল্লেখ
আছে। রামায়ণে দেখা যায় মারীচ রাক্ষস ঐ ইন্দ্রজাল-
শক্তির প্রভাবে রাম সীতার নিকট মায়ামুগ রূপে ভাণ
করিয়াছিল; মায়াবী রাবণ ঐ ইন্দ্রজাল শক্তি প্রভাবে
রামের মায়ামুগ ও মায়ী ধনুকের ভ্রম উৎপাদন করিয়া
সীতাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

এ সকলই মায়ামাত্র—illusion! এস্থলে ঐ ঐ
প্রতীয়মান বস্তুর বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত কোন পৃথক্ অস্তিত্ব
ছিল না। অর্থাৎ তাহারা আদৌ তাত্ত্বিক বা বাস্তবিক
নয়। এই বিশাল বিচিত্র বিশ্ব বিজ্ঞানবাদীর মতে ঐরূপই
অবাস্তবিক।

তাহারও কোন তাত্ত্বিক সত্তা নাই। বিজ্ঞানমাত্রম্
এবৈতৎ তথা জাগ্রৎ চরাচরম্। ইহাই বিজ্ঞানবাদ
(Idealism)।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন, বাহাদের নাম
মাধ্যমিক। তাঁহারা নিপট বিজ্ঞানবাদী (Uncompro-
mising Idealists)। তাঁহারা আত্মস্থ বিজ্ঞান (সম্বিৎ)
ভিন্ন অল্প কোন সত্তা স্বীকার করেন না—

কেবলাং সংবিদাং স্বস্থাং মন্তান্তে মধ্যমাঃ পুনাঃ।

—বিবেকবিলাস

* Sheeling—Shepherd's hut.

মরীচিকায় ও ইন্দ্রজালে যেমন 'অতশ্মিন্ তদবুজ্জি' এ
স্থলেও অবিকল সেইরূপ। এ মতে বাহ্যজগৎ (external
world) একেবারে প্রত্যাখ্যাত। মাধ্যমিক বলেন—

'বিজ্ঞান (idea) ব্যতিরিক্ত বাহ্যার্থ (external
world) কোন কিছু নাই। স্বপ্নাহুত্বের জায় ইহা বুঝিতে
হইবে। স্বপ্ন, মায়া (illusion,) মরীচিকা (mirage)
প্রভৃতিতে যেমন বাহ্যবস্তু ব্যতিরেকেও জল, জন্তু, গন্ধর্বপুত্রী
প্রভৃতির প্রতীতি হয়, জাগরিত অবস্থাতেও সেইরূপ বাহ্য
বস্তু না থাকা সত্ত্বেও স্থূল জগতের প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থে এই মাধ্যমিক
মতের সমর্থন পাওয়া যায় বটে—

অহো বিকলিতং বিশ্বম্ অজ্ঞানাং ময়ি ভাসতে।

রূপাং শুভৌ, ফণী রজ্জৌ, বারি সূর্য্যকরে যথা ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা, ২।৯

কিন্তু এ সম্পর্কে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অভিমত কি? একটু
নিবিষ্টভাবে দেখিলে প্রতীত হয়, শঙ্কর-বেদান্তে বিজ্ঞান-
বাদের সমর্থন থাকিলেও শঙ্করাচার্য্য মাধ্যমিকের মত নিপট
বিজ্ঞানবাদী ছিলেন না। মাধ্যমিকের বিজ্ঞানবাদ হইতে
শঙ্করের বিজ্ঞানবাদের বৈশিষ্ট্য কোথায়? what is
its point of departure?

আমরা দেখিচ্ছি, মাধ্যমিক বলেন স্বপ্নাদিবৎ চ ইদং
দ্রষ্টব্যম্—'স্বপ্নসৃষ্টির জায় জাগ্রৎ সৃষ্টিও অসীক। ইহার
প্রতিধ্বনি করিয়া গোড়পাদ তাঁহার কারিকায়
লিখিয়াছেন—

'অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রৎ ন সংশয়ঃ।

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিদং সচরাচরম্ ॥

'স্বপ্নে যে দ্বৈত জগতের ভাণ হয়, তাহা নিঃসংশয় মনঃ
কল্পিত। জাগ্রতের দ্বৈত-ভাণও নিশ্চয় ঐরূপ। চরাচর
যাহা কিছু দ্বৈত, তাহা সমস্তই মনঃকল্পিত (অর্থাৎ বিজ্ঞান
মাত্র)।'

ব্রহ্মসূত্রে বাদরাষণ কিন্তু এ মতের প্রতিবাদ করিয়া-
ছেন। তিনি বলেন—'বৈধর্ম্মাৎ ন চ স্বপ্নাদিবৎ (বেদান্ত
সূত্র, ২।২।২৯)। কারণ,—মায়ামাত্রস্ত কাৎশ্যেনা
নভিযাক্তস্বরূপত্বাৎ (৩।২।৩৩ সূত্র)।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন ‘মাইরব সংখ্যা সৃষ্টিন’ পরমার্থগন্ধোপ্যন্তি ** তস্মাৎ মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনং । **পরমার্থিকস্ত নাহং সংখ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিষয়াদিসর্গবৎ ইত্যোক্তবৎ প্রতিপাদ্যতে ।’

‘অর্থাৎ, স্বপ্নে যে সৃষ্টি তাহা নায়িকমাত্র ; তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই । অতএব স্বপ্নদর্শন মায়ামাত্র । সুতরাং স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া যে সৃষ্টি উদ্ভূত হয়, সে সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির জায় পারমার্থিক নয় ।’

বাদরায়ণ ‘বৈবর্ম্মাৎ ন চ স্বপ্নাদিবৎ’ এই সূত্রে স্বপ্ন সৃষ্টি ও জাগ্রৎ সৃষ্টির যে ভেদ নির্দেশ করিলেন তাহার ভিত্তি এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হয় ; কিন্তু আকাশাদি প্রপঞ্চ, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অহুভব না হইলে বাধিত হয় না ।

‘প্রাক্ তু ব্রহ্মাত্মদর্শনাদ্ বিষয়াদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিত-রূপো ভবতি, সংখ্যাশ্রয়স্ত প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইতি । অতো বৈশেষিকমিদং সংখ্যাস্ত মায়ামাত্রম্ উদ্ভিতম্ (৩২।৪ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য) ।’

অধিকন্তু মাধ্যমিকের মতে, যে বিজ্ঞান জগৎরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা ‘কণিক’ বিজ্ঞান । কিন্তু সকল বৈদান্তিক-আচার্যই একবাক্যে বিজ্ঞানকে ‘পরমার্থ সং,’ অর্থাৎ, eternal and immutable বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন । এইজন্য দেখা যায় গোড়পাদের জায় আত্যন্তিক বিজ্ঞানবাদীও লিখিতেছেন—

‘নহি স্বপ্নে হস্তাদি-গ্রাহ্যং গ্রাহকং চক্ষুরাদিভ্যং বিজ্ঞান-বাতিরেকেনান্তি । জাগ্রদপি তথৈব । পরমার্থসদ্বিজ্ঞান-মাত্রা বিশেষাৎ ।

অর্থাৎ ‘স্বপ্নে গ্রাহ্য-গ্রাহক—বিষয়-ইন্দ্রিয়, এই ত্রৈলোক্যের বাস্তবিক সত্তা নাই ; কেবল বিজ্ঞান (Idea) মাত্র থাকে জাগ্রতেও একরূপ । উভয় অবস্থাতেই বিজ্ঞানই সৃষ্টিক্রমে প্রতীত হয় । এই বিজ্ঞান কিন্তু ‘পরমার্থসং’—আত্যন্তিক সত্য ।’

ঐ যে পরমার্থসং বিজ্ঞান—উহা ব্রহ্মেরই নামান্তর—বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম । শঙ্করের মতে ঐ ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাত হন—তদাস্পদং হি ইদং সমস্তং কার্যম্ (শঙ্কর) । মাধ্যমিক বৌদ্ধ যে বলেন—‘জগৎ নিরাধার—শূন্যই ইহার প্রতিষ্ঠান’—শঙ্কর একথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন ন তাবদ্ উভয়-প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ ! কিঞ্চিৎ হি পরমার্থম্ আনন্দ্য অপারমার্থঃ প্রতিবিধ্যতে যথা রাজাদিষু সর্পাদয়ঃ । তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধাত, পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ ।

অর্থাৎ, ‘জগৎ ও জগতের আধার উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে ; কারণ, তাহা হইলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হয় ।

‘পরমার্থসং’ (ব্রহ্ম) অ-বাধিত তিনি আছেনই । তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অপারমার্থ (প্রপঞ্চ) বাধিত হয় । অতএব ইহাই স্থির যে, তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মায়ায় নিবৃত্তি ঘটিলে মুক্ত পুরুষের নিকট প্রপঞ্চ বাধিত হয়, জগৎ নিমীলিত হয়—

যদা সর্বং আত্মবাত্মং বিজ্ঞানতঃ তদা কং কেন পশ্যেৎ বৃহ, ২।৪।১৩ ।

—কিন্তু নির্বোধ ব্রহ্ম কখন, কোনদিন প্রতিষিদ্ধ হন না—হইতে পারেন না ! সত্য বটে, যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন ।

স্বাবর জন্ম দেখে না দেখে তার মুক্তি ।

সর্বত্রতে হয় তার ইষ্টদেব ক্ষুণ্ণি ॥

গীতার ভাষায়, ‘বাহুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সূতুলভঃ’

—কিন্তু প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিষয়াদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি (৩২।৪ সূত্রের শঙ্করভাষ্য) ।

অর্থাৎ, আকাশাদি প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত অবাধিত ব্যবস্থিত-রূপই থাকে ।

আর এক কথা । শঙ্কর-বেদান্ত বলেন, তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জগৎ নিবৃত্ত হইলেও ‘অভাব’ হয় না—শূন্য হয় না । বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে একথা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—

নাভাব উপলব্ধে—২।২।২৮ সূত্র ।

ইহার উপর শঙ্করভাষ্য এইরূপ :—

‘ন খবভাবো বাহ্যসার্থস্ত অধ্যবসাতুং শক্যতে । কস্মাৎ । উপলব্ধে । উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোবর্ষঃ স্তম্ভঃ, কুড্যাং, ঘটঃ পট ইতি ।’

‘জগতের অভাব (নাস্তিত্ব) সিদ্ধ করা যায় না কেন ? যেহেতু আমরা প্রত্যেক চিত্তবৃত্তিতেই বাহ্যার্থ উপলব্ধি করি স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি ।

অতএব বাদরায়ণ বলিয়াছেন—

ভাবে চোপলব্ধে—২।১।৫ সূত্র

ন ভাবোহুপলব্ধে—২।২।৩০ সূত্র

‘যে বস্তু আছে, তাহারই উপলব্ধি হয় ; যে বস্তু নাই, তাহার উপলব্ধি হয় না ।’

অর্থাৎ, বিশ্বের যখন উপলব্ধি হইতেছে, তখন বিশ্ব অলীক নয়,—নশ্বর বটে । তব্বে যেভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, বেদান্তের মতে তাহা ব্যাবর্ত (phenomenon) যাত্র পরমার্থ (noumenon) নহে । ঐ নশ্বর ব্যাবর্তের পশ্চাতে কিন্তু এক অবিদ্যমান, অজর, অমর, অক্ষর পরমার্থ বিদ্যমান আছেন । সেইজন্য শঙ্করাচার্য্য বলিলেন ‘পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ’ । ‘ঐ পরমার্থসং’ ব্রহ্মই বস্তু, আর বাহ্য কিছু সমস্ত অ-বস্তু ।

প্রসাদ

(বড় গল্প)

পুরাণো নহর স্থানটি নগরের শেষ প্রান্তে এক খণ্ড বৃহৎ পতিত জমি—স্থানীয় রাজাদের প্রায় পাঁচ পুরুষ আগে এই স্থানে বসতবাটা ছিল। স্থানটা পছন্দ না হওয়ায় তাঁরা নগরের মাঝখানে প্রাসাদ বানিয়ে বাস করছেন, পুরাণো নহরে পড়ে আছে শুধু ভিটার আঁকা ঝাঁকা ভাঙা ভিৎ। রাজবাটা স্থানান্তরিত হয়েছে কিন্তু বাস্তুদেবী শ্যামাকালীর মূর্তি স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই। দেবমূর্তি নড়াতে নাই বলে মন্দির বিগ্রহ যেমন তেমন রয়েছে আজও। নিত্য পূজা ভোগাদির ব্যবস্থা ঘোল আনা বজায় আছে পূর্বের মত। তাল তাল চন্দন ঘষা, রাশি রাশি মালা গাঁথা, ঝকঝকে করে ঠাকুর ঘরের মেঝে ধোয়া, ক্রটি হয় না একটুও, পুরোহিত ঠাকুর পূজায় বসেন যথা নিয়মে, মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয় নিখুঁত ভাবে।

ভূতপূর্ব পুরোহিত ছিলেন তত্ত্বমতের সাধক। শাস্ত্রজ্ঞান ছিল তাঁর অসাধারণ, নাম ছিল কালিকানন্দ আগমবাগীশ। স্তোত্র আওড়াতেন তিনি সকাল সন্ধ্যা নিজের মনে অনবরত, আনাহার কোন সময়েই বাদ যেত না। পূজায় বসে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একাহারী সান্ত্বিক ব্রাহ্মণ নিষ্ঠার অবতার। সকলেই ভক্তিতে মাথা নত করতো তাঁর পায়ে। রাজবাড়ীর পুরুষ নারী সকলেরই তিনি ছিলেন দীক্ষাগুরু। সৈদিক দিয়েও তাঁর প্রতিপত্তি ছিলনা কম। মন্দির সংলগ্ন মাটির বাড়ীতে ছিল তাঁর বাস। গ্রন্থরাশি ছিল তাঁর সম্পদ। দেবত্র সম্পত্তির আয়ে দেবীর পূজা ভোগাদির যাবতীয় ব্যয় ও পুরোহিতের পরিবার প্রতিপালন হোত খুব স্বচ্ছন্দে। পুরোহিত-ঠাকুরাণীকে গা-ভরা সোণার গয়না দিয়েছিলেন রাজমাতা পুণ্যমালা দেবী। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

বর্তমানে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সিন্ধুপুরুষ কালিকানন্দের পুত্র যোগানন্দ বাপের পরে পৌরহিত্যপদ

শ্রীহেমলতা দেবী

পেয়েছিলেন। তিনি বাপের কাছে তত্ত্বশাস্ত্র মন্ত্রাদি শিক্ষা করার সঙ্গে কতকটা ইংরাজিও শিখেছিলেন আধুনিক কালের মত। নিজের ছেলেকে তিনি পুরো আধুনিক দস্তরে কলেজে পড়িয়ে বি-এ, পাশ করিয়ে স্বর্গগত হয়েছেন। দেবীর বি-এ, পাশ করেছেন বটে কিন্তু পৈত্রিক পৌরহিত্য পদ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। নিয়মিত পূজাপাঠ তাঁকেই করতে হয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও।

মানুষ যে বিদ্যা আয়ত্ত করে তার চর্চা না করে যে থাকতে পারে না। রাজপুরোহিত দেবীরও নিজের ইংরাজি শিক্ষাটুকুকে কাজে না লাগিয়ে থাকতে পারেন নি। পুরাণো নহরের মাইল খানেক দূরে একটি গ্রাম্য পাঠশালার শ্রীযুক্ত সাধনে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। পাঠশালাটির নাম শ্যামাকালী পাঠশালা। দেবীর নামে পাঠশালাটির প্রতিষ্ঠা। সেকেলে বাংলা নবীশ ছজন বুড়ো পণ্ডিত এবাবৎ পাঠশালার কাজ চালিয়ে এসেছেন। দেবীর শিক্ষার নূতন ধারা প্রবর্তনা করে প্রায় সেটিকে মাইনার স্থূল করে তুলেছেন। শ্যামাকালী পাঠশালা নাম পরিবর্তনের উপায় নাই, কারণ দেবীর নামে নামকরণ। ছপুরে দেবীর পূজাভোগ শেষ করে প্রসাদ পেয়ে তিনি প্রতিদিন পাঠশালায় যান, নিজে পড়ানও তদন্তও করেন ভালমতে। ছাত্রসংখ্যা বেড়ে এখন একশোর বেশি দাঁড়িয়েছে। দেবীরের প্রশংসা চারিদিকে; বর্তমান রাজা পৃথিনাথও তাঁকে ভালবাসেন খুব, ব্যবহার করেন বহুর মত।

পিতামহের আমলের মাটির বাড়ী দেবীরের বাবার আমলেই পাকা হয়েছিল। তিনখানি ঘর দুখানি পাশা-পাশি একখানি অগ্ন্যধারে। দেবীর নিঃসন্তান। মন্দিরের ভূত্য নফর সঙ্গীক ওখানে বাস করে; তারা ভূত্যও বটে বাড়ীর অভিভাবকও বটে। ছোট থেকে দেবীরকে নফর কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, তার প্রতিপত্তি সংসারে খুবই।

শনিবার, পাঠশালা থেকে ফিরেছেন দেবীবর আজ সকাল সকাল। বাইরে রাখা গাড়ু থেকে জল ঢেলে হাত পা ধুয়ে ডাকলেন, ওগো, শুনচো! ভিতর থেকে সাড়া এল—যাই।

গৃহিনী পাথরের বাটিতে ভিজানো মিশ্রী ঢালাঢালি করে স্বামীর জন্ত সর্বস্ব তৈরী করছিলেন, দেবীবর আবার বললেন—শুনচো, চাপির বিয়ে, শুকো লিখেছে তোমাকে আমাকে যেতে। তোমাকে নিতে আগেই সে লোক পাঠাবে—আমি বিয়ের দিন সকালে পৌঁছবো। কাল শিব আসবে তোমাকে নিতে। মায়ের পূজার ব্যবস্থা না করে তো আমার যাওয়ার ঘো নাই, কাজেই আমার যেতে দেবী হবে।

বিয়ের নামে উল্লসিত মগ্নময়ী বললেন—চাপির বিয়ে! কোন তারিখে? কার সঙ্গে? কোথাকার বর? কেমন বর?

—সে সব কিছুই জানি না; শুকো লিখেছে, বিয়ে, এই পর্যন্ত। তার বস্তুর ঠিক করেছেন,—তার মতেই কাজ। গিয়েই দেখা যাবে, কি অবস্থা, কি ব্যবস্থা! পলাশ তো কিছুই লেখে নি! ভাল হলে সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমাকে পত্র দিতো। চুপচাপ আছে দেখছি। তাউই মশাই বেরকম অর্থপিশাচ, কি সে কি ঘটচ্ছেন, কে জানে!

দেবীবরের একটি মাত্র বোন শুকতারার, বিয়ে হয়েছে চার খানা গ্রাম দূরে। শুকতারার নাম, শক্তিশ্বর বাড়ুজ্যে, তাঁর স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় নাই, সে-ঘরে মেয়ে দেবার পূর্বে। ছেলেটি খুব ভাল দেখে তাঁর হাতে মেয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাপের উপর একটি কথা কইবার শক্তি শুকতারার স্বামী পলাশচন্দ্রের নাই। মুখ বুজে সব সহিতে হবে—বাপ বা করেন।

গৃহিনী, ছেলে, বৌ সকলকে তিনি দাবিয়ে রেখেছেন মহা শাসনে। কঠোর স্বভাব, কঠিন বাক্য, সামনে বড় কেউ এগোয় না।

সরবতের গেলানটি স্বামীর হাতে ধরে দিয়ে মগ্নময়ী রেকাবীতে ফল সাঙালেন স্বামীর জন্ত। ভাগ্যীর বিয়ে—ননদের বাড়ী যাবেন হুদিনের জন্ত, সে হুদিন

স্বামীর ঘর করবে কে ভেবে মনটা তাঁর একটু বিমর্ষ হলো। যাই হোক, ভাগ্যী চম্পকলতার বিয়েতে কি দিতে হবে, দুজনে পরামর্শ করতে লাগলেন। পুরোহিতের ঘরে কাপড়ের অভাব নাই, জোড়া জোড়া কাপড় ঘরে বস্তা বাধা। একখানা ফুলকাটা দামী চেলির কাপড়, একজোড়া লালপাড় শাড়ী নেবেন চম্পকের জন্ত। সেকেলে নমুনার সোনার এক জোড়া কড়নও নিতে হবে ঠিক হোল। একটি ভাগ্যী,—ভাল করে দিতে হবে তো! একখানা লালপাড় গরদ নেবেন শুকতারার জন্ত—ননদের জন্ত একখানি ভাল কাপড় না নিয়ে যাওয়া যায় না। দেবী-শ্রীমাকালীর কৃপায় তপর গরদ চেলী কিছুই অভাব নাই পুরোহিতের ঘরে।

ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে রইল, কাল লোক এলেই মগ্নময়ী রওনা হবেন! দেবীবরের মনটা চিন্তিত হয়ে রইল—পলাশ কেন চিঠি দিল না ভেবে।

পরদিন সকালেই শিবকুমার এসে হাজির মামীমাকে নিতে। শুকতারার একটি ছেলে, একটি মেয়ে। চম্পকলতার বয়স ষোল হবে, শিবকুমার তার চেয়ে দুবছরের বড়। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে সহরের হাইস্কুলে। শিবকুমারকে দেখে মামা মামী দুজনেই খুব-খুসী—কি রে শিবু, চাপির বিয়ে—বর কেমন হচ্ছে?

কি জানি মামা—বরের খবর তেমন কিছু শুনছি না। বাবার মেজাজ খারাপ—মায়ের মন ভার, ঠাকুর দাদার উপর কথা বলবে কে; জানেন তো কি রকম কড়া মেজাজের লোক! বাবা আপনাকে শীঘ্র যাবার জন্ত বলে দিয়েছেন।

—আমার যে দেবীর পূজা শেষ না করে যাবার উপায় নাই। সকালের পূজা শেষ করে পূজার ভোগ দেওয়ার ভার পুজারীঠাকুরের উপর দিবে আমি বিয়ের দিন বেলা আটটা নাগাদ রওনা হব।

জিনিষপত্র গুছিয়ে বেঁধে মগ্নময়ী রওনা হলেন শিব কুমারের সঙ্গে। যাবার সময় নক্ষত্রের বউকে বলে গেলেন,—দেখিস তোরা, তোর দাদাঠাকুরের খাওয়া পাওয়ার যেন কোন কষ্ট না হয়। তুই সামনে বসে খাওয়াস।

বিয়ে বাড়ী, সকাল থেকে আয়োজন উদ্‌যোগ চলছে। —আয়োজন বৎসামান্ত, খুব কম খরচেই কাজ সারা হবে।

একটি টাকা শক্তিশ্বর বাঁড়ুয়ার মা-বাপ। ছ'শ টাকায় নাতনীর বিয়ে সারবেন ফর্দ ধরে বসে আছেন। কথাটি ক'বার ঘো নাই বাড়ীর কারো।

বেলা দশটা—দেবীবর বোনের শশুর বাড়ী এসে পৌছলেন। তাউই মশাইকে বারবাড়ীতে প্রণাম করে পায়ের ধূলা নিয়ে ভগ্নীপতির খোঁজে চল্লেন। দালানে উঠতেই পলাশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা। সখক্ষীর হাত ধরে পলাশচন্দ্র পাশের ঘরে ঢুকলেন।

বিপদ উপস্থিত। দেবীদা—মেয়েটাকে গলায় কলসী বেঁধে জলে ফেলা হচ্ছে। বুড়োর বয়েস পঁয়ষট্টি। আটশ' টাকা পণ নিয়ে বাবা তার হাতে টাপিকে বিসর্জন দিচ্ছেন। আমি তো কতটা সম্প্রদান করবো না—তা আমার কপালে যাই থাকুক। বাবা বাড়ী থেকে মেরে তাড়ান—সেও ভাল। বিয়েটা ভাঙ্গা যায় কি ক'রে, একটা পরামর্শ দিতে পার দাদা! আমি মরিয়া হয়ে বাড়ী থেকে না-হয় বেরিয়েই গেলুম—কিন্তু তোমার ভগ্নীর দশা কি হবে ভেবে দেখ। তাকে আস্ত রাখবেন না বাবা। ভাববেন, তার পরামর্শেই আমি দাঁড়িয়েছি বাপের বিরুদ্ধে, আর আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেও বিয়ে বন্ধ হবে না—বিয়ে তিনি দেবেনই। এক্ষত্রে উশায় কি, আমি কাল থেকে অনাহারে জ্বাছি। এতটুকু জল রুচছে না মুখে।

পলাশচন্দ্রের সঙ্গে দেবীবরের খুব ভাব কলেজে পড়ার সময় থেকে। ছুজনে একসঙ্গে বি-এ পাশ করেছেন এক কলেজ থেকে। দেবীবরের বাবুত্ব শুকতারাকে পলাশচন্দ্রের হাতে দেওয়ার কারণ। কে জানতো তখন এমন স্বদয়হীন শশুর।

ছুজনে অনেকক্ষণ পরামর্শ করে একটা মন্তলব আঁতলেন। জলস্পর্শ না করে তখনি ছুজনে বেরোলেন কার্ধ্যাসিদ্ধির চেষ্টায়।

সন্ধ্যার পূর্বে অধিবাসের সামগ্রী নিয়ে বর রওনা হয়েছেন নিজের গ্রাম থেকে। ছুথানা গ্রাম পেরিয়েছেন। কাপসা হয়ে এসেছে যেন দিনশেষের ক্ষীণ আলো।

রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ—গাছের ওপর থেকে হঠাৎ বরের পাকীর উপর বড় বড় ইট পড়তে শুরু হোল। বেয়ারাগুলো চমকে চারিদিকে হকচকিয়ে চাইতে লাগল কোথা থেকে ইট পড়ে। মাহুয় দেখা যায় না—ইটের পর ইট পড়ছে। একটা বেয়ারা চোঁচিয়ে উঠলো—ভর সন্ধ্যা ভূতের কাণ্ড! চল বাবা, পাকী ফেলে ছুটে পালাই। আর একজন বলল, পাকীখানার দাম কত জানিস? পাকী গেলে দেবে কে? পাকী বয়ে পেট চালানো ব্যবসা, পাকী গেলে খাব কি? বুড়োটাকে নামিয়ে ফেলে পাকী নিয়ে দৌড় মারি!

কথাগুলো কহিতে কহিতে ইট পড়লো আরও বিশ-পঁচিশ খানা। পাকীর মাথার কাঠটা গিয়েছে ফেটে। একটা বেহারার হাতে পড়ল একখানা ইট। সে চীৎকার করে পাকী ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল রাস্তায় হাতের বস্ত্রণায়। মাথায় ইট পড়ার ভয়ে বাকি বেহারাগুলো দিল পাকী রাস্তায় বসিয়ে। বুড়োর তখন হাঁস হয়েছিল—মুখ বাড়িয়ে দেখছে, বেহারাগুলো হিটকে পড়েছে, পাকী হলো অচল। পাকী থেকে বেরিয়ে বর দাঁড়ালো রাস্তায়, ছুটো বেয়ারা ছুটে এসে অধিবাসের জিনিষগুলো লগুতগু করে দিয়ে টাকা কড়ি বা ছিল বুড়োর সঙ্গে টেনে হিঁচড়ে নিল কেড়ে। সঙ্গে ছিল একটা চাকর। তাকে মারতে শুরু করেছিল তারা আগেই। এমন সময় গাছ থেকে নেমে পড়ল স্কুলের ছেলের দল। বুড়োকে তাড়া দিয়ে বাড়ী ফেরালো, না ফিরলে মেরে ভাঙবে হাড়—ভয় দেখালো। হতবুদ্ধি বর ছ'একবার অশ্রুটস্বরে পুলিশ পুলিশ হেঁকে ছেলেদের হাতে উচানো লাঠি দেখে নিজের গ্রামের দিকেই দিল পাড়ি—বিয়ে রইল মাথায় তোলা। চাকরটা মার খেয়েছিল বেদম—সে সেই গ্রামেই রইল পড়ে সেদিনের মত। পাকী-বেয়ারারা প্রায় পাকীর দাম উত্তল করে নিয়েছিল বুড়োর পকেট থেকে।

এদিকে রাত দশটা বাজে, বিয়ে বাড়ীতে বর পৌছায় না। শক্তিশ্বর ঘর-বার করছেন, “বর কৈ—বর কৈ” রব সকলের মুখে। ক্রমেই রাত বাড়ে—বর পৌছায় না, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সব বসে, পাত্র কৈ! গ্রাম নিতান্ত কাছে নয় যে তখনি লোক পাঠিয়ে খবর আনানো যায়

তবু একজন লোক পাঠান হোল—তার খবর নিয়ে ফিরে আসতে রাজি হোল শেষ। বিবাহের লগ্ন বয়ে গেছে অনেক আগে।

বুড়ো গ্রামে ফিরে রটিয়েছেন—রাস্তায় অস্থূল হয়ে পড়ায় তিনি বিবাহহলে পৌঁছতে পারেন নাই। গ্রামের লোকরা আগে থেকেই বিক্রপ ও বিরক্তিতে গ্রাম তোলপাড় করছিল বুড়োর বিষয়ে নিয়ে। একটি বিধবা মেয়ে রয়েছে বুড়োর ঘরে ত্রিশ বছরের। এই বুড়োর বিষয়ে। মেয়েটি সন্ধ্যা থেকে কারাকটি জুড়েছিল খুব। বিয়ে না করে বাপকে ফিরে আসতে দেখে সে ঘেন দম ফিরে পেল আগে। বোল আনার হরিরলুট দেবে মনে মনে মান্য করলো।

শক্তিশ্বরের মেজাজ খুব খারাপ। খুঁৎপড়া মেয়ে ঘরে রইলো—বিয়ে করবে কে! অস্ত্র ভাবনা—বর আবার আটশ টাকা ফিরে পাবার দাবী না করে। বরমেজাজে তাঁর স্বর উঠলো সপ্তমে চড়ে। চীৎকার করে ডাকলেন, বৌমা টাপিকে নিয়ে এখন করা যায় কি! এমন হতভাগা মেয়েও পেটে ধরেছিলে! আমার জাত কুল মান সম্মান সব বেতে বসল ওর জন্ত। ওর মুখ আমি আর দেখবো না। যেখানে হয় তোমার মেয়েকে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা কর। আমি একদিনও আর ওকে এখনে ঠাই দেব না।

চোরের মত চুপটি করে শুকতারী নীরবে শব্বরের ভৎসনা বাক্যগুলি হজম করলেন। খানিক পরে বল্লেন, বাবা দেখি যদি দাদা ওকে নিয়ে যান! অনেকটা দূবে গিয়ে থাকলে পাড়াপড়শীদের মধ্যে অন্দোলন একটু কম হতে পারে। আপনি যদি আজ্ঞা করেন তবে দাদা বৌদির সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দিই। শক্তিশ্বর গল্পগজ্ঞ করতে করতে বল্লেন—বাক—তাই বাক্, দূর করে দাও এখান থেকে। আর কখনো এ বাড়ীতে ওকে এনো না, আমি ওর মুখ দেখবো না! মনে মনে ভাবলেন, টাকা আটশ' তো পকেটে পুরেছি—দাবী করলে বুড়ো বেটা, সে টাকা আর ফেরৎ পাবে না, বলব, বিয়ের উদ্যোগে খরচা হয়ে গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি—হাঁকিয়ে দেব এক কথায়। মেয়েটারও খোরপোষের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল—মন্দ নয়।

সেই দিনই চম্পকলতা খুসীমনে পুরাণো নহরে চলে গেল মামা মামীর সঙ্গে।

ভোরে উঠে মগ্নময়ী দেখেন ঘরের কাজগুলি সব সেরে চম্পক দাঁড়িয়ে আছে মামাবাবুর খড়ম জোড়া হাতে নিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে মামাবাবু পরবেন। বারন্দার একধারে মামাবাবুর মুখোবার সরঞ্জাম গোছান। দাতন, মাজন, পিতলের কলসীভরা জল, মুখের উপর একটি জলভরা ঘটি চাপানো। ধবধবে গামছাখানি ভাঁজ করে ঘটির মুখে রাখা।

মামী বল্লেন—কিরে চম্পক, তুই যে হার মানালি আমাকে। পাঁচটার মধ্যে সব কাজ সেরে বসলি—কাণ্ডখানা কি? এমন তালিম তোকে দিল কে?

—মা শিখিয়েছেন মামীমা—কাজ করতে হাতে ধরে। ভোরে তাঁর অভ্যাগতি তাঁরই করে দেওয়া। মা আমার নিরলস, অত্যন্ত পরিশ্রমী। ঠাকুরদার মেজাজ রেখে চলতে তিনি এমনই অভ্যস্ত যে নিজের অবকাশের কথা ভাবতে শেখেন নি কোন দিন। কোন কাজে খুঁৎ হলে ঠাকুরদা চটে আগুন। তাঁর ভয়ে বাবাকে পর্য্যন্ত মা যত্ন করতে সময় পান না এতটুকু। বাবার কাজের যত ভার ছিল আমার হাতে। বলে চম্পকলতা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

মা-বাবা বাপের ঘর মনে পড়ে মনটা তার অধীর হয়ে উঠল, চেপে রাখলো মনের ব্যথা মনে। মামা-মামীর আদর যত্নে এখানে যে স্থখে আছে খুবই তবু মা বাবাকে ভোলা তো যায় না!

দাদা শিবকুমার মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যান। মা-বাবার এমুখো হবার ঘো নাই। জানলে ঠাকুরদা রক্ষা রাখবেন না। মা পত্র দেন শিবকুমারের হাতে; মেয়ে বেঁচে আছে, স্থখে আছে, এতেই তাঁরা সুখী।

দেবীবর ভাগ্নী চম্পকলতার সুন্দর সদভ্যাগ ও নিরলস প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হন। ভাবেন, আর একটু মাহুত্ব করে তোলা যায় কি করে! জীকে বল্লেন, মগ্ন, আমি ঠিক করেছি তোমাকে ও চম্পককে রাতে পড়াবো—বাংলা

সংস্কৃত ইংরাজি যা তোমরা পড়তে চাও, যতদূর শিখতে পারো। ঘরের কাজ এখন ভাগাভাগি হয়ে অবসর পেয়েছো ঢের হেলায় সময় নষ্ট করা চলবে না। চরকায় সূতো কেটে পৈতে তৈরী করে তো রাশ করেছো তাও কর, পড়াও শেখ। পৃথিবীর শ্বশুর জানবে তাতে অনেক বেশি।

মামী-ভাগ্নীতে উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো খুব। মগ্ন বল্লেন, আমি বুড়ো হতে চললুম, আমার আবার পড়া! চম্পককে পড়াও।

—সে হবে না, তোমাকে নিশ্চয় পড়তে হবে। বসে বসে পৃথিবীর অন্ন ধ্বংস করা চলে না, পৃথিবীর হুন খেয়ে গুল গাইতে হবে।

—আমি তো মা শ্রামাকালীর অন্ন খাই, পৃথিবীর অন্ন খাব কেন?

—পৃথিবী ও মা শ্রামাকালী :যে এক—তাতে জানো না। লেখাপড়া শেখ তবে তো জানবে।

—সে আবার কি রকম?

—পরে বুঝবে।

—মন্ত্র সাধন করে এই বুঝি শিখেছ?

—মন্ত্রের সঙ্গে পৃথিবীর কাজের সঙ্গে যোগ ঘটালে

তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কালই আমি তোমাদের জন্ত বই নিয়ে আসবো।

চম্পক মহা উৎসাহে লেগে গেল লেখাপড়া শিখতে। মামীমাও মুখ বুজে মেনে নিলেন স্বামীর আজ্ঞা। মনে মনে ভাবলেন, দিনকতক না পারলেই ছেড়ে দেবেন নিজে। বুড়ো বয়সে আবার পড়া!

লিখতে শিখে চম্পক মাকে চিঠি লিখে জানাল, মামাবাবুর কাছে সে লেখাপড়া শিখছে। মায়ের মন চম্পকের ভবিষ্যৎ ভেবে অনেক সময় চিন্তায় অবসন্ন হয়। বিয়ে তো মেয়েটার হয় নি। পুনরায় বিবাহ হওয়া সম্ভব হবে না কি—শ্বশুর থাকতে তো নয়। মনের কথা মনেই চেপে রাখেন। দাদা তাকে পড়াশোনা শেখাচ্ছেন, এতে শুকতারার মনটা অনেকখানি হালকা হোল। বুক থেকে চিন্তার বোঝা যেন একটু কমলো। [চম্পককে পাঠিয়ে পর্যাপ্ত শ্বশুরের ভয়ে তিনি কোন দিন মুখে আনেন নি যে আমি বাপের বাড়ী যাব। শ্বশুর নাম করেন না চম্পকের একদিনও।

তিন বছর কেটে গেল, চম্পক মামীমামীর কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



মিসেস্ পাল্ বাক্

ক্রীশ্চিয়ান চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর থেকে বাঙালার শিক্ষিত জনসাধারণ সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটির সহিত সবিশেষ পরিচিত। প্রতি বৎসরই স্বেডিশ-অ্যাকাডেমী (Swedish Academy) বিচারের ফলাফল জানানর অন্তে তাঁরা আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করে থাকেন। বৎসরের শাস্ত সাহিত্য সৃষ্টির পুরস্কার লাভ করে জয়ের গৌরব তিলক ললাটে কে গ্রহণ করেন তা জানানর অন্ত আমাদের আজ আর কৌতূহলের সীমা নেই।

মাস কয়েক হল সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে ১৯৩৮ খৃঃ অব্দে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে আমেরিকান মহিলা সাহিত্যিক 'মিসেস্ পাল্ বাক্কে' (Mrs. Pearl Buck)। এ গৌরব তাঁর ব্যক্তিগত গৌরবমাত্র নয়, জগতের সমগ্র নারীজাতি তাঁর মে গৌরবে আজ গর্ভ অন্ভব করেছে। আনাতোল ফ্রান্স, উইলিয়ম বাট্‌লার রেইট্‌স্, বার্নার্ড শ, জন গ্যালস্-ওয়ার্দি, লুইগি-পিরা'ন্ডেলো, বাঙালার ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ব সাহিত্যের চির ভাস্বর জ্যোতিষদের মালায় আজ আর এক নূতন জ্যোতিঃকণা গাঁথা হল। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে বা বর্তমান বিশ্ব সাহিত্যে তাঁর চেয়ে আরো যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন কি না সে বিচারের সময় এখন নয়। সাহিত্যমোদী হিসাবে আমাদের এখন কর্তব্য এই নব পরিচয়লব্ধ বিদেশীয় সাহিত্যিকের সাহিত্য-সম্পদের সহিত পরিচিত হয়ে নূতন আনন্দ লাভ করা।

মিসেস্ পাল্ বাক্‌কে পুরস্কার তাঁর স্বদেশবাদী আর মাত্র দুইজন আমেরিকান এই পুরস্কার লাভ করেছেন—ঔপন্যাসিক সিনক্লয়ার লুইস্ (Sinclair Lewis) ও নাট্যকার ইউজীন্ ওনীল্ (Eugene O'Neil)। মহিলাদের এই গৌরবলাভে তাঁর স্থান চতুর্থ। ১৯০৯ সালে স্বেডেনের (Sweden) সেলমা লাগের লক্ মহিলাদের মধ্যে এই পুরস্কার প্রথম লাভ করেন। তাঁর পরে নরওয়ের মহিলা-সাহিত্যিক সিগরিদ্ উন্সেট্ (Sigrid Undset) ও

ইটালীয় মহিলা ঔপন্যাসিক গ্রাৎসিয়া দেলেদা (Grizia Deledda) এই পুরস্কারে সম্মানিত হন।

মিসেস্ পাল্ বাক্‌কে সম্পূর্ণ নাম পাল্ সাইডেনষ্ট্রাইকার বাক্ (Pearl Sydenstriker Buck)। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার হিল্‌সবোরোতে (Hillsboro) এক সুপরিচিত পাজী পরিবারে ১৮৯২ খৃঃ অব্দের ২৬শে জুন তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম অ্যাবসালোম সাইডেনষ্ট্রাইকার (Absalom Sydenstriker) এবং মাতার নাম ক্যারোলাইন (Caroline); শৈশবের অধিকাংশ সময়ই তাঁর অতিবাহিত হয় চীনদেশে ইয়াংসি নদীর তীরে শিন্‌কিং (Chingking) নগরে। চীনের সঙ্গে এই আশৈশব নাজীর যোগ ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর উপন্যাসের প্রতিটি চৈনিক চরিত্র-চিত্রে আন্তরিক দরদর এক অপকল্প বাচ্‌ ঢেলে দিয়েছে। চীনা চাষী 'ওয়াং' পরিবারের জীবন নিয়ে যে উপন্যাসমালা (trilogy) তিনি রচনা করেছেন (Good earth 1931; Sons 1932; A house divided,) চীনা জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বেদনা-বৈচিত্র্যময় জীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকলে সে রচনা কখনই এমন সার্থক হয়ে উঠতে পারত না।

শৈশব থেকে সতেরো বছর পর্যন্ত তাঁর জীবন প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে চীনদেশেই কেটেছে। বাপ মার ভাষা ইংরাজি শিখবার বহু পূর্বেই তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের ভূকোথ্য ভাষা প্রাণের এক সহজাত আকর্ষণে অতি অনায়াসে শিখেছিলেন। সতেরো বৎসর পূর্ব হবার পূর্বেই তিনি উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করতে আমেরিকায় রওয়ানা হন। ভার্জিনিয়ার Randolph Macon মহিলা কলেজে তিনি ভর্তি হন এবং শেষ পর্যন্ত (Cornell) স্নানভাসিটির এম্. এ, ডিগ্রী লাভ করেন। চীনে ফিরে ১৯২১ সাল থেকে প্রায় দশ বৎসরের অধিককাল তিনি নানকিং (Nanking) স্নানভাসিটিতে

ইংরাজীর অধ্যাপনা করেন। আমেরিকা থেকে ফেরার বছর দুই পরেই জন লসিং বাক্ (John Lassing Buck) নামে এক আমেরিকান মিশনারীকে তিনি বিবাহ করেন। সে বিবাহের শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে। মিসেস বাকের বর্তমান স্বামীর নাম রিচার্ড ওয়াল্শ (Richard J. Walsh) কিন্তু জনসাধারণের কাছে তিনি মিসেস বাক নামে পরিচিত হতেই পছন্দ করেন।

সন্তানের জীবনে মায়ের গভীর প্রভাবের উদাহরণ সংসারে নিতান্ত অল্প নয়। মিসেস বাকের সাহিত্য-প্রতিভাও তাঁর জনমীর কাছে নানাভাবে ঋণী। তাঁর এক রচনায় তিনি গর্বের সঙ্গে সে কথা উল্লেখ করেছেন।

“আমার মা আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা দান করে কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্য করে তুলেছিলেন ;

সকল সম্পদই আমার তাঁর কাছে পাওয়া। সবচেয়ে বড় জ্ঞান তিনি আমাকে দিয়েছিলেন শব্দের (sound) ও কথা (word) সৌন্দর্য্য বুঝতে শিখিয়ে এবং তাদের আত্মপ্রকাশের স্বরূপটা ধরিয়ে দিয়ে। আমি যা কিছু দেখি এবং অনুভব করি তা যথাযথ ভাবে লিখতে তিনি আমাকে শৈশব থেকে শিখিয়েছিলেন ; আর সাহায্য করেছিলেন সর্বত্র চিরসুন্দরকে সহজ দৃষ্টিতে দেখতে।

(The Home of Chiang King)

মিসেস বাকের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে নিহিত আছে এই বীজমন্ত্র এবং তাকে পূর্ণ করে তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র উপচিহ্নিত হয়েছে তাঁর সমবেদনাময় চির সরস নারীহৃদয়। অমর সাহিত্যের পথে এই অক্ষয় পাথর যার আছে তাঁর যাত্রা নিত্য জয়যুক্ত।

গাঁয়ের স্মৃতি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

যেখানে আকাশ সীমার মাঝারে বাধা
চাঁদ তারা নিমেষের তরে দেখা যায়,
গান ফুটে না কো—যার শুধু স্বর সখা
মাটির পরশ লাগে না মনে ও গায়,—
বাতাস কিম্বা সীমার মাঝারে থাকি,
গাহে না আকাশে দেশ বিদেশের পাখী,
নীল আকাশের বুকেতে ধূমের মেলা
সেখানে থাকিতে চাহে না আমার প্রাণ,
জীবের জীবন নিয়ে যেথা চলে খেলা
কেন মোরে সেথা রাখিলে হে ভগবান ?

যে-দিকেতে চাই শুধু ইট কাঠ ঘর
এত বড় ধরা—বুকে তার ঠাই নাই,
কেন এরা এলো পরদেহে দিতে ভর
এতটুকু নিয়ে রেবারে চলে তাই।

এর পথ ঘাট শাস্ত, নীরব নয়
দেখি চারিদিক শুধু কোলাহল-ময়,
কিম্বাইয়া পড়ে কণ্ঠকান্ত দেহ,
স্তিমিত হইয়া আসে সে ক্রান্ত প্রাণ,
সাম্বনা মোরে একটু দিল না কেহ—
কেন মোরে হেথা রাখিলে হে ভগবান ?
যেখানে আকাশ অসীম, উদার, নীল
যত দূরে চাই দৃষ্টি মেলিয়া রাখি—
কালো জলে ভরা নদী ও তড়াগ-বিল
গান গেয়ে যেথা উড়ে চলে শত পাখী ;
অপরিচিতের বালাই সেখানে নাই ;
সকলেই সেথা পিতা, মাতা, বোন, ভাই।

গাঁয়ের বুকেতে দেখেছি মায়ের হাসি
উদার বাতাস কোলে তুলে নেয় মোরে,
আমার গাঁয়েই আমি বড় ভালোবাসি,
সেখাকার স্মৃতি আছে মোর মন ভরে।

দক্ষিণ ভারত-পথে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পক্ষীতীর্থ

ইলেক্ট্রীক ট্রেন এগম্বর ষ্টেশন হইতে আমাদের লইয়া প্রাতে ৭টা ৩০ মিঃ সময় চিঙ্গলীপুট ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিল। রমাণীয়া বড়ই আনন্দ। ইলেক্ট্রীক ট্রেনে প্রথম যাইতেছে। ধূম উল্লীসের বালাই নাই, জ্বালার নিকট বসিলে চোখে কলার গুড়া পড়িবার সম্ভবনা নাই। শব্দ কম, ঝাঁকানি ও মৃদু; গমনে যেমন সুবিধা তেমনি আরাম। সহর, সহরতলী, ও সহরের সংলগ্ন পল্লীর সৌধাবলীর শোভা পনর মাইল পর্যন্ত চোখে ভাসিতে লাগিল।

কলিকাতা নগরীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ত্রিশ মাইল গম্বীর দুই পার্শ্বে মন্দির, ঘাট, বাগানবাটী, ঠাকুরবাটী, মিলের কর্ম্মাধক্ষকদের স্বগম্য অট্টালিকা সমূহ যে অপূর্ণ শোভা সৃজন করিয়া কলিকাতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে তাহার তুলনায় মাদ্রাজ সহরতলির সৌধ সম্পদ অতি মান। তথাপি নূতন নূতন ঘরবাড়ি বেশ সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন। দেখিতে দেখিতে মামবালাম্, সেয়ডপেট্, ওইনডী অতিক্রম করিয়া সেণ্টটমাস মাউন্ট ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেন থামিল। এখানে দমদমায় এরা ডোমের স্তায় পরিচ্ছন্ন বিস্তৃত উড়া জাহাজের অডা এবং তাহার পার্শ্বে বেতারবার্তা প্রেরণের সরকারী ঘাটী উঁচু উঁচু টেলিগ্রাফের খুঁটির স্তায় দণ্ডায়মান। এই রেডিও ষ্টেশন হইতে মাদ্রাজ সহর ও সহরতলীতে বেতার সঙ্গীত ও বার্তা ঘোষিত হয়। ষ্টেশনের অনতিদূরে একটা ছোট পাহাড়ের উপর সুদৃশ্য একটা গির্জা বিরাজিত, তাহাকে ঘিরিয়া সুন্দর ফুল, ছাত্রাবাস, পুস্তকালয় আদির অনেকগুলি হৃদয় দেখা যায়। পাহাড়ের উপরের সজীব তৃণাচ্ছাদিত ময়দান ও পুষ্প বীথিকাগুলি একখানি নাট্যমঞ্চের চিত্রের স্তায় দেখাইতেছিল।

তাহার পর তাধারাম ষ্টেশন মাদ্রাজ হইতে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত, এইখানি ইলেক্ট্রীক ট্রেনের প্রধান আড্ডা, ইহার ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত চিঙ্গলুপুট পর্যন্ত ইঞ্জিন

সাধারণ ট্রেনের গাড়ী মত টানিয়া লইয়া যায়। রেল লাইনের দুই পার্শ্বে অজস্র নারিকেল গাছের শীরে প্রান্তঃ-কালীন সূর্য্য কিরণের সোনালী রেখাপাত অতি মনোরম দৃশ্য সৃজন করিয়াছিল। সমুদ্র হইতে মৃদু মন্দ সমীরণ বহিয়া আসিয়া অদ ও প্রাণ শীতল করিতেছিল। ইলেক্ট্রীক ট্রেনের এই ভ্রমণ পরম আনন্দ দায়ক ও প্রীতিপ্রদ।

ষ্টেশনে লেকট্ লগেজ গুদামে সমস্ত মালপত্র রাখিয়া পক্ষীতীর্থ দর্শনে বহির্গত হইলাম। মোটরবাস পাওয়া



দক্ষিণ ভারত-পথে

গেল। চিঙ্গলীপুট জিলার প্রধান কেন্দ্র এই চিঙ্গলীপুট সহর, ডিস্ট্রিক্টের প্রধান কেন্দ্রের আবশ্যকীয় যাবতীয় কারবার এখানে আছে। জেলার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ও কাছারি ফুল, হাসপাতাল, জেলখানা কয়েকটা গির্জা দেখিতে দেখিতে মোটার বাস চড়িয়া সাত মাইল দূরে পল্লীতীর্থের দিকে যাইতে লাগিলাম। চিঙ্গলীপুট নগর ক্ষুদ্রায়তনের হইলেও পরিচ্ছন্ন। ওই সাত মাইল বাইবার অল্প মোটার বাসের ভাড়া প্রতি-জনে নয় পয়সা দিতে হইল। সন্ধ্যার একটা খোপ্

মেয়েদের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। হেমলতা দেবী, রমা ও তাহার মাতা এই সামনের খোপে বসিতে পাইয়া আনন্দিত হইল। আশ ঘণ্টার মধ্যে পক্ষীতীর্থের পাহাড়তলে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা দশটা।

বাস্ হইতে অবতীর্ণ হইতেই কয়েকটা পাণ্ডা আসিয়া ঘেরিল, তাহার মধ্যে একটি হিন্দী ভাষাভাষী জ্বীলোক ছিল। আমরা সেই জ্বীলোকটিকে পথপ্রদর্শিকা করিলাম। পাহাড়তলে একটি ব্রাহ্মণের যাত্রী-আবাসে বিশ্রাম করিলাম, এখানে কূপ আছে গভীর এবং জলও স্বচ্ছ, হেমলতা দেবী প্রভৃতি আরামে স্নান করিলেন।



দক্ষিণ ভারত-পথে

মাদ্রাজের মিসেস দে বলিয়াছিলেন, মাদ্রাজ হইতে কিছু আলু সংগ্রহ করিয়া লইবেন এবং সেখানে যাইয়া আলুভাতে, স্বত, ডাল, এবং দুধ ও কলা দিয়া মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থা করিবেন। এ অঞ্চলে তাহাই রুচিকর ও স্বাস্থ্যকর হইবে। মাদ্রাজে যেখানে গিয়াছি পরিচয় সৰু চাউল, বিস্কুট খাটা দুগ্ধ, ও স্মিট কলা পাইয়াছি। সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণরা নিষ্ঠাবান ও পরিচ্ছন্ন হয়। সেই আচারনিষ্ঠার ফলে প্রতি হোটেলই গৃহস্থবাসীর মত পরিচ্ছন্ন ও চিত্তাকর্ষক। মিসেস দেবীর পরামর্শ মতন আহারের ব্যবস্থা করা হইল, অতি তৃপ্তির

সহিত ভোজন সমাপ্ত করিলাম। ক্ষুদ্র পল্লীতে আহারের দ্রব্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা বা ভেজাল নাই।

পক্ষী-তীর্থ

সমস্ত ভূমি হইতে সোজা হইয়া একটি পর্বত দণ্ডায়মান। তাহারই শিরোপরি বেদ্রিগিখর বা ‘বেদ্যানিধেশ্বর’ মহাদেবের মন্দির ঠিক যেন নৈবেদ্যের মস্তকে ‘শাগ্’ মিষ্টর ত্রায় বিরাজিত। পাহাড়ের এক দিকের গাত্র সোজা ভাবে শিবমন্দির মস্তক করিয়া রহিয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দির গাত্রে দীপমালা প্রজ্জ্বলিত করা হয়। দূর হইতে নক্ষত্র খচিত নভোমণ্ডলের ত্রায় প্রতীয়মান হয়। পর্বতটি প্রায় পঁচশত ফুট উচ্চ। প্রায় চারিশত পঁচিশটি সোপান বহিয়া উঠিতে হয়। উপরে উঠিয়া মন্দির অভ্যন্তরে জানলার উপর বসিলে সমুদ্রের শীতল বায়ু পাহাড়ে উঠিবার ক্রান্তি দূর করিয়া দেয়। নির্জন স্থানে পুণ্যতীর্থ বেদ্রিগিখর মহাদেবের পূজা আরতি, পুষ্প বিত্তাস দর্শন করিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হইল ভক্তি ভরে বলিলাম—

ও নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।

নিবেদয়ামি চাত্ত্বানং গতিস্তুং পরমেশ্বর।

বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি একটু নিম্নে পাহাড়ের অন্তরালে এই নির্জন স্থান প্রায় দুই শত নয়নারীর সমবেত কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সেই রহস্যময় পক্ষীতীর্থ, এখানেই মধ্যাহ্নে ঠিক ১২টার সময় শ্বেতবর্ণ শঙ্খচীলের মতন বৃহৎ দুইটা পক্ষী উড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনটা পায়ে তৈল, ইটার জল, ও পরিষ্কার জল রক্ষিত হয়। পক্ষী দুইটা আসিবার পূর্বে যাত্রী ও দর্শকগণ ঘন ঘন হর্ষধ্বনি করিতে থাকে। “এই আসছে” বলে চিংকার ধ্বনিতে পর্বত কন্দর প্রতিধ্বনিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ে দুইটা পক্ষীকে আসিতে দেখা গেল, পাখী দুইটা পাহাড়ের উপর রক্ষিত তৈল পায়ে প্রথমে মস্তক ডুবাইয়া, ইটের জলে মস্তক ও গাত্র পরিষ্কার করিতে থাকে, তৎপরে সচ্ছ জলে স্নান করিয়া পুরোহিতের নিকট নিতান্ত পোষাভাবে উপস্থিত হয়। পুরোহিত মহাশয় বহুদিনের প্রাচীন দ্রাবিড়

ব্রাহ্মণবংশের সন্তান। নিষ্ঠার সহিত দুই হাতে দুইটা রৌপ্যের পাঁত্রতে স্বস্ত্যাহ্ পরমাম লইয়া যোগাসনে বসিয়া থাকেন। এবং পক্ষীঘরের আগমনের জন্ত স্তবস্তুতি করিতে থাকেন। স্নান করিয়া পক্ষীঘর ধীরে ধীরে আচার্য্যের হস্তস্থিত পাঁত্র হইতে ভোগার তিনগ্রাসে খাইয়া সন্নিহিত রক্ষিত জল পাঁত্র হইতে জলপান করেন। তৎপর দেবালয়ের উপর তিনবার উড্ডীয়মান হইয়া প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে রামেশ্বর দিকে উড্ডীন হইয়া যান। এই রহস্য লীলা বহু শতাব্দী হইতে সাধিত হইতেছে।

এই রহস্য লীলার সহিত হিন্দুরা নানা বিদ্যুৎ প্রচলিত করিয়াছেন। এই পক্ষীঘর শাপভ্রষ্ট দুইটা ঋষি প্রত্যহ মানসসরোবর হইতে উড়িয়া আসিয়া এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিয়া রামেশ্বরে উড়িয়া যান এবং পুনরায় সন্ধ্যায় কৈলাসে বাইয়া হরপার্বতীর চরণ সেবা করেন।

আবার এক কাহিনী প্রচারিত আছে যে এই পক্ষী দুইটা পার্বতী ও পরমেশ্বরের প্রতীক। ইহারা কালীধাম হইতে প্রত্যহ রামেশ্বর গমন করেন; পথিমধ্যে ভক্তগণকে অন্নগ্রহ করিবার নিমিত্ত এইখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ ব্যাপিয়া এই রহস্য ময় লীলা চলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী পক্ষিরাপ-ধারী হয় পার্বতীকে ভক্তিভাবে প্রণিপাত ও স্তবস্তুতি করিয়া ধন্ত হয়।

অবিশ্বাসীরা বলেন, ইহা কোন শক্তিতে পক্ষিঘরকে পোষ মানাইয়া নিয়মিতভাবে এই প্রকার লীলা সাধন করান হয়। পুরহিতদের ইহা চাতুরী। তাহা হইলেও ইহাও এক বিশিষ্ট শক্তি, বিজ্ঞান ইহার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই। তবে এই লীলাদর্শক মাঝেই আনন্দিত ও বিস্মিত হন। ঈশ্বরের শক্তিতে প্রভাষিত হইয়া থাকেন।

কুতু কোম্পানী একখানি স্পেশাল ট্রেনে দক্ষিণ দেশের যাবতীয় তীর্থ দর্শন করাইবার মতলবে তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী লইয়া তীর্থ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই ট্রেনের প্রায় ১২০ জন যাত্রী পক্ষীতীর্থে সমবেত হইয়াছিলেন। বাইশ দিন ট্রেনে থাকিয়া ১৮টি তীর্থ দর্শন করিবার সুবিধা ইহারা প্রাপ্ত হন। আসবাব রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা নাই।

কুলিমজুর ও গাড়ীওয়ার সহিত কোন ঝগড়া নাই, আহার ও বিহারের স্থান অধেষণ করিতে হয় না, অজানা স্থানে অথবা ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, বাঙ্গালীর রুচি অন্নযায়ী আহার পাওয়া যায়, যাত্রীর উঠা নামার হেতু অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। নিজ নিজ পরিচিত সঙ্গীও অভাব নাই, ব্যাধি হইলে চিকিৎসকের সাহায্যের জন্ত ভীত হইতে হয় না। একাধিকমে তিন সপ্তাহ ট্রেনে নিদ্রার ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও রুচির পক্ষে মঙ্গল নহে, এবং সবই অল্পের ইচ্ছায় চলিতে হয়। উক্ত অসুবিধা বাতীত ভ্রমণের পক্ষে এই প্রকার ট্রেন খুবই সুবিধাজনক।



দক্ষিণ ভারত-পথে

উক্ত ট্রেনের পরিচিত কয়েকটি যাত্রী ও এই অভিজ্ঞানের কর্মকর্তাদের নিমন্ত্রণে চিদমল্লীপুট ট্রেনে গাড়ীর ভিতর তাঁহাদের নির্দিষ্ট রাজিকালীন খাদ্য ভোজন করিয়া তৃপ্তি বোধ করিলাম। খাদ্যদ্রব্যগুলি বিশুদ্ধ ও মৃৎরোচক এবং সুন্দর পরিপাট্যের সহিত রন্ধন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাহারা থাকেন তাহারা নিজ বাতীর যাবতীয় সুবিধা অন্নযায়ী গৃহস্থালী সজ্জিত করিয়া আরামে বাস করিতেছেন।

সেই হিন্দিভাষাভাষী জীলোকটির নিকট পক্ষীতীর্থের মহিমা এবং নানা বিস্ময়কর কাহিনী শুনিলাম।

তাহারও জীবন কাহিনী নানা রহস্যে ভরা। কোন উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া পীড়িত হইয়া এদেশের এক গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় পায়। আরোগ্যলাভ করিয়া সেই পরিবারের এক কন্যার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়, তৎকালে তাহার যে সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল, সেই বংশে এই জ্ঞীলোকটির জন্ম এবং তিনি পাণ্ডাগিরি করিয়া জীবিকা অর্জন করেন। হিন্দী ভাষায় কথাবার্তায় সক্ষম বলিয়া উত্তর ভারতের যাত্রীরা ইহাকেই পাণ্ডা মনোনীত করেন এবং জ্ঞীলোক বলিয়া নারী যাত্রীরা ইহাকে পছন্দ করেন। মেয়েটীও বেশ আক্সাবাহী ও উপকারী। ইতিপূর্বে কোন জ্ঞীলোক পাণ্ডার পরিচয় পাই নাই। ১০ অ'না পরমা দিতেই সম্বন্ধ হইল।

পক্ষী তীর্থের পর্বতের পাদদেশে একটি বিশাল শিব মন্দির। তাহার গোপুরাম, (উচ্চ তোরণ) টেপাকুলম্ (সরবর মধ্যে বিশ্রাম মন্দির) দেখিতে মনোরম। ইহার অনতিদূরে চারিদিকে শৈল পরিবেষ্টিত উপত্যকার উত্তর প্রান্তে একটি ভূর্গের ভগ্নাংশ অবস্থিত। তাহারই উত্তর পূর্বে দুই মাইল বিস্তীর্ণ একটি হ্রদ আছে।

চিঙ্গলপুট স্টেশন হইতে পক্ষীতীর্থ ছয় মাইল মোটার বাসে আসা যায় তথা হইতে চৌদ্দ মাইল “জ্যাডকা” ঘোড়ার গাড়ীতে পূর্ব দক্ষিণ দিকে সমুদ্র উপকূলে মহাবলীপুরম যাইতে হয়। ‘জ্যাডকা’ যাত্রায়াতের জন্ত দেড় টাকা মাত্র ভাড়া লাগে।

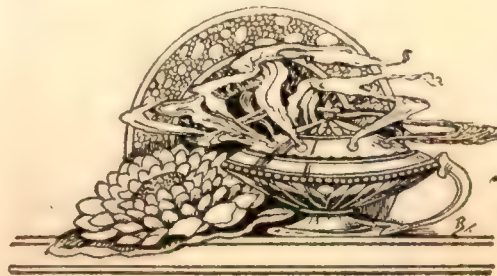
মাস্ত্রাজ মহাবলীপুরম গমন করিবার অল্প একটি পথ আছে, মাস্ত্রাজ নগরের সাত মাইল দূরে পাপকৌরী নামক ঘাটে নৌকায় উঠিয়া খাল দিয়া ত্রিশ মাইল জলপথে নৌকায় যাইতে হয়। বোটের ভাড়া ৬৭ টাকা লাগে। বেশী সঙ্গী থাকিলে এই পথ আরামদায়ক এবং সস্তা।

মাস্ত্রাজ হইতে টানা মোটরে শ্রীমতী নীলিমা দেবীরা গিয়াছিলেন, তাহারা এই পথ আরামদায়ক নহে বলিয়া ইণ্ডিয়ান স্টেট রেলওয়ে ম্যাগাজিনে লিখিয়াছেন। পক্ষীতীর্থ হইতে মোটর ভাড়া ৭২ টাকা এবং চিঙ্গলীপুট স্টেশন হইতে যাত্রায়াত ২২ নয় টাকা পড়িয়া থাকে।

‘জ্যাডকা’তে তিনজনের অধিক ব্যক্তি বসিয়া যাইতে পারে না, বাঙ্গলার পল্লীগামের ছত্রীওলা গরুর গাড়ির আকারে দ্বিচক্রযান একটি ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যায়, এই “জ্যাডকা” গাড়ী, উত্তর ভারতের একান্ত গ্রাম্য দক্ষিণ ভারতে ‘জ্যাডকা’ প্রসিদ্ধ যান, ভাড়াও সস্তা। ১৪ মাইল পথ যাইতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল।

একটি বিস্তীর্ণ খাল বা নদীর মোহনার তীরে ‘জ্যাডকা’ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রবৃত্ত ভিভাগের পারাপারের নৌকায় পার হইয়া মহাবলী পুরামের মন্দির প্রাঙ্গণে যাইতে হয়। নৌকা তীরে লাগে না, এক হাঁটু জলের উপরই অবতরণ করিতে হয়। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীকে সম্বন্ধে দুইটা গাইড হস্তোপরি বসাইয়া জল পার করিয়া দিল।

এখানে বৃহৎ সোনামুখী ডাব এক পয়সায় বিক্রীত হয়, ডাবের জল পান করিয়া পরম তৃপ্তি পাওয়া গেল। বালুর উপর দিয়া কিয়ৎদূর যাওয়া মহাবলী পুরামের চিত্রবিখ্যাত রথাকারে সপ্ত মন্দির তলে উপনীত হইতে হয়। ধর্মরাজ ভীম, দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের নামে পঞ্চ মন্দির বিখ্যাত। পাশা পাশি পাঁচটা মন্দির এক এক খণ্ড পাহাড় কাটিয়া নির্মিত। কি অপূর্ব এই স্থাপত্য কৌশল! দেশ বিদেশের শিল্পীগণ ইহা দর্শনে বিম্বিত হয়। পঞ্চতল বিশিষ্ট ধর্মরাজের মন্দিরে সর্বোপরি উঠিলে দিগন্তব্যাপী নিলাধু রাশির শোভা নয়ন ও মন পুলকে ভরিয়া দেয়।



যৌগিক

উপজ্ঞাস

—৩রাধাচরণ চক্রবর্তী

২ রবিবারের দিন ওঁরা এম্বিন্দল বেঁধে বেড়িয়ে আসেন। দল বেঁধে এবং দীর্ঘ বিলম্বিত ছন্দে সে দিনও ওঁদের সাক্ষ্য ভ্রমণের সমাপ্তি গিয়ে পৌঁছেচে রাতের প্রহরে।

গলার ধার থেকে বাড়ীর পথটুকু পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করছেন। ফুটপাথের ভীড় অনেকটা বিরল হ'য়ে এসেছে, নীচের রাস্তাতেও গাড়ী-ঘোড়ার উৎপাত কম। ওঁরা নীচের রাস্তার একপাশ দিয়ে এসে ক্রসিংয়ের মুখে ফুটপাথে উঠে দাঁড়ালেন। একটা প্রকাণ্ড লরী প্রচণ্ড শব্দ করে' চলে গেল; ওঁরা ক্রসিংয়ে নামলেন।

বাতাস যেন সকলকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে! কল্পনা করা কঠিন, দিনে কি দারুণ রৌদ্র-রষ্টি হ'য়ে গেছে এই এতিনিউ-টার। দিনাস্তব্যাপী গুমোটের পর এই বাতাস...আঃ।

আঁচল সামলাতে সামলাতে অতসী বললে, "গাড়ী—"

ক্রসিংয়ের শেষার্ধ্বে অতিক্রম করতে করতে মুখ না ফিরিয়েই অধ্যাপক রায় বলেন, "সত্যি, এন্ড্রয়ব্ল।"

সকলের পেছনে নীতীশ তার ছোট্টদিকে বলছে, "ঠিক যেন গায়ের মাঠের মতই এখানকার হাওয়া।"

অতলা বিজ্ঞপের স্বরে বলল, "গড়ের মাঠে বৃষ্টি হাওয়া নেই।

গলির মুখেই বাড়ী। এ পাশে একটুকরা পোড়ো জমির আগাছা আর ইট-পাটকেল জঞ্জালে ভর্তি; ওপাশে একটা নতুন চারতলা বাড়ী উঠছে—তার কাঠামোটাকে ঘিরে' আস্ত আস্ত বাঁশের দাঁড় আর ভারী বাধা। বস্তুরূপের একটা কৃত্রিম কৃত্রীতা যেন মাথা উচিয়ে আছে। একদিক থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে এদিকে; ওদিকে একটা গ্যাস পোষ্টের আলোর অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা। দপ্পনে গ্যাসের বাতির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রায় একবার চাঁদের আলোর দিকে চাইলেন। অতসী ও অতলা দুজনেরই মুখে এসে চাঁদের আলো পড়েছে।

সকৌতুকে অতসী বললে, "কি দেখ্চ?"

রায় একটু মৃদু হাসলেন, উত্তর দিলেন না।

অতলা চকিতেই একবার রায়ের মুখের দিকে চেয়ে নীতীশের নাগাল ধরবার জ্ঞে এগিয়ে চলে।

তখনই ক'জনে এসে বাড়ীতে ঢুকলেন।

মোড়ের পাশাবী হোটেল থেকে আনিয়ে রাতের খাবারের ব্যবস্থা অতসী ও অতলা দুজনেরই ঘাণা সম্বিষ্ট হ'ল। চাকরকে ঠিক দশটার খাবার আনবার হুকুম দিয়ে টাকা গছিয়ে দেওয়া হ'ল।

সিগারেটের কোটা হাতে করে' দোতলার খোলা বারান্দায় রায় ওদের তেকে বেরিয়ে এলেন, "তোমরাও এস এখানে, হাওয়ার বসবে।"

নীতীশ তার পড়বার ঘরে গেল কালকের কঠিন রিইনজেন্সানের টাস্টটা আঞ্জই করে রাখতে। অতসী ও অতলা আগে-পিছে বাইরে এসে বসল।

গ্যাসের দপ্পনে বাতিটা বারান্দার এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে না। ফিকে চাঁদের আলোর বাইরের বস্তুরূপ একটা স্বপ্নময় রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইট-কাট-পাথর যেন ঠিক আর ইট কাঠ পাথর নয়। নতুন যে বাড়ীটা উঠছে তার সামনে ওখানটার অনেকখানি জায়গা জুড়ে একরাশ চূণ ঢালা; চাঁদের আলোর মনে হ'চ্ছে, সেগুলো যেন চূণের স্তূপ নয় চন্দ্রমল্লিকার রাশীকৃত গুচ্ছ।—চমৎকার!

রায়ের চিন্তাকেই যেন ভাষায় রূপ দিয়ে অতসী বললে, "চমৎকার...."

"কি?"

অতসী বলে, "কলকাতারও একটা সুন্দর রূপ আছে, যা তুমি স্বীকার করতে চাও না।"

অতলা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "গ্রামের চেয়ে সহরই আমার লাগে ভালো।"

রায়ের হাসিতে উপহাসের ছায়া পড়ে।—"না। চাঁদের আলো তোমাদের এই বিভ্রম ঘটিয়েছে। দিনের প্রকাশে সহরের রূপটা এমন সুন্দর নয়।"

—“কিন্তু এমন চমৎকার লাগছে এখন...চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।”

অতলা বলল, “এভিনিউটা যদি নদী হ’ত।”

রায় উৎসাহের সঙ্গে বললেন, “বিউটিফুল!...অতলা, তুমি কবিতা লিখতে চেষ্টা ক’রো।”

অতসীর দৃষ্টি অতলার মুখের ওপর দিয়ে এসে রায়ের চোখে ঠেকল। বলল, “গঙ্গার ধারটা আমার সব চেয়ে ভালো লাগে।”

একটু থেমে বলল, “আমার মনে হয়, এই গঙ্গাতীরই একদিন রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’কে ইনস্পায়ারড করেছিল।”

অতলা বলল, “দিদি, ভুলে’ যাচ্ছ যে, সেটা—‘ঝিলামের তীরে.....’।”

রায় বললেন, “অতলা সত্যি কথাই বলেছে। পরিকল্পনার পেছনে পারিপার্শ্বিক প্রভাব বড় কম কাজ করে না। কবি যদি কল্কাতার ডকের জেটীতে দাঁড়িয়ে স্থানলিলা গঙ্গার দিকে চেয়ে কাব্যের প্রেরণা পেতেন তাহ’লে বলাকার পরিকল্পনায় তাঁর কল্পনা উদ্ভাস হ’য়ে নক্ষত্রলোকে উড়ে’ চলত না। তাহ’লে—”

অধ্যাপক রায় যেন কলেজের ক্লাশে অধ্যাপনা করছেন, এমনি ভঙ্গীতে বলে’ চললেন, “তাহ’লে বিপরীত কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ বস্তু থেকে ভাবে না গিয়ে ভাব থেকে বস্তুতে নেমে আসতেন। সে কল্পনায় পৃথিবীর বন-পর্বত পাখা মেলে আকাশে পাড়ি দিতে উন্মুখ হ’ত না, আকাশ নেমে আসত ধরণীর ধুলির আবর্তে। তা হ’লে—”

আবার ‘তাহ’লে’।...অতলা মনে মনে কৌতুক অমৃভব করল, সাধারণ কথা বলতে বলতে উনি এমনি সিরিয়াস হ’য়ে ওঠেন। কিছু বলল না, কিন্তু ইচ্ছা হ’ল যে একবার বলে—লেকচার!

অতসী অন্ধার সঙ্গে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে আছে।

একটু থেমে রায় আবার স্বপ্ন করলেন, “দেখ অতসী, আজ গঙ্গার পোস্তার ওপর বসে’ আমি নীচের একটা খোলা আবর্তের দিকে চেয়ে ছিলাম। কত কি সব কুটিকাটি, কাঠ-কয়লার কুচি, একটা গোড়া বাঁশের খানিকটা, আরও কত এটা সেটা জঞ্জাল সেই আবর্তের টানে পড়ে পাকে পাকে ঘুরতে ঘুরতে এসে জলনাভি দিয়ে তলিয়ে

অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি কি ভাবছিলাম, জানো?”

“কি—?”—অতসী কৌতূহলের সঙ্গে আগ্রহ মিশিয়ে বলল।

রায় বললেন, “তখন জেটির আলোক পড়ে’ গঙ্গাবক্ষ ফস্ফরাসের মত জ্বলছে, তার ওপরে এসে পড়েছে জেটির প্রতিচ্ছায়া—অস্থির স্রোতে কাঁপছে। তীরে তীরে জাহাজ ও নৌকার সারি, ইত্যন্ততঃ ভাসছে বয়াগুলো,—মাঝগঙ্গা দিয়ে একখানা ষ্টিমফ্রাট চলেছে ধূয়ো উড়িয়ে, জেটির ওধার থেকে একটা ফেরী ষ্টিমার ছাড়ল...। মনে হ’ল, ঐসব জাহাজ, নৌকো, ষ্টিমফ্রাট, ফেরী, বয়াগুলো,—গোটা জেটিটা শুধু ভেঙে যেন ঐ আবর্তের মুখে চলেছে!”

একটু কেসে গলা পরিষ্কার করে’ নিয়ে রায় বললেন, “আমি যদি কবি হ’তাম তাহলে হয়ত’ আমার সাহসিক কল্পনা প্রত্যক্ষ করত, আকাশ ভেঙ্গে সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহতারা সব নেমে আসছে নিম্ন আবর্তের অভিমুখে...নেমে আসছে এবং তলিয়ে যাচ্ছে।...”

অতসী উত্তেজিত হয়ে উঠে’ দাঁড়িয়েছে।—“চমৎকার! ...এই নিয়ে আমি সত্যি একটা কবিতা লিখতে চেষ্টা করব।”

অতলা হাত নেড়ে বলল, “বলাকার পান্টা কবিতা! —কি নাম হবে দিদি, সেই কবিতার?”

রায় হেসে বললেন, “তলিয়ে যাচ্ছে এই অর্থে ‘অতলা’।”

অতসী বিস্মিত অর্থে রায়ের মুখের দিকে চায়।—অতসীর দিকে চেয়ে হাসছেন উনি।

অতলা—চন্দ্রালোকিত এভিনিউয়ের দিকে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে।

দিনের প্রকাশ বাড়ীটার বাস্তব রূপকে উদ্ঘাটিত করে’ দেয়। পারিপার্শ্বিকের বস্তুবিশ্বাস গৃহসৌন্দর্য্যকে সায়কবিক্ষ করে রেখেছে। স্বন্দরের সীমানা সঙ্কুচিততর হয়ে এসে কক্ষ ক’টির স্বল্প অবকাশে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

গৃহসজ্জার রুচি পরিবারের সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর না থাকলেও পরিচ্ছন্নতার শোভনতা

আছে। শেষের ছোট ঘরখানা নীতীশের পড়বার ঘর। মাঝেরটা অতলার জন্য নির্দিষ্ট; রাত্রে ঐ ঘরে ওরা ভাইবোনে মিলে থাকে—নীতীশ ও অতলা। এদিকের ঘর একাধারে লাইব্রেরী এবং শয়নঘর। এই ঘরখানাকে অতসী তার মনের সৌন্দর্য্য দিয়ে সাজিয়েছে। বইয়ের আলমারি এবং শেল্ফের বইগুলো সব তক্তকে বাক্বকে, —স্ববিস্তৃত। চেয়ার ক'খানা, এদিকের বড় টেবুল ও এদিকের ছোট ত্রিপদী, দেয়াল-গায়ের ত্র্যাক্ট আলনা, খাটের বাজু ও শিখান কাঠ—প্রভৃতির মার্জিত রূপ দেখলে মনে হয় আস্বাবগুলো যেন আজই নতুন কিনে আনা হয়েছে।

ত্রিখাদীর ফুলদানীতে খোলা বারান্দার টব থেকে আশ্রিত একটি নাম-না-জানা ফুলের গুচ্ছ...অতসী আপন হাতে জল ঢেলে ফুলের গুচ্ছকে তাজা রাখে।

বস্তুর পর আসে মানুষ। যে মানুষ ক'টি দিয়ে এই ক্ষুদ্র পরিবারটি গঠিত, তার পেছনে একটি আনন্দ-বেদনার বিচিত্র ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে।

অশেষ রায় আর্টের শেষ পরীক্ষা দিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট হ'য়ে পাশের খবর তখনও বেরোয়নি। মেসে থেকে টিউশানি করে আর ভেবে ঠিক করতে পারেনা অতঃপর আইন-আয়তনে ঢুকবে, না চাকরীর চেষ্টা করবে। এমন সময় একদিন এক বাস-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে বরানগরবাসিনী এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পরিবারের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয় ঘটে। পরিচয়ের পরব্যায় ঘনিষ্ঠতায় ঘনীভূত হয়। শিক্ষয়িত্রীর শ্রামশ্রী দুটি শিক্ষিতা মেয়ে—অতসী ও অতলা। অশেষের চিন্তা আকর্ষিত হয়—কিন্তু বুঝতে পারে না ঠিক কোন দিক থেকে আকর্ষণ আসছে।

বিপর্য্যয়ের ফলে বুক ও পাক্রের আঘাত পেয়েছিলেন শিক্ষয়িত্রী, কিছুদিনের মধ্যেই তা' তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়াল। মৃত্যুকালে তিনি অশেষের হাত ধরে 'অমরোধ করে' গেলেন সে যেন তাঁর বড় মেয়ে অতসীকে বিয়ে করে, যেহেতু তিনি জানেন, মেয়ে তাকে গভীর ভালবাসে।

গভীর ভালোবাসা!...ভাবপ্রবণ অশেষ অমুগ্ধব কবুল,

তার নিজের ভালবাসাও অগভীর নয়। গভীর এসে হৃগভীরে পরিণতিলাভ করে। এবং, তার ফলে—!

পিতৃমাতৃহীন যুবক অশেষ। অভিভাবক তার পিতৃব্য। তাঁর মত মাত্র না নিয়েই সে কুমারী অতসী সরকারের সহিত আনুষ্ঠানিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পিতৃব্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে।

বর্তমানে অশেষ রায়—অধ্যাপক এ, সি, রায় একোয়ার। নদার্ণ কলেজে দেড়শ' টাকা বেতনে অধ্যাপনা করেন এবং প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রিকায় উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ লেখেন। অতসী, অতলা ও নীতীশের মাতৃধন হাজার দুইটাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে; রায় এখন সেই টাকার ধরিরক্ষক এবং টাকার মালিকদের একমাত্র অভিভাবক।

এরপর—পটভূমিকার ওপর আখ্যায়িকার ক্রিয়া-শীলতা।

অশেষ যখন তাঁর ফাউন্টেন পেন এবং মোটা রাইটিং প্যাডখানা নিয়ে খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এসে গোল টেবুলটার সামনে দাঁড়ালেন, তখন—অত সকালেই বাইরের রাস্তায় রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে, যদিও গৃহ-পরিবেশের স্নিগ্ধতা নষ্ট হয়নি তখনও।

বারান্দায় ছাদের নীচে এদিকটায় কয়েকটা ফুল গাছের টব। অত সকালেই কে চারাগুলোর গোড়ায় এবং গায়ে জলের বারা দিয়ে গেছে। চক্চকে তাজা চারাগুলোর দিকে চেয়ে রায় ভাবলেন, আর কে—অতসীই। ওর দৃষ্টি এতটুকু এড়াই না।

চেয়ারে বসে প্যাডখানা টেবুলের উপর রাখলেন। এদিকের দোর গোড়ায় বসে ভূত্য বন্দীনাথ পুরাণো প্রাইমাস্টার বার্ণার পরিষ্কার করছে নিডল খুঁচিয়ে। অতলার আঁচলের পাড়টা একবার খেলে গেল চৌকাঠের পাশ ঘেঁসে। অতসী এখনও কলতলা থেকে আসেনি; এসে নিজ হাতে চা তৈরী করবে।

অশেষ চোখ ফিরিয়ে আবার টবগুলোর দিকে চাইলেন। একটা চারা পাছে কয়েকটা কুঁড়ি ফুল হ'য়ে

ফুটে উঠবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পাপড়ির জোড়ে নতুন রঙের ছোপ স্পষ্ট দেখা যায়! ...প্যাডখানা টেনে নিলেন তিনি হাতের কাছে।

কালকের রাতের কথোপকথন তাঁকে একটি নতুন রচনার খোরাক জুটিয়েছে। ভাবী প্রবন্ধের শিরোনামটি ধীরে ধীরে লিখলেন; বলাকার প্রেরণা এক লাইল—
I saw eternity the other night—মটোর পর প্রবন্ধ শুরু হল,—

“অসীমের যে অনির্বচনীয় রূপের প্রতিচ্ছায়া এসে পড়ে আমাদের সীমা-সঙ্কীর্ণ বাস্তব জীবনের ওপর আমরা সাধারণ মানুষ সংসারের কার্যব্যস্ততার উদ্ভাস্তির মাঝখানে সেই...”

কর্ণ-পীড়াকর!—কলম ধামিয়ে বিরক্তি স্ফূর্ত জরুজিত করলেন। আবার আসছে কাণে—আবারও।—কি রং প্রোনান্শিয়েসন ছোকবার!...ওদিকে কি কেউ নেই? ‘অতলা, অতি’?

অতলা ওঘর থেকে জবাব দেয়, “কি—জামাই বাবু? অশেষ চৈতন্যে বলেন, তোমার ভাই কি পড়ছে মাথামুণ্ড, শুন্চ না?”

অশেষ আবার হৈকে বললেন,—“কিং অব দি ক্রোকোডাইল পড়ছে চোকরা, রীদম্ ত’ কেটে যাচ্ছেই, তার ওপর যা-তা বলছে।”

অতলা ভঙ্গী করে বলতে বলতে বেরিয়ে আসে দালানে “ও অম্নি পড়ে, বুঝেছেন? অফনকে বলে অফ্টেন, আবার—সেই ‘ক্যাছাবিয়াঙ্কা’ পোয়েমটার বলে কিনা,—‘ষ্টুড অন দি ফারমিংডেক’—ডেকের ওপর চাষ করছে।

“চা-যা” অক্ষুধস্বরে বলে অতলা আঁচল লুটিয়ে চলল লক্ষ্মীনাথের পাশ কাটিয়ে।

যাঃ—! ওর আঁচলের টানের হৈচকায় পুরানো ষ্টোভটা সশব্দে পড়ল কাত হ’য়ে—বার্ণারটা ছিটকে গেল রেলিং গলিয়ে।

আতঙ্গী এসে দুয়ারে দাঁড়িয়েচে।—আহা! এমন সখের প্রাইমাস ষ্টোভটা!

তিরস্বারে তীব্রতা ফুটে ওঠে, “একেবারে চোখ কপালে তুলে’ হাঁটো কিনা!”

অশেষ ফাউন্টেন হাতে অকু স্থানে এগিয়ে আসেন। “থাক্, তা’হোক্। অতি’র চোট লাগল না’ত’ পায়ে!”

আতঙ্গী আত্মবিরক্তিতে বলে, “দেখত’ কি দিয়ে আমি এখন চা করি—সেদিন ও স্পিরিট ল্যাম্পটারও করেছে এই দশা!”

“ভালোই হ’ল,” অশেষ বলেন, “ষ্টোভটা জখম হয়ে ভালোই হ’ল, না’ত’ এই গরমে চা খেয়ে জখম হতাম আমরাই—! অতঙ্গী এক কাজ করবে দয়া করে? লক্ষ্মীনাথকে দিয়ে ঐ পাঞ্জাবী হোটেল থেকে সেই যে কি সেই ঘোলের কি, আঃ! নামটাও আসছে না মনে,—তাই আনাও এক কেট্‌লী।”

অতলা যেন আপন মনেই বলে, “লো-ও-স্ত্রী।”

“নস্ত্রী নয় যে, তাই ভালো।” অশেষ হেসে বলেন। অতঙ্গী হাল্কা মুখে বলে, “খাচ্ছা”

অশেষ আবার প্যাড্ টেনে নিয়ে বসেন। কিন্তু মুড়টা তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে! “এসব সিরিয়াস্ সাবজেক্ট নিয়ে একটু নিরিবিলিতে না বসলে—”

অসমাপ্ত বাক্যাংশটা শেষ করছেন, এমন সময় অতঙ্গী এসে বসল পাশের চেয়ারে—“লক্ষ্মীনাথকে পাঠালাম।”

“বেশ,” অগ্নমনস্কতার বাক্যাংশে দুটি ভুল শব্দ যোগ করে’ ফেলে’ অশেষ বললেন, “অতি’ গেল কোথায়?

“নীতীশের ঘরে। তারই কথা বলছি কিন্তু”

অশেষের প্রারম্ভ প্রবন্ধের ওপর কুঁকে পড়ে অতঙ্গী সহসা আশ্চর্যের স্বরে বলল, “কিন্তু তুমি অতলাকে সাবজেক্ট ম্যাটার করে আর্টিকল লিখছ নাকি?

লজ্জিত বিষয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, সত্যি, অতলা স্পর্শ লিখতে ভুল করে অতলার নামটি লিখে ফেলেছেন পংক্তিতে। স্বরে কুণ্ঠা ফুটে উঠল “স্লিপ অব পেন! থাক্, রাতের নিরিবিলিতে না হলে আমার এ লেখা হবে না। যে সব বাধা বিপত্তি।”

অতঙ্গীর মুখে একটা প্রকাশমান ভাব দ্রুত প্রচ্ছন্ন

হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, “অতিরিক্ত কথা বলছিলাম। তুমি ওকে বড় ইন্ডালজেন্স দিচ্ছ আজকাল।”

অশেষের চোখে প্রশ্ন ফুটে ওঠে।—‘মানে’ ?

—“মানে, কিছুই বল না ওকে। আজ এটা ভাঙছে, কাল সেটা চূবড়ে—অপরা মেয়ে। তারপর, সেদিন ও নীতের কাছে কি বলেছে জানো, তোমাকে বলিনি আর আমিও ছেলেমানুষি বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি কথাটি, কিন্তু আসলে তা ঠিক ছেলেমানুষের কথা নয়। ও বলে কি না, আমার ওপর ও জেলাস্”

অশেষ হেসে ফেললেন। “হাঃ হাঃ জেলাস্! কেন, বড় খালায় করে খেতে দেওয়া হয়নি বলে?”

অতসী একটু হুঁকোখা হাসি হাসল। শ্লেষের স্বরে বলল, “হ্যাঁ, বড় খালায় করে খেতে দেওয়া হয় না বলেই—এতই ও ছেলেমানুষ! আমার চেয়ে ছ’বছরের শুধু ছোট ত’।”

অশেষ গম্ভীর হয়ে ওঠেন। “হ্যাঁ, তা কি?”

অতসী নিরন্তরে বলে, “ওর জেলাসিও সেটারে রয়েছে। তুমি! আমি নাকি—আর আমি বলতে পারব না। যদি বুঝে না থাকো ত’ না বোঝাই ভালো।”

অশেষের মুখের গাভীখ্যে ভাবপরিবর্তনের জোরাকাটা দাগ পড়ে।

অতসী ভাবে, উনি বিরক্ত হলেন। কোমল স্বরে বলে, “তোমার এতে মন খারাপ করবার কিছু নেই। তোমার কাছে আর ও’ প্রশ্ন না পায়, তাই বলি। আর পারো যদিও তোমার কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ওর জন্তে একটি”

কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই অশেষ বলে ওঠেন, “অধ্যাপকের কাজ আর ঘটকের কাজ এক নয়।”

বলেই আবার কি ভেবে বললেন, “আমি চেষ্টা করব যখন তুমি এতই ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।”

লক্ষ্মীনাথ কেটলী ভরে কোন্ড ড্রিক নিয়ে এসেছে। ওঘর থেকে নীতিশ আর অতলা বেরিয়ে এল। অতসী নিজে পরিবেশনের ভূমিকায় না দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীনাথকে ভার দিল।

ঘোলের আসর একেবারেই জমল না। সকলেই নির্বাক। অতসী ভাবল, অনর্থ ঘটিয়েছে বৃদ্ধো প্রাইমাস টোভটাই। অভিমানী মন নিয়ে তখনই সে নীতিশের অহুগামী হ’ল।

অতসী স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে উঠে গেল লক্ষ্মীনাথকে ভাড়া বুকিয়ে দিতে এবং বাজাবে পাঠাতে। লক্ষ্মীনাথ একাধারে তাদের পরিচরক ও পাচক।

প্যাডের প্রথম পাতাখানা প্যাড্ থেকে খসে’ যখন অশেষের হাতের মুঠিতে গুটি পাকিয়ে গেল, তখন তিনি ভাবলেন, আইডিয়ালিষ্টিক এবং রিয়ালিষ্টিক ওয়ার্ল্ডের সংঘাতের কথা।...কিন্তু তিনি ঐ সঙ্গে আর একটি কথা ভাবলেন না—যে, ছ’টি ভিন্নধর্মী উপাদান মিলে’ যে বিচিত্র পরিণতি আনে, সেই যৌগিক ধর্ম মানুষের মনের দিক দিয়ে আরও অভাবনীয় ভাবে ঘটে।

সেই যৌগিক পরিণামের সূক্ষ্ম কারণ-বীজ নিয়ে একদা জাম্‌সেদপুর থেকে এক পত্র এসে উপস্থিত হ’ল। পত্রখানা অতসীর একখানি পূর্বপত্রের উত্তর। লিখেছে তার গত দিনের এক সতীর্থ, যে এখন তার স্বামীর সঙ্গে প্রবাস-জীবন যাপন করে। তার স্বামী নাকি ফিলাডেলফিয়ার উপাধিওয়ালা একজন নামকরা ডাক্তার, টাটানগরের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি।

অতসী পত্রখানা পড়ে’ অশেষকে দিল। অশেষ পড়লেন :

টাটানগর, জাম্‌সেদপুর

১১/৫/৩৮

প্রিয়তমাসু—

অতসী, কতদিন পর তোমার এই পত্রখানা পেলাম এবং কত যে খুসী হলাম! প্রোফেসর মশাইকে আমার নমস্কার দিয়ে।

তোমার-বোন সম্পর্কে কথাগুলো আমি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি এবং ভেবেছি। এখানে বাঙালী খুব বেশী নেই, তারই মধ্যে চেষ্টা করব। তবে একটা কথা আমার মনে হয়েছে, তাই লিখছি। তুমি হয় ত’ জানো না, আমার এক বিরাগী বৈমাত্র দেবর আছেন—নাম তাঁর

দেবনাথ। আমেরিকার লোক তাঁকে দেবানন্দ স্বামী বলে' শ্রদ্ধা করে। তিনি সম্প্রতি সন্ন্যাসে বীতরাগ হয়েছেন এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছেন—অর্থাৎ আমাদের এখানেই আছেন। ভাবে বোঝা যায় সংসারধর্মের প্রতি যেন মন খুঁকেছে, মুখে যদিও কিছু বলেন না। এখানে নাকি তাঁর মন টক্ছে না, ক'লকাতা যাব-যাব করছেন। বল' ত' কায়দা করে' তোমাদের ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাঁকে মেয়ে গছানো বড় সহজ কথা নয়—মেয়েদের সাধারণতঃ তিনি তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে' থাকেন এবং অল্প-জ্ঞান বলে' অহুঁকম্পা করেন। তোমার বোন কি পারবে এত বড় গুণী লোকের মনোহরণ করতে ?

অধিক বাহুল্য। বুঝে' এবং বিবেচনা করে' আমাকে জানানবে। ভালো আছি। ভালবাসা নেবে। *ইতি—
তোমারই নীলি

পুঃ ধীর কথা লিখলাম, বর হিসাবে তাঁর স্বাস্থ্য এবং চেহারার তুলনা নেই। শুনেছি যথেষ্ট টাকাকড়িও আছে হাতে।

পাঠকারীর মুখে এক গান্ধীর্যের ছায়াপাত ক'রে পত্র-খানি শেষ হ'ল। অতনী কি বলতে গিয়েও থেমে গেল এই লক্ষ্য ক'রে যে আবার উনি গোড়া থেকে শুরু করেছেন। দ্বিতীয়বার পাঠের পর সেখানি না মুড়েই অশেষ অতনীর দিকে চেয়ে বললেন, “পড়লুম।”

অতনী বলল, “কি মনে হয় তোমার ?”

অশেষ বিজ্ঞপ করলেন কি না ধরা কঠিন।—“রাজপুত্র এবং অর্ধেক রাজ্য।”

অতনীর মুখের আশাঘ্রিত ভাব বিধায় দোল খায়। বলল, “ভরসা হয় না এই ভেবে যে লোকটা বিরাগী প্রকৃতির এবং মেয়েদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে' থাকেন।”

অশেষ কৃত্রিম গান্ধীর্যে বললেন, “অর্থাৎ পঞ্জীরাজ ঘোড়ায় চড়ে' থাকেন.....”

অতনী তথাপি বিজ্ঞপ মনে কবুবার স্বযোগ পেল না। উনি যেমন সাধারণ কথাতেও সিরিয়াস হ'য়ে ওঠেন, তেমনি সিরিয়াস কথাতেও সাধারণ হ'য়ে পড়েন—এ ওর

পুরাণো স্বভাব। সে তবু বিরক্তি দেখিয়েই বলল, “সব কথাতেই হেঁয়ালি..... আমি তোমার মত জিজ্ঞাসা করলুম।”

অশেষ এবার সহজভাবে হেসে বলেন, “সৌজ্ঞা কথায় যদি হেঁয়ালি মনে কর, আমার কি দোষ! পঞ্জীরাজ ঘোড়ায় চড়ে' পৃথিবীর দিকে চাইলে সব কিছুই নগণ্য ব'লে মনে হয়।..... মেয়েদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবার আর কি কারণ থাকতে পারে ?”

অতনী মুহু হেসে বলে, “আমেরিকা-ফেরতা মানুষ। সে দেশের মেয়েদের তুলনায়.....”

অশেষ ভ্রমসংশোধনের স্বরে বলেন, “এদেশের মেয়েরা নগণ্য।”

অতনীর মুখের হাসি চোখে ভেসে ওঠে।—“ও সব দেশে অনেকদিন থেকে এলে প্রথম প্রথম অম্মি মনে হয়, শুনেছি।”

—“কিন্তু আশার কথা এই যে, অল্প জানী ব'লে ওদের আবার অহুঁকম্পাও করে' থাকেন উনি!—পিটি!”

“তাহ'লে আশ্বস্ত হ'তে পারি।” ব'লে অতনী উচ্চে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে অশেষ গেলেন সহসা গভীর হ'য়ে।

উচ্চ হাসিতে আকুণ্ঠ হ'য়ে অতলা আসছে। চৌকাঠে পা দিয়েছে, পেরোয় নি। মুখ বাড়িয়েছে—অশেষ দেখলেন, মুখখানি অকারণ হাসিতে ভরা। অতনী এ-মুখ হ'য়ে আছে, ওকে দেখতে পায়নি।

“এস এস, এগিয়ে এস—সন্দেশ খাওয়া হচ্ছে!”—হাসতে হাসতে হাত তুলে' অশেষ বললেন।

“কোথায় সন্দেশ ?—ঠাট্টা করছেন জামাইবাবু। কিসের সন্দেশ” বলতে বলতে এগিয়ে এল অতলা।

অশেষের হাতে সেই খোলা চিঠি। “এই নে!” ব'লে ওর দিকে ছুড়ে ফেললেন।

“আঃ! একবারেই বুদ্ধিশুদ্ধি নেই!”—অতনী তাড়াতাড়ি লুফে ছুহাতে ধ'রে ফেলল।

কি এমন নিষিদ্ধ জিনিষ বে দিদি অমন ক'রে লুকেতে চান!—অতলা হাতে দিয়ে ছিনিয়ে নিতে চায়।

“রাখ, রাখ” করতে করতে,—কাগজখানার ছ'মুড়া

হুহাতে চেপে ধরেছে অতসী,—মাঝের খানিকটা ছোঁ
মেয়ে ছিঁড়ে নিল অতলা।

হুঁপা পিছিয়ে গিয়ে ক্রত দৃষ্টিতে পড়ে ফেলল গোটা
আড়াই লাইন—কোনই বৈচিত্র্য নেই। অতসীর দিকে
হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “নাও দিদি তোমার আমেরিকান
সন্ধ্যাসীট, শ্রদ্ধা ক’রে রাখো বাজে।”

নিবন্ধ পত্রাংশটুকু অতসীরই হাতে। তবু—“দেখ
‘ও’ মেয়ের ছুটু মি! ছুটু মি কি, আশ্পর্কী.....কি নিলজ্জ
সাহসিকতায় কেমন ক’রে ছিনিয়ে নিল চিঠিখানা হাত
থেকে টেনে ছিঁড়ে!.....মেয়ে হয়ত’ ওর জামাইবাবুর
সঙ্গেও এমনি কাড়াকাড়ি করতে পারত যদি এটা থাকত
তঁারই হাতে!”...জোখে যেন অতসীর বাকরোধ হ’য়ে
গেল; সে শুধু তীব্র দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে
রইল।

আশ্চর্য! ন যদৌ ন তহৌ—অতলাও দাঁড়িয়ে রইল
অনড় হ’য়ে ওর দিদির চোখে স্থির চোখের দৃষ্টি হেনে’।

মুহূর্ত্ত থেকে মিনিট। তারপর ছজনই যেন হেসে
ফেলবে—কিন্তু হেসে ফেলল শুধু অতসীই,—অতলার
চোখের কোণ দিয়ে টম্ টম্ ক’রে কয়েক ফোঁটা জল
গড়িয়ে পড়ল ওর গালে।

অতসী একেবারেই হতভম্ব।.....হঠাৎ পেছন ফি’রে
আশ্চর্য ক্রততায় বেরিয়ে গেল অতলা ঘর থেকে।

অশেষ যে কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।
টেনিসনের সেই ‘idle tears’ এর কথাটা কেনই বা তাঁর
মনে পড়ে যায়।...অশ্রু,—অকারণ অশ্রু।

মনস্তাত্ত্বিকের অভিজ্ঞতা হয় ত’ এর মধ্যে কারণের
আরোপ করতে চাইত। অথবা হয় ত অকারণই ঐ
পত্রখানাকে কেন্দ্র ক’রে সেদিন সমস্ত দিন মাছুষ তিনটির
মনের সহজ অচ্ছন্দতা একটা হুঁকোখা বেদনা বোধে
ব্যথিত হ’য়ে রইল।

দিন এসে সন্ধ্যায় ঠেকল। অশেষ কলেজ থেকে
ফিরেই বেরিয়েছিলেন কোথায়। এসে চায়ের আসর
জমাতে চাইলেন। চা-পান চলল কিন্তু আসর জমল না।
ইমার্গন নিয়ে বসলেন অশেষ; অতসী সেলাই নিয়ে।
অতলা যেন গরম বাঁচাবার জন্তেই বারান্দার আলোকহীন

অস্পষ্টতায় দেয়াল ঠেসান দিয়ে ব’সে রইল চুপচাপ।

ওদের অজ্ঞাতে বাড়ীটাতে যেন কেউ ব্যাধিগুস্ত
হ’য়ে পড়েছে।.....চনা-ফেরা, দৈনন্দিন কৃত্য সব আজ
সম্বপিত, শব্দগুস্ত এবং স্থানিয়স্থিত। একমনে নীতিশ
তার পড়বার ঘরে ভুল উচ্চারণের “কারমিং” ডেকে উঠে’
নিরঙ্কুশ বিচার চাষ ক’রে চলল।

খাওয়া দাওয়ার পরও এসে নীতিশ আবার তার পুঁথি-
পত্রের নিরে বসেছে। কালকের দু’হুটো সাংঘাতিক
পিরিয়ড ওদের সেই মারমুখো মাষ্টারটির। দু’একটা
কানমলা বা বকাঝকি দিলে কিছু এসে যেত না, কিন্তু
তিনি ‘নিল ডাউন’ বা ‘ষ্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেক’ না
করিয়ে দিয়ে ছাড়েন না—তার ভারী লজ্জা করে।...প্রথম
ধীরে ধীরে, তারপর তার অজ্ঞাতেই তার স্বরগ্রাম উঠল
উচ্চ হতে উচ্চতর সুরে।

অতলা ওর কামরায় এসে বিছানাটা টেনে টুনে নিয়ে
শুয়ে পড়বে, কিন্তু—শুয়ে পড়বে কি, নীতিশ এ ঘরে না
এলে ত’ ও বাতি নিবিয়ে শুতে পারছে না। মাঝের
খোলা দরজা দিয়ে ও ঘরের দপদপে বাতির আলোর
খোঁচা এসে সোজা লাগছে ওর চোখে। এঃ যে গরম!
আর কি ষাঁড়ের মত টেঁচিয়ে পড়ছে,—ইঃ! সছঃ হয়
না ত আর।

“নীতে—নীতে,—নীতিশ!”—এদিকে ও ই কছে,
ওদিকে সে বেপরোয়া প’ড়েই চলেছে।

ইচ্ছে করেই শুন্ডে না!...একটু এদিকে এগিয়ে
আসে। মাঝের দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে তরুণী
তুলে বলে, “নীতে, থাম্ বলছি! অমন করে ষাঁড়ের মত
টেঁচালে টিক্তে পারে মাছুষ এ ঘরে?”

নীতিশ একবার চোখ উচু ক’রে তুলেই আবার নীচু
করে বইয়ের ওপর বুকে পড়ে স্বরু করল: “আই হ্যাড
‘অক্টেন’ হার্ড অব লুজি গ্রে...”

“নীতে”, বলে অতলা চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দাঁড়ায়।

নীতিশ আড়চোখে চেয়ে দেখে’ মুখ না তুলেই বলে,
“এ ঘরে টিক্তে না পারে মাছুষ, টিক্ত গিয়ে ও ঘরে।”

হঠাৎ অমন রেগে ওঠা অতলার পক্ষে অস্বাভাবিক।
যে অজ্ঞাত আঘাত ওকে মনে মনে উত্তপ্ত করে’ রেখেছে,

তারই একটা প্রতি-আঘাত করবার ইচ্ছা ওর অজ্ঞাতেই ওর মনে জেগে উঠেছিল। ও' তবু তবু করে' সোজা এসেই নীতীশের বইয়ের ওপর বুকে-পড়া মাথাটা চুল ধরে' ইচ্ছা টানে টেনে' তুলল।—“ফাঙ্কিল ছেলে...!”

নীতীশ একেবারেই কঁদে ফেলেছে! টেনে টেনে শুধু বলল, “আমাদের সেকেণ্ড মাষ্টা...”

অতলা নীরবে নিজের ঘরে চলে' আসে ওকে একটা মাত্রও সাহসনার কথা না বলে'। দিদির ভাবান্তর লক্ষ্য করে' নীতীশ তখনই থেমে যায়।

ও ঘরে—

অশেষ বলেন, “ওরা আবার কি গুণগোল বাধালে ওদিকে?”

অতলা পাশ ফিরে' শুতে শুতে বলে, “লক্ষ্মীছাড়ী ত' গুণগোল বাধাতেই রয়েছে!”

—“নীতি', ঘুমোলি না কি ভাই—?”

একটু দেরী করে' উত্তর আসে, “উছ”।

—“কেন, ঘুম আসছে না গরমে?—জানালায় বাতাস খেলছে ত' বেশ।”

একটু দেরীতে উত্তর আসে, “না।”

—“না—কি রে?”

“গরম নয়।” বলে'ই আবার নীতীশ চুপ করে' যায়।

অতলা আশ্চর্য হ'য়ে বলে, “গরম না—তো কি? থমকে থমকে কথা কইছিস...কি ভাবছিস।”

নীতীশ যেন বিরক্ত হ'য়েই বলে, “ভাবছি না,—মুখস্থ করছি। ফাষ্ট পিরিয়ভেই কাল...”

ও:।...অতলা আশ্বাসদানের স্বরে বলে, “তোরা সেই ‘লুসি গ্রে’ ত' ?—কাল আমি ব.স থেকে তোকে মুখস্থ করিয়ে দেব।—বুঝলি?”

“হু”।

এর চৌকীখানা লম্বালম্বি, ওর চৌকীখানা আড় করে' পাতা—হাত বাড়িয়ে ওকে ছোঁয়া যায়। অতলা হাত বাড়াল। এই নীতীশের বালিস,—এই ওর মাথা।...ওর মাথার চুলে আস্তে আঙুল বুলিয়ে অতলা কোমল স্বরে বলে, “মাথায় খুব লেগেছে তখন, না? চুলের গোড়ায়—ব্যথা পাচ্ছিস এখানে, ভাই।”

নীতীশই যেন অতলাকে সাহসনা দেয়: “এই একটু-একটু...তা' সে কিছু নয়। তাই বুঝি তুমি ভাবছ এতক্ষণ ধরে'।”

দিদি ভাইটির মাথায় কপালে এক মুহূর্ত চুপ করে' হাত বুলিয়ে চলে।—ও' যেন মনে মনে কি ভাবছে!

—“নীতে'।”

—“কি? খুম পাচ্ছিল ছোট দি', ভাঙিয়ে দিলে।”

অতলা ঘুমের গুরুত্বকে লঘু করে' দেয়; রাত বেশী হয় নি ত, ঘুমোবি পরে।”

একবার কেসে গলা পরিষ্কার করে' নিয়ে বলে, “তোকে কাল এক মজার জিনিষ দেব, বলত কি মজার জিনিষ!...”

নীতীশ বলে, “খাপি' বয়—?”

—পারলি নি বলতে। সেই এ্যারোপ্লেন, দম দিলে যা' মেঝের ওপর ওঠে আর পড়ে ঠিক উড়বার ভঙ্গিতে।

তাই নাকি ছোটদি'!—নীতীশ আর খুসি ধরে রাখতে পারে না।

“চেষ্টা নি; সত্যি দেব।” বলে' অতলা আবার চুপ করে' গেল।

এবার নীতীশই ছোটদিকে ডাকে, “খুমলে, ছোটদি' সেই এ্যারোপ্লেনটা...”

ছোটদি' বলে, “নীতে তুই কাকে সব চেয়ে ভালো বাসিস বল ত?”

—“তোমাকে ছোটদি'!—ও চিন্তামাত্র না করাই বলে।

—“কেন বড়দিকে না?”

—“তাকেও।”

—“তোরা রায় মশাইকে?”

নীতীশ শুধু বলল, “ভারী কড়া মেজাজের মানুষ।”

“কড়া মেজাজের মানুষ? হবেও বা।” অতলা আবার বলে, “কড়া মেজাজের মানুষ বলেই বুঝি ভালো বাসিস না?”

নীতীশ নিস্পৃহ ভাবে বলে, “বাসি—একটু একটু।”

অতলা থুক করে' একবার কাশে। বলে, “তোরা জামাইবাবু কাকে ভালো বাসেন রে সব চেয়ে বেশী?”

নীতীশ এবার একটু ভাবে!—বড়দিকে। আর, আর—

—বা:। থেমে গেলি যে?”

নীতীশ ভয়ে ভয়ে বলে “তোমাকেও...”

ভয়ের কোন কারণ নেই। অতলা মুহূর্ত হেসে বলে, “কেমন করে' জানলি?”

সপ্রতিভ ভাবে নীতীশ বলে, কেন সেদিন তুমি জামাই বাবুর অমন দামী ঘড়িটা ভান্ডলে হাত থেকে ফেলে দিয়ে,—কিছুই বললেন না তিনি। বরং বড় দিকেই বকলেন। অতলা অগ্রমনস্কতার স্বরে বলে, “তাতে কি...?”

নীতীশ বলে' ফেলেই ভয় পায়: “আমি জানি দিদি, তোমার সব কাজেই জামাই বাবুর পাশিয়ালিটি।”

অতলার চোক বুজে এসেছে। হাই তুলতে তুলতে বলে, “আমার ঘুম পেয়েছে ভাই, চুপ করো।”

ক্রমশ:



সুপ্রসিদ্ধা মহিলা লেখিকা শ্রীমতী পাল বাক
গত বৎসর ইনি সাহিত্যে নোবেল-প্রাইজ পাইয়াছেন

বঙ্কিম-সাহিত্যে গার্হস্থ্য-জীবন

সমগ্র সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিমাধুর্যের মূলটির প্রতি সূক্ষ্ম অনুভূতিতে লক্ষ্য করলে সম্যক প্রতীয়মান হয়, যে একটি উদ্দেশ্য সাধনকেই ভিত্তি গৌণে সাহিত্য হয়ে ওঠে গঠিত, হয় রূপে রসে সম্ভাবিত, সমৃদ্ধ; বিশমানবের এক অভিনব সম্পদ হয় সে তখন। বঙ্কিমসাহিত্যে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যই ছিল অতুলনীয়। যেন অস্তঃসলিলা ফাস্কানদীর মতই একটি মহান আদর্শের সুরে নিরবচ্ছিন্ন বহুত তাঁর সাহিত্য। এই আদর্শের অক্ষুণ্ণতাই গার্হস্থ্য জীবনের প্রতীক স্বরূপ তাঁর সামাজিক গ্রন্থগুলিতে সমাজের এবং সামাজিক মানব জীবনের প্রকৃষ্ট আলেখ্য-গুলিকে নিখুঁত নির্বাচনে ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষনে পরিষ্কৃত করে তুলেছে। “কৃষ্ণ কান্তের উইল”, “বিষবৃক্ষ”, “দেবী-চৌধুরাণী”, “ইন্দিরা”, “কপালকুণ্ডলা”, “চন্দ্রশেখর” ও

“রজনী” এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। নন্দনবনের করিবৃথের মতই গার্হস্থ্য জীবনে অপ্রাকৃত প্রেম ও অর্থের অজস্রতাই আনে বিপ্লব; ধীরে ধীরে সন্দোপনে কণ্টকের মতই বৈরী হয়ে ওঠে, তারই দৃষ্টান্তে যেন এই কৃষ্ণকান্তের উইলের সৃষ্টি। ছিল স্বথ ও প্রাচুর্যের নদীতে টলমলে হরিদাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের, জী পুত্র, ভাতুপুত্র ও তার বহু দাসদাসী বেষ্টিত সংসারের ভরা তরলীখানি; হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের উইল সে নদীতে আন্লে তুফান, সেই উইলই সে স্বথের সংসারে ফাটল ধরালে। তারপর এল বালবিধবা রোহিণী ভর যৌবনের অসংযত প্রেম নিয়ে—তারই উৎস দিল সে তবকে ডুবিয়ে, ফাটল ধরা সংসারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে তাজলে। যে ভ্রমর ছিল গোবিন্দলালের প্রাণের উৎস, মনের গ্রন্থ, নয়নের মণি, এমন একদিন এল যেদিন সেই ভ্রমর ছোল

গোবিন্দলালের অসহনীয় ; যেন তাঁর মনের বনের গোলাপ-ফুলটী মরে গেল, তার কাঁটাগুলোই তাঁকে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগলো। দাস, দাসী পাড়াপ্রতিবেশীরাই এ পথে সহায়তা করলে, ভ্রমরের প্রতিবাসীদের ঈর্ষ্যা ছিল ব্যাকুলিত, তারা একবিন্দু জলের মত ঘটনাকে সমুদ্রের মত উদ্বেল করে তুললো ; যা হয়নি, যা ঘটেনি তারই অমূলক প্রচার সত্যের রূপ ধরে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠলো। এই ঘটনা প্রচারের মধ্যে অপবাদটুকুর জন্তই ভ্রমর গোবিন্দলালের পরে অভিমান করে গেল চলে পিত্রালয়, আর তারই পত্রাবাতে প্রবাসী গোবিন্দলাল যেন আকাশ থেকে খসে পড়লো। যে সংঘনী গোবিন্দলাল অসংযত চিত্ত-উদ্বেলকে সংযত করতে প্রবাসী হলেন, তাঁর নামে এ কি কলঙ্ক ? তিনি ছুটে এলেন গৃহে—কিন্তু ভ্রমরকে পেলেন না—চিত্তের বাঁধ তাঁর গেল টুটে, ভ্রমরের প্রতি তিনি হলেন ক্ষুব্ধ, ক্রোধে উন্নত, বিদ্বেষে তাঁর অভিমানী মন এর প্রতিবিধানে উন্মূখ হয়ে উঠলো ; স্বীয় প্রতি প্রতিশোধ নিতে তিনি চাইলেন। এ পথে রোহিণীর প্রেম তাঁকে করলে সহায়তা, ছাই চাপা আগুনের মত যে প্রেম ছিল গোবিন্দলালের নিভৃত মনের প্রান্তে, প্রতিবেশীদের অহুকম্পার অহুকূল বাতাস পেয়ে তা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো। এদিকে কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু বাসরের দিন ঘনিষ্ঠে এল, গোবিন্দলালকে সংযত করতে কৈশল করলেন তিনি ভ্রমরের আয়ত্রে তাঁকে রাখতে, অর্ধেক সম্পত্তি ভ্রমরের নামে লিখে দিলেন। কিন্তু কোনও বাস্তবিক গার্হস্থ্য জীবনে শব্দর চেয়ে বধুর আধিপত্য সংসারকে স্বপ্নের করে না। এ ক্ষেত্রেও তাই হোল ; কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সমাপনে—গোবিন্দলালের জননীর প্রতি বিদ্বেষী মন বিদেশ যাত্রায় উন্মূখ হ'য়ে উঠলো। তাঁর এই বিদেশ যাত্রাই সংসারের ভাঙ্গনকে আরও নির্ধম করে তুললো, এই সুযোগই গোবিন্দলালের গোপন পথ চলবার ধারাকে আরও প্রশস্ত করলো, সহায়তা করলো। সে জননীর সাথে গেল কাশী, তারপর নিজের জীবনধারাকে ঠিকমত গুছিয়ে নিল। কিন্তু রোহিণীর প্রেমে, ও স্বপ্নে নিবিড় হ'য়ে উঠতে পারলে না, তৃষ্ণা মিটতে না মিটতে, কেউটে সাপের খোলস গেল খসে ; রোহিণী নিজ মূর্ত্তি ধারণ করলো, এর ফল বা স্বাভাবিক

তাই ফললো। প্রায়শ্চিত্ত হোল, গোবিন্দলালকে নীড়ে ফিরতে হোল, ভ্রমরের কাছে ক্ষমা চাইতে হোল। কিন্তু নীড় বাঁধা তার আর হোল না, অভিমানিনী ভ্রমরের বাধাদান্ধ মন আর সে সোনালী মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করতে পারলে না। ওর জীবনপ্রদীপ নিবে গেল। কোথায় রইল বা সেই রোহিণী, কে বা ভোগ করলো সেই উইল, মাঝ থেকে এক স্বপ্নের সংসার হয়ে উঠলো ছিন্নছাড়া। বাস্তবে এমনই গার্হস্থ্য জীবনের আলেখ্য প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে।

সচরাচর দেখা যায় ধনীর ছললের চিত্তবৃত্তি বড়ই উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হয় ; তারা একটা প্রবৃত্তির প্রেরণায় মনকে পারে না সংযত করতে, পারে না আয়ত্রে রাখতে। বহির্মুখের বিষয়ক গ্রন্থে, নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে তারই প্রমাণ আমরা পাই। গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ রূপে, গুণে, ধনে, মানে, ঐশ্বর্য্যবান ; গার্হস্থ্য জীবন তাঁর স্বপ্নের, গৃহে প্রিয়তমা পত্নী স্বর্ধ্যমুখী—আত্মীয় পরিজন দাসদাসী বেষ্টিত মস্ত সংসার। হঠাৎ বৈশাখী ঝড়ের মতই, নগেন্দ্রনাথের মনোবৃত্তি, কুন্দর আবির্ভাব সে সংসারে আনলে বিপ্লব, আনলে বিবর্তন। যেদিন নগেন্দ্রনাথ গেছিলেন নৌকা বিহারে, পথে ঝড় বৃষ্টি তাঁকে বিপর্য্যস্ত করলে। এক গৃহস্থের ঘরে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মৃত্যুপথ-যাত্রী সে সর্ব্বহারী গৃহস্থ কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে শুধু আশ্রয় দানেই সাহায্য করলেন না—দক্ষিণাশ্রুপ বালিকা কুন্দ-নন্দীকেও দান করলেন। নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে নিয়ে এলেন কলকাতায় অহুজা কমলমণির গৃহে, স্বর্ধ্যমুখীকে এ বিষয় পত্র দিলেন। ইত্যবসরে কুন্দর বরের সন্ধান মিললো, গোবিন্দপুর ফিরে স্বর্ধ্যমুখীর পিতৃগৃহের দাসীপুত্র তারা-চরণের সাথে ওর বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কুন্দর ললাটে ছিল না লেখা বিয়ের স্বথভোগ ; তারাচরণ মারা গেল ও ভাদ্রের নদীর মত টলমল ঘোবনে ফিরে এল কুন্দ নগেন্দ্রনাথের গৃহে ; যেন নগেন্দ্রনাথ আর স্বর্ধ্যমুখীর সংসার-আকাশে উজ্জ্বল মতই। ক্রমে সে উজ্জ্বল কুন্দ দগ্ধ হোল, নগেন্দ্রনাথকে দগ্ধ করলে। স্বর্ধ্যমুখীর স্বপ্নের পথ রোধ করলো। নগেন্দ্রনাথ ওকে প্রিয়রূপে পেতে উন্নত হয়ে উঠলেন, কুন্দ বিহীনে জীবন তাঁর মকময় হয়ে উঠলো।

নগেন্দ্রনাথের ভালবাসা কুন্দকে মুগ্ধ করলো, ওর ঘোবনের অতৃপ্ত স্বর নগেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে উঠতে চাইলো। গার্হস্থ্য জীবনের সর্বনাশের প্রতীক দাসী হীরা করলে এ পক্ষে সহায়তা, সুযোগ দেবেন্দ্রনাথ। কুন্দর বধুর জীবনে এই দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিল তার সান্নিধ্য, পাইনি; আজ সে অতৃপ্ত কামনার বল্লানো মনকে তৃপ্ত করতে বৈষ্ণবী বেশে এল জমীদারের মেয়েমহলে। গান শুনিযে মেয়েদের মুগ্ধ করলো, তাদের পরচর্চাকে নিবিড়তর করে তুললো, কুন্দর সাথে আলাপ করে হৃদয় বৃত্তির কিছু তৃপ্তি সাধন করলো। কিন্তু ওর এ চাতুরী সূর্য্যমুখীর কাছে পরাস্ত লাভ করলে, সূর্য্যমুখী বুঝলে এ বৈষ্ণবী মেয়ে নয়, পুরুষ; কুন্দকে সে রীতিমত তিরস্কার করলে। কুন্দ সইলোনা এ তিরস্কার—অভিমানে ও গৃহ ত্যাগ করলো, অন্ধকার রাত্রে হীরার গৃহে আশ্রয় লাভ করলো সে। হীরা মনে মনে ভাবলো “বেশ রত্নটা পাওয়া গেল, নগেন্দ্রনাথকে খেলানো যাবে। কুন্দর অদৃষ্টে নগেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন পাগলের মত উন্মত্তপ্রায়; হীরা ইচ্ছন জোগাল তার স্বাভাবিক কূট বৃত্তি নিয়ে—“কুন্দকে সূর্য্যমুখী বিভাঙিত করেছে”, নগেন্দ্রনাথের চিত্ত সূর্য্যমুখীর উপরে বিদ্রোহ পূর্ণ হয়ে উঠলো। এদিকে সূর্য্যমুখী স্বামীর এ সঙ্গীন অবস্থায়, হয়ে উঠলেন সন্ত্রস্ত, ব্যাকুলিত; এর প্রতিবিধান করতে কুন্দর সন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠলেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—স্বামীকে স্থখী করিবেনই। ইত্যবসরে কুন্দ প্রত্যাবর্তন করলে, নগেন্দ্রনাথকে দেখবার লুক্ক দৃষ্টিকে পরাস্ত করতে পারলো না বলে সূর্য্যমুখীর আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহ হয়ে গেল। কিন্তু সূর্য্যমুখীর মন কঠিন নয়, কোমল; ও পারলো না এ বিপুল রিক্ততা সইতে, সংসার হতে চির নির্বাসন গ্রহণ করলে। এইবার নগেন্দ্রনাথের চমক টুটলো, কুন্দর মোহ নিমেষে তাঁকে মুক্ত করলো, যেন, স্বপন হতে জেগে উঠলেন তিনি। যেমন করে ঠিক কুন্দকে পেতে উন্মুগ্ন হয়েছিলেন, সেই রকমই হলেন সূর্য্যমুখীকে ফিরে পেতে, কুন্দর প্রতি চিত্ত তাঁর ক্ষুদ্র হয়ে উঠলো। জীব সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন, গুনলেন সূর্য্যমুখী মরজগতে নেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে স্বর করলেন, গৃহ তাঁর ছন্ন ছাড়া হয়ে

উঠলো। ইত্যবসরে একদিন নিতান্ত অভাবিতে সূর্য্যমুখী প্রত্যাবর্তন করলে, কুন্দ তখন মৃত্যুর সান্নিধ্যে। অনেকই ভেবেছিল সূর্য্যর মৃত্যুসংবাদ শুকে স্থখে অভিভূত করবে—কিন্তু তা করেনি, তাঁর জীবনে স্বামীর আনন্দই শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল। ও নগেন্দ্রনাথকে ভালোবেসেছিল, তাঁর অনাদর সইতে পারেনি। হীরার আফিমটুকু ও কৌশলে আত্মগাং করেছিল। যখন আনন্দে আপ্ত হয়ে নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখী ওর কক্ষ প্রবেশ করলেন, তখন মৃত্যুর তুহীন আলিঙ্গনের স্পর্শ ও পেয়েছে। যে নারীর চিত্ত বৃত্তি অতৃপ্ত, সংযম শিক্ষা নাই, সে নারী গার্হস্থ্য জীবনে কি তুলসীদেবের সৃষ্টি করতে পারে তারই নিখুঁত একখানি আলোখ্য আমরা এই গ্রন্থে পাই। হীরাদাসী সংসারের মূর্ত্তিমতী সর্বনাশ যেন। এগ্রন্থে আর একটি গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় পাই আমরা; শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির তাঁদের সংসারে ঝড় নেই, মেঘ নেই, নির্মল, নির্মেঘ আকাশ।

দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে আমরা পাই সেকালের কুলীনের বিবাহের আধিক্য, তাকে কেন্দ্র করে অর্থাজ্ঞন, সপত্নী সহ মেয়েদের ঘর করণার একখানি স্তম্ভটি ছবি, যাকে বেঠন করে হরবল্লভ, তাঁপ জী, ব্রজেশ্বর, প্রফুল্ল, সাগর নয়নতারা, ঠাকুরমা, দাসদাসী প্রভৃতির গার্হস্থ্য জীবন গঠিত হয়ে উঠেছে। হরবল্লভের পুত্র ব্রজেশ্বরের তিনটা বিয়ে!

বড় বধু নাকি বাগদীর মেয়ে, হরবল্লভ তাকে গ্রহণ করতে পারেন না। সখামা বধু নয়নতারা সংসার করেন, আর কনিষ্ঠা সাগরবধু ধনীর মেয়ে—সে অধিকাংশ সময়েই পিজালয়ে থাকে। কিন্তু নয়নতারার অদৃষ্টে স্বামীকে একা দখল করবার সুখ বুঝি সইলো না—যেদিন প্রফুল্লর মায়ের বাড়ী ভিক্ষা করে আর দিন অতিবাহিত করতে না পেরে—অসহ হয়ে উঠলো, উন্মত্ত হোল, পণ করলে ও, শশুর গ্রহণ না করলেও, শশুরগৃহে যাবেই, তার অভাব কিসের? ধনী শশুরের পুত্রবধু সে। মাকে সম্মত করিয়ে শশুরগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলে। কিন্তু হরবল্লভ ও বাগদী মেয়েকে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না, ব্রজেশ্বরের জননী নথপাড়া দিয়ে স্বামীর মন জয়ের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হোল—

পূজবধূকে সোজা বলতেই হোল—“তোমার খণ্ডর মত করলেন না।” উপায় কি? খণ্ডরের আদেশে, স্বামী-গৃহে যখন স্থান হোলনা—তখন ফিরে যেতেই হবে ওকে, হয়তো বা তাদের আদেশমত লুণ্ঠনবৃত্তি করে উদরকে পরিভূপ্ত করতে হবে। কিন্তু বারেকের জন্ত স্বামী-সাক্ষাতের আগ্রহ ওর অন্তরকে ব্যাকুলিত করে তুললো। এ পথে সহায়তা করলো তাকে সাগর, সমস্ত দিনের ওর ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করলো, স্বামী সান্নিধ্যের পথটাকে মুক্ত করে দিল। ব্রজেশ্বর শুন্লে, “প্রফুল্ল এসেছে” অধীর আগ্রহে তার সান্নিধ্যের প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠলো, ইত্যবসরে সাগরের সহায়তায় ওর আশা পূর্ণ হোল, আর নয়নতারার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ী পিঠিতে স্বরু করলে। রাত্রের গভীরতায় ওদের স্বামী স্ত্রীর মিলন নিবিড় হোল, প্রফুল্লকে পেয়ে ব্রজেশ্বর খুসীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো, ওকে বিদায় দিতে অশ্রু প্রবাহ বুকের ভেতর বস্ত্রের মত নেবে এল, তবু বাপের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলে না, স্থিতি স্বরূপ শ্রিয়ীর অকুলিতে আপন অঙ্গুরীয় পরিণে দিলো। কিছুদিন পর প্রফুল্লর জননী অন্তিম শয্যায় শয়ন করলেন, যারা প্রফুল্লর বিবাহে উদরের তৃপ্তি সাধন করতে না পেয়ে—রটিয়েছিল, প্রফুল্ল বাগদীর মেয়ে,—তঁরাই প্রফুল্লর জননীর সংকার করলে, শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা করলে; আবার তারাই প্রফুল্লর মৃত্যু সংবাদ রাষ্ট্র করলে। বড় আশা নিয়ে ব্রজেশ্বর স্ত্রীর সান্নিধ্যে এসে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেলো। কয়েক বৎসর পর মৃত প্রফুল্ল জীবন্ত হয়ে উঠলো, দেবী চৌধুরাণীর মুক্তিভে—ওর লুণ্ঠনের দলসহ বজরা নদীতে ভাসতে লাগলো। ইত্যবসরে হরবল্লভের জমীদারী নিলামে উঠলো, অর্থাভাবে ব্রজেশ্বর এলেন সাগরের পিজালয়ে; খণ্ডর গৃহে সে জামাইর সমাদরে যথেষ্ট শ্রীত হোল, কিন্তু অর্থ সে পেলোনা। এই নিয়ে সাগর ও ব্রজেশ্বরের মতান্তর হোল। ওদের এই দ্বন্দে মিলনের রেখা টান্লে দেবী চৌধুরাণীর সহায়তা—তার দস্যদল ব্রজেশ্বরের নৌকা লুণ্ঠন করলে। বহুদিন পর ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লর দেখা হোল, একজন চিন্লে, একজন চিনি-চিনি করে চিন্লে না—, মৃত্যু কি কখনও জীবন্ত হতে পারে? তবে ওর ভ্রম সংশোধন করলে সাগর; প্রফুল্ল যে অর্থ দিয়ে খণ্ডরকে সহায়তা

করেছিল, সেই অর্থ প্রত্যাবর্তনের দিনটায় প্রতীক্ষা সে করতে লাগলো। হরবল্লভ কিন্তু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, অর্থ ফেরতের পরিবর্তে তিনি সিপাহীকে দস্যদলের সংবাদ প্রেরণ করলেন। তবে আশা তাঁর সার্থক হোল না,—দস্যদের দৌরাণ্যে রীতিমত বিপর্যস্ত হলেন, ব্রজেশ্বরের চতুর্থ বিবাহের সম্মতি দিয়ে মুক্তির পথ প্রশস্ত করলেন। ব্রজেশ্বর চতুর্থ স্ত্রী নিয়ে বাড়ী ফিরলেন, বাগদী মেয়েকে দেখে বাড়ীভুক্ত সকলে খুসীতে রোমঙ্কিত হয়ে উঠলো শুধু নয়ন তারার মনের কথা বলা একটু কঠিন। গার্হস্থ্য জীবনে মেয়েদের স্বর্গরূপে সংসার ধর্মপালন করাই যে জীবনের মহনীয় উদ্দেশ্য ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য—সেই চিত্রই আমরা এ গ্রন্থে সম্পষ্ট পাই।

মেয়েদের তরলমতি, চঞ্চলতা, অসংযত মনোবৃত্তি, নন্দন-কাননের মত স্তম্ভর সংসারকে, মুহূর্ত্তে যে মরুভূমি করতে পারে তারই পরিপূর্ণ বিকাশের চিত্র বক্ষিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর গ্রন্থখানি। চন্দ্রশেখর আর শৈবলিনী—, ছুজনের সংসার; নিষ্ঠাপূর্ণ ধর্মের প্রতীকের মতই আদর্শ; তাকে ঘিরে ওদের গার্হস্থ্য জীবনের তরীখানি ফুরুরে বাতাসে হেলে ছলে বেয়ে চলে। চন্দ্রশেখর ভালোবাসেন শৈবলিনীকে অপরিসীম—, শৈবলিনি হয়তো বা ভালোবাসে স্বামীকে, তবে সে আবারো সহচর প্রতাপের প্রণয়ে আবদ্ধ। তাকে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। ও অলক্ষণ পেতে চায় প্রতাপের সান্নিধ্য—, ফষ্টর সাহেব ওকে এ পথে সহায়তা করলে, তারই সঙ্গিনী হয়ে ও প্রতাপের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠলো। হৃদয় বৃত্তিকে স্বামীর প্রেমে তৃপ্ত করতে পারলে না। ওর আশা সার্থক হয়েছিল, প্রতাপকে ও পেয়েছিল; তবে প্রতাপ ছিল আদর্শ পুরুষ মনের মণি-কোঠায় শৈবলিনীর প্রেমের সন্ধান অক্ষুণ্ণ রাখলে ও, বাহিরে, পরস্ত্রীর প্রেমকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। তবে ও বুঝেছিল—সে থাকবে কাঁটার মতই শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের স্বথের পথ রোধ করে। জীবন দিয়ে পর্যন্ত সে ওদের স্থখী করতে চেয়েছিল। তবে স্থখী তারা হোতে পেরে ছিল কি না এ কথা বলা একটু কঠিন। হয়তো বা তারা গার্হস্থ্য জীবন আবার রচনা করবে কিন্তু মাধুর্য্য তাতে আসবে কি? প্রতাপের মৃত্যু কি স্বথের পথে অন্তরায় হবে

না? সংসারের প্রতি মেয়েদের উদাসিন্তে, গার্হস্থ্য জীবন যে প্রাণময়, গীতিময় হয়ে উঠতে পারে না, শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের গার্হস্থ্য জীবন-তারই প্রতীক যেন।

* * * * *

নারী ও পুরুষের বিবাহের মূলে পরস্পরের পারিপার্শ্বিকের অসামঞ্জস্য যে মিলনকে দুর্বিসহ করে তোলে, বার্থ করে, তারই সম্যক পরিচয় আমরা কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের গার্হস্থ্য জীবনে পাই। কপালকুণ্ডলা ছিল বনবালা, বনের লতা-পাতা ফুল ফলের আবেষ্টনে নীলাকাশের মুক্ত পাখীর মতই ও বেড়ে উঠেছিল। নবকুমারকে বিবাহ করে তার গৃহিণী হয়েও, স্বামীকে ভালোবাসলেও, মন ওর নীড় বাঁধতে নিবিড় হয়ে ওঠেনি। মানব মনের স্বাভাবিক মন স্তব্ধগুলি ও জান্তোনা বলে স্বেচ্ছায় চাইতো সর্বত্র অবাধ বিচরণ করতে, স্বামী এর জন্তে যে ব্যথা পেতে পারে তা ও ভাবতেই পারেনি। এইজন্তই সে নন্দনাইকে সখী নন্দিনীর প্রেমের শিকলে বেঁধে দিতে, মানে বশ করতে, অমাবস্তা নিশীথে চূর্ণ কুন্তলে ওষুধের এক পাতা তুলতে গেল বনপ্রান্তে, স্বামীর বারণ শুনলে না, ওর নিঃশব্দ পূর্ব জীবনের নিঃস্বার্থ প্রেমই ছিল যেন বিশাল এক সম্পদ, ত্রুত পালনের মতই ও পরোপকার করতে ভালোবাসতো। এই অবসরে নবকুমারের পূর্ব জী লুৎফুন্নেসা শয়তানের বৃত্তি নিয়ে আপন স্বার্থ পূরণে প্রবৃত্ত হোল, এ কার্যে কাপালিক ওকে সহায়তা করলো। ফলে কারোই স্বার্থ পূর্ণ হোল না, দু দিনের জন্ত কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারকে কেন্দ্র করে যে এক ছোট মাধুর্যপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবন রচিত হয়েছিল, তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। বন থেকে এসে ‘বনবালা’ নীড় বেঁধেছিল, নীড় ভেঙ্গে দিয়ে নদীর জলে মিশে গেল। বুঝিয়ে দিল আমাদের সেই গার্হস্থ্য জীবনই হয় স্থখের থনি, যার পারি পার্থক্য সামঞ্জস্য বিবাহের মূলে ভিত্তি স্বরূপ হয়।

* * *

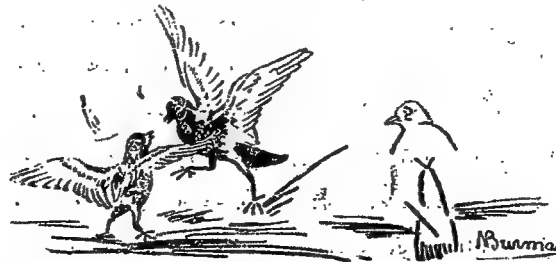
গার্হস্থ্য জীবন রচনা করবার একটা অদম্য ব্যাকুলতা মেয়েদের অন্তর-বীণায় যে নিরন্তর বাজত হয়ে ওঠে, তারই একটা নিরবচ্ছিন্ন স্বর আমরা ইন্দিরা গ্রন্থে, ইন্দিরার চরিত্রে স্পষ্ট শুনতে পাই। ইন্দিরা ধনীর ছল্লালী, বিবাহ

হয়েছে গৃহস্থের ঘরে, স্বামী ওর উপার্জনক্ষম নয়; তাই পিতার আদেশ, উপেন্দ্র বোজগার করলে, মেয়েকে তিনি স্বামী গৃহে পাঠাবেন। বোজগার করতে উপেন্দ্র হয়ে উঠলেন উন্মত্ত; নিদেশ যাত্রায় তা সার্থকতা লাভ করলো। এদিকে ইন্দিরা অসহনীয় হয়ে উঠলো, ধনী বাপের টাকার গদীতে; ওর আকাশ হোল স্তম্ভিত বিরহের কালো মেঘে। ভালো লাগে না কিছু—সংসার যেন ওর সমুখে এক মায়াময় সৃষ্টি করলো। ইত্যবসরে বিস্তর টাকা উপার্জন করে উপেন্দ্র স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন—শুভ্রগৃহে ইন্দিরার ডাক পড়লো, বুঝি এবার ওর আকাশ মেঘ মুক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু বাতাস বইলো প্রতিকূলমুখে—আকাশের মেঘ মুক্ত হোলনা, বরং আরও নিবিড় হয়ে উঠলো। ওর আশা, ওর আনন্দ নিমূল হোল, ধূলিমাংস হোল, দস্যুর লুণ্ঠন স্বামী গৃহে যাত্রা ওর ব্যর্থ করলো। কুণ্ডহারানো ঢেউর মত আশ্রয় হারা ইন্দিরা বনপ্রান্তে বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো, স্ত্রীভাষিনীর মায়ীর সহায়তা ওকে কুল দেখিয়ে দিল, স্ত্রীভাষিনীর গৃহে ও পাটিকা রূপে আশ্রয় লাভ করলে। কি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! ধনীর ছল্লালী পাটিকা বৃত্তিতে জীবন অতিবাহিত করবে। এই পাটিকা ইন্দিরাকে কেন্দ্র করে, শুভ্র, শান্তি, স্বামী, ছেলে মেয়ে বেষ্টিত স্ত্রীভাষিনীর গার্হস্থ্য জীবনের তরীধানি যেন স্থখের এক উদ্ভাস। স্ত্রীভাষিনী বললে শান্তিডীকে—“ও বামুন ঠাকুরাণী হাঁড়ী ছুঁতে দেয় না, থিটুথিটু করে, একটা স্বজাতি কায়স্থ মেয়েকে পাটিকারূপে রাখতে হবে।” পাটিকার বয়স শুনে শান্তিডী একটু থমকে গেলেন,—দুর্বলতা তাঁর মনের প্রান্তে কাঁটা বিদ্ধ করতে লাগলো—তাঁর যৌবন তো বহুদিন বিদায় নিয়েছে, এই নিয়ে সংসারে তো কোনও অনর্থের সৃষ্টি হবে না? তিনি সম্মত হতে পারলেন না—তবে পুত্রস্নেহ তার সকল ওজর আপত্তিকে পরাস্ত করলো। স্ত্রীভাষিনী আর রমনবাবুর কারসাজিতে ইন্দিরা সে গৃহে সসম্মানেই আশ্রয় লাভ করলো, এবং ইন্দিরাও তার চতুর বুদ্ধি বৃত্তিতে স্ত্রীভাষিনীর শান্তিডীর পাকা চুল কলপে কালো করে, যৌবনের এক কৃত্রিমরূপে তাঁকে সজ্জিত করে তাঁর মন জয় করে ফেললে। এই সংসারের বাতাস যেন ওর অদৃষ্টের অল্পকুল মুখে

বইলো। বহুদিন সঞ্চিত আশা ওর সাফল্য লাভ করলে, স্নাতকমণী ও রমণবাবুর ষড়যন্ত্রে ও স্বামীর সান্নিধ্যে মিলিত হোল। ইন্দিরা স্বামীকে দেখেই চিন্তে পারলে, উপেক্ষাবাবু তার নামের পরিবর্তনে চিনি চিনি করেও চিন্তে পারলেন না,—তবে ইন্দিরার কটাক্ষে হৃদয় বৃত্তিকে সংযত করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না। এই নিয়ে ইন্দিরাও তাঁকে একটু নাকাল করবার লোভ সংবরণ করতে পারলে না। তারপর সে ফিরে গেল পিতৃভবনে, ওকে পেয়ে হরমোহনবাবুর সংসার মৃষ্টিমান আনন্দের রূপ ধারণ করলো। অম্মজা কামিনী ওর সব কথা শুনে, জামাইবাবুটিকে একটু নাকাল করবার লোভ সংবরণ করতে পারলে না। তারই হস্তরসের উৎস উপেক্ষার প্রেমাপদ্য কুন্দ,—ধর্মপত্নী ইন্দিরায় পারবত্তিত হোল। বহুদিন পর হরমোহন দত্তের গার্হস্থ্য জীবন প্রাণপ্রাচুর্য্যে টলমলে হয়ে উঠলো,—সে স্বর্গের নদীতে পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়পরিজন সকলে মিশলো এসে। যেন পরিপূর্ণ একখানি গার্হস্থ্য জীবনের আলোখ্য এই ইন্দিরা গ্রন্থে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

পুষ্প বিক্রেতা রাজচন্দ্র দাসের অঙ্ক মেয়ে রজনীকে কেন্দ্র করে রামসদয় মিত্রের গার্হস্থ্য জীবনের একটা চিত্র আমরা রজনীগ্রন্থে দেখতে পাই। রামসদয়বাবুর স্ত্রী দুইজন, বিগত যৌবনা ভুবনেশ্বরী, যৌবনসম্পন্ন লবঙ্গ লতিকা পুত্র একটা শচীন্দ্র। এই সংসারে রজনী আসতো ফুল বেচতে, ও গরীবের অঙ্ক মেয়ে তাই লবঙ্গলতিকা ওর ফুল দ্বিগুণদামে কিন্তো,—ওকে ভালোবাসতো। এই সংসারের সাহায্যভূতির আর্জতায় ও নিবিড় হয়ে উঠেছিল। ও অঙ্ক মেয়ে ওকে কে বিয়ে করবে? লবঙ্গলতিকারই চেষ্টায় রামসদয় বাবুর সরকারের ছেলে গোপাল বাবুর সঙ্গে ওর বিয়ের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। অবশ্য গোপাল বাবুর এ

বিয়ে পুত্রের অজ্ঞাতে, কারণ স্ত্রী তাঁর বর্তমান ছিল, নাম তার চাঁপা। গরীবের বরের বয়স্থা অঙ্ক মেয়ে রজনী এ বিবাহে খুসী হয়ে ওঠা তার স্বাভাবিক কিন্তু খুসী সে হয়নি আদৌ, স্মিয়মান হোল, দৃঢ় পণ করলো গোপালকে বিয়ে সে কিছুতেই করবে না। ও ভালবাসে শচীন্দ্রকে, সেই ভালোবাসাই ওর মনে চির অক্ষুণ্ণ থাকবে। চাঁপা চায়না সপত্নী কণ্টকে ও ক্ষত বিক্ষত হবে। রজনীকে সহায়তা করলে এ বিবাহ হতে মুক্তি পেতে। রজনী,—চাঁপার ভাই হীরালালকে সাথী করে চাঁপার বাপের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। হীরালালের অভীষ্ট মন্দ ছিল সার্থকতা লাভ করতে পারলো না বলে, রজনীকে মাঝপথে ফেলে দিয়ে সরে পড়লো, উদ্ধার করলে তাকে অমরনাথ। এই অমরনাথ রজনীর জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দিলে। রামসদয় বাবু শুনলেন, সম্পত্তি তাঁর নয় রজনীর; সম্পত্তি রক্ষা করতে শচীন্দ্র ও রজনীর বিবাহ দিতে চাইলেন। শচীন্দ্র অঙ্ক রজনীকে বিবাহ করতে আপত্তি করলো, স্বামী এ কার্য্যে সহায়তা করলে লবঙ্গলতিকা। সে সন্ন্যাসী আনন্দে মত্ত পড়ালে, সন্ন্যাসীর অপরিমীম শক্তিতে শচীন্দ্র রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হোল, সে বিবাহে সম্মতি প্রদান করলে। কিন্তু রজনী তাঁর সম্পত্তি গ্রহণ করতে সম্মত হোল না, শচীন্দ্রকে ভালো সে বাসলেও—স্বমরের ঋণ পরিশোধ করতে তাকেই বিবাহ করতে চাইলো। কিন্তু অমরনাথ যখন জানলে শচীন্দ্র ও রজনীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা হৃগতীর, তখন সে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিলো। রজনী—শচীন্দ্রের বিবাহ হোল, সেই সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদে রজনী চোখ ফিরে পেলো, একটা সুন্দর স্বপ্ন গার্হস্থ্য জীবন রচনা করলে ওরা ভবানীনগর গ্রামে। কারণ রজনী ফুল বিক্রেতার মেয়ে সমাজ তাদের ঘৃণা করবেই।



গীতার পুনরুক্তি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু—গীতারত্ন

নবম অধ্যায় রাজগুহ্যবোগ, এই অধ্যায়ে 'মাং' শব্দ ১৭বার ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে কি করিয়া সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সেই গুহ্যতম উপাসনা সহ ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন করিয়াছেন। এই বিদ্যা রাজবিদ্যা, সর্গবিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং ইহা সর্বাপেক্ষা গুহ্য। গুহ্য হইয়াও একান্ত প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষবোধে নিত্যগ্রাহ্য। সূর্য্যের দীপ্তি যেমন সূর্য্যে একীভূত হইয়া থাকে, তেমনই এই বিদ্যা বাহ্যার বিদ্যা, তাঁহাতেই একীভূত হইয়া আছে। আত্মজ্ঞানরূপ এই বিদ্যা 'ধর্ম্মাং'। সর্গধর্ম্ম এখানে বিরোধহীন। সর্গ সম্প্রদায় এই ধর্ম্মে আপনাকে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায়। যোগ, ভোগ ও ত্যাগ, সব ইহাতে একীভূত হয়। ইহা অবলম্বনে সর্গদেবতা পূজিতা হন—সর্গশক্তি জুতা হন—ভুক্তি মুক্তি পরস্পরকে আলিঙ্গন বন্ধ করে। এই বিদ্যার দ্বারা ধৃত হয় সমস্ত। আবার এই বিদ্যা 'স্বস্থং কৰ্ত্তুম্', অর্থাৎ এই বিদ্যা অবলম্বনে, এই বিদ্যার দেবতাকে সাধন করা স্বথময় স্বপ্নই এই দেবতার মুক্তি। স্বপ্নপ্রাবনই এই অপূর্ণ বিদ্যা, বাহ্যার দ্বারা এই বিদ্যার দেবতা চিরবিদিত। এই জ্ঞান 'অব্যয়'। কাল ইহাকে বিনষ্ট করিতে অক্ষম, বিস্মৃতি ইহাকে মুছিয়া দিতে অসমর্থ। এ পরমাত্মবোধের স্রবণ নাই।

বাহ্যার এই ধর্ম্মের স্বরূপে ভক্তিহীন, তাঁহার 'মাং' কে না পাইয়া মৃত্যুময়' সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাহ্যার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয় না, তিনি তাঁহাকে পাইতে পারেন না। এই আত্মবোধময় স্বপ্ন-ধর্ম্মটিতে শ্রদ্ধাবান না হইলে, তাঁহাকে না পাইয়া, জীবকে মৃত্যুময় সংসার-পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি কৰ্ম্ম করিয়া, নিত্য পরমাত্মরূপে অক্ষত, সঙ্গহীন, উদাসীনবৎ থাকেন, সেই

জন্ত সেই কৰ্ম্মসকল তাঁহার উপর গ্রহীত্বদ্বান করিতে পারে না। ইহা হইতে জীব কি শিক্ষা পায়?

আমরা যদি ঐক্সেপ্‌থোর ভোক্তা হইতে চাই, তবে আপনাদের মূলে উদাসীনবৎ অসঙ্গ সংস্থানটিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে।

আত্মার ভোগময় দিকটিই জীবত্ব এবং যোগময় দিকটিই শিবত্ব। জীব শিবত্বে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার ভোগের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইবে, সদগুরুর নিকট হইতে যোগ শিক্ষা করিতে হইবে, গীতার ইহাই উপদেশ।

আত্মা কেবল অধ্যক্ষ এবং উদাসীন, আর প্রকৃতিই সর্গকৰ্ম্মকর্ত্তা, এই জ্ঞানে মানুষের কৰ্ম্মবন্ধন শিথিল হয়।

মানুষ নিজের হৃদয় মধ্যে 'মাং'কে আত্মরূপে অনুভব করিয়াও, তাঁহার সদময় জীবভাবটিকেই উপাসনা করে, অতএব 'মাং' এর অসঙ্গ সর্গভূতশ্বর পরমভাবটি দেখে না, দেখিতে চাহে না এবং চেষ্টাও করে না, ফলে জীব 'মাং'এর অবহেলাই করিয়া থাকে। দৈবী প্রকৃতি প্রাপ্ত মহাত্মারা ভূত সকলের আদি ও অব্যয় 'মাং'কে জানিয়া, অনন্তমনা হইয়া 'মাং'এর ভজনা করেন। আত্মার পরমভাব না জানিলে, জীব রাজসী ও তামসী প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। আত্মাই ভূত সকলের আদি ও অব্যয় কারণ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সর্গভূত মহেশ্বর, তিনি অব্যয় ও অক্ষর, এই ভাবে আত্মাকে জানিতে পারিলে, জীব দৈবী প্রকৃতি লাভ করে। দৈবী প্রকৃতি অর্থে দেবতাদিগের প্রকৃতি—দ্যোতলশীলা সাত্ত্বিকী প্রকৃতি।

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা কখনও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বোধে 'মাং'কে উপাসনা করেন, আবার কখনও বহুধা পৃথক পৃথক দৈবী শক্তিভাবে বিভক্ত এক স্বগতভেদময় পরমেশ্বর ভাবে তাঁহার উপাসনা করেন। 'বাসুদেবঃ সর্গঃ', এই জ্ঞানে

আরুঢ় হইয়া কখনও দেখেন যে এক অদ্বয় চেতন স্বরূপ পরমাত্মা ভিন্ন কোথাও কেহ নাই, আবার কখনও দেখেন যে এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বে এক পরমেশ্বরই বহুরূপে প্রতিভাত হইতেছেন।

ঐহারা সাধারণ সাত্ত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন, অথচ পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ নহেন, অতএব মাহাত্মা নহেন, কেবল মাত্র যজ্ঞ কৰ্মাদিতে নিরত থাকিয়া বেদের সাধারণ কৰ্মকাণ্ড ঐহারা অনুধাবন করেন, সেই সকল পুরুষ ভগবতুপাসনার দ্বারা স্বর্গা-দিলোকে বাস প্রার্থনা করেন। পরমাত্ম তত্ত্ব অনধিগত থাকায়, তাঁহাদিগের ভোগ প্রার্থনা অগ্নিকুণ্ড স্বর্গাদি লোকে, তাহার ফলে তাঁহারা সেইরূপই গতি লাভ করেন। তাঁহারা বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্ত্য-লোকে প্রত্যাবর্তন করেন। এই যাতায়াতই তাঁহারা পাইতে থাকেন, অনাবর্তন তাঁহারা পান না, কারণ তাঁহারা আত্মজ্ঞান শূন্য কামকামী। তাঁহাদের চক্ষু থাকে আত্মাতে নহে, অন্যথায়।

‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।’-৪।১১

কল্পতরুর নিকটে যিনি যাহা চান তিনি তাহাই পান। আর ঐহারা কামকামী নহ্ন, ঐহারা আত্মকামী, তাঁহারা অনন্তকামী হইয়া ‘মাং’ এর সম্যক্ ভাবে উপাসনা করেন এবং তিনি সেই নিত্যাভিযুক্ত পুরুষদিগের যোগক্ষেম বহন করেন। অনন্তচেতা উপাসকদিগের যোগক্ষেম তিনি নিজেই বহন করেন অর্থাৎ বাহ্য বিশ্ব হইতে তাঁহাদিগের যোগক্ষেম তিনি বাহিত করেন। আর ঐহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অল্প দেবতার ভজনা করেন, তাঁহারাও অবিধি পূর্বক ‘মাং’ অর্থাৎ পরমাত্মারই ভজনা করেন। তিনি সৰ্বদেবতারূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন, স্ততরাং জীব যে কোন দেবতার বা দেবভাবেরই উপাসনা করুক, সে দেবতা তিনিই এবং সেই উপাসনা তাঁহারই উপাসনা। কিন্তু এইরূপ উপাসনা বৈদিক বিধান নহে। বৈদিক বিধান হইতেছে যে পরমাত্ম বোধ সম্পন্ন হইয়া উপাসনা করা, স্ততরাং ওইরূপ উপাসনা অবিধিপূর্বক উপাসনা। পরমাত্মা সৰ্বদেবময়, এই বোধে সকল দেবতার উপাসনা করিতে হইবে।

তিনি সৰ্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; জীব তাঁহাকে তত্ত্বতঃ এইরূপ ভাবে জানে না বলিয়া, লোক হইতে লোকান্তরে,

ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে যাতায়াত করে। পরমাত্ম-জ্ঞান-শূন্য দেব উপাসনা অবিধি পূর্বক উপাসনা। অবিধি পূর্বক উপাসনা জীবকে মুক্তি দিতে পারে না।

দেন্নোপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হয়, পিতৃ উপাসকেরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়, ভূতুপাসকেরা ভূতলোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমাত্মার উপাসকেরা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরমতত্ত্ব তত্ত্বতঃ না জানা পর্যন্ত মুক্তি নাই। ইহা জানিলেই জীব অপুনরাবর্তনময় হয়, তাহাকে আর পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতে হয় না।

যদি অতীব দুরাচারী ব্যক্তি ও অনন্তভাক্ হইয়া তাঁহার ভজনা করেন, তিনি সাধু বলিয়া গণ্য হন, কারণ তিনি সম্যক্ ব্যবসিত হইয়াছেন অর্থাৎ তিনি আত্মবোধে উপনীত হইয়াছেন। যিনি অনন্তভাক্, তিনি সাধু, তিনি ব্যবসিতাত্মা, তিনি ভক্ত, তিনি সকল আচারের বাহিরে। তাঁহার ভক্তের বিনাশ নাই, ব্যর্থতা নাই, বিফলতা নাই, বিপন্নতা নাই। ইহাই পতিতপাবনের তারক তেজ। ঐহারা পাপযোনিজাত, ঐহারা জী, ঐহারা বৈশ্ব, ঐহারা শূদ্র, তাঁহারাও পরাগতি লাভ করেন, পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ বা ভক্তিমান ক্ষত্রিয় রাজর্ষি-দিগের কথাই নাই। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভাবিতে হইবে না কাহাকেও।

শ্রীভগবান্ সকল জীবকে বলিতেছেন যে তুমি এই অনিত্য, অস্থায় লোক পাইয়া, আমার ভজনা কর। চিন্ময় বলিয়া, অনিত্যে দেখ নিত্যকে, অস্থ্যে দেখ স্থ্যকে। ইহাই তাঁহার ভজনা। তাঁহার ভজনার অর্থই এই যে অনিত্যকে নিত্য করা, অনৃতকে রত করা, দুঃখকে সুখময় করা, মৃত্যুকে জীবন্ত করা, অজ্ঞতাকে সত্ত্বতিময় করা, অশান্তকে শান্ত করা।

নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীভগবান্ ভজন প্রণালীর উপসংহার করিলেন।

‘মাংসমস্কর’—অর্থাৎ জীব তোমার জীবত্বকে ঈশ্বরত্বের কাছে নমিত কর—নমস্কার মাত্র কায়িক নহে। কায়মনঃ প্রাণে তোমার জীবত্বের সংস্কার পুলিন্দ শ্রীভগবানের নিকট সমর্পণ কর, কাটিয়া যাক তোমার সকল সংশয় ও হৃদয়গ্রন্থি, তোমার সকল কৰ্ম্মক্ষয় হইয়া যাক, তুমি নিজাত্মাতে বিশ্বাত্মা দেখ। ইহাই শ্রীভগবান্কে নমস্কারের ফল।

দশম অধ্যায় বিভূতিযোগ (The Yoga of the Pervading Powers), এই অধ্যায়ে ‘মাং’ শব্দ ৭ বার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—৩, ৮, ৯, ১০, ১৪, ২৪ এবং ২৭ শ্লোকে। অনাদি ও অভজ ‘মাং’কে যিনি লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনিই সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ পান। তাঁহাকে সমগ্রভাবে কোন জীব জানিতে পারে না, কারণ জানা সম্যক্রূপে হইলে জীবত্ব আত্মত্ব গিয়া মিলিত হয়, অর্থাৎ জীবত্ব তখন অন্তর্হত হইয়া যায়। অতএব সর্বলোক মহেশ্বরকে সম্যক্রূপে জানা মানে তাঁহার সমস্ত প্রভাবকে জানা।

কি অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে, কি অধিদৈব ক্ষেত্রে, যাহা কিছু প্রকাশমান, সে সমস্তই তাঁহার বিভূতি, সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ তিনি, তাঁহা হইতেই সমস্ত জাত, পুষ্ট ও লীলায়িত, সমস্ত তাঁহারই শক্তি-বিলাস, তাঁহারই লীলা। এমন কোথাও কিছুই নাই, যাহাতে ওতপ্রোতভাবে তিনি বিদ্যমান নাই। জ্ঞানিগণ এইরূপ ভাবসম্বন্ধিত হইয়া, তাঁহাকে সর্বত্র দেখেন ও তাঁহার ভজন করেন, তাঁহার স্বরূপ ও গুণ বর্ণনার দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বুঝাইয়া প্রবোধিত করিয়া, পরম সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। সেই নিত্যযুক্ত, প্রীতিপূর্বক জ্ঞানশীল পুরুষদিগকে তিনি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করেন, যদ্বারা সেই ভক্তগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

সাধন, ভজন বা উপাসনা ঠিক ঠিক হইলে, বুদ্ধি চৈতন্যময় হইয়া উঠে, তখন সাধকের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তখন তাঁহাদিগের আত্মভাবে অবস্থিত জীবময়বোধকে তিনি পরমাত্মাবোধে পর্যাবসিত করেন। জীবের অজ্ঞানজন্ম, একমাত্র শ্রীভগবানের অনুকম্পা দ্বারা নাশ হয়,—জীবের সাধনার দ্বারা তাহা হয় না। জীবশক্তি ও তাহার সাধনার একটি সীমা। অসীমে পৌছিতে হইলে, সীমার গণ্ডিকে অসীম না পার করা হইয়া দিলে, জীবের নিজ সাধনবলে তাহা সম্ভব হয় না। পারাপারের ব্যবস্থার কাণ্ডারী শ্রীহরি।

একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন যোগ; এই অধ্যায়ে ‘মাং’ শব্দ তিন স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—৮, ৫৩, ৫৫।

দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গুহ্য অধ্যায়জ্ঞানপূর্ণ

উপদেশ দিয়াছিলেন। অর্জুন এখন শ্রীভগবানের বিভূতি-পূর্ণ ‘রূপমৈশ্বর্য’ দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বিভূতি-যোগ সাধনার পরিণতি দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। গুরুর উপদেশে অর্জুনের কোন সন্দেহ নাই। অর্জুনের দৈব সংস্কার মরিয়াছে, কিন্তু তাহা তখনও সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল, তাই তাঁহার দেবতাকে জানিয়াও জানা হয় নাই। এইজন্য অর্জুন দেখিতে চাহিলেন তাঁহার দেবতার যোগৈশ্বর্য—পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য রূপ।

যখন জীবের প্রার্থনা—‘ঋষ্ট মিচ্ছামিতে রূপ মৈশ্বর্য পুরুষোত্তম’ জীবন্ত ভগবানের অন্তরে গিয়া উপনীত হয়, তখন তিনি ফুটাইয়া দেন জীবের দিবা চক্ষু—তাঁহার বিশ্বের সকল স্থানে প্রকটিত হন বিশ্বেশ্বর।

শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে সকল গীতা শাস্ত্রের যাহা সারভূত অর্থ এবং যাহা একমাত্র নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়, শ্রীভগবান একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে সেই উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম তাঁহার The Yoga of the Bhagavat Gita, এই অধ্যায়ের উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—“Only the power of love, the soul's own power, love that for ever seeks to give itself, straining towards Eternity, can bring about the union of the self with the one self by which alone the Cosmic Form is seen and ultimately entered.”

দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ; এই অধ্যায়ে ‘মাং’ শব্দ ৪ স্থানে আছে, যথা—২, ৪, ৬, ৯।

ভক্তির সামিপ্য লাভের জন্ত কেবল মাত্র দ্বিবিধ পন্থা আছে—সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ। শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয় সংঘম এই পথের সম্বল।

শ্রদ্ধাবান ও সংযতেন্দ্রিয় এই উভয় পন্থার পথিকেই জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিতে সক্ষম। ইহজীবনের একটা মূল্য ও মর্যাদা আছে, যাহা কর্মের দ্বারা ও ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়।

‘মাং’কে আশ্রয় করিয়া, এই পথের অনুবর্তন করিলে, ইহকালে অভ্যুদয় ও পরকালে সদগতি লাভ হয়, যাহার

অনুষ্ঠান করিলে মানুষ বলিতে পারে—‘খ্যোহহম, কৃত কৃত্যোহহম,—আমি ধন্য হইলাম, আমি কৃত কৃত্য হইলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায় পুরুষ প্রকৃতি বিভাগ যোগ; এই অধ্যায়ে ‘মাং’ শব্দ ১ স্থানে আছে,—যথা দ্বিতীয় শ্লোকে। এই শরীর ক্ষেত্রনামে অভিহিত হয় এবং এই শরীরকে যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ; পরমাত্মাই জীবাাত্মরূপে ক্ষেত্রজ। ‘মাং’ বা পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞেও ক্ষেত্রজ। সর্বক্ষেত্রে এই ‘মাং’কে দর্শন করিতে হইবে, তাহা হইলে সমবুদ্ধি আপনি আনিবে। যাহারা সর্বত্র সমদর্শী, সর্বভূতহিতে রত ও ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া, অনির্দেশ্য অব্যক্ত সর্বব্যাপী অচিন্ত্য অচলক্ (নিত্য) কূটস্থ (মায়ার অধ্যক্ষ) অক্ষরকে সম্যক উপাসনা করিয়া থাকেন, ‘তে প্রাপ্নবন্তি মামেব’ অর্থাৎ তাহারা ঈশ্বররূপী আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

চতুর্দশ অধ্যায় গুণত্রয় বিভাগযোগ, এ অধ্যায়ে এক স্থানে ‘মাং’ শব্দ আছে, যথা ২৬ শ্লোকে।

এই কৰ্ম্মময় বিধে, যেখানে ত্রিগুণের খেলা সর্বসময়ই চলিতেছে, কৰ্ম্ম না করিলে ব্যাভিচারী হইতে হয়। কৰ্ম্ম-ত্যাগ অপেক্ষা, ভগবদযুক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করাই শ্রীভগবানের মত। এই কথা পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবান গীতাতে বলিয়াছেন। ইহাই গীতার মৰ্ম্ম কথা। শ্রীভগবান গুণত্রয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, জগৎকে কৰ্ম্মময় করিতেছেন। একমাত্র তিনিই অক্ষর এবং সকল কৰ্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা। এই অক্ষর ভাবে পৌছিবাব একমাত্র উপায় ২৬ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবন্ত্ভিত্তিই একমাত্র গুণাতীত হইবার পরম উপায়। যে ভক্তির মধ্যে কোন ব্যাভিচার নাই অর্থাৎ শ্রীভগবানের অভিমুখে অবিকলিত সমভাবে প্রবাহিত, তাহাই অব্যভিচারী ভক্তি। যিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের সহিত শ্রীভবানের সেবা করিয়া থাকেন, তিনিই এই গুণত্রয় অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মভাবের অর্থাৎ মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। এইরূপ মহাত্মাই মোক্ষলাভের একমাত্র অধিকারী। কেবল জ্ঞানবলে মোক্ষলাভ হয় না, চাই জ্ঞানের সহিত ভক্তির স্মৃতি। এবং যিনি ইহা করিতে

পারেন, তিনি ইন সর্ববিৎ ও সকল রহস্তের বেত্তা।

গীতা ১৫।১২

পঞ্চদশ অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ; এই অধ্যায়ে এক স্থানে ‘মাং’ শব্দ আছে, যথা ১ম শ্লোকে।

পুরুষোত্তমকে লাভ করিবার উপায়, এই অধ্যায়ের প্রতি মন্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। “সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম” ইহাই পুরুষোত্তমতত্ত্ব। এই জগৎই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ইহার প্রতি ধূলিকণাটিও চিহ্ন। পুরুষোত্তম প্রতি-অনুতে পরমাত্মতে প্রবিষ্ট। এই পুরুষোত্তম মহাত্মা অশেষ রহস্যজালে জড়িত।

ক্ষরস্বভাব জগৎ এবং অক্ষর স্বভাব জীব, উভয়ই পরম পুরুষ হইতে অভিন্ন, এই নিমিত্ত উভয়ই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

কার্য ও কারণরূপে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় অপেক্ষা পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ। যাহার এইরূপ প্রকৃষ্ট পরিজ্ঞান হইয়াছে, তিনিই সর্ববিৎ অর্থাৎ সকল বিষয়ের জ্ঞানই তাহার লব্ধ হইয়াছে। সেই ভাগ্যবান জন্ম মৃত্যু, ইহকাল পরকাল এবং সুখ দুঃখ, এই সকলের রহস্যই তিনি সম্যক প্রকারে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। সেইরূপ সর্ববিৎ মহাত্মা সর্বপ্রকারে সেই পুরুষোত্তম স্বরূপ শ্রীভগবানেরই ভজনা করিয়া থাকেন।

চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যে-সাধক ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, তিনিই সত্ত্বাদি গুণসমূহকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম-ভাবের অর্থাৎ মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন।

ষোড়শ অধ্যায় দৈবাস্ত্র সম্পদ্বিভিন্ন যোগ (বা ভাবের বিভিন্নতা)। এই অধ্যায়ের দুই স্থানে ‘মাং’ শব্দ আছে, যথা—১৮ ও ২০ শ্লোকে। যিনি আত্ম সুখকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তিনি অস্তুর বলিয়া কথিত। পরার্থে কৰ্ম্ম করাই সত্ত্বগুণাত্মক কৰ্ম্ম; আপন তৃপ্ত্যর্থ কৰ্ম্ম করাই তমোবিশ্লিষ্ট কৰ্ম্ম।

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধকে অবলম্বন করিয়া আপন ও পরদেহে অন্তর্যামী বেশে অবস্থিত ঈশ্বররূপী ‘মাং’কে দেব করতঃ ও হেয় জ্ঞানে যাহারা উপেক্ষা করেন তাহারা অস্তুর। নারায়ণ অন্তর্যামী মূর্তিতে জীবদে

অবস্থান করেন এবং জীবকে প্রারম্ভ ভোগ করান। ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করাই ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ করা। আমার এতগুণ আছে, এই প্রকার যে ভাবনা তাহাই অহঙ্কার।

সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রীভগবানকে পায় না। কি প্রকারে ইহারাও উদ্ধার লাভ করিবে, শ্রীভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছেন।

সপ্তদশ অধ্যায় শ্রদ্ধাভ্রম বিভাগ যোগ; এই অধ্যায়ে একস্থানে ‘মাং’ শব্দ আছে, যথা ৬ শ্লোকে।

গুণভেদে জীব শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হন।

আমি করিতেছি, এইরূপ দন্ত ও অহঙ্কার সহকারে কামনা ও আসক্তিতে মুগ্ধ হইয়া অশাস্ত্রবিহিতভাবে যাহারা উৎকট সাধনা করে, অজ্ঞানতাবশতঃ শরীরস্থ ভূত ও অন্তঃ শরীরস্থ ‘মাং’কে যাহারা কর্শন করে, তাহাদিগকে অম্বর প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। তাহারা বিজ্ঞান ভুলিয়া নিজ প্রচেষ্টাকে বড় মনে করে। ইহার দ্বারা শরীর ও আত্মাকে কর্শিত করা হয় মাত্র। রাজস ও তামস ভাবই অম্বর ভাব। ইহাকে অতিক্রম করিয়া সাত্বিক ভাব বা দেবভাব লাভ করিতে হইবে। তাহা হইতে হইবে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভক্তি এবং ভক্তি হইতে মুক্তিলাভ।

অষ্টাদশ অধ্যায় মোক্ষযোগ, এই অধ্যায়ের ৫ স্থানে ‘মাং’ শব্দ আছে, যথা—৫৫, ৬৫, ৬৬, ৬৭ ও ৬৮ শ্লোকে।

দান ব্রত যজ্ঞ আমরা যে কর্মই করি, যদি প্রতিদান চাই, তাহা বন্ধনরূপে আমাদের নিকটে আসে। প্রতিদান প্রত্যাশার জন্তই গতায়াত। গতাগতং কামকামা লভন্তে ৯২১ কামনায়ুক্ত জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ভক্তির উদয়ে তত্ত্বজ্ঞান হয় বা তত্ত্বতঃ পরমাত্মাকে বিদিত হওয়া যায়। তত্ত্বতঃ ‘মাং’কে জানিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীধর স্বা মীবমতে গীতাশাস্ত্র অতিগম্ভীর। ইহার তল কোন জীবই স্পর্শ করে নাই, করিতে পারে না।

গীতার সার সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দুটি শ্লোকে ৬৫ ও ৬৬ শ্লোকে) বলিয়াছেন।

ময়না ভব মন্ত্ৰেণ মদ্যাজী মাং নমস্কর।

মামে বৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫

গীতার চরম উপদেশ ৬৬ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন।

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য যামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

অনেক মনিষী এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু কোন অর্থই সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। ইহার অর্থ অনন্ত; মাহুয় বলিয়া শেষ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে (গোরখপুর কল্যাণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত) এক মহাত্মা এই শোক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই বক্তৃতাশ্রম-মন্ত্রের ভিতর ১৬ প্রকার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। আমরা নিম্নে শ্লোকের কতিপয় শক্তি প্রকাশ করিলাম।

(১) অর্থের অনন্ততা;

(২) অব্যয়ের আধিক্য;

(৩) এই মন্ত্র হইতে ৩৪ সংস্কার যন্ত্র হইয়াছে;

(৪) কথার অর্থ ভেদ ৭৯ কোটিরও অধিক;

(৫) ৭৪ প্রকার ধাতুর যোগে এই মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সান্ত সীমাবদ্ধ মাহুয় গীতাকে কিছুই বোঝে না। যিনি যতটুকু বুঝিয়াছেন, তাহাতেই ধত্ত হইয়াছেন।

“জীব ক্ষুদ্র-বুদ্ধি গীতা কে পায়ে বর্ণিতে

তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥”

“গীতা বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান ॥”

সেই নাহি বুঝে গীতার প্রমাণ ॥”

গীতার ‘মাং’ শব্দকে আলোচনা ও অনুধাবন করিলে, সমগ্র গীতাকেই আলোচনা করা হয় এবং ইহা কতক পরিমাণে বোঝা যায়।

বাছল্য ভয়ে প্রবন্ধটি অতি সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে, তথাপিও কিছু বড় হইয়া পড়িয়াছেন।

অন্ধ-প্রেম

এক

কত বছর আগেকার কথা, ঠিক করিয়া বলা শক্ত। তবে তখনকার দিনের কলিকাতা সহর এখনকার মত ছিল না—আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তখন ভিত্তি ছিটাইত, ধূলিপূর্ণ পথে জন, “বাবু লোকেরা” পান করিত লালদীঘির “মিঠা পানি”, পথের দুই ধারে ছিল দেড় মাস্ক-ভোর খানা-লহর, পথের আলো ছিল মিট মিটে কেরোসিন ল্যাম্প, ওয়েলিংটন স্ট্রিটের পাম্পিং স্টেশনের জলটানা পাম্প তিনটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যরূপে সেই সবমাত্র প্রতিষ্ঠিত ইহবার মত বন্দোবস্তের গভীরে পড়িয়াছে। এই প্রকার আরো কত কীই!

সেই সময়ে বহুবাজার অঞ্চলে বহু বড়লোকের বাড়ীতে যাতায়াত করিত একজন অদ্ভুত চরিত্র ব্রাহ্মণ। বয়স তাহার ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু দেহ বেশ সবল। চুল কাঁচা-পাকা, দাঁতগুলি অসম্ভব রকমের উচু ও বড়, গায়ের রং পাকা আবলুস কাঠের মত। পরণে চওড়া কালা পাড় ধুতি। অঙ্গ অঙ্গরাখাহীন, মাথায় একটা অসম্ভব রকমের প্রকাণ্ড শাদা পাগড়ী, চরণে খুব ভাল পেটেন্ট লেদারের জুতা, হাতে থাকিত বীভৎস রকমের একটা মোটা লাঠী। ব্রাহ্মণের চলন-ভঙ্গী অপরূপ, বলন-ভঙ্গী হস্তরসাম্পদ। কেহ বলিত, ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য অসাধারণ, কাহারও ধারণা—শুধুই সে মূর্থ নহে, বড়লোকের বাড়ীর ভাড়। মাস্কঘটার নাম জানিত না কেহই। চাঁদা ক্যাপা নামে তাহার প্রসিদ্ধি।

যাত্রা, থিয়েটার, জিমনাস্টিক, কনসার্ট, হাফ-আখড়া, পাঁচালী প্রভৃতির প্রচলন বহুবাজার অঞ্চলে তখন খুব বেশী। যে সকল মনীষি ও ধনী ব্যক্তি এ অঞ্চলে বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের একটা-না-একটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। চাঁদা এই সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সহসা একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। সে ঘোষণায় সকলে ত হাসিয়াই খন।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া হুঙ্কার দিয়া চাঁদা প্রচার করিতে

লাগিল—

“যে দেশে আমার মত গরীব দুঃখী হ’ল শতকরা নিরেনব্বই জন, যাঁরা মায়ে’র পেট থেকে প’ড়ে খেতে পায়না দুধ, জোয়ান বয়সে পায়না দু’বেলা আঁচা’তে, বুড়ো বয়সে—মরণকালেও পায়না তেষ্ঠার জল, তা’দের অত সখ সখ কিসের বাবা! ও সব সখ ফেলে দাও ধাপার লোনা পুকুরে। সখ করতে হয়, মাস্ককে ভাত-কাপড় দাও। মাস্ককে ভালবাস, মাস্কের সেবা কর, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দাও; বুঝি তবে তোমাদের কেমন সখ তোমরা কেমন সৌখীন!”

রত্নেশ্বর বক্তার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—

“আরে কর কি, কর কি—ক্যামা দাও, ক্যাপা, ক্যামা দাও। তোমার ক্যোপানীর সখ থাকে, সরাসরি চলে যাও ধাপায়। সার মাস্কের গুণে সেখানে চটপট বেড়ে উঠবার উপায় হ’বে। আমরা যাত্রা, থিয়েটার, জিমনাস্টিক ক’রে আসছি চিরটাকাল, আর করবও; তা’তে তোমার বুক চড়চড়ায় কেন বাপু?”

হুঙ্কার দিয়া চাঁদা বলিল—

“জীবন নষ্ট করতে চাও বাবা, হুলস্থল রার কর; কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমার কাছে কয়োনি ও সব কথা। রক্ত ফুটে উঠবে টগ-বগ-ক’রে—বিগুড়ে যা’ব, মার দেগা—হাঁ”

মুখ-চোখ এক রকম করিয়া রত্নেশ্বর কি একটা বিকীর্ণ কথা বলিতে যাইতেছিল; রত্নেশ্বরের বন্ধু মহেন্দ্র ইঙ্গিত করিয়া সে বলা বন্ধ করিয়া দিল। মহেন্দ্র জানিত, ক্যাপাকে ক্যাপাইলে ভারী বিপদ। কথাটা চাপা দিবার জন্য মহেন্দ্র বলিল—

“আচ্ছা, চাঁদা, লোকে যে বলে—তোমার কেউ কোথাও নেই, তুমি একা; সে কথাটা কি ঠিক?”

চাঁদা বলিল—

“ঠিকও বটে, বেঠিকও বটে !

একা আমি আসিয়াছি, ভবার্ণবে ভাসিয়াছি

যা'ব একা, কেহ নাহি যা'বে।

কিন্তু এ কথাও আবার বলি—

একা আমি নহি আর, বন্ধু তুমি নারায়ণ,

তুমি যা'র আপনার, দুখ তা'র উদযাপন।

মহেন্দ্র বলিল—

“ও সব ত কাব্য-কথা চাঁচুদা !

“আরে না না, ঐ হ'ল মূল কথা। শোন্ মদীনন্দর তবে বলি। এই বিশ্ব-সংসারে যা' কিছু দেখ'ছিস, ওসব হ'ল আমারও বটে, তোরও বটে, আর সবারই বটে। ঐ যে দেখ'ছিস গড়ের মাঠে অক্টারলোনী মল্লমেন্ট, আর মা-গঙ্গার বৃকের উপর বিরাট সেতু, ওয়া হ'ল আমার সহোদর, নিস্তার জেলেনি আমার সহোদরা, রাজু মুখুয্যে আমার খুঁড়ো, মোহন ঘোষ হ'ল আমার মামাত ভাই, কালুনিয়া আমার জাতি-ভাই। আর কত বলবরে !”

মহেন্দ্র খুব গভীর হইয়া বলিল—

“ব'লে যাও দাদা, যেগুলো জানা ছিল না, সেগুলো জেনে নিও।”

“হঁ, তবে শোন্। বিয়ে করেছি কাকে জানিস—বোটানিক্যাল গার্ডেনকে। ভারী রূপসী আমার প্রিয়া। শালী হোল ইডেন্ গার্ডেন। জুয়োলোজিক্যাল গার্ডেন হ'ল আমার প্রেমসীর মাস্তুতো বহিন। আরো শুন্তে চাস্ ত আরো বলি।

“শুন্ব বৈ কি চাঁচুদা, শুন্ব বৈ কি ! তুমি ব'লে যাও, বলে যাও।”

“বেশ—তবে শুনে যা। হিমালয় হ'ল আমার বাবার একটা জমিদারী; সমুদ্র, নদ-নদী, আকাশ-পাতাল যেখানে যা-কিছু আছে, সব হ'ল আমার বাবার সম্পত্তি। মাহুঘ, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ, চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারা যা-কিছু দেখ'ছিস, সবার মালিকানি সব হচ্ছে আমার বাবার। আমার কিছু নেই, একথা বলে কি সাজবে বাবা ? ওসব বুট্ বাৎ—ধোৎ।

কথা শেষ করিয়াই ফ্যাণা হাসিয়া উঠিল। সে কি

বলিল, কেনই বা হাসিল, রত্নেশ্বর ও মহেন্দ্র তাহার কিছুই বুঝিল না—বুঝিতে পারিল না।

ফ্যাণার ফ্যাণামী বলিয়াই তাহারা সেটা ধরিয়া লইল। কথাবার্তা হইতেছিল পথে দাঁড়াইয়া। একজন অন্ধ ভিক্ষুক সেই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। অন্ধের বয়স খুব অল্প নহে। সঙ্গে আছে তাহার বৃদ্ধা জননী। অন্ধের দক্ষিণ হস্তের কজীতে ঘুমুর বাঁধা। বাম হস্তে একটা বড় মেটে-হাঁড়ি। কেমন একরকম গলায় সে বলিল—

“বাবুরা গান শুন্বে গা ?”

তাহার বলিবার ভঙ্গীতে রত্নেশ্বর ও মহেন্দ্র হাসিয়া উঠিল। ফ্যাণা কিন্তু গভীর ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

“কিসের গান হে ? যাত্রা থিয়েটারের গান নয় ত ?”

সে প্রশ্নের উত্তর দিল অন্ধের জননী। সে বলিল—

“না বাবু, উসব গান আমার ছেলেকে শিখু তে দিই না বটেক। ছেলেকে যে গান শিখুয়েছে, তেনার মত—উসব বড়াই মন্দা। তেনি বলে—উসব গানের সুর, সুর-লয়, সুর-তালের ছেয়াদা।”

অভিমত শুনিয়া রত্নেশ্বরও মহেন্দ্রের দিকে চাহিয়া চাঁচু হাসিল ও কাশিল।

তাহার মাঝখানে অন্ধ গায়ক সহসা বলিয়া উঠিল—
“মা, আমি বাবু হ'ব, বিয়ে কর'ব, গাড়ী চ'ড়ে খুশুরবাড়ী যাব। বৌ এনে তোমার স্রাবা করা'ব বটেক।”

মহেন্দ্রের কাণে কাণে রত্নেশ্বর বলিল—চাঁদা ফ্যাণার জুড়িদার বটে। কি বল, এ্যাঃ ?”

অন্ধ ইতোমধ্যে হাঁড়ি বাজাইয়া গান আরম্ভ করিয়াছে—

জাগো অন্ধ জাগো !

কুণ্ডর ফলে দৃষ্টি তোমার—

সৃষ্টি দেখিতে জাগো !

ধ্যানের জ্ঞানের প্রান্তর ভূমি,

গুরুর কৃপায় চিনিয়াছ তুমি,

আলোর সোহাগ অন্তরে তব।

পুলকে আজিকে জাগো !

তুমি দেখ রূপ শব্দ-পরশে
অ-দেখার দেখা চলে গো হরষে
তরুণ নয়, মনোময় তুমি

জানালোকে জাগো জাগো !

বাহিরের পথে হয়েছে বিবাগী,
অন্তরে চির-সুখা অহুরাগী—
বরণীয় হ'য়ে স্মরণীয় দিনে

মুক্তির গানে জাগো—

জাগো জাগো জাগো—

গানের সুর ভৈরব বা ভৈরবো। একতারা তোলে

গানটা খুবই জমিয়া উঠিল। গান শেষ হইতেই ভৈরব-
রূপী-চাঁদা ক্ষ্যাপা হুকার দিয়া বলিল—

“আমি অন্ধ, তুমি অন্ধ, সকলেই অন্ধ। চক্ষুমান্ সেই,
যে চিন্তে পারে আপনাকে। ক্ষ্যাপা আর দাড়াইল
না সেখানে। লাঠি ঠুকিয়া হুকার দিয়া পথের জনতার
মধ্যে সেনমিশিয়া গেল।

অন্ধগায়ক ও তাহার মা বলিল—“বাবু পয়সা ?”

পয়সার তাগিদ হইতেই শ্রোতার দল পাতলা হইয়া
পড়িল। গান শুনিবার জন্য ভীড় জমিয়াছিল খুবই।
পয়সা পড়িল মাত্র পাঁচ সাতটা।

[ক্রমশঃ]

হিন্দু মহিলাদের নার্সের কাজে আগ্রহ

শ্রীতরু ঘোষ

বাঙ্গালী হিন্দু মহিলাদের নার্সিং কার্গে ব্রতী করিবার
জন্তু কয়েকটি মহিলা মিলিয়া একটা নার্সিং সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা
করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে। তাহারই ফলে নার্সিং
ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমাদের এই ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ছোট্ট একটা ইতিহাস
আছে। ভারতীয় নার্সদের সজ্জবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা
আমরা অনেকদিন থেকেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করে-
ছিলাম এবং অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা সজ্জবদ্ধ
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার বাসনা মনে মনে পোষণ করে-
ছিলাম। আর্থিক সচ্ছলতা আমাদের ছিল না, বাইরে
থেকে অর্থ সাহায্যও আমরা পাই নি—অথচ, শুধু আশা
নিয়ে চিরকাল বসে থাকাও চলে না, তাই—হঠাৎ একদিন
মাত্র সাত জন সভ্য নিয়ে আমরা এই গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ
কয়ে বসলাম। আমাদের ভরসা ছিল—মাত্র নিজেদের
সততার উপর আর মাথার উপর ছিলেন—সর্বস্বত্বাধারী
ভগবান! গত এক বৎসর দশ মাস কাল আমরা যে কত
বাধা বিপত্তি—ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে আজ ক্ষীণ একটু-
খানি আশার আলো দেখতে পেয়েছি তা একমাত্র আমরাই
জানি। আজ আমাদের সভ্যসংখ্যা যে খুব বেশী হয়েছে

তা নয়, নিশ্চিত সফলতা যে লাভ করেছি তাও বলতে
পারি না, তবে জনসাধারণ আমাদের এই সজ্জটিকে প্রীতির
চক্ষে দেখেছেন, সর্বসাধারণের অযাচিত সহানুভূতি আমরা
পেয়েছি—এইটুকুই আমাদের অনিশ্চিত যাত্রাপথকে
অনেকখানি স্বগম করে দিয়েছে—এইটুকুমাত্র বলতে
পারি। এখন আমাদের সভ্যসংখ্যা চল্লিশের উপর এবং
আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনজন মহিলা নার্সিং শিক্ষা
করতে গিয়ে—জীবনে অন্ততঃ একটুখানি প্রতিষ্ঠিত হ'তে
পেরেছেন।

এই যে নার্সিং—এই যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান—এর উপকারিতা
—এর প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশ এখনও ভাল করে
উপলব্ধি করতে শেখেনি। তবে আমার বিশ্বাস কয়েক
বৎসর আগে পর্যন্ত—অজ্ঞ জনসাধারণ একে ঘে-রকম
অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন, এখন আর ততখানি ঘৃণার চক্ষে
একে দেখেন না। শিক্ষিতা মহিলারা তো এ পথে
আসতেনই না, আসতেন শুধু তাঁরাই—জীবনে যারা—না
পেলেন শিক্ষা, না পেলেন সংস্থান—দৈবের বিড়ম্বনায়
যে-সব নারী হলো নির্যাতিতা, লাক্ষিতা,—সমাজে যারা
কোনরকমে এতটুকু-ঠাই করে নিতে পারলে না—মাতৃহীনা,

আত্মীয়স্বজনহীনা—সর্বপ্রকারে পরিত্যক্তা অবহেলিতা দুঃখা ভগিনীরা আস্তেন নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে। তাই এ বস্তুটি ছিল সকলের অবজ্ঞার, এখানে ছিল অনাচার, ছিল অবিচার। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। মানুষ এখন বুঝতে শিখেছে—এর প্রয়োজনীয়তা।

আর আমাদের দিক থেকেও এ ত' শুধু জীবিকা উপার্জনের উপায় মাত্র নয়, এ যে নারীর পরম ধর্ম, এ যে সেবাব্রত! এই মহান সেবাব্রত ধারা দীক্ষিতা হ'তে না

ভগিনী রাজ্যশ্রীর দেশের মাতা-কন্যা-বধূ-ভগিনীদের সেবাব্রতের কথা—বোধকরি বুঝিয়ে বলতে হয়। আর্ত পীড়িত দুর্ভাগ্য লাঞ্চিত পথের পথিককে দেখলেও দেশের মেয়েদের চোখের জল আপনিই গড়িয়ে আসে। দেশের মেয়েরা যদি এই সেবাব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারে—ত' আর পরম কোথায়?

আমাদের এ কাজ অতি পবিত্র, অত্যন্ত মহান।



নার্সিং ইউনিয়ন

সভাপতি—ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস

পারে—একে জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে যারা গ্রহণ করতে না পারে—এ বিন্যাশিকা তাহাদের ব্যর্থ হয়। তবে আশার কথা এই, ভারতের নারীদের অন্তরে সেবাব্রতের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা জয়গত। আর্তের গুণাবাকে ভারতীয় নারী তার স্বভাবস্বলভ ধর্ম বলেই মনে করে। ফ্রান্সে নাইটিঙ্গেলের দেশে নারীদের এ তথ্য বোঝাবার প্রয়োজন হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু রাজা হর্সবর্কনের

শান্তি আছে, তৃপ্তি আছে, আর আছে অবাচিত আশীর্বাদ। মনে-প্রাণে সদাসর্বদা আমরা যদি শুচিশুদ্ধ হ'য়ে অন্তরের ঐকান্তিকতার সঙ্গে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করতে পারি, তা হ'লেই জান্‌বো—আমাদের নারীজীবন সার্থক হয়েছে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। *

* কলেজ স্কোয়ার কলিকাতায় এই নার্সিং হোম অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

বর্তমানে পৃথিবীতে এমন সব ঘটনা ঘটছে যাতে কোন দেশই এখন উদারনী ধাক্কাতে পারে না। দূরে আছি, অথচ নিজেদের অনেক কিছু সমস্যার মীমাংসা করবার আছে বলে আন্তর্জাতিক বিষয়ে একেবারে উদারনী ধাক্কা সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ যে সব ব্যাপার ঘটছে এখন ইয়োরোপে।

জার্মানিতে হিটলারের প্রতিপত্তির সঙ্গে জুলুমবাদ ও যুদ্ধের ভয় জেগে উঠেছে চারিদিকে। এর আঁচ গিয়ে পড়েছে প্রত্যেক দেশে। ভারতও যাচ্ছে না বাদ। জার্মানিতে করবার ছিল অনেক। হিটলার তার দেশ-বাসীদের জন্তে করেছেও ঢের। তাদের মধ্যে একতা স্থাপন করেছে, সকলকে কাজ জুটিয়ে দেওয়া ও স্বাধীন করবার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু এই সব করতে গিয়ে একটা ভুলও সে করে বসেছে। নিজের হাতে গড়া তার দেশটিকে ও তাদের এই নবপ্রাপ্ত শক্তিকে ব্যয় করেছে সে কেবল জোর জবরদস্তি ও দুর্বলের প্রতি বল প্রয়োগে। সৈন্য সংখ্যা তার অনেক। বোমা ফেলবার হাওয়াই জাহাজও আছে তার ঢের। ১৯৩৮ সালে নিউনিকের চুক্তির পর হতেই সে এইসব সৈন্য ও হাওয়াই জাহাজ নিয়ে কেবল শাসিয়ে বেড়াচ্ছে সবাইকে। চারিদিকে রণভঙ্গা বাজিয়ে দিয়েছে সে। অবশেষে নিয়েছে কেড়ে চেকো-স্লোভাকিয়াকে জোর করে। যুদ্ধ হয়নি সত্যি। যুদ্ধ হবেই বা কি করে? চেকোস্লোভাকিয়া একটা ছোট দেশ, জার্মানির সঙ্গে তার লড়াই সম্ভবপর নয়! তা' ছাড়া ১৯৩৮ সালে চেক জাতি আত্মরক্ষার সব কিছুই দিয়েছিল ছেড়ে ইচ্ছা করেই। তবু জার্মানী তাদের দেশের মধ্যে সৈন্য সামন্ত, গোলাগুলি নিয়ে ঢুকে পড়ে দেশটিকে নিল দখল করে। ফল হ'ল যুদ্ধেরই মত। চেক জাতি হারাল তার স্বাধীনতা। এর ফলে জার্মানির সত্যি যদি কোন অভাব অভিযোগ থাকে তবে তার শাস্ত্যভাবে বিবেচনা করবার পথ রইল না আর খোলা। যুদ্ধের ভয় দেখান যতদিন না হিটলার ছাড়বে ততদিন এইভাবে মিটমাট করবার উপায় থাকে না আর। যতদিন না আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি সবাই জানে, যতদিন না আন্তর্জাতিক মিটমাটের উপর লোকের দৃষ্টি আস্থা থাকে ততদিন পৃথিবীতে কেউই নিশ্চিন্তে বাস করতে পারবে না, যেহেতু যে কোন দিন এক শক্তিশালী জাতি অপর দুর্বল জাতিকে নিপেষিত করে দিতে পারে, বিশেষতঃ আকাশ থেকে বোমার সাহায্যে।

এই ভয়ে নিজেদের বাঁচাবার জন্তে সব দেশেই এখন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে গোলাগুলির উপর, হাওয়াই

জাহাজের উপর, বোমার উপর। এই সব টাকা কিন্তু যাচ্ছে জলে। গোলাগুলিতে ত' মাস্কের পেটের জালা মেটেনা। যে টাকা পেত হাসপাতাল, স্কুল, কৃষিশিল্প, জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠান সে টাকা যাচ্ছে ধ্বংসের যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্তে। ফলে সকলেই হয়ে পড়ছে গরীব।

ভারতকেও নিজেকে হবে সামলাতে। জার্মানী যে বলছে উঁচু গলায় তার উপনিবেশের প্রয়োজন আছে। তারা একবার যাদের উপর আধিপত্য করবে বিস্তার তাদের স্বাধীনতা বলে আর থাকবে না কিছু। অসহযোগ পন্থা ও সত্যাগ্রহ তারা দেবে উড়িয়ে হেসে। জোর জবরদস্তিই হ'ল উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, এই শিক্ষাই তারা দিয়ে থাকে; অল্প মতগুলিকে তারা দুর্বলতা বলেই করে মনে।

সমাজ সেবা, গরীব দুঃখীর উন্নতি, দারিদ্র মোচন, এই সব কাজের জন্তে চাই পৃথিবীতে শান্তি। যারা এই শান্তি প্রার্থী এখনই তাঁহাদের হয়েছে সময় এক জোটে হয়ে দূর করতে এই যুদ্ধের বিভীষিকাকে।

গোলা গুলি ও বোমাই সব পন্থার শ্রেষ্ঠ পন্থা স্বীকার না করে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক গড়ে তোলাই হ'ল এখন কর্তব্য। সকলে মিলে একটা উপায় ঠিক করুক যা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে জার্মানীকে তার এই জুলুমবাদ পন্থা থেকে। যুদ্ধ ছাড়া আর অনেক উপায়ই বেরুতে পারে যদি সকলে মিলে করে প্রাণপণ চেষ্টা। তবে করতে যদি হয় এই ব্যবস্থা তবে করতে হবে সেটা খুব তাড়াতাড়ি।

সকল ভারতবাসীরই জানা উচিত পৃথিবীর দেশ বিদেশে কোথায় কি ঘটছে আর যাতে এই আন্তর্জাতিক বৈঠকটি বসে শীঘ্র তার করতে হবে চেষ্টা। এ না হলে তার নিজের কোন কাজ হবে না। শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীর কোথাও কোন কাজ এগুবে না। ভারতের এবং অন্যান্য প্রদেশের গরীবরা গরীবই থেকে যাবে; সমস্তক্ষণ একটা ভয় ভাবনার ভিতর থাকবে তারা, আর হয়ত যে কোন মুহূর্তে তারা যুদ্ধের ভিতর জড়িয়ে পড়বে। তাদের অবস্থার কোন উন্নতি হবে না যতক্ষণ না এসবের একটা ব্যবস্থা হয়, যতক্ষণ না এইটাই স্থির হয় যে জোর যার মূলুক তার নয়।

বই পড়ে ও অন্যান্য উপায়ে আমাদের সকলকেই খবর রাখতে হবে পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে। আমাদের দেশনেতাদের দিয়ে জোর করে বলাতে হ'বে যে এই আন্তর্জাতিক বৈঠকে ভারতের যা বলবার আছে তাকে তা বলতে দিতেই হবে, এবং সকল জাতিই যাতে শান্তিতে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা তাঁদের করতে হইবে।

হলুদে পাতা

শ্রীকণা দত্ত

ছাত্রজীবনে বোর্ডিং টুকিয়াই সর্ব প্রথমে ঝাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলাম, তিনি আমাদের সুবর্ণ-দি। আমার প্রতি তাঁহার সর্বপেক্ষা অসন্তুষ্টির কারণ যে, আমার বোর্ডিং জীবনের প্রথমতম মুহূর্তটিতে তাঁহার মত একজন বিখ্যাত নারীকে আমি ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারি নাই। বাইরের সারি সারি পাম্ আর ক্রোটনের টব বসানো করিডোরটিতে, সুবর্ণ-দিকে নিবিষ্ট চিত্তে সেলাই করিতে দেখিয়া, আর একটি মেয়েকে আমি নিতান্ত নিরীহভাবেই প্রণয় করিয়াছিলাম, “ইনি কে?” ভাগ্যদোষে স্থলেখাও নবাগতা। পাতলা রান্না ঠোট দুটি উন্টাইয়া সেও উত্তর দিয়াছিলো “কে জানে? কি-টি হবে হয়তো কেউ!” —অদূরে নীবনরতা সুবর্ণ-দি কথাটা শুনিলেন। একরাশ বান্ধবে যেন কে নির্বিকার চিত্তে জলন্ত দেশলাই এর কাটিটি ফেলিয়া দিয়াছে। এমনি আকস্মিক ক্রোধে সুবর্ণ-দি জলিয়া উঠিলেন। বার্কক্য জরাগ্রস্ত কুক্ষিত লোলচর্ম মুখখানি; ক্রোধে সে এক অপক্লপ রূপ ধারণ করিয়াছে। ঝুলিয়া পড়া ঠোটখানিকে তখনও অবশিষ্ট থাক। দুটিমাত্র দাঁত দিগা প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া সুবর্ণ-দি গর্জন করিয়া উঠিলেন,—

“আমি কেন কি হতে যাবো গো? কি তোমরা। তোমাদের চোদপুরুষ কি, তাই সুবর্ণকে চেনান। জানো আমি কে? এইস্থল বীর আমি তাঁর মেয়ে; এর প্রত্যেকজন টিচার মেট্রণ মাষ্টার সব আমার চাকর চাকরাণী।”

আমি আর স্থলেখা সেই সাপের মত ক্রুর, হিংস্র জলন্ত দৃষ্টির সম্মুখে নিষ্পন্দ চক্ষু দণ্ডায়মান। বুক ভয়ে কাঁপিতেছে; কি সর্বনাশই করিয়া বসিলাম। স্থলে ঢুকিতে না ঢুকিতে বুঝি বাড়ী ফিরিতে হইল। ফিরিবার পাথেয় স্বরূপ তিরস্কার, অপবাদ আর গল্পনাই শুধু সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম। কিন্তু এভাবে কিছুক্ষণ বৃথাই গজরাইবার পরে সুবর্ণ-দি দেখিলেন যে আসামীদ্বয়কে তিনি তাঁহার

সুতীক্ষ্ণ বাণে যথেষ্টই কাবু করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

গলার কর্কশ স্বরটাকে যথাসম্ভব খাদে নামাইয়া তিনি আবার স্বর করিলেন,—

“কানে দুটো বালতি ঝুলালে আর ঘুরিয়ে শাড়ী পরতে শিখলেই, বুদ্ধিমতী হওয়া যায় না, বুঝলে?”

স্থলেখারও যেমন কপাল! এমন সঙ্কট মুহূর্তেও তাহার কানে দুখানি বড় বড় কানবালা ঝুলিতেছে এবং দুজনই আধুনিক প্রথামতে, যথাসাধ্য আপ্ টু ডেট্ হইবার প্রয়াসে, পরনের শাড়ীখানিকে ঘুরাইয়া পরিয়াছি। আড়চোখে স্থলেখার পানে চাহিয়া দেখিলাম, বালতিসহিত তাহার চল্লিশ টাকা দামের কানবালা জোড়ায় মধ্যান্তিক উপমায় বেচারার চোখ দুটি ছলছল করিতেছে। আর কত সওয়া যায়?

শোকে দুঃখে দুর্দশায়—মা বসুন্তীর মত সেকালের ধৈর্যশীলা নারী মহি, বিংশ শতাব্দীর নারীপ্রগতির সুবিশাল বাহিনীর, আমরা প্রত্যেকেই এক একটা নারীসেনানী বলিয়া নিজেদের মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। কথায় বার্তায় আচার ব্যবহারে, এবং সর্বপেক্ষা বেশী নাজসজ্জায়, আমাদের বিংশ শতাব্দীর কাচ প্রাণপণে প্রকটীত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত আপ্রাণ সাধনা করিতেছি। আমাদের মাতা পিতামহী আমাদের সেই অতি আধুনিক রুটির বস্তার উদ্যম স্রোতের সম্মুখে পড়িলে তাহার গতির প্রচণ্ড আবেগে, ভূপের মত অতি সহজেই ভাসিয়া যাইতেছেন। অল্প বেতনভোগী পিতা তাঁহার প্রতিটা রক্তবিন্দু ব্যয় করা স্বপ্ন আয়ে, আমাদের রুচির নিতানূতন সরঞ্জাম সরবরাহ করিতে করিতে দীর্ঘবাসী কষ্টে রোধ করিয়া অদৃশ্য দেবতার চরণে মিনতি জানাইতে যেন পরজন্মে আর আপ্-টু-ডেই মেয়ের বাপ হই। তাঁহাকে জয়গ্রহণ করিতে না হয়। এ হেন দুর্দশায় নারী-প্রগতির আবেগ কি অবশেষে, সুবর্ণদির মত

একজন সেকলে বুদ্ধার হাতে পড়িয়া লাক্ষিত হইবে? আমিই বলিলাম,—“আমরা এ স্থলে নতুন ভর্তি হয়েছি কিনা, তাই আপনাকে চিন্তে পারি নি স্ববর্ণদি। আপনার চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আপনি খুব বড়ঘরের মেয়ে?”

আমার দুটি কথায় যেন আশাতীত রকম ফল ফলিল? স্ববর্ণদির স্বর তারা হইতে যেন উদারায় নামিয়া আসিয়াছে, এমনি কোমল কণ্ঠে তিনি বলিলেন—

“তাই বল বাছা, নইলে স্ববর্ণকে চেনে না এমন লোক কলকাতায় আছে বলে তো জানি নে? এই স্ববর্ণের নামে লাট সাহেবের মেস শুদ্ধ গাড়ী থেকে নেমে ছুটে আসবে। আঁহা! কি যুগই ছিল সেকালে! লিটন সাহেবের মেস স্থল দেখতে এসে আমার হাত ধরে, সে কত কথা?”

মনে মনে বলিলাম, সেকাল গিয়াছে ভালই হইয়াছে। নতুবা আমাদের এতদিন গৃহকোণে তিন চারটি শিশুকে কোলে করিয়া, উন্ননশালের অসহ্য গরম এবং বিশ্রী ধোঁয়ায় রাঁধিয়া রাঁধিয়া প্রাণান্ত হইতে হইত। একালের কল্যাণেই তো কালো মুখখানাকেও অসম্ভব সম্ভব নানা উপায়ে কমনীয় করিয়া তুলিয়া, কপালে অহুঁরাধা টিপ জাঁটিয়া আর আধ হাত লম্বা ক্ষীণ বেনীটিতে কাশ্মীরি পুঁতির ঝালর লাগানো। ঝুম্‌কোটা ছলাইয়া আজ সজীব প্রাণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ধন্য একাল! ধন্য নারীপ্রগতি এবং ততোধিক ধন্য আমরা, যাহারা এই সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

স্ববর্ণদি এবার কাজের কথা পাড়িলেন,—প্রকৃত পরিচয়টা উহার এইখানেই বুঝিলাম। “তা বাড়ী থেকে তোমরা যদি কিছু এনে থাকো, মানে খাবার-টাবার আশায় যেন দিতে ভুলো না। এখানকার বিয়েয়া যা বিশ্রী রাঁধে। মুখ পচে গেছে।”

এ বিপদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত দুজনে অতি সহজেই এ প্রস্তাবে রাজী হইলাম। আমার টিকিন বাস্কেটে পরোটা মাংস এবং স্থলেখার গ্ৰাণ্ডউইচ, চপ, কার্টলেট ফিরপোর রুটী ইত্যাদি দুজনে স্ববর্ণদির নিকট যথাসম্ভব শীঘ্র হাজির করিয়া দিবার প্রতি-

শ্রুতিতে ছাড়া পাইলাম। স্থলেখার বাস্কে লঙ্কার আঁচার এবং ম্যাক্সো ব্লাইস কাশ্মীরি চাটনী ছিল, সে তাহা প্রকাশ করিল না, আমিও বুদ্ধির সহিত তাহা চাপিয়া রাখিলাম।

কমন সিঁড়িটা দিয়া তেতালার নিজেদের নির্দিষ্ট রুমটাতে গিয়া যে ঘর ঘরে ঢুকিলাম। স্ববর্ণদির হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া জীবন-দেবতাকে যতখানি দৃঢ়বাদ জানাইয়াছিলাম এমন আমার স্বদীর্ঘ জীবনে আর কখনও জানাই নাই।

কম-মেট রমলাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাইয়া স্ববর্ণদি স্বেচ্ছা প্রদান করিলাম। জানিলাম, আমাদের স্থলটির যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই স্ববর্ণদিকে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া শৈশব হইতে লালনপালন করিয়াছিলেন। লেখাপড়ায় স্ববর্ণদির মোটেই মনোযোগ ছিল না এবং এখন কোনো মতে তিনি দু'এক ছত্র পড়িতে পারেন।

স্ববর্ণদির অন্নদাতা গত হইয়াছেন সে আজ বহু বৎসর হইল। সেদিনের বালিকা আজ মত্তর বৎসরে পদার্পণ করিয়া, পিছনে পড়িয়া থাকা অতীতের স্বথের জন্ত বৃথাই আক্ষেপ করিয়া মরিতেছেন।

রমলা বলিল “এই স্থলটা আর তার যত মাষ্টার টিচার সব স্ববর্ণদির অধীন, স্ববর্ণদির মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলেও কেউ তাকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। স্থল থেকে খেতে পান। হয় তো বা কিছু হাতেও পান, তা ঠিক জানি না, কিন্তু ঐ পর্যন্তই! সে অযোধ্যাও আজ নেই, আর ত্রায়ের নির্মম দণ্ড পালনকারী সে রামও নেই, অতএব স্ববর্ণদি আজ একান্ত অসহায়। মাঝে মাঝে বোড়িংএর মেয়েদের ওপর শুধু তাঁর অথও প্রতিপত্তি জাহির করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।”

বেচারার উপর কেমন জানি না একটা মায়া অল্পভব করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিন্তু আজীবন তো উনি এমন অথর্ব ছিলেন না। ওরা ওঁর একটা বিয়ে দিয়ে দিলে না কেন? এ রকম গলগ্রহ-জীবনে খাচার চেয়ে, সে তো অনেক স্বথের হোতো?” আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, রমলা তাহার স্প্রিংএর খাটে বিছানো শয্যাটির স্বল্পগভীরে ডুবিয়া হাসির উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ পরে অতি কষ্টে নিজেকে দমন করিয়া রমলা

বলিল, “মেয়েদের কাছে গুনেছি, লালা রঘুপতি যিনি ওঁকে মানুষ করেন, তিনি স্ববর্ণদির জন্ত একটা বেশ ভাল পাত্র ঘোগাড় ক’রে আনেন। ছেলেটা বিয়ের আগেও প্রায় এসে এসে ভিজিটাস রুমে স্ববর্ণদির সাথে গল্প করতো। একদিন কথায় কথায় ছেলেটা বলেছিলো—
“বিয়েব পর আমরা পাড়ারগায় গিয়ে থাকবো। আমার পাড়ারগাঁ খুব ভালো লাগে। ছেলেবেলায় সেখানে পরের আম-জাম কত চুরি ক’রে খেয়েছি?”

স্ববর্ণদি আঁতকাইয়া উঠিয়াছিলেন, “চুরি? আপনি চুরি ক’রেছিলেন? জানেন, চুরি করা কত বড় পাপ?”

এই অদ্ভুত আকস্মিক আক্রমণে ছেলেটা অপ্রস্তুত।

“কিন্তু এ রকম চুরিকে কি চুরি বলে? এ তো খেলা বই আর কিছু নয়।”

স্ববর্ণদির মাতৃকতা যেন আরও আহত হইল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “তবে খেলা ক’রে এবার মানুষ খুন করুন গিয়ে, এখানে আর আসবেন না, এটা চোর-জুয়াচোরদের আড্ডা নয়।”—রাগে স্ববর্ণদির মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

—হতভম্ব নির্দোষ ছেলেটাও যেন সহসা রাগিয়া আগুন হইয়াছে—“না এটা চোরদের আড্ডা নয় জানি! এটা আসামীদের কাঠগড়া। যেখানে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য ক’রে তুলবার প্রাণপণ প্রয়াস চলে।”

ছেলেটা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছুয়ারের ভারী নীল ফ্রেপের পর্দাখানি সরাইয়া, বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া আবার বলিল—এবার কথঞ্চিৎ ঠাট্টার স্বরে,—
“আর আপনি কে, তাও জানি। লালা রঘুপতির কুড়িয়ে এনে মানুষ করা মেয়ে; আর হাইকোর্টের মেয়ে জজ।”

বিবাহের সকল সম্ভাবনার ইতি করিয়া দিয়া, চরম আঘাতের অপমানটুকু স্ববর্ণদির মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া, ছেলেটা সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছিল—
আর কখনও সে পথ মাড়ায় নাই।

লালা আরও কয়েক জায়গায় চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু স্ববর্ণদিই নাকি বাঁকিয়া বসিয়া তাঁহার সব চেষ্টা পণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন।

* * * *

কয়েক বৎসর সুখে-দুখে জলের মত কাটিয়া গিয়াছে।

সম্মুখে ম্যাট্রিক টেষ্ট আসন্ন। পরীক্ষায় ভাল নম্বর রাখিব, নিজের প্রতি এ দৃঢ় আস্থা আমার ছিল। জনরব কাণে আসিল, আমি নাকি স্কলারশিপ পাইব বলিয়া কর্তৃপক্ষগণ আশা করিয়া আছেন। মনে মনে হাসিলাম, কিন্তু আসন্ন বন্ধুবিচ্ছেদের ব্যথায় বুকখানা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আনন্দ ও বেদনায় ভরা এই সুদীর্ঘ বৎসরগুলি যাহাদের সাহচর্য্য কাটিল, নিমেষের মধ্যে, কোনো দ্ব্যনসিক দুর্বলতা প্রকাশ না করিয়া তাহাদের অকুণ্ঠিতচিত্তে ভুলিয়া যাওয়া, শুধু নিষ্ঠুরতা নহে, রীতিমত পাপ! আধুনিক যতই নব্য কৈতায় আমরা আপাদমস্তক মার্জিত হই না কেন, বাঙ্গালী মেয়ের স্নেহ-প্রবণ কোমল স্বভাবটিকে কেমন করিয়া ভুলিব। শিশুর চাঁদমুখে ভুবন-ভুলানো হাসিটুকু দেখিলে তাই আজও পরনের দামী কাপড়টির অস্তিত্ব ভুলিয়া, স্বর্গচ্যুত সেই শিশু-নারায়ণটিকে স্বীয় বক্ষে ভুলিয়া, চুষনে চুষনে তাহাব ধূলাকাণা মলিন মুখখানিকে ভরাইয়া দিই।

রক্তকরবী আর হাসাহাঁনার ঝাড় দিয়ে ঘেরা সবুজ লন্টীতে সেদিন আমাদের আসরটি জমিয়াছিল ভাল। পরীক্ষার ভয়ে প্রায় প্রত্যেকের হাতেই এক একখানি বই ধরা আছে। অধীত অধ্যায়টিতে আঙ্গুলটি রাখিয়া সকলেই নিবিষ্টচিত্তে আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছি।

রেখা-ই প্রস্তাবনাটি উত্থাপন করিয়াছিল—“আমরা আমাদের এই আলোর পৃথিবী হইতে অধিকতর আলোময় স্বর্গে প্রস্থান করিবার সময়, এই নম্বর ধরণীতে আমাদের কি স্থিতিচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারি?”

লীনা বাধা দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিল—“আমরা যে স্বর্গেই যাবো সকলে, তারই বা কি মানে আছে? নরকেও তো কেউ কেউ যেতে পারি!”

কিন্তু রেখা যেন নিশ্চয় জানে যে, একমাত্র স্বর্গেই তাহার স্থান। অবিচলিতকণ্ঠে প্রত্যুত্তর হোলো—“নরকে যেতে হয় ভূমি যেও। দাস্তের ইন্‌ফার্নোতে আর ফাউন্ট নরকের বর্ণনা পড়ে আমি সেখানে যাবার জন্ত বিন্দুমাত্র ব্যস্ত নই। যদি জোর ক’রে পাঠায়, মহাত্মার মত প্রায়োপবেশন ক’রে তবু স্বর্গে যাবো। রেখা রায়কে

নরকে পাঠালে নরক তোলপাড় ক'রে ঠিক বেরিয়ে আসবে জেনো।”

একটা হাসির ঘটনা পড়িয়া গেল। হাসি থামিলে জয়া আবার কথাটা স্মরণ করিল—

“আমি ভাই দেশের কাজ ক'রে সরোজিনী নাইডুর মত নাম রেখে যাবো” রেখাও তৎক্ষণাৎ ;—

“তা তুমি কোরো, যা পারো। আমি কিন্তু বিয়ে ক'রে এ জগতে স্থায়ী নাম এবং স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাবো। স্মৃতি-চিহ্নগুলি আমার কি থাকবে জানিস? একটা মৃতদার প্রোট স্বামী, আর গুটিকতক রোগের ভিণো অপোগণ্ড মানব শিশু। প্রত্যেক মূহুর্তে তারা তাদের হারিয়ে যাওয়া মাকে স্মরণ করবে। স্মৃতিচিহ্ন এবং জগতের কল্যাণের জন্যে আমি বিয়েই করবো। মণিকার এবং বীথিকার ভাল নাচিয়ে বলে খ্যাতি ছিলো। তাহারা উদয়শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত নাচের মজলিশে ঢুকিয়া সমগ্র জগতকে স্তম্ভিত এবং আমাদের মত নগণ্য বান্ধবীদের চমৎকৃত করিয়া দ্বন্দ্ব করিয়া দিবে।

“দেখ, হয়তো স্বর্গেও উর্বরী মেনকা রম্যাকে রিটার্নার করিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র, তোদের সে আসনগুলো সর্গেরবে দখল করতে সবিনয় অত্যাচার করবেন।” রেখার তরফ থেকে মন্তব্য হোলো। একবার সকলের পানেই অলক্ষিতে চাহিয়া লইলাম তাহাদের নির্বাক মৌন চাহনি, যেন তাহাদের সাথী রেখারই মতাবলম্বী বলিয়া আপনাদের গোপন অন্তঃস্থলটুকু প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। অর্থাৎ তাহারা অধিকাংশই বিবাহ করিবে।

আমার এই দৃষ্টির আঘাতটুকু যে ছুই চারিজন লক্ষ্য করিল, তাহারা যেন একটু সন্তুষ্ট হইয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, তাহারা শিক্ষয়িত্রীর পরমব্রত লইয়াই জীবন কাটাইতে মনস্থ করিয়াছে। মনে মনে কিন্তু, আমি জানি, তাহারা প্রত্যেকেই বলিয়াছে— “দায় পড়েছে আমাদের বুকের রক্ত মুখে তুলে চিরজীবন বসে বসে গাখা পিটিয়ে মাহুয় করতে! তার চেয়ে মধুর স্বভাব, উদারচেতা একটা স্বামী এবং ততোধিক মধুর কিছু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, ছোটো একটা বেবীঅষ্টিন, আর বালীগঞ্জ মহলে ছবির মত একটা মাখা গুঁজিবার ঠাই

পেলেই আমাদের যথেষ্ট। স্বর্গ, নরক সেতো ভূয়ো কল্পনা-বিলাস। হয়তো আছে হয়তো নেই। সেই অনিশ্চিত সুখের আশায় এ-পারের পাখিব এতটুকু সুখসান্ধ্য ছাড়বো কেন?” ভাবনানা তাদের ঠিক এমনিধারাই।

নিজের তরফ হইতে—আমি স্ববর্ণদিকে এ জগতে অমর করিয়া রাখিয়া যাইব এই সঙ্কল্পই তাহাদের সাক্ষাতে প্রকাশ করিলাম। দাস্তে যদি বিবাহটিকে, র্যা.ফল যদি মোনা-লিসাকে এবং গাব্রিয়েল রসেটী যদি লেডী লিলিথকে এ মরজগতে চির অমর করিয়া রাখিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, তবে আমিই বা স্ববর্ণদিকে চির-অমরীয় করিতে পারিব না কেন? না হয় উহাদের মত আঁকিবাব ক্ষমতা আমার নাই কিন্তু লর্ড বাইরণের মেরী চারওয়ার্থ, শেলীর হেন-রিয়েটার মত আমারও স্ববর্ণদিকে আমার লেখনীর ছ একটা আঁচড়েই স্বনামধন্য করিয়া তাঁহার সব দুঃখ ঘুচাইয়া দিয়া যাইব। বন্ধুরা বিজ্ঞপত্রে হাসিয়া উঠিল, তা উঠুক! এমন একটা ওরিজিণাল ক্যারাক্টার আর কোথায় পাইব? * * * হাতে কাজ নাই। মাঠের একপ্রান্তে বসিয়া একমনে মাটি খুঁড়িতেছিলাম। বাড়ী হইতে সূর্য্যমুখী লঙ্কার কীচি বহিয়া আনিয়াছি। আমার ভবিষ্যতের অনাগত অজানিত বন্ধুদের জন্য তাহাই দানস্বরূপ রাখিয়া যাইব, মনে আছে আশা।

স্ববর্ণদি সন্দিহন কোন্ এক পুরাণো-দিনের বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাহারা লাউপাতায় দুটি মিষ্টান্ন ও মাটিতেই একটুকুরা পেঁপে রাখিয়া তাঁহাকে জলযোগ করিতে দিয়াছিল। ইহাতে স্ববর্ণদির আত্মাভিমান বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। সেই কাহিনীই আমার নিকট সবিস্তারে ও সখেদে বর্ণনা করিতে করিতে স্ববর্ণদির নজরে পড়িল আমি পরম মনোযোগ সহকারে একরাশ মাটি তুলিয়া ঢিবি করিয়াছি। আঘাতের উপর আঘাত যেন স্ববর্ণদিকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল। যাহা মুখে আসিল তাই বলিয়া আমাকে সেশ্বান হইতে তাড়াইলেন। মনে বড় রাগ হইল। বলিলাম, “চিরদিন অখ্যাতই থাকুন আপনি! কাজ নেই আমার আপনাকে বিখ্যাত করিয়ে।”

“এ মাটি আমার! তুমি কেন তা খুঁড়বে? কেন হাত দেবে? আমার মাটি আমি দেবো না ছুঁতে।

আমার খুশী!” সুবর্ণদি অসংযত প্রলাপ বকিয়াই চলিলেন। আমি ক্লাসরুমে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বড় একটা স্কলার-শিপের আশাও গোপনে মনে জাগিয়াছে। অঙ্গর বন্ধু-বিচ্ছেদের বেদনার সহিত পিতামাতাকে, ছোটো ছোটো ভাই-বোনগুলিকে বুকের একান্ত সন্নিহিতে পাইবার অব্যক্ত মধুর আনন্দ মিশ্রিত।

পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের অনেক ছদ্মবেশ পরাইয়াছে; অনেক ব্যবহারকে বদলাইয়া সুমার্জিত করিয়াছে। কিন্তু বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজনের জন্ত হৃদয়-নিভূতে যে পবিত্র ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহপ্রীতির ফলস্বরূপ টুকু নিয়ত বাঙালী মেয়েদের অন্তর-গহন ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহাকে এতটুকু কমাইতে বা নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে নাই। আমাদের সংসারের অভাব-বেদনা-জর্জরিত পিতামাতার ইহাই পরম সাহসনা যে, আমরা এখনও তাঁহাদের ভালবাসিতে ভুলি না। সকলের সহিত অশ্রুনেত্র দেখা করিয়া, সুবর্ণদির নিকট হইতেও বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আশৈশবের ক্রীড়াভূমি! এতদিন যে স্থানটিকে প্রতি মুহূর্তে বন্দী-নিবাসের সহিত তুলনা করিয়া আসিয়াছি—আজ সেই বোডিংটিকেই পরম শোভন, পরম রম্য নিকেতন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাই নিয়ম! নিকটে থাকিতে যাহাকে আমরা এতটুকু মূল্য দিই না, ক্ষণেক বিচ্ছেদে সেই আমাদের নিকট সুহৃৎ ও একান্ত কাম্য হইয়া উঠে। নিকটে থাকিতে হেলাভরে যাহার পান ফিরিয়াও চাহি নাই, দূরে সে সরিয়া গেলেই বুকখানা যেন অসহ্য বেদনায় ভাজিয়া পড়িতে চায়। ভাই মাহুশ মাটির, আর দেবতা পাষাণের। মাহুশের তুচ্ছ ব্যথা-বেদনার এতটুকু জাঁচড়ও সে পাষাণে আঁকা থাকে না।

*

*

* * * * * শেষ পর্যন্ত রেখার পথই অবলম্বন করিলাম। অর্থাৎ বিবাহ করিয়াছি। জীবন-দেবতা তাঁহার এই জয়ে এবং আমার পরাজয়ে অলক্ষ্যে হাসিয়া-ছিলেন যে নিশ্চয়, সে আমি জানি। কিন্তু যতই তিনি

হাস্তন পরাজয় আমার হয় নাই তাও আমি জানি। প্রগতি আমি কামনা করি না। সে নেশা আমার কাটিয়া গিয়াছে। যুগযুগান্তর ধরে ভারত-ললনা যাহা কামনা করিয়া আসিতেছে, সবই আমি পাইয়াছি। দেব-চরিত্র স্বামী, শিশুর, কুন্দফুলের মত শুভ পবিত্র শিশুর চপল কলকাকলীতে মুখরিত একখানি আনন্দ-শান্তি পূর্ণ গৃহ, আত্মীয়স্বজনের অনাবিল স্নেহ-ভালবাসা, আর কত মাহুশ চায়? প্রাচুর্য নাই সত্য, অভাবও নাই। জীবন-দেবতাকে নিভৃত শয়নে ডাকিয়া প্রণাম জানাই বলি অনেক দিয়েছ দেবতা! তুমি যেন ভাগ্যে সয়।

স্কুল হইতে খবর আসিয়াছে, পুরাতন মেয়েদের লইয়া একটা উৎসব হইবে, যেন অবশ্যই আমি যাইবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করিবার কিছু ছিল না। মুখের কথা খসিতে না খসিতে অহুমতি মিলিয়া গেল। স্বামী স্বয়ং পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। কি জানি কেন সুবর্ণদির কথাই সর্বপ্রথমে স্মরণপথে উদিত হইল। প্রথম দিন স্কুলে ঢুকিয়াই যাহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, আমার এই অন্তহীন স্মৃতি এবং গেরবের দিনেও তাহাকেই যেন মন দেখিতে চায়।

একটা মেয়েকে ডাকিয়া সুবর্ণদির কাছে চলিলাম। এ কি? এ কোথায় লইয়া চলিয়াছে? সুবর্ণদি তো দোতালার টিচারদের ঘরে থাকিতেন। মেয়েটা বলিল,—“টিচার অনেক বেড়ে যাওয়াতে তাঁকে সেক্রেটারী বাবু ঐ বিয়েদের ঘরের পাশে একটা কামরা দিয়েছেন। মাসে মাসে হাত-খরচও তিনি আর পান না। হাতের সেলাই বিক্রী করে টিফিনের পয়সা সংগ্রহ করেন।”

সুবর্ণদির বাসস্থান দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। অদূরেই ঘোড়ার আস্তাবল। মাছি আর ভুগন্ধে সেখানে দু’মিনিট দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! সেই স্রোতসেতে আলো-বাতাসলেশ-শূন্য অন্ধকার কারাকক্ষে দড়িবাঁধা ভাঙ্গা চশমাটা চোখে লাগাইয়া সুবর্ণদি নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছেন। স্তম্ভ পিঠখানি তাঁহার আরও এক প্রান্ত ভাজিয়া গিয়াছে। মুখখানি ভরিয়া অপরিসীম ক্লান্তি, আঘাত আর হৃৎক অপমানের স্তম্ভী বেদনা পরিস্ফুট। ঐ অপমানিত, সংসারের কোনো ক্ষুদ্র কাজেও অপ্রয়োজনীয়, অনাহুত বুদ্ধার জন্ত মনের মধ্যে অকথ্য বেদনা ও স্নেহ অন্তর্ভব

করলাম।—মনে করলাম স্ববর্ণদিকে বাড়ী নিয়ে যাবো।
যতই খরচ হয়! উনি তাতে এতটুকু অসন্তুষ্ট হবেন না।

স্ববর্ণদি ঝাপসা দৃষ্টি তুলিয়া আমার পানে চাহিলেন,
“কে? চিন্তে পারছি না তো তোমায়?”

বললাম, “আমি প্রতিমা, স্ববর্ণদি। আপনাকে
আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি।”

স্ববর্ণদি যে কত খুসী হইলেন তাহার আর ইয়ত্তা
নাই। বোধ হয়, বহু বৎসর পরে তিনি একরূপ কোমল
সম্ভাষণ লাভ করিলেন “তাই কি হয় দিদি? লালার
রঘুপতির মেয়ে হয়ে কি শেষ দশায় পরের আশ্রয়ে
যাবো? আর কটা দিনই বা? এ আমি বেশ আছি।”
ক্ষীণ তৃপ্তি এবং আত্মমর্য্যাদার ষোল আনা গুরু সেই
উচ্চারিত কথা ক’টাতে ফুটিয়া উঠিল খানিক পরে প্রণাম
সারিয়া ফিরলাম। স্ববর্ণদির প্রতি স্কুল কড়পক্ষের এ
অন্তায় বিচারে মনখানা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু
বলিবারই বা কি আছে? এই প্রয়োজনের দ্রুতগতির
যুগে অপ্রয়োজনীয় যাহা কিছু আমাদের বাধা বিঘ্ন, সবই
আমরা হৃদয়হীনতার সহিত দুই হাতে দূর করিয়া
সরাইতে সরাইতে নিজেদের পথ প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছি।
আর কাহারও ব্যথা-বেদনা তুচ্ছ স্বথ-দুঃখ প্রয়োজনের
দিকে আমাদের চাহিয়া দেখিবার সময় কোথায়?

প্রকৃতিতেও এই নিয়ম পরিস্ফুট দেখি। অবহেলা ভরে
জীর্ণ পত্রগুলি পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ আবার নূতন পত্রে
সজ্জিত হয়। শুধু খাঁহার চরণতলে ক্ষুদ্র, উচ্চ, ধনী,
নিধন, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ভেদভেদ নাই, সেই
অন্তর্য্যামীই এই সব অপমানের বেদনা-জর্জরিত প্রাণ-
গুলিকে আপনার স্নেহ-করে বক্ষে তুলিয়া লন। তাঁহার তীক্ষ্ণ
স্ববিচার হইতে একটি ক্ষুদ্রতম ঝরা পাতাও হারায় না।

* * * * * আমার ক্ষুদ্র বাড়ীখানি সচকিত
করিয়া রেখা আসিয়াছে। তাহার মুখেই শুনিলাম স্ববর্ণদির
শেষ জীবনের অপমান ও বেদনার অবসান ঘটয়াছে। তিনি
মরিয়া বাঁচিয়াছেন। সে দিন বয়স এবং অভিজ্ঞতা কম
ছিল। আজ স্ববর্ণদির কথার নত্যতা মর্মে মর্মে বুঝিতেছি।
যাহা কিছু খুঁটিনাটী আত বন্ধে স্ববর্ণদি সঞ্চিত
বরিয়া রাখিতেন, তাহার কিছুই তাঁহার সঙ্গে যায় নাই।
শুধু যে “মাটী আমার” বলিয়া একদিন তাঁহার নিকটে
তিরঙ্কত হইয়াছিলাম। সেই মাটীই তাঁহাকে পরম স্নেহ
ভরে নীরবে আপনার স্নিগ্ধ স্মৃতিতল বক্ষে টানিয়া, নিজের
মধ্যে সেই অবজ্ঞাত প্রাণটিকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া
লইয়াছে। মাটী স্ববর্ণদির কিনা জানি না, কিন্তু স্ববর্ণদি যে
মাটির এবং নিশ্চিহ্ন ভাবে সেই মাটিতেই মিশিয়া আছেন, এ
বখার মত সত্য কথা এ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই।

শিল্পীর ব্যথা

(সংস্কৃত হইতে)

আমার কবিতা সে নহে কবি তা, বনিতা মম,
প্রতি পদে পদে পদবিন্যাসে পরমতম—
ছন্দের ধ্বনি উঠে রণরণি গুঞ্জরিয়া,
ফিরে পায় পায় মধুকর প্রায় আমার হিয়া।

তোমার লাগিয়া নহেকো বন্ধু, রচনা মম,
হয়তো হাসিবে দৃষ্টি হানিবে শাণিততম—

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

ব্যঙ্গের শর ব্যথা-জর্জর বক্ষপরে
ভুগি হাস হায়! মোর বেদনায় বক্ষ ভরে!
অনন্ত কাল পৃথ্বী বিশাল কখনো যদি
আসে কোনো জন মনেরি মতন কোনো দরদী,
তাহারি লাগিয়া কথা দিয়া দিয়া গাঁথি এ-মালা
পরি মোর হার হইবে তাহার বক্ষ আলা—!
আজি কেহ নাই কাহারে শুনাই কবিতা মম,
গোপন কক্ষে রাখিব বক্ষে বণিতা মম।

সাহিত্য

শ্রীরেণু লাহিড়ী

সাহিত্যশব্দের ব্যুৎপত্তিগত। অর্থে আমরা বুঝি “স-হিতস্ত ভাবঃ সাহিত্য”—স হিতের ভাবই সাহিত্য। হিতের সঙ্গে, মঙ্গলের সঙ্গে যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহাই হইতেছে প্রকৃত-পক্ষে সাহিত্য। এই নিখিল বিশ্বে মানবের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-অশ্রু ঘাত-প্রতিঘাত নিত্যই দেখা যায়। সাহিত্যিক তাহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত রস ও সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া যখন সেইগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করেন তখনই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। শুধু উপন্যাস নহে, কাব্য নাটক প্রবন্ধ গল্প সকলেরই সমান স্থান সাহিত্যে।

“বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্”। সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য রস ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। দুঃখ-দৈন্য প্রসিদ্ধিত মানব-চিত্তে এবং রসপিপাসুর মনে সাহিত্য নিত্যই রস পরিবেশন করে এবং কবি মানব-মনের অন্তর্লোকে থাকিয়া সেই রসের খোরাক যোগান। তাই যুগে যুগে কালে কালে বিশ্বের দরবারে সাহিত্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। তাই পৃথিবীর সাহিত্যে শকুন্তলা, কাদম্বরী, ইলিয়াড, ওমরঐখ্যাম, মেঘদূত চিরদিন অমর।

‘You will find in literature a source of solace and comfort and refreshment of strength and encouragement such as no department of science can give you.’ (Geikie) সাহিত্যের মধ্যে একবার মন-প্রাণ সমর্পণ করিলে বাস্তবের নিষ্ঠুরতা ও দুঃখ-দৈন্য সহজেই বিস্মৃত হওয়া যায়। ইহা দুঃখে সাহায্য—কষ্টে সহানুভূতি এবং ভারাক্রান্ত চিত্তে রসের উৎস সৃষ্টি করে।

কোনও একজন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন—“Literature is the true criticism of life” মানবজীবনের সুখ-দুঃখ—হাসি-কান্না ও আনন্দ-অশ্রু সাহিত্য সৃষ্টির প্রধানতম প্রেরণা। শিশু যখন বড় হইয়া উঠে তখন স্বপ্নপূরীর রাজকন্তা অথবা তেপান্তরের মাঠ তাহার চিত্তে আর রসের উৎস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না—

তখন “কুসকান্তের উইল” “দত্তা” অথবা টুর্গেনিভের “Smoke” পড়িতে তাহাদের মনে অদম্য আগ্রহ জাগে। সাহিত্যদর্পণে পাঠক বাস্তবের অনুরূপ চিত্র দেখে—তাই জগতের লোকের নিকট সাহিত্য এত প্রিয়। তাই আধুনিক পাঠকের নিকট বান্ধবচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের রচনা এত সমাদৃত এবং সেই জগতই বোধ হয় অধিকাংশ লোক—Comidy ও প্রহসন অপেক্ষা Tragedyই বেশী ভালোবাসে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—“সাহিত্যে জীবনের সত্য চাই, ভার চাই না।” “Literature is a mirror of the Nation” সাহিত্য এবং জাতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাতীয়তা ভিন্ন সাহিত্য গঢ়িয়া উঠিতে পারে না এবং সাহিত্য ব্যতীত সাধারণের মনে জাতীয়তার বীজ উদ্ভূত হইতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে French Revolutionএর অগ্রে রুসোর সাহিত্য ছিনা, তাই জাতি নিজের ভালোমন্দ বুঝিতে পারিয়াছিল এবং শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। আবার ইংল্যাণ্ডে দেখি রাণী এলিজাবেথের সময় দেশে শান্তি ও সুশাসনের ফলে প্রসিদ্ধ Elizabethan Literature গড়িয়া উঠিয়াছিল। “যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য।

এই সকল ভিন্ন সাহিত্যের আর একটা প্রধান গুণ আছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের ভাব ভাষা কৃষ্টি স্বরূচি ও কল্পনাশক্তির যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়। সাহিত্য আমাদের বিভিন্ন দেশের ও জাতির বিষয় জানিতে সাহায্য করে এবং জগতের সকল যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সহিত পরিচিত করাইয়া দেয়—যেমন আমাদের মহাভারত এবং রামায়ণ। তাই Geikie বলিয়াছেন “The culture and taste spring from prolonged contact with the highest models of literary expression.” গল্প

উপগ্রাস ও কাব্যের মধ্য দিয়া আমরা ইহাদের রচয়িতার সহিত পরিচিত হই। অনেক স্থলে সাহিত্য-মুকুরে সাহিত্যিকের জীবন ও চরিত্র স্বন্দররূপে প্রতিকলিত হইয়া উঠে। ইংরাজ কবি Shillyর অধিকাংশ কবিতায় তাঁহার জীবনের Tragedy মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছে “সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরের পরিচয় দেয়, নিজের অগোচরে যেমন দেয় ফুল তার গন্ধ, তারা তার আলোক।” সুতরাং এ সকল বিষয়েও সাহিত্য আমাদের জীবনের পরম বন্ধু।

পরিশেষে এই বলিয়া শেষ করি যে—ঈশ্বরপ্রেম, জাতীয় প্রেম ও বিশ্বপ্রেম আমাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচারিত হয় এবং সেইজন্য সকলেরই উচিত সাহিত্য-জননীর

সেবা করা। “Charish the literary tastes you have acquired and devote yourselves sedulously to the further cultivation of them during such intervals of leisure as you may be able to secure.” নিজের দেশের সাহিত্যকে অন্য দেশের সাহিত্যের তুলনায় ভাব ভাষা চিন্তা দিয়া উন্নত করিয়া জনসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। নিজের সাহিত্য যখন বিশ্বসাহিত্যে উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে তখন হইবে কবি, ঔপন্যাসিক ইত্যাদির সাহিত্য সেবার সার্থকতা। দেশের সাহিত্য তখন অন্য দেশের লোকের চিত্তে প্রেরণা জাগাইতে পারিবে।

লক্ষ্মীর বাঁপি

কাশীধামে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ভীষণভাবেই হ'য়ে গেছে। হতাহতের সংখ্যা অনেক। পুলিশ-কর্তৃপক্ষের প্রশংসা-বাণী শুনা যাচ্ছে। খুব ভাল কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারা যায়, পূর্বভাগে সতর্কতা অবলম্বন করলে এই দাঙ্গা, খুন, জখম বন্ধ হ'ত কিনা? অতীতকালে গৌড়ামীর ফলে যে বর্বরতা চলত, বিংশ শতাব্দীতেও যদি চলে সেটা, তবে বুঝতে হ'বে, কৃষ্টি সংস্কৃতি সবই হয়েছে বুঝা। এই দাঙ্গা-নাচনের নাচনদার কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ মহাজন, সেইটা বুঝে পুলিশ-কর্তৃপক্ষ যথাবিহিত ব্যবস্থা পূর্ব থেকে করলে এ সকল দাঙ্গার জড় ম'রে যায় অনেকটা। জড় মারবার ব্যবস্থাটা হ'তে পারে না কি? নিত্য যদি ভায়ে-ভায়ে এমন দাঙ্গা চলে, দুই ভায়ের ক্ষতিই যে সমান। সেটা কেন বুঝে না মানুষ!

— — —

বছর বার পূর্বে স্বনামধন্য মিস্ মেয়ো “মাদার ইণ্ডিয়া” লিখে শুধু প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই, সিন্দুক ভর্তি ক'রে-ছিলেন আশ্চর্য রকমে। কেতাব খানার নাম হ'য়েছিল তখন “ডেন্ ইন্স্পেক্টারস্ রিপোর্ট”। উপযুক্ত নামই বটে। চলতি

চাকতির মহিমায় জে, এক, ম্যাডান্, সিগ্নারিয়ো লিখিয়ে সিনেমায় চালাবার সঙ্কল্প করেন। ম্যাডান্ কোম্পানীর তদানীন্তন ম্যানেজার তাঁ'দের শুভানুধ্যায়ী রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখার্জি মহাশয়কে ধ'রে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কবি মুনীন্দ্রপ্রসাদের দ্বারা “মাদার ইণ্ডিয়া” সিগ্নারিয়ো লেখাবার বিলক্ষণ চেষ্টা করেছিলেন। লোভ দেখান হয়েছিল আড়াই হাজার টাকার। সে প্রস্তাবটাকে উপেক্ষা-গণ্ডীতে ফেলে দিয়ে কবি দেশাত্মবোধ ও মহিলা-মর্যাদার যে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা মিস্ মেয়ো'র কাণে পৌঁছালে তিনিও লজ্জাহতব করতেন কিনা বলা কঠিন। সে যাই হোক, “মাদার ইণ্ডিয়া”, “আনুগাপি ইণ্ডিয়া” প্রভৃতি গ্রন্থ “মাদার ইণ্ডিয়া” উত্তর। কিন্তু তাতেও মিস্ ঠাকুরাণী লজ্জা পান নাই। তা'র পরেও ঠাকুরাণীর অনেক কীর্তি-কাহিনী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্বনামধন্য শিষ্য মহাত্মা সি, এফ, এ্যাণ্ডকজ “টু ইণ্ডিয়া” লিখে মিস-বাবার কেতাবের উত্তর দিয়েছেন। উত্তর হয়েছে মুখের মত। কিন্তু তা'তেও তাঁ'র মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন হ'বে কিনা সন্দেহ। স্বভাবো এবাত্র তথ্যতিরিচ্যতে।

— — —

বসন্ত সমাগমে দৌল-লীলা উৎসবে আবির্ভাবা শুধু আনন্দ নহে, তা'তে প্রভূত উপকারও আছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সে কথা ব'লে দিবে। ফাল্গুনোৎসবে হিন্দু-জগৎ আনন্দময় হ'য়ে উঠে। কিন্তু ও উৎসবে যারা যোগদান করতে চায় না, করাটা অত্যাশ্র এবং অধর্ম মনে করে, তা'দের অঙ্গ রাক্ষিয়ে দেওয়া খুবই অত্যাশ্র। আইনের মতে ওটা কুকার্য এবং সেটা দণ্ডনীয়। এই রং দেওয়া ব্যাপার নিয়ে অনেকস্থলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা বাধে এবং তা'র ফল বিষময় হয়ে উঠে। সুতরাং আনন্দ করতে গিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা কোনো মতেই যুক্তিসঙ্গত, ত্রায়সঙ্গত এমন কি ধর্মসঙ্গতও নহে। দেশের মঙ্গলে উৎসবমত জনগণের এ কথাটা মনে রাখার খুব দরকার—বিশেষতঃ এখনকার দিনে। আর একটা কথা—আবিরের উপকারিতা আছে; ম্যাজেটা বা অত্যাশ্র বিলাতী রং এ সে উপকারিতা নাই, বরং অপকারিতা আছে। যা'তে অপকার, তেমন জিনিস নিজের বা পরের উপর প্রয়োগ করার অধিকার কোনো মানুষেরই থাকতে পারে না। আনন্দে মত্ত হ'য়ে অপরিচিত পথিক এবং মহিলাগণের উপর রং বা আবির নিক্ষেপ করা চলতে পারে না কোনো মতেই। তেমনটাও এখনকার কালে চলছে শুনে অনেকেই লজ্জান্বিত ব'লেছেন। ভবিষ্যতে এমনটা আর না হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—•—

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার হকের সরকারী হিন্দু রাজ-পুরুষদের সম্বন্ধে একখানা চিঠি দেশে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। পত্রখানি প্রকাশ হ'বার পর হক্সাহেব স্বপক্ষে যে বিবৃতি দিয়েছেন, অনেকের বিবেচনায় সেটা আদৌ সন্তোষজনক নহে। ব্যক্তিগত পত্র অবশ্য ছাপান উচিত হয় নাই। কিন্তু যখন সেটা যে কারণেই হোক হ'য়েই গেছে, তখন সে পত্রের একটা সূত্রের দান মাননীয় হক্সাহেবের পক্ষে শোভন এবং কর্তব্যও বটে। মনোমালিন্য ঘটায় লাভ নাই, বরং ক্ষতিই। বাঙ্গালী ও বাংলার লোক হক্সাহেবকে চিরদিনই শ্রদ্ধার আসন দিয়ে এসেছে। সেই শ্রদ্ধা অর্জন করতে হক্সাহেবকে বহু আয়াসই যে স্বীকার

করতে হয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করতে পারেন না তিনি। আমরা তাঁকে আমাদের পূর্বের হক্সাহেবই দেখতে চাই। সেটা হ'লে দেশ ও দেশেরই যে শুধু মঙ্গল হ'বে, তা নয়, রাজনীতির শান্তিময় রাজপথ তিনি দেখতে পাবেন। তাঁর সরলতা, উদারতা, কর্মশীলতা, বন্ধুবাৎসল্য দীনদরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, বিজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ও সুবিধা ঘটেছিল আমাদের সেই কারণেই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের এমন সশ্রদ্ধ উক্তি।

—•—

“বঙ্গবাসী কলেজের” প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষা-বিস্তারের অগ্রতম অগ্রদূত স্বর্গত আচার্য্য গিরীশচন্দ্র বসুর তিরোধানে “ইটালী চতুষ্পাঠীর” সভাপতি পদ শূন্য হ'য়েছিল। শূন্যপদ পূর্ণ করার ব্যবস্থায় লোকান্তরিত আচার্য্য দেবেরই সাউথ ইটালী রোডস্থিত ভবনে চতুষ্পাঠীর কার্য্যকরী সমিতির একটা সভা হয় বিগত ২রা মার্চ। সে সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রেছিলেন শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্কাদিকারী। স্থায়ী সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারে সদস্যগণের মধ্যে চার জনের নাম উল্লেখ হয়। শ্রীযুক্ত সর্কাদিকারী একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ক'রে স্বর্গত আচার্য্যদেবের সুযোগ্য পুত্র “বঙ্গবাসী কলেজের” বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার বসুর নাম প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবই সর্ববাদী সন্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। নবনির্বাচিত সভাপতির কার্য্যকুশলতায় প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি হোক, ইহাই আমরা কামনা করি। চতুষ্পাঠীতে মহিলা-বিভাগ খোলা হ'লে মৈত্রী-গার্গী-খনার জাতি পাঠাধ্যয়নের সুযোগ পাবেন ব'লে অনেকেই মনে করেন।

—•—

স্বাস্থ্যশাসনের গৌরব কলিকাতা করপোরেশনের প্রতি-কূলে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে আমরা ব্যথা অনুভব করি। কিন্তু করপোরেশনে চাকরী দেওয়া ব্যাপারে দুই একজন কাউন্সিলারের কাণ্ড দেখে বুকের ব্যথা বুকে চেপে আমাদের বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করতে হবে সম্ভবতঃ। চাকুরীস্থলে মহিলা-নিয়োগ ব্যাপারেও গলদ আছে ব'লে শুনা যাচ্ছে। প্রমাণ-পত্র আমাদের হস্তগত হ'লেই আমরা

আমাদের অভিমত প্রকাশ করব এবং যাতে অজ্ঞায়ের প্রতীকার হয়, তা'রও চেষ্টা করা যাবে। ইতোমধ্যে যদি দোষ-ত্রুটি সংশোধিত হয়, ভালই। করপোরেসন্ এবং অগ্রাগ্র কাউন্সিল ও প্রতিষ্ঠানে দেশের লোকই যে প্রতি-নিধি পাঠায়, এ কথাটা প্রতিনিধিগণের মনে রাখা খুব দরকার। “পাগু বাঁধ-বার” অবসর পেয়ে অজ্ঞায়ে অহুসার হ'লে প্রতিনিধির পদ অলঙ্কৃত করা চলে না ত! জ্ঞায়ের মর্যাদা সর্বদা ও সর্বদা রক্ষণীয়।

—•—

পাটীগণিত, বীজগণিত প্রভৃতি শব্দের প্রচলন এখন হয়েছে খুব বেশী। কিন্তু বাংলা দেশে এই দুই গণিতের যিনি প্রথম গ্রন্থকার, যা'র গণিত-পরিভাষা জায়া-বিজ্ঞানে অপূর্ব সম্পদ, দেশের লোক তাঁ'কে বিস্মৃত হয়েছে বললেই হয়। এটা যে কত বড় লজ্জার কথা, সেটা প্রকাশ করবার ভাষা নাই। এই “পাটীগণিত”, “বীজগণিতের” গ্রন্থকারই এককালে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে। দেশের লোক তাঁ'র স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা কি করেছেন, সেটা জানবার জন্য দেশের নরনারী চেষ্টা করুন।

—•—

রাজকোটের ব্যাপারে অনশন ব্রতের শক্তিতে তথাকথিত “কোট” বজায় ক'রে মহাত্মা গান্ধী জয়যুক্ত হয়েছেন। সাধু প্রচেষ্টা। কিন্তু উড়িষ্যায় টেনেকেনেলের যে কাণ্ড সারাদেশের লোককে অশ্রুশ্রিত করেছে, সেটা রাজকোটের অশ্রুধারার তুলনায় অনেক বেশী ব'লেই অনেকে মনে করেন। নারীর লাঞ্ছনা উড়িষ্যায় অল্প হয় নাই। সে ক্ষেত্রে মহাত্মার অনশন ব্রত হ'ল না কেন, সে সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন করছেন। রাজনীতি জিনিসটা অগাধজলের মস্ত বিশেষ। অনেক সময়েই ও বস্তু ধরার বাহিরে। কিন্তু এটা বেশ বলতে পারা যায়, যে অনশন ব্রত পালন ক'রে নারী আপন কার্য উদ্ধার করতেন, সেই অনশন ব্রতের অহুসার মহাত্মাজীকে প্রবল শক্তিশালী ক'রে তুলেছে রাজনীতি ক্ষেত্রে। পাঠক-পাঠিকা রাজাস্তঃপুরে

“গোস্বামী ঘরের” কথা স্মরণ করুন, “গোস্বামী” ক'রে “গোস্বামী ঘরে” প'ড়ে থাকার কথা কল্পনা চক্ষে দেখুন। তবেই আমাদের কথার যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভবপর হ'বে। এমন অনশন-ব্রতরূপ অল্প মহাত্মাজী একাধিকবার প্রয়োগ করলেন। তেমন প্রয়োগ হ'ল না কেবল উড়িষ্যা এবং বাংলার ভাগ্যে। এমন অপ্রয়োগে হাস্যাহাসি করছেন অনেকেই। তবে বড়র মনস্তত্ত্ব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা অশোভন। আর্থ প্রয়োগের ব্যবস্থা বোধ হয় ও জায়গাটায়। ওটা কিন্তু লজ্জার কথা ব'লেই ধ'রে লওয়া চলে। অতঃপর?

—•—

ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাণ্ড কাণ্ড অকাণ্ডে পরিণত হয়েছে দেখে বহু মহিলা ও পুরুষ লজ্জায় অবনত হ'য়ে ভাবছেন বিশ্বের দরবার ও কাহিনী গ্রহণ করবে কি ভাবে। ভাবনার কথাই বটে। কিন্তু যখনই সুরাট কংগ্রেসের দক্ষ-যজ্ঞের অভিনয় স্মরণ-পথে আসে, তখনই মনে হয় ওটা সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত। লাক্ষিত মনোবিগণের অভিধাপ ঘেঁষা যা'বার নয়, ত্রিপুরীর কল্পিতা প্রমাণ করল তাহাই!

—•—

একটা বহু প্রাচীন বিদ্যায়তনে পারিতোষিক বিতরণ উৎসব উপলক্ষে সভাপতি বরণের গানে বসন্ত সমাগমেও শরৎ ঋতুকে বেঞ্চের উপর খামকা খামকা দাঁড় করান হয়েছে দেখে সাহিত্য-রসিক ও রসজ্ঞগণ বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। গানের ভাব-ভাষা-ছন্দ-স্বর প্রভৃতি খুব হচ্ছে এখন অনেকের হাতেই। কিন্তু ঋতুরাজকে stand up on the bench—বেঞ্চের উপর দাঁড়াও—অহুজা এই বোধ হয় প্রথম। চালাকী দ্বারা ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠে না হয় দল পাকানই চলে। কিন্তু সাহিত্যের হাতে ও সিসার আদী অচল। বিদ্যায়তনটিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অল্প নয়। তা'রা যখন ঐ সিসার আদীটা ধ'রে ফেলবে, তখন অবস্থাটা কি দাঁড়া'বে, সেটা চিন্তার বিষয়। বিদ্যায়তনটা সাধারণের সম্পত্তি। স্বতরাং সাধারণের মন্তব্য প্রকাশের অধিকার যথেষ্ট।

—•—

ইউরোপে মহাসমর অচিরে বাধ্বে কিনা, একথা অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন। আমরা জ্যোতিষী বা যুদ্ধনীতি-বিশারদ নই। তবে লক্ষণ বুঝে এইটুকু বলতে পারা যায়—যুদ্ধ বাধ্বে কি, বেধেই আছে। পায়তড়াই চল্বে এখন। তবে তাতেও ভয় অল্প নয়। এক এম্‌ডেন্‌ কি বিল্টাইট ঘটিয়েছিল। এখন ত বিরাট আকাশ-পথ বেবাক্ খোলা। সতর্কতা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কায। স্ত্রী-পুত্র কন্যা পরিজন নিয়ে যাদের দুঃখ কষ্টে সংসার করতে হয়, তাঁরা কতটা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে, সেটাও ভাববার জিনিস।

—০—

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক-শিক্ষা কলিকাতা সহরেও চালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি

আছে বলে শুনা যাচ্ছে। অনেকেই আমাদের অভিমত ব্যক্ত করতে অনুরোধ করেছেন। খুব ওয়াকিবহাল না হ'য়ে এ সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। সব জিনিসেই ভাল মন্দ দুটা দিক থাকেই থাকে। সুতরাং খুব সংযত ভাবেই তা'র বিচার করা সমীচীন।

—০—

কলিকাতা সহরে বহু বালিকা-বিদ্যালয় হচ্ছে দেখে অনেকেই শঙ্কিত হ'য়ে পড়ছেন। এ শঙ্কার ভিত্তি কি, এটা জানতে পারলে, এ সম্বন্ধে কিছু বলা চল্বে পারে। যাদের মনে শঙ্কা জেগে উঠেছে, তাঁরা তাঁদের বক্তব্য জানালে আমরা সে সব কথা'র সাধ্যমত উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

—০—

পথে

জীবনের ধারা সবেগে বহিয়া যাইতেছে—বাধা-বন্ধ আছে, রোগ-শোক-মৃত্যু আছে—তথাপি বহিয়া যাইতেছে জীবনধারা, তথাপি—

পশ্চাতে মোটর বাসের বিকট “হর্ণ” বাজিয়া উঠিল। আর একটু হইলেই গিয়াছিলাম আর কি! তাড়াতাড়ি ফুটপাথে উঠিয়া পড়িলাম। অফিসফেরা কেরানীর দল, বায়ুসেবনবিলাসী বাবুর দল, কাজ-না-থাকা বেকারের দল এবং পান-বিড়ি-চিনাবাদামবেচা হকারের দল ফুটপাথ জুড়িয়া চলিতেছে। আমার মত স্বপ্নবিলাসীর স্থান কোথায় এখানে! এখানে যে মাহুঘের গায়ে ধাক্কা মারিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে, যাইতে হইবে যাওয়ার কথা ছাড়া আর সব কিছু ভুলিয়া। না—এ পথে আমার যাওয়া নিরাপদ মনে হইতেছে না; পাশের পার্কে ঢুকিলাম।

দলে দলে বায়ুসেবনখানী ঘুরিতেছে, ওপাশটায় লোহার যন্ত্রপালায় ছেলেরা ঘুরিতেছে। স্থান কৈ—স্বপ্নবিলাসের স্থান কোথায় এখানে? এ যে নিরবচ্ছিন্ন কর্মজগৎ, কর্মের জগৎ

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

লোক এখানে আসিয়া শক্তি সঞ্চয়ের কর্ম করিয়া যায়। বড়ই ভুল করিয়াছি এখানে আসিয়া। বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু যাইব কোথায়! এই বসন্তের সন্ধ্যায় বসবার মত একটুকরা নিরালা স্থান নাই কি এই বিশাল সহরে। আশ্চর্য হইলাম, হয়ত সত্যই নাই; তথাপি বসন্ত তো আসিয়াছে, পুষ্প পল্লবে চৌরঙ্গীর দক্ষিণ দিকটা তো শোভায় শোভাময় হইয়া গিয়াছে। দূরে ইডেন উত্থানটাও তো সাজিয়াছে বসন্তোৎসবে। প্রকৃতি তো এখানেও যথেষ্ট যত্নে বসন্তের আসর রচনা করেন! তবে কাব্য বিলাসের স্থানই বা থাকিবে না কেন? কাব্য তো মানব-প্রকৃতির বসন্তোৎসব; ইহার মুকুলদলেই তো মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল সঞ্চিত হয়—প্রসূত হয়—তবে কবির স্থান থাকিবে না কেন। সেও তো একপ্রকার কর্ম—হয় তো সাধারণ অপেক্ষা মহৎ কর্ম।

তিনটি তরুণী যাইতেছে, রঙিন প্রজাপতির মত বেশ-

বাস, চলন ভঙ্গীটি পর্যন্ত সুন্দর—মনটাকে যেন কোন স্বপ্নবাজ্যে লইয়া যায়। উহারাই তো আমাদের সেই “মঞ্জুলিকা, মুকুলিকা, মালবিকার দল” উহাদের জন্মই তো স্বপ্ন আজও স্বপ্নের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছে, জাগরণের ক্রিয়তা আজও জীবনকে গ্রাস করিতে পারে নাই—কিন্তু সর্বনাশ! এমন করিয়া উহাদের দিকে চাহিলে পথ-চারীরা ভাবিবে কি? সরিয়া পড়া যাক।

ভিখারী! আঃ ভিখারী তো আছেই, সর্বদেশে, সর্ব কালে কিন্তু কলিকাতার মত হাড়-জালানো ভিখারী আর কোন দেশে নাই বোধ হয়। এদের উদর আর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। স্বপ্নবিলাস এখান হইতে বহুদূরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। কিন্তু ইহাদের হাত এড়াইবে কোথায় গিয়া? ইহারি যে সহরের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে।

না—এ ভিখারীটা বড়ই কান্নাকাটি করিতেছে। উহাকে একটা পয়সা দেওয়া যাক। ও হরি! এষে দশটা হাত একসঙ্গে বাড়াইয়া দিয়াছে! এত পয়সা তো কাছে নাই! থাক, কহাকেও দেওয়া হইবে না—পলায়ন

করা যাক। গঙ্গার তীরে হয়তো একটু ঠাই মিলিতে পারে;—যাই সেইখানেই।

না—যাওয়া যটিবে না। মোটরে-ট্যাক্সিতে-রিক্সাতে একাকার হইয়া গিয়াছে। এ ভীড় ঠেলিয়া যাওয়া অসম্ভব। দূর হইতে গঙ্গামাইকে নমস্কার করিয়া ফিরিতে পারিলে বাঁচি। আর গঙ্গাও তো ঐ দেখা যাইতেছে জাহাজ, মাস্তল নৌকা আর বয়লারের ধোঁয়ার ভর্তি, কী হইবে ওখানে গিয়া!

স্বপ্নবিলাসের ঠাই নাই এখানে; এখানে মানুষ হৃদয় মনের সঙ্গে কথা কহিবে না, কহিবার সময়ভাব এবং স্থানাভাব, হয়ত বা প্রয়োজনভাব। ফিরিয়া যাই, বৃথা খুঁজিয়া কি হইবে।

কিন্তু একি! এতক্ষণ ধরিয়া তো হাঁটিয়াছি, কত কি দেখিয়াছি এবং নিজের মনের সঙ্গে এত কথা কহিয়াছি, মনের কাছে তো বেশ নির্জনই বোধ হইতেছিল! তবে? তবে কাব্যবিলাসের স্থান নাই কেন? নিজের অন্তরই তো কাব্যবিলাসের শ্রেষ্ঠ আসন!

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিবংশজ ঘোষ

সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক মাতৃসদন

১২ চৈত্র জুগলী জেলায় সিদ্ধুর গ্রামে বাঙ্গলার লাট পত্নী লেডী রিড মহোদয়া “সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃ সদন” নামে হেলথ উনিট ও গ্রন্থি আগারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

এই মাতৃ সদন প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক এমএ বিএল,সি,আই ই মহাশয় করিয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রী, বিলাতে ভারত সচিব সভার সভ্য, বহু বৎসরের কংগ্রেস কর্মী হইয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়াছিলেন, কিন্তু পল্লীবাসীর আর্ন্তে তাঁহার প্রাণ সতত দ্রবিত হইত। সেই নিমিত্ত নিজে তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে “মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়”, রাজেন্দ্র মল্লিক হাসপাতাল’ অপূর্বপুর নৈশ বিদ্যালয়,

‘গোলাপসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়’ স্বগ্রামে স্থাপনা করিয়া পল্লীবাসীর সেবা করিয়া অমরধামে তিন বৎসর পূর্বে গিয়াছেন।

তাঁহারই স্বাক্ষর পত্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা মল্লিক মহোদয়া নিজ অর্থ হইতে নগদ ৮০,০০০ টাকা গৃহ নির্মাণের জন্ত ৪৫০০ ব্যয়ে আটলক্ষ ইষ্টক ও মাতৃসদনের যাবতীয় আসবাব প্রদান করতঃ স্বামীর স্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়া দত্ত হইয়াছেন।

মহীয়সী মহিলার পতিগত প্রাণের পরিচয়ে ও বিপুল দানের অহুপ্রেরণায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিপুষ্ট করিবার জন্ত বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অভিনেতা লেঃ কলঃ এ, সি, চাটার্জী, ডিস্ট্রিক্টবোর্ড ও “রকফেলার অর্থ ভাণ্ডার” বহুলভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

“রকফেলার ফাণ্ড” হইতে পাঁচবৎসরের জন্ত এই হেলথ

উনিটের খরচ বহন করা হইবে। মাতৃদনে ৪টি 'বেড' প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং এইখানে মেয়েদের প্রসূতি বিদ্যা ও জনস্বাস্থ্য প্রচার কার্যের উচ্চাঙ্গের শিক্ষা প্রদান করা হইবে।

এই প্রতিষ্ঠান যেমন মেয়েদের হিতকারী তেমনি স্বর্ণপ্রভা মল্লিক মাহাদয়ার পতি ভক্তিতে মহিয়ান। ধন্য স্বর্ণপ্রভা, ধন্য বাঙ্গলা দেশ।

বঙ্গীয় স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্মেলনের মহিলা সভা

১০ই, ১১ই, ১২ই, চৈত্র কলিকাতা ভবানীপুরের আর আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে বঙ্গীয় স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্মেলনের অধিবেশন ও প্রদর্শনী হইয়াছিল। কলিকাতায় পৌর সভাপতি মেয়র জ্যাকেরিয়া সাহেব প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধান চন্দ্র রায় এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন।

আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুরমা মিত্র এম এর প্রস্তাবে সম্মেলনের মহিলা বিভাগের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন আমাদের বরণীয়া শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর মহোদয়া। স্বাস্থ্যতত্ত্ব মেয়েরা বাহাতে শিখিতে পারে, স্বাস্থ্য উন্নতিতে মেয়েদের কর্তব্য বাহাতে উপলব্ধি করিতে পারে, এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় মেয়েরা সাহায্য করিতে পারে তাহার আলোচনা করিবার জন্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্মেলন, এই ব্যবস্থা করিয়া দেশের মঙ্গল হইয়াছে।

ডাঃ শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু এম ডি (বার্লিন প্রসূতি) পার্চর্যা ও সন্তান পালন সম্বন্ধে বিষয় জ্ঞান আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ যিনি গুলিয়াছেন তিনি উপকৃত হইয়াছেন।

ডাঃ শ্রীমতী ফুলরেণু দত্ত এমএ, ডি, লিট (প্যারিস) মহোদয়া পাশ্চাত্য রমণীরা কি প্রকারে দেশের স্বাস্থ্য উন্নতি করেন তাহা বোঝাইয়া বলিয়াছিলেন।

শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্তী বাঙ্গলার নারীকে দেশের স্বাস্থ্য উন্নতি করিয়া স্বেচ্ছা মন, স্বাস্থ্যপূর্ণ সন্তান সন্ততি জননী হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন।

কুমারী রমা রাণী ঘোষ ও কুমারী কল্যাণী গুপ্ত কয়েকটি উদ্দেশ্য উপযোগ্য গান গাহিয়া সকলকে তৃপ্তিদান করিয়াছিল। বাঙ্গলা সরকারের জন স্বাস্থ্য বিভাগ "জাতীয় স্বাস্থ্য নারীর স্থান" নামক নূতন একটা ফিল্ম প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণ নারীর মধ্যে জনস্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

শঙ্কর মিত্র কীর্তন বিদ্যালয়ে মহিলা ছাত্রী—

লেডী প্রতিমা মিত্র ছুই বৎসর হইল তাঁহার পুত্রের স্থিতিতে যে কীর্তন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা দিন দিন উন্নতির পথে যাইতেছে। ইহার ছাত্রী বিভাগ ভবানীপুরের স্যার রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। সুবিখ্যাত মুদাউক বাদক ও কীর্তনীয়া শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ ব্রজবাসী ছাত্রীদের সম্বন্ধে বিশুদ্ধ গরণহটী পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করেন। ছাত্রীর সংখ্যা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি পারিতোষিক বিতরণ সভায় ছাত্রীরা কীর্তন গাহিয়া তাহাদের গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন।

ওইম্যান্স কো-অপারেটিভ হোমে লেডী রীড—

লেডী অবলা বসুর কর্তৃত্বাধিনে এবং নারী শিক্ষা সমিতির সংযোগে গত নভেম্বর মাসে যে কুটির শিল্প কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা কয়েক মাসের মধ্যে বেশ ফলপ্রসূত করা হইয়াছে। লাট পত্নী লেডী রীড এই হোমের উৎপন্ন পণ্যের সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য কার্যকার্য্য, সংবিজ্ঞান, ও স্বল্প মূল্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। প্রতি মেয়ে এখানে ইহার মধ্যে মাসিক ১৫।১৬ টাকা অর্জন করিতেছে। এখানকার পণ্যের চাহিদা হইতেছে।

কেন্দ্র সমিতির কথা

প্রচার কার্য—

চৈত্র মাসে কেন্দ্র সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত সুধীর লাল সরকার এবং মহিলা কর্মী শ্রীযুক্তা সুবোধ বাল্য ঘোষ বসিরহাট প্রদর্শনীতে গমন করেন। মহিলা দিবসে শ্রীযুক্ত সরকার মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যধারা এবং মাতৃ মঙ্গল সম্বন্ধে ম্যাজিক লর্গন সহযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত প্রদর্শনীতে কেন্দ্র সমিতি হইতে নানাবিধ শিল্প দ্রব্য প্রেরণ করা হয়। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ সমিতির কার্য ও শিল্প দ্রব্যাদি দর্শনে সম্ভষ্ট হইয়া একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রদান করেন।

এই মাসে শ্রীযুক্ত সুবোধ বাল্য ঘোষ কেন্দ্র সমিতির সদস্য শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুরের সঙ্গে মানিকতলা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন।

সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত হরমাত্যালি-স্থিত শাখা সমিতির উদ্যোগে জয়দীশপুরে একটি স্বাস্থ্য সমিতি হইতে পণ্ডিত কামাখ্যা চরণ শাস্ত্রী নানাবিধ শিল্প দ্রব্য নিয়া উক্ত প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। মহিলা দিবসে তিনি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কার্যাবলী সম্বন্ধে ম্যাজিক লর্গন সহযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন।

জয়দীশপুর প্রদর্শনীর পর শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী সিলেট মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন ও মহিলাদের সজ্জবদ্ধভাবে কার্য করিবার উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ধাত্রী শিক্ষা কেন্দ্র—গত মার্চ মাসে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির তত্ত্বাবধানে ৪টি মহিলা সমিতিতে ধাত্রী শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়।

মাণিকগঞ্জ মহিলা সমিতি—স্থানীয় মহিলা সমিতির উদ্যোগে জনৈক প্রবীণ ডাক্তারের পরিচালনায়

মাণিকগঞ্জ মহিলা সমিতির ধাত্রী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। ১০ জন পেশাদারী ধাত্রী ব্যতীত ও অনেক ভদ্র মহিলা এই ক্লাশে যোগদান করিয়াছেন।

কালিয়া মহিলা সমিতি—কালিয়া মহিলা সমিতির উদ্যোগে এই স্থানে একটি ধাত্রীকেন্দ্র খোলা হয়। একজন স্বদক্ষ এম্. বি ডাক্তার ক্লাশ পরিচালনা করেন। এখানেও বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা এই ক্লাশে যোগদান করেন।

চাকুরিয়া মহিলা সমিতি—জনৈক লেডী ডাক্তারের পরিচালনায় এই ক্লাশ অসম্পন্ন হয়। পেশাদারী ধাত্রী ব্যতীত মহিলা সমিতির সদস্যরাও অনেকে এই ক্লাশে যোগদান করেন।

ডোমজুড় মহিলা সমিতি—ডোমজুড় পল্লিমঙ্গল মহিলা সমিতির উদ্যোগে এ স্থানেও একটি ধাত্রী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। পেশাদারী ধাত্রীদের সহিত বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা এই ক্লাশে যোগদান করেন।

কিষাণগঞ্জ মহিলা সমিতি—গত ২৬শে মার্চ কিষাণগঞ্জ মহিলা সমিতির প্রথম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে মহিলা সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় বালিকাদের দ্বারা একখানি নটিকা অভিনীত হয়। এই উৎসবে বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন।

ভ্রম সংশোধন

গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত রাঁচি মহিলা সমিতি শীর্ষক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্তা নলিনী সেনের রচিত এবং এই সংখ্যায় প্রকাশিত “বঙ্কিম সাহিত্যে গার্হস্থ্যজীবন” প্রবন্ধটি শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা গোস্বামীর রচিত। ভুলক্রমে উহাদের নাম মুদ্রিত হয় নাই—

বঃ সং



বরিশাল মহিলা সমিতির বার্ষিক কার্য বিবরণী

বিধাতার কৃপায় সমিতির আরও একটি বৎসব পূর্ণ হইল। নানাপ্রকার বাধা বিপত্তির মধ্যেও সমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠানটিকে জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়া অদৌর্ধ চতুর্দশ বর্ষকাল সজীব রাখিয়াছেন।

বিগত বৎসর সর্বশুদ্ধ সমিতির দশটি অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে শিশুমঙ্গল সমিতির কার্য প্রণালী নির্ধারণের জন্য তিনটি, মাসিক অধিবেশন পাঁচটি স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্তের আয়োজনে একটি, ও সম্পাদিকার স্থানান্তর হইতে আগমনের পর গত মাস একটি অধিবেশন হয়। ইহা ছাড়া সমিতির সভ্যগণ রেডক্রসের কলা ভবন প্রতিষ্ঠায়, প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষে, এবং শিশুমঙ্গল উৎসবের শিল্পপ্রদর্শনীর ভার গ্রহণ করিয়া সেই জন্ত ৩৪ দিন মিলিত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ৪৫ দিন হাসপাতাল পরিদর্শন করা হইয়াছে। বর্তমান বর্ষে সমিতি শ্রীযুক্তা মনোরমা বসুর অক্লান্ত চেষ্টা ও অসাধারণ ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত মাতৃমন্দিরের সাহায্যের ও কার্য প্রণালীদিগের পরামর্শের জন্ত বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সম্পাদিকা এবং সমিতির আরো ২৪ জন সভ্য লইয়া একটি কার্য নির্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগের এই অত্যাশঙ্কনীয় কর্ম প্রতিষ্ঠানটি বাহাতে জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাহায্য লাভের সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেজন্ত সমিতির সভ্যগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

সমিতির বিশিষ্ট সভ্যা শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস এই মার্চ-

মন্দিরের পৃষ্ঠপোষিকা ও সভানেত্রী। এবৎসর সমিতি হইতে 'মাতৃমন্দিরের' গৃহ নির্মাণের সাহায্যার্থ ৬০০ ৬ মাসিক টাকা বাবদ ১০০ দেওয়া হইয়াছে। এত বড় সহরে এই প্রতিষ্ঠানটি বালবিধবা অত্যাচারিতা ও বিপন্ন স্ত্রীলোকের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা ও স্থাপয়িত্রী—শ্রীযুক্তা মনোরমা বসু অপরিসীম ধৈর্য ও ত্যাগের সহিত ইহার পরিচালনা করিতেছেন এবং বিশেষভাবে সমিতির সর্বপ্রকার সাহায্য লাভে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহার অপ্রয়োজনীয়তা যেরূপ অত্যাবশ্যক অভাবও তদ্রূপ অত্যধিক। বর্তমান বর্ষে ২০২৫টি স্ত্রীলোক এখানে আশ্রয় লাভ করিয়া বিপন্ন হইয়াছেন।

মহিলা সমিতির সভ্যা ও কর্মী শ্রীযুক্তা হরিমতি রায় স্থানীয় রেডক্রস সোসাইটির শিশুমঙ্গল বিভাগে নানারূপ সেবা ও সাহায্য দ্বারা নানাকার্য এই সভা হইতে একটি রোপ্য পদক লাভ করিয়াছেন। সমিতির ভূতপূর্ব ধনাধ্যক্ষ ও সভ্যা মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস জাহ্নবারী মাস হইতে বালিকা শিক্ষালয় নামে একটি আদর্শ শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া স্বচাৰুভাবে তাহার কার্য সম্পাদন করিতেছেন। অল্প বেতনে বহুছাত্রী বাহাতে নিপুণভাবে গৃহ কর্মের সহিত অধ্যয়নেও পারদর্শিনী হইতে পারেন সেইজন্ত তাহার এই শুভ প্রচেষ্টা বর্তমান বার্ষিক ভারতের জন ছাত্রী স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন। আশা করা যায় কালে ইহা সহরের মধ্যে আদর্শ শিক্ষালয়ের রূপে পরিগণিত হইবে। সমিতি ফণ্ডে ব্যাপক ৫০০ শত টাকার কিছু বেশী টাকা জমা আছে।

এ বৎসর সমিতি শিল্পাদি অগ্রাঙ্ক কার্য অপেক্ষা বিস্তৃত-তর ভাবে জনহিতকর কার্যে অগ্রসর হইতেছেন।

সমিতির অধিকাংশ সভ্যা প্রবীণা এজ্ঞা শিল্পাদির সেরূপ কোনও ব্যবস্থা নাই। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট নারী কল্যাণ ভাণ্ডার' বাহিকাগণ নানাবিধ শিল্প কার্য করিয়া সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া থাকেন, এবং লভ্যাংশ দরিদ্র বালিকার সাহায্যার্থ ব্যয়িত হয়। সমিতির সভ্যা শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস এই নারীকল্যাণ ভাণ্ডারের সভানেত্রী ও উৎসাহ দাত্রী।

সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য পরস্পর মেলামেশা ও ভাবের

আদান প্রদান সমষ্টিভাবে দুঃস্থ বিপন্নের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া। সমবেত শক্তি দ্বারা বিভিন্ন মঙ্গল প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করা।

কি উপায়ের নারী গৃহশান্তি রক্ষা করিয়া ও সর্ববিষয়ে উন্নত হইতে পারে সেজ্ঞা আলোচনা ও চেষ্টা।

মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের সাধুসংকল্পের সহায় হউন। তাহাই আশীর্বাদে আমরা কর্মশক্তি লাভ করিয়া উৎসাহের অগ্র মরণ।

পরলোকে জলধর সেন

সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনপ্রিয় রায় জলধর সেন বাহাদুর অশীতি বৎসর বয়সে গত ২৫শে চৈত্র ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতন সরল, চিত্ত-হাস্তময়, সদালাপী সাহিত্যিক এ যুগে বিরল। তাঁহার সাহিত্যসেবার একনিষ্ঠতা অল্পকালীয়। সাহিত্যিক সমাজে তিনি চির আদরীয় “জলধরদা” নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া “ভারতবর্ষ” পত্রিকা সম্পাদন করিয়া বঙ্গ-

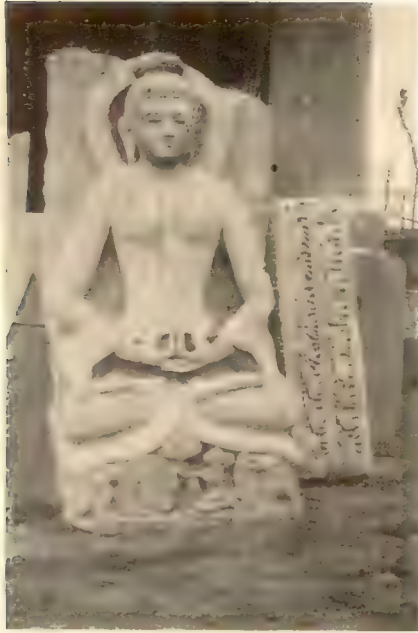
সাহিত্য ভাণ্ডারে বহু অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়াছেন, এবং বহু সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার “হিমালয় ভ্রমণ” পাঠে আজ চল্লিশ বৎসর বাঙালী মন নিমগ্ন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা অমরগীমাও এই তাঁহার অভাব মর্মে মর্মে অল্পভব করিতেছেন। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুন এই প্রার্থনা। পর মাসে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে মহিলাদের আগ্রহ

বর্তমান বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে কুমিল্লার ২৫শে ২৬শে চৈত্র হইয়া গিয়াছে। ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মূল সভাপতি হইয়াছিলেন। মহামায়া স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি সম্মিলন উদ্বোধন করেন। ইহা সম্মেলনের পক্ষে পরম গৌরব। ত্রিপুরার রাজকার্য্য বাঙ্গলা ভাষায় পরিচালন হইয়া থাকে।

সাহিত্যে আবহুল উদ্দ, দর্শনে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, ইতিহাসে ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন, ও বিজ্ঞানে ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়া ছিলেন।

শ্রীযুক্তা সবলা দেবী সঙ্গীত শাখায় সভানেতৃত্ব করিয়া বঙ্গমণীদেব মুখোজ্জল করেন। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র মন্ডী একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার গাঙ্গুলী আলোকচিত্র সাহায্যে ভারত শিল্পের অবদান বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার, ডাঃ রাধা কুমদা মুখার্জি, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, শ্রীজ্যোতিচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নলিনী ভট্টশালী শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব নানা বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রায় ৫০০ শত মহিলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপস্থিত থাকিতেন।



বুদ্ধদেব
উৎকল ভাস্কর্য

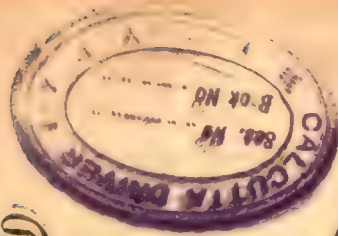


ভুবনেশ্বরের মন্দির
উৎকল ভাস্কর্য



ত্রিভঙ্গ নারী-মূর্তি
উৎকল ভাস্কর্য

শ্রীযুক্ত বীরেন রায় মহাশয়ের সৌজন্দে

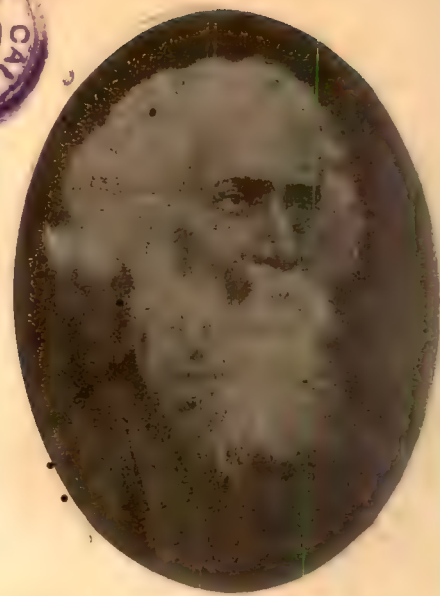


বঙ্গলক্ষ্মী

চতুর্দশ
শতাব্দী বর্ষ

৭ম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ-১৩৪৬



আশীর্বাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্ত-সমুদ্রের কূলে এসে তোমাদের সঙ্গে
আমার সাক্ষাৎ হোল। তোমাদের ষাঁরা রাষ্ট্রনায়ক
আমাদের এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছেন এখানে
এই সমুদ্রের তীরে এর বাতাসে স্বাস্থ্যলাভ করব
বলে, কিন্তু দেশের হৃদয়ের মধ্যে আমন্ত্রণ করার
ভার একমাত্র দেশের নারীদেরই আছে।
পুরনারীরা আজ আমাকে যে অভ্যর্থনা করলেন,
দেশের কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা আমাকে জানালেন, এই
তো যথার্থ এখানে আমার আমন্ত্রণ। তোমাদের
শুভকামনার দ্বারা, মধুর্যাময়ী অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি
দ্বারা তোমরা আমাকে তোমাদের দেশের মধ্যে
ডেকে নিলে। তোমাদের কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা মণ্ডিত
অভিনন্দন সহ দেশের অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ
করে আজ আমি আপনাকে ধন্য মনে করছি।

বহুদিনের জীবন-পথের পথিক আজ শ্রান্ত আমি
এসেছিলাম আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, এই
সমুদ্রের স্নিগ্ধ হাওয়ার শুভ্রাষা লাভ করবার জন্য
এইজন্তই এখানে আমাকে আনা হয়েছিল।
তোমাদের স্নিগ্ধ হৃদয়ের শুভ কামনা আজ আমি
অনুভব করলাম, আমার মনে হচ্ছে যেন এর
কল্যাণ হস্ত স্পর্শে আমি ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের পথে
অগ্রসর হচ্ছি, সুস্থ হয়ে উঠছি। আমার যাবত
দিন হোল। আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায়
গ্রহণ করছি। বিদায় বেলায় নিয়ে গেলুম সমুদ্রের
হাওয়ার মত স্নিগ্ধ তোমাদের শুভ কামনা আর এই
স্বাস্থ্য, তাই নিয়ে যাবার দিন তোমাদের আশীর্বাদ
করে যাচ্ছি। *

* পুরী-নারী-সমাজের প্রতি।

রবীন্দ্রনাথ

বন্দে আলী মিয়া

হে রবীন্দ্র, আজি তব জন্মতিথি বার—

দূর হতে আজি মোর লহো নমস্কার ।

একদা বৈশাখ দিনে মাহেন্দ্র বেলায়

এসেছিলে হে রবীন্দ্র

ভারতের জনারণ্য-জীবন-মেলায় ;

তোমার লভিয়া স্পর্শ ধন্য হলো বিপুলা ধরণী,

স্বর্গ হতে বৃহস্পতি পাঠায়ে আশীষ

গেয়েছিলো তব জয়ধ্বনি ।

দেবতা প্রসন্ন মনে দিয়েছিলো প্রতিভা তোমায়

তার সাথে দিয়েছিলো ঐশ্বর্য অটল—

ধন, মান, আভিজাত্য লভেছিলে জন্ম অধিকারে,

তার লাগি নমস্কার জানাই তোমারে ।

কৈশোরের স্বপ্ন মাঝে তুমি ছিলে সুখ সাধ মম

সেই দিনে পরশিয়া ছিলে মোর নিভৃততম ।

তোমারে দেখার আগে ছিলে মোর মনের বিলাস

উষার প্রথম রাগ—সন্ধ্যার প্রসন্ন আভাস ।

যে-দিন হেরিছু তোমা বিস্ময়ে রহিলাম চাহি

কে এ বিরাট পুরুষ—অমরার জ্যোতির্লোকে

এলো অবগাহি ।

দীর্ঘ ঋজু বর বণু—শুভ্র শ্মশ্রু—কুঞ্চিত দীর্ঘ

কেশ পাশ ।

অতীতের তপোবনে দেবর্ষির প্রত্যক্ষ বিকাশ ।

বিশ্বের বরণ্য তুমি হে সম্রাট কবি,

সর্বজনে সমাদরে আজ ।

ক্লেদপঙ্ক আজি কভু স্পর্শে না তোমাক্কে ;

তোমার দীপ্তির মাঝে আমাদের দেখা

নাহি যায় ।

তবু মোরা তৃপ্ত মনে আলিলাম আরতির দীপ,

দিলাম কথার অর্ঘ্য চরণে তোমার ।



রবীন্দ্র-জয়ন্ত

বিশ্ববরেণ্য,

তোমার যে কণ্ঠে আপনি বাগদেবী তাঁহার
বরমাল্য পরাইয়া দিয়াছেন, সেই কণ্ঠে আমাদের
শুভচিন্তার মূর্ত্তস্বরভিমালা পরাইয়া দিয়া আমরা ধন্য
হইলাম। তুমি আমাদের অন্তরের প্রীতিপুষ্প
ও শ্রদ্ধার স্রবচ্চন্দন গ্রহণ কর।

যে রত্নগর্ভার মুখের হাসি তোমার বচনকে অমৃত-
মধুর ও সঙ্গীতকে বিশ্বজন-মনলোভন করিয়াছে
আমরা তাঁহারই গৌরবে গরবিনী ভারতীয় নারী-
সমাজ। তুমি আমাদের বিখ্যাত-সমাজে
গৌরবময়ী করিয়াছ। কৃতার্থ আমাদের পুলকস্রাত
স্নেহদৃষ্টি তোমাকে শতায়ু করুক, তোমার জীবন-

পথকে নিকটক ও স্বস্তিশোভন করুক।

যে সীমন্তিগীর সিন্দূররেখা-আভায় তোমার
লেখনীমুখ গোলাপকুমুমবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে,
তোমার কবিতা নিখিল বিশ্বের প্রণয়ীচিত্তকে উতলা

করিয়াছে, তাঁহার অন্তরের সকল মঙ্গলচিন্তা আজ
আমাদের অন্তরলোক হইতে উদ্ভাসিত হইয়া
তোমার জীবনের আগন্তুক নববর্ষকে কলাগঞ্জী
মণ্ডিত করিয়া তুলুক।

ছহিতা আমরা তোমার, দৌহিত্রী আমরা
তোমার, তোমার অন্তরকামধেনুর মধু-পীযুষধারা
দৌহন করিয়া লইতেছি ও আকণ্ঠ পান করিতে
পাইতেছি বলিয়া আজ আমরা ধন্য। ধন্য আমরা,
ধন্য আমাদের দেশ, ধন্য বিশ্বজনসমাজ, তোমার
বীণার রণমধুরনি শ্রবণ করিয়াছি, তোমার কন্ধুকণ্ঠের
জাগরণমন্ত্ৰ লাভ করিয়াছি।

ভারতভাগ্যবিধাতার অনিমেঘ নতনয়নের অবিচল
স্নেহদৃষ্টি তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুক।

বন্দে মাতরম্

ভক্তি শ্রদ্ধাবনতা

পুরী-নারী-সমাজ

প্রীতি-অভিনন্দন

বেণু হয়ে জন্মেছিষু বনে,

তোমার গানের সুর পশিল শ্রবণে
দখিনা বায়ুর কথা।

বসন্তে আমার চিত্তে জাগে সেই ব্যথা

তাই শুনাইয়া তুমি ডাকিলে আমায়
আসিলাম নব রূপে তাই এ খাতায়।

রাখালের বাঁশী নই আর

উর্দ্ধে তুলি শ্যাম স্নিগ্ধ পত্রের স্তম্ভার,

বায়ু ভরে নাই ছলি

বাঁশী হয়ে রঞ্জে রঞ্জে সুর নাহি তুলি,

অমল কমল শুভ্র পত্র রূপ ধরি

কবিতার মধুভাণ্ড হতে আশা করি।

শ্রীজ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

মোর বুকে কত শত ছবি

কত গীতি, কত ছন্দে একে দিবে কবি ;

শ্যামল বনেরে ত্যজি

তাই মানুষের হাতে ধরা দিষু আজি

শুভ্রবেশা কত নারী প্রীতিমুগ্ধ আঁখি-

দল পরে দলগুলি দিল মোর রাখি।

আপনার কিঙ্কার কোমল

কোল দিল বনমুগুরূপা ধরাতল ;

সব নিয়ে নারী-মন

ভালবেসে নবরূপ করিল গঠন।

আমাদের ভালবেসে তুলে লও আজ

ধন্য হই মোরা—ধন্য মহিলা-সমাজ। *

* কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে পুরীতে পাঠিত।

কিশদত্তী

চতুর্দিকে সোরগোল প'ড়ে গেল' যে চ্যানেলের ভেতর দিয়েই আবার ইংলও আক্রান্ত হবে। কথাটা শুনেই চারিদিকের বিপুল কোলাহল সত্ত্বেও মনে প'ড়ে সেই গল্পটা যেটা বুড়ো 'সেলবি' কম ক'রে হাজারবার আমাদের শুনিয়েছিল। চোখের ওপর বেশী ক'রে ভেসে উঠলো একটা সন্ধ্যার কথা। যখন বৃষ্টিতে ভিজে জাব হয়ে গিয়ে ঢুকলুম সরাইখানার ভেতরে। দেখি যে 'সেলবি'র শ্রোতার দল চিম্নির কোল ঘেঁসে বেশ পুরু হ'য়ে উঠেছে। আমাকে দেখবামাত্রই ঠোঁট থেকে পাইপটা নামিয়ে সে একটু মুহূর্ত হাসলো। সে হাসির অর্থ আনন্দ, শোক বা উদ্ভাস, এ সবের একটাও নয়। যারা তাকে জানে তারাই কেবল বোঝে তার মানে। গল্প ব'লতে পাওয়ার বিপুল আনন্দই তার মুখে ফুটিয়ে তুলেছে ঐ ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখা; বিশেষ কিছু না ব'লে আমিও সেদিন তার কাছে ঘেঁসে ব'সে গেলুম। * * * *

'সেলবি' ব'লে চ'ললো—'তোমরা সকলেই জানো যে আমার বাবা ছিলেন মেঘ-পালক। আর আমাদের বাড়ী ছিল এখান থেকে ঠিক চার মাইল দূরে—'কোভে' জন্মাবধি আমিও সেখানেই থাকতুম। বিয়ের পরেই এখানে বাস নিতে হয়।

আমাদের বাড়ীটা সমুদ্রের খুবই কাছে ছিল। আধ মাইলের ভেতরে আর কোনও লোকের বসবাস ছিল না। শুনেছি এখন আর সেখানার কোন চিহ্ন নেই। জায়গায় জায়গায় কেবল ইট পাটকেলের গাদা জমা হ'য়ে আছে।

শীতের সময়ে ওখানকার আবহাওয়া মোটেই ভালো থাকতো না। চারিদিক শুকনো খটখটে। অস্বস্তিতে মন ছেয়ে ফেলতো। গরমের সময়টা বেশ একটু আরাম হ'ত। যে ক'টা বছর সেখানে কাটিয়েছিলুম তার মধ্যে আঠারগ' তিন, চার আর পাঁচ সাল আজও আমার মনে জাজ্জল্যমান হ'য়ে রয়েছে। কারণ সে বয়সে জগতে যা কিছু দেখি তাই-ই জানুবার জন্তে প্রবল আগ্রহ জন্মায়।

লেখক : টমাস হার্ডি

অনুবাদক : নিখিলকুমার ভট্টাচার্য্য

আর তা ছাড়া তখন জানুবার মতন ঘটনাও ঘটেছিল বেশ।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তখন সবেমাত্র তাঁর দ্বিধিজয় অভিযান সেরে ঘুরে এসেছেন। ইংলণ্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তোড়জোড়ে তখন তিনি খুবই ব্যস্ত। চ্যানেলের ঠিক ওপারে রোজ তাঁর সেপাইদের পুরোদমে কুচ্-কাওয়াজ চ'লতো।

ক্রান্তের সব যায়গা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে সেখানে ঘাঁটি হাজার পদাতিক আর পঞ্চাশ হাজার সওয়ার জড় হ'য়েছিল। ছ'হাজার নৌকো তৈরী হ'ল সৈন্য সামন্তদের পার করার জন্তে। সে গুলোতে আস্তাবল ছিল। এ সব কাজের জন্তেও ছুতোর কামার, সহিস, মিস্ত্রী মিলিয়ে তা প্রায় হাজার পাঁচ ছয়ক লোক অবিরাম খাটতো। এ ভাবে ঠিক তিন বছর ধ'রে আয়োজন চ'ললো।

প্রতিদিন সকালে সেই বিপুল সৈন্যদল সার বেঁধে দাঁড়াতো। তারপর চ'লতো তাদের শিকার কাজ—কি ক'রে লাটবহর সমেত পার হওয়া যায় নদী, নালা, সমুদ্র, কি ভাবে পরের দেশের ওপর প'ড়তে হয় ঝাঁপিয়ে।

একদিন সকালে বাবা ভেড়ীর দল ভাঙিয়ে সাপেক্সের দিকে যেতে যেতে একটা উঁচু যায়গা থেকে দেখেন যে সূর্যের আলোয় সৈন্যদের কিরীচ, উফীষ সব রূপের মতন বাকবাক ক'চ্ছে।

আমার একজন খুড়োমশাই ছিলেন পদাতিকদলের সার্জেন্ট, তাঁর নাম জব। যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে আমরা তাঁকে চরম বিশেষজ্ঞ মনে করতুম। তিনি বলেছিলেন যে-রাতে কোন রকম দুর্ঘটনা হবে না সেই রাতেই নেপোলিয়ান চ্যানেল পার হবেন। কিন্তু কোন জায়গায় যে তিনি এসে উঠবেন সেটা ঠিক ক'র্তে না পেরে আমরা সদাসর্বদা শঙ্কিত থাকতুম। ঐ বিষয়ে এক এক দলের এক এক রকম মত ছিল। কারুর মতে ডোভারই তাঁর নিশানা।

তাদের বিপক্ষদল তখনি ব'লতো—হ্যাঁ, তা নয় আর।
অতবড় সেনাপতির ঘটে কি এটুকু বুদ্ধিও নেই যে সবাই
যে যায়গাটাকে স্থির ক'রে উদ্গ্রীবভাবে অপেক্ষা ক'রছে
সেইটা দিয়েই আসবে !'

দলে দলে চ'লতো নানান রকম বাগ্‌বিত্তা। কত
জল্লা-কল্লা, কত যায়গাই যে ঠিক না হ'ত,—টেম্‌স্‌নদীর
পূর্ব ঘেসে, পোর্টল্যাণ্ডে, কিম্বা বীল আর সেন্ট আলবাসের
মাঝখানে দিয়ে। কিন্তু হতভাগ্য 'কোভ' পড়ে সকলের
সন্দেহের অতীতে। ও যায়গাটা দিয়ে যে কিছু ঘটতে
পারে এ কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।'

কারও মুখে শোনা গেল যে ফরাসী নৌবহরের একটা
দল একেবারে সরাসরি স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে উঠবে। তারপর
সেখেন থেকেই একটা স্বেচ্ছাসেবক যায়গা বুঝে তার ভেতর
দিয়ে ইংলণ্ডে পড়বে। এসব খবরে কিন্তু সন্দেহ করার
মত অনেক কিছুই ছিল। এবং পরে জানাও যায় যে
বোণাপার্ট নিজেই তখনও কোন যায়গা ঠিক করে উঠতে
পারেনি। কেননা ইংরেজ সৈন্য যে কোন্ কোন্ যায়গায়
মোতায়েন রয়েছে তা তাঁর জানা ছিল না।

বোণাপার্টের একটা প্রকাণ্ড স্বেচ্ছাসেবক ছিল যে তাঁর
নৌকোগুলোর জন্তে কোন বন্দর দরকার হত না। কেবল
লোকের চোখে ধুলো দিয়ে চুপি চুপি নেবে পড়ে কোন
সোজা রাস্তা ধরা যায় এমন একটা যায়গা চাই। আর
এই সমস্তার সমাধানের জন্তে কপিকার সেই দুর্দ্বার বীর
একদিন রাত্তিরে কতদূর বুদ্ধি খাটিয়ে যে কি বিষয়
হুঃসাহসিকের কাজ করেছিল তা দুচারজন লোক ছাড়া
এই বিরাট পৃথিবীর সকলেরই কাছে অজানা। কোন
লেখক বা খবরের কাগজের পাণ্ডা তা ঘুণাক্ষরেও টের
পায়নি। ছাপার হরফে ছলাইন পড়ে যে সব লোক
হজুগে মেতে ওঠে তারাও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি।

আমাদের ভেড়ীগুলো সমস্ত দিন বাড়ীর আশেপাশের
জমিতে চরতো। কিন্তু শীতকালে বাবাকে রাত থাকতে
উঠে সেগুলোর পেছনে বড় খাটতে হত। বড় হওয়ার
সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাবাকে এদিক দিয়ে খুব সাহায্য
করতুম।

এখন একেবারে ঠিক মনে পড়ছে না যে সেটা

আঠারশ চার কি পাঁচ সাল। তখন রোজই রাত্তিরে
আমাকে সেখেন থেকে আরও আধমাইল দূরে খোঁজ
গিয়ে থাকতে হত। সারা জীবন নির্জন যায়গায়
থেকে থেকে ভয়ডর বলে কোন জিনিষই আমায়
স্থান পেত না। বরং লোক দেখলেই যেন কিংবদন্তি
একটা অজানা আগ্রহ দেখা দিত।

হঠাৎ একদিন দেখি খুড়ো এসে হাজির হ'ল।
রেজিমেন্টের ক্যাম্প তখন ওখান থেকে অনেকদূর
কাজেই আমি একটু আশ্চর্য্য বোধ করলুম।

সন্ধ্যার সময়ে বাবা খুড়ামশাইকে নিয়ে কোথা
না খোঁজাড়ে গেলেন। প্রায় দুইঘণ্টা পরে ফিরে
ওরা দুজনেই গুলেন। রাত এগারটার সময়ে রোজকার
বাঁবার ডাকে উঠে আমি যখন খোঁজাড়ে যাবার
বেলা হচ্ছিল তখন খুড়ো মশাই এসে বললেন—এত
একাবাঁবি কিরে! আমিও তোর সঙ্গে যাই।

খোঁজাড়ে পৌঁছে সব ঠিক আছে দেখে আমরা
গাদার মধ্যে শুয়ে পড়লুম। নিস্তর রাত। কোন
একটিও জনপ্রাণীর টুশদটি পর্যন্ত নেই। ঢেউও
আছড়ে পড়ার শব্দে মনে হচ্ছিল যেন ঘুমন্ত
পৃথিবী নিঃশ্বাস উঠছে। তাঁদের আলোয় জল, খড়, ঘাস
ধবধবে।

শুয়ে শুয়ে খুড়ামশাই যুদ্ধের গল্প আরম্ভ ক'রেন,
কোন্ কোন্ লড়াইয়ে তিনি গেছেন, জখম হ'য়েছেন ক'
এই সব। বল্লেন যে খুব সম্প্রতিই তিনি ফরাসী
বিপক্ষে লড়েছেন এবং ভবিষ্যতে বহুবারই লড়াই
হবে।'

গল্প শুনতে শুনতে মনে হ'ল আমিও যেন যৈ
আমিও যুদ্ধে গেছি। ঘটনাগুলো সবই আমার মাঝে
ভেতরে এলোমেলো ভাবে ঘোরাফেরা ক'র্তে লাগলো
আস্তে আস্তে কখন যে ঘুমিয়ে প'ড়লুম তা বুঝতে
পারিনি। ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখছিলুম যুদ্ধ, কামান, বন্দুক
সৈন্যদল পালাচ্ছে, এই সব।

কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিলুম তা মনে নেই। ভেড়ী
গুলোর পায়ের ঘষঘমানি আর ব্যা ব্যা আওয়াজ হ'য়ে
খুমটাকে চট্ ক'রে দিল ভেঙ্গে। দেখলুম খুড়ামশাই

একেবারে কুস্তকর্ণ হয়ে গেছেন। চোখ দু'টো একবার র'গড়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল'। প্রায় হাত চল্লিশেক দূরে ছ'জন লোক দাঁড়িয়ে আশ্তে আশ্তে কি সব বলাবলি ক'চ্ছে'। তাদের কোমরে তরোয়াল, গায়ে বড় কোট, আর মাথায় চোখ পর্যন্ত ঢাকা টুপি। আমার মাথায় হঠাৎ কি এক বুদ্ধি খেলে গেল'। আমি ওদের কথা শোনার জন্তে কান খাড়া ক'রে রইলুম। কিন্তু ফরাসী ভাষা না জানায় একবর্ণও বুঝতে পারলুম না। কাজেই ধরণধরণে বুঝতে যদি পারি সেই আশায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাদের দিকে লক্ষ্য ক'র্তে লাগলুম।'

চাঁদের আলোয় বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম যে একজনের হাতে একখানা বড় গুটানো কাগজ রয়েছে। সে চারদিকে হাত দেখিয়ে দেখিয়ে অল্প লোকটাকে কি সব ব'লছে। বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হ'ল না যে ঐ জায়গাটা সম্বন্ধেই সে তার সঙ্গীকে বোঝাচ্ছে।

এতক্ষণ খুড়োমশাইকে জাগাই নি'। এবারে কিন্তু ভয় হ'ল। ওরা যদি এসে আমাদের মারে। তখন তখন খুড়োর কাণে মুখ লাগিয়ে আর কেউ যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে ডাকলুম।

—কি হ'ল—ব'লে খুড়োমশাই চোখ মেললেন।

—চুপ—আশ্তে আশ্তে—ছ'জন ফরাসী, আমি বল্লম।

—ফরাসী!!—খুড়ো মশায়ের স্বরে বিষম আতঙ্ক ফুটে ওঠে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—কোথা দিয়ে মৈত্র নিয়ে উঠবে, তাই-ই দেখতে এসেছে—আমি জবাব দিলুম।

এবারে খুড়ো মশাই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন।

আমি কিন্তু তাঁকে আর কোন কথাই বলতে পারলুম না। কারণ লোক দু'টো তখন আমাদের দিকে এগোতে আরম্ভ ক'রে। হাত কুড়িক এগিয়ে এসে তারা কাগজ-খানাকে খুলে মাটির ওপর ছড়িয়ে দিলে। তারপর একটা ছোট আলো জ্বলে তার ওপরে ফলে। আমরা দু'জনেই বুঝতে পারলুম যে সেটা একটা ম্যাপ।

ফিস্ ফিস্ ক'রে খুড়ো মশাইকে জিজ্ঞেস করলুম—ওরা কি দেখছে?

খুড়ো মশাইও উত্তর দিলেন খুবই আশ্তে—চ্যানেলের নক্সা।

তারপর খানিকক্ষণ ধ'রে চললো তাদের ম্যাপ দেখা আর কথা বলাবলি। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে এখানে ওখানে নির্দেশও হ'চ্ছিল। বেশ বুঝতে পারলুম যে দু'জনের একজন আর একজনকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে, সমীহ ক'রে কথা কইছে কিন্তু সে লোকটা তাকে বেশ হতভাই দেখাচ্ছে।

আমরা কেবল ম্যাপটার দিকেই তাকিয়েছিলুম। লোক দু'টোর মুখ দেখা দরকার মনে করিনি। কিন্তু যখন তারা ম্যাপ থেকে মুখ তুলে নিচ্ছিল তখন অতর্কিতে আমাদের চোখ সেই দিকেই পড়ল। খুড়োমশাই ছিলেন ব'সে, প'ড়লেন একেবারে ধপাস্ ক'রে শুয়ে। আমার ভয় হ'ল তাঁর ফিট্টিং হ'লো না কি?

ব'লে উঠলুম কি হ'ল।

‘খড়ের মধ্যে মুখ গুজেই খুড়োমশাই ব'লে উঠলেন—ওরে বাপ—আমার বিশ্বয় চতুর্গুণ বেড়ে গেল’—বল্লম—কি, কি!!

‘জড়িয়ে জড়িয়ে খুড়োমশাই উত্তর দিলেন—নেপোলিয়ান, কর্ণিকার সেই যাজুর—বাঁচতে যদি চাও তো মাটির সঙ্গে মিশে শুয়ে প'ড়। যেন দেখতে না পায়। দেখলে আর এ যাত্রা রক্ষে নেই।

তাড়াতাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে প'ড়লুম। কিন্তু খানিকক্ষণ কাটবার পর আর কোঁতুহল দমন ক'র্তে পারলুম না। একটু মাথা জাগিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলুম—হাঁ,—ঠিকই—ছবির মত ছব্ব এক চেহারা।

তার বেশী কিছু হ'ল না। কয়েক মিনিট পরেই ম্যাপটাকে গুটিয়ে আলো নিবিয়ে তারা দু'জনেই ফিরে গেল। খুড়োমশাইয়েরও যেন এবারে জ্ঞান ফিরে এলো। ব'লে উঠলেন—গ্রন্থি এর প্রতিকার ক'র্তে হ'বে। তা না হ'লে ইংলণ্ড গেল জন্মের মতন।

তারা অনেকটা এগিয়ে গেলে আমরা দু'র থেকে চুপি চুপি তাদের অনুসরণ ক'রলুম। দেখলুম খানিকদূরে

আরও ছুঁজন লোক এসে জুটলো। আমরা একটা ছোট চিপির ওপরে উঠে দেখতে লাগলুম। একটা ছোট নৌকায় ক'রে মাঝজলে গিয়ে আর একটা বড় নৌকায় উঠে তারা অদৃশ হ'য়ে গেল'।

সেই রাত্রেই খুড়োমশাই সামরিক মহলে খবরটা দেবার জন্যে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাতে যে কি ফল হ'য়েছিল তাও জানি না আর নেপোলিয়ানের একটা সেপাইকেও

কোতে আসতে দেখিনি। এলে অবিশ্বাসি আর আমাকে এখানে ব'সে ব'সে গল্প ব'লতে হ'ত না।

* যারা সেদিন রাতে বুড়ো সেলু'বির গল্পটা শুনে তারা সবাই-ই আজ বছর দশ ধ'রে তার কবরটিকে খুঁজছেন। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তার গল্পটা চিরকাল গল্পই রয়ে গেছে। সত্যি সত্যি বাস্তবজগতে ব'লে ব'লে কেউই সেটা বিশ্বাস করে নি।

দক্ষিণ ভারত-পথে

মহাবালিপুরম্

প্রকৃতির সৌন্দর্যের পরম বিকাশ হয় পর্বতে, সাগরে, জামল ক্ষেত্রে, এই তিনটির সাম্মিলন হইয়াছে মহাবালিপুরম্ প্রান্তে। ভারতের সাধকগণ প্রকৃতির রমণীয় কোড়ে তাহাদের সাধন-ভঙ্গনের স্থান নির্বাচন করেন। সৌন্দর্য্য চিত্তে ধোয়ায় আনন্দ রস, আনন্দই দেয় সত্যের সন্ধান। সত্যের মহিমা প্রকাশ পায় দেবলীলায়, জীবার স্থানই পরিণত হয় তীর্থে। ভক্তরা তাহাদের যাহা শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় তাহা প্রদান করে দেবদেউল বা বিহার নির্মানের জন্য। শিল্পীরা তাহাদের মন, প্রাণ, বুদ্ধি, শক্তি সব ঢালিয়া দেয় সাজাইতে দেবতার আবাস। যুক্ত হয় সেই শিল্পীর নিপুণতার সহিত কবির কল্পনার বিচিত্র কাহিনী, পরিণত হয় সেই পুণ্য স্থান এক তীর্থে, যুগ যুগান্তর হইতে টানিয়া আনে শত সহস্র ভক্ত নর-নারীকে দিতে অর্ঘ্য।

তেমনি এক পুণ্যস্থান মহাবালিপুরম্, যার শিল্প-সম্পদ আজও আকর্ষণ করে দেশ বিদেশের স্রষ্টাজনকে। ভরিয়া দেয় দর্শকের চিত্ত বিশ্বাসে ও পুলকে। পক্ষী তীর্থ হইতে মহাবালিপুরমের পথে যে নহরটি পার হইয়া মহাবালিপুরমে উপনীত হইতে হয়, তাহার নাম বাকিংহাম খাল, মাদ্রাজ হইতে পণ্ডিচেরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই নহরটি দীর্ঘ ১২৫ মাইল। থেয়া ঘাট পানমারাই একটি ধীর পল্লীতে, যখন আমরা পার হইয়া পরপারে যাই কতগুলি জেলে ছেলে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র

মেয়ে সারি বাধিয়া গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া জাল হাতে বসিয়া মৎস্য ধরিতেছিল, তিন ঘণ্টা পরে যখন প্রত্যাহার করি তখনও তাহাদের ঠিক সেই অবস্থায় জেলে থাকিতে দেখিলাম। কি অপার সহিষ্ণুতা।

ইতিহাস

মহাবালিপুরম্ অতি প্রাচীনকালের সমৃদ্ধিশালী ও বন্দর। ইহার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমগ্র ভারতে ও প্রাচ্যে ব্যাপ্ত ছিল। নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে মহাবালিপুরম্ একাদশ খৃষ্টাব্দে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সেখানে বহু সুরম্য সৌধ ও প্রাসাদ বিরাজিত ছিল। কালের প্রভাবে তাহা বিধ্বস্ত ও গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগের নগরবেষ্ণুর ফলে মহাবালিপুরমের পর্বতগাত্রস্থিত গুহা এবং পাণ্ডবদের রক্ষাকৃত পঞ্চমন্দির প্রায় ২০০০ বৎসর প্রাচীন, নির্ধারিত হইয়াছে। (ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেনো ম্যাগাজিন দশম খণ্ড পৃঃ ৩০০) সমুদ্র তীরবর্তী মন্দির পঞ্চ রথের বহু পরবর্তী সময়ে প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পল্লব বংশের নরপতি বাহু নরসিংহ বর্মণ মহাবালিপুরম পত্তন করিয়াছিলেন। মহাবালিপুরমের সৌভাগ্যের সময় সমুদ্রতীরস্থ মন্দির গম্বুজগুলি উজ্জল ভাষাপাত দ্বারা মণ্ডিত ছিল, তাহা উপর যখন সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অতি উজ্জ্বল

শ্রী ধারণ করিত, সেই জ্যোতিঃ দর্শনে সমুদ্রগামী পোতের নাবিকগণ যেমন পুলকিত হইত তেমনি গম্যস্থান নির্দেশ করিবার স্বযোগ পাইত।

নামের কাহিনী

মহাবালিপুরমের নামের উৎপত্তির সহিত নানা রহস্যময় কাহিনী বিজড়িত। পণ্ডিতরা বলেন, রামায়ণের বানররাজ বালির রাজধানী এই স্থানে ছিল, সেই খ্যাতিতে নগরটি মহাবালি-পুরাম নামে অভিহিত।

কোন তামিল গ্রন্থের মতে বহু পর্বত বেষ্টিত স্থান “মহামালয়ী” পুর হইতে মহাবালিপুরম নামকরণ হইয়াছে।

তেলেগু পল্লী গাঁথায মহামল্ল রাজা নরসিংহ বর্ষা মহোদয়ের মল্ল ক্রীড়াভূমি ‘মামল্লপুরম’ বা মল্লপুরী হইতে এই স্থান মহাবলি পুরাম নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।



দ্রৌপদীর রথ

মহাভারতে বর্ণিত প্রভূত চিত্ত ঐশ্বর্য-প্রতাপশালী স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের অধিশ্বর বলি রাজা এই স্থানে বাস করিতেন। তিনি পরম দানশীল, তাঁর দর্পে ত্রিভুবন টলমল করিত। ইন্দের প্রভাব নিস্তেজ হইয়াছিল। তাঁহার অতি দানের দর্প হরণ করিবার জন্ত ভগবান বামনরূপে বলিকে ছলনা করিয়া পাতালপুরীতে প্রবেশ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। —ছড়ায় আছে

অতি দর্পে হতা লক্ষা, অতি মানে চ কৌরবা
অতি দানে বলি বঁজ সর্বমত্যন্ত গহিতম ॥

সেই নিমিত্ত অতি দানে মত্ত স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের অধিশ্বর বলিরাজ বামন দেহধারী ভগবানকে দেখিয়া তাঁহার দান গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অল্প অনুমান করিয়াছিলেন। যখন বামন অবতার ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন বলি তখন বামনের তিন পা ভূমি কত আর হইবে তাই দান করিতে বিনা বিধায় সম্মত হইলেন। বামন অবতার যখন দান গ্রহণ করিতে উদ্যত বলিরাজ দেখিলেন সেই বামনের ত্রিপদ পরিমাণ ভূমি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন ব্যাপিয়া যাইল, অবশিষ্ট পদ রাখিবার ভূমি আর বলি রাজার নাই, তাহার দানের প্রতিজ্ঞা ও দান করিবার দর্প বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন ভগবান তাঁহার চরণ বলি রাজার মন্তকোপরি স্থাপিত করিয়া ত্রিভুবন ও বলিরাজকে উদ্ধার করিলেন। ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন। কাঞ্চি ভারামের বামন মন্দিরের বিশাল মূর্তি এই লীলা ব্যক্ত করিতেছে। সেই পুণ্য ভূমি আজ মহাবলিপুরম নামে খ্যাত।

প্রাচীনতা

কিষদন্তী বাহাই হটক এই স্থানটি অতি প্রাচীনকালে জনাকীর্ণ ও ঐশ্বর্যশালী মহানগরী ছিল। ৬২৫-৬৪৫ খৃষ্টাব্দে বিশ বৎসর পল্লব বংশের রাজা নরসিংহ বর্ষাণের রাজধানী ছিল। সেই সময়ে মহাবালীপুরম নানা শিল্প ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইয়া দেশ ও বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী পল্লব-রাজ নরসিংহ, চলুক্য রাজাকে ৬৩ খৃঃ পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ও তামিল ভারতখণ্ডে তাঁহার সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এ তথ্য ডাঃ কর্ণেল ধর্মরাজ মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিমাল্য পাঠে জ্ঞাত হইয়াছেন। তাহারই সময়ে এক একটা পর্বত খোদিত করিয়া রথাকৃতিতে পাঁচটি প্রকাণ্ড মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। পাঁচটি মন্দির ধর্মরাজ, ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী ও সহদেবের রথ নামে খ্যাত। ইহাদের গঠন প্রণালী ও শিল্প চাতুর্য জগতের শিল্প সম্পদের মধ্যে অপূর্ব ও অতুলনীয়। ইহার মূর্তিগুলির জীবন্ত ভাব দর্শকদের অভিভূত করিয়া দেয়। একখানি পাথর বা পাহাড় কাটিয়া কি অপূর্ব দক্ষতার সহিত এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে, বিশেষ শিল্পীর এমন দক্ষতা আর আছে কিনা সন্দেহ। দেশ বিদেশ হইতে শিল্পামোদী, রসিক স্বধীবৃন্দ রথগুলি দর্শন করিয়া পরম আনন্দ পাইয়াছেন এবং ইহাদের শিল্প-নিপুণতার জন্ত অজস্র প্রশংসা লিপিরাজ করিয়া গিয়াছেন।

প্রসাদ

পূর্বাহ্নরতি

শ্রীহেমলতা দেবী

কালীপূজার রাত। অমাবসয়ার ঘোর অন্ধকারে শ্রামী-কালী দেবীর মন্দিরে পূজার ঘটা লাগে খুব। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের পোড়ো জমি জুড়ে মেলা বসে জমকিয়ে। নানা গ্রামের লোক জড় হয় প্রায় হাজার খানেক। রাতের মেলা চোখে দেখা যায় না সব স্থানটা ভাল করে। পঞ্চাশটা মশালের আলো জলে তাতেও আলো হয় না যথেষ্ট। মেয়েদের চলাফেরার পক্ষে স্থানটা সুবিধার নয়। গুণ্ডা জড় হয় অনেক। দেবী দর্শনের আকাজক্ষা মেয়েদের মনে এতই প্রবল যে ভয় ঠেলে তারা দেবীর পা দুখানি স্পর্শ করা, পূজার ফুল মাথায় নেওয়া, চরণামৃত মুখে দেওয়ার আকাজক্ষা চরিতার্থ করে প্রতি বৎসর ঐ দিনে।

দেবীর স্ত্রীকে ও চম্পককে দেবী দর্শন করিয়ে আনেন সাবধানে সন্ধ্যায়, বেশী রাতে যেতে দেন না কখনো। গহনচুরি, টাকাচুরি তো হয়েই থাকে—এমন কি মানুষ চুরিও হয়েছে শোনা যায় মাঝে মাঝে।

এ বছর পূজার দিন গভীর রাত্রে পূজা শেষ করে পুরোহিত দেবীর মন্দিরের দ্বার পেরিয়েছেন, নারীকণ্ঠে ফিস্ ফিস্ কথাবার্তা শুনলেন। একজন বলছে :

১ম—মেয়েটা গেল কোথায়? বিপদ বাধাল দেখছি, বোকা মেয়ে বাড়ীতে না-বলে দলের সঙ্গে চলে এল, এখন ফিরে গিয়ে বলা যাবে কী!

২য়—হাভাতে মেয়ে দল ছেড়ে সরে গেল কেন? আমাদের হাতে দড়ি দেবে শেষটা!

৩য়—অন্ধকারে কে যেন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ছুসমন চেহারার একটা গুণ্ডা মনে হল।

২য়—সর্বনাশ! এখন উপায়?

১ম—ফিরে গিয়ে বলা যাবে আমরা কিছু জানি না; যায় নি সে আমাদের সঙ্গে।

২য়—তাই কি হয়? পাড়ার লোক দেপেচে রোগা মেয়েটা ছেলে কোলে নিয়ে আমাদের সঙ্গ ঘরে চলছে।

১ম—মরণে তবে খবর দিয়ে। থানায় যা হয়ে সাক্ষী দে, তোর সাহস বেশি!

২য়—সাহস নয় দিদি, মিথ্যা বললে আরে পা পড়তে হবে! তার চেয়ে তার স্বামীকে গিয়ে সত্য বলা দেওয়াই ভাল।

কথা শোনা গেল না আর, কে জানে কোনদিকে সরে পড়ল অন্ধকারে।

পুরোহিত উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগলেন ব্যাপার কী? ধীরে ধীরে মন্দিরের সিঁড়ি কধেক ধাপ নেমেছেন, দেবীর মন্দিরের শেষ ধাপে শোয়ান একটা শিশু ঘুমিয়ে আছে। অল্পমানে বুঝলেন, সেই হারানো মেয়েটার শিশু তবে কার্তিক মাসের হিম, শিশুটিকে এইখানে ফেলে রেখে দেবে হিম খেয়ে সে মারা পড়তে পারে। কিংকর্তব্যবিদূহ হয়ে দেবীর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। দেবী মন্দিরের পুরাণো ভূত্য নফরকে বললেন :

—শিশুটিকে তুলে নিয়ে চল আমার সঙ্গে। পুরোহিত চলছেন এগিয়ে—শিশুকোলে নফর পিছু পিছু। ভূত্য বন্ধ দিয়ে মামী-ভাগ্নী শুয়ে ঘরে, নফরের বৌ আছে তাদের। কড়া নাড়তেই চম্পক বেরিয়ে এসে মানবে ছুয়ার দিল খুলে। মামার পিছনে শিশুকোলে নফরকে দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। মামা বলেন,—শিশুটিকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যা চম্পক।

মামার আজায় চম্পক তাড়াতাড়ি নফরের কোল থেকে শিশুকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে মামীমার ঘরে গিয়ে বসে,—মামীমা, দেখুন, দেখুন, কী সুন্দর শিশু এনেচে মামাবাবু! মগ্নমগ্নী ঘুমের ঘোরে বিশ্বয়ে চোখ বড় করে বলেন :

—শিশু! মামাবাবু এনেছেন! কোথা থেকে?

—কি জানি মামীমা!

—নিজে এসেছেন তো?

—হাঁ, সঙ্গে নফর আর এই শিশু।

—অবাককাণ্ড! কার শিশু কুড়িয়ে আনলেন?

—শিশুটি বড্ড সুন্দর—দেখুন না চেয়ে।

—কোথা থেকে আনলেন না জেনে এখন ছোঁয়াছুয়ি করাসনে সব। দেবীঘর ঘরে ঢুকে বললেন, খুব ভাল জাতের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে—নিশ্চিত মনে ঘরে স্থান দাও—দেবীর প্রসাদ বলে জেনে রাখ।

চম্পক শিশুটিকে কোলে নিয়ে বারবার তার মুখে চুমো খেতে লাগল। শিশুটি নাড়া পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে উঠল। ক্ষিপ্ৰহাতে চম্পক তাকে নিজের ঘরের তক্তায় শুইয়ে ঘরে-রাখা দুধ খানিকটা পাতার জালে গরম করে খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়াল।

ভোরে উঠে চম্পক দেখলো শিশু তার গায়ের উপর পড়ে তাকে মা-মা বলে ডাকছে। কচি শিশু চিনতে পারেনি সে নিজের মা কি না।

মন্দিরের পূবদ্বারে প্রকাণ্ড একটা পুকুর, দুদিকে বাধা ঘাট। পূর্বরাজাদের আমলের পুকুরটা দেবতার কাজে এখন ব্যবহার হচ্ছে। এখন সেটি দেবত্র সম্পত্তির অন্তর্গত। পুরোহিত পূজায় যাচ্ছেন, পথে হেঁচট শুনে এগিয়ে গেলেন পুকুরের দিকে। দেখলেন একটা ক্ষীণাক্ষী কিশোরীর মৃতদেহ জলে ভাসছে। কি করে জলে ডুবলো, কখন মারা গেল কেউ তার খবর বলতে পারছে না। চিন্তিত মনে তিনি মন্দিরের দিকে ফিরলেন, মনে মনে ভাবলেন, হয়ত বা মেয়েটি ঐ খোকার মা। কথাটা তাঁর মনে চাপা রইল, দ্বিতীয় ব্যক্তি জানলো না।

তিন বৎসর কেটে গেছে। শিশুটি চম্পকের ভরা স্নেহের কোলে দিনে দিনে বেড়ে উঠে তিন বছরেরটি হয়েছে। দেবীর দান ভেবে চম্পক তার নাম রেখেছে প্রসাদ। দেবীঘর বলে দিয়েছেন,—চম্পক, এ খোকা তোর। তোর যা খুশী নাম দে, যেমন করে চান্স মাহুষ কর। মনে মনে ভাবতেন, কি জানি খুঁপড়া মেয়ে

চম্পার যদি আর বিয়ে নাই হয় তবু ছেলটাকে নিয়ে জীবন কাটাতে পারে।

প্রসাদ চম্পককেই মা বলে জানে, মা বলে ডাকে। মা-সম্বন্ধে তার অগ্র কোন ধারণাই জন্মে নাই।

শিবরাত্রিতে শ্রামাকালীর মন্দিরে দেবীর পূজা হয় ধুম করে। বহু লোক শ্রামাকালীর মন্দিরে এসে রাত জাগে। দেবীদর্শন, জাগরণ সব তাদের একসাথে হয়। ভোরের সময় উপবাসের পারণ। সকলেই জলযোগ করবে সে-সময়। মন্দিরের দ্বার খুলে পুরোহিত দেখেন, দেবীর গলায় বড় বড় মুক্তার নহর গাঁথা, বড় বড় পান্নার থামি দিয়ে থাকে থাকে সাজানো সরস্বতী হার পরানো।

দেবীর গলায় ফুলহার চিরদিনের দেখা। সেই গলায় আজ রত্নহার কে পরালো। বিস্ময়! বিস্ময়! মহাবিস্ময়!

পুরোহিত স্তম্ভিত, একলা এগুতে পারছেন না। অলৌকিক দৈব ঘটনা না মাহুষের কাজ! হতবুদ্ধি হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। পূজাঙ্গণের কথা মনে রইল না। হঠাৎ ঢ্যাঁড়রা পেটার শব্দ, রাজবাড়ীর বরকন্দাজরা ঢ্যাঁড়রা পিটে ফিরছে। রাণীমায়ের গলার মুক্তাহার গতরাজে চুরি গেছে। বহুমূল্য হার। পাওয়া চাই-ই-চাই। নতুবা রাজাবাহাদুর মাথা রাখবেন না কারো।

দাসদাসী, পাইক বরন্দাজ সবাই মন্ত্রস্ত, ভীত। পুরোহিত দেবীঘর হেঁকে বললেন,—দেখ দেখ, মাংয়ের মুক্তাহার—এটিই রাণীমায়ের হারাণো হার কি না। উপস্থিত সকল লোক বিস্মিত, চমৎকৃত! পাইক ছুটলো রাজবাড়ী খবর দিতে।

খবর শুনে স্থির হোল, রাণীমা নিজে আসবেন নিজের গলার হার চিনতে। ঘটনাখানেকের মধ্যে রাণীমায়ের পাক্ষী এসে হাজির। সঙ্গে এসেছেন রাজ-দেওয়ান, ব্যাপারের তদন্ত করতে।

দেওয়ান বসেন, চোরের কাজ। রাণীমা বসেন, মাংয়ের গলায় হার কি মানিয়েছে! এ হার আমি খুলে নিতে পারব না।

দেওয়ান বললেন, অনেক দামী হার মা—দেবীর গলায় থাকলে চুরি যাবার সম্ভাবনা থাকবে প্রতিক্রিয়া। পুরোহিত বসেন, নিন, খুলে নিন রাণীমা। দেবমন্দিরের গহনা চুরির

খবর সবাই জানে। এতে চোরের উপদ্রব পড়বে আমাদেরও উপর, তাতে প্রাণের ভয় আছে।

—যাই বলুন আপনারা, হার আমি খুলে নিতে পারবো না। রাণী মায়ের উত্তর।

দেওয়ানজি এক বুদ্ধি ঠাওরালেন। বলেন—হারের দাম কত রাণীমা?

—দাম জানে কে! এতো আজকার জিনিষ নয়! বহু পুরুষ আগের কেনা—রাজবাড়ী তখন এই পুরানো নহরেই ছিল। আজ আবার সেই পুরানো হার পুরানো নহরেই ফিরে এসেছে। দেওয়ানজি,—এ কি ফিরিয়ে নেওয়া যায়!

এদিকে চোরের ভয়ে পুরোহিত হার রাখতে অভ্যস্ত নারাজ—মহাসমস্যা। ভেবে চিন্তে দেওয়ানজি বলেন, রাজবাড়ীতে যে দেবীমূর্তি আছেন, তাঁরই গলায় এ হার পরান থাক—সেখানে পাহারা অনেক, চোরের ভয় নাই। এ পোড়ো মাঠে মুক্তা হার কেন! দেবী আছেন সর্বত্র।

কথাটা রাণীমায়ের মনে লাগল, বলেন,

—মূল্য দিতে হবে দেওয়ানজি, এখানে তাহলে মূল্য দিতে হবে।

—মূল্য কত হবে মা!

—আপনিই অনুমান করুন।

—ত্রিশহাজার!

—তাতো হবেই; এই টাকা আপনি পুরোহিত ঠাকুরের হাতে দিন; তিনি দেবীর অভিপ্রায় বুঝে এই টাকা ব্যবহার করবেন।

পুরোহিত দেবীর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন—দেবী শ্রামাকালীর অর্থ আর কে নেবে শ্রামাকালী পাঠশালা ছাড়া। এই অর্থে পাঠশালার প্রভূত উন্নতি সাধন কর যাবে। তাতে বহুজনের কল্যাণ। জীবের কল্যাণই তো মায়ের আশীর্বাদ!

শ্রামাকালী পাঠশালা আজ উচ্চইংরাজি শিক্ষালয়ে পরিণত হয়েছে। নূতন শিক্ষক এসেছেন কয়েকজন। অশোকনাথ মুখ্যজ্যে এম্-এ বি-টি, তিনি হেডমাষ্টার হয়ে এসেছেন। শিক্ষালয়ের নামটি আছে পূর্বের মত

“শ্রামাকালী পাঠশালা”। রাণীমা নাম বদল করতে নারাজ। দেবীর নামেই শিক্ষালয়টি উৎসর্গীকৃত।

প্রথম যেদিন অশোকনাথ এসে বিদ্যালয়ে পৌঁছলেন, তাঁর মুখ দেখে পুরোহিত দেবীবর চমকে গেলেন। অবিকল শিশু প্রসাদের মুখ যেন বসান। পুরোহিত এই বিদ্যালয়ের কর্মধ্যক্ষ। তাঁরই উপর তত্ত্বাবধানের সব ভার।

প্রসাদের সঙ্গে অশোকনাথের মুখশ্রী সাদৃশ্যের কথাটা তিনি মনে চেপে রেখে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন বেশি করে। জানলেন তাঁর জ্ঞান নাই। বিপজ্জিক কি কুমার সেটো জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না সহজে।

দিন কাটে—ছয়মাস চলে গেল। জ্যৈষ্ঠ একদিন গোপনে পুরোহিত বলেন,—একটা বড় গোপনীয় কথা, কাণে না যায় কারো। মনে ঘুরছে, কাউকে বলতে সাহস হয় না। শ্রামাকালী পাঠশালার হেডমাষ্টার অশোকনাথ মুখ্যজ্যের মুখের সাদৃশ্য এতই প্রসাদের মত যে তিনি ওর আত্মীয় না হয়ে যান না, বাপ হতেও পারেন। চম্পক শুনলে ভয়ে সারা হবে—ভাববে, তার খোকাকে কেউ তার আত্মীয় হয়ে দাঁড়িয়ে কেড়ে নিয়ে না যায়। বেচারী চম্পক তাকে ছাড়তে পারবে না কখনো। এমনি সে মায়ায় জড়িয়েছে ওকে মানুষ করে। যাই হোক, আমি অশোককে একবার নিমন্ত্রণ করে নিজে আসি বাড়ীতে। তুমি প্রথম দেখ। তোমাতে আমাতে দৃষ্টির মিল হয় কি না দেখি।

পরদিন বৈকালে অশোকনাথকে নিয়ে বাড়ী এলেন দেবীবর। আড়াল থেকে দেখে মগ্নমগ্নী দৃঢ়রূপে ধরে নিলেন, নিশ্চয়ই এ প্রসাদের বাপ হবে, অবিকল এক মুখ।

জলযোগ করে অশোকনাথ হলেন বিদায় সন্ধ্যার সময়। রাত্রে স্বামীকে মগ্নমগ্নী বলেন, নিশ্চয় প্রসাদের বাপ হবে, ভাল করে খবর নাও। বিপজ্জিক হলে দাও না চম্পকের সঙ্গে রিয়ে—সব দিকে তাহলে মজল ঘটে। কথাটা দেবীবরের বড় মনে লেগে গেল। তিনি উঠে পড়ে একাজে উন্মোগী হলেন।

একদিন সন্ধ্যায় হুজনে বেড়াতে রেরিয়ে দেবীবর

অশোকনাথকে বলেন, আপনি আমাকে বিশ্বাসী বন্ধু মনে করতে পারেন ?

—নিশ্চয় !

—একটি রথশ্রমণ ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে তোলাপড়া হয়ে আমাদেরকে ব্যাকুল করে তুলেছে। আপনাকে সেটা বলতে চাই।

অশোকনাথের বুকটা কেমন নাড়া পেয়ে উঠল। বুকের ভিতরের একটা চাপা বেদনা আজ পুরোহিতের মাঝে হঠাৎ ভেঙে বেরিয়ে না পড়ে।

—বলুন, আমি প্রস্তুত আছি শুনতে।

—ক্ষমা করবেন আমাকে। আমার প্রথম, আপনি কুমার না বিবাহিত না বিপজ্জিক।

—এ কথাটা আমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক। আপনার এতে কিছু প্রয়োজন আছে কি ? আপনাকে অবিশ্বাস করছি না, প্রশ্ন করছি মাত্র।

—জানি, এরূপ প্রশ্ন ভদ্রতাসঙ্গত নয়, তবু বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করেছি—কারণ আছে।

—কারণটা কি আগে যদি বলেন, তবে শেষে আমার যদি কিছু বলার থাকে—বলবো।

দেবীবর একটি শিশুকে তিন বৎসর পূর্বে কালী পূজার রাতে কুড়িয়ে পাওয়ার ঘটনা থেকে আজ পর্যন্ত সেই শিশু তাঁর বাড়ীতে পালিত হচ্ছে—অশোকনাথকে বলেন।

—তার এত সাদৃশ্য আপনার চেহারার সঙ্গে যে সে খুব সম্ভব আপনার কোন আত্মীয় হবে। ছেলেটিকে আমি একবার আপনাকে দেখাতে চাই।

অশোকনাথের বুকের ভিতরটা যেন মুঠো করে চেপে ধরলো কেউ। অম্পষ্ট স্বরে বলেন, দেখাবেন দেবীবাঘু।

ঠিক হোল—পরদিন সন্ধ্যায় অশোকনাথ বাড়ী আসবেন পুরোহিতের।

চম্পক শুনেছে প্রসাদের বাবা আসছেন আজ। সে ধরে নিয়েছে, যিনি আসছেন, তিনিই প্রসাদের বাবা। ভয়ে তার বুকের ভিতর কাঁপছে। তার খোকাকে এবার কে যেন কেড়ে নেবে। সারাদিন সে জলম্পর্শ করে নাই, কেঁদে কেঁদে দিন কাটিয়েছে, মামা-মামী সাধুনা দিচ্ছেন—সে প্রবোধ মানে না। অনেক বুঝিয়ে ধমক দিয়ে মামা

তাকে বৈকালে একটু ডাবের জল খাওয়ালেন। খোকাকে সে আজ কিছুতেই ছাড়বে না, তার বাপের কাছে যেতে দেবে না—মনে-মনে পণ করে রসে আছে।

সন্ধ্যায় অশোকনাথ উপস্থিত হলেন। চম্পক ভেবে আছে, নাজানি আগন্তুক লোকটা কি রকম দুই চেহারার হবে, নতুবা সে কি খোকাকে কেড়ে নিতে আসে! ভয়ে ভয়ে সে ছয়ারের ফাঁক দিয়ে চোখ ফেলল, অশোকনাথের মুখের দিকে। ওমা—কী স্বন্দর মুখ, অবিকল যে খোকার মত। দুইভা মাখান নাই সে মুখে একটুও। ব্যথা সরিয়ে তার অন্তর যেন লুটিয়ে পড়ল অশোকনাথের পায়ে। “খোকাকে কেড়ে নিও না গো—” যেন গুমের গুমের বন্ধ।

দেবীবর চম্পকের ঘরে গিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন অশোকের সামনে, ধরলেন তার মুখটি তুলে। সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আমার ভাগ্যী চম্পকলতা একে লালন করেছেন পুত্রস্নেহে। খোকাকে ছাড়তে পারা তার পক্ষে অসম্ভব। আপনি এখন বলুন, ছেলেটি আপনার কে ?

—মর্মান্তিক ঘটনা। আমার ছেলে ছিল তাকে ফিরে পাবার আশা ছিল না। গত কথা অভিষাপের মত আমার জীবনে জড়িয়ে আছে। খোকা আমার দেবী শ্রামাকালীর মন্দিরেই তার জন্মস্থান পরিশোধ করেছে। আপনার ভাগিনেয়ী, যিনি তাকে মানুষ করেছেন, খোকা এখন তাঁর। আমার দাবীদাওয়া কিছু নাই।

পুরোহিত তখন অশোকনাথের কাছে চম্পকের বিবাহ-বিজ্ঞাপনের আমূল বৃত্তান্ত, খুৎপড়া কুমারী-জীবন নিয়ে তার মামার বাড়ীতে বাসের খবর সবিস্তারে জানানেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করলেন, আমার ও আমার জীবন বড় সাধ চম্পকলতাকে আপনি গ্রহণ করেন।

—অপরিশোধনীয় ঋণ আমার তাঁর কাছে। তাঁর ইচ্ছা কি আগে জাহ্নন।

পুরোহিত ডাক দিলেন—মা চম্পক শোন, খোকাকে চির জীবনের মত যাতে তোমাকে ছাড়তে না হয় তার ব্যবস্থা করছি। তুমি স্বীকার আছ তো!

চম্পকের সুগঠিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মূর্তি ও স্নেহে উদ্ভাসিত মনটি মুখে ফুটে রয়েছে দেখে অশোকনাথ বিমুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন পলকশূন্য হয়ে।

বিনা আয়োজনে, বিনা উদ্যোগে নিজে পৌরহিত্য করে সেই রাতেই অশোকনাথের হাতে দেবীবর চম্পককে সম্ভ্রদান করলেন।

বিনা যত্ন শয্যাপাতা ঘরে চম্পকের হোল বাসর। সেকলে কাঁচঘেরা লঠনে তেলের ঘোলাটে আলো জলছে মিটির মিটির,—তার বাসর ঘরের দীপসজ্জা। থোকা ঘুমিয়ে আছে আগে থেকে বিছানায়। কর্মনিপুণা চম্পক-লতার তখনো কাজে মন।

অশোকনাথ বিছানায় গেলেন, চম্পক গেল পাশের ঘরে কাজ সারতে। কাপড় চোপড় গুছিয়ে রেখে ভোরের সময় যা কিছু দরকার হবে তার ব্যবস্থা করে এসে বসল সে বিছানা-পাতা তক্তার একটি কোণে।

অশোকনাথ তখনো মশারীর মধ্যে বসে আছেন, শোন নাই। বলেন, চম্পক, শোবে না।

—থোকাকে কোলে নেবেন না।

—তুমি কোলে দাও।

চম্পক মশারীর ভিতর ঢুকে ঘুমন্ত থোকাক তুলে

নিষে তার দুই গালে দুটি চুমো দিয়ে অশোকনাথের কোলে গুইয়ে দিল।

বিমুগ্ধ অশোকনাথ চম্পকের হৃদয়ের অতল্পর্শ গভীরতা অনুভব করে, তার হাতটি ধরে বলেন—অতুলনীয় দান।

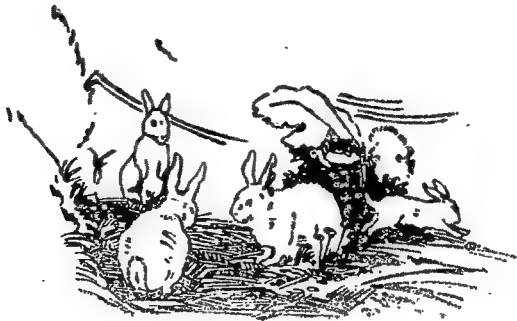
কথাটা চম্পকের কানে গেল না। বাপসা আলো—সে একদৃষ্টে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে আছে। ধীরে ধীরে অক্ষুট কণ্ঠে বলল—দুটি মুখ অবিকল এক রকম। কী সুন্দর! উদ্বেলিত হৃদয়ে অশোক বলেন—প্রেম কি সুন্দর, তুমি কি সুন্দর।

* * * *

পুরোহিত রাত্রেই কুশগিকা সেরেছিলেন—সকাল পূজার ক্ষণে তাঁর সময় হবেনা বলে।

চম্পকের স্বামীর গৃহে যাত্রার সময় হয়ে এল। যাবার আগে দেবী শ্যামাকালীকে সে প্রণাম করে যাচ্ছে। মন্দিরে প্রবেশ করে দেবী-মূর্তির পদতলে আগে থোকাকে দিল গুইয়ে—শেষে মায়ের চরণে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে বলল, মা শ্যামাকালী—কি ধন দিয়েছিলি মা।

দেবীপদতল ছেড়ে ইত্যবসরে প্রসাদ কখন যে মায়ের কোলে উঠে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে, দেখে চম্পকের হৃৎস্পন্দন নাই।



সাহিত্যে নূতন ও পুরাতন

সাহিত্যে নূতন ও পুরাতনের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ কেবল স্বাভাবিক নয়—একটি শাশ্বত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল সাহিত্যেই ইহা ছিল, আছে এবং থাকিবে; কারণ মানুষ স্বেচ্ছায় বিভিন্ন মতবাদের কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়া সত্যের প্রকৃত রূপটিকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিতে ভালবাসে এবং এই জন্তই সে কায়া ছাড়িয়া মূর্চের গ্রাস ছাড়ার পশ্চাতে ছুটিয়া যায়। জাগতিক রহস্তের মর্মজ্ঞ কবি আত্মাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন—“সত্যেরে লও সহজে,” কিন্তু সত্যকে সহজরূপে মানিয়া লইতে হইলে যে সংস্কার-বিমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা সাধারণ মানুষের নাই এবং থাকিতে পারে না। তাই শুধু সাহিত্যে নয়—সংসারেও এত বিরোধ, সংঘর্ষ এবং অশান্তি।

আদর্শের সংঘাত যুগে যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে মল্লভূমিতে পরিণত করিয়াছে; ইহা একটি নূতন ঘটনা নয়, বরং চিরন্তন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। সাহিত্য জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন কোনও নিরাশ্রয় নিরালস্য পদার্থ নয়। এ কথা একটি সাধারণ এবং অতি পরিচিত প্রবচনের মধ্যে পরিণত হইয়াছে যে ইহা জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। মনোজগতের সকল স্বাত প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব ও বিপ্লব, সংশয় ও সন্দেহ ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। মানুষের জীবনেই যদি এত বিচিত্র ও বিভিন্ন আদর্শের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যেও নানা প্রকার আদর্শের এবং মতবাদের সমাবেশ এবং উহাদের অনিবার্য সংঘাত লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

একজনের নিকট যে আদর্শ অনিন্দ্য ও অতুলনীয়, অস্ত্রের নিকট তাহাই অশ্রদ্ধা এবং উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য জীবনের অন্ত্রাঙ্গক্ষেত্রে যেরূপ, সাহিত্যেও সেইরূপ পরমত-সহিষ্ণুতা অত্যন্ত চূর্ণ। নব্যপন্থী ও পুরাতন পন্থীদের মধ্যে যে গোচনীয় সন্ধীর্ণ মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি ইদানীং বঙ্গসাহিত্যে দেখিতে পাই, তাহার মূলেও এই কারণ বিদ্যমান। আশ্চর্যের বিষয় এই যে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম, এ

অনন্ত আদর্শ ও মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মের গ্রাস একটি মহান ও নিখিল মানবের মিলনক্ষেত্রেও নিতান্ত লজ্জাকর এবং অবাস্তবীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অতএব সাহিত্যক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবার উপায় নাই!

সাহিত্য জ্যামিতির প্রাথমিক কতকগুলি সূত্রের গ্রাস স্থিতিশীল এবং পরিবর্তনীয় নয়; চলিষ্ণুতা, পরিবর্তন-শীলতা এবং নব নব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠাই ইহার ধর্ম। জীবনকে যুগে যুগে সকলেই একটিমাত্র দৃষ্টি-কোণ হইতে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করিবে ইহা আশা করা সম্ভব নয়। এইজন্যই সাহিত্যে আকস্মিকভাবে মতবাদ, রুচি ও দৃষ্টি ভঙ্গিমার পরিবর্তন হয় এবং এই অবশ্যজ্ঞাবী—পরিবর্তনকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তখন একদল আর একদলকে নিন্দা করিয়া আপন মতের অকাট্যতা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু উভেজনার আধিক্যে পরস্পর পরস্পরের যুক্তি পরস্পরকে উপলব্ধি করিতে চায় না।

সাহিত্যক্ষেত্রে নূতনকে পুরাতন চিরকাল অলুকাপ্পার দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। অজ্ঞাতকুলশীলকে বিশ্বাস করিতে তাহার ভয় এবং সংশয় জাগে; তাই সে তাহাকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে পারে না। গতানুগতিক সংস্কারের অতি পরিচিত সীমারেখার মধ্যে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হওয়ার পুরাতন নূতনের আকস্মিকতা ও উৎকেন্দ্রিকতায় আশঙ্কিত ও উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠে। শুধু সাহিত্যে নয়—জীবনেও অহরহ ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতনের দৃঢ় প্রত্যয় যে এ জগতে একমাত্র সে স্বয়ং সকল তথ্যের সন্ধান পাইয়াছে; এবং যাবতীয় রহস্য শুধু তাহারই নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে; অপর কাহারও পক্ষে এগুলি জানিবার প্রয়াস জনাধিকার চর্চা মাত্র! এই জন্তই নূতন যখন বলে :—

রক্ত আলোর আলোয় মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,—
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে

পুচ্ছটি তোর উচ্ছে তুলে নাচা।

তখন জীবনের পরিপূর্ণতার এই উচ্ছ্বসিত আবেগ
পুরাতনের স্নায়ুকে পীড়িত করে; এই দুর্দমনীয় উল্লাস ও
চঞ্চলতাকে তাহার নিকট নিতান্ত উন্নততা বলিয়া বোধ
হয়। উৎসাহের প্রাচুর্য্যে নূতন ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা
করে—

শিকল দেবীর ঐ যে পাষণ বেদী

চিরকাল কি রইবে খাড়া?

পুরাতন বিজ্ঞভাবে উত্তর দেয়, হে উন্মাদ, ঐ শৃঙ্খল
তোমার অসংযত চরণ যুগলের জগুই প্রস্তুত হইয়াছে।

নূতনও পুরাতনকে তাহার অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার জগু
উপহাস করিয়া প্রতিশোধ লইতে কুণ্ঠিত হয় না। প্রাচীনের
সতর্কতার আতিশয্যে নবীনের নিকট সে চিরকাল
হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার অচলায়তনের
পাষণ প্রাচীরে কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে নূতনের বিজয় পতাকা
উড্ডীন হইয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই।
তাহার সতর্কতার ব্যর্থতায় সে শুধু হাহাকার ধ্বনিতে গগন
পবন মুখরিত করিয়াছে। উচ্ছ্বসিত জলরাশিকে সে শুধু
মুক্তিকার প্রাকার তুলিয়া চিরকাল প্রতিহত করিতে
চাহিয়াছে, কিন্তু দুর্ব্বীর প্রবাহ গতির উল্লাসে সেই মুক্তিকা-
প্রাকারের ক্ষণ ভঙ্গুরতা প্রতিপন্ন করিতে ছাড়ে নাই।

সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সময় একটি ভ্রমাত্মক ধারণার
মধ্যে সকল বিরোধ ও অনর্থের মূল নিহিত দেখিতে পাওয়া
যায়। প্রাচীনতা এবং আধুনিকতা উভয়েই সাময়িক ও
আপেক্ষিক; আজ যাহা আধুনিক কিছুদিন পরে তাহাকেই
প্রাচীন বলা হয়। সুতরাং সাহিত্যকে অথও এবং অবি-
ভাজ্যরূপে না দেখিলে ইহার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে
পারা যায় না। নূতন হোক অথবা পুরাতন হোক, যাহা

ভাল তাহা চিরকালের সামগ্রী; তাহার ধ্বংস নাই
একদা যাহা ভাল লাগিত তাহা যদি আজ ভাল না লাগে
তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা রুচিবিকৃতির চিহ্ন অথবা উক্ত
পদার্থের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ভাল লাগিবার বিশেষ কিছুই
নাই; শুধু একটা সাময়িক উত্তেজনাই তাহাকে জনপ্রিয়
করিয়া তুলিয়াছিল। “A thing of beauty is a joy
for ever”—সাহিত্যের পক্ষে বোধ হয় ইহাই চূড়ান্ত
উক্তি।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিলে সাহিত্যকে নূতন ও
পুরাতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা চলিতে পারে, কিন্তু
এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে—
পরস্পর মিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। নদীর স্রোত যেমন এক-
টানা, সাহিত্যকেও সেইরূপ ভাবে কল্পনা করিলে ইহার
সমগ্র রূপটিকে সম্পৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; একটি প্রবাহের
সহিত আর একটি প্রবাহের যেমন একটা নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ
একাত্মতা আছে, সাহিত্যেরও সেইরূপ এক যুগের সহিত
অপর যুগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পুরাতনের চিতাভস্মের
উপর নূতনের তুঙ্গদৌধ নির্মিত হয় এবং কালের প্রবাহ
আধুনিক প্রাচীনের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়।

সাহিত্যের আত্মা পরিবর্তনশীল না হইলেও তাহার
অবয়বের পরিবর্তন ঘটে এ কথা অনস্বীকার্য্য। যদিও
জগৎ ও জীবনই ইহার সনাতন উপজীব্য, তথাপি এই
দুইটিকে পর্য্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি করিবার রীতি ও ভঙ্গী
পৃথক হইতে পারে। কিন্তু ইহা তো নিতান্ত বাহিরের
ব্যাপার, তাই অধুনা প্রশ্ন জাগে “এহো বাহ্য আগে কহ
আর”। মোটের উপর বলিতে পারা যায় যে সাহিত্য যদি
সাহিত্য না হয়, তবে নূতন হোক অথবা পুরাতন হোক
তাহা ব্যর্থ; মতবাদে ভারাক্রান্ত হইলে ইহা ক্রটিম
হইয়া পড়ে এবং ইহার স্বাভাবিক প্রেরণা ক্ষুণ্ণ হয়। ক্রটিম
উপায়ে নূতনত্ব সৃষ্টি করিবার আসক্তি এবং অতিরিক্ত
প্রাচীনত্বের আশ্ফালন কোনটিই সাহিত্যে বাঞ্ছনীয় বস্তু নহে।

যৌগিক

(পূর্বানুবৃত্তি)

অতসী বুঝি ঘুমিয়েছে; অশেষ ঘুমোন নি।

ষে গরম।...পা যে খুব ঘামছে এমন নয়, কিন্তু বিশ্রী রকমের একটা উত্তাপ বোধ সমস্ত শরীরে চারিয়ে পড়েছে। ফ্যানের লাইনটা ঠিক করে নিয়েও গড়িমসি করে ফ্যান এনে বসানো হ'ল না। আজকালের মধ্যে বন্দোবস্ত না করলে চলছে না। এই গুমোটো...

হাত পাখাটা হাতড়ে টেনে নিয়ে আবার খানিকটা বাতাস করলেন। কিন্তু পাখার বাতাস আর ফ্যানের হাওয়া। আর পাখা ঘুরেবে না ঘুমবে মাহুষ! না, কালই তিনি ফ্যান এনে ফেলছেন নিজে তদ্বির করে।" কিন্তু—

হ্যাঁ, আরও একটা ফ্যান চাই ওদের ঘরের জন্তে। মেয়েটা একেবারেই গরম সহিতে পারে না। এমনি ত' শুনিয়ে বলে ওর দিদিকে, বেটার ঘরটা নিজেদের জন্তে নিয়ে...

ওর দিদির সঙ্গে অমনি ওর চুলচেরা আড়ি।...ছেলে-মাহুষ। অতসীও কম ছেলে মাহুষ নয়,—বোঝে না,—সামান্য বিষয়কে ঘুরিয়ে অসামান্য করে' তোলে। বলে, জেলাসি!

...এ জেলাসির আবার একটা মনগড়া ব্যাখ্যা তৈরি করে রেখেছে।

অতসী পাগল!

টুক টুক করে চলতে চলতে টাইমপীসটা বাজে টিং করে। নিজা হীনতার গায়ে সময় এসে যেন টোকা মেরে আঘাত করল। সাড়ে এগারোটা? না, এগারোটা সেই কখন বেজে গিয়েছে। এ সাড়ে বারোটাই। :এবং— এখনই তাঁকে যেমন করে হোক ঘুমোতেই হবে। কাল আর্লিয়ার না উঠলে কোন প্রকারেই তাঁর চলবে না। বাইরে বেরুতে হবে একবার;...কলেজের লেকচারটাও একবার ভালো করে তৈরি করে নিতে হবে।

মাথার দিকের জানালা খুলে দেন নি নাকি ভুল করে?

—৩৭—রাধাচরণ চক্রবর্তী

তাই ত'।...এই ত' জানালা দিয়ে দিবি হাওয়া আসছে

জানালা দিয়ে বাইরের খানিকটা দেখা যায়। সেই অর্ধসমাপ্ত নতুন উচু বাড়ীটা আকাশের অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে। চাঁদ বোধ হয় মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে; একটা পীতাম্ব আবছা আলোক এসে পড়েছে ইট-বা'র-করা অসংস্কৃত বাড়ীটার গায়ে। বাড়ীটাকে যেন কেউ সম্মানীর গৈরিক বস্ত্র পরিয়েছে! অথবা—

আশ্চর্য্য বিপরীত চিন্তায় তখনই তাঁর মনে হয়, সম্মানীকেই কে যেন ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে সাজিয়েছে... গৈরিকের বস্তৃতান্ত্রিকতা!

...একটা ছেঁড়া চিঠির কালো হরফের মাঝখান থেকে একজন গৈরিক-পরা মাহুষ বেরিয়ে আসে। আমেরিকা ফেরত সম্মানী!

অশেষ জানালার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জোর করে' চোখ বোজেন।

অতসী সত্যি ঘুমিয়েছে; কিন্তু ঘুমিয়েও ও' জেগে রয়েছে। স্বপ্ন দেখছে:

মস্ত বড় বিয়ের আসর। চারদিকে রোশনাই, আতশ, কোলাহল। দূর থেকে নহবতের বাজনা আসছে কানে; কাছ থেকে ঢোলের সঙ্গে সানাইয়ের স্বর।

দরদালানে বেজে উঠল শাঁখ...লাজবর্ষণে শুভ্র হ'য়ে গেল অলিন্দ...পূরজীরা হলুধনি দিচ্ছে।

'চুপ, চুপ—বর আসছে রে বর!'—কোলাহল মুছ হ'য়ে গুঞ্জে পরিণত হ'ল।

বর এল। ফুলের গন্ধে ভরে' গেল বাতাস। দালানের কোণ থেকে অশেষের পাশে দাঁড়িয়ে উকি মেরে, অতসী দেখে, মহাতাবের মত মুখের রং!...দপ্ দপে মুখের ওপর এসে পড়েছে কেয়ারি-করা চুলের খর। মুখ-খানা যেন পুরুষের মুখ নয়, মেয়ের মুখ—এমনি কোমল, এমনি স্নন্দর বরের মুখ।...এই বর।

"কেমন দেখছে, ক'নে স্নন্দর না বর স্নন্দর?" অতসী প্রশংসমান চোখে বরের দিকে চেয়ে বলে।

ও' সত্যি ভয় পেয়েছে! তাড়াতাড়ি জেটীর ধার থেকে এসে পড়ে রাস্তায়।

ফুটপাথে ভীড় কমে' এসেছে; গাড়ীর রাস্তায় গাড়ীর চলাচল কম। ও' ফুটপাথের পাশ ঘেঁসে গাড়ীর রাস্তা দিয়ে চলেছে।

ক্রসিংয়ের মুখে এসে ফুটপাথে উঠে দাঁড়াল। একটা লরী রাস্তা ক্রস্ করছে।

“—অতসী, কেমন সুন্দর টাঁদের আলো!”

—‘আর কি হাওয়া—!’

অতসী মুখ ফিরিয়ে চাও। ওঃ, ওরা সব একসঙ্গে চলেছে। অশেষ, অতলা, নীতীশ—সকলেই আসছে তার পিছে পিছে।

...ওরা গঙ্গার ঘাট থেকে বেড়িয়ে ফিরছে।...অতসীর মুখে খুসীর হাসি।

—ধীরে ধীরে স্বপ্ন ফিকে' হ'য়ে মিলিয়ে গেল, ঘুম এল ঘন হ'য়ে।

জানালা দিয়ে বাতাস আসছে।...অতসীর নিদ্রিত মুখের ওপর এসে পড়েছে মেঘ-ভাঙা পাণ্ডুর টাঁদের আলো।

* * * *

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত বা স্বভাবের দ্বন্দ্ব বাইরের মনে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে' থাকে, তারই একটা প্রতিচ্ছায়া গিয়ে পড়ে অলক্ষ্যে তার ভেতরের মনে। মগ্ন-মননের মানদণ্ডে সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হ'য়ে যায় সেই আবহাওয়ার সুক্ষ ভাগ-অসমতার ক্রম। তারই ফলে, বাইরের মন যখন বাহ্যতঃ নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে, তখন ভেতরের মন থেকে সেই আবহাওয়া উঠে এসে বাইরের মনের আচ্ছন্নতায় একটা ক্রিয়মান বৈচিত্র্যের ছায়াবাকী রচনা করে' চলে। আমরা এ'কে স্বপ্ন বলি।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই অতসীর মনে হ'ল যেন কি একটা বিশেষ স্মরণীয় কথা তার মনে পড়ছে না। ওঃ কালকের সেই অন্ধক লেখা চিঠিখানা বুঝি কোথায় রেখেছে সে, এখানে বালিসের তলায় কি? না, এই যে তোষকে শুড়ের ভাঁজে, এখানে। কিন্তু এ চিঠির কথা নয়, আর কোন কিছু। কি তাঃ—না, একেবারেই মনে পড়ছে না, অথচ নিশ্চয়ই একটা কিছু।

৩

একবার মনে হ'ল, বোধ হয় ওর পাতলা ঘুমের মত খানে ওরা সব সামনের বারান্দায় জুটে কি সব বলাবলি করছিল। ঠিক, লক্ষ্মীনার্থ, নীতীশ, অতলা—ওরাই। বুঝি সেই ভাঙা টোভটা নিয়েই ওদের আলোচনা হ'চ্ছিল উল্হঃ না ধরালে আর চা খাওয়া চলবে না কি না।...উহঁ, কেন, কালই ত' টোভটা মেরামত হ'য়ে এসেছে সন্ধ্যার পর।

এবার তার মনে হ'ল—স্বপ্ন। হ্যাঁ, কি যেন একটা অদ্ভুত রকমের স্বপ্ন দেখেছিল ও' মনে পড়ছে না। না পড়ুক, কি এসে যায়। অতসী মনে মনে হাসে, এখনও ওর ছেলেমানুষি যায়নি।

ও' এবার সহজ ভাবে উঠেবাইরে এসে দাঁড়াল।

মাথা উচু করা নতুন বাড়ীটার আওতা পড়ে' ঘরে-ভেতর একটা ছায়ার অস্পষ্টতা রচনা করে রাখলেও বাইরের বারান্দায় তখন দিনের স্পষ্টতা ঝকঝক করছে। সিঁড়ির মুখে থানিকটা রোদ পড়ে' দামী আয়নার পুরু কাচের মত ঝলমল করছে রংগার অংশটুকু।

এদিকের গোল টেবলের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অতলা সেদিনের সত্তা আগত খবরের কাগজখানার নিউজ কলাম দিয়ে অলস ভাবে চোখ বুলিয়ে আনছিল। একটু পেছনে তার পিঠের আচল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে নীতীশ।

নীচের কলতলা থেকে যে ইচ্ছাকৃত কাসির আওয়াজ আসছে, তাতে বোঝা যায়, অশেষ মুখ ধোবার শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছেন।

নীতীশ এইবার দিয়ে এই তৃতীয়বার ছোটদি'র জঁচনা ধরে' টানে।—“এস ছোটদি, আমার পড়ার ঘরে গিয়ে তৈরী করিয়ে দেবে আমার প...”

বড় দি' আসছেন।...নীতীশ তৎপরতার সঙ্গে ঘোমটা যায়! বড়দি' আবার না ভাবে যে সে বুঝি ছোটদি'কে দিয়ে ক্রীমস্লেসান করিয়ে নেবার মতলব করেছে।

এমন চক্চক করছে বাইরেটা...অতসীর চোখে ব'লে লাগে। ছুঁচোখের পাতার কোণ ছুঁহাতের তলা দিয়ে রগড়ায় আর বলে, “এতক্ষণ ধরে' ঘুমিয়েছি, আমাকে কেউ ডেকে দেয়নি।

মুখ তুলে, হেসে অতলা বলে, “জামাই বাবু নিষেধ করে গেলেন : গরমে ঘুম হয়নি রাতে—ঘুমুচ্ছে।”

“ভারি গরম, না অতি?” অতসী বলল, অতলা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

অতির মুখখানা কি সুন্দর! চোখ দুটি ছেলে মানুষের মত চল্‌চলে।...অতসী ওর মুখে চোখে আর একবার চোখ বুলিয়ে আনে।...কিন্তু কেমন মন-মরা ওর মুখের ভাব!... সে সত্যি অবিচার করে ওর ওপর! অতসীর মনে মায়া হয়।

চুলগুলো কেমন অগোছালো। তার মনে পড়ে, কাল ওকে সে চুল বেঁধে দেয়নি। কিন্তু তাই বলে, কি দুটি বিছানি করে’ একটা এলো খোঁপাও ও’ বাঁধতে জানে না নিজ হাতে?

খণ্ডর বাড়ীতে গেলে কষ্ট আছে মেয়ের!...মনে মনে ভাবে, আর মুখে ডেকে বলে, “এদিকে সরে দাঁড়া ত’ অতি।”

অতলা এদিকে সরে’ না আসতেই, অতসী গিয়ে ওর পেছনে সরে দাঁড়াল। তার পর ওর এলানো চুলের গুঁহি তুলে’ নিল হাতের মুঠিতে।—“মাথা নাড়ানি, লাগবে।”

সিঁড়ির ধাপে সিঁপার বাজিয়ে অশেষ আসছেন উঠে। নীতীশ শেষবার তার ছোটটির আচলে টান দিয়ে, এক প্রকার সাক্ষাতিক গলার শব্দ করে’ চলে’ গেল তার পড়বার ঘরে।

দিদি বোনটির চুল বেঁধে দিচ্ছে।

দাঁড়িয়ে থেকেই আশ্চর্য্য নিপুণতায় দেখতে দেখতে হয়ে গেল জোড়া বিছানি আর চুড়ো খোঁপা।

—“হ্যাঁ, এখন হয়েছে—যাঃ; বিকেলে মনে করে’ চুল বেঁধে নিসু।”

“ভুগিই মনে করিয়ে দিয়ে দিদি।”...অতলা হেসে বলে।

অশেষ এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন! হাসতে হাসতে সামনে ঘুরে’ দাঁড়ালেন। একটা কৃত্রিম খাস ত্যাগ করে’ বললেন “বাঁচলুম হাঁক ছেড়ে। আমি ভাবি, চুলোচুলি হ’চ্ছে দু’বোনে! যেমন করে’ চুল ধরে’ টানছিলে।”

অতলা ফিক্ করে’ হেসে ফেলে।

অতসী হাসিকে কৃত্রিম কোপে রূপান্তরিত করে’ বলে, “বোনে বোনে বুঝি চুলোচুলি করে তোমাদের দেশে?”

অশেষ সহজ ব্যঞ্জে বলেন, “তুল করেছি—সতীনে সতীনে।”

অতসীর মুখের ভাব অসহজ হ’য়ে উঠতে চায়। মুখ ফিরিয়ে বলে’ মুখ ধুতে নীচে নেমে যায়: “অতি’ ষ্টোভটা ধরিয়ে চায়ের জল চড়া’; আমি আসছি।”

...অতসীর আশ্চর্য্য দুর্বলতা!

লক্ষ্মীনাথকে দিয়ে চিঠিখানা পোষ্ট করতে পাঠিয়ে, অতসী নীচের দরজা বন্ধ করে’ দিয়ে ওপরে আসছে। তার মুখে একটা হাল্কা ভায়মোচনের ভাব। যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কালই চিঠিটার উত্তর পাঠানো উচিত ছিল। এ সব ব্যাপারে এমন করে’ স্বযোগ এসে কমই উপস্থিত হয়। তবে, কালই ও’ চিঠি পেয়েছে—উত্তর গেল আজ; একটা দিনের দেরীতে কি আসবে যাবে এমন!

কাল এর ঢের আগেই ওরা এ চিঠি পেয়ে যাবে। অতসী ত’ যতদূর সম্ভব গুঁহিয়ে লিখেছে। এখন দেখা যাক বিধাতার কি ইচ্ছা। যদি হয়ত ভগবানেরই দয়া!...লোকটা শুধু পণ্ডিত নয়—সাধু; আমেরিকার মত অমন একটা সভ্যদেশে অতদিন কাটিয়ে এসেছে। কত জানে শোনে! তুলনা করলে—

একি! কার সঙ্গে তুলনা করতে যাচ্ছে ও’—অশেষের সঙ্গে? হিঃ!...আমেরিকা ফেরত না হ’ন, এর মত গুণী ব্যক্তি পথে ঘাটে বিকোয় না। ইংরিজীতে ‘অনাস’ নিয়ে ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট-এম-এ হওয়া চারটিখানি কথা নয়।...

অতসী বারান্দায় উঠে আবার সিঁড়ির রেলিংয়ের দিকে চায়। মেলে’ দেওয়া কাপড়খানাই বুঝি খসে’ ওখানে রেলিংয়ে গিয়ে জড়িয়ে আছে?—লক্ষ্মীনাথের যেমন কাজ। ভাগ্যে জড়িয়ে আছে ওখানটায়, না ত’ একেবারেই গিয়ে পড়তো কলতলার নোংরায়।

ওঁরই সেই নতুন নরুণপাড় কাপড়। নাঃ, লক্ষ্মীনাথকে আজ আচ্ছা করে' ধমকে না দিলে চলবে না—যত সব এড়া-ছাড়া কাজ।

রেলিংয়ের খাঁজ থেকে আলগোছে কাপড়খানা ছাড়িয়ে নিয়ে, আঙুলে কৌচাতে কৌচাতে ও' ওপরে উঠে' আসে।

কাপড়টা আলনার রাখতে গিয়ে অতসী গোটা' আলনা-টাই গোচাতে শুরু করে। এমন বিস্তী অগোছানো! কাপড়গুলো, গেম্জি, ফতুয়া, পাঞ্জাবী কা'ট সব পৃথক পৃথক ভাবে সাজিয়ে রাখছে।...এই গেম্জিটার বুকের দিকের এতটা সেলাই খুলে' গেছে, ঐ পাঞ্জাবীটার নীচের দিকের ছ' ঘর বোতাম নেই।

গেম্জী আর পাঞ্জাবীটা হাত বাড়িয়ে খাটের ওপর রাখে। এখনই সে সেলাই করে', বোতাম পরিষে রাখবে।...অতসী আপনাকে অপরাধী ভাবে, এমন করে' চোখ এড়িয়ে যাওয়ার অমনোযোগিতা ওর পক্ষে অপরাধ। আলভোলা মাছুষ কিছু মুখে বলেন না, তাই...

আঃ—এই সিন্ধের চাদরটাতে যে এতবড় একটা ফুটো হ'য়ে রয়েছে! এটাকেও রিপু না করলে নয়। এক হাতে চাদরটাকে তুলে' কাঁধের ওপর ফেলল, অস্ত্র হাতে ভেজা গামছাখানা আলনার দাঁড় থেকে উঠিয়ে হকের সঙ্গে লটকিয়ে রাখল।

সেলাইয়ের সরঞ্জাম বা'র করছে, দোরগোড়া থেকে অতলা মুহূর্তে বলে, “দিদি, ও ঘরে বড় গরম।”

অতলার হাতে একখানা কি' বই, মাঝখানে আঙুল চুকিয়ে বইয়ের পাতা মোড়া। অতসী চোখে বইখানার দিকে চায়, মুখে জবাব দেয়, “এ ঘরে আসতে আবার পার্ব-মিশান নিতে হয় না কি?”

“না—অম্নি,” বলে' হেসে অতলা এসে মেঝেয় পাতা মাছুরের ওপর বসে।

“বই পড়'বি ত' খাটে গিয়ে বস, আমি এখানে সেলাই নিয়ে বসব।”—অতসী বলে।

অতলা বইখানা কোলের ওপর রেখে বলে, “সুচে সূতো পরিষে দেব দিদি, তোমার কষ্ট হয়।”

সূচ-কোড়া সূতোর গুলতিটা ওর হাতে দিতে দিতে অতসী বলে, “দেখ, ত', মাছুরটার জামা-চাদরের কি

দুর্দশা! ভূই আর তোর জামাইবাবু একটুও কেয়ার নিসনে আগের মত।”

অতলা মনে মনে খুসী হয়। এরকম কথা শুনে তার খুব ভালো লাগে। বলল, “দাও দিদি, সেলাইট' আধাআধি ভাগ করে' নি।”

অতসী হাঁটুর ওপর চাদরের ছেঁড়া অংশটা টান করে' পেতে রিপু করছে; অতলা পাঞ্জাবীর বোতামের ঘর সা'ব করে' গেম্জীটার ফোঁড়-খোলা জোড়ের মুখ সেলাই করতে কেবল আরম্ভ করল।...কাঁকে কাঁকে ছ' বোনের কথাবার্তা চলছে ছ' একটি করে'।

—“উলটিয়ে নিয়েছি' ত' গেম্জীটা?”

অতলা মাথা ঝাঁকাল।

অতসী বিজ্ঞতার স্বরে বলল, “আগে ‘বকেয়া’ ফোঁড় দিয়ে নিয়ে তারপর খুব মি'ছি করে' সেলাই তুল'ব, বুঝ'লি?”

অতলা বলে, “তা'ই কর'ব; আমি কি নতুন সেলাই শিখ'ছি দিদি!”

অতসী হেসে বলে, “সে কি,—ভূই যে এবজন খলিকা!”

“কক্ষনো না, আমি কি ওদের মত আঙুলের মাঝামাঝি টুপী পরি?”—ও প্রতিবাদ করে'।

খানিকটা সেলাই চলল নীরবে।

অতলা বলল, “জামাইবাবু—দিদি, বড্ড সে-ফলে ধরণের ইয়ে পরেন।”

—“কোন' ইয়ে?”

—“এই দেখ' না, এরকম গেম্জী আজকালকের দিনে কেউ পরে না। আমাদের নীতের গায়েরটা কেমন সুন্দর...কামিজের মত এ'দুর পর্যন্ত হাতা নামানো নয়।”

অতসী একবার চোখ তুলে'ই আবার রিপূর দিকে আধিনিবেশ করে।—“মন্দ কি, উনি অম্নি পছন্দ করেন।”

অতলা আঙুল উচিয়ে বলে, “কিন্তু ঐ ম'ডা'তা প্যাটার্ণের পাঞ্জাবীটা একেবারেই চলতে পারে না দিদি!... আজকাল সবাই পাঞ্জাবী পরে—বোতামের ঘর গান্ধী-মারি নয়, কাঁধের দিক দিয়ে একপাশে।”

“কি পছন্দ রে!”...অতসী মুখ-তুলে' বলে, “কি নে বলি

আর কেমন যে পছন্দ ! কলেজের ছেলেদের গায়ে দেখে-
ছিস্ বুঝি ? তোর জামাইবাবু ত' কলেজে পড়তে যান
না, পড়াতে যান ।”

অতলা সামনের দিকে মাথা নেড়ে বল্ল, “হ্যাঁ,
প্রোফেসর হ'লেই তাঁর মাথার চুল অম্নি সঙ্গে সঙ্গে পেকে
সাদা হ'য়ে যায় কি না ।”

অতসী খুসী হ'ল। সত্যি, তার স্বামী ঘে-বয়সে
অধ্যাপনা করেন, সে-বয়সে বেশীর ভাগ মানুষ অধ্যয়নই
করে ।

অতসীর স্বামিগর্ভ তার মুখে কোতুকের হাসিতে
রূপান্তরিত হয়। বলে, “আচ্ছা, কাপড় আনিয়ে দেব,
অম্নি চঙের ছটো পাঞ্জাবী তৈরি করিস্ । একটা দিস
তোর জামাইবাবুকে, আর একটা তুলে' রাখিস্ তোর—”

জামসেদপুরের চিঠিখানা ঘেন মনের চোখে পড়ে
অতসীর...কোতুকের স্বরে স্নেহ মিশিয়ে বলে, “তোর
বরের জন্মে ।”

অতলা সেলাই বন্ধ করে' বিরক্তির স্বরে বলে,
“তোমাকে বলি নি দিদি, যে ও সব কথা আমার ভালো
লাগে না ।”

অতসীর রাগ হয়।—“ভালো লাগে না—মানে ?
আইবুড়ো হ'য়ে থাকবি নাকি চিরদিন ।”

অতলা ঠোঁট কুঁচকে বলে, “দোষ হয় না এমন কিছু
তাতে । এই ত' পড়'ছিলুম 'উইমেনস্ মুভ্‌মেন্ট' বইটার,
যে—”

অতসী অস্বীকৃতির ভঙ্গীতে বলে, “যেথেকে দে'ও সব
বিদেশী মেয়ের কথা...ম্যান্‌লি ওম্যান্‌!...বিলিতি
সাফ্রেজিষ্টদের মত গলায় নল লাগিয়ে জল গেলাতে হবে
নাকি এদেশী মেয়েদেরও ? তুই তার লীডার হবি ।”

অতসীর মুখে স্পষ্ট অসহিষ্ণুতার চিহ্ন। অতলা আত্ম-
বিক্রপের স্বরে বলে, “বর আসছে আমার চৌদলে
চেপে...।”

এবার ছ'জনেই নিঃশব্দে সেলাই করে' চলে । ঘড়ির
টিক্‌টিক্‌ শব্দ আর ওদের নিশ্বাসের শব্দ। অতলা ভাবে :
দিদি ঘেন আমাকে বিয়ে দিয়ে দূরবার করতে পারলে
বাচে ! অতসী ভাবে : কি জানি ওর মনের ইচ্ছা কি !

চুল-বাঁধা আর ঘর-গোছানো সারা করে' ওরা কল-
তলায় চলেছে । নীচের দালানে পা' দিয়েছে, অশেষ এসে
বাড়ীতে ঢুকলেন—সঙ্গে একজন ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রী আর
একটা মূটের মাথার একজোড়া ক্লাইড্‌ ফ্যান ।

—“এই উঠ' যাও এ' দোস্তলামে—।”

মূটেটা উঠে চলল ; মিস্ত্রীটা অহুসরণ করল তার ।

অশেষ অতসীকে লক্ষ্য করে' বললেন, “ছোটো ফ্যান
আনলুম ; লাইন ঠিক করাই আছে, মিস্ত্রীটা এখনি কিট
ক'রে দিয়ে যাবে ।”

—“ছোটো ফ্যান—কোথায় কোথায় বসবে জামাই
বাবু ?”

—“একটা এ' আমাদের ঘরে, আর একটা সেই
গোয়াল ঘর—গোক থাকে যেখানে ।”—বলেই বক্তা উচ্চ
হাস্য করে' উঠলেন ।

অতসী না হেসে বল্ল, “যাও,—ওরা গিয়ে দাঁড়িয়ে
থাকবে । অনেকগুলো টাকা খরচ করে' এলে...।”

—“গরমে অস্থখ করলে আরো বেশী খরচ পড়'ত ।”

অশেষ ওপরে উঠে' গেলেন ; ওরা কলতলায় নামল ।

কলঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে অতলা বল্ল,
“জামাইবাবু অম্নি বেহিসেবী খরুচে, দিদি । আমাদের
ঘরে ফ্যান বসাবার কোনই দরকার ছিল না ।”

“কেন, তোরা কি মাছুষ ন'স্ ।” বলে' অতসী তখনই
কথাটাকে ঘুরিয়ে বলে, “ঠিক আমাদের নিজেদের জন্মেই
ফ্যান আনলেন না উনি, আমাদের বাড়ীতে—”

অতসী ইতস্ততঃ করে, এখনই ওকে কথাটা বলবে
কি না ।

অতলা ঔৎসুক্যের স্বরে বলে, “আমাদের বাড়ীতে—
কি, দিদি ?”

—“একজ গেষ্ট্‌ আসছেন কি না ।”

—“গেষ্ট্‌—মানে, কে ?”

মুখে চোখে সস্ত্রমের ভাব ফুটিয়ে অতসী বলে, “সম্মানিত
অতিথি—যে-সে লোক ন'ন ।...তোকে ত' দেখাতামই
চিঠিখানা, ছি'ড়ে' ফেল'লি তুই টানাটানি করে'...।”

অতলার কোতুহল সন্ধিষ্ট হয়।—“সেই যে কোন
আমেরিকা-ফেরত স্বামীজি ?”

“হ্যাঁ, সেই স্বামী।” অতসী সাবধান হয় অতিরিক্ত কিছু না বলে ফেলে এখন। বলে, “তোরা জামাই বাবুর জানা মন্তবড় পণ্ডিত মানুষ। আর’ সন্ন্যাসী বলে যে চিমুটে কৌপীনধারী এমন কিছু নয়—ভদ্রলোক। আমেরিকা থেকে অনেকদিন পরে এদেশে ফিরেছেন। কলকাতায় আসছেন তাঁর কি কাজে, এখানে কয়েকদিন থাকবেন।—কথা কচ্ছিস্ না যে?”

“তা’ আসুন।” অতিরিক্ত আর একটি কথাও ও’ বলে না।

...ওর মন যেন তলে তলে হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হ’য়ে পড়ে। ওর মনে হয়, এ বাড়ীতে যেন ওরা ক’জন মানুষ ছাড়া অপর কোন ব্যক্তির স্থানের সম্মান হ’তে পারে না, এবং তা’ অস্বাভাবিক।

অতলার খমকে’ খেমে যাওয়ায় অতসী বিস্মিত হয়। হঠাৎ অমন চূপ করে গেলি যে! কি ভাবছিস্?”

“—আমার ঘরখানা হয়ত’ ছেড়ে দিতে হবে তাঁকেই তাই।...”

অতসী হেসে বলে, “ক’দিনই বা থাকবে লোকটা! ...নীতীশের ঘরে অস্থবিধে হয় আমাদের ঘরেই থাকবি।”

তারপর—

সেই সম্মানিত অতিথি একদিন সত্যই এসে উপস্থিত হ’লেন অধ্যাপকের গৃহে।...

সে দিনও অতসী তার প্রত্যাশিত পত্রোত্তর পায় নি যার জন্তে নীতীশকে দিয়ে সে বেচারী পিওনকে পর্যন্ত এ কয়দিনে অতিষ্ঠ করে’ তুলেছে। আজ আর পিওনের ভৎসায় নয়, স্বয়ং অশেষক পাঠিয়ে দিয়েছে সে সরাসরি পোষ্টাফিসে খোঁজ করতে।

নীতীশ তার পড়বার ঘরে; অতসী অশেষের পরিত্যক্ত রেল্ দিয়ে অতলার হাতের নথ কেটে দিচ্ছে—ও’ হুচোখে অমন বাঙল নথ দেখতে পারে না।

এমন সময় লক্ষ্মীনাথ—

আসলে বাঙালী, কিন্তু চুলছাঁটা ও জুল্পীর কায়দায় দেখায় ঠিক হিন্দুস্থানীর মত। প্রথম সাক্ষাতে যে কেউ ওকে হিন্দীতে সম্বোধন করে এবং ও’ আদর্শেই হিন্দী জানে না বলে’ হাস্যকার রকম বিভ্রাট বাধিয়ে বসে অনেক সময়। ...লক্ষ্মীনাথ গিয়েছিল কয়লার বাজার তদ্বির করতে নীচে। টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে কয়েকবার কি যেন বলল কাকে—শোনা গেল ওপর থেকে।

অতসী বলে, “টেঁচায় কেন নীচে থেকে?”

অতলা বলে, “বোধ হয় কয়লাগুলার সঙ্গে—।”

হুমদাম করে’ উর্দ্ধ্বাসে দৌড়ে উঠে’ এসে দাঁড়াই লক্ষ্মীনাথ দোরগোড়ায়।

ওরা দুজন চকিত হ’য়ে চোখের প্রাণে বলে : কি রে!

লক্ষ্মীনাথ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, “পেশোয়ারী—দিদিমণি, একটা পেশোয়ারী চুকেছে বাড়ীর ভেতর... আমি বাংলাে দিলুম কিন্তু উল্টে সে আমাকে ধমকায়!”

অতসী ভয় পায়।—গুণ্ডা-টুণ্ডা নয় ত’? ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, “নীতে’কে ডাক দে নীগুগির, হতভাগাটা।”

অতলার খুব বেশী সাহস। “দেখছি কেমন পেশোয়ারী!” বলে’ বেরিয়ে আসে দৃষ্ট ভঙ্গীতে।

ঠিক সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অতলা; নীচে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই লোক হাতে একটা স্ট্রট্‌কেস্, বগনে এ্যাটাচিকেস্ একটা।

“তোম’ কোন্‌ ছায়?” বলে’ ফেলে’ই ও’ সংশয়ী হয়।

চোগা আর পাগড়ী পরা থাকলেও বেশ ভদ্রলোকের মত চেহারা। পাগড়ীটা কেমন গিরমাটি রঙের! লম্বা চুলের গুছি পাগড়ীর শাসন না যেনে ছড়িয়ে আছে কাঁধের ওপর, হয় ত’...

লোকটি বাঙালীর ভাষাতেই বলে, “প্রোফেসার র... কি থাকেন না এ বাড়ীতে—?”

অতলা এক পা পিছিয়ে পাশ ফিরে দাঁড়ায়। এদিকে দিদির দিকে চোখের ইঙ্গিত করে, ওদিকে আগন্তুককে বলে, “হ্যাঁ; তিনি বেরিয়েছেন একটু আগে। আপনি—”

লোকটি বলে, “আমি জাম্‌সেদপুর থেকে আসছি।... সেনের ভাই।”

অতসী মাথার অবিস্মৃত কাঁপড়টা একটু টেনে এঁদিয়ে আসে। মুহূর্ত্তে ‘সব’ বলে’ অতলাকে সরে’ দাঁড়াতে ইসারা করে। যুক্তকর তুলে’ অতিথিকে নমস্কার করে’ সৌজন্নের হাসিতে বলে, “আপনিই স্বামীজি—আস্থান—আস্থান, উঠে’ আস্থান ওপরে।”

অতিথি প্রতিনমস্কার করে’ উঠে’ আসতে আসতে বললেন, “ভূস্বামী কি গোঁস্বামী—কোন্‌ স্বামীর বলে ফেলবেন জানিনে! আমি দেবনাথ; ইচ্ছে ফলে দেবানন্দ বলে’ও ডাকতে পারেন।

অতলা সাক্ষেতিক চোখে দিদির মুখের দিকে একবার চেয়েই সামনের ঘর দিয়ে দ্রুত সটকাই করে’ ওদিকের বারান্দায় গিয়ে পড়ে।

অতসী সলজ্জ সম্মমে বলে, “কিছু মনে করবেন না, আমার বোন আপনাকে চিন্তে না পেরেই...”

অতিথি হেসে একপাশে মাথা ঝাঁকালেন।

অতীত বাংলার শৌর্য-বীর্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

জাতির অতীত ইতিহাস ও গৌরবময় কাহিনী জাতির প্রাণকে আশার উদ্দীপনা ও তেজোদীপ্ত শক্তিমত্তা দিয়া মাতাইয়া তোলে। অতীত শৌর্য-বীর্যের কথা স্মরণে জাতির অন্তর ও মন তেজোদীপ্তিতে রঞ্জিত হইয়া উঠে, এমন কি, মরণোন্মুখ জাতির দেহেও নব বল ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা বাদশাহী আত্ম-বিস্মৃত জাতি—বাংলার অতীত গৌরব-গাথা, শৌর্য-বীর্যের কাহিনী, শিক্ষা সভ্যতার কথা জানিবার জন্য আমাদের ঔৎসুক্যের একান্ত অভাব।

বাংলা দেশের অধিকাংশ ঐতিহাসিক শ্রাম, চীন, তিব্বত, বৃহত্তর ভারত অথবা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা বাংলার ঐতিহাসিক গবেষণায় ততখানি পরিশ্রম করেন না। অদ্যাপি বাংলার ধারাবাহিক সত্যকার ইতিহাস রচিত হয় নাই। ইহা কি বাদশাহীদের গভীর লজ্জার কথা নয়?

বাংলার অধিকাংশ ঐতিহাসিকই বলিয়া থাকেন যে, বাংলা দেশের ইতিহাস রচনার উপযোগী উপাদান ও উপকরণ নাই, কাজেই বাংলার ইতিহাস রচনা করা দুঃসাধ্য কাজ। এ কথা সত্য কি? আমরা লাইব্রেরীর শত শত বইএর সাহায্যে ‘খিসিস’ লিখিয়া ‘পি-এইচ-ডি’ উপাধির জন্য যতখানি পরিশ্রম করি, তাহার তুলনায় বাংলার অতীত গৌরবময় কাহিনী জানিবার জন্য কতখানি পরিশ্রম করি?

বাংলার শৌর্য-বীর্যের কাহিনী উদ্ধার করিতে অপরি-সীম আগ্রহ ও যত্নের দরকার। এবং তজ্জন্ম কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। কঠোর পরিশ্রমের সহিত অনু-সন্ধান করিলে বাংলার ইতিহাস রচনার যথেষ্ট উপাদান ও উপকরণ পাওয়া যাইবে। বাংলার পল্লীর ধ্বংসস্তুপে, প্রাচীন পুথি, গ্রন্থের মূর্তি ও শিলা লিপির মধ্যে বাংলার সত্যকার ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। পাহাড়পুর ও মহাস্থানের ধ্বংসস্তুপগুলি হইতেই যে তথ্য আবিষ্কৃত

হইয়াছে, তাহাই বাংলা দেশের ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। আমরা যদি বিশেষ অবধানতার সঙ্গে প্রাচীন ধ্বংসস্তুপগুলির মধ্যে ও বাংলা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য কিম্বদন্তীর সংগ্রহের ভিতর আমাদের অনুসন্ধান চালাইতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গভূমির প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা যাইবে। বাংলার পল্লীতে যে সব গাথা অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে, সেই সব পল্লী-গীতিকার ভিতর ও বাংলার শৌর্য-বীর্যের কথা নিহিত আছে। আমরা কয়জন এই গুলির খোঁজ করি? বহু কায়িক শ্রম ও মানসিক উৎকর্ষের সহিত সন্ধান করিয়াও যদি কিছু না পাওয়া যায়, তাহাও কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। এখনও তো উত্তর দক্ষিণ মেরুর প্রদেশগুলি আবিষ্কারের জন্য কত পাশ্চাত্য অভিযানকারী যুবক প্রাণ দিতেছে।

বঙ্গভূমির শৌর্য-বীর্যের কথা বলিতে গেলেই সর্ব প্রথম বরেন্দ্র ভূমির কথা মনে পড়ে। বহু ঐতিহাসিক-গণের মতে সমগ্র বাংলা দেশের ইতিহাসে বরেন্দ্র-মণ্ডলের স্থান অতি উচ্চে। এই বরেন্দ্রী মণ্ডলেই বাংলা দেশের শিক্ষা ও সম্ভ্রুতির আরম্ভ হইয়াছিল। বরেন্দ্রভূমি গুপ্ত ও পাল বংশীয় রাজাদের সময়ে যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস অনেকেই অঙ্কিত করিয়াছেন। বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন নগর-নগরীর ধ্বংসাবশেষ এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শনও এই বরেন্দ্রভূমিতেই পাওয়া গিয়াছে। এই ভূমিতেই সংস্কৃত সাহিত্যের একটা বিশেষ রচনা-শৈলী অর্থাৎ গোড়ীয় রীতি এবং প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের গোড়ী, বঙ্গালী প্রভৃতি সুরের সৃষ্টি হইয়াছিল।

শিল্পকলায় বরেন্দ্রভূমি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই পাল রাজাদের শেষ সময় পর্য্যন্ত মগধে শিল্পের চরম উন্নতি হয় এবং বঙ্গদেশেই যে মগধের চিত্রাগার ছিল ইহা ক্রমশই প্রমাণিত

হইতেছে। পাল রাজত্বের পূর্ব হইতেই গোড় উত্তর ভারতের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ও বর্দ্ধিস্থ নগর বলিয়া বিদেশীয়-গণের আকর্ষণভূমি ছিল। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশ চারু শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। দেবপালের* রাজত্ব কালে আমরা দুইজন, প্রতিভাশালী ধীমান ও তৎপূত্র বীতপালের পরিচয় পাই। ভিক্ষু তারনাথ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবপালের রাজত্বের সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে নিপুণ-দক্ষ শিল্পী ধীমান ও তৎপূত্র বীতপাল ধাতুশিল্পে, ভাস্কর্য্যে, চারুকলায় বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। বীতপালের শিষ্য মগধেই বেশী ছিল। ধীমানের শিল্প-পদ্ধতিকে ‘পূর্ববিভাগ’ এবং বীতপালের পদ্ধতিকে “মধ্যদেশ শিল্প বিভাগ” বলা হইত। দশম শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় গোপাল সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময়ের একখানি সচিত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই সময় তিব্বতীয়েরা উত্তর বঙ্গ আক্রমণ করিতে বঙ্গশিল্পের অধঃপতন শুরু হইয়াছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই তিব্বতীয়েরা বাংলায় প্রবেশ করিতে থাকে। অনেকে অনুমান করেন যে এই সময় হইতেই বঙ্গশিল্প নেপাল ও তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এলিস্ গেটি লিখিয়াছেন—বাংলায় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তৈজসপত্রে মগধরীতি অনুযায়ী যে চিত্রাঙ্কন হইত সেই চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি তিব্বত এবং নেপালে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভিক্ষু তারনাথও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে দেবপালের সময় হইতেই নেপালের শিল্প বঙ্গশিল্পের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এবং তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের বর্তমানরূপ অতীশই প্রথম প্রবর্তন করেন। তখন তিব্বতের শিল্পও পালশিল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। আমরা নেপাল ও তিব্বতের মন্দিরগাত্রে লক্ষ্যমান চিত্র ও সমসাময়িক পালশিল্প বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি। (প্রবাসী, ১৩৪১)

বরেন্দ্র ভূমিই জননায়ক গোপাল, রাষ্ট্রপতি দিব্য ও রাজা ভীমের লীলাক্ষেত্র বলিয়াই, বরেন্দ্রভূমি সম্বন্ধে এত গুলি কথা বলার আবশ্যক হইল। বরেন্দ্রদেশ শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিল্পকলায় যেমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সেই

রূপ শৌর্য-বীর্য্যেও গৌরবময় সমৃদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রাজার ও রাজপুরুষগণের লীলাক্ষেত্র। এই সকল নৃপতি ও রাজপুরুষগণের মধ্যে মহান উদ্বেগ সম্পাদনের জন্ত যথাসম্ভব সিন্ধু মহাপুরুষের অভাব নাই। কিন্তু আদৌ স্বেচ্ছায় নহে, জনসাধারণ দ্বারা আহৃত বা নির্বাচিত হইয়া রাষ্ট্রীয় সাধনা-সমন্বিত অবতীর্ণ হইয়া বাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ মহাজনের উদাহরণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে স্থলভ নহে। সৌভাগ্যক্রমে বরেন্দ্রভূমিতে এইরূপ দুইজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই দুইজনের একজন পাল রাজবংশের প্রথম রাজা গোপাল দেব, যিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জনসাধারণ কর্তৃক অরাজকতা নিবারণের জন্ত রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে সংঘটিত রাজ-বিপ্লবের অধিনায়ক দিব্য।

জননায়ক গোপাল

অষ্টম শতাব্দীতে অরাজকতা নিবন্ধন অত্যাচার, উৎপীড়ন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গোড়ার বীরগণ গান্ধারাণী বীরগণের জন্মভূমি হইতে সামন্তরাজ্য দমিত বিষ্ণুর বংশধর গোপালের উন্নত শিরে রাজ-মুহুর্ত তুলিয়া দিয়া বাংলার ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় সূচনা করিয়াছেন। দেশে অরাজকতার দরুণ বিষম্পতি, মণ্ডলাধীশ সামন্ত নৃপতিগণের অত্যাচারে প্রকৃতিপ্রসূ বিদ্রোহী হন এবং গোপাল দেবকে জননায়ক নির্বাচিত করেন। তৎকালীন দেশের পরিস্থিতির বিচার করিয়া অধিবাসীবৃন্দ গোপালকে জননায়ক নির্বাচিত করিয়া আশ্চর্য্য দূরদর্শিতা, স্বদেশপ্রীতি ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

নির্বাচিত জননায়ক গোপালদেব অশেষ গুণের এবং অসামান্য শৌর্য-বীর্য্যের অধিকারী ছিলেন। অসাধারণ রণনৈপুণ্যের সঙ্গে বিনয় না থাকিলে গোপাল কখনও জনসাধারণের ভক্তি-বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিতেন না। নির্বাচনের পর বাহু ও আভ্যন্তরীণ শত্রুদমন করিয়া এবং আশঙ্ক্যমত রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়া গোপাল দেব

রাষ্ট্রকে শান্তিস্থ দান করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। গোপালদেবের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বংশধরগণ ক্রমে তাঁহাকে বুদ্ধদেবের সমান আসনে উন্নীত করিয়াছিলেন। যিনি এক সময়ে অরাজকতা নিবারণের জন্ত জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন, এবং রাজা নির্বাচিত হইয়া যিনি জনসাধারণের আশা পূরণ করিয়াছিলেন তিনি বৌদ্ধত্ব লাভ না করিয়া থাকিলেও বুদ্ধদেবের চরিত্রের অনেক গুণ যে তাঁহাতে বর্তমান ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্রপতি দিব্য

প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক গোপালের প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন শত বৎসর পরে বাংলায় আর একটি আশ্চর্য্য রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল। এই রাষ্ট্র বিপ্লবের ‘অনন্ত সামন্ত চক্রের নির্বাচিত নায়ক ছিলেন দিব্য।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহীপতি প্রথম মহীপাল স্বর্গারোহণ করিলে তৎপুত্র নয়পাল ১০২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভ্যন্তর কালব্যাপী রাজত্বের পর তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই সময়ে পালরাজগণ অপেক্ষাকৃত হীনবল ছিলেন। বিরাট নামক স্থানের প্রতিপত্তিশালী সামন্ত রাজ দিব্য তাঁহার ‘নৌকাধ্যক্ষ’ বা নৌ সেনাপতি ছিলেন। ইহারই বাহুবলে চৌদীপতি কর্ণ পরাজিত হইয়া বিগ্রহ পালের হস্তে স্বীয় যৌবনশ্রী নারী কন্যা সমর্পণ করেন। বিরাট পতি দিব্য ক্রমে স্বীয় অপূর্ণ ভূজবল প্রভাবে পালরাজ গণের ‘মহাবলাধ্যক্ষ’ বা প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। দিব্যের ‘ভীমা’, ‘পত্রপুতা’, ‘গন্ধরা’ প্রভৃতি রণ পোত সমূহ ভাসমান তিত্ত অলাবুর দ্বারা গদা-করতোয়া রক্ষ সর্বদা পরিশোভিত রাখিত। তাঁহার রাজ্য মধ্যে ‘নাবতা ক্ষেত্রী’ বা পোত নির্মাণ স্থান ছিল। তিনি স্বয়ং অস্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং মন্ত্র-বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষ গুণী জনের আশ্রয়স্থল ছিল এবং বিশাল ভূজবল সর্বদা শত্রুপক্ষের ভীতিস্থল ছিল। তাঁহার রাজ্যে তৈবজ্য বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজাজ্ঞকরণে দিব্যের ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট উদারতা ছিল। বিরাট রাজ্যে হিন্দু

মন্দির ও বৌদ্ধমঠ পরস্পরের পার্শ্ব মঠে থাকিয়া বর্ণাশ্রমী হিন্দু ও বৌদ্ধ শ্রমণের সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করিত। দিব্যের ভ্রাতৃপুত্র ভীম তখন পদৌ নামক স্থানের সামন্ত ছিলেন। দিব্যের প্রজারঞ্জন খ্যাতির সহিত তাঁহার বীরত্ব খ্যাতিও দিগ্ভিত্তি আলোকিত করিয়াছিল। তাঁহার এই ‘ভূজশ্রী’ তৎকালীন বীরগণের সদা কাম্য ছিল।

স্বল্পকাল রাজত্ব করিয়া বিগ্রহপাল পরলোক গমন করেন; কর্ণের কন্যা পটুমহিবী যৌবনশ্রীর গর্ভে মহীপাল ও শূরপাল এবং রাষ্ট্রকূট-রাজকন্যা মোহিনী দেবীর গর্ভে রামপাল নামক কুমারজয় জন্ম গ্রহণ করেন। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর মহীপাল পাল-রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এই বংশে এক নূতন নাটোর অভিনয় আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ মন্ত্রিবংশ পুরুষাত্মক্রেম পালরাজগণের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। প্রবল শক্তি সম্পন্ন মন্ত্রিগণের নিকট স্বয়ং সম্রাট ‘সচকিত ভাবে’ সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। বড়-রিপু পুজারত মহীপালের ইহা অসহ্য হইল। তিনি সর্বপ্রথমে মন্ত্রিবর্গের ক্ষমতা বিলোপের চেষ্টা করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রিবর্গ একে একে তিরস্কৃত ও বহিস্কৃত হইলেন। ছুটমতি বৌদ্ধ, ভিক্ষু ও শ্রমণগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিলেন। অনুভবাদীর দলে রাজসভা পরিপূর্ণ হইল। পবিত্র বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা মন্ত্রের ব্যতিচার ঘটিতে লাগিল। বহুকালের ক্রুদ্ধ ভোগ-বিলাস-বাসনার স্রোত পুনরায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল। বর্দ্ধিত করদানে অস্বীকৃত প্রজা-বন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। হিন্দুর উপর অকথ্য অত্যাচার হইতে লাগিল। কোথাও দেবদেবীর মন্দির চূর্ণ হইল, কোথাও অভয়স্তরঙ্গ বিগ্রহ স্থানচ্যুত হইলেন। উচ্ছ্রাল সৈন্যের পরিভ্রমণে প্রজার সর্বনাশ হইতে লাগিল। রাজকুমার শূরপাল ও রামপালকে ভবিষ্যৎ কটক মনে করিয়া ছুটমতি মন্ত্রিগণের প্ররোচনায় তাঁহারের প্রাণ বিনাশার্থ মহীপাল গুপ্তবাতক নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে অকৃত কাণ্ড হইয়া শেষে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতঃ পৌণ্ড বর্দ্ধন দুর্গের নিভৃত তমসচ্ছন্ন কক্ষে আবদ্ধ করিলেন। উচ্ছ্রাল রাজার ব্যবহারে ‘গুপ্তচর’, ‘চৌরদ্রবিক’, ‘মহাপ্রতীহার’, ‘বলাধ্যক্ষ’ প্রভৃতি রাজপুরুষগণ অপমানিত হইলেন। এমন কি, মহাবলাধ্যক্ষ দিব্যও অপমানিত ও সেনাপতির পদ

হইতে বিচ্যুত হইলেন। এইরূপ পাশব শক্তি-প্রভাবে চতুর্দিকে অশান্তি উপদ্রব মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বঙ্গভূমিকে গ্রাস করিতে উত্তত হইল। মহীপালের অত্যাচার এইরূপে চরম সীমায় উপস্থিত হওয়ায় প্রজাবর্গ নানাস্থানে সমবেত হইতে লাগিল। রাজ্যের নানাস্থানে, গ্রামপ্রান্তে, বিপনি সমূহে রাজ-অত্যাচার কাহিনী বিবৃত হইতে লাগিল। সর্বত্র রাজার প্রকৃলে ঘোরতর সমালোচনা চলিতে লাগিল। এমন কি, পুরনারীরা দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্মের ভিতরও মহীপালের অত্যাচারকাহিনী গাহিতে লাগিলেন; এই কথা পরবর্তী কালে প্রবচনরূপে পরিণত হইয়াছে, যাহা “ধান ভানতে মহীপালের গীত” বলিয়া পরিচিত।

ক্রমে ক্রমে সামন্ত নরপতিগণ একত্রীভূত হইতে লাগিলেন। বিরাটপতি দিব্য, তাঁহার অমুজ রুদ্র (রুদক) পদীরাজ ভীম, রাজনগরীর গোবর্দ্ধন, ফনির অধিপতি হরি, দেদপুররাজ, দেবীকোটপতি, সর্বেশ্বর নগরীর মহারাজ প্রভৃতি পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে লাগিলেন। রাষ্ট্রনীতি বিশারদ বীরবর দিব্য দেখিলেন হিন্দুধর্ম বিপন্ন হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট বিকৃতি ঘটয়াছে। স্বয়ং সম্রাট পরম্পাপহরণকারী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, দেশের সর্বত্র হাহাকার, প্রজার ধন মান প্রাণ বিপদাপন্ন। একদিকে ধর্ম ও দেশ, অত্রদিকে দুষ্কার্যরত সম্রাট, কাহাকে রক্ষা করা প্রয়োজন তাহা এই মহানায়ক কিছু দিন হইতে চিন্তা করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন বঙ্গের এই ‘অনন্ত সামন্তচক্র’ ও ‘বরেন্দ্রের সমগ্র প্রজাপুঞ্জ’ তাঁহার নেতৃত্বে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে বন্ধপন্থিক হইয়াছে তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না।

মহানায়ক দিব্য উত্তরোত্তর ‘ধর্মযুদ্ধে’ জয়ী হইতে লাগিলেন অবশেষে একদিন সম্রাট সৈন্য ‘ভয়ভীতরিক্ত, মুক্ত কণ্ঠে’ হইয়া পলায়ন করিল। সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। সেদিন জলোচ্ছ্বাসময়ী বীচিভঙ্গ করতোয়ার স্বচ্ছ সলিলরাশি বঙ্গবীরগণের হৃদয় শোণিতে রক্তিমাত হইয়া উঠিয়াছিল। দিব্য পরিচালিত বঙ্গসৈন্য জয়লাভ করিল।

* * * *

এই সময় রাজকুমারদ্বয় শূরপাল ও রামপাল কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। রামপাল তথা হইতে রাষ্ট্রবিপ্লব ও যুদ্ধের

সংবাদ যথাসম্ভব প্রাপ্ত হইতেন। যখন তিনি জ্ঞান পারিলেন যে মহানায়ক দিব্য পরিচালিত সৈন্যের নিঃসম্রাট পরাজিত হইতেছেন তখন তাঁহার বুদ্ধিতে বলা রহিল না যে এই উদ্বেলিত প্রজাশক্তির নিকট মহীপাল সিংহাসন শ্রোতের তৃণের তায় ভাসিয়া যাইবে।

কিন্তু তিনি দূরদর্শী হইলেও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-প্রহরী ছিলেন। প্রজাশক্তির এই উন্মেষ তাঁহার অমনঃপূত হইল না। কারারক্ষীকে প্রলুব্ধ করিয়া পলায়ন সহ কারাগার হইতে রাষ্ট্রকূট রাজ্যে পলায়ন করিয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ বাঙ্গালী প্রধানগণ যথাস্থানে অবসানে কারাগারের লৌহ কপাট উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন যে শূরপাল বা রামপাল তথায় নাই। জাহাঙ্গীর শিরে রাজমুকুট স্থাপিত হইবে?

পুনরায় সামন্তবর্গ সম্মিলিত হইলেন—প্রজাবর্গ আহূত হইল। স্থির হইল বরেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনীতিবিশিষ্ট সামন্তপ্রধান মহান নেতা দিব্য জননায়ক দিব্য সিংহাসন মুকুটিত গঙ্গাকরতোয়া-হার-আভরণা বিশাল গোড়বন্ধে অগণিত প্রকৃতিপুঞ্জ ও সামন্তচক্রের মহিমাম্বিত প্রভৃতি স্বরূপ রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এবং প্রতিষেধিত করতোয়ার বিশাল তটে অনন্ত সামন্তসৈন্য প্রজাপুঞ্জের সমক্ষে তাঁহাদের প্রদর্শিত আত্মগতোতা রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবে। একাদশ শতাব্দীতে পুনরায় বাংলার প্রজাশক্তির অশক্তিমানতার পরিচয় প্রদান করিল। রাষ্ট্রপতি দিব্য বিরাট গোড়বন্ধের কোন সামন্ত নরপতি ফোন অস্ত্রোত্তোলন করেন নাই।

রাজা ভীম

রাষ্ট্রপতি দিব্যের স্বর্গপ্রাপ্তির পর তাঁহার অমুজ রুদ্র রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তৎপর ইঁহার সর্বপ্রথম পুত্র ভীম রাজা হন। রাজা ভীম জ্যেষ্ঠতাত দিব্যের প্রারব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিলেন। এই ভীম যুদ্ধের সেইরূপ বুদ্ধিমান আর সেইরূপ ক্রমশঃ লোক জনের ভীম অনেক বৎসর যাবৎ এই বরেন্দ্র প্রদেশের

করেন। রাজা ভীমের শক্তি যে কত বড়, তাঁহার সৈন্যদল ও অশ্ব-হস্তী যে কত বেশী ছিল তাহার প্রমাণ ইতিহাস দিতেছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রামপাল অনেক বৎসর চেষ্টার পর যুদ্ধের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া অসংখ্য বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে ভীমকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হন। ভীমের করতলগত ছিল বরেন্দ্রভূমি, অর্থাৎ বর্তমান রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা রাজসাহী ও মালদহ জেলা—পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে করতোয়া ও প্রাচীন তিব্বত, ইহার মধ্যবর্তী দেশটা।

রাজা মহীপালের উত্তরাধিকারী রামপাল প্রথমতঃ গঙ্গার পূর্বের ও পদ্মার দক্ষিণের ভূমিখণ্ডে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা ভীমের রাজ্যের..তিন দিক বেষ্টিত করিয়া তাঁহার পৈতৃক করদ রাজা এবং আত্মীয়দের দেশ—ঢাকা, ময়মনসিংহ ইহাতে পাটনা পর্যন্ত। রামপাল এই সমস্ত জেলায় স্বয়ং গমন করিয়া অথবা দূত পাঠাইয়া সৈন্য ও সহকারী সংগ্রহ করিয়া নরপতি ভীমের রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস পান। অনেক দিন ধরিয়া চেষ্টার পর বিপুল অর্থসম্পত্তি, অশ্ব, হস্তী, মণিমাণিক্য উপহার দিয়া রামপাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও মণ্ডলগণের সাহায্যে অগণিত সৈন্যদল লইয়া বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করিলেন। রাজা ভীম যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত ও বন্দী হইলেন। তাঁহার সৈন্য-নায়ক হরি ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণকে সম্মিলিত করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিলেন কিন্তু এত অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিলেন না। হরিরও পরাজয় হইল।

রাজা ভীম ও তাঁহার সৈন্যনায়ক হরির প্রাণবধ করা হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে বরেন্দ্রীয় স্বতন্ত্র প্রাদেশিক রাজবংশও লোপ পাইল।

পরম সৌভাগ্যবলে বাঙ্গালী ভীমকে নৃপতিরূপে পাইয়াছিল। রাজা ভীম রক্ষাযোগ্য ব্যক্তিমাত্রের রক্ষক ছিলেন। ভীমের সমীপে বিপক্ষ নৃপতিগণের দুর্ব্বার সর্ব প্রকার বাহিনী ভগ্ন বা বিকল হইয়া যাইত। বহুতর রত্নরাজির আশ্রয়ে সরস্বতীও স্বয়ং লক্ষ্মী হইয়া তাঁহাতে অবস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গে পরাজিত শত্রুসকল অশ্ব-হস্তী ও বীরগণ পর্যন্ত তাঁহার অধীন হইয়াছিল। রাজা ভীম সর্বপ্রকার অধর্ম হইতে মুক্ত ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে চন্দ্রকলাশোভিত ভূজবিভূষিত দেবাদিদেব মহেশ্বর ভবানীসহ সর্বদা বিরাজ করিতেন। রাজা ভীম অত্যন্ত যশ দ্বারা দিগভিত্তি শোভিত করিয়াছিলেন। তিনি লোভের বশবর্তী হইয়া কোন কার্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন না। তিনি ধর্মবস্ত্র অন্নসরণ দ্বারা মহাশয়তা লাভ করিয়াছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রাজা ভীমের মহত্ব সম্বন্ধে এই প্রশংসা গাহিয়াছেন।*

* এই প্রবন্ধ রচনায় প্রথম দিব্যস্মৃতি উৎসবের সভাপতি শ্রীযুক্ত রমাশ্রীচন্দ্র চন্দ্র ও দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের অভিভাষণদ্বয় এবং “একাদশ শতাব্দীতে বাংলায় রাজ-নির্বাচন” পুস্তক হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়াছি। —লেখক।



নারী কি হইবেন

শ্রীকণা দত্ত

বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য জীবন যাত্রার ইতিহাস যে সব জটিল সমস্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নারীঘটিত সমস্যা বোধহয় তাদের মধ্যে প্রধানতম !

আজকাল মেয়েদের কথা সবাই চিন্তা করিতেছেন। দেশবিদেশের বহু মনস্তত্ত্ববিদ মনীষী, তাহাদের স্বচিন্তিত অভিমতগুলি দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বিশ্বের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের মত বিদ্যা বা বুদ্ধি আমার কিছুই নাই কিন্তু আমিও নারী ! যাহাদের লইয়া আজ দেশের বড় বড় মনীষীরা তাঁহাদের বহুমূল্য সময় ব্যায় করিতেছেন আমি তাহাদেরই একজন। স্বতরাং বিদ্যাবুদ্ধি বিশেষ কিছু না থাকিলেও আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় যে সব অসামঞ্জস্য ও যে সব ক্রটিবিচ্যুতি আমাদের সমবেদনা আকর্ষণ করে শুধু সেইটুকুই বলিব বলিয়া আজ বসিয়াছি।

মিস্ মেয়োর “Mother India”র প্রভুত্বের কানাইয়া লাল গাওক “Uncle Sam” নামে যে গভীর গবেষণাপূর্ণ বইখানি লিখিয়াছেন তাহা সত্যি এযুগের পক্ষে উপকারী। উহার একজায়গায় আছে, “The Eve of today bears a close resemblance to Adam. She is masculine in her strength the curse of this age.”

This may be old-fashioned, but ninety-nine out of hundred is old-fashioned, if old fashioned signifies the type of women whom our fathers loved and who became our mothers. Perhaps their dresses were a little cumbersome, but their hearts were of gold. I say the ninety-nine out of a hundred men today prefer the type of

their mothers to the adulterous love of the third decade of this century”—

কথাগুলি লেখক আমেরিকার নারীজাতিকে উৎকর্ষিত করিয়া লিখিলেও সবদেশের এবং সব জাতির পক্ষেই উৎকর্ষিত অমূল্য সত্য কথা।

“প্রগতির মোহে পড়িয়া মেয়েরা আজকাল নারীত্বের স্বভাবগত লজ্জা, সন্ত্রস্ততা এবং সহজ কৃষ্ণা প্রায় হারাইতে বসিয়াছেন”—এইরূপ একটা অপরাধ আজকাল প্রায় শুনি। কথাটা সম্পূর্ণরূপে সত্য না হইলেও কিয়দংশে ইহার সত্যতা নিশ্চয় আছে। কিন্তু মেয়েদের পক্ষ হইতে এ কথা না বলিলেও অজ্ঞায় করা হয়, যে, নারীদোষই শুধু তাহাদের নহে। শেষের কবিতায় লাবণ্য কথ্যটা সম্পূর্ণ ঐভাবে ব্যবহৃত না হইলেও এখানে এরকমে বলা চলে। “নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিলো, তাকে তুমি আপনার বরণ রাখলে না কেন? যে কারণেই হোক আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে তার পরে দেশের মুঠোর চাপ পড়ে ওর উপরে। ওর মূর্তি গেছে বদলে। আজ দেখি বিলিতি দোকানের পুতুলের মত।”

যুগের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা ও ক্রটিরও আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সেকালের লোকেরা ব্রীড়াসঙ্কুচিতা, দীর্ঘাবগুষ্ঠিতা ছোটোখাটো একটা নির্ঝাঁক বা স্বল্পভাষী বধু লইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন।

আশৈশব মেয়েরাও জানিত, স্বামীর সন্তানদায়ী তাহাদের লালন পালন এবং স্বামীর সংসারে তাঁহাদের তাঁহার আত্মীয় পরিজনদের সুখ সুবধা ও সেবা শুশ্রূষা দিকে অবহিত দৃষ্টি দেওয়াই তাহাদের নারী-ঘটনাবলীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ কার্য ! স্বতরাং জন্মক্ষণটাই হইতে মৃত্যুবর্ত পৰ্যন্ত তাঁহারা পিতামাতার সেবা, স্বামী পুত্রের কল্যাণ কামনায় ও তাঁহাদের সুখসুবিধার জন্ত জীবনের প্রত্যেক

ক্ষুদ্র মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যায় করিয়া শেষ নিশ্বাসটা ত্যাগ করিতেন।

স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনা ছাড়া তাঁহাদের জীবনে, সেদিন আর কোনই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁহাদেরই কল্যাণ মাগিয়া, তুলনী মূলে মঙ্গল প্রদীপটা রাখিয়া জীবন দেবতাকে প্রণাম জানাইতে গিয়া নিজেদের কথা তাঁহারা নিঃশেষে ভুলিয়া যাইতেন। অনেক দিয়াও তাঁহারা অল্পই চাহিতেন এবং সেই অল্পটুকুতেই নিজেদের পরম স্থখী মানিতেন।

পুরুষের নিকট হইতে জোর করিয়া প্রীতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা আদায় করিবার প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করেন নি। তবু তাঁহারা ভালবাসা ও পূজা পাইতেন। নিজেদের ব্যবহারে নিজেদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার তাঁহারা না চাহিতেও লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আজ তাহার পুরাতন রুচি ও প্রথা ভুলিয়াছে। নারীকে আজ তাঁহারা কেবলমাত্র সংসার নির্বাহের যন্ত্র স্বরূপ দেখিতে রাজী নহেন। সেদিনের সেই শান্ত সঙ্কুচিতা লক্ষ্মী বধূটির পরিবর্তে আজ তাহারা নারীকে চান বন্ধু, বধু ও সহচরীরূপে।

সংস্কৃতিকে সহচর ও বন্ধুর পদ দিয়া তাঁহাকে পাশে লইয়া উভয়ের মিলিত কর্ম সাধনায় নিখিল বিশ্বের কল্যাণ সাধন করিতে চান। তাঁহাদের সেই প্রয়োজন অনুসারেই আজ নারী আপনাকে নতুনরূপে গড়িয়া তুলিতে বাধ্য। সৃষ্টির আদিমতম দিনটা হইতে মানব-বিধাতারই নিয়ম অনুসারে, নারী শুধু পুরুষের জগতই সৃষ্ট-হইয়াছিলেন। যুগযুগান্তর হইতে আজ পর্যন্ত শুধু পুরুষের রুচি অনুযায়ীই নারী আপনাকে সাজাইয়াছেন।

সুতরাং সেকালের নারীর সেই দীর্ঘ অবগুষ্ঠন আজ যদি সংক্ষিপ্ত ও শিথিল হইয়াই থাকে, একবস্ত্রধারিণী সেদিনের সেই গৃহস্থেই একান্ত নিষ্ঠাবতী বধূটি, আজ যদি ব্লাউসমণ্ডিতা ও পাছুকায় স্ত্রীশোভিতা হইয়া, প্রাণপণে নিজেকে বর্তমানকালের চলমান দ্রুত প্রবাহের সহিত খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করেন, তবে সেটা তাহার খুব বেশী

অপরাধ নহে। রোমে থাকিলে যে রোমান সাজিতে হয়, এ প্রবাদ তো আজিকার নহে।

তবু একথাও সত্য, যে আমরা যতই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হই না কেন ও দেশের মেয়েদের পক্ষে যাহা শোভন ও সঙ্গত, আমাদের দেশে তাহা সব সময় কখনই শোভন হইতে পারে না। ইবসেনের ডলস্ হাউস এর নায়িকা Noraর মনোবৃত্তি আমাদের দেশের সব নারীর পক্ষে খাটে না। জোর করিয়া খাটাইতে গেলেই অনর্থ ও অশান্তি বাধিবার সম্ভাবনা।

ভগবান, পুরুষের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিবার জগত পুরুষকে সবল ও কর্মঠ, এবং নারীকে কোমল ও ভীক প্রকৃতি করিয়া গড়িয়াছেন। কিন্তু হয়তো আজকাল সে ব্যবস্থা নারীর পছন্দ হয় না। কাহারও অধীনতার হীনতা স্বীকার করিতে আজ তিনি একান্তই অনিচ্ছুক। পরের সাহায্য লওয়ায় তাঁহার অপমান ও আত্মদমনে আঘাত লাগে। স্বামীর গৃহের পরম গৌরবজনক আসনটুকু ছাড়িয়া দিয়া পয়ের ছয়ারে ছয়ারে খাটিয়া বেড়াইতে এবং পরের অধীনতা স্বীকারেও কি কিছুমাত্র মানি নাই।

“Marriage has been often likened to a Partnership, the Partnership sanctified and idealised to ensure permanency. In certain societies marriage is a sacrament, a union incapable of dissolution.”

In christianity marriage is a Sacrament. “What God hath joined let no man put asunder” (Uncle Sam. Chapter X. Page 97).

সংস্কৃতেও পড়িয়াছি :—

“পত্নী পত্ন্যঃপতিঃ পত্ন্যাঃ পরত্রেচ্ছত্ব কর্মণি।

পরস্পর হিতং কুর্যাদ্ভাববন্ধনাভুবি ॥”

সৃষ্টির দিনটা হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত নারী পুরুষের সবল স্ফূট বাহির আশ্রয়টুকুর পানেই আশা ও বিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। ইহাতে লজ্জা বা অপমান নাই। ইহাই স্বাভাবিক আর ইহাই তো নিয়ম।

ক্রিয়াগাং খলু ধর্মাগাং ।

সংপত্তো মূল কারণম ॥”

“সংপত্তীই সমস্ত ধর্মকর্মের মূল কারণ ।

সহধর্মিণী ও শক্তিরূপে তিনি পুরুষের বাহ্যতে সামর্থ্য ও দৃঢ়তা জোগাইবেন । মাতারূপে স্নেহছায়ায় সন্তানকে সুস্থ ও তৃপ্ত করিবেন, সুখ দুঃখ, আপদ-বিপদ ও দুর্দিন দুর্দশায় তাহার দুঃখে সমব্যথী হইবেন; নারী পুরুষকে ধর্মজীবনে উন্নত করিবেন; এবং পুরুষ নারীর জীবনভার জীবনের গ্লানি ও দুঃখ বহন করিবেন ।” উদ্ধাহ অর্থে এমনই একটা আশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা বুঝায় । সর্বশাস্ত্রমতে নারী ও পুরুষের গ্রায়সম্বন্ধে মিলন পবিত্রীকৃত বলিয়াই বিবেচ্য ।

খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে সেন্ট পল একস্থানে তাঁহার শিষ্যদের লিখিয়াছেন

For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the the husband. Else were your children unclean but now they are holy.”—

প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—

—“পতিব্রতীর মুখচ্ছবিতে বিবাহিতা রমণীর যে গৌরবশ্রী অঙ্কিত আছে, তাহা নিয়ত আচরিত কল্যাণ কর্মের স্থির সৌন্দর্য্য ।”

নরনারীর এই যে অবিচ্ছেদ্য পবিত্র ধর্ম-সম্বন্ধ ইহার মধ্যে অধীনতা স্বীকারের দুঃখ বা অপমান লজ্জা কোথায় ?” বিনা দানে তো নারী কিছু চায় না, নিজের সমুদয় সত্ত্বা স্বামীর সংসারে নিঃশেষে বিলাইয়া তবেই তো তিনি দাবী করিতে পারেন । সে দাবীর পূর্ণ অধিকার তাঁহার আছে ।

ভালবাসাতেই পূর্ণতা । তার যা আকাঙ্ক্ষা, সে তো দরিদ্রের কাঙ্গালপনা নয় । দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালবাসেন তখনি আসেন ভিক্ষা চাহিতে ।”

একজনের শান্তি ও প্রেমমহান উদার স্নেহছায়ায় বসিয়া পরিপূর্ণ নিশ্চিন্তে বিশ্রাম চাওয়া নারীর পক্ষে লজ্জা তো নহেই বরং উহাই গ্রায় সঙ্গত এবং সম্পূর্ণ সুসঙ্গত । বিংশ

শতাব্দীর নারী-প্রগতির পথে, প্রচুর মোহ ও উদ্বেগ থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মার তৃপ্তি ও সুখশান্তি তাহা নাই । নিজের রুটী সংগ্রহ করিয়া খাওয়ায় আত্মগ্রাসনে গর্ব্ব আমরা অন্তর্ভব করি বটে, কিন্তু সত্য কি প্রেম নারীর উহাই কাম্য ?

“In our heart of hearts all of us want to get married. Said an American girl to me. •

This is probably true not merely of American girls but girls the world over. The boys, also the world over, consider marriage as the supreme culmination of their youthful dreams.”

(Uncle Sam, Chapter XI, Page 3)

আমরা আজ ভুলিয়া গিয়াছি অথবা স্বীকার করি না যে, শান্তির মধ্যোই সৌন্দর্যের পূর্ণতা । বিবেচনা মধ্যো নহে । স্বামী স্ত্রীর গৃহধর্মে যে কল্যাণ বহন করে তাহাতেই প্রেমের শাস্ত সংযত রূপশ্রী প্রকাশ পাইয়াছে ।

প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “তাহা ভ্রমের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্মের দ্বারা ধ্রুব । সেই সৌন্দর্য্যে নরনারীর দুর্গিবার দুর্ভাগ্য প্রলয়-বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গল মহান সের মধ্যে পরম স্তব্ধতা লাভ করিয়াছে । এইজন্য তাহা জন-বিহীন দুর্দর্শ প্রেমের অপেক্ষা মহান ও বিশ্বয়কর ।”

কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট ও দুঃখ দুর্দশায় দিন যতটুকু সুখশান্তি আমরা ইচ্ছা করিলেই সহজে পাইতে পারিতাম, তাহাও আজ হেলায় হারাইয়াছি । আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনকে শান্তি ও সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ করিয়া দিতে হইলে, প্রচুর ধৈর্য্য ও ঐকান্তিক তপঃনিষ্ঠার প্রয়োজন । আজ যে নারীর জীবনযাত্রায় পুরুষের অনাহুত অবপ্রীতি জন্মাইয়াছে, সেদিনের সর্বমানব-পুণ্ডিত নারী যে এই বিংশ শতাব্দীতে সকলের ব্যঙ্গ ও উপহাসের সহ্য হইয়াছেন, সে দোষ কাহার ? শান্তিছায়া সমগ্র মানব-মায়ের প্রতি ঘরে ঘরেই যে আজ বিরোধ এবং অসন্তোষ একটা ধুম মলিন আবহাওয়া ঘনাইয়া আমাদের চোখে

শিষ্ট পবিত্র শান্তিকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়া দিতেছে তাহার জন্তই বা কাহাকে দোষী করিব ?

তাহা আমাদেরই দোষ। পাশ্চাত্য জগতের যাহা শিক্ষণীয় এবং প্রকৃতপক্ষেই শিক্ষাযোগ্য, তাহাই আমরা সমস্তে দূরে সরাইয়া রাখিয়া, তাহাদের উদ্ভেজনা ও বিজ্রোহটুকুই শুধু সমস্ত অন্তর ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছি। প্রগাঢ় আত্মচেতনা ও আত্মবেদনার বিশাল অহুভূতিবোধে শুধু নিজের দাবী দাওয়া লইয়া উম্মাদের মত বার্থ হাহাকার করিয়া ফিরিতেছি। নিজের স্বথ স্ববিধাই যোল আনা করিয়া হিসাব মিটাইবার জন্ত দুঃসহ আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিতেছি। তাই আমরা বিবাহ করিলেও একটা শান্তিপূর্ণ সংসার আমাদের স্বার্থ পরতাপূর্ণ দুর্বিদ্য দাওয়ার প্রাচুর্যে ছিন্নভিন্ন ও বিনষ্ট করিয়া ফেলি। স্বামী এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজন যেন আমাদের লইয়া আর তেমন পরিপূর্ণভাবে স্থখী হইতে পারেন না।

প্রগতির নেশা আমাদেরিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে বাহিরের অসংখ্য দাবী মিটাইতে মিটাইতে আমাদের ঘরের কথাই অনেক সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই। নারীর জীবনে যাহা সর্কাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য,—সন্তানদের শিক্ষায় গড়িয়া তোলা—তাহাতেই আর আমাদের অনেকের অর্দো মনোযোগ নাই।

যতশীঘ্র পারি তাহাদের স্থলে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চন্ত হই। ফলে আমাদের জীবনাধিক প্রিয় সন্তানকে ক্রমশই আমাদের নিকট হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছি। “A Home without children is cold, barren, lifeless. It is accursed of nature and of God.” ভালো তাহাদের বাসি নিশ্চয় কিন্তু এই গতির যুগে বাস্তব ও ব্যাপৃত আমরা, কাহাকেও ভালবাসা দেখাইয়া স্থখী করিবার মত সময় আমাদের নাই। অনেক সময় দেখিয়াছি মেয়েরা বিবাহের পরে এ নেশায় মাতিয়া থাকেন। বিশ্বের মঙ্গল কামনায় এবং নিজের নানাবিধ খেয়াল খুশীতে সমস্ত দিনের অধিকাংশটুকুই তাহারা কাটাইয়া দেন। শুধু ভুলিয়া যান তাঁহাকে—যাহার স্বথ দুঃখের অংশ সমভাবে গ্রহণ করিবেন বলিয়া এক শুভলগ্নে আকাশের দেবতা ও আগুনের পবিত্র হোম

শিক্ষাকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন। ভুলিয়া যান যে তাঁহার এবং তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততির দৈনিক কটীটুকু জোগাইবার জন্ত সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া শ্রান্তদেহে শুধু একখানি কল্যাণ ধর্ম স্পর্শের আকাঙ্ক্ষাতেই পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন।

এ যেন ভগবানের সৃষ্ট পৃথিবীতে জীবনের আনন্দরস ভোগ করিতে করিতে, তাঁহাকেই নিঃসমভাবে ভুলিয়া থাকার মত অমার্জনীয় অপরাধ; দৃষ্টিকটু এবং সর্ব-রকমেই হাস্যকর।

সংসারের কোথাও যেন আমরা আজকাল নিজেকে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করিতে অক্ষম। তাই আমাদের জীবনে আর স্বথ নাই। নাই শান্তিপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন স্থলীতল মধুর আরাম। ছলনাময়ী মরীচিকার মতই বার্থ স্বাধীনতার দিকে আকর্ষণ তৃষ্ণায় বুঁকিয়া পড়িয়া নিজেদেরই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে, আমরা আমাদের সংসার যজ্ঞের পবিত্র হোম শিখাটা বারে বারে নিবাইয়া দিতেছি।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজ শুধু অজস্র দাবী করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু, কাহারও কাছে হাত পাতিয়া কিছু দাবী করিবার পূর্বে তাহাকেও যে কিছু দেওয়া প্রয়োজন, সে কথা কি আমরা মনে করি ?

“পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা

রিক্ত হাতে চাসনে তারে

রিক্ত চোখে যাসনে ঘারে।”—

স্বথ এবং শান্তির উপায় কতকটা থাকে প্রত্যেকেরই নিজের হাতে। যাহাদের ভালবাসিবার জন্ত ‘ভগবান নারীকে কন্যা, মাতা এবং জায়া রূপে সজিয়াছিলেন’ তাহাদেরই স্বথের জন্ত—তাহাদের শান্তির জন্ত যদি আমরা আমাদের প্রচুর আত্মচেতনাবোধ, আমাদের অজস্র দাবী-দাওয়া একটুখানি কমাইয়া দিই, তাহাতে কি আমাদের খুব বেশী কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা ?

যাহাকে ভালবাসি কিছু না চাহিয়াও তাঁহাকে যেদিন ভালবাসিতে শিখিব সেদিনই তো জীবনের পরম মুহূর্তের সন্ধান পাইব।

কবে এমন আত্মসমর্পণের সুরে আমরা বলিতে শিখিব,
“প্রবল পরুষকণ্ঠে কত দাবি করিয়াছিলাম—

আজ কিছু চাহিনাকো

আপনারে সঁপিয়া দিলাম।”

বাঙালার প্রত্যেক নারীর জীবন শুধু তখনই মধুর ছন্দে ছন্দিত হইবে। দুঃখ-ব্যথা-নিপীড়িত দিনগুলি সেদিন শুভ স্বন্দর ও আনন্দম্বিত হইয়া উঠিবে।

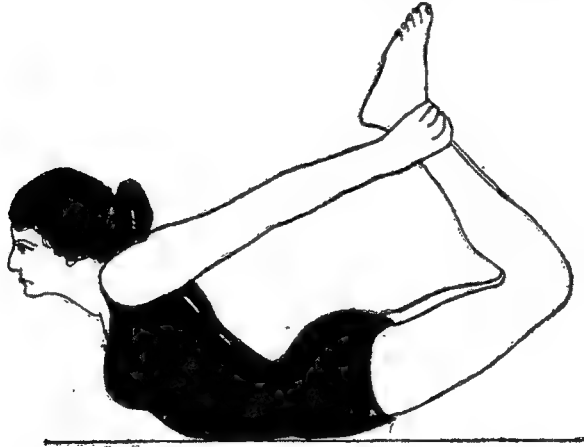
ইঠযোগ আসনাবলী

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

ধনুরাসন

ইতিপূর্বে আমরা গলভাসন ও ভুজঙ্গাসনের বর্ণনা করেছি। ধনুরাসনকে এই দুটি আসনের সমন্বয় বলা যায়। এই আসনে দেহ ধনুকের আকার ধারণ করে বাহু দুটি ধনুকের জ্যা'র মত দেখায়। এই কারণে আসনটির এই বিশিষ্ট নামকরণ করা হয়েছে।

সমতল ভূমির ওপর মাহুর বা গালিচা পেতে উপুড় হয়ে শয়ন করুন। বাহু দুটি দেহের পাশে ও পা দুটি সোজা থাকবে। পা দুটি ওপর দিকে তুলে হাত দিয়ে গোঁঠের কাছে ধরুন। প্রথম প্রথম হাঁটু জোড়া রেখে পা ধরা সম্ভব হবে না, কাজেই হাঁটু প্রয়োজন মত ফাঁক রাখুন।



ধনুরাসন

পূর্ণ শ্বাস গ্রহণ করে হাত দিয়ে পা দুটি ওপরের দিকে আকর্ষণ করুন, কিন্তু এই আকর্ষণ করবার সময়ে দেহের কোনখানে কিংবা কোন সন্ধি স্থানে যেন বাটকা না লাগে। তাড়াতাড়ি এই আসনটি করতে গেলে কিংবা বাটকা দিলে আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকে। পা দুটি আকর্ষণ করলে

দুই প্রান্ত আপনা হতে ওপরের দিকে ওঠে ও মেরুদণ্ডটি সম্পূর্ণভাবে সঙ্কুচিত হয়। এই অবস্থায় সনভ—৫ ভুজঙ্গাসনের যা উপকার ধনুরাসনেও কতকটা সেই উপকার হয়। কিন্তু ওই দুটি আসন আলাদা আলাদা অভ্যাস করলে যতটা উপকার হয় ধনুরাসনের উপকার তত গভীর নয়।

কিন্তু ধনুরাসন অভ্যাসে পেটের পেশীর যে আকৃষ্টন ও তজ্জনিত উপকার হয় তার সঙ্গে অন্য দুটি আসনের উপকারের তুলনা হয় না। পেটের পেশীগুলি স্ফূটন হয় ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলিও মজবুৎ ও কার্যক্ষম হয়। মেরুদণ্ডের ওপর ধনুরাসনের বিশিষ্ট প্রভাব আছে। ধনুরাসনের দ্বারা মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া

মেরুদণ্ডস্থিত বাতনাজীগুলিরও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায়। পিঠ পাহা প্রভৃতি অঙ্গের পেশীগত উপকারও যথেষ্ট হয়ে থাকে।

প্রথম প্রথম পাঁচ সেকেন্ড মাত্র ধনুরাসন রক্ষা কর যথেষ্ট হবে। পেশীগুলি আয়তীভূত ও দৃঢ় হলে আসনের সময় ধীরে ধীরে বাড়ানো উচিত। প্রথম দুই সপ্তাহ পাঁচ

সেকেণ্ড যথেষ্ট, তারপর স্থিতি পাঁচ সেকেণ্ড করে সময় বাড়ানো যায়। তিন মিনিটের বেশী এ আসনটি করার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই।

আসনটি আয়ত্ত্ব হলে হাঁটু দুটি আর ফাঁক রাখা উচিত নয়। হাঁটু জোড়া করে আসনটি করা শীঘ্রই সম্ভবপর হয়ে ওঠে এবং তাতে উপকারও বেশী পাওয়া যায়।

দেহ ওপরের দিকে তোলবার ও পা দুটি আকর্ষণ করার সময়ে শ্বাসরোধ করা প্রয়োজন হলেও পরে শ্বাসরোধ করে থাকার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এ কথাও অবশ্য বলা প্রয়োজন যে অনেকের মতে আসন প্রতিষ্ঠিত হলেও শ্বাসরোধ করে থাকার উপকারিতা আছে।

ধনুর্ভঙ্গ অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ সারে। খাওয়ার পর পেট ফাঁপাও ধনুর্ভঙ্গের দ্বারা নিরাময় হয়। আন্তরিক সমস্ত যন্ত্রগুলি এই আসন অত্যন্তের দ্বারা স্বস্থ ও নূতন শক্তিসম্পন্ন করা যেতে পারে।

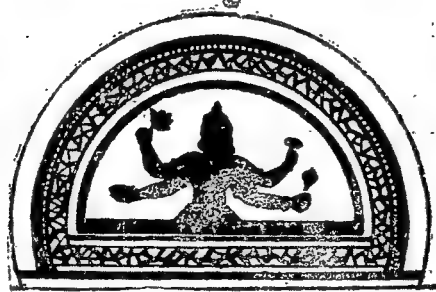
দেহের পেশী প্রকরণ ও মেরুদণ্ডের ওপর ধনুর্ভঙ্গের যে বিরাট প্রভাব আছে তার দ্বারা মেয়েরা বিশেষ উপকৃত

হন এই কারণে যে ধনুর্ভঙ্গ তঁাদের দেহ সোজা ও তঁাদের ভঙ্গিমা (posture) সুন্দর করে। ফুসফুসের আয়তন ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তঁাদের জীবনীশক্তিও প্রভূতভাবে বেড়ে যায়।

এখন পর্যন্ত আমরা যে কয়টি যৌগিক ব্যায়ামের বর্ণনা করেছি সর্বাঙ্গাসন ছাড়া সব কয়টি একটি ধারার অন্তর্গত। অর্থাৎ সর্বাঙ্গাসনটি একটি সম্পূর্ণ ব্যায়াম হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তার সঙ্গে অন্য ব্যায়াম না করলেও চলে। কিন্তু বাকীগুলির মধ্যে কোনটি এভাবে ব্যবহার করা উচিত হয় না, সেগুলি ধারাবাহিকভাবে করা উচিত।

যদি একান্ত সময়ের অভাব থাকে তাহলে সর্বাঙ্গাসন অভ্যাস যথেষ্ট হবে, কিন্তু এটিকে কেন্দ্রীয় ব্যায়াম বলে গ্রহণ করে যদি অন্যান্যগুলিও অভ্যাস করা যায় উপকার যে ব্যাপক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাজকর্ম করার পর দেহ ক্লান্ত হলে ভূজঙ্গাসন যেমন দেহকে স্বস্থ ও শক্তিশালী করে ধনুর্ভঙ্গেরও সেই বিশিষ্ট গুণ আছে।



বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিবৃত্ত

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

হোক সম্মিলন ভূমে প্রাণের প্রাণের
আত্মায় আত্মায় পরিচয়,—
পূজার মন্দিরে তব যুক্ত হৃদয়ের
পুষ্প-মালা চির মধুময়।
অমৃষ্ট রাগিনী মা গো, তোমারি বীণার
দিকে দিকে হয়ে মৃতিমান,
তোমার বন্দনা গীতে কল্লক সংসার
পবিত্র কৃতার্থ মহীয়ান—
নিয়ে এস দিব্য চক্ৰ অরি লো কল্যাণী,
ভক্ত বাহা কল্পলতা অয়ি,
তৃপ্ত হোক শান্ত হোক নিখিল পরাণী
সাকল্যের শুভবার্তা বহি

এই অমূল্যপ্রেরণাতে আজ ষাটবিশবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মণ্ডপতলে বাঙ্গালার স্বর্গী ও সাহিত্যিকগণ মিলিত হইতেছেন। মিলনেই আনন্দ—যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিও জগতে ফুটে নাই—ভারতে তখন যে বেদগানে মিলন মন্ত্র গীত হইয়াছিল, সেই সঙ্গীতের মধুর আকর্ষণেই ভারতবর্ষ যেন একপ্রাণ হইয়া গিয়াছিল—শ্রোত যুগের সেই সাহিত্যিক একতা, সেই সজ্জবদ্ধ, সেই চিবনবীন প্রেম, সেই আদরের মিলন—এখন রান হইয়া আসিয়াছে

সে বৈদিক যুগও নাই, সে বিরাট বৈদিক সাহিত্যের ধোঁস কম লোকই আজ রাখে। তথাপি বাঙ্গালার সেই সাহিত্যিক একতা, মণীষার সম্মেলন—প্রয়োজন হয় যুগে যুগে।

সেই প্রয়োজনেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৩১১ সালে সাহিত্য সম্মিলনের সূচনা করিয়াছিলেন তাঁর “অবস্থা ও ব্যবস্থা” প্রবন্ধে, বৎসরে বৎসরে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের কল্পনা রবীন্দ্রনাথ বাক



ত্রিপুরার মহারাজা মাণিকা বাহাদুর



বহুমানের মহারাজা



যশবন্ত চৌধুরী

করেন তাঁর সেই প্রবন্ধে। তখন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহঃসভাপতি ছিলেন। সাহিত্য পরিষদকে ভিত্তি এই সম্মিলনের উদ্যোগ করিবার জন্য অমুরোধ জানান কিন্তু সাহিত্য পরিষদ তখন ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিলেও সম্মিলনের কোন উদ্যোগ আয়োজন করিতে পারেন নাই।

তৎপরবৎসর রংপুরের শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদের শাখা সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবের সময় বঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার অমুরোধ করেন। এইরূপে কবি রবীন্দ্রনাথের

প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত হইবার প্রথম সুযোগ হয়, কিন্তু সে প্রস্তাবও পরিবর্তন হয়।

১৩১৩ সালে ৩রা বৈশাখ সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন স্বর্গীয় দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বরিশালে আহ্বান করেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব

পুর সাহিত্য পরিষদও প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন, বহু প্রতিনিধি বিভিন্ন জেলা হইতে বরিশালে সমবেত হইয়া ছিলেন; রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মতিলাল ঘোষ, রামেন্দু হুম্মর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅমূল্য বিজ্ঞানভূষণ প্রভৃতি মনীষিগণ বরিশালে উপস্থিত হন।



সুরলা দেবী

করিবার জন্ত বরিশালে গমন করিয়াছিলেন। বরিশালের সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ৪৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন। রংপুর ও ভাগল-



শ্রী জগদীশ চন্দ্র বহু

সাহিত্য সম্মিলনের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকিবে না, ইহাও বিজ্ঞাপিত হয়। সেই সময় ১৩১৩ সালের ১লা ও ২রা বৈশাখ বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনের (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের) অধিবেশন হইতেছিল, কিন্তু বরিশালের সরকারী কর্মচারীগণ সেই রাজনৈতিক

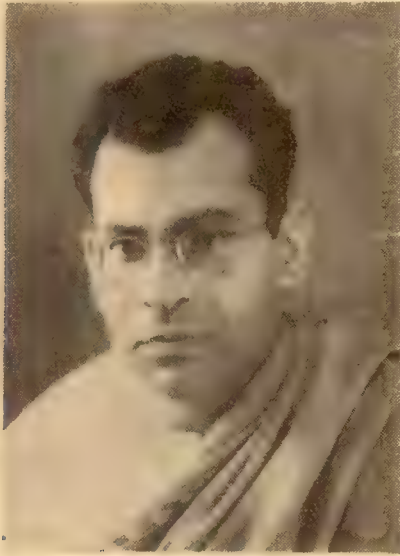


আচার্য আনন্তোব মুখোপাধ্যায়



অক্ষয়কুমার সরকার

কনফারেন্সের অধিবেশন বাতুলবে ভাঙ্গিয়া দেন, ১লা বৈশাখ পুলিশ প্রাদেশিক সম্মিলনের সভ্যদের নির্দয়ভাবে নির্যাতন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথ ধৃত ও নিপীড়িত হইয়াছিলেন, কৃষ্ণকুমার, সভাপতি এ রজুল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ প্রভৃতি দেশ-নেতাগণ নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার এই দুর্ঘটনা ইতিহাসের চিরস্মরণীয় ঘটনা, ২রা বৈশাখও তাণ্ডব লীলা চলিয়াছিল। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন সাহেব পুলিশের সাহায্যে প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেন, নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিহতভাবে নিগৃহীত করেন। ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি উচ্চারণ একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেন।



ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশনের মণ্ডপেই সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন ৩রা বৈশাখ হইবার ব্যবস্থা হইয়া ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সেই মণ্ডপে বা বরিশালের অন্তর্ভুক্ত কোন সভা হইতে পারিবে না বলিয়া আদেশ প্রচার করেন, চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল, রাজ পুরুষ ও ছাত্রদিগের উপর রাজনৈতিক সম্পর্কশূন্য সাহিত্য সম্মিলনে যোগদান করিতে নিষেধ আজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল। ‘বন্দে মাতরম্’ গান সাহিত্য সম্মিলনে গীত হইতে পারিবে না ইহাও নির্দেশ করা হইয়াছিল।

এইরূপ গুরুতর পরিস্থিতিতে বিশেষতঃ ‘বন্দে মাতরম্’ গান সাহিত্যিকরা গাহিতে বা শুনিতে বঞ্চিত পারিবে না, তখন বরিশালে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? ২রা বৈশাখ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ

সমবেত সাহিত্যসেবীদের সহিত পরামর্শ করিয়া সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন স্থগিত করিয়া দিলেন। বরিশালবাসীরা দারুণ মর্শ্ববেদনার সহিত সম্মিলনের প্রতিনিধিদের বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। তাৎক্ষণিক শ্রম ও অর্থ ব্যথা ব্যয় হইল, ‘না বসিতে বোধন দান’ ভাঙ্গিয়া দিল মঙ্গল ঘট।’



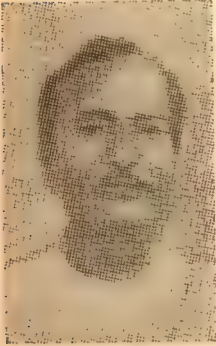
আবদুল উদ্দুহ

দেবীর আরাধনা শত বাধায়ও হইয়া থাকে—এক বৎসর পর সম্মিলনের অধিবেশন বরহামপুরে হইবে স্থির হইল। সাহিত্যিকদের চিরস্বহৃদ মহারাজা স্যার বীজচন্দ্র নন্দী মহাশয় সম্মিলনের প্রথম স্থগিত অধিবেশন বরহামপুরে আহ্বান করেন। ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’এর লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই সম্পাদকদ্বয়ের



প্রমথ চৌধুরী

নামে নিমন্ত্রণ পত্র বাঙ্গলার সুধিবৃন্দের নিকট প্রেরিত হইল। সমগ্র বাঙ্গলায় সাহিত্যিক ও সাহিত্য অহুরাগীদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু ভগবান এ সাধেও বাদ হানিলেন। উচ্ছোক্তা মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। বিষাদে বরহামপুর কালিমাময় হইল, সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত হইল।



সারদা মিত্র



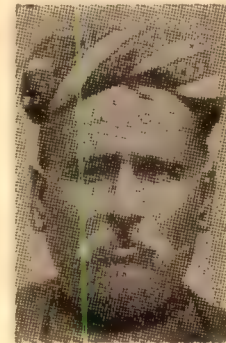
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

কালের মহিমা যখন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ পড়িল তখন বেদনাক্রিষ্ট চিত্ত লইয়াও মহারাজ বরহামপুরে। ১৩১৫ সালের পূজার অবকাশের অব্যবহিত পূর্বে মর্শিদাবাদে সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিবার সঙ্কল্প জানাইলেন। ১৩১৫ সালে ১৭ই ও ১৮ই কার্তিক শ্রামাপূজার ছুটিতে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। মহারাজা স্বয়ং অভির্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যাতরা বেদনাময় চিত্ত লইয়া বাঙ্গলার সুধিবৃন্দকে এই মিলনোৎসবে অভির্থনা করেন। বঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক যোগদান করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী প্রমুখ সুধিগণ প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গদেশে জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনের জ্ঞান ও জাতীয় কৌতুকলাপ রক্ষার নিমিত্ত একটি “সারস্বত ভবন” স্থাপনের প্রস্তাব এই প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত করেন। তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। এই পরিকল্পনা হইতে “রমেশ ভবন”টি স্থাপিত হইয়াছে। এই সুদৃশ্য অট্টালিকা বাঙ্গালীর প্রিয় ও গৌরব স্থান। এখানে বাঙ্গলার অতীত গৌরবের, কৃষ্টির, সাধনার নিদর্শন সংরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গলার বিশিষ্টতাপূর্ণ ভাস্কর্য্য, চিত্র, পট, মুদ্রাদি, বহু মূল্য দ্রব্য এই সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত হইতেছে। বাঙ্গালীমাত্রেই এই সংগ্রহালয়কে

নিজ সম্পত্তি মনে করিয়া দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া এই ভবনটির শ্রীবৃদ্ধি করা কর্তব্য।

এই সংগ্রহালয়ে বাঙ্গলার দুই শত বর্ষের সাহিত্যিক ও মনীষিগণের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি, চিঠিপত্র সংরক্ষিত আছে। তাহা দর্শনে হৃদয় আনন্দে ও গর্বে পূর্ণ হইয়া যায়। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রাণী ভবানী, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী, তরু দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায়, অমৃতলাল বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের স্মৃতি-জড়িত বহু সামগ্রী দেখিয়া বাঙ্গালী ধত্ত হইবে।

প্রথম অধিবেশন হইতেই সাহিত্যাহুরাগীদের মধ্যে সম্মিলনের প্রতি প্রবল অহুরাগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তদবধি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নানাস্থানে অধিবেশন বসিল, বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবী সাগ্রহে যোগদান করিয়া এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়া সম্মেলনকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিলেন। তখনকার দিনে সাহিত্যসেবীদের সম্মিলনে যোগদান করিবার জ্ঞান অভির্থনা সামতিক্রে এত অহুরোধ উপরোধ করিতে হইত না। প্রবন্ধের জ্ঞান লালায়িত হইতে হইত



হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

না। তখন সাহিত্যসমাজে এমন দলাদলি, ব্যবসাদারী, আত্ম-প্রশংসাপ্রিয়তা এবং নিজেকে লোকসমাজে জাহির করিবার প্রচেষ্টা হইত না। নিজের প্রকৃত মহিমাতে তখনকার সাহিত্যিকরা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সম্মিলনের ক্রমোন্নতির সহিত বিভিন্ন শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। কলিকাতায় যখন ৭ম অধিবেশন হয়, স্বর্গীয় বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন সেই অধিবেশনে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার প্রচলন হয়, নানা উন্মুখীন বিদ্যার বিস্তৃত আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়।

বঙ্গের জাতীয়তার নব জাগরণের সময়ও জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন নানা মালমসলা

যোগাইয়াছিল। তখন বাঙ্গালার আয়তন বিস্তৃত ছিল। বাকলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই প্রদেশভুক্ত থাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন তখন ভাগলপুর, পাটনায় হইয়াছিল, আবার চট্টগ্রাম—ময়মনসিংহতেও হইত। বঙ্গের বহু সুখীজন মূল ও শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া ধৃত হইয়াছেন। অত্র সহ তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম ও বিষয় জ্ঞাত হইতে পারা যাইবে।

১৩২০ সালে কলিকাতায় টাউন হলে সপ্তম অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্মিলনেও উদ্বোধন করেন তদানীন্তন শাসনকর্তা লর্ড কারমাইকেল সাহেব। সারা বাঙ্গালায় তখন রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের পীড়নের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল। ‘বন্দে মাতরম্’ উচ্চারণ করা ভীষণ অপরাধ, এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন আস্থান করিতে মফঃস্বলের কোন নগরবাসী সাহস পাইল না। সেইজন্য কলিকাতায় অধিবেশন হয়। এমন



কামিনী কুমার দত্ত

দুঃসময়েও শাসনকর্তা লর্ড কারমাইকেলের উপস্থিতিতে ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি সমগ্র গীত হয়। গভর্ণর ও সমবেত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই জাতীয় সঙ্গীতের ও ইহার রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কিন্তু আজ তার ২৫ বৎসর সাধনার পরে সেই “বন্দে-মাতরম্” গান গাহিবার অন্তরায় কংগ্রেস ও মুসলমান সম্প্রদায় হইয়াছে। ইহা কি প্রগতির ফল, না অবনতির পথ সরল করিবার উদ্দেশ্য?

সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসনে বসিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বীণাবিনিম্বীত কণ্ঠস্বরে কত আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে

রাজসাহীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মৌলিক গবেষণা করিতে উৎসাহ দান করেন। তৃতীয় অধিবেশন ভাগলপুরে বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র বাকলা ভাষা গভীর জ্ঞানের আকর বলিয়া ঘোষণা করেন। ময়মনসিংহ চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতির বেদী হইতে বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ভাবময় জগৎ ও জড়জগতের সমন্বয়রূপ “এই যেন” ও “এই সেই” কাব্যের তপোবনে উদ্ভাসিত



ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী

চরম সত্যকে শুনাইবার প্রয়াস কবিয়াছিলেন। চূঁচড়াব পঞ্চম অধিবেশনে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ধনীর কর্তব্য এই সত্য প্রকাশ করেন এবং প্রতিপন্ন করেন। ষষ্ঠ অধিবেশনে চট্টগ্রামে অনৈসর্গিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসিয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বাঙ্গলা ভাষার সরল রচনার মাধুর্য্য প্রকাশ করেন। ৭ম অধিবেশনে কলিকাতা মহানগরীতে নানা তত্ত্বকথা শুনাইয়া জড়বাদের জনকলরবের মধ্যে প্রথম দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসীমের মহিমার সন্ধান দিতে



স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অষ্টম অধিবেশনে বর্ধমানের মহারাজার রাজোচিত আতিথ্যের মোহের মধ্যে বসিয়া



নাটোরের মহারাজা

পাণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালী জাতির নানা গৌরব-কাহিনী শুনাইয়া স্ত্রীবনী শক্তিসঞ্চার করেন। যশোহরে নবম অধিবেশনে প্রিয়দর্শী সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস, ক্রম-বিকাশ ও গতি সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করেন। পাটনায় দশম অধিবেশনে প্রতিভাশালী শ্রীর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মাতৃভাষার প্রতি জলন্ত অনুরাগ জ্বলন্ত ও ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ মধুর ভাষায় বক্তৃত করিয়া দেশবাসীর প্রাণে অমুপ্রেরণা প্রদান করেন। ঢাকায় একাদশ অধিবেশনে মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গ ভাষাই আমাদের যাবতীয় শিক্ষার “বাহন” হওয়া একান্ত কর্তব্য, এই সত্য বহু যুক্তি দিয়া স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। হাওড়াতে দ্বাদশ অধিবেশনে শ্রীর আশুতোষ জগদগন্তীরস্বরে বঙ্গভাষা বিশ্বের অগ্রাগ্র শ্রেষ্ঠ

অধিবেশনের সভানেত্রী স্বর্ণকুমারী পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যে মহিলাদের দান বিবৃত করেন। চন্দন-



দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নগরে বিংশ অধিবেশনে সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ নিভীকভাবে সাহিত্যে কুরুচির প্রচলনের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বিংশ অধিবেশনে কৃষ্ণনগরে প্রমথ চৌধুরী বীরবলী ধারায়



বিজয়লল চাক্রবর্তী



হেমলতা দেবী

ভাষার জায় উচ্চাসন পাইবার যোগ্য, ঘোষণা করেন। মেদিনীপুরে ত্রয়োদশ অধিবেশনে সুপণ্ডিত রায় বতীন্দ্রনাথ দেশের প্রাচীন কাহিনী ও সাহিত্য জাতি গঠনের প্রধান অমুপ্রেরণা, ইহাই বুঝাইয়া বলেন। নৈহাটিতে চতুর্দশ অধিবেশনে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাত্মব লক্ষ্মীর বরপুত্রও সর্বস্বতীর রূপালাভ করিতে সমর্থ তাহাই প্রাপ্তি পন্ন করেন। রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে পঞ্চদশ অধিবেশনে বঙ্গিয়া পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গ-সাহিত্যের সম্যক আলোচনা করিয়া বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণবুদ্ধির জয়গান করেন। মুন্সীগঞ্জের ষোড়শ অধিবেশনে মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রামপালের বীরত্বগাঁথা গাহিয়া বাঙ্গালীর শক্তি সম্বলের মহিমা গান করেন। বীরভূমে সপ্তদশ অধিবেশনে রসরাজ অমৃতলাল বসু বাঙ্গালীর হাস্যরসপটুতার পরিচয় প্রদান করেন। মাজুর অষ্টাদশ অধিবেশনে প্রবীন সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গসাহিত্যের ও প্রাচীন বঙ্গ কবিগণের পরিচয় প্রদান করেন। ভবানীপুরের ঊনবিংশ



সর্গাধর রাজেন্দ্র মুখার্জী

ইতিহাস প্রদান করেন। কুমিল্লায় ষাণ্মাষ অধিবেশনে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় মহা কাব্য ও ভাষার শ্রেষ্ঠ দাবী করেন। এইরূপে শাখা সভাপতিগণের

অভিভাষণ আজ ত্রিশ বৎসর বাবং বঙ্গ-সাহিত্যে কত শত নূতন তথ্য প্রচার করিয়া সাহিত্য ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছেন।

স্বর্গীয়া অপরূপা দেবী একমাত্র মহিলা মূল সভার নেত্রিত্ব করিয়াছেন। সাহিত্য-শাখায় বীরভূমে শ্রীমতী সরলা দেবী, চন্দননগরে কাব্য ও কথা সাহিত্যে শ্রীমতী মানকুমারী ও শ্রীমতী অমরুপা দেবী, কৃষ্ণনগরে কথা ও পদাবলী সাহিত্যে শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর ও শ্রীমতী অপরূপা রায় সন্ডানেত্রীর আগুন গ্রহণ করিয়া মহিলা সাহিত্যিকদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।



হীরেন দত্ত

অমর সাহিত্যিকদের জন্মস্থান বা লীলাভূমিতে সাহিত্য সম্মিলন হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেই প্রস্তাব মত বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ায়, রামমোহনের রাধানগরে, ভারতচন্দ্রের মাজুতে জন্মস্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কুন্তিবাস, চণ্ডীদাস, মধুসূদন আদি কবির জন্মস্থানে সম্মিলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্মিলনের কার্য্য অপরিচালনার জন্ত এবং সারা বৎসর-ব্যাপী সাহিত্য-উন্নতি-বিধায়ক কার্য্য করিবার জন্ত এবং সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকবৃন্দের মিলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পাটনায় পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্মিলনটিকে আইনতঃ রেজিষ্টারী করিবার চেষ্টা করেন। নানা বাধা বিঘ্নে বহু বৎসর সে সুবিধা হয় নাই; ১৩৩৬ সালে ভবানীপুরে উদ্যোক্তাদিগের চেষ্টায় সম্মিলন রেজিষ্টারী করা হয়। ১৯৩১ সালের ৩রা জুলাই কলিকাতায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ নং আইন অনুসারে “বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন” নামে এই প্রতিষ্ঠানটি রেজিষ্টারী করা হয়। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৯৩১-৩২ সালের ৭৪৭ নং।

রেজিষ্টারী করিবার বর্ণনাপত্রে মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বতীন্দ্র নাথ বসু, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষ্মত ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী, হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহোদয়গণ কামিনী রায় মহোদয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহার সাহিত্য পরিচালনার ও সংগঠনের নিয়মাবলী সংযুক্ত করা হইয়াছিল ইহা একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার কার্য্য পরিচালন সমিতি সম্মিলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রতিনিধিদের মতে গঠিত হয়। বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এবং সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদাভ্যুত্থানে), সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কুমিল্লা সম্মিলনে নির্বাচিত এবং অধ্যাপক ময়্যথমোহন বসু (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক পদাভ্যুত্থানে) আর কোষাধ্যক্ষ ডাঃ সত্যচরণ লাহার স্থলে ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী সম্মিলনের মূল সভায় নির্বাচিত হইয়াছেন; ইহার দশজন সভ্য সাধারণ সভ্যের দ্বারা নির্বাচিত এবং পাঁচজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্য নির্বাহক সমিতির দ্বারা মনোনীত হন। তিন টাকা বাৎসরিক দিয়া সভ্য হইলে যাবতীয় পরিচালন সমিতিতে অধিকার থাকে।



অপরূপা দেবী

ভবানীপুরের অধিবেশনে যে সাহিত্য ও শিল্প সভার লইয়া প্রদর্শনী হয় তাহা যেমন অভিনব তেমনি শিক্ষাপ্রদ

হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর ধারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন বাদলার স্বসন্তান স্ত্রীর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তদবধি চন্দননগরে, কৃষ্ণনগরে ও কুমিল্লায় প্রদর্শনীর আয়োজনে অনেক তথ্য আবিস্কৃত হইয়াছে।

পূর্ব সভাপতিরা সম্মিলনের অধিবেশন উদ্বোধন করেন। কেবল কলিকাতায় লর্ড কারমাইকেল, চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথ, এবং কুমিল্লায় স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করিয়াছিলেন।



সত্যীশ চন্দ্র বিহাবিনোদ

সাহিত্যিক ও স্থবিবৃন্দের মধ্যে মেলামেশা একান্ত আবশ্যক, তাহার জন্ত প্রীতি সম্মিলন, আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। চন্দননগর ও কৃষ্ণনগরে সাধারণভাবে মূল ও শাখার অধিবেশন ব্যতীত বিশেষভাবে আলোচনার জন্ত—“বাদলায় বানান সমস্যা” ও “চণ্ডীদাসের স্বরূপ নির্ণয়” বিষয় সম্যক আলোচনা (symposium) হয় তাহাতে ডাঃ সাহীতুল্লা ও অপর্ণা দেবী নেত্রিত্ব করেন এবং বহু স্থবীজন যোগদান করিয়াছিলেন। তাহা সকলের মনঃপূত হয়। সেইজন্ত নিয়ম হইয়াছে পরিচালন সমিতি অধিবেশনের ছয়মাস পূর্ব হইতে চারিটি শাখার চারিটি বিষয় সম্যক আলোচনার জন্ত নির্দিষ্ট করিয়া পূর্বেরই বিজ্ঞাপিত করিবেন বর্তমান বর্ষে এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

ভবানীপুর অধিবেশনের পর ছয় বৎসর কোন অধিবেশন হয় নাই, কিন্তু চন্দননগর ও কৃষ্ণনগরের অধিবেশনে চারিটি শাখা ব্যতীত আরও অনেক শাখার সৃষ্টি হয়, তাহাতে সমস্যাভাব হয় ও শৃঙ্খলা রাখা যায় না। তাই

বর্তমান বর্ষে পূর্বের ত্রায় চারিটি শাখার অধিবেশন হইবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন যে প্রেরণা ও পরিকল্পনা লইয়া কার্য আরম্ভ করে তাহারই অহুপ্রেরণায় আজ বাদলায় ও বাদলার বাহিরে প্রবাসেও ছোট বড় অনেক সাহিত্য সম্মিলন বসিতেছে। কিন্তু সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া মূলের গোড়ায় সোহাগ ও অহুরাগ-বারি সিঞ্চন করিলে এই সম্মিলন-বৃক্ষটী মহীয়ান ও গরীয়ান হইবে, তাহার ভালপালা নানা মনোহর পত্র ও পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া দেশ বিদেশে স্বগন্ধ বিতরণ করিবে, নানা জাতির মধুকর আকৃষ্ট হইবে। তাহারই আশ্রয়ে কত ছোট বড় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান দেশে, প্রবাসে, নগরে, পল্লীতে মাথা তুলিয়া উঠিবে কত কুগাছ আগাছাও নির্মল হইয়া যাইবে। সেইজন্ত বঙ্গভাষাভাষী নরনারীমাত্রই এই বাদলাগীর মহা মিলন ক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে সমবেত হইয়া ধন্য হউন, সাহিত্যকে গোরবাসিত করুন, দেশের ও দেশের মঙ্গল করুন। মনে মন মিশাইয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, হৃৎকলকে কোলে তুলিয়া, সকলকে আগুন করিয়া



শ্রীযুক্তা অরুণা দেবী

লইয়া এক পথে একযোগে যাত্রা করা এখন আবশ্যক, মায়ের পাদপদ্মে অঙ্কলী দিবার সময় মনোমালিন্য রাখিতে নাই। অজ্ঞানতা অবিদ্যার মোহজাল ছিন্ন করুন, বাদলাকে আবার জ্ঞান গরিমায় বিভূষিত করুন; সাহিত্য সৃষ্টি হউক, প্রাণে আনন্দ আশ্রক, বাহুতে বল সঞ্চারিত হউক—আবার আমরা “মা” বলিয়া ডাকি—

বন্দেমাতরম্!

অন্ধপ্রেম

দুই

ব্রজেশ্বর ভারী ধনী ব্যক্তি—জমিদার। কলিকাতা সহরে আট বিঘা জমীর উপর তাঁহার দৌলতখানা। গাড়ী ঘোড়া, পাল্কী, তাজাম ও আসবাব-পত্র তাঁহার আমীরি রকমের। সেই আমীরি-আব্বাওয়ার মধ্যে মালুষ বা অমালুষ গড়িয়া উঠিতেছে তাঁহার দুই পুত্র রত্নেশ্বর ও জীবেশ্বর। দুই পুত্রের পর একটা কন্যা—রত্নমালা। রত্নমালা সুন্দরী, কিন্তু অন্ধ। ব্রজেশ্বরের তাহাতে দুঃখের সীমা নাই। অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিলেও রত্নমালা যদি দৃষ্টি ফিরিয়া পায়, ব্রজেশ্বর তাহা দিতেও প্রস্তুত।

ব্রজেশ্বরের আরো একটা দুঃখ—রত্নেশ্বর ও জীবেশ্বরের মধ্যে আদৌ সদ্ভাব নাই। অন্ধ বহিনকে তাহারা ভাল চক্ষে দেখে না। রত্নমালা আট নয় বৎসরের বালিকা। সেই বয়সের বালিকাকে “কানী” বলিয়া ডাকিলে, উপেক্ষার ডাকে সে যে কেমন ব্যথা পায়, উপেক্ষাকারীর সেটা বোধগম্যও হয় না ঐটুকুতেই অ-মানতার পরিচয়। ব্রজেশ্বর ও তাঁহার স্ত্রী বিমলা বুঝেন সগই, কিন্তু তাহাতে কথা কহিবার বা পুত্রদের শাসন করিবার তাঁহাদের উপায় নাই। অভি-শাপকে তাঁহারা নিমন্ত্ৰণ করিয়াই ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর একদিন তাঁহার বাপ-মায়ের বিব্রন্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, সহোদরদের ঠকাইয়া বাপ-মায়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। অভিশপ্ত তিনি তাহাতেই; বিমলা এবং বিমলার পিতা-মাতার পরামর্শে ব্রজেশ্বর এই মহাপাপ করিয়াছিলেন। সে কথা তাঁহার দুই “ঈশ্বরই” জানিত। নিরাকার ঈশ্বরকে ব্রজেশ্বর ফাঁকি দিতে পারিয়া-ছিলেন, পুত্ররূপী মাকার ঈশ্বরদ্বয়কে সে ফাঁকি দেওয়া চলিল না। শাসন-গণ্ডীর বাহিরে চলাচল এই ঈশ্বর-দ্বয়ের প্রকৃতি প্রতিশোধ লয় বুঝি এমনই করিয়া।

এই ব্রজেশ্বর কিন্তু অন্ধ কন্যাটিকে ভালবাসেন অসম্ভব রকমের। অন্ধ রত্নমালা ব্রজেশ্বরের নয়নমণি। পুত্রদ্বয়ের

শ্রীমুনিব্রহ্মসাদ সর্ববাক্যিক

অত্যাচার, উপদ্রব, অবাধ্যতা এই ভালবাসার মূলকে কবিরিয়াছে কিনা মনস্তত্ত্ববিদই বলিতে পারে।

অন্ধ কন্যাকে লইয়া ব্রজেশ্বর বহির্ব্বাটীর মা বাগানে বেড়াইতে ছিলেন। সময়টা তখন সন্ধ্যার প্রায় বিহগ কাকলীতে স্থানটা মুখর। অন্তর্গত রবীন্দ্র রক্তিমভা তখন বৃক্ষচূড়ায় জড়াইয়া আছে। পূর্ণ চন্দ্র স্ফটিক জল বায়ুহিল্লোলে বিভাড়িত। বৃক্ষ, জল ও নীড় প্রত্যাগমনশীল উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়া বাগানে প্রতিফলিত হইয়া কাঁপিতেছে। ফুলের ফসলে সে গন্ধ্যমোদিত। এত সৌন্দর্যের মাঝখানেও ব্রজেশ্বর এতটুকুও সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

রত্নমালা ডাকিল—“বাবা।”

ব্রজেশ্বর সঙ্গেহে কণ্ঠার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—

“কেন মা, আমি ত তোমার কাছে আছিই।”

“আচ্ছা বাবা, দাদারা আমাকে কেন এত বলত ? তুমি বুঝি আমার মত তাঁদের আদর কর না ?”

ব্রজেশ্বর চূপ করিয়া থাকিলেন।

রত্নমালা বলিল—

“বুঝেছি, তুমি তাদের বকে বকে। তাই ত আমাকে দেখতে পারে না। তা’ বকুগগে—দাদারা আমাকে দেখতে পারে না। তা’রা দেখতে পারে না। আমি পাই না কিছুই দেখতে। আমার চোখে অন্ধকার। আলো-আঁধার আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তবু শুনে শুনে আলো দেখতে কেমন ইচ্ছা করে। কবে আমার চোখ হবে বাবা ?”

ব্রজেশ্বর চোখ মুছিয়া বলিলেন—

“আরো বড় হ’লে তোমার চোখ হবে মা।”

“এ্যাং, তাই হয় বুঝি ! যা’ হয় তা’ ঐ ছেলে-বোনের হয়। বড় হ’লে, আর কিছুটা হয় না। তা না হ’লে

তুমিই আমার চোখ, তুমিই আমার সব কিছু। কি বল বাবা এঁাঃ? তোমার চোখেই ত আমি সব দেখি।”

সে কথার উত্তরে কি একটা বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিলেন না। ব্রজেশ্বরের তখন কণ্ঠ হুইয়া গেছে বন্ধ, চোখ হুইয়া গেছে ঝাপসা। চাঁদা ফ্যাপা সেই সময়ে আসিয়া আরো গোল বাধাইয়া দিল। অভ্যাস মত হুকার দিয়া চাঁদা বলিল—

“তাই ত বেরুজ বাবু, তাই ত! ভারী গোল—ভারী গোল ওখানটায়।

“কিসের গোল চাঁদু?”

এই সব চোখের, কানের, বুদ্ধির—ক’টাবল্‌বো আর বল? তোমাদের ও বাড়ীতে গিছলাম—তোমাদের জাতি গো! সেখানেও দেখে এলাম তোমার মেয়ের মত দুটা মেয়ে। অমন ছেলেও ত দেখছি অনেক বাড়ীতেই। তাই বলছিলাম—ভারী গোল, ভারী গোল!”

রত্নমালা জিজ্ঞাসিল—

“উনি কে বাবা?”

“তুমি ঠিক চিন্বে না মা”—বলিয়া চাঁদা হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল—

“তাই ত বেরুজ বাবু, এর একটা বিহিত না করলে ত চলছে না। এত চোখবোজা ছেলে মেয়ে নিয়ে তোমরা করবে কি? তোমাদের ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে দেখ দেখি, এমন বদ্বিষাতী করেন কেন তিনি। না না ও কথাটা আর জিজ্ঞাসা করে কাষ নেই। জিজ্ঞাসা করলেই প্রভু কারো না-কারো মুখ দিয়ে বলিয়ে দিবেন—ওটা কর্ম-ফল। বাস, সাফ জবাব।”

ব্রজেশ্বর বলিলেন—“সে কথা ত আমিও বলব।”

চাঁদা হুকারের মাত্রায় একটু কড়ি ও কোমল মিলাইয়া বলিল—

“বলই যদি, বোঝাই যদি, তবে তেমন কর্ম কর কেন বাপু? তা’ করে থাক, করেইছ। এখন থেকে নূতন পথে চল, কর্ম-ধারা বদলাও। বাস।”

কথাটা বলিয়াই ফ্যাপা চলিয়া যাইতেছিল। ব্রজেশ্বর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—

“মাচ্ছ যে? কেনই বা হঠাৎ এলে, কেনই বা

অমন একটা থাপ্‌ছাড়া কথা বলে চলে যাচ্ছ, সেটা বলে গেলে না ত!”

“হঁঃ—পাগলের আবার কথা! তবে একটা কথাও আছে বটে। সোঁদর বনের ভিতর আমার সঙ্গে একবার যেতে পার? যাও যদি, একজনের সঙ্গে তোমার মেয়ের সঙ্কে একটু বোঝাপড়া করি। কি বল?”

সেখানে কি—সে ত বাঘের আড্ডা!”

আরে মশায়, মানুষ-নারায়ণ হ’তে পারে, আর বাঘ-নারায়ণ হ’তে পারে না বুঝি?—বারে! ও সব নারায়ণ, সব নারায়ণ। বুঝলেই বোঝা যায়, না বুঝলে যে অন্ধ-কার, সেই অন্ধকার। তা’ দেখ বেরুজ বাবু, তুমি যদি পান্দুী কি বজ্রা ঠিক কর, তা’ হ’লে একবার বেয়ে-চেয়ে দেখি।”

“আচ্ছা বিবেচনা করে দেখব।”

“হুত্তরি বিবেচনা! ঐ বিশ্বাসহীন বিশ্বত্মল বিবেচনাই ত তোমাদের জাহান্নামে দেয়।”

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদা ফ্যাপা অদর্শন-ধারবান ভূত্য প্রভৃতি প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রত্নমালা জিজ্ঞাসা করিল—

“ও কে বাবা?”

“কেউ বলে পাগল, কেউ বলে ভাঁড়, আর কেউ বা বলে সাধুপুরুষ।”

“তুমি কি বল বাবা?”

“কিছুই না।”

“আমি বলি, উনি খুব ভাল লোক। কি বল বাবা?”

“কিসে বুঝলে ভাল লোক?”

“তা’ বুঝব না কেন গো? যে মানুষ ভগবানের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়, সে যা তা লোক বুঝি? তুমি এটাও বুঝতে পার না বাবা?”

ব্রজেশ্বর অপ্রস্তুত হইলেন। স্তব্ধতা নিরন্তর। রত্নমালা বলিল—

“কিছু বলছনা যে বাবা? রাগ করলে বুঝি? আচ্ছা বাবা, তুমি ত বল তোমার মা-মেয়ে আমি দুইই। তবে আমার কথায় তুমি রাগ করবে কেন বাবা? আমি

এতটুকু মা বলে বুঝি। তা' হবে না বাবু। মা চির-
কালই মা—ওর আর ছোট বড় নেই।”

ব্রজেশ্বর নির্ঝাঁক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাল
মানুষ সাজিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া তিনি তাঁহার মা-বাপের
যথাসম্মান আজ্ঞাসংক্রিয় নিজেই জীবন নামে কুরিয়া
লইয়াছেন। চোখের জল তাঁহারা ফেলিয়াছিলেন অনেক।
এখন তাঁহারা লোকান্তরে। সেই সকল কথাই ব্রজেশ্বরের
আজ মনে পড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিতেছিলেন—
তাঁহার এতটুকু মেয়ে এবং তাঁহাতে কত তফাৎ!

জল অগ্নি নির্ঝাঁপিত করে। কিন্তু চোখের জলে
আছে বোধ হয় অভিশাপের অনল। দহন-জ্বালা অভি-
শপ্তকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। ব্রজেশ্বরের সেই দশাই
হইল।

রত্নমালা জিজ্ঞাসা করিল—

“পাল্‌কী এল কা'র বাবা?”

“পাল্‌কী! কৈ না ত!”

“হুঁ হুঁ—নিশ্চয়। হুম্ময়োগি শব্দ কানে গেছে
আমার।” পাল্‌কী ঐকথানা ঠিক্‌ই প্রাঙ্গণে প্রবেশ
করিয়াছিল। ব্রজেশ্বর তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

মহেন্দ্র পাল্‌কীর পশ্চাতে ছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া
ব্রজেশ্বরকে সংবাদ দিল—কোনো দুষ্ট লোক ইচ্ছা মারিয়া
রত্নেশ্বরকে ভীষণ জখম করিয়াছে। রত্নেশ্বর অজ্ঞান হইয়া
পড়িয়াছে। মহেন্দ্র রত্নেশ্বরের সঙ্গেই ছিল। পাল্‌কী
ডাকাইয়া সেই রত্নেশ্বরকে বাড়ী আনিয়াছে। পাল্‌কীর
ভিতর রক্ত-গন্ধ।

সংবাদ শুনিয়া রত্নমালাকে টানিতে টানিতে ব্রজেশ্বরের
পাল্‌কীর অভিমুখে ছুটিলেন। রত্নমালা তখন কাঁদিতে
কাঁদিতে কেবলই বলিতেছে—“দাদাকে ভাল ক'রে দাও
ঠাকুর।”

ক্রমশঃ

জয়

শ্রীনমিতা দেবী

হে মরণ,
আমারে কি পারো তুমি করিতে হরণ?
ফুল ঝরে যায়
ধরণীর গায়
ফলে ফুলে বীজে তার সবুজ অঙ্গুর,
জীবনের সুর,
তোমার করাল ক্রোড়ে কালের বজ্রায়।
আমার কঙ্কাল যদি ভেসে চলে যায়,
বাধাহীন গভীর ছোটে অবিরাম,
অনন্ত আকাশ তলে নাহিক বিরাম।
সবুজ অন্তর,
গ্রহ হতে ছোটো গ্রহান্তর,
ধরণীর বুকে,
সৃষ্টি তার হেসে ওঠে সুরে।
শীতের উত্তরী হিমবায়ু,
কেমনে তরুর নেবে আয়ু?

দখিনা বাতাসে পাতা ঝরে' পড়ে যায়,
নাচে পুনঃ নব কিশলয়,
জীবনের জয়।

প্রভাতের ফুল ঝরে সন্ধ্যার বাতাসে
গন্ধ তার স্মৃতি বহি আকাশেতে ভাসে।

মন্দির করিয়া সারা বনে—
কবিতা লিখিয়া রাখে অমর লিখনে।

মোর এই ধরাভল হতে
আমি যদি চলে যাই দূর যাত্রা পথে,
মৃত্যু নাহি—মৃত্যু নাহি—হেথা হতে নবীন জীবনে,
সেখায় যাইব ছুটি' জীবনের মহাজয় গানে।

স্বপ্নে বাঁধি মনোবীণাখানি,
নিত্য আমি আত্মার সঙ্গিনী;

নহে যাহা চিরন্তন সে তোমারে কল্পক না ভয়,
হে মরণ, আমি জানি মোর চির জয়!

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

গতমাসে ইয়ুরোপের যা খবর দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে এ মাসের খবর আরও অনেক ঝরপ। সেটা কিন্তু কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। ইয়ুরোপের গতি যে ভাবে চলছে তার ফলও তাই সেই রকম হবে। যদি লোকে বিশ্বাস করে যে জোর যার তারই সব মূল্য তা হলে সৈন্ত, যুদ্ধের জাহাজ, বন্দুক কামান, গোলা গুলি ছাড়া আর কি ভাবে লোকে নিজেকে রক্ষা করে? হিটলার তো সমস্ত চেকোস্তোভাকিয়া নিয়ে নিয়েছে। চেক জাতির স্বাধীনতা বলতে আর এখন কিছু নেই। তারা কি চায় তা'ও মুখ ফুটে বলবার অধিকার আর নেই তাদের।

এদিকে ইটালি নিয়ে নিয়েছে আলবেনিয়া। পাহাড়ের কোলে শুয়ে আছে এই ছোট দেশটি। এখানকার অধিবাসীরা বেশীর ভাগ মুসলমান ধর্মাবলম্বী। ইটালিয়ানরা হঠাৎ তাদের সমুদ্র উপকূলে গিয়ে হাজির হ'ল কতকগুলি যুদ্ধের জাহাজ নিয়ে। আকাশ থেকে উড়ো জাহাজের সাহায্যে বোমা ফেলতে লাগল সেই দেশবাসীর উপর। তারপর একরাশ সৈন্ত নিয়ে দেশের ভিতর ঢুকে পড়ল। নিরপায় হয়ে আলবেনিয়ার রাজা জোগ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। আর তাঁর রাণী জেরেলডাইন তিন দিনের শিশু পুত্রকে নিয়ে দেশত্যাগী হ'লেন। এখন তিনি গ্রীসে। শরীর তাঁর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

এখন দেখা যাচ্ছে যে যদি কারু দেশ ছোট হয়, আর যদি তাদের সৈন্ত সংখ্যা বেশী না থাকে আর যদি তারা যুদ্ধের জন্তে প্রস্তুত না থাকে তা হলে হয় জার্মানী নয় ইটালি তাকে গ্রাস করবে। কিন্তু মালুম কি কেবল সৈন্ত সামন্ত আর গোলা গুলি নিয়েই বাস করবে? অল্প কোন উপায় নিশ্চয় বের করতে হ'বে যাতে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয় কারণ মালুম কেবল মারপিটের মধ্যে বাস করতে পারে না।

ভারতবর্ষ ইয়ুরোপ থেকে অনেক দূরে তাই অনেকে মনে করতে পারেন যে ইয়ুরোপের যুদ্ধের আঁচ এখানে এসে পড়বে না। ভারতের নিজের সৈন্ত, যুদ্ধের জাহাজ ইত্যাদি কিছুই নেই। যা আছে তা' ব্রীটিশদের হাতে। তারা যদি তাদের সৈন্ত, জাহাজ, ইত্যাদি জার্মানি ও ইটালির সঙ্গে যুদ্ধের জন্ত সরিয়ে নিয়ে যায় তবে আমাদের এই রকম দুর্বল অবস্থায় পেয়ে জার্মানি হয়ত চেকো-স্তোভাকিয়ার মত আমাদেরই ঘাড়ে এসে পড়বে আর তাদের নিয়ম কানন জোর করে চালাবে আমাদের উপর। কিম্বা স্ববিধা বুঝে জাপানও এসে যেতে পারে। যে জাতি কেবল জোরের উপর রাস্তা বাঁধে তাদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা করা যায় না।

তারা নিজেদের ইচ্ছামত চলবে, কারো মুখ চাইবে না। কিন্তু এই জোরের রাজত্ব আর টিকবে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এরাও এক সময় জোর কোরেই তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, কিন্তু সেটা হয়েছিল প্রায় দু'শ বছর আগে আর এখন তারাও আস্তে আস্তে বুঝছে যে শুধু জোরের উপর রাজত্ব করা চলে না, তারাও অল্প অল্প করে তাদের অধিনস্থ দেশগুলিকে স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছুক। এরই মধ্যে আবার জার্মানি ও ইটালি দুর্বলের উপর বল প্রয়োগ করে সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারটিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে বসেছে। এদের খামাতেই হ'ব।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুসভেল্ট এই সম্বন্ধে একটি স্বন্দর প্রস্তাব এনেছেন। তিনি সব দেশকে একত্রিত হ'বার জন্তে আহ্বান করেছেন। তাঁর ইচ্ছা সব জাতি, সব দেশ এক সঙ্গে মিলে একটি বৈঠক গঠন কোরে তাতো যার যা অভাব অভিযোগ আছে তা' বলুক। শান্ত ভাবে বিচার ও বিবেচনা করে প্রত্যেকেরই অভাব মোচনের চেষ্টা করলে যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না। সব দেশ সব জাতিকে

বাঁচতে হবে। এই বাঁচবার জন্ত প্রত্যেকেই কোনে না কোন জিনিষের প্রয়োজন আছে। যার যা প্রয়োজন তা যদি সবাই মিলে বিবেচনা করে তাকে দিয়ে দেয় তা' হ'লে জোর করে কেড়ে নেবার প্রয়োজন হয় না। শুধু তা' হ'লে দেশের অর্থিক ধন সম্পদ গোলা গুলির পিছনে জলাঞ্জলি দিতে হবে না।

ভারতবর্ষকেও এই আন্তর্জাতিক বৈঠকে যোগ দিতে হবে। তারও অনেক কিছু অভাব অভিযোগ আছে। যদি শান্তি রক্ষার্থ এইরূপ আন্তর্জাতিক সভা বসে তা হ'লে আমাদের দেশ-নেতাদের দেখতে হবে যাতে তার তার সত্যদাবী থেকে বঞ্চিত না হয়।

ব্রহ্ম-মানব

শক্তির সাথে চেতনার শিব এক হয়ে দোলে ছন্দে,
তারি রস থেকে ঝরে প'ল রূপ পরশে ও রসে গঞ্জে।
নিগুণ থেকে গুণ ঝরে হোল দানা বেধে রূপ সৃষ্টি,
দেবদেবীবেশে রূপ-নরনারী মতে মেলিল দৃষ্টি।
আদিমচিন্ত বন্ধনহারা অসীমের মাঝে বাস তার,
আদি স্তম্ভর স্তম্ভরী-সাথে বিধে করিল রাস তার।
দোল দোলাদোল লীলাহিন্দোল লীলায় নাচিল বিশ্ব,
শক্তির শিশু সৃষ্টির কোলে দোলাইল নিজদৃশ্য।
ভুবন ব্যাপিয়া অসীম হইয়া ভ্রমিল মানব ছন্দি,
প্রকৃতির শিশু সৃষ্টির দেহ করেছিল বৃকে বন্দি।

শুধু—এ জীবন ছিল একখানি গানতাল গো,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া অসীম মিলনে বাঁধা ছিল মহাকাল গো।
জীবনের বেদে নাহি ছিল ভেদ ছিল নাকো ছেদবন্ধন,
গণ্ডীবিহীন ছন্দের মত ছিল অমৃতের নন্দন।
চন্দ্রে সূর্য্যে তারকায় তা'রা বাঁধি জীবনের মাণ্ড্য,
প্রকৃতির মধু চন্দন মাখি' হয়েছিল নির্মালা।

শ্রীশৈলীজনাথ তট্টাচার্য

মৃত্যুরে সে যে করেছিল দাস, যম তারে দিত বর গো।
নিয়তি যে তার শঙ্কায় ছিল কম্পিতা থর থর গো।
চৈতন্য ও শক্তির তেজে ছিল সে যে মৃত্যুঞ্জয়,
স্তম্ভর চির স্তম্ভর সে যে করেছিল রূপ গুণ জয়।
আজো তার সেই আদি ভাবধারা অন্তরে করে কলকল,
ফিরে যেতে সেই মধু-উৎসবে প্রাণ করে তার টলমল।
ওই যে আবার অরূপ গোবুল চাণ্ডিককে দোল দেয় তা,
উজ্জানের গানে আকাশের তলে বাঁশী বেজে ওঠে বাঁধন।
পুনঃ তার হৃদপদ্মে যে বাজে ব্রহ্মার মহাবীণ গো,
উঠে বাজার উঠে টঙ্কার উদ্দাম নিশিদিন গো।
জীর্ণ ধরার বাঁধন ছিঁড়িয়া একদা বিরাট ছন্দে,
সব অবসাদ মথিয়া আবার দাঁড়াবে সে মহানন্দে।
সকল জাতির সব হীনতার কর্মেরে করি চূর্ণ,
আদি সৃষ্টির স্বধাবৃষ্টিতে করিবে সে ধরা পূর্ণ।

সে—শিব-সাথে পুনঃ দাঁড়াবে মানব হৈহু,
গণ্ডী ভাঙ্গি' পে ব্রহ্মে নাচিবে তাইথে; তাইথে; থৈচা।

লক্ষ্মীর বাঁপি

বুদ্ধিমান ব'লেই বাঙ্গালীর পরিচয়। কিন্তু আওতায় প'ড়ে এই জাতিটা এখন বিপরীত পরিচয় দিচ্ছে। বিগত ১লা এপ্রেল—“বোকার দিনে” অনেককেই বৈবাক বোকা দেখা গেল। নিমন্ত্রিত হ'য়ে কেউ সেবা ক'রে এসেছেন অর্দ্ধ পয়সার মুড়ি, ময়দার সরবৎ, আর কেহ কেহ দেখে এসেছেন আস্থায়কের দ্বার তাল। বন্ধ। বুদ্ধিমান ব'লে পরিচয় দিয়েছেন তাঁ'রাই, যাঁরা আঠারই চৈত্র অর্থাৎ পয়লা এপ্রেল তারিখে নিমন্ত্রণ পেয়ে পাল্যা জবাবে লিখে পাঠিয়েছেন—বন্ধ হে ভারী ব্যস্ত আছি ব'লেই তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়ে উঠলাম না।” মেয়ে-মহলেও ঐ স্মরণীয় দিনের বাড়ি বাপুটা পৌঁছেছিল ব'লে শুনা যাচ্ছে। সাগরপারের রত্নরসের নকল দানা গ্রাম-স্বত্ব-দর্শনাদির দেশ বিকিয়ে যাচ্ছে দেখে অনেকের সঙ্গে আমরাও বিস্মিত হয়েছি। কথকতার দিন চ'লে গেলেও “নিরঙ্কুশ কবি” :বাগজ চেপে তবু সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন—আঠারই চোত, পয়লা এপ্রেল, ভাবী ভয়ের কথা,

এপ্রিলি ফুল বানিয়ে রাবা থেয়োনা আর মাথা!

রত্নরস বটে! কিন্তু ও রস-সাহিত্য বুঝে কে—কয়জন?

এতটুকু এ্যালবেনিয়া রাজনৈতিক কারণে ইটালীর কুক্ষিগত হ'ল এক নিমেষে। জার্মানী বোধ হয় এখন কিছুকাল ঠাণ্ডা হ'য়েই থাকবে। জার্মানী-ইটালী—ওঁরা দুই ভাই। এক ভাই যখন সরব হ'ন, আর এক ভাই থাকেন নীরব। বন্দোবস্ত হয়েছে ভাল। কিন্তু ভগবানের মার ভারী মার। দপী-দস্তী সেটা বুঝেও বুঝে না, মুঞ্চিল ত ঐখানে। এলা ছইলার উইল্‌ক্সের গোটা কয়েক লাইন এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করি :—

O men, wise men, superior beings, say
Is there no substitute for war in this
Great age and era? If you answer
“no”,
Then let us rear our children to be
wolves
And teach them from the cradle how
to kill.

মহিলা কবি যা লিখেছেন, বীরপুঙ্খবেরা কি তা'র কিছুই বুঝেন না?

—o—

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি সাম্প্রদায়িকতা চালাবার বিধিমত বন্দোবস্ত হচ্ছে। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ঐ বিরাট প্রতিষ্ঠানটা গ'ড়ে উঠেছে কা'দের টাকায়, কা'দের পণ্ডা এবং কা'দের মস্তিষ্কের জোরে, তা'র উত্তর দিতে হ'লে বন্দোবস্তকারীদের লজ্জা এসে পড়বে আপনাই। থাকতেন স্যার আশুতোষ, তাহ'লে বিষ নামা'তে হয় কেমন ক'রে সেটা ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিতেন তিনি। বিদ্যা-মন্দিরে এমন সাম্প্রদায়িক প্রচলন-চেষ্টা নিতান্তই অশোভন ও অদ্ভুত।

—o—

বাংলার জলধরদা' আশী বৎসরের পর সাহিত্যাকাশ থেকে স'রে গেলেন সাহিত্য ক্ষেত্রকে মরুভূমি করে। তাঁর যাত্রা শুরু হ'য়েছিল হিমালয়ে, তখন ছিলেন তিনি নবীন। যাত্রা শেষ করলেন তিনি অশীতি বর্ষে গৌরব মণ্ডিত হ'য়ে। এবারকার যাত্রা তাঁ'র ভবসিদ্ধি পোঁরে। ফেরবার আর উপায় নাই। অজাতশত্রু হ'বার সকল গুণই ছিল তাঁর। তা'তেও কিন্তু শত্রুর হস্ত থেকে তিনি পরিত্রাণ পান নাই। তাঁর তিরোধানে শত্রু মিত্র সকলেই অশ্রু বিসর্জন করছে। তিনি গৌরবধ্বজ মরণ রথে

আরোহণ করায় আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করছি; সেই সঙ্গে সমবেদনা, সহানুভূতি প্রকাশ করছি তাঁর শোকে মুহমান সন্তান সন্ততি, স্বগণ স্বজনগণের প্রতি। শ্রুতি তাঁকে জাগিয়ে রাখবে আগামীগণের হৃদয়ে। গৌরবের মরণ বরণ করে রায় বাহাদুর জলধর সেন জয়যুক্ত হয়েছেন। আমরা তাঁর অক্ষয় স্বর্গ কামনা করি।

—•—

রাজা লক্ষণসেনের অব ১২৪৬ সাল আরম্ভ হ'ল বিগত পয়লা বোশেখ থেকে। নববর্ষকে আমরা অভিনন্দিত করি, স্বাগত সন্তাষণ করি। বিগত বৎসরটা চ'লে গেছে অনেক দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে। অর্থকষ্ট, অন্নকষ্ট, শোক তাপ, রোগ, অমর্যাদা, যুদ্ধভীতিতে বিশ্বের দরবার ভেঙ্গে পড়েছে। স্বহৃদে, বিদ্রোহ, অকল্যাণ ধুমকেতুর মত আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছে সারা বিশ্বে। সাল-তামামি নিতান্তই অকরণ। কাল অনন্ত, আশাও অনন্ত। সেই আশায় আশাবিত্ত হ'য়ে “প্রসাদ কবির” ভাষায় নববর্ষের প্রশস্তি করি—

পুরাতন আজ তোমারে বিদায়, স্বাগত নূতন বর্ষ।

নবীন আশায় নূতন ধারায় জাগাও জাগাও হর্ষ।

—•—

ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিনা পুঁজিপাটায় বেলেঘাটায় একটি হাঁসপাতাল গড়ে তুলতে পেরেছেন শুনে আমরা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেছি। এই গড়নের মুখে আছে আন্তরিক চেষ্টা ও প্রাণপাত পরিশ্রম। ষাঁদের উদারতা ও কর্মকুশলতায় বেলেঘাটায় হাঁসপাতাল বহু বিঘ্ন অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তাঁ'রা দেশবাসীর ধন্যবাদার্থ। এই হাঁসপাতালে মহিলাগণের স্বচিকিৎসা হ'বার বন্দোবস্ত থাকবে শুনে বর্জপক্ষগণকে আমরা আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এমন হাঁসপাতালের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। কলিকাতা কর্পোরেশন, বাংলা সরকার এবং দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায় এই সকল প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি

স্বদৃঢ় হ'তে পারে। সে চেষ্টা হ'বে কিনা ভবিষ্যতাই বলতে পারে। কিন্তু ইতোমধ্যে যদি বহুবাজার, কোলার বাজার শিয়ালদহের বাজার প্রভৃতির সজ্জাধিকারীদের বাজারের “তোলায়” কিম্বদংশ এই বেলেঘাটার আত্ম-প্রতিষ্ঠানে দান করেন, তাহ'লে রোগী-রোগিণীদের পথের ব্যবস্থা ভালই হয়। এ ভালয় দাতাদের ভাল কিছু কম হবেনা। এই সঙ্গে পুরীস্থিত বসন্তকুমারী আশ্রমের কথাটাও মনে করিয়ে দিই। দাতার দান ইহকাল ও পরকালেও কীৰ্ত্তি ঘোষণা করে। এ ঘোষণা উপেক্ষা বস্তু নহে ত!

—•—

“বাসুদেব” একখানি মাসিক পত্র—প্রকাশ হয় ৮ বি বিবেকানন্দ রোড থেকে। সম্পাদক—পণ্ডিতপ্রবর চারুকৃষ্ণ তর্কতীর্থ। পত্রখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু এই পত্রের মধ্যে “সোণা মাটি, মাটি সোণা আছে।” এই মাটি-সোণা র কৌশলী কি অপকৃষ্ণ মূর্তি গড়েছেন, “বঙ্গলক্ষ্মী” পাঠক পাঠিকা তা'র সন্ধান নিন্। রহস্য-জাল বিস্তার করার উদ্দেশ্যে আমরা সে শিল্পীর নামোল্লেখ করলাম না। শ্রীমতী গীতাদেবী আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীমতী অনিলা দেবী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাণী-পীঠের পূজারিণী ও পূজারীর রচনা উপাদেয়। অগ্রান্ত রচনাগুলি ধর্ম্ম্য তত্ত্ব নিহিত গুহায়াম্। তা'তে কাগজ চলা স্বকঠিন। যে যুগে নোংরা ছবি, নোংরা গল্প-কবিতা এবং তা'র অপেক্ষাও অনেক নোংরা জিনিস মাসিকপত্রকে সমৃদ্ধ করে, সে যুগে “বাসুদেবের” স্থান কোথায় হ'বে, সেটা অহুমান করা শক্ত নয়। তবে কবি প্রসাদী-সাধনার ভাষায় চা'ক চালিয়েছেন—

ভুলোনা দেখিয়া সোনার স্বপন—অনিত্য সোণার বোন,
নিজে সোণা হও, সোণা চিনে নাও—সোণা মাটি, মাটি

সোণা!

“বাসুদেবের” বৈশিষ্ট্য এখানে। সাধু সাধু। “বাসুদেবের” প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই আমাদের শুভেচ্ছা।

—•—

এতদিন ই, আই রেলওয়েতেই যত কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছিল; ই, বি রেলওয়ের একটু সুনাম ছিল ও বিষয়ে। কিন্তু বিগত ১৬ই এপ্রেল তারিখের ঢাকা-মেলের সংঘর্ষে ই, বির সুনাম নষ্ট হ'য়ে গেল। মজার কথা—এই এঞ্জিন-চালক নাকি সিগ্‌ন্যাল—বিপদের সঙ্কেতও মানে নাই। ঢাকা মেলের সংঘর্ষ হয় নর্থ বেঙ্গল রেলওয়ের গাড়ীর সঙ্গে। হতাহতের সংখ্যা অল্প নয়। রেল কোম্পানীকে পয়সা দিয়ে তা'রা প্রাণ হারাল। পুরুষ ও স্ত্রীলোক ছিল-গাড়ীতে অনেক। তাদের মধ্যে কতজন হত, কতজন আহত—সেই সংবাদটুকুই আমরা জানতে চাই। উপযুক্ত রেল-দুর্ঘটনা হ'য়ে গেল অনেকগুলি। তথাপি রেল দুর্ঘটনা বন্ধ করবার বিশেষ কোনো আয়োজন দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাপারটা কি? এমন ব্যাপার চলতে থাকলে রেল-পথে ধন-প্রাণ নিয়ে মানুষের যাতায়াত করা আদৌ নিরাপদ নয় এবং যাওয়া-আসাও উচিত নয়। মানুষের প্রাণ এত সস্তা নয় যে খামকা খামকা তা' নষ্ট হ'লেই হ'ল। রেল-যাত্রীদের রূপচাঁদ দেওয়া বন্ধ হ'লেই রেল-কর্তৃপক্ষের তখন সাড় হ'বে—এই সব কাণ্ড যা'তে বন্ধ হয়, ভবিষ্যতে যা'তে এ সব কাণ্ড আর না ঘটে, তখন তা'রা চেষ্টা করবেন। ফিস্‌প্লেট সরান, এঞ্জিন চালকের অবাধ্যতা গোঁয়ার পনা প্রভৃতির কথা শুনে আমাদের কোনো লাভ নাই। আমরা চাই নিরাপদ হ'তে। দেশের লোকের টাকা দেওয়া বন্ধ হ'লেই কর্তৃপক্ষ আপনাআপনিই সতর্ক হ'বেন। আবেদন-নিবেদনের অপেক্ষা এ মন্তাই হচ্ছে বিশেষ শক্তিশালী।

শিল্প-প্রদর্শনীর অজু হাতে এই সেদিন গোটা ওয়েলিংটন স্কোয়ারটা ঘেরাও হ'য়েছিল প্রায় এক মাস কাল। তা'র

ক্ষতচিহ্ন স্কোয়ারের অনেক স্থানেই এখনো দেখতে পাওয়া যায়। সে চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হ'তে না হ'তেই স্কোয়ারের অর্দ্ধেকটা ঘেরাও হ'ল কংগ্রেসী সভামণ্ডপের জন্ত। সাধারণের দাক্ষণ অসুবিধা ক'রে এই সকল কাণ্ড যে ক্ষমাগতই হ'য়ে চলেছে, তা'র জন্ত দায়ী কে বা কাহারো? প্রশ্নটা করা হচ্ছে পৌর-সভার সদস্যগণকে। বেড়াবার জায়গা অমনভাবে ঘেরাও হয় যদি বৎসরের অর্দ্ধেক কাল, ছেলেপিলে নিয়ে মানুষ ইপ্‌ছাড়া বার স্থান পায় কোথায়? ওঁদের যদি এত সভা-সমিতি-প্রদর্শনী করতে হয়, ওঁরা জমী খরিদ ক'রে মণ্ডপাদি প্রস্তুত করেন না কেন? করদাতৃগণের অধিকারের উপর এ ভাবে হস্তক্ষেপ করলে, তা'রা সেটা সহ্য করবে না ত? 'স্বাস্থ্য রক্ষা কর, স্বাস্থ্য রক্ষা কর' ব'লে বক্তৃতাও হ'বে, আর সেই সঙ্গে ফরাদা জায়গাগুলো অহেতুকী রূপার এইভাবে বন্ধ হ'বে—ওটা স্রায়ের স্ত্রজ নয় ত!

—o—

অব্যবস্থিত চিণ্টের প্রসাদও যে ভয়ঙ্কর; এ কথা—নীতিকার লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু টেলিফোন সাহায্যে শুভার্থী পরম উপকারী জনকে আহ্বান ক'রে এনে তাঁকে অহেতুকী রূপাবশে দর্শনদানে বঞ্চিত করার সৌজন্ত অধিকতর ভয়ঙ্কর। এ কালে সে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে একজন প্রথিত যশা কবির। কবি সেই ব্যাপার নিয়ে একখানি কেতাব লিখছেন। কেতাব প্রকাশিত হ'বে আচরেই। কত গুপ্ত বাণী তা'তে কাণাকানি হ'বে যে সেই কথা ভেবেই আমরা আতঙ্কিত হচ্ছি। এর উপরেও আর এক ডিগ্রি আছে—সেটা পিতার অভিশাপ। গল্পটা ভারী জমাট। গল্পটা যদি হস্তগত হয়, "বঙ্গলক্ষ্মী" পাঠক পাঠিকাকে আমরা সেটা উপহার দিব।

—o—

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ্চন্দ্র ঘোষ

মুঙ্গের পৌরসভায় বঙ্গরমণী কমিশনার

বিহার গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি শ্রীমতী রেণুবালা মুখোপাধ্যায় বি-এ কে মুঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার মনোনীত করিয়াছেন। ১৩৩৭ সালে শ্রীমতী রেণুবালা দেবী গোহাটি কটন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিহার সরকারের মোটারযান বিভাগের অফিসার মিঃ এল পি মুখার্জী তাঁহার স্বামী। সেই স্বত্রে তিনি মুঙ্গেরে বাস করিতেছেন। বিহার সরকারের এই মনোনয়নে বাঙ্গলার রমণীরা পরম আনন্দিত।

বাঙ্গলা সরকার কোন রমণীকে কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিশনার বর্তমানে মনোনয়ন করেন নাই, এমন কি কলিকাতায় পৌর সভাতেও নয়।

“গীতশ্রী”

চারি বৎসর যাবত সম্মিলনী মেয়েদের মধ্যে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা পরীক্ষার প্রচলন করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীকে “গীতশ্রী” পদবীতে ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “গীতশ্রী” নামকরণ করিয়া দিয়াছেন।

লক্ষ্মী মরীচ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রতন বাকার মহাশয় সঙ্গীতজ্ঞ কয়েকজনের সহিত পরীক্ষা গ্রহণ করেন। বর্তমান বর্ষে কুমারী শীলা সেন ও কুমারী আরতি দাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া “গীতশ্রী” পদবী পাইয়াছেন।

প্রথম বর্ষে গীতা দাস, ইভা গুহ ২য় বর্ষে রেণুকা মোদক, বিজলী দত্ত ও শান্তিলতা ব্যানার্জী, ৩য় বর্ষে মনিষা গুপ্ত “গীতশ্রী” পদবী পাইয়াছেন।

কুমারী শীলা সেন পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ এস, পি, সেনের কন্যা ও সার কে, জি, গুপ্তের দৌহিত্রী এবং শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার দাসের কন্যা।

মুসলমান রমণী এফ-আর-সি-এস

মিস্ আমুদা গোলাম মহাম্মদ এভিনবার্গ হইতে এফ, আর, সি, এস্ নামক দুক্কহ ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়াছেন। ইহার পূর্বে কোন মুসলমান মহিলা এফ, আর, সি, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই।

বাঙ্গলায় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রসার

বাঙ্গলা সরকারের ১৯৩২ হইতে ১৯৩৭ সাল এই বার্ষিক বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে, বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হইয়াছে।

বাঙ্গলায় মোট ৫০টি আর্টস কলেজ তার মধ্যে ৩৬টি ছাত্রীদের জন্য, এতদ্ব্যতীত ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি কলেজে ছাত্রী-বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং কয়েকটি কলেজে সহ-শিক্ষার প্রচলনও আছে।

১৯৩২ সালে উনিভারসিটিতে ও কলেজ সমূহে ৩২ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিত, ১৯৩৭ সালে এই সংখ্যা ১০৫৪ পাইয়া ১০৫৪ হইয়াছে। মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩২ সালে যেখানে আটটি মুসলমান ছাত্রী ছিল ১৯৩৭ সালে সে স্থলে ৪৫টি ছাত্রী হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে ১৯৩২-৩৩ সালে রায় বাহাদুর বিহারীলাল মিত্র হিন্দু জীলোকদের শিক্ষার উন্নতিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে মাসিক ৪ হাজার টাকা আয়ের সমর্থন উইল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনা হইতেছে। মিস্ জ্যোতিপ্রভা দাসগুপ্ত এম-এ, বি-এ, ডিপ, এড (লগুন) বিহারী লাল ফেলোশীপ হইতে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে নানা নারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়াছেন।

মেয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দেশে দ্রুতহারে বর্ধিত চলিতেছে, ইহা যেমন আনন্দের কথা তেমনি আশঙ্ক্যের কথা। শিল্প ও সংস্কৃতির প্রয়োজনে মেয়েদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে উদ্দেশ্য লইয়া মেয়েরা কলেজে কি পড়িতে যায়, বা সেই প্রাপ্ত জ্ঞান লাভই কি হইতেছে?

পূর্ণ প্রথা ও বেকার সমস্যার জ্বলুমে ছেলেরা অধিকাংশ স্থলেই বিবাহে সম্মত হয় না—তাই বাধ্য হইয়া মেয়েদের শিক্ষা করিয়া না রাখিয়া কলেজে পাঠাইতে হয়। অতঃ

উপায়হীন, পারিবারিক বন্ধনহীন জনতা সৃষ্টিই যেন উচ্চ শিক্ষার পরিণতি হইয়া উঠিয়াছে ; এমন শিক্ষার প্রসার জাতির বা সমাজের মঙ্গলকর নহে।

ঝাড়গ্রাম বিদ্যাশাগর বাণী-ভবন

কলিকাতায় নারী-শিক্ষা-সমিতির পরিচালনায় বিদ্যাশাগর বাণী ভবনে ৬০ জন হিন্দু বিধবাকে বিনা খরচায় এমন কি খোরাকী ও বাসস্থান দিয়া শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়।

লেডী অবলা বহুর পরিকল্পনায় মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনের উদ্যোগে ও ঝাড়গ্রাম রাজবংশধর কুমার নরসিং দেব মল্ল মহাশয়ের বদান্যতায় গত ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রামে বিদ্যাশাগর বাণী ভবনের একটি শাখা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। ঝাড়গ্রাম রাজ সরকার ৫০ বিঘা জমি ও মাসিক ১০০ টাকা খরচ জ্ঞাত দান করিয়াছেন। মিঃ বি, আর, সেন গৃহ নির্মাণের জন্য ৭৫০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। নারীশিক্ষা সমিতির তহবিল হইতে ৫০০০ লওয়া হইবে। ত্রিশটি বিধবা সেই স্থানে শিল্প শিক্ষা পাইবেন।

বিদ্যাশাগরের জিলায় বিধবাদের মঙ্গল-প্রতিষ্ঠান স্থাপন খুবই সমীচিন। পল্লীর আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে এই প্রতিষ্ঠানের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ভিত্তি স্থাপন উৎসবের সভায় কুমার নরসিং দেব মল্ল সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বেদগান ও উল্লুপনির মধ্যে মিঃ বি, আর, সেন ভিত্তি স্থাপন করেন। নারীশিক্ষা সমিতির তরফে লেডী বহু, মিসেস এস আর দাস, শ্রীমতী সুনীতি সরকার, শ্রীমতী অমিয়া দেব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও লেখক যোগদান করিয়াছিলেন।

রাজবন্দিনীদের মুক্তি

বাঙ্গলা সরকার দুই বৎসরের মধ্যে সমস্ত মহিলা, যাহারা বিনা বিচারে আটক এবং হত্যাপরোধে দণ্ডিত তাহাদের মুক্ত করিয়া দিয়া পরম দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বহু পূর্বে লীলা নাগ, কল্যাণী দাস, রেণু সেন, বিমলপ্রতিভা দেবী প্রভৃতি বহু রাজবন্দিনীকে মুক্তি

দিয়াছেন। সম্প্রতি বীণা দাস, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, অমিয়া মজুমদার, কল্লনা দত্ত যাহারা নরহত্যা অপরাধে অপরাধী বিশেষত দুজন গর্ভনারের জীবন গ্রহণে উদ্যোগে রমণীদের মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। ধন্য ব্রিটিশ শাসন প্রণালী, অপার তাহাদের উদারতা। এই সৎসংগের স্ববিধা বিপথ গামিনী মহিলারা গ্রহণ করিয়া তাহারা সমাজের ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেই মঙ্গল।

ব্রতচারী মহিলা শিক্ষা কেন্দ্র

আজ দুইমাস ব্যাপিয়া ব্রতচারী সঙ্ঘ সরোজনলিনী শিক্ষা-মন্দির-প্রাঙ্গণে যে মহিলাদের ব্রতচারী পণ, প্রথা, নৃত্য, গীত, কৃত্য আদি শিক্ষাদানের ক্লাস পরিচালন করিতে ছিলেন, তার সমাপ্তি-উৎসব গত ২২শে এপ্রিল হইয়াছে। মিসেস হাশিনা মুরসেদ এম, বি, ই ; এম, এল এ, এই উৎসব সভায় সভানেতৃত্ব করিয়া প্রশংসা পত্র, পুরস্কার ও পদক বিতরণ করিয়াছিলেন।

মেয়েদের মধ্যে ব্রতচারী প্রচেষ্টার আদর ও আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এবার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬২ ছিল। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়া সমান আগ্রহে ব্রতচারী পণ, কৃত্য, নৃত্য, গীত পরম আনন্দে শিক্ষা করিয়াছেন।

এবারকার উৎসবে মেয়েদের বুড়ি ঝাড়ু হস্তে কোদাল কাঁধে বাদ্য বাজাইয়া যাত্রা দেখিলে প্রতি মেয়ের চিত্তে অপূর্ণ আনন্দ জাগিয়া উঠে। বাঙ্গলার নিজস্ব পল্লী গীত, ব্রত নৃত্য, যেমন জাতিয়তা বোধের সৃষ্টি করে তেমনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান রমণীর প্রাণে পরম আনন্দ প্রদান করে ; শরীর সুঠাম হয়, স্বাস্থ্য রক্ষা পায়।

ব্রতচারী প্রচেষ্টা তামাসা নহে, সংঘম ও সাধনায় আত্মশুদ্ধি করিবার পুণ্য ব্রত। খাটী মানুষ হইবার; জাতির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়। ব্রতচারী-প্রচেষ্টা বাঙ্গালীর একটি শ্রেষ্ঠ অবদান ; ইহার প্রসারেই প্রবর্তক গুরু সদয় দত্তজী ধন্য ও পুণ্যবান হইবেন। বাঙ্গলার আকাশ বাতাস প্রাঙ্গণ জ-গো-বা 'জয় সোনার বাঙ্গলা' ধ্বনিতে মুখরিত হইবে।

পুস্তক-সমালোচনা

আবাল্য-তপস্বিনী বাঙ্গালী মেয়ে—শ্রীস্বরজা দেবী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, শ্রীশ্রী লাইব্রেরী হইতে শ্রীভুবনমোহন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১।০ টাকা। পুস্তকখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা শ্রীগৌরীমার জীবন-কাহিনী। তাঁহার বাল্য-লীলা হইতে সাধিকাজীবনের ক্রমপরিণতির ইতিহাস অতি সুন্দর ভক্তিরসাত্মিত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। লেখিকা শ্রীগৌরীমার জীবনের সহিত বিশেষভাবে পরিচিতা, তাঁহার রচিত মাতাজির জীবন-কাহিনী প্রত্যেক ভক্ত পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে অমৃতরস দিগ্ধন করিবে। আমরা সকল বাঙ্গালীকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সরল হিন্দী শিক্ষা—লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী, ১০৫ নং সদানন্দ বাজার, বেনারস সিটি। তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

আজকাল এদেশে প্রায় সকলেরই মনে হিন্দী শিখিবার জন্ত এক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে অনেকই সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারেন না। এই পুস্তকের দ্বারা তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে। পুস্তকখানি বাংলায় লিখিত হওয়ায় বাঙ্গালীর পক্ষে পড়িতে কোনই কষ্ট হইবে না। বর্ণ পরিচয়, উচ্চারণ, অনুবাদ, ব্যাকরণের নিয়মপ্রণালী সবই এই পুস্তকে বাংলায় লিখিয়া দেখান হইয়াছে।

শান্তিপুত্র পরিচয়—শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল; গ্রন্থকার কর্তৃক ১—১৪ রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১।০ টাকা।

লেখক পরম সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনকথা

তাঁহার এই খণ্ডে বিবৃত করিয়াছেন। সুন্দর ও সহজবোধ্য ভাষায় সাধকের জীবনের মর্ম্মকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সাধু মহাত্মার পারমার্থিক জীবনের পুণ্যকাহিনী ভক্ত পাঠকের নিকট অতি উপদেশ সাধারণের জন্তও প্রাচীন ইতিহাস এবং মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ আভির্ভাবকালে বাংলার অবস্থা সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার—শ্রী

মূল্য টাকা।

স্কুলে পড়িবার সময়ই অশ্বিনীকুমার দত্তের নাম শুনিয়াছিলাম। পরে যখন তাঁহার অগাধ মানবোক্তি সংগৃহাবলীর পরিচয় পাইলাম তখন হইতেই তাঁহার জীবনের কাহিনী জানিবার ইচ্ছা অন্তরে প্রবল হইল। পুস্তকখানি আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। এই স্থলিখিত জীবনী কমই পাঠ করিয়াছি। স্বদেশ ও স্বজাতি মঙ্গলকামী প্রত্যেক ব্যক্তির ইহা পাঠ না করিলে তাহার ভাণ্ডার অপূর্ণ রহিবে মনে হয়।

শ্রীকাল্কনি মুখোপাধ্যায়

সাঁঝের প্রদীপ শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত, কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১।০ টাকা।

কবিতার বই। সেনগুপ্ত মহাশয় স্বকবি,—৬। সহিত ভাষার সমন্বয় সাধন করিয়া যে সুন্দর কবিতা দিয়া তিনি সাঁঝের প্রদীপ সাজাইয়াছেন তাহাতে বঙ্গ দেবায়তন সুশোভিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কবিতা কবির দরদী অন্তরের ছাপ পরিস্ফুট।

শ্রীতি

কেন্দ্র সমিতির কথা

প্রচার কার্য .

গোবরডাঙ্গায় একটি বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গত ১৬ই এপ্রিল কেন্দ্রসমিতির মহিলাকর্মী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ গোবরডাঙ্গায় গমন করেন। তথায় মহিলাদের একটি সভা হয়, ঐ সভায় শ্রীযুক্তা ঘোষ মহিলা সমিতির গঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, সভায় মহিলা সমিতি গঠনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জগদীশপুর প্রদর্শনী

গত ৭ এপ্রিল হইতে ১২ই পর্যন্ত স্বরমাত্যালিখিত সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে এবং স্থানীয় লোকদের প্রচেষ্টায় শ্রীহট্ট জেলার জগদীশপুর গ্রামে একটি কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। ৮ই তারিখ কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার দায়রা জজ মিঃ এন, এল, হিঙলে আই, সি, এস মহোদয় কর্তৃক প্রদর্শনীর উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আসাম গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগ হইতে ষ্টল গ্রহণ করা হইয়াছিল; গবর্ণমেন্ট শিল্পবিভাগের ষ্টলটি এবং গবর্ণমেন্ট এম্পোরিয়ামের ষ্টলটি অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল, বিশেষভাবে ডাঃ বি, ব্যানার্জির পরিচালনায় স্বাস্থ্যবিভাগীয় ষ্টলটি লোকশিক্ষা হিসাবে সবিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। বঙ্গীয় হিতসানন মণ্ডলীও একটি ষ্টল লইয়াছিলেন। কেন্দ্র সমিতির প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী কেন্দ্রীয় শিল্প শিক্ষালয়ের প্রস্তুত বিভিন্ন শিল্প সস্তার সহ উক্ত প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। প্রতিদিন পণ্ডিত মহাশয় ষ্টলে উপস্থিত দর্শকদের শিল্পশিক্ষা প্রণালী ও শিল্প শিক্ষার উপযোগিতা এবং প্রদর্শনীমণ্ডপে ম্যাজিক ল্যান্টার্ন সহযোগে বক্তৃতা দ্বারা মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য, গঠন প্রণালী ও কার্যধারা বুঝাইয়া দেন। প্রদর্শনীর পরিসমাপ্তি দিবসে কর্মীদের উদ্যোগে এক বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হয়; প্রায় ৫০০ শত মহিলা এবং সহস্রাধিক পুরুষ সভায় যোগদান করেন। সাধারণের অনুমোদনক্রমে পণ্ডিত শাস্ত্রী সভাপতি নির্বাচিত হইলে শ্রীহট্টের বিখ্যাত কর্মী রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ চৌধুরী শ্রীহট্ট জেলার আর্থিক

অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। আসাম গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অর্থপূর্ণ বক্তৃতা দিলে পর পণ্ডিত মহাশয় বক্তৃতা করেন। এই প্রদর্শনী দ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে একটা সাদা পড়িয়া গিয়াছে; বিশেষভাবে মহিলাদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়াছে; ইতোমধ্যেই তাঁহারা মহিলা সমিতি গঠন করিয়া শিল্প শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছেন। যে সব মহিলা কোনদিন বাহিরের সংবাদ রাখার কথা ভাবিতেও পারেন মাই, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে প্রচার কার্য করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

১৩ই এপ্রিল তারিখে পণ্ডিত শাস্ত্রী শ্রীহট্ট গমন করেন। তথায় রায়নগর বালিকা বিদ্যালয়ে একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বহু সন্তান: ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় ম্যাজিক ল্যান্টার্ন সাহায্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীমঙ্গল সমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

১৫ই চৌহাট্টাস্থ জোয়ারমল মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের ট্রেনিং ক্লাসে মহিলাদের সভায় শিশুমঙ্গল ও প্রস্তুতিকল্যাণ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৮ই এপ্রিল সুনামগঞ্জে একটি সভা হয়, উক্ত সভায়ও বক্তৃতা দেওয়া হয়। সুনামগঞ্জ হইতে পণ্ডিত শাস্ত্রী ইন্দ্রেশ্বর গমন করেন। তথায় ৪ দিন সভা হয়; ৪ দিনের সভাতেই বহু লোক উপস্থিত থাকেন। ৪ দিনই ম্যাজিক ল্যান্টার্ন সাহায্যে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্য, কার্যধারা ও গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়। তৎপর স্বরমা অঞ্চলে গমন করেন এবং বিভিন্ন গ্রামে বক্তৃতা দ্বারা মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন।

গত ১৬ই এপ্রিল বালিগঞ্জ কার্ণ রোডে মহিলাদের একটি সভা হয়। এই সভায় কেন্দ্র সমিতি হইতে শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় একটি মহিলা-সমিতি গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়। শ্রীমতী তথায় একটি মহিলা সমিতি গঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

মানিকতলা মহিলা সমিতি—

সমিতি পরিদর্শন, ৮ই মে কেন্দ্রসমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত স্বধীরলাল সরকার মানিকতলা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন। এই সমিতি মাত্র এক বৎসর পূর্বে স্থাপিত হইলেও, ইহার মধ্যেই কয়েকটি সভা সেলাই ও কাটিং দ্বারা কিছু কিছু উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সমিতিতে স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধেও আলোচনা হয়, উহার ফলে একটি সভা তাঁহার শিশুর জন্ম শিশু প্রদর্শনীতে একটি পুরস্কার পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত স্ববোধবালা ঘোষ সালিখা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন, এই সমিতি প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় মহিলারা প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে সমিতি গৃহে সমবেত হন এবং শিল্প কার্যাদি শিক্ষা করেন। এই সমিতির সদস্যরা স্থানীয় লোকের এবং কোন কোন সময় বিবাহাদিতে জামা ব্লাউজ ইত্যাদির অর্ডার সাপ্লাই করিয়া থাকে। দরিদ্র এবং দুঃস্থ মহিলা এই সমিতি দ্বারা খুবই উপকৃত হইতেছে বলিয়া সম্পাদিকা অভিযত প্রকাশ করেন।

ব্যাটরা মহিলা সমিতি :—

শ্রীযুক্ত স্ববোধবালা ঘোষ গত ১১ই এপ্রিল ব্যাটরা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন। ১৭ জন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা সমিতিতে শিল্প কার্যাদি শিক্ষা করিয়া থাকেন। ৩৪ জন মহিলা এই সমিতিতে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

কাঁচড়াপাড়া মহিলা সমিতি—ইষ্টাণ বেঙ্গল রেলওয়ের উদ্যোগে গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই সমিতি স্থাপিত হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমিতি স্থানীয় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাবলিসিটি অফিসার গত ১২ই এপ্রিল এই সমিতি পরিদর্শন করেন। সমিতির সভানেত্রী ও সম্পাদিকা এই সমিতির কার্যের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

শ্রামনগর মহিলা সমিতি :—গত ১৩ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত সরকার শ্রামনগর মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন। শ্রামনগর মহিলা সমিতি সম্প্রতি ১৩০০ টাকা ব্যায়ে তাহাদের একটি নিজস্ব গৃহ তৈয়ারী করিয়াছে।

বিবিধ :—

মানিকগঞ্জ মহিলা সমিতি ছাত্র ট্রেনিং ক্লাশের

পুরস্কার বিতরণ

গত ৭ই মে ট্রেনিং ক্লাসের ব্যাগ ও পারিতোষ বিতরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা সেন গুপ্তার সভাপতিত্বে সমিতি গৃহে একটি সভার অধিবেশন হয়। সমিতির সম্পাদিকা কার্য বিবরণী পাঠ করিলে স্থানীয় ডি, ও মিঃ এ, ডব্লিউ, হ্যাচবার্ণওয়েল, আই, সি, ও মহোদয় ধাত্রীদের ব্যাগ বিতরণ ও ডাক্তারের ফিস প্রদান করেন। অতঃপর তিনি সমিতির ও ধাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করিলে সমিতির সদস্য শ্রীমতী প্রীতি লতা চন্দ্র মহোদয় মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ সংক্রান্ত বক্তৃতা দেন। তৎপর স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত প্রিয়দর্শ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দের বক্তৃতা শুনি মেয়েদের ২টি সঙ্গীত হয় এবং সঙ্গীত শেষ হইলে সভানেত্রী এস, ডি, ও এবং অধ্যক্ষ ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয় ধন্যবাদ প্রদানের পর সভার কার্য শেষ হয়।

সৈয়দপুর মহিলা সমিতি

৯ই এপ্রিল স্থানীয় বি, অ্যান্ড সিং ইন্সটিটিউটে সমিতির ব্রতচারী সমিতির তৃতীয় বার্ষিক জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়। উৎসব সভায় ই, বি রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ও গুরুজীর সাদর অভিবাদী পঠিত হইলে সম্পাদিকা অভিভাষণ পাঠ করেন। সঙ্গীত ও ব্রতচারী নৃত্যাদি উৎসব শেষ হয়।

শোক সংবাদ

কৈকালী মহিলা সমিতির উদ্যোক্তা ও প্রবীণ পণ্ডিত রাজকুমার বেদতীর্থ মহাশয়ের মৃত্যুতে উক্ত সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় মৃত্যুতে সমিতি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, নিঃসন্দেহ।

সাকরাইল মহিলা সমিতি—স্বর্গীয় মহারাজা মনমথনাথ রায় চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে তাঁহার

শ্রদ্ধা নিবেদন ও শোক প্রকাশের জন্ত শ্রীযুক্তা যামিনী স্নন্দরী দেবীর সভানেতৃত্বে মহিলা সমিতির একটি সভা হয়। উক্ত সভায় স্বর্গীয় মহারাজার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া ও মহারানী হেমাদ্বিনী চৌধুরানী মহোদয়াকে সমবেদনা জানাইয়া এবং মহারাজের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিয়া এক প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

মহিলা সমিতি পরিদর্শন

বাংলা নূতন বৎসরের প্রারম্ভ হইতে কেন্দ্র সমিতির প্রচারকগণ বিভিন্ন মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিয়া তাহাদের কার্যে নবপ্রেরণা দান করিতেছেন। যে সব সমিতি এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সম্পাদিকার সহিত পত্রের আদান প্রদান দ্বারা ব্যবস্থা করিতে পারেন।

মহিলা-সমিতির কথা

ঠাকুরগাঁও মহিলা সমিতি

মঙ্গলময়ের অগ্রগৃহে গত ১৩৪৪ সাল হইতে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অপরিণীত ধৈর্য্য সহকারে আমাদের ঠাকুরগাঁও মহিলা সমিতিকে নির্জীব অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া পুনর্জীবিত করা হইয়াছে। তৎপরবর্তী এই এক বছর যাবৎ আমাদের মহিলা সমিতির যাবতীয় কার্য বেশ ভাল রূপেই চলিতেছে।

বালিকা বিদ্যালয় পরিচালন :—

মহিলা সমিতি কর্তৃক গঠিত উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়টি ইহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই এক বছর যাবৎ এই বিদ্যালয়টি মহিলাগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বালিকাদের বিদ্যালয়ে পৌছাইয়া দিবার জন্ত একটি বি রাখা হইয়াছে। ছয়টি ছাত্রী উক্ত বিদ্যালয় হইতে এবার প্রোমশন লইয়া অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। মহিলা সমিতি হাইস্কুলের শিক্ষকদিগের মাহিয়ানা, বিয়ের বেতন এবং একটি দুঃস্থ আগ্রহীলা বালিকার বেতন বাবদ মাসে মাসে ১৫ টাকা করিয়া বালিকাদের ৭ম শ্রেণীতে পড়ার জন্ত সাহায্য দিয়াছেন। ৭ ও ৮ম শ্রেণীতে বালিকা বেশী হওয়ায় মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট ঘর তুলিয়া ক্লাস খোলার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।

শিল্প শিক্ষা :—

আমাদের সমিতি হইতে শিক্ষা প্রাপ্তা মনোরমা দেবী মহিলাদের সর্ববিষয়ে সেলাই শিক্ষা দিবার জন্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত মনোরমা দেবী কর্তৃক শিল্পক্লাস বেশ ভালরূপেই পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গত বৈশাখ মাস হইতে তিনি অসুস্থ হন এবং ২ মাস ভুগিয়া ইহজগত হইতে বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার অল্পবয়সে এই আকস্মিক মৃত্যুতে মহিলাগণ সকলেই শোকে অত্যন্ত অভিভূত হওয়ায় কিছুদিন পর্যন্ত শিল্পক্লাস একরূপ বন্ধ থাকে। এখন আমাদের সমিতি হইতে শিক্ষাপ্রাপ্তা কালীদাসী দেবী আপাততঃ অস্থায়ী ভাবে ঐ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্তমানে প্রতি ঘরে ঘরে প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত হওয়ায় আর কাহারও বেশী ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে হয় না।

চিকিৎসালয় :—

শ্রীযুক্তা সরোজিনী রায় হোমিওপ্যাথি ঔষধ মহিলাদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। মহিলাগণ সকলেই যে কোন গৃহে ব্যারাম পীড়ার সংবাদ পাইলে অবিলম্বে যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। এমন কি শুশ্রূষা প্রভৃতির জন্ত মহিলাগণ প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ২৩ দিন

পালাক্রমে রাজিযাপন করিয়া থাকেন। পরস্পরের সাহায্য, ভাবের আদান প্রদান ও মেলামেশার এতটা সুযোগ যে মহিলা সমিতি দ্বারা সাধিত হইয়াছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

অর্থ সংগ্রহ :—

উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রারম্ভে সাহায্যকল্পে সমিতির মহিলাগণ চাঁদাস্বরূপ এককালীন ১৪৫০ আনা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে সভানেত্রী সরোজিনী রায় ৫২ টাকা দিয়াছেন।

মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া ২টা দুঃস্থ ব্রাহ্মণ বিধবাকে এই এক বছর যাবৎ সাহায্য করা হইতেছে। ঐ সামান্য সাহায্য দ্বারাই তাঁহারা কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছেন।

খাই ট্রেনিং ক্লাশ :—

খাত্তী শিক্ষা প্রাপ্তা মহিলাগণ এখানে রীতিমত উপার্জন করিতেছেন।

সব্জী বাগান :—

শাক সব্জীর বাগান এখানে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই করিয়া থাকেন। সেতারা খাতুন (এস, ডি, ওর জী) চপলা রায় নিকুণমা পাল প্রভৃতি নিজেরাই খুব উৎসাহের সহিত বাগানের কাজ করিয়া থাকেন। প্রচুর তরকারী উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে তরকারী খুব সস্তা, বিক্রয় করিয়া লাভ হয় না। কাহাকেও বেশী তরকারী ক্রয় করিয়া খাইতে হয় না।

মহিলা সমিতি হইতে কাপড় কাচা সাবান তৈয়ারী করিয়া দোকান হইতে একটু সস্তা দরে মহিলাদের মধ্যে বিক্রয় করা হইতেছে। মহিলাদের আর যাহাতে দোকানের সাবান ক্রয় করিতে না হয় এই উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে সাবান উৎপন্ন করার চেষ্টা করা হইতেছে।

এ বৎসর জাহ্নবারী হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমিতির মোট আয় ২৬৬/১০ ও মোট ব্যয় ২৬০/ হইয়াছে। আয়ের মধ্যে কেন্দ্র সমিতি হইতে প্রেরিত ১৫/ আছে। এখানে অনেক ভদ্রলোকের আয় কমিয়া যাওয়ায় সমিতিতে অনেকেই টাকা দেওয়া বন্ধ রাখিয়াছেন, ইহাতে ভবিষ্যতে বাহিরের সাহায্য না পাইলে সমিতির অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হইবে।

শ্রীহট্ট মহিলা সমিতি

১৯৩৮ সনের বার্ষিক কার্য বিবরণী

সমিতির এই বৎসর কয়েকটা অধিবেশন হইয়াছে, সমিতিতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে মহিলারা মিলিত হইয়াছেন। সভ্য সংখ্যা প্রায় ৫০ জন; তন্মধ্যে নিয়মিত চাঁদা দাতা সভ্য সংখ্যা প্রায় ৩০ জন।

এই বৎসর সমিতির অত্যন্ত সমৃদ্ধিশীল শ্রীযুক্তা সার্বভৌম গুপ্তার স্বামী অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্তার অর্থায়নে সমিতি এক বিশেষ অধিবেশনে শোক-প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সার্বভৌম গুপ্তা ও কয়েক জন সভ্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

সমিতির উদ্দেশ্য—জানানুশীলন, শিক্ষা-বিস্তার, শিশু-চর্চা, শিশু-মঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, জনসেবা প্রভৃতি কার্য সম্পাদনা করিতে চেষ্টা করা যায়।

জানানুশীলন—এই বৎসর শ্রীযুক্তা প্রমদাহন্দরী দাস, হৈমবতী দাস, শরৎ রায় চৌধুরী, মালতী মজুমদার, সুরবালা দেব, পুণ্যপ্রভা দাস; সত্যপ্রভা দাস প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন। সভ্যাদিগের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ভারতবর্ষ, প্রবাসী পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শিশু-বিদ্যালয়,—এই বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। আরো একটি প্রয়োজন হওয়াতে এবং গভর্ণমেন্ট গৃহের জন্য সাত টাকা দেওয়াতে নূতন একটি গৃহ প্রাপ্ত হইতেছে; প্রয়োজন সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা দাস গুপ্তা বি, এ, বি, টি, এডাল্ট অতি উৎসাহে ইহার কার্য সম্পন্ন করেন; বর্তমানে দুটি লওয়াতে শ্রীযুক্তা স্মৃতি মজুমদার বি, এ, ইহার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নব প্রতিষ্ঠিত কিশোরীমোহন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগকে উৎসাহ দানের জন্য ছাত্র সমিতি স্থাপন করা হয় এবং এবারও ছাত্রী সমিতির সহযোগিতায় ও রায়নগর বালিকা বিদ্যালয়ের “ছাত্র সমিতির” উদ্যোগে বিগত শারদীয় পূজার পূর্বে মহিলা সমিতি “নারী-শিল্প-মেলা” ব্যবস্থা করেন। আভাষ রুদ্রি ও জল্প কিছু ব্যাঘাত হইলেও যথেষ্ট জনসমাগম হইয়াছিল।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের বেদনাশূন্য জালা

জালায় তীব্রবেগ যখন শরীরের ভিতর প্রথম উপস্থিত হয়, তখন অসহনীয় যাতনায় মানুষকে ক্রিপ্ত ও ব্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু সে জালা যখন সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া জীবনকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় তখন যাতনার স্বরূপও উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

দুঃখিত জীবনের ব্যথা জীবনে অনুভূত না হইলে সে জীবনের স্বার্থকতা কোথায়? বর্তমান যুগধর্ম্মে চিকিৎসক-বৃন্দের অর্থ উপার্জনের জন্ত যে জালা উপস্থিত হইয়াছে সে জালাতে সর্ব্ব অঙ্গ এমনি ভাবে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে নিজের বেদনার গুরু অস্তিত্বও বুদ্ধিগতির শক্তি হইতেছে না।

মানুষের দুঃখময় বেদনাকে জয় করিবার জন্তই ঋষিদের প্রাণ অভিজ্ঞ হইয়া পাড়িয়াছিল। তাই তাঁহারা সত্যরূপ পাওয়ার জন্ত আরাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

ভোগ ও বাসনার উদ্ধামবৃত্তিতে মানুষ শান্তি না পাইয়া যখন ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল এবং জীবনের স্তরগুলি নিঃশ্বাস হইয়া আসিতেছিল তখনই মহামানবগণের প্রাথমিক সাধনা আরম্ভ হয়। দুঃখক্লিষ্ট জীবনের মরণশীল যাত্রাপথে ও কিভাবে স্বর্গীয় আনন্দের তরঙ্গ মানুষের জীবনকে শান্তি দিতে পারে এবং সংসার জীবনের পরস্তরেও শান্ত শান্তি লাভ করিতে পারে ইহার জন্তই মহাপ্রাণ ঋষিগণ, সাধনার দ্বারা আরক্ত জ্ঞান গ্রহণ করিয়া উদাত্তকণ্ঠে নির্দোষবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। “জ্ঞানং পরং তরং নহি” অর্থাৎ জ্ঞানের তুল্য শ্রেষ্ঠ স্বথ আর দ্বিতীয় নাই। এই জ্ঞানই দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ সংসার-পথের একমাত্র আলোক-বর্ত্তিকা। তাই মানুষের চিন্তা জগতে দন্দময় ধারাগুলির সমাধানের জন্ত, সাংখ্য, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন সমূহ অল্পসঙ্কিস্ত্র মানব হৃদয়ে শান্তি দিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই জ্ঞান বিজ্ঞানের অমৃতধারাতে সিক্ত হইয়া মানুষ শান্তি লাভ করিলেও হৃদান্ত রোগের নিষ্ঠুর আক্রমণে

ক্ষণেকের ভিতরেই সে স্বথ শূন্যেতে মিলিয়া যায়। তাই করণীয়-কর্তব্যের মধ্যে শরীর রক্ষাই প্রধান এবং প্রথম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হওয়ার নির্দেশ করিয়াছেন “শরীরমাদ্যাং খলুধর্ম্ম সাধনম্।”

মহামতি চরকও এই সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রস্ফুট করিয়াছেন তাঁহার চির সত্য বাণীর ভিতর দিয়া। যথা— “ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষনামারোগ্যং মূলমুত্তমম্, রোগান্তস্যাপ্য হর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্ত চ ॥” অর্থাৎ রোগ শূন্য জীবনেই ধর্ম্মের পরিণতি, অর্থের স্থিতি, ভোগের তৃপ্তি ও শান্ত শান্তি লাভ হয়, হ্রস্ব রোগই ধর্ম্মের বিষয়, অর্থের প্রতিবন্ধক, এবং শান্তির অবসান জন্মাইয়া দেয়। বিশেষতঃ যে জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, ভোগ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত, হ্রস্ব রোগ সেই জীবনকেই ধ্বংস করিয়া দেয়।

তাই মহাপ্রাণ ঋষিদের হৃদয়ে রোগ-পীড়িত মানব-জীবনের দুঃখের জালা যখন বাজিয়া উঠিল তাহারই ফল স্বরূপ আত্মসম্মিত অবস্থায় যে জ্ঞান তাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাহাই “আয়ুর্বেদ সংহিতা।”

আয়ুর বাসভূমি শরীর। এ শরীরকে সবল, কশ্মঠ, স্বথ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভরপুর রাখিবার জন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় প্রণালী এই আয়ুর্বেদ সংহিতাতে বিস্তারিতভাবে উপদেশ দিয়াছেন।

বাসনা ও ভোগের অভ্যস্তর ধর্ম্মজীবনের প্রেরণা ও সাফল্য লাভের জন্ত এ দেহ যন্ত্রই একমাত্র ভিত্তি।

ভগবানের সযত্নসিদ্ধ অসংখ্য কলা কৌশলে নির্মিত জীবদেহের স্তরগুলি মানুষী বুদ্ধিতে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। যে মানুষ বুদ্ধিবলে শরীরের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা অভ্রান্তরূপে আজও পরিণত হইতে পারে নাই।

ক্রমশঃ

বঙ্গলক্ষ্মী—



বিচিত্রার সৌজশ্চে

সুখের হাট

শিল্পী—লিওনার্ডো দা-ভিঞ্চি



১৩৪৬
বর্ষ

আষাঢ়, ১৩৪৬

৮ম সংখ্যা

পত্রালাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

C/o Thomas Cook & Sons
Ludgate Circus, London.

কল্যানীয়াহ—

এদেশে এসে অবধি চিঠিপত্র বা অন্য কিছু লেখা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। আমি এখানকার যে দলের মধ্যে এসে পড়েছি তাঁরা আমাকে যথেষ্ট সমাদর করেছেন—সেটা আমার পক্ষে উপাদেয় এবং নিঃসন্দেহ আমার দেশের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু আমার অবকাশ একেবারে ঘুচে গিয়েছে। লগুনে যে কয়দিন ছিলুম স্থির হয়ে বসে কিছু কাজ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

সম্প্রতি এখানকার পাড়ারগেয়ে একজন পাত্রির বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি আমি এবং বৌমা ; প্রায় এক সপ্তাহ হোল এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। এদের ইচ্ছা আমরা আরো মাসখানেক থেকে যাই কিন্তু সেটা হয়ে

উঠবে না। এ জায়গাটি যেমন অত্যন্ত সুন্দর তেমনি এরা মাল্লবও খুব ভাল—এদের ভদ্রতা, ধর্মনিষ্ঠতা, চিত্ততা আমাকে খুবই মুগ্ধ করে—এদের প্রতিদিনের জীবনও মঙ্গল অল্পটানে পূর্ণ এবং অকৃত্রিম। এদের দ্বারা মাধুর্যমণ্ডিত অথচ সেই সঙ্গে এদের অল্পশীলন দেখে খুসি হতে হয়। এই ব্যাড়াই ভাল ভাল বইয়ে ভরা ;—চারিদিকের বাগান-ই গ্রামের লোকদের সঙ্গে এদের সম্বন্ধটি কল্যাণকর। বাহিরে সকল দিকেই মঙ্গল এবং সৌন্দর্যের দেখতে পাই। কোথাও শৈথিল্য নেই। হাঁস, পায়রাদের প্রতিও এদের যত্ন নিরলস। অর্থাৎ এদের চারিদিকে যেখানে যা কিছু আছে সেখানে চিত্ত সজাগভাবে প্রসারিত আছে। এমন অবস্থায় যে যথেষ্ট যত্ন পাব সে কথা বলা বাহুল্য।

কেবল যত্ন নয়, এদের সংসর্গে এমন একটি

যায় যেটা আমাদের সকল প্রকার তামসিকতাকে নষ্ট করে দেয়।

এদেশের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রথীকে তাঁর কাছে নিযুক্ত করেছেন। সেইজন্তে সে আমাদের সঙ্গে এখানে আসতে পারেনি; এই ব্যবস্থাটি রথীর পক্ষে কম-ভাগ্যের নয়। এ রকম স্বযোগ সকলের সহজে ঘটে না। বৌমা এখানে ভালই আছেন। তাঁর ইংরেজি ভাষার সামান্য সখল নিয়ে তিনি এদের সঙ্গে একরকম করে চালিয়ে দিচ্ছেন। ভাষাটাও ক্রমশঃ বোধহয় এর-কাণে অভ্যস্ত হয়ে আসছে। বৌমা বেশ সহজ, অসকোচ ভাবে এদের সঙ্গে মিশতে পারেন—এরা একে সবাই ভালবাসে।

বড় দাদাকে আমার প্রণাম জানিয়ে।

ইতি, ৬ই আগষ্ট, ১৩১২

(২)

কল্যাণীয়াসু,

বিদ্যালয় সম্বন্ধে নেপাল বাবুদের সঙ্গে এই দুদিন অনেক আলোচনা করেছি।

যেটাতে মঙ্গল তোমাদের সকলের চেষ্টার ভিত্তর দিয়ে, এমন কি, সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই সেটা উদ্ভিন্ন হয়ে উঠবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই—এই বিশ্বাসটি মনের মধ্যে বহন করে আমি আজ বিদায় হচ্ছি।

আমাকে ঈশ্বর যদি দয়া করেন তবে আমার মধ্যে যেটুকু ভাল আছে সেইটুকু তিনি আমার সকল কাজে ও সকল সম্বন্ধে বিকশিত করে তুলবেন—আমার জীবনকে ব্যর্থ করবেন না—আমি যেখানে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অসত্যের দ্বারা সংসারকে আঘাত করেছি সেখানকার সমস্ত ক্ষত বেদনা নিজের হাতে তিনি জুড়িয়ে দেবেন।

বিদ্যালয়ের মধ্যে আমার সত্য জীবন যেটুকু রেখে গেলুম তার প্রতি তিনি যদি স্নেহ দৃষ্টিপাত করেন তবে তোমাদের হাত দিয়েই তিনি তাকে পালন করিয়ে নেবেন, —তোমাদের শ্রদ্ধা ও স্নেহ তিনিই আকর্ষণ করবেন—তাঁরই সমস্ত জীবনশক্তিকে পিতামাতার দ্বারা তিনি ত এমনি করেই মাহুষ করিয়ে নেন—আমাদের যে পুণ্য জীবন তার শৈশবের অসম্পূর্ণতা ও দৌর্বল্য থেকে বেড়ে ওঠবার জন্তে প্রয়াস পাচ্ছে তার জন্তেও তিনি মা বাপকে নিয়োগ করছেন—কেননা সে যে আনন্দের ধন। যদি তোমাদের দৃষ্টির সামনে তিনি তাকে স্থাপিত করেন তবে তোমরাও তাকে কিছুতে ত্যাগ করতে পারবে না। অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাকে তোমাদের সকল অবস্থার মধ্যে মাহুষ করে তুলতে হবে।

তাই জন্তে আমি কোনো বাঁধা পথ নির্দেশ করতে চাইনে। প্রয়োজন বিচিত্র হবে;—নানা প্রকার অভাব ঘটবে, নানা প্রকার আঘাত আসবে, তারই দ্বারা তোমাদের সেবার চেষ্টা বিচিত্রভাবে উদ্বোধিত হয়ে উঠবে এবং সেই সমস্ত বিঘ্নের সঙ্গে বারম্বার সংগ্রাম করেই তোমাদের অন্তরের স্নেহ প্রতিদিন সবল ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে।

আজ আমার এই যাত্রাকালে তোমাদের সকলের কাছ থেকে একটি নির্মল প্রসন্নতা কামনা করি—তোমাদের তপঃ পরায়ণ মাতৃহৃদয় প্রসারিত হয়ে আমার যাত্রাকে পবিত্র সত্যের দিকে মঙ্গলের দিকে অগ্রসর করে দিক।

বড় দাদাকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবে।

ইতি—১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২



স্মৃতি ও বিশ্বাস

শ্রীমতী পুষ্পরাণী ঘোষ বি-এ

আমরা অনেক কথা মনে রাখি আবার অনেক কথা ভুলেও যাই। সাময়িক ভাবে ত প্রায় সবই ভুলে যাই কারণ অধিকাংশ মনস্তত্ত্ববিদের মত এই যে মানুষের সচেতন মন কখনও একসঙ্গে একটার বেশি ভাব ধরে রাখতে পারে না।।

সে যাই হোক না কেন মোটের উপর আমরা যে ভুলি একথা ঠিক এবং অনেক সময় সেই ভুলের জন্য অনেক শাস্তি পাই ও কষ্ট ভোগ করি সেও ঠিক—কিন্তু তারপর আর সেবিষয়ে বিশেষ কিছু ভাবি না। ভুলতো ভুলই তার আবার মানে কি? কিন্তু ভুলেরও মানে আছে। মনে রাখার যেমন নিয়ম আছে ভুলেরও তেমনিই নিয়ম আছে। মনস্তত্ত্ববিদগণের মধ্যে এই এক মস্ত সমস্যা যে স্মরণই স্বভাব না বিশ্বরণই স্বভাব। কেউ কেউ বলেন, স্মরণই স্বভাব আর বিশ্বরণই ব্যতিক্রম আবার অনেকের মতে বিশ্বরণই হলো নিয়ম আর স্মরণই হলো তার ব্যতিক্রম।

এখন ঠাঁরা বলেন যে বিশ্বরণই নিয়ম তাঁদের তো তাহলে কেন স্মরণ করি, কেমন করে স্মরণ করি—তার প্রশ্নালী কি—সে সব বুঝিয়ে দিতে হবে। বিশ্বরণই যদি স্বভাব তবে আবার মাঝে মাঝে স্মরণ করি কেন আর কি করেই-বা কি করি? একটা জিনিষ যখন প্রথম জানলাম সে তো আর স্মরণ হলো না—সে হলো প্রাথমিক জ্ঞান কিন্তু পরে যখন সেটা আবার মনে এলো এবং সেটাকে সেই প্রাথমিক জ্ঞান বলে জানতে পারলাম—সেই হলো স্মরণ। এখন কথা হচ্ছে যে যখন প্রথম জানলাম এবং পরে যখন সেটা মনে হলো, এর মাঝখানে সে জ্ঞানটা থাকে কোথায়? এবং যখন মনে আসে তখন আসেই বা কোথা থেকে?

এর উত্তরে হয় বলতে হয় তারা শূন্য থেকে আসে নয়ত অপ্রবুদ্ধ ও মগ্নচৈতন্য স্বীকার করতে হয়। তার মানে এই যে আমাদের জ্ঞান-রাজ্যের প্রান্তদেশে এবং তার সীমানার পরও মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে কিন্তু তা অত্যন্ত মৃদু

এবং আমরা খুব গভীর মনোযোগ না দিলে বুঝতে পারি না—অনেক সময় মনোযোগ দিয়েও ঠিক বুঝতে পারি না। আমাদের সব জ্ঞান এই প্রবুদ্ধ চৈতন্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। সেখানেও আবার তাদের ভিতর নানা ঘাত-প্রতিঘাত। সে জন্য প্রায়ই দেখা যায়, আমরা যা স্মরণ করি তা প্রাথমিক জ্ঞানের থেকে কিছু ভিন্ন আকারে দেখা দেয়। এই কথা মেনে নিলে বলতে হয় যে জড় জগতে “শক্তির অবিনাশত্ব” আছে মনোজগতেও তাই কেবল বস্তু এই যে জড়জগতে যেমন প্রত্যক্ষভাবে শক্তির স্থিতি অবস্থা দেখতে পাওয়া যায় মনোজগতে তা সম্ভব হয়। অল্পমানের উপরই নির্ভর করতে হয়।

এই শেষের মত বা “মনোজগতে জ্ঞানের অবিনাশবাদ” থেকেই বিপরীত মতের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। আলোচনা করতে যেয়েই মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেন, তাই যদি—তবে তো বিশ্বরণ নিয়ম নয় স্মরণই নিয়ম আর বিশ্বরণ তার ব্যতিক্রম; অতএব বিশ্বরণেরই কারণ খুঁজে করতে হবে। তাঁরা বলেন যে প্রত্যেক ভাবেরই একটি থাকবার বা সব সময় মনে জাগরুক থাকবার প্রাথমিক আগ্রহ থাকে—একটা কথা যে আমরা ভুলে তার কারণ এই যে অল্প একটা কথা তখন আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু যেই শেষের ভাবটা অপসৃত হয় অমনি আবার আগেকার ভাবটা মনে আসে। সেই ঘুম থেকে উঠলেই আবার জাগ্রত অবস্থায় যা ভাব ভাবতে ঘুমিয়েছিলাম সেই কথা মনে পড়ে। আমরা স্মৃতি দুই রকম; এক হচ্ছে সাধারণতঃ আমরা যা ভাবি যা নিজেই মনে থাকে—হঠাৎ অল্প কিছু এসে তাকে আচ্ছন্ন করে দিলেও মেঘে ঢাকা চাঁদের মতই মেঘ সরে গেলে অর্থাৎ সেই অল্প ভাবগুলো সরে গেলেই আবার দেখা দেয় আর এক রকম হলো, যা কোন কারণ বশতঃ সহসা মনে পড়ে। যে কথা হয়ত আমরা একেবারেই ভুলে গেছি

মনে হয় অথচ হঠাৎ কিছু দেখলে মনে পড়ে যায়—আসলে সেগুলো অল্প সব পরবর্তী ভাবের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিল মাত্র। এই জুই শৈশবের কথা যৌবনে বেশি মনে পড়ে না, পড়ে বার্কক্যে—যখন মন অপেক্ষাকৃত খালি থাকে—অল্প নানা কথায় ভরা থাকে না। আর এই জুই অসুখ-বিস্ময়ের সময় বা গভীর শোকের সময় মন যখন প্রায় শূন্য ভাবে থাকে—তখনই পুরানো দিনের কথা বেশি করে মনে পড়ে।

উপরোক্ত দুই মত নিয়ে যথেষ্ট বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে—দুইটি মতেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বলবাব মত বুড়ি বুড়ি কথা আছে—দুইটিকেই মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে পরীক্ষা করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কাজেই এর কোনটি যে সত্য আর কোনটি যে ভুল—অথবা দুটির কোনটি একেবারে সত্য বা ভুল নয় উভয়ের অপূর্ণ সমন্বয়েই প্রকৃত সত্য, তা বলা কঠিন। প্রত্যেকে নিজের নিজের মনের সঙ্গে মিলিয়ে যা সত্য বলে মনে হয় সেইটাকেই ঠিক বলে ধরে নিতে পারেন।

দেখা গেল আমরা কি করে মনে রাখি আর কেনই বা ভুলি। এখন দেখা যাক কেমন করে চেষ্টা করে মনে রাখা যায় বা ভুলতে পারা যায়।

যে প্রণালী দ্বারা আমরা স্বভাবতই মনে রাখি চেষ্টা করে মনে রাখার জ্ঞানও সেই প্রণালীরই অনুসরণ করতে হবে। এখন সেই প্রণালীটিকেই বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

আমাদের অপ্রবুদ্ধ চৈতন্তে জ্ঞান যদি প্রচ্ছন্ন ভাবেই থাকে তবে চিরকালই থাকে না কেন? মাঝে মাঝে আবার আগ্রহ চৈতন্তে উঠে আসে কেন? কি করেই বা আসে?—আসে ভাবানুসঙ্গের দ্বারা—আসে সাদৃশ্য ও সান্নিধ্যের ফলে। বর্তমান সময়ে আমি যা প্রত্যক্ষ করছি তার সঙ্গে পূর্বের কোন ভাবের যদি সাদৃশ্য থাকে তাহলে অপ্রবুদ্ধ চৈতন্তের সেই জ্ঞান আগ্রহ চৈতন্তে আসতে চায়। একটা লাল গোলাপ দেখলে আমার হয়ত আমার বাড়ীর লাল গোলাপের কথা মনে পড়লো—অপ্রবুদ্ধ চৈতন্তের প্রচ্ছন্ন জ্ঞান এইরূপে আগ্রহ চৈতন্তে আসে।

আমাদের যে বর্তমান অনুভূতি হয় তার ফলে একদিকে যেমন তার সদৃশ পূর্ব ভাব মনে আসতে চায় তেমনি অল্প

দিকে দৃষ্টির বিষয়ীভূত প্রত্যক্ষ বস্তু সমূহও মনে আসে। এই ভাবে আমাদের মনে সব সময় যেন ছুটি ধারা বিরাজ করতে থাকে;—যেমন ধরুন আমি হয়ত রেলগাড়ী করে যাচ্ছি, এর থেকে আমার মনে পড়লো গত বছর রেল করে পুরী গিয়েছিলাম—তার আগের বছর গিয়েছিলাম শিলং—তার থেকে মনে জাগলো সে সব জায়গার নানা স্মৃতি। অপর দিকে আবার দেখছি গাড়ীটা ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছে, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে—মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী পার হচ্ছি। একটা ধারায় বর্তমানের প্রাধান্য, অপরটাতে অতীতের। একটায় প্রত্যক্ষের অপরটাতে স্মৃতির। এই দুটি কিন্তু পরস্পর বিরুদ্ধ। যার মনে একটা ধারা প্রবল তার মনে অপর ধারা নিস্তেজ। আবার সময় ও অবস্থা বিশেষে একই লোকের মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারার প্রাবল্য দেখা যায়।

এই দুইটি ধারার ও দুই রকম বিশেষত্ব আছে—একটি সাদৃশ্যগত ও অল্পটি সন্নিধিগত। যেমন আমি যদি রেলগাড়ীতে বসে খালি রেলগাড়ীতে চড়ার কথাই ভাবি সেটা হলো সাদৃশ্যগত—অর্থাৎ একটা ভাব মনে অনুকল্প ভাব-রাশি আগিয়ে তোলে। আর যদি রেলগাড়ী চড়ে পুরী যাওয়ার থেকে সমুদ্রের কথা, সমুদ্রে সূর্যাস্তের কথা—এই সব ভাবতে থাকি তাহলে সেটা হলো সন্নিধিগত অর্থাৎ একটা ভাব মনে তার সন্নিধিতে অবস্থিত অল্প নানা ভাব আগিয়ে তোলে। এই দুই ধারাও পরস্পর ভিন্ন এবং এই দুইটিই ভাবানুসঙ্গ মতবাদের প্রধান দুই নিয়মকে নিয়ন্ত্রিত করে।

যখন প্রথমোক্ত ভাবে কিছু মনে পড়ে তখন তাকে বলে সাদৃশ্য-সাহচর্য আর দ্বিতীয়রকম ভাবে মনে পড়লে তার নাম হয় সন্নিধিগত বা বহিঃসম্পর্ক সাহচর্য। আরও এক রকম ভাবে আমরা কোন বস্তু স্বরণে আনতে পারি—বৈপরীত্য-দিয়ে যেমন কাল জিনিষ দেখলে আমাদের সাদা জিনিষের কথা মনে পড়ে, রাত্রির কথা ভাবলে দিন মনে আসে, সুখের মাঝে দুঃখের, বিষাদের মাঝে আনন্দের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। কিন্তু এই বৈপরীত্যকে অনেকেই একটা আলাদা নিয়ম বলে স্বীকার করেন না—উপরোক্ত দুই প্রধান দুটো নিয়মেরই প্রকারান্তর বলে মনে করেন।

মোটের উপর দেখা যাচ্ছে মনে রাখতে হলেই ভাবানুসন্দের প্রয়োজন, কাজেই চেষ্টা করে মনে রাখতে হলেও আমরা এই নিয়মগুলিই অবলম্বন করি। সত্যিই যে কিছু মনে রাখতে হলে আমরা এই প্রাণালীর অনুসরণ করি একটু চিন্তা করলেই তা বেশ বোঝা যায়। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে কোন কথা মনে রাখবার দরকার হলে কাপড়ের আঁচলে গিট বেঁধে রাখবার বহুল প্রচলন দেখা যায়। আঁচলে গিট বেঁধে রাখলে যে মনে পড়বে তার কারণ এই যে গিট বাঁধার সঙ্গে সেই কথার একটা সম্পর্ক একটা সাহচর্য্য হয়ে থাকে—গিটটা দেখলে সেটা মনে পড়ে যায়। একটু ভাবলেই এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, যেমন আশ্বিনের ঝড়, বিহারের ভূমিকম্প প্রভৃতি বড় বড় প্রাকৃতিক ঘটনার সমসাময়িক বহু ঘটনা তাদের সাহায্যে মনে আনা যায়।

এতক্ষণ তো মনে রাখার কথাই হল; এবার দেখা যাক কি করলে ইচ্ছা করে ভুলে যাওয়া যায়। ভোলা জিনিষটাকে যত সহজ মনে হয় আসলে তত সহজ নয়। মনে রাখা যেমন কঠিন ভুলে যাওয়াও ঠিক তাই। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমরা যা মনে রাখতে চাই সেটাই ভুলি আর যা ভুলতে চাই সেটাই বেশি করে মনে থাকে। আরও মুশ্কিল এই যে যা মনে রাখতে চাই না তেমন অনেক কথাও আমাদের মনে থাকে কিন্তু যা ভুলতে চাই তা হয়ত কিছুতেই অনেক কষ্টেও ভুলতে পারি না। কাজেই সময় সময় মনে রাখার চেয়ে ভুলে যাওয়ার শক্তিরই বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সাধারণতঃ ছোট খাট ব্যাপার আমরা ভুলে যাই কিন্তু কষ্টদায়ক ঘটনাগুলি—যা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে যায় তা ভুলতে পারি না। তাছাড়া এমনও দেখা যায় যে ব্যক্তিবিশেষের মনোবৃত্তি হয়ত এরূপ ভাবে গঠিত থাকে যে তাদের কষ্টদায়ক ঘটনাগুলিই বেশি করে মনে থাকে। অনেক সময় অবশ্য আবার এমন অবস্থাও আসে যখন আনন্দজনক ঘটনাগুলি ভোলবারই বেশি দরকার হয়ে পড়ে।

চেষ্টা করে মনে রাখবার মত চেষ্টা করে ভুলে যাবারও কতকগুলি নিয়ম আছে। এইবার সেগুলির বিষয়

আলোচনা করা যাক। (১) ভুলে যাবার প্রধান নিয়ম এই যে কোন একটা বিশেষ ভাব ভুলতে হলে তার চেয়ে বেশি চিন্তাকর্ষক ও ক্ষমতাপন্ন ভাবের স্মরণ নিতে হয়, তাহলে সেই ভাবের তলায় পূর্ববর্তী ভাব চাপা পড়ে যায়। চেষ্টা করে ভুলতে হলে সাধারণতঃ বেশির ভাগ জিনিষ এই রকম ভাবেই ভুলতে হয়। একজন স্কুলের ছেলের হয়ত কিছুতেই পড়ায় মন লাগছে না—খালিই মনে হচ্ছে পাশের গ্রামের স্কুলের সঙ্গে ফুটবল প্রতিযোগিতার কথা। যদি তখন পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে পুরস্কার লাভ করতে পারলে কেমন আনন্দ হবে, উপরন্তু কাকার কাছ থেকে নতুন সাইকেল পাওয়া যাবে, এইসব অধিক চিন্তাকর্ষক কথা ভাবে তাহলে তার পড়ায় মন আসবে। কি রকম ভাবের দ্বারা সে অপর ভাবকে দাবিয়ে রাখতে পারা যায় সে অবস্থা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ মনোবৃত্তির উপর। স্বৈচ্ছাধীন বিস্মরণের শক্তি শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের মস্ত বড় সহায়।

(২)

অনেক সময় একটা ভাব প্রথম থেকেই অপর এমন একটা ভাবের সঙ্গে জড়িত থাকে যে তার আওতায় পড়ে সেটা ক্রমে ক্রমে একেবারেই মিলিয়ে যায়। কোন ছোট্টছেলেকে যদি আঙ্গুল দিয়ে কোন জিনিষ দেখিয়ে দেওয়া হয় তাহলে প্রথমে অবশ্য সে আঙ্গুলটার দিকেই তাকিয়ে থাকবে কিন্তু জিনিষটা যদি তার পক্ষে কোন অকর্ষণের বস্তু হয় যেমন লাল ফুল কিম্বা রঙীন প্রজাপতি তাহলে সে সেইটাই দেখবে আঙ্গুলটার কথা একেবারেই ভুলে যাবে। অধিকাংশক্ষেত্রে এইটাই হল শিক্ষার মূলভিত্তি। শিক্ষকের ও অগ্রদূতের কাছে শুনে এবং বই পড়েই বেশির ভাগ জ্ঞান লাভ হয় কিন্তু কালক্রমে সেই জ্ঞান যখন জীবনের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় তখন আর শিক্ষক বা বইয়ের কথা মনে থাকে না। কার কাছ থেকে শুনেছিলাম বা কোথা পড়েছিলাম সে প্রশ্নই মনে জাগে না—অর্জিত জ্ঞান নিজস্ব হয়ে যায়। অবশ্য সবসময়েই যে এরকম হয় তা নয়। অনেক সময় দেখা যায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত যে উপায় অবলম্বন করা হয় শেষপর্য্যন্ত উদ্দেশ্যের চেয়ে সেই উপায়ই

হয়ত প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। যেমন অনেক লোক প্রথমে অর্থের নানাবিধ প্রয়োজনীয়তার জন্ত—অত্যাশ্রয় নানা কার্যের উপায়স্বরূপ অর্থোপার্জনে মন দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সব ভুলে গিয়ে অর্থকেই আসল উদ্দেশ্য করে তোলে। সেখানে হয় উল্টা ফল—উপায় এসে উদ্দেশ্যকে তাড়িয়ে তার জায়গা দখল করে নেয়।

(৩)

অনেক সময় আবার দেখা যায় যে প্রথম ভাবটা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায় না কিন্তু অল্প যে সব ভাব সে জাগিয়ে তোলে নিজে তার তলায় চাপা পড়ে মনের সামান্য মাত্র স্থান অধিকার করে থাকে। আমরা যখন পড়ি, অক্ষরগুলো আমাদের মনে নানারকম ভাব ও অল্পভূতি জাগিয়ে তোলে কিন্তু তাই বহল তারাও যে একেবারেই দূর হয়ে যায় তা নয়। অলঙ্কার, সাংকেতিক বাক্য ও রূপকের ভিতরেও কথার আসল মানেটা মনের কোণে আবছাভাবে একটু আধটু উকিঝুকি দেয়—মুখচন্দ্র বলে স্বন্দর মুখ তো মনে হয়ই সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে চাঁদের ছবিটাও যেন অস্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে।

(৪)

অনেক সময় আবার একটা ভাব অপর একটা ভাবকে ডেকে আনে কিন্তু সে নিজেও বর্তমান থাকে—দূরে সরে যায় না। দুটো ভাব মিলে একটা নতুন ভাবের সৃষ্টি করে, যাতে দুটোরই প্রাধান্য সমানভাবে বজায় থাকে অথচ দুটো এমন মিশে যায় যে একটা থেকে আর একটা তফাৎ করা যায় না। দুটি ঘরোয়া উদাহরণ দিয়ে এটা বেশ বোঝা যায়। যেমন ধরা যাক আলুর চপ ও ক্ষীরের লুচি—ঠিক আলাদা আলাদা হয়েই স্পষ্টভাবে মনে জাগে তা নয়, অথচ যে ভাবটা জাগে তাতে দুটোর কোনটার প্রাধান্যই কান্নুর চেয়ে কম নয়—দুটোতে মিলে একটা নতুন ভাবের সৃষ্টি করে। আসলে কিন্তু প্রথমে মাছ মাংস-প্রভৃতি অল্প জিনিষের চপের থেকে আলাদা করবার

জন্ত আলুর ও অল্প নানারকম লুচির থেকে আলাদা করবার জন্ত ক্ষীরের লুচি নামের সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণতঃ সব যোগরূঢ় শব্দের ইতিহাসই এই রকম। প্রথমে অল্পসব জিনিষ থেকে আলাদা করবার জন্ত দুটো কথা মিলে একটা কথার সৃষ্টি হয় কিন্তু কালক্রমে মানুষ সে কথা ভুলে যায়—দুটো কথার মানে আলাদা করে না ভেবে তার একটা বিশেষ অর্থই ধরে নেয়—এর সবচেয়ে প্রচলিত উদাহরণ পঙ্কজ।

দূরত্বের জ্ঞান আমাদের কাছে অতি সহজ ও সাধারণ মনে হয় কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দূরত্বের প্রথম জ্ঞান অতি সহজে লাভ হয়নি। অনেক জটিল পথের ভিতর দিয়ে, অনেক ভাবের মিশ্রণে, অনেক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয়েছে। সমষ্টিমূলক সর্বপ্রকার জ্ঞানই এইভাবে অর্জিত হয়। যা হয়ত বহু দিনের রহস্যপ্রস্রাবের ফলে খুটিনাটি নানা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে জানা গেছে কালক্রমে সেইটাই প্রত্যক্ষ অল্পভূত সত্য—অন্তঃসিদ্ধ জ্ঞানের রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। তখন তার মধ্যে আগেকার সেই তর্কবিতর্ক বাদানুবাদ বিচার বিবেচনা কিছুই আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে অভ্যাস ও প্রথা সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। কোন বস্তুর বিষয় যত বেশি করে যত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা যায় ভবিষ্যতে সেটা তত বেশি অন্তঃসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ বলে মনে হয়।

এইগুলিই হল ভুলে যাওয়ার নিয়ম। অর্থাৎ মানুষের মন তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যন্ত্রচেতনার রাজ্যে এই সব প্রক্রিয়ার দ্বারা জাগ্রত চৈতন্যের ভাবরাশির ভীড় কমিয়ে দেয়। যে মানুষের মনের এই ক্ষমতা থাকে না—যার চেতনায় যখন সব রকম ভাব এসে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে বিশৃঙ্খল গুণ্ডগোলের সৃষ্টি করে—কেউ কাউকে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না—তখন তাকে আর প্রকৃতিস্থ বলা যায় না।

বসন্ত কুমারীর স্মৃতি-বার্ষিকী

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

মাননীয় সভাপতি, সমবেত জননীগণ এবং ভ্রাতৃবৃন্দ,

বছরে বছরে আজকের এই পুণ্য তিথিতে পুণ্যলোকা বসন্তকুমারীর স্মৃতি বার্ষিকী সভায় তাঁহার নীলাচলের এই পুণ্য প্রতিষ্ঠানে আমরা সমবেত হয়ে থাকি। বসন্ত কুমারীর উদার হৃদয়ের পরিচয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্বে এই স্মৃতি বার্ষিকীর সভাপতি রূপে বিস্তৃত ভাবে দিয়েছিলেন এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই তা শুনেছিলেন—তাই সে কথার আজ পুনরুক্তি করবো না। স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাশ প্রণীত “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” পুস্তকে সার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং লেডী বসন্ত কুমারী দেবীর অনেক কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। ষাঁরা এই দম্পতীর মহাভূতবতা, উদারতা, বদান্যতা, জনসেবা এবং দেশ ও স্বজাতিপ্রীতি জানতে চান—তাঁরা ঐ পুস্তক পাঠ করলে জানতে পারবেন। নারীজাতির কল্যাণ কামনায় বসন্তকুমারীর কিরূপ তীব্র আগ্রহ ও ব্যাকুলতা ছিল—তার নিদর্শন আপনাদের চোখের সামনে জল্জল করছে। তাঁর দান এই পুণ্য প্রতিষ্ঠান—বিধবাস্রম। হিন্দুনারী যাতে তাঁর উচ্চ পবিত্র আদর্শ রাখতে সমর্থ হয় এই ছিল তাঁর ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। মনে করবেন না এই বাড়ীটী তিনি দান করেছেন বলে আজ তাঁর পুণ্য স্মৃতি আমরা স্মরণ করবো। নানা কাজে অনেকে এ রকম দান করে থাকে, তার মূল্য কিছু থাকতে পারে বটে কিন্তু তার জন্ত আমরা তাঁর পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করতে এত শ্রদ্ধার সহিত এখানে সমবেত হতাম না। এই দানের পশ্চাতে যে উচ্চ আদর্শ রক্ষার প্রেরণা আছে, নারীধর্মের প্রতি যে প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস আছে—তাই আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে সমবেত ভাবে তাঁর পবিত্র স্মৃতির বেদীমূলে আজ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতে।

আজকাল এই প্রগতির যুগে পাশ্চাত্য বিদ্যায়

মগ্নিত হয়ে অনেকে মনে করেন হিন্দুজাতি বা হিন্দু ধর্ম নারী জাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেছে, তাঁদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি কোন লক্ষ্য করেনি এবং সমাজে তাদের গুণু পরিচায়িকা বা জীতদাসীর মত স্থান দিয়েছে। কিন্তু এই সব ধারণা একেবারে ভ্রান্তিমূলক।

বৈদিক যুগে আমরা দেখতে পাই প্রায় বার জন পুণ্যবতী মহিলা ঋষিদের মত মন্ত্রদ্রষ্টা লাভ করে ছিলেন এবং তাঁরা কেহ এক বা একাধিক স্মৃত্ত বা মন্ত্র প্রকাশ করে ঋষিদের নিকট শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেয়েছিলেন। ঋষিদের প্রথম মণ্ডলে ছাব্বিশ স্মৃত্তের মন্ত্রদ্রষ্টী রোমশা নাম্নী নারীঋষি। লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, শাশ্বতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, যোষা এবং অদিতি প্রভৃতি অনেক নারী ঋষির উল্লেখ আছে। এঁরা ছিলেন দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন। অদিতির নিকট স্বয়ং ইন্দ্রদেবতা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার জন্ত উপদেশ প্রার্থী হয়েছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখতে পাবেন অশেষ শাস্ত্রবিদ বেদবেদাদ্যপারদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ বাজবল্ক্যের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন নানা শাস্ত্র পারদর্শিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ী তত্ত্বজ্ঞানের গূঢ়রহস্য সম্বন্ধ বিচার করেছেন। এমন কি অষ্টৈতকেশরী শ্রীশঙ্করাচার্যের সহিত মণ্ডন মিশ্রের যখন দার্শনিক বিচার হয় তখন তার মধ্যস্থতার কাজ করেছিলেন অখিল-শাস্ত্র-পারদর্শিনী মণ্ডনপত্নী উভয় ভারতী।

পৌরানিক যুগে রাজর্ষি জনকের সভায় আমরা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন মহা যোগিনী স্থলভার নাম দেখতে পাই। পৌরানিক যুগে যে সকল হিন্দুনারী পাতিব্রত ধর্মের মহোচ্চ আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন আজ পর্যন্ত তাঁদের পবিত্র নাম উচ্চারণ করে কোটী কোটী নরনারী কৃতার্থ বোধ করে। জনক নন্দিনী সীতা ঘরে ঘরে পূজিতা হচ্ছেন। গাবিত্তীব্রত পালন করে লক্ষ লক্ষ নারী ধন্য বোধ কচ্ছেন। দময়ন্তী, পতিব্রতা চিন্তা প্রভৃতির নাম কে না জানেন ?

মহুসংহিতা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন “নিত্যমাশ্রয়
শুচি স্ত্রীণাং।” অর্থাৎ স্ত্রীজাতির মুখমণ্ডল নিত্য পবিত্র।

“যত্র নার্যাস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ॥

যত্রৈতাস্ত ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া ॥

অর্থাৎ যে পরিবারে নারী পূজিত বা সম্মানিত হয়
সেখানে দেবতারা আনন্দে বিরাজ করেন। যেখানে
নারীর সম্মান বা পূজা নাই—সেখানে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান
বিফল হয়।

শোচন্তি জামযো যত্র বিনশান্ত্যাস্ত তৎকুলম্।

ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা।

যেখানে স্ত্রীজাতি অশান্তিতে কাল যাপন করে—সে
কুল বা পরিবার আশু বিনষ্ট হয়।

যেখানে স্ত্রীজাতি অশান্তিতে থাকে না—অর্থাৎ সমস্ত
চিত্তে থাকেন সেখানে সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মহুসংহিতা ও অন্যান্য স্থিতি শাস্ত্রে এমন ভুরি ভুরি
শ্লোক আছে, সে সব উদ্ধৃত করে আপনাদের ধৈর্য্যকে
পীড়িত করব না।

বিধবাদের সম্বন্ধে মহু বলেছেন যে—

বশাহ পুত্রাস্ত চৈবং শুভ্রক্ষণং নিকুলাস্ত চ।

পতিব্রতাস্ত চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাস্ত চ ॥

অর্থাৎ রাজা এই কয়জনকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করবেন—
বক্ষ্যা, অপুত্রবতী, নিকুল (অনাথা) পতিব্রতা সাধবী, বিধবা
ও পীড়িতা স্ত্রী। শুধু তাই নয়—মহু রাজাকে ব্যবস্থা
দিয়েছেন যে—

“জীবন্তীনাস্ত তাসাং যে তদ্ধরেষু স্ববাক্ষবা।

তজ্জিঘ্যাক্ষৌরদণ্ডেন ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ॥

যে আত্মীয়েরা এই সকল স্ত্রীজাতির ধনসম্পত্তি রক্ষা
করিবার ছলে তাদের জীবিত কালেই হরণ করে—ধার্মিক
মরপতি সেই সকল আত্মীয়দের চৌর্যাদও দ্বারা শাসন
করবেন।” মহু বলেন—

স্ত্রী বিপ্রাত্ম্যপপত্তৌ চ ধর্ষণে ন্ন ন জ্যতিঃ ॥

স্ত্রী ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে রক্ষার জন্ত হত্যা করলেও
ধর্ম্মানুসারে পাপ হয় না।

প্রাচীন হিন্দু এই চক্ষে স্ত্রীজাতিকে দেখতেন।
পরিবারে পিতার অপেক্ষা মাতার গৌরব অধিকতর।

“সহস্রশত পিতৃন্যাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে” পিতার অপেক্ষা
মাতার গৌরব সহস্রগুণ অধিক—এই কথা স্বয়ং মহু
বলছেন। সর্বশেষে হিন্দু স্ত্রীজাতিকে জগজ্জননী মাতৃস্বরূপা
দেখতে নির্দেশ করেছেন—

বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভোদাঃ

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

ত্বয়ৈকয়া পূরিত মনুষ্যৈ তৎ

কা তে স্ততিঃ স্তব্যাপরা পরোক্তিঃ ॥

“হে জননী—অনন্ত জ্ঞানের তুমি কারণ—তুমি বিদ্যা
স্বরূপিনী। জগতের প্রত্যেক স্ত্রী মূর্তি তোমারই আকার-
ভেদ—তারাই তোমার প্রাণময়ী প্রতিমা। হে দেবি!
সকল স্তব স্ততির তুমি অতীত—বিশ্বের প্রতি স্থানে
প্রত্যেক অল্পপরমাণুতে হে মহাশক্তি, তুমি ব্যাপ্ত হয়ে
রয়েছ।”

এই আমাদের নারী জাতি—মাতৃজাতি! মহু বলেছেন
যে “মুতে ভর্ত্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।

স্বর্গং গচ্ছত্য পুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।

অর্থাৎ অগুত্রা হইলেও সাধবী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর
ব্রহ্মচারিণী হইবেন। যারা ব্রহ্মচর্য্য যথাযথ পালন করেন
তারা দিব্যগতি লাভ করে থাকেন।

পুণ্যবতী বসন্তকুমারী ব্রহ্মচারিণীর পুণ্যাদর্শ
প্রতিষ্ঠা করেছেন এই বিধবাস্রমে।—কিন্তু এর পরিপূষ্টি
ও আদর্শ রক্ষার জন্ত যিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন
সেই পুণ্যবতী “বড়মা”কে আমরা আজ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান
করব।—তিনি যে কত ক্রোশে, কত দুশ্চিন্তায়, কত ত্যাগে
এই আশ্রমটিকে পুণ্যময় করে তুলছেন তা যেন আমরা না
বিস্মৃত হই। স্বাধীনভাবে যাতে বিধবারা স্বীয় জীবিকার্জন
লাভ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে—যাতে তাদের
ত্যাগমণ্ডিত পবিত্র জীবন দেশের ও দশের কল্যাণে উৎসর্গ
করতে পারে—বৃহত্তর ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজে যাতে এই
ব্রহ্মচারিণীর দল মানব জাতিকে মহাদর্শে অনুপ্রাণিত
করতে পারে—তাই “বড়মা”র লক্ষ্য। নীলাচল-স্বামীর
নিকট প্রার্থনা করি, এই ব্রত সফল হোক—এই আশ্রম
পুণ্যভীর্থে পরিণত হক, আদর্শপথে মাতৃজাতির অভিযান
পরিচালিত হক।

যৌগিক

পূর্বাহ্নবৃত্তি

৩ রাধাচরণ চক্রবর্তী

ছিল ছুটির দিন—কলেজের হাঁদামা নেই। অতিথিকে ওঘরে মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের অবকাশে অগ্রসর করিয়ে দিয়ে অশেষ এসে এঘরে ঢুকলেন।

ওরা দু'বোন তখনও খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে আসেনি। হাত বাড়িয়ে ফ্যানের স্নইচটা টিপে দিয়ে অশেষ টেবলের সামনের চেয়ারটাতে বসলেন এবং টেবলের কোন থেকে সিগারেটের কৌটাটি টেনে নিলেন।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে একবার কপালের ঘাম মুছলেন। ভাবলেন, দৈনন্দিন জীবনের স্রুতিতে এ একটা অতিরিক্ত কৃত্য। অতিথি-সেবা মন্দ নয়, কিন্তু বাকিও কম নয় তার। অনর্থক কত-খানি সময় নষ্ট হ'ল আজ বাজে বকে'। কৃত্রিমতার পালিস দিয়ে প্রতিটি কথায় সৌজন্য প্রকাশ করাও এক দুর্ভাগ্যময় আর্ট। তারপর—

অতসী এসে ঘরে ঢোকে। চুকেই—একি! অতসী অবাক হ'য়ে বলে, “একি! লাইট জালিয়ে বসে' আছ আর ঘামছ!”

“লাইট—তাইত! কোন্ স্নইচ টিপতে টিপে দিয়েছি কৌন্টা!” অশেষ নিক্ষেপ্তকৈ বললেন।

অতসী লাইট নিবিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিল।

—“স্বামীজি গিয়ে শুলেন নাকি—দিনে ঘুমোন?”

অশেষ হেসে বলেন, “হ্যা, স্বামীজি শুলেন এবং ঘুমের ব্যাঘাতও হবে না তার সম্ভবতঃ,—কিন্তু স্বামী তোমার—”

অতসী কোমল স্বরে বলে, “বাড়ীতে কেউ এলে এক-অধাটু এম্নিতর অস্ববিধে হ'য়েই থাকে।...শুয়ে একটু রেস্তা নাও এখন।”

—অশেষ যেন এই প্রথম লক্ষ্য করলেন; অতলা আসে নি।—“ওর এখনও খাওয়া হয়নি—অতি'র?”

—“ও গিয়েছে নীতীশকে ভালো করে' বারণ করে দিতে যেন খুটখাট শব্দ না করে, আর সেই কলের এ্যারোপ্লেনটায় এখন দম না দেয়।”

অশেষ বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে ওঠেন, “অতিথি-সেবা মেয়েরাই জানে।”

খাটে গিয়ে বসছেন, এমন সময় দৌড়বার ভঙ্গীতে ওদিকের টেনে-দেওয়া কপাট ঠেলে, অতলা ছড়মুড় করে' ঢুকে পড়ল ঘরে। ওর আঁচলের তলে বৃকে ধরা কি এক খানা বই।

“কিরে, কি হয়েছে!”—অশেষ ও অতসী দু'জনেই কম আশ্চর্য হন নি।

অতলা • হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বলে, “এই বইখানা আনতে ভুল করে' গিয়েছিলুম ঐ ঘরে—জানি কি, যে...”

অতলার মুখ যেন বিরক্তিতে বিকৃত হ'য়ে ওঠে; “কি যে অস্ববিধে হয়েছে! একে ত' এই পায়রাখুপী বাড়ী, তার ওপর মাথা-গুন্টি ঘর.....কতবার যে ভুল করব আরও...ছি ছি!”

অশেষ সায় দিয়ে বলেন, “সত্যি, বাড়ী আমাদের এমন ছোট যে এর ভেতর আর কোন মানুষের ঠাঁই হওয়া কঠিন!”

অতসী অশেষের মুখের দিকে চেয়ে অতলার মনের ভাব অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করে।

অশেষ বলেন, “কিন্তু তোমার পক্ষেও অতলা, অমন ভুল করা ছেলেমানুষি হয়েছে। উনি হয় ত' মনে করবেন, মেয়েটা কি নিলজ্জা!”

অতসী কথাটাকে অল্পকূলে ঘুরিয়ে আনে; “মনে করবে, না আর কিছু! আমাদের নীলি'র দেওর—নীলিকে জানিসনে অতি, সেই যে বরানগরে আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকত, পড়ত আমার সঙ্গে?—নীলি'র দেওর,... নিজেদের লোক বললেই হয়...মনে করবে আবার কি!”

অতলা নতুন জ্ঞান।—“শুধু জামাইবাবুর ফ্রেণ্ড ন'ন দিদি, তোমারও ক্লাশফ্রাণ্ডের দেওর? আগে ত' বল' নি।”

অতসী স্বামীর দিকে চেয়ে চোখের মিনতি করে।
ওর কথার আংশিক মিথ্যাকে তিনি যেন মার্জনা করেন
এবং মেনে নেন।

অতলার প্রশ্নের জবাব দেয়, “আবশ্যক মনে হয়নি
বলেই বলিনি। এখন বলছি, সাপ-বাঘের চোখে ঝুঁকে
তুই দেখিস্ নে। তোর নিজের ভাইয়ের মতই... ভয়
করবার কিছু নেই, সঙ্কোচও কর্বিনি অত।”

অতলা চোখের কোণ কুঁচকে বলে, কিন্তু তোমার ঐ
দেওরটি কি আবহমান কালের জন্তে দিদি,.....”

অতসী ভঙ্গী করে বলে, তোমাদের কিছু খেতে পরতে
আসেন নি উনি! কি কাজের জন্তে এসেছেন কলকাতা,
কাজ ফুরোলেই যাবেন চলে...।”

অশেষ হেসে বললেন, “অর্থাৎ প্রবহমান কালের
জন্তে।”

চা খেয়েই ওঁরা বেরুবেন। মেয়েদের পোষাকের
প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।

চা খাওয়া হ'ল—কিন্তু চায়ের টেবুল ওদের ছেড়ে দিল
না; প্রথমে সাধারণ টেবুল টুক, তার থেকে তর্ক—এখন
তর্ক চলছে অসাধারণ বিতর্কের পরিণতিতে।

একটা সামান্য বিষয় এমনি করেই অসামান্য ক্ষীতি
লাভ করে থাকে।—

চা খেতে খেতে দেবনাথ তাঁর হাতের ‘ব্লু পিটার’
খানার পাতা উল্টাচ্ছিলেন। পোলাণ্ডের কে একজন
সমর-সচিব রোমে উপনীত হয়েছেন, তাঁকে ফ্যাসিষ্ট ট্যাঙ্ক
বাহিনীর কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হ'চ্ছে। এই চিত্র এবং তার
নীচের ক'লাইন পরিচায়িক মন্তব্য থেকেই তর্কের
সূত্রপাত।

দেবনাথ উৎপ্রেক্ষা দিয়ে বললেন, “বর্তমান শতাব্দীর
সভ্যতা ঠিক ঐ ট্যাঙ্কের মতই দুর্ব্বার, তাকে অস্বীকার
করলে সে তাকে পেষণ করে যাবে।”

অশেষ বললেন, “যে যান্ত্রিক শক্তি শুধু পেষণ করে চলে
তার সঙ্গে সভ্যতার তুলনা করে আপনি অলঙ্কার-দুষ্টি
ঘটিয়েছেন! এ যেন বিস্কোটকের রক্ত বর্ণের সঙ্গে উপমিত
করা হয়েছে সুন্দর ওষ্ঠের রক্তিমাকে।”

—“কেন, এই যে কলকারখানা, যান্ত্রিক আবিষ্কার,
যান্ত্রিক উন্নতি—একে আপনি সভ্যতা বলতে চান না?
আশ্চর্য্য!”

—“যতটুকু ওর পরিপোষণের শক্তি আছে ততটুকুই
ওর সভ্যতা—অবশ্য তা'ও সভ্যতা—কিন্তু যখনই ও'
পেষণের সীমায় এসে দাঁড়ায়, তখনই বলব ওকে বর্বরতা,
সভ্যতা নয়।”

দেবনাথ বললেন, “আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই
ধনু, বাঁতা—”

ঘরের ভেতর জানালার ধারে বসে তর্ক শুন্ছে ছ'বোন
—অতসী ও অতলা। নীতীশ বেড়াতে যাবার জন্তে
অধীর হ'য়ে মেঝেয় পায়েচারি করে ফিরছে।

অতলা অতসীর গায়ে আঙ্গুলের ঠেলা দিয়ে বলে,
“দিদি, এস আমরা কাপড়-চোপড় ছেড়ে রাখি।”

—“কেন?”

অতলা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, “আজ বেরুনো হবেই না,
দেখো এখন বাঁতা ঘুরবে।

নীতীশ থমকে দাঁড়িয়ে বলে “কোথায় বাঁতা দিদি?”

ওদের মাথায় এবং কথায়! ওর ছোড়দি হেসে বলে
“যা—তুই এখন গিয়ে ছাদের ওপর লাটিম ঘুরো... আজ
ওরা বেরুবেন না।”

অতসী বিরক্ত হয়ে বলে “আঃ! চুপ কর, ওদের
কথা শুন্তে দে।”

দেবনাথ এবার যা উপমা দেবেন তা যেন অলঙ্কারদুষ্টি
না হয়, মনে মনে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। “এই ধরন
বাঁতা”—

—“হ্যা, তা কি বলতে চান?”

—“এই ধরন বাঁতা—তার একদিকে পেষণ, অন্যদিকে
চলেছে পোষণের প্রস্তুতি। গমগুলো যেমন করে বাঁতার
চাকার তলে পড়ে বিচূর্ণ হ'য়ে পিষে যায় তা' দেখে দুঃখ
হ'তে পারে, কিন্তু তারি সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে,
যখন দেখবে—চমৎকার ময়দাগুলো বেরিয়ে আসছে সেই
পেষণ যন্ত্র থেকেই।”

অশেষ বললেন, “হ্যা, উপমা আপনার মন্দ হয়নি
এবং আংশিক সভ্যও আছে কথাটাতে।” কিন্তু বাঁতায়

পরিপুষ্ট হচ্ছে শস্য, পরিপুষ্ট হচ্ছে ময়দায়। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির খাঁতায় একই মানব-সমাজের এক দলকে পেষণ করা হয়, অপর দলকে পোষণ করা হয়। একে আপনি যত বড় অভিনিধানিক নামই দিন না কেন, এ বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়।”

দেবনাথ বলেন, অর্থাৎ আপনি রাষ্ট্রশক্তিকে অস্বীকার করতে চান?”

অতলা এই পলিটিক্স জিনিষটাকে একেবারেই পছন্দ করে না। সে ‘উইমেন্স মুভমেন্ট’ বইখানা নিয়ে অত্যধিক নাড়া চাড়া করে বটে, কিন্তু তার শিক্ষা এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে, পলিটিক্সের দিক দিয়ে নয়।

অতলা বলল, “দিদি, চল আমরা ওদিকের দালানে কি ছাদে যাই। ওরা আজ উঠবেন না।”

অতসী বিরক্তির ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকাল, মুখে কিছু বলল না।

একেবারে তন্ময়! ...অতলা একটু মুহূর্ত হেসে ধীরে ধীরে দালানে বেরিয়ে আসে।

অতসী জানালার মুখের দিকে আর একটু ঝুঁকে বসে।

অশেষ বলেন, “আমি কেন, রাষ্ট্র শক্তিকে সেকালের মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরাও অস্বীকার করেন নি। আমাদের দেশে ত রাষ্ট্রশক্তির উপর দেবত্বের আরোপ করা হয়েছে। চণ্ডীতে স্বয়ং রুদ্রচণ্ডী বলছেন, ‘আমি রাষ্ট্ররূপা।’ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মুখ্যতঃ এই রাষ্ট্র-বানীই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সে রাষ্ট্রশক্তির প্রকাশ—দুহৃতকে দণ্ডদান এবং ধর্মের সংস্থাপনের জন্তু—নর-সমাজকে পেষণ করবার জন্তু নয়।”

দেবনাথ বললেন, “অর্থাৎ—”

অতঃপর এই ‘অর্থাৎ’ নানা বাক্যসঙ্কটের মধ্য দিয়ে বিমণ্ডিত হ’য়ে চললো। পুরুষের ভাগ্য এবং স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে যে কবিপ্রবাদ আছে, এই তর্ক সম্পর্কেও সে কথা পুরোপুরি খাটে। সেই প্রবাদ-বাক্যকে প্রমাণিত করবার জন্তে রাষ্ট্রশক্তি এবং সভ্যতা অস্বাদ্যভাবে ঘুরপাক খেয়ে চলতে থাকল। ইতিহাসের পাতা থেকে এসে বাইজান্টাইন এবং মিশরীয় সভ্যতা একালের ইয়াক্সি সভ্যতার গায়ে ধাক্কা

খেয়ে পড়ল সেকালের অতিকায় রাষ্ট্রগুলির অবলুপ্তির মতো প্রাগৈতিহাসিক যুগের লুপ্ত অতিকায় প্রাণী ডাইনোসরসে তুলনা করে। একালের অতিকায় রাষ্ট্রকে ইতিপূর্বে আরও করিয়ে মস্তব্য প্রকাশ করা হ’ল—বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, একদিন এই হাতীও পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।”

দেবনাথ এবার অস্বীকৃতির স্পষ্টতায় বলে, “আপনি কি বলতে চান, পৃথিবী থেকে একদিন যুদ্ধবিগ্রহ একেবারেই উঠে যাবে?”

তর্কের বোধ হয় একটা প্রবল আকর্ষণ শক্তি আছে। অতসী কখন জানালার মুখ থেকে উঠে এসে তর্কচক্রে একাংশে একটি আসন দখল করে বসেছে, সেই জানে না।

সহস্রাই সে চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে উঠে হয়ে উঠে বলল, “হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবে উঠে যেদিন পৃথিবী নারীমত একবাক্যে সংহত হ’য়ে বলবে যারা রাষ্ট্রবাদে নামে পরম্পর গলা কাটাকাটি ক’রে মরবে, সেই খুনে পুরুষদের আমরা কেউ বিয়ে করব না, ভগ্নিস্ত দান করব না, মাতৃস্ব দিব না। সেদিন—”

দেবনাথ অল্পকম্পার ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বললেন, “এ আপনার নারী স্বলভ কোমল চিন্তের উন্মাদ। কোন যুক্তি নেই এর মধ্যে! মেয়েরা—অশেষ হাত তুলে’ উত্তেজনা সঙ্গে বললেন, “এর কথাই সঙ্গে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের অভিমতের আশ্চর্য্য সমতা দেখে’ আমি বিস্মিত হচ্ছি। ঠিক এমনি কথাই বলেছেন—ম’সিয়ে ক্ল্যামোরিয়ো। ত্রিখ বছরেরও বেশী হ’ল তাঁর সেই অভিমতের সারাংশ উদ্ধৃত হয়েছিল সমসাময়িক ‘নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি’ পত্রিকায়। ভাবী পৃথিবী সম্বন্ধে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার মধ্যে একটিতে ঠিক এমনি ধরনেরই কথা রয়েছে। তিনি বলছেন—”

“আপনার স্ত্রীর মননশক্তির আমি প্রশংসা করি। কিন্তু আজ আর থাক্”—বলে দেবনাথ উঠে দাঁড়ালেন।

দেবনাথের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় বিভ্রত হয়ে প্রশংসিতা তার চোখ নামায়।

দেবনাথ অশেষের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন,

“ফ্রান্সের জীবনী পড়লে হয়ত জানা যাবে, তিনি জৈগ ছিলেন।”

অবাস্তব—অশেষ বিরক্ত হলেন, কিন্তু এমন ভাব দেখালেন যে, কথাটা আরো তাঁর কাণে যায়নি।

অতিথির খাদ্যচর্চার ভার লক্ষ্মীনাথের হাত থেকে অতসী নিজের হাতে নিয়েছে এবেলা। অতলা এটা সেটা যোগান দিয়ে তাকে সাহায্য করছে।

সাহায্য এবং আদেশপালন—“বেসন দে আরো খানিকটা না—না, বাটা পোস্ত না, গোটা দানা ছড়িয়ে দে গুটিকত। হ্যাঁ, হয়েছে, এখন আধাআধি পেরোজের রস আর আদা রসন বাটা দিয়ে বেশ করে ফেঁটে নে।”

—“এ তোমার কেমন এগচপ দিদি, গুচ্ছের খানিক হিজিবিজি দিয়ে?”

অতলার অজ্ঞতায় আঘাত করে অতসী “কিছু শিখলিনি! বলিনি যে এ তোর কেবিনের চপ নয়, বড়া?”

দিদির কৃতিত্বের ওপর ওর শ্রদ্ধা আছে। ও নীরবে ফেটে চলল ভাঙ্গা ডিমের শাঁসের সঙ্গে বেসন আর মসলা।

“হ্যাঁ হয়েছে—খাম্।” বলে হাত বাড়িয়ে দিদি ষ্টিলের বাটিটা টেনে নেয় কোণের কাছে।

বোন বলে, “ডিমের বড়া, মাছের চপ, কালিয়া, আবার মাংসও। সন্ন্যাসীর উপযুক্ত খাদ্যই দিদি।”

দিদি বলে, “এ তোদের চিমটেগুলো সন্ন্যাসী নয় যে ভিক্ষে করে ভাল রুটি যুগিয়ে খাবে! স্বসভ্য দেশের শিক্ষিত মিশনের মানুষ—অত খাদ্যজব্যের বিচার করেন না।”

বোন প্রতিবাদ করে, “খাদ্যাখাদ্যের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে, জামাই বাবু বলেন।”

—“তোর জামাই বাবু একটু বেশী সেকলে। ভুলে যাসনি যে এরা কস্মযোগী—ধূনী জালিয়ে কুড়িয়ে করেন না বসে বসে।”

—“তাই ডিম মাংস খেয়ে কস্মের শক্তি বাড়ান?”

অতসী সমর্থন করে।—“হ্যাঁ, তাই।.....দেখ শরীরে শক্তি আছে যার সেই ক্ষমা করতে পারে সহজে। যার

পৌরুষ আছে সেই হতে পারে শ্রেষ্ঠ সংযমী—কাপুরুষেরা নয়।”

অতলা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, “তাই ত’ ঐ সব মিশন মেয়েদের খ্রিস্টীয়ানা ঘেসতে দেয় না—না?”

“ভুল শুনেছিস,” অতসী যেন নতুন আলোকপাত করে, এদের সঙ্গে রকমের নয় একেবারেই—মেয়েরা আছে এবং অনেকে স্বামী-স্ত্রী শুদ্ধ আছেন একসঙ্গে।”

—অতলার সংশয় নিরসন হয়।—“ওঃ, তাই বল, সে একটা উপনিবেশ—আশ্রম নয়।

—“ভুল বুঝ্ছিস, আশ্রমই। স্বামিস্ত্রী থাকে ধোঁয়ানে কিন্তু থাকে পৃথক পৃথক—সম্পর্কের পরিচয় ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই।”

অতলা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে ভাবে, আশ্চর্য্য! কিন্তু এতদূর সংযমী ওরা....

সেই অপূর্ণ আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা কি অশ্রদ্ধা করবে ভেবে পায় না।

অতসী এবার উল্টো কথা বলে, “কিন্তু অস্বাভাবিক! সেই স্বামিস্ত্রীগুলির অমুণিতর ভাবে জীবন-যাপন। দেবনাথ বাবু ত’ সেই জগ্গেই—”

অসীম কোতূহলে অতলা দিদির মুখে চোখ তুলে চায়। “কি, দিদি—?”

—“আশ্রম ছেড়ে চলে এসেছেন।”

—“কি করবেন এখন?”

ব্যাচিলার মানুষ...কি করবেন, “আমি কি জানি!” বলেই, হঠাৎ কড়া’র ওপর বুকে পড়ে আফশোষের স্বরে বলল, “আহা-হা, শেষ বার বড়াগুলো একেবারেই পুড়ে গেল বোকা মেয়েটার সঙ্গে একশ’ কথা বলতে...!”

—বড়াগুলো কিন্তু সত্যিই পুড়ে যায়নি।

অতলা কিছুতেই পরিবেশনের ভার নিতে রাজী হ’ল না। বলল, “আর যা-কিছু বল দিদি, কঠিন হ’লেও করতে রাজী আছি, কিন্তু ও কাজটি আমি কিছুতেই পারব না... হাত কেঁপে হয় ত’ বাটি শুদ্ধ চেলে পড়বে কার হাতে কি পাতে।...আমি ভারি নার্ভাস হ’ছি দিদি...কোনদিনই আমি পারি নে ওসব।”

অতসী রেগে উঠতে চায়; পেশোয়ারীকে ধম্কে দিতে ভড়কাস্ নে, আর যত শাইনেস্ তোর এই ইয়েতে ?”

নিরুপায়ের ভঙ্গীতে অতলা বলে, “এত করে’ র’াধ্লে বাড়লে, অবশেষে ওদের খাওয়াটা পণ্ড করবার নিমিত্তের ভাগী করতে চাও আমাকে! তুমি ত’ জানোই দিদি, যে...”

দিদির মায়া হয়।—“একেবারেই ছেলে মানুষ। পরের ঘরে গেল কর্ণ কি তাই ভাবি। এই তেল-বোল মাখা কাপড়-চোপড় আবার বদলাতে হ’চ্ছে আমাকে গিয়ে..।”

অতসী কাপড় বদলাতে যায়। ওর অজ্ঞাতেই যেন ও’ পরিপাটী প্রসাধন করে’ ফিরে’ আসে। তারপর পরিবেশনে রত হয়।

দিদি পরিবেশন করে; হেঁসেলের সামনের দালানে ওরা খেতে বসেছেন—কোণের জানালার ধারে অতলা চুপ করে’ থাকে বসে’।

অশেষ একবার পরিবেশনকারিণীর দিকে প্রশংসমান চোখে চেয়ে দেখেন। একটা মার্জিত স্ত্রী ওর পরিচ্ছদ থেকে পরিবেশনে সংক্রমিত হ’চ্ছে।

দেবনাথ প্রথম গ্রাস মুখে তুলে’ই অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করেন; “আহার জিনিসটা একটা কুস্ত্রী আদিম বৃত্তি।”

অশেষ আশ্চর্য্য হ’য়ে বলেন, “কি রকম...?”

—“দেখুন না, এই হাঁ-করা বিকৃত মুখভাব, জিহ্বার এই লোলুপতা, দাঁত দিয়ে কঠোর ভাবে চিবিয়ে চলা,...সেই দাঁতের তলায় উদ্ভিদ, প্রাণিদেহ সব কিছু চলেছে নির্মম ভাবে নিষ্পেষিত হ’য়ে...পাশব বৃত্তি নয় এটা?”

অযৌক্তিক নয় কথাটা। আশষ বলেন, “হ্যাঁ, তা’ অস্বীকার করা যায় না একেবারে। কিন্তু একে পশুত্ব না বলে’ শারীর ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।”

—“ও’ একটা শুদ্ধ পরিভাষা যাত্র। তবে ভবিষ্যতে এর কুস্ত্রীতা অনেকটা কমবে যখন কেমিক্যাল হাউস থেকে ক্ষুদ্র শিশি বা টিউবে ভর্ত্তি হ’য়ে এমন সব খাদ্য বেকবে—যার একটি চাক্তি বা একটি বড়ি খেলেই ক্ষুধা নিবারণ আর শরীরের পুষ্টি হবে। তখন এত বড় হাঁ করে’ এমন ভাবে দীর্ঘকাল ধরে’ পশুর মত চিবিয়ে চলতেও হবে না।”

—“হয় যদি, তার মূলে থাকবে অল্প কারণ—মানুষের সময়ের অভাব এবং অস্বাস্থ্য খাদ্য বস্তুর অভাব।...আপনি যে শোভনতার কথা বলছেন সে শোভনতা মানুষ গ্রহণ করেছে চের আগে থেকেই—খাদ্য বস্তুতে দিয়েছে রন্ধন-বৈচিত্র্য, খাদ্যপাত্রের পারিপাট্য, এবং—”

অতসী মৃদুস্বরে বলল, “তোমরা খাবে, না গা করবে?”

অশেষ মুখ তুলে’ হেসে বললেন, “ধীরে ধীরে খাওয়া চলবে গল্পও চলবে—আধুনিক মতে।”

দেবনাথ বললেন, “বলুন।”

—“এবং সৌন্দর্য্যের প্রতীক নারীর হাতে অর্পিত হয়েছে তার পরিবেশন ভার।”

দেবনাথ যেন পরিবেশনকারিণীর দিকে এই প্রথ চোখ তুলে’ চাইলেন।—দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ওঁর বিশেষত্ব।

অতসী স্বামীর দৃষ্টিতে স্নিগ্ধতা খুঁজতে চোখ ফির্কতে নেয়।

এক মিনিট নীরবে ওদের খাওয়া চলে।

দেবনাথ কিছু বলবার জন্তে প্রস্তুত হ’য়ে নিয়ো বললেন, “কিন্তু মানুষ কি নারীর সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হ’য়েই তাকে পরিবেশন ভার দিয়েছে? একেবারেই না, নারীর পরিবেশনের উদারতাই তাকে ওর প্রেরণা দিয়েছে।”

—“বুঝলুম না।”

—“সে, না চাইতেই আহারকারীর মন বুঝে’ তা’ প্রচুর পরিমাণে ঢেলে দিতে পারে—সেইজন্তেই।”

অশেষ বিমূঢ়ভাবে বলেন, নারীসৌন্দর্য্যকে আপাদ্র স্বীকার করছেন না, আশ্চর্য্য।”

দেবনাথ হেসে বলেন, “সে ডাইনিং টেবলের ওপরকার ফুলের তোড়ার সৌন্দর্য্য।”

জানালার ধার থেকে ল্যাঙ্কশেপ ছবির মতই দালানের আলোকিত অংশটুকু অতলার চোখে পড়ে। কানে আরো ওঁদের প্রত্যেকটি কথা।

এর পর কোন্ ফাঁকে অতসী আসে চলে। ওঁর নির্বাক ভাবে আহারে মনোনিবেশ করেন।

অতসী দালান ঘুরে একেবারে ওর শোবার ঘরে চলে

আসে। ওর যেন ভীষণ মাথা ধরেছে এমনি অস্বস্তিকর মুখের ভাব।

আলনার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রতহস্তে বস্ত্র পরিবর্তন করে, পরিবেশনের জন্য বিশেষ করে 'ও' বা 'একটু আগেই পরে' গিয়েছিল। বস্ত্র পরিবর্তন করে আর মনে মনে 'আ'ওড়ায় দেবনাথের সেই সংক্ষিপ্ত উপমা—'ফুলের তোড়া'।...ছি ছি! লোকটা কি মনে করেছে যে 'ও'নার সামনে নিজেকে প্রদর্শন করবার জন্তেই স্বেচ্ছায় গিয়েছিল সে সেজেগুজে? ও' শুধু পরিবেশনের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করবার জন্তেই ঐ ভালো কাপড়খানা পরে' গিয়েছিল, এই সহজ কথাটা তার মনে হয় না?—আশ্চর্য্য!

ফুলের তোড়া—।...ঐ কথাটা বলে' উনি শুধু সাধারণ ভাবে নারীজাতিকে হেয় করেন নি' বিশেষভাবে 'ওকে শুদ্ধ অপমান করেছেন। ওর আতিথ্যের উপযুক্ত পুরস্কারই দিয়েছেন অতিথি!

কিন্তু—

বস্ত্রপরিবর্তন শেষ করে' আলনার পাশ থেকে সরে' আসতে আসতে ভাবে:

কিন্তু—ঠিক ও'ক অপমান করবার জন্তেই হয়ত' ও'কথা উনি না'ও বলে' থাকতে পারেন! হয়ত এংক্রে প্রতীপক্ষকে পরাজিত করবার ঐক্যই ও'কে জোর করে' ও'কথা বলিয়েছে। তখনও ত'—বিকেলের বিতর্ক বৈঠকের কথা ওর মনে পড়ে,—সেই ফ্রামেরিয়' সম্বন্ধে উনি যে অদ্ভুত মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন, তার ভেতরেও ঐ একই কারণ বর্তমান ছিল—তর্ক করে' জয়ী হওয়া। অথবা—

অতসীর মনে পড়ে নীলি'র প্রথম চিঠিখানার কথা। নীলি' জানিয়েছিল তাতে যে তার দেওরটি মেয়েদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে থাকেন।...কি জানি ঐ ভাবে উনি হয়ত' সেই তাচ্ছিল্যই প্রকাশ করে ফেলেছেন স্বভাবতঃই।

নীলি' আরও জানিয়েছিল যে, শুধু তাচ্ছিল্যই নয়, অল্প-জ্ঞানী বলে, মেয়েদের উনি অল্পকম্পা করেন? হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি অল্পকম্পা বশতই উনি অ-নারীবর্জিত পরিবারে অতিথি হ'য়ে প্রবেশ করেছেন, এবং কখনও যদি সে

শুভযোগ ঘটে, ওর বোনকে বিয়ে করবেন উনি নিছক অল্পকম্পা করে'ই।...

হাসি আর উপহাসিতে মিলে' অতসীর মনের উত্থাকে জুড়িয়ে আনে। "ফুলের তোড়া'র কাঁটা সহনীয় হ'য়ে ওঠে নারীর পরিবেশনেব উদারতা'র স্বীকৃতিতে। নারী অক্লপণ হাতেচলে দিতে জান'!

এবার' অতসীরই অল্পকম্পা হয়। শুধু জ্ঞানমরুচারী মাহু! শুধু ঢেলে দেওয়া নয়, উজাড় করে'ই ঢেলে দেবে...অতি'র দিকে চেয়ে দেখে একবার সহজ ভালোবাসার চোখে।

ও' এবার স্বাভাবিকতায় ফিরে' আসে। কি জানি ওদের আর কিছু দরকার পড়ল কিনা, যেমন করে, চলে' এল ও' হঠাৎ? তা'—অতি' ত' রয়েছেই হেঁসেলে, ভালোই হয় ওরা যদি কিছু চেয়ে বসেন!...কিন্তু বোকা মেয়ে ভাববে, চালাকি করে'ই ফেলে' দিয়ে গেছে দিদি ওকে পরিবেশনের খপ্পরে।

—অতসী দালান ঘুরে' আবার লঘু পা'য়ে চলে হেঁসেলের দিকে।

অতলার ঘর অতিথির জন্তে নির্দিষ্ট হয়েছে। অতিথির ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত নীতীশের পড়বার ঘর; সে ঘরে ওর স্থানের অভাব না ঘটলেও অশোভন বলে থাকতে পারে না। অল্পবিধা হলেও দিদির ঘরেই থাকতে হচ্ছে ওকে।

অতলার শয়ন স্থানের অল্পবিধাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে এনে অশেষ ওকে স্তুবিধা করে দিলেন। ব্যবস্থা হ'ল, ওর দিদি আর ও থাকবে ঘরের ভেতরে খাটের বিছানায়, অশেষ রইবেন বাইরের খোলা বারান্দায় পুরাণো ক্যাম্প খাটখানা পেতে।

কি যে কৃতজ্ঞ জামাই বাবুর ওপর!...না হলে, ওকে যে কি জড়মড় হয়েই অস্বস্তির সঙ্গে কাটাতে হ'ত রাত এক ঘরে শুয়ে। তারপর ওর শোওয়া এখনো ছেলে মাহুষের মত।

কৃতজ্ঞ অতলা নিজের হাতে ক্যাম্প খাটটা দালানের কানোচ থেকে ব'য়ে এনে পাতে। পরীক্ষা করে আবিষ্কার

করে, একটা জু একটু ঢিলে হ'য়ে একদিকের পায়ানডবড়ে হ'য়ে পড়েছে। লক্ষ্মীনাথকে ডেকে জুটা ঠিক করে নিয়ে আবার ও' পরীক্ষা করে' দেখলে—না এবার আর নড়বড় ভাব নেই।

ঘর থেকে ছোট সতরঞ্চখানা এনে পাতল। তার ওপর তোষক পেতে চাদর পাতবে।

অশেষ সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। অতলা এদিকের খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ওর দিদির দিকে চেয়ে বলে, “তোষকটা একটু হচ্ছে দিদি লম্বাটে, মাথার দিকে খানিকটা ভাঁজ করে, পাতি—কেমন?”

ভেতর থেকে উত্তর আসবার আগেই বাইরে থেকে অশেষ হেসে বললেন, “তোষক রেখে খাটের গদীটা উঠিয়ে এনে ভাঁজ করে পাতে! বিছানার চাপে ভেঙ্গে পড়ে যদি খাটখানা ত পড়ুক।”

ভেতর থেকে অতসী হেসে বলে, “বুজিটা ওর একটু বেশী। জামাইবাবুর আরামের জন্তে পুরু করে বিছানা পাতছে কিন্তু ভেবে দেখেনি যে যার ওপর পাতছে সেটি লোহার খাট কি আর কিছু।”

দিদি এবার বোনকে নিজের বুজি দেয় “তোষক পাতলে আরও গরম হবে। তারপর, ক্যাম্পখাট ত অমনিই নরম তোষক পেতে নরম করিতে হবে না।”

শেষ কথায় একটু স্নেহ দেবার প্রলোভন ছাড়তে পারে না, শুধু ভালো বাসলেই হয় না, ভালাবাসার প্রয়োগটা একটু বুজিমানের মত হওয়া দরকার—আদরের চাপড় অনেক সময় আঘাতের মত গিয়ে বাজে স্নেহপাত্রের পিঠের ওপর।”

অতলা তোষক উঠিয়ে চাদর পেতে দিয়ে সজ্জভাবে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

অশেষ সিগারেটের কোটা গোল টেবলের ওপরে ঠক করে বসিয়ে ক্যাম্পখাটে উঠতে উঠতে ভাবেন, উপমাটা মন্দ দিল না অতসী।

অতসী রেকাব চাপা দেওয়া একশাস জল এবং হাত-পাখাটা এনে রেখে গেল টেবলের ওপর।

অতলা উঠে আসে বিছানায় হাত বাড়িয়ে দেয়ালে গায়ের সুইচ টিপে দিয়ে। জানালা দিয়ে দেখা যার বারান্দার ধার ঘেঁসে চন্দ্রোদয়ের প্রথম আলোর এক ক্ষীণ রেখা এসে পড়েছে। বারান্দার এদিকে আলোক না থাকলেও স্পষ্টতা আছে।

ঘরের ভেতরটা ঠিক অন্ধকার নয়, একটা অস্পষ্টতা ছায়া আছে আঁচল বিছিয়ে। ছুবোন যেন মাংসে আঁচলের তলে শুয়ে পড়ল পাশাপাশি।

অনেক দিন পর—অতসীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে ওরা আর এমন ভাবে শুয়েছে বলে অতলার মনে পড়ে না। ও যেন ওর মনের ভেতর এক মধুর স্নেহপূর্ণ ভাব অনুভব করে।

অতসীর মনেও ওর মনের ভাব সংক্রমিত হয়েছে। হাত বাড়িয়ে ওর গায়ে হাত দিয়ে বলে, “একেরাণে এতটা ধারে গিয়ে শুয়েছিল, এদিকে সরে' শো।”

তোমার গরম লাগবে না দিদি...বলে ও সরে আসে একটু এদিকে। অতসী বলে, এ কি! তোর গলার দিকটা এমন ঘামে ভিজা...ফ্যানটা খুলে দিয়ে আসিসনি বুঝি?”

“না” বলে ও আরও যেন কি বলবে, ইতস্ততঃ করে বলল না। এদিকে আবার চোপাচাপকান গায়ে দিয়ে শুয়েছিল যে...কি মেয়ে! গলার বোতামের ঘরটা খুলে শো! মুখে বলে, আর ও গলার বোতাম খুলে দেয় অতসী।

—না না, খুলো না দিদি, আমার শোয়া ভাল নয়—উনি আছেন জানালার বাইরেই।

অতসী বিরক্তির স্বরে বলে, আমাকে শুদ্ধ ঘুমুতে দিবি নে দেখছি। অনেক দূরে আছেন, তুই খুলে শো বাপু! আর—ফ্যানটাও অমনি খুলে দিয়ে আয়।

অতসী জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলে, “খুলে দিতে বল, দিচ্ছি ফ্যান খুলে, একটু সেল্ফিসনেস হচ্ছে কিন্তু এতে?”

মানে? বলেই অতসী ওর সেল্ফিসনেসের তাৎপর্য ধরতে পারে। গভীর মুখে বলে, অবাক করলি তোর জামাই বাবুর কথা বলছিস ত? বাইরে ফ্যান নাই বলে ঘরের ফ্যানটা বাতিল, যেহেতু উনি বাইরে শুয়েছেন গিয়ে!

এর পর আরও কিছু বলে না ফেলে দিদি!... “দিচ্ছি ফ্যান খুলে অমনি জানালাটাও বন্ধ করে দিয়ে আসব কিন্তু ওদিকের।”

ও তখনই আবার কারণ দেখিয়ে বলে, গরম ত আর লাগবে না...আমার শোয়া খারাপ,...জানালাটা বন্ধ করে দিয়েই আসি।

কি ছেলে মানুষি। অতসীর হাসি পয়ে কিন্তু হাসি চেপে রাগের ভঙ্গীতে বলে, জানালার দিকে আমি আছি—তুই আছিস আমার আড়ালে; আমাকে টপকে কে চুরি করে দেখতে আসছে রে তোকে।

ফ্যান ঘুরতে শুরু করেছে। হাতের ভর দিয়ে বিছানায় উঠে পড়েই অতলা বলে, দেবানন্দ স্বামী।

দিদি বোনের গাল টিপে দিয়ে কি বলবে, বলল না, শুধু জোরে গালটাই দিল টিপে।...দেবনাথের চোখের তীক্ষ্ণতা সহসাই তার মনের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে।

...সত্যি, লোকটা তার দিকে চায় কেন। কিন্তু ওরও দিকে কি অমনি করে চায়? বাইরের থেকে মিষ্টি ধূঁয়ার গন্ধ আসে। অতলা মাথা উঁচু করে দেখে, জামাই বাবু একটা শেষ করে আরেকটা সিগারেট শুরু করলেন।

আর একটা, আরও একটা এমনি পর পর গোটা চারেক সিগারেট একই ভাবে টেনে নিঃশেষিত করলেন অশেষ। এমনি অবিচ্ছিন্ন একক ধূমপানের ধারায় একটা অল্পমনস্কতার আচ্ছন্নতা ধূমায়িত হয়ে চলে। ধূমপানকারীর মন যেন সেই আচ্ছন্নতার অন্তরালে নিলক্ষ্য ভাবে চলছে এবং লক্ষ্যনির্ণয়ের প্রয়াস মাত্র নেই।

বারান্দার ধারে ক্ষীণ কিরণলেখা স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে এগিয়ে এসে ক্যাম্পবাটিকে স্পর্শ করেছে কিন্তু তার হাতের আঙুল তখনও শায়িত মানুষটিকে স্পর্শ করেনি।

সিগারেটের শেষাংশটুকু পুড়ে একেবারে আঙ্গুলের কড়ায় এসে ঠেকেছে, তারই তাপ-সচেনতায় সেটুকু খসে পড়ল আঙ্গুল থেকে। অশেষ তাঁর অজ্ঞাতেই একবার আঙ্গুলে আঙ্গুলে ঘষে হাতখানাকে উঠিয়ে এনে বুকের উপর রাখলেন। তাঁদের আলোর খানিকটা এসে এবার তাঁকে স্পর্শ করে তাঁর বুকের ওপর পড়ে। আলোক তাঁর দেহকে

স্পষ্টতা দেয় ঐ সব স্থাবর জিনিষগুলোর মতই, পারিপার্শ্বিকে যা ছড়িয়ে আছে।...অশেষের মন তাঁর মনকে স্পষ্টতা দিতে পারছে না।

আলোকের একফালি লম্বা হয়ে এসে পড়ে মুখের ওপর’ চোখের উপরও; এ রোদের স্পর্শ নয়, কিন্তু বিরক্ত ভাবেই চোখের পাতা দুটিকে অশেষ নামিয়ে আনেন।

অল্পভূতিটা পর্যন্ত যেন অসহ্য হয়। মুখ ফিরিয়ে ওপাশ হয়ে শোন। দৃষ্টির স্বভাববর্ধ প্রসারণ। অশেষের অল্পমনস্ক দৃষ্টি চায় অস্পষ্টতায় প্রসারিত হয়ে চলতে। এই অগ্রসর যেন এক রহস্যকে আবিষ্কার করতে চলেছে...।

অর্দ্ধ অস্পষ্টতায় জানালার শারিটী পর্যন্ত রহস্যময় হয়ে আছে; শারি পার হয়ে তাঁর দৃষ্টি যে ঘরে যায় সে ঘর যেন প্রত্যাহের তুচ্ছ খুঁটি নাটি সাংসারিকতায় ভরা ঘর নয়—অনাবিষ্কৃত এক রহস্যের সীমা।

অশেষের দৃষ্টি শয্যাস্পর্শ করে। সাদা চাদরটা যেন রহস্যের অস্পষ্টতার সঙ্গে খাপ খায় নি।...অতসী শুয়ে আছে। ঘুমিয়েছে নিশ্চয়, কারণ ওর স্বভাবের শান্তচিত্ততা ওকে সহজে অকারণ চিন্তার দ্বন্দ্ব দোলা দেয় না।

অশেষ এক মুহূর্ত অতসীরই মুখের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে রাখতে চায়।...ওর মুখ অতি পরিচয়ে আয়তীভূত বলেই নেই তাতে রহস্যের আবেদন—হৃদয়ের এবং মধুর, কিন্তু মদির নয়।

অতসীকে অতিক্রম করলেই আবার রহস্যের সংকেত। আছে শুধু অস্পষ্টতা—বিছানার চাদরকে অত শাদা বলে মনে হয় না; বিছানার ওপর...তাঁর অল্পমনস্ক চিন্তার ভেতর থেকেই কে তাঁর মনকে ধাক্কা দেয়। অর্দ্ধমনস্ক ভাবে একটা সূক্ষ্ম নীতিবোধ জাগে মানসিক সংস্কারে। ...তিনি কি ভাবছেন আর কি-ই বা দেখতে চান!

মনস্কভাবে তখনই এপাশ ফিরে শোন একেবারেই বিমুগ্ধ হয়ে। ...তাঁদের আলোয় সমস্ত পারিপার্শ্বিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে; চাঁদ আকাশের মাঝামাঝি উঁচুতে উঠে এসে সেই ইট-বার করা উঁচু বাড়ীটার মাথার ওপরেও দাক্ষিণ্য বর্ষণ করেছে।

অশেষ ভেবে ঠিক করিতে পারেন না—বস্তুতাত্ত্বিকতার
কল্পরূপ, না কল্পনারই বস্তুতাত্ত্বিকতা।

—ওদিকের ঘরে কে কাসছে। অতিথির অস্তিত্ব
বাস্তবতাকে নির্দেশ করে।...বৃদ্ধদের মতই ভেঙে পড়ে
কল্পনা।

কৌতুক-প্রভুত্বের ছলে আমীজীর নামটা বলে ফেলেই
অতলা ভয়ে ভয়ে ছিল—কি জানি, দিদি তাকে কি-ই
বা বলে রেগে মেগে। কিন্তু সাধারণ ভাবে একটু টিপে
দিয়েই চুপ করে' গেল।.....এই লোকটার সম্পর্কে দিদি
যেন তাকে প্রশংসা দিয়ে চলতে চায়। কে জানে, কি আছে
দিদির এই দুর্বলতার ভেতর।.....

অতলা বুঝতে পারে না এবং বুঝতে চায়ও না। কিন্তু
ওর ভারী আশ্চর্য লাগে, এই সন্ন্যাসী ধরনের বিদেশী
মানুষটির কাছে দিদি যেমন নিঃসঙ্কোচে নিজেকে নিয়ে
যায়, তাকেও চায় তেমনি নিয়ে যেতে। সন্ন্যাসীর ব্যবসা
কি গুরুগরি যে তাঁর কাছে আত্মপ্রকাশ করে পরে দীক্ষা
নিতে হবে?

—সন্ন্যাসী, না আর-কিছু!.....এদিকে গেক্সা পেরেন,
ওদিকে লম্বা চুলে পরিপাটি সিঁতি। আহা! যেমন বাছ-
বিছার নেই, তেমনি নেই সংযম—অতগুলো ডিম-মাংস
তরকারীর একটি ছোট টুকরোও সন্ন্যাসী রেখে যাননি তাঁর
পাতে, নিজের চোখেই দেখেছে অতলা। তারপর নিজের
কানে শুনেছে, কথাবার্তাতেও নেই লোকটার এতটুকু

বাধন.....থেতে বসেও উনি তর্ক জুড়ে দিয়ে যান।
সামনে যা তা বলেন। তারপর—

মনের দিক দিয়েও যে মানুষটা একজন সাধুপুরুষ।
তা' স্বীকার করতে রাজী নয়। ও স্পষ্টই দেখেছে
ও ভুল কয়ে গিয়ে ওবেলা ঢুকেছিল ওর ঘরে, উনি তাঁর
পাঠ করছেন—ই্যা, ও মলাটের ওপর স্বচক্ষে অক্ষর
নামটি পড়ে দেখেছে মোপাসাঁ.....মেয়েমানুষের ছবিও
সেই মলাট! হয়ত' ওর স্ট্রটকেশ ভর্তি ঐ সব বই
আছে।

.....জামাই বাবুর মুখে শুনেছে, মোপাসাঁর
এমন কতকগুলো বই আছে যেগুলো সকলের পড়বার
উপযুক্ত নয় এবং সেইজন্যই নাকি ঐ শ্রেণীর বইগুলো
'after dinner series' নাম দিয়ে চিহ্নিত করে
হয়েছে।.....সেই বই উনি পড়েন—আদর্শ সন্ন্যাসী!

কিন্তু—

এই সন্ন্যাসীকে নিয়ে ও এমন কি মাথা ঘামাবে
প্রব্লেমের সলিউশান করতে বসেছে যে এত রাতেও
চোখে ঘুম নেই? প্রয়োজন হলে মাথা ঘামাবে দিদি
জামাই বাবু।

মনে মনে বলে 'জামাই বাবু', অমনি একবার মাথা
উঁচু করে দেখে। পুরাণো ক্যাম্প খাটখানা কাঁচা
করে উঠল; জামাই বাবু সেইমাত্র ওপাশ ফিরে গেলেন।

অতলা বালিসে মাথা নামিয়ে চোখ বোজে।
এখন ঘুমবে।

ক্রমশঃ

নবীনের দাবী

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

[সংস্কৃত হইতে]

“পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্বম”
পুরাণ বলিয়া যাহা কিছু সব
নহে সমাদর যোগ্য নহে—
নবীনের বেলা শুধু অবহেলা
তা'ই বা কাহার বিচারে সহ?

যে জন সৃজন সুখী সজ্জন
মজে সে গুণের বিচার করি,
পর জিহ্বায় যেই জন খায়
মূঢ় পরিবাদ তাহারি করি।

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান

শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তী

‘স্বরাজ’ কথাটির অর্থ কি তাহা বুঝাইতে গিয়া শিক্ষিত সমাজের চিন্তা নানা প্রশ্ন ও নানা উত্তরের পাকে জড়াইয়া যায়। কিন্তু আমাদের অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট উহার অর্থ অতি সুস্পষ্ট, অতি প্রত্যক্ষ। ‘স্বরাজ’ বলিতে তাহাদের মনে আসে দুটি বেল। পেট ভরিয়া থাইতে পাওয়ার অধিকার অর্জন করা। সাম্প্রদায়িক দলাদলি তাহাদের প্রতিদিনের সংসার-যাত্রার ব্যাপারে এতটুকুও সাহায্য ত করেই না উপরন্তু তাহাদের সমষ্টিগত স্বার্থের ব্যাঘাত করে। এই সহজ সত্য আজ আমাদের নিরন্ন নিরক্ষর কৃষক ও মজুর সাধারণের চোখের উপর কঠিন মূর্তিতে দেখা দিয়াছে।

“হিন্দুর মন যে মাল-মসলায় তৈয়ারী ঠিক তাহার বিপরীত মাল-মসলায় মুসলমানের মন তৈয়ারী”—এই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি বিরস ও বিরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই ভুল ধারণায় উভয়ের মন যতদিন বিমুখ থাকিবে ততদিন ঐক্য সম্ভব হইবে না। মনের ভিতর হইতে মিলনের সাড়া না পাইলে বাহিরের জোড়া-তাড়ায় কাজ হইবে না। অন্তরের সায় না পাইলে শুধু শতকরা ভাগের হিসাব দিয়া উভয় সম্প্রদায়কে জুড়িয়া রাখিতে পারা যাইবে না। প্রধানতঃ মনের আত্মীয়তার উপরই রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক সুবিধার খাতিরে আমাদের মিলিতে হইবে এ কথায় এ দেশের জন সাধারণের মন নাচিবে না। রাজনীতির বাণী হিন্দু-মুসলমান জন সাধারণের নিকট এখনও এক রকম বেসুধাই শুনাইবে। এই উভয় জন সাধারণের জীবনে যাহা গভীরভাবে সত্য রাজনীতি তাহা নয়। যাহা লইয়া ইহাদের স্বপ্ন, যাহা লইয়া ইহাদের আনন্দ, যাহা লইয়া ইহাদের সাধনা, রাজনীতি তাহা নয়। বাদশায় রাজার যুদ্ধ চলিয়াছে—আর জন সাধারণ নির্বিকারে দরবেশ ও সাধুর কাছে ভিড় পাকাইয়া ভক্তির বাণীতে মন ভরিয়া লইয়া যাইতেছে; ইহাই এ

দেশের মধ্যযুগের লৌকিক ইতিহাস। আমাদের বর্তমান রাজনীতিকগণ গণ-সংযোগের বুলি আওড়াইতেছেন অথচ এই ইতিহাসের ধার ধারেন না! মহাপুরুষের বাণীই এদেশের মন নাচাইয়াছে। আজও এ দেশের জনগণ বাহার বাণীতে আগিয়াছে তিনি তাহাদের নিকট সবারমতীর ফকির বৈ অন্য কিছু ন’ন। যেখানে তিনি ফকির ন’ন সেখানে তিনিও তাহাদের কাছে বিশেষ কিছু ন’ন।

আজও পীরাল সাহেবের দরগায় সমস্বরে সৈয়দ ও ব্রাহ্মণ কোরাণ ও বেদ গাহিতেছেন ও সেই দরগায় দলে দলে হিন্দু মুসলমান ভক্তি নিবেদন করিয়া আসিতেছে। এইরূপ ছোট বড় অনেক দরগা ও আখড়া, অনেক সাধু ফকিরের মেলা দেশের লোকের মন জুড়িয়া বসিয়া আছে। ধর্মের সাথে হাত ধরিয়া ছোট বড় শিল্প ও সাহিত্যও এই ভাবে জনগণের মন জিয়াইয়া রাখিয়াছে। তাজমহলের দিকে যে জনশ্রোত বহে সেও এই মনের আত্মীয়তার প্রবাহেই বহিয়া যায়। বড় কথা নাই ভাবিলাম। ছোট’র বেলাতেও তাই। এবং ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরও তাই। একটি সুন্দর বেনারসী খেলনা কিম্বা কাশ্মীরী শাল কিম্বা মুর্শিদাবাদী হাতীর দাঁতের কাজ আমরা সকলেই বেশ উপভোগ করি; কারিগর হিন্দু কি মুসলমান একথা তখন মনেও আসে না। সুগন্ধি উমদা এক ডিম্‌ দোপিয়াজি কি খাসা একখানি মজলিসী ইয়ার্কি আমরা হিন্দু মুসলমান ভাগ না করিয়া দিব্যি জমিয়া উপভোগ করি।

হয়ত বা এভাবে হিন্দু মুসলমান বিচার তুলিয়া উপভোগের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। রাজনীতির জলধারা এরূপ জোর চলিয়াছে যে ভেদনীতির চাপ ঘন ঘন ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছে। রাজনীতি দিয়া মিলাইবার অজুহাতে আমরা পরস্পরের ভাগে দাঁত বসাইবার চেষ্টাই বেশী করিতেছি। একান্ত রাজনৈতিক মিলনের চেষ্টায় এরূপ উল্টা ফলই ফলিবার কথা। কারণ, শতকরা ভাগের হিসাবে বুদ্ধি পাকাইতে গিয়া আমরা আমাদের লোভকেই

শানাইয়া তুলিতেছি। কার কতটুকু থাকিবে, অপরের কতটুকু ছাট দিয়া নিজের কতটুকু বাড়াইব, ইহারই দিকে কড়া নজর রাখিতে গিয়া মিলনের দৃষ্টি ক্রমেই ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। বাহিরের কতটুকু ছাড়িয়া অপরের মনের কতটুকু দখল করিব সে ভাবনা ভাবিতেও নিজের মনে নিজেকে বোকা বলিয়া লজ্জা আসে। কারণ আমরা নিজেকে (practical statesmen) বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিক বলিয়া গর্ব বোধ করিতে শিখিয়াছি। এ শিক্ষা লইয়াছি ইউরোপের কাছ হইতে। চোখের উপর দেখিতেছি পৃথিবী জুড়িয়া আজ এই ইউরোপীয় রাজনীতির নিলজ্জা লোভের নির্মম লীলা। দেখিয়া শুনিয়া এই নীতিকে করিয়া গালাগালি দিতেছি আর সেই সঙ্গে সেই পশ্চিমা কায়দায় সাধ্যমত সমানে টানাটানি ছেঁড়াছি-ড়ি করিয়া সাম্প্রদায়িক চুক্তির অভিনয় জমাইতেছি।

সকল দেশেই নিজ নিজ জাতীয় সমস্যা রহিয়াছে। সমস্যা বিষয়ে ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে। এই সমস্যার সংখ্যাও যেরূপ অগণিত ইহার স্বরূপও তেমনি অদ্ভুত। ভারতের এই অগণিত অদ্ভুত সমস্যার ভিতরে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মত কলঙ্কজনক অথচ কোঁতুককর সমস্যা অল্প কোথাও আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, আমরা যাহাকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বলিতেছি তাহা আদৌ সমস্যা হওয়া উচিত ছিল না। উপরন্তু পৃথিবীর এই দুইটি বৃহত্তম সংস্কৃতির সহবাস শুধু ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নহে, জগতের বিচিত্র জাতি-সমষ্টি-সমস্যা সমাধানের পথ দেখাইতে পারিত কিন্তু তাহা না হইয়া, অর্থাৎ পরস্পরের মিলনে একটা নূতন যুগ প্রবর্তন না হইয়া, হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে হনন করিতেছে। অবিশ্বাস, ঈর্ষ্যা ও সন্ধীর্ণ স্বার্থের প্রবাহে ভারতের আকাশ, বাতাস, আজ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে মিলনের কথা উচ্চারণ করিলে তাহা যেন একটা বিরাট বিজ্রপের মতই চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হয়। কোন সত্যকার হেতু হইতেই এই বিদ্বেষ উদ্ভূত হয় নাই। পরস্পরের মনের মিলনের পথ হারাইয়া যাওয়াই ইহার কারণ। প্রকৃতির বিধানে দুইটি মহাসম্প্রদায় প্রচণ্ডভাবে মিলিবার জন্মই হয়ত পরস্পর এই আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত

হইয়াছে। পৃথক্ থাকা যদি একান্তই সহজ হইত তাহ হইলে এই স্বদের সৃষ্টিই হইতে পারিত না। মধ্যযুগের গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যাহারা আদব কায়দায়, লৌকিক ধর্মে ও উৎসবে, শিল্পে ও সঙ্গীতে, ভাষায় ও গণ সাহিত্যে মিলিয়াছে তাঁহারা আজ ভুল করিয়া পৃথক হইতে চাহিয়া দেখিতেছে পৃথক হওয়া সহজ নহে—অনেক নিম্ন বাঁধনে টান পড়িতেছে, অনেক আত্মীয়তার সংকুল মুচড়াইয়া যাইতেছে। তাই আজ মিলনেও যেমন পৃথক হইতেও তেমনি বিপুল বাধা ও বেদনা জমিয়া উঠিতেছে।

নানা জায়গায় নানা সময়ে এ পর্যন্ত যত মিলন-বৈঠকই বসিয়াছে শতকরা ভাগের অল্প নির্ধারণের জগদদল পাথরে মাথা ঠুকিয়া তাহার সব গুলিই ভাঙ্গিয়াছে। এই হিসাবের পাথরে ঠোকর মারিয়া রাজনৈতিক চুক্তির কুশলী এগিনিয়ারগণ সকলে যন্ত্রপাতি প্রায় চূর্ণ করিয়া বসিয়া আছেন। এই বিতর্কের ফলে জটিলতা বরং বাড়িয়াই যায়, একেবারে পরিবর্তে বিদ্বেষ সংক্রামিত হয়। অন্ততঃ ১৯২৩ হইতে রাজনৈতিক চুক্তি নামার ইতিহাস এই কথাই বলিতেছে। স্থল জিনিসের ভগ্নাংশ ভাগ লইয়া ব্যস্ত থাকার দরুণ হিন্দু মুসলমানের পক্ষে তাহাদের গভীর ও স্থায়ী ঐক্যের দিকটা চোখেই পড়িতেছে না।

সাম্প্রদায়িকতার মূলে আছে পরস্পরের প্রতি অনাস্থা ও আতঙ্ক। অথচ সে অনাস্থা ও আতঙ্কের মূলে সত্যকার কারণ কিছুই নাই। রজ্জুকে যখন একবার সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তজ্জনিত ভয়ও সত্যকার ভয়রূপেই মনের উপর কাজ করে। ভয়ের কারণ কাল্পনিক, কিন্তু সে ভয় মর্মান্তিক সত্য। উহাকে রজ্জুরূপে না জানা পর্যন্ত সে ভয়ের শেষ নাই। এইভাবেই, জাতীয়তার আলোক দিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বিভীষিকা যে মিথ্যা তাহা না জানিলে অথবা ভয়ের হাত হইতে রেহাই নাই। আর এদেশে জাতীয়তার আলোক মনের আত্মীয়তার আলোক হইতে ধরাইয়া লইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক নেতাদের কথাগ ভুলিবার লোক যে বিস্তর জুটে তাহার কারণ তাঁহাদের কথাগ সত্য না থাকিলেও সত্যের কাল্পনিক রঙ আছে। এক সম্প্রদায়ের স্বার্থ যে আর এক সম্প্রদায়ের বিরোধী এই বিশ্বাস ক্রমে ভাঙিতেছে। সাদা আলোয় ক্রমে উভয়ের

সাধারণ স্বার্থ সহজভাবে তাহারা দেখিতে পাইতেছে। দিনের দিন জীবনযাত্রার কারবারে তাহারা ক্রমে জানিতেছে যে হিন্দু মুসলমানের মাঠের স্বার্থ, ঘাটের স্বার্থ, হাটের স্বার্থ, বাটের স্বার্থ—সবের মধ্যে এক ভারত-বাসীর সাধারণ স্বার্থ জড়ান রহিয়াছে।

হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার পরিচয় ভাল ভাবে লইতে গেলেই মূল বিষয়ে মনের আত্মীয়তা দেখিতে পাইব। অথচ উভয় জাতির সাংস্কার সঙ্কলন ঘটবার আগে পৃথক ভাবে উভয়ে যে চিন্তা করিয়াছেন ও সভ্যতা গড়িয়াছেন তাহার মধ্যেও অনেক মিল আছে—অনেক প্রধান বিষয়েও মিল আছে। যথা, হিন্দুও এক ঈশ্বরের উপাসক। প্রাচীন মুসলমান পণ্ডিত স্বয়ং অলবিরুণী ও আবুল ফজল এ বিষয়ে হিন্দুর তারিফ জানাইয়া গিয়াছেন। অবশ্য, অমিলও অনেক বিষয়ে আছে। কিন্তু সেগুলির মূল বিষয় এতই মহৎ ব্যাপার যে তাহার উপলক্ষে একের উপর অশ্রুর রাগ না

হইবার কথা; বরং মহতের সন্ধানে কে কোন মনোরম পথে গিয়াছেন তাহার পরিচয় পাইয়া পরস্পরের প্রতি অহুরাগই হইবার কথা। তারপর, এই ভারতবর্ষে একত্র বাসের কাল হইতে ক্রমে উভয় সভ্যতার সহযোগে এমন এক সম্মিলিত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা হইতে কাহারো অংশ সরাইয়া আলাদা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চিন্তাও সম্ভব হয় না। সামাজিকতায়, ধর্মবিশ্বাসে, সাহিত্যে, স্তম্ভের বহুবিধ সাধনায় এই সম্মিলন সার্থক ও সুষমাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—ভারতীয় মধ্যযুগে কবীর প্রভৃতির প্রচারিত এক-ঈশ্বর ভক্তি ও মানুষ্যে মানুষ্যে মহামিলনের ধর্ম যেরূপ সহজে ও পরের পর জন্মলাভ করিতেছিল এবং হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে জনসাধারণের উপর উহার যে নিবিড় ও সজীব প্রভাব হইয়াছিল তাহা আদৌ সম্ভবপর হইত না যদি না উভয় ধর্মের মর্মে মূলগত আত্মীয়তা থাকিত।

আশুতোষ-স্মৃতি

(প্রসাদ-কবি)

বিশ্ববিদ্যা-হিমাচলে জ্ঞান দেবতা

তোমার আসন,

নিত্য নবরূপে সেথা রূপায়িত

কৃষ্টি-সাধন !

বাংলা ভাষা তোমার তরে

আজ পূজা পায় ঘরে ঘরে

অপাংক্লেয় নয়কো তা আর—এমনি কঠিন

তোমার শাসন !

শুনলে তোমার বাণী-বিষাণ

দ্বন্দ্ব-জীবির কাঁপে পরাণ

দ্বন্দ্বাতীত বন্দিত হও হে আশুতোষ

নীবর-তারণ !

স্মরি-জ্ঞানী-ধ্যানী-যতি

নিত্য থাকের বিচারপতি,

অদর্শনের অন্তরালে তোমার চির-

স্মৃতির বাঁধন,

রমা-শ্যামা-উমা-বামা শুধুই নহে

তোমার আপন !

অন্ধ-প্রেম

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

(তিন)

রত্নেশ্বরের সেই অবস্থা দেখিয়া জীবেশ্বর বলিল—
“বেশ হয়েছে। বড় বাবু লোকের সঙ্গে যেমন লাগতে যায়,
তেমনি ফল পেয়েছে। ধড় থেকে মাথাটা আলাদা ক’রে
দিলে ঠিক হ’ত।”

মহেন্দ্রকে জীবেশ্বর এই কথা বলিতেছিল। মহেন্দ্র
কহিল—

“ভায়ে ভায়ে এমন অসম্ভাব বাহাদুরীর নয়। লোকে
শুনলে, কি বলবে বলত ?”

“লোকে বলবে কেন, তুমিই ত বলছ—বড়বাবুর বন্ধু
ব’লে সম্ভবতঃ।”

“না ভাই, আমি ত তোমাদের দুজনেরই বন্ধু। শুধু
বন্ধু নয়—আত্মীয়।”

হঁ—হঁ তা’ জানি। তুমিই হচ্ছে বড় বাবুর মন্ত্রণা-
দাতা। রাতদিন আছ সঙ্গে সঙ্গে—রাতদিন হচ্ছে ফিস্-
ফিস্, গুজ্-গুজ্। আমার বাপের পরিসা না থাকলে ওটে
করবার তুমি পরিশ্রম স্বীকার করতে কিনা সন্দেহ। চিনি
সকলকেই যে, বুঝলে মহেন্দ্র।”

“তা’ চিনে থাক, ভালই করেছে। চেনাবার কষ্টটা
আমাকে আর স্বীকার করতে হল না। তবে যতই
বল, তোমাদের ত্যাগ করা চলে না আমার। তা’র
কারণ হচ্ছে, আমি সত্যশ্রয়ী। গঙ্গা-গর্ভে দাঁড়িয়ে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে
আমি তোমাদের পাশে থাকুব, ত্যাগ করুব না
উৎপীড়িত হয়েও। যে দিন তোমরা দুভাই সাঁতার দিতে
দিতে ডুবতে বসেছিলে, আর আমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ
ক’রে তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম জলসমাধি থেকে—
সে দিনের কথা মনে পড়ে কি জীবেশ্বর ?”

“হঃ—কথার আবার দাম! কথা-কথা মাত্র। কথায়
বলে—আমার কথাটা ফুরোল, নোট্রে গাছটা মুড়োল—হঃ।”

“সেটা তোমাদের কাছে হ’তে পারে, কিন্তু ভদ্র-সমাজে
সে জিনিষটা সম্পূর্ণ অচল।”

“কি বললে! তা হলে তুমি ভদ্র, আর আমরা হ’ল
অভদ্র—এই না ?”

“দেখ, কথা বাড়ালে বেড়েই যায়। থাক্ এখন ওসব
কথা। তোমার দাদা স্বস্থ হোক আগে, তারপর আমাদের
প্রতিশ্রুতির ফেরৎ-ঘোরৎ করা যায় কিনা, সে বিচার করা
যাবে।”

জীবেশ্বর গোয়ার হইলেও আঘাত পাইলে কেমন-কেন
ভীর্ণ হইয়া পড়ে। মহেন্দ্রের দৃঢ়তা দেখিয়া সে চুপ করি-
গেল। জল-সমাধি হইতে তাহাদের দুই ভাইকে গঙ্গা
করার কথাটা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় জীবেশ্বরের একটা
লজ্জাও হইয়াছিল।

রত্নেশ্বরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
ডাক্তারেরা তাহাকে অন্ধকার ঘরে রাখিয়াছেন। তাঁহাদের
ধারণা—খুব বেশী চোটে লাগায় রোগীর কন্জেন্সেন্স অফ-
ব্রেন হইয়াছে। তিনদিন অতীত হইল, তথাপি তাঁহান
জ্ঞান হয় নাই। চিকিৎসা খুব ঘটা করিয়াই চলিতেছে।

ইট মারার কথাটা থানায় জানান হইয়াছিল, কিন্তু
থানাদার তাহার কোনো কিনারাই করিতে পারে নাই।
মহেন্দ্রের এজাহার লওয়া হইয়াছিল। সে বলিতে পারে
নাই—কে বা কাহারো এ কাজ করিয়াছে। কারণ ইট যে
ছুড়িয়াছিল, তাহাকে কেহই দেখিতে পায় নাই।

কিন্তু সে দিক্‌টায় রত্নেশ্বরের আদৌ লক্ষ্য ছিল না।
অবাধ্য সন্তান হইলেও পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য রত্নেশ্বর খুব
বেশীই কাতর। রত্নমালাও তাই। ছেলে মেয়ের জননী
মাধবীকে কিন্তু তেমন উদ্বিগ্ন হইতে দেখা যায় নাই।
মাধবীর কথা—উদ্বিগ্ন হ’য়ে লাভ নাই, বরং ক্ষতি।

রোগীর চিকিৎসা রীতিমতই চলিতেছে। ডাক্তার

বলেন—“রোগী হয়ত বাঁচবে; কিন্তু চক্ষুরত্ন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।”

মহেন্দ্ৰের সেবা শুশ্রূষার আর বিরাম নাই। সে সেবা দেখিয়া জীবেশ্বরকেও প্রশংসাবাদ করিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিল—ওটা অব্যবস্থিত চিন্তের প্ররোদ মাত্র।

যখন এই সব ব্যাপার চলিতেছে, সেই সময়ে চাঁদা আসিয়া শূন্দের বনে যাইবার তাগিদ দিল। সঙ্গে আনিয়াছিল সে দশবার জন অন্ধ, খঞ্জ, মূক বধিবকে। চাঁদা বলে—তা’রা পরম্পরে ভাই।

সকল কথা কাণে তুলিবার অবসর ছিল না ব্রজেশ্বরের তখন। কিছুদিন পরে যাইবার কথা হইল। চাঁদা বলে—এত গোল। সময়ের ফল সময়ে না হ’লেই সব মাটি।

চার

কলিকাতা সহরের বড় বড় রাস্তায় আলোকের অবস্থা ও ব্যবস্থা যখন বিদ্যুৎ রকমের শোচনীয়, তখন গলি-পথে যে কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। হাত পঞ্চাশেক কি আরো বেশী দূরে-দূরে একটা করিয়া কেরোসিনের আলো; তাহাও আবার অপরিষ্কার কাচের মধ্যে। অন্ধকার তাহাতে বাড়িয়াছে অধিকতর। তাহার উপর আছে কাঁচা ও পাকা বাড়ীগুলার অগল্ বগলে গাছপালা ও জঙ্গল। ফরাদা মাঠে তত অন্ধকার নাই, কারণ সেখানে আছে তারা ও মুক্ত আকাশের আলো।

তেমনি একটা গলি-পথে উদয়নারায়ণ কিশোরের হাত ধরিয়া পথাতিক্রম করিতেছিল। আর একটা হাতে ছিল হাত-বাতি। সেই হাত-বাতির নিশ্চিহ্ন প্রায় আলোকের সহায়তায় পথ-চলার কাজ উদয়নারায়ণ কোনো রকমে চালাইয়া লইতেছে।

পথে ভেক্ কুলের লাফালাফি, অহিকুলের বক্রগতিতে ছুটাছুটি, শিবাদলের হাঁকাহাঁকি, সারমেয়ের ডাকাডাকি অতীব প্রীতিপ্রদ। জোনাকীর বাতিতে গাছে গাছে, মাঠে মাঠে শূণ্য শূণ্য হীরক জ্বলিতেছে; রাবণের চিতা যে নির্দাপিত হয় নাই, তাহা ঘোষণা করিতেছে অশ্রান্ত বিল্লীরব।

কিশোর জিজ্ঞাসা করিল—

বাড়ী আর কতদূর বাবা?

উদয়নারায়ণ সে প্রশ্নের উত্তর দিল না। কিশোরকে টানিতে টানিতে পথ চলিতে লাগিল।

কিশোর বলিল—

“আমার কি চোখ আছে বাবা যে তুমি অমন ক’রে টানাটানি করলে আমি তোমার মত ছুটে চলতে পারব?

উদয়নারায়ণ বিরক্ত সহকারে বলিল—

“না চলতে পারিস, এইখানে ব’সে থাক। রাত বাঁঝা করছে—চারিদিকে বিভীষিকা, আর উনি নাকী স্বর টেনে বলছেন—তাড়াতাড়ি চলতে পারছি না। কে তোকে চোখের মাথা খেতে বলছিল, তাই বল। আ গেলরে, যত কিছু বলিনি বটে!”

“বলার বাকী আর রাখছ কি বাবা? যা’ বলা যায় না, তা’ও বলছ তোমার অন্ধ অসহায় সন্তানকে। দেখ বাবা, অন্ধ হ’লেও আমার বয়স হ’ল বছর কুড়ী। বুঝতে পারি সবই। তবে হাত নেই আমার কিছুতেই। অথবা ধমক দিয়ে লাভ কি বল?”

“থাম্—থাম্ জ্যোষ্ঠাতাগিরি আর করিস নে। তোর জন্তই হ’ল সব মাটি। অন্ধ হয়েছিলি, বেশ ক’রেছিলি। কিন্তু বয়সটা অমন চট ক’রে কুড়ী পার ক’রে দিল কেন? আর চেহারাটা অমন তালগাছের মত আকাশ ছোঁয়া করলি কি কাজে—তাই বল।”

“ও জবাব তুমি দিতে পার, আর ভগবান দিতে পারে। কিন্তু তা’তে কাজের ক্ষতিটা হয়েছে কি, সেটা ত আমি বুঝতে পারছি না বাবা।”

“পারবিও না কোনো কালে।”

কথাটা বলিয়াই উদয়নারায়ণ পুত্রকে টানিতে টানিতে অধিকতর দ্রুতগতিতে পথ চলিতে লাগিল।

কথাটা হইতেছে—অর্থাভাবে দ্বিধাদিক জ্ঞানশূন্য উদয়নারায়ণ পুত্র কিশোরকে একজনের কাছে পাঁচ শত টাকায় বেচিতে গিয়াছিল। সেই “একজন” গল্প কথার মত ধনাঢ্য ব্যক্তি—অপুত্রক। উদয়নারায়ণ কাহার মুখে শুনিয়াছিল—সেই আঢ্য একটি ছেলে ক্রয় করিয়া তাহার টাকা কড়ি চিরদিন রক্ষা করিবার জন্ত “যক্” করিবে।

পরের ছেলে মারিয়া “যক্” করা, স্বপন-ক্রিয়া করিয়া “নিশি ডাকা”, মরণ-উচাটন আশান-বশীকরণ প্রভৃতি অনেক

কিছুই তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল—এখনো কিছু কিছু আছে হয়ত। তন্ত্রশাস্ত্রের অপব্যবহারে দেশ ও সমাজের যে কত বড় ক্ষতি, সেটা বুঝে না—বুঝিতে পারে না—বুঝিতে চাহে না যাহারা—এই গর্হিত কাজ হয় তাহাদের দ্বারা। মারণ তত কঠিন নয়, যত কঠিন জীবের সেবক হওয়া, মহাজন পদাবলী গাওয়া জীবকেও হিংস্র, পশুশ্রীকাতর প্রত্যক্ষ্যে প্রিয়বাদী, পরোক্ষে কার্ধ্য-হস্তারক, কৃতঘ্নতা পাপে পাপী দেখা যায়। হরেন্দ্র সেই জাতিরই একজন। অকর্ম্ম তাহার কিছুই নাই। নাই বলিয়াই দেশের শত্রু, মানুষের শত্রু, দেবতার শত্রু যে আঢ্য, মহাজন-পদের গায়ক হইয়াও হরেন্দ্রনারায়ণ গিয়াছিল তাহারই কাছে পুত্র বেচিতে—অর্থ লাভের আশায়। আত্মমর্য্যাদা যাহার নাই, আত্মবিক্রয় তাহার পক্ষে অতি সহজ। কিন্তু সহজিয়াপন্থী হরেন্দ্র-নারায়ণ আত্মবিক্রয় করিতে গিয়াও জুতা খাইল। বয়োধিক্য ও দৃষ্টিহীনতার অজুহাতে কিশোরকে কিছুতেই ক্রয় করিতে চাহিল না আঢ্য মহাশয়। কিশোরের মত পাত্রের যক্ হওয়ার যোগ্যতা নাই নাকি তত্ত্বের বিধানে।

এ সকল কথা উদয় যে না বুঝিত, এমন নহে। যখন বুঝিত, তখন তাহার জনীদারী ছিল, কলিকাতা সহরে দশ পনেরো খানা ভাড়া-বাড়ী ছিল, নগদ টাকা ছিল, জীর অঙ্গে হীরামুক্তা সোনারানা ছিল। ব্রজেশ্বরের পরামর্শে টাকা বাড়াইতে গিয়া মামলা মোকদ্দমায় পড়িয়া উদয় সর্বস্বান্ত। উদয়ের স্বর্কষ আসিল ব্রজেশ্বরের ভাণ্ডারে। প্রেমারা খেলায় সে সর্বস্বান্ত। উদয় ব্রজেশ্বরের সতীর্থ ও স্বগ্রামবাসী।

বিস্ত হারাইয়া উদয়ের চিত্ত হইয়াছিল মরুভূমির মত। সেই মরুভূমিতে “মরুদ্যান” তাহার পত্নী বিজয়া। বিজয়া না থাকিলে উদয়ের আর থাকাই চলিত না সংসারে। যা কিছু স্বখ, যা-কিছু শান্তি, নিরানন্দের মধ্যে যা-কিছু আনন্দ, উদয়ের সেইখানে। কিন্তু তাহার মাথা বিগ্‌ড়াইলে বিজয়াও তাহাকে আটগিরা উঠিতে পারিত না। মাথা খারাপ করিয়াই উদয় ইট্‌ মারিয়া ব্রজেশ্বরের মাথা গুড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; আবার মাথা বিগ্‌ড়াইতেই কিশোরকে সে পাঁচ শত টাকার বেচিতে গিয়াছিল। বিজয়া সব জানে, জানিয়াও কিন্তু তাহার কিছু করিবার উপায় নাই। বাধা

পাইলে উদয় আরও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। বিজয়ার সদাক ভয়—পাগল স্বামী কোন্‌ সময়ে কি অনর্থ বাধাইয়া বসে। অনেক হিসাব করিয়াই বিজয়াকে সংসার চালাইতে হয়। বিজয়ার মত মেয়েই তাহা পারে।

উদয়ের পুত্র আছে আরো দুইটি—অমল ও বিমল। তাহারাই উদয়ের সমধিক প্রিয়। অন্ধ বলিয়াই কিশোরের অনাদর। তবে বিজয়া ভালবাসে কিশোরকেই বেশী। সে কথা কিন্তু কিশোরকে জানাইবার উপায় নাই। সংবাদটা উদয়ের কাণে উঠিলে অনর্থপাতের সম্ভাবনা।

এমন করিয়া দুঃখকষ্ট অশান্তির মধ্যে এই দুঃখী পরিবারটির দিন কাটে। উদয় সে সম্বন্ধে কোনো সংবাদই রাখে না—রাখিতে চায় না। কেমন করিয়া কিছু টাকা পাওয়া যায়, সেইটাই তাহার অহোরহ চিন্তা। আর সেই চিন্তার ফলেই তাহার মাথা খারাপ। কিন্তু উদয়ের বিশ্বাস সে যাহা করে, যাহা ভাবে, তাহা সমস্তই ঠিক—তাহাকে বুঝিতে পারে না তাহারাই, যাহাদের বুঝি বলিয়া জিনিষ-টার একান্ত অভাব।

এই বুঝিতে উদয় তাহার অন্ধপুত্রকে লইয়া ব্রজেশ্বরের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল সেই গভীর রাত্তিতে। একটা গুঁচ অভিসন্ধি তাহার মাথায় গজাইয়া উঠিয়াছিল বুঝির প্রভাবে। পুত্রকে তাই সে তালিম দিতেছিল, যাহা ভে কিশোর বলে—ভুলাইয়া লইয়া আসিয়া ব্রজেশ্বর তাহাকে আটক করিয়াছে। কিশোর কিন্তু সে প্রভাবে রাজী নয়। সে বলে—

“সে কি বাবা, যা’ নয় তা’ কেমন ক’রে বলব! আর বলবই বা কেন? চল, বাড়ী ফিরে যাই। ঘুমে চোখ আসছে জড়িয়ে।”

হরেন্দ্র রাগতভাবে বলিল—

“তাহ’লে তুই আমার কথা শুনবি না, কি বল?”

“ছেলেকে তুমি এসব কি শেখাচ্ছ বাবা?”

“হঃ—ভারী ছেলে তুই। যে ছেলে কথা শোনেনা, সে ছেলে ছেলে নয়, পিলে। বুঝিলে হারাম্‌জাদ, কেউটের বাচ্ছা! এক চড় দিয়ে তোকে চিংপট্টা ক’রে কেলে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার। কিন্তু সেটা পেরে উঠছি না নেহাৎ বাপ বলে। থাক্, এখন শোন্‌ বলি। না শুনিস্, তোক

এইখানে রেখে চলে যাব—আর ত্যজিয়া পুত্ররও করতে পারি। শুনে রাধ্ কথাকাটা, আবাগের বেটা ভূত।”

কিশোর কাদিতে লাগিল। উদয়ের তর্জনে গর্জনের কিন্তু বিরাম নাই। সে তখন ভুলিয়াই গিয়াছে, অমন হল্লা করিলে ব্রজেশ্বরের লোকজন উঠিয়া পড়িবে। হইলও তাহাই। দোবে, চোবে, তেওয়ারি, রামসিং প্রভৃতি জাগিয়া উঠিয়া লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উদয় ও কিশোরকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। দোবে জিজ্ঞাসা করিল—

“তু কোন্ হায়রে চোড়া, ডাকু?”

ভীত উদয় বলিল—

“না বাবা ছাতু, আমি এই রাস্তা দেকে চলতে চলতে তোমাদের বাড়ীর সামনে এসে পড়্তা ছাতু। ভারী ভুক লাগ্ গিয়া, তাই তোমাদের কাছে ছাতু চাইবার জন্ত চিল্লাচিল্লি কর্তা ছাতু। তা’ আমার অন্ধ ল্যাড্খাটি তোমাদের কাছে থাক্ না বাবা। তোমরা একটু একটু ছাতু দিও। আমি অল্পত্র চলা যাতা ছাতু।”

চোবে ও রাম সিং লাঠি উচাইয়া বলিল—

লাঠী মারুকে পটক্ দেই, কেয়া বোলো দোবেজী?”

দোবে তাহাদের মধ্যে একটু বয়স্ক লোক। মার ধবুটা সে আর করিতে দিল না। মনিবের সম্মুখে এই ডাকুটাকে হাজির করাই স্ববুদ্ধির কাজ বলিয়া সে বিবেচনা করিল। কিন্তু মনিবের কাছে ডাকুকে আর লইয়া যাইতে হইল না। মনিব স্বয়ং আসিয়াই উপস্থিত। গোলমালে তাঁহার নিজা ভঙ্গ হইয়াছে।

উদয়কে দেখিয়া ব্রজেশ্বর আশ্চর্য্য নৈত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন—

তুমি উদয় এত রাত্রে এখানে!

বাড়ীতে নয়, পথে।

“তাই না হয় হ’ল। কিন্তু কেন, কি মংলবে?”

“মংলব থাক্ যদি তা’ হলে পথের ভিখারী কেউই করতে পার্বে না আমাকে। সে কথা তুমি ভালই জান—মনে মনে।”

“চূপ্, বেশী গোলমাল কর ত, ধরিয়ে দিব থানাদারকে।”

“তা’ পার্বে না তুমি। কেন, সেটা তুমি বিলক্ষণই জান। কিন্তু থাক্ সে কথা। আমি এসেছিলাম, এই অন্ধ ছেলেটাকে লুকিয়ে তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে যাব ব’লে। সে অমেক কথা—বলবার এখন সময় নয়। আমি এখন জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমার অন্ধ ছেলেটাকে তুমি রাখ্বে কিনা।”

“ইস্, ভারী জোর-জোর কথা যে! থানাদার ডাক্বে নাকি?”

“সে সাহস হ’বেনা তোমার। পরকে মেরে, পরের যশ কীর্তি, টাকা হরণ ক’রে তোমার আমার মত যে কীর্তিধ্বজ, তা’দের ও সাহস নাই যে, সে কথা আমিও যেমন জানি, তুমিও জান তেমনি। এখন কথা বাড়তে চাই না আর। বল এখন ছেলেটাকে রাখ্বে কিনা?”

“না।”

“না! আচ্ছা, রও ছুঁচো, দেখ, তোমার কি দুর্দশা করি। কিশোর, ব’স্ এইখানে চেপে। আমি আসছি থানাদারের কাছ থেকে। সেখানে বলব কি জানো?”

কিশোরকে ফেলিয়া উদয় ছুটিয়া চলিয়া যার দেখিয়া ব্রজেশ্বর একেবারে দমিয়া গেল। ভয় দেখাইতে গিয়া সে যে কেন এত ভয় পাইল, তাহা ব্রজেশ্বরই জানে।

উদয়কে বহু কষ্টে ফিরাইয়া চূপি চূপি কথাবার্তা কহিয়া উদয়ের সঙ্গে ব্রজেশ্বর অপোষ করিয়া ফেলিল। কিশোর স্থান পাইল ব্রজেশ্বরের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায়। টেচা-টেচি করিয়াই উদয় আপনার কাজ গুছাইয়া লইল।

দোবে, চোবে, পাড়ে প্রভৃতি তাহা দেখিয়া অবাক। যাহার প্রতি তাহারা লাঠী উচাইয়াছিল, তাহাকেই তাহারা এখন অভিবাদন করিল।

(ক্রমশঃ)

দক্ষিণ ভারত-পাথে

মহাবলীপুরম্

ত্রিজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পঞ্চপাণ্ডবের রথ

এই বিস্ময়কর সৌধগুলির গঠন প্রণালী ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধারার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি ঠিক এক একটি বিহার ও মঠের চিত্র। লোক সমাগমের দালানের (assembly halls) অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত।

ধর্মরাজ রথ বা মন্দিরটি চারিতলাবিশিষ্ট মঠ বা Buddhist monastery মধ্যে একটা দালান সংযুক্ত এবং দুইটা আলিসা দ্বারা প্রদক্ষিণ-পথ বেষ্টিত আছে। এই উন্মুক্ত পথ হইতে একপ্রকার বিস্ময়কর দানব-মুখায়বব স্থাপিত আছে যাহার মধ্য দিয়া এই প্রদক্ষিণ পথের জল-নিকাশ হয়। ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলার কুলঙ্গীতে যে সব ধ্যানমগ্ন যোগাসনে উপবিষ্ট পুরুষ মূর্তি খোদিত রহিয়াছে, শিল্পী তাঁহার বাটালির ঘায়ে অন্তরের ভাব এমন সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছেন যে দেখিলেই মনে স্থনিঃশব্দ ভাবের উদয় হয়। অপূর্ণ কৌশল শিল্পীর। এক স্থানে শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। বিশ্বের সৃষ্টির রহস্য সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতেছে। পুরুষ ও প্রকৃতির অপূর্ণ সম্মিলন। নারী সৃষ্টি না হইলে বিশ্বের পুরুষ সৃষ্টি বার্থ এই জটিল রহস্য শিল্পীর দক্ষতায় সরল ভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এই মন্দিরটির পাশ্বে উৎকীর্ণ লিপিমালাই ইহার ইতিহাসের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করে। ইহার সর্বোপরি তলায় উঠিলে নীলাধুরাশির অনন্ত মূর্তি চিত্তে অপার আনন্দ আনিয়া দেয়। এই গম্বুজটি ছয়কোনা আকৃতির।

ভীমের রথ

ধর্মরাজ রথের পার্শ্বেই ভীমরথ, মন্দিরটি আকৃতিতে ঠিক একটি বৌদ্ধ চৈতোর (এসেদলী হলের) মতন, ধর্মরাজ রথের শিল্প কার্যগুলির অপূর্ণতা পূরণ করিবার জন্যই এই ভীমের রথ নির্মিত হইয়াছে। আকারে

৪৮ ফিট লম্বা, ২৫ ফিট প্রস্থ, ও ২৬ ফিট উচ্চ একখানি পাথর বা পর্বত টুকরা হইতে খোদিত। দ্বিতল হল, গাত্রে কার্যসূক্ষ্মতা দর্শককে বিম্বিত করিয়া দেয়। দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ কাঠের উপর কারুকার্যের অল্পকরণে এই রথ শিল্প। সেই কার্য শক্ত কাল গ্রেনাইট পাথরকে শোভিত করিয়াছে। দুই ধারের খিলানের মধ্যে যে শিব মূর্তি খোদিত আছে তাহা অপূর্ণ ত্রিধারণ করিয়া আছে। স্থপতির কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতেছে। তবুও ইহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

দ্রৌপদীর রথ

ইহার পার্শ্বে দ্রৌপদীর রথ। পঞ্চপাণ্ডবের রথ মধ্যে দ্রৌপদীর রথ না থাকিলে সৃষ্টির নিয়ম প্রতিপালিত হইল না। সেই জন্যই বোধ হয় দ্রৌপদীর রথের আবির্ভাব। কিন্তু এক পাণ্ডব নকুলের রথের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পঞ্চদ্বারী থাকা সত্ত্বেও দ্রৌপদী হিন্দু শাস্ত্রকার মতে পরম সতী। কুন্তী, তারা, অহল্যা, মন্দোদারী ও দ্রৌপদী এই পঞ্চ সতীকে শাস্ত্রকারগণ আদর্শ সতী রূপে পূজা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের পরপুরুষের সহিত লীলার উদ্দেশ্য ও চতুরতার সহিত সমর্থিত হইয়াছে। সভ্য নর-নারীর চক্ষে তাহা অশ্রদ্ধ ভাব আনয়ন করিলেও ইহারা যুগ যুগান্তকাল হইতে পরম শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন। মাহুয়ের বেলা খেলা আর দেবতার বেলা লীলা। এই রথটি সরল আকৃতির, ইহার মধ্যে একটা দণ্ডায়মান স্ত্রীনারী মূর্তি খোদিত আছে, ইহাই দ্রৌপদী দেবী রূপে পূজিতা। কাহারও মতে মূর্তিটি বিষ্ণুর অবশায়িনী লক্ষ্মীর। এই রথের চত্বরের উপর পশ্চিম দিকে বৃহদাকার সিংহ ও হস্তী এবং পূর্বে নন্দী (বৃষ) মূর্তি এক এক খানি পাথর হইতে খোদিত হইয়া স্থাপিত। মন্দির ও মূর্তি গুলি একটি পর্বতকে কাটিয়া কাটিয়া নির্মিত হইয়াছে। শিল্পীর কি অপূর্ণ দক্ষতা, দূর হইতে রথটি ঠিক বাঙ্গলা দেশের খড়ের চালের কুটারের আকৃতিতে গঠিত।

বলিয়া মনে হয়, ইহার এই বাঁকলার খড়ের চালের অল্পকরণে ছাদ খুব বিশিষ্টতায় পূর্ণ। স্তম্ভের মতন অর্জুনের রথটি ও শিল্পকলায় পরম কৌশল মণ্ডিত। বৌদ্ধ আভাস ইহার গঠন-প্রণালীর উপর থাকিলেও এইটি শৈব স্থাপত্যের প্রকৃত নিদর্শন। মন্দিরটি নবরত্ন, নয়টি চূড়া বিশিষ্ট, তাহার মধ্য চূড়ার চারি পার্শ্বে ছোট ছোট আটটি গম্বুজ শোভিত হইয়া অপূর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে। সম্মুখের মন্দির তোরণটি অতি সুনিপুন শিল্পীর সাধনার ফল, স্বল্প লতা-পাতা যেন কাষ্ঠ ফলকের উপর উৎকীর্ণ হইয়াছে। একটি পুষ্প মালা যেন দ্বার পরিবেষ্টন করিয়া মন্দির চূড়ার গলে



সমুদ্রতীরবর্তী সপ্তমন্দিরের একটি

দৃশ্য। এই রথের মন্দির তোরণের দুইপার্শ্বে দুইটি মনোমোহিনী নারী মূর্তি দ্বারপাল রূপে খোদিত হইয়াছে। এখানে ভীমকায় রক্তমূর্তি দ্বারপালের পরিবর্তে মনোমোহিনী জীমূর্তি দ্বারী হিসাবে বসানয় কল্পনা খুবই রহস্যময়। দ্রোণদী ও অর্জুনের রথ একই চত্বরের উপর রহিয়াছে।

ভারতীয় শিল্পের প্রধান সমালোচক ফারগুসন সাহেব এই রথগুলির সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—

It is a particularly interesting temple and as an example of marvellous stone cutting

and carving, is quite the most wonderful monument in south India. It is also very interesting as the phototype of the lofty structural and pyramidal temples chisled out from one single boulder.

ইহারই পার্শ্বের সহদেবের রথটি ক্ষুদ্রায়তনের এবং সাধাসিধা ধরণের, অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, আকারে ও গঠন-প্রণালীতে বৌদ্ধদের সাঁচী ভূকট ও অমরাবতীর স্তূপের অনুরূপ হইয়াছে। বালুকা স্তূপের মধ্যে অনন্ত সাগর তীরে এই রথগুলি অতীত যুগের ভারতবাসীর ঐশ্বর্য্য ও প্রতিভা রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখানে শ্রীমতী হেমলতা দেবী বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। স্থান ত্যাগ করিবার বাসনা তাঁর হইল না। সুমিষ্ট নারিকেলোদক পানের সহিত অপূর্ণ শিল্প চাতুর্য্য দেখিয়া পরম তৃপ্তি পাইয়াছিলেন। তাঁর ইটালীর মৌদাবলী দর্শনে যে স্থখ হইয়াছিল তাহা যেন স্মান হইয়া গেল।

মহাবলিপুরমের নগরের ও শিল্পের ঐশ্বর্য্যের স্বার্থে এক কাহিনী শুনা গেল। প্রহ্লাদের পুত্র বোরচনা দক্ষিণ ভারতে প্রতিপত্তি বিস্তার করেন, তাঁর পুত্র বালী মহাবলিপুরমের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাই পুত্র বানাসুর। পুরানে তাঁর সহস্র হস্ত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বানাসুরের পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। তাহার সৌন্দর্য্যের ও শিল্পকলার খ্যাতি সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া ছিল। অশ্বরনন্দিনীর রূপের ঘশে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বানাসুরের রাজ সভায় ছদ্ম বেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং বানাসুরের কন্যাকে কৌশলে ভুলাইয়া লইয়া যান। হইতে বানাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের পথ আটক করিলেন, অনিরুদ্ধ ও বানাসুরের মধ্যে এই মহাবলিপুরামের প্রান্তে মহা যুদ্ধ বাধিল, অনিরুদ্ধ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। দ্বারকায় এই দুঃসংবাদ প্রচার হইলে, শ্রীকৃষ্ণ পৌত্রের উদ্ধারের জন্ত মহাবলিপুরমের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বানাসুর শিবের পরম ভক্ত, শিব মহাবলিপুরমের প্রধান দ্বার রক্ষা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎদর্শনে চিন্তিত হইলেন, নানা কৌশলে শিবকে এড়াইয়া

বানাসুরের সম্মুখীন হইলেন, দেব ও দানবে প্রবল যুদ্ধ চলিল, পরম বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিবার পর দেবের মায়াতে বানাসুর নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল, শ্রীকৃষ্ণ এক এক করিয়া তাঁহার ৯৯৮টা হস্ত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, অবশিষ্ট দুইটা হস্তে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রণামের জ্ঞতা রাখিয়া দিলেন। বানাসুর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার মহিমা বোষণা করিলেন, অনিরুদ্ধকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রাজ্য ও রাজধানী রক্ষা পাইল।

বানাসুরের পর কয়েক শতাব্দী মহাবলীপুরুষ হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, মলীসিরণ নামে নরপতি নগরের লুপ্ত ঐশ্বর্য্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক দুর্ঘটনা ঘটিল, স্থল-পূরণের মতে রাজা মলীসিরণ প্রমোদ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া নগর উপকণ্ঠে সুরম্য উপবনে প্রবেশ করিলেন, এবং জল উৎসধারার তীরে উপস্থিত হইয়া দুইটা অঙ্গাঙ্কে নয় অবস্থায় স্থান করিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। একটা অঙ্গারার সহিত তাঁহার প্রগাঢ় প্রণয় হয়। দুইটা অঙ্গরা প্রায় রাজার সহিত কেনী করিতে সেই প্রমোদ বাগানে আসিত। রাজার প্রেমিকা একদা স্বর্গ হইতে মর্ত্তে তাঁর ভরিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত রাজার পরিচয় করাইয়া দিলেন সেই অঙ্গরা সুন্দরী, রাজার একান্ত অমুরোধে রাজাকে গোপনে স্বর্গে ইন্দ্রের রাজ সভায় লইয়া যাইলেন, মর্ত্তবাসীর সে স্থানে বাইবার অধিকার নাই। রাজা ইন্দ্রসভা ও স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইন্দ্রপুরীর মতন মহাবলীপুরামকে ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত করিলেন, এবং ইন্দ্রপুরের পৌর শাসন অম্বায্যী নিজপুরী শাসিত করিতে লাগিলেন। স্বর্গের গৌরব স্নান হইয়া পড়িল। ইহাতে দেবরাজ চিন্তিত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িলেন, তিনি বরুণ দেবতাকে এই নগর ধ্বংস করিবার জ্ঞতা আদেশ প্রদান করেন, তাঁহারই আদেশ প্রতিপালিত হয়, সমুদ্রের ভীষণ তাণ্ডব লীলার বরুণ দেবের প্রতাপে মহাবলীপুরমের ঐশ্বর্য্য সমুদ্র গর্ভে লীন হইয়া গেল। এই কাহিনী সপ্ত প্যাগোডা বা স্তম্ভ কূলের সাতটা মন্দির মধ্যে ছয়টির নিমজ্জন অবস্থা প্রদান স্বরূপ প্রদর্শিত হয়। সেই জলমগ্ন ছিন্ন বিছিন্ন পাহাড় গুলি প্যাগোডার ধ্বংসাক্ষিপ্ত রূপে কথিত হয়।

অর্জুনের তপস্যা

পঞ্চ পাণ্ডবের রথ হইতে নীচের রাস্তা দিয়া বাইলে পাহাড়ের গাত্রে কয়েকটা গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মাঝখানে পর্ব্বতের গাত্রে একস্থানে নানা চিত্র খোদিত রহিয়াছে, উন্মুক্ত স্থানে এত বড় পাহাড় গাত্রে (বাস রিলিফ) চিত্র ভারতে আর কোথাও নাই। ৩০ ফিট দীর্ঘ ও ৪০ ফিট উচ্চ পর্ব্বত খণ্ডে অর্জুনের তপস্যার চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে। দুইটা পাহাড় যেন এক স্থানে সংযুক্ত হইয়াছে। এই স্থানে উৎকীর্ণ দেবমূর্ত্তা, অর্জুনের রথাকৃতি মন্দিরের অঙ্কুরণে মন্দির, যুক্ত করে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, ঋষি, দেবতাগণ, নাগ ও নাগিনীদের মূর্ত্তিগুলি যেমন ভাব-ব্যঞ্জক তেমনিই সুশ্রী ও প্রাণবন্ত। ইহার উৎকীর্ণ কারী শিল্পীর দক্ষতা বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়া দেয়। দুইটা পাহাড়ের সংযোগ স্থলটি এমন কোণশেলে সংযুক্ত করা হইয়াছে, ঠিক যেন সমুদ্র হইতে উদ্ভিত নাগরাজ ফণা বিস্তার করিয়া সমুদ্র মন্থন করিতে বাইতেছে কিম্বা অর্জুনের তপস্যা সিঁড়ির জ্ঞতা তাহার মস্তকের উপর জয় চিহ্ন স্বরূপ ফণা বিস্তার করিয়া আছে। পার্থ স্বর্গের ইন্দ্রপুরী নন্দন কাননে গিয়া পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। বাহার দ্বারা পাণ্ডবেরা কোরবদের ধ্বংস করিতে সক্ষম হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত গাণ্ডীব ধনুকের প্রভাবে এবং তাহার দেবোচিত চরিত্রের বলে এবং ইন্দ্রের আশ্বাসে অর্জুন স্বর্গে পাশুপতাস্ত্র আনিতে গমন করেন এবং ভাবিয়া ছিলেন সহজেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু স্বর্গদ্বারে পৌছিয়া প্রবল বাধা পাইতে লাগিলেন। ইহাই প্রথম অংশে খোদিত হইয়াছে। ইন্দ্র পাশুপত অস্ত্রটি অর্জুনকে প্রদান করিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত শিব তদনুকূপ আর একটি মহাস্ত্র ইন্দ্রকে প্রদান করেন। অর্জুন পাশুপত অস্ত্র না লইয়া ফিরিবেন না। সেই নিমিত্ত শিবকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই উৎকীর্ণ চিত্রে অর্জুনের তপস্যার বিভিন্ন স্তর স্বকোণশেলে খোদিত হইয়াছে। অবশেষে অর্জুনের তপস্যাক্রীট কহালসার মূর্ত্তি আকিয়া শিল্পী অপূর্ব্ব কোণশ প্রদর্শন করিয়াছেন, ক্ষীণ অস্থি চন্দ্রসার উজ্জ্বল এক পদে দণ্ডায়মান অর্জুনের মূর্ত্তি তপস্যার প্রভাব প্রচার করে। অর্জুনের

তপস্যার শক্তি এবং মনের একাগ্রতা এত প্রবল যে সমস্ত বিশ্ব তাঁহার তপঃ তেজে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। নানা দেব দেবীরা তাঁহার মঙ্গল কামনায় উপর অংশে দণ্ডায়মান। গন্ধর্ব ও অম্বরগণ তাহাদের তামস ভাব ক্ষণিকের জন্ত ভুলিয়া এই পবিত্র সাধনার শক্তি দেখিয়া বিস্মিত, দুইটি পাহাড়ের উপরিভাগ ত্রিদিববাসীদের সম্মিলনে উদ্ভাসিত, মৃষ্টিগুলি এমনই স্তম্ভর, এমনই স্পষ্ট, এমনই মনোরম, মনে হয় যেন মোমের পুতুল! নিম্নাংশে হস্তীর দল অর্জুনের কঠোর তপস্যায় ভীত ও চকিত। তাহারা যেন এই মহা তাপসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্ত মস্তক অবনত করিয়া চলিয়াছে। হস্তী যুথের অগ্রে অগ্রে যে হাতীটি চলিয়াছে, তাহার অবয়ব দলপতিরই মতন অতিকায়। ১৭×১৪ ফিট



নাহারের গায়ে অর্জুনের তপস্তার চিত্রে হস্তী

আকারের এই হস্তীর আশ্রয়ে যেন তাহার জাত ভায়েরা নির্ভয়ে চলিয়াছে। হস্তিগীটা হস্তীর বিপুলকায় দাঁতের ফাঁক দিয়া তপস্বীকে দর্শন করিবার জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। সর্ব বৃহৎ গজের সম্মুখে এক বিড়াল তপস্বী অর্জুনের তপস্যায় উল্লসিত এক পদে উর্দ্ধ বাহুতে দণ্ডায়মান দেখা যায়। শিল্পী বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের ননীভাণ্ড হইতে মাখন খাওয়ার

প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ত বিড়ালের তপস্যা কর্তব্য মনে করিয়াই এই মূর্তি উৎকীর্ণ করিয়াছেন। এই পর্বতের উপরে প্রকাণ্ড মস্তক পাঞ্জের ভগ্নাংশ দেখা যায়। সেইটি বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের মাখন মাড়িবার পাঞ্জ, তাহার ব্যাস প্রায় পাঁচ হাত। বিড়ালকে তপস্যায় রত দেখিয়া একটি মুষিক খাদ্য সংগ্রহের সুবিধা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছে, তাহারও চিত্রটি নিখুঁত, শিল্পীর পরম দক্ষতা প্রকাশ করিতেছে। এই অতিকায় 'ব্যাস রিলিফ' বা প্রস্তরে উৎকীর্ণ করা অর্জুনের তপস্যার চিত্র অর্জুনের তপস্তা-মহিমার জন্তই যে শিল্পী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা নহে, সাধারণ নর নারীও তপস্যায় বাহাতে অল্পপ্রাণিত হয় তাহারই সজীব পরিকল্পনা।

ধর্ম্মরাজের সিংহাসন

ছিন্ন ছিন্ন পর্বতমালায় শিরে মন্দিরের একটি গোপুরাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই গোপুরামের কাঞ্চকার্য্য বিজয় নগরের শিল্প প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন, বিজয়নগরের সম্রাটগণ চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত শিল্প ও স্থাপত্যের চরম ও পরম উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহারই এই একটি নিদর্শন। পল্লবদের বিশ্ববিশ্রুত বন্দরের অপূর্ব দৃশ্য ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ স্থলে এই দেবালয় নির্মিত হইয়া বিশ্বের নাবিক ও যাত্রীদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিত। মহাবলিপুুরাম বন্দরে রপ্তানী ও আমদানীর ব্যবসার প্রসারের বৃত্তান্ত অনেক ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন। বৃত্তান্তে দেখা যায় যে এখানকার নারীরাই এই বাণিজ্যকেন্দ্রের প্রধান ক্রেতা ও বিক্রেতা ছিল। সেই নিমিত্ত এই দেশের রমণীরা অবরোধপ্রথার কোন ধার ধারে না। সরলভাবে ও নির্ভয়ে গমনাগমন ও হাট বাজার করিতে অভ্যস্ত।

গোপুরামের অনতিদূরে ধর্ম্মরাজের বিশাল সিংহাসন। সিংহের মতন কিছুত আকারের বৃহৎ পশুর পৃষ্ঠে এই রাজ-আসন নির্মিত। সেইজন্ত ইহার নাম সিংহাসন হইয়াছে; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে সিংহাসনে বসিয়া জ্ঞায় বিচার করিতেন, সেই সিংহাসনের উপর উপবেশন করিয়া ক্ষণিকের জন্ত রাজার পদগর্ভে গর্ভিত হইবার ইচ্ছা মনে উদয় হইল না বটে—তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে চিত্ত পুলকিত হইল।

দেখিলাম, পর্বতমালার উপর দিগা রাস্তা গিয়াছে, তাহার
নির্মাণ কৌশল আধুনিক স্থপতিদেরও বিশ্বয় উৎপাদন করে,
এই সব শিল্পীর প্রতিভা স্মরণে গৌরব অমূল্য করিলাম।
সে যুগে প্রকৃতির উপাসক হিন্দুরাও মনের জ্ঞান ও
বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিত। একদিকে উপত্যকার দৃশ্য
কি মনোরম, শতক্ষেত্র পবন হিল্লোলে যেন নাচিতেছে।
অপরদিকে অনন্ত নীলাম্বরীশীর নীলাভার মনোমোহিনী
মুক্তি। অসীমের মধ্যে সীমাও আছে, তরঙ্গের ঘাত প্রতি-
ঘাতে বারির চূর্ণ বিচূর্ণিত ফেনরাশির খেলা স্বপ্নে নির্মলতা

এবং চিত্তে আনন্দ ভরিয়া দিল। দেহও শ্রুতল নারিকেল
জলপানে পরিতৃপ্ত হইল। এই জনবিরল স্থানে না
আছে খারারের দোকান, না পাওয়া যায় কফির বা চায়ে
আড্ডা, না দেখা যায় মুদীর বিপণী—কেবল শিল্পের
প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখিয়া কুখা তৃষ্ণা তুলিয়া যাইতে হয়।
তবে যখন দেশীয় রমণীরা কচিকচি ডাবের ঝুড়ি পিঠে
করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহা পান না করিয়া আর বাধ্য
গেল না। এক পরসে একটি ডাবের দাম, দর করিলে আর
কম হইতেও পারিত!

দাবীর শেষ

শ্রীমতী শ্রীলেখা চৌধুরাণী

কারোর পরে রাখব না
আর দাবী,
ফেলবো মুছে সকল
মনস্তাপই।-
কেনই মিছে মায়ায়।
ফাঁসী পরা;
হৃদয়খানি ব্যাখ্য
ভারী করা;
ছুখে যদি এসেই
পড়ে হায়,
বাধা কত দেব না
আর ভায়।
মাহুষ শুধু বাহির
বিচার করে,
অণেক তরে চায় না
সে অন্তরে;
স্বার্থ তাহার
সবার বিচারক;

ভক্তি প্রীতি
সেথায় নিরর্থক।
শুক ধরায়
স্নেহের ছায়া নাই;
কঠোর মরু
যেদিক পানেই চাই।
তাই মনে হয়
কেনই আশা করি,
কার কাছেতে
মিথ্যা কেঁদে মরি?
বাসলে ভাল
করবে অবহেলা,
এই ত রীতি—
এই জগতের খেলা।
তুচ্ছ জ্ঞানে মুখ
ফেরালে পরে,
বিশ্ব তখন লুটায়
পায়ের পরে।

ই ছুরের ভোজ

শ্রীমদ্ভগবতী দেবী

ছেলেরা বললে, “ভারি অম্মায়, আমরা নতুন পণ্ডিতের কাছে কিছুতেই পড়ব না।” নতুন পণ্ডিত মশায় বিনি আসছেন তাঁর নাম কালীকুমার তর্কালকার।

ছুটির পরে ছেলেরা রেল-গাড়ীতে যে যার বাড়ী থেকে ফিরে আসছে ইস্তুলে। ওদের মধ্যে একজন রসিক ছেলে কালো কুমড়োর বলিদান ব’লে একটা ছড়া বানিয়েছে, সেইটে সকলে মিলে চীৎকার করে আওড়ায়। এমন সময় আড়খোলা ইন্টেশন থেকে গাড়ীতে উঠলেন একজন বুড়ো ভদ্রলোক। সঙ্গে আছে তার কাঁথায় মোড়া বিছানা। কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধ করা দু’তিনটে হাড়ি, একটা টিনের ট্রাক, আর কিছু পুঁটুলি। একটা ঘণ্টা গোছের ছেলে, তাকে ভাকে সবাই বিচকুন বলে, সে চোঁচিয়ে উঠল—এখানে জায়গা হবে না বুড়ো, যাও দূর গাড়ীতে। বুড়ো বললেন, বড়ো ভিড়, কোথাও জায়গা নেই, আমি এই কোনটুকুতে থাকব, তোমাদের কোনো অস্ববিধে হবে না। ব’লে ওদের বেঞ্চি ছেঁড়ে দিয়ে নিজে এক কোণে মেঝের উপর বিছানা পেতে বসলেন। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করলেন, “বাবা তোমরা কোথা যাচ্ছ, কী করতে। বিচকুন ব’লে উঠলো, শ্রদ্ধ করতে। বুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, কার শ্রদ্ধ? উত্তরে শুনলেন, কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কার। ছেলেগুলো সব হুঁর করে চোঁচিয়ে উঠল—কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কা দেখিয়ে দেব লবোডকা।

আসানসোলে গাড়ী এসে থামল, বুড়ো মানুষটি নেবে গেলেন, সেখানে স্নান করে নেবেন। স্নান সেরে তিনি গাড়ীতে ফিরতেই বিচকুন বললে, এ গাড়ীতে থাকবেন না মশায়!

কেন বলো তো।

ভারি ইছুরের উৎপাত।

ইছুরের? সে কী কথা!

দেখুন না আপনার ঐ হাড়ির মধ্যে ঢুকে কী কাণ্ড করেছিল।

ভদ্রলোক দেখলেন তাঁর যে হাড়িতে কদমা ছিল সে হাড়ি ফাকা, আর ঘেঁটাতে ছিল খইচুর তার একটা দানাও বাকি নেই।

বিচকুন বললে, আর আপনার শ্রদ্ধাভাজনে কী একটা বাধা ছিল সেটা শুদ্ধ নিয়ে দৌড় দিয়েছে।

সেটাতে ছিল ওঁর বাগানের গুটি পাঁচেক পাকা আম।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, আহা ইছুরের অত্যন্ত ক্ষিদে পেয়েছে দেখছি। বিচকুন বললে, না না ও জাতটাই ও রকম, ক্ষিদে না পেলো খায়।

ছেলেগুলো চীৎকার করে হেসে উঠলে, বললে, ই মশায়, আরো থাকলে আরো খেত।

ভদ্রলোক বললেন, তুল হয়েছে, গাড়িতে এত ইছুর একসঙ্গে যাবে জান্লে আরো কিছু আনতুম।

এত উৎপাতেও বুড়ো রাগ করলে না দেখে ছেলেরা দমে গেল—রাগলে মজা হোত।

বর্ধমান এসে গাড়ি থামল। ঘণ্টা খানেক থামবে গাড়ি এখানে। অল্প লাইনে গাড়ি বদল করতে হবে। ভদ্রলোকটি বললেন, বাবা, এবারে তোমাদের কষ্ট দেব না, অল্প কামরায় জায়গা হবে।

—না না সে হবে না, আমাদের গাড়িতেই উঠতে হবে। আপনার পুঁটুলিতে যদি কিছু বাকি থাকে আমরা সবাই মিলে পাহারা দেব, কিছুই নষ্ট হবে না। ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা বাবা, তোমরা গাড়িতে ওঠো, আমি আসছি।

ছেলেরা তো উঠল গাড়িতে। একটু বাদেই মিঠাই ওয়ালায় ঠেলা গাড়ি ওদের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল, সঙ্গে সেই ভদ্রলোক।

এক এক ঠোঙা এক একজনের হাতে দিয়ে বললেন,

এবারে ইহুরের ভোজে অনটন হবে না। ছেলেগুলো হুরে ব'লে লাফালাফি করতে লাগল। আমার খুড়ি নিয়ে আমওয়ালার এল—ভোজে আমও বাদ গেল না। ছেলেরা তাঁকে বললে, আপনি কী করতে কোথায় যাচ্ছেন বলুন। তিনি বললেন, আমি কাজ খুঁজতে চলেছি, যেখানে কাজ পাব সেখানেই নেবে পড়ব।

ওরা জিজ্ঞাসা করলে, কী কাজ আপনি করেন?

তিনি বললেন, আমি টুলো পণ্ডিত, সংস্কৃত পড়াই।

ওরা সবাই হাততালি দিয়ে উঠল, বললে, তাহলে আমাদের ইঙ্কলে আছেন।

তোমাদের কতারা আমাকে রাখবেন কেন।

রাখতেই হবে। রামকুমড়ো টাটকা লঙ্কাকে আমরা পাড়ায় ঢুকতেই দেব না।

মুসকিলে ফেললে দেখছি। যদি সেক্রেটারি বাবু আমাকে পছন্দ না করেন।

পছন্দ করতেই হবে—না করলে আমরা সবাই ইঙ্কল ছেড়ে চলে যাব।

আচ্ছা বাবা, তোমরা আমাকে তবে নিয়ে চলো।

গাড়ি এসে পৌঁছল স্টেশনে। সেখানে স্বয়ং সেক্রেটারী বাবু উপস্থিত। বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে বললেন, আহ্নন, আহ্নন তর্কালঙ্কার মশায়। আপনার বাসা প্রস্তুত আছে।

—ব'লে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

টিউব রেলওয়ে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ বসু

‘উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর,

অপরূপ আর কিবা আছে এর পর।’

বিখ্যাত কবি ষড়্‌গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত এই লাইন দু’টি অনেকেই পড়েছেন এবং এই লাইন দু’টির অর্থও খুব সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন। কিন্তু কোথায় এবং কি ভাবে এই রকম হচ্ছে তা’ জানা থাকলেও কি প্রণালীতে তা’ হওয়া সম্ভব তা’ বোধ বহুলোক জানে না।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত লণ্ডন সহরের মধ্য দিয়ে বিখ্যাত টেম্‌স্‌ (Thames) নদী ব’য়ে গিয়েছে—প্রত্যহ সেই নদীর ওপর দিয়ে শত শত জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি জলযান যাতায়াত করে। আবার, ঐ টেম্‌স্‌ নদীর নীচ দিয়ে টানেল্‌ (tunnel) অথবা হুড্‌পথে প্রত্যহ শত শত ট্রেনও যাতায়াত করে। এই রকম অবস্থাটি বর্ণনা করার জন্যেই কবি উপরোক্ত লাইন দু’টি লিখেছেন। লণ্ডন সহরের নীচ দিয়ে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে ইলেক্ট্রিক্‌ ট্রেন চলেছে, এবং তা’রই ওপরে রিজেন্ট স্ট্রীট্‌ (Regent Street), বণ্ড স্ট্রীট্‌ (Bond Street), পিক্যাডিল্লি সার্কাস্‌ (Piccadilly Circus) প্রভৃতি পৃথিবীর বিখ্যাত রাস্তাগুলো এবং

তা’দের হুঁধারে আটদশ তলা উঁচু প্রকাণ্ড বাড়ীগুলো রয়েছে আবার সহরের নীচ দিয়ে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে ইলেক্ট্রিক্‌ ট্রেন চলেছে এবং তা’রই ওপরে টেম্‌স্‌ নদী ব’য়ে যাচ্ছে, আর সেই টেম্‌স্‌ নদীর বুকের ওপর দিয়ে প্রত্যহ শত শত জাহাজ, জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি যাতায়াত করছে—এই রকম অবস্থাটি শুনতে প্রথমতঃ একটু আশ্চর্য লাগে,—সত্যিই তা’ এক অদ্ভুত ব্যাপার! আরও মজার জিনিষ এই যে মাটির নীচে ইলেক্ট্রিক্‌ ট্রেনে ব’সে যাওয়ার সময়ে তা’রই মাথার ওপরে বিশাল বিশাল বাড়ী প্রভৃতি রয়েছে, কিংবা ঐ রেলপথের মাথার ওপরে টেম্‌স্‌ নদী ব’য়ে যাচ্ছে এবং তা’ দিয়ে শত শত জাহাজ চলাফেরা করছে—এই সকলের কিছুই বোঝা যায় না। সাধারণ ট্রেনের মতই এই সকল ট্রেন চলে—তবে, সাধারণ ট্রেনে ব’সে যেতে যেতে রেলপথের হুঁধারে মাঠ, বাগান, চাষের ক্ষেত প্রভৃতি বহু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই প্রকার ট্রেনে মাটির তলা দিয়ে যাওয়ার সময়ে সেই সকল দৃশ্য কিছুই দেখা যায় না—এইটুকুই তফাত।

কেহ কেহ হয়তো মনে করতে পারেন, নদীর তলা

দিয়ে ট্রেন যাওয়া কি করে সম্ভব! কিন্তু যে উপায়ে পাহাড়, পর্বত, রাস্তা, ঘর, বাড়ী প্রভৃতির নীচ দিয়ে রেলপথ তৈরী করা হয়, ঠিক সেইভাবেই নদীরও তলা দিয়ে (tube) রেলপথ প্রস্তুত করা হয়। তবে, নদীর তলা দিয়ে যেতে হ'লে সেই স্থানের টানেল বা হুডল সাধারণ টানেল অপেক্ষা অনেক গভীর করে কাটতে হয়।

বহু লক্ষ-কোটি অর্থব্যয় হয়েছে এই সকল রেলপথ প্রস্তুত করতে। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন, টানেল তৈরী করতে যখন এতই খরচ, তখন কেন মাটির নীচ দিয়ে টানেল পথে ট্রেন চালান হয় এবং তা'র প্রয়োজনই বা কি? মাটির ওপর দিয়ে সাধারণ রেলপথেই ত ট্রেন চালান যায়।

সিম্পল এবং মণ্ট্‌ ভেনিস্‌ টানেল) পাহাড়ের ওপর অথবা পাহাড়ের গায়ে জু-এর মত পেঁচান রেলপথ তৈরী করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সহরে অল্প কারণে টানেল রেলপথ তৈরী করতে হয়। সহরে এই রকম রেলপথ তৈরী করার কারণ এই যে, রাস্তা, ঘাট, ঘর, বাড়ী প্রভৃতি থাকার জগ্গে মাটির ওপর দিয়ে সাধারণ রেলপথ তৈরী করা অসম্ভব—যদিও বা তা' সম্ভব হয়, তা'হলেও ঐ সকল স্থানের জমীর এত দাম যে তা' কেনা সাধ্যাতীত।

আপনারা অনেকেই খুব সম্ভব মনে করতে পারেন যে, টানেল মাটির নীচে একটা হুডলপথ ভিন্ন আর কিছুই নয়—কিন্তু এই সকল টানেল বলতে আরও অনেক কিছু বুঝায়।



টিউবের জন্ত টানেল কাটা হইতেছে

পার্কৃত্য প্রদেশে পাহাড়, পর্বতের ওপর ঘুরিয়ে, ঘুরিয়ে রেলপথ তৈরী করা অপেক্ষা ঐ সকল পাহাড়ের নীচ দিয়ে টানেল তৈরী করে সোজা পথে ট্রেন চালান অনেক সহজ সম্ভব। এই রকম টানেলে রেলওয়ে চালানর খরচাও অনেক কম, কারণ প্রথমতঃ রেলের লাইন সমতলভূমির ওপর দিয়ে যায় ব'লে এঞ্জিন অনেক বেশী বোঝা টানতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, টানেলের পথ সোজা ব'লে দূরত্ব অনেক কম—সুতরাং সে জগ্গেও খরচা অনেক কম। আবার অনেক ক্ষেত্রে (যেমন ইউরোপে আল্পস্‌ পর্বতের নীচেকার

প্রথমতঃ, এই টানেল তৈরী করা খুবই কষ্টসাধ্য—মাছঘের সাহায্যে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে, যে ভাবেই হোক না কেন, এই রকম টানেল ঠিক যতখানি প্রয়োজন ততখানিই কাটা হওয়া চাই—ইঞ্জিনিয়ারগণের মাপযোগ্য অপেক্ষা এক ইঞ্চিও বেশী অথবা কম কাটা হ'লে চলবে না—সুতরাং বুঝতে পারছেন যে, এই টানেল কাটতে হ'লে কি রকম ঠিক মাপযোগ্যের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, এই টানেলে উপযুক্ত রকম ড্রেন এবং বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাও প্রয়োজন। যদি চারদিকের মাটি নরম হয় কিংবা কাছাকাছি কোনও

ব্যবস্থা থাকে তা'হলে জল চুইয়ে প'ড়ে ক্রমশঃ টানেল্ ভর্তি হ'য়ে যাবে। সেই জন্তে টানেলের ভিতরে ইট এবং সিমেন্ট দিয়ে একটা আচ্ছাদন মত ক'রে দিতে হয়। সাধারণ রেলের যে রকম টানেল্ দেখতে পাওয়া যায় সচরাচর তা' বেশ চওড়া এবং দেখতে অনেকটা ঘোড়ার কুরের মত। কিন্তু মাটির নীচ দিয়ে রেলপথ তৈরী করিতে হ'লে যে রকম টানেল্ তৈরী করা হয় তা' একেবারে গোলাকার এবং কোনও জংশন অথবা স্টেশনের স্থানগুলো ভিন্ন সমস্ত রেলপথই এত সৰু যে তা'র

দিয়ে ইম্পাতের টিউব্ অথবা নলের মধ্য দিয়ে যে রেলপথ যায় তাকে বুঝায়।

টিউব্ রেলপথ কাটা এক হাদ্দামা বিশেষ ; কত সময়ে কত ড্রেন, জলের কলের পাইপ, কিংবা মাটির নীচস্থ ইলেক্ট্রীক তার ভেঙ্গে গেছে—কত সময়ে বা ওপর থেকে মাটি ধ'সে পড়ে টানেল অথবা খুড়দ বদ্ধ হয়ে গেছে এবং কত কুলী-মজুরের প্রাণ গিয়েছে—আবার কত সময়ে টানেল্ কাটেতে বাটতে নদী বা ঝরনা পড়েছে এবং পাম্পের সাহায্যে সেই জল ফেলে দিয়ে তবে কাটার কাজ



টিউব রেলওয়ে প্রস্তুত করা হইতেছে

মধ্য দিয়ে একটি ট্রেন চ'লে গেলে আর একটুও স্থান ফাঁক থাকেনা—ঠিক একখানা ট্রেন চ'লে যেতে যতটুকু স্থানের প্রয়োজন হয় ঠিক ততখানি চওড়া। এই জন্তে এই রকম রেলপথের নাম টিউব্ রেলওয়ে (Tube Railway)।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড (Underground) বলতে সাধারণতঃ মাটির নীচ দিয়ে টানেল অথবা খুড়দপথে যে রেলওয়ে যায় তা'কেই বুঝায়, কিন্তু টিউব বলতে মাটির গভীর স্তর

চালান হয়েছে। ইংলণ্ডের গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে (Great Western Railway) নামক রেল-লাইনেব সেভার্ন (Severn) টানেলে এইজন্তে দ্বিবারাত্র পাম্প চালাতে হয়।

টিউব্ রেলওয়ে অথবা মাটির নীচে টানেল্ কাটা হয় প্রধানতঃ যন্ত্রের সাহায্যে। এই রকম যন্ত্রের মধ্যে সাধারণতঃ দু'টি যন্ত্রই ব্যবহার করা হয়—তাদের নাম, গ্রেটহেড্ শীল্ড্ (Greathead Shield) এবং

রোট্যারী এক্সক্যাভেটর (Rotary Excavater)।
গ্রেটহেড্ শীল্ড্ অপেক্ষা রোট্যারী এক্সক্যাভেটর প্রায়
দ্বিগুণ দ্রুত কাটতে পারে কিন্তু এই যন্ত্র কেবল মাত্র সাধারণ
মাটির তলা দিয়ে টানেল তৈরী করার কাজেই ভাল রকম
ব্যবহার করার উপযোগী, গ্রেটহেড্ শীল্ড্ খুব শক্ত এবং
পার্কৃত্য মাটির তলা দিয়ে টানেল তৈরী করার কাজে
ব্যবহার করা চলে। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, ছুতার

বোল্ট (Bolt) এবং নাটের (Nut) সাহায্যে পরস্পরের
সঙ্গে শক্ত করে জুড়ে দেওয়া হয়—যাতে ক'রে একটি লম্বা
লোহার টিউব অথবা স্বড়ঙ্গপথ তৈরী হয়ে যায়।
এইভাবে প্রস্তুত লোহার টিউবের ব্যাস অথবা ডায়ামিটার
(Diameter) টানেলের ব্যাস অপেক্ষা অনেক ছোট।
সেইজন্তে লোহার টিউব তৈরী হয়ে যাওয়ার পরে,
মাটির স্বড়ঙ্গপথ এবং লোহার টিউবের মাঝখানে যে ফাঁক



আপ ও ডাউন টিউব রেললাইন

তুরপুন নামক যন্ত্রের সাহায্যে কাঠে নানা রকম ছিদ্র
করে। ঠিক সেই রকমেই গ্রেটহেড্ শীল্ড্ এবং
রোট্যারী এক্সক্যাভেটর এই দুটি যন্ত্র দিয়ে ইলেক্ট্রীসিটি
বা বৈদ্যুতির শক্তির সাহায্যে মাটির নীচে স্বড়ঙ্গ পথ
কাটা হয়। প্রথমে খানিকটা গোলাকার স্বড়ঙ্গ কাটা
হলে ইম্পাতের বড় বড় গোলাকার চাকাবিশেষ সেই
স্বড়ঙ্গ পথের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে সেগুলো

থাকে তার মধ্যে শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে খুব তরল
এবং পাতলা সিমেন্ট চালিয়ে দিয়ে সেই ফাঁক বন্ধ করে
দেওয়া হয়। এই সিমেন্ট লোহার টিউবের গায়ে চারদিকে
লেগে গিয়ে ক্রমশঃ পাথরের মত খুব শক্ত হয়ে যায় এবং
এই রকম করার ফলে দুটি টিউব তৈরী হয়—একটি
সিমেন্টের টিউব এবং অপরটি লোহার টিউব। সিমেন্টের
টিউবের মধ্যে লোহার টিউব থাকে। ছবি দেখলেই

জিনিষটি ঠিক বুঝা যাবে। এইভাবে সমস্ত টানেলটির মধ্যে সিমেণ্টের টিউব এবং সেই সিমেণ্টের টিউবের মধ্যে ইম্পাতের টিউব তৈরী করা হয় এবং ঐ টিউবের ওপরকার মাটি এবং বাড়ী প্রভৃতির যত চাপ সমস্তই প্রথমে সিমেণ্টের টিউবের ওপর এবং পরে লোহার টিউবের ওপর পড়ে। এই রকম ব্যবহার ফলে টানেলের ওপরকার মাটি অথবা ঘর, বাড়ী কসে পড়ে যাওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকে না এবং আশেপাশের মাটি যদি ভূমিকম্প অথবা অন্ত কোনও নৈসর্গিক কারণে ফেটে যায় বা স্থানচ্যুত হয় তাহ'লেও টিউব রেলপথের কোনই অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে প্রস্তুত ইম্পাতের টানেলের মধ্য দিয়েই টিউব রেলওয়ে ট্রেন চলা-ফেরা করে। সাধারণ রেলপথের অন্তে যে টানেল বা সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করা হয় তাহ'তে এত ব্যবস্থা করতে হয় না এবং তা'র মধ্যে লোহার সুড়ঙ্গপথ বা টিউব বসাতে হয় না।

টিউব রেলপথ তৈরী করার সময়ে হু'ধারে যে মাটি জমা হয় তা' অল্পস্থানে যেখানে মাটির প্রয়োজন আছে বা থাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক সময়ে এই মাটি বাঁধ দেওয়ার কাজেও লাগান হয়।

টিউব রেলওয়ে তৈরী করতে হ'লে ছ'টি টিউব পাশাপাশি কাটা হয়—একটি আপ (Up) ও অপরটি ডাউন (Down) লাইনের অন্তে। মধ্যে মধ্যে ছ'টি লাইন একটি প্রকাণ্ড টিউবে এসে মিলিত হয়। এই রকম মিলন-স্থানকেই জংশন বলে এবং সেখানকার টিউবের ব্যাস খুব চওড়া। এই ছ'টি টিউবপথে পরস্পর বিপরীত দিকে ট্রেন যাতায়াত করে। লণ্ডন টিউব রেলওয়ের ক্যাম ডেন

(Camden Town) জংশন ষ্টেশনটি বেশ বড়—এখানে ছ'টি বিভিন্ন টিউব রেলওয়ে লাইন এসে মিশেছে—এই লাইন ছ'টি কিছুদূর পর্যন্ত পাশাপাশি গিয়ে পরে ভিন্ন ভিন্ন পথে চ'লে গেছে। এই ছ'টি পাশাপাশি টিউব পথে প্রতি ঘণ্টায় ১০টি টিউব ট্রেন গর্জন করতে করতে যাতায়াত করে, কিন্তু রাস্তার ওপরের লোকেরা তা'র কোনও সাড়াই পায় না!

মাটির নীচে টানেলের গায়ে বরাবর প্রতি ৫০ ফুট দূরে ইলেকট্রীক আলো থাকে টানেলটিকে আলোকিত করার জন্যে। প্রথম প্রথম এই সকল আলো সর্বদাই জ্বালিয়ে রাখা হ'ত কিন্তু আজকাল আর তা' করা হয় না—এখন কেবলমাত্র বিপদ আপদ ঘটলে ঐ সকল আলো জ্বালান হয়। টানেলের দ্বায়ে বরাবর টেলিফোনের তারও আছে—প্রয়োজন হ'লে ড্রাইভার অথবা গার্ডসাহেব নিকটবর্তী ষ্টেশনের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলতে পারে।

লণ্ডন অতি প্রাচীন সহর—রাস্তাগুলো নিতান্ত সরু—হু'ধারে বিশাল বিশাল বাড়ী—সেইজন্মে বর্তমানে লোক চলাচলের বিশেষ সুবিধা একপ্রকার অসম্ভব। যদি সমস্ত সহরটিকে একেবারে ভেঙ্গে নতুন ক'রে তৈরী করা যায় তবেই চওড়া চওড়া রাস্তা প্রস্তুত ক'রে লোকজন মোটর বাস প্রভৃতি যাতায়াতের সুবিধা হ'তে পারে। কিন্তু মাটির নীচে এই সকল ব্যাপার নেই—সুতরাং লণ্ডনের টিউব রেলওয়ে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার লণ্ডনের পার্কতা, শক্ত মাটিও এই কাজের পক্ষে যথেষ্ট অমূল্য।

(ক্রমশঃ)



সুন্দরী-হিন্দোল

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নমঃ বন্দিগো যৌবননন্দিতা সুন্দরী ছন্দের সঙ্গীতে বন্দিনী ধন্য,
এলে বিশ্বের প্রাঙ্গনে মর্তের মন্দিরে ভগ্নের জ্যোতি মেখে স্বর্গের কন্যা।
আদি সৃষ্টির স্বয়ম্বর লক্ষীর ধ্যান থেকে অধরে ঝরে প'ল তব দেহ ছন্দে,
ওগো গীর্বাণী বেদগানে কাব্যের মত তুমি মর্তেতে এলে নেমে রূপে রসে গন্ধে ;
তব মঞ্জু নিতম্বের হিন্দোল ভুলে ওঠে সঙ্কেতে দোল খায় মাধবের মন গো,
ওই নির্জ্বর-পমোদর-নিঝর বেদীতলে রূপ ভোলা শিল্পীর বাঁধা তপোবন গো।
ওগো কিম্বর কিশোরের কণ্ঠের সুর ঘিরে সব গান মুচ্ছায় তব দেহতীর্থে,
চির যোগভোলা মহাদেব সব ধ্যান ভুলে যায় সুন্দরী গৌরী গো
বুকে তব ফিরতে।
তব মস্থর গতি-তলে চঞ্চল জগতের নৃত্যের সব তাল হোল অকলঙ্ক,
ওগো তব দেহসিদ্ধুর কটিতট সৈকতে প্রেমজয়-যাত্রার বাজে জয়শঙ্খ।
তব কণ্ঠের কস্থর-মন্দির সোপানেতে সন্ধ্যাব আরতির জলে ওঠে দীপ গো,
ওই রত্নীন অধরের অঙ্কে দাঁড়াইয়া শিব তোর শিরে দেয় সিন্দুর টীপ গো।
তব বন্ধিম চাহনিতে বিদ্যুৎ চমকায় শঙ্কর ঝড় বয় ক্রোধ ভরা চক্রে।
ওগো তব অভিসম্পাত বজ্রের বজ্রনু সৃষ্টির বাজারে বহ তুমি বকে।
তব দুঃখের অন্তর বিরহের সস্তাপে অন্তরতলে যে গো অসুদ সৃষ্টি,
তব হাস্যের ধারে রসসৃষ্টির ঝঞ্ঝার তার চেয়ে বিশ্ব যে নেই সেরা রুষ্টি।
তব চিন্তের জাগরণ নিদ্রার মাঝে ওগো উন্মাদ আর সন্ধ্যা যে হয়ে আছে ময়,
তব অঙ্কের ছুটি যুগ-সন্ধির মিলনেতে শিব আর গৌরী যে হয়ে আছে লয়।
তুমি শৃংখলা ভেঙ্গে যবে হও বিশৃঙ্খল লক্ লক্ করে জিভ হাতে দোলে খড়া,
তব পা'র তলে মঙ্গল মহাদেব শঙ্কায় খাবি খায়, গজ্জায় প্রলয়ের ঝড় গো।
ওগো 'সত্যম্ শিবমের' মাল্যের শৃঙ্খলে করুণায় পুনঃ তুমি হও যবে বন্দী,
ওগো বিশ্বের ধাত্রীর সৃষ্টির পালনের সব রূপ জেগে ওঠে তব দেহ ছন্দে।
দেবি, তব দেহ সৃষ্টির উৎসব-ধ্যান-শেষে ব্রহ্মার কল্পনা হয়ে গেছে নিঃশ্ব,
তব স্বর্গের পূজা শেষে মর্তের পালা আজ, সঙ্গীত গাহে তব আজ তাই বিশ্ব।
ওগো মানবের সব পাপ পুণ্যের দেহে তব রচে দিল সঙ্কোচ মেখে দিল লজ্জা,
তব লজ্জার তলে তারা তাহাদের পাপ ঢাকি' গুটনে রাখি'

তোমা দিল মধুসজ্জা

তুমি পুরুষের দেওয়া এই লজ্জার গুটনে বহি সেই লজ্জায় রচিয়াছ স্বর্গ,
তুমি দেবতার মানবের সকলের চেয়ে বড় ঈশ্বর দেওয়া তুমি বিশ্বের বর গো
ওগো স্বর্গের প্রাঙ্গনে তোমারে যে আঁটে নাই তাই তুমি নামিয়াছ মানবের কক্ষে
তুমি নহ শুধু ভাগ্যের তোমার সিংহাসন পাতা তাই চিরদিন কবিদের বক্ষে।

স্ত্রীশিক্ষার ধারা

জোহরা বেগম

বর্তমানে নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার প্রভাব খুবই বেশী দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক মহিলাগণ পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলছে। এই 'সমান' হওয়ার মধ্যেই যত গোলমাল। ভগবান নারী সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সেই নারী যদি ভগবানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়ে সর্ব বিষয়ে পুরুষের সমান হয় তবে নারীজন্মের সার্থকতা কোথায়?

বাঙ্গালীর মেয়ের উপযুক্ত বয়সে বিয়ে হওয়া দরকার, এই বয়সে বিয়ে না হলে বাঙ্গালী সমাজের মেয়েদের বিয়ে হওয়া কঠিন। কিন্তু আধুনিক যুগে ঠিক বয়সে মেয়েদের প্রায়ই বিয়ে দেওয়া হয় না। লেখা পড়া গান বাজনা ইত্যাদি শেখাবার জন্ত মাষ্টার রাখা হয়। পরিণত বয়সে প্রত্যেক নরনারীর প্রাণে একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তারা কাউকে সঙ্গীরূপে পেতে চায়। এই ক্ষুধা মেটাবার জন্ত তারা উন্মাদ হয়ে উঠে। কিন্তু তাদের অভিভাবকগণ এতে বাধা দেন। তাদের জীবনের মধ্যে আসে মন্ত অশান্তি। এই অশান্তি নিবারণের জন্ত কেউ করে আত্মহত্যা, আর কেউ করে গৃহত্যাগ। এমন করে তারা কলঙ্কালিমা লেপে দেয় সমাজের মুখে। এসব অনর্থ ঘটে শুধু আমাদের বুদ্ধির দোষে। কারণ এখনও আমাদের সংযম শিক্ষা হয় নাই। সংযমই প্রকৃত শিক্ষা। যেদিন আমরা সংযম শিখতে পারব সেই দিনই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

আমাদের সাধারণ ঘরের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা না পেলেও চলতে পারে। আমাদের মেয়েদের আবশ্যিক কাজ শেখা ও সংসারের উন্নতি বিধান। সাধারণ লেখা পড়া শিখলেই একাজ চলতে পারে। যাতে সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব পত্র রাখা যায় ও ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া যায়, তাই যথেষ্ট। তবে অনেকে উচ্চ শিক্ষা করতে চান। এ

অবস্থায় স্কুল কলেজে পড়তে হয়। যে সব বিদ্যাশীল শিক্ষয়িত্রীগণের দ্বারা শিক্ষা দান করা হয় মেয়েদের শিক্ষা ভাল হয়। শিক্ষকদের শিক্ষিত মেয়েদের উপর অনেক সময়ই কার্যকরী হয় না। তাই সহশিক্ষা,—সহ শিক্ষার সময় এখনও এদেশে আসে। যতদিন আমাদের দেশে নৈতিক চরিত্রের পূর্ব দোষ ফিরে না আসবে ততদিন সহশিক্ষার কুফল সম্পূর্ণ হতে দূর করা সম্ভব হবে না।

আধুনিক সভ্য জগতের আবহাওয়ায় আমাদের জীবন ব্যবহার রীতি নীতি বদলে যাওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। আজ কাল শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা গুরুজন বিদেহ প্রায়ই মানতে শিখে না। ছ'পাতা ইংরেজী শিখে তৎ দেশের আচার ব্যবহার ভুলে বিদেশী আচার ব্যবহার অনুকরণ করে একেবারে খাঁটি বিলাতী হতে চায়। কিন্তু আমরা যে দেশের লোক সে দেশে গুরুজনদিগকে শ্রদ্ধা করাই প্রধান ধর্ম। গুরুভক্তির সন্মান এ দেশের মোটামুটি চিরকালই আছে। এবং আমাদেরও সে সন্মান রাখতে হবে। কিন্তু আমরা বিদেশী সভ্যতার ধর্ম গ্রহণই গ্রহণ করি, ভালর দিকে দৃষ্টিপাতও করি না।

অনেকেই মেয়েদের স্বাধীনতার জন্ত সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমাদের মেয়েদের এখনও পূর্ণ হয় নাই। কাজেই স্বাধীনতার কথা আসে নাই। তাদের সংযমী হবার এখনও অনেক দূর আছে। তারা যেদিন বুঝবে যে তাদের সংসারী হবার হবার প্রয়োজনীয়তা আছে, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে সে-দিন তারা যুগা বোধ করবে। সে দিন তারা পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে একটা ব্যবধান হতে বুঝবে; সেই দিন তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। আর যতই নারীর স্বাধীনতা বলে চোঁচাই না কেন, আমরা মনে রাখতে হবে—আমাদের দেশ পরাধীন।

মেয়েদের প্রধান শিক্ষা গুরুজনদিগকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা, সেবা করা আর সংসার ধর্ম পালন করা। যে নারী স্বহস্তে রান্না করে স্বামী পুত্র গুরুজনদিগকে খাওয়ায়—যে নারী দান ধ্যান করে, যে সংসারের সকলের সঙ্গে সরল ভাবে মিশে সংসার ধর্ম করতে পারে সেই প্রকৃত নারী; তার জন্মই সার্থক। তার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

বর্তমান কালে স্কুলে পড়ুয়া মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ মোটেই জানে না। সময়ে একটা ভাল-ভাত রান্না করে কারও পাতে পর্য্যন্ত দিতে পারে না। এমন অনেক মেয়ে আছে যারা কারও সঙ্গে ভদ্র ভাবে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারে না। স্কুলে শুধু বই মুখস্থ বিদ্যা শেখান হয়। আর শেখান হয় ক্যাশান। যদিও বা কোন কোন স্কুলে রান্না শিখাবার বন্দোবস্ত আছে তা মিষ্টি তৈয়ারী ছাড়া অল্প কিছুই নয়। প্রত্যেক স্কুলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘর কন্নার কাজও শিখান উচিত। বাড়ীতেও মেয়েদেরকে সংসার পরিচালনার জ্ঞান দান করা উচিত।

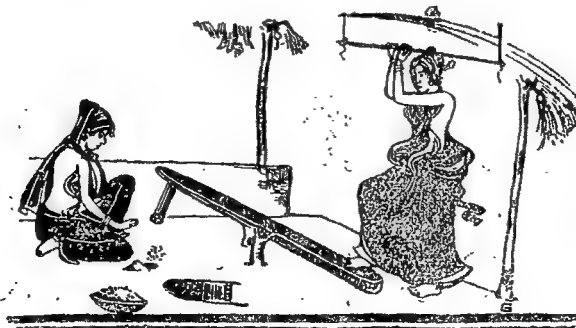
যে মেয়ের শুধু ইউনিভার্সিটির যথেষ্ট ডিগ্রি আছে অথচ সে সংসারের কোন কাজ কর্তব্য করতে পারে না বা স্বামী, পুত্র, গুরুজনদিগকে সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে না তার নারী-জন্ম সার্থক নয়। সংসারে তার মা হ'বার প্রয়োজন আছে, তার স্বামী পুত্রের সেবা কুরবার প্রয়োজন আছে এবং সে যদি এসব করতে পারে তবেই তার নারীজীবন সার্থক হয়।

নারীর গুণ কোমল। নারীর হৃদয় গঠিত দয়া মায়া, স্নেহ, মমতা, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি দিয়ে। সেই নারী

যদি পুরুষের সমান তালে পা ফেলে চলতে গিয়ে নিজের ধর্ম কর্তব্য ভুলে যায় তবে নারী আজ পর্য্যন্তও যে স্নেহময়ী জননীর আসনে অধিষ্ঠিতা সেখান হতে ছিটকে পড়বে। নারী জাতি হবে স্বনিত; মায়ের জাত হয়ে যাবে লুপ্ত, বিধাতার সৃষ্টি হয়ে যাবে বিশৃঙ্খল।

মেয়েদের জীবনের পথ শেওলার গায় পিচ্ছিল। এ পথে সবাই চলেছে। কিন্তু এই পথ ধীরমহর গতিতে পার হতে হয়। আবার হয়ত কেও পা পিছলে কাঁত হয়ে পড়ে যায়। যে পড়ে যায় সে যদি পড়েই থাকে, উঠতে চেষ্টা না করে তবে সে পড়ে থাকে সমাজের বাইরে। জীবনপথে চলতে হলে ধীরে ধীরে চলতে হয়। একটা স্থির লক্ষ্য রেখে এগুতে হয়। এই চলার পথে ধৈর্য ও সংযম পথ প্রদর্শক; যে পড়ে যায় সে পথ পার হবার জন্য হয়ত ঠিক লক্ষ্য রেখেই চলে, কিন্তু তার পথের মাঝে কাঁটা এসে দাঁড়ায় বা তার মন নানা দিকে ছুটে যেতে চায়। সে অসংযমী। তাই পা পিছলে পড়ে যায়। মানুষের একটা মন, একদিকেই দেওয়া যায়, নানা দিকে নিয়োগ ফলপ্রসূ নয়।

চিরদিন পুরুষ সমাজের কর্তা। পুরুষ কর্তোর, নারী কোমল। ছোট ছেলে দোষ করলে মাতাপিতার নিকট ক্ষমা পায়, কিন্তু সমাজ ক্ষমা করে না। সে শাস্তিই দিতে জানে। তবে সমাজ যদি না থাকত তবে পৃথিবীর মধ্যে শৃঙ্খলা থাকত না। বিধাতার সৃষ্টি এলোমেলো হয়ে যেত, তাই সমাজের প্রয়োজন। সমাজে নারী পুরুষের অধীন। মানুষ সমাজের জন্ত নয়, সমাজ মানুষের জন্ত। নব্য সভ্যতার মোহে সমাজ আর কেউ মানতে চায় না। এভাবে বেশি দিন থাকলে সমাজ হয়ত লুপ্ত হয়ে যাবে।



সংবাদপত্রে সে যুগের কথা

• শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম, এ, তত্ত্বব্রাহ্মকর

[বঙ্গলক্ষ্মীর বর্তমান সংখ্যায় ১২৬৪ বঙ্গাব্দের সংবাদ

প্রভাকর হইতে কয়েকটি তথ্য সংকলিত হইল। প্রথমটিতে দীনবন্ধু গুপ্ত প্রণীত “অজেন্দুমতী চরিত” গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। অপর দুইটিতে শিক্ষাব্রতী রিচার্ডসন সাহেব সম্বন্ধে এদেশবাসীদের মনোভাব জ্ঞাত হওয়া যাইবে। উক্ত সাহেবের বিলাত গমনের প্রাক্কালে এদেশীয় শিক্ষিত জনসাধারণ তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাহাকে “রজতময় আহারীয় দ্রব্যাদির আধার অর্থাৎ ইংরাজ-গণের ব্যবহার যোগ্য তৈজসাদি প্রদান করণের অভিপ্রায়” করিয়াছিলেন। হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রেরাও সভা করিয়া রিচার্ডসন সাহেবের প্রতি তাহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।]

[মঙ্গলবার ১০ বৈশাখ ১২৬৪ সাল

ইং ২১ এপ্রিল ১৮৫৭ সাল]

“শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু গুপ্ত প্রণীত” “অজেন্দুমতীচরিত্র” নামক এক পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে আমরা তাহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠান্তর পরম পরিতুষ্ট হইলাম। সন্নিধান গ্রন্থকর্তা সংস্কৃত রঘুবংশের আদর্শানুসারে অজরাজ ও তৎপত্নী ইন্দুমতীর ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, যদিও ইহা সংস্কৃত পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে এবং সংস্কৃত শ্লোকের গ্রায় স্বরস নহে তথাচ স্থললিত সরল সাধু ভাষায় উক্ত পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। সংস্কৃতের লালিত্য ও রস ভাষান্তরে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে ভেলা ঘারা সমুদ্র পারের চেষ্টার গ্রায় হাস্যাত্মক হইতেন। অপিচ উল্লিখিত পুস্তকখানি ৭২ পৃষ্ঠায় উত্তম অক্ষরে জ্ঞানব্রাহ্মকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ১০ আনা, গ্রহনেক্ষ মহাশয়েরা প্রথম চন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের শোভাবাজারস্থ ২১ নম্বর ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। পাঠক বর্গের বিদিতার্থ পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

অজেন্দুমতীচরিত।

পুরাকালে সূর্য্যবংশে রঘু নামে অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন প্রবল বল শালী এক ভূপাল ছিলেন। যিনি নিজ ভূজবলে ও বিক্রমে ক্রমে ক্রমে অশেষ দিগ্‌দেশ জয় করিয়া সমাগত ধরায় স্বকীয় প্রভুত্ব প্রকাশ পূর্বক বিশ্বজিন্ময় আত্মায়েণ যজ্ঞ করিয়া সর্বস্ব দক্ষিণায় ও করিয়াছিলেন। পরে কিয়দ্দিন অতীত হইলে কোৎসনামা একজন ব্রাহ্মণ-কুমার গুরুদক্ষিণার্থী হইয়া বদান্তবর রাজ্ঞপ্রবর রঘুরাজার নিকটে আগমন করিলেন। কিন্তু ভূপতি তৎকালে নিঃস্বস্ত বশত সমাগত ব্রাহ্মণের সভাজনজগ্ম যুগ্ময় পাত্রে পাদ্যার্থ্য প্রদান করিলেন। শিষ্য যুগ্ময় পাত্র নিরীক্ষণ করিয়া এবং নিধনতার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনে মনে কল্পন করিলেন, “এই জন হইতে মদীয় প্রার্থনা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই”, পরে রাজাকে সম্বোধন করিয় বলিলেন, রাজেন্দ্র! আপনার মঙ্গল হউক, স্বরপীত চন্দ্রমার কলাক্ষয় ষাদৃশ স্নানীয় ও প্রশংসনীয় ত্বদীয় নির্দীনস্ব ও তাদৃশ তাহার সংশয় মাত্র নাই। যাহা হউক চাতক্য-কুল নিজল জলধরের নিকট কখনই জল প্রার্থনা করে না, আমি কার্য্য সিদ্ধি জন্ত এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া স্থানান্তরে বদান্তান্তরের সমীপে সমুপস্থিত হই। অনন্তর বিবেকশীল স্থশীল রাজা বিবেচনা করিলেন, “প্রার্থীজন রঘু সমীপে নিক্রম হইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, এতাদৃশ দুঃসহ অপবাদ সম্ব করা মরণাপেক্ষা দুঃখদ, কি বা করি সমুদয় দিগ্‌বলয় জয় করিয়া সমস্ত ধন আহরণ পূর্বক বিশ্বজিং যজ্ঞ করিয়াছি; এক্ষণে কপর্দক মাত্রও হস্তে নাই। কিয়ৎক্ষণ স্থপ্তমীন হ্রদের গ্রায় নিস্তদ্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা করিলেন, যাহা হউক এক্ষণে ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে জয় জগ্ম অলকাপুরীতে গমন করাই গ্রাঘ্য কার্য্য হইতেছে, অনন্তর ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, হে অর্থিন! আপনার প্রার্থনা অচিরেই পূর্ণ করিব,

কিন্তু মদীয় আবাস দুই তিন দিবস বাস করুন ; বলিয়া প্রয়াণে সুসজ্জিত হইতেছেন এমত সময় কোষরক্ষক কোন পুরুষ সস্ত্রমের সহিত আগমন পুরসের নিবেদন করিল, মহারাজ ! আকাশমার্গ হইতে কোষগৃহ মধ্যে কাঞ্চনময়ী বৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, এক্ষণে ইতি কর্তব্য অবধারণে পূজ্যপাদ প্রমাণ ।”

শনিবার ১৪ বৈশাখ ১২৬৪ সাল

ইং ২৫ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল

“বিজ্ঞবর সূকবি স্থলেখক শ্রীযুত কাণ্টেন রিচার্ডসন সাহেব এতদেশীয় ব্যক্তিদিগের ইংরাজী বিদ্যালয়শীলন বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে এতদেশীয় লোকেরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশার্থ তাঁহাকে রজতময় আহারীর জব্যাদির আধার অর্থাৎ ইংরাজগণের ব্যবহারযোগ্য তৈজসাদি প্রদান করণের অভিপ্রায় করিয়াছেন, এবং তাঁরা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। কাণ্টেন রিচার্ডসন সাহেব বিবিধ বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হইয়া ছাত্রবৃন্দকে সত্বপদেশ প্রদানপূর্বক এ দেশের যে পরমোপকার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে আমারদিগকে অকৃতজ্ঞ

হইতে হয়, তাঁহার শ্রায় স্মরণ্য ও সূকবি এদেশে বোধ হয় অল্প আসিয়াছেন, তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদি পাঠে যে কেবল এদেশের লোকেরা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এমত নহে; স্বজাতি সমাজেও তাঁহার উচ্চ সম্মান বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং তিনি স্বদেশেও বিপুল স্মৃতি লাভ করিয়াছেন. এক্ষণে তিনি স্বদেশের শীতল সমীরণ সেবন পূর্বক স্বস্থ হইয়া এদেশে পুনর্বার আগমন করতঃ আপনার অসীম বিদ্যাভাণ্ডার হইতে অকাতরে বিদ্যাধন বিতরণ পুরসের এদেশে জ্ঞান সূর্য্যের প্রভা উন্মীলন করুন।”

গুরুবার ১২ই বৈশাখ ১২৬৪ সাল

ইং ২৩ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল

“হিন্দু মেট্রোপলিটন কালেক্টর প্রধান প্রধান ছাত্রেরা গত দিবস উক্ত কালেক্স বাটীতে এক সভা করিয়া কাণ্টেন ডেবিড লেটের রিচার্ডসন সাহেবকে এক এড্রেস অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা সূচক বক্তৃতা ও স্মরণচিহ্ন প্রকাশক এক উৎকৃষ্ট ঘড়ি ও এক কলমদান দান করিয়াছেন, ঐ সভায় মেট্রোপলিটন কালেক্টর পুষ্টিবর্দ্ধক মহাশয়েরা এবং নগরীয় অন্যান্য অনেক ধনি মহাশয়েরা সমাগত হইয়াছিলেন।”

গান

কাজি আবুল কাসেম

সেদিন যে গান গেয়েছিলাম

সুন্দর প্রভাতে,

আজকে সে গান মিলিয়ে গেছে

অস্ত-রবির সাথে।

আজকে আমার বীণার তারে

সেই সাধা স্বর বাজে নারে,

গানের পাখী মুছে পড়ে

স্বরের বেদনাতে।

আজ পৃথিবী হারিয়ে গেছে অন্ধকারে,

নিরুপায়-মোর ভীকু করাধাত বন্ধ দ্বারে,

তবু সেই প্রভাতের হাসি

আমি আজো ভালোবাসি

যখন আমার পড়ে মনে

তোমার মনের সাথে ॥

সাধনা

শ্রীমতীমত মজুমদার

(১)

“ইভা, ইভা-মা আমার, একবার শুনে যাতো এদিকে।”

মাতার আহ্বান শুনিয়া কণ্ঠা তাঁহার নিকট আসিয়া
ড়াইল। ইভা অষ্টাদশী বালিকা ভরা যৌবনে তাহার
সর্বদা কানায় কানায় পরিপূর্ণ। দেহে বেশভূষার
পারিপাট্য নাই, দেহের কোনস্থানে একখানি গহনাও
নাই। কিন্তু উজ্জল সিন্দুরবিন্দু সীমন্তদেশে শোভা
করিয়া আছে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইভা, তোর এইরকম বেশ
দেখে কিন্তু আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়; কতদিন আর
এরকমভাবে থাকবি মা; এত অল্প বয়সে এরকম তো
কেউ করে না।”

ইভা বলিল, “কেন মা! এতে তো কোন ক্ষতি
নাই। আমার প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হোত কিন্তু
আজকাল তা সয়ে গিয়েছে। এই রকমভাবে সংসারে
নিম্পৃহ থেকে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তো খুব ভাল বলেই
মনে করি।”

“দেখ, তোর শুকনো মুখ, উপবাসে শীর্ণ দেহ দেখলে
আমার মনে যে কি হয় তা কেমন করে বলব। কেবলই
মনে হয় যে আমাদের অবিবেচনাতেই তোর এ দুর্গতি।
আমরা যদি তখন সব জেনেগুনে কাজ করতাম তাহলে
তোর এ দশা হোত না।”

“মা কেন নিজেকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছ? এ
সকলই আমার পূর্বজন্মের পাপের ফল। কিন্তু এই ধর্ম-
আলোচনায় আমি মনে শান্তি পাই তখন বুঝা জীবন
কাটাতে পারি না।”

“আচ্ছা, তাবলে এতটা বাড়াবাড়ি করা কি তোর
সাজে? এই সকাল থেকে স্নান করছিস তো করছিসই,
বোধ হয় সবশুদ্ধ পাঁচ ছয়বার স্নান করলি। এরকম

করলে শরীর কদিন টিকবে? আজকাল তো মাছ খাও
ছেড়েই দিয়েছিস।”

“ওতে আমার কিছু হবে না মা। জান মা, আমার
কি মনে হয়? এই কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে থাকতে মাঝে
মাঝে আশার আলো দেখতে পাই। মনে হয় যে তিনি
আছেন, এই পৃথিবীরই কোনও স্থানে, এই মাছুষের মধ্যেই
কোথাও আপনাদের স্থান তিনি করে নিয়েছেন। আমি
এ সাধনা ব্যর্থ যাবেনা। আমি আমার পূর্বজন্মের পাপের
প্রায়শ্চিত্ত করছি। প্রায়শ্চিত্ত অস্তে নিশ্চয়ই তাঁর দেখা
পাব।”

মা বলিলেন, “প্রার্থনা করি, তাই যেন হয়, ভগবান
তোর মঙ্গল করুন; আমাদেরও মনে তাহলে শান্তি হয়।
কত আশা করেই যে তোর বিয়ে দিলাম, কিন্তু একদিনে
জগৎ সুখী হতে পারলাম না। ভগবান যেন তোকে
শুধু ব্যর্থতার বোঝা বইবার জন্তেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর
ইচ্ছে হলে এই দুঃখের বোঝা একদিন হালকা হলেও হতে
পারে।”

“সেই আশায়ই তো আমি ঈশ্বরের কাছে নিজেবে
নিঃশেষে উৎসর্গ করেছি। সারাদিন ধরে তাঁর কাছে
আমি ব্যাকুল মনের বাসনা জানাই।”

“এতদিন ধরে তো আমাদের চেষ্টার কোনও ফল
হয় নাই। যত রাজ্যের খবরের কাগজে লেখা হল, কোনও
সন্ধানই তো পাওয়া গেল না। তখন তোর তেরো বছর
বয়স, আর আজ তুই আঠার বছরের হয়েছিস। কি দুঃখ
নিয়ই যে সে চলে গেল, তাও তো জানতে পারলাম না।
সেই জন্ম সকল কাজকর্মের মধ্যেও একটা কাঁটা মাঝে মাঝে
বুকের মধ্যে বিধতে থাকে।”

“তাইতো আমি এইপথ বেছে নিয়েছি, মা। এ পথে
এলে সকল যন্ত্রনাই ভুলে থাকা যায়। তাঁর কথা ভুলে

থাকবার এইটাই সবচেয়ে বড় উপায়। আমি এপথ ত্যাগ করলে আর কি নিয়ে থাকব?”

মা অশ্রুমাচন করিয়া বলিলেন, “কিন্তু আমাদের অবিবেচনার জন্ত তুমি কষ্ট করবি তা তো চোখের সামনে দেখতে পারিনে। মাঝে মাঝে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।”

“তোমাদের অবিবেচনার কথা মনে করে কেন শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ? এ ভগবানের বিধান,—মাথা পেতে গ্রহণ না করে উপায় নেই। এর অন্তরালে নিশ্চয়ই মঙ্গলের বার্তা নিহিত আছে।”

মা বলিলেন, “তুমি যদি হেসে খেলে বেড়াতিস, তাহলে আমার এতটা দুঃখ হোত না—কিন্তু তোর মনের সমস্ত উৎসাহ চলে গিয়েছে দেখেই আমার কষ্ট হয়।”

ইভা বলিল, “না, মা, আমি মনে মনে খুব সুখেই থাকি। যাও মা, আমার এখন চণ্ডী পড়বার সময় হয়ে এল।”

ইভা চলিয়া গেল।

মাতার মনে পড়িল সেই পাচবৎসর পূর্বের একটি দিন। মনে কত আশা, কত আগ্রহ। আনন্দে অন্তর পরিপূর্ণ। মনের মধ্যে কি একটা কল্পনার জাল বুনিতে তিনি রত ছিলেন। মহা তাহা নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্ন হইয়া গেল। স্বথের আশা ফুরাইল, দীপালীর আলো নিবিয়া গেল—নামিয়া আসিল ভবিষ্যতের নিরাশা, পলে পলে অতীতের আনন্দকে ব্যঙ্গ করিতে। ক্ষণিক মিলনের পরে বিচ্ছেদ ঘনাইয়া আসিল।

কর্তা হরপ্রসন্ন বাবু ঘরের মধ্যে আসিলেন। “দেখছ তো মেয়ের কাণ্ড কারখানা। শরীরের ওপর এত অত্যাচার করলে কদিন বাঁচবে?”

হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, “ও যা ভালবাসে তাই করুক না কেন? ওই যদি ওর নিয়ে থাকতে ভাল লাগে তাহলে ক্ষতি কি? ও ভগবানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।”

গৃহিণী বলিলেন, “কিন্তু দিন দিন যে ও মনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে! ওকে দেখলেই মনে হয় যে ওর মনে কোন সুখ নেই। সব সময়েই দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকা তো অসম্ভব!”

হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, “দেখ, এক কাজ করলে হয়। ওকে কোনখানে বেড়াতে নিয়ে গেলে হয় না? তাতে শরীরটাও একটু সারবে, মনটাও প্রফুল্ল হবে।”

গৃহিণী বলিলেন, “তাই ভাল, নইলে আমি আর এ সহ্য করতে পারছি না। তুমিতো বাইরে সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাক, আমাকে সব সময়েই ওর স্নান মুখখানা দেখতে হয়।”

“তাহলে তাই করা যাক। একবার বাইরে বেড়িয়ে আসলে ভালই হবে। এবার পুরীতে যাওয়া যাক। সেখানে জগন্নাথ দর্শন হবে—আর কিছুদিন থাকলে শরীরও ভাল হবে। কিছুদিনের ছুটি নেবার চেষ্টা করি। ওর মতটা একবার জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও তো।”

গৃহিণী বলিলেন, “সে আর জিজ্ঞাসা করার কোন দরকার নেই। ওর নিশ্চয়ই মত হবে। জগন্নাথ দর্শন হবে শুনলে ও আনন্দে নেচে উঠবে। তাহলে তাই তুমি কর।”

(২)

হরপ্রসন্ন বাবু দেশভ্রমণ উপলক্ষে পুরীতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী এবং কন্যা ইভা। সমুদ্র হইতে নিকটে একটা সুন্দর বাড়ী ভাড়া পাওয়া গিয়াছে। সেই বাড়ীতে বসিয়াই সমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীটি অল্প পরিসরের মধ্যে নিশ্চিত, কিন্তু তার সম্মুখের দিকে নানা ফুলের সমাবেশে স্থানটি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। এই ফুলগাছগুলির প্রতি অত্যধিক বহু লওয়া হয়। দরজার দুইপাশে নিপুণ শিল্পীর খোদিত দুইটি অপূর্ণ চিত্র বাড়ীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

বাড়ীটির নাম “শান্তি-নিবাস”। হরপ্রসন্ন বাবু এই বাড়ীতে আসিয়া প্রথমেই উপলব্ধি করিলেন যে গৃহের অধিকারীর নামকরণ করিবার সার্থকতা আছে। এইরূপ বাড়ীতেই তো শান্তির আসন স্থাপিত থাকে। এই সঙ্গে তিনি ভাবিয়া অশ্রু হইলেন যে এখানে তাঁহার কন্যা নিশ্চয়ই শান্তির আশ্রয়ে বাস করিয়া কথঞ্চিৎ সুখলাভ করিবে। সম্মুখেই অসীম সমুদ্র মাসের পর মাস তরঙ্গমালা লইয়া খেলা করিতেছে। তাহার সেই উন্নত গর্জন জয়-ছঙ্কারের মত শুনা যাইতেছে। সমুদ্রের স্বদূর বিস্তৃত

জলরাশি মানুষের মনে এক অসীমের চিন্তা আনিয়া দেয়; মানুষকে তন্ময় করিয়া ফেলে। এইখানে বসিয়া সমুদ্রের উন্মাদমূর্তি দেখিতে দেখিতে ইভা কিছুক্ষণের জন্ত অতীত ভুলিয়া যাইতে পারে।

হরপ্রসন্ন বাবু স্থির করিলেন, এই ‘শান্তি-নিবাসে শান্তির নীড় রচনা করিয়া একমাস থাকিবেন। এই একমাসে কন্ঠার মনের এবং স্বাস্থ্যের নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে।

এখানে আসিয়া ইভা প্রায় সমস্ত সময় তীর্থ দর্শন এবং দেব পূজায় ব্যাপ্ত থাকে। সকাল বেলায় স্নান সমাপন করিয়া পূজাদির পরে জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসে। এই কয়দিনের মধ্যে সে চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার প্রভৃতি প্রায় সমস্ত স্থান দর্শন শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। দেবদেবী পূজার জন্ত তাহার আগ্রহ বাড়িয়া গিয়াছে; পূজার জন্ত পুষ্পের অভাব নাই। বাড়ীর সম্মুখে বাগানে অফুরন্ত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বৈকালিক আহার সমাপন হইলে সে সমুদ্রের ধারে ভ্রমণ করে; এই সমুদ্র দর্শনেই তাহার আনন্দ। সহরের সারাদিন ক্যাপী কৰ্ম্মকোলাহলের নিকট হইতে মুক্তি পাইয়া ইভা হাফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

গৃহিণী বলিলেন, “এখানে এসে খুবই ভাল হয়েছে। দেবদর্শনে ও অনেকটা শান্তি পায়। ও না বলেও আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে ওর মনের মধ্যে একটা বেদনা ওকে অনবরত খোঁচা দিচ্ছে। ও ভাবত আমি বুঝতে পারি না, সেই জন্ত সর্বদা সেই বেদনা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতো। এখানে এসে ও যেন দুঃখটাকে অনেকটা বেড়ে ফেলতে পেরেছে বলে মনে হয়।”

হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, “হ্যাঁ, এ যে সত্য কথা, তা তো ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এইতো এক সপ্তাহ হল এখানে আসা হয়েছে, আরো তিন সপ্তাহ থাকব। এই সময়টা দেখবে ওর মনে কতটা পরিবর্তন এনে দেবে।”

গৃহিণী বলিলেন, “আহা, ভগবান করুন, তাই যেন হয়। ওকে ভাল দেখলে আমিও সুখী হই। এই কয়দিনে ওর মনটা একটু ভাল হয়েছে দেখে আমিও যেন শান্তি পাচ্ছি।”

হরপ্রসন্ন বাবু বেড়াইবার জন্ত ঘরের বাহিরে আসিলেন;

স্বর্ষের তৈনিক কৰ্ম্মতালিকা তখন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে তাই সে পশ্চিমের কোলে চলিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমা-কাশে যেন আগুন জলিয়া উঠিয়াছে। উন্মুক্ত আকাশপটে সেই বর্ণবৈচিত্র্য অথগুতভাবে বিরাজ করিতেছে। সমুদ্রতীরে তখন স্বাস্থ্যলাভার্থী অনেক ভদ্রলোক চলাফেরা করিতে ব্যস্ত।

তিথি একাদশী। ইভা একাদশীর দিন ফলমূল ছাড়া আর কিছুই আহার করে না। আজ ভোরে উঠিয়া, স্নান শেষ করিবার পরে তাহার পূজা অর্চনা সমাপ্ত হইয়াছে। বেলা সাড়ে আটটার সময় পিতার সহিত সে জগন্নাথদেব সন্দর্শনে চলিল। এখান হইতে মন্দির প্রায় দুই মাইল।

এতদিন হইল ইভা পুরীতে আসিয়াছে, একদিনের জন্তও জগন্নাথ দর্শন বাদ দেয় নাই। প্রত্যেক দিন মন্দিরে যাইয়া দেবদর্শন করিয়া আপনার হৃদয়ের বাসনা তাঁহাকে জানাইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরের নিদারুণ মনোব্যথা সে দেবতার নিকট ব্যক্ত করিয়াছে; ঈশ্বরের কাছে দুঃখের কাহিনী জানাইয়া তাহার এতদিনের সঞ্চিত দুঃখের ভার লঘু করিয়াছে। জগন্নাথ দেবই তাহার একমাত্র সাহুনা।

দেব দর্শন করিয়া ফিরিতে এগারটা বাজিয়া গেল। পথে আসিতে আসিতে হঠাৎ কিসের সোরগোল শুনা গেল। চারিদিকে লোকজন ছুটাছুটি করিতেছে, দূরে খুব একটা গোলমাল হইতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর ‘আগুন’ ‘আগুন’ শব্দ শুনা গেল।

একটি বড় খড়ের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। হরপ্রসন্ন বাবু কন্ঠার সহিত সেই বাড়ীর নিকটে আসিয়া পড়িলেন। আগুন নিবাইবার জন্ত সকলে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। ক্রমে ক্রমে আগুন চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। গৃহের কর্তা বিহ্বল হইয়া পাশে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি যেন ব্যাপারটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ঘরের মহিলারা বসিয়া নিফল ক্রন্দনে রত।

সহসা গৃহকর্তী চোঁচাইয়া উঠিলেন, “আমার ছেলে,— আমার ছোটছেলে যে ঘরে শুয়ে আছে তার কি হবে? গৃহকর্তা ইহা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

তখন সে ঘরে কে প্রবেশ করিবে? অগ্নি তখন ক্রমশই শিথিল হইতেছে। তিনি বুঝিলেন, পুত্রের রক্ষার কোন উপায়ই নাই। পাশের ভদ্রলোকেরা সমবেদনার স্বরে ‘আহা’, ‘আহা’ করিয়া উঠিলেন।

একজন যুবক একধারে দাঁড়াইয়া ছিল। এই কথা শুনিয়া সে মুহূর্ত্তে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার পরণের কাপড় মালকোঁচা দিয়া পরিল, আর, জামার আন্তরীণ গুটাইয়া ফেলিল। তারপর পার্শ্ববর্তী দর্শকদিগকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সমবেত ভদ্রলোকেরা ‘হায়’ ‘হায়’ করিতে লাগিল; তাহারা নিশ্চিত জানিল যে এই হটকারী যুবকের মৃত্যু অবধারিত।

সকলেই কণ্ঠচিহ্নে অপেক্ষা করিতে লাগিল। হরপ্রসন্নবাবু এই যুবকের সংসাহস দেখিয়া মনে মনে যুবককে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইভা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মিনিট তিনেক পরে যুবক অগ্নিশিখা হইতে বাহির হইয়া আসিল—হস্তে একটি শিশু। যুবক শিশুটিকে মাতার হস্তে প্রদান করিল,—তখন সে হাঁফাইতেছে। জামার দুই এক স্থান অগ্নিতে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। ঘরের আগুন তখন দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। চতুর্দিকে যুবকটির উদ্দেশে দৃষ্টি পড়িয়া গেল।

এই সাহসী যুবাকে দেখিয়া হরপ্রসন্নবাবুর হঠাৎ কি মনে

পড়িয়া গেল। অনেকদিন পূর্বেরকার ঘটনা স্মৃতিপথে আসিল। এখন তো সে অনেক বড় হইয়াছে, তাই বোধ হয় এই পরিবর্তন। না কি তাঁহারই ভুল হইয়াছে? সহসা যুবকের হস্তে একটা কাটা দাগ নজরে পড়িল। তাহা হইলে তো সত্যই তিনি চিনিতে ভুল করেন নাই।

হরপ্রসন্ন বাবু যুবককে ডাকিলেন। যুবক আসিয়া নমস্কার করিল। হরপ্রসন্ন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ বাবা, তোমার নাম জীমুতবাহন নয়?”

যুবক বলিল, “হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো এর আগে দেখেছি বলে মনে হয় না।”

হরপ্রসন্নবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বাবার নাম দর্পনারায়ণ নয়?”

যুবক অবাক হইয়া গেল। তখন হরপ্রসন্নবাবু বলিলেন, “দেখতো, আমাকে চিন্তে পারো কিনা।”

কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিবার পরে যুবক আপন খণ্ডরকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। হরপ্রসন্নবাবু বলিলেন, “চল বাবা, ঘরে চল। এ রকমভাবে—নিরুদ্দেশ হয়ে কি থাকতে আছে?”

হরপ্রসন্নবাবু জামাতাকে লইয়া গৃহে আসিলেন। ঘরে আসিয়া বলিলেন, “ওগো, এই যে তোমার মা-লক্ষ্মীর সাধনায় আজ হারানো রত্ন ফিরে পেয়েছি; সেই সদ্বে তার মহত্বেরও পরিচয় পেয়েছি। আমাদের পুরীতে আসা সার্থক।”

গৃহিণীর চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল।



লক্ষ্মীর বাঁপি

হাত-পা থাকলেই মানুষ হয় না। মানুষ হ'তে হ'লে চাই কৃষ্টি সাধনা, কলাচার; আর তা'র সঙ্গে চাই উদারতা, ঐকান্তিকতা, স্নেহ-প্রীতিপ্রেম। সেবা ধর্মই মানুষের ধর্ম। হিংসাভাব পোষণ করা পশু-ধর্ম। মানুষ জন্ম গ্রহণ ক'রে পশুধর্মী হ'তে দেখা যাচ্ছে অনেককে একালে; অথচ মানুষ এবং ভদ্র ব'লে পরিচিত তা'রা মানবসমাজে। সমাজের সর্বনাশ হচ্ছে এই সকল পশুধর্মীর জন্ত। মানুষ-সমাজে তা'দের স্থান হওয়া উচিত নয় কোনো মতেই। মানুষ্যামধারী এমন কয়েকটি জীবের কাহিনী আমাদের কাণে পৌঁছেছে। নারীর প্রতি অত্যাচার করা তা'দের রোগে দাঁড়িয়েছে। সে রোগ আপনি সারে ভালই; না সারে, লাঠ্যোষধির প্রয়োজন।

পণ্ডিত শ্রীচাক্রকৃষ্ণ তর্কতীর্থ দর্শনাচার্যের সম্পাদনায় ভারতীয় শাস্ত্রপরিষদের মুখপত্র “বাসুদেবের” ২য় বর্ষের ১০ম সংখ্যা আমরা পেয়েছি এবং যত্ন সহকারেই পাঠ করেছি। প্রবন্ধগোঁরবে ‘বাসুদেব’ সমৃদ্ধ। কবিতার মধ্যে ‘সোনা মাটা, মাটি সোনা’ বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাবার মত সামগ্রী, শ্রীমতী অনিলা দেবীর সৌন্দর্য-জ্ঞান সৌন্দর্য প্রিয়দের উপভোগ্য। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের “শ্রীশ্রী নাম সাধনা” সাধকের সিদ্ধি-পথ সরল করে। শাস্ত্র-পরিষদের মুখপত্রে “বার্ষপু্রে সাহিত্য-সম্মেলন ও শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার” উপ-যোগীতা আমরা কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। সে যাই হোক, আমরা “বাসুদেবের” শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। “বাসুদেবের” বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র—প্রাপ্তিস্থান ৮ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

জার্মানীর ভূতপূর্ব কাইজার দারুণ অর্থকষ্টে পড়েছেন শুনে অনেকেই শিহরিত হয়েছেন। হরিশ্চন্দ্র, নল-দময়ন্তী,

শ্রীবৎস-চিন্তা প্রভৃতির কথায় যে দেশ মুখরিত, সে দেশে অমন শিহরণ শোভন নয়। কমলা চিরদিনই লোলা—অর্থাৎ চঞ্চলা। ওর আবার কথা কি? “খোদা দেনে ওয়াল” গান গাইবার তেমন লোক নাই কাইজারের কাছে, থাকলে, দারিদ্র্যেও তিনি আনন্দ পেতেন, আশার রঙ্গিন কাছে সারা জগৎটাকে তিনি দেখতে পারতেন। হেরু হিটলার ত খুব কুট রাজনীতিজ্ঞ। কাইজারকে তিনি কোন্ চশ্মায় দেখছেন? ড্রপিং দি পাইলটের স্থিতি সারা জগৎ এখনো ভুলে নাই। কর্মক্ষেত্রে বিশ্বাসী হ'বার সময় এসেছে বিভাঙিত কাইজারের। কিন্তু সে বিশ্বাস তাঁ'র হবে কি? যদি হয়, অনেকটা শাস্তি পাবেন অতীতের মদদপী সন্ডাট।

একটা রব উঠেছে ভারতে রেল-বিস্তারের জন্ত সারা দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ; আর তা'র ফলে কোটা কোটা লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাণ্টা জবাব হয়ত হ'বে— কেন, ইউরোপ, আমেরিকায় রেল-বিস্তারের আর সীমা নাই; সেখানে ম্যালেরিয়া-ব্রাফসী বদন ব্যাদান করেনা কেন? এ “কেন”র উত্তরে যদি কেহ বলেন—ও সকল মহাদেশে যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রেল-পথ প্রস্তুত হয়, জল-নিকাশের পথ থাকে, এদেশে তেমনটি হয় না; তবে তার উত্তর কি? বৃষ্টির উপদ্রবও এখানে অল্প নয়। জল-প্লাবনও তাই। এক্ষেত্রে এদেশের রেল-কর্তৃপক্ষকে আংশিকভাবে দায়ী করা খুব চলে। সে দায়ী-ত্বের জন্ত খেসারত দাবী করা বোধ হয় অসম্ভব নয়। রেল-কোম্পানীর আয় বিপুল। সে আয় থেকে আইন বলে খেসারত আদায় হ'লে সেটা ম্যালেরিয়া-রোগাক্রান্তদের পাওনা। পাওনা পেলে রোগী রোগিণীগণ খেয়ে বাঁচে। ভাল আহার জুটলে ও সকল রোগ আর আক্রমণ করুতে পারে না যে-সেটা খুব খাঁটি কথা।

অগ্রগতির পথে বাঙ্গালী সে কেমন পেছিয়ে পড়ছে, ঘটনা ও অবস্থাতেই তা' প্রকাশ। বাঙ্গালীই ছিল এক দিন সকল বিষয়ে অগ্রণী। সেই বাঙ্গালী আজ কোন্ পথে সকলের পশ্চাতে পড়ে যাচ্ছে, সে কথা কে বলবে! কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঋষির জ্ঞান নিয়ে জাতি-গঠনের প্রবল চেষ্টা করছেন “শান্তি নিকেতনের” সিদ্ধাসনে ব'সে। যা' ভেঙ্গেছে তা' হয়ত তাঁ'র এবং আরো কয়েকজন মনীষির প্রাণপাত পরিশ্রম ও চেষ্টায় গ'ড়ে উঠতে পারে অনাগত কালে। নিশ্বাসে যে বিশ্বাস নাই, এই হয়েছে মুস্কিল। মন্ত্র-দ্রষ্টাদের সুদীর্ঘ জীবনলাভ হোক, এই আমাদের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা।

যুদ্ধ-ভীতি সারা জগতের নরনারীকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সে ভয় ভারতেও অল্প নয়। কিন্তু পৃথিবীর কুরুক্ষেত্র-সমর সহজে বাধ্বে ব'লে মনে হয় না। তবে বাধ্বে বাধা নাই। স্বার্থ-সংঘাতে না হ'তে পারে কি? যুদ্ধই বাধে যদি, ভারতের কর্তব্য কি—ভারতবাসীর সেটা এখন থেকেই স্থির করা উচিত। ভারত-বাসীর সহায়তা রাজ-শক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলতে পারলে ভারতবাসী লাভবান হ'বে বলে অনেক নীতিজ্ঞের বিশ্বাস ও ধারণা। বিপরীত ধারণাও যে নাই, এ কথা বলা চলে না। ভারতের অসহায় নরনারী সম্বন্ধ হলে এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হ'তে পারে। রাজ-শক্তির সহিত অসহযোগীতা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে কিনা, সেটা বুদ্ধিমানেরাই স্থির করুন।

কলিকাতা-মিউনিসিপ্যাল বিল্ চৌ-চাপটে পাশ হ'য়ে গেল রাজনীতির চালে। সার্ব্ব স্বরেন্দ্রনাথের স্মৃতির যে অমর্যাদা হ'ল এ চালে, সেটা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু তার আর উপায় কি? এমনটা যে হ'বে, সে ভবিষ্যদ্বাণী আমরা বহু পূর্বেই করেছিলাম। সর্বম্ অতি অস্তে গর্হিতম্, একথা বুঝাবার জ্ঞান আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছি। কিন্তু

“পাগু বাঁধা” কর্তারা আমাদের সতর্কতাটা হেসেই দিয়েছিলেন উড়িয়ে। তাই হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না—কথাটা হ'য়ে গেল ব্যর্থ। পাপের কড়ি গ'ণে দিতে হ'বে আমাদেরই, নিরুপায়!

বৈশাখ সংখ্যার “প্রবাসী”তে শ্রীমান্ ফান্সী মুখোপাধ্যায় ‘শনিবারের বৈকালে’ বেচারী শরৎকে পাগল করার ফন্দী এঁটেছেন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দুড়ম্ ক'রে ফেলে; গল্পের গ্লটটি মজার। “বঙ্গলক্ষ্মীর” পাঠক পাঠিকা তাতে হাসবেন ব'লেই মনে হয়। শরতের আলতা ও অল্প পয়সায় এক শিশি গন্ধদ্রব্য ক্রয়—সেই সঙ্গে ক্যামেরা হাসির অবদান ক'রে তুলেছে। “শৈল”র সঙ্গে গন্ধসারের শিশিটা ঢেলে দিতে না পারায় এবং আলতার শিশিটা শ্রীচরণ কমলেশ্ব কবুতে অসমর্থ হওয়ায় কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের ভারী লাভ হয়ে গেছে। কিন্তু ক্যামেরাটি? “বঙ্গলক্ষ্মীর” পাঠক পাঠিকাদের হাসি ত এঁটা নিয়েই। ফান্সীর সব্য-সাঁচী হওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, শ্রীমানকে আমরা শুভচ্ছা জ্ঞাপন করি।

কুমিল্লা-সাহিত্য-সম্মেলন প্রসঙ্গে ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর সম্বন্ধে “বঙ্গলক্ষ্মীর” সম্পাদকীয় মন্তব্যে অনেক অপ্রিয় কথাই আলোচিত হয়েছে। “বঙ্গলক্ষ্মীর” তর্ক-যুক্তির জোর সামান্য নয় বলেই অনেকে মনে করেন। ডাক্তার ও মহামহোপাধ্যায়ের প্রভাবের দেওয়া খুবই উচিত। না দিলে তাঁ'দের পরাজয় স্বীকার করতেই হ'বে। তাঁ'রা দুই জনই মহাপণ্ডিত ব'লেই সাধারণের বিশ্বাস। তাঁ'দের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও অল্প নয়। একরূপ ক্ষেত্রে নীরব থাকলে তাঁ'দের স্লামার হানি হ'বে ব'লেই মনে করতে পারা যায়।

কলিকাতা সহরের অনেক পল্লী ও বস্তি, যদিও অনেক পরিষ্কার হয়েছে, তথাপি অপরিচ্ছন্নতা অল্প নয়। সেজন্য খানিকটা অপরাধী পল্লীবাসী, আর খানিকটা হচ্ছে কলিকাতা করুপোরেন্স। পরস্পরের স্বস্তি সহযোগিতা না হ'লে রাজার ধনীর পথ-ঘাট, বস্তি-পল্লী প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'তে পারে না—সেটা হ'বার উপায় নাই। মহামারির বিভীষিকা এখন চারিদিকে। মরণের আহ্বানে মানুষের আতঙ্ক বাড়লেই অকাল মরণ রোধ হ'বে না। বাঁচতে হ'লে বিষের আড়ত-গুলাকে পরিষ্কার করা চাই। সেটা করা ত খুব শক্ত নয়।

১৩৪৬ সালের “ভারতবর্ষের” জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় “নীলব অভিশাপ” শীর্ষক একটি কবিতা বাংলা দেশের পাঠক-সমাজে যেন কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কবিতাটিতে শঙ্কর মাছের চাবুক থাকা সত্ত্বেও অনেকেরই তা' ভাল লেগেছে। সমালোচনা-স্বত্রে বেহালা-অন্ধ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অরুণ শাহ কবিকে যে পত্র লিখেছেন, আমরা আমাদের মন্তব্য প্রকাশ না ক'রে তা' উদ্ধৃত করলাম। সাহিত্য হিসাবে পত্রখানির কিছু মূল্য আছে।

বেহালা, কলিকাতা,

১৮ই-মে—১৯৩৯

প্রজ্ঞাপদেয়—

রামুকে একপ বিপদে ফেললেন কেন? কবির! নিইর। একটু চেষ্টা করলেই সিনেমা থেকে তা'কে স্বামীর কাছে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারতেন। এখনও ছুলাইন যোগ ক'রে আপনাদের সে ত্রুটি সেরে ফেলাই আপনার ভাল। অমন কত রামু কবিদের হাতে প'ড়ে কেঁদে জীবন কাটাচ্ছে। কশাঘাতটা খুব জোরে লাগলেও সমাজে তা'র প্রয়োজন আছে। রহস্যের মধ্য দিয়ে তা' সুন্দর ভাবেই পরিবেশন করেছেন। তবু তা'র তিক্ততা ত কমতে পারে না।

কবির দৃষ্টি এইবার ঘরের মা-লক্ষ্মীদের উপর একটু পড়ুক। সিনেমা থেকে তিনি গৃহলক্ষ্মীদের অন্দরে আছেন। সেখানে যে পবিত্রতা পাবেন, তা'তে কবির সোনার কলম চক্চক ক'রে উঠবে। তাই হোক—এই প্রার্থনা করি। নমস্কার জানবেন। ইতি—

আপনার প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীঅরুণকুমার শাহ।

মহিলা-সমিতির কথা

বাইনান অসিরঞ্জন বালিকা বিদ্যালয় ও অবলা

সমিতির বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের বিবরণী

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৯ই মে তারিখে আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত স্বধীরলাল সরকার বি, এ, ও শ্রীযুক্ত স্ববোধ বালা ঘোষ বাইনান (হাওড়া) অবলা সমিতি পরিদর্শন ও অসিরঞ্জন স্মৃতি সভায় যোগদান করিতে গমন করেন। সভায় বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরবিন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অবলা সমিতির সম্পাদিকা

শ্রীমতী সুশীলা গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পুরুষ ও মহিলা হিন্দু ও মুসলমান বহুব্যক্তি সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় অসিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম,এ,এম,এল, সি মহোদয়ের প্রতিকৃতিও মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত প্রসাদ রঞ্জন রায় চৌধুরী (১) মহাশয় স্বর্গীয় অসিবাবুর স্মৃতিস্তম্ভ, (২) জেলাবোর্ডের রাস্তা তাঁহার নামে নামাস্ত-রিত করার অনুরোধ (৩) তাঁহার স্মৃতিদিবসে বাইনান

বামনদাস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছুটির পুনঃপ্রবর্তন ও (৪) বাইনান বামনদাস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি হইতে প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধির স্থান চ্যুতীতে যে বিক্ষোভ হয় তার ক্রটির সংশোধন কল্পে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, উহা সর্ববাদী সম্মতক্রমে গৃহীত হয়।

স্বর্গীয় অসিাবাবু পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বহুকার্যের অল্পস্থান করেন। গ্রামের অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, জেলাবোর্ডের রাস্তা, পোষ্ট অফিস, প্রভৃতি তাঁহারই ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। আজ তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া বাইনান মহিলা সমিতি গঠিত হইয়াছে। বাইনান মহিলা সমিতি প্রথম হইতেই সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সহিত জড়িত। মহিলা সমিতির মধ্য দিয়া বহু মহিলা নানাভাবে পুরস্কৃত হইয়াছে। শ্রীমতী প্রভাবতী দাসী শিল্প শিক্ষার দ্বারা পরে—খাত্তাবিদ্যা ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বিশেষ যশস্বিনী হইয়াছেন। তিনিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা ঘোষ মহিলাগণকে নানাভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া স্বামীর ও সংসারের সাহায্য করিবার জন্ত উপদেশ দান করেন। তিনি কতকগুলি গৃহশিল্পের শিক্ষা দেন বাহা মহিলাগণ অল্পায়াসে গৃহে প্রস্তুত করিয়া, বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতে পারেন। সমিতির সম্পাদিকা মহোদয়ার সহিত আলোচনায় জানা যায় তিনি শ্রীযুক্তা ঘোষ মহোদয়ার প্রস্তাব মত কতকগুলি নূতন শিল্প প্রবর্তন করিয়া সভ্যাগণকে উৎসাহিত করিবেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও সমিতির সভ্যাগণের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত হুদীরলাল সরকার মহোদয় ছায়াচিত্রযোগে রমণীগণের স্বাস্থ্য, শিশুপালন, পল্লীস্বাস্থ্য প্রভৃতি নানা পল্লীউন্নয়ন বিষয়ক বক্তৃতা করেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত শঙ্কুনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ কাব্যতীর্থ মহাশয় স্বর্গীয় অসিাবাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া ও তাঁহার স্মৃতি রক্ষা কল্পে, (তিনি যুবক সম্প্রদায়ের পরিচালক ছিলেন) যুবকগণ যাহাতে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করে ও যাহাতে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা

হয় তদ্বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভায় শ্রীমথগুল মুখোপাধ্যায় রচিত একটি শ্রদ্ধাজলি জ্ঞাপক কবিতা শ্রীযুক্ত বিমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় রচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। শ্রীবিমল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বাইনানের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ স্বর্গীয় অসিাবাবুর উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষা করিবে ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহাশয় উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিয়া ও স্বর্গীয় অসিাবাবুর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় ও অবলা সমিতির গৃহ নির্মাণ করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বাইনান অসিরঞ্জন বালিকা বিদ্যালয়ের বর্তমান গৃহ বিদ্যালয় ও সমিতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। স্থানান্তরে বিদ্যালয়েও সমিতির কার্যের প্রসার লাভ হইতেছে না। বিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষাপ্রণালী ও মণ্টেশরী নিয়মে শিক্ষা দিতে বহু যত্নসংগ্রহ করা হইয়াছে, বিদ্যালয়ের সহিত একটি বালিক বিভাগ ও রহিয়াছে। এ বৎসর কয়েকটি বয়স্ক পুরুষকে শিক্ষাদান করা হয় ও বয়স্কদের জন্ত বিদ্যালয় হইতে একখানি বড়দের শিক্ষার উপযোগী কোকনদ পাঠ প্রথম ভাগ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ও উহা বয়স্ক শিক্ষার্থীগণকে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদ্যালয় ও সমিতির জন্ত বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক স্থানীয় জমিদার ও সরোজনলিনী এসোসিয়েশনের স্থায়ী সদস্য শ্রীযুক্ত মনমথ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একখণ্ড ভূমি দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। গত বৎসর মে মাসে তাঁহার বাইনান পরিদর্শন কালে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ও বিদ্যালয়ের কার্যাদি দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। গত মার্চ মাসে উলুবেড়িয়া মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এন, জি, রায় মহোদয় পরিদর্শন করেন ও বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও সমিতির সভ্যাগণের প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যাদি দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। দূর পল্লীতে জী শিক্ষায় সহায়ত্বের অভাবেও যেরূপ ভাবে নীরবে পল্লী উন্নয়ন কার্য চলিয়াছে তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। বিদ্যালয় নারী শিক্ষা সমিতি হইতে আদিক সাহায্য পাইয়া থাকে।

নিখিল-বিশ্ব-পল্লী-মহিলা-সম্মেলন

লণ্ডনে ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সহযোগিতা

গত ৩০শে মে হইতে ১০ই জুন পর্যন্ত লণ্ডন মহানগরীতে নিখিল বিশ্ব-পল্লী-মহিলা-সম্মেলনের ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে স্বসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই সম্মেলনে পৃথিবীর নানাস্থান হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছেন। একমাত্র আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে বিভিন্ন মহিলা সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে তিনশত মহিলা আসিয়াছেন, আরও বহু দর্শকও আসিয়াছেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা হিমাংশু বালা ভাট্টী ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ভারতনারীর আদর্শ সম্বন্ধে সরোজনলিনীর জীবনচরিত ও কার্যধারা অবলম্বনে বক্তৃতা করিয়াছেন; বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ভাবধারা অবলম্বনে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইয়াছে, বঙ্গীয় পল্লী-মহিলা-সমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার পর হইতে তাঁহার বক্তৃতা শোনার জন্য উপস্থিত মহিলাগণ খুবই উদগ্রীব হইয়া থাকিতেন এবং এই সব পল্লীনারীর জীবন ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বহু সংখ্যক প্রশ্নের পর প্রশ্নের তাঁহাকে জবাব দিতে হইত; অনেক মহিলা আবার এদেশের সহিত পাত্র বিনিময়ে যোগসাধনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন এবং তাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার মতামতের প্রশ্ন করিতেন। এই সব সপ্রাণ নারীদের সহিত নির্জীব বঙ্গনারীর যোগসাধন সম্ভবপর কিনা, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইলেও শ্রীযুক্তা ভাট্টী তদ্বিষয়ে যত্নপর হইবেন বলিয়া আশাসও দিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা ভাট্টী লিখিয়াছেন যে “এই কনফারেন্স নিয়া এদেশে বহু ব্যাপার চলিতেছে। পত্রে ইহার কার্যের তালিকা দেওয়া শক্ত।” শুধু পত্রে লিখিয়া কেন প্রচার

দ্বারাও দেওয়া শক্ত। আমাদের দেশের গতিধারা হিমাংশু, এর কোন জোয়ার-ভাটা আছে বলিয়া মনে হয় না, এ দেশ সমুদ্রের নিকটবর্তী ছোট নদী—সোজা সরল-গতি, কোন প্রত্যাবর্তন বা আলোড়ন নাই। সে দেশের নারী পল্লীনারীর মিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম নির্বাহ করাকে যেমন অবশ্য কর্তব্যবোধে সমাধা করিয়া থাকে তেমন পরিবর্তনশীল জাগতিক গতিধারাকেও লক্ষ্যের বাহিরে ছাড়িয়া দিয়া গতাত্তরগতিকের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে না; তাহার তা অগ্রগামী হইতে। যুগের প্রভাবকে সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া সে দেশের নারী আত্ম পুরুষের সাথে সমতা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর; আর এদেশের নারী সমাজের গতিহীন নারীশক্তির ক্ষীণ স্রোতটুকুও প্রায় চমক অগোচর, অন্তঃসলিলা, তথাপি ভারতের যুগান্তিক সংস্কৃতির বাণীকে পাশ্চাত্য নারীজগতের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতের যুগান্তিক আদর্শকে আধুনিক সভ্যজগতের আদর্শের সহিত মিলিত করিয়া যে অপূর্বতম নারীত্বের আদর্শ গড়িয়া উঠিবে তাহাই এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার দান। শ্রীযুক্তা ভাট্টী ভারতের এই বাণী বহন করিয়া সরোজনলিনীর জীবন অবলম্বনে আলোকজালা সহরে টেলিভিশন ক্যামেরায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করেন। তিনিই প্রথম ভারত মহিলা টেলিভিশনে বক্তৃতা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা ভাট্টীর এই ভারতের পল্লীমহিলাদের অস্তর গৌরব স্বদূর বিদেশে এমন স্ফূর্ত্তভাবে বহন করিয়া দিবার জন্য সরোজনলিনীর কর্তৃপক্ষ তথা ভারতের জনসাধারণ তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

স্বগায়িকা শ্রীমতী বীণা আচা এই বিষয়ে শ্রীযুক্তা ভাট্টীকে সর্বশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা

উপমা কালিদাস—

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, পি, আর, এস,

রসচক্র সাহিত্য সংসদ—২১ এ, রাজা বসন্তরায় রোড, কলিকাতা।

মেঘ-মলিন সন্ধ্যায় জনৈক বন্ধুর গৃহে বেড়াইতে গিয়া উপরোক্ত পুস্তকখানি লইয়া আসিলাম বর্ষমুখর রজনীতে উপভোগ করিবার জন্ত। দেখিলাম, ঠকিয়া যাই নাই। সমস্ত পুস্তক কিনিয়া পাঠ করা আমার সাধ্যাত্ত নহে, বেশির ভাগই চাহিয়া-চিন্তিয়া পড়িতে হয়। তাহার সমালোচনা করা সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু ভাল কোন পুস্তক পাঠ করিলে স্ত্রুসাহিত্যিক বা সুপাঠক কেন যে ঐ পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করেন না তাহা আমার জানা নাই। আমার মনে হয়, গুণগ্রাহী সাহিত্যসেবীদের সকলেরই উচিত কোন সঙ্গ্রহ পাঠ করিলে তাহার যথাশক্তি প্রচারের সাহায্য করা। বাণী-মন্দিরের প্রত্যেক নিষ্ঠাবান পূজারীরই এই উদ্যোগ থাকা উচিত নয় কি!

উপমা কালিদাস পাঠ করিয়া যে স্বতঃ উৎসারিত আনন্দ আমাকে অল্পপ্রাণিত করিয়াছে, তাহারই প্রভাবে এই কয়টি লাইন লিখিলাম। গ্রন্থকারের কবিত্ব কালিদাসের কাব্য-কুসুমের প্রতিটি সুষ্প-বর্ণ-বিভার রসসম্পদ আপনার অতুলনীয় কবিত্বময় ভাষায় রসপিপাসকে পরিবেশন করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় সকলের জ্ঞান না থাকিতে পারে, উপরন্তু ঐ ভাষার দৃঢ়বদ্ধ মাণিক্যপেটিকার উন্মোচনও অতিশয় দুঃসহ, সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট দূরবিগম্য। উপমা কালিদাস সেই পেটিকা উন্মোচিত করিয়া ধরিয়াছে রসিক স্বজনের নিকট। গ্রন্থকারের সাহিত্য-নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাঁহার ভাষার রসসৌরভ সর্বতোভাবে এইরূপ অল্পপম পুস্তক প্রণয়নের অল্পকূল।

দুই তিনবার পাঠ করিয়া বইখানি ফেরৎ দিয়া আসিয়াছি, তথাপি মনে হইতেছে, আরো দু'একবার পাঠ করিলে ভালো হইত।

যৌন বিজ্ঞান—আবুল হাছান, আই, পি, ১১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, মোহাম্মদী প্রেস হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

আলোচ্য পুস্তকখানির নামটিই বলিয়া দিতেছে, গ্রন্থকার কিরূপ দুঃসহ বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শুধু আলোচনা নয়, তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ে নিজের স্ফুটন্তিত্ত স্বাধীন মতও ব্যক্ত করিয়াছেন। কত যে

অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি এই সুন্দর বইখানি লিখিবার জন্ত তাহা চিন্তা করিলে বিশ্বয় লাগে।

যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় পুস্তক সংখ্যা এখনো কম। যাহা আছে তাহা বহু চক্কর উচ্চ কলরোল বিক্রয় হয় খুবই, কিন্তু পড়িয়া নিরাশ হইতে হয়। আবুল হাছান সাহেব বঙ্গ ভাষার এই অভাব দূর করিয়াছেন। বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। উক্ত বিষয়টি নানা দিক দিয়া অতিশয় জটিল এবং ভাষায় প্রকাশ করার বাধাও বহু, তথাপি গ্রন্থকার যেরূপ সহজ ও স্বকৃতি সঙ্গত ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না। যৌন শাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত, আলোচিত ও সমালোচিত হইয়াছে। নানা মনীষির মত লইয়া একটা সার্বজনীন মত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করিয়া গ্রন্থকার পাঠকদের পরম উপকার করিয়াছেন। পুস্তক খানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, এক কথায় ইহা একখানি সুন্দর বই।

বিজ্ঞান ও বিশ্বায়—শ্রীধাভূষণ বসু—প্রকাশক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর এণ্ড সন্স, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য দশ আনা।

দৈবাৎ, রামধনু, আকাশ-ফটোগ্রাফী, সী-ড্রোম, মারসিলাইজড শিক, আবর্জনার মূল্য, ইলেকট্রিক বাল্ব, কয়লা, চালিত মোটর গাড়ী, জীয়ানো খাদ্য, ব্যাংকালাইট, ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিশ্বায়কর আবিষ্কারগুলিকে শিশুদের উপযোগী করিয়া লিখিত উপাদেয় একখানি পুস্তক। দুঃসহ বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিকে এত সহজগ্রাহী করিয়া পুস্তক রচনা করাও একটি বিশ্বায়কর বস্তু। বৈজ্ঞানিক পুস্তক শিশুদের উপযুক্ত প্রায়ই হয় না, যাহা হয় তাহাতে বালকবালিকাগণ তৃপ্ত না হইয়া বিরক্ত হইয়া উঠে। আলোচ্য পুস্তকখানি শিশুদিগকে বিজ্ঞানের বিশ্বায়কর বহু বিষয়ে আনন্দের সহিত জ্ঞান দান করিবে—ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস। এল্প পুস্তক প্রত্যেক পিতামাতার এক এক খণ্ড কিনিয়া ছেলেদিগকে উপহার দেওয়া কর্তব্য।

সন্ধানী—সচিত্র মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক শ্রীশান্তি রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বার্ষিক সডাক ১০ আনা; অত্যন্ত কম মূল্যে একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, চিত্র-সমালোচনা লইয়া প্রকাশিত হইতেছে। আমরা বারাস্তরে ইহার বিশদ আলোচনা করিব। প্রত্যেকেই ১০ পয়সা মাত্র দিয়া একখণ্ড দেখিতে পারেন।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

কেন্দ্র সমিতির কথা

প্রচার কার্য :—

কাটিহার মহিলা সমিতি :—

গত ১৮ই মে কেন্দ্র সমিতি হইতে মহিলা কর্মী শ্রীযুক্তা স্ববোধ বালা ঘোষ ও প্রচারক শ্রীযুক্ত স্বধীর লাল সরকার কাটিহার মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান, প্রথমে তাঁহারা সমিতির কার্যাবলী পরিদর্শন করেন। ১৯শে তারিখে অপরাহ্নে স্থানীয় রাজারাম ইন্সটিটিউটে মহিলাদের এবং ভদ্র মহোদয়দের একটি সম্মিলিত সভা হয়, সভায় শ্রীযুক্তা ঘোষ বক্তৃতা দিলে শ্রীযুক্ত সরকার ম্যাজিক লঠনের সাহায্যে মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শান্তাহার মহিলা সমিতি :—

গত ২৩শে এপ্রিল কর্মীগণ শান্তাহার গমন করেন। প্রথমে তাঁহারা সমিতির শিল্প দ্রব্যাদি পরিদর্শন করেন। অতঃপর সন্ধ্যা ৭। ঘটিকার সময় স্থানীয় হার্ভি ইউ, পি, স্কুলে মহিলাদের একটি সভা হয়। এই সভায় শ্রীযুক্তা ঘোষ ও মিঃ সরকার উভয়েই সমিতির উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ম্যাজিক লঠনের সাহায্যে বিভিন্ন সমিতির

কার্যাবলী দেখান হইয়াছিল। সমিতির কার্যে স্থানীয় মহিলাদের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

পাকসী মহিলা সমিতি :—

২৪শে এপ্রিল প্রচারকগণ পাকসী মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। প্রথমে স্থানীয় মহিলাদের লইয়া একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুক্তা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয় মহিলা সমিতি-গৃহে মহিলাদের একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত সরকার মহিলাসমিতির বিভিন্ন কার্যাবলী ও বিভিন্ন সমিতির কার্যের কথা উল্লেখ করিয়া ম্যাজিক লঠনের সাহায্যে বক্তৃতা দেন।

পুরী বিধবাপ্রশ্রম :—

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ২রা জুন পুরী বিধবাপ্রশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী স্বর্গীয়া লেডি বসন্ত কুমারী চাটার্জির মৃত্যু-বার্ষিকী কার্য পুরী আশ্রমে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয় কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় কর্ণেল এ, সি, চাটার্জি, কুমদবন্ধু সেন প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

তোমারে প্রণাম করি

এ, এফ, এম, ফজলুল হক

হে দেবী! তোমারে প্রাণের বেদীতে রাখিয়া প্রণাম করি,
পুষ্পাঞ্জলি দেই তব পায়ে, হৃদি-মন্দিরে বরি!
ধূপ-ধূনা আর গুগগুলু দিয়ে তোমারেই করি পূজা,
আমার নয়নে মানবী ত নহ, তুমি যে গো দশভূজা!
অশ্রুর কূলে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে মাগি পদ-রেণু,
আপনারে আমি হারামে আবার যেন আজি খুঁজে পেরু
সারা এ বিশ্ব তোমাতেই যেন হয়ে গেছে একাকার
আমার নয়নে তুমিই প্রতিমা, লহ গো নমস্কার!
ছিন্নবীণায় তুলিয়াছি তান আপনারে বিশ্বরি,
ক্ষম অপরাধ, চরণরেণুকা দাও—দাও কৃপা করি'।

অভ্যর্থনা

[গত ৭ই তারিখে স্কুল-ভবনে এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়।]

মানুষ যায়, মানুষ আসে। কিন্তু এই যাওয়া-আসার মধ্যেও মানুষের সার্থকতা আছে। মানুষ চলে যায়—পশ্চাতে রেখে যায় তার স্মৃতি। এই স্মৃতিই মানুষকে অমর করে রাখে। সর্বপ্রাসী মৃত্যু কালক্রমে সমস্তই গ্রাস করে;—পারে না কেবল স্মৃতিকে গ্রাস করতে। কারণ মৃত্যু স্মৃতির নাগাল পায় না। আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রীর স্মৃতিও আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। তিনি বহুপূর্বে চলে গেলেও তাঁর স্মৃতি হয়ে বেঁচে রয়েছে এই বিদ্যালয়টি। এই বিদ্যালয়টাই তাঁর নাম অমর করে রেখেছে। তাই আমরা ভাবি :—

গিয়েও তুমি যাওনি ওগো আছ মোদের কাছে।

তোমার কৃতির স্মৃতিখানি সদাই জাগে হিয়ার মাঝে ॥

আমাদের বিদ্যালয় অনেকের তুলনায় হয়ত ক্ষুদ্র কিন্তু এই ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র সাহায্যে অনেক নারী আজ সুনিস্ক্রিত ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। সূর্যের তুলনায় প্রদীপ অতি ক্ষুদ্র হোলেও, তার আলো দানের ক্ষমতা অতি ক্ষুদ্র স্থানে সীমাবদ্ধ হোলেও সে জগতের আধার কিঞ্চিৎ পরিমাণে অপসারিত করে আলোক প্রদানে সমর্থ হয়। এই সামান্য আলোক প্রদানেই তার সার্থকতা। আমাদের বিদ্যালয়টাই তার সাধ্যানুসারে দেশের অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রীকে শিক্ষা দান করে। এই সাধ্য মত চেষ্টার মধ্যেই তার সার্থকতা।

আমরা এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী। আজ এই বিদ্যালয়ে একটি ক্ষুদ্র উৎসব। কিন্তু আমাদের নিকট ঐরা আজ

উপস্থিত। তাঁরা এককালে এখানেই শিক্ষা লাভ কোরে গেছেন।

আজ তাঁদের সহানুভূতিতে, অনুকম্পায় আমাদের উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হবে, এ আশা আমরা রাখি। তাঁরাই জাগাবেন আমাদের তরুণ প্রাণে তরুণ প্রেরণা; হৃদয়ে জাগাবেন নব উত্তেজনা। তাঁরাও এককালে বিদ্যালয়ের উৎসবে মাতামাতি করেছিলেন। তাঁরা জানেন এই মাতামাতির মধ্যে কত আনন্দ এবং সে আনন্দ কত নিখল, নিষ্কলুষ ও পবিত্র। তাই আমরা আশা করছি যে তাঁরা তাঁদের এই ভগ্নীদের উৎসবে যোগদান কোরে আমাদের আনন্দ দ্বিগুণ ভাবে বর্ধন করবেন ও উৎসবকে সর্বাঙ্গসুন্দর কোরে তুলবেন।

এই উৎসব-মিলনে আমরা আহ্বান-গীতি গাইছি :—

আজি মিলনের গীতি উঠিল ধ্বনিয়া

সুদূর আকাশে বাতাসে,

তাই জাগিয়া উঠিল আমাদের হিয়া

কি এক মধুর আবেশে।

নবীন প্রেরণা এসেছে আজিকে

মোদের নবীন অঙ্গে,

তাই বিলাইতে চাই, মিশাইতে চাই—

নিজেরে বিশ্ব-সঙ্গে।

নিবেদিকা—

সরোজনলিনী শিল্প-

শিক্ষালয়ের ছাত্রীবৃন্দ

যুগ-সমস্যা

আধুনিক জগতে নারী শুধু পুরুষের সহধর্মিণী নন, সহকর্মিণীও! জগতের সর্বত্র নারী আজ আপন কর্ম-প্রতিভায় পুরুষের সহযোগিতা করিতেছে, সাহায্য করিতেছে—সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে সে আজ পুরুষের সমপ্রাণা সখী।

অন্তঃপুরচারিণী অনর্থ্যস্পৃশা যে নারী-চরিত্রের কথা আমরা পুরাণে ইতিহাসে পাঠ করি তাঁহাদের উন্নততম চরিত্রমাধুর্য্য আমাদের মনে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোক বিকীরণ করে,—আমাদের মনকে অপার্থিব আনন্দে নিমজ্জিত করে, কিন্তু যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহকোটর বন্দিনী অসহায়। নারীর আর্ন্ত দীর্ঘশ্বাস আজ আমাদের সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, বিচলিত করিয়া দিয়াছে।

যে দিন জগতে ছিল অখণ্ড শান্তির প্রতিষ্ঠা, ছিল প্রতিযোগিতাহীন অম্লের স্বর্ণপাত্র, সে দিন অন্তঃপুরচারিণী হইয়া নারী তাঁহার স্বামীপুত্রের কল্যাণ কামনায় দিবানিশি নিরত থাকিতেন, সেদিন তাঁহার সে অধিকারে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে চাহে নাই; কিন্তু আজ সমগ্র জগতের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অর্থের জন্ত, অম্লের জন্ত রাজাধিরাজ হইতে ভিখারি পর্যন্ত আজ ব্যাগ্র, ব্যাকুল; তাই সমগ্র মানবের অর্দ্ধাংশ নারী-জাতির আজ আর গৃহচারিণী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহাকে আসিতে হইতেছে বাহিরে, কর্মমুখর জনতার মধ্য হইতে তাহাকে তাহার স্বামীপুত্রের সাহায্যার্থ কর্ম সংগ্রহ করিতে হইতেছে; নতুবা একক স্বামী বা পুত্র প্রতিযোগিতায় হটিয়া আসিবে।

স্বামীহীনা বিধবা বা অবিবাহিতা কুমারীকে আর আশ্রয়গণ সহজপোষা মনে করেন না—কারণ এই দুর্দিনের সংস্পর্শ তাঁহারাও এড়াইতে পারেন না।

অবিবাহিতা কুমারী কন্যাগণ সবত্র সহস্র প্রকার কার্যে যোগদান করিতেছেন, স্বাবলম্বী হইয়া পিতা-মাতা-ভ্রাতার

সাহায্য করিতেছেন—বিধবা তাঁহার অপোগণ্ড শিশুগুলি লইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের চেষ্টা পাইতেছেন—জগতের দিকে দিকে আজ এই নীতি নিরত অহুষ্ঠিত প্রচারিত হইতেছে।

কিন্তু গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে আজও বাংলায় উপরোক্ত কার্যধারা পূর্ণোদ্যমে পাইয়া হইতেছে না—অথচ বাংলায় ইহার প্রয়োজনীয়তা পৃথিবী যে কোন দেশে হইতে অধিক।

ইহার কারণ অল্পসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—বাঙ্গালী সমাজের যুগব্যাপী অসাড়তা, স্থবিরত্ব, চর্চা জগতের পথে চলিবার শক্তিহীনতা। এই অসাড়তায় শক্তিহীনতাকে যেমন করিয়াই হউক জয় করিতে হইবে—নতুবা বাঙ্গালী সমাজ রক্ষা পাইবে না! আজও বাঙ্গালীর মাতা, কন্যা, বধূ, পতিপুত্রের অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্ত স্বেচ্ছায় অগ্রগামিনী না হন তবে পৃথিবী ব্যাপী অর্থদঙ্কটের এই মহাসঙ্কটের বাঙ্গালীর অর্থ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বেকার শস্যার নিপীড়নে তাহার অল্পপ্রত্যঙ্গ বিস্কৃত হইয়া যাইবে। বর্তমানেই জীপু পরিবার লইয়া একক উপার্জনশীল পুরুষের নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে—তাহার নির্জীব দেহে শক্তি সঞ্চার করিবার শক্তি আছে একমাত্র তাহার সহধর্মিণী সহকর্মিণীর।

স্বল্প ব্যয়ে স্বল্পকাল মধ্যে কুটির শিল্প, চাকশিল্প এবং কারুশিল্প শিক্ষা করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জনের গৌরব কেন বাঙ্গালার মেয়েরা লাভ করিবে না, অন্তত অল্প-উপার্জনকারী স্বামীর সংসারে স্বেপার্জিত অর্থ দিয়া কেন শাস্রয় করিবে না তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যদিও পুরুষ চাহেনা যে তাহার স্ত্রী-কন্যা-ভ্রাতার অস্ত্রের দাসত্ব করুক, কিন্তু দাসত্ব না-করিয়াও যে স্বাধীন

ভাবে উপার্জন করা যাইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বিরল নয়।

কলিকাতার সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয় হইতে যে সমস্ত ছাত্রী উত্তীর্ণ হন তাঁহাদের সকলেই স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া আনেন। ভারতের অত্র কোন শিক্ষালয় এত অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পকার্য শিক্ষা দিতে পারেন না। সামান্য দুই বৎসর মাত্র মনোযোগ দিয়া শিক্ষা করিলে যে কোন সাধারণ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক এই শিক্ষালয়ে স্বাধীন জীবিকার্জনের বিদ্যা শিখিয়া আসিতে পারেন। এই শিক্ষালয়ে বহুপ্রকার শিল্প শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বাংলা-ইংরাজিও শিক্ষা দেওয়া হয়। সর্বাপেক্ষা সুবিধার কথা এই যে এখানে কোন ছোট মেয়ে (১৬ বৎসরের নিম্ন) ভর্তি করা হয় না; স্বতরাং বয়ঃকনিষ্ঠাদের সহিত একযোগে পাঠ করিবার লজ্জা হইতে বয়স্ক অন্তঃপুরিকাগণ নিস্তার পাইয়া থাকেন। বিধবা, বিবাহিতা অথবা কুমারী যে কোন মহিলা জাতিধর্ম নির্বিশেষে এখানে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। শিক্ষাদানের পদ্ধতিও মহিলাদের উপযোগী সরল এবং স্বাভাবিক-পূর্ণ।

পল্লীর মেয়েদের স্বরক্ষিত রাখিবার জন্ত এই স্কুলে অতি অল্পব্যয়ে বোর্ডিংএর ব্যবস্থা করা হইয়াছে; সেখানে নানা প্রকার গৃহকার্যের শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া এই স্কুলে জুনিয়ার ট্রেণিং বিভাগও রহিয়াছে। যে সব মহিলা শিক্ষকতার কার্যকে জীবনে বরণ করিয়া লইতে চান, অন্ততঃ প্রয়োজন হইলে শিক্ষকতা পাইতে পারেন, তাঁহারা দুই বৎসরে জুনিয়ার ট্রেণিং পাশ করিতে পারেন।

নানাবিধ কুটীরশিল্প সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার যে কোন একটি ভালরূপে আয়ত্ত করিলে একজন মহিলা গৃহের সমস্ত কার্য করিয়াও দৈনিক আট আনা হইতে একটাকা উপার্জন করিতে পারেন। আধুনিক বেকার-সমস্যার দিনে ইহাতে স্বামীপুত্রের বড় কম সাহায্য হয় না।

সরোজনলিনী শিল্প প্রতিষ্ঠান আজ চতুর্দশ বর্ষ কাল বাংলার নারীকে ব্যগ্র আহ্বান জানাইতেছে,—“এম, জনকোলাহলময় কর্মমুখর পৃথিবীতে তোমাকে স্বস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা সাহায্য করিব।”

জগতের এই অর্থনৈতিক দুর্দিনে আমরা আর একবার আমাদের মাতা-ভগিনী-কন্যা-বধূদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি,—যে গৌরবদীপ্ত পথ তাঁহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে সেই পথে চলিয়া স্বামীপুত্রের কল্যাণ করিতে তাঁহারা যেন আর কালবিলম্ব না করেন।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

স্বর্ণকুমারী পদক

স্বর্গীয় স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লেখিকাদের মধ্যে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। “বঙ্গ সাহিত্যে স্বর্ণ কুমারীর দান” ছিল প্রবন্ধের বিষয়, সর্বশ্রেষ্ঠ লেখিকাকে একটি স্বর্ণ পদক প্রদত্ত হইবে ইহাই ঘোষিত হইয়াছিল। শ্রীমতী সতী গুপ্ত (ঘোষ) এম-এ মহোদয়া এই স্বর্ণকুমারী

পদক পাইবার উপযুক্ত লেখিকা বলিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিযুক্ত বিচারকগণ স্থির করিয়াছেন।

সাহিত্য পরিষদ খ্যাতনামা মহিলা সাহিত্যিকের স্মৃতি এই প্রকারে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া প্রথম মঙ্গল করিয়াছেন। বর্ষে বর্ষে মেয়েদের বাংলা সাহিত্যে অবদানের সম্বন্ধে আলোচনা হইলে বঙ্গসাহিত্য-অম্বরগী রমণীরা খুব উৎসাহিত হইবেন।

বিলাতে শিক্ষার জন্ম মেয়েদের সরকারি বৃত্তি

বর্তমান বর্ষে বাঙ্গালা সরকার ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্ম যে নয়টি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুই জন মহিলা বৃত্তি পাইয়াছেন। মিস্ মনোরমা ঘোষ এম এ লওনে ট্রেনিং শিক্ষার জন্ম এবং মিস্ স্থলতানা আমেদ এম এ লওনে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পার্শীয়ানে পি এচ ডি ডিগ্রী পাইবার জন্ম বাঙ্গালা সরকারের নিকট বৃত্তি পাইয়াছেন। এই প্রকার সরকারী বৃত্তিতে ছাত্রীদের পরম উপকার সাধিত হইবে।

দশ বৎসরের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রী

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ, বর্তমান, বর্ষে কুমারী বাণী ঘোষ দশ বৎসর সাত মাস বয়সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার পূর্বে এত কম বয়সের কোন ছাত্র বা ছাত্রী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। বিশেষ প্রতিভা না থাকিলে এত অল্প বয়সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া অস্বাভাবিক।

কলিকাতার সর্বপ্রাচীন বালিকা বিদ্যালয়

মেয়েদের স্কুলে শিক্ষা দিবার প্রথা প্রথমে ইংরাজ সরকার গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালার কয়েকটি সমাজনেতা ও খৃষ্টান মিশনারীরা ইহার প্রথম উদ্যোক্তা। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের প্রাসাদে বালিকাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা ১৮২০-১৮২৪ সাল পর্যন্ত হইয়াছিল। জ্ঞানী শিক্ষা প্রচলনের জন্ম সোসাইটি ১৮২০ সালে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী অভাবে সে সংকল্প ত্যাগ করা হয়। তাঁহার বিলাত হইতে মিস্ কুক নাম্নী এক শিক্ষা বিশারদ মহিলাকে ১৮২১ সালে খরচ দিয়া ভারতে আনয়ন করেন। কিন্তু অর্থভাবে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারই চেষ্টায় এবং লেডীজ সোসাইটি অব ফিমেল এডুকেশন সাহায্যে তিনি কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় তালতলা, জানবাজার, চোরবাগান প্রভৃতি কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং ১৮২৮ সালে হেডুয়ায় দক্ষিণ পূর্ব কোনে কেন্দ্র বিদ্যালয়ের স্থায়ী গৃহ নির্মাণ হয়। এই স্কুলটির গৃহই আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার প্রথম মেয়ে স্কুল গৃহ। সেই অট্টালিকার জন্ম রাজা বৈদ্যনাথ বিশ সহস্র মূদ্রা সাহায্য করেন। এই বিদ্যালয় গৃহের নিয়ন্ত্রণের এক প্রকোষ্ঠে প্রস্তর ফলকে যে কথাগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে তাহার প্রতিলিপি পাঠে ইহার ইতিহাস জানা যায়।

এই

মাধ্যমিক পাঠশালা

এ ও দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার্থে

সম্রাট খৃষ্টীয় জ্ঞানী সমূহের

এক সভামণ্ডল কর্তৃক

স্থাপিত হইল

তন্নিমিত্ত

শ্রীমান রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর

অতি সচ্ছলরূপে বিংশতি সহস্র মূদ্রা

সাহায্য করিয়াছেন

এবং ইহার প্রয়োজনে সকলেরা তদারিক্ত

সাধনা ও অর্থের সাহায্য দেন

শ্রী শ্রীযুক্ত চার্লস্ নওলেস্ রবিনসন সাহেব

কর্তৃক, যিনি এইগৃহের পাণ্ডুলিপি দেন

তদানুসারে গৃহ নির্মাণ করেন

১৮২৮

এই স্কুলটি কেন্দ্র করিয়া মিস্ কুক (পরে মিসেস্ উইলসন) কলিকাতার এবং বোম্বাইতে জ্ঞানী শিক্ষা প্রদানের জন্ম অনেকগুলি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। তাহাই আধুনিক জ্ঞানী শিক্ষার গোড়াপত্তন। মিস্ কুকই প্রবর্তয়িকা।

শ্রীযুক্ত স্বর্ণপ্রভা মল্লিকের রাজ-উপাধি লাভ—

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে স্বর্ণীয় স্বরেন্দ্রনাথ মল্লিক সাহেব, আই, ই, মহোদয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা মল্লিক “কাইজার ই-হিন্দ” প্রথম শ্রেণী পদক পাইয়াছেন। সাধনী রমণী স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে স্বামীর পরিকল্পনা অনুসারে সিংহ গ্রামে “স্বরেন্দ্রনাথ মল্লিক মাতৃসদন” প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার এই বদান্যতা ও জনসেবার জন্মই রাজ সরকার এই পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির পৃষ্ঠপোষিকা ভারতের বড়লাট পত্নী হার একসেলেমসী লেডী বিন লিথগো মহোদয়া কাইজার ই-হিন্দ পদকে জনসেবার জন্ম ভূষিত হইয়াছেন। ইহাদের সম্মানে বঙ্গনারী মাজই আনন্দিতা।

ডাক্তার শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ দস্তিদার—

বর্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কুমারী ডাঃ প্রতিভা ঘোষ দস্তিদার এম, বি, ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; আর কোন মহিলা বর্তমান বর্ষে ডাক্তারী এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। তিনি লেডী ডাফরীণ হাঁসপাতালে নিযুক্ত হইয়াছেন। বরিশালের গডো গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের বেদনাশ্রুত জ্বালা

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ

আগুনের জ্বালায় স্বর্ণের অসারাংশই যেমন ভস্ম হইয়া যায়, স্বর্ণই একমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ মানব হৃৎকের ভীষণ জ্বালায় দহনে ঋষিদের অপ্রান্তরূপে যে জ্ঞান প্রস্ফুট হইয়াছে তাহা চিরসত্য এবং চিরনিত্য।

তঁাহারা মানব হিতার্থে এ জ্ঞানের বাণী, অকাতরে শিষ্যবৃন্দকে উপদেশ দিতেন। ইহাতে স্বার্থের কোনই গন্ধ থাকিত না। বিনিময়ে কেবল শান্তিই তঁাহারা ভোগ করিতেন।

আজ যুগযুগের পরাধীনতার পেণে মাহুষের নির্মল সত্য নিষ্ঠুররূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ঋষিদের সে সত্য জ্ঞান, মিথ্যা আবরণের ভিতর গ্রহণ করিয়া আয়ুর্বেদীয় প্রায় সমস্ত চিকিৎসকগণই বর্তমান যুগে দুঃস্থ, নিঃশ্ব, অসহায় ও পীড়িত রোগীর উপরে তঁাহাদের শাণিতাজ্ঞ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। আর্থ্যঋষিদের জ্ঞানের মূলে এ কুঠারাঘাত বড়ই পীড়াদায়ক।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকবৃন্দের সত্য-লেশ-বর্জিত বহু প্রকারের নিম্নিত নীতি, তীব্র সমালোচনার বিষয়ীভূত হইলেও সবচেয়ে ন্যাকারজনক নীতি হইয়াছে এই যে, স্বকীয় কলিত নামের ভিতর দিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা।

প্রায়শই এক চিকিৎসকের বুদ্ধিবাহু শক্তি থাকে না, অধিকাংশ চিকিৎসকই শাস্ত্রোক্ত ঔষধগুলিরই ভিন্ন ভিন্ন নাম যোজনা করিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বুদ্ধির মূল্য হিসাবে উচ্চস্তরের ভিজিট দিয়া একজন সুবিজ্ঞ এলোপ্যাথিক চিকিৎসককে কল দিলে তিনি বাহা ব্যবস্থা করিবেন সেই ঔষধ অতি সাধারণ কম্পাউণ্ডেরও সরবরাহ করিতে পারেন। কিন্তু কবিরাজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নস্তরের চিকিৎসকগণ ইহাতে উচ্চ স্তরের যে কোন চিকিৎসককেই আহ্বান করুন না কেন, তাহাদের ব্যবস্থা কাহারও বুদ্ধিবাহু শক্তি থাকে না। ইহার অর্থ এই যে শাস্ত্রোক্ত

সাধারণ ঔষধগুলিরই গভীর অর্থবোধক বিভিন্ন নামকরণ করিয়া উচ্চমূল্য গ্রহণ করিবার জন্ত পথ উন্মুক্ত রাখা হয়। ইহাতে স্বার্থ ঔষধের সঠিক মূল্যও নিরূপণ করিবার উপায় থাকে না।

ইহাতে একদিকে যেমন শরণাপন্ন লোকদিগকে প্রতারিত করা হয় অপরদিকে একজন প্রতিভাপন্ন চিকিৎসকের স্বব্যবস্থা জানিতে না পারিয়া চিকিৎসকমণ্ডলীরও জ্ঞানের খর্বতা হইয়া থাকে। এইভাবে আয়ুর্বেদেই উৎকর্ষতা ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

ঐশ্বরিক শক্তি নিয়া বহুলোকের জন্ম সম্ভব হয় না। মহামানবের জ্ঞানের আলো সর্বত্রই প্রকাশিত হওয়া চিরন্তন রীতি। যে ভাগ্যবান চিকিৎসক ভগবদত্ত শক্তিতে চিকিৎসা নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছেন তঁাহাদের এই কুটনীতিতে সর্বসাধারণ বিশেষভাবেই প্রতারিত হয়।

স্বষ্টজনক রোগের উপস্থিতিতে এলোপ্যাথিক বহু চিকিৎসকেরও মিলন যেখানে সম্ভব না হয় সেখানে নানা-বিধ বিচার বিয়োগের ফলে যে ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হয় তাহা সর্বজন সম্মত না হইলেও সর্বজন বিদিত। কিন্তু এরূপ বিপজ্জনক অবস্থাতেও কবিরাজ মহাশয়গণ স্ব স্ব কলিত নামের ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ইহাতে পরস্পর কাহারও ব্যবস্থা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যে কোন কৌশলক্রমে রোগীটিকে নিজের চিকিৎসাধীনে আনয়ন করিবারই প্রধান উদ্দেশ্য থাকে বলিয়া, এই জাতীয় ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন।

তঁাহারা সাধারণ ব্যবস্থিত ঔষধগুলিও পূর্বপুরুষের অপ্রান্ত ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিংবা নিজের আবিষ্কৃত এই অব্যর্থ ঔষধে, এই প্রকার রোগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গলক্ষী —



ভারতের সর্বোচ্চ মন্দির-তোরণ
গোপুরম্—মীনাক্ষী মন্দির



চতুর্দশ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৪৬

৯ম সংখ্যা।

আশীর্বাদ

স্ববীজনাথ ঠাকুর

প্রসূন !

আকাশ-রবির পুণ্য-আলো :

উজ্জ্বল হতে ঝরে

দেবে তোমায় পরিপূর্ণ

প্রস্ফুটিত ক'রে ।

ধরার রবি সে দীর্ঘকাল

রইবে না এই ভবে,

তবু তাহার আশীর্বাদ তো রবে ।

পত্রালাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

508, W. High Street

Urbana

Illionois

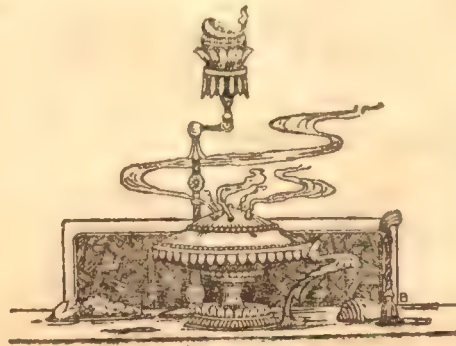
U. S. A.

কল্যাণীয়াসু

আমরা আৰ্বাণাতে এসে ঘরকরনা ফেঁদে বসে
আছি। ছোট খাট নির্জন সहरটি—কোনপ্রকার
উপদ্রব নেই—আকাশও নিম্নল এবং সূর্যালোক
অপর্যাপ্ত। এখানেও কিছু কিছু কাজে জড়িয়ে
পড়েছি—আমি দেখতে পাচ্ছি, সেটা আমি কোন
খানেই এড়াতে পারিনে—আমাকে যেমন করেই
হোক লোকের মাঝখানে বেরিয়ে আসতেই হবে।
এখানে সম্প্রতি তার সুরূপ হয়েছে এবং নিশ্চয়ই
দেখতে দেখতে সেটা বেড়ে উঠতেই থাকবে। যাহোক
ইতিমধ্যে কিছুদিন আপন মনে থাকতে পেরেছি।
সেটা আমার অত্যন্ত দয়কার বোধ হয়। লোকের
ভিড়ে, কাজে কর্মে বা মনের বিক্ষিপ্ততায় যখন চাপ

পড়ে তখন ভিতরে ভিতরে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতে
থাকে। যেটা আমার জীবনে সব থেকে দরকার
সেই লক্ষ্যটাকে আমার সামনে রাখতেই হবে—
সেটাকে আর কিছু দিয়ে ঢাকা দিলে সে যেমন
করে হোক ঠেলেঠেলে ভেঙে চুরে বেরিয়ে আসবেই।
আমি নানারকম করে দেখেছি, আমার পালাবার
রাস্তা নেই—আমাকে বড় রাস্তা ধরে চলতেই হবে,
জীবনটাকে যদি বাজে বোঝায় ভারাক্রান্ত করি
তবুও আমাকে বসে থাকতে দেবে না—রাস্তার
প্রত্যেক ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একে একে আমার কাছ
থেকে আমার প্রত্যেক মাণ্ডলটি শেষ কড়া পর্যন্ত
আদায় করে নেবে। অতএব আমার পক্ষে কিছু
জমানোও সহ্য হবে না, পিছনে ফিরে দেখলেও
চলবে না—আমার চাই খোলা রাস্তা, খোলা
আকাশ।

—ইতি, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১৯



কলঙ্ক-আশিস

শ্রীকাশীশ্বর দাশগুপ্ত বি-এ

কিছুদিন থেকে জীবন সঙ্কে মনকষাকষি চলছে। তিনি ধনীরা আদরের কন্যা; গরীবের গরীবখানায় তাঁর পোষাবে কেন? যাযাবর জীবন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যুরে বেড়াই দেশে দেশে। এই আমার জীবিকার একমাত্র সংস্থান। আমার এ একটানা চলা—বাইরের জগতের সঙ্গে আমার এ নিবিড় পরিচয় তিনি পছন্দ করেন না। আসলে আমার উপর তাঁর বিশ্বাস নেই।

দু' একবার বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে খালি পেটে ভালবাসা ভাল জমবে না সুতরাং পেটের সংস্থান আর প্রেম দুটো একসঙ্গেই চলুক, একের জন্তে অপরের একটু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বৈ কি! কিন্তু তাঁর চোখ মুখের দিকে চেয়ে কোনদিন এ কথা বলতে ভরসা হয় নি।

—আমি তাঁকে সত্যিই ভালবাসতাম, আর সে ভালবাসায় ছিল না কার্পণ্য; কিন্তু আমার প্রতি তাঁর উদাসিন্য, তাঁর অশ্রদ্ধা আমার মনকে পীড়িত করত। সমস্তা ছিল, কিন্তু ছিলনা শুধু সমাধানের উপায়।

মফঃস্বল থেকে কলকাতা ফিরে এসেছি মাত্র দু'দিন—আফিসের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই বাইরে যাবার তাগিদ এসেছে। বাড়ীতে এ খবর দেবার ইচ্ছা না থাকলেও না দিয়ে উপায় ছিল না। শুনেই ত তিনি ফেটে পড়লেন—স্বপ্ন হল বচসা আর বর্ষণ দুই-ই!

ঘরে যখন মন টিকলো না, বাইরে তখন শান্তি খুঁজলাম। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। শ্রামবাজারের মোড়ে বাসে চেপে বসে সদ্য-কেনা খবরের কাগজটা খুলতেই চোখে পড়ল বড় বড় হরফের কয়েকটি কথা—“রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড।” পরে বাইশ কি তেইশ বৎসর বয়স্কা একটি মেয়ের ফটো আর তারই নীচে লেখা রয়েছে—“রমলা দেবী, গত রাত্রিতে ইহাকে তাহার বাড়ীতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।”

মনটা বিম্বিয়ে উঠল। রোজ সকালবেলা খবরের কাগজ উল্টা-তাই চোখে পড়ে শুধু নারী-ঘটিত ব্যাপার;

হয় প্রেম, নয় হরণ, নয়ত হত্যা। এ প্রগতির কোথায় কে জানে! আর এ অসংঘর্ষের বোঝা করে জাতি বাঁচবেইবা কেমন করে!

ফটোটোর দিকে চোখ পড়তেই আমি চমকে পেরে উঠে। একে আমি পূর্বে কোথাও দেখেছি—এ নাম আমার নিকট অপরিচিত নয়।

বিস্তারিত খবর জানবার জন্তে আমার মন উদ্বল হয়ে উঠল। রমলা! হ্যাঁ, একে আমি চিনি এবং ভাল করেই চিনি। আটবছর আগেকার কথা। আমি কলেজে পড়ি। আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে সঙ্কে পরিচয়। রমলার বয়স তখন পনেরের বেশী কারণে অকারণে রমলাদের বাড়ী যেতাম। তার শিশুসুলভ চঞ্চলতা, অপূর্ণ গতিভঙ্গি, তার হাসিমুখ আমায় মুগ্ধ করত।

একজন বন্ধুর নিমন্ত্রণে রমলা সহ তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। গ্রামের মনোমুগ্ধকর পথ, ধানের শীষ আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিলে—আশ্রিত তখন মুকুল ফুটে উঠেছে, তার সুবাস মনে আনে প্রাণে বনবাদাড়ের ঝোঁপ, কাশ ফুলের শোভা আমায় নির্ভীক অজানা পথের ইঙ্গিত। সংসারের রথচক্রতলে আত্মসেদিনকার কবি-মন আজ সমাধি লাভ করেছে।

রমলা একটা শুকনো ফুলের দিকে চেয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলে—“আচ্ছা, বলতে পার, ফুল কেন ফোটে, অর্থাৎ কেনই বা ঝরে যায়;

রবীন্দ্রনাথ পড়া ছিল। বললুম—ফোটাতেই ফুলের স্বভাব। ফুল ফোটে মালুম তাতে পায় আনন্দ। দুনিয়ার কাজ যখন তার ফুরিয়ে যায়, তখন সে ঝরে পড়ে ঝরাতেই তার স্বার্থকতা। ফুল আপনার মত বিস্ময় করে দিয়ে বিশ্বস্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে চায়—অপূর্ণ পরিপূর্ণতা, সসীম চায় সসীমকে।

সেদিন রমলা কি বুঝেছিল জানি না। সে শুধু তা

পরিপূর্ণ গম্ভীর দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে ধরে আমাকে
হয়ত বা কিছু বলতে চেয়েছিল। আজ তার এই
শোচনীয় পরিণতিতে মনটা সত্যিই ব্যথিত হয়ে উঠল।

ভাবতে ভাবতে আমি আফিসএ এসে উপস্থিত
হলাম। ক্লাকদের মধ্যে একজন আমায় বললে—“গোয়েন্দা
পুলিশ আপনার জন্তে অপেক্ষা করছে।”

“গোয়েন্দা?”—আমি জিজ্ঞাসা করলাম। “কি চায়
সে?”

“আমি জানি নে—সে আমায় কিছুই বলে নি”—সে
বললে।

আমি আফিসএ ঢুকে পড়লাম। আমি যেতেই একজন
দীর্ঘ শ্রমবিশিষ্ট লোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করলে—“আপনিই কি মিঃ
বোস?”

আমি জবাব দিলাম—“হ্যাঁ।”

“আমি একজন গোয়েন্দা”—সে বলল।

“তা জানি।”

কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার
দিকে চাইল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমি বললাম—“আপনার জন্তে
আমি কি করতে পারি?”

“একটা বিষয় জানবোর জন্তে আমি আপনার কাছে
এসেছি।”

“কোন বিষয় বলুন।”

সে মুহূর্তকাল করল। তারপর আন্তে আন্তে বললে—

“মিঃ বোস, আপনি কি খবরের কাগজ পড়েন না?”

“আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি নে।”

“কিছুই বুঝছেন না?”

“না।”

আবার নিস্তব্ধতা। অত্যাশ্চর্য কামরা থেকে টাইপ-
রাইটারের ঠক ঠক শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে আসছে
না। আমি বললাম—“আপনি আমার কাছ থেকে কি
জানতে চান একটু খুলে বলুন ত।”

“রমলা দেবীকে আপনি চিন্তেন?”

একথা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে সামনের দিকে

ঝুঁকে এক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে
যেন আমার মুখের মৌন ভাষা পড়তে চায়।

খানিকক্ষণের জন্তে আমি বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম—
আমার যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছিল।

নিজকে সামলে নিয়ে আমি বললাম—“আমি তার
সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি নে। আপনি ঠিক জায়গায়
আসেন নি।”

“তাই কি?”—সে বলল।

“হ্যাঁ”—আমি জবাব দিলাম।

“আপনি কি তাকে কোনোদিন চিন্তেন না?”

“আট বৎসর পূর্বে কয়েকবার আমার সঙ্গে তার
সাক্ষাৎ হয়েছে।”

“তারপর আপনি আর তাকে দেখেন নি?”

“না।”

“টেলিফোনেও কি আপনার সঙ্গে তার কোনদিন
কথাবার্তা হয় নি?”

“না।”

মনে হল, সে যেন আমার কথাগুলো হজম করছে।
তার মুখ চোখে যেন একটা অদ্ভুত ভঙ্গি ফুটে উঠল।

“অদ্ভুত মেয়ে”—অক্ষুণ্ণে কথা দুটি উচ্চারণ করলে
গোয়েন্দা।

“ধন্যবাদ, মিঃ বোস। আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।”
বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

আমি বললাম—“এ খবরের মামলায় আপনারা আমায়
জড়াতছেন না ত?”

গোয়েন্দা হেসে উঠল। তারপর বললে—“না, আপনার
কোন ভয় নেই।”

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম—“সত্যি কথা
বলতে কি, মেয়েটির সম্বন্ধে আমি ত বিশেষ কিছুই জান-
তাম না—তবু আপনারা আমার নিকট কেন এলেন,
বুঝতে পাচ্ছি নে।”

“তার ডাইরী-আমাকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছে,
মিঃ বোস।”

“তার ডাইরীতে কি আমার সম্বন্ধে কিছু লেখা
আছে?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

জবাব হল—“কালই জান্তে পারবেন।”—বলেই লোকটি বেরিয়ে গেল।

তার শেষোক্ত কথা কয়টি আমার ভাবিত করে তুলল। বুঝলাম, ভবিষ্যতের যবনিকার আড়ালে আমার জন্তে আরও দুঃখ সঞ্চিত হয়ে আছে—না হলে পৃথিবীতে এত লোক থাকতে রমলা আমার নাম তার ডাইরীতে উল্লেখ করল কেন? পারিবারিক কলহের কথা ভেবে আমার মন আরও উদ্বেল হয়ে উঠল। এ সব ব্যাপার স্ত্রীর কানে গেলে আর রক্ষা নেই। একেই ত স্ত্রী রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন।

আফিস থেকে বেরিয়ে একখানা সাক্ষ্যসংখ্যা খবরের কাগজ কিনে পড়তে লাগলাম। সাংবাদিকদের মতে মেয়েটির মৃত্যুর একমাত্র কারণ প্রেম।

আমার দুর্ভাবনা কেটে গেল, যখন দেখলাম যে কাগজে কোথাও আমার নামের উল্লেখ নেই।

পরদিন সকালবেলা কাগজ খুলতেই আমার সর্বদ্বন্দ্ব—যেন অবশ হয়ে এল—আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ী পেটার শব্দ আমি শুনে পেলাম—মনে হচ্ছিল, আমার দেহ থেকে তাজা রক্তের ফিন্‌কি বেরুচ্ছে। আমি দেখলাম কাগজে আমার ফটো ছাপান হয়েছে—আর তার নীচে লেখা রয়েছে—“মৃত রমলার বাক্সে প্রাপ্ত।”

আমার মনে হল যেন আমার পায়ের নীচ হতে পৃথিবী সরে যাচ্ছে। মেয়েটির ডাইরী হতে কোন কোন অংশ কাগজে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আমি এক নিঃশ্বাসে পড়লাম—“মেয়েটি তার প্রেমের প্রতিদান পায় নি।” আমি পড়লাম,—রমলা প্রথম দর্শনেই আমায় ভালো বেসেছিল। কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবধান ছিল এ মিলনের পরিপন্থী; তাই সে হতাশ হয়ে পড়ে। তারপর এই সুদীর্ঘ আটটি বৎসর সে আমার কথা স্মৃতিপটে গঁথে রেখেছিল—প্রাণ-সম্ভাষণ মুহূর্ত মুহূর্ত পতন-ধ্বনিতে মনে যখন জাগত বিরহ-ব্যথা, তখন স্মরণ করত সে আমাকে—নিশীথ রাতে চোখে যখন ঘুম আসত না, তখন জ্যোৎস্নাভরা আকাশ-তলে দাঁড়িয়ে সে আমায় করত তার প্রেম নিবেদন।

পড়া শেষ হল। আমার মনে হল, আমি এখনই হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। বেচারী রমলার জন্তে আমার

ভাবনা হয় নি; ভাবনা হয়েছিল বাড়ীতে স্ত্রীর লোহন গঞ্জনার কথা ভেবে। স্ত্রী কি মনে করবে, এ ঘটনার পরে এই একটা ঘটনা অবলম্বন করে হয়ত আমার বিবাহিত জীবন বিড়ম্বনায় ভরে উঠবে।

এ চিন্তাধারার সংঘাত আমাকে অস্থির করে তুলল; হা ভগবান! দুঃখ তুমি দিতে চাও; কিন্তু এ হীন কলঙ্কের বোঝা আমার মাথায় এমনি করে চাপিয়ে না দিলে কি তোমার সৃষ্টির ধারা ব্যাহত হত! আমার দুঃখ বেহে বড় বড় দুঃখোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল...। মাছুষ এমনি স্বার্থপরায়ণ যে মৃত রমলার জন্ত শোক করবার অবকাশ আমার মনের আকাশে ছিল না তখন। ক্ষণে ক্ষণে স্ত্রীর জরুতী-কুঞ্চিত মুখমণ্ডল আমার অন্তরাকাশকে বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ করে তুলছিল; নীড়বিতাড়িত বিহ্বলের মত আমার ক্লান্ত পাখা ছুটি চাইছিল শুধু একটুখানি আশ্রয়, একটু মেহসজল সহানুভূতি—আমি নিরপরাধ।

সারাদিন আমি রাস্তায় রাস্তায় উদ্বেগ হীনভাবে ঘুরে বেড়লাম। বাড়ী গিয়ে একটা বিস্ত্রী আবহাওয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার ভয় হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত রাত প্রায় নটার সময় আমি যেন আমার ভিতরে একটু বল পেলাম। এ ঘটনার জন্তে দায়ী ত আমি নই; তবে এর জন্তে কেন আমি দুঃখ ভোগ করব!

স্ত্রী আমার জন্তে অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ী ঢুকতেই তিনি বললেন,—“আজ তোমার বড় দেৱী হয়েছে, এত দেৱী করলে কেন গো?”

স্ত্রীর কথার স্বর নরম এবং শান্ত। তাঁর নিকট হ’তে এ ব্যবহার আশাতীত—আমি অবাক হয়ে গেলাম।

“তোমাকে বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে”—স্ত্রী বললেন।

“হ্যাঁ, আমি সত্যিই শ্রান্ত”—আমি জবাব দিলাম।

“তোমার বুঝি কিছুই খাওয়া হয় নি?”

আমি সংক্ষেপে বললাম—“না”।

তিনি রেকাবীতে করে কিছু খাবার নিয়ে এলেন। খবরের কাগজ টেবিলের উপরই পড়ে ছিল—তাতে আমি আমার ফটোটা দেখতে পেলাম।

আমি স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললাম—“আমি সত্যিই বড় দুঃখিত।”

“কার জন্তে?”

“তোমার জন্তে, তুমি মনে কষ্ট পাচ্ছ।”

“আর আমার মনে হয় তোমার নিজের জন্তেও,—
তিনি বললেন। ক্ষণেক চুপ করে থেকে তিনি আবার
বললেন—“আমাদের দু’জনের চাইতে রমলার দুঃখ
কি বেশি ছিল না?”

স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব কোনপথে চলছে বুঝতে না পেরে
চুপ করে রইলাম।

তিনি টেবিল থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে এক দৃষ্টে

আমার ফটোখানার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর
আস্তে আস্তে বললেন—

“আমি জানি, মেয়েটা কেন তোমায় ভাল
বেসেছিল; যে কোন মেয়েই তোমাকে ভালবাসতে পারে
বলেই তোমাকে সন্দেহ করতাম”—আশ্চর্য! তাঁর চোখ
ভিজ্জে উঠলো।

সেদিন থেকে সংসারে ফিরে এসেছে শান্তি। যে
কলঙ্ক একটু আগেও অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল, তাই
আজ আমার কাছে অশীর্বাদ রূপে ধরা দিয়েছে।

নব-মেঘ

—শ্রীলীলা দেবী

আজি এ সঘন বরষায়
কি ভেবে প্রাণ মোর উথলায়,
কি কথা উঠে প্রাণে ছলে ছলে
না জানি কে যে এলো পথ ভুলে
আমারে তার করি নিতে চায়—
আজি এ সঘন বরষায়।

এখনো ফোটেনি ত কেতকী
একথা তারে আমি কব কি?
পবন সুরভি বনে মাতে নি,
শয়ন কদমরেণু পাতে নি,
মরম দুয়ারে শুধু নিরখি,
এখনো ফোটেনি ত কেতকী।

চরণ-ছায়া তার আঙনে
গহন তিমির ঘন শাঙনে
আঁকেনি এখনো তো কোনো দাগ
তবে এ ভালবাসা অনুরাগ

জাগাল কে বাদল এক্ষণে,
পড়েনি ছায়া তার আঙনে।
নিবিড় নব মেঘ আকাশে
সজল মন্তর বাতাসে
কাহারে মনে পড়ে কে জানে
কেহ ত নাই একা এখানে।
মধুর বাণী কার বিকাশে
নিবিড় নব ঘন আকাশে।
আজি এ সঘন বরষায়
কারুসে আখি ছুটি চমকায়
সিন্ত পল্লবে বীথিকায়,
চামেলী চম্পক বরা ছায়,
কেবলি মনে পড়ে কেন তায়
আজি এ সঘন বরষায়!*

* ‘নব ঘন’, ‘কিশলয়’, ‘রূপহীনীর রূপ’ রচয়িত্রী।

জলধর স্মৃতি

ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস

ছপুর বেলা পরিষৎ-মন্দির হইতে টেলিফোন পাইলাম—“আজিকার সভায় বক্তাদের মধ্যে আমার নাম থাকিবে, তাহার অনুমতি চাই।” অনুমতি দিলাম। আবার সন্ধ্যাবেলা টেলিফোন আসিল যে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইল যে আমি সভায় জলধর সেন মহাশয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিব। সর্জনশ! এত কম সময়ের মধ্যে আমার মত একজন অসাহিত্যিকের পক্ষে খ্যাতনামা সাহিত্যিক জলধর সেন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাহিত্য-পরিষদে এককাল টেলিফোন ছিল না; আমারই প্রস্তাবানুযায়ী গত বৎসর পরিষদে টেলিফোন আসিয়াছে। আজ সেই টেলিফোন আমাকেই বিপদে ফেলিয়াছে। করি কি? সকালে ছুতিন ঘটা বুসিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিলাম। মনে কিন্তু বেশ জানি যে আমরা বাহার প্রণয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্থ্যদান করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছি, ইহা তাঁহার মোটেই উপযুক্ত হইবে না।

গত ২৬শে চৈত্র জলধর সেন লোকান্তরে গিয়াছেন। সেদিন কুমিল্লা সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য শেষ করিয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, আমি ও আরও কয়েকজন প্রতিনিধি ত্রিপুরার মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজধানী আগড় তলায় গিয়াছি। সন্ধ্যায় এক বৃহৎ সভায় ত্রিপুরার জন সাধারণ আমাদিগকে একখানি মানপত্র দিলেন। আমি প্রতিনিধিবর্গের পক্ষ হইতে পত্রের উত্তরদান করিতেছি, এমন সময়ে রেডিওযোগে সংবাদ আসিল যে জলধর সেন পরলোকগমন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সভায় তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহার পূর্বদিবস কুমিল্লার সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন-কালেই তাঁহার অল্পস্থতার সংবাদ পাইয়া সম্মিলনে তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। সাহিত্যিকদিগের সমবেত সে কামনা পূর্ণ না হইলেও, কুমিল্লা ও ত্রিপুরার সভায় তাঁহার প্রতি দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইয়াছিলাম।

বস্তুতঃ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহার প্রাণ তাঁহাদের মধ্যে জলধর সেন একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। আশি বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অন্ততঃ ষাটপয়ষটি বৎসর ধরিয়া তিনি নানা ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার “ছুতিনী” নামক ছোট উপন্যাসখানি ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যখন উহা লিখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র পনের বৎসর। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—১৮৭৫ অব্দের মধ্যে ইংরাজী ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা প্রদানের পর আমি এইখানি এবং আর এক খানি গল্পপুস্তক লিখি—তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর। এঁচড়ে-পাকা ছেলে এখন স্থলভ হইলেও ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বেও নিতান্ত দুর্বল ছিল না। তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল স্বর্গীয় হরনাথ মজুমদার মহাশয় সম্পাদিত “গ্রামবার্তায়।” এই রচনার নাম ছিল “ভঙ্গ-হরির মেলা দর্শন।” তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ষোল বৎসর। বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার এই অহরাগ পরিণত বয়সে তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ লেখকে পরিণত করিয়াছিল।

তাঁহার সাধারণ লেখাপড়া সম্বন্ধে ইহা জানা যায় যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি বাঙ্গালা পড়িয়াছিলেন। পাশ করিতে পারেন নাই। সাহিত্য সেবার দিক দিয়া হয়ত এটা মাস্টলিক সূচনাই, কারণ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকপালগণের জীবনী পাঠে জানিতে পারা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি বাঙ্গালা সাহিত্য সেবার পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীয় নহে। তবে একথাও আমি বলিতেছি না যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি বা উচ্চশিক্ষা বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার পরিপন্থী। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র, মদনমোহন, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতির বঙ্গ সাহিত্য সেবার অদ্ভুত সাফল্য

উচ্চ শিক্ষা লাভ যে সাহিত্য রচনার ক্ষমতা লাভের পরিপন্থী নহে তাহা সপ্রমাণিত করিতেছে।

সে যাহা হউক জলধর সেন ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া শিক্ষকতা ব্রত গ্রহণ করেন। এখানে ওখানে কাজ করিয়া তিনি ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শিক্ষকের চাকরী লইয়া দেৱাদূন যান। সেইখানেই তাঁহার হিমালয় ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা মনে উদ্ভিত হয় এবং পর বৎসর তিনি হিমালয় ভ্রমণে বাহির হন। হিমালয় ভারতের প্রকৃতির প্রধান গৌরব। জলধরবাবু সত্যই লিখিয়াছিলেন: “হিমালয় একটা জগৎ।” এই হিমালয় পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গগুলি আরোহণ করিবার জন্য বহু দেশ দেশান্তর হইতে প্রতি বৎসর ইংরেজ জাৰ্মান ও ভূতি জাতির বহু সাহসী ব্যক্তি এ দেশে আসিয়াছেন এবং ঐ কার্যে অনেকে জীবনও দান করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী গৃহাভিমুখী। নিশ্চল আলম্র আমাদের পক্ষে সমধিক আরাহমপ্রদ। তাই পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জলধরবাবুর পদব্রজে ভূস্বর্গ কাশ্মীর, হৃষিকেশ, লছমনবোলা পার হইয়া বদরিকাশ্রম-গমন একটা দুঃসাহসিক ব্যাপার না হইলেও বাঙ্গালীস্বভাব ব্যাপার ছিল না। আর একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস স্মৃদুর অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া হিমালয়ের পরপারে তিব্বতে প্রবেশ করিয়া উহার রাজধানী লাগা পর্যন্ত গিয়াছিলেন। বাঙ্গালী প্রাচীন পর্যটকগণের মধ্যে ইহাদের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য দেশের সাহসী বীরস্থানীয় পর্যটকগণের অসাধ্য সাধনার অনুকরণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, পর্যটক বলিয়াই জলধর বাবুর প্রধান কৃতিত্ব নহে। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব এই দেশ-পর্যটনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সাহিত্য রচনায় তাঁহার অসামান্য সফলতা। দেৱাদূনকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার দেশপর্যটনের ফল আমরা পাইয়াছি ‘প্রবাস চিত্রে’ আর হিমালয় পর্যটনের ফল পাইয়াছি তাঁহার ‘হিমালয়’ বা ‘হিমাদ্রি’ গ্রন্থে। এই গ্রন্থগুলি যে কিরূপ সরস উপন্যাসের মতই উপভোগ্য তাহা ষাঁহার। এগুলি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। বাস্তবিক জলধরবাবুর উন্নত ধরণের সাহিত্য রচনা করিবার ক্ষমতার পরিচয় ‘হিমালয়’ গ্রন্থ

রচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী পাইয়াছে। ভ্রমণ বৃত্তান্তকে কিরূপে কবিত্বপূর্ণ ও সরস করিতে পারা যায়, সে আর্ট জলধরবাবু কিরূপে নিজস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরবর্তী কালের ‘দশদিন’ পাঠেই বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তিনি দশদিন ছুটি লইয়া বঙ্গমানেব মহারাজের সহিত কাশী ও আগরা গিয়াছিলেন। আমরাও অনেকেই বহুবার গিয়াছি। কিন্তু জলধরবাবু স্বীয় অভুলনীয় লেখনীর প্রভাবে এই তুচ্ছ ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে কিরূপ মনোজ্ঞ করিয়াছেন, তাহা ষাঁহার। তাহা পাঠ করেন নাই তাঁহাদিগকে পাঠ করিতে বলি। একটি স্থান উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি সেবার যাইতেছিলেন সেকেন্ড ক্লাসে। সেকেন্ড ও থার্ড ক্লাসে ভ্রমণের পার্থক্য তিনি লিখিতেছেন নিম্নলিখিত ভাষায়—“একে মেল ট্রেন—এক এক রাজ্য অতিক্রম করিয়া তবে দম জিরায; তাহার পর রিজার্ভ-টিকিটমারা ইলেকটিক আলোকিত, ইলেকটিক পাখাসংযুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী; তারপর বেঞ্চ জোড়া সুবিস্তৃত সুকোমল শয্যা; তাহার পর শ্রীমন্দলাল—লতিতের আনন্দোচ্ছ্বাস। আরে রাম! ইহার নাম কি ভ্রমণ। ভ্রমণ করিব তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে;—বসিব এক বেঞ্চে পাঁচ জনের স্থানে এগার জন; প্রত্যেক ষ্টেশনে আরোহণেচ্ছু যাত্রীর সহিত রীতিমত বচসা করিব; গাড়ীর দ্বারের হাতল টানিয়া ধরিয়া যাত্রীর বল পরীক্ষা করিব; ‘এ গাড়ীমে য়াংগা নেহি, হুসরা গাড়ীমে য়াও’ বলিয়া বলিয়া গলা শুকাইরা ফেলিব, আরোহণে অকৃতকার্য, প্র্যাটফরমস্থিত যাত্রীর স্মধুর বাক্য-বর্ণণে এবং নূতন নূতন সম্বন্ধ স্থাপনে কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত করিব; পাটের কলে পিষ্ট পাটের বাগুলের মত চাপা পড়িয়া বসিব—আরও কত কি করিব,—তাহারই নাম ভ্রমণ।”

এই সকল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ছাড়া ‘বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার দ্বিতীয় দান—উপন্যাস ও গল্প রচনা। ন্যূনাত্মক পঞ্চাশখানি উপন্যাস ও বিশেষতঃ—গল্প তিনি রচনা করিয়াছেন। উপন্যাসগুলি রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ প্রভৃতি উপন্যাসের মত বড় নয়—মাকারি বা ছোট সাইজের। উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার তুলনা করা

যাইবে না, কিন্তু গল্প রচনায় তাঁহার সমকক্ষ এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কাহাকেও বড় একটা দেখিতেছি না। ছোট গল্পে আজ বাংলার মাসিক সাহিত্য একেবারে প্রাবল্য। এই ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রথম প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি যে একজন বিশিষ্ট অগ্রণী এ বিষয়ে বোধ হয় সকলেই একমত। এই সকল উপগ্ৰাস ও গল্পের নায়ক-নায়িকা সকলেই বাংলার পল্লীগ্রাম হইতে গৃহীত। পল্লী-জীবনের সুখ-দুঃখের নানান দিক তিনি এই সকল গল্পের মধ্য দিয়া অতি নিপুণতার সহিত পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সর্বোপরি এই সকল গল্পের মধ্যে, বিশেষতঃ তাহাদের শেষ অংশে এমন একটা করুণাত্মক ধ্বনি আছে যে, তাহা অতুলনীয়। এটা তাঁহার নিজস্ব আর্ট। তা' ছাড়া সর্বত্রই অনাবিল হাস্য-রসের ছিট ছিট দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা শ্লেষ বা আঘাত করিবার ইচ্ছা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

বাংলা সাহিত্যে তাঁহার তৃতীয় প্রকারের দান—“কাদাল হরিনাথের জীবনী”। “গ্রাম-বাঙালি” সম্পাদক শ্রীহরিনাথ মজুমদার মহাশয় উত্তরকালে কাদাল হরিনাথ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই কাদাল হরিনাথের সাহিত্য-সাধনা, আত্মোৎসর্গ, সাধনতত্ত্ব, বাউল-সঙ্গীত প্রভৃতি জলধরবাবুর জীবন, চরিত্র ও সাহিত্য-সাধনার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কাদালের জীবনী রচনা করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়া শিষ্যের উপযুক্ত কার্য্যই তিনি করিয়া গিয়াছেন। গুরু এর চেয়ে বড় দক্ষিণা আর কি চাহিতে পারিতেন?

এই সকল গ্রন্থ রচনা ছাড়া আর এক উপায়ে জলধরবাবু বাংলা সাহিত্যের সম্যক সেবা করিয়াছিলেন। সেটা হইতেছে—পত্রিকা সম্পাদন। তিনি বহুকাল ধরিয়া “বঙ্গবাসী” “হিতবাসী” “স্বলভ-সমাচার” প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় এগার বৎসর কাল তিনি সাপ্তাহিক “বঙ্গমতী” সম্পাদকতা করেন। পরে ১৯২০ সালে তিনি “ভারতবর্ষের সম্পাদকতা আরম্ভ করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উহাকে বঙ্গীয় মাসিক সাহিত্যক্ষেত্রে

অপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পত্রিকা সম্পাদন কালে কত যে নূতন লেখক ও সাহিত্যিক তিনি নিজ হস্তে গড়িবার স্বযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাহিত্য রচনা অপেক্ষা “সাহিত্যিক রচনা” নিশ্চয়ই কম গৌরব ও কৃতিত্বের কথা নহে। তাঁহার “রবি-বাসর” প্রতিষ্ঠার মূলেও এই “সাহিত্যিক-সৃষ্টির” অভিনায়কই দেখীপ্যমান।

জলধরবাবু শুধু স্নেহলব্ধ ছিলেন তাহা নহে, স্ববক্তাও ছিলেন। বহুস্থানে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য অনেকের মত আমারও হইয়াছে। এই সকল বক্তৃতাতে তাঁহার লেখার প্রধান গুণ—করুণাত্মক ধ্বনি, স্বদেশী ভাব ও হাস্যরস দেখিতে পাইতাম।

জলধরবাবু খাটী বাংলানী ছিলেন। স্বদেশী ভাব তাঁহার সবখানেই ছিল। হয়ত তাঁহার মুখের চির ও নিত্য শোভা বর্ণামুকুটের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কেহবা কিঞ্চিৎ অমুযোগ করিবেন। কিন্তু ধূমপানের অভ্যাস বড়ই বালিহ, একবার হইলে তাহা ছাড়া একান্তই কঠিন—সেই জন্ত ক্ষমাহ। সে যাহা হউক, জলধরবাবুর অমায়িক ব্যবহার, বালক-স্বলভ সারল্য তাঁহাকে সকলের “দাদা” করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভাইস-চ্যান্সেলার কর্তৃক প্রদত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির তকমা তাঁহার ছিল না, কিন্তু বঙ্গবাসীর আদরের নিদর্শন স্বরূপ লোকমুখে প্রদত্ত এই “দাদা” উপাধি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিদারীও আকাঙ্ক্ষা করিবেন নিশ্চই কিন্তু পাইবেন না। এই সার্বজনীন “দাদা” উপাধির মধ্যে কত আত্মীয়তা, কত নৈকট্য, চরিত্র ও ব্যবহারের কত সারল্যের দ্যোতনা তাহা কি বুঝাইতে হইবে? আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি, সাহিত্য-সম্রাট, বিশ্ব-কবি আছেন, তাঁহারা অবশ্য নমস্, কিন্তু বাংলানীর “দাদা” বুঝাইতে একমাত্র জলধরকেই বুঝায়।

বাংলানী সাহিত্যিকের “দাদা” আজ স্বর্গগত। আশি বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন, সে কারণে তাঁহার মৃত্যুর জন্য শোক করিব না। তবে তাঁহার গুণমণ্ডল ভায়েরা আজ যে শোক-সভা করিয়াছেন, তাঁহার

তাঁহার উদ্দেশ্যে কেবল এই কথাই বলিবার জন্ত আসিয়াছেন যে, তাঁহারা এ জীবনে আর “দাদা” পাইবেন না। আর এই অসংখ্য ভায়েদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক তাঁহার এই সাহিত্যিক দাদার স্মৃতির উদ্দেশে

কিঞ্চিৎ পুষ্পাঞ্জলি দিবার স্মরণে পাইয়া নিজেকে ধৃত জ্ঞান করিতেছে, এই কথাই সে বলিতে আসিয়াছে। *

* গত ১৫ই জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে জলধর-স্মৃতি-সভায় পাঠিত।

প্রাচ্য বিজ্ঞা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীকুমুদিনী বসু বি-এ,

ভারতের ধন, সম্পদ, ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান, ভারতের পরাক্রম এক সময় তাহাকে অপরায়েয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ভারতের ঋষি, ভারতের সাধক, ভারতের তাপসগণ তাহাকে যেমন সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানে উন্নীত করিয়া ছিলেন, ভারতের আত্মতত্ত্বের সাধনা, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ত তপস্বী তাহাকে যে মহিমাযুক্ত গৌরবময় আসন দান করিয়াছিল তাহা অতুলনীয়। ভারতের সবই গিয়াছে কিন্তু ভারতের সাধকদিগের সাধনা ও তপস্বী এখনো এই বিংশশতাব্দীর জড়বাদের যুগেও তাহাকে সমস্ত জগতের প্রদ্বার পাত্র করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচ্য বিজ্ঞা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর পরলোক গমনে এদেশে এইরূপ একটি সাধককে হারাইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ১৯ বৎসর বয়সে বিশ্বকোষ সম্পাদন আরম্ভ করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সে উহা সমাপ্ত করেন। উহার হিন্দী সংস্করণ ৪৭ বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া ৬৬ বৎসর বয়সে শেষ করেন। যৌবন হইতে বার্লিন পর্যন্ত একই সাধনায় নিমগ্ন হইয়া ছিলেন। ৪৫ বৎসর ধরিয়া একই তপস্বায় ডুবিয়া সিদ্ধ-কাম হইয়াছিলেন। জগতে যত মনীষী জ্ঞানের সাধনায় রত হইয়া এই পৃথিবীকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্ততম। ঈশ্বর তাঁহাকে যে অপূর্ব শক্তি দান করিয়া এ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন তাহাই তাঁহাকে এই অসাধ্য কৰ্মসাধনে সিদ্ধিদান করিয়াছিল। নতুবা ১৯ বৎসরের স্বল্প শিক্ষিত, সহায় সম্বলহীন যুবকের পক্ষে এত বড় একটি কার্যের ভার লওয়া অসম্ভব ছিল। ঈশ্বরের শক্তিতে অল্পপ্রাণিত না হইলে মানুষের চক্ষে বাহা

অসম্ভব সেই কাজ কোনো মানুষ সম্পন্ন করিতে পারে না। ঈশ্বর তাঁহাকে এই বিরাট কার্য সাধন করিবার জন্তই এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার মধ্যে অনন্ত-সাধারণ অধ্যবসায়, ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিদারী ছিলেন না সত্য, কিন্তু জ্ঞানের যিনি উৎস তিনিই এই সাধকের নিকট তাঁহার অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া নিত্য-নব নব জ্ঞানায়তে তাঁহাকে সজীবিত রাখিয়াছিলেন তাই পণ্ডিতগণও যে কার্যভার লইতে সঙ্কুচিত হন, সেই কার্যে ৪৫ বৎসর রত থাকিয়া অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত তিনি তাহা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যাতা তাঁহার এই বিচিত্র জগতে যুগে যুগে এই-রূপেই পন্থকে দিয়া গিরি লঙ্ঘন করাইয়াছেন, মুককে বাগ্মী করিয়াছেন, অন্ধকে চক্ষুমান করিয়াছেন, যুগকে পণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি কোথা দিয়া কাহাকে কোথায় লইয়া যান, কোন নগণ্য দীনাত্তিদ্দীনকে দিয়া তাঁহার কোন বিরাট কার্য সাধন করান, তাহা অজ্ঞান ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, কিরূপে জানিব? তাই নগেন্দ্রনাথের মত মানুষ যে এত বড় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট বিশ্বাসের বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

নগেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন হুঃখ, বিপদ, বড়, ঝগ্ডার সহিত সংগ্রামে পূর্ণ। জন্মিয়াছিলেন অতুল ধনশালিনী পিতামহীর কোড়ে কিন্তু তাঁহার কৈশোরেই পিতামহী সর্বস্ব হারাইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন। সুতরাং সেই কৈশোরেই নগেন্দ্রনাথকে ঘোর হুঃখ, দৈন্য, অভাব

অনটন সহ করিতে হইয়াছে। অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তবে স্বর্ণ উদ্ধল হয়, তাহার মলিনতা দূর হয়। তাই বিধাতা নগেন্দ্রনাথকে দুঃখ দৈন্তের পেষণে পিষিয়া তাঁহার চিত্তকে দৃঢ় করিয়াছিলেন, দুঃখ কাঁধ্য রত হইবার যোগ্য অধ্যবসায় ও ধৈর্য দান করিয়াছিলেন। বিধাতা যাহার দ্বারা তাঁহার যে কার্য সাধন করান, তাহাকে তাহার উপযুক্ত তিনিই করিয়া লন। তাই দেখিতে পাই, একমাত্র গুণের-বিশেষ-ব্যতীত জর্জরিত হইলেও তিনি কৰ্ত্তব্য কর্ম সাধনে তিলেকের জন্তও বিরত হন নাই। এমন শোক-

জয়ী বহু কর্মবীর এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন।

যুগে যুগে যে সকল মানুষ মানবসমাজের উপকারের জন্ত তিলে তিলে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অতীতম।

আজ আমরা এই সাধকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে সমবেত হইয়াছি। তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনা-নিরত জীবনের উচ্চ আদর্শ আমাদের চরিত্রকে যদি মহত্বের দিকে লইয়া যাইতে পারে তবেই আজিকার এই সভা সার্থক হইবে। *

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত

মহানদের মন্দির

শ্রীনীগোপাল দাশ

মেসে শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগছিল না। হঠাৎ মনে হ'ল স্থলীলবাবুর কথা; ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন বাস এ দেখা। হাতে ছিল নিজের একটা এলবাম আর পরণে ছিল সাহেবী পোষাক। বাসে উঠে স্থলীলবাবুর কাছে বসতে হ'ল। ভদ্রলোক হাতের এলবামটির দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি রিপোর্টার। কথা বললাম না, চুপ করে রইলাম। তিনি পুনরায় বললেন, দেখতে পারি কি হাতের এ জিনিষটি। তখন রাগটা একটু কমে গিয়েছিল, তাই হাসিমুখে বললাম—নিশ্চয়ই।

তারপর অহুসন্ধানে তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, তাঁদের গ্রামে একটা নাককাটা বুড়ো জগন্নাথ পড়ে আছে। শুনে মনটা আনন্দে নেচে উঠল। আমি মূর্ত্তি খুঁজেই বেড়াচ্ছিলাম। মূর্ত্তি, গ্রামের ছড়া গান সংগ্রহ করাই আমার একমাত্র ব্যবসা হয়ে পড়েছিল। তাই সেদিন নাককাটা বুড়ো জগন্নাথের কথা মনে হতেই সেই সময়ে বেরিয়ে পড়লাম স্থলীলবাবুর বাড়ী যাব বলে। কাপড় বদলাবার মত সময়ের ফুরসৎ হ'ল না। একটা চাদর নিয়েই হাওড়া ষ্টেশনে ছুটলাম। এসে দেখি ট্রেন মাত্র কয়েক মিনিট হ'ল ছেড়ে গেছে। আর বিকালে সাড়ে তিনটায় ট্রেন, রাত্রিটা

তারকেখর থাকতে হবে। মেসে ফিরতে আর ইচ্ছা হ'ল না, ওয়েটিং রুমে বসে থাকলাম, যা হয় বিকালের ট্রেনে যাব। রাত্রিতে শীতে নাহয় কষ্ট পাব। সন্ধ্যার পূর্বে তারকেখর এসে পৌঁছলাম। এসেই মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দিরের গাত্রদেশ মধ্য যুগের স্থম্বর কারুকাণ্ডে ভরা। রাম রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি রামায়নের দৃশ্যাবলী ও বৈষ্ণব ধর্মাবলীর বহু চিত্র ইষ্টকথণ্ডের উপর খোদিত। শিল্পীর স্থল তুলিকার টানে প্রতি মূর্ত্তিটি যেন জীবন্ত। এই ভাবে তন্ময় হ'য়ে মন্দিরের কারুকাণ্ড দেখছিলাম এমন সময় মনে হল তাই তো, আমি হিন্দুর ছেলে, মন্দিরের দেবতাকে তো দেখলাম না। তাকে তো প্রণাম করলাম না। লোকে নাস্তিক বলবে, মনটা কেমন হয়ে গেল। ভাবলাম দেবতা যদি রেগে যান। তাই ছুটে গেলাম কিছু মিষ্টি কিনে এনে ভোগ দিতে। ভোগ দিবে প্রণাম করে বেরিয়ে আবার মন্দিরের কারুকাণ্ড ভাল করে দেখে বাজার দেখতে গেলাম। দেখলাম জাপানী পুতুল দোকান ছেয়ে ফেলেছে। আর তার পাশে একটা দোকানে দেখলাম দেশী কুমোরের হাতে গড়া কতকগুলি দেবমূর্ত্তি।

মূর্তিগুলি আমার বেশ লাগল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
যাবতীয় কলার সংগ্রহশালায় রাখবার জন্য দুটি
পুতুল বেছে কিনে নিলাম। বাজার থেকে আসবার

গেছি। আজ বাংলার স্থলী সমাজ পটুয়াদের আঁকা পট
সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। এদের আঁকা পট নিয়ে আজ থিসিস্
লিখা হচ্ছে। অঙ্কনপদ্ধতি নিয়ে কত আলোচনাই না



লালাজীউর মন্দির

সময় একটা কুমোর দেখি তার বাড়ীর দাওয়ায় বসে
পুতুল গড়ছে। অমনি তার কাছে গেলাম। পট
চিত্র আঁকতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, পট কেউ
আর কেনে না তাই আঁকা ছেড়ে দিয়েছি, ভুলেও

চলছে, অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন এদের পট কেউ
দেখে নাই, একটু উৎসাহ ও দেয় নাই।

পরদিন সকালের ট্রেনে বি, পি, রেলওয়ের একখানা
টিকিট কিনে গাড়ীতে চড়ে বসলাম। সেই মাছাতার

আমলের গাড়ী, জোড়াতালি দিয়ে কোন প্রকারে কাজ চালান হচ্ছে। যথারীতি গাড়ী ছাড়ল ও ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মহিষের গাড়ীর মত চলল—মাঠের মাঝ দিয়ে! কিছুদূর যেতেই মাঠের মাঝে গাড়ী থেমে গেল।

মাঁচা। ষ্টেশন ঘরের ভিতরেও একটি মাঁচা দেখা গেল। ভাল করে দেখা গেল না, কি জানি সেই মাঁচাই ষ্টেশন মাঠারের চেয়ার টেবিল হবে। এক মাইল, দুই মাইল অন্তর ষ্টেশন। তবে দু-একটা ষ্টেশন দালান যেন



জ্যোতেশ্বরনাথের মন্দির

মুখ বার করে দেখি একটি ষ্টেশন সিগনালনই, প্লাটফর্ম এমন নয়। এমনি করে ছোট ছোট ষ্টেশন পার করে নাই, কিছুই নাই। ঘরখানি খড়ের। তাও আবার যে খড়ে দুপাশে অনেক আখের খেত রেখে আমাদের দেশে ঘর ছাওয়া হয় সে খড়ের নয়। গরুর জগৎ গাড়ী কানানদী যখন পৌঁছিল তখন বেলা ১০টা যে খড় রাখা হয়, সেই খড়ের। যাত্রীদের জগৎ বাশের হবে।

ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে খোঁজ নিয়ে কোন রকমে তো
স্বশীল বাবুর বাড়ীতে এসে উঠলাম। স্বশীলবাবু বাড়ীর
বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে বাঙ্গালী পোষাকে
দেখে হয় তো চিনতে পারছিলেন না। পরে পরিচয় দিতে

স্বশীল বাবুর পরিচয় এখানে একটু দেওয়া দরকার।
গ্রেটওয়ারের সময় তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তারপর আর
চাকরী না করে দেশেই আছেন। নিজের ছোটখাট বা
একটু জমিদারী আছে তাই দেখাশুনা করেন। আর



গোষ্ঠেশ্বরনাথের মন্দির

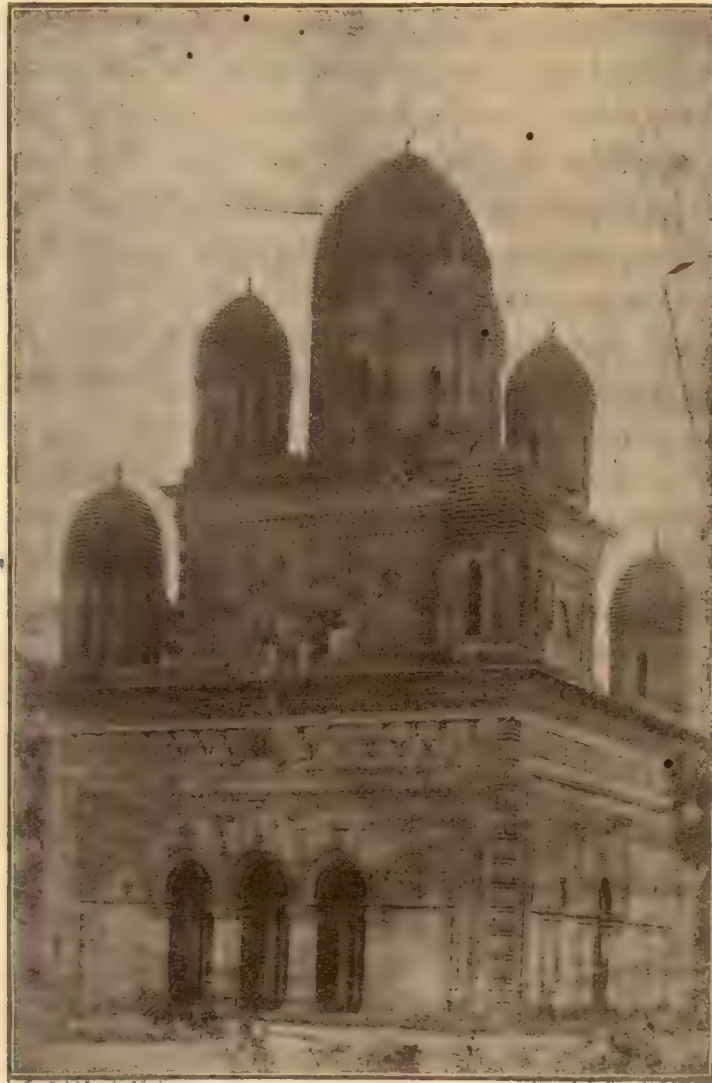
বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে খোকা খুকীদের সঙ্গে পরিচয়
করিয়ে দিলেন।

স্বশীল বাবুর ছেলেমেয়েগুলি বেশ বুদ্ধিমান, ভাব করে
নিতে বেশী সময় লাগল না।

অবসর সময়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে লেখা পড়া করে দিনগুলি
কাটিয়ে দেন। মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে কিছুদিন থাকেন,
যাতে ছেলেমেয়েগুলি বাইরের আলোক পায়।

জুগুপ্তে যথারীতি আহালাদি করে সেই মূর্তি দেখতে

গেলাম। মূর্তিটা একটা প্রকাণ্ড দিঘীর পাড়ে পড়ে আছে। মূর্তিটা মাটিতে বসে গিয়েছিল। মাটির নীচে মূর্তিটার জুখানি হাত ও নাকটা ভাঙা ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি। কৃষ্ণবর্ণের বেশ বড়। মূর্তি, দৈর্ঘ্যে ৪ হাত না। তারা বলতে লাগল—বাবু, এ মূর্তি কি আর খুঁড়ে করা যাবে, যতই খুঁড়বেন ততই এ বেড়ে যাবে।



ব্রহ্মময়ীর নবরত্ন মন্দির

আমরা মূর্তি দেখতে যেতেই কতকগুলি লোক জমে গেল, তারা বলতে লাগল—মূর্তিটা সত্যযুগের। মুসলমান অত্যাচারের ভয়ে পালাচ্ছিলেন, কিন্তু লোক এসে পড়ায় এইখানেই বসে পড়েন। লোকে একে নাককাটা বুড়ো জগন্নাথ বলে।

একবার আমরা ১৬ হাত পর্যন্ত খুঁড়ে তথাপি মূর্তি যেমন তেমনই ছিল। এ কথা শুনে একটু হেসে চলে আসলাম। মূর্তির সন্ধানে গেলাম! এই মহানদ সন্ধ্যাে অনেক গল্প-গুজব

কার লোকদের মুখে শুনে পাওয়া যায়। কেউ বলেন, মাকাতার আমলে নির্মিত বলে ইহার নাম মহানদ হয়েছে, আবার কেউ বা বলেন নিকটবর্তী একটা বটগাছে ক্রোঞ্চ পক্ষী বাস করত। কালক্রমে পক্ষী গর্তবতী হলে পক্ষীকে মহাশঙ্খের মাংসের জন্য অমরোধ জানায়। তার অমরোধে পক্ষী একদিন পক্ষীগণকে সঙ্গে নিয়ে মহাশঙ্খের জন্য সমুদ্রে যাত্রা করে। কিন্তু সেখানে পক্ষীকে মহাশঙ্খের হাতেই প্রাণ দিতে হয়। পক্ষীগণ রোদন করতে করতে স্বস্থানে ফিরে আসে এবং দুইটি শাবক প্রসব করে। কালক্রমে শাবক দুইটি মায়ের মুখে পিতার এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনে মহাসমুদ্র অভিমুখে যাত্রা করে এবং মহাশঙ্খকে এনে মাকে সন্তুষ্ট করে। তারপর হতেই সেই শঙ্খ সেই গাছেই থেকে যায়। পরে একদিন ঝড় বৃষ্টির সময় এই শঙ্খ বেজে উঠে এবং সেই শব্দ শুনে দেবতারাই সেই স্থানে এসে রাজ্যের মধ্যেই এক সুন্দর পুরী নির্মাণ করেন।

কিন্তু দত্তীর মূল্য যাহা হউক না কেন মহানদ যে প্রাচীন বাংলায় একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল তার যথেষ্ট নিদর্শন এখনও মহানদের নগরপাড়ার সুন্দর ব্যাপী অত্যাচ্ছ ইষ্টক স্তূপ, প্রাচীন জলাশয়, মন্দিরাদি ও ভগ্ন দেবমূর্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়াও বহু প্রাচীন গ্রন্থেও মহানদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহানদে আমি শ্রীপ্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

অতিথি হই। তিনি আজ ২০২৫ বৎসর যাবৎ মহানদের প্রাচীন কীর্তিকলা নিয়ে গবেষণা করে দুইখানি বই লিখেছেন।

প্রথমে আমরা মহানদের নগর—পাড়ার অত্যাচ্ছ স্তূপ দেখতে গেলাম। দেখলাম প্রভুতত্ত্ব বিভাগ কয়েক বৎসর যাবৎ সেখানে খনন কার্য্য করছেন। এই খনন কার্য্যের ফলে হয় তো একদিন মহানদের প্রকৃত ইতিহাস ধরা পড়বে। স্তূপের নিকটেই ৬জটেশ্বরনাথের মন্দির নামক সুপ্রশস্ত রাক্তা ও জীবৎকুণ্ড নামক এক কুণ্ড। এই জামাই জাম্বাল ও কুণ্ড সম্বন্ধে বেশ সুন্দর সুন্দর গল্প স্থানীয় লোকদের মুখে শুনে পাওয়া যায়। এই কুণ্ডের জল মরা মানুষের গায় দিলে সে তখনই বেঁচে উঠত। মুসলমান আক্রমণের সময় মহানদের রাজার সৈন্যগণ এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কুণ্ডের সজীবনী শক্তি প্রভাবেই পুনর্জীবন লাভ করে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করত। মুসলমানগণ এই কথা জানতে পেরে কুণ্ডে গোমাংস নিক্ষেপ করেন।

এ ছাড়াও আমরা ৬ব্রহ্মময়ীর মন্দির, লালজীউর মন্দির, বেনে রাজার হাতীশালা, অত্যাশ্চর্য্য পাথর ও নানা ভগ্নমূর্তি দেখেছিলাম। এ প্রবন্ধে মহানদের কয়েকটি মন্দিরের ফটো প্রকাশিত হল। ফটোগুলি ডাঃ প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্তে প্রাপ্ত। এর জন্য তার নিকট

আমরা কৃতজ্ঞ।

সুজনের গান

শ্রীগিরীন চক্রবর্তী

বুকের জালা ঢেকে রাখি দিয়ে মুখের হাসি।
আর না তুমি বাজাও কালা তরল-বাঁশের বাঁশী ॥
তোমার বাঁশীর ধ্বনি শুনে,
জলে মরি মন-আগুনে,
রইতে নারি, সইতে নারি, আঁখিজলে ভাসি ॥
গোপন হয়ে লুকিয়ে আমি আছি অভাগিনী,
আগে-পাছে চলে আমার শাউড়ী, ননদিনী।
সবার কাণে কপাট দিয়া
বাজাও বাঁশী চতুরিয়া,—
করবো দেখা ছল করিয়া কদম-তলায় আমি' ॥

টিউব রেলওয়ে

শ্রীরাধাতুষণ বসু

লণ্ডন সহরে কোথায় যে সর্বপ্রথম টিউব রেলপথ তৈরী করা হয় সে সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া মুশ্কিল। লণ্ডনের অন্তর্গত টাওয়ার হিল (Tower Hill) নামক উঁচু ঘাটগার কাছেই লণ্ডনের সর্বপ্রথম টিউব রেলপথ করা হয় বলে অনেকের বিশ্বাস। এই রেলপথ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত করা হয় এবং তা'র কন্ট্রাক্টর ছিলেন জেমস হেনরী গ্রেটহেড (James Henry Greathead) তাঁরই নামানুসারে গ্রেটহেড শীল্ডের এ রকম

এ রেলওয়ে ট্রেনের গাড়ীতে কোনও জানালা থাকত না— গাড়ীর বেষণুলো শক্ত কাঠের তৈরী করা হত। এই সর্ব প্রথম টিউব রেলওয়ে লণ্ডনের অন্তর্গত স্টকওয়েল (Stock well) নামক স্থান হ'তে কিং উইলিয়াম স্ট্রিট (King William Street) পর্য্যন্ত ছিল। এই রেলপথটি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড (তখন প্রিন্স অব ওয়েলস্) কর্তৃক খোলা হয় এবং এটিকে তখন উনবিংশ শতাব্দীর আশ্চর্য্যময় জিনিষের মধ্যে একটি বলা হ'ত।



একটি আধুনিক টিউব টেশন

নামকরণ হ'য়েছে। এই টিউব রেলওয়ে বেশীদিন চলেনি—সেইজন্তে তা'কে সর্বপ্রথম টিউব রেলপথ বলা চলে না। সত্যিকার সর্বপ্রথম টিউব রেলপথ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং এ বছর লণ্ডনের City & South London Railway নামক রেলওয়েটি চলতে কে করে। এই সর্বপ্রথম টিউব রেলওয়ের গাড়ীগুলো যেতান্ত অল্পত রকমের ছিল। মাটির নীচ দিয়ে ট্রেন বাবে—সুতরাং জু'ধারে কিছুই দেখার উপায় নেই তাই

এই রেলপথে প্রথম প্রথম বহুদিন পর্য্যন্ত মেরামত, রং লাগান প্রভৃতি কাজের জন্তে গাড়ীগুলোকে লিফ্ট (lift) নামক ভার উত্তোলক যন্ত্রের সাহায্যে মাটির ওপরে আনতে হ'ত।

প্রথমকার টিউব রেলপথের টানেল বা সুড়ঙ্গের ব্যাস ছিল দশ ফুট দু'ইঞ্চি। কিন্তু ক্রমে অপেক্ষাকৃত বড় গাড়ী যাওয়ার জন্তে আরও চওড়া সুড়ঙ্গপথ তৈরী করা হ'ল। বর্তমানে লণ্ডনের সমস্ত টিউব রেলওয়ে টানেলের ব্যাস

এগার ফুট সওয়া আট ইঞ্চি। অল্পদিন পূর্বে লণ্ডনের সমস্ত টিউব রেলপথ মেরামত করা হ'য়েছে এবং আরও অনেক নতুন পথ খোলা হ'য়েছে—মধ্যে মধ্যে নতুন জংশন স্টেশনও স্থাপিত হ'য়েছে।

প্রথম প্রথম টিউব রেলপথ তৈরী করিতে বড়ই অসুবিধা পেতে হ'য়েছিল। তখনকার টানেল বা সুড়ঙ্গ উপর থেকে বেশী নীচে নিয়ে যাওয়া হ'ত না—কলে, টানেল তৈরী করতে করতে মাটির নীচস্থ ড্রেন, জলের পাইপ প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যেত। আজকাল রাস্তা থেকে অনেক নীচে টিউব রেলপথ তৈরী করা হয়—সুতরাং জলের পাইপ, ড্রেনের পাইপ, ইলেক্ট্রিক এবং টেলিফোনের তার প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যাইহোক, প্রথম প্রথম এই রকম নানাবিধ অসুবিধার পরে টানেল তৈরী করা হল। কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠল, কি উপায়ে ট্রেন চালান হবে ঐ সুড়ঙ্গ পথে। মাটির নীচ দিয়ে টানেল রেলপথ তৈরী করার জন্তে যে বিল (Bill) অর্থাৎ আইন পাশ করান হয়েছিল তাতে বিশদ ভাবে বলা ছিল যে ঐ নতুন রেলওয়েতে ইঞ্জিন চালান নিষিদ্ধ কারণ, তাহলে ধোঁয়া, বিসাক্ত গ্যাস এবং ঝুল-কালিতে টানেল ভাঙে হয়ে যাবে এবং তা' স্বাস্থ্যের পক্ষেও হানিকর। সুতরাং মাটির নীচে টানেল পথে যে এঞ্জিন চলবে তা সম্পূর্ণ ধোঁয়াবিহীন এবং শরীরের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর গ্যাস-বিহীন হওয়া চাই। সেইজন্তে এঞ্জিনে কয়লা ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে একরকম বিশেষভাবে প্রস্তুত ইটের চুল্লী যুক্ত এঞ্জিন প্রস্তুত করা হ'ল। কিন্তু ঐ প্রকার এঞ্জিনে বাষ্প এত শীঘ্র নিশেষ হ'য়ে যেতে লাগল যে মাত্র চার মাইল পথ যাওয়ার পূর্বেই এঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও মাঝপথে অচল হয়ে থাকত। যাত্রীরা তাতে অনেক রকম অসুবিধা ভোগ করত। এই জন্ত এই রকম এঞ্জিন খুব বেশী দিন চলল না। এই রকম এঞ্জিনে কয়লা ব্যবহার করা হত না বলে কোনও প্রকার ধোঁয়া বা গ্যাস হ'ত না বটে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও নানা অসুবিধার জন্তে বেশী দিন চালান গেল না। অতঃপর ফাউলার (Fowler) নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার সম্পূর্ণ ধোঁয়া এবং গ্যাসবিহীন এঞ্জিন তৈরী করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই ফাউলারই মাটির নীচে টানেল রেলপথ তৈরী করেছিলেন। তিনি বহু চেষ্টা করে একটি এঞ্জিন তৈরী করলেন—তাতে কোনও রকম ধোঁয়া, গ্যাস অথবা ঝুল কালি হ'ত না এবং সেই এঞ্জিনটিকে ফাউলার্স গোস্ট (Fowler's ghost) অর্থাৎ ফাউলারের ভূত বলা হ'ত। কিন্তু এই এঞ্জিনটিও কার্যকরী হল না এবং কিছুদিন পরেই এটিকে চালান বন্ধ করা হল। পরে অল্প রকম এঞ্জিন তৈরী করা হল এবং অনেক দিন পর্যন্ত মাটির নীচে টানেলে ষ্টীম এঞ্জিনই চলত। পরে অবশ্য ইলেক্ট্রিক মোটরে চলতে আরম্ভ করল এবং এখনও পর্যন্ত সেই ভাবেই চলছে ট্রামের ইলেক্ট্রিক মোটরের মত। এখন পৃথিবীর যেখানেই টিউব রেলওয়ে আছে সেখানেই ইলেক্ট্রিক ট্রেন চলে।

টিউব রেলপথের জন্তে লণ্ডনের নিকটবর্তী সহরতলী এবং পল্লীগ্রামগুলোরও যথেষ্ট উন্নতি হ'য়েছে এবং তা'রা এখন সহরের মধ্যে এসে পড়েছে। লণ্ডনের অন্তর্গত গোল্ডার্স গ্রীণ (Golders green) নামক পল্লী লণ্ডনের অত্যন্ত জনবহুল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল, চেয়ারিং ক্রস (Charing Cross) নামক স্থান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত কিন্তু তা' সত্ত্বেও গোল্ডার্স গ্রীণ সহর থেকে বহুদিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল। কুড়ি বছর পূর্বে এই গোল্ডার্স গ্রীণ সামান্য পল্লী অঞ্চল ছিল বললেই হয়। সহর থেকে সাধারণ রেলওয়ে ট্রেন গোল্ডার্স গ্রীণে যেতে পারত না, কারণ, সহর থেকে ঐ অঞ্চলে যেতে হ'লে মাঝখানে পার্লামেন্ট হিল (Parliament Hill) নামক একটি ছোট পাহাড় বিশেষ অবস্থিত ছিল এবং সাধারণ ট্রেন অত উঁচুতে উঠতে পারত না। কিন্তু টিউব রেলওয়েতে সে রকম কোনও অসুবিধা নেই—মাটির নীচ দিয়ে যে দিকে ইচ্ছা সোজা পথে ট্রেন চালান যায়। গোল্ডার্স গ্রীণ পল্লী পর্যন্ত টিউব রেলওয়ে তৈরী করার পরে ঐ অঞ্চল এখন সহরের খুবই কাছে এসে পড়েছে এবং মাত্র পনের, কুড়ি মিনিটের মধ্যেই গোল্ডার্স গ্রীণ থেকে লণ্ডনের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল, পিক্যাডিলি (Piccadilly), ব্যাঙ্ক (Bank), চেয়ারিং ক্রস (Charing Cross), ট্রাফাল্গার স্কোয়ার (Trafalgar Square) প্রভৃতি

স্থানে পৌছান যায়। এখন প্রতি বছরে প্রায় সওয়া কোটি লোক গোন্ডারুস গ্রীণ অঞ্চল থেকে টিউবে যাতায়াত করে।

লণ্ডনের আণ্ডারগ্রাউণ্ড্ রেলওয়েতে টানেলের অংশ ৭২ মাইল। এই পরিমাণ টানেল প্রায় সমস্তই লণ্ডন সহরের মধ্য অবস্থিত। লণ্ডনের সহরতলী এবং অতি নিকটবর্তী স্থানেও আণ্ডারগ্রাউণ্ড্ রেলওয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই সকল স্থানে মাটির নীচে দিয়ে ট্রেন যায় না। ও সকল অঞ্চলে সাধারণ ট্রেনের মত মাটির ওপর দিয়েই টিউব্ ট্রেন যায়, কারণ এই সকল স্থানে লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে জমীর দামও খুব সস্তা। সুতরাং সেই সকল অঞ্চলে আর বহু অর্থব্যয়ে মাটির নীচে টানেল তৈরী করে ট্রেন চালানর প্রয়োজন হয় না।

টিউব্ রেলওয়ে এবং সাধারণ রেলওয়ে লাইন সমান চওড়া হয়।

সাধারণ রেলপথ যা' আমরা দেখে থাকি, তা'তে দু'টি লাইন বা লোহার পাটি থাকে এটা আপনারাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এবং সেই লোহার পাটির ওপর দিয়েই ট্রেন যাতায়াত করে তা'ও জানেন। কিন্তু মাটির নীচে টিউব্ রেলপথে সাধারণ রেলপথের মত দু'টি লোহার পাটি ত-থাকেই, তা' ছাড়া এ দু'টি লোহার পাটির মাঝখানে আর একটি তৃতীয় লোহার পাটি থাকে। দু' পাশের দু'টি লোহার পাটির ওপর দিয়ে ট্রেন আসা-যাওয়া করে—মাঝখানের তৃতীয় লোহার পাটিতে শক্তিশালী বিদ্যুৎ-প্রবাহ থাকে। ট্রেন আসা-যাওয়ার সময়ে এই তৃতীয়



টিউবট্রেনের গাড়ীর ভিতরের দৃশ্য

লণ্ডনের টিউব্ রেলওয়ে এখন লণ্ডনের এলাকা ছাড়িয়ে বাহিরে অস্ত্রান্ত্র সাধারণ রেলওয়ের সঙ্গে মিশে গেছে—সুতরাং এখন লণ্ডন থেকে গাড়ী বদল না করে ইংলণ্ডের অনেক স্থানে যাওয়া যায়। লণ্ডন এবং লণ্ডনের কাছাকাছি খানিকদূর পর্যন্ত টিউব্ ট্রেন মাটির নীচে চলে—পরে সাধারণ রেলওয়ে ট্রেনের মত চলে। কিন্তু এই রকম রেলওয়ে লাইন খুব বেশী নেই; কারণ, টিউব্ রেলওয়ের লাইনগুলো সাধারণ রেলওয়ে লাইন অপেক্ষা কিছু কম চওড়া। সেইজন্মে এখন চেষ্টা হচ্ছে যা'তে করে

লোহার পাটি থেকে বিদ্যুৎ নেয় এবং তা'রই সাহায্যে ট্রেনের মোটর চলে। আপনাদের মধ্যে যা'রা কলকাতা বাস করেন তাঁ'রা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, ট্রামগাড়ী বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলে এবং ট্রাম লাইনের মাথা ওপরকার একটি মোটা তামার তারের সাহায্যে ট্রামে ইলেক্ট্রীক মোটর চালানর অঙ্গে ইলেক্ট্রীসিটি সরবরাহ করা হয় এবং একটি মোটা লোহার ডাণ্ডার সাহায্যে ট্রামের মোটর মাথার ওপরের তার থেকে এই বৈদ্যুতিক শক্তি নিঃখাকে। টিউব্ ট্রেনের এঞ্জিনও ট্রামের মত ইলেক্ট্রীক

মোটরে চলে। তবে টিউব ট্রেনের এঞ্জিন ট্রামের মত মাথার ওপরের তামার তার থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি না নিয়ে, গাড়ীর নীচেকার ঐ তৃতীয় লোহার পাটি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি নেয়—এইটুকুই যা তথ্য! যদি কোনও যাত্রী দৈবাৎ ঐ তৃতীয় লাইনটির ওপর পড়ে যায়, তাহলে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় কিংবা সে গুরুতরভাবে আহত হয়। যদি কোনও কারণে গাড়ীর কল কজা বিগড়িয়ে গিয়ে গাড়ী অচল হয়ে যায় তখন ট্রেনের ড্রাইভার অথবা গার্ড নিকটবর্তী স্টেশনে টেলিফোনে খবর দিয়ে দেয় এবং তখন সেই স্টেশন থেকে ইলেক্ট্রীসিটি সরবরাহ করা বন্ধ রাখা হয়। যাত্রীরা তখন গাড়ীর পিছনদিকের পথ দিয়ে নেমে টানেলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে নিকটবর্তী স্টেশনে চলে যায়। টিউব ট্রেনের গাড়ীগুলো এননি ভাবে তৈরী যে এক গাড়ীর মধ্যে দিয়ে অল্প গাড়ীতে যাওয়া যায়—সুতরাং গাড়ী অচল হয়ে গেলে সমস্ত যাত্রীই গাড়ীগুলোর সাধারণ দরজা দিয়ে না নামতে পেরে পিছনের দরজা দিয়ে টানেলের মধ্যে নামতে পারে। আবার, কোনও কোনও লাইনে ড্রাইভার নিকটবর্তী স্টেশনে টেলিফোন না করে নিজেই ইলেক্ট্রীসিটি সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে—এমন ব্যবস্থাও আছে।

টিউব ট্রেনে মাত্র একজন ড্রাইভার থাকে—সাধারণ এঞ্জিনের মত দু'জন ড্রাইভার এবং তার সঙ্গী দু', তিনজন আরও লোক থাকে না। যদি এই ড্রাইভার দৈবাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলেই ব্যঙ্গ—টিউব পথে গাড়ী আপন ইচ্ছামত রেল লাইনের ওপর দিয়ে বাধাবিহীন এবং স্বচ্ছন্দগতিতে চলতে থাকবে—তা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু এই রকম আকস্মিক বিপদ থেকে ট্রেনগাড়ী এবং তার যাত্রীদিগকে রক্ষা করার জন্তে ডেড ম্যানস হ্যাণ্ডেল (Dead Man's Handle) নামক একটি বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। এটি অতি সহজ ব্যবস্থা—ট্রেনখানার এঞ্জিনের মোটর চালানর হাতলের সঙ্গে সংযুক্ত আর একটি গোল এবং চ্যাপ্টা মুণ্ডি লাগান থাকে এবং ঐ মুণ্ডি বিশেষভাবে একটি স্প্রিং থাকে, যাতে করে ড্রাইভার যতক্ষণ মোটর চালানর হাতলটিকে হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে থাকে, ততক্ষণ এই বিত্তীয় মুণ্ডিটাও কাজ করতে

থাকে। কিন্তু যদি কখনও ড্রাইভার মোটর চালানর হাতলটা হাত ছাড়া করে কিংবা দৈবাৎ তার হাত থেকে একটু আলগা করে, তাহলে ঐ মুণ্ডিটাও আলগা হয়ে যাবে এবং তখন মোটর আপনাই বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে সমস্ত ট্রেনখানির ব্রেক (Brake) আপনাই লেগে গিয়ে ট্রেনখানি আপনাই বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং কোনও প্রকার আকস্মিক বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। টিউব ট্রেনের সকল গাড়ীতেই ভ্যাকুয়াম (Vacuum) ব্রেক নামক অতি আধুনিক এবং শক্তিশালী ব্রেক লাগান থাকে।

লগনে টিউব রেলওয়েতে ট্রেন সকাল ছ'টা হ'তে রাত্রি একটা পর্যন্ত চলে—সুতরাং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় উনিশ ঘণ্টা চলে। এই জন্ত টিউব রেলওয়েতে মেরামত প্রভৃতির কাজ রাত্রি একটা হ'তে ভোর ছ'টার মধ্যে ভিন্ন করা যায় না।

লগনের টিউব রেলওয়েতে কেবলমাত্র একরকম শ্রেণীর কামরা অথবা গাড়ী আছে—থার্ড ক্লাস বা তৃতীয় শ্রেণী। কিন্তু সেই থার্ড ক্লাসের গাড়ী এত ভাল যে তা আমদের দেশের রেলওয়ে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর সমান। আবার প্রত্যেক টিউব ট্রেনে দু'রকমের গাড়ী আছে, যথা, স্মোকিং (smoking) এবং নন স্মোকিং (Non smoking) এবং প্রত্যেক ট্রেনের কামরার জানলার গায়ে বড়, বড় অক্ষরে দু'টির মধ্যে একটি কথা লেখা থাকে। যে গাড়ীতে বা যে কামরাতে “নন স্মোকিং” কথাটি লেখা থাকে, সেই গাড়ী বা কামরাতে বসে সিগারেট বা চুকট প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ—কেবলমাত্র “স্মোকিং” কথাটি লেখা কামরাতেই ধূমপান করা চলে। গাড়ীগুলোর দরজা মাঝখানে এবং খুব চওড়া—এই দরজা আপনি খোলে এবং আপনিই বন্ধ হয়। ট্রেন কোনও স্টেশনে থামলে সেই গাড়ী সাহেব একটি ইলেক্ট্রিক সুইচ টিপে দেয়—সঙ্গে সঙ্গেই সেই ট্রেনের সকল গাড়ীর দরজা আপনিই খুলে যায়। যাত্রীরা নামা-ওঠা করার পরে আবার গার্ড সাহেব আর একটি ইলেক্ট্রিক সুইচ টিপে দেয় এবং তখন সমস্ত দরজাগুলো আপনিই বন্ধ হয়। প্রতি স্টেশনে টিউব ট্রেন মাত্র আ

মিনিট বা এক মিনিট ধামে—কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই শত শত যাত্রী উঠছে, নামছে, অথচ কা'রও কোনও বিপদ আপদ হয় না—সে এক আশ্চর্যের ব্যাপার।

রাস্তা থেকে মাটির নীচে টিউব স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম (Platform) পৌঁছান কিংবা প্ল্যাটফর্ম থেকে রাস্তার ওপর উঠে আসা হয়, লিফ্ট (Lift) অথবা ভার উত্তোলক যন্ত্র এবং এসকেলেটর (Escalator) নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

যন্ত্রের সাহায্যেও রাস্তা থেকে নীচে প্ল্যাটফর্মে এবং প্ল্যাটফর্ম থেকে রাস্তায় যাওয়া আসা করা যায়। এই এসকেলেটরগুলো দেখতে আমাদের দেশের নাগর-দোলার মত—তবে নাগর-দোলার তুলনায় এসকেলেটরগুলোতে অনেকগুলো ধাপ আছে এবং সেগুলো অনবরত ঘুরতে থাকে। এক কথায় বলতে গেলে, এসকেলেটরগুলো ঘুরায়-মান সিঁড়ি ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং এগুলো ইলেকট্রিকে



আধুনিকতম এসকেলেটর

রাস্তার ওপরে অবস্থিত স্টেশন থেকে প্রয়োজন মত টিকিট কিনে টিকিট ঘরের সংলগ্ন লিফ্টের সাহায্যে প্রায় দেড়শ', দু'শ ফুট নীচে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছান যায় এবং ট্রেন আসামাত্রই ট্রেনে ক'রে গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়। আবার ট্রেন হ'তে প্ল্যাটফর্মে নেমে সেই লিফ্টের সাহায্যে দেড়শ' দু'শ ফুট ওপরে রাস্তায় এসে পৌঁছান যায়। এই লিফ্ট ভিন্ন এসকেলেটর নামক আর একটি অতি আধুনিক

চলে। এসকেল (Escale) মানে লাফিয়ে যাওয়া কথটি থেকেই এই যন্ত্রগুলোর নাম হ'য়েছে এসকেল। কারণ এই গুলোর সাহায্যে নীচে হ'তে ওপরে এবং ওপরে হ'তে নীচে যাওয়া-আসা করা যায়। এসকেলেটর অনবরত ঘুরতে থাকে ব'লে তা'তে ওঠা-নামা সময়ে একটু সাবধান হ'তে হয়, না হ'লে হেঁচক খেতে বাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লিফ্ট অপেক্ষা এসকেলেটরে

নামা-ওঠা করা স্থবিধাজনক, কারণ, লিফ্টের জন্তে প্রায়ই যাত্রীদিগকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়; তা' ছাড়া একটি লিফ্টে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীর বৈশিষ্ট্য নেওয়া চলে না। এস্কেলেটরে এই সকল অস্থবিধা নেই—এস্কেলেটর অনবরতই ঘুরতে থাকে বলে যখন ইচ্ছা তখনই তা'তে চ'ড়ে নামা-ওঠা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, একটি এস্কেলেটরের সাহায্যে বহু সংখ্যক যাত্রী ওঠা-নামা করতে

পারে—সর্বাপেক্ষা বড় লিফ্টে যত যাত্রী ধরে, তা' হ'তে বহুগুণ বেশী লোক একটি এস্কেলেটরে নামা-ওঠা করতে পারে। এই সকল এস্কেলেটর খুবই আশু আশু ঘোরে এবং সাধারণতঃ ঘণ্টায় প্রায় দু' মাইল গতিতে চলে। লিফ্ট অবশ্য তা' হ'তে দ্রুত ওঠা-নামা করে, কিন্তু তা' হ'লেও একটি এস্কেলেটর অন্যান্য আর্ট, দশটা লিফ্টের কাজ করে।

যৌগিক

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

• ৩রাধাচরণ চক্রবর্তী

ঘুমোবে বলেই যেন অতলার ঘুম আসতে চায় না। ওর এমনি হয়। ছেলেবেলা থেকেই ও' পরীক্ষা করে' দেখেছে, যখন ঘুমোবে বলে' চেষ্টা করে তখন ঘুম আসেই না, আর ঘুমোবে না বলে' স্থির করলে ঘুম ওর আসবেই।

আজও হ'চ্ছে তাই; কতক্ষণ থেকে চোখ বুজে' অনড় হ'য়ে পড়ে' রয়েছে চূপচাপ এবং শুধু পড়ে' থাকাই নয়, নিশাসটা পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে ঘনদীর্ঘ করে' ফেলেছে নিদ্রিতের নিশাসের মত, কিন্তু—

ঘুম আসছে না,—কিছুতেই না। আসবেও না, ও' জানে। অমনি মনে পড়ে' যায়, ওর আশ্চর্য্য বিপরীত অভ্যাসের কথা। অবশ্য,—

অতলা আজ ঘুমোবে না ত', জেগে থাকবে। জেগে থাকা ওর চাই-ই!

ও' জেগেই আছে—। চাঁদের আলো বারান্দার দিকে ছায়া ফেলে' ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। ত্র্যকেটের ঘড়িটা এক ঘেয়ে টিক্ টিক্ করে' চলেছে। অতসীর নিশাসের শব্দ ভারী হ'য়ে ওর কানে এসে লাগছে। বাইরে—

অতলা আবার মুখ উচু করে' দেখে। ক্যাম্পখাটের ওপর চিং হ'য়ে শুয়ে রয়েছে কেউ, ছায়ার আবছায়ায় অবয়বের আদল পাওয়া যায় কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় না।

আকৃতি; কালো চুল এবং গোঁফের কলঙ্ক শুধু ফুটফুটে মুখ-খানাকে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে রেখেছে, যদিও তা' পূর্ণতঃ নয়।

ও' কান পেতে কি শোনে!—না, দিদির ভারী নিশাসের শব্দ, স্পষ্ট কানে আসে, জামাই বাবুরটা অস্পষ্ট ভাবেও না। কে জানে, কার নিশাস কতটা লঘু বা গুরু...!

অতলা জেগে আছে ত' জেগেই আছে...। বিপরীত অভ্যাসের ব্যত্যয় ঘটল নাকি?—আঃ!...ও' এবার আপনার ওপর আপনিই বিরক্ত হয়।

চাঁদের আলো এসে সোজা এদিকটায় পড়েছে। হোক চাঁদের আলো, আলো ত' চোখে এসে পড়লে নাকি ঘুম হয়!...ও' এক হাতের ওপর ভর দিয়ে ওর দিদিকে ডিঙিয়ে, আর-হাত আমূল বাড়িয়ে জানালার একটি কপাট আলগোছে টেনে দিল।

না,—আরও কিছু। ফ্যানটা থেকে কেমন একঘেয়ে বিশিষ্ট ঘষ্ ঘষ্ শব্দ হ'তে শুরু করেছে,...প্যাচটা আলগা হ'য়ে গেল নাকি? দিতেই হ'চ্ছে বন্ধ করে' ফ্যানটা! কিন্তু—

দিদি যা' রেগে যাবে ফ্যান বন্ধ দেখলে...। অতসীর নিয়মিত শ্বাস-শব্দ তার গভীর নিদ্রার পরিচয় দেয়। দিদি দেখছে কোথায়।

নিদ্রিতার নিদ্রা না ভাঙে এমনি সম্ভরণে অতলা বিছানা

ছেড়ে নেমে আসে। হুইলের বোতাম আস্তে ধরে' উঠিয়ে দেয়—ফ্যান বন্ধ হ'য়ে যায়, শব্দ হয় না।

—আরও যেন কিছু বাকী। ও' বুঝতে পারছে না, ঠিক কি তা'। ওঃ, এমন পিপাসা পেয়েছে ওর—ও' বুঝতে পারে নি।...খানিকটা জল খেয়ে শুলেই এবার ও' নিশ্চয় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে।

জলের কুঁজোটা দেখবার জন্যে লাইট জালতে যাচ্ছে, জানালার ঘে দিকের কপাট খোলা সেদিক দিয়ে ও' দেখতে পায়—বারান্দার টেবলের ওপর রেকাবী ঢাকা জলের গ্লাস,—নিশ্চয়ই জল-ভরা রয়েছে কারণ জামাই বাবুর মাথার কাছে প্রথা মতই জল ভর্তি একটা গ্লাস থাকে কিন্তু কচিং সে গ্লাস শূন্য অবস্থায় কেউ দেখেছে।

ঐ জলটারই সদ্যবহার করে' আগুবে অতলা।...ও' দোরের দিকে ধীরে এগিয়ে যায়। একদিকে নিখাস আসে সম্বর্ধিত হ'য়ে, অন্যদিকে বুকের মধ্যে ছুঁক ছুঁক করে। ও' যেন জল খেতে যাচ্ছে না, চুরি করতে যাচ্ছে।

অতলী ঘুমিয়েছিল, কিন্তু তার ঘুমকে খুম না বলে, প্রকাণ্ড রকমের একটা আলসেমী বলাই সঙ্গত। অগভীর নিদ্রার গভীর আলস্য। যেন ওর বুকের ওপর কেউ ভারী পাথর চাপিয়ে ওকে ফেলে রেখেছে। নিখাস ভারী হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু ঘুমটা ঝুলছে একটা পাতলা পর্দার মতই,—ইচ্ছা করলে যেন সেই পর্দার ভেতর দিয়ে জাগরণের ডাঙাটাকেও আব্ছা মত দেখা যায়।

তার দেহটা ঘুমের ভেতর থেকেও তাপ বিকীর্ণ করে' চলেছে। গরম ও' মোটেই সহ্য করতে পারে না। দিনে গিয়েছে দারুণ গুমোট, তারপর সারা সন্ধ্যা ভর উত্তন-পাড়ে বসে' রান্না করেছে। তারও পর—

শুধু দেহের উত্তাপ নয়, মনেরও উত্তাপ। ওর মনটাও যেন ভেতরে ভেতরে তপ্ত হ'য়ে উঠেছিল। অতলাকে উপলক্ষ্য করে' যে অতিথির আবির্ভাব তাদের গৃহে এক নব পরিস্থিতি রচনা করে' চলেছে তা' যেন এক জুতুগৃহের রচনা...বাইরে থেকে তার অগস্ত প্রকাশ অগোচর, ভেতরে আছে চাপা-জালা।

ওর দেহের ও মনের তাপ মিলে' ওর নিদ্রাকে যেন বাষ্পের লঘুতা দিয়ে অগভীর করে' রেখেছে এবং সেই

অগভীরতায় প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে এক অস্বস্তিকর তপ্ত বোধ।

ও ঘুমুচ্ছে কিন্তু তলে তলে একটা তাপের অস্বস্তি আছে। ফ্যানের হাওয়া সেই অস্বস্তিকে বাইরে থেকে আলাগা আঁচল-চাপা দিয়ে রেখেছে। ওর চোখ দুটি নিম্নলীন পূর্ণতা পায় নি এবং মুখেও নেই বিশ্রামের প্রশান্তি। একটা ক্লান্তির অবসাদ ওর নিদ্রাকে শুধু ভারী করে' তুলে গভীর নিদ্রার ছদ্মবেশ দিয়েছে।

ওদের পারিবারিক জীবন-ধারণার যে সহজ কেন্দ্রাভিঃ গতি ছিল, এক নবাগত মানুষ এসে তাতে কেন্দ্রাভিঃ গতি সঞ্চারিত করে' যে ছদ্মবেচিত্রের সৃষ্টি করেছে তারই অস্বাচ্ছন্দ্য ওকে ওর নিদ্রার ভেতরও দিয়েছে এক পীড়কর চিন্তার চলিষ্ণুতা।

স্বপ্ন নয়—ওর বহির্মুখ জাগ্রতের মতই ওকে সে দিনের এবং রাতের প্রত্যেকটি ছোট বড় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিয়ে চলেছে। ও যেন মনে মনে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করছে এক অভিনব প্রণালীতে।

সহসাই ওর মনন ওর মনের এক বিশেষ কেন্দ্রে এসে তার সমস্ত বিশ্লেষণ শক্তি হারিয়ে ফেলে। কার চুটি উজ্জল চোখের অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা এসে প্রথম স্রোতালোকের মত ওর মানস দৃষ্টিকে অন্ধ করে' ফেলে... সেই তীক্ষ্ণতার লক্ষ্য, তার তাৎপর্য—কি? কে ওকে বলবে!

ওর মনের উত্তাপ বাড়ছে...

ওর দেহের তাপবোধ ওর চোখের পাতা দুটোকে একেবারেই উঠিয়ে আনে।—এঃ, কি গরম!

...অঁ পাখাটা বন্ধ করে' দিলে কে?

পাশ ফেরে।—অতি কোথায় গেল?

দরজায় কিসের শব্দ হয়।...অতলী সজ্ঞতাবে উঠে বসে।

—“অতি! অতি!”

অর্ধোন্মুক্ত দরজার কপাটের খিলটা কাঁপতে কাঁপতে অতলা বন্ধ করে' দেয়। বুকের শব্দ দিদি শুনতে পাচ্ছ না কি! কাঠ হ'য়ে শুকিয়ে উঠেছে সারা গুলা। গলা

ফেটেই যেন বেরুল স্বর : “জলের কুজোটা খুঁজে পাচ্ছি নি দিদি...”

অতসী বলে,—“ফ্যানটা বন্ধ করে’ দিয়েছিস কেন ?
আবার লাইটও জ্বালাস নি !”

অতলার মৌনতা অতসীকে দেয় ওর নির্বুদ্ধিতার
সাক্ষ্য !...বোকা মেয়ে ।

অতসী কৃত্রিম কোপে বলে, “টুপিড্ ।”

অতলা এসে খুট্ করে স্ইচ্ টিপে দেয় ।

অতিথির দ্বিতীয় দিন :—

সকালের সঙ্গে সঙ্গেই রোদের তাপ প্রখর হ’য়ে ওঠে
নি । আকাশ মেঘ-ম্লিষ্ট এবং বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস
বইছে । দূরে যেন কোথাও রুষ্টি হ’য়ে গেছে এমনি
আবহাওয়া ।

অতসী স্বান পেরে’ উঠে’ আস্তে, আগ কাটিয়ে নীতীশ
এসে লাফিয়ে উঠল সিঁড়ির ধাপে, তার হাতে ও দাঁতে
একটা ষ্টিক-চকোলেটের সেতুবন্ধ ।

এখনও পড়তে বসে নি ছেলেরা, কোয়াটার্লি এগিয়ে
আসছে ? সকালে উঠেই গিয়েছিল চকোলেট কিনতে
দোকানে !...ধমকের স্বরে বলল, “নীতে, পড়তে বসিস
নি এখনো ?”

“পার্ক গিয়েছিলুম ।”—ছকপাতহীন ভাবে বলেই
লাফিয়ে উঠল নীতীশ আরেক ধাপে ।

—“পার্ক চকোলেট বিক্রি হয় নাকি ।”

নীতীশ সগর্বে বলে, “মিঃ স্বামীজির সঙ্গে গিয়েছিলুম
দিদি !—তিনি গিয়েছিলেন আমাকে ডেকে নিয়ে, চেনেন
না ত’ নিউ পার্কের রাস্তা ।”

“ও,...” অতসী খুসী হ’য়ে বলে, “চকোলেট কিনে
দিলেন বুঝি তিনিই ?” বলেই পেছন ফিরে চায়, কিন্তু
কেউ আসছেন না নীতীশকে অনুসরণ করে’ ।

হেসে বলে, “তা তোর মিঃ স্বামীজি” গেলেন কোথায়,
—পার্কই রইলেন ?”

“না—সেভিং সেলুনে ।”—তড়াক্ তড়াক্ করে’
লাফিয়ে নীতীশ মুহূর্তেই বারান্দায় উঠে’ গেল ।

পেছনে পেছনে উঠে’ আসে অতসী । মুখে ওয় স্পষ্ট

খুসীর ছোপ ।—দেবনাথ তাদের পারিবারিক পরিবেশে
মমতার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছেন স্বতঃই ।...এবার অতি’র
দিকে ওয়...

সামনেই অতলা । অতলা বলল, দিদি, তোমার গেইট
কোথা ! ঠোঁড় জালিয়ে আবার দিলুম নিবিয়ে ।”

ভেতর থেকে অশেষ বলেন, “ঠোঁড় ধরাবার ভার
তোমার দিদিকে’ দিলেও পারে । এখন আমার ম্যাচটা
খুঁজে দিয়ে যাও এসে, কোথায় ফেলে এলে ঠোঁড় ধরাতে
নিয়ে গিয়ে ?”

ম্যাচ ছিল অতলার হাতেই ; দিদির দিকে চেয়ে হেসে
চোখের ভাষায় কি বলে ।

অতসী হাসির সাথে জুড়ুটি মিশিয়ে বলে, “এক মিনিটও
স্মোক না করে’ থাকতে পারেন না তোর জামাই বাবু ।”

অশেষ লজ্জিতের স্বরে সহাস্যে বলেন, “আগের থেকে
চের কমিয়েছি, না—অতি ?”

চায়ের জল তৈরী হয়েছে, এখন ছাড়া হবে চায়ের
পাতা ; দেবনাথ বললেন, “ছাড়বেন না পাতাগুলো, —
চা’র বদলে তৈরি হোক আজ এই জিনিষটা ।”

বলে, তিনি পকেট থেকে বা’র করলেন একটা চ্যাপটা
মোটা কাচের শিশি ।

কৌতূহলের সঙ্গে সকলেই চায় শিশির গায়ের লেবেলের
দিকে । লেবেলে লেখা—‘Hoosh’ ।

‘হুস্’ কি—? চোখের প্রশ্ন আসে অতসী ও অতলার
দিক থেকে ; মুখের প্রশ্নে অশেষ বলেন, “হুস্—কি ?”

দেবনাথ শিশিটা উচিয়ে ধরে’ বলেন, “একপ্রকার
উপাদেয় পানীয় । আমেরিকার ভদ্রমহলে এর যথেষ্ট চলন
আজকাল । ক্রিম আর মণ্টের গুণ এবং কোয়েকার ওটসের
উপাদেয়তা মিলিয়ে এই চমৎকার জিনিষ তৈরী হয়েছে ।”

অতসীর হাতে শিশিটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলেন,
“হাঁ, ক’জন আমরা ক্যাণ্ডিডেট, ঠিক গুনে’ ততটা করে’
চাক্কি ।”

অতসীর হাত থেকে শিশিটা অতলা নিয়ে লেবেলের
নীচের দিকের ছোট ছোট লেখাগুলো পড়ে । অজস্র
গুণকীর্তন । মাথা বাঁকিয়ে বলে, “ভালোই জিনিষ হবে
দিদি, কিন্তু নামটা একটু অদ্ভুত ধরণের—না ?”

অশেষ বলেন, “কথাটা বোধ হয় ওদেশী নেটিভদের ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে, মনে হয়।”

দেবনাথ বলেন, “অহুমান বৈঠক হয় নি—আপনি বোধ হয় ভাষাতত্ত্বের অহুশীলন করেন।...হুস্ হুছে রেড ইণ্ডিয়ানদের একপ্রকার কাথ জাতীয় পানীয়ের নাম।”

অশেষ হেসে বলেন, “ঠিক ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অহুমান করিনি। মনে পড়ছে না কোন্ বইটা—কিন্তু পড়েছি যে তার আর তুল নেই এবং ‘হুস্ হুস্’ শব্দ করে খাওয়ার থেকে যে ওর নামকরণ হয়েছে ‘হুস্’ সেটা স্পষ্টই মনে পড়ছে।”

গুণ্টি চাকতিগুলো গরম জলে ফেলতে ফেলতে অতসী বলল, “অতি’র হয়ত’ মনে থাকতে পারে—ও’ যেমন বইয়ের পোকা।”

অতলার মনে পড়তে পড়তে মনে পড়ে না। বলে, “সেই যে এন্জুরাস জাহাজ ডুবির পর এলিফ্যান্ট আইল্যান্ড থেকে আকেনটন কি একখানা বোটে করে—ও, ই্যা মনে পড়ছে ‘জেব্‌স্ ফেয়ার্জ’ সেই বোট খানার নাম—সেই বোটে করে সাউথ পোলের এক দুর্গম জলপথ পাড়ি দিয়ে উপনীত হয়েছিলেন কোন্ হোয়েলিং ট্রেনে। ...‘ওয়াইড ওয়াল্ড’ কি ‘রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন—কি নটিলাসের নী ভয়েজ’ সিরিজেরই কোন বই থেকেই পড়েছিলাম, ঠিক মনে পড়ছে না।”

দেবনাথ বললেন, “আপনি ত’ অনেক বই পড়েন।”

অশেষ গর্বিত প্রশংসায় অতলার মুখের দিকে চেয়ে বলেন, “ও’ আমার আত্মারির সব বই পড়ে শেষ করেছে। আমার যা’ মনে থাকে না, ওর তা’ মনে থেকে যায়।”

দেবনাথ কি বলতে যাচ্ছিলেন “আপনি—”

অতসী ভ্রম সংশোধনের স্বরে বলে, “ওকে ‘আপনি’ না বলে ‘তুমি’ বলবেন দয়া করে।”

দেবনাথ বললেন, “তোমার ষ্টাডি’র জন্তে প্রশংসা করি। কিন্তু তোমার বয়সী মেয়ের বেশী যা-তা বই পড়া ভালো নয়।”

একটু থেমে অতসীর দিকে আঁর্জুল তুলে’ বলেন, “উনি পারেন পড়তে।”

অতলা মুখ নীচু করে’ মুখের বিরক্ত ভাব চাপতে চাপতে মনে মনে বলে, “আমি আপনার মত লুকিয়ে মোপাসার আক্টার-ডিনার সিরিজের বই পড়িনে মশাই...।”

চায়ের কাপ ভরে’ ধুমায়িত হুস্ পরিবেশিত হ’ল। পরিবেশন করতে করতে অতসী স্বামীকে লক্ষ্য করে’ বলল’ “খেয়ে দেখ, কেমন লাগে মুখে।”

—“ভালোই লাগবে, চমৎকার ফ্লেভার পাচ্ছি।”

দেবনাথ বললেন, “পরিবেশনে মেয়েদের দক্ষিণ্য হাজার মুখে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু সব জিনিষেরই ‘অত্যন্তটা গর্হিত...এমন কাপ ভরে’ দিয়েছেন যে খানিকটা চলকে পড়ে’ গেল তুলে’ নিতে।”

অতসী বলল, “আহা, হাতে পড়ে নি ত’?”

—“না, পিরীচে এবং টেব্লে। অথচ এমন ভালো জিনিষটার একমাত্র পড়বার স্থান হওয়া উচিত মুখেই।”

অতলা মুখ বিকৃত করে’ মুহূর্তে দিগিকে গুনিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল, “বিচ্ছিরি ওষুধ-ওষুধ গন্ধ...”

অতসী চেখে দেখল, মন্দ নয়—স্বাদ অনেকটা চকোলেটের মত।

দেবনাথ অতসীর স্বাদ-পরীক্ষা-শেষের পরিতৃপ্তি লক্ষ্য করে’ মুহূ মুহূ হাসছিলেন। অতসী মুখ তুলতেই বললেন, “ভালো লাগল না?”

অতসী মাথাটা একবার একপাশে হেলিয়েই চোখ কিরিয়ে অশেষকে বলল, “অনেকটা চকোলেটের মত টেট, তাই না?”

অশেষ বলেন, “এবং শরীরকে একটু হিটেড করে যেন।”

—“হ্যাঁ, মাইনর প্রপোরশনে একটুখানি করে’ মাস্ক আছে এতে। —হেল্‌দী।”

দেবনাথ যেন হঠাৎ কি আবিষ্কার করে’ ফেলেছেন, এমনি ভঙ্গীতে বললেন, “মিসেস্ রয়, সিঁথিতে আপনি সেকলে মেয়েদের মত সিঁদূর পরেন?”

অতসী বলে, “বুঝলুম না আপনার কথা,...এর আবার
সেকাল-একাল কি?”

অশেষ সর্কোতুলে চোখ তুলে' চাইলেন। কি জানি,
কি অদ্ভুত কথাই বলবেন উনি!

দেবনাথ বলেন, “আমি বলছি, একালের মেয়েরা
আর অমন করে সিঁথেয় সিঁদুর পরে না। বৌদিকে
দেখেছি, মাথায় বা কপালে কোনখানেই পরেন না।
ঐ সেকালে প্রাথম মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়
ব'লে আমারও বিশ্বাস।”

অশেষ বলেন, “এই প্রথার মূলে কি আছে, জানেন
কি?”

—“কি—?”

অতসী বলে, “হিন্দুধর্ম্মমতে পরিণীত জীবনের স্বীকৃতি।”

—“অর্থাৎ, স্বামীকে শিরোধার্য্য করা ত’?”

অতসী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, “নিশ্চয়ই; হিন্দু মেয়েরা
স্বামী-সম্পর্ককে দেবতার মত মাথায় করে' রাখে।”

দেবনাথ অল্পজ্ঞানীর প্রতি অহুকম্পার ভাবে বলেন,
কিন্তু স্বামী ব্যক্তিটা মানুষ, দেবতা ন'ন। এর দ্বারা
একই সঙ্গে দেবতা ও মানুষকে অপমান করা হয়।”

অশেষ প্রতিবাদ করেন।—“এখানে বস্তু না নিয়ে
গুণকে নেওয়া হয়েছে। মানে স্বামী নয়—স্বামিত্ব।
বিগ্রহের মধ্যে যেমন দেবত্বের আরোপ করা হয়,
তেমনি—”

দেবনাথ বাধা দিয়ে বলেন, “বাস্তব জিনিষের ওপর
এ আপনার ফিলোসফির ডিগ্বাঙ্গী!...আপনি মেরি
ষ্টোপ্‌সের ‘Marriage in my time’ বইখানা পড়বেন
যাতে সভ্যতা-সঙ্গতভাবে বিবাহ বস্তুটার বিশ্লেষণ আছে।”

অশেষ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেন, “আমি মেরি
ষ্টোপ্‌সের ওখানা পড়ে' দেখেছি। কম্প্যানিয়নেট
ম্যারেজ উচ্ছৃঙ্খল জাতিব ভোগবিকৃতির ফল!...

আপনি বরং রাসেলের ‘Conquest of Happiness’
বইখানা আমার আলুমারি থেকে নিয়ে ভালো করে'
পড়বেন।”

দেবনাথ প্রথমে নিস্পৃহ হাশ্বে বলেন, “আমি

অবিবাহধর্ম্মী মানুষ—ও, সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরঙ্গতা
নেই।”

পরক্ষণেই গভীর বিতর্কায় বললেন, “বিবাহ যদি মুক্তি
না হ'য়ে বন্ধন হয়, সে বিবাহ প্রসঙ্গে আমার আসক্তি
নেই।”

স্বকৃতায় ‘হুস্’-চক্রের সমাপ্তি ঘটল।

দেবনাথ তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে চললেন খবরের কাগজখানা
উঠিয়ে নিয়ে। অশেষ উঠে দাঁড়ালেন—বরের টেবলে
গিয়ে কলেজের লেকচারটা একটু তৈরি করে নিতে
হবে।

অতসী বলল, “উনি একেবারেই বিবাহ-বিদ্বেষী।”

অশেষ নীরস স্বরে বললেন, “ওঁর নিরাসক্ত ভাব
আসক্তিরই ছদ্মবেশ।”

মেঘ-সিঙ্ঘতা দূর হয়ে প্রথর রোজে ঝলমল করছে
পারিপার্শ্বিক।

স্বাদে ঔষধের বিশ্বাস আবিষ্কার ক'রে কাপটা হাতে
করে অতলা যখন এদিকের দালানে বেরিয়ে এল, রকের
উপর উবু হ'য়ে রসে নীতীশ তখন নিঃশেষিতপ্রায়
ছোট কাপটার তলানিটুকু অবলোহন করছে।

তার ভাল না লাগলেও ওর ভাল লাগছে। বাঁকা
হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের কাপ নীচু করে ধ'রে অতলা বলল,
“খুব ভাল লাগছে? থেতে চাস্ ত এ কাপটাও নে,—
আমি এ সব ভালবাসি নে। এঁটো কিন্তু, এক চুমুক
খেয়েছি।”

“তুমি খেলে এঁটো হয় না, ছোটদি, বলে, বয়সস্বলভ
লোলুপতার সঙ্গে পুরো কাপটা টেনে নিল, খালিটা
নামিয়ে রাখল নীতিশ।”

“তুই খা” বলে একেলা আসে পিছন ফিরে খোলা
বাগান্নার দিকে।

ক্যাস্প খাট গুটিয়ে রাখা হয়েছে দেয়াল ঠেগান দিয়ে,
সেই জলের গ্লাস কিন্তু তখনও তেমনি রেকাবী-ঢাকা
রয়েছে গোল টেবলের ওপর।

কাল রাতে এই গ্লাসটাকে কেন্দ্র করে.....

অতলার মুখ একবার রক্তিম হ'য়ে উঠেই আবার সহজ শুভ্রতায় ফিরে আসে। সে ত কোন অজ্ঞায় কর্তে আসছিল না, আসছিল শুধু জল খেতে।.....বুঝতে পারছে না কেন এমন অপরাধবোধ আগ্রত হয়েছিল তখন মনে! 'দিদিকে পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলে' ভুলিয়েছিল, 'কুঁজো খুজে পাচ্ছি না।'

সে এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই রেকাবী-ঢাকা গ্রাসটির প্রতি।

.....আশ্চর্য! গ্রাসটা যেন পিপাসার প্রতীক...ওর সত্যি পিপাসা পাচ্ছে!

কিন্তু পিপাসা নিবারণের সন্ধেতও আছে ঐ গ্রাসটির ভেতর, তার পানীয়ের পরিপূর্ণতা ওকে আহ্বান করছে...।

অতলা ঢক ঢক করে সমস্ত জলটুকু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল।

তাপদগ্ধ ছপূরের একটা বিরাগী-বেদনার অমৃতভূতি আছে। তাপটা তার বেদনা, আর সুরতা তার বিরাগ। একটা প্রগাঢ় বিরাগে পরিক্রান্ত হ'য়ে পড়ে দিক হ'তে দিগন্তরের নিলক্ষ্য অবকাশ।

অতসীর বুকে এসে লাগে সেই বিরাগের ছোঁয়া। একটা হৃষীকণ্ঠ বেদনাবোধে ওর মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে।

অশেষ কলেজে; নীতীশ তার স্থলে। অতলা ঘুমিয়ে পড়েছে মাতুরের ওপর কাত হ'য়ে উইমেন্স মুত্‌মেণ্টের পাতা উল্টাতে উল্টাতে। ও ঘরে দেবনাথ—কে জানে, বই পড়ছেন, কি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সিঁড়ির নীচের খিলানের কানাচ থেকে লক্ষ্মীনাথের নাক ডাকা ওপর থেকেও শুনা যাচ্ছে।

একলা অতসীই জেগে রয়েছে ছপূর দিনের সুরতাকে মুখোমুখি করে'। ওর কোলের ওপর একটা অর্ধকৃত সেলাই। আঙুলের ফাঁকে সূচটা ধরা আছে কিন্তু সেলাই করছে না। সেলাইয়ের সরঞ্জামগুলো বিছানায় ছড়ানো.....সূতার গুলতিটা গড়িয়ে পড়ে গেছে মেঝের ওপর অনেকটা সূতোর পাক খুলে নিয়ে।

কিছুই ভাল লাগে না।.....একটা অহেতুক বিভ্রম। একটা অকারণ বেদনা-বোধ।

কিছুক্ষণ ও কিছু ভাবে না, শুধু মনে হয়—ভালো লাগছে না কিছুই!

আরও কিছুক্ষণ।.....হাতের সূচটা ও সেলাইয়ের কাপড়ে ছুঁড়ে রাখল।

ওদিকের যে জানালার কপাট ছোটো টেনে দেওয়া ছিল, কখন দম্কা হাওয়া তা' খুলে খানিকটা ফাঁক করে দিয়ে গেছে। সেই ফাঁকে চোখে পড়ে ওদিকের দালানের অনেকটাই।

দেয়ালের দিকটায় একটুকু ছায়া, বাকীটুকু রোদ। সাদা সিমেন্ট করা শানের ওপর রোদ যেন ইম্পাতের পাতলা পাতের মত কাঁপছে। কোন এক কবির উপমা মনে পড়ে যায় অতসীর—দিনের তুষার মত কাঁপে শুক্ক ছপূরের রোদ।

উপমা এসে উৎপ্রেক্ষার সাজা পায়।.....ওর মনে হয়, ঐ জলজলে রোদের মতই জ্বালার একটা ভ্রম যেন ওর বুকের ভেতর কাঁপছে।

—অতসীর বিভ্রম ওর তুষারই উল্টোটা পিঠ!

কিন্তু, কিসের ভ্রম? অতসী বুঝতে চায় কিন্তু ওর অন্তঃমনের প্রচ্ছন্নতায় সঙ্কচিত হ'য়ে আছে যে চাওয়া সেই চাওয়াটাকে ঠিক ধরতে পারে না, অথচ তারই না পাওয়ার অপরিতৃপ্তি ওর বহির্মুখকে পরিতপ্ত করে তুলছে। আশ্চর্য!

ওর মন ওর মননকে পার্বসী পুথির পাতার মত শেষের দিক থেকে গোড়ার দিকে উল্টিয়ে নিয়ে চলে। ওর জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলিকে ও পেছন ফিরে স্থপষ্ট করে দেখতে চায় মধ্যদিনের আলোকে।

অনেকক্ষণ, ওর কপাল ঘেমে উঠেছে.....ও যেন রৌদ্রবালসিত মধ্যাহ্নের পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে এসেছে, অনেক দূর, আরো অনেক দূর যাবে; দাঁড়িয়েছে সেই বরানগরের জুলবাড়ীর গোড়ায়! বেশী দূর ত' নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে কত দূর। জীবনের সমস্ত ছপূরগুলো যেন এই পথটুকু আসতে একে একে ওর মাথার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে...জ্বল থেকে এসে খোলা জমিটুকু পার হয়ে বাড়ীর রকে উঠে বাঁচত ওরা ছই রোন।

ওরা বাড়ীতে ঢুকেই জলের কুঁজোর দিকে এগিয়ে যায়।

মা নিষেধ করেন, “একটু না জিরিয়ে জল খাস্‌ নি।”

ওরা মুখে বলে, “খাচ্ছি নে মা” কিন্তু কুঁজোর মুখেই ঢক ঢক করে জল খায়, ঢোক উপচে ভিজে যায় বুকের কাপড়।

কলেজের জীবনের ছুটির দিনগুলো—ওদের দাপা-দাপিতে অস্থির হ’য়ে উঠতেন মা। ছ’বোনকে জোর করে ধরে শুইয়ে দিতেন বিছানায়, কিন্তু মার তল্লার ফাঁকে কখন ওরা উঠে গিয়ে আবার জুড়ে দিত দাপাদাপি।

কুমারী জীবনের এক অরণীয় মধ্যাহ্ন। বাস এন্জি-ডেটের পর মা’কে নিয়ে এক স্বকুমার সুন্দর যুবক এসে ওদের বাড়ীতে প্রবেশ করল। মার জেঙ্গে উদ্বেগ আশঙ্কা কম ছিল না কিন্তু আনন্দের উদ্বেগও ছিল তারই সমান্তরালে—সেই যুবকের উপস্থিতিকে অভিনন্দিত করে।

তারপর অনেক—অনেকগুলো নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর।…… নিস্তব্ধ কিন্তু একান্ত নির্জ্জন নয়। অতলা এসে সেই নির্জ্জনতায় সাহচর্যের সৃষ্টি বিদ্ধ করত। অতসী বেশ করে ভেবে দেখে; হ্যাঁ, অতলাই—সে যেন পরিপূর্ণভাবে সেই দিনগুলোকে উপভোগ করতে দেয় নি। সে দিন-গুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ওর কামনাকে উদ্ভিন্ন করে জীবনের কাম্য—এর পূর্বরাগ, অল্পরাগ এবং……, সেই দিনগুলোকেও ও’যেন প্রাণের পানপাত্রেই পরিপূর্ণ ভাবে পায়নি। পেতে দেয় নি—ঐ অতলাই।

নিদ্রিতা অতলার দিকে ও’ একবার ক্রুর কটাক্ষে চায়।……কি জানি হয়ত’ ওর অভূতপূর্ব রহস্যের মূল এইখানেই।

পার্সী পুথি এবার বাংলা পুথিতে পরিবর্তিত হয়েছে। অতসী ওর জীবনস্মৃতিকে গোড়ার দিক থেকে আবার শেষের দিকে উলটিয়ে নিয়ে আসে।

বিবাহের পরের প্রথম রঙীন দিনগুলো—অশেষ তখনও অধ্যাপক পদবাচ্য হননি, শুধু সকালে বিকালে ভালো ভালো ছুটি টিউশনি করতেন,—সেই দিনগুলির এক একটা ছপুরকে, এখন মনে আছে, কত অর্থহীন ছেলেমানুষি, কত কথা গান, অকারণ অভিমান, আনন্দ-বেদনা-অল্পরাগ

দিয়ে স্বপ্নময় করে তুলত, বুড়ে বুড়ে বিচিত্র রঙীন করে তুলত……। সেই স্বপ্নময়তার আচ্ছন্নতায় একটা স্বপ্নের চুকুরার মত, সেই কল্পনার বুড়ে একটি পরিকল্পনার সন্ধেতের মত সংলগ্ন হ’য়ে রইত—অতলাও।

ওর ওষ্ঠ স্ফুরিত হ’য়ে ওঠে।—কিসের অংশ প্রত্যাশা করে পৌ ?

……একটা রুদ্ধ অভিলাষ এসে ওর স্ফুরিত ওষ্ঠে কাঁপে।

ওদিকের জানালাটা একেবারেই খুলে কপাট ছুটো সরে এসেছে ভেতরের দিকে এবং দালানের দিকের ছায়া ফিরে গিয়েছে বারান্দার রেলিংয়ের দিকে এবং দালানের রোদ ঘুরে এসে পড়েছে জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে। অতলা যে মাত্রেরে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে, সেই মাত্রেরে একাংশে এসেও একফালি রোদ পড়েছে—এখনি গড়িয়ে যাবে তার মুখের ওপর।

ও চেয়ে দেখল, কিন্তু উঠে গেল না জানালাটা বন্ধ করে দিতে।

মুখের ওপর গড়িয়ে এসেছে রোদ—গাল ছুটো রাঙা হ’য়ে উঠে গলার দিক বেয়ে উঠেছে।

চোখের পাতার ওপর এসে পড়ল—নিদ্রাঘোরও ওর মুখে ক্লিষ্ট অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠে। ও এখনি হয়ত’ পাশ ফিরে শোবে, অথবা জেগে উঠে বসবে।

ওর মুখের রক্তিম সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে দেখে অতসী, সৌন্দর্যের ওপর ক্লিষ্টতার কালিমা। তার মায়া হয়……

অতসী তখন উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে আসে।

ঐ সঞ্চরণশীল রোদের মতই ওর প্রাক্তন চিন্তাধারা গতি পরিবর্তন করে। ওর মনের তাপ অলক্ষ্যে গিয়ে রৌদ্র পাত করে অশেষের ভাবমূর্ত্তির মুখে।

অতি’র দোষ কি! তার যে রস সে বয়সে মেয়েরা স্বতঃই একটু ভাবপ্রবণ হ’য়ে পড়ে। তারা একটা বস্তুকে আশ্রয় করে ভাবকে রূপ দিতে চায়। বয়োধর্ম্মে দেহবোধ জাগ্রত হয়……রক্ত-মাংসের আকাজক্ষা হাত বাড়ায় একটা পরিপূরক সাহচর্যের দিকে।

এই দেহবোধ এবং আকাজক্ষা—ওর কি দোষ!

উনিই আরও উন্মেষের পথে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছেন
নির্ধিকারে যা-তা বই পড়বার অধিকার দিয়ে.....মেরি
ষ্টোপসের বই পর্যন্ত বাদ পড়েনি। দেবনাথ তখন সত্যই
বলেছিলেন যে ও-বয়সী মেয়ের এত বাজে বই পড়া
ঠিক নয়।

তারপর ওর আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক স্বরূপ তিনি শুধু
ওকে অবাধ সাহচর্য দেননি, অজস্র প্রশংসা দিয়েছেন
কৌতুকে, উপহাসে এবং নিজেকে উদাহরণ রূপে উপস্থাপিত
করে.....

এবার চিন্তার রোদ ঘুরে এসে পড়ে নিজের মুখের
ওপর।

অতনী ভাবে উদাহরণ স্বরূপ সেই কি নিজেকে দাঁড়
করায় নি? তার দাম্পত্য জীবনের প্রথম সম্মোহনের মুখে
অতিক্রমে সে যে সন্মোহিত করেনি শুধু তা নয়, কত গোপন
খুঁটিনাটি কথা নিয়েও ওর সঙ্গে অসন্মোহিত আলাপ আলোচনা
করেছে.....আরও কত কি!

দোষ অতিরিক্ত নয়, দোষ তারই।

ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ এতক্ষণ পর ওর কানে আসে।
গরমে কার্কশ তেতে উঠে বুঝি ফ্যানটা অমন কিব্বিকিব্ব
শব্দ করছে।

অতনী ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে দেখে—আড়াইটা
বাজতে পাঁচ মিনিট। এখনও অনেক বেলা।

ফ্যানের হাওয়া কি গরম!... ..

ঘরের ভেতরের শুষ্কতাকে যেন হাত দিয়ে ধরা যায়।

একটা গভীর অবসাদে ও ধীরে ধীরে গুয়ে পড়ল বালিশে
মাথা না দিয়েই।

চোখ বুজেই আবার চোখ মেলে। বোজা চোখের
ভেতর দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন উকি মেরে যায়।
কিন্তু দেবনাথের কথা ত'ও একবারও আর ভাবে নি?

দিদি যেন আজ আগের দিদিতে ফিরে এসেছে। তার
অভিভাবকত্বের আসন থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে সখিত্বের
সমতালে। অতলা আশ্চর্য্য হয়।

ওর অবিচল দিবনিদ্রা থেকে দিদি ওকে আজ ধাক্কা

মেরে জাগিয়ে দেয়নি। লজ্জাই করছিল—যেমন করে
ওর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, কচি খুকীকে যেন চুমা দিয়ে
জাগাচ্ছে! তারপর কৌতুক করে যে সব কথা বলছিল
ভালো লাগছিল কিন্তু লজ্জাও করছিল তারই সঙ্গে। এ সব
দিদির ছুঁমি, কিন্তু তার ভারি কচি চালের চেয়ে এমনি
হালুকা ভাবই ওর ভালো লাগে। সত্যি, দিদি যেন তার
এমনিই থাকে বরাবর।

অতলা পেছনে হেলে বসে দিদির হাতে মাথার একরাশ
চুল নিরুপায় ভাবে ছেড়ে দিয়েছে। বসে আছে যেন
আত্মদানের ভঙ্গীতে; কান পেতে আছে আবার, দিদি কি
বসে বসে মুচকি হাসছে?

—“তারপর বেনে বোঁ—”

“কোন বেনে বোঁ?” অতলা ভাবে, ভাগ্যিস দিদি
এবার তার ঘাড় থেকে নেমে বেনেবোঁয়ের ঘাড়ে
চাপল!

অতনী বলে, “ছোটবেলার অনেক কথাই ভুলে গিয়েছিল;
সেই যে বেনে-বোঁ, কিন্তু তখন ত তুই খুব ছোট্টা নস,
ইকুলে পড়িস—সেই বেনে-বোঁ আসত আমাদের বাড়ী।
বয়স হয়ে তার মাথার চুল সামনের দিকে উঠে গিয়ে টাক
পড়বার মত হয়েছিল সেই চুল—”

নিশ্চয় একটা চমৎকার হাসির কথা হবে! আসন্ন
হাসির জন্ম মুখভাবকে প্রস্তুত করতে করতে অতলা
বলে, “হ্যাঁ দিদি, মনে পড়ছে অমনি একটা বোঁয়ের কথা,
সেই চুল—”

মনে পড়ছে? মেয়ের ছুঁমি! বেনেবোঁ আতনীর
সম্পূর্ণ মনগড়া জিনিস। হেসে বলে, “বলেছিই ত মনে
পড়া উচিত। হ্যাঁ, সেই বেনে-বোঁ তার সেই টাক পড়া
মাথার পাতলা চুলের গুছি”—

ওর ধৈর্য্য আর অপেক্ষা করতে পারে না। “পায়ে
পড়ি দিদি, বল সেই চুলের গুছি কি?”

—“সেই চুলের গুছি যত্নে বিছানী করে বেঁধে দিত
ওর—”

“ওর দিদি?” কথাটাকে অগ্রসর করিয়ে দিতে চায়
অতলা।

—“তোর মাথা! ওর দিদি নয়, ওর বর। চুল

বৈধে দিত ওর বর ওকে নিত্যি যত্ন করে। আর চুল না বাঁধলে দেখাত ওকে ঠিক—”

অতসী অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে কটাক্ষ করে বলে, “দেখাত ঠিক কার মত—বলতে পারিস?”

অতলা হাসে না, শুধু হতভম্ব হয়। যেন মাথা চুলকচ্ছে এমনি ভাবে মাথায় হাত দিয়ে দেখে ওর মাথার সামনের চুলগুলো পাতলা কিনা...কি জানি, দিদি হয়ত ওকেই বিক্রপ করছে।

বলে, “কার মত দেখাত দিদি?”

অতসী বলে, তোর মগজে শার্পেনেস বলে জিনিসটা আদপেই নেই। দেখাত নাকি ঠিক ঐ স্বামীজির মত?

অতলা মুহূর্তকাল মনে মনে স্বামীজির লম্বা চুলওয়ালা মাথাটা পর্যবেক্ষণ করে। পরমুহূর্তেই—

হি-হি-হি-হি-হি!—হাসি থামাতে মুখে আঁচল চাপে!

অতসীর কৌতুক যেন তার একটা ভাবী প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের ছদ্মবেশী ভূমিকা...সে হাসে না, চুলের-গুচ্ছ-ধরা হাত ছুটো আলগা করে দিয়ে চুপ করে কি ভাবে।

ওর হাসি থেমে চুলের গুচ্ছ আবার দিদির আয়ত্তে এসেছে। অতসী বলে, “স্বামীজীর—”

অতলা বলে, “স্বামীজি বললেই আমার হাসি পাবে দিদি! দেবনাথ বাবু বল্ল।”

দেবনাথ বাবু !...অতসী খুসী হয়। বলছি—সত্যি বলবি, দেবনাথ বাবুর মুখখানা ঠিক মেয়েলি চঙের কিনা, মেয়েলি চঙের বলেই হয়ত অমন সুন্দর।”

অতলা সরল ভাবেই বলে, “উনি গৌফ দাড়ি সব শেভ করে ফেলেন বলেই হয়ত অমনি দেখায়।”

“তোর জামাই বাবুর মত যদি একঘোড়া গৌফ থাকত তাহলে অমন দেখাত না,—না?” দিদি বলে এবং বোনের দিকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে চায়।

অতলার অন্তিমোদন অকপট প্রশংসায় মুখর হয় “জামাই বাবুর গৌফজোড়া সত্যি ভারী সুন্দর দিদি !...”

অতসী ঈষৎ গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

শরৎ, আকাশের লঘু ধূসর মেঘছায়ায় মতই একটা পাতলা ছায়া খেলে’ যায়, চকিতেই আবার কৌতুকোজ্জল

হ’য়ে ওঠে। ওর মননের ক্রম ধরা কঠিন। মন ওর গান্ধীর্ঘ্যের গুচ্ছ থেকে বেরিয়ে এল তখনই সমতলের আলোকে।

বল্ল, “দেখ্ অতি; লোকটার মুখ অমন কোমল মেয়েলি চঙের, কিন্তু চোখ দুটি যেন দুর্বাসা মুণির মত, দেখিস্ নি?”

—“চোখ আবার দেখিনি, কিন্তু অত লক্ষ্য করিনি দিদি।”

“আজ থেকে করিস্।” অতসী অবিখ্যাসের ভঙ্গীতে বলে, “কেন, সেই যে সিঁড়িতে ছুটে’ গিয়েছিল পেশোয়ারীকে তাড়াতে, তখন ত’ ভালো করেই দেখেছিল্ তার অন্তরে চাওয়া?”

অতলা স্বীকৃতির স্বরে বলে, “হ্যাঁ দেখেছি—ব্রাইট্।” অতসী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, “শুধু ব্রাইট্ না রে, একেবারে ভস্ম-করা ভাব। যখনই উনি চোখ তুলে’ চান তখনই দেখি অমনি...”

অতলা সন্দ্বিগ্ন হয়—হিপ্ নোটিস্ট্ না কি !...বলে, “সবার দিকেই অমনি করে’ চায়? জামাই বাবুও লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়?”

অতসীর স্বর নিম্ন হ’য়ে আসে।—“সবার দিকে নয়, শুধু মেয়েদের দিকেই।”

নারীমূলভ কৌতুহলে অতলা মুখ ফিরিয়ে বসতে চায়—বেগীতে পড়ে টান। মুখ না ফিরিয়েই বলে, “মেয়েদের দিকেই—কেন?”

“আঃ। মাথা নেড়ে চুলের বিছনীটা আবার খুলে’ দিলি।” সোজা জবাব না দিয়ে ঝাঁক করে’ বলে, “লোকটার তর্কের মস্তব্যগুলো বুঝি ভালো করে’ শুনিস্ নি? শুন্লেই বুঝতে পারতিস্।”

অতলার কথায় শাণিত অন্তসন্ধিসা।—“বুঝিনি এবং এখনও বুঝতে পারছিনি, দিদি।—বল’ই না খুলে?”

বিছনী শেষ করে’ বেগীটা দ্রুত হস্তে ঘোঁপায় জড়িয়ে তুলতে তুলতে দিদি বলে, “ওয়েট্ এ’ বিট্, এটা শেষ করে’ ফেলি আগে।”

ঘোঁপার ধারগুলো করতলে চেপে ক্লিপ কাঁটাগুলো স্বকৌশলে চুলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে, ঘোঁপার চূড়ায়

একটা চাপড় মেরে বললে, “হয়েছে ; এবার ঘুরে’ বসে’ আমার দিকে চেয়ে শোন ।”

বোনের ঘুরে’ বসতে মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। দিদি বলে,—“লোকটা যে কি ঘোর নারীবিরোধী, বুঝতে পারতিন্ তার কথাগুলো শুনে। মেয়েদের ত্যাগিলা করে বলে’ই অমনি দুর্বাসার মত চোখ করে’ চায়,— বুঝলি ?”

অপরাধীর অস্ত্রাণ্ড আচরণগুলো। মনে মনে বিচার করে’ অতলা চায় অপরাধের প্রমাণ বা’র কর্তে—পায়না। শুধু, সেই যে—“ও-বয়সী মেয়ের অত বই পড়া ভালো নয়” বলে’ যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল ওকে’ মনে পড়ে। বলে,

“আশ্চর্য্য কি, কোন্ সন্ন্যাসীর আশ্রমে ছিলেন যে আগে, তারই জন্তে হবে। সন্ন্যাসী মানুষ।”

“সন্ন্যাসী মানুষ।” দিদি বোনের কথার প্রতিধ্বনি করে।—“হ্যাঁ, সন্ন্যাসী মানুষ ; কিন্তু আমরাও মানুষ যদিও মেয়ে মানুষ।”

‘উইমেনস্ মভ্‌মেন্ট’ পার্টির তাপ তলে তলে অতলার মনে তখনও জুড়িয়ে যায়নি। ও’ সঙ্গে সঙ্গে বলে’ উঠে, “নিশ্চয়ই—আমরাও মানুষ।”

অতসী বলে, “এ অহঙ্কারী মানুষটাকে—” ওরই মধ্যে মনে মনে কি ভেবে নিয়ে বলে, “এ অহঙ্কারী মানুষটাকে আমরা একটু জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরাও মানুষ।”

ক্লেশঃ

তোমারে পাব বলে

শ্রীমতী নলিনী সেন

আঁধার সীমাহীন অকূল পারাবার
বাহিতে পারিনেগো জীর্ণ তরী আর।
আশার দীপশিখা নিবিয়া যেতে চায়,
আঘাতে ভেঙ্গে গেছে জীর্ণ বুক হায়।
ঝড়ের রাতি কাটে ভাঙা এ হালধরি,
জানিনে কোথা কুল, ভিড়িবে কোথা তরী।

সে দিন বলেছিলে দুঃখ-বেদনাতে,
রহিবে নিশিদিন আমার সাথে সাথে।
অভয় জেগেছিল, গভীর বিশোয়াসে
অকূলে ভেসেছিল চরণ পাব আশে।

আজি যে ভাঙাবুক চলে না পদ আর
রয়েছ কত দূরে হে চির আপনার।
তুমি কি ভুলে গেছ ? নেবে না ডেকে আর
কি নিয়ে রব বল, কাঁদিব কত আর ?
জীবন নিয়ে খেলা হে চির লীলাময়
বোঝোনা কত ব্যথা আমাদের বুকে সয়।

তবুও আশা জাগে, তবুও পথ চাই,
মন যে মানে নাগো তুমি যে সাথে নাই,
অকূল পারাবার আঁধার সীমাহীন,—
তোমারে পাব বলে চলেছি নিশিদিন।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার রাশিচক্র

শ্রীতিলক

মানব-ভাগ্যের অল্পকূলে ও প্রতিকূলে, কর্ম সাফল্যের ভিত্তি মূলক যে সকল কারণগুলি বিধিবদ্ধ থাকে, জ্যোতিষ-চক্র বিচার বিনা সেগুলি উদ্ঘাটন করা যায় না। বাহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করেন, এবং এই শাস্ত্রে বিশ্বাসী বাহারা, তাঁহারা বিশেষ ভাবেই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। কর্ম-সাফল্যের অল্পকূলে ও প্রতিকূলে সাহায্যকারী ও বাধাপ্রদানকারী কারণগুলির ভিত্তি জাতকের জন্মচক্র হইতে বিচার করা চলে। জ্যোতিষচক্রস্থিত গ্রহ-সংস্থান এবং তৎসংবদ্ধ গ্রহনক্ষত্রগুলির ফলাফল অশীলনান্তর বাহারা কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাঁহারা বোধ হয় কোনরূপ প্রতিকূল বিপত্তির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বা বিফল মনোরথ হয়েন না।

মহাত্মা গান্ধীর কর্মচক্র বিচার করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার জীবনে শুধু শুক্র চন্দ্র প্রভৃতি সাধক-মনোবৃত্তি ও প্রেরণাময় কর্মগুলিই দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে; নিম্নোক্ত মঙ্গল গ্রহের প্রভাব ও রক্তগতিশীল মধুম গৃহস্থিত বৃহস্পতির কারকতায় যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। আবার ষষ্ঠ গৃহস্থিত বক্রী বরুণ ও নবম গৃহস্থিত হার্শেল পরস্পর মিত্র সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া পরস্পরের কেন্দ্রে চতুর্থ দৃষ্টিতে থাকিয়া তাহাদের অধিনস্থ জাতিবৃন্দকে জাতকের প্রেমিক হৃদয়ে স্থান দান করিয়াছে।

উক্ত বরুণ ও হার্শেল (ইউরেনাস) স্নেহভাবাপন্ন গ্রহ। একজন শত্রু স্থান গত, অষ্টটি ধর্মস্থান বা ভাগ্যস্থান প্রাপ্ত, কিন্তু যেহেতু তাহারা পরস্পর মিত্র এবং স্কোয়ারে (কেন্দ্রে-চতুর্থে) দৃষ্ট, মহাত্মাজীর ভাগ্যে শুধু বাধা দানই করিবে। মহাত্মাজী প্রদত্ত অহিংসা নীতির সুযোগ লাভ করিয়া এই দুই যবন গ্রহের জাতকগণ বিশ্বাস-যাতকতা ও শত্রুতাচরণের কার্য করিবে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

এই প্রবন্ধে আমি শুধু মহাত্মা গান্ধীর ভারত-রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা প্রসূত অহিংসা নীতি সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া বিচার করিব; সুতরাং এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর ঠিকুজীর অল্প কোন ফলাফল সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকা কিছু জানিতে পারিবেন না; তাহা পূর্বে বলিয়া রাখিতেছি।

ঠিকুজীতে যে গ্রহ কর্ম-সাফল্য দান করিবে, সেই চন্দ্র-গ্রহ রাহুর দ্বারা আক্রান্ত, এবং কেন্দ্রে স্থানেই; সুতরাং এই রাহু যে মহাত্মাজীর সাধকমনোবৃত্তির প্রতিকূলে নিয়ত বাধা প্রদান করিবে তাহাতেই বা সন্দেহ কি? আবার রাহু কেন্দ্রগত হইলেও উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। অতএব বেশ বুঝিতে পারা যায় যে রাহুর প্রভাব মহাত্মার হৃদয়ে না জাগিলে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রমাণিত না হইলে, মহাত্মাজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এখানে বলিয়া রাখি যে, ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠাই তাঁহার উদ্দেশ্য, এবং অহিংসাত্মক নীতিই তাঁহার একমাত্র অস্ত্র। তারপর, নৈসর্গিক মিত্রভাব লক্ষ্য করিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, যে চন্দ্র এবং রাহু পরস্পর শত্রু সম্বন্ধে জড়িত। স্বকেন্দ্রস্থ চন্দ্র ও তুঙ্গস্থ (উচ্চগৃহস্থ) রাহু পরস্পর যুক্ত; কেন্দ্রে স্থানে। ইহার ফলাফলে অনুমিত হয় এই যে, উচ্চ গৃহস্থ রাহুর কারকতাই মহাত্মাজীর উপর প্রবলভাবে প্রভাব দান করিবে। অতঃপর এই কর্কট রাশিস্থ (ঠিকুজীর কেন্দ্রগৃহ এবং রাহুর উচ্চ স্থান) রাহুর ফলাফল প্রয়োজন বশতঃ প্রবন্ধের শেষ অংশে বিবৃত করিয়াছি।

দ্বাদশ গৃহস্থ রাশির দৃষ্টি কম হইলেও, তাহা আদৌ শুভ নহে; তবে তাহার অষ্টম গৃহে, অর্থাৎ মহাত্মাজীর লগ্নের সপ্তমে যে দৃষ্টি আছে, তাহাও সুবিধা জনক নয়; অতঃপর রবির কারকতা তাঁহার উদ্দেশ্য সাফল্যের পথে আদৌ সাহায্যকারী নহে।

মহাত্মাজীর কর্মচক্র, নৈসর্গিক বলে বলীয়ান গ্রহ-গুলির মধ্যে দাঁড়াইতেছে, লগ্নস্থ শুক্র, বৃধ, মধুমস্থ বৃহস্পতি,

নবমস্থ ইউরেনাস এবং কেন্দ্রস্থ (দশমস্থ) রাহু চন্দ্র-যুক্ত। ইহারাই তাঁহার উদ্দেশ্যের পথে নিয়ত প্রভাব দান করিবে। ইহাদের প্রভাবের ধারা কিরূপ হইতে পারে তাহাই যথা সম্ভব ব্যক্ত করিলাম।—

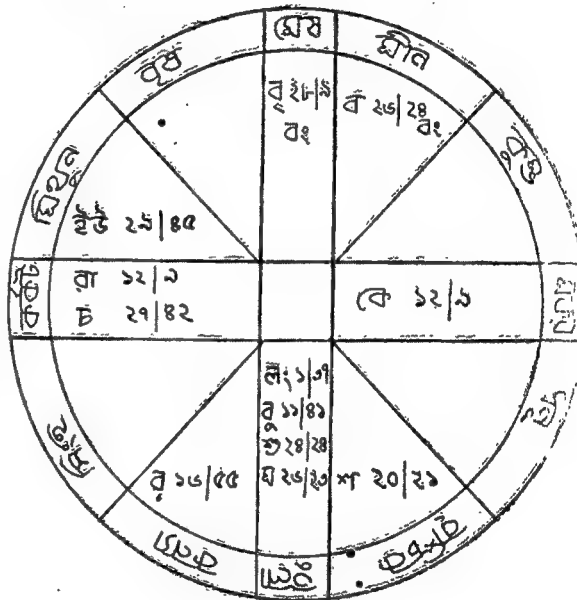
মহাত্মাজীর জন্ম হইয়াছে ‘তুলা’ লগ্নে। স্বতরাং তুলা লগ্নের ফলাফল, যথা, সহায়ত্ব, আন্তরিকতা, অহিংসা, ভোগ বিলাস, অলস-কর্ম, চিন্তাশীলতা, প্রভৃতি গুণ সমূহ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকিবে। অধিকন্তু, লগ্নপতি গ্রহ শুক্র আপন ঘরেই আছে। শুক্রের কারকতা এক্ষণে সাধনা ও বাসনার পূর্ণতা। স্বগ্রহস্থ শুক্র লগ্নপতি হইয়াছে, স্বতরাং ইহার প্রভাব চূড়ান্ত ভাবে মহাত্মাজীর জীবনে পরি-লক্ষিত হইবে। একদিকে মহাত্মাজীর কর্মপ্রেরণা পূর্ণভাবে সফল হইয়া তাঁহার পরম আদর্শ সমগ্র জগৎকে জাগরিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শুক্রের পূর্ণ কারকতায় একটি মাত্র গ্রহ সম্পূর্ণ অন্তরায় দেখা যায়। ইহা ‘শনি’। দ্বিতীয় গৃহস্থিত শনি, তাহার দ্বাদশ গৃহের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, কারণ তাহার দ্বাদশস্থ গৃহে মহাত্মাজীর জন্ম, শনির উচ্চ স্থান। শনির দ্বাদশ দৃষ্টির জন্ম উদ্দেশ্যে আবার দেখা যায়, বক্রগতি বৃহস্পতি লগ্নে সপ্তম দৃষ্টি করিতেছে বটে, কিন্তু, শনির সহিত অষ্টম ও ষষ্ঠ দৃষ্টিতে অভিযুক্ত অর্থাৎ জাতকের (মহাত্মাজীর) উপরই ইহাদের মন্দ প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে। ভারতের বর্তমান ভ্রুগতি দূরী-করণার্থ ত্যাগী মানবের ত্যাগ স্বীকার সর্বথা গ্রাহনীয় ও শ্রদ্ধের হইলেও, তাঁহার আদর্শ গ্রাহনীয় ও প্রার্থনীয় হইতেছে না। উক্ত শনি ও বৃহস্পতির পরস্পর নষ্ট দৃষ্টির দরুণই মহাত্মার জীবনে সাধনার চরম আদর্শ অনশন ব্রতই একমাত্র তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্যবহারিক জগতে ও ব্যবহারিক সাধনায় অনশন ব্রত মানব ধর্মের ‘অন্তরায় বা মানব চরিত্রে ইহা অল্পশীলন যোগ্য নহে ইহা বলিতে হইবে, (যদিও আমার এই অর্থ অনেকেরই নিকট নিরর্থক ও ভ্রান্ত বলিমা মনে হইবে, তব্রাচ বলিতে বাধ্য হইলাম, কারণ মানব-চরিত্রের অল্প-শীলন যে এই ব্রতের অল্পকূল নয়, ইহা সকলেই জানেন)।

মানবের উপর যে অপর শক্তি নিয়ত প্রেরণা ও উৎসাহ জাগাইতেছে তাহা ব্যবহারিক কর্মপদ্ধতির সাফল্যের প্রতিকূলাত্মক ফলাফল দান করে—তথা এই কর্ম-জগতের প্রকৃত রহস্যটির অন্তরাল হইয়া দাঁড়ায়।

রাষ্ট্রের মুক্তি-কামনায় ইহার অল্পশীলন কতটা সফল প্রা-তাহা বলা যায় না।

তারপর লগ্নপতি শুক্রের সঙ্গে যুক্ত বৃহ গ্রহ। বৃহ নবম গৃহের অধিপতি। ধর্ম এবং নীতি তত্ত্বের কারক বৃহ নবম লগ্নপতি শুক্রের সঙ্গে যুক্ত। প্রেমিকতা ও সাধনার সঙ্গে



গান্ধীজীর রাশিচক্র

দার্শনিক তত্ত্বকে যুক্ত করিল। ইহা ছাড়া বৃহ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে। প্রভুত্বপন্ন মতিত্বকে এই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। অসম্ভব বুদ্ধির প্রখরতা বা বুদ্ধি পরিচালনার শক্তি মহাত্মার প্রত্যেক কর্মপ্রচেষ্টায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি এই বৃহের প্রভাবের ভাৱ রাষ্ট্রনৈতিক অথবা যে কোন সামাজিক ভিত্তিমূলক দোষগুলির খালনের জন্ম যে নীতি আবণ্ডক, তাহা আপন দার্শনিক চিন্তার বলেই আবিষ্কার করিতে পারেন। সমাজ বা রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তে তাহার মুক্তির জন্ম যে পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা অনায়াসে উদ্ঘাটন করিতে পারেন। শুক্র কৃত প্রেমিক হৃদয়ের স্বৈর্য্যকে বৃহ অল্প-

শীলন তত্ত্ব আবিষ্কার কার্যের দ্বারা নিয়ত আলোড়িত করিয়া রাখিতেছে। ক্ষতিকারক গ্রহ এখানে মঙ্গল। যত কিছু ব্যক্তিগত বিড়ম্বনা, বা শক্তি আহরণের অস্বকূল পন্থার অভাব প্রসূত ঘটনা সমস্তই দুর্বল, অশুভকর স্বভাবের কৃত। শুক্র ও বুধের যুক্ত প্রভাবে দেশ-কল্যাণের জন্ত যে পন্থার আবিষ্কার তিনি করিতেছেন, সকলই পারিপার্শ্বিক ভ্রান্ত যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ব্যর্থ হইতেছে। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় এই যে, মহাত্মাজী বলিতেছেন এক, কাজে হইতেছে অপরূপ। সাফল্য আসা ত দূরের কথা। কুফলের প্রতিঘাত সামলানো কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

বৃহস্পতি যে জ্ঞান ও শক্তি বিকাশের কারক (এখানে বৃহস্পতি জ্ঞানরূপ সাধনা শক্তি প্রকাশ করিতেছে) সেস্থান বিশেষে থাকিয়াও বক্র অবস্থায় খণ্ডিত। মহাত্মা গান্ধী যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন তাহা মাত্র দেশের এক শ্রেণীর লোক মানিয়া লইতে পারে। বর্তমান ভারত ইউরেনাস গ্রহের প্রভাবে অনাচার ও অত্যাচারের চরম সীমায় অগ্রসর হইতেছে। এই অবস্থায় গান্ধীজীর নির্দিষ্ট ব্রত সেই একশ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোক বিনা অস্ত্র কেহই গ্রহণ করিবে না। দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ প্রথমেই আদরণীয় হইবে না। তাঁহার নির্দিষ্ট নীতি অবলম্বনের বিপক্ষে বর্তমান ভারতে উদীয়মান এক সম্প্রদায়; সুতরাং এই ইউরেনাসের মঙ্গল বা বক্রণের অ-দৃষ্ট-পূর্ণ রহস্যময় কর্ম-প্রচেষ্টাকে দমন করিতে হইলে সমপ্রভাব যুক্ত গ্রহের সহায়তার প্রয়োজন। কাঁটার দ্বারা কাঁটা তোলায় ব্যবস্থা। বৃহস্পতি বজ্রী না হইলে অথবা মঙ্গল লগ্নে না থাকিলে এ ক্ষেত্রে শুভফল প্রদান করিত।

মহাত্মার চিত্তে অহিংসার অক্ষুর জাগরিত হইতেছে নবম গৃহ হইতে। কারণ ধর্ম বা নীতি প্রকাশ করিয়া থাকে নবমগৃহ। নবমাধিপতি গ্রহ বুধ। বুধ শুক্রের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া অপরূপ প্রভাবে ব্যাপ্ত। মহাত্মার ঠিকুজীতে নবমভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে স্নেহগ্রহ ইউরেনাস। ইউরেনাস আবার বক্রণের সঙ্গে স্কোয়ারে যুক্ত। ইহাদের পরস্পরের কৃত ফলাফল শুধু মহাত্মার পারিপার্শ্বিক কর্মাবস্থার কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের পথে তথা

তাঁহার নীতি সাফল্যের দিকে কতখানি শুভ হইবে তাহা বলা যায় না। ইউরেনাস ও বক্রণের প্রভাব সম্বন্ধে আমি পূর্বেই বলিয়াছি।

এবার কেন্দ্রস্থিত রাহু ও চন্দ্রের মহাত্মাজীর ঠিকুজীতে কারকতা কিরূপ তাহা বলিব। চন্দ্র চিত্তকে প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু রাহু যুক্ত থাকিয়া তাহা বিকাশ করিতেছে। রাহু যদিও উচ্চ স্থানে স্থিত, তজ্জ্বাচ রাহুর কারকতা যে এখানে কিরূপ হইবে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। এমন হইতে পারে যে চন্দ্র স্বক্ষেত্রে থাকিয়া আপন প্রভাবকে অতুজ্জল করিত, কিন্তু রাহু নিজে তুঙ্গ (উপঘর) বৃহস্পতি কর্কটে পূর্ণ দৃষ্টি করিতেছে এইজন্ত যদিও রাহু এখানে উচ্চস্থান বলিয়া ভাল ফল দান করিত, বৃহস্পতির প্রভাব তাহা বিনষ্ট করিতেছে। বৃহস্পতি চিত্তকে ধর্ম প্রবণ ও উদ্দেশ্যের পথ উজ্জলতর করিতেছে বটে কিন্তু রাহু তুঙ্গে থাকিয়া বাধা দিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। রাহু এইখানে চায় কেন্দ্র শক্তি, দৃঢ়তর তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের ব্যবহার বৃহস্পতি ও চন্দ্র লগ্ন ও লগ্নপতির কেন্দ্রে প্রভাব রাখিয়া চায় সাধক মনোবৃত্তি। এখানে একমাত্র হইতে পারে যে মহাত্মা গান্ধীর সাধক মনোবৃত্তি রাহুর সাধকে এত দৃঢ় ও প্রখর যে, তাহা জাগতিক কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের শক্তি ব্যহত করিতে পারিবেন না, তিনি আপন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অথবা এই তুঙ্গস্থিত রাহু আপনার প্রভাবকে সফল করিবার জন্ত জাতকের চিত্তবৃত্তিকে বারংবার বাধা প্রদান করিতেছে। রাহুর উদ্দেশ্য দৃঢ়, বলবান, তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের ব্যবহার তথা কেন্দ্রস্থিত থাকায় জয়যুক্ত হইবার জন্ত উদ্ধাম প্রচেষ্টা; চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্রের উদ্দেশ্য সাধক মনোবৃত্তির দ্বারা অহিংসা নীতির পূর্ণ বিকাশ। রাহু তুঙ্গগত সুতরাং শক্তিমান। আর শুক্র, শনি, ইউরেনাস ও বক্রনের দ্বারা পীড়িত, চন্দ্র স্বক্ষেত্রে থাকিলেও রাহু পীড়িত, সপ্তমস্থিত বৃহস্পতি কর্কটে পূর্ণ দৃষ্টি করিলেও বজ্রী। সুতরাং একা শুক্র মঙ্গলাক্রান্ত হইয়া স্বগৃহে লগ্নগত হইয়া কতটুকু সাফল্য দান করিবে বলা যায় না। মহাত্মাজী অহিংস ব্রত ও আর কিছু অবলম্বনে ভারতের রাষ্ট্র মুক্তির পরিকল্পনা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত

হইবে তাহাই বা কি করিয়া বলা যায় ! এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে জ্যোতিষ মতে, যে ভারতের যতটুকু অংশ শুক্র রাশি অর্থাৎ ‘তুলা’ রাশির তাহা রাশির অংশে প্রভাবান্বিত হইতেছে, সেই অংশ সমূহে মহাভ্রাতার নীতি সর্বাপেক্ষা বেশী পালিত হইবে, কিন্তু

মঙ্গল গ্রহ সূর্যের জন্ত প্রভব দান করিতে না পারায় সম্ভবত পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না।

এই প্রসঙ্গে আমার আর যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

অন্ধ-প্রেম

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

(৫)

বহু কষ্টে ও বহু চেষ্টার ফলে রত্নেশ্বর আরোগ্য লাভ করিল বটে, কিন্তু বেচারী দৃষ্টিশক্তি হীন হইল। পিতার পাপে পুত্রের যে সর্বনাশ হয়, এ কথাটা ব্রজেশ্বরের এখন মনে করিতে হইতেছে। বড় জালা এখন ব্রজেশ্বরের। টাকায় তাহার আর স্বথও নাই, শাস্তিও নাই। পত্নী মাধবী নির্বিকার। বিত্ত, সম্পদ, স্বথ-বিলাসেই তাহার আনন্দ। সেই আনন্দেই তাহার গর্ব। সে গর্ব যাহাতে থর্ব না হয়, সে দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি।

বাতাসের মত ছুটিয়া আসিয়া জীবেশ্বর তাহার মাকে বলিল—

“ভারী একটা জ্বর খবর পেয়ে গেছি মা। ছুটতে ছুটতে তাই এলাম তোমার কাছে।”

“কিসের খবর রে?”—বলিয়া মাধবী পান-দোস্তা মুখে দিল।

“শোন তবে বলি। পাশের ঘরে তোমার পদ্মলোচন ছেলে কি তা’র উকীল মোক্তার কেউ নেই টেই ত? ভারী গুপ্ত কথা। দাঁড়াও, চারিদিকটা একবার ভাল ক’রে দেখে আসি।”

পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গিয়া চারিদিক দেখিয়া আসিয়া জীবেশ্বর তাহার মাকে বলিল—

“জান মা, তোমার যে ঐ পদ্মলোচন বড় ছেলেটা আর তা’র অর্দ্ধাঙ্গিনী, ও দুটা হচ্ছে সর্বনেশে জীব।”

“কি রকম?”

“বলছি, শোননা। ওরা এক তান্ত্রিক জুটিয়েছে; সে নাকি যা’ মনে করে, তাই করতে পারে। মারণ, উচাটন, বশীকরণ তা’র হ’ল গে সিদ্ধ বিদ্যা। সেই বিত্তের জোরে তান্ত্রিক তোমাকে নাস্তানাবুদ করতে পারে। কবুবেও। আমি নিজের কাণে তা’দের পরামর্শ শুনে ছুটতে তোমাকে বলতে এলাম। একটা বিহিত কর মা: নইলে তুমিও অন্ধ হ’য়ে নিরুপায় হ’বে, আর বাবাও তা’দের হাতে প’ড়ে তা’দেরই যথাসর্ব্ব দিয়ে বসবেন। তখন পথের ভিখারী হ’ব আমরা সকলেই।”

উত্তেজিত ভাবে মাধবী কহিল—

“বটে! এক রত্তি মেয়ের এত বুদ্ধি, এত দর্প! তা’ ও সব বুদ্ধি তা’কে দিলে কে? সে খবরটা আনতে পারলি না?”

“তা’কি আর না এনেছি মা। তোমার বোঁটিনে নাচাচ্ছে, বুদ্ধি দিচ্ছে, তা’র পিতে গো। আমার মামা বাড়ীতে তোমাদের সেই একজন জটীরাম ছিলনা, ওদের এ সেই রকম একজন তান্ত্রিক আছে। ব্যাটা ভারী ওস্তাদ—শাসন-ক্রিয়া করে।”

“হায় হায় এই সময়ে যদি জটীরাম জ্যাঠা থাকত। তবে বোঁ-এর বাপের বাড়ীর ঐ নচ্ছার তান্ত্রিকটার মস্তা তত্তর সব বা’র ক’রে দিতাম। কিন্তু জ্যাঠা ও আর নাই এখন!”

“নাই যে, সেটা শুভগ্রহ। থাকলে আমাদের ভান্ডা সংসার আরো ভেঙ্গে পড়ত তাঁর ফুস মস্তুরে। সেইত আমার ঠাকুর মায়ের পেটে ওষুধ ক’রেছিল না? আর বাবাকেও দিয়েছে তোমার আয়তাবীন ক’রে।”

“থাম্ বেয়াদব, কাকে কি বলতে হয় এ বয়সেও সেটা শিক্ষা হয়নি? দূর হ সামনে থেকে। এক পরসাত্ত আর দিচ্ছি না তোকেও। যা’ কিছু আছে, সব লিখে প’ড়ে দিয়ে যা’ব দাতব্য-ভাণ্ডারে। তা’তে বরং নাম থাকবে। তোদের দিয়ে গেলে সব উড়ে যা’বে তিন দিনে।”

“এই ত মা রেগেই উঠলে শুধু। আমি বলতে গেলাম এক কথা, তা’র মানে করলে তুমি আর। আচ্ছা আমার ঘাট হয়েছে মা। জগদ্ধাত্রীর মত তুমি মা আমার, এতটুকু রাগ হ’লেই বুঝি সন্তান ত্যাগ করতে হয়। হেঃ—ভারী ত তুমি মা তা’ হলে। হেঃ কথায় বলে—

কু-পুত্র যদি বা হয়,

কু-মাতা কখনো নয়।

হেঃ—বুঝতে পাচ্ছ মা?”

“আচ্ছা, এবার মাপ্ করলাম। বল এখন, তোর কি বলবার আছে। তা’রপর কর্তাকে ব’লে বড় ছেলে, বড় বোঁএর বিলি-ব্যবস্থা করুছি।”

“খবরদার, খবরদার, ও কাষ কোরোনি মা; তা’ হ’লেই সব মাটা আকু কি। তোমার ছোট বোঁকেও কিছুটা বোলোনি মা, তা’তেও সব ভেসে যা’বে। এ সব হ’ল ভারী গুপ্ত জিনিস। যা কিছু কথা হ’বে, সে সব তোমাতে আমাতে। সব আমি ছুরন্ত ক’রে দিচ্ছি, দেখনা তুমি।”

“তুই আবার কি ছুরন্ত করবি রে। তোর আবার ক্ষামতা কি. কুঁড়ের বাদশা তুই।”

“তা’ বুঝি জাননা মা, আমিও এক সন্ন্যাসী ধরেছি। ভারী ক্ষামতা তা’র। সেই ঐ তান্ত্রিক ব্যাটার মস্তর টন্তর সব উন্টে দেবে বলেছে। এখন তোমার মত পেলেই কাষ আরন্ত ক’রে দিই আর কি।”

“আচ্ছা, কর্তাকে সব বলি, তা’রপর তিনি যা’ করতে বলেন।”

“খবরদার, খবরদার—ও কাষটা কোরোনি মা। পাঁচ

কাণ হ’লেই সব গোলমাল হ’য়ে যাবে, তা’ ব’লে রাখছি, হাঁ। আমার সন্ন্যাসী সে কথা আগে ভাগেই ব’লে দিয়েছে।”

রত্নগর্তা মাধবী জানিত, তাহার পুত্র দুইটি কি বস্ত। কিন্তু জানিয়াও জীবেশ্বরের কথা সে অবিশ্বাস করিল না বা করিতে পারিল না। জটীরাম জ্যাঠার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহাতেই তাহার পুত্রের কথায় বিশ্বাস। গরজ্জ এমনই জিনিস।

স্বার্থ্য উদ্ধার হইয়াছে বুঝিয়া জীবেশ্বরের অগ্রজ চলিয়া গেল। মাধবী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—টাকা থাকিলেও বিপদ, না থাকিলেও বিপদ। এমন দার্শনিক-ভাবটা কেন যে তাহার চিন্তাধারার অন্তর্গত হইল, সে তত্ত্ব কোন্‌ গুহায় নিহিত, তাহা জানিবার উপায় নাই।

জীবেশ্বরের চলিয়া যাওয়ার পর রত্নমালা কিশোরের হাত ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত। অগ্রমনস্ক ভাবে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল—

“কিরে রত্ন?”

রত্নমালা বলিল—

“কিশোরদা’ কি বলছিল জান মা? বলছিল—শুধু বাপ্-মায়ের পাপেই ছেলে-মেয়ে অন্ধ হয় না, ছেলে মেয়েদের নিজের কর্মফলও তা’র সঙ্গে যথেষ্ট। হ্যাঁ মা, তাই কি? বাবাকে জিজ্ঞাসা করব, ভেবেছিলাম, কিন্তু তিনি ত বাড়ী নাই!”

রত্নমালার কথার জবাব না দিয়া মাধবী কিশোরকে বলিল—

“হাঁরে হতভাগা, আমার মেয়েকে কুশিক্ষা দেবার জন্তই কি তোর বরাখুরে উন্‌ পাজুরে বাপ্ আমার বাড়ীতে তোকে রেখে গেছে? দয়া ক’রে তোকে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে যে, সেটা তোর ভুলে যাওয়া উচিত নয় ত!”

“উচিত, অহুচিত গুলো তোমাদের কাছেই ত শিখ্বে জ্যাঠাই মা। তা’ আমার অপরাধে বাবাকে যা-তা বলবে কেন, সেটাও ত এই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারি। আরো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সত্যি কথা বলবারও কি কারো অধিকার নেই?”

“কি সত্যি কথাটা, তাই শুনি।”

“রত্নকে যা’ বলেছি, সেইটাই সত্যি কথা। আমার ভিতরকার মানুষ যা’ বলিয়েছে, তাই বলেছি। ওটা তুমি বন্ধ করতে পার কি জ্যাঠাই মা?”

“ইস, ব্যাস্দের এসেছেন আর কি! তবু পরের ভাতে তোর জাত্। বুঝলি হতভাগা?”

“সব ঠিক বুঝতে পারিনি জ্যাঠাই মা। কারো ভাত থাকলেও জাত্ যায়, কেউবা জাত্ থাকতেও ভাত পায়না। যাই হোক, ভাত দেওয়া তোমার যদি অস্ববিধা হয়, সে ভাত্ খাওয়া আমার উচিত হ’বে না।”

“কোন চুল্লার যা’বি, তাই শুনি। বাপের ত ঐ দশা।”

“সে হিসেব তোমার না রাখলেও চলবে। আমি অন্ধ হ’লেও পুরুষ মানুষ। ভিক্ষা করার অস্ববিধা নাই। আজই তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব, জ্যাঠাই মা।”

রত্নমালা এতক্ষণে চুপ্ করিয়াইছিল, এইবার কথা কহিল। সে বলিল—

“তা’ হ’তে পারে না কিশোরদা। এ বাড়ী ছেড়ে তোমার যাওয়া চলবে না। বাবাকে ব’লে তোমার সব ব্যবস্থা আমি ক’রে দিব। তুমি গেলে কথা কইবার লোক পা’ব না এ বাড়ীতে। আচ্ছা মা, তুমি কি সকলকেই সুবাক্য বলবে এই রকম ক’রে?”

মাধবী খুব রাগিয়া উঠিয়া বলিল—

“তোর লজ্জা করলনারে ঐ কথা শুলো মুখে আনতে। এ সব হ’ল কর্তাধ দোষ।”

“কিসের দোষ গা”—বলিয়া রত্নেশ্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দৃষ্টিহীন হইলেও রত্নেশ্বরের প্রতাপ এখনো পূর্ববৎই আছে। গর্ভধারিণী হইলেও মাধবী রত্নেশ্বরকে

ভয় করে—সম্ভবতঃ ছুস্মুখ বলিয়া। দাদার আগমনে রত্নমালাও এতটুকু হইয়া গেল। কেননা, তাহার দোষে কথাই মাধবী বলিতেছিল। দাদাকে রত্নমালার ভারী ভয়।

হাত্ ডাইয়া হাত্ ডাইয়া একটা কাঠাসন সংগ্রহাৎ তাহার উপর বসিয়া রত্নেশ্বর বলিল—

“দেখ, দোষ হ’ল অনেক রকমের। কে কোন্ দোষটা ক’রে বসে, তা বুঝে উঠা খুব শক্ত। কিন্তু যাক্ সে কথা। বলি, চোখই না হয় হারিয়েছি, কাণ ত আছে ঠিক। বরং কণেন্দ্রিয়টা বেশী রকমেরই সজাগ হয়েছে এখন। আমায় সেই কাণ শুনে ফেলেছে, কিশোর আমাদের বাড়ী ছেড়ে চ’লে যেতে চায়, আর ছোট বাবু ধরেছে এক সন্ন্যাসী বে। ‘হাওয়ার জঞ্জিককে’ যুদ্ধং দেহি বলতে পারবে। কেমন এ শোনাটা ঠিক ত?”

মাধবী মনে মনে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। বাহিরে শক্ত হইয়া বলিল—

“হ্যাঃ—জীবুর আবার কথা। ওর কথায় বিশ্বাস করছে কে?”

“তুমিই ত করেছ গো। সন্ন্যাসীকে যখন বিশ্বাস করেছ, তখন সর্বস্বান্ত তোমাকে হ’তেই হ’বে। তা’র জন্ত প্রস্তুত আছ কি?”

“কি বলিস্নের রতন? হক্ না হক্ সর্বস্বান্ত?”

“ঠিক তাই।”

“তা’ হ’লে উপায়?”

“উপায় আছে সঙ্গে এস”—মাতা পুত্রের সঙ্গে চলিল। কিশোর ও রত্নমালাও তাহাদের অনুসরণ করিল।

ক্রমশঃ



হঠযোগাসনাবলী

• শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

শলভাসন

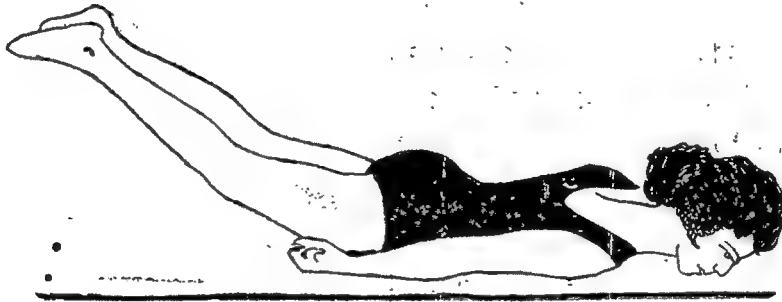
পদ্মপালের সংস্কৃত নাম শলভ। এই বিশেষ আসনটিতে মাহুয়ের দেহের সঙ্গে বোধ হয় পদ্মপালের ভঙ্গির সাদৃশ্য আছে, সেই কারণে হঠযোগ আবিষ্কারকেরা আসনটির এই বিশেষ নামকরণ করেছেন।

আমরা পূর্বে ভূজঙ্গাসনের বর্ণনা করেছি। এই আসনে দেহের একপ্রান্ত যেমন বিশেষ ভঙ্গিতে রক্ষা করা হয় শলভাসনে দেহের অগ্রপ্রান্তও তেমনি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে থাকে।

সাধারণতঃ কোন আসন তাড়াতাড়ি বা ঝোঁক দিয়ে করা নিয়ম নয়, কিন্তু শলভাসন এই নিয়মের ব্যতিক্রম,

দাড়ি মাটিতে থাকা দরকার। অবশ্য এটুকু তফাতে কিছু যায় আসে না।

এই অবস্থায় একটুখানি স্থির থেকে গভীর শ্বাস গ্রহণ করুন, এবং সেই সঙ্গে পা দুটি হাঁটু না ভেঙ্গে ঝোঁক দিয়ে তাড়াতাড়ি যতদূর সম্ভব উপর দিকে তুলুন। এইবার আসন প্রতিষ্ঠিত হল। এই অবস্থায় প্রথম প্রথম পাঁচ সেকেন্ডে থাকা যথেষ্ট। ক্রমশঃ অভ্যাস হলে তখন আর সেকেন্ডে গোনবার দরকার নেই। যতক্ষণ নিশ্বাস আটকে রাখতে পারা যায় ততক্ষণ আসনটি রক্ষা করা উচিত। কিন্তু যেই মনে হবে যে আর নিশ্বাস আটকে রাখা সম্ভব নয়,—নিশ্বাস ছাড়বার পূর্বে পা দুটি খুব দীর্ঘ দীর্ঘ



পূর্ণ শলভাসন

কারণ ঝোঁক না দিলে এই আসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, এবং এই ঝোঁকের কারণে আসনটি অপেক্ষাকৃত কঠিন।

মাটিতে একটা কষল কয়েক পাট করে বিছান। সব আসন অভ্যাস করার জন্ত এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে প্রশস্ত। এই শয্যাটি মাহুয়ের মত লম্বাচওড়া হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। পা দুটি একত্র ও সম্পূর্ণ প্রসারিত থাকবে, আসনের কোন অবস্থায় হাঁটু ভাঙ্গা নিয়ম নয়। বাহু দুটিও দেহের পাশে থাকা দরকার। হাত মুঠিবদ্ধ করুন ও মুঠি দুটি উপরের পানে রাখুন। দাড়ি মাটিতে রাখুন। কেউ কেউ বলেন যে নাক মুখ ও

মাটিতে নামান। এই অবস্থার পর শ্বাসপ্রশ্বাস অবশ্য দ্রুত হবে। একটু বিশ্রাম করুন, শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে গেলে আবার আসনটি করুন।

আসনটি তিনবার থেকে সাতবার করা যথেষ্ট। কিন্তু প্রথমে দুই কি তিনবার করাই বুদ্ধির কাজ। নিজের শক্তি বুঝে ক্রমশঃ আসনের সময় ও বার বাড়ানো উচিত।

শলভাসনের অনেক গুণ আছে। প্রথমতঃ এই আসনটি পেটের, পাহার ও কোমরের পেশীগুলিকে স্থস্থ ও মজবুত করে। মেরুদণ্ডবাহী বাতনাড়ীও এই আসনের দ্বারা উপকৃত হয়।

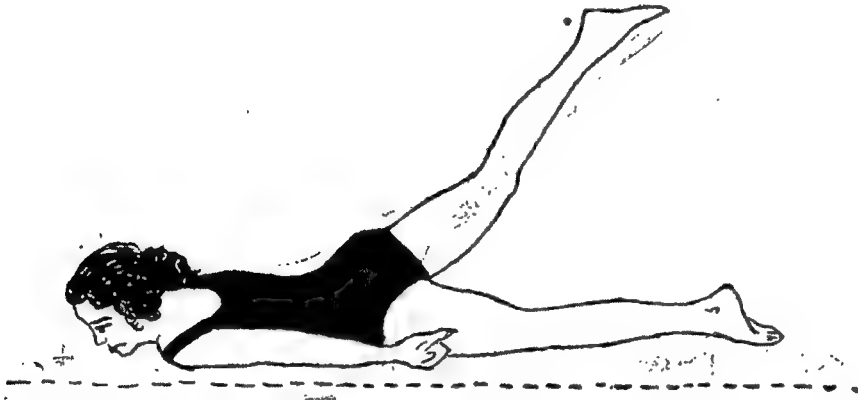
যাঁদের খাবার অব্যবহিত পরে পেট ফাঁপে, শলভাসন তাঁদের পক্ষে বিশেষ উপকারী, কালক্রমে এই রোগ দূর হয়। শলভাসন কটিবাতের বিশিষ্ট ঔষধ। যদি এই আসনটির সঙ্গে ভুজঙ্গাসন যোগ করা যায় তো কটিবাতসহজে নিরাময় হয় এবং ভবিষ্যতেও হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। শলভাসনের দ্বারা অজীর্ণরোগ ও কোষ্ঠবদ্ধতাও সারে।

সাধারণতঃ আমাদের মেয়েরা ফুসফুসকে বেশী খাটান না, সেইজন্য ফুসফুসের যেমন উৎকর্ষ হয় না তেমনি সে ছুটি দুর্বলও থেকে যায়। শলভাসনের অভ্যাসে আমরা ফুসফুসের প্রত্যেকটি বায়ুকোষকে কাজে লাগাতে ও দৃঢ়, কর্মক্ষম করতে পারি। সেইজন্য এই সহজ আসনটি মেয়ে-

করবার পূর্বের অবস্থা এক। শ্বাস গ্রহণের নিয়মও এক। কেবল ছুটি পা উর্দ্ধে তোলার পরিবর্তে একটি পা তোলাই নিয়ম। যতদূর সম্ভব ওপরে তুলে পা'টি উর্দ্ধে রাখুন। একটা পায়ের-পেশী শান্ত হলে পূর্ব নিয়মালম্বারী সেটিবে নামিয়ে অল্প পা'টি ওপরে তুলুন। অর্দ্ধ শলভাসনের প্রণালী এই।

কিন্তু দীর্ঘকাল এই আসনটি অভ্যাস করবার প্রয়োজন নেই। নিজেকে সক্ষম মনে হলে পূর্ণ-শলভাসন করা উচিত।

অর্দ্ধ শলভাসনের উপকারিতা পূর্ণ আসনটির মত হলেও অনেক মৃদু, সেইজন্য পূর্ণ আসন অভ্যাস করার প্রয়োজন আছে।



অর্দ্ধ শলভাসন

দের পক্ষে প্রভূত উপকারী। শলভাসনের অল্প বিশিষ্ট গুণ স্বদৃশ্যকে শক্তিসম্পন্ন করা।

কিন্তু সকল মেয়েই যে প্রথম চেষ্টাতে এই পূর্ণ শলভাসনটি করতে পারবেন তা আমি মনে করি না, কারণ অধিকাংশ মেয়ে কোমরের মাঝের অংশ, বস্তি প্রদেশের ও পেটের পেশী নানা কারণে দুর্বল থেকে যায়। কিন্তু তাঁদের শলভাসনের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হবার কোন কারণ নেই। তাঁরা অল্প সহজসাধ্য উপায়ে শলভাসন অভ্যাস করবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন।

এই সহজতর উপায়ের নাম অর্দ্ধ শলভাসন। এই আসনেও দেহের প্রাথমিক ভঙ্গি, অর্থাৎ আসন প্রতিষ্ঠা

আমার পূর্বেই বলা উচিত ছিল যে যৌগিক অঙ্গ-অভ্যাসের সঙ্গে যতটা পারা যায় দুধ খাওয়া উচিত, তা হলে আসনের উপকার দ্রুত ও অধিকতর গভীর হয়।

আশা করি আমার পাঠক পাঠিকারা এই অনুষ্ঠান আসনগুলি অভ্যাস করছেন। যারা কোন উপকার পেয়েছেন কিংবা যাদের স্বাস্থ্যলাভ হয়নি এবং এখনো কোন সংশয় আছে তাঁদের কাছ থেকে কোন সংবাদ পোঃ আমি অত্যন্ত বাঞ্ছিত হব। এই সংবাদ আমার ব্যক্তিগত সম্বোধনের জন্য নয়, অন্যান্য পাঠিকারা তার দ্বারা উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি। বঙ্গলক্ষ্মী-সম্পাদিকা ঠিকানায় এই সকল সংবাদ দেওয়া যেতে পারে।

দক্ষিণ ভারত-পথে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পর্বত গুহায় মহিষমর্দিনী

এই পাহাড়ের গায়ে যে কয়টি গুহাগৃহ আছে তাহার নির্মাণ কৌশল বা কারুকার্য অজস্র বা ইলোরার গুহার মন্দির অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়, বরং কতক অংশে আরও অধিক প্রাণবন্ত। মহিষমর্দিনী গুহা দেখিলে দর্শক যেমন বিস্মিত হয় তেমনি পুলকিত হইয়া থাকে। এই গুহা পর্বত গায়ে খোদিত করিয়া প্রায় পনের ফিট অভ্যন্তরে গিয়াছে, তিন দিক পাহাড়গাত্র সমুখ দিক উন্মুক্ত, উপরের পাহাড়ের অংশ ছাড়া তাহা ছয়টি স্তম্ভ দ্বারা সমর্থিত। ভাইনের দোয়লে মহিষাশুরের যে বিরাট মূর্তি উৎকীর্ণ তাহা ভাবে ও গঠনের ভঙ্গিমায় পৃথিবীর শিল্প সস্তারের মধ্যে অতুলনীয়। দুর্গার চক্ষুর জ্যোতি, গঠনের ভঙ্গিমা, অপার শক্তি প্রকাশ করিতেছে। শারীরিক গঠন প্রাণালী হইতে যে দৃঢ়তা ও অন্তরের ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহা দেবীর মাহাত্ম্যরই প্রতীক। যেমন দেবী মহিষাশুরকে পদদলিত করিয়া দশ হাতে নানা আয়ুধের অহরুপের শক্তি দ্বারা অশুর নিগৃহীত করিয়াছেন, বিশ্বের যাবতীয় রিপু সমূহকে তেমনি দমন করেন। আবার অশুর হস্তে ভীত মর্তবাসীকে অভয় প্রদান করিতেছেন। এ মূর্তি না দেখিলে ইহার সম্যক অভিব্যক্তি উপলব্ধি হইবে না। লেখনীতে পুথি বাড়িয়া যাইবে, শিল্পির দক্ষতার মর্যাদা প্রদান হইবে না। সুবিধা হইলেই বঙ্গ নরনারীর এই মূর্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত। দুর্গার যেমন তেজোদীপ্ত মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে অমনি তাঁর স্নেহময়ী করুণা দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মহিষাশুরের গর্ভমণ্ডিত ও উদ্বেগপূর্ণ মূর্তিটো অপরূপ। আপনা হইতে বাহির হইল

ঐ হি দুর্গা দশগ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী
নমামি ত্বাং।

বাহতে তুমি মা শক্তি

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

তোমারই প্রতিমা গড়ি

মন্দিরে মন্দিরে,

বহু বল ধারিণীং নমামি তারিণীং

রিপুদল বারিণীং মাতরম্ ॥

চক্ষে জন আসিল, দেখিলাম পশ্চাতে কুণ্ড কোম্পানীর ট্রেনের যাত্রীরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারাও স্তম্ভিত, পুলকিত! একটি মেয়ে বলিল আবার আপনি গান করুন, আমি বলিলাম গান নয় স্তব, আপনারাও মন্ত্র উচ্চারণ করুন, অনেকে মিলিত কণ্ঠে গাহিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই ত শিল্পির সাধনার সার্থকতা!

মহিষমর্দিনী গুহার বাম প্রাচীরে শ্রীবিষ্ণুর অনন্ত শয্যায় শায়িত বিরাট মূর্তি খোদিত আছে। তাঁহার মস্তাকোপরি অনন্ত নাগ সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এমন স্তম্ভের তীরে অনন্ত শয্যায় স্থির, অচল, অটল মূর্তি বড়ই সুশোভন। দেহের গঠন যেমন রমণীয় তুল তুল আখিতারা দুইটো তেমনি কমনীয়। সেই বীর জননী মূর্তির সঙ্গে এই প্রশান্ত নারায়ণ মূর্তি বিশ্বনিয়মের ধারা রক্ষা করিয়াছে।

মধ্যের প্রাচীরের মাঝে হরের ক্রোড়ে পার্বতী বসিয়া অনন্ত সাগর প্রতি চাহিয়া অন্তলীলার ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। জগন্মাতা জগতের সন্তান সন্তানকে মঙ্গল ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্ত স্বামীর নিকট হইতে বিশ্বের রহস্য তত্ত্ব সমস্ত জ্ঞাত হইতেছেন। ভোলানাথের মূর্তি যেমন মহান, পার্বতীর বক্ষ তেমনিই উদার। কি সাধনা বলেই পাথর কাটিয়া শিল্পী জীবের রহস্য কাহিনী মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে শিল্পী কোথায় আজ! সে সাধনার ধারা কি লুপ্ত, আর কি হবে না মূর্ত!

কৃষ্ণলীলা মণ্ডপ গুহা

কয়েক হাত পশ্চিমে বাইলে আর একটি রমণীয় গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার গাত্রে চিত্রাবলী শ্রীকৃষ্ণর লীলাব্যঞ্জক। দক্ষিণ দেশ শৈব প্রধান দেশ বলিয়া সর্বত্র শিবের মন্দির দেখা যায়, বা শিব পরিবারের পূজার প্রচলনই অধিক। এই গুহাতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাই উৎকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে।

গোপীনাথ নয়নোৎপলাচ্ছিত-তমুং গো-গোপং সংসারতম্।

গোবিন্দং কমলবেণুবাননপং দিব্যান্ভূষণং ভজে ॥

এই মূর্তি অর্পণ করিয়া কামবাণ পীড়িতা মহত্ গোপকন্তা
পতি, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, কুলশীল, মান মর্যাদা সমস্তই
ফেলিয়া একাগ্র চিত্তে সেই ভগবানের চরণে নিজ প্রিয় ধন
ঘোষন, মান, দেহ অর্পণ করিতে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছেন।
এই ব্যাকুলতা ফুটাইয়াছে শিল্পী পর্বত গাত্রে, তাহা দর্শনে
প্রাণে সেই ব্যাকুলতা স্রষ্ট করাই শিল্পীর ছিল বাসনা।

কেহ পতি সনে আছিল শয়নে,

তাজিয়া তাহার সঙ্গ।

কেহ ব্যস্তছিল সখীর সহিত,

কহিতে রভস রঙ্গ।



মীণাক্ষী দেবীর মন্দিরের প্রধান তোরণ

মূর্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া গোচারণ করিতেছেন।
অদূরে মা যশোদা গোদোহনরতা। আর বাল কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের
ঈশ্বর পাত্র হস্তে দুগ্ধ ভিক্ষা করিতেছে। যশোদার
বাৎসল্য রসধারা যেন শিল্পীর বস্ত্রের আঁচড়ে ক্ষরিত
হইতেছে। এক পাশে যমুনা পুলিনে কদম্ব বৃক্ষতলে মদন
মোহন দাঁড়াইয়া আছেন—

অরেন্দ বৃন্দাবনে রম্যে মোহনস্ত মনোরতম্

গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্তা মহশ্রবঃ।

আত্মানং বদনান্তোজে প্রেরিতাক্ষিমধুরতাঃ

পীড়িতা কাম বাণেন চিরম্নেত্রবণোৎস্রুতাঃ।

কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্তনে,

চুলাতে রাখি বেসালি।

তাজি আবর্তন হই আনমন,

ঐচ্ছলে সে গেল চলি।

কেহ শিশু লইয়া, কোলেতে করিয়া

দুগ্ধ করায় পান।

শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,

শুনি মুরলীর গান।

কেহ বা আছিল, রক্ষণ করিতে

তেমতি চলিয়া গেল

কৃষ্ণ মূখী হইয়া, মুরলী শুনিয়া

সব বিস্মরিত ভেল।

সকল রমণী, খাইল অমনি,

কেহো কারে নাহি মানে।

যমুনার কুলে, কদম্বের মূলে

মিলল শ্রামের সনে।

গোকুলে সকলে বারিপাত ও স্তম্ভলের আশায় ইন্দ্র-পূজা ও যাগযজ্ঞ করিত। গোবর্ধনের খান্ধ্যাভাব হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ সখা সহ ইন্দ্র যজ্ঞের জব্যাদি গোপসেবায় নিয়োজিত করিলেন। উদ্যোক্তা গৃহস্থ, যজ্ঞভোগী পুত্রক, যজ্ঞাহতি অধিকারী ইন্দ্র কুপিত হইল। কৈফিয়তে বালকৃষ্ণ অধরে হাসি টিপিয়া বলিল প্রতি জীবে ভগবান বসতি করেন, তখন গরুর খাওয়া বা আর দেবতার খাওয়া এক। ইন্দ্র কুপিত হইয়া সাত দিন ঝড় বৃষ্টির উৎপাদন করিয়া গোকুল ভাসাইয়া দিবার উদ্যোগ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বাম হস্তে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপর গোবর্ধন গিরি উর্দ্ধে উঠাইয়া সমগ্র গোকুল রাজ্যের উপর ধারণ করিলেন। যেন সমস্ত দেশ বিশাল ছত্র তলে স্থাপিত হইয়া ঝড়, বৃষ্টি ও জলনিমগ্নতার হাত হইতে রক্ষা পাইল। ইন্দ্র বালকৃষ্ণের মহিমাতে অভিভূত, সেই চিত্রই পর্বত প্রাচীরে খোদিত।

কৃষ্ণ গোচারণে যাইতেছেন আর গোপীগণ সেই মোহন মুরতি হইতে নয়ন ফিরাইতে পারিতেছে না।

গোষ্ঠে চলে যাহুমণি উঠিল মঙ্গল ধ্বনি

শিখা বেণু মুরলী বিশাল।

আগে আগে দেখু চলে হৈ হৈ রাখাল বণে

আগে পাছে চালাইল পাল।

বৃষভাসু শুকুমারী, অট্টালিকা উপরি

অনিমিখে চাঁদ মুখে চায়।

এই ছবি শিল্পী ফোটেইতে প্রয়াস পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কল্বিনী, বলরাম, নন্দ গোপাল, প্রভৃতির কয়েকটি মূর্তিও এই মণ্ডপে দেখা যায়। মণ্ডপের মধ্যে একটি বৃহৎ ১৫ × ১০ ফিট বৃক্ষ একখানি প্রস্তর খণ্ড হইতে খোদিত হইয়া বসান হইয়াছে।

পঞ্চ পাণ্ডব গুহা

এ গুহাটির এক দেয়ালে অজ্ঞানের তপস্তার চিত্রটি ছোট ভাবে খোদিত হইয়াছে। ইহার তিন দিকের প্রাচীর পর্বত গাত্র এবং এক দিকে কোন আবরণ নাই। সামনের দ্বার ফোকরের পার্শ্বে কয়েকটি খামের উপর পাহাড় অবস্থান করিতেছে। সম্মুখে দিগ্বার একটি মূর্তি বসান আছে।

বরাহস্বামী গুহা

বরাহস্বামী গুহা নামে পর্বত গুহাটিও অতিশয় রমণীয়। এই গুহাটিতেও বিষ্ণুর নানা লীলার চিত্র খোদিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবদের খুবই প্রিয় স্থান। গুহার বামপার্শ্বের প্রাচীরে বরাহ মূর্তিটি চিত্তাকর্ষক। বরাহ অবতারের দক্ষিণ পদ সহস্র মন্তকবিশিষ্ট “আদিশেষ” নাগরাজের মাথার উপর স্থাপিত। কুণ্ডলীকৃত অনন্তনাগের শয্যার উপর বিষ্ণু শায়িত, তাহারই দক্ষিণ উরুর উপর বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী সানন্দে বসিয়া আছেন। ক্ষীরোদ মহাসাগর মগ্নন করিয়া বিষ্ণু রাক্ষসদের কবল হইতে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দক্ষিণ প্রাচীরে ক্ষীরোদ সাগর হইতে উত্থিত লক্ষ্মী মূর্তি খোদিত হইয়াছে, ইন্দের শেতকায় হস্তিষ্ম দুই দিক হইতে শুণ্ড উত্তোলন করিয়া কলসী উল্টাইয়া মঙ্গলবারি ঢালিতেছে। লক্ষ্মী সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্ধারকর্তা বিষ্ণুর দিকে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ নয়ন দুইটি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। মুখে যেমন হাসি, তেমনি সরলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয়, বিষ্ণুবক্ষ বিহার করিবার জন্ত উন্মত্ত।

অন্য পার্শ্বে বামন অবতারের মূর্তি। স্বর্গজয়ী বলি রাজার নিকট হইতে স্বর্গ পুনর্দখল করিয়া ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত বিষ্ণু বামন অবতার গ্রহণ করিয়া মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। বলি রাজ-মন্তকে পদ রক্ষিত করিয়া বামন দেব দণ্ডায়মান। অধরে হাসি হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। Southey তাঁহার Curse of Kehama গ্রন্থে বলিকে মহাবলিপুত্রামের স্থাপয়িতা বলিয়া গিয়াছেন। বামন অবতারের লীলাকে তিনি স্তায়, ধর্ম, দয়ার পরাকাষ্ঠা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

For though he was cast down to Padalon
Yet there, by yamen's throne,
Doth Bali sit in Majesty to might,
To Judge the dead and Sentence them
aright.

খোদিত থাকায় গুহা মনোরম দেখাইতেছিল। ইহার
সুস্ত দেখিলে কাঠের থাম বলিয়া ভ্রম হয়; অতি মঙ্গল
এবং সুন্দর কারুকার্যময়; সেইগুলি স্থলপুরাণে মন্ত্রভরমের
যে নগরের উল্লেখ আছে তাহাই মহাবলিপুরাম বলিয়া
বর্ণিত।



তিরুমল নায়কের রাজপ্রাসাদ, মাদুরা

গণপতি মন্দির

পূর্বত গুহাগুলি বাতীত এখানে একটি পাহাড় কাটিয়া
সুদৃশ্য ত্রিভুজ বিশিষ্ট গণপতির মন্দির আছে। মন্দিরটির
চতুঃপার্শ্বের নানা পরী মূর্তি, তাহার পার্শ্বে স্থান লতাপাতা

The Madras Govt Epigraphist A. ...
1886-87 আছে—"Atyantakama (about 550
A. D.) was the founder of the so-called
Ganesa temple, Dharmara Raja Mandap
and Ramaunj Mandap at Mama-zzparam
(I. M. P. Vol, P I, 227-319)

সপ্ত প্যাগোডা

পর্বতমালায় গুহা ও মন্দির দেখিয়া সমতল ভূমি দিয়া সমুদ্র তীরের মন্দিরটি দেখিতে চলিলাম। পথিপাশে আধুনিক যুগের একটি নাতিবৃহৎ বিষ্ণু মন্দির ও টেপাকুলাম (সরোবর) দেখিলাম। জাবিড় শিল্পীর কৌশল ও ধারা এ মন্দিরেও প্রকাশিত হইয়াছে।

উলিয়াম চেম্বারস সাহেব “এসিয়াটিক রিসার্চ” গ্রন্থের প্রথম ভাগে ১৭৮৮ খৃঃ সপ্ত প্যাগোডা ও মহাবলিপুরমের ইতিবৃত্তি প্রথম প্রকাশ করেন। তদবধি এই খ্যাতস্থানের বর্ণনা নানা গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে এবং নানা স্থধী ও সাধক মহাবলিপুরম্ দর্শন করিয়া ধন্ত হইয়াছেন।

সমুদ্রের গর্ভ হইতে উথিত এই মন্দিরটির অবস্থানের স্থান এবং কারুকার্য এবং স্থল-শয়না পেরুমল বা অনন্তশায়ী বিষ্ণু মূর্তি যে কোন পাষণ হৃদয় বা নাস্তিক প্রকৃতির মানবকে ভগবানের মহিমায় অভিভূত করাইয়া ফেলে। কিম্বদন্তী, সপ্ত মন্দির এই স্থান শোভা করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। ছয়টি ইন্ডের রোষে সমুদ্রের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে প্রায় অর্ধ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিন্ন পর্বতশ্রেণীকে ছয়টি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া পথ প্রদর্শকরা ও পাণ্ডারা বোঝাইবার চেষ্টা করেন। কিম্বদন্তী ব্যতিরেকে ইহাদের কোন সত্য বিবরণ পাওয়া যায় না। এই ধ্বংশের উপরে আলোকস্তম্ভের পদতলে যখন সমুদ্রের নীল জলরাশী আছাড় খাইয়া দ্বৈত ফণাযুক্ত হয়, ইহার জলকণা বিক্ষুরণ হয় তখন এক অপূর্ণ ত্রীধারণ করে, তখন সেই ধ্বংশের লীলার মধ্যেও স্তম্ভময় আলোক স্রষ্টি চিত্র পুলকিত করে। মন্দিরের অলিন্দায় বসিয়া বসিয়া অনন্ত নীলাধরাশীর দৃশ্য, স্ত্রীতল সমীরণ, স্তরু ভাব আমাদের একবারে বিহ্বল করিয়া দিল। সেই শান্তিময় স্থল হইতে উঠিয়া আসিতে মন আদৌ চাহে না। যত পথ ক্রান্তি, মনের অশান্তি দূর হইয়া গেল। মনে হয় ভগবান এই অনন্ত অসীম জলরাশী হইতে ভাসিয়া আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন।

মন্দিরটি পরিত্যক্ত ও অবহেলিত। দুই একজন পুজারী এখানে থাকিয়া কোন রকমে দেবতার মাথায় ফুল

বিষপত্র প্রদান করে এবং হিন্দু যাত্রীদের নিকট পয়সা ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করে।

মন্দিরের মধ্যে ঘোল মুখ বিশিষ্ট কাল গ্রেনাইট পাথরের প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বিরাজিত, দেয়ালে হর, পার্শ্বতী, স্বব্রহ্মমুনিয়া (কার্তিকেয়) স্তম্ভের মূর্তি খোদিত আছে। এই মন্দিরের শৈব্য ও বৈষ্ণবদের মিলন হইয়াছিল বলিয়া বৈষ্ণবপ্রবর তিরুমঙ্গল আলোবার প্রমাণ দিয়াছেন। অনেক স্থলে মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে বিষ্ণুর মূর্তির সহিত ছোট ছোট মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রাঙ্গণের দেয়ালের উপর চারিদিকে প্রস্তরে উববিষ্ট বুঘ পৃথক পৃথক ভাবে বসান আছে প্রায় শত বুঘ মূর্তি হইবে। এইগুলি পাথরের দেয়ালের সহিত এক সঙ্গে খোদিত ও প্রাচীরের মাথা রূপে নির্মিত। সেই জগুই ইহা প্রকৃত পক্ষে শিব মন্দির রূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই স্থানের নিকট পর্বতগাত্র খোদিত একটি “অতিকায় রাজা বলির” মূর্তি আছে। ইহা লম্বায় ১৫০০ সহস্র ফিট। এই মূর্তিটিকে বলি রাজার মূর্তি বলিয়া পূজা করিলেও ইহা একটি জৈন জিনের মূর্তি। মহাবলিপুরমের অনেক মূর্তি বা মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। শিল্পীগণ কেন যে তাঁহাদের আরও কৰ্ম শেষ না করিয়া যন্ত্র গোটাইয়া ছিল তাহার রহস্য এপর্য্যন্ত ঐতিহাসিকরা সমাধান করিতে পারেন নাই। তথাপি এই স্থানের শিল্প-সম্ভার ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অনন্তকাল ব্যাপিয়া দর্শকগণকে আকৃষ্ট করিবে এবং ভারত-শিল্পীর জয় গানে বিশ্ব মুগ্ধ হইবে।

সাউথ ইণ্ডিয়ান সরাইন গ্রন্থের ১৬০ পৃঃ লিখিত আছে মহাবলিপুরমের Most of these sculptures here attest to the art sculpturing having been carried to perfection by the ancient Hindus.

কার সাহেবের “সেভেন্ প্যাগোডাজ” পুস্তকে অর্জুনের তপস্তা ও মহিষমর্দিনীর গুহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তিনি অর্জুনের তপস্তায় সর্ববৃহৎ হস্তিনী মস্তক হইতে ল্যাজ পর্য্যন্ত ১৬ ফিট লম্বা ও ১৪ ফিট উচ্চ লিখিয়াছেন। চিত্রাবলীর সমস্তটা ২৪০০ বর্গ ফিট স্থান জুড়িয়া আছে।

সম্রাট তীরবর্তী মন্দিরের শিলালিপি হইতে জানা যায় রাজা রাজদেব এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, চিদাম্বরমের চীং সভা মণ্ডপের অন্তর্করণে। এই মন্দিরের নাম জলাশয়ন একবার ছিল। এই মন্দিরের মধ্যে আর একটি লিপিতে খোদিত আছে বীর রাজেন্দ্র চোলা নরপতির নবমবর্ষ রাজ্যকালে শিরিষার বা নরসিংহ মঙ্গলমের মহাসভা ভগবান তিরুকাদালমল্লি নামে ২০০০ জুই সহস্র কুলী ভূমি প্রদত্ত হইল (See S.I. Shrine Vol No42 pp 68-9)

এই মন্দিরের দক্ষিণদিকের পোস্তার কো রাজকেশরী বর্ষন রাজরাজ প্রথমের পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজ্যকালে গ্রামবাসীদের সহিত রাজস্ব আদান প্রদানের যে চুক্তিনামা হইয়াছিল তাহারই পরিচয় খোদিত আছে। (এই পুস্তকের ৪০ খণ্ডের ৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মন্দিরের উত্তর পোস্তায় উক্ত রাজার ২৬ বৎসর রাজ্য কালে নির্মিত তিনটি মন্দিরের কথা উল্লেখ আছে। যথা রাজসিংহ পল্লবেশ্বরদেব, ক্ষত্রিয় সিংহ পল্লবেশ্বরদেব এবং পল্লকোন্দার। তিরুমঙ্গলাই আলবার পাশাপাশি শিব ও বিষ্ণুর মন্দির স্থাপনের কথা লিখিয়াছিলেন।

বরাহস্বামী মন্দিরে বামপার্শ্বে পূর্বত গাত্রে যে কথা উৎকীর্ণ আছে তাহা হইতে চোলরাজ কো পরকেশরী বর্ষ ওরফে উদেবার রাজেন্দ্র দেবের ১০৫০-৬২ খৃঃ দ্বাদশ বৎসরের রাজশাসনের ইতিহাস জানা যায়।

পল্লকরম ছত্রমের নিকট প্রস্তরখণ্ডে বিজয় নগরের রাজা অচ্যুতদেবের ১৪৫৭ শকাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। স্যার ওয়ালটার ইলিয়ট ইহার পাঠ অল্প রকম করিয়া বিক্রমদেবের মৃত্যু ১১৫৭ শকাব্দে বলিয়াছেন।

গণপতির মন্দিরে অক্ষর তারিখ বার্গেল সাহেব খৃঃ ৭০০ মতন বলিয়াছেন। কিন্তু ধর্মরাজমণ্ডপের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে যে গণপতি মন্দির ও এই মণ্ডপ অত্যন্ত কম দ্বারা নির্মিত! ইহারই অল্প নাম নরসিংহ বর্ষ দ্বিতীয়। (সাউথ ইণ্ডিয়া ইনস্ খণ্ড ১ম, ১০ পৃঃ)

স্থলশায়ন পেরুমল মন্দিরের শিলালিপিতে কো পরকেশরী বর্ষর বিংশ বৎসর রাজ্যকালে এক সহস্র কুলি জমি দেবসেবার জন্য প্রদত্ত হইল উৎকীর্ণ আছে। ইহার উত্তর দেয়ালে দল্য তিরুমল নায়ক (Dalavay Tirumalanayak) শ্রী রজার্যার রাজসময়ে স্থলশায়ন পেরুমল দেবকে বহুদত্ত প্রদেশে কুমাণ্ডর গ্রামখানি প্রদত্ত হইল।

এই প্রকার শিলালিপি হইতে উপলব্ধি হয় যে মহা বল্লিপুলামের মন্দিরগুলি সহস্র বৎসরের পূর্বে নির্মিত হইয়াছে। এবং তদানীন্তন স্বাধীন নরপতিগণ দেবসেবায় বহু অর্থ ও জমি প্রদান করিয়াছিলেন। কাজে ধর্ম না থাকিলে দেবসেবার কার্য নিবিঘ্নে হইতে পারে না ঈশ উপনিষদে দেববাজী ত্রায় কাজবাজী একান্ত প্রয়োজন। স্থপ্তি রাখিতে হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের মধ্যেও প্রীতি, পরস্পর সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক। মিশনারী, মিলিটারী, মার্চেন্ট ও মেজরেল লেবার চারি প্রকার বর্ণচারী লোকই বর্তমানের সভ্যজাতি গঠন করিয়াছে। হিন্দুর সৌভাগ্য ও স্বাধীনতা অগমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ধ্বংস হইয়াছে এবং দেবশাস্ত্র ও শিল্প-সৃজন-শক্তি লোপ পাইয়াছে।



আধুনিকা.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর ।
কবি-গিরি ফলাবার উৎসাহ-বহুয়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্বেষণ,
যদি সন্দেহ করো এত বড়ো অধিনয়,
চুপ ক'রে যে সহিবে সে কখনো কবি নয় ।
বলিব দু-চার কথা, ভালো মনে শুনো তা ;
পূরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা ।

পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্র
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি সত্তর ।
আয়ুর তবিল মোর কুণ্ঠির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে ।
চলিতে চলিতে গাথে আজকাল হরদম
বুকে লাগে যম-রথ-চক্রের কদম ।
তবু মোর নাম আজো পারিবে না ওঠাতে
প্রান্তিক তবের গবেষণা-কোঠাতে ।
জীর্ণ জীবনে আজ রং নাই মধু নাই
মনে রেখো তবু আমি জন্মেছি অধুনাই ।
সাড়ে আঠারো শতক A. D. সে যে B. C. নয়,
মোর যারা মেয়ে বোন, নারদের পিসি নয় ।
আধুনিকা যারে বলো তারে আমি চিনি যে,
কবি-বংশে তারি কাছে বারো আনা খণী যে ।
তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছিও শাস্তি ।

প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ-কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর ।
কাছে পাই হারাই-বা তবু তারি স্মৃতিতে
সুর-সৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে ।
মনোলোকে দৃতি যারা মাধুরী-নিকুঞ্জে
গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ-যে ।
সেকালেও কালিদাস-বররুচি-আদিরা,
পুরস্কন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা,
যাদের মহিমা-গানে জাগালেন বীণারে,
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে ।
আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যাম্বুশীলনা ।
পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সুগ্রহ
চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ ।
জুতা-পায়ে খালি-পায়ে শ্লিপারে বা নূপুরে
নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে ছপূরে,
যেথা স্বপনের পাড়া, সেথা যায় আগিয়ে,
প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে ।
তবু কবি-রচনায় যদি কোনো ললনা
দেখো অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা ।
মিঠে আর কটু মিলে' মিছে আর সত্যি,
ঠোকাঠুকি ক'রে হয় রস-উৎপত্তি ।
মিষ্ট কটুর মাঝে কোন্টা যে মিথ্যে
সে কথাটা চাপা থাক্ কবির সাহিত্যে ।
ঐ দেখো, ওটা বুঝি হোলো শ্লেষবাক্য ।
এ রকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য ।

প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
সাম্প্রদায়িক নাহি যায় অকারণ কটুতা ।
বারে বারে এই মতো করি অত্যাধিক,
ক্ষমা ক'রে কোরো সেই অপরাধমুক্তি ॥

আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই
তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার থলি বই ।
অন্ন ভরিয়া দাও সুখা তাহে লুকিয়ে,
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে ।
অনেক গেয়েছি গান মুখ এ প্রাণ দিয়ে ।
তোমরা তো শুনেছ তা, অন্তত কান দিয়ে ।
পুরুষ পুরুষ ভাষে করে সমালোচনা,
সে অকালে তোমাদেরি বাণী হয় রোচনা ।
করণায় ব'লে থাকো, “আহা, মন্দ বা কী !”
খুঁটে বের করো না তো কোনো ছন্দ-কাঁকি ।
এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় ক'জন,
এত লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা ।
এর পরে বাঁশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
তখন আমারে ভুলো পারো যদি ভুলিতে ।
সে দিন নূতন কবি দক্ষিণ পবনে
মধু ঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে,
তখন আমার কোনো কীটে-কাটা পাতাতে
একটা লাইনো যদি পারে মন মাতাতে
তাহলে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া ।

এ কী গেরো ! কাজ কী এ কল্লনা-বিহারে,
সেক্টিমেন্টালিটি বলে লোকে ইহারে ।
ম'রে তবু বাঁচিবার আব্দার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি ।

এটা তো আধুনিকার সহিবেনা কিছুতেই
এস্টিমেশনে তার পড়ে যাব নিচুতেই ।
অতএব মন, তোর কলসি ও দড়ি আন,
অতলে মারিস ডুব Mid-Victorian ।
কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে ।
শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে ।
গদগদ সুর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যায় ঠাট্টায় ঠাট্টায় ॥
তোমাদের মুখে থাক্ হাস্তের রোস্নাই,
কিছু সীরিয়াস কথা বলি তবু, দোষ নাই ।
কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
শুধু এ-কল্লিনী নয়, যারা চিরকালিনী ।
এ কথাটা ব'লে যাব মোর কনকেশানেই
তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই ।
জীবনের সন্ধ্যায় তাহাদেরি বরণে
শেষ রবি-রেখা রবে সোনা-আঁকা স্মরণে ।
সুর-সুরধুনীধারে যে-অমৃত উথলে
মাঝে মাঝে কিছু তার ঝরে পড়ে ভূতলে,
এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না ।
আমাদের কত ক্রটি আসমে ও শয়নে,
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে ।
প্রেম-দীপ জ্বলেছিল পুণ্যের আলোকে,
মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে ।
নানারূপে ভোগসুখা যা করেছে বরষন
তারে শুচি করেছিল স্কুকার পরশন ।
দামী যাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে ।
তবু মনে আশা করি মৃত্যুর রাতে ও
তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথেয় ।
আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
যে কালে এসেছি আজ সে কালটা Cynical ।

কিছু আছে তার লাগি স্নগভীর নিশ্বাস
জেগে ওঠে, ঢাকা থাক তার প্রতি বিশ্বাস

একটু সবুর করো, আরো কিছু ব'লে যাই,
কথার চরম পারে তারপরে চলে যাই ।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়ো না চেতনা,
ছায়া'রে অতিথি ক'রে আসনটা পেতো না ।
বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিত ভাঙে স্মৃতিটার ।
ভিড় ক'রে ঘটা করা ধরা-বাঁধা বিলাপে,
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা খিলাপে
ভারতে ছিল না লেশ এই সব খেয়ালের,
কবি 'পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের ।
“ভুলিব না ভুলিব না” এই ব'লে চীৎকার
বিধি না শোনে কভু, বলো তাতে হিত কার ।

যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সে-ই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে ।
শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা,
তেলহীন দীপ লাগি দেশলাই পোড়াটা,
যে-মোষ কোথাও নেই সেই মোষ তাড়ানো,
কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো,
শক্তির বাজে ব্যয় এরে কয় জেনো হে,
উৎসাহ দেখাবার সত্বপায় এ নহে ।
মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ,
স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য
সকলি আহুতি-রূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টিকে না যা, কথা দিয়ে কে পারিবে টিকাতে ।
ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে ॥

লাহোর

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫



বঙ্গ সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর দান

শ্রীমতী ঘোষ, এম,এ*

বঙ্গ সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম প্রবেশ বিস্ময়-
কর। একজন মহিলা অন্তঃপুরের অন্তরাল হইতে যে এমন
সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে, ইহা সহজে কেহ বিশ্বাস
করিতে পারে নাই। তাহার কারণ আছে। সে যুগে
অন্তঃপুর অন্ধকারেই ছিল আচ্ছন্ন। স্বতরাং তাহার মধ্য
হইতে আলোর স্বর্ণকমল ফুটিয়া উঠিতে দেখিলে কাহার না
বিস্ময় বোধ হয়! কিন্তু একথা হয়ত সকলেই ভুলিয়া
গিয়াছিল যে অন্ধকারের নিকষ কালো পটেই আলোর
স্বর্ণকমল তাহার প্রথম চিহ্নটি আঁকিয়া দেয়, জ্যোতির
সাগর হইতে সে উঠে না।

কিন্তু শিশু যেমন অপরিচিত কাহাকে দেখিলে
খানিকক্ষণ বিষয়ে স্তব্ব হইয়া থাকে, তাহার পর আনন্দে
তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বঙ্গ-সাহিত্য-শিশু তেমনি
সেদিন বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ব থাকিয়া স্বর্ণকুমারীর কোলে
ঝাঁপাইয়া পড়িল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, স্বর্ণ!
তোমার রচনার ওপর দেবতার পুষ্প-বৃষ্টি হউক—তাঁহার
আশীর্ব্বাদ সফল হইল।

তাঁহার এই বহুমুখী উজ্জল প্রতিভার জন্ম বঙ্গীয়
সাহিত্য সম্মেলন (১৩৩৬) তাঁহাকে সভানেত্রীর পদধানে
ধন্য হইয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অগভারিনি স্বর্ণ
পদক দানে প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর করিয় ছেন।

“স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিভা ছিল বহুমুখী, দৃষ্টি ছিল
সুদূরপ্রসারী, শক্তি ছিল প্রচুর, সৃষ্টির ছিল বৈচিত্র্য, ভাষার
ছিল লালিত্য, দৃষ্টি এবং কল্পনার ছিল প্রসারতা কিন্তু
তিনি যে শুধু সাহিত্য রচনার যশগৌরবেরই অধিকারিণী,
তাহা নহে—তিনি সাহস করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে না
নামিলে আর কোনও নারী এ পথে আসিত কিনা, আমার
সন্দেহ হয়। সেই জন্ত বলি, তিনি বাঙালা দেশে নারী
জাতির আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।”

(নিস্তারিণী দেবী)

স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য রচনার বিষয় বিস্তারিত
আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমার মনে
রচিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধরাশির একটি তালিকা (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)

পরিশিষ্ট ক

উপস্থাপন। * পুস্তকের নাম প্রথম প্রকাশ পুস্তক প্রকাশের
তারিখ

দীপনির্বাণ	১২৮৬ (?)	
ছিন্নমূল	১২৮৫	১২৮৬
মালতী		১২৮৬
মিবার রাজ		১৮০৯ খ্রিঃ
বিক্রোহ	১২৯৪	১২৯৯ খ্রিঃ
হুগলীর ইমামবাড়ী	১২৯১	১২৯৪
স্নেহলতা	১২৯৬	১২৯৯
ঈশ্বরের মালা	১২৯৯	১৩০১
* কাহাকে ?	১৬০৩	১৬০৫
বিচিত্রা		
স্বপ্নবাণী		১৬২৮
মিলন রাত্রি		১৬৩৩

* তারকা চিহ্নিতগুলি ইংরাজীতে অনূদিত

গল্প : নবকাহিনী

কুমার ভীমসিংহ ৩৪১১১২৯৩ ভারতীয়

* দিব্য কমল (ভার্মানীতে অনূদিত) ১

* শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পগুলি ইংরাজীতে অনূদিত
প্রকাশিত হইয়াছে—

* ১ উল্লেখ মাত্র পাই, কিন্তু কলিকাতার
বিখ্যাত গ্রন্থাগারে পাই নাই।

পুস্তকের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশ তারিখ	পুস্তকের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশের তারিখ
ক্ষত্রিয় রমণী (?)	১১৪।২।২৩	ভারতী	কবিতা গাথা		১২৮৭
এক ভয়ঙ্কর ঘটনা	৬৪২।১।২৫	" "	ও কবিতা ও গান		১৩০২
ক্ষত্রিয়ের, স্ত্রী,			সঙ্গীত প্রভাত সঙ্গীত		গ্রন্থাবলী
অশ্ব ও তরবারি	৮২।২।২৭	" "	মধ্যাহ্ন সঙ্গীত		ঐ
আমার জীবন	২৫৩।৫।২৮	" "	সন্ধ্যা সঙ্গীত		ঐ
কেন ?	১৬২।৩।২৮	" "	নিশীথ সঙ্গীত		ঐ
গহনা	৩২৭।৭।২৮	" "	সঙ্গীত শতক		ঐ
প্রতিশোধ	১০৩।২।২৮	" "	জাতীয় সঙ্গীত		ঐ
প্রেম	৮৫।২।২৮	" "	কবিতা পারিজাতহার		ঐ
লজ্জাবতী	২২৫।৬।২৮	" "	নব কবিতাবলী		ঐ
সম্মাদিনী	৪।১।২৮	" "	ধর্ম সঙ্গীত এবং প্রেম পারিজাত		ঐ
অমর গুচ্ছ	৮২।২।১৫ হইতে	" "	বিজ্ঞান : পৃথিবী		১২৮২
ছোট গল্প : যমুনা	গ্রন্থাবলী হইতে		বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিজ্ঞান শিক্ষা	১২৩।৪।৮২	
মিউটিনি	ঐ		(ভারতীতে প্রকাশিত		
নূতন বালা	ঐ		গ্রন্থাকারে বাহির হয় নাই) অগ্ন্যাগ্ন গ্রহগণ জীবের		
চাবীচুরি	ঐ		প্রলয়	৬২।২।২২	
রক্ত পিপাসু	ঐ		নিবাস ভূমি কি না ?	২২।১।৬।৮২	
ট্যালিসম্যান	ঐ		পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা		
বিজ্ঞান আশীর্বাদ	ঐ		কিরণ পদার্থ	১৬০।৪।২১	
নব ডাকাতের ডায়েরী	ঐ		মঙ্গলে জীব থাকিতে		
স্বপ্ন না কি ?	ঐ		পারে কি না	৩৮।১।২২	
পুজার তত্ত্ব	ঐ		সৌর জগতে কত চাঁদ	১৮২।৩।২৩	
হাসি	ঐ		তারকারাশি	৫৭৩।১০।২৪	
নাট্য গ্রন্থাবলী : বসন্ত উৎসব	১২৮৩		যমক এবং বহু সঙ্গিক		
কৌতুক নাট্য		১৩০৮	তারকা	৬৩২।১।২৪	
দেব কৌতুক	১৩১১	১৩১২	পরিবর্তনশীল তারকা	৭১৫।১২।২৪	
কনে বদল	১৩১২	১৩১৩	তারকার জ্যোতি	৫৩৮।২।২৪	
পাকচক্র	১৩১৫	১৩১২	তারকা বর্ণ ও তারকার		
রাজকথা	১৩১৮	১৩২০	নির্মাণ উপাদান	১২।১।২৫	
যুগান্ত কাব্য নাট্য	১৩২০		তারকা গুচ্ছ	১২৭।৩।২৫	
অতৃপ্তি		গ্রন্থাবলী	নীহারিকা	১২০।৪।২৫	
নিবেদিতা		ঐ	সূর্য	৩২৫।৬।২৫, ৪৬৫।৮।২৫	
			বৈজ্ঞানিক সংবাদ	৫০ পৃঃ ১১২২৬	

ভারতী সম্পাদন; ১২৯১—১৩০১; ১৩১৫—১৩২১

ভ্রমণ	প্রথম প্রকাশ	ভারতী
(প্রবন্ধ) দারজিলিং পত্র	২২।১।২৫	ভারতী
গাজিপুর পত্র ২৭ পৃঃ, ১২৯ পৃঃ, ২৭২ পৃঃ		
	১২৯৬ সাল	„
নীলগিরি	৫১৫।২।১৩০২	„
পাহাড়পুর	৫৭৩।১০।০৪	„
পুরী	৬৪১।৬।২০	„
পত্রাবলী	গ্রন্থাবলী	
সমুদ্রে	ঐ	

জাতিতত্ত্ব : নীলগিরির টোডাজাতি	৫৭৫।১০।১৩০২	„
অস্ত্রাশ্রয় বিবিধ কান্ হোজি আদে	৩২।১।০৭	„
উল্লেখযোগ্য কর্তব্য কোন পথে	৪৩০।২।১৫	„
প্রবন্ধ কর্জন ও বর্তমান অরাজকতা	২২।২।১৫	„
বিধবা বিবাহ ও হিন্দু পত্রিকা	২৫২।৫।১৬	„
রমাবাহি	২৪৩ পৃঃ।১২৯৬	„
কবি, নাস্তিকতা ও শৈলী	১১৪।২।২৪	„
জী-শিক্ষা ও বেধুন জুল	২২৫।৪।২৪	„
গিলটির বাজার	১৭৩।৩।২৪	„
আমাদিগের সমাজ	৬৬।১।১।২৪	„
পুস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব	৫৩।১।২৫	„
সরলতা কি নিন্দাপ্রিয়তা	২১৪।৪।২৪	„
রাণা বংশে ইরানীজ আরোপ	১০১।২।২৪	„
গল্প-প্রবন্ধ মঞ্জুবা	গ্রন্থাবলী	„
সেকলে কথা	ঐ	„
প্রবন্ধ রত্নমালা	ঐ	„

ইহা ব্যতীত শিশুপাঠ্য পুস্তকের তালিকা অপ্রয়োজন বোধে দিলাম না। রামমোহন লাইব্রেরীর তালিকায় ভ্রমর নামক একখানি পুস্তকের উল্লেখ দেখিয়াছি, কিন্তু গ্রন্থাগারিক মহাশয় বইখানি দেখাইতে পারেন নাই, সাহিত্য স্রোত, গল্পমগ্ন প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তকের উল্লেখ করিলাম না।

বঙ্গ সাহিত্যের স্রোতস্বিনী যখন সবেমাত্র হিমালয় হইতে বাহির হইয়া স্বন্দর ধারায় বহিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, স্বর্ণকুমারী দেবী সেই স য়ে সেই প্রবহমান

স্রোতের সহিত আপনার ধারা মিশাইয়া প্রেরণা দিলেন তাহাকে একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে, সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতে। স্মরণ্য তাঁহার লেখায় আমরা যদি সমুদ্রের বিশালতা, গভীরতা এবং অপার সৌন্দর্য্য অহুসঙ্কান করি, তাহা হইলে আমাদিগের নিরাশ না হইয়া উপায় কি? বঙ্গ-সাহিত্যের গগনে সেদিন চাঁদ উঠিয়া ছিল বটে, কিন্তু সে পূর্ণিমার চাঁদ নয়, যে সমস্ত জগৎপাশি উজ্জল করিয়া বান ডাকাইয়া দিবে।

তাঁহার প্রথম উপন্যাস—‘দীপনির্বাণ’, ইহা ঐতিহাসিক।

পৃথিবীজকে পরাজিত করিয়া মহম্মদ ঘোরির ভারত জয়ন্ত ইতিহাস অবলম্বনে ইহা লিখিত। মন্ত্রীপুত্র বিজয় পৃথিবীজের কন্যা উবার প্রণয়াকাম্বী ছিল, কিন্তু উবার ভালবাসেন রত্নসিংহের পুত্র কল্যাণকে। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া উবার সখী গোলাপের সাহায্যে বিজয় কল্যাণের মনে একটা অশ্রুপাশ জাগাইয়া দেয়। রাজকুমার ইহাতে নাকপ আঘাত পায়, ফলে তাহার মৃত্যু হয়। এদিকে গোলাপ ভুল বৃত্তিতে পারিয়া কল্যাণকে সমস্ত খুলিয়া বলে, কল্যাণ রাজকুমারীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বৃদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার সহিত কিরণ সিংহ এবং শৈলর উপাখ্যানটি সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বইখানিতে আরো দেখি, বিজয় সিংহই বিশ্বাসবাক্যতা করিয়া মহম্মদ ঘোরীকে ভারত বিজয়ে সাহায্য করিয়াছে। পুস্তকের পটভূমি বিরাট, স্মরণ্য প্রত্যেকটি চরিত্রের উপর দৃষ্টি দিতে গিয়া চরিত্রগুলি সবক্ষেত্রে উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই, তবে বিজয় এবং গোলাপ স্তম্ভর হইয়াছে। গোলাপের ভালবাসার স্বযোগ গ্রহণ বিজয় স্তম্ভর ভাবেই করিয়াছে। শৈলের রসিকতা বইখানির সম্পদ, পুস্তকের শেষাংশ ঘাত প্রতিঘাত-হীন হওয়ায় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

‘ছিন্নমূল’ সামাজিক উপন্যাস—প্রমোদ ও তাহার বন্ধু যামিনীনাথ শিকারে বাইরা। সন্ধ্যার অন্ধকারে বনমাঝে পথ হারাইয়া ফেলিলে নিকটবর্তী মন্দিরের পুরোহিতের কন্যা নীরজা তাহাদিগকে আশ্রয় দেয়। উভয়েই তাহার প্রেমে পড়েন এবং যামিনীনাথ সন্ন্যাসীর অহুপস্থিতিতে চক্রান্ত করিয়া নীরজাকে হরণ ও তাহারই উদ্ধার সাধন করেন। ফলে সন্ন্যাসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। এদিকে প্রমোদের ভগ্নী কনককে দেওয়া যামিনীনাথের বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়। তখন সে নীরজাকে বিবাহ না করিয়া প্রমোদের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়ায়। ইতিমধ্যে একদিন কনক ডুবিয়া যাওয়ায় তাহাদের পুত্র পরিচিত হিৰণকুমার তাহার উদ্ধার সাধন করেন এবং উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়েন। যামিনীনাথ হিরণের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়ার ফলে প্রমোদ হিরণের সহিত কনককে বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হয়। ফলে দুঃখে কনকের মৃত্যু হয় এবং হিরণ কুমারও সম্যাস গ্রহণ করিয়া কিছুদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুস্তকের শেষে মন্দিরের পুরোহিতের সহিত (স্বশীলার ছদ্মবেশী স্বামী) স্বশীলার মৃত্যুকালে মিলন উপন্যাসটীকীয় হইয়া পড়িয়াছে। হিরণ কুমারের চরিত্রচিত্রণ উচ্চাঙ্গের হয় নাই। ভাবাবেগ প্রধান হইয়া পড়ায় বই খানির মূল্য অনেকাংশ কমিয়া গিয়াছে। নীরজাকে পাওয়ার জন্য যামিনীনাথের প্রমোদকে হত্যার চেষ্টার মধ্যে যুক্তিগত কারণ নাই। সম্যাসী এবং নীরজা কেহই ফোটে নাই। একমাত্র যামিনীনাথ সমধিক পরিস্ফুট। তবে লেখিকার বর্ণনাশক্তি এবং প্রকাশভঙ্গী অধিকতর উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে।

‘মালতী’ টিক উপন্যাস পর্যায়ে পড়ে না। তাহা হইলেও ইহা উপন্যাস জাতীয়। তিনটি চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে বইখানি স্থিতি। ইহার মধ্যে মালতীর চরিত্র চিত্রণ উচ্চাঙ্গের বলা যাইতে পারে। কিন্তু শোভনা কেন রমেশকে সন্দেহ করিল তাহার কারণ লেখিকা আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে সাহায্য করেন নাই।

‘হুগলীর ইমাম বাড়ী’ : মহসীনের (মদীন!) অপূর্ণ ত্যাগজীবনের কাহিনী। ইহার মধ্যে যে চরিত্রটি আমাদের হৃদয়ে সর্বাঙ্গপেক্ষা দাগ রাখিয়া যায় তাহা ভোলানাথ; মন্নার চরিত্রটি সুচিহ্নিত হইয়াছে। সম্যাসীর প্রভাব মদীনকে স্বাধীনভাবে গড়িতে বাধা দিয়াছে। বুড়ীর চরিত্রটি সুন্দর। বইখানির গাভীরাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে যে স্বল্প রসিকতা আছে তাহা উচ্চধারণের। লেখিকার প্রকাশভঙ্গী মনোরম।

‘মিবার রাজ’ : স্বর্ণকুমারী দেবীর সর্বাঙ্গপেক্ষা যে পুরুষ চিত্রটি উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে তাহা মিবার রাজের মন্দালিক। পুত্রস্নেহ এবং স্বার্থ বিসর্জন দিয়া তিনি চিত্তোত্তরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গুহা এবং ‘তালগাছ’ চরিত্র দুইটিই সুন্দর। বইখানিতে কোন নারী-চরিত্র নাই। অথচ বর্ণনাভঙ্গীর কৌশলে পাঠকের গতি কোথাও ব্যাহত হয় না।

‘বিদ্রোহ’ : মেবার রাজ নাগাদিতা ভীল যুবক জুমিয়ার পালিত কন্যার সঙ্গে যুগ্ম হইয়া বিবাহ করিতে চাহিলে তাহার পরিষদবর্গ অত্যন্ত দুঃখিত হন। রাজপুরোহিত তাহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন। রাজা, পারিষদবর্গ, পুরোহিত, এমন কি রাণীর প্রার্থনায় বর্ণপাত না করিয়া ‘সুহার’কে বিবাহ করিতে উদ্বৃত্ত হইলে প্রকাশ পায় যে, সুহার ব্রাহ্মণ কন্যা। এদিকে রাজা তাহাদের সম্মানে আঘাত দিয়াছে মনে করিয়া ভীলরা বিদ্রোহী হয়। বিদ্রোহে ক্ষত্রিয়গণ পরাজিত হয়, রাজা, রাণী নিহত হন। তাহাদের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করিতে যাইয়া জুমিয়া প্রাণত্যাগ করে। সুহার রাজবংশের সেই একমাত্র কুলপ্রদীপকে নির্জন বনপ্রান্তরে লালন-পালন করিতে থাকে।

জুমিয়া চরিত্রটি বইখানির শ্রেষ্ঠ বস্তু, একদিকে বন্ধুত্ব, অন্তরিকে বন্ধুকে হত্যা করিবার জন্য পিতার আদেশ— এই দুই সন্দেহ দোলায় ছলিয়া তাহার চরিত্রটি অধিকতর রমণীয় হইয়াছে। ‘সুহার’ বইখানির মধ্যে সর্বাঙ্গপেক্ষা কম কথা কহিয়াছে অথচ তাহার নীরবতা এবং মৌনতার মধ্যে দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে সে সর্বাঙ্গপেক্ষা বেশী। ইহাকে ভালবাসি তাঁহার প্রিয়জিনিষ, তাঁহার স্মৃতি বহিয়া বেড়ানর মধ্যে নারী-জীবনের যে কতখানি সার্থকতা আছে তাহা লেখিকা সুহার চরিত্রে ফুটাইয়াছেন।

‘স্নেহলতা’ স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় সামাজিক উপন্যাস। ইহার ভূমিকায় লেখিকা বলিয়াছেন (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) অধুনা বঙ্গসমাজে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ ভাব, যেরূপ কার্য-কলাপ শতশ্রোতে প্রবাহিত তাহারই পূর্বতন চিত্র, স্ত্রীপ্রাপ্ত উক্ত সময়ে এই উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে। স্নেহলতা জগৎবাবুর পালিতা কন্যা : আশ্রয়হীন হইয়া

আদিয়া জগৎবাবুর সংসারে পালিতা হয়। সংসারকে ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্বেই তাহার বিবাহ হইল, কিন্তু অল্পদিন পরেই স্বামীর জীবন নিবিয়া গেল। স্নেহলতা শিশুরস্বে এবং পালিত পিতার গৃহে নির্ধাতা হইয়া অবশেষে মৃত্যুর মধ্যে নিজের আশ্রয় খুঁজিয়া লইল। এই যে মুকুল অকালেই ঝরিয়া গেল তাহার অল্প দম্পী তাহার ভাগ্য না সমাজ, এই প্রশ্নই লেখিকা আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

উপন্যাসখানি বিরাট, কিন্তু ইহার মধ্যে সর্বাঙ্গিক উল্লেখযোগ্য চরিত্র জগৎবাবু। সংসার হইতে নিজেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া স্নেহলতার প্রতি সমস্ত স্নেহটুকু ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহাকে নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার এদিকে স্ত্রী, পুত্র, সংসার, অতীতকে স্নেহলতা—এ দুইয়ের বন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে মনোরমভাবে। টগর এবং কিশোর যথাযথ হইয়াছে।

প্রয়োজনানুযায়ী পুস্তকে ‘জীবনের’ স্থান খুব বেশী বলিয়া মনে হয়।

‘ফুলের মালা’ লেখিকার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার মধ্যে তাহার গল্প বলিবার কৌশল এবং নারী চিত্র চিত্রণ শ্রেষ্ঠতম হইয়াছে। রাজা গণেশদেব মাতৃ আজ্ঞায় শক্তিকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলে, শক্তি এই প্রত্যাখানের সমুচিত প্রতিফলবাসনায় বিবাহ করিল সম্রাট গিয়াসুদ্দীনকে। কিন্তু যখন রাজা গণেশ বন্দী হইলেন, তখন তাহাকে মুক্ত করিতে গিয়া শক্তি নিজের জীবন দান করিল, ইহাই তাহার চরম প্রতিশোধ। বস্তুতঃ শক্তির মত এমন একটি তেজস্বিনী নারীচরিত্র আর তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বইখানি বঙ্গসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজমান থাকিবে।

‘কাহাকে’: প্রথম প্রেমের পরশ নারীহৃদয়ে যখন শিহরণ জাগাইয়া তোলে, তখন সে তুলিয়া যায় নিজেকে, তখন তাহার মনের আঙ্গিনায় যাহারা ছায়া কেলিতে থাকে, তাহাদের মধ্যে কাহাকে জীবনপথের সঙ্গী করিয়া লইবে, ইহাই তাহার প্রধান সমস্যা, এই সমস্যার দোলায়

দোলায়মান হৃদয়কে লেখিকা স্নন্দরভাবে রূপ দিয়াছেন। বইখানি একখানি গীতিকাব্যের মত, বাধাহীন সাবলীল।

স্বপ্নবাণী’ বিচিত্রা এবং মিলন রাত্রি : তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ লেখিকার পশ্চিমত বয়সের এক সুদীর্ঘ উপন্যাস। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক সমস্যা তরুণ যুবকদের প্রাণে যে আশা আকাঙ্ক্ষার ঢেউ জাগাইয়া তোলে, তাহারই প্রতিচ্ছবি অতি সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে এই উপন্যাসে। হিংসাপূর্ণ সংগ্রাম যে জাতির পক্ষে মঙ্গলকর নয়, তাহাই এই উপন্যাসের নায়িকা তাহার মৃত্যুতে প্রমাণ করিয়া গেলেন। এই সুদীর্ঘ উপন্যাসের চরিত্রগুলি অপ্রয়োজনীয় হইয়া রসের সৃষ্টি করে নাই। জ্যোতিষ্ময়ীর চরিত্রে যে “Idea বা ভাব” ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন তাহা সার্থক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে অতুলানন্দ, কৃষ্ণলাল, হাদি এবং শরৎকুমার স্নন্দর হইয়াছে। নিছক শরৎকুমারের মধ্যে যে গাভীর্ষ্য, সংযম এবং মাধুর্য আছে, তাহা লেখিকার অল্প কোন নায়কের চরিত্রে কচিং দেখা যায়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসগুলির সংক্ষেপে আলোচনার পর এবার আমরা তাহার উপন্যাসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

স্বর্ণকুমারীর প্রথম যুগের উপন্যাসগুলির অধিকাংশই ঐতিহাসিক। কিন্তু ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া রচনা করিলেও, তাহার চারিদিকে চরিত্রের যে উর্ণানাতত্বগুলি ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহাতে ইতিহাসের চিহ্ন নাই, তাহা চিরন্তন মানবজীবনের। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাহার উপন্যাস পদ্ধতির ঐক্য এবং রমেশ দত্তের সহিত অনৈক্য। রমেশ দত্ত ইতিহাসকে কোথাও অস্বীকার করিয়া স্বাধীন মতবাদ প্রচার করেন নাই।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করার কতকগুলি কারণ ছিল। উপন্যাস সাহিত্যের নবপ্রভাত যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অরণ্যলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে ইহাই প্রতিদেশের সাহিত্য প্রমাণ করে; দ্বিতীয় কারণ তাহার স্বদেশ প্রেম; জাতিকে জাগাইয়া তুলিতে হইলে তাহার পূর্বপুরুষের বীরত্বকাহিনীর সাহায্য ছাড়া উপায় কী?

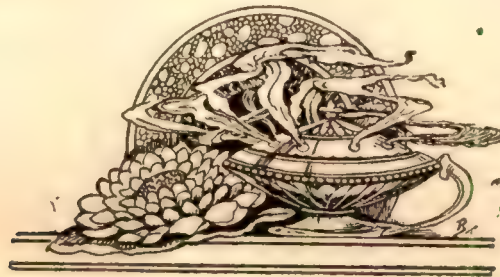
কিন্তু সর্বোপরি বড় কথা যে স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন গীত-ধর্মী, অত্যন্ত কল্পনাগ্রবণ এবং সৌন্দর্য্য প্রিয়। সে যুগের বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র অপরিসর গভীর মধ্যে কল্পনা প্রতিপদে খাঁচায় বদ্ধ পাখীর মত দ্বারের কাছে থাকার খাইয়া খাইয়া আসিত বলিয়াই ঐতিহাসিক উপন্যাস দিয়াই তিনি সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য তাঁর এইখানে যে তিনি কল্পনার এবং সৌন্দর্য্যের উচ্চগগনে বিহার করেন সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনার পক্ষপাতের নিদর্শন মেলে না।

স্বর্ণকুমারী দেবীর চরিত্র চিত্রন অনেকাংশে একরূপ তাহার কারণ সে যুগের ভাবধারা। পুণ্যের সর্বত্র জয় এবং পাপের সর্বত্র শাস্তি এই মতবাদ তাঁহার চরিত্রগুলিকে সর্বত্র স্বাধীনভাবে গড়িতে দেয় নাই। তাহার দীপনির্বাণের বিজয় ও ছিন্ন মুকুলের যামিনীর মিলন রাত্রির বিজয় অনেকাংশে একরূপ; আবার অন্তরিকে দীপনির্বাণের কল্যাণকুমার, ছিন্নমুকুলের হিরণ কুমার প্রভৃতি একই বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'মিবাররাজের' মন্দালিকের একদিকে পুত্র ও অপর দিকে গুহা আসিয়া তাহার মনে যে ঘাত প্রতিঘাতের ঢেউ তুলিয়াছে বা জুমিয়ার একদিকে পিতৃ আদেশ, স্বদেশ প্রেম এবং অন্য দিকে বন্ধুত্বের দ্বন্দ্ব যেমনভাবে প্রস্ফুট হইয়াছে তাহা সাহিত্যে সচরাচর মেলে না।

নারীচরিত্র অকনে স্বর্ণকুমারী দেবী যথেষ্ট প্রতিভা দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রথম যুগের উপন্যাসে হয়ত নারী-চরিত্র সাধারণের পর্য্যায় ছাড়িয়া অধিকদূর উঠিতে পারে নাই, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ইহার যথেষ্ট ব্যত্যয় ঘটিয়াছে।

তাঁহার দীপ নির্বাণের উষা, ছিন্নমুকুলের কনক এক বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহী স্বহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিন্তু ফুলের মানার শক্তি তাঁহার সমস্ত নারীচরিত্রগুলিকে ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে। তাহার বাল্যজীবনের দুর্দান্ত পৌরুষ এবং নারীজলভ লজ্জা সঙ্কোচের অভাব আমাদের প্রথম আকর্ষণ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত লেখিকা সেই আকর্ষণের বিচ্যুতি ঘটতে দেন নাই, গণেশের প্রতি অসীম ভালবাসা অথচ প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ গ্রহণে তার দ্বন্দ্ব, অন্তরিকে বাহাকে ভালবাসি না, সম্ভানের মধ্য দিয়া তাহারই স্মৃতি বহিয়া বেড়ানোর মধ্যে নারী-জীবনের মর্ম্মস্পর্শী ব্যর্থতা যে কতখানি, এ যে কত বড় অভিশাপ তাহাই লেখিকা নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আমার মনে হয় এই একটি মাত্র চরিত্র সৃষ্টি করিয়া লেখিকা সাহিত্য-জগতে অমর হইয়া থাকিবেন। তাঁহার নারী চরিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে নিস্তারিনী দেবী বলিয়াছেন "তাঁহার রচিত নারীগুলি ঐ মহিমাময়ী দীপ্তিতে উজ্জল, তাহারা রমণী বলিয়া যে ধূলি-অবনত তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে আত্মসম্মানের তেজ, নারীত্বের গর্ব এবং অন্তরে একটি শক্তি আছে। তাহারা অন্ধবিশ্বাসের পথে চোখ বাঁধিয়া চলে না এবং বিপদের মুখে কেবলই হাহাকার করিয়া মরে না। তাঁহার অন্তরে নারী জাতীর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান আছে, তাহারই প্রেরণায় তিনি আমাদের দেশের নারী জাতিকে একটি প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। ইহা শক্তিমানের কাজ, স্বর্ণ কুমারী সেই মহাশক্তির অধিকারিণী।"

ক্রমশঃ



লক্ষীর বাঁপি

“সর্বং অতি অন্তে গহিতম্” কথাটা যে কত বড় খাঁটি, নীতিকার সেটা বিশদরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ সে ব্যাখ্যা পাঠ করে, হয়ত বোঝেও। কিন্তু বুঝেও যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, অসুয়াবশে বুদ্ধিব্রষ্ট হ’য়ে দর্পে দন্ডে সেই পাপই করে। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে ছাড়েনা কিন্তু একেবারেই। আর্থানীর উপর প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে সেই সনাতনী নিয়মে। হিংসাবশে ইহুদী-বিতাড়ন-বল্ল করেছিল ধরাকে সরাজ্ঞান করা এই আর্থানী। বিতাড়িত ইহুদীগণের মধ্যে টেকনিক্যাল ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন অসংখ্য। সেই সকল ব্যক্তির অল্পপস্থিতে টেকনিক্যাল-ক্ষেত্রে হাহাকার উঠেছে। দুর্দ্বর্ষ হিটলারও সে কারণে চক্ষে অন্ধকার দেখেছেন। এখন আর্থানীর কথা—“ওগা ইহুদী ভায়েরা, তোমরা ফিরে এস, ফিরে এস। তোমাদের বিষয়ে আমরা বিশেষ রূপেই বিবেচনা করুব।” আত্মমর্যাদা রক্ষা কল্পে ইহুদীরা না ফিরতেও পারে। নানা কারণে ফেরাও হয়ত অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতির কি ভীষণ প্রতিশোধ! এ কাহিনী শ্রবণ ক’রে দর্পীদম্ভী অকারণে নির্ঘাতনকারীদের চোখ খুলবে কি? এই প্রসঙ্গে আমাদেরই মধ্যে আর্থান-পছন্দসারী বহু লোকের উদ্দেশে বলতে পারি—ওহে বাহাদুরের দল, ষাঁদের দস্যায় মাথায় পাগু বাঁধবার অধিকার পেয়েছ, তাঁদের, কিংবা তাঁদের সন্তান সন্ততিগণের অকারণে অনিষ্ট করবার চেষ্টা কোরোনা। তোমাদের বিজ্ঞার বহর, মোসাহেবীর বহর, প্রত্যক্ষো গ্রন্থাবাদী, পরোক্ষে কার্য্য হস্তারক হওয়ার প্রবৃত্তি সবই আছে জানা হে। বেশী চালাকিটা কর, প্রকৃতি ঢাক বাজা’বে নির্দম হ’য়ে। হুতরাং সাবধান!

সরোজ নলিনী প্রতিষ্ঠান ও “বঙ্গলক্ষীর” শুভানুধ্যায়ী এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ কর্ম্মী স্বর্গত গোকুল চাঁদ বড়াল স্মৃতি-ঘোষণায় এখনো জীবিত। জন-রবের সহস্র জিহ্বায় শুনা গিচ্ছ তিনি ফিরে এসেছেন। জন্মান্তরবাদে ষাঁদের বিশ্বাস আছে, তাঁদের কাছে এটা

অবিশ্বাস্য নয়। জুলিয়ান চেম্বারে এ বিষয়ের অন্তিমসন্ধান করলে ফল কিরূপ দাঁড়ায়, বলা যায় না। তবে বিগত ১লা জুন “গোকুল-ক্ষেত্রে” শ্রীমান্ নির্মল চাঁদ বড়াল তাঁর এক বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ অরুণ চাঁদ বড়ালের শুভ জন্ম-তিথিতে প্রসাদ কবির সহায়তায় যে বাণী দিয়েছেন, তা’তে মনে করতে পারা যায় জনরব মিথ্যা নয়। কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে—

চলেনা চরণ বা’র বুদ্ধাবন ত্যাগ করি’,
সেই শিশু ব্রহ্মরাজ অজয়ের রূপ ধরি!
নিত্য চলে যাওয়া-আসা অসীম-সদীম-পথে
মায়া বশে কায়া-ছায়া প্রদীপ্ত জীবন-রথে!
লীলায় গোকুল চন্দ্র ফিরিল “গোকুল-ক্ষেত্রে”,
জয়গানে প্রপূরিত আনন্দাশ্রু বহে নেত্রে!
সাধনে নির্মল করো “মেটেঘরে বুদ্ধাবন”,
সাধক পাইবে সেখা’ চির-সাধনার ধন!
বেণুরব শুনি যেন, খেয় চরে কল্পনায়,
ব্যাকুলা জননী দেখে মনে পড়ে যশোদায়।
জন্মদিনে হে বাঞ্ছিত এ প্রার্থনা বারবার,
তব পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক শাস্তি শৃঙ্খলার!
রাজীবলোচন শিশু নন্দিত বন্দিত হও,
সদীয়ে মহিম হ’য়ে অসীমের টীকা লও।

কবিতাটি অপরূপ—গভীর অর্থযুক্ত। প্রাচ্যে ত বটেই—প্রতীচ্যেও মিষ্টার ডব্লিউ টি-ষ্টেড্, স্যার অলি-ভার্ন লজ্ প্রভৃতি মনীষির আলোচনাতেও এমন ভাব-ধারা কল্পের মতই প্রবহমান। এলা-হুইলার উইল্ফক্সের বাণী—

“But I could not stay and I would
not stay”

The other ghost replied
“I must hurry back to the old
earth track
And stand at my loved one’s side.
এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা চলে “গোকুল-ক্ষেত্রে”

গোকুল চাঁদ মায়াবশেই ফিরেছেন। স্বজনগণের মধ্যে পুরাতন ও নতনের উদ্দেশে আমরা আমাদের শুভচ্ছা জ্ঞাপন করি।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত গুরু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিপত্নীক হ'য়েছেন শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হ'লাম। লক্ষ্মী স্বরূপিনী স্বর্গতা সাধ্বী ছিলেন সেবারতা ও কর্তব্য পরায়ণা। তাঁর তিরোধানে অনেকেই মাতৃহারা হয়েছেন ব'লে মনে করেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেনারস-ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বহুকাল যাবৎ অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ছাত্র বাৎসল্য তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শুনা যায়, এ বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ তাঁর পত্নীর অসাধারণ উদারতা। পুত্র কন্যা তিনি রেখে গেছেন অনেক গুলি। শোকসন্তপ্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তাঁর স্বজনগণের প্রতি আমরা আমাদের সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করি।

পুরাকালে ডাকাতের দল পূর্বভাগে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করত। সেটা দস্যবলের ধর্ম্মভাব কি বাহাদুরী ডাকাতদলই বলতে পারে। ইংরাজের কড়া শাসনে চুরি ডাকাতি বন্ধ না হোক, কমেছিল খুবই। বর্ত্তমান যুগে সেটার আবার নব পর্য্যায় দেখা যাচ্ছে। পল্লী-গ্রামের কথা দূরে থাকুক, থান কলিকাতা সহরেই ডাকাতির সংখ্যা অল্প নয়। সম্প্রতি একজন ধনবানের গৃহে ডাকাতি হ'বে ব'লে ডাকাত দল পত্র দিয়েছিল। নিদ্রিষ্ট তারিখে গৃহস্থ সজাগ ছিল ডাকাত দলকে অভ্যর্থনা বহুবার জ্ঞাত। পুর-মহিলাগণও সে চিঠি পেয়ে ভয় পান নাই। এমন সংসাহসের আমরা ভূয়সী প্রশংসা করি। সে যা' হোক, ডাকাত-প্রভুদের দর্শন পাওয়া যায় নাই—সম্ভবতঃ ছুটি ডবল ব্যারেল বন্দুকের মহিমায়। বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলার এমন সংসাহস খুবই প্রশংসনীয়। সর্ব্বত্র এমন সাহসের পরিচয় পেলে দস্যবল ডাকাতি করিতে বিশেষ ভাবে ইতস্ততঃ করবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা চলে। এখনকার দিনে এই সব ডাকাতী, অভাবে না স্বভাবে? স্বভাব এর মূলে থাকলে, সে মূল উৎপাটিত করা কঠিন। কিন্তু অভাব—বেকার-সংখ্যা মূল হ'লে ডাকাতি বন্ধ করা শক্ত নয়। সরকার কর্তৃপক্ষ ও দেশের ধনী ব্যক্তিগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় বেকার-সমস্যা অনায়াসেই দূর হ'তে পারে। মানুষকে যদি কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায়, তা' হ'লে নীতি-বিরুদ্ধ, সমাজ-বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কাজ করবার তাদের প্রবৃত্তিও হয় না, অবসরও ঘটে না। টাকার গদীতে উপবিষ্ট হ'য়ে জন কয়েক ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বধর্ম্ম সম্পদ উপভোগ করবে, আর অগণ্য লোক পুত্র কন্যাদি নিয়ে অন্ন বস্তাদির অভাবে জীবন ত হয়ে ব'সে থাকবে, দৈন্তের সঙ্গে অহোরহ যুদ্ধ করবে, এমনটা হওয়া উচিত নয়। এটা অল্পচিত্ত ভেবেই পূর্ব্বকালের ধনী ব্যক্তির বোধ হয় নানাভাবে দরিদ্রের সাহায্য করতেন, পূজা-পার্ব্বণ ও উৎসবাদিতে তা'দের সাদর আহ্বান ক'রে ভূরী ভোজন করিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের অজুহাতে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জন করতেন। তা'র ফল হ'ত শুভই। মোট কথা—টাকা শুধুই বাস্তবলক্ষী করার জিনিস নয়। দেশের মুখ চেয়ে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তার করার চেষ্টা করলে ধনিকের ধন-সম্পদ-বৃদ্ধি হয়, আর বেকার-সমস্যাও অনেক পরিমাণে সমাধান হয়। চাকরীর বাজার দারুণ মন্দা। এ দু'দিনে ধনী নির্ধন অভিমান ভুলে সখ্যতার হেম-শুভ্রলে আবদ্ধ হ'য়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য কৃষি-শিল্প প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করলে দেশের অভাব দূর করবার উপায় হয়না কি? অভাবই ত যত নষ্টের গোড়া!

ত্রিপুরায় একটা বিবাহ নাকি হ'য়ে গেছে। শ্রীমতী ননীবালা নামী একটা মহিলার বিধবা-বিবাহ হ'বার পর তাঁর স্বামী নাকি ফিরে এসেছেন। বিধবা-বিবাহটা যদি শাস্ত্রানুসারে হ'য়ে থাকে, সেটা অসিদ্ধ হ'বে কিরূপে? প্রথম পক্ষের বিবাহ সন্ধেও ঐ কথা। পণ্ডিত-সমাজ কি বলেন, কি বিধান দেন, দেখা যাক।

আমরা বরাবরই বলে আসছি—বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বাদ্‌বার আপাততঃ সম্ভাবনা নাই। আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা হয় নাই। যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মহামানব রুজ্‌ভেল্টের চোখ-রাদ্‌নীতে ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিশেষভাবেই বদলে গেছে বলেই মনে হচ্ছে, শুভ সংবাদ! অকাল বৈধব্যের দায় থেকে বহু নারীই রক্ষা পাবে। বহু পিতা, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এবং শান্তিকামী বহু ব্যক্তিই কৃতজ্ঞতাস্বত্রে!



শ্রীমান অজয়চাঁদ বড়াল

কর্মবীর, নীতিবীর নিভীক রুজ্‌ভেল্টের প্রতি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন, এটা খুব সহজ সত্য। রুজ্‌ভেল্ট জয়যুক্ত হয়েছেন—আগামী কালেও সে জয়ের ঘোষণা থাকবে।

—o—

সেকেণ্ড ক্যালকাটা বয় স্কাউট এসোসিয়েশনের মার্চ, এপ্রেল মাসের “নোট্‌স্‌ এ্যাণ্ড নিউস্‌” আমরা পেয়েছি।

লর্ড ব্রোবোর্গের পরলোক গমনে এই এসোসিয়েশন থেকে প্রকাশিত মিষ্টার পি, বি, মুখার্জি রচিত নিবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। “নোট্‌স্‌ এ্যাণ্ড নিউস্‌” স্কাউট লব্ধ সংবাদ পাওয়া যায় অনেক। এ এসোসিয়েশনের সভাপতি আমাদের পরম স্নেহে স্যার মন্থনাথ মুখোপাধ্যায়; অনারারি ট্রেজারার—মিষ্টার জে, এন, বসু; সেক্রেটারি—মিষ্টার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পেট্রিন, ডাইন-প্রেসিডেন্ট একজিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের তালিকা যাহাদের নাম দেখা গেল, তাঁরা প্রায় সকলেই দিক্‌পাল। আমরা এ প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। ব্রতচারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকুশলতাও এই সন্দেহ উল্লেখযোগ্য। এ প্রতিষ্ঠানটিও দেশে নূতন জীবনী-শক্তি এনে দিয়েছে। ব্রতচারী সজ্জের এই সন্দেহ আমরা জয় ঘোষণা করি।

—o—

জনগণমনোরঞ্জন রাজরাজেশ্বর বর্ষ জর্জ আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকাবাসীর হৃদয়আগন অধিকার করেছিলেন শুনে আমরা পরমানন্দ লাভ করেছি। যুক্তরাজ্যের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের মর্ম্মর মূর্তির কণ্ঠদেশে রাজরাজেশ্বর মালা অর্পণ করেছিলেন। আমেরিকার অধিবাসীগণের তাতে আনন্দের আর সীমা নাই। এ আনন্দের কারণ, ইতিহাসাভিজ্য ব্যক্তি মাত্রেই বুর্জুয়ে পাবেন। তৃতীয় জর্জ করেছিলেন যে দেশটাকে শত্রু, রাজরাজেশ্বর বর্ষ জর্জ আপন মহিমায় সেই দেশ ও সেই জাতিকে গ্রহণ করলেন পরম মিত্র বলে। বহু তথাকথিত গুরু ও উদারতা শিক্ষণীয়। ব্যবহারের ফলেই মাহুয হয় মাহুযের শত্রু ও মিত্র। কথাটা মিথ্যা কি?

—o—



মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

কুমারী বাণী ঘোষ

একটি দশ বৎসরের বালিকা এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাটিকুলেশন পাশ করিয়াছে। ক্যাপ্টেন জে, এম, ঘোষ এম বি, ডি, পি, এইচ্ (লণ্ডন) ডি, টি, এম, এণ্ড এইচ, (ক্যান্টাব) মহাশয়ের এই কন্যাটি ১৯২৮ সালের ৪ঠা আগষ্ট জন্মগ্রহণ



শ্রীমতী বাণী ঘোষ

করে। তিন বৎসর বয়সে অক্ষর পরিচয় আরম্ভ করিয়া দে পাঁচ বৎসর বয়সে রামায়ণ মহাভারতের গল্প পড়িতে পারিত। অতি অল্প বয়সেই তাহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সঙ্গীতের প্রতিও এই মেয়েটির যথেষ্ট অনুরাগ আছে এবং সে ভাল এসরাজ বাজাইতে পারে।

শ্রীমতী বাণীর মত অল্প বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পৃথিবীর অস্বাভাবিক দেখা যায় নাই। আমরা এই প্রতিভাময়ী বালিকার দীর্ঘজীবন ও সর্বদান্বিত উন্নতি কামনা করি।

বঙ্গ মহিলার হোমিওপ্যাথিতে ডিগ্রী লাভ

শ্রীমতী অনিমা চৌধুরী আমেরিকার হ্যানিম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত চিকাগো মেডিক্যাল কলেজ অব হোমিওপ্যাথি হইতে এম, ডি, এচ এস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। রংপুর জিলার কুড়িগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল চৌধুরী ইহার স্বামী। এই গরিব দেশে তাঁহার স্বেচ্ছিকৃত হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রতি মেয়েদের আস্থা বৃদ্ধি পাইলে দেশের মঙ্গল। বাংলার মেয়েরা গাছ গাছড়া ও মুষ্টি যোগ সাহায্যে শিশু ও প্রসূতিদের চিকিৎসা করিতে দক্ষ ছিলেন। তখন ব্যাধিও কম ছিল এবং চিকিৎসার এত ব্যয় বাহুল্য হয় নাই। মেয়েরা স্বাস্থ্যবতী ও সুখী ছিল। কাশীতে বঙ্গমহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট—ইউ পি, সরকার বেনারাস সহরে পাঁচজন মহিলাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল আসামীদের বিচার করিবেন। পাঁচজনের মধ্যে শ্রীমতী আশারানী মুখার্জি একমাত্র বাঙালী মেয়ে, শ্রীমতী মহারাজকুমারী শ্রীমন্তব, শ্রীমতী বিদ্যাদেবী উপাধ্যায়, শ্রীমতী কমল কুমারী ও ডাঃ শ্রীমতী জানকী অপর চারজন মহিলা। বাঙলা সরকার মহিলা মেজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার প্রথায় উদ্যোগী। শিশু বিচারালয়ে কয়েকজন মহিলা বিচারক আছেন মাত্র।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতি বাঙালী ছাত্রী—

শ্রীমতী চামেলী ঘোষ (দত্ত) বি, এস-সি, (কলিকাতা) লণ্ডন উনিভার্সিটি হইতে ষ্টাটিষ্টিক্স্ (হিসাব শাস্ত্রে) সন্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বি, এস-সি, ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। খাটি হিন্দু ঘরের বধূর এই সন্মান পরম গৌরব। কলিকাতায় বি এস সি পাশ করিবার পর তাঁহার পরিণয় হয়, বিবাহের পর নব পরিণীত স্বামীর সহিত বিলাতে গমন করেন। দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া এই দুক্লহ পরীক্ষা পাশ করেন। ইতি পূর্বে ষ্টাটিষ্টিক্স্ কোন বাঙালী মহিলা বিলাতে ডিগ্রী পান নাই।

মাইকেলপত্রীর সমাধি স্তম্ভ—মাইকেল মধুসূদন দত্তর স্বাক্ষরী পত্নী সোফিয়া হেনরিয়েটা দত্ত কবির মৃত্যুর সত্তর ঘণ্টা পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেন। কবির সমাধির পার্শ্বে তাঁহার সমাধি। এই সমাধিটি সুরক্ষিত ছিল না। গত বৎসর বাৎসরিক স্মৃতি উৎসব দিনে এই সমাধিটি সংস্কার ও বেঠেনী দ্বারা সুরক্ষিত করিবার প্রস্তাব লেখক করেন। সেই আবেদনের ফলে ৪৮ টাকা মাত্র সংগৃহীত হয়। যখন সাহিত্য পরিষদ এই বেঠেনী প্রকানের ব্যবস্থা করিতেছিলেন তখন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয় মহাহুভব শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের নিকট মাইকেল পত্রীর সমাধিতে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণের বিষয় উত্থাপন করেন। মাইকেল-ভক্তের মন বিগলিত হয়। তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজব্যয়ে একটি মর্ম্মর স্মৃতি স্তম্ভ করিয়া দিতে সম্মত হন।

তাঁহারই আত্মকুল্যে পাওয়েল কোঃ অতি স্বল্প লাভে একটি সুদৃশ্য স্মৃতি-মন্দির মার্কেল পাথরে নির্মাণ করিয়া সমস্ত সমাধি ক্ষেত্রটি মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত ও বেঠেনী দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া দিয়াছেন। স্তম্ভ গাত্রে লিখিত আছে—

বাঙ্গালার অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নী

হেনরিয়েটা দত্তের স্মৃতি স্তম্ভ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক

শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ চন্দ্রের আত্মকুল্যে

স্থাপিত হইল।

২০শে জুন ১৯৩৯ মৃত্যু—২৭শে জুন ১৮৭৮

১৪ই আষাঢ় ১৩৪৬

এই লিপিমালা উৎকীর্ণ হইয়াছে। স্মৃতি স্তম্ভের আবরণটি শ্রম যত্ননাথ সরকার উন্মোচন করিয়াছিলেন। বিদেশিনীর স্মৃতি রক্ষা করিয়া সাহিত্য-পরিষদ ও দাতা বাঙ্গালার সুধীমণ্ডলীকে সুখী করিয়াছেন।

বি.এ পরীক্ষায় ছাত্রীর কৃতিত্ব—

শ্রীমতী প্রতিমা ব্যানার্জি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর অনারে প্রথম হইয়া বি-এ পাশ করিয়াছেন। তিনি আশুতোষ কলেজের ছাত্রী শ্রম যত্ননাথ সরকারের মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দোহিত্রী এবং অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ., রাব-এট-ল, এম.এল. এর কন্যা।

মহিলাদের নূতন কলেজ—

বেলতলা গার্লস্‌ স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আই এ পরীক্ষা দিবার জন্য অনুমোদন পাইয়াছেন। বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে ১৮ বৎসরের মধ্যে সহস্রাবিক বালিকা অধ্যয়ন করে। ইহার সংশ্লিষ্ট কলেজটির শীঘ্রই শ্রীবৃদ্ধি হইবে আশা করা যায়। শ্রীমতী শকুন্তলা রাও এম, এ (ডবল) শাস্ত্রী মহোদয়া লেডী প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

লেডী প্রেবর্ণ কলেজ—বাঙ্গালার সরকার পদ্ধিনী মহিলাদের পাঠের সুবিধার জন্য মহিলা অধ্যাপক দ্বারা পরিচালিত কলেজ স্থাপিত করিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কলেজের নূতন গৃহ আদি প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমানে পার্ক সার্কাসে ডাঃ বীরেশ্বর মিত্রের বাড়ীতে কার্য আরম্ভ হইয়াছে। জনপ্রিয় মহিষসৌর নামের সহিত কলেজটি বিজড়িত থাকায় ইহা নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

বি এ পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রী

ইতিহাস প্রথম শ্রেণীতে প্রতিমা ব্যানার্জি ও রমা মিত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন দুইজনই আশুতোষ কলেজের ছাত্রী। দ্বিতীয় শ্রেণী মনীষা বসু ও অরুণা সেনগুপ্ত (ভিক্) সাধনা গুহরায় (বিদ্যা)।

ইংলিশ দ্বিতীয় শ্রেণীতে—দীপ্তি মিত্র ও আরতি সেন (ভিক্) রমারাবু। প্রতিভা হাজরা (সিটি) ইরা দাস (লরেটো), রমলা দাস (শিলং) অমিয়া সেন (স্কটিস) এবং ছয়টি!

সংস্কৃত দ্বিতীয় শ্রেণী—কমলা রায় (ময়) লতিকাদিত্য (সিটি), শান্তিলতা সাউ (ভিক্) কল্যাণী সরকার (স্কট), শোভাময়ী সরকার (বিদ্যা) মহামায়া মোলিক, রেবা দত্ত (আশু), জয়ন্তী পাণ্ডে (শিলং)

দর্শন—সুবিনীতা ঘোষ (সিটি) শেফালী গুপ্ত (বেং), সুজাতা গুপ্ত (বেং) প্রীতিকণা সরকার (বিদ্যা) মনিষা মুখোপাধ্যায় (ময়)

অঙ্ক—আশালতা মোদক (কৃষ্ণ)

ইকনমিক—সাহসনা সেনগুপ্ত (স্কট) নীলিমা রায়
চৌধুরী ; অমিয়া ঘোষ (বিদ্যা)

বি, এস-সির কৃতি ছাত্রী

মাত্র আটটি ছাত্রী পাশ করিয়াছে—সম্মানের সহিত—
রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, (বিদ্যা) নলিনীপ্রভা দাসগুপ্ত (আশু)
পাশকোর্সে স্নানীতি অধিকারী (বিদ্যা) অমিয়া সেনগুপ্ত ও
সুরমা সেনগুপ্ত (স্কট) জ্ঞানপ্রভা রায় দুহারী (মিসেস
ফুকান (গৌহাটী) রমলা দাস মুকুতা দে।

উইমেন্স এথলেটিক ক্লাব

ইহা একটি পর্দানশীন মহিলাদিগের সস্তরণ-প্রতিষ্ঠান।
ইহা মহিলাদিগের দ্বারা পরিচালিত ; সস্তরণ ও জীবন
রক্ষায় অভিজ্ঞ মহিলা শিক্ষয়িত্রী সস্তরণ শিক্ষা দিয়া

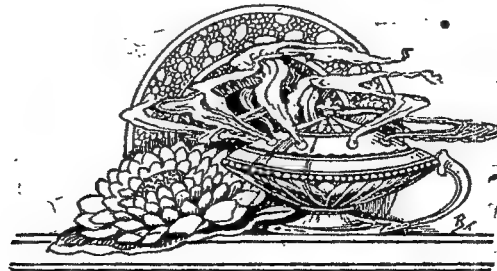
থাকেন। প্রত্যহ প্রভাতে ৫টা হইতে ৬-৩৫ পর্যন্ত
হেতুয়া পুষ্করিণীতে মহিলা ও বালিকাদিগের সস্তরণ
শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত ৫ বৎসর ধরিয়া
বহু সস্তান্ত ও মধ্যবিত্ত গৃহের মহিলা ও বালিকাগণ
এই প্রতিষ্ঠান হইতে সস্তরণ শিখিয়া উপকৃত হইয়াছেন।
সস্তরণ মহিলাগণের পক্ষে একমাত্র উপযোগী ও সহজসাধ্য
ব্যায়াম। ইহা দ্বারা দেহের যেকোন শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় তেমনি
দেহের আভ্যন্তরিক যে কোন ব্যাধিরও যথেষ্ট উপকার
হয়। এ দেশে মহিলাদিগের উপযুক্ত মহিলা পরিচালিত
ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের অতিশয় অভাব। সে ক্ষেত্রে উইমেন্স
এথলেটিক ক্লাবের এই উদ্যম অতিশয় প্রশংসনীয়।
মহিলাদিগের পর্দা রক্ষার ব্যবস্থাও উপযুক্তভাবে হইয়াছে।
এই প্রতিষ্ঠানের চাঁদার হারও অতিশয় কম। আমরা
আশা করি বহু মহিলা মহিলাদিগের এই একমাত্র সস্তরণ
প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া ইহার মহৎ উদ্দেশ্য সফল করিবেন।

আকাশ ও মৃত্তিকা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম, এ,

মাঝে মাঝে মনে ভাবি সংসারের ক্ষুদ্রতার মাঝে
আমার হৃদয় যেন অবিচল নিশিদিন রাজে
দৃঢ়মূল অভ্রচূষী বনস্পতি সম ! যেন হায়,
চিত্ত মোর নিত্য আরো উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধে শুধু ধায়
বিহঙ্গের মত ! কভু জীবনের জটিল জঞ্জালে
অকস্মাৎ যেন হায় জড়ায়ে না পড়ি কোন কালে ;
অহরহ এ ধরার উচ্ছ্বসিত কলকোলাহল—

তার মাঝে এ অন্তর থাকে যেন সদা অচঞ্চল
নিষ্কম্প প্রদীপ শিখাসম ! সর্ব্ব শোক দুঃখস্তর
পার হ'য়ে নির্বিকার ধ্যান-মৌন আমার অন্তর
সঞ্চরিয়া ফিরে যেন আনন্দের সপ্তস্বর্গ মাঝে—
কল্পনার মঞ্জুবীণা গুঞ্জরিয়া যেথা সদা বাজে।
ভাবের শিখর হ'তে অবিরত মর্ত্য-মৃত্তিকায়
তবু—তবু কে আমারে নিশিদিন টেনে আনে হায় !



কেন্দ্র সমিতি

গত জুন মাসে লন্ডন নগরীতে নিখিল বিশ্ব পল্লী মহিলা সম্মেলনের যে ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা হিমাংশুবালা ভাট্টা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন।

তিনি কেন্দ্র সমিতিতে জানাইয়াছেন যে, ইউরোপের বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ ভারতবর্ষের বিশেষভাবে বাংলাদেশের পল্লী-নারীর জীবনধারা ও কর্ম-পদ্ধতি জানিবার জন্ত বিশেষ উদগ্রীব। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, পত্রবিনিময় দ্বারা তাঁহাদের সহিত এদেশের মহিলাদের সংযোগ স্থাপন করেন; তাই তাঁহারা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মারফৎ এ দেশের সমস্ত মহিলা প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের সহিত পত্রের বিনিময় দ্বারা ভাবের আদান-প্রদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন শ্রীযুক্তা হিমাংশুবালা ভাট্টার নিকট লিখিয়া তাঁহাদের মনোভাব জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা উত্তর পাইতে ও জানিতে পারিবেন।

এই সব পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হইবে; বাংলা দেশের সমস্ত মহিলা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইংরাজীতে পত্র লেখা সম্ভবপর হইতে নাও পারে, তাই আমরা জানাইতেছি যে, তাঁহারা এই পত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছুক অথচ ইংরাজী ভাষায় পত্র লেখায় অপারগ, তাঁহারা তাঁহাদের বক্তব্য কেন্দ্র সমিতিতে লিখিয়া জানাইলে এখান হইতে ইংরাজীতে অল্পবাদ করিয়া যথাস্থানে পাঠান যাইবে আবার তাঁহাদের উত্তর আসিলে তাহাও জানান যাইবে। ইহা ভিন্ন শ্রীযুক্তা ভাট্টার নিকট বাংলায় লিখিয়াও তাঁহারা জানাইতে পারেন।

কিঙ্গপ ভাবের পত্র লেখা যাইতে পারে, তাহা বুঝিবার সুযোগের জন্ত শ্রীযুক্তা ভাট্টা কেন্দ্র সমিতির শাখা মাহিলাড়া মহিলা বান্ধব সমিতির নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহার নকল এখানে দেওয়া গেল। উহার উত্তর লিখিলেই চলিবে।

“মাহিলাড়া মহিলা-বান্ধব সমিতি”

আমার স্নেহের বোনেরা সব—

সুদূর বিদেশে বসে সাগর পার থেকে আমি তোমাদের চিঠি দিচ্ছি। কেউ হয়ত তোমরা আমায় চাইতে বয়সে বড়, আবার অনেকেই হয়ত আমায় চাইতে ছোট—কিন্তু বাংলাদেশে স্নেহের দাবীতে দিদি-ভাই ত আমরা অনেক সময় “ভুগি” বলে সন্ধান করি—স্নেহের দাবী নিয়ে আজ আমি “মাহিলাড়া মহিলা বান্ধব সমিতি”র—ছোট বড় আমার সব বোনকেই “ভুগি” সন্ধান করে পত্র দিচ্ছি।

আচ্ছা এখন কথা বলি শোন—

আমি আছি বিলাতে, তোমরা আছ বাংলাদেশে আমাদের উভয়েরই অনেক কিছু জিজ্ঞাসার আছে, তাই না? তোমাদের ভেতর যার বিলাত আসনি, বিলাত বিষয়ে ভাল মন্দ নানা ধারণা হয়ত তোমাদের আছে। তোমাদেরই মত বাংলা দেশের যে সব বিলাতে আসে তারা কি লেখাপড়া করে, কি ভাবে থাকে, কি করে, অনেক কিছু তোমরা জানতে চাও। তেমনি এদেশের মেয়েরাও তোমাদের চিঠি লিখে নানাকথা জানতে চায়। তোমাদের চিঠি লিখে উত্তর পেতে উৎসুক হয়। তাই তোমরা কেউ যদি চিঠি লিখে আমার ও বিদেশী মেয়েদের সঙ্গে সংযোগ রাখতে চাও, তবে উপরোক্ত ঠিকানা তোমরা নিজের নাম ঠিকানা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে লিখে চিঠি দিও, আমি যেখানেই থাকিনা কেন পাব ও খুঁজি মনে উত্তর দেব। চিঠিতে এক রাজনীতি (Politics) এবং ধর্মনীতি (Religion) ছাড়া তোমরা যা খুসী জিজ্ঞাসা করতে পার ও তোমাদের যা খুসি সংবাদ দিতে পার—যেমন তোমাদের স্বামী পুত্র কন্যা, ঘর সংসার, তোমাদের “মহিলা সমিতি” তোমাদের স্বথ দুঃখের কথা সব। তেমনি আমি ও এদেশের মেয়েরা এখানকার কথা তোমাদের জানাবো। যদি কোন অগ্রিয় কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা থাকে আমায় লিখো। তোমাদের নাম ঠিক না গোপন রেখে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আমি সাধ্যমত দেব। বোন যেমন বোনকে চিঠি দেয় তেমনি নিঃসঙ্কেচে আমায় চিঠি দিও, আমি বোনের দাবী নিয়ে তোমাদের

Mrs. H. B. Bhaduri

C/o Royal Bank of Scotland

64, New Bond Street, London. W. 1

কাছে এসেছি, সেই স্নেহের দাবী নিয়েই তোমাদের চিঠির উত্তর দেব।

তোমাদের সমিতির উন্নতি হউক, সে কামনা আমি খুব করি। সরোজনলিনী এসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগ রেখে "এসোসিয়েটেড কাউন্টি উইম্যান অব দি ওয়ার্ল্ড" (Associated Countay women of the world) এর সঙ্গে সংযোগ করে আমরা বাংলা দেশের বোনেরা যেন পৃথিবীর তালে চনতে পারি। এ, সি, ডব্লিউ, ডব্লিউ, (A. C. W. W.) বিষয়ে তোমরা যদি কিছু জানতে চাও লিখো। উত্তর দেব।

শীত কুহেলী কেটে এ দেশে রৌদ্র দেখা দিয়েছে। জানাইয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের কার্যেরও সুবিধা লওনে বসে অগণ্য নক্ষত্র নির্মল নীলাকাশ দেখার সৌভাগ্য

আমাদের ভাগ্যে বছরের প্রায় নয় মাসই ঘটে না। যে তিনটি মাস আমরা একটু রৌদ্র পাই ও রাত্রে নীলাকাশে তারার মুখ দেখতে পাই সেটুকু আমরা অতি আগ্রহে গ্রহণ করি। তবে এটুকুও জানিয়ে রাখি, গরমের সময় লণ্ডনও বেশ গরম হ'তে জানে। চিঠি লিখো। তোমাদের জগৎ আমার আন্তরিক মঙ্গল কামনা রইল।

ইতি—তোমাদের বোন
● বাঁহারা এইরূপ পত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছুক এবং নিজেরাই শ্রীযুক্তা ভাড়াড়ীর নিকট পত্র দেওয়া মনস্থ করিবেন, তাঁহারাও যদি তাঁহাদের কথা কেন্দ্র সমিতিতে জানাইয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের কার্যেরও সুবিধা হইবে এবং আমরা খুব আনন্দিত হইব।

শ্রুতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এই বিচিত্র সৌর জগৎ
সাগরাস্ররা ধরা
অতি অপূর্ণ প্রাণী মণ্ডলী
হস্তে বাঁহার গড়া।
দেবতার ছবি নর-নারায়ণ
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বাঁহ
লোক পিতামহ সে প্রজাপতিরে
জানাই নমস্কার।
মানব মনের ভিতর বাঁহার
সৃষ্টি শুভঙ্করী,
হংসবাহন সে চতুর্ভুজে
অগ্রে প্রণাম করি।

তুমিও চতুর্ভুজের বন্ধু
হে কবি জাতিস্বর।
তোমার সৃষ্টি সৌর জগৎ
চেয়ে ও বৃহত্তর।
হংসপুচ্ছ বাহন তোমার
হংসের বাহা সার।

ব্রহ্ম কণ্ডলুর অধিক
তোমার মন্যাদার।
অনন্ত ভব সৃষ্টির ধারা
কত বিচিত্র বেশ,
নিতি নব নব রসের সৃষ্টি
প্রতিভার উন্মেষ।
কতই ছন্দ লীলা অভিরাম
সৃষ্টি চমৎকার—
তোমার চরণে আমি বার বার
জানাই নমস্কার।
আধা দেহী তুমি আধেক আত্মা,
তুমি নর-নারায়ণ,
বিধাতার ঠিক পাশেই রয়েছে
তোমার সিংহাসন।
পঞ্চভূতে বিধির সৃষ্টি
করিতেছে নাজেহাল,
তোমার সৃষ্টি চির সুন্দর
প্রশিতে নারে কাল।

পুস্তক-পরিচয়

সন্ধানী—সচিত্র মাসিকপত্র, শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৭নং শিবপুর রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত, মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা।

এত কম মূল্যে যে একরূপ একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিক-পত্র দেওয়া যাইতে পারে বর্তমান বাজারে তাহা-
বিশ্বয়কর। বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাগণের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, চিত্র-সমালোচনা, মহিলাসংবাদ ইত্যাদি নানা বিষয় দিয়া প্রতিমাসেই সন্ধানীর কলেবর সুসজ্জিত হইতেছে।

সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে সাহিত্যে প্রগতি-
বাদের এই দুর্দিনে সন্ধানীর কার্য হইতেছে কোথায় কোন
শক্তিশালী লেখক অনাদরে অবহেলায় রহিয়াছেন তাঁহা-
দিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পাঠক-সমাজে সুপরিচিত
করা। বর্তমানে বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র বহু
সাহিত্যিককে স্থান দান করিতেছেন, কিন্তু সেই সব সাহি-
ত্যিকদের মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভা কদাচিত দৃষ্ট হয়। সন্ধানী
সত্যকার প্রতিভাশালী সাহিত্যসেবী খুঁজিয়া বাহির
করিতেছে এবং সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠাপন্ন সাহিত্যিকদের
সুচিন্তিত লেখার সহিত পাঠকদের পরিচয় করিয়া দিতেছে।
বহু সুন্দর সুন্দর ছবি, সুনির্বাচিত লেখা এবং স্বল্প মূল্য এই
পত্রিকাখানিকে সাধারণ্যে লোভনীয় করিয়া তুলিবে।

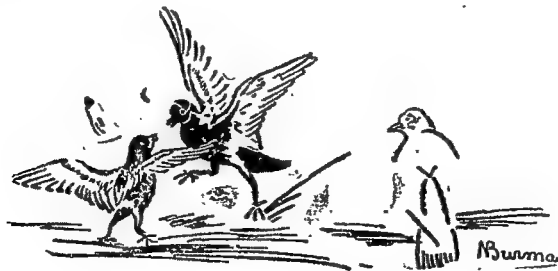
মানসী—শ্রীকালিদাস ঘোষাল সম্পাদিত, ১১০ কলেজ
স্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

উপরোক্ত পত্রিকাখানি সুনির্বাচিত প্রবন্ধাদি
সুলিখিত গল্পাদি লইয়া প্রতিমাসে প্রকাশিত হইতেছে।
সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচি যে কত মার্জিত তাহা
পত্রিকাখানি দেখিলেই বোঝা যায়। গত সংখ্যায় হে
গল্প ও কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া
সত্যই আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই পত্রিকা-
খানি বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সরল সীবন শিক্ষা—(প্রথম ও প্রথম ভাগে
অতিরিক্ত অংশ) শ্রীমতী প্রতিভাশ্রী বসু প্রণীত, ১০২
জগন্নাথ সুর লেন (দর্জীপাড়া) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত
ডিমাই ৮ পেজী ৮৭৩৪২ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

এ যুগে এমন একখানি পুস্তকের খুবই প্রয়োজন।
বিশেষ করিয়া মেয়েরা এবং বহু পুরুষরাও বেকার
অবস্থায় এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত উপকৃত হইবেন। লেখিকা
আমাদের সাধারণ ঘরে যে যে জিনিষের প্রয়োজন প্র
সবগুলিই অতি সুন্দর ও সহজ বোধগম্য ভাষায় এবং
সহায়ত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখিকার
সেলাইয়ে জ্ঞানও যেমন প্রগাঢ় তিনি লিখিয়াছেন ও তেমনি
প্রাঞ্জল ভাবে। প্রথম শিক্ষার্থীরও ইহা বুঝিতে কোন
কষ্ট হইবে না। আমরা মেয়ে স্কুলে ও বাড়ীতে বাড়ীতে
এই বইটি পড়ানো বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি।
ইহাতে বহু নরনারী অর্থসমস্তা দূর করিতে পারেন।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়



সকলের পক্ষে ভালো

শরীরকে কর্মক্ষম রাখবার জন্য চায়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রায় সব খেলোয়াড়ই এক মত পোষণ করেন। আমাদের দেশের সব চেয়ে বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় মেজর সি, কে, নাইডু বলেছেন :—

“ক্রিকেট, হকি, ফুটবল কিম্বা যে-কোনো খেলার মাঝখানে চা খেলে, আমি দেখেছি, শরীর তাজা হয়ে ওঠে। চা নির্দোষ, তার শক্তি মুহূর্তে। যে-কোনো রকম কঠোর খেলা ঝাঁপা খেলেন তাঁদের আমি এই পানীয় খেতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। পানীয়ের মধ্যে একমাত্র চা-ই আমি নিজে ভালোবাসি। সকালে বা বিকালে চা ছাড়া আমার চলেই না।”

এস, এ, সামাদ আজ বিশ বছর ধরে খেলছেন। তাঁর মতে :—

“আজকালকার ছোকরা ফুটবল খেলোয়াড়দের আমি সব সময়ই চা খেয়ে ট্রেনিং নিতে উপদেশ দিয়েছি। চা-ই তাদের সব সময় খাওয়া উচিত, একথাও আমি বলেছি। প্রথম শ্রেণীর ফুটবল সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা আমার মত অনুরোধ মেনে নেন। শরীর তেজোপূর্ণ, কষ্টসহিষ্ণু এবং কর্মপটু রাখবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে প্রচুর চা খাওয়া। আমি নিজে চিরকাল তাই করেছি এবং যতদিন ফুটবল খেলবো ততদিন তাই করবো।”

মোহনবাগানের বিখ্যাত ব্যাক ডাক্তার সম্রথ দত্ত—
বিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ‘অল-ইণ্ডিয়া ফুটবল চ্যাম্পিয়ন’-এর অধিনায়ক ছিলেন—বলেছেন :—

“গরমের দিনে খেলা হয় বলে ফুটবল খেলায় শরীরের উপর চোট পড়ে খুব বেশি। আমার মতে প্রত্যেক ফুটবল খেলোয়াড়ের পক্ষেই সবচেয়ে উপযোগী পানীয় হচ্ছে চা।”

ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান টেনিস খেলোয়াড় যত্সু মহম্মদ বলেন :—

“টেনিস খেলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাজা হয়ে উঠবার জন্য অনেক পানীয়ই আমি খেয়ে দেখেছি কিন্তু ভালো এক পেয়ালা গরম চায়ের মতো আর কিছুই নেই।”

ট্রেইনিং-এর সময় খেলোয়াড়দের পক্ষে চা খে অপরিহার্য সে কথা সব ট্রেইনারই স্বীকার করেন। মাস্তাজ সৈদাপেট-এর ওয়াই, এম, সি, এর কলেজ অফ

ফিজিক্যাল এডুকেশনের ডিরেক্টর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন মিঃ এন, কে, মিয়াহ নাম অনেকেই জানেন। ভারতবর্ষীয় অলিম্পিক ক্রীড়া ও কুস্তির টিম ১৯৩৬ সালে যখন বার্লিন গিয়েছিলো তখন মিঃ মিয়াই ছিলেন সে-টিমের ম্যানেজার। তিনি বলেছেন :—

“ওয়াই, এম, সি, এ, কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন এর ছাত্রদের আমি সব সময়ই বলি যে তা’রা যেন অন্য কোনো রকম মুহূর্তে উত্তেজক পানীয় না খেয়ে চা খায়। আমি দেখেছি চা শক্তি ও ফুর্তি দেয়। খেলার উপদেষ্টা হিসেবে আমি এবং বালিনে ভারতীয় অলিম্পিক ক্রীড়া ও কুস্তির টিমের প্রতিনিধি হিসাবে সব সময়ই আমার টিমে প্রচুর পরিমাণে চা ব্যবহার করেছি এবং চা যে খুব তাড়াতাড়ি শরীর তাজা করে তোলে তা’র প্রমাণও আমি পেয়েছি।”

এই সম্পর্কে নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার জি, এফ, শ্রেইডার উক্তি স্বভাবতই মনে পড়ে। তাঁর মত হচ্ছে :—

“আজকের দিনের জ্ঞত, ছেদহীন, চরম কর্মঠতার দিনে চায়ের চেয়ে ভালো কোনো তেজোদায়ক পানীয় আছে কিনা সন্দেহ।”

এটা অবশ্য স্মরণ রাখা যে আজকালকার শ্রমবহুল জীবনযাত্রার মধ্যে আমরা আমাদের দৈনিক সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারছি। আমরা টেনিস ক্রিকেটারই হই বা টেনিস চ্যাম্পিয়ানই হই, একটা জিনিষ আমাদের সকলেরই চাই, তা হচ্ছে স্বস্থ ও সবল দেহ। আমাদের মানসিক সম্পদ হয়তো বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। শরীর স্বস্থ রাখবার জন্য চা আমাদের সকলের পক্ষেই ভালো, এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।

বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় কে, ভট্টাচার্য—কাষ্টমস্ টিমের নামজাদা খেলোয়াড়—বলেন :—

“ফুটবলের মরশুমে শক্তি ও সহনশীলতা বজায় রাখবার জন্য প্রচুর চা না খেলে আমার চলেই না। খেলা শুরু হবার আগে আমি এক পেয়ালা চা খেয়ে নিই, সেইজন্য প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলার দারুণ পরিশ্রম আমি সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারি। চা খেলে কোনো রকম খারাপ প্রতিক্রিয়া হয় না বলে পানীয়ের মধ্যে চা-ই আমি সব চেয়ে ভালোবাসি।”

বঙ্গলক্ষ্মী



পাইন-শার্পে সজল মেঘের খেলা ।

“কাশীরের কথা”

ওইতে উদ্ভূত।

সি, এচ্, আরান্ এণ্ড কোং'র

সৌজন্যে—



চতুর্দশ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৪৬

১০ম সংখ্যা

প্রেম-জ্যোতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেমের আদিম জ্যোতি আকাশে নঞ্চরে

গুহ্রতম তেজে

পৃথিবীতে নামে সেই নানা রূপে রূপে

নানা বর্ণে সেজে ।

পত্রালাপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াস্তু !

তোমার ওখানে আবার ছেলেদের খাওয়া আরম্ভ হয়েছে, এতে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করছি। বিদ্যালয়ের ভোজনশালার চেয়ে তোমার ওখানে খাওয়া ভাল হবে বলেই যে খুসী হচ্ছি তা নয়। একজন কেউ মনের সঙ্গে যত্ন করে ওদের খাইয়ে দিচ্ছে, এইটেই ওদের পক্ষে সব চেয়ে উপাদেয়। মানুষ ত শুধু কেবল রসনা দিয়ে খায় না, সে হৃদয় দিয়ে খায়। সেই সর্বদাঙ্গী খাওয়াটি সব চেয়ে দরকার শিশুদের। সেইটে ছেলেরা তোমার ওখানে পাবে, এইটে বিদ্যালয়ের পক্ষে সব চেয়ে কল্যাণকর। জগৎ-সংসারে সকল কাজের মধ্যেই মেয়েদের একটি বিশেষ কাজ আছে, কেবলমাত্র ঘর সংসারের মধ্যে নয়। পৃথিবীর কোথাও এ কথাটা আজও সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় নি। কিন্তু না-হয়ে থাকবার জো নেই—জগতের কর্মক্ষেত্রের এই অসম্পূর্ণতা মানব-প্রকৃতি কোন মতেই চিরদিন বহন করবে না। আমাদের হতভাগ্য দেশে নারীশক্তিকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে ঘরের কোণে নির্বাসিত করে দিয়ে আমাদের সমাজকে যে কি রকম পঙ্গু করে দিয়েছে তা বোঝবার পর্য্যন্ত শক্তি আমাদের নেই। আমার

বিদ্যালয়ে সেই অভাবটি যথার্থভাবে যদি দূর হতে পারে তা হলে আমি খুব খুসী হই। এটাকে সম্ভবপর করে তুলতে গেলে এজন্য আমাদের কঠিন রূপে প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের অনেক দিনের সংস্কার ও অনভ্যাস বড় ভয়ানক বাধা—তার দ্বারা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হওয়াতেই পরস্পরের সম্বন্ধ সহজ হতে পারে না—সর্বদাই সেটা সম্বন্ধে চেতনার অতিশয়তা ঘটে। ধীরে ধীরে এই গ্রন্থি মোচন হয়ে গেলে সংসার কি সুন্দর কি পূর্ণরূপে পবিত্র হয়! আমাদের অনভ্যাসের ব্যবধানের গা ঘেঁসে কলুষ জমে জমে উঠে এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে আমাদের জীবনক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থান থেকেই আমরা জননীকে একেবারে বিদায় করে দিয়েছি। আমাদের সমাজের পনেরো আনা অংশ মাতৃহীন, তেমন দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? পাপের দ্বারাই আমরা মা'কে বিদায় করি, আবার মায়ের চোখের উপরে থাকিনে বলেই পাপ বেড়ে উঠে। এমন করে কখনই মঙ্গল হ'তে পারে না। আমাদের সমাজের সর্বত্র জননীর সাধনা করা আমাদের বাকী আছে।

১ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমৎ মণ্ডলেশ্বর মহাদেবানন্দ গিরি

কৃষ্ণ—এই শব্দের অর্থ—যিনি এই সব বিশ্ব-জগৎ আকর্ষণ করিয়া স্থিতি-স্থির রাখেন। যেমন সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহগণকে আকর্ষণ করতঃ স্থিতি-স্থির রাখেন। ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে—“কৃষ্ণদ্যুশ্চ নিম্নোচে গীর্ণে-
স্বজগরেণ হ” —কৃষ্ণসূর্য্য অজগর-গিলিত জন্তু অন্তর্মিত। ইচ্ছাই ঋগ্বেদের অহি-আচ্ছাদিত সূর্য্যরূপ ইন্দ্রের কথা। যখন সূর্য্য দক্ষিণায়নে থাকেন; দেবস্থান স্মেরুস্থিত ব্যক্তিগণ ছয়মাস সূর্য্যদর্শন প্রাপ্ত হইবেন না, তখন সূর্য্য দক্ষিণ-সমুদ্রে অহি-
কবলিত হন; এমন বর্ণনা ঋগ্বেদের ১।১২১।১০ মন্ত্রে আছে—
“পুরা যং সুরন্তমসো অপীতে স্তমদ্রিবঃ ফলিগংহেতিমস্ত।

শুষ্কস্তচিৎ পরিহিতং যদোজাদিবস্পরি সূগ্রথিতং তদাদ” ॥ অর্থ-
৩০রমেশ চন্দ্র দত্ত অনুবাদ হইতে—যখন সূর্য্য অন্ধকারের সহিত সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইলেন তখন হে বজ্রধারী তুমি সেই বৃত্ত রূপ শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং সেই কৃষ্ণের যে বল সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং সূর্য্যের উপর গ্রথিত হইয়াছিল তাহা তুমি ভগ্ন করিয়াছিলে ॥ অথবা যিনি আপনাতে প্রলয়ে সব আকর্ষণ করিয়া নেন তিনিই মহাকাল কৃষ্ণ, যেমন গীতায় একাদশ অধ্যায়ে লোকখয়কৃৎ ইত্যাদি। অথবা যিনি ভক্ত-
চিত্তাকর্ষক তিনিই কৃষ্ণ। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের ৬৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ দেখা যায়—“কৃষি-
ভূঁ বাচকো শব্দো ন তু নিবিত্তি বাচক। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধিত ॥ অর্থ্যাৎ কৃষ্ণ সং ও আনন্দ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। কৃষ্ণ বাসুদেব—তাহার অর্থ বসুদেবের অগত্যও হয়। আবার বসতি ইতি বাসু, যে দেব সর্ব্ব দেহে বসতি করেন তিনিই বাসুদেব। অথবা বাসয়তি ইতি বাসু, যার দেবদেহে স্বর্গস্থ দেবগণ, অন্তরক্ষীস্থ কিন্নরাদি, পৃথিবীস্থ নর ও ভূতগণ এবং পাতালস্থ নাগগণ বাস করেন অর্থ্যাৎ যার দেহে চতুর্দশ ভূবন স্থিত তিনিই বাসুদেব। যে বিশ্বরূপ গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন দেখিয়াছেন।

গীতাতেও বলে “বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি” ৭।৭।১৯ অর্থাৎ বাসুদেবই সব কিছু বাহা দেখা ও জানা যায়। “হরিরেব জগৎ জগদেব হরি। হরিতো জগতে নহি ভিন্ন তদুঃ।” তাঁহার কৃষ্ণত্ব সম্বন্ধে মহাভারতের আদি পর্ব্বের ১২৭ অধ্যায়ে—“স চাপি কৈশো হরিরুচ্চকর্ত্ত্ব একং শুক্রমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশবাবিশতাং যদূনাং কুলে শ্রিয়ৌ রোহিনীং দেবকীঞ্চ। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোহহসৌ শ্বেত স্তম্ভ দেবস্ত কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্ভবঃ কেশো যোহসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ।” কেশজাত জন্তু কেশব এবং কৃষ্ণ কেশজাত জন্তু কৃষ্ণ। এই কেশ হইতে উৎপত্তির বিষয় বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতের ২' ক ৭অ ২৬ শ্লোকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি বেদের ইন্দ্র পদ বাচ্য পরমাত্মা তিনিই কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের বাল্যলীলার অধিকাংশ বিষয় ঋগ্বেদে ইন্দ্রের লীলারূপে বর্ণিত আছে তাহা সবিশেষ মৎপ্রণীত উপাসনা নামক গ্রন্থে বিবৃত আছে। বিশেষ বাল্যলীলা প্রাকৃত ভাষায় বহু রূপে ভাবিত হইয়াছে। একজন এখানে বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত থাকিলান। বাল্যলীলা মধ্যে রাস-
লীলাটি সম্বন্ধে অনেকে নানা অলীক কল্পনা করিয়া কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়া থাকেন একজন তৎসম্বন্ধে দু'একটি কথা নিবেদন করিতেছি। যখন উক্ত লীলা ঘটে তখন কৃষ্ণের বয়ঃ ক্রম কি ছিল? যে ভাগবতে রাসলীলা বর্ণিত তাহাতেই দেখিতে পাই—যঃ সপ্ত হায়নো বালঃ করেনৈকেন লীলয়া। কথঃ বিদ্রুদগিরিব্রজং পুঙ্করং গজরাড়িব। ৩৩ ॥ দশমে ২৬ অধ্যায়।

ঐ স্কন্ধে ৩৮ অধ্যায়ে অক্রুরের গোকুলে বাইয়া রামকৃষ্ণসহ মথুরা গমন বর্ণিত—তথায়—

কিশরৌ শ্রামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদভূজৌ ॥২৯

ঐ ৪১ অধ্যায়ে—নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ

বিরেজতুঃ। স্বলঙ্কৃতৌ বালগজৌ পর্ব্বনী বাসতেতরৌ ॥৪১

ঐ ৪৩ অধ্যায়ে ভগবত্বক্তি—

বাল্যবয়ঃ তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িষ্ঠামো যথোচিতম্ ।

ভবেমিচ্ছকং মা ধর্মঃ স্পৃশেন্ মল্ল সভামদঃ ॥ ৩৮ । চাম্বর
উবাচ—

ন বালো ন কিশোরঃ স্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ ।

লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বীপ সত্ত্বতঃ ॥ ৩৯

ঐ ৪৪ অধ্যায়ে—

ক বজ্রগার সর্বাক্রৌ মল্লো শৈলেন্দ্রসন্নিভো ।

ক চাতি স্ক্রু মারাক্রৌ কিশোরো নাপ্ত যৌবনো ॥ ৮

এই রাস লীলাটি মথুরাগমনের পূর্বকালের বিষয়। কৃষ্ণের
মথুরা গমনের পর কখনও আর গোকুলে বা বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন
ঘটে নাই। গোবর্দ্ধন ধারণ সাতবৎসর বয়সের কথা। সূতরাং
অপ্রাপ্তযৌবন কিশোর বয়সেরও পূর্বে রাসলীলা। ৮। ১০
বৎসর বয়সের কালে বালক বালিকার একত্র খেলাধুলা মধ্যে
কেহ মৈথুনধর্মের আশঙ্কা করে না। যদিও গোপী মধ্যে
কেহ বিবাহিতা কেহবা পুত্রবতীও জানা যায় তবু তাহারা
পূর্ব জীবনে বনবাসী মুনিগণ, আলিঙ্গন সুখাভিলাষে স্ত্রী
মূর্তিতে অবস্থিত। ইহজীবনেও কৃষ্ণ দর্শনের জন্ত দেবী
কাত্যায়নীর পূজন ব্রত রূপে সমাপন করিয়াছিলেন। এই
বালক বয়সে তিনি যত সংখ্যক গোপীসহ রাসক্রীড়া করিয়া
ছিলেন তত সংখ্যক গোপী সৃষ্টি করেন ও তাহাদিগকে স্বামী
পিতা বা ভ্রাতার পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন ১০ম স্বন্ধে
৩৩ অধ্যায়—

কুস্মাতাবস্তমান্যানং বাবতী গোপযোষিতঃ ।

রেমে ভগবান্ স্তাভিরাষ্ট্রা রামোহপিলীলয়া ॥ ১৯

গোপীনাং তৎপতিনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্

যোহন্ত শ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নে নেহ দেহভাক্ । ৩৫

নাহুয়ন্ থলু কৃষ্ণায় মোহিতা স্তম্ভমায়য়া ।

নম্রমাণাঃ স্বপার্ষস্থান্ স্থান্ স্থান্ দারাগ্ ব্রজৌকমঃ ॥ ৩৭

যোগেশ্বরেন কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্বয়োঃ । ৩

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্ধর্থাভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৬

এই সকল শ্লোক হইতে আরও জানা যায় যে যত গোপী
তত কৃষ্ণও উৎপন্ন হইয়াছিল। জানা যায় গোপী সংখ্যা
খোল হাজার ছিল। গোপীগণের স্বামী বা পিতার
মনে স্বভার্য্যা বা কন্যার অল্পপস্থিতি জন্ত কোন সন্দেহ
উদ্বেকের কারণ ছিলনা, নতুবা পরদারাভিমর্শন রূপব্যাপার

সমাজের উৎশৃঙ্খলতা উৎপাদনে বিনাশের হেতু হইতে পারিত।
এই যে লীলা তাহা তাঁহার মায়াকল্পিত স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রম মাত্র।
যদি কৃষ্ণ ঈশ্বর না হইতেন তবে এমন বাল্যে এই যে বহু
নরনারীত্বের আবির্ভাব বিষয়ক কর্তৃত্ব তাহা সম্ভবপর নহে।

এই প্রকার একের বহু মূর্তি ধারণ, ইহা যোগশাস্ত্রে
সুপরিণত কেহ কেহ কায়বাহুযোগে অবলম্বনে করিতে সক্ষম
হন। যেমন ঋগ্বেদের ঋষি সৌভরি, যিনি মহারাজ চক্রবর্তী
মাক্ষাতার পঞ্চাশৎ কন্যা বিবাহ করেন, তিনি পঞ্চাশ মূর্তি
হইয়া তাঁহার পঞ্চাশ স্ত্রীসহ বাস করিয়াছিলেন। ব্রজে
নন্দগোপগৃহে বাস সময়ে এমন বাল্যে যোগাভ্যাস করার
কোন কথাই হইতে পারে না। বরং দেখা যায় কংস বধ
করিয়া উপনয়ন সংস্কার পূর্বক মহর্ষি সন্দীপনকে গুরু
করতঃ তৎগৃহে গুরুশুশ্রূষার সহিত সূদামাদিসহ বাস করিয়া
ছিলেন ও পশ্চাৎ মৃত গুরুপুত্রের যমালর হইতে আনয়নাদি
অলৌকিক কার্য্য দ্বারা গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন। সূতরাং
কৃষ্ণ ঐশীশক্তির বিকাশ দৃষ্টে তাঁহাকে ঈশ্বর বলাই যুক্তি-
যুক্ত। ঈশ্বাবাস্তং ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন
ত্যক্তেন ভুঞ্জী!

এই যে ঈশা তিনিই সচ্চিদানন্দ পুরুষ ষণ্মাত্রয় ত্যাগে
অর্থাৎ জাগতিক ভোগ বিলাস ত্যাগে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে
হয়। অতএব উৎতিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরণ নিবোধত।
ইতিহাসের কৃষ্ণচরিত্র স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়া
ছেন। সূতরাং তাহার পুনরুক্তি নিম্নয়োজন। কৃষ্ণ-গীতা
বলিয়াছেন লিখনদুরীকরণার্থ বাহা ভগবান্ বেদব্যাস
সম্প্রসৃত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণ কলির আদিতে
জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকালে অন্নায়ু অল্পবুদ্ধি জনগণ বেদ-
বেদাঙ্গাদির পঠন পাঠন বিমুখ হইবে জানিয়া বৈদিক ধর্ম
চিরতরে লোপ না হয় তাই বেদের সার যে উপনিষদ তাহার
সারাংশ গীতাকারে নিবদ্ধ করাইয়াছেন। বর্তমানে আচার্য্য
রামানুজ, আচার্য্য বল্লভ, আচার্য্য মধ্ব ও আচার্য্য নিম্বার্ক
যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছেন তাহারই অবলম্বনকারী
জনগণের সংখ্যাগরিষ্ট দেখা যায়। ইহাদের সকলেরই ধর্ম
গীতামূলক শৈবশাক্ত ও গীতার অম্বুযায়ী। সূতরাং গীতাকে
যুগধর্ম বলা দোষাবহ হইবে না। ভাগবতের ১০।৩ অধ্যায়ে
বর্ণিত—

তমহুতং বালকমমরজ্ঞেষ্ণং । চতুর্ভূজং শঙ্খগদাযুদায়ুধম্
শ্রীবৎসলক্ষ্মণং গদলশোভিতকৌস্তভং । পীতাম্বরং সান্ন পযোদ
সৌভগম ।

মহাবৈভব্য কিরীট ইত্যাদি যে পীতবাস, বনমালাকৌস্তভা-
লঙ্কৃত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৃষ্ণমূর্তি পরিকল্পিত হয় তাহার
স্বরূপ শ্রীমৎভাগবৎ পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে
বিরাট পুরুষের বর্ণনে বৈরূপ বিবৃত তাহা অনেকের নয়নপথে
পতিত হয় না, তাই তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা
গেল—

“কৌস্তভ ব্যাপদেশেন স্বাত্মজ্যোতিবিত্ত্যজঃ ।

তং প্রভাধাপিনী সক্ষাচ্ছিবৎস মুরসাবিভূঃ ॥১০

স্মায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ ।

বাসচ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মহুত্রং ত্রিবৎসরম্ ॥১১

বিভক্তি সাংখ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে ।

মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্বলোকাত্তরঙ্গরম্ ॥১২

অব্যাকৃত মনস্তাধামাসনং বদধিতঃ ।

ধর্মজ্ঞানাদিভির্ভুক্তং সত্বং পদ্ম মিহোচ্যতে ॥১৩

ওজঃ সহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ ।

অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনং ॥” ১৪ ইত্যাদি ।

অর্থ সেই বিরাট পুরুষ যাহার দৌ নতক, চন্দ্র সূর্য্য চক্ৰ,
অন্তরীক্ষ বপু, পৃথিবী পাদ সেই সর্বব্যাপী সর্বাধই কৃষ্ণ ।
শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য নিষ্কিয় নির্বিকার শুভ্র জ্যোতিঃ ও জ্যোতিঃ
স্বরূপ পুরুষ শুদ্ধ ছিলেন । পশ্চাৎ রজবহলা প্রকৃতি যোগে রক্ত-
বর্ণ সিন্ধু স্রবৎ । তৎপর পীত বা হিরণ্য বর্ণ অঙ্কুরে ব্যক্ত
হিরণ্যগর্ভ বা সৃষ্টিস্থিতিবিনাশ কর্তা হন, আবার তিনিই বিশ্ব
বিরাট রূপে দৃশ্য প্রপঞ্চাধার শ্রামল কৃষ্ণ (ভাগ ১০।২৬।১৬) ।
এই যে নীলাকাশ নীল বর্ণসমুদ্রবেষ্টিত শস্ত্র শ্রামলা ধরিত্রিদেবী
তঁাহা যে শ্রাম তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত সেই বিরাট দেহে যে কৌস্তভ
মণি তঁাহা তাঁরই স্বাত্মজ্যোতির নিদর্শন মাত্র । যে শ্রীবৎসলক্ষ্মণ
তিনি বক্ষে ধারণ করেন তাহা ঐ জ্যোতিরই প্রভাংশি
তাঁর গলবিলম্বিত যে বনমালা তাহা নানাগুণময়ী মায়ার পরিস্থিতি
মাত্র । তাঁহার পীতবাস ছন্দোময় অর্থাৎ বেদ ত্রয়ই তাঁর পীত-
বস্ত্র তাঁর গলায় যে ব্রহ্মহুত্র তাহা ত্রিমাত্রাবিশিষ্টা ঔকারাখ্য
প্রণব । তাঁর কর্ণে যে মকরকুণ্ডল তাহা সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র
দ্বয়, যাহা শ্রবণে মুক্তি লাভ ঘটে । সর্ব লোকের অভয়প্রদ

যে পারমেশ্বরী বা ব্রহ্মলোক তাহা তাঁহার মৌলি (মন্তকাত্তরণ) ।
তিনি যে আসনে আসীন অর্থাৎ তাঁর অনন্ত শয্যা অব্যাকৃতাক্ত
প্রধানই জানিবে । ধর্ম ও জ্ঞানাদিযুক্ত যে সত্ত্ব তাহাই তাঁর
হস্তস্থিত পদ্ম । ওজঃ সহ বলযুক্ত মুখ্য প্রাণাখ্য তত্ত্বই তাঁর
হাতে গদা । অপ্‌তত্ত্ব শঙ্খ এবং তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন জানিবে ।
প্রাচীনতম ঋগ্বেদে বর্ণিত ইন্দ্রলীলা সমূহই ভাগবতাদি পুরাণে
কৃষ্ণলীলা এক্রুপে বর্ণিত হওয়ায় বৈদিক দেবতা ইন্দ্র ও কৃষ্ণ
অভেদ । এজতাই পুরাণ সকল যাহা পুরাণ পুরুষের গুণানুবাদে
পূর্ণ সেই বৈদিক পুরুষেরই মহিমাযিত । নিত্য বৈদিক ধর্মই
পুরাণ ধর্ম তাহাই বর্তমান যুগধর্ম বটে । বেদে যে অদ্বৈত তত্ত্ব
নিহিত আছে তাহা ইতিপূর্বে “বৈদিক যুগে” নামক পুস্তকে
বিশেষ ভাবে দেখান হইয়াছে । সেই অদ্বৈত তত্ত্ব ভগবদগীতার
ও ভাগবতে ভগবান্ সর্বজনহিতায় অর্জুন ও উদ্ধবকে উপলক্ষ
করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন । সেই ভগবদ বাক্যামৃত পাঠে
জ্ঞানযজ্ঞ পরিসমাপন করা ইহলোকে মনুষ্য জীবনের কৃত
কৃত্যতা । গীতাতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ ইহা স্পষ্ট নির্দেশ
করিয়াছেন ।

অধ্যোয্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহসিষ্টঃ স্থামিতি মে মতিঃ ॥৭০

সেই গীতা পঠন পাঠনের অধিকার কার আছে তৎসম্বন্ধে
ভগবান্ বলিয়াছেন । অষ্টাদশ অধ্যায় ।

ইদন্তে নাতপস্কায় নাতক্তায় কদাচন ।

ন চাশু শ্রমবে বাচ্যং নচ মাং যোহহ্যতরতি ॥৬৭

অর্থ বার তপস্তা নাই, ভক্তি নাই, গুরু শ্রদ্ধা নাই, যে
ঈশ্বরে অহুয়া করে এমন ব্যক্তিকে গীতা বলিতে নাই । এই
ভক্তি কথাটির লক্ষণ এইরূপ দেখা যায় । “সাপরাত্নরতিরীশ্বরে ।”
অন্যত্র “সাক্ষ্যে পরম প্রেমরূপা” । অন্যত্র “দ্বীকেন
হৃষিকেশং পুজনং ভক্তিরূচ্যতে ।” রামানুজ বলেন—ভক্তি-
স্ত নিরতিশয় আনন্দ প্রিয়ানন্যপ্রয়োজন সকলেতরবৈতন্ধ্য
বজ্জ্ঞান বিশেষ এব । অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দ যাহা হইতে
হয় এতাদৃশ প্রিয় যিনি (পরমাত্মা) তাহা হইতে অনন্ত
প্রয়োজন সকল ইতর বিষয় বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান বিশেষই ভক্তি ।
গীতাতেও পরাভক্তি, একা ভক্তি, অনন্তা ভক্তি ও
অব্যভিচারিণী ভক্তি জ্ঞানের পূর্বাভাসকেই বলা হইয়াছে ।
এই ভক্তি হইলে তবে তাঁকে জ্ঞান যায় এবং জানিলে
মুক্তি লাভ হয় ।

বলি

শ্রীকণা দত্ত

(গল্প)

[এক]

ভগবতী কুৎসিত। নিজের মনেও সে দেখখা জানে। মামাতো ননদ মায়া তারই সমবয়সী। ভগবতীকে প্রায় রোজই সে একবার করে বলে,—“পৃথিবীতে মেয়ে কি কিছু কম ছিলো বৌদি? অজস্র টাকা আর রূপেগুণে লক্ষী কত মেয়ে নিয়ে বাপেরা সব দাদার হাতে পায়ে ধরে মিনতি করে গেছে। শেষ পর্যন্ত তোমাকে দেখেই কিন্তু দাদা বিয়েতে মত দিলো। তোমার কিছু বাহু আছে তাই।

পান সাজতে সাজতে ভগবতীর কালো মুখখানাও আকর্ণ রাঙা হয়ে উঠে। উৎকর্ণ হয়ে সে মায়া'র কাছে আরও যেন কিছু শুনতে চায়। মায়া'র দাদার কথা শুনতে তার ভারী ভালো লাগে।

হাজার মেয়ের মাঝখান থেকে যে আর্ঘ্য শুধু বেছে বেছে তাকেই ঘরে আনবে,—এমন আশ্চর্য্য কথা কে কবে ভেবে ছিলো? সারাদিনের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মায়া'র এই কথাটিই শুধু তার মনে মধুবর্ষ করে।

আড়ালে গিয়েই কিন্তু মায়া মুখ বাঁকায়। বলে “বলিহারী পছন্দ বাপু তোমার ছেলের! ডানাকাটা সব পরীদের ঠেলে রেখে ঘরে এনেছে এক রক্ষকালীর বাচ্ছা।

কেন, বিয়ে না করলেই তো লেঠা চুকে যেতো! ছেলের তোমার আশ্চর্য্য জেদ পিসীমা। লীনার সঙ্গে বিয়ে হোল না বলেই কি অগ্নি বউ ঘরে আনতে হবে নাকি? কেন লীনা ছাড়া ভূ-ভারতে আর মেয়ে নেই বুঝি?”

ভীত ত্র্যস্ত স্বরে পিসীমা বাধা দেন,—

“চুপ কর মায়া। বোম্বা বেচারী শুনতে গেলে মনে ভারী কষ্ট পাবে। বড় লক্ষী মেয়ে, আহা! ওর কি দোষ?”

মায়া কিন্তু থামতে চায় না।

“বাই বল পিসীমা, আমি হলে অমন বিচ্ছিন্ন বউ ঘরে

আনার চেয়ে চিরজন্ম আইবুড়ই থাকতাম। দাদার যত বাহাহারী।”

পিসীমা প্রায় ধমক দিয়ে উঠেন,—

“বা, বা তোর মত সবাইকে যে ডানাকাটা পরী হতে হবে, তারই বা কি মানে আছে? যদি কপালে থাকে, ঐ মেয়েই অজুকে এমন বশ মানিয়ে নেবে, দেখে তখন আশ্চর্য্য হয়ে বাবি।”

মায়া শুধু ঠাট্টা করে, আর হাসে।

আগুনের মত জলন্ত রূপ তার। কুরুপের প্রতি তাই বৃষ্টি তার বিতৃষ্ণার সীমা নেই। নেই এতটুকু সহানুভূতির দাক্ষিণ্য।

কাঁটা, ফিতে আর ভিজ়ে গামছাখানা নিয়ে বিকেলে ভগবতী শাশুড়ীর কাছে চুল বাঁধতে বসেছে।

মায়া অহুযোগ করল—

“পিসীমা শুধু বৌ বৌ করেই পাগল, মেয়েটা আজকাল ভেসেই গেছে।”

মায়া অভিমান করে আর্ঘ্যর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। পিসীমা সেদিকে চেয়ে স্নেহভরে হাসলেন,—

“বিয়ে হয়ে গেলো, পাগলীর ছেলেমানুষী তবু বুচলো না! এখনও অজুর সঙ্গে মারপিট করে আর এক পাতে ভাত খায়।”

পিতৃমাতৃহীনা মায়া'কে পিসীমা নিজের ছেলের সঙ্গে এতটুকুও তফাত করে দেখেন না।

মনের গহীন গভীরে, মায়া'কে নিয়ে, ভগবতী যেন একটু-খানি ঈর্ষামিশ্রিত বেদনা অনুভব করে।

স্বামী যেন ষোলোআনাই এই মেয়েটির দখলে। প্রায় ছ' বছর ভগবতীর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আর্ঘ্য একটি দিনও তার সঙ্গে তেমন মন খুলে আলাপ কল্ল নি।

স্বামীর কাছে ভগবতী যেন নিতান্তই অবাস্তব।

তাকে বিয়ে করে ঘরে এনে রাখার পর আরও কিছু কর্তব্য

যে তার উপর আছে,—আর্য্য যেন সে কথা সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে।

মায়া যেকটা দিন খুশরবাড়ী থেকে এসে এখানে থাকে শুধু সেই কটা দিনই যেন আর্য্য তার সহজ জীবনে বেঁচে থাকে, পরিপূর্ণ না হোক, কিছু আনন্দে।

আমীর মনের তল ভগবতী আজও পেলো না। তবু অনেক মেয়ের ভেতর থেকে বেছে আর্য্য যে একমাত্র তাকেই বিয়ে করেছে এতেই সে খুশ, এতেই সে সুখী। অল্প দুঃখ বা অভাব সে অনুভব করে না।

[দুই]

আবাল্যের সহচরী মায়া... শুধু তার কাছেই আর্য্য নিজের মনখানা খুলে ধরে। বলে—

“আচ্ছা, এতদিন ধরে আমার আশায় রেখে রেখে শেষ পর্যন্ত কেন লীনা আমার প্রস্তাবে রাজী হলো না বলতে পারিস মায়া? কোথায় আমার ত্রুটি ছিলো?”

নিবিড় বেদনায় আর্য্যর মুখখানা কালো হয়ে যায়। মায়া যেন কান্না পায়। তার দাদাকে এমনি নির্ভর ভাবে যে আঘাত করেছে, মনে মনে তার মৃত্যু কামনা করে সে অভিসম্পাত দেয়।

“যে-পোকার অঙ্কনে পুড়ে মরাই বিলাস, তাকে কেমন করে ঝোঁক করবে তাই?” মায়া উত্তর দেয়। ক্লান্ত মুখে আর্য্য চুপ করে থাকে।

“কিন্তু ভালই যদি না বাসবে দাদা, ভগবতীকে কেন তুমি বিয়ে করলে তাই?”

আর্য্য পাণ্ডুর হাসি হাসলো।

“বড় প্রেম জীবনে শুধু একবারই আসে মায়া। লীনাকে যে একবার ভালবেসেছে আর কোনো মেয়ের দিকে ফিরে চাওয়াও যে তার পক্ষে অসম্ভব।

মায়া মাথা নাড়লো—

“বুঝলুম, কিন্তু ভগবতীকে তা হলে তো তোমার বিয়ে না করাই উচিত ছিলো দাদা।”

রান হাসিতে টুকরো কান্নার আভাস জমিয়ে আর্য্য প্রতিবাদ করলো।

“আর সকলের মত তুইও কি আমার ভুল বুঝবি বোন?”

আমি কি ভালবাসবার জন্য ভগবতীকে ধরে এনেছি তাই লীনার গর্ভ ভাঙবে। শুধু সেইজন্যই তো ভগবতীকে ধরে আনা।”

—কিন্তু তাকে জব্দ করতে গিয়ে, নিজেকেই কি আরও বেশী জব্দ করলে না তুমি?”

মায়া প্রশ্নভরা স্বরে আর্য্যকে জিজ্ঞেস করলো।

দুই হাতে আর্য্য মুখ ঢাকলো। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন অসহ্য জ্বালা! কশালের শিরাগুলো উদগ্র ব্যথায় ফেটে পড়তে চাইছে।

“সে কথা আজ আমার মত আর কেই বা বুঝছে বল? লীনা কি একবারও ভাবে, যে শুধু তারই জন্যে একজন নিজেকে তিলে তিলে অপমৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে?”

স্বর্য়্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকুর মত চকিত করুণ হাসিতে মায়া মনের কান্না সরিয়ে বসে:

“সে কি তোমার মত পাগল দাদা?”

তার খেরলখুশীর স্রোতে তোমার মত ছুপাচটা প্রাণ ভেসে ভেসে গভীর অতলে মিলিয়ে গেলেও, সে কি চেয়ে দেখে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলবে কোনদিন।”

আর্য্য অকস্মাৎ যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো।

“ভুল বলছিস মায়া, প্রত্যাখ্যান করলেও, আমার হাতে অসম্মত হোলেও লীনা আমার ভালবেসেছিল।”

শিথিল স্বর আরও দৃঢ়তর করে বলে “এখনও ভালবাসে আমার।”

মায়া স্বর কঠিন হয়ে এসেছে—

“কিন্তু নিজের কথাটাই তুমি ঝোলো আনা করে হিসাব করলে তাই? বৌদির জীবনটার মূল্য কি কিছুই নয়?”

মায়াও নারী। ভগবতীর এইখানটুকুতেই মায়া প্রগাঢ় সহানুভূতি।

রামাঘর থেকে পিসীমা হাঁক দিলেন “মায়া, খেতে আর।”

অপরাজের রোদ ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে।

প্রখর রৌদ্রদাহও ক্রমে শীতল হয়।

কেয়া খয়েরে সাজা, কেওড়া জল ছিটানো পান নিয়ে ভগবতী ধরে ঢুকলো। নির্মল ঠাণ্ডা জলে সে এইমাত্র গা ধুয়ে এসেছে। সমস্ত শরীরে তার অপরাধিতার গ্রামমেঘের

আর রজনীগন্ধার সুশীতল স্নিগ্ধতা। চাকর সঙ্গে সঙ্গে খাবার এনেছে।

স্বামীর সামনে খেত পাথরের থালায় নিপুণ করে সাজানো ফলমিষ্টান্নগুলি ভগবতী এগিয়ে ধরলো।

রৌদ্রদগ্ধ দিনের শেষে, গোষ্ঠুলির মেহছারার মত, তার সারা শরীরে কাহার জন্ম যেন তীক্ষ্ণমান অজস্র সেবা আর লতারিত আকৃতি উপচে পড়ছে?

আর্য্য কি খেতে ভালবাসে, না কাসে, তার খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি ইতিহাস ভগবতীর মত অত সূক্ষ্মভাবে আর কেই বা জেনে রেখেছে! ঘরের সিলিংএ ক্রান্তগতিতে ফ্যান ঘুরছে। তবু ঋতুস্রবের সুগন্ধি ভিজ়ে পাখাটা তুলে নিয়ে ভগবতী আর্থ্যকে বাতাস করবে।

তার ধারণা তার হাতের বাতাসই আর্থ্যকে ঢের বেশী আরাম দেবে। হাতের বাতাসে সে রাজ্যের মেহ আর সহানুভূতি ঢেলে দিতে চায়। অনেক মেরের মাঝ থেকে তার মত একটা মেয়েকেই যে মায়ার দাদা বিয়ে করেছে তার জন্ম সে অজস্র কৃতজ্ঞতা দিয়ে তাঁকে পূজা করবে।

[তিন]

“দাদা, লীনা এসেছে, বৌদিকে দেখতে চায়।” বাইরে থেকে মায়ার আর্থ্যকে ডেকে বললো।

ঘরের ভিতর ভগবতী অকস্মাৎ সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। কে লীনা? ভগবতীকে তার কিসের প্রয়োজন? লীনার নাম নিয়ে ছ’একটা গোপন ইঙ্গিত ভগবতীর কাণ এড়ায়নি; তবু স্পষ্ট করে সে কিছুই জানেনি।

লীনা বোধ হয় মায়ার বন্ধু! কিন্তু আর্থ্যর সে কে? ভগবতীর সারা বুক ভরে কি যেন একটা অজানা আশঙ্কা, মণিত করে ফিরছে। সমস্ত রক্তস্রোতে একটা অশান্ত বিদ্রোহ প্রবাহ। পায়ের শব্দ ক্রমেই ঘরের পানে এগিয়ে আসছে।

আর্থ্যর কাছে তার প্রতিটি অঙ্গর মুগ্ধ!

কিন্তু আর্থ্য কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেলো নাকি? ভরে ভগবতীর চোখ জলে ভরে গেলো।

আর্থ্য নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। তা নইলে, ভগবতীর হাত ছুঁখানা ধরে, তাকে সে বৃকের একান্ত সম্মিষ্টে টেনে নিলো কেন?

ভগবতীর নিঃশ্বাস রোধ হয়ে আসছে। টেঁচিরে টেঁচিরে আর্থ্য কাকে বলছে সব কথা?

“কি সুন্দর তুমি ভগবতী! তোমাকে ভালবেসে যেন আমি পাগল হয়ে গেছি। কোথায় তোমার রাশি বলতো? এত সুন্দর তুমি, এত পবিত্র!”

আনন্দে বেদনায় ভগবতী শুধু চোখের জল ফেলছে।

সামনের ভারী পর্দাটা সরিয়েই লীনা থমকে দাঁড়ালো। সমস্ত মুখ তার বেদনায় নীল হয়ে গিয়েছে। মৃতের মত নিম্পন্দ চোখে এক ফোঁটা জলের আভাষ নেই। বৃকে অসহ দাঁহ। চোখেও যেন আগুন জ্বলছে।

আর লীনার ভগবতীর সঙ্গে কোনো প্রয়োজন নেই। ফিরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লীনার আয়ত চোখ দুটা জলে ভরে গেলো; গর্ষ আজ তার চূর্ণ হয়েছে। একটা প্রেমিক হৃদয়ের নির্মম অপমৃত্যু সে আজ সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। মুহূর্তে লীনা বাড়ীর বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো।

আর্থ্য শান্ত হয়ে শুয়ে পড়লো। মায়ার তার বিপর্য্যন্ত চুলে হাত বুলিয়ে মেহ ঝরাচ্ছে। আর্থ্য যেন ভূমিকম্পে ভেঙ্গে পড়া একটা পাহাড়।

“কেমন জন্মটা করলাম ওকে, মায়ার, বলতো?”

“ছিঃ ছিঃ অন্তর্ব্যামীর সম্মুখে এ যে নির্ভুর আত্ম-বলিদান!” মায়ার বলে।

ভগবতী আর স্বপ্ন দেখে না। তার জীবনের একটামাত্র সাঙ্ঘনা শুচে গেছে। ভগবতী বুঝেছে, মায়ার দাদা ভালবাসবে বলে নয়, ভালবাসবেনা বলেই তাকে বিয়ে করেছে।

ধ্যানভঙ্গ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় স্খ্যাকান্ত, লুগায় অনিল চন্দ ।
ভিজিটরকে এগিয়ে আনে, অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি ।
আনে ফটোগ্রাফের দাবি, রেজেষ্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি ।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন, মিথ্যে তাঁরে ডাকা ।
ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূণ্যে ছড়াছড়ি ।

সত্য যুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত ঋষিযুনির ভেঙে দিতেন ধ্যান,
ভাঙন কিন্তু আর্টিষ্টিক, কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হোত দেবতাদিগের পক্ষে ।
তপস্বীটার ফলের চেয়ে অধিক হোত মিঠা
নিষ্ফলতার রসময় অমোঘ পদ্ধতিটা ।
ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া,
তখন ছিল কুলের বাঁধন, এখন দড়িদড়া ।
ধাক্কা মারেন সেক্রেটরি, নয় মেনকা, রস্তা
রিয়লিষ্টিক আধুনিকের এই মতোই ধরম বা ।
ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেবতা যদি চান তা,
স্খ্যাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান স্খ্যাকান্ত ।
কিন্তু জানি ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ,
ইন্দ্রদেবের বাঁকা মেজাজ, আমার ভাগ্যমন্দ ।
সইতে হবে স্কুল হস্ত অবলেপের দুঃখ,
কলি যুগের চালচলনটা একটুও নয় সূক্ষ্ম ॥

সম্পাদিকার জম্পনা

রবীন্দ্রনাথের “পরম গুরু” উপাধিলাভ

বর্তমান বৎসরে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ পুরী যান। তাঁর আগমন-সংবাদ রটনার সঙ্গে সঙ্গে পুরীর রাজা বাহাদুর শ্রীরামচন্দ্র দেব বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন কি ভাবে কবিকে তিনি সম্বর্দ্ধনা করবেন। কবির উপযুক্ত সমাদর কিসে হয় তিনি ভাবতে লাগলেন। শেষে স্থির করলেন, পুরী রাজবংশ থেকে শ্রেষ্ঠ মানবদের পূর্বে যে-সব সম্মানজনক উপাধি দেওয়া হোত তারই একটি বিশিষ্ট উপাধিতে তিনি কবিকে ভূষিত করবেন। অনেকগুলি উপাধির মধ্যে “পরমগুরু” উপাধিটি তিনি নির্বাচন করেন।

কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপাধিদানের ইচ্ছা জানালে উত্তরে কবি বলেন—উপাধি আর কি হবে?

রাজা বলেন—আপনি উপাধি চান না কিন্তু উপাধি নিজেই খুঁজে আপনার কাছে আসছে। কবি নিরুত্তর হন।

যথাদিনে রাজবাড়ীর ব্রাহ্মণপুরোহিত, লোকলঙ্কার বাচ্চ-সহ মন্দিরের প্রহরীঘেরা স্তম্ভজিত চারটি হাতীর পৃষ্ঠে নানাবিধ উপঢৌকনসমেত সনন্দটি বাহিত হয়ে এল। শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ পদাবলীর শ্লোকগুলি, নিপুণ শিল্পীর হাতে বোনা লাল রংয়ের রেশমি চাদরের উপর অক্ষরতোলা অতি সুন্দর একখানি প্রায় বারো-তেরো হাত লম্বা শিরোবস্ত্র রাজগুরু কবির মাথায় সেকালের পদ্ধতিতে পাগড়ীর মত করে বেঁধে দিলেন। পাগড়ীটির গড়ন অনেকটা পোপের উক্ষিষের মত। শুভ মুষ্টি কবিকে পরম-গুরুর উক্ষিষে ভারতীয় বেশে পোপের মতই দেখাচ্ছিল। বস্ত্রখানির আরো একটু মাহাত্ম্য আছে, শোনা গেল। শিল্পীকে নয় মাস হবিষ্যাম গ্রহণ করে এই পবিত্র উক্ষিষবস্ত্র বুনতে হয়। অধিকারীকে সাবধানে ব্যবহার করতে বলা হয়, না-ছেঁড়ে, না-আঙনে পোড়ে।

পুরীবাসী সকলেই বললেন,—এই উপাধি কম গৌরবের নয়। পূর্বে শ্রেষ্ঠ গুরুরাই এই উপাধি লাভ করতেন। কবিকে এই সম্মান দানের জন্ত রাজা শ্রীরামচন্দ্র দেবকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লর্ড ও লেডী সিংহ

স্বর্গীয় লর্ড সত্যপ্রসন্ন সিংহ বংশানুক্রমে লর্ড উপাধিলাভ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র লর্ড অরুণকুমার সিংহ লর্ড উপাধি লাভ করা সত্ত্বেও এযাবতকাল ইংলণ্ডের লর্ড সভায় আসন পান নাই। সম্প্রতি ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট মহাসভা তাঁকে লর্ড সভায় আসন দান করেছেন। বর্তমান লর্ড ও লেডী সিংহ আমাদের সকল কর্মে সহায়ত্ব প্রকাশ ও সাহায্য করে থাকেন। তাঁদের এই সম্মানলাভে আমরা তাঁদিকে শুভ ইচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মাইকেল-পত্নী হেনরিয়েটা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যত্নে ও উদ্যোগে মাইকেলপত্নী সাক্ষী হেনরিয়েটার সমাধির উপরে সম্প্রতি একটি মর্ম্মরস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। মহামতি মধুসূদনের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান না আছে কার! প্রতিভার আলোকে কবির স্মৃতি দেশবাসীর মনে চিরজাগ্রত, চিরউজ্জল। কিন্তু তাঁর সাক্ষী পত্নীর জন্ত এই যে প্রাণের দরদ, এটি আমাদের প্রাণে গভীর কৃতজ্ঞতা এনে দিয়েছে উদ্যোক্তাগণের প্রতি। একজন নারীর সম্মানে সকল নারী সম্মানিতা। বিশেষভাবে বিদেশিনী নারীকে সম্মান দেওয়া বাঙালী জাতির উদার মহত্বের পরিচায়ক। আমরা এই কার্যে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি।

লেডী নির্মলা সরকার

নব যুগের নূতন প্রেরণায় অমুপ্রাণিত যে-সব পুরুষ ও নারী, নূতন শক্তিতে নূতন ভাবে সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান ও চরিত্রবতী হয়ে গড়ে উঠেছিলেন, লেডী নির্মলা সরকার সেই সব যুগাগ্রণী নারীদের অন্ততম। বাংলার শ্রেষ্ঠ উচ্চ-তম সংস্কারগুলিতে সংস্কৃত, অথচ কুসংস্কারগুলি বাদে জীবনে পরাহত, শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত সেই সকল আদর্শ নারীগণের ইনি একজন। পিতৃবংশ ও শ্বশুর বংশের মুখ উজ্জলকারিণী বাংলার কুললক্ষ্মী, কুলবধু নির্মলা দেবী নিঃস্বার্থ ব্যবহারে স্ববৃহৎ পরিবারের

সকলকে স্বধী করে নিজে স্বধী হয়েছিলেন। বাংলার ঘরে ঘরে এই আদর্শ আদরণীয় ও অমূল্যবোধীয়। আমরা তাঁর স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

পুরী বিধবাপ্রশ্রমে স্ত্রীযুত

শ্রীযুক্ত স্ত্রীযুত বহু সম্প্রতি পুরী গিয়েছিলেন। পুরীবাসী পুরুষ ও নারী সমাদরে সন্মিলন করেছেন তাঁকে আন্তরিক ভালবাসার সঙ্গে। তাঁর সময় সখ্যপ, তবুও তিনি সময় দিয়ে পুরীর বসন্তকুমারী বিধবাপ্রশ্রম প্রতিষ্ঠানটি দেখে এসেছেন, এতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। আশ্রমের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অটলকুমার চক্রবর্তী তাঁকে আশ্রম পরিদর্শন করান। সকলের শুভ ইচ্ছা ও সহায়-ভূতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কল্যাণকর। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত স্ত্রীযুতের মত লোক,—দেশের কল্যাণ করাই ধীর জীবনসর্বস্ব পণ, তাঁর সঙ্গে শুভ সংযোগ মহা মূল্যবান।

সাক্ষী স্বর্ণলতা মল্লিক

স্বর্ণীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা মল্লিক বর্তমান বৎসরে স্মার্ট-প্রদত্ত সম্মানজনক

প্রথম শ্রেণীর কাইজার-ই-হিন্দ পদক পেয়েছেন। তাঁর মহাপ্রাণতা, মানব-সেবায় অমুরাগ, তাঁকে এই সম্মানের অধিকারিণী করেছে। হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রাম তাঁর স্বামীর পৈত্রিক বাসভূমি। স্বর্ণীয় মল্লিক মহাশয় গ্রাম খানির সর্বপ্রকার উন্নতির জন্ত জীবনকালে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। পিতার নামে হাঁসপাতাল, মাতার নামে বালিকাবিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয়, নৈশ বিদ্যালয়, ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি স্থাপন, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে পরিচ্ছন্ন পাকা রাস্তাঘাট তৈরী করিয়ে তিনি গ্রামের লোকদের স্বথ স্ববিধার বহুতর ব্যবস্থা করে গেছেন।

তাঁর সাক্ষী পত্নী স্বর্ণলতা দেবী স্বামীর অমূল্য কথাকে সর্বাদ্বন্দ্বের করার জন্ত সিঙ্গুর গ্রামে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার একটি প্রস্তুতি-আগার স্থাপন করে গ্রামবাসী নারীদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। এই সংকায়ের জন্ত আমরা তাঁকে নারীদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দক্ষিণ-ভারত-পথে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

(পূর্বাহ্নরতি)

ধনুস্কোটি

ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর-সঙ্গমে ভারতের শেষ স্থলবিন্দু ধনুস্কোটি রামেশ্বর মন্দির হইতে ১২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সাগরতীর হইতে রামেশ্বরের গোপুলাম বেন গন্ধমাদন পর্বতের মতন দেখায়। রামেশ্বর হইতে নৌকাতে গমন করিলে ধনুস্কোটির মানের কেন্দ্রে বেলা ১০ টার সময় উপনীত হওয়া যায়। রামেশ্বর হইতে ধনুস্কোটি সমুদ্র-কূলের নিকট দিয়া পাল তুলিয়া নৌকায় আসিতে বেশ আরাম

এবং মনোহর। এখানকার সমুদ্রের জল স্বচ্ছ, নীলাশ্রম্য এবং প্রশান্ত। ডুবিলার বা দোলনের ভয় নাই বরং প্রাতঃকালীন সূর্যোদয়ের স্নিগ্ধ দৃশ্য, স্নানীতল বায়ু চিত্তে পরম পুলক আনয়ন করে।

অসীম অনন্ত নীলাশ্রুশাশীর প্রান্ত হইতে যখন অকস্মেৎ ধীরে ধীরে উখিত হইয়া গগনে ও সাগরে তাঁহার ক্রিরণের রক্তিম ছটা বিচ্ছুরণ করেন তখনকার সৌন্দর্য্য নয়নে পরম ভক্তি প্রদান করে। সাগর নীরের আলোড়নের সহিত রাঙা রঙের খেলা এক অপূর্ব দৃশ্য সৃজন করে।

• রবীন্দ্রনাথের কথায় মনে হয় যেন—

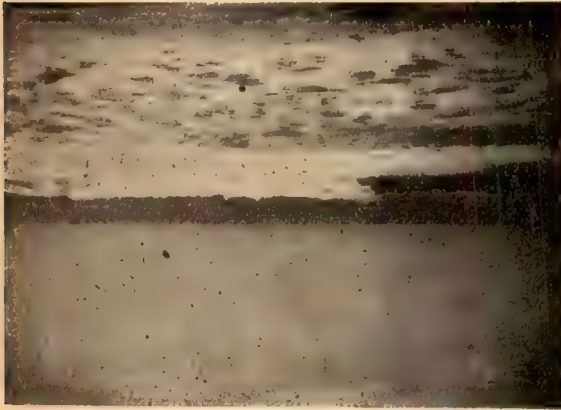
“উন্নত সে অভিসারে

তব বক্ষহারে

ঘন ঘন লাগে দোলা, ছড়ায় অমনি

নক্ষত্রের মণি।”

ধনুস্কোটির মানের স্থানে দাঁড়াইয়া যখন একদিকে দেখিতে লাগিলাম ভারত সাগরের জলরাশীর ভীষণ তাণ্ডব নীলা, ঘোর গর্জন এবং মুহুমুহু তরঙ্গ মালায় রূপ পরিবর্তন, তখন অপর দিকে নয়ন ফিরাইয়া দেখিলাম বঙ্গোপসাগরের অনন্ত অসীম জলরাশী যেন রামের অমুশাসনের মহিমায় ত্রোতা মুগ্ধ হইতে আজও ধীর ও শান্ত। প্রকৃতির এ রহস্যময় নীলা দেখিলে



• ধনুস্কোটি

মানবের ক্ষুদ্রত্ব, জড়ের অসারত্ব উপলব্ধি হয়। ধনুস্কোটির বালুচরে দাঁড়াইয়া যখন দেখিলাম সূর্য্য উদয় মানব জীবন যেন সার্থক হইল, ভক্তিতে সেই জীবনশক্তি প্রদায়ক, বেদের সর্বপূজ্য সবিতা দেবকে যুক্ত করে প্রণাম করিয়া—অর্ঘ্য প্রদান করিলাম—

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কশং কাশ্যপেয়ং মহাত্মতিম্।

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপয়ং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ, ভাস্বতে বিশ্বতেজসে।

জগৎ সবিত্রে স্তব্ধে সবিত্রে কর্মদায়িনে।

ওঁ সূর্য্যায় নমঃ

ভারতের স্ববিগল সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্য্য উপাসনার যে বিধি প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা পরম কল্যাণকর, সৃষ্টির স্থিতি এবং পরিষ্কৃটন সূর্য্যের তেজের উপর নির্ভর করে। ধনুস্কোটির বালুকাময় চড়ায় দিগন্তে অনন্ত অসীম জলরাশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সূর্য্য উদয় দর্শন করিলে পরম পুণ্য ও আনন্দ লাভ হয়।

বর্তমানে রামেশ্বর হইতে ধনুস্কোটি যাইবার রেলপথই সুব্যবস্থা। রামেশ্বর হইতে স্থানীয় গাড়িতে পাশ্চান্ট ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হয়। এখানে ভারত হইতে আগত ধনুস্কোটি এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠিয়া ধনুস্কোটি পায়ারে গন্তব্য শেষ করিতে হয়। সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রায় এক ফারলং জেগে গিয়াছে। তাহারই এক পার্শ্বে ট্রেন দণ্ডায়মান, ট্রেনের যাত্রী ও মাল খালাস হইতেছে। অপর পার্শ্বে সিলোন যাইবার জাহাজে যাত্রী ও মাল বোঝাই হইতে লাগিল। ট্রেনের কামরায় বসিয়া বা জেটিতে পদচারণ করিতে করিতে সাগর পাড়ির আয়োজন দেখা যায়।

অদূরে প্রকৃতির পরম ঐশ্বর্য্যে গৌরবান্বিত লঙ্কাদীপ, তার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই কবিগুরু বাণিকী লঙ্কা সোনার পুরী বলিয়া গাহিয়াছেন। লঙ্কা এখান হইতে মাত্র ৬৪টি মাইল। জাহাজের জেট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ট্রেন ধনুস্কোটির ষ্টেশনে অবস্থান করিল। জনমানব বিরল এই স্থান, আহাধ্য্য অপ্রাপ্য ও অখাদ্য। ট্রেডলার্স বান্ধলোতে বহু বালি ভাঙ্গিয়া যাইতে হয় এবং অতিশয় নিরীলা। সেখানে বসিলে মনে হয়—মানব সমাজ এমন কি পৃথিবী হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ষ্টেশন হইতে ধনুস্কোটির মানের স্থানে তিন মাইল বালুকরাশীর উপর দিয়া গমন করিলে তবে উপনীত হওয়া যায়। সেখানে জুতা পায়ে দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব নহে, পদব্রজে যাওয়া ব্যতীত উপায় নাই।

ক্রমশঃ

ভারতীয় শিল্প-কলা

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়



বক্ষমান প্রবন্ধে প্রফ.
রেয় বুদ্ধমূর্তিটি একটি
শ্রেষ্ঠ রূপস্ফটি।

ভারতীয় শিল্পকলায়
ইতিহাসে জৈন ধর্মের
অবদান সামান্য নহে।
সেই যুগবিশ্বত রসশিল্পা-
গণ যে অতুপম রূপস্ফ-
• প্রস্তর-পিত্তল মূর্তিতে এবং
মন্দিরের সর্বাবয়বে
রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা
দর্শনে আজিও আমাদের
শিল্পরসিক অন্তর নানিত
হইয়া উঠে।

বুদ্ধমূর্তি—মথুরা (প্রস্তর)

নিজদের জ্ঞান শিল্প-
রসের যে অপরূপ স্মৃতি-
জ্বলমা তাঁহারা রাখিয়া
গিয়াছেন তাহারই সৌরভ
দিয়া আমরা আজ তাঁহা-
দের অর্চনা করিতেছি।

আবু পাহাড়ের মন্দির
রের মধ্যে আমাদের মন
শিল্পরসের অমৃত-সাগরে
ডুবিয়া যায়।



আবু পাহাড়ের জৈন-মন্দির



পাণ্ডুপুৰী মন্দির—রাজগী

পাণ্ডুপুৰী মন্দিরের পরিকল্পনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে কোন এক স্বপ্নরাজ্যের ইঙ্গিত ; এই বিশালানন্দ-দেবগৃহ স্বাহারা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের সৌন্দর্য্যবোধ নিশ্চয়ই ইহার উপযুক্ত ছিল ।

রাজগীরের বোঞ্জমূর্তিটির স্নেহকোমল মুখ-
ছবি দেবত্বের মহিমায় উজ্জল।

যে-জাতির মধ্যে শিল্পরস-বোধ এতখানি
জাগ্রত ছিল সে জাতির ইতিহাস কত
মহীয়ান হইবে তাহা বোঝা দুষ্কর নয়।



বোঞ্জমূর্তি—রাজগীর

শ্রীযুক্ত বিজয় সিং নাহার মহাশয়ের সৌজন্যে

যৌগিক

৩রাখাচরণ চক্রবর্তী

দিদির কথাগুলো অতর এমন ভালো লাগে! ওর উৎসাহ হয় এবং ও এগিয়ে বসে। পুঁথিতে পড়া মতগুলো ও মনে করে নিজেদেরই যুক্তিসঙ্গত সত্য বলে! এদেশে রামায়ণের যুগ থেকে এবং সেদেশে খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের কথা বাদ দিলেও খ্রীষ্টর সময় থেকে আজ পর্যন্ত নারীজাতির প্রতি শুধু নারী বলেই সম্মান ভাবে সাপ্রেসন চলে আসছে। উইমেনস্ মুভমেন্টের সমস্ত-পাঠিকা অতলা—ওর মনের প্রতিবাদ নারী-বিদ্বেষী পুরুষটির প্রতি শানিত হয়ে ওঠে।

মাথাটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে জলজলে চোখ তুলে বলে, “মেয়েদের সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা বলেছ তুমি দিদি, যে তারাও মানুষ এবং সেই মানুষ্যত্বের পরিচয় দিতে হবে।……আমরা মানুষের পরিচয় দিতে চাই। হ্যাঁ, তুমি বল।”

অতসী বলে, “অতি, প্রথম কলেজ লাইফের একটা কথা বোধ হয় এখনও তুলে আসনি তুই। সেই যে ব্যায়ামবীর ছোকরা—আমাদের বাড়ীর অপোজিট সেই আমগাছ ওয়ালা বাড়ী”

অতলা ঢেঁকিতে পাড় দেবার ভঙ্গীতে মাথাটা একবার উচু নীচু করে বলে, “মনে পড়েছে, সেই যে ছোটো বারবেল পড়ে থাকত যাদের বাড়ীর সামনের জমিটাতে—না?”

—“হ্যাঁ, আসল নাম মনে পড়ছে না, আমি দিয়েছিলুম তাকে ‘বীরভঙ্গ’ নাম। সেই ছোকরা আমাদের ছজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, ‘বুঁচি টুইন্স’—আমাদের নাক টিয়ে পাখীর ঠোঁটের মত তরতরে নয় বলে।’ মনে হচ্ছে?”

“খুব মনে হচ্ছে” বলতে বলতে হাসি পড়ে ঠোঁটের পাটিতে উপচে—অতলা বলে, “আরো মনে হচ্ছে সেই বীরভঙ্গকে তুমি নাকে দড়ি দিয়ে—”

—“আর তুই বুঝি ঘুরিয়েছিলি—না?”

—“হ্যাঁ, আমরা ছজনই। আর মা তাকে আমাদের

বাড়ীর কানোচে চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার টিয়েপাখীর ঠোঁটের মত তরতরে নাকটাকে তাঁর পায়ের গোড়ার মাটিতে একটু ঘষিয়ে নিয়ে ছেড়ে ছিলেন।”

“হ্যাঁ, যাকে বলে নাকে খৎ দেওয়া।” অতসী হেসে বলে।

অতলা নিষেধের ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, “না দিদি, অতটা বাড়াবাড়ি গ্লান করতে যেয়ো না—আমাদের সম্মানিত অতিথি ত’ বটে?”

অতসী চোখের ভঙ্গী করে বলে, “তুই বোকা। বীরভঙ্গের কথাটা শুধু উপমা স্বরূপ দিলাম। আমাদেরই নীলির দেওর যে দেবনাথ বাবু; তা কি আমি ভুলে গিয়েছি। আমি চাই শুধু—”

অতলা সোজা হ’য়ে বসে বলে, “চাই তাকে জানিয়ে দিতে যে আমরাও মানুষ।”

“হ্যাঁ, তাই তা।” অতসী অতলার পৃষ্ঠপোষকতা করে “তুই যা বলেছিস, তাকে জুনিয়ে দিবি যে মেয়ে-মানুষও মানুষ...। এর ভূমিকা তোকেই নিতে হবে, কিন্তু আমি থাকব সর্বদা তোমার পেছনে পেছনে—ভড়কাসুনি।”

অতসী একটু থেমে যত্নস্বরে বলল, “তুই নারীর মানুষ্যত্বের পরিচয় দিবি।...নারী-বিদ্বেষীকে নারীর স্তাবক করে তুলবি,—নারীর অল্পগ্রহের অস্ত্রে সে যেন প্রার্থীর মত হাত পেতে দাঁড়ায়,—তুই যেন নারীজাতির প্রতিনিধি, প্রতীক! তোমার অল্পকম্পার প্রত্যাশী হয়ে সে যেন তোমার পায়ে পায়ে ফেরে।...

“ফাপী” বলেই অতলা হঠাৎ গভীর হয়ে পড়ে। প্লের পরিকল্পনাটা চমৎকার মজার কিন্তু কার্যত: পার্টটো ভাঙী কঠিন। আর জামাই বাবু কি মনে করবেন যদি জানতে পারেন—সন্ধ্যা করেন?...জামাই বাবুকেই যেন

ওর সব চেয়ে ভয়! অথচ তাঁর কথা দিদিকে ও কি মনে করে বলে না, চুপ করে থাকে।

দিদি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখভাব লক্ষ্য করছে। বলল, ভাবছি! তোর একেবারেই মর্যাদা কারেজ নেই!

অতলা মুহূর্তের অস্থমনস্বতা থেকে মনস্বতায় ফিরে আসতে আসতে বলে, “যথেষ্ট আছে দিদি, কিন্তু আমি ভাবছি, লোকটা শেষে একেবারে ক্ষেপে না ওঠে... আমার শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে. আমার! শেষে বিয়ে করবার জন্তে ক্ষেপে উঠে লোকটা বিভ্রাট না বাধায়, তুমি ত জানো, ওসব বিয়ে টিয়ে কথার একেবারেই ধার ধারিনে আমি বিরক্তিকর।”

অতনী আশ্বাস দিয়ে বলে “কে তোকে তোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে বলছে?...লোকটা ত ক্ষেপে উঠবেই—ক্ষেপে ওঠাই চাই তার! তখনই ত তুই শেষ কথা বলবি, যে, আমি নরবিদ্বেষী, তোমাকে কেন, কোন পুরুষকেই আমি বিয়ে করব না! অহুকম্পার সঙ্গে তোমাকে ক্ষমা করছি,—তুমি যাও।”

অতলার মৌনতা তার সম্মতির সাক্ষ্য দেয়। তার উৎসবের সঙ্গে এসে উত্তেজনা মেশে। পুরুষকে পরাজিত করবার জন্তে নারী-প্রকৃতির মূলে যে একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে, সে ভুল করে মনে করে যে তাই তার মর্যাদা কারেজ।

অতনী বলে, “কোন ভয় নেই, আমি আছি তোর পিছে।”

অতনী সহজ ভাবে ওর নিজের প্রসাধন শেষ করে। চুল আঁচড়িয়ে একটা সাধারণ এলো থোপা বাঁধে। কিন্তু অসাধারণ ভাবে সিন্ধুরে টানে এক অতিকায় সিন্দুরের রেখা—তা একদিকে ওর এয়োতির গৌরবচিহ্ন, অত্নদিকে অতিথির সীমন্ত-স্নাতকের আরজ প্রতীক। ওর সীমন্ত-সিন্দুরে তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাকে আঘাত করুক, আহত করুক।

দেবনাথকে আঘাত করবার একটা হৃদমণীয় স্পৃহা অতনীর চিন্তায় চারিয়ে পড়েছিল। আঘাতের স্পৃহা না বলে একে প্রতি-আঘাতের প্রস্তুতি বলা যেতে পারে, কারণ দেবনাথ শুধু অতনীর সংস্কারে আঘাত করেন নি,

তাদের পারিবারিক স্থিতি-স্থাপকতাকে আহত করেছেন। কাজেই সেও আঘাতকারীকে আঘাত করবে, আহত করবে।

নারী-শক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে অত বড় পণ্ডিত ক্লামেরিয়াকে পর্যন্ত উনি জ্বৈন বলতে সাহসী হলেন। এবং ওর দুঃসাহসিকতা এই যে, ক্লামেরিয়ার ভেতর দিয়ে ঐ অপবাদটা হুকোশলে চাপিয়ে দিলেন এনে তারই স্বামীর ঘাড়—যে হেতু তিনি জ্বীকে ভালোবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। সরল মানুষ অশেষ—তিনি হয়ত বুঝতে পারেননি ওর কথার কারিগরি, কিন্তু অতনীকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয় মোটেই।

তারপর স্বামীর দিক থেকে শত্রুতা ঘুরিয়ে দিলেন উনি সোজা জ্বীর দিকে। একজন মহিলাকে অনায়াস নিলজ্জিতায় উপমিত করলেন ফুলের তোড়ার সঙ্গে—

নিলজ্জিতা শেষে ধুটতার স্পর্শ পায়। স্বামীর সামনে জ্বীকে উনি গিঁথির সিন্দুর মুছে ফেলতে বলেন! আপ্পদা!

তারপর—

ওর বুকের ভেতর শিহরণ জাগে...আরও, আরও ঘেন্না কি আঘাত। অতনী গভীর অহুভবে উপলব্ধি করতে চায় সেই আঘাতের বেদনাকেজুটি কোথায়,—উপলব্ধ হয় না অথচ বেদনাকেও অস্বীকার করা যায় না। কি জানি, মর্মের কোন্ গোপন মর্দঙ্গস্থলে বা!

না,—অস্বীকার করা যায় না। অম্পষ্টতার ভেতরই জ্বম্পষ্ট!...এ আঘাত করেছে আঘাতকারী আরও হুকোশলে, নিঃশব্দতার নিষ্ক্ষেপ—অলক্ষ্য।

...শুধু অতনীই লক্ষ্য করেছে তা...মাহুষের চাওয়া অমন নির্মম তীক্ষ্ণ হতে পারে! অবজ্ঞা বা তিরস্কার কোনটারই পর্যায়ে ফেলা যায় না সেই তীক্ষ্ণতাকে।

কিন্তু—কি, তা? অতনী জানতে চায় না; জানে যে—তা আঘাত।

ও নিশ্চয়ই প্রতি-আঘাত করবে।

করবেই এবং এখনি করতে যাচ্ছে এমনি দৃপ্ত ভঙ্গীতে ও উঠে দাঁড়ায়। মাথার ওপর উঠিয়ে আনে দক্ষিণ করতল—সিঁথির ওপর রাখে।

করতে গিয়ে যেন ওর করতেলো আঁচড় রেগেছে।

অতসী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলে, “অতি, আলমারিটা

এলোপাখাড়ি না ঘেঁটে’ বইটা শুধু খুঁজে’ বার করব না। আমি যাচ্ছি হেঁসেলটা একটু গুছিয়ে আসতে। কলে জল পড়ার শব্দ পাচ্ছি। একটু সকাল সকালই নামব আজ কলতলায়।”

বলে’ বেরিয়ে যায়। অতলা তার দিদির নির্দেশ অনুযায়ী টেনিসনের ‘দি প্রিন্সেস’ খানা খুঁজে বার করছে মেয়েমানুষের মনুষ্যত্ব প্রয়োগ করবার একটা আত্মসজ্জিক কৌশল হিসাবে।

গোটা দালানটাতেই আর রোদ নেই; দালানের রোদ দেয়াল বেয়ে উঠে’ গিয়েছে ছাদের আলিঙ্গার দিকে, দেয়ালের ছায়া এসে পড়েছে দালানে।

কিন্তু দালানের রণা এখনও কি তপ্ত। পায়ের তলায় আঁচ লাগে, যেন ফোসকা পড়বে। অতসী পায়ের তলাটাকে সজ্জিত প্রসারিত করতে করতে আলগোছে পা ফেলে’ ফেলে’ চলল হেঁসেলের দিকে।

হেঁসেলের দিকে কিন্তু হেঁসেলে নয়। লক্ষ্মীনাথ যেমন নিকিয়ে গিয়েছে হেঁসেল তেমনি গুছিয়েও। অগোছালো কিছু থাকে, পরে দেখা যাবে তখন। এখন—

অতসী হেঁসেলের কোণ ঘুরে’ মাঝের ঘর আর নীতিশের ঘরের সীমান্ত রেখায় এসে দাঁড়ায়। ওদিকে দরজাটা বন্ধ; এদিকে একটা জানালার ছিটকিনি খোলা কিন্তু কপাট টেনে দেওয়া।

হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যায় জানালা। কপাটের গায়ে একটু আঙ্গুলের ঠেলা দিলেই সরে’ যায় কপাট-নিশ্চয় ফাঁক হ’য়ে।

ঘন নিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে ভাবে, হাতটাকে কি বাড়িয়ে দেবে? ওর তর্জনীটা আপুনি উত্তত হ’য়ে কাঁপতে থাকে।

ওর আঙ্গুলের আলগা ঠেলা লেগেই হোক; কি বাতাসেই হোক জানালার কপাট ছোটো একটু ফাঁক হ’য়ে গেল।

আরাম-প্রয়াসী অতিথি। আতিথ্যের অপমান করেও অল্পতপ্ত হয়নি নিশ্চয়—নিরঙ্ক-দিবানিদ্ৰা উপভোগ করছে নিশ্চিন্ত আরামে। অতসী মাথাটাকে বাড়িয়ে আনে চোখ দুটিকে তিরস্কারে উজ্জ্বল করে।

মাথার আঁচল শস্ত হ’য়ে সরে’ এসেছে পেছনের দিকে। আঙ্গুল সরে’ ওর সীমান্তের বক্তিম মর্যাদা অমর্যাদা-কাণীর বিশ্রামের ওপর প্রতিচ্ছায়া ফেলুক!...অতসীর সীমান্ত স্বয়ংক্রিয় ভাবেই বুকে’ এসে পড়ে জানালার ফাঁকের মুখে।

বকের ওপর একখানা বই খুলে’ উপুড় করা। এক খানা হাত বিছানার ওপর ফেলা, আর একখানা আড় করে’ তোলা। আঁখানা মুখ ঢেকে কপালের ওপর দিয়ে। মেয়েলি-ডগের মুখের এপাশটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

ঘুমের ঘোরেই হাতটা একটু নড়ে’ উঠল বুবি। চোখের পাতা কাঁপছে নাকি?...চকিত দৃষ্টিতে একটা তীব্র তিরস্কার নিক্ষেপ করেই জানালার মুখ থেকে দ্রুত সরে আসে অতসী নিশ্বাস রোধ করে।

অতলা খুঁজে’ বের করেছে ‘দি প্রিন্সেস’। ডানার চাপে বইখানাকে জাপটে’ ধরে’ আলমারির গা তালি বন্ধ করে’ ফিরে’ দাঁড়ায়।

—“একি দিদি, তোমার মুখ চোখ অমন রাঙা যে।”

“যে গরম বাপু রাইরে।” তারপর—অতসী হাতটাকে একবার মুখে বুলিয়ে করতল মেনে’ ধরে’ বলে, “সিঁদুর পর্বতে তখন বুবি...কি বিচ্ছিরি, দেখ ত?” বলে’ প্রণামের ভঙ্গীতে নামিয়ে আনে মাথা।

দিদির সীমান্তের স্থূল সিঁদুর রেখা অতলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিস্ময়ে বলে, “এত মোটা করে’ টেনেছ দিদি সিঁতি, সাড়ীর লাল পাড়ের মতই।”

অতসী একটু দুর্বোধ্য হাসি হাসে।

কোন প্রকার কৌশলের আশ্রয় নিতে হ’ল না, অতলার মনুষ্যত্ব প্রকাশের প্রথম সুযোগ এনে দিল দৈব। দৈবাৎ একটা বিপরীত শিভ্যালরি’র ভেতর দিয়ে অতলার সঙ্গে দেবনাথের নতুন ক’রে পরিচয় স্ফুটত হ’ল। এ্যাকসিডেন্টের পিঠে চেপে এল ইনসিডেন্ট।

ওরা দু'বোন কলতলা থেকে আসছে উঠে'। অতসী কাপড় বদলিয়েছে কলতলাতেই; অতলা আসছে ভেজা কাপড়ে, হাতে তার নিজের সাবানকাটা সেমিজটা আর দিদির কাপড়খানা, একটা টাবুকিস তোয়ালে বুকের ওপর বেড় দিয়ে জড়ানো।

ওরা উঠে' আসছে; স্নিপার পায়ে দেবনাথ ওদিক থেকে এসে পড়লেন সিঁড়ির মুখোমুখি—সজ্জা ঘুম থেকে উঠে' এসেছেন, চোখের পাতা ভারী ভারী। অতসী লঘু পায়ে ছুঁধাপ পেরিয়ে বারান্দায় উঠে' বোনকে হাতের ইসারা করল—অর্থাৎ, 'পাশ কাটিয়ে উঠে' আয়'।

অতলা পা টিপে' টিপে' উঠে আসছে, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ভেজা কাপড়ের জল গড়িয়ে পড়ছে সিঁড়ির ধাপে—পা স্নিপ না করে। দিদির ইসারায় চোখ তুলে'ই দেখে সামনে দেবনাথ। যে পোষাকে ও' ওপরে উঠছে, ওর লজ্জা হয়। মুখ নীচু করে' একপাশে চেয়ে তাতাতাড়ি উঠে' আসতে লাগল।

করল স্নিপ পা ত...

ওর নয়।

ও' বোধ হয় এমন ভাবে সিঁড়ি থেকে বারান্দায় উঠছিল যে দেবনাথের গায়ে হয়ত' ওর হাতের ভেজা কাপড়ের ছোঁয়া না লেগে যায়নি। অন্ততঃ তেমনি স্মৃতিচারণা প্রয়াসী ভঙ্গীতে দেবনাথ যেন তড়িৎস্পৃষ্টের মত রেলিংয়ের দিকে সুরে' দাঁড়াতে চাইলেন। অমনি দৈবাত—

এমন ভাবে স্নিপারটা স্নিপ করল তাঁর সামনের পায়ে যে, পেছনের পা দিয়ে ভারসমতা রাখবার প্রয়াস প্রতিকূল হয়ে তাঁকে কাত করে' এনে ফেলল ছুঁধাপ নীচের সিঁড়ির রেলিংয়ের ওপর। তারপর—

অতসী চীৎকার করে' উঠল।—“এঁটে ধরুন রেলিংটা শক্ত করে'।”

দেবনাথ বেকায়দায় কিছুতেই রেলিংয়ের কাঠ ধরে' নিজেকে সামলাতে পারছেন না...শরীরের প্রায় অর্দ্ধেক ওপাশে ঝুলে পড়বার মত হয়েছে।...সর্বনাশ! নীচের কলতলায় পড়লে একেরােই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবেন।

মুহূর্ত্ত মাত্র। হাতের কাপড়গুলো রকের 'পরে ছুঁড়ে'

ফেলে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে অতলা এসে হাত বাড়িয়ে দেয় দেবনাথের দিকে।

এ্যা! ও' শুদ্ধ যে পড়ে' যাবে!...অতসী কাপতে কাপতে এগিয়ে আসে, চেষ্টা করে'ও চীৎকার করতে পারে না।

অতলার স্বাস্থ্য কি...এত শক্তি ওর দেহে...!

আপ্রাণ বলে জড়িয়ে ধরেছে অতলা দেবনাথকে। কিন্তু দেবনাথ যেন একবারেই গা ছেড়ে দিয়েছেন,—অর্দ্ধনিম্নীলিত চোখে ভয়বিষম ভাব।

পরক্ষণেই সবেগে সাপুটে' ধরে' অতলা দেবনাথকে রেলিং থেকে ছাড়িয়ে এনে বসিয়ে দিল সিঁড়ির ধাপে।...

অতসীর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। ছুঁদেব থেকে একটা অল্পকূল দৈব। কিন্তু মেয়েটার কি সাহস! ও প্রশংসার চোখে বোনের দিকে চায়। চোখ নামিয়ে আনতেই মুখ গম্ভীর হয়ে পড়ে—অতির তুলনায় ও' কত ভীক।

অতলার মুখে অল্পকম্পার ভাব—কাওয়ার্ড'।

দেবনাথ—!

পতনের লজ্জা আদৌ স্পর্শ করে না তাঁকে। সেও' একটা এ্যাক্সিডেন্ট!—আত্মত্বানের নিষ্ফলিত্তে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আশ্চর্য্য দেহশক্তি; এতবড় বিপদ থেকে তাঁকে এইমাত্র রক্ষা করল, তার প্রতি একটা আন্তরিক প্রীতিবোধ তিনি মনের ভেতর খুঁজে পান না, যে হেতু তা' যেন একটা রবারের সক্রিয়তা যার ভেতর কোন সজীবতার সাড়া নেই।

অতলা যেন দৃষ্টিজয় করে এসেছে! ওকে কেন্দ্র করে এমনি একটা সমারোহ সৃচিত হ'ল সেদিনের সান্ধ্য বৈঠকে।

অতিপ্রশংসার পশলায় অতলা প্রায় ঘর্ম্মসিক্ত হয়ে উঠল। ও শেষে বিরক্ত হয়ে বলে 'জামাইবাবু, অমন করে বসে'...

অশেষ হেসে বলেন “কেমন করে বলব সে আমরাই জানি। কিন্তু এ শুধু আমাদের বলাই; সেকালের দিন

হলে তোমার এই শিভ্যালুরিতে উদ্ধৃত পক্ষ ফিরে দাঁড়িয়ে বলত, আমি তোমারই জন্ত, তুমি আমাকে জয় করছ, এখন বন্দী করে রাখ আজীবনের বন্ধনে...। এখন বিজিত ব্যক্তি হয়ত শুধু 'হুম' খাইয়ে খাপ পরিশোধ করবেন!"

অতলা উঠে দাঁড়িয়েছে। কিছু না বলেই ও পা বাড়িয়েছে স্থান ত্যাগের ভঙ্গীতে।

অশেষ ওর হাত ধরে ফেলেছেন। "শালাও কেন, ঠিক কথা বলিনি আমি?"

অতলা হাত ছাড়িয়ে না নিয়ে মুহূষেরে বলল, "শিভ্যালুরিতে প্রকাশ পায় পুরুষের পৌরুষ"...

দেবনাথের মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বলল, "কাপুরুষতা নয়।"

অশেষ বললেন, "এ নারীশক্তির প্রকাশ...একে আমি শিভ্যালুরিই বলব। ক্লামেরিয়াও এই কথা বলেছেন।"

ক্লামেরিয়ার নামটা যেন দেবনাথকে শুনিয়ে দেবার জগ্গেই বলছেন এমনি ভাবে তাঁর দিকে একটা কটাক্ষ করে বললেন, "সেকালের শিভ্যালুরিতে নারীর দিক থেকে যে বশ্চতার স্বীকৃতি আসত একালেরটায় আসছে তা পুরুষের দিক থেকে। এ যুগধর্ম, লজ্জা করবার কিছু নেই।"

"কিন্তু তর্ক করবার আছে...। বলছি শুধু" বলে বোধ হয় দেবনাথ ভাবতে লাগলেন কি বলবেন।

অতলা জামাই বাবুর পাশ ঘেঁসে বসে—তাঁর হাত ওর হাতে ধরাই আছে।

অতসী একবার চায় ওদের হস্তবন্ধনের দিকে, একবার তর্ককামী দেবনাথের মুখে।...অহুকূল আবহাওয়াটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেন!

দেবনাথ বলেন, "পুরুষরা বশ্চতা স্বীকার করে সৌন্দর্যের কাছে, পুরুষালির হঠকারিতায় নয়। আর মেয়েরা—"

যাক নষ্ট হয়ে অহুকূল আবহাওয়া! অতসী প্রতিবাদ করে বসে, "হঠকারিতা বলতে চান আপনি কাকে?"

—বিপদসঙ্কুল স্থানে ওর অম্মি ভাবে এগিয়ে আসাকে। মাফ করবেন, আমি আপনাকে তুলনা করছি ওর সঙ্গে। কেন, আপনিও তা ছিলেন সেখানে সে সময়, অনায়াসেই

পারতেন এগিয়ে আসতে, আপনারও ত চমৎকার স্বাস্থ্য সুপুষ্টি দেহ—কিন্তু শক্তিকে সংহত করে' চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তখন,—কেন? কারণ?"

অতলার মুখ নীরস্ত হয়ে পড়েছে। কি বলতে চান উনি এমন অপমানজনক ভাবে! কি অকৃতজ্ঞ! অশেষের মুঠির মধ্যে ওর হাত কাঁপে। স্পর্শের সাহসনায় তিনি ওর হাতটা আরও জোরে চেপে ধরেন। ও যেন নির্ভরের মত তাঁর দিকে হেলে পড়ে।

অতসী যেন মুখের প্রচ্ছন্নতা চাপতে চায় দেবনাথের দিকে চেয়ে। তার মনের প্রচ্ছন্ন ভীকৃতার লজ্জা উনি যেন অপগত করে দিচ্ছেন অভিজ্ঞ মনোবিদের মত।

দেবনাথ বলে চলেন, "আপনি হঠকারিতা করতে চান নি। কারণ আপনি নিশ্চয়ই জানতেন যে আমার পৌরুষ যদি ঐ সামান্য বিপদকে এড়িয়ে না আসতে পারে, আপনার হঠকারিতা শুধু বিপদটাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। আমি যদি রেলিংটা ছেড়ে দিতুম বা জড়িয়ে ধরতুম এমনি করে আপনাকে"...

দেবনাথ একবার বাহ প্রসারিত করে নামিয়ে আনেন বুকের দিকে...তর্কের উত্তেজনায় সত্যিই যেন কাকে জড়িয়ে ধরছেন "জড়িয়ে ধরতুম এমনি করে তাহলে পতন শুধু আমারই হ'ত না—দুজনেরই!"

অতসী একটা অহেতুক উত্তেজনা অনুভব করে। অভিনয় দেখতে গিয়ে মাছুষ যেমন্ অকারণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে তেমনি।...ক্রুত কল্পনায় অতলার স্থানে অতসী আপনাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়...কেউ যেন ওকে জড়িয়ে ধরেছেই...রেলিং ভেঙে নিরুপায় বদ্ধতায় দুজনেই যাচ্ছে পড়ে...

অতসীর মাথা ঘুরে ওঠে। ও চেয়ারের হুটি হাতল দুহাতে চেপে ধরে মাথাটাকে ঝুঁকিয়ে আনে বুকের ওপর।

অতলার অপমানবোধ যেন সীমা অতিক্রম করে তার মনকে নয় দেহকেও দিয়েছে—শিথিলতা। অশেষ তার শিথিল দেহভার এক হাতে সামলিয়ে দেবনাথের দিকে অগ্রহাত ভুলে তীব্রতার সঙ্গে বলতে যান কিছু—

সমগ্র পরিস্থিতি অধ্যয়ন করে ফেলেছেন দেবনাথ

মুহুর্তেই। অশেষকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই বলে ওঠেন, “আমার প্রাণদাতাকে সহস্রবার আমি ধন্যবাদ দি। কিন্তু আমার প্রাণের মূল্য এত বেশী নয় যে, উনি এসেছিলেন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে।...একেই আমি হঠকারিতা বলছি, মাফ করবেন।”

...পরিস্থিতির ভারসমতা রক্ষিত হল অশ্চর্য্য ভাবে।

“বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত দেবনাথের যাওয়া হ’ল না—অতসী প্রবল বাধা দিল, আজ তাঁর একেবারেই না বেরুনো উচিত যেহেতু যে দুটি ল্যাঠা ঘটতে যাচ্ছিল আজই।...

থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি হলে সেদিন নাকি কি একটা সভা ছিল, সেখানে কার সঙ্গে দেবনাথের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা ছিল। সভা অবশ্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সাতটায়, যাক—নাহি বা গেটলন, আর যেতে যেতেই হয়ত সভা ভঙ্গ হয়ে যাবে। বিশেষতঃ মিসেস রায় যখন অত করে বাধা দিচ্ছেন, কাজ নেই বাধা ঠেলে গিয়ে।

যাওয়া স্থগিত করে দেবনাথ বললেন “বেরুলুম না শুধু আপনায় জট্টাই, যেমন বৌদির জন্তে সেখানে আটক থাকতে হয় আমাকে অকারণই এক একদিন ঘরে।”

বলে দেবনাথ একটু হেসে বললেন “বৌদির মতই আপনি আমাকে ভালোবাসেন—ই্যা বৌদির মতই।”

নব পরিচয়ের ভেতর যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব থাকে, অতসীর সেই বাধো-বাধো ভাব এই আত্মীয় সম্পর্কের স্নেহ সঙ্কেত নিয়ে যেন একেবারেই কেটে যেতে চায়। ওর নিজের বৌদির মতই।

অতসী মুহূ হেসে বলল, নীলি আমার নিজের বোনের মত—ছেলেবেলা থেকেই আমরা দুজন ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলাম। আমি আপনাকে—

—“বৌদি হলে আমাকে ‘আপনাকে’ না বলে বলত তোমাকে।”

বৌদিকে দেবনাথ ‘তুমি’ বলেই সম্বোধন করেন... অতসীর মনে একটা সংস্কারের সঙ্কোচ এসে তর্জ্জনী তুলে দাঁড়ায়।

সত্যিকার সম্পর্ক এবং পাতানো সম্পর্কের সেখানে

একটা ব্যাধান রেখাপাত করে তর্জ্জনী না—না, তাকি হয়।

অতসী গম্ভীর হাসিতে বলে, “মাফ করবেন, সম্পর্কটো মুখের ডাকে নাহি বা নামিয়ে আনা হ’ল, তবে,—”

মনে মনে দেবনাথের পাশে অতলাকে এমন দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে, “তবে যদি সম্পর্কটা আরও নিকটে এসে দাঁড়ায় কখনও, দেখা যাবে তখন।...আমি বলছিলাম—”

দেবনাথ কথা দিয়ে হাসিকে ঢেকে বলে, “সম্পর্কটা কি এখনো নিকটে এসে দাঁড়ায় নি?”

“এর উত্তর আমার বোনের মুখ দিয়ে পাবেন! বলে” অতসী একপ্রকার অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

দেবনাথ দ্বুর্ভূতে পারেন না—কোনটি বাচ্যার্থ আর কোনটি বা ব্যঙ্গার্থ। তিনি অতসীর মুখের দিকে অর্থ-ভেদের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

অতসী চোখ নামিয়ে বলে, “আমি বলছিলাম, কমপ্লিট রেজ্ট্র নিতে এখন ঘরে গিয়ে। যে জার্কটা পেয়েছে আপনায় দেহ...অস্থখ করতে পারে।”

“সত্যি একটু টায়ার্ডনেস ফিল্ করছি।” বলে দেবনাথ তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে চলে যান।

লক্ষ্মীনাথ উল্লন ধরিয়েছে কতক্ষণ, কয়লা জলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অতসী অতিক্রমে ডেকে নিয়ে হৈসেলে যাবে।

অশেষ টেবলের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসেছেন; ফাউন্টেন পেনটি ব্লটিংপ্যাডের ওপর কাত করা, রাইটিং প্যাডটি টেনে নেন নি।

“অতি” বলে অতসী ঘরে গিয়ে ঢোকে। “নেই ত,—কোথায় গেল! ও, ওদিকে দোরগোড়ার-বাইরে বসে আছে দেওয়াল ঠেসান দিয়ে, দেখা যাচ্ছিল না।

অতসী এগিয়ে আসতে আসতে বলে, “একি! অমন করে বসে আছিস-চুপচাপ”...

অতলা মুখ তুলে চায় নিস্পৃহ ভাবে, কথা বলে না।

—“আচ্ছা, তুমি থাক—যে ব্যক্তি গেছে তখন সেই

এ্যাকাসডেটের মুখে। আমি একলাই যাচ্ছি হেঁসেলে।

তুই থাক...লক্ষ্মীনাথকে দিয়েই আমার হবে।”

অতসী পা তুলেই আবার পা ফেলে ফিরে দাঁড়ায়।

“দেখ”—অশেষ মুখ তোলেন।

—“ওকে ডেকে ভেতরে আসতে বল না।

একটুতেই ও’ অমনি মুড়ে পড়ে।”

অশেষ ঘাড় বাড়িয়ে অতলাকে দেখতে চেষ্টা করেন।

“অতি,” বলে ডাক দিতে যাচ্ছেন, অতসী—আগে হেসে

পরে বলে, “দেখ,” নীলি’র দেওর আমাকে ‘বৌদি’ বলে

ডেকেছে,—শুন্ছ?”

অশেষ আগে বলে’ পরে হাসতে চেষ্টা করেন:

“বেশ ত’...”

“আমি যাচ্ছি হেঁসেলে।”—অতসী লঘু পায়ে বেরিয়ে

যায়।

না ডাকতেই অতলা উঠে’ ঘরে আসে। বাইরে কেমন

বিস্তী বাতাসের ঝাপটা আসছে!

ঝাপটা এসে পড়ল ঘরেও।

খোলা জানালা দিয়ে একটা ঝাপছাড়া বাতাসের ধাক্কা

এসে টেবলে। উপরকার হালকা কাগজ চাপাটি উলটিয়ে

ফেলে’ দিল কতকগুলো কি কাগজ পতর, কর্কর করে’

শব্দ হ’ল কাগজ গড়বার।

“আহা হা! অশেষ হাত বাড়ালেন, হাত এড়িয়ে

গেল সেগুলো।

ক্লিপআপ করা কয়েকখানা কিসের স্লিপ—ছড়িয়ে পড়েনি

ভাগিস্। অতলা উবু হ’য়ে মেঝে থেকে স্লিপ ক’খানা

উঠিয়ে নিয়ে ক্লিপটা আরো ভালো করে’ আঁটতে আঁটতে

এগিয়ে আসে টেবলের দিকে। চেয়ার ধরে পেছন থেকে

বেড় দিয়ে পেরিয়ে একহাতে রাখে কাগজগুলো টেবলে,

অপর হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে’ দিতে যায় জানালার সাদি।

“এক হাতে পারা যায় নাকি?” বলে’ অশেষ তাঁর

হাতটি বাড়িয়ে দেন। ওর বাঁ হাত, ওর ডান হাত—

দু’হাতে বন্ধ হ’য়ে যায় সাদি।

—দুজনার দুটি হাত মিলে, যেন একটি মানুষের

হাতের সম্পূর্ণতা লাভ করল।...অশেষের কল্পনাশীল মনে

এই পরিকল্পনাটি যেন অজ্ঞাতেই ছায়াপাত করে।

এই পরিকল্পনার মূলে তাঁর মগ্নমনের কোন ইঙ্গিত

নিহিত, মনে মনে ধরতে চেষ্টা করেন। সাময়িক ভাবে

একটু অনমনস্ক হ’য়ে পড়েন তিনি।

অতলার প্রত্যাশা আহত হয়। উপকারটা সামান্য

হ’লেও কিছু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল জামাই

বাবুর—অন্ততঃ একটা মৌখিক ধন্যবাদও।

খানিক চুপ করে’ থেকে ও’ আপনাপন বলে,

“নীতীশটা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে তার ঘরে। পড়ার

শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বড্ড ফাঁকি দিচ্ছে আজকাল।

দেখি ত’ গিয়ে...”

অনমনস্কতা কেটে অশেষ ওর মুখের দিকে চান—

অতলা তাঁর দিকে চেয়ে নেই, যদিও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

আছে।

বল্লেন, “তোমার ভুল ধারণা যে নীতীশ ঘুমিয়েছে।

ওদিকে যখন ওর বড়দি আছে, সাধ্য কি ও’ পড়ার ফাঁকি

দেয়।”

উত্তরে ও’ কি বলতে যাচ্ছিল, না বলে’ হঠাৎ দোরের

দিকে মোড় ফিরে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায় দোরের মুখে।

বুকে এসে লাগে বাতাসের ঝাপটা—মুখে এসে পড়ে

বৃষ্টির ছাঁট। এঃ, বাইরেটা একেবারে কালো হ’য়ে

পড়ছে...

পরমুহূর্তেই প্রবল বৃষ্টিপাতের শব্দ...ঘরের মেঝের

অর্ধেকটায় পর্যন্ত বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে ঘরমুখো

বাতাসে।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে অশেষ বলেন, “হঠাৎ এমন

করে’ এল ঝড় বৃষ্টি। হেঁসেলে ওরা সব—”

“যাচ্ছি” বলে’ অতলা এগুতে চায়—পিছিয়ে আসে।

তার সামনের দিকটা একেবারেই ভিজে’ গিয়েছে...কি

বাতাস!

অশেষেরও ভিজতে বাকী নেই। “বন্ধ করে’ দাও

দোর।—তিনি যেন নিজকেই নিজের আদেশ করলেন

এবং ভিজে’ চুপসে’ কোনপ্রকারে বন্ধ করে’ দিলেন দোর।

কম বেশী নেই, দুজনই সমান ভিজে’ উঠেছেন।

অশেষের কল্পনা এবার অভলার মুখে ভাষা পায় : “আমরা ছুজন যেন একটা নদী সঁতারে এসে কুলে উঠেছি !...”

বলে’ ও’ মুখ তুলে’ চেয়ে হাসে।

অতি’টা এল ভালেই হ’ত ; লক্ষ্মীনাথ কি যোগাড় দিতে পারে ? বাটনা কোটনা সবই পারবে, কিন্তু ঐ যে অতলী আজ ওর রান্নার চাটে ধরে’ রেখেছে ওরই উদ্ভাবিত বিশেষ একটা জিনিষের পাক,—উদ্ভাবনা ওর নিঞ্জের হলেও তার তাক্কাটিক ওর দ্বারা তেমন হয় না যেমন হয় অতি’কে দিয়ে। যাক্, তা’ত এমন বিশেষ কিছু এসে যাবে না।

মাঝের ঘরখানা থেকে উজ্জল আলোর খানিকটা বলক দরজার সামনের দালানের কতকটায় অন্ধবৃত্তাকারে পড়েছে। আলোকের সীমানা ইচ্ছে ক’রেই এড়িয়ে ও’ দালানের এখার ঘেসে চলে। কিন্তু ওর দৃষ্টি চলে আলোক রেখার পথ ধরে একেবারে ঘরের মাঝামাঝি।

ভালো লোককে রেখে নিতে পাঠিয়েছে ও’ ; কি সব কাগজ-পত্ৰ যাঁচাযাঁচি করছেন বিছানার ওপর। এ্যাটাচিকেস্ খুলে রেখে সন্মোদী। ব্যাচিলার মালুম হ’লেও বিষয়কর্মের দিকে বেশ খরদৃষ্টিই আছে বোঝা যাচ্ছে।... অথবা হয়ত ওঁর বিদেশী বন্ধুদের চিঠিপত্ৰ যাঁচিছেন।

কিন্তু সর্বতোভাবেই রেখে নেওয়া উচিত ছিল ওঁর। —ডেকে বসবে ? নাঃ।

অতলীর চলা একবার অচল হ’য়েই আবার ওঁ’র সচল হ’য়ে।

—“একি, এত কাঁচা লক্ষা কুচিয়ে রেখেছিস, লক্ষ্মী ! কি বলি আর ক য়ে করিস্।”

লক্ষ্মীনাথ সপ্রতিভ ভাবে বলে, “কেন, ছোটদিমনি যে বললেন তখন, বেশী করে’ লক্ষা কুচিয়ে রাখতে ?”

“কক্ষণো না, শুনতে তুল করেছিস।” ধমকের স্বরটাকে আবার মোলায়েম করে’ এনে বলে, “তা হোক্, নষ্ট হ’য়ে যাবে না আর, কাল সকালেই ওগুলো চলে’ যাবে। এক কাজ কর্ লক্ষ্মী, ঐ পেতলের ডেক্‌চিতে করে’ এক ডেক্‌চি জল চাপিয়ে দে উত্থনে আগে। তারপর যা’ বলি—”

লক্ষ্মীনাথ আদেশ পালনে রত হয়।

• একটা মেটে হাড়ী’র ওপর একটা তরকারির চ্যাঙারি’ তার ওপর একখানা উপুড় করা কুলো—চ্যাঙারির ঢাকনির কাজ করছে। দেয়ালের চৌকা জানালার ফুকোর দিয়ে আচম্কা এক বাতাসের বাটকা ঢুকে’ সশব্দে উলটিয়ে ফেলে’ দেয় কুলোটাকে অতলীর পিঠের ওপর।—ও’ চমকিয়ে উঠেছিল আর কি !

• কুলোটাকে উঠিয়ে রাখছে, জানালা দিয়ে চেপে পড়ে নীতীশের ঘরে। ওঃ, তাইত শোনা যাচ্ছে না ছোকরার পড়ার শব্দ... ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ পরের উইকেই ওর নাকি কোয়াটার্লি স্বপ্ন হ’চ্ছে ?

“নীতুবাবু ঘুমোচ্ছে পড়ে’ পড়ে’, বলিসনি ত’ ?” বলে ও’ বেরিয়ে যায় তাকে ডেকে উঠিয়ে দিতে। ধাক্কা দিয়ে না তুললে ওর ঘুম ত’ আর সহজে ভাঙবে না।

বলে, “তুই জলটা উঠিয়ে দে ততক্ষণ।” যেতে যেতে হাতের কজী উলটিয়ে।

নীতীশের ঘরের দরজায় পা দিতে না দিতে অতলীর গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাতাসের বেগে বড় বড় বৃষ্টির ফোটা। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে বাম্ বাম্ করে’ বেজে ওঠে প্রবল বর্ষণের শব্দ।

মুহূর্তের বিমূঢ়তা কাটিয়ে তখনই ও’ তাড়াতাড়ি ছ’হাতে চেপে দরজা বন্ধ করে’ দেয়।

ছ’ঘরের মাঝামাঝি দরজাটি খোলা। ও ঘরের আলোকধারায়—ও ঘরে—

বৃষ্টি যেন দেয়াল ফুঁড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। আলোক পড়ে ঝিম্‌ঝিম্‌ জলের সরীসৃপ চিক্‌চিক্‌ করছে ঘরের মেঝেতে।

বৃষ্টি—তার সঙ্গে বাতাস। কাজের তাড়া আর এ্যাটাচিকেস্ নিয়ে বিব্রত দেবনাথ। এ্যাটাচিকেস্‌টা বালিস চাপা দিয়ে রেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ় ভাবে উঠে দাঁড়াবার ভূমিকায় উঠু হ’য়ে উঠেছেন।

“সব যে ভিজ্’ গেল ! টেঁচিয়ে বলতে বলতে অতলী ছুটে আসে মাঝদরজা পেরিয়ে ও ঘরের আলগা দরজাটা বন্ধ করে’ দিতে।

দেবনাথ নেমে দাঁড়িয়েছেন মেঝেয়। তাঁর গায়ের

ওপর দিয়ে ওর আঁচলের আভাস দেখা যায়। দেবনাথ যেন স্বপ্ন দেখছেন...উনি! এমনভাবে?...বাইরের আবহাওয়াটাই যেন মুগ্ধি ধরে' ঘরে এসে চুকেছে...

অতসী দরজার কপাট ছটিকে ছুহাতে টেনে ছিটকিনির মুখ চেপে ধরেছে চৌকাঠের খাঁজে, কিন্তু ব্যস্ততার আতিশয্যে ঠিক বসাতে পারছে না স্থায়ী ঘরে। কাত হ'য়ে দরজার ওপর দেহভার রেখে কোন প্রকারে ছিটকিনিটাকে ঠিকমত পরিণে দেয়।

ছিটকিনি পরিণে শরীরটাকে ফিরিয়ে এনেছে সে সাগনের দিকে,—ঘরের মেঝে যেন ঘাটের রপার মত পিছল হ'য়ে পড়েছে—অতর্কিতে পিছলে গেল ওর বাড়ানো পা'টা...

মনে একবার দ্রুত বিভ্রান্তি এসে মিলিয়ে যায়; ও' যেন সিঁড়ির ধাপে গড়িয়ে পড়েছে—স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতল প্রসারিত হয়েছে—চোখ দুটো বুজে এসেছে ভয়ে! ওর প্রসারিত করতল প্রতিহত হ'ল না কঠিন সানে, দেবনাথ পাশ থেকে এসে ওকে ধরে' ফেলেছেন—ওর হ'হাত ছদিক থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ে দেবনাথেরই দেহের 'পরে।

ও যেন প্রকৃতই শানের ওপর আছড়ে পড়েছে, শুধু আশ্চর্য্য ভাবে এড়িয়ে গিয়েছে কেমন করে' কঠিন আঘাত।... আশ্চর্য্য ত'!

এক মুহূর্ত। তন্মুহূর্তেই ও মুখ তুলে চায়—

দেবনাথ!...দেবনাথ ওর পতন নিবারণ করেছেন আকস্মিক অলক্ষ্যতায়—ও একটুও আঘাত পায়নি, আহত হয় নি।

তাইত'...সিঁড়ির ধাপে নয়, ঘরের মেঝেয়!...

হঠাৎ ওর চেতনা হয়, ও যেন ওঁর দেহের ওপর সংলিপ্ততর হয়ে পড়েছে...একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি জাগে ওর দেহে। ও নিজের আশ্রয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চায়।

কিন্তু পতন যেন তখনও নিবারণিত হয়নি। ওর বুকের মধ্যে কম্পন জাগে। উর্দ্ধ দৃষ্টিতে দেখে, দেবনাথের ঠোঁটে একটুকরা অদ্ভুত হাসি কাচের টুকরার মত ভেঙে পড়েছে।

অতসীর বুকের কাঁপন ওর সমস্ত দেহে চারিয়ে পড়ে চকিতে।

একটা অস্বাভাবিক দুর্বলতা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়... ও যেন এখনই মুচ্ছিত হয়ে পড়বে। দৃষ্টি ওর উন্মিলিত কিন্তু নিলক্ষ্য।

বিদ্রোহের দ্রুততায় একটা তীব্র চেতনার বেদনা মুহূর্তেই ওর সমস্ত দুর্বলতাকে কাটিয়ে দেয়। বিদ্রোহ-শিখার মতই ও আপন শক্তিতে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।...দেবনাথকে ও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল যেন।

দেবনাথ ছিটকে গিয়ে খাটের ধার ধরে' স্থির হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, “ভাগ্যে আপনি পড়ে' যাননি বৌদি’...কিন্তু হঠাৎ এমন বাদল এলো কি করে!”

অতসীর দৃষ্টির তীব্রতা ধীরে ধীরে কোমল হ'য়ে আসতে থাকে। ওঁর কি দোষ!...কণ্ঠস্বরে কিন্তু স্পষ্টই তীব্রতা ফুটে ওঠে! “কিন্তু—আমি আপনাকে ধরে' ঠেকাতে বলিনি ত'।”

—“আমার নিজের বৌদি হ'লেও আমি এমনি ধরে' ঠেকাতুম।”

নারীপ্রাণের কোমলতা অতসীর মুখে চোখে ফুটে ওঠে। মুহূর্তেই বলে, “কিন্তু আপনি এমন ছেলেমানুষ যে, বিষ্টিতে ঘর ভিজে' যাচ্ছে—অথচ উঠে' দোরটা বন্ধ করে' দিতে পারেন না?”

বলেই অতসী এগিয়ে যায় মাঝদরজার দিকে। জু'পা এগিয়েই আবার পিছিয়ে ফিরে' দাঁড়ায়।—“দেখুন, এমন কেয়ারলেসলি পা স্লিপ করবার কথা শুন্লে সবাই হাসবে। আপনি বলবেন না কারকে।”

অতসীর কথার সুরে অনুনয় ও আদেশ দুইই আছে।

দেবনাথ গম্ভীর ভাবে বলেন, “আমি কখনোই আপনার উপহাসের কারণ হব না।

অতসী নীতীশের ঘরে চুকে ভেতর থেকে দরজাটায় হড়কো পরিণে দেয়।

আপনা আপনি বলে, “আজ কি সবারই পা স্লিপ করবার পালা পড়েছে!”

বঙ্গ-সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর দান

• শ্রীমতী ঘোষ এম-এ

ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। গল্প ক্ষুদ্রাবয়ব; সুতরাং উপন্যাসে যে চরিত্র চিত্রণ ও মনোজগতের ভাব বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে ছোট গল্পে তাহা নাই। 'লিরিক' কবিতা যেমন ভাবপ্রধান, ছোট গল্প তেমনি ঘটনাপ্রধান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার চরিত্রগুলি বিকাশ লাভ করে। ঘটনাপ্রধান হওয়ায় গল্পের সমাপ্তিতে ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং অনেক সময় উপসংহারে একটি অপ্রত্যাশিত অংশের সাফাৎ মেলে।

মৌলিক গল্প রচনার ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর পূর্বে বড় বেশী কেহ হাত দেন নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে অগত্যা হস্তের নিদর্শন মেলে না, বরঞ্চ পাই সবল হস্তের ছাপ; তাঁহার গল্পে বেশ একটি কল্পনার প্রসার আছে, বলিষ্ঠ মননশক্তির পরিচয় আছে, আর আছে নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে সৃষ্টি কার্যে যাহারা প্রথমে অগ্রসর হন, নব নব সৃষ্টির রসে তাহাদিগকে পাইয়া বসে। এই আনন্দের নর্তন শিল্পীর শিরায় শিরায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; শিল্পী তখন নিজেকে ভুলিয়া যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী কখনও কখনও আনন্দের এই আবর্তে পড়িলেও, তাঁহার অপূর্ব সংযম তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে। এই কারণেই তাঁহার গল্পগুলি অপাঠ্য না হইয়া রসসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বর্ণকুমারীর গল্প দুই প্রকার, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক; ঐতিহাসিক গল্পের মধ্যে গল্প বলিবার ক্ষমতা এবং বর্ণনাশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ক্ষত্রিয়ের অশ্ব, স্ত্রী ও তরবার প্রবিষয়ে প্রাণধানযোগ্য। সামাজিক গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে অপ্রত্যাশিত ঘটনার দ্বারা তাহাদের উপসংহার করা হইয়াছে। 'প্রতিশোধ' 'চাবী চুরি' গল্পগুলির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে।

তাঁহার প্রেমের গল্পের মধ্যে একটি অপূর্ব সংযম আছে। ভাবপ্রবণতার আতিশয্য নাই, আছে একটি সতেজতা। 'হাসি'

এই দলের মধ্যে একটি চমৎকার গল্প। 'পন প্রীতি'ও এই দলেই পড়ে; ইহার সরলতায় সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রবন্ধ : যে স্বল্প কয়টি প্রবন্ধ স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি এবং বৈদ্যের পরিচয় পাই। ইহার মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উল্লেখযোগ্য। ইহাতে তাঁহার কাব্য-সাহিত্যের বিচার করিয়াছেন। 'সাহিত্য-জ্যোত' এই কারণেই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছিল।

কাব্য-সাহিত্য : স্বর্ণকুমারী দেবী যে-সময় কাব্য-সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন, তাহা ছিল প্রশান্তির যুগ। সমাজ বিপ্লব বা রাষ্ট্রতন্ত্রের বিপ্লব তখন মানুষের নিশ্চিত আশ্রয়টির ভিত্তি টলাইয়া দেয় নাই; এ যুগের দারিদ্র্যের করাল ছায়া, বাঁচিবার জন্ত প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম, বস্তুতাত্ত্বিকতার প্রবল চেটে সে যুগের কবিকে এমন ভাবে বিচলিত করে নাই; সে যুগের কবি নিদাঘের পল্লবছায়ায় বসিয়া বা মেঘমেঘের অন্ধরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া বাঁশী বাজাইতেন আর সেই সরল সুরটি দূরদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়া মানুষকে তৃপ্তি দিত। স্বর্ণকুমারী সেই যুগের কবি, তাই তাঁহার কাব্যে পাই প্রচুর প্রশান্তি এবং সরলতা, বাহা আমাদের বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিয়া না দিলেও মনকে আনন্দ দেয়। স্বর্ণকুমারীর বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে মানসিক এই গভীর শান্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া কাব্যে রূপ লইয়াছে।

কোন কবিতা উচ্চদরের হইতে হইলে তাহাতে সাধারণতঃ এই তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন : চিত্র, গীত এবং ভাবধর্ম। অবশ্য ইহার মধ্যে একটি প্রধান হইয়া দাঁড়াইবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু ইহার একটির অভাবে কাব্যের সৌন্দর্য যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়। একমাত্র গীতকর্মী হওয়ায় জয়দেবের কাব্য খুব উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, আবার গীতধর্ম যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় বিহারীলালের কবিতাও ততোধিক উচ্চাঙ্গের হয় নাই। স্বর্ণকুমারী দেবীর কাব্য গীতধর্মী; তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা হৃদয়ের রসে সঞ্জীবিত করিয়া আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া

বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে এই তিনটি যেমন :—

গুণের সমাবেশ অরবিস্তর দেখা যায়, ... যেমন—

শীতল শান্ত বেলী

শাল শ্রামল নদী সৈকতে অশ্বর মেঘ মেলা,

পাখি আমি অতিশ্রান্ত, একেলা বড় একেলা... ইত্যাদি।

অথবা,

ও আমার সূর্য্যমুখী

ও গো কুমুমরাণী,

শুধাই তোরে চুপে চুপে গোপন একটি বাণী।

এমন তোমার রূপের ঘটা!

এমন বর্ণ এমন ছটা!

লুকাও তুমি কিসের তরে মধুর গন্ধখানি?... ইত্যাদি।

(কবিতা পারিজাতহার)

অথবা,

সে ভুলেছে, আমি কেমনে ভুলি!

নূতন বসন্তে নূতন হাওয়া,

মধুর নয়নে মধুর চাওয়া,

ফুল ভুলে চুলে পরাইয়া দেওয়া,

থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়া বুলি—

হায় সে ভুলেছে, আমি কেমনে ভুলি! (মধ্যাহ্ন সঙ্গীত)

... ইত্যাদি।

অথবা,

হায়রে, হোল না ত মালা গাঁথা।

সারা বেলা ফুল তুলে

গাঁথব বলে এলু ফুলে

কে জানে গো কেমন ভুলে

ভাবতে ভাবতে কাহার কথা।

আঁচল খ'সে ফুলরাশি

শ্রোতের জলে গেছে ভাসি

মুছে আঁখি চমকে দেখি

কোলে পড়ে খালি হুতা... ইত্যাদি।

(সঙ্গীত শতক)

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রণয় কবিতাগুলি রসমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ :

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী

সে শুধু গো যদি আসিত।

পরানে এমন আকুল পিয়াসা

যদি সে শুধু গো ভালবাসিত! ইত্যাদি।

(সঙ্গীত শতক)

অথবা,

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা

জীবন ফুরায়ে এল আঁখিজল ফুরাল না... (সঙ্গীত শতক)

স্বর্ণকুমারী দেবীর বহু গানের সহিত অনেকেরই পরিচয়

আছে। আমরা আর সংখ্যা না বাড়াইয়া তাঁহার একটি সর্গ

জনবিদিত রামপ্রসাদী চণ্ডের গানের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

মা বলে আর ডাকবো না মা!

নাম রেখেছি পাষাণ মেয়ে!... ইত্যাদি।

তাঁহার রচিত গানগুলি এত মধুর হইবার কারণ যে তিনি
ছিলেন নিজে সঙ্গীতজ্ঞ।

বঙ্গ-সাহিত্যে গাথাকাব্য স্বর্ণকুমারী দেবীর অন্ত্যতম শ্রেষ্ঠ
দান। তাঁহার পূর্বে কেহ গাথাকাব্য রচনা করেন নাই, তিনিই
প্রথম। সাধু সম্প্রদান, সাধের ভাসান, খড়্গ পরিণয়,
অভাগিনী এই চারিটি ক্ষুদ্র গাথায় পুস্তকের সৃষ্টি। খড়্গ
পরিণয় গাথাটি রাজপুতকাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই
গাথাগুলিতে কবির গল্প বলিবার কৌশল, বর্ণনাত্মক, মানব
মনের নিভৃত কন্দরের সুখ বেদনা সুন্দর ভাবে সরল ছন্দে
মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি গাথাই বিরোগার
ইহার বিষাদময় চিত্র আমাদের মনে বেদনা জাগাইয়া তোলে।
গাথা কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে Sunday Mirror বলেন

This little book of poetical tales is
novelty in Bengali literature and a
novelty the charm of which challenge our
sincere admiration. The poetry is the
poetry of genuine heart-felt pathos—
powerful for its sublimity and affect-
ing for its tenderness. There is not a
word or image in the 'Gathas' to disturb

the placid tenor of sacred melancholy that pervades it, nor an idea or conception to break our dream of soft communion with something holy and far removed from earth. (Sept., 11, 1881)

স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতা এবং গান যথেষ্ট আছে এবং ইহার অধিকাংশই মধুর। ইহার মধ্যে তাঁহার শব্দ চাতুর্য্য এবং অল্প কথায় ভাবের প্রকাশ এবং চিত্র অঙ্কনের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাঁহার কবিতার ও গানের কথা পথে চলিয়া পাঠক ক্লান্তি বোধ করিলে ছায়াশীতল বেণুকুঞ্জের সাক্ষাৎ পায় এবং পথের শেষে একটি সুখপূর্ণ বিশ্রাম স্থান পাইয়া আনন্দ লাভ করে।

নাট্যসাহিত্য : স্বর্ণকুমারী দেবীর নাট্য রচনাগুলির অধিকাংশই গীতিনাট্য বা অপেরা এবং প্রহসন জাতীয়। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। বাংলা সাহিত্যের আসরে তখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত নাট্যরসিক তাঁহাদের নাট্যসাহিত্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশই পঞ্চাঙ্ক বৃহৎ নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। ইহার দ্বারা আমি একথা বলিতে চাই না যে বাংলা সাহিত্যে তখন পর্য্যন্ত গীতিনাট্য বা প্রহসন রচিত হয় নাই; তাহা অপরিণাপ্ত পরিমানেই হইয়াছে। আমি শুধু বলিতে চাই নাটক যেমন তখন পরিণতির দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে প্রহসন বা গীতিনাট্য তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। যদিও তখন রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অতুল মিত্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকগণ প্রহসন বা গীতিনাট্য রচনা করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু যে কোন স্বল্পদৃষ্টি-সম্পন্ন সমালোচক একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের অধিকাংশ রচনাই নাট্যশ্রোতের বাঁধা খাতে চলিয়া প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাদের প্রহসন তাৎকালিক জনসাধারণের রুচির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হইয়া অধিকাংশ স্থলেই কুরুচিপূর্ণ এবং দোষভূত হইয়াছে। ইহা সত্য কথা বটে যে নাটক, গীতিনাট্য বা প্রহসন রচনা করিবার সময় পারিপার্শ্বিকের উপর যথেষ্ট পরিমানে দৃষ্টি রাখিতে হয়, লক্ষ্য রাখিতে হয় তাৎকালিক দর্শকবৃন্দের রুচির উপর; স্বীকার করি এ কথা সত্য যে Drama is the art of expressing ideas

about life in such a manner as to fender that expression capable of interpretation by actors and likely to interest an audience assembled to hear the words and witness the actors. (Nichol: Theory of Drama P. 38)

কিন্তু ইহাই যদি একমাত্র মাপকাঠি হয় তাহা হইলে যে কোন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের সহিত যে কোন তৃতীয় শ্রেণীর নাট্যকারের কোন পার্থক্যই থাকে না। আসল কথা, ইহার উপর নাট্যকারের নিজস্ব শক্তি আছে, একটা প্রতিভা আছে যাহা তাহার আসনের পার্থক্য করিয়া দেয়।

‘বসন্ত উৎসব’ তাঁহার প্রথম গীতি-নাট্য। রাধা কৃষ্ণের প্রণয় লীলা লইয়া রচিত; গতানুগতিক পথে না চলিয়া তিনি একটু তির্যক গতি অবলম্বন করিয়া কল্পনার রম্য বিকাশে, সঙ্গীতের ভাব মাধুর্য্যে আপনার গীতিকাব্যখানি উদ্ভাসিত করিয়াছেন। গীতিনাট্যের গীতই প্রধান কিন্তু ইহার তলে যে সুন্দর গল্পধারা রহিয়াছে তাহা এই :—শোভা এবং লীলা দুই সখী এবং তাহাদের প্রণয়ী কুমার ও কিরণ; কিন্তু কিরণ লীলাকে ভালবাসে না এই কারণে শোভা এবং লীলা যোগমায়ার মন্দিরে গমন করে। সেখানে উদাসিনীর সাহায্যে লীলা দেবতার মন্ত্রপূত মালা গ্রহণ করিলে কুমার এবং কিরণ উভয়েই তাহার প্রেমে পড়ে। শোভা ইহাতে হুঃখিত হইয়া পুনরায় যোগমায়ার মন্দিরে আসে এবং সেখানে দেবতার মন্ত্রপূত অঞ্জন পরে। ফলে তাহাদের মিলন হয়। এই গীতিকাব্যের গানগুলি লেখিকার অতুল সম্পদ; সে যুগের যে কোন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সহিত ইহা অনায়াসে স্থানলাভ করিতে পারে। Indian Mirror ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, প্রয়োজন বোধে আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

...There is no melodrama in Bengali, that we know of, which is so thoroughly chaste and sweet, so rich in charms of poetry, and therefore none so well calculated to improve the taste of the play-going public....As we read it, its morning-freshness and lyrical sweetness steal upon us and we feel if we were in as a “bubble of visionary happiness” unrefilled by the tempests blowing without.

বইখানিতে সেন্সপিয়রের কিছু ছায়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ছায়াই—তাহার কোন কায়া নাই।

দক্ষিণ বঙ্গের মাঘব্রত

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

মেঘেলী ব্রত-ছড়ার মধ্যে মাঘব্রত সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রান্তিক * পূর্ববঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত তাহা বিস্তারলাভ করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের দিকে তাহার প্রচলন এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

মাঘব্রতের ছড়া সূর্যকে উপলক্ষ্য করিয়া। ইহাকে সূর্য-ব্রতও বলা যাইতে পারে। এই ব্রত মাত্র দুই চারশত বৎসরেরও নয়, কতদিনের তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। প্রকৃতিদেবতাকে পূজা করিবার রীতি বেদের কাল হইতে আমরা পাইয়াছি। বৈদিক দেবতাসকল পরবর্তী কালে আমাদের নিকট বিভিন্ন প্রকারে দেখা দিলেন। কেহ কেহ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের পূজা পাইতে লাগিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সরস্বতী, রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আবার কেহ কেহ প্রকৃতিতেই অবস্থান করিলেন, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্র, পৃথ্বী, সূর্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শৈবোক্ত দেবতাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে অনেক ব্রত-ছড়ার প্রচলন আছে। উত্তর বঙ্গের মেয়েরা এখনো ইন্দ্রোৎসব করিয়া থাকে, তাহারা কোন নির্দিষ্ট রাত্রে দল বাঁধিয়া নাচ গান করে। ইন্দ্র হইলেন বর্ষার দেবতা—বেদে তাহাকে কৃষির দেবতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার সহিত পৃথিবীর নিকট সম্বন্ধ। শস্ত-সম্পদবতী পৃথিবী তাহার বারি বর্ষণের জন্য সতৃষ্ণভাবে অপেক্ষা করেন। তাই, বৈশাখ মাসে পশ্চিম বঙ্গের মেয়েরা পদ্মপাতা ও বস্ত্রমতীর ব্রত করে। সঙ্গে সঙ্গে কত কামনা করে। এস্থলে তাহার কিছু উল্লেখ করিতেছি।

পৃথিবী আসছেন পদ্মপাতে,

শঙ্খ চক্র গদা হাতে ॥

থাব চিনি মাখব ননী,

বসে থাকব রাজার রাণী ॥

ঘাট পালঙ্ক দেব দালঙ্ক

বিদ্যা আসে পাশে,

রূপ যৌবন, সদাই স্মৃখী,

সোয়ামি ভালবাসে ॥

ছড়ার শেষাংশে স্বামীর ভালবাসা কামনা করা হইয়াছে। পরে, বস্ত্রমতীর বৃকে সংসার পালন করিয়া, তাহার বৃকে অন্তিম শয়ন করিবার কামনা ব্যক্ত হইয়াছে।

বসোমাতা নাগো,

জল দাও, স্থল দাও,

পতি দেও, পুত্র দেও,

তুমি আমার ঠাণ্ডা কর,

আমি তোমার ঠাণ্ডা করি ॥

এ রকম নানা বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি-দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন প্রকৃতি-রমণীরাই করিয়া আসিয়াছে। সূর্য্যই প্রকৃতি-দেবতার মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সেজন্যই মেয়েদের মধ্যে সূর্য্য-ব্রত করিবার ঘটা এত অধিক দেখা দিয়াছে। কারণ,

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি, বৃষ্টিরম্ন ততঃ প্রজাঃ ॥

সূর্য্যের কিরণে জগত সমুদ্ভাসিত হয়, সূর্য্য হইতে মেঘের উদ্ভব, তাহা হইতে বারি রাশি, তাহার দ্বারা অন্ন এবং তাহার দ্বারা যাবত জীবের পুষ্টিবর্দ্ধন।

শীতের জড়তা আমাদের ভাল লাগে না, তাহাতে আমরা কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলি। সেজন্য, শীতকালে সূর্য্যের কিরণকে আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করি। ছোট ছোট মেয়েরা শীতের জড়তা কাটিইবার জন্য খুব ভোরে উঠিয়া সূর্য্যের ব্রত আরম্ভ করিয়া দেয়। প্রথমতঃ তাহারা জলাশয়ের কাছে যাইয়া জল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকে, এবং সমবেত-স্বরে ছড়া বলিতে থাকে। দক্ষিণ বঙ্গের মাঘব্রত-ছড়া আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।—

* প্রান্তিক পূর্ববঙ্গ—চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট ইত্যাদি।

এক জল ভাঙ্গি আমরা কাগে আর বগে,
আর জল ভাঙ্গি আমরা দুর্ব্বার আগে ॥
হুবল হুবল সরস্বতী নড়ে না চড়ে
গিরির গো ঝি ঘোঁ শিঞ্জিরে মরে

ফরিদপুরে প্রচলিত আছে :—

যে জল ছোঁয় না লো কাগে আর বগে ।
সে জল ছুঁই মোরা দুর্ব্বার আগে ॥
দুর্ব্বা দুর্ব্বা সরস্বতী নড়ে আর চুড়ে,
নড়িয়া চড়িয়া কি বর মাগে ?
সাতসতীনের পায়ে পড়ে ॥

ইত্যাদি ।

তারপর মেয়েরা জলের মধ্যে পিড়ি ভাসাইতে গিয়া বলে ।
আম কাঠালের পিড়িখানি গঙ্গাজলে ভাসে,
সেই পিড়িতে আমার ভাই, রাইল ঠাকুর বসে ॥
রাইল গেল ভাসে,
ভাই আলো হাসে ॥

এস্থলে স্বর্ঘ্যকেই ভাই বলিয়া ধারণা করিয়া লওয়া হইয়াছে
বলিয়া মনে হয় । রাইল ঠাকুর শিবের নামান্তর মাত্র । ধর্ম্মঃ
মঙ্গল সাহিত্য তাহাকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল ।

এখন স্বর্ঘ্যের জাগরণ সম্বন্ধে বলা হইতেছে । কুরাসার
জন্ত তিনি উঠি উঠি করিয়াও যেন উঠিতে পারিতেছেন না ।
পূর্ব বঙ্গের মাঘ-ব্রতের ছড়ার মধ্যে আছে ।

উঠ উঠ স্বর্ঘ্য ঠাকুর ঝিকি মিকি দিয়া,
—না উঠিতে পারি আমি নিশির লাগিয়া ॥
নিশির পঞ্চবটী শিয়রে রাখিয়া,
স্বর্ঘ্য উঠ বেন কোনখান্ দিয়া ?
বামন বাড়ীর বাটখান্ দিয়া ॥
বামনের মেয়েটি বড় শ্রাযান,
পৈতা যোগান বিয়ান বিয়ান ॥

ক্রমে মালি, নাপিত, কায়েত প্রভৃতির বাড়ীর খাট উপলক্ষ্য
করিয়া ছড়া বলা হইয়া থাকে । ইহার সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের
মাঘ-ব্রতের কোন প্রভেদ নাই ।

তারপর স্বর্ঘ্যের বিবাহ সম্বন্ধে উপভোগ্য রূপে বর্ণনা করা
হইয়াছে । বিয়ের কনে দেখিবার জন্ত নানাদেশ-বিদেশ ঘুরিবার
কথা ছড়ার মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে ।

বাওন ঘরে ছুটি মেয়ে মেলে দেছে কেশ ।
তা' দেখে স্বর্ঘ্য ঠাকুর বেড়ান দেশ দেশ ॥
বাওন ঘরে ছুটি মেয়ে শুয়ে আছে খাটে ।
তা দেখে স্বর্ঘ্য ঠাকুর নাও লাগালেন ঘাটে ॥
বাওন ঘরে ছুটি মেয়ে মেলে দিছে শাড়ী
তা দেখে স্বর্ঘ্য ঠাকুর বেড়ান বাড়ী বাড়ী ॥
বাওন ঘরে ছুটি মেয়ে মলখাছু পায় ।
তা দেখে স্বর্ঘ্য ঠাকুর বিয়ে করতে যায় ॥

সকাল বেলা মুখ প্রফালন বিষয়ে নানারূপ প্রশ্নোত্তর
ফরিদপুরের মেয়েদের ব্রতছড়ার মধ্যে প্রচলিত আছে ।

ও পারেতে জিগায় মালি, কি কি ফুলে মুখ পাখলালি ।
কাল দিছিলাম শরীর ডালি সেই সেই ফুলে মুখ পাখলালি ?
পশ্চিম পাড়ে মালির ঝি জাগোনি ।
আমার গো ফুলের ডালা রাখোনি ।
হাতে কলসী কঁাকে পোলা,
কেমন করে রাখুম পঙ্কফুলের ডালা ॥

ইত্যাদি ।

স্বর্ঘ্যের বিয়ের আয়োজন চলিতে থাকে । কত রকম
বাজনা বাজে ; স্বর্ঘ্য “রাইল ঠাকুরের” মেয়েকে বিবাহ করেন—
দান স্বরূপ কিছুই তিনি পান না । এরূপ কথা রঙ্গপূর্ণ ভাবে
বর্ণনা করা হইয়াছে ।

নাড়া বনে কাড়া বাজে
লোকে বলে কি ?
স্বর্ঘ্য ঠাকুর বিয়ে করে
রাইল ঠাকুরের ঝি ॥ (১)
বিয়ে করলে স্বর্ঘ্য ঠাকুর
ব্যভার পাইল কি ?
ব্যভার পাইলাম আমড়ার আঠি
গম্ভা হারাইছি ॥

বস্তুতঃ স্বর্ঘ্যের বিবাহের ছড়ার মধ্য হইতে অতীত কালের
একটা সুন্দর ভাবধারা আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত
হয় । তখন পণপ্রথার তেমন প্রচলন ছিল না ; নহিলে স্বর্ঘ্য
ঠাকুরের মত অমন স্নেহাঙ্গ্য বর নিজের সব কিছু হারাইয়া
“রাইল ঠাকুরের ঝি” কে বিবাহ করিতেন না ।

তারপর, মেয়েরা চিত্রিত কোঠের নিকট আসিয়া “রাইল
ঠাকুরের” মূর্তি লইয়া ছড়া উচ্চারণ করিতে থাকে।

এবার বড় মাঘ মাস তাতে বড় কুয়ো, (২)

আম গাছটি বলইছে ভালো

ডালে ডালে শুয়ো ॥

ছ’বুড়ি ছয়টি আম পালাম

তার একটি গেল পোকা।

তা’ দিয়ে কেনব আমরা

রালির কাণের সোনা ॥

রালির কাণের সোনা না লো

লড়িয়ার পিতল।

আছে আছে লড়িয়ার পিতল,

ঐ আমাদের বেত্তের পিতল ॥

ফরিদপুরের দিকে আছে :—

লাড়ো ফেরে বাড়ী বাড়ী

হেদেরো লাড়ো তোর পাকো দাড়ি ॥

দখির স্বর দখির স্বর

ভাইটো আমার রাজা।

পরিশেষে, বাপ-ভাই, এবং নিজের স্বামী-সৌভাগ্যকে কামনা
করিয়া ব্রত শেষ করা হয়।

কাটে কুটে ফেললাম

থরকো মটুমের মাজা

আই কাটে ভাই পালাম,

ভাইয়ের শতু র দুই নখে কাটলাম।

ইত্যাদি।

মাঘ মণ্ডল সোনার কুণ্ডল,

সোনার কুণ্ডলে ঢেলে ঘি,

আমরা হলাম বড় মানুষের বি।

সোনার কুণ্ডলে ঢালে মৌ।

আমরা হলাম বড় মানুষের বৌ ॥

সোনার কুণ্ডলে ঢালে বালি।

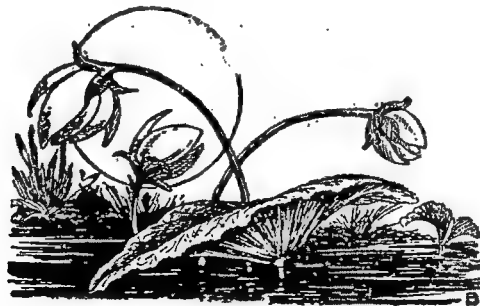
আমরা হলাম বড় মানুষের শালী ॥

শ্রমি পূজি দিবাকর

চন্দ্র সমান মিলুক বর ॥

মাঘ-মণ্ডলের ছড়াগুলি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত
হইলেও তাহাদের সবাকার প্রতিপাদ্য বিষয় এক।
ছড়াগুলির উপর মেয়েদের পারিবারিক জীবনের ছায়া
পড়িয়াছে। বাপ, ভাই ও স্বামীর সৌভাগ্যকে কেন্দ্র করিয়া
মেয়েদের অধিকাংশ ছড়া প্রচলিত—তাহাতে অগৌরবের কিছু
নাই। দুঃখের বিষয়, মেয়েলী ছড়ার লুপ্ত সম্পদ উদ্ধারের চেষ্টা
আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে তেমন ব্যাপক ভাবে দেখা
দেয় নাই। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের দায়িত্ব অনেক
বেশী। তাঁহারা এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে জাতীয় স্মৃতির
পটোমোচন সহজসাধ্য হয়, সন্দেহ নাই ॥

(১) ঝি-ছহিতা, ধুতা ঝিয়া-ঝি (২) কুয়ো-কুয়াসা।



টিউব রেলওয়ে

শ্রীরাধাভূষণ বসু

লণ্ডনের টিউব রেলওয়ের সমস্ত স্টেশনগুলোতে যতগুলো এস্কেলেটর আছে তা'রা সকলে মিলে প্রত্যহ দু'হাজার মাইলেরও বেশী ঘোরে। চলন্ত বা ঘূর্ণমান এস্কেলেটর থামান খুবই সোজা; যাত্রীরা ইচ্ছা করলে নিজেরাই একটি ইলেক্ট্রিক সুইচ টিপ দিলেই আপনিই এস্কেলেটরটি বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন নিশ্চল এবং স্থির অবস্থায় থাকে। তখন এস্কেলেটরটিকে একটি সাধারণ সিঁড়ির মত দেখায়। অনেক সময়ে ঘূর্ণমান এস্কেলেটরে চড়ে ওঠা নামা করতে যাত্রীদের গা-বমি করে। তখন এস্কেলেটরের পাশের সুইচটি বন্ধ করে দিলেই ইলেক্ট্রিক কারেন্ট (current) বা শক্তি বন্ধ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে এস্কেলেটরটি আপনা হতেই বন্ধ হয়। তখন সেই এস্কেলেটরের সাহায্যে সাধারণ সিঁড়ির মত ওঠা নামা করা যায়।

প্রতি স্টেশনে ক'টি লিফট অথবা ক'টি এস্কেলেটর থাকবে তা নির্ভর করে সেই স্টেশনের যাত্রীসংখ্যা এবং রাস্তা হতে সেই স্টেশনের গভীরতার ওপর। যদি কোনও স্টেশনে টিউব রেলওয়ের লাইন্স অথবা প্ল্যাটফর্ম রাস্তা হতে খুব গভীর নীচে অবস্থিত হয়, তা'হলে লিফট বা এস্কেলেটর অনেকগুলো রাখতে হয়, কারণ একটি লিফট অথবা এস্কেলেটরের সাহায্যে যাত্রীদের নীচে নামতে বা ওপরে উঠতে বহু সময় লাগে। কিন্তু টিউব রেলওয়ের লাইন্স যদি রাস্তা হতে অল্প নীচে হয়, তা'হলে অল্প সংখ্যক লিফট বা এস্কেলেটরেই কাজ চলে। আবার যদি কোনও স্টেশন মহরের জনবহুল স্থানে অবস্থিত হয় এবং অগ্ন্যাশ্রু স্টেশন অপেক্ষা সেই স্টেশনে বহু যাত্রী যাওয়া আসা করে, তা'হলে সেই স্টেশনে অগ্ন্যাশ্রু স্টেশন অপেক্ষা বহুসংখ্যক লিফট এবং এস্কেলেটর রাখতে হয়। লণ্ডনের চেয়ারিং ক্রস, ব্যাঙ্ক, হোবর্ন প্রভৃতি টিউব স্টেশনগুলোতে প্রত্যহ যত যাত্রী যাওয়া আসা করে অল্প কোন স্টেশনে অত যাত্রী যাওয়া-আসা করে না।

সেইজন্তে ঐ স্টেশনগুলোতে চারিটি করে এস্কেলেটর আছে

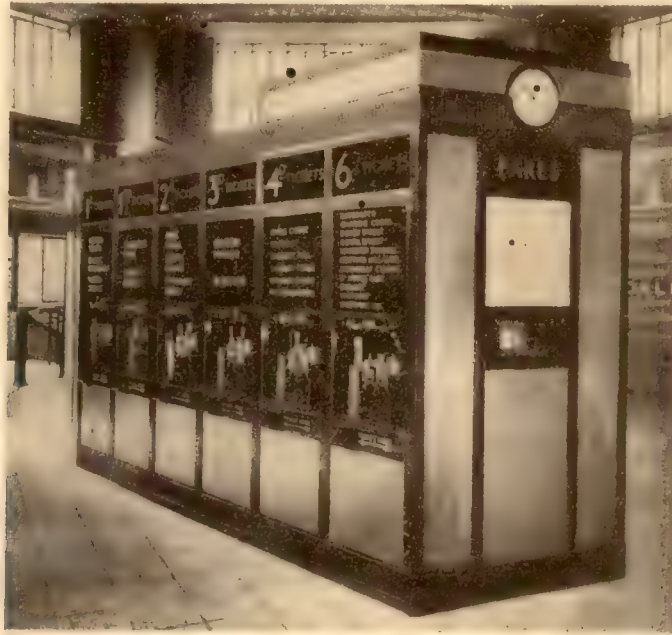
—দু'টি ওঠা এবং দু'টি নামার জন্তে। আবার, লণ্ডনের পিক্যাডিলি সার্কাস টিউব স্টেশনটি এত ব্যস্ত যে সপ্তাহে প্রায় দশ লক্ষ লোক ঐ স্টেশনে যাতায়াত করে। এই জন্তে পিক্যাডিলি সার্কাস স্টেশনে ন'টি আলাদা আলাদা এস্কেলেটর আছে—প্রতি ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ হাজার যাত্রী নিয়ে ঐ এস্কেলেটরগুলো ওঠা নামা করে। তবে, প্রতি স্টেশনেই তিন চারিটি লিফট এবং দু'টি এস্কেলেটর থাকেই—এই দু'টি এস্কেলেটরের মধ্যে একটি ওঠা এবং অপরটি নামার জন্তে।

এস্কেলেটরগুলো চালানোর জন্তে কোনও লোকের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু লিফট চালাতে হলে প্রত্যেক লিফটের জন্তে একজন লিফটম্যান (Liftman) অথবা লিফট-চালক আবশ্যক। লণ্ডনে লোকজনের মাহিনা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশী—সেইজন্তে আজকাল টিউব স্টেশনে লিফটের পরিবর্তে এস্কেলেটর প্রবর্তিত হচ্ছে। অবশ্য কয়েকটি ছোট ছোট টিউব স্টেশনে, যেখানে যাত্রীর ভীড় নেই বললেই হয়, অটোম্যাটিক (automatic) লিফট অথবা চালকবিহীন লিফটও আছে। এই প্রকার চালকবিহীন লিফট আপনিই ওঠা নামা করে, তাদের দরজাও আপনিই খুলে যায় এবং বন্ধ হয়। এই রকম দু'তিনটি লিফট একজন লোকের তত্ত্বাবধানে থাকে। লণ্ডনের গুড্জিট (Goodge Street) নামক টিউব স্টেশনে এই প্রকার লিফট আছে।

প্রথম প্রথম বহুদিন পর্যন্ত রাস্তা হতে মাটির নীচে প্ল্যাটফর্মে নামা এবং নীচেকার প্ল্যাটফর্ম হতে রাস্তার উঠে আসার কাজ সাধারণ সিঁড়ির সাহায্যে হত কিন্তু তাতে অনেক সময় নষ্ট হত এবং অনেকেই দুশ আড়াইশ ফুট নীচে হইতে ওপরে উঠে আসতে হাঁফিয়ে পড়ত। এই কারণে সাধারণ সিঁড়ির পরিবর্তে ক্রমশঃ লিফট ও এস্কেলেটরের প্রচলন হয়েছে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত প্রত্যেক স্টেশনেই সাধারণ সিঁড়িও আছে—তবে সেগুলো কেবলমাত্র এমার্জেন্সী স্টেয়ার্ কেস (Emergency Staircase) ভাবেই

ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ যখন লিফট বা এস্কেলেটর চলতে চলে হঠাৎ খারাপ হয়ে যায় অথবা ইলেক্ট্রিক্ কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায় কেবলমাত্র তখনই ঐ সকল সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তার প্রয়োজন বড় একটা হয় না।

কেনা কিংবা দেহের ওজন নেওয়ার ইচ্ছা হ'ল—তখন সেই যাত্রী ঐ সকল অটোম্যাটিক মেশিনের সামনে গিয়ে মেশিনের গায়ে সংলগ্ন একটি স্লট (Slot) বা ছিদ্রপথে প্রয়োজনমত পরস্যা ফেলে দিলেই সেই মেশিন হতে আগনিই জিনিষ বার হয়ে



অটোম্যাটিক্ টিকেট মেশিন—এই যন্ত্রে প্রয়োজন মত “পেনি” ফেলবামাত্রই টিকিট বার হয়ে আসে

এইবার টিউব স্টেশনের প্রাট্ফরম্ এবং সেই প্রাট্ফরমে কি ভাবে টিউব ট্রেন যাতায়াত করে সেই সম্বন্ধে বলা যাক। টিউব স্টেশনের প্রাট্ফরম্গুলোও সাধারণ রেলওয়ে স্টেশনের প্রাট্ফরমেরই মত, তবে তাতে সাধারণ স্টেশনের প্রাট্ফরমের তুলনায় লোকের ভীড়, চোঁচামেচি, চীৎকার প্রভৃতি অনেক কম। ঐ সকল প্রাট্ফরমে টিউব রেলওয়ে কোম্পানীর ছ'তিনজন পোর্টার (Porter) অথবা ধ্বংসকারী করার লোক এবং সিগারেট, চকোলেট, ওজন নেওয়ার যন্ত্র প্রভৃতি কয়েক রকম অটোম্যাটিক্ (Automatic) যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই সকল অটোম্যাটিক্ যন্ত্র আপনা হতেই কাজ করে, অর্থাৎ সেগুলো চালানর জন্তে কোনও লোকের দরকার হয় না। যাত্রীদের মধ্যে কা'রও হয়তো সিগারেট বা চকোলেট

আসে। ওজন নেওয়ার যন্ত্রও ঠিক এই ভাবেই কাজ করে। এই রকম অটোম্যাটিক মেশিন আজকাল আমাদের দেশেও বড় বড় সহরে ছ' চারটে দেখতে পাওয়া যায়।

লিফট অথবা এস্কেলেটারে করে টিউব স্টেশনের ফরমে নেমে ট্রেনের জন্তে অপেক্ষা করতে করতে ট্রেন চলবে টিউব বা স্তূপপথ থেকে হঠাৎ গুড় গুড় আওয়াজ শোনা যায়—মনে হয় যেন আবণ মাসে আকাশে মেঘ ডাকছে। পরেই টিউবের মধ্য দিয়ে স্থিতিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে দৈত্যের চোখের মত ট্রেনের এঞ্জিনের ছ'টি উজ্জ্বল আলো তীরবেগে ছুটে আসে। ‘অবাক্ হ'য়ে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে চোখের পলক না ফেলতেই নিমেষের মধ্যে সমস্ত ট্রেনখানা গজ্জন করতে করতে একেবারে প্রাট্ফরমে এসে হাজির! ট্রেনখানা

আসার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনের গার্ড সাহেব একটি ইলেকট্রিক সুইচ টিপে দেয়—অমনি সকল গাড়ীর দরজা আপনিই খুলে যায়, মাত্র আধমিনিট বা বড় জোর একমিনিট মাত্র ট্রেনখানা থামে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে কত শত যাত্রী নামে, কত উঠে—আবার গার্ড সাহেব আর একটি ইলেকট্রিক সুইচ টিপে দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই সেই ট্রেনের সকল গাড়ীর দরজাই আপনি বন্ধ হয়ে যায় এবং ট্রেনখানা আবার ঘন্টার তিরিশ, পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে পরবর্তী স্টেশনের দিকে চলে। এইভাবেই প্রত্যহ শত শত টিউব ট্রেন যাতায়াত করে।

আলো সবুজ হয়ে যায় এবং তখন পিছনের ট্রেনখানা আবার পরবর্তী স্টেশনের দিকে অগ্রসর হয়। এইভাবে সমস্ত লাইনে সিগ্‌নাল্ কাজ করে—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এই সমস্ত কাজ সকলই আপনিই হয় কলের মত এবং বিপদ আপদ বা ধাক্কা-ধাক্কি হয়না বললেই চলে।

লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে শীতকালে টিউব রেলওয়ে টানেলের বাতাস রাস্তার বাতাস অপেক্ষা অনেক গরম—আবার গরমকালে টানেলের বাতাস রাস্তার বাতাস অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা থাকে। এই রকম অবস্থার দ্বারা প্রমাণ হয় যে,



একটি বুকিং হল

টিউব রেলওয়ের সিগ্‌নাল্ (Signal) ইলেকট্রিকে চলে এবং অটোম্যাটিক অর্থাৎ আপনিই কাজ করে। তা না হলে প্রতি ঘন্টার একই লাইনের ওপর দিয়ে প্রায় চল্লিশখানা ট্রেন যায়, অর্থাৎ প্রতি স্টেশনে প্রতি দেড় মিনিট অন্তর একখানা ট্রেন এসে হাজির হয়। সুতরাং সিগ্‌নালিং খুব নিখুঁতভাবে না হলে ধাক্কাধাক্কি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই। এই অটোম্যাটিক সিগ্‌নালগুলো ট্রেন চলতে আরম্ভ করলেই কাজ করতে শুরু করে। একটি স্টেশন হতে যেই ট্রেন চলতে শুরু করল অমনি লাইনের সিগ্‌নালিং আলো লাল হয়ে যায়, অর্থাৎ তখন সেই লাইনে ট্রেন চলা বিপজ্জনক এবং পরবর্তী বা পিছনের ট্রেন সেই স্টেশনে এসে অপেক্ষা করে। আগের ট্রেনখানা সেই পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছালে পিছনের স্টেশনের সেই লাইনের

রাস্তাঘাটের বাতাসের উত্তাপ থেকে টিউব টানেলের বাতাসের উত্তাপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই প্রকার অবস্থা না হওয়া কিরূপে সম্ভব—কৃত্রিম উপায়ে বাতাস গরম অথবা ঠাণ্ডা করে টানেলের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়। টানেলগুলো রাস্তা হতে বহু নীচে অবস্থিত—সুতরাং অত নীচে সাধারণ উপায়ে ঐ সকল স্থানে বায়ু চলাচল একপ্রকার অসম্ভব—তার ওপর টানেল পথে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই—সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়। এইজন্যে টিউব পথগুলোতে বিরাট বিরাট পাম্পের সাহায্যে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। টিউব স্টেশনে লিফটগুলো ওঠা নামা করে এবং এস্কেলেটরগুলোও অনবরত ঘুরতে থাকে—তাঁতে অবশ্য কিছু বিশুদ্ধ বায়ু ওপর হতে নীচে

বায়ু এবং নীচেকার কিছু দূষিত বায়ু ওপরে চ'লে আসে। আবার টিউব পথে ট্রেন যাতায়াত করাতেও কিছু বায়ু চলাচল হয় কিন্তু তা' মোটেই যথেষ্ট নয়। টিউব-পথে অসংখ্য ট্রেন যাতায়াত করে—তা'র জন্তে উত্তাপের স্রষ্টি হয়, এবং সেই উত্তপ্ত বায়ু-চলাচলের যথেষ্ট ব্যবস্থা না করলে টানেলগুলো ক্রমশঃ 'অত্যন্ত গরম হ'য়ে যায়—এই জন্তেও বায়ু চলাচলের প্রয়োজন। আমেরিকার নিউইয়র্ক (New York) সহরে 'যখন সর্বপ্রথম টিউব রেলওয়ে স্থাপিত হল তখন টানেলে বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে 'অল্প দিন পরেই দেখা গেল যে, প্রতি বছরই ঐ সকল টানেলের উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন অবশ্য ঐ সকল টানেলে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা হ'য়েছে।

লন্ডনের টিউব রেলওয়েই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়। পূর্বেই বলেছি—প্রথম প্রথম এই সকল পথে স্টীম এঞ্জিনের সাহায্যে ট্রেন চালান হ'ত, কিন্তু এখন সমস্ত টিউব ট্রেনই ইলেকট্রিক চলে। লন্ডনে, মেট্রোপলিটান (Metropolitan) ডিস্ট্রিক্ট (District), সেন্ট্রাল লন্ডন (Central London) গ্রেট নর্থার্ন এণ্ড সিটি (Great Northern and City) বেকারলু (Bakerloo) মর্ডেন এজওয়ার্থ হাম্পস্টেড ও পিকাদিলি মোট এই সাতটি লাইনই লন্ডন প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট (London Passenger Transport Board) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীন। পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন লাইন ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর অধীনে ছিল কিন্তু গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই হতে সমস্ত টিউব লাইনই এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে এসেছে।

টিউব ট্রেনে যাওয়া আসা করার একটি প্রধান অসুবিধা এই যে টিউব ট্রেনে বসে যেতে যেতে রেললাইনের দুধারে কিছুই দেখা যায় না—দুধারে শুধুই অন্ধকার! সুতরাং সহর দেখার ইচ্ছা থাকলে টিউব ট্রেনে চড়ে গেলে কিছুই দেখা যায় না। তবে যেখানে সময়ের তাড়াতাড়ি সেখানে টিউব ট্রেনই সুবিধাজনক। লন্ডনের জনাকীর্ণ সড়ক রাস্তাগুলোতে বাস, ট্যাক্সি অথবা ট্রামে করে যাতায়াত করতে বহু সময় লাগে—সেইজন্তে কাজের তাড়া থাকলে সকলেই টিউব ট্রেনে যাওয়া আসা করে।

টিউব ট্রেনে শুধু যাত্রীই যাওয়া আসা করে। সাধারণ রেলওয়েতে যাত্রী এবং মাল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্তে আলাদা

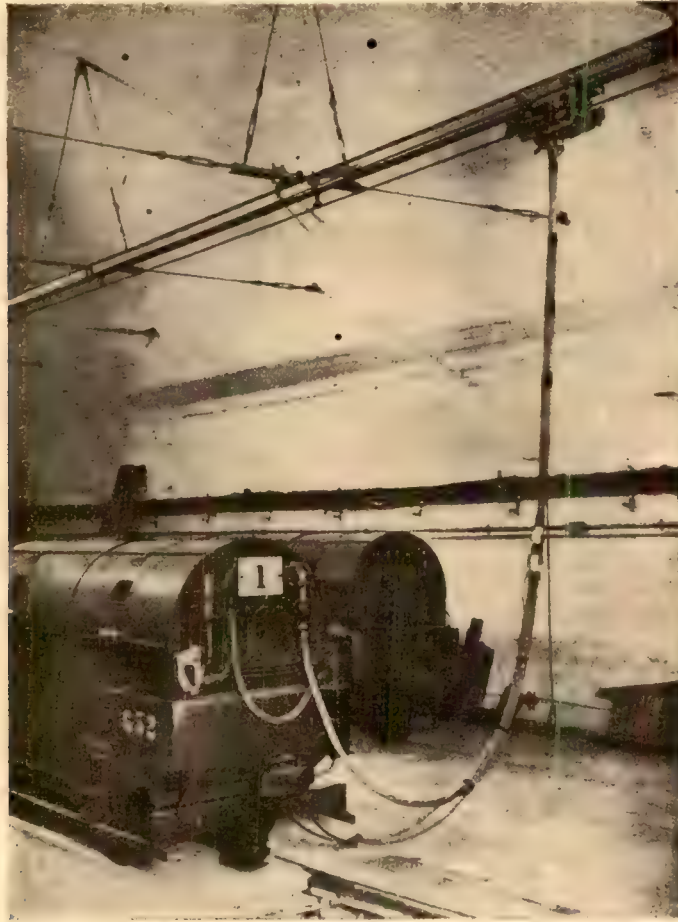
আলাদা ট্রেন থাকে, কিন্তু টিউব রেলওয়েতে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না বলে কেবলমাত্র প্যাসেঞ্জার ট্রেন (Passenger Train) বা যাত্রী বয়ে নিয়ে যাওয়ার ট্রেনই থাকে—সাধারণ রেলওয়ের মত মালগাড়ী থাকে না। একমাত্র মেট্রোপলিটান লাইন ভিন্ন অন্য কোনও লাইনে টিউব ট্রেন মাল বয়না।

একমাত্র লন্ডন ভিন্ন গ্রেট ব্রিটেনের অন্য সহরগুলোতে টিউব রেলওয়ের প্রচলন নেই বললেই হয়। ইংল্যান্ডে লন্ডনের টিউব রেলওয়ে ভিন্ন আর একটি মাত্র টিউব রেলওয়ে আছে—এটি হচ্ছে দি মার্জি রেলওয়ে (The Mersey Railway) স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো (Glasgo) সহরেও একটি টিউব রেলওয়ে আছে—আয়রল্যান্ডে মোটেই নেই। মার্জি টিউব রেলওয়েটা ইংল্যান্ডের মার্জি নদীর নামানুসারে হয়েছে এবং এটি মার্জি নদীর নীচ দিয়ে গিয়েছে। এই রেলপথ ইংল্যান্ডী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে খোলা হয় এবং এটি লিভারপুল (Liverpool) ও বার্কেনহেড (Birkenhead) নামক সহর দুটিকে সংযোগ করে। এই রেলপথে প্রথমে স্টীম-চালিত ইঞ্জিনে ট্রেন চলত, এখন ইলেকট্রিক চলে। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো সহরে যে টিউব রেলওয়ে আছে সেটিকে অনেক সময়ে দি ক্যালী (The Calley) বলা হয়। এই লাইনটি খুব বড় নয়।

লন্ডনের উপরোক্ত সাতটি লাইন ভিন্ন আরও তিনটি আঙুর গ্রাউণ্ড (Underground) রেলপথ আছে—সেগুলো হচ্ছে দি পোস্ট অফিস (The Post Office) দি ওয়াটারলু এণ্ড দি সিটি (The Waterloo and the city) এবং দি ইস্ট লন্ডন (The East London)। দি পোস্ট অফিস লাইনটি যাত্রী নিয়ে যায় না—এটি কেবলমাত্র জি. পি. (G. P. O.) অথবা জেনারেল পোস্ট অফিস (General Post Office) অর্থাৎ বড় পোস্ট অফিসে মেল ব্যাগ (Mail Bag) অথবা ডাকের থলগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন রাস্তা অত্যন্ত জনাকীর্ণ এবং অপ্রশস্ত বলে বাস, ট্যাক্সি বা ট্রামে যাতায়াতের অনেক অসুবিধা এবং বহু সময় লাগে—যা'র জন্তে টিউব রেল পথ স্থাপিত হয়েছে—সেই রকম মেলব্যাগগুলোও বিভিন্ন পোস্ট অফিস হ'তে জি. পি. ওতে নিয়ে যেতে বহু সময় লাগে। বলেই ঐ আঙুরগ্রাউণ্ড রেলপথে নিয়ে যাওয়া হয়। এই

রেলপথটি গত মহাযুদ্ধের পরে খোলা হয়। বহুদিন হতেই লণ্ডনের ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ লণ্ডনের রাস্তাগুলোতে লোকের ভীড়ের জন্তে ডাক যাতায়াতের বিলম্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। রাস্তায় এক এক সময়ে এত ভীড় হয় যে ডাকবাহী মোটর লরীগুলো কিছুক্ষণের জন্তে রাস্তায় একেবারে বন্ধ হয়ে থাকে। এই জন্তে তাঁরা ডাক নিয়ে যাওয়ার জন্তে একটি আলাদা আগারগ্রাউণ্ড পথ প্রস্তুত করার মতলব আঁটতে

পরেও কিছুকাল পর্যন্ত ঐ টিউব রেলওয়ের কাজ আরম্ভ হয়নি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কাজ আরম্ভ হ'ল। তিন বছর ধরে কাজ চলল এবং পরে সাড়ে ছ' মাইল লম্বা টিউব রেলপথ খোলা হল। প্রথমে মতলব ছিল যে লণ্ডন সহরের এলাকাধীন প্রত্যেক ডাকঘর এইভাবে জেনেরল পোস্ট অফিসের সঙ্গে সংযুক্ত হবে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা কাজে পরিণত হয়ে উঠেনি। বর্তমানে ডাক বিভাগের নিজস্ব বে টিউব রেলপথ আছে তা



লণ্ডনের আগার গ্রাউণ্ড পোস্টাল টিউব ট্রেন

লাগলেন। বহুদিন এই সম্বন্ধে চিন্তা করার পরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁরা স্থির করলেন যে, টিউব রেলওয়ের মত একটি আগারগ্রাউণ্ড পথে মালগাড়ীর সাহায্যে ডাক যাতায়াত করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ডাক বিভাগের কাজ কর্ম চলবে। এই রকম স্থির ক'রে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পোস্ট অফিস আগারগ্রাউণ্ড টিউব রেলওয়ে প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ হল, কিন্তু সেই বছরই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে লোকাত্যাব বশতঃ অল্পদিন পরেই কাজ বন্ধ করতে হয়। যুদ্ধাবসানে সন্ধি হওয়ার

লণ্ডনের পশ্চিমে অবস্থিত প্যাডিংটন (Paddington) হতে লণ্ডনের পূর্বে অবস্থিত ইষ্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট পোস্ট অফিস (Eastern District Post Office) পর্যন্ত গিয়েছে।

দি ওয়াটারলু এণ্ড সিটি লাইনটি বেশ মজার—এইটিই কেবলমাত্র একটি টিউব রেলওয়ে যাতে মাত্র ছটির বেশী স্টেশন নেই। এই লাইনটির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এই লাইনের স্টেশনে টিকিট ঘর নেই—ট্রেনে, গার্ড সাহেবই টিকিট বিক্রয় করে।

ক্রমশঃ

অন্ধ-প্রেম

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বস্বাধিকারী

(ছয়)

একটা অন্ধদল লইয়া চাঁদ্র পথে বাহির হইয়াছিল। সে দল গান গাহিতে গাহিতে পথাতিক্রম করিতেছিল। ব্যাপারটা নূতন রকমের বলিয়া পথ হইল লোকে লোকারণ্য। গানের বাণী—

হ্যালোক ছেড়ে ভুলোকবাসী

শাশ্বতেরি মহিমায়,

ধর্ম নিয়ে কর্ম করি

আপন আপন ভাব-ধারায় !

সাধন চাক্র কলাচারে

চিনি যখন আপনারে

মানস-চোখের দৃষ্টি তখন

ছড়ায় বিশ্ব-বহুধায় !

বাহির চোখে দেখা কি ছার

বিচার শুধুই তাতে মিছার

অনন্ত চোখ অন্তরে যার

যোরে-না সে আলোয় !

গুরুর বাণী শুনে কাণে

পুলক জাগে অ-লোক-গানে

পাই যে আলো জ্ঞানারূপে

ভয় নাহি আর আশিয়ার—

সন্তোষেরি অমররাগে

অন্ধ নহে অসহায় !

দলের আগে আগে চলিয়াছে মাথায় পাগড়ী, লাঠী হাতে চাঁদ্র। অন্ধ বালক-বালিকারা একজনের পশ্চাতে আর একজন কাঁধে কাঁধে হাত লাগাইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিয়াছে। চাঁদ্র হাতের লাঠী অন্ধ-দলের প্রথম বালকটী ধরিয়াছে দৃঢ়ভাবে। এ সকল শিক্ষা চাঁদ্রই দেওয়া। এ জিনিসটা চাঁদ্র পাগ লামীর একটা খেয়াল বলিয়াই অনেকের ধারণা। কিন্তু অন্ধদের শিক্ষা

দেওয়া সম্বন্ধে বাঁহারা একটু চিন্তা করেন, তাঁহাদের কথা—
চাঁদ্র শিক্ষা-ধারা সত্যই অভিনব।

দল জমারত হইল বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত একটা বিস্তৃত মাঠে। সহস্রাংসুর প্রভাত-কিরণ তখনো পর্যন্ত বৃক্ষপ্রভা হইতে ভূমিতলে নামে নাই। বিহগু-কাকলী ও দৃষ্টিহীন তোরাই-সুর আকাশ-প্রান্তর মুখরিত করিয়া তুলিল।

পথের লোক ভাদ্রিয়া পড়িল সেই বিশাল প্রান্তরে। এ জনতা, কোতুক দেখিবার জ্ঞাত। চাঁদ্র ইদিকে তখন ন থামিয়া গিয়াছে। অন্ধ-পরিবার স্তম্ভামল দূর্বাসনে তখন উপবেশন করিয়াছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ছদ্ম দিয়া অন্ধ-বাহিনীকে উদ্ভা দাঁড়াইবার জ্ঞাত চাঁদ্র আদেশ করিল। বাহিনীর এইর আরম্ভ হইল কুচ্-কাণ্ডোজ। আদেশের ভাষা—“উঠে দাঁড়া”, “মনোযোগী-হও”, “সংখ্যা বল”, “বামে ঘোর”, “ডাননে ফেরো”, “তাল রাখো”, “সামনে এস”, “পিছে হাঁট”, “আরাম নাও”, প্রভৃতি। বাহিনীর শৃঙ্খলা, আদেশ-পালন ও নিয়মানুবর্তিতা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইল। অত অল্প বয়সের বালক-বালিকা শিক্ষার গুণে যে এমন ভাবে গতি উঠিতে পারে, পূর্বে তাহা অনেকে ধারণাই করিতে পারে নাই। চক্ষে দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্যই হইল।

এই সকল কাণ্ডের পর চাঁদ্র বক্তৃতারম্ভ। সে বক্তার জনমণ্ডলীকে চাঁদ্র বুঝাইবার চেষ্টা করিল—“শিক্ষা পালে অন্ধরা হতে পারে চক্ষুস্থানের সমকক্ষ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চক্ষুস্থান অপেক্ষাও ভাল হয়ে থাকে চক্ষুহীনরা। অন্ধদের শিক্ষা দিবার জ্ঞাত একটা ছুইটা নয়, তদধিক প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। দেশের লোকের সে বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

অন্ধরা শুধুই দয়ার পাত্র, এমন কথা মনে করলে খুবই অন্ত্রায় করা হয়। দয়ার পাত্র তারাই, যাঁরা একান্ত অসহায়। অন্ধের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না একেবারেই। চক্ষু নেই

হাতে চক্ষুস্থানের মত শিক্ষা পেলে, প্রায় চক্ষুস্থানের মতই তারা কাজ করতে পারে। আবার অবস্থাগতিকে চোখ ওয়াল লোক যে অন্ধেরও অধম হ'য়ে যায়, তা'র প্রমাণ পাওয়া গেছে অনেক স্থলে।

যাই হোক, মোট কথা হচ্ছে এই—যেমন ক'রেই হোক, অন্ধদের প্রতি আমাদের বিশেষ সহানুভূতি চাই। টাকা কড়ির সাহায্য ত কর্তেই হ'বে, তা'র উপর চাই কায়িক পরিশ্রম। চোখ আছে বলে চক্ষুস্থানেরা ভোগ করবে পৃথিবীর যা কিছু ভাল, আর অনন্ত হুঃখ ভোগ করবে চক্ষুহীনরা—এটা ভাবতেই পারা যায় না। মানবতায় যাদের বিশ্বাস আছে, কর্মকেই ধর্ম বলে যা'রা মনে করে, যত্র জীব তত্র শিব বলে যাদের বিশ্বাস আছে, তা'রাই এই অন্ধ-মণিদের করবে গলার হার। যা'রা তা না করবে, বুঝতে হবে মানবতান্ধের তাদের আস্থা নাই।”

ইহার পর চাঁহু করিল তাহার স্বাভাবিক হুকার। এই হুকারের মধ্যে তাহার হৃৎসের কিছু ইঙ্গিত ছিল। চক্ষুহীনের দল অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিয়া কুচকাওয়াজ বন্ধ করিতেই চক্ষুস্থানের দল নিজ নিজ বাসভবনাভিমুখে চলিয়া গেল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—চাঁহু পাগল নয়, অদ্ভুতকর্ম।

• (সাত)

রত্নেশ্বর সেই যে তাহার মাকে বলিয়াছিল—“জীবেটা শয়তান” এবং সর্বস্ব গ্রাস করতে চায়”, সেইটাই হইল জীবেশ্বরের ভীষণ রাগের কারণ। জীবেশ্বর সেই অবধি রত্নেশ্বরকে দেখিতে লাগিল বিষদৃষ্টিতে। কি করিলে তাহাকে রীতিমত জ্বল করিতে পারা যায়, তাহারই উপায় উদ্ভাবনে সে যত্নবান হইল।

রত্নেশ্বর দৃষ্টিশক্তি হারাইলেও তাহাকে জ্বল করা জীবেশ্বরের পক্ষে কিন্তু খুব সহজ হইল না। হুঃস্ত বুদ্ধিটা, জীবেশ্বরের অপেক্ষা রত্নেশ্বরেরই বেশী। আর জ্বল করিব বলিলেই তাহাকে জ্বল করা চলে না। তথাপি জীবেশ্বর উপায় চিন্তিতে লাগিল।

মাধবী এখন অনেকটা রত্নেশ্বরের দিকেই। রত্নেশ্বরের

বুদ্ধির সঙ্গে জীবেশ্বর কিছুতেই পাল্লা দিতে পারিল না। এ সকল ক্ষেত্রে রত্নেশ্বর এখানো খুব খেলোয়াড়।

আর একটা বুদ্ধির সঙ্গে রত্নেশ্বরের বিলক্ষণ যোগাযোগ আছে। সে বুদ্ধিটা হইতেছে তাহার পত্নী আলোয়ার ভ্রাতা দেখান ও বশুতা-স্বীকারের ঘটনা-চটক খুবই। কিন্তু আসলে সবটাই ফাঁকা। সংবিশ্রুত বৃথাভিমাত্রী স্বামীকে অসাধারণ *প্রীতি-ভক্তির বন্ধন দিয়া সে বুঝাইয়াছে—স্বার্থ-উদ্ধারে মেজাজ খারাপ করা চলে না আদৌ। নীতিকারের কথা'র সে বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী হইলেও পৃথিবীর অস্তান্ত লোকের মতই অধূনা অন্ধ বোচরাকে সেই বুদ্ধিই গ্রহণ করিতে হইল। এমনই মায়া। মায়া'র বিস্তীর্ণ ভগবান নির্মায়েদং জগৎ মহৎ।

এ মনস্তত্ত্ব ব্রজেশ্বর ও মাধবী যে না বুঝিতেন, এমন নহে। কিন্তু বুঝিয়াও কিছু করিবার তাঁহাদের হাত ছিল না। এটাও তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন, এক অন্ধ কত্না ছাড়া পরিবারস্থ অস্তান্ত সকলেরই কাম্য—তাঁহাদের মৃত্যু। কেননা, তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিলেই উত্তরাধিকার-স্থত্রে বিষয়-আসয় সমস্তই উত্তরাধিকারীদের হস্তগত হয়। বিষয় যে কি ভীষণ বিষ, কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানহীন ব্রজেশ্বর ও মাধবীর এখন তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। সেই কারণেই তাঁহাদের এমন জ্বালা—এত অল্পতাপ। মনের অগোচর পাপ নাই। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাদের মনে মনেই করিতে হইল। অন্তরে বাহা থাকে, থাকুক; বাহিরে লজ্জা-সঙ্কোচ প্রকাশ করা বা লজ্জা-উপহাসের ভয় যথেষ্টই। নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করার সাহস দুর্বলচিত্ত বৃথাভিমাত্রী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই কারণেই তাহাদের অন্তরের জ্বালা এত ভীষণ। ঐ জ্বালাটা তীব্র প্রায়শ্চিত্ত।

মাধবী বলিল—“শুনহ তোমার পুত্রবৃন্দের রেবারিষির কথা?”
গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া ব্রজেশ্বর কহিল—

“শুধু শোনা নয়, বহুকাল যাবৎই দেখে আসছি। আমাদের দিন যত শেষ হ'য়ে আসছে ওদের স্পর্দাও তত বেড়ে উঠছে। বিষয় সম্পত্তির মালিকানী-সত্ত্ব পেতে ওদের যা' বাড়াবাড়ি রকমের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, তাতে বুঝছি, একটা অনর্থপাতেরই সম্ভাবনা। শুনছি, টাকার জ্ঞান জীবু নাকি ভ্রাতৃহন্তা, পিতৃমাতৃহন্তা হতেও পিছপাও নয়। এও কাণে এসেছে, কে

একজন সন্ন্যাসী তা'র সাতপুরুষের গুরু হয়ে ঐ মুখটাকে কাশে ধরে ওঠাচ্ছে, বসাচ্ছে, খেলাচ্ছে। এ সকল খবর রাখ কি তুমি?"

“রাখি, আর না রাখি, উপায়?”

—“উপায় হচ্ছে ঘোড়ার চাবুক। এক পরসাপ ওদের দিয়ে যাব না। আমার বা কিছু আছে, দিয়ে যা'ব আমি আমার রত্নমাণের নামে লেখাপড়া ক'রে।”

“ওটা যে অন্ধ মেয়ে। ওকে দিয়ে লাভ?”

“ও অন্ধ হতে পারে, কিন্তু ওর যে ছেলেপুলেও অন্ধ হবে, এমন কিছু কথা নাই। রত্নর জন্ত একটি সংপাত্র ঠিক করেছি। শীঘ্রই ওকে পাত্রস্থ করবার সঙ্কল্প আমার।”

“কৈ, সে কথা ত কোনদিনই বল নাই।”

“বলি নাই, আজ বললাম।”

“তোমাকে আজ যেন বেশ একটু গরম দেখছি; কেন বল ত?”

—“চিরদিনই তোমাকে জুজু ভেবে ভয় করা চলে না। ঐ জুজুর ভয়ই সর্বনাশ করেছে আমার; আর ক'রেও থাকে অনেকের।”

কথাটা বলিয়াই ব্রজেশ্বর ঘর হইতে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বহির্কোণে তখন চাঁদা-ক্ষ্যাপার আগমন সংবাদ হুঙ্কার-ধ্বনিতে প্রচারিত। ব্রজেশ্বর বহির্কোণেই চলিয়া গেলেন। মাধবী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—জীবর সন্ন্যাসী ঠাকুর কর্তাকে উচাটন করিল নাকি!

ব্রজেশ্বর নীচে নামিয়া আসিয়াই বহির্কোণের প্রাঙ্গণে দেখিলেন—চাঁহ এক অপরূপ ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। আজ তাহার মাথার বড় পাগড়ীটা নাই—হাতে লাঠি নাই—পায়ে জুতা নাই। তাহার চেউখেলান কেশগুচ্ছ আজ চূড়ার আকারে বাঁধা, হরিদ্রাবর্ণের কাপড় একটা অভিনব রকমে পরা, আর হাতে আছে বাঁশের বাঁশী।

চাঁহর সেই অপরূপ বেশ ও ভঙ্গী দেখিয়া অত দুঃখেও ব্রজেশ্বর হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—“তাইত, আজ দেখছি ক্ষ্যাপা থেকে তুমি একেবারে মুরলীধর। অবতার হলে নাকি?”

চাঁহও হাসিল। হাসিতে হাসিতে বলিল—

“অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেশ্বরবতরণম্ অবতারঃ। কিন্তু তোমার প্রকৃতির লোক চট করে তা বুঝবে না, আর মানবেও না। কেননা, বুঝবার ও মানবার মত বুদ্ধি তোমার এখনো হয় নাই। তবে হবে একদিন। এখন যে অবস্থায় আছ, তাতে তোমরা না জড়বাদী, না হেতুবাদী, না সংশয়বাদী, না উচ্ছেদবাদী, প্রেমবাদী, দেহবাদী, অনাত্মবাদী—কিছুই নও তোমরা। হয়েছে কেবল ইহসর্বস্ববাদী। তাও কি ছাই পুরাদস্তুর! তা হ'লে ত বুঝতাম, একটি বাদীর মত বাদী হয়েছে! আদালত-ঘর কর বটে বাদী-প্রতিবাদী হ'য়ে। কিন্তু সেটা আসল নয়, ভুল। পঞ্চভূতের বিকারে তৈরী প্রাকৃত জগৎকে যে প্রপঞ্চ বলে, আর তার অতীত যে পরব্যোম্, আর সেই অপ্রাকৃত ধামের নাম যে অপ্রপঞ্চ, সেটা আর বুঝবে কি করে বেরজ বাবু? ও সব নিয়ে পড়ে থাকে আমার মত পাগল। ক্ষেপিয়ে তোল তোমরাই। ক্ষ্যাপাকে। তাই ক'রে যাও বাবা খুসী মনে। তাতে তোমাদেরও আনন্দ, আর ক্ষ্যাপারও আনন্দ। কিন্তু সোঁদর বনে যাচ্ছ কবে—দেবী করলে ত আর চলবেনা।”

“বেদিন ঠিক করবে, সেই দিনই রওনা হব। কিন্তু তুমি কি ভাবলে চাঁহ, তোমাকে আমি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখি?”

“দেখলেই আর করছি কি বল? ও সব শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধায় কি যায় আসে বল? রসো বৈ সঃ বুঝতে, রসের রসিক, ভাবের ভাবুক হ'তে, বুঝতে পারতে তখন ভক্তির ঘনীভূত অবস্থাটা কি? ঐ ভক্তিরই নামান্তর হ'ল প্রেম। সত্যিকার প্রেম হ'লে শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, রাগ-অমুরাগ, আনন্দ-নিরাশ্রয় সব এক হয়ে প্রেমটাকে আর সাধন রাখেনা, ক'রে তোলে সাধা; উপায়টা হয় উপেষ, আর গোপন হয়ে পড়ে মুখ্য। এ সকল বুঝেছিল জয়দেব-পদ্মাবতী, বিদ্যাপতি-লছমী, চণ্ডীদাস-রামী, বিষ্ণুদাস-চিন্তামণি। আর রায় রামানন্দ!—তিনি ত হ'লেন পুরুষ-প্রকৃতি একই আধারে। ধ্যেৎ, অনেক আবল-তাবল ব'কে যাচ্ছি হক্-না-হক্। অরসিকেষু রসস্ত নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।”

চাঁহ যখন এই সকল কথা বলিতেছিল, ব্রজেশ্বর অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি বলিলেন—

“আচ্ছা তুমি নিজে ও রস পেয়েছ কি?”

“চাইবার মত চাইলেই পাওয়া যায়। না চাইলে পাওয়ার
দেবী হয়। তবে পেতেই হবে একদিন।”

কথা শেষ করিয়াই উপর দিকে চাহিয়া চাঁচু কেমন এক
রকমের হাসি হাসিল। সে হাসি ভারী মধুর।

তাহার পরেই বাঁশের—বাঁশীতে সে আলাপ করিতে
লাগিল। তাহার বাঁশীর সুরে সুর যেন মূর্ত হইয়া উঠিল।

বাঁশী থামিলে ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—

“আজ এ নূতন রূপ কেন চাঁচু?”

“কারণ না থাকলে কাজ কখনো হয় কি বেরজ বাবু?
আমার প্রাণপ্রিয় অন্ধ স্বজনদের আমার বাঁশী-সুন্তে চেয়েছে।

তাই যাচ্ছি তাদের বাঁশী শোনাতে। যাবার পূর্বে তোমাকে
বলে যেতে চাইগো—সাবধান সাবধান।

ঘুরছে শনি পায়ে পায়ে

যাবে পড়ে বিষম দায়ে।

চল্লম—এখন চল্লম। কখন কোথায় থাকি ঠিক কি!

তবে দরকার হয় ডেকো—ফ্যাপাকে ফ্যাপার মত ডেকো—
হাজির পাবে।”

চাঁচু আর দাঁড়াইল না—উদ্ধ্বাসে ছুটিল। সহস্র

আহ্বানেও সে আর ফিরিল না। এখন আর চাঁচুর হৃদয়

নাই।—দূরগত বেণুরব ব্রজেশ্বরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

ভীত ত্র্যস্ত ব্রজেশ্বর ভাবিতে লাগিল—এ কি প্রহেলিকা!

ক্রমশঃ



লক্ষহীরা

বন্দে আলী মিন্না

প্রথম দৃশ্য

[লোকজনের কোলাহল, শব্দ ও ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাইবে।]

প্রথম ভিক্ষুক—একটা পয়সা দাও মা, আজ সূর্য্যগ্রহণের যোগ, চান করে যাবার সময় গরীব ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে যাও মা, আঃ আজকের একটা দিন কিছু দিলেন না?

২য় ভিক্ষুক—দুখ্য করিসনে নিমাই, লক্ষহীরা ভূহাতে মণি মুক্তা দান করতে করতে এদিকে আসছেন।

ভিখারিণী—ওমা তাই নাকি গো! তবেতো এই বেলা চলি, —ওরে নেদি খেঁদি কোথায় গেলিরে! আঃ মলো যা— কোথায় সোনা দানা পাবে তা রেখে একটা পয়সা, দুমুঠো চাল মাগতে কোথায় যে গেছে অভাগীরা!

জর্নৈক দ্বারবান—ওরে তোরা সর—সর। আমাদের লক্ষহীরা রাণী মা আসছেন।

২য় দ্বারবান—এই হঠাৎ যা—লাঠির গুঁতোয় চোখ কানা করে দেবো।

প্রথম বালিকা—ওগো আমার দাও—আমায় দাও রাণী মা;— ওকে ছবার করে দিলে, আমি একবারও পেলুমনা।

২য় বালিকা—ওলো চোখখাগী, আমি ছবার পেয়েছি, জিবেণীর ঘাটে দাঁড়িয়ে মিছে কথা বললে জিভ খসে পড়বে, জানিস?

প্রথম বালিকা—শাপমুনি্য দিসনে লো আজকের দিনে। ভগবান আছেন, তিনিই বিচার করবেন।

লক্ষহীরা—এই ভিখারিণী মেয়ের দল, চুপ! চুপ। চোঁচামোচি করিসনে, আমি তোদের সবাইকে দেবো, নে ধর। (প্রদান)

দ্বিতীয় বালিকা—আহা, বেঁচে থাকো মা, রাজরাণী হও।

[দূরে লোকজনের কোলাহল, খোল কুরতালের ধ্বনি এবং কীর্তনের শব্দ—“হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ।” “ওই দ্যাখো এবারে পূর্ণ গ্রাস।” “হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল; “ওরে স্বান এই বেলা সেরে নে।” “জয় মা গঙ্গা” “জয় সূর্য্যদেব” ইত্যাদি শব্দ শোনা যাইতে থাকিবে।]

নির্ম্মলার গীত—ভিক্ষা দাওমা ভিক্ষা দাও

আমরা অতি গরীব অনাথ—

মোদের পানে ফিরিয়া চাও।

তোমাদের সবার দানে

বেঁচে আছি আজও প্রাণে

যাবার বেলায় দয়া করে দিয়ে কিছু যাও ॥

আমাদের ছাটি ভিক্ষা দাও মা, আমরা বড়ো গরীব।

লক্ষহীরা—ভিখারিণী, তোমার কণ্ঠ অতি মধুর। সীমন্তে তোমার সিঁহুর মনে হয় এয়ো-স্বী তুমি—সর্বদেহ নিরাভরণ কেন মা? তুমি কে?

নির্ম্মলা—আমি ভিখারিণী—দরিদ্রা ব্রাহ্মণী। আমার স্বামী ইনি, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। দিনান্তে আমাদের একবেলা খাব, কোনোদিন জোটে, কোনোদিন বা নয়।

লক্ষহীরা—আহা, ইনি তোমার স্বামী? বড্ডো কষ্ট তো তোমাদের। আচ্ছা, আমি তোমাদের প্রচুর সোণ রূপো দান করছি, আর একমুঠো ভিক্ষা করতে হবে না।

নির্ম্মলা—জয় হোক, অন্তে ব্রহ্মলাভ হোক। যা দান করলেন তার কোটিগুণ ভগবান দেবেন।

লক্ষহীরা—এই মুক্তার মালা আর হীরকের বালা জোড় তোমায় দিলুম, সর্বদা পরে থাকবে। তুমি সাধ্বী নারী, তোমায় অলঙ্কার পরতে হয়।

কৌশিক—দেব-দ্বিজ ভক্তি তোমার চিরকাল অটুট থাক। আমি কৌশিক ঠাকুর—তোমাকে আশীর্বাদ করি। নারায়ণ তোমাকে স্নেহে রাখুন। অন্তে তিনি যেন চরণে আশ্রয় দেন।

লক্ষহীরা—কৌশিক ঠাকুর, তোমার আশীর্বাদ সত্য হোক।

নির্ম্মলা—হ্যাঁগা রাণীমা, আপনি কে?

লক্ষহীরা—আমি মহাপাতকী, মহাপাপিনী।

কৌশিক—আপনি যদি পাণ্ডী তবে পুণ্যবতী কে?

লক্ষহীরা—সত্যিই কৌশিক ঠাকুর, আমার পাপের পরিসীমা নাই।

নির্মলা—আপনি কে রাণীমা ?

লক্ষ্মীরা—আমি লক্ষ্মীরা ।

নির্মলা—আপনি ? আপনিই লক্ষ্মীরা ?

লক্ষ্মীরা—হ্যাঁ ঠাকরণ, মহাপাপিনী আমি ।

নির্মলা—আজ সূর্য্যগ্রহণের স্নানে আপনার পাপ ক্ষয়
হ'য়ে যাক—দানে অক্ষয় পুণ্যলাভ হোক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৌশিক—ব্রাহ্মণী, ওগো ব্রাহ্মণী, ওগো নির্মলা ঠাকরণ,
কোথায় গেলে গো ?

নির্মলা—(দূর হইতে শব্দ আসিবে) . কেন গো ?
(নিকটবর্তী হইয়া) কেন ডাক্ছো গো ?

কৌশিক—শোনো (মৃদুকণ্ঠে) আমরা দরিদ্র, আমাদের
এই পর্ণকুটীরে সোনা, হীরা-মুক্তা রাখলে রাজ্যেই চুরি হয়ে যাবে,
সে কথা ভেবেছো ?

নির্মলা—তাই তো । কিন্তু—কিন্তু কী করা যায়
বলো তো ?

কৌশিক—আমিই যদি জানি তবে আর তোমাকে জিজ্ঞেসা
করছি কেন !

নির্মলা—ঘরের মেঝের গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে রেখে ওপরে
মাটি ঢাপা দিয়ে বিছানা পাতবো । ল্যাঠা যাবে চুকে—কেউ
জানতে পারবে না ।

কৌশিক—একেই বলে নারী-বুদ্ধি । তুমি আমার গৃহিনী
সচিব-সখি মিত ললিতকলাবিশোধী ।

নির্মলা—থাক আর শাস্ত্র আওড়াতে হবে না ; তুমি
একটুখানি বসো—আমি রান্না করতে চল্লুম ।

[শব্দগুলি দূর হইতে দূরান্তরে যাইয়া মিলাইয়া যাইবে]

কৌশিক—আচ্ছা এসো ।... লক্ষ্মীরা—লক্ষ্মীরা, আঃ, কী
মিষ্টি নাম ! সুন্দর ডাগর নয়ন—পদ্মের পাপড়ির মত চোঁট—
চাপার মতন গায়ের রঙ, থোকা থোকা রেশম চুলের নরম
রাশি—আহা-হা ! ভুবন ভোলানো রূপ বটে, এত
রূপ মানুষের দেহে !! আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য ! কিন্তু, লক্ষ
স্বর্ণ মুদ্রা যার দর্শনি তার দেখা পাওয়া—তার সঙ্গে
বাক্যালাপ ছরাকাজ্জীর স্নেহের স্বপন—বামন হয়ে চাঁদে হাত

দেবার কল্পনা আমার । আমি বৃদ্ধ কুষ্ঠরোগী, অল্পগ্রহ করে কি
ছুটো হেসে কথা আমার সঙ্গে সে বলবে ? কিন্তু যে আজ অত
হীরা জহরৎ মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিলে তার প্রাণ কি অত কঠোর
হবে ? নিশ্চয়ই দরিদ্রের প্রার্থনা সে শুনবে । ব্রাহ্মণীকে
কথাটা বলবো ? সে কী যাবে ? সে কী আমার আবেদন
তাকে জানাতে রাজী হবে ? না—হ্যাঁ—বলবো ;—কথায় বলে
সাহসে লক্ষ্মীলাভ । ব্রাহ্মণীকে বলবো—যা থাকে অদৃষ্টে ।
সে তাকে কি জানাতে রাজী হবে ? ওগো ব্রাহ্মণী !

[দূর হইতে সাড়া আসিবে, “যাই”—নিকটবর্তী হইয়া
“এখনো রান্না হয় নি—একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে ।”

কৌশিক—আরে পাগলী—রান্না নয়, শোন এইদিকে ।
বসো । বলবো তোমাকে ? বলবো ?

নির্মলা—কী কথা বলবে বলো ? তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী—
আমাদের মধ্যে লুকোবার কী থাকতে পারে ?

কৌশিক—তা বটে, কিন্তু নাঃ, নাঃ, তুমি শুনে রাগ
করবে । নাঃ, বলবো না ।

নির্মলা—যদি না বলতে চাও—চলি তবে ?

কৌশিক—আরে না-না যেও না—কী হবে ছাই ! বলেই
ফেলি—শোন ।

নির্মলা—কিছু বল্ছো না যে—কী শুনবো ?

কৌশিক—তুমি—তুমি—বুঝলে নির্মলা, লক্ষ্মীর বাড়ী
আমাকে একটুবার নিয়ে যাবে ?

নির্মলা—(বিস্ময়পূর্ণকণ্ঠে) কেন ? সে যা ভিক্ষা আজ
দিচ্ছে, তা আমাদের আশার অতীত । আবার গেলে কী
বলবে সে—ভারী লজ্জা কর্ছে গো ।

কৌশিক—সোনা রূপে ভিক্ষে করতে তার বাড়ী আমি
যাবো না—

নির্মলা—ওমা, তবে কিসের জন্তে ?

কৌশিক—এ-ই এ-ই তাকে প্রাণভরে একবার দেখবো
—আর এই ধরো গিয়ে তার সঙ্গে ধানিকক্ষণ কথা বলবো—
বাস্ ।

নির্মলা—হঁ, বুঝছি । কিন্তু—

কৌশিক—কিন্তু কি নির্মলা ?

নির্মলা—তুমি যে রূপ অদৃষ্ট প্রস্তাব কর্ছো এ যে
স্বপ্নের অতীত । সে রাণী—আমরা ভিখারী । তার বাড়ীতে

হয়তো ঢুকতেই পারা যাবে না ; সিংহ দরজা থেকে দরোয়ান
গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে ।

কৌশিক—সে কথা হয়তো সত্যি, কিন্তু—কিন্তু—যে এতো
দান করতে পারে—যে এতো ভদ্র—এতো রূপবতী—যার প্রাণ
এতো কোমল—সে কী এরূপ নির্মম হবে !!

নির্মলা—বিষয় বিশেষে লোকে কোমল কঠোর হয় ।

কৌশিক—কিন্তু নির্মলা, তুমি সতী—পতিব্রতা নারী—
ভেবে দ্যাখো, একদিকে লক্ষহীরার নিকটে লজ্জা, অপর দিকে
স্বামীর আদেশ—স্বামীর অনুরোধ ।

নির্মলা—সত্য বটে প্রভু, যা থাকে ভাগ্যে আমার—যাবো
আমি লক্ষহীরার নিকটে ।

তৃতীয় দৃশ্য

[লক্ষহীরার বাটা]

সহচরীদের নৃত্য ও গীত—

ভুলে যাও বঁধু—যাও যাও ভুলি

তব ঘুমঘোরে দিছি থোঁপা খুলি ।

নিশি যায় ফিরে,

আলো জাগে ধীরে,

ঝরে ফুলদল—পর্যো কেশে তুলি ॥

তুমি ভীকু সখী থাকো দূর নভে

তব সনে আর দেখা নাহি হবে ।

ক্ষমো মনোচোর

অপরাধ মোর

তব কথা তব প্রাণে উঠে ছলি ॥

সহচরী—গভীর মুখে নীরবে বসে আছে কেন সই
লক্ষহীরা ?

লক্ষহীরা—দেহটা ভাল নেই আজ সই । জানিস্ তো—
আজ জুপুরে ত্রিবেণী-তীরে সূর্য্যগ্রহণের স্নান করতে গেছলুম,—
দেখলুম, একজন কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী গান গেয়ে
ভিক্ষা করছে । সেই ব্রাহ্মণীর কণ্ঠস্বর কী মধুর—আঃ, এখনো
যেন কাণে আমার বাজছে সেই মধুমাখা স্বর ।

[সহসা বাহিরে ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল]

সহচরী—দ্বারবান, ঘণ্টাধ্বনি কে করে । সমাদর বসে
নিয়ে এসো তাকে ।

দ্বারবান—যে আজ্ঞা রাণী মা ।

লক্ষহীরা—এসো ঠাকুরণ, আমার প্রণাম নাও । আমি
জুপুরে নদীর ঘাটে তোমার আর তোমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় ।
এই এক্ষুণি তোমার কথা এদের কাছে বল্ছিলুম । বসে
ঠাকুরণ, এতো রাতে কী জন্তে এসেছো ?

নির্মলা—অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে এসেছি । একটু
নিরিবিলিতে বলবার সুযোগ চাই ।

লক্ষহীরা—আচ্ছা বেশ ! সই, তুমি এদের নিয়ে বাইরে যাও

[সহচরীদের প্রস্থানের নূপুর ধ্বনি শোনা গেল]

লক্ষহীরা—নতমুখে বসে রইলে কেন—বলো ঠাকুরণ ।

নির্মলা—বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে ।

লক্ষহীরা—কোনো লজ্জা কোরো না, তুমি যা চাও—
আমার সাধ্যায়ত্ত্ব হলে নিশ্চয় পাবে, বলো ।

নির্মলা—আমার স্বামী একে দরিদ্র ভিক্ষুক, তার কুষ্ঠরোগ
এখানে এসে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান—বামন হাত
চাঁদে হাত দেবার অমার্জনীয় স্পর্দ্ধা ; প্রস্তাব করতে লজ্জা
আমার মাথা কাটা যাচ্ছে ।

লক্ষহীরা—লজ্জার কি আছে । আগামী কল্য সন্ধ্যায়
তাকে আসতে ব'লো ।

নির্মলা—আঃ বাঁচলুম । আমার কল্পনাও শেষ অবধি
পরাজিত হলো । আশীর্বাদ করি লক্ষহীরা—স্বামী—সেই
যদি আমার সত্য হয়, আমি যদি সতী হই তবে আশীর্বাদ
করি—এই উদারতা, এই দয়ার জন্তে পর জন্মে সই
সাবিত্রী হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন ।

লক্ষহীরা—গীত—(আজি) তোমারে যেন স্মরি,

তুমি থেকে প্রভু আলোক ছায়ায়,

নিখিল মম ভরি ।

আমার পাপের বেদনার জ্বালা

পরশে তোমার হলো ফুলমালা

সেই মালা যেন রহে মোর গলে দিবস বিভাবরি ।

বাতাসে তোমার যে বাঁশী বাজে

শুনি সে ধ্বনি মোর হিয়া মাঝে

মনের কলুষ কামনা আমার

যেন গো যায় সরি ।

চতুর্থ দৃশ্য

লক্ষ্মীরা—এসো এসো কৌশিক ঠাকুর—প্রণাম নাও তুমি—
তুমিও প্রণাম নাও নির্মলা ঠাকরুণ, আজ আমার কী
সৌভাগ্য ! তোমাদের চরণস্পর্শে আমার গৃহ পবিত্র হলো।
তুমিই ধাতা। অক্ষম পঙ্গু স্বামীকে বহন করে এখানে নিয়ে
এসেছো। তুমি যথার্থ সত্যী সাধবী। আশীর্বাদ করো
যেন তোমার চরণ ধুলির যোগ্য হতে পারি।

কৌশিক—আমার কী ভাগ্য, আজ তোমার গৃহে অতিথি
হবার অদৃষ্ট আমার হয়েছে।

লক্ষ্মীরা—সে তো আমারি অদৃষ্ট ঠাকুর। বহুদূর হতে এসে
তুমি নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিশ্রান্ত হয়েছো।—চামর নিয়ে
কিছুক্ষণ ব্যজন করি।

কৌশিক—না—না, পরিশ্রান্ত আমি কিছুমাত্র হইনি।
লক্ষ্মীরা, তুমি বসো। তোমাকে প্রাণ ভরে দেখি।

লক্ষ্মীরা—আমি সামান্য বেগু মাত্র।—নরকের কীটতুল্য।
দেখবার মতো আমার মধ্যে কিছুই তো নাই ঠাকুর।
তোমার শ্রীপাদপদ্মদর্শনে আমার কিছু পাপ বিদূরিত হলো।

কৌশিক—বিনয় সৌজন্যে তুমি আদর্শ, দয়া দাক্ষিণ্যে তুমি
অতুলনীয়, রূপে লক্ষ্মী স্বরূপা।—শান্তিরূপিনী প্রীতি-
দায়িনী, আনন্দদাত্রী নারী। তোমার সেবা যত্নের সুখ
স্পর্শে আমার জীবন আজ আনন্দময় হলো। লক্ষ্মীরা,
তোমার সমগ্র দেহে লাভার্থ্যের অমৃত নিবারণ, প্রতি অঙ্গ
সঞ্চালনে বলকে বিদ্যুৎ ? তুমি বসো—একটা গীত গাও
যার ভাষায় আনন্দ—স্বরে আনন্দ।

লক্ষ্মীরা—আচ্ছা শোন (গীত)

সুন্দর হে লহ প্রণাম,

তোমার মহিমা আমার মাঝারে

লভে বিরাম।

তোমার সৃষ্টি এমন মধুর

দৃষ্টি তোমার চলে সুদূর

স্রষ্টা তুমি গো না জানি কেনম

নয়নাভিরাম।

কৌশিক—আঃ কী মধুর কণ্ঠ ! আমি যেন এই ধূলি-
মলিন পৃথিবী ছেড়ে কোথায় কোন স্বপ্নলোকে ছিলাম।
লক্ষ্মীরা একপাত্র জল দাও—তৃষ্ণা দূর করি।

লক্ষ্মীরা—কৃতার্থ হইলাম। তুমি আমার নিকটে জল
চেয়ে এই অপবিত্রাকে ধৃত করলে ঠাকুর। অপেক্ষা করো,
আমি জল নিয়ে এখনি ফিরে আসছি। (প্রস্থান)

কৌশিক—সর্বগুণসম্পন্ন এই লক্ষ্মীরা, কে বলে এই
নারী অপবিত্রা ? পৃথিবীতে এর আশ্রয়ই একমাত্র সুখের
স্থান। সাধ করে কি দেশের ধনীরা লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দর্শনী দিয়ে
দেখা করতে আসে ! ওকি ? ছুপাত্রে জল আনলে কেন
লক্ষ্মীরা ! স্বর্ণপাত্রে আর মৃৎপাত্রে কেন ? পৃথক স্থানের
জল পৃথক পাত্রে এনেছ কি ?

লক্ষ্মীরা—হ্যাঁ ঠাকুর, তোমার অনুমান সত্য। মাটির পাত্রে
গঙ্গার শীতল পবিত্র জল আর সোনার পাত্রে নন্দমার দূষিত
জল। যেটা তোমার অভিরুচি, পান করো।

কৌশিক—জল নিয়ে এ রহস্য কেন লক্ষ্মীরা ?

লক্ষ্মীরা—এই সহজ সত্য তুমি বুঝতে পারনি ঠাকুর।
বাইরের সৌন্দর্য্য, রূপের আকর্ষণ, দেহের প্রলোভন আমার যতই
থাকনা—তথাপি আমি ঘৃণ্য, আমার নিখাস দূষিত। আমার
রূপের বিষবাস্পে কত সংসার বে ছারখার করে দিয়েছি তার
পরিণাম না জানি কী ভীষণ ? মাটির পাত্রে পবিত্র গঙ্গাজল
তোমার শ্রী নির্মলা দেবী। পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ—শীতলতায়
হিম সদৃশ।

কৌশিক—অতি বড়ো নীতি শিক্ষা তোমার নিকট পেলাম
লক্ষ্মীরা। তুমি আমার জ্ঞান-নয়নকে উন্মীলিত করলে—
তুমি আমার গুরু। আমার মোহ আজ কেটেছে—আমার কমা
করো দেবী।

লক্ষ্মীরা—না ঠাকুর—কমা চেয়ে আমার অপরাধ বাড়ায়ো
না। তোমার যথাযোগ্য সমাদর হয়তো করতে পারছি না,
আমায় মার্জনা করো।

কৌশিক—আমার মোহ ভঙ্গ হয়েছে লক্ষ্মীরা। আমি এই
যজ্ঞোপবিত স্পর্শ করে বলছি, আর জন্মে যেন তুমি আমার
শ্রী নির্মলার স্মৃতি সত্যী হয়ে জন্মগ্রহণ করো।

লক্ষ্মীরা—আমার প্রণাম নাও ঠাকুর। জীবন ধৃত হোক,
পাপক্ষয় হোক।

বার্ণার্ড শ'র মস্তিষ্ক.

শ্রীমাগর ঘোষ

কিছুদিন আগে বিলাতের এক ধনী বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানের স্বার্থের জন্য মিঃ জর্জ বার্নার্ড শ' এর কাছে এক প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবের বিষয় ছিল, বার্নার্ড শ'র মৃত্যুর পর তাঁর মাথাটি তিনি পাঁচ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫,০০০ হাজার টাকা দিয়ে ইঙ্গিওর করে নিতে চান। এই ধরনের প্রস্তাব ওদের দেশে নূতন নয়, বিখ্যাত নাচিয়ের পা, গাইয়ের কঠনালী, শিল্পীর হাতের আঙ্গুল ইত্যাদি হাজার হাজার টাকায় মৃত্যুর আগে থেকেই ইঙ্গিওর করে রাখার খবর আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু বার্নার্ড শ'র মস্তিষ্ক কেনার প্রস্তাব থেকে প্রশ্ন উঠেছে যে, এই সব অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাঁদের মস্তিষ্ক বাস্তবিকই কোন কাজে লাগবে কিনা? জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব নরনারী খ্যাতি যশ ও প্রতিভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে গেছেন তাঁদের প্রতি বৈজ্ঞানিকদের এই ধরনের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে।

১৮২১ সালে নেপোলিয়ন যখন মারা যান, বৈজ্ঞানিকরা তাঁর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; তাঁদের ধারণা হলো যে নেপোলিয়নের মস্তিষ্কের আকার, ওজন ও আকৃতি থেকেই যোদ্ধা হিসাবে নেপোলিয়নের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। বৈজ্ঞানিকেরা খুঁটিনাটি করে নেপোলিয়নের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে দেখলেন যে সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় এই মৃত সম্রাটের মস্তিষ্ক আকারে ও ওজনে যথেষ্ট ছোট ও হালকা। আমাদের ধারণা যে মস্তিষ্ক ছোট হলেই তার বুদ্ধি কম হয় এবং বিরাট মস্তিষ্ক বিরাট প্রতিভারই পরিচায়ক। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের এই পরীক্ষা সে ধারণার ভুল ভেঙ্গে দিল।

বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধিৎসার খোরাক জোগানোর জন্যে মাথা দেওয়ার প্রথম ঘটনা নেপোলিয়ন নয়। তাঁর বহু বৎসর পূর্বে ডীন স্মিথ্ ছিলেন আরেকজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, ১৭৪৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সময়ে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা স্মিথ্‌র মৃত্যুর সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের তুলনা দিয়ে থাকেন।

এই মহাপুরুষের মস্তিষ্কও বৈজ্ঞানিকদের সন্তুষ্টিসাধনের জন্য কাঁচের শিশির ভেতর রেখে দেওয়া হয়েছিল।

স্মিথ্‌র মস্তিষ্ক পেয়ে বৈজ্ঞানিকরা অনেকখানিই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তা' আকারে ছিল বড় আর ওজনেও ছিল যথেষ্ট ভারি। বড় মস্তিষ্ক যে বেশী বুদ্ধির পরিচায়ক বৈজ্ঞানিকদের এই প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণে এই ঘটনাটি অনেকখানি সহায়তা করেছিল। কিন্তু এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে স্মিথ্‌র মস্তিষ্কবিক্রিটি ঘটেছিল; তবে বৈজ্ঞানিকরা নিঃসন্দেহে আমাদের একথা স্মরণ করিয়ে দেবেন যে বিরাট প্রতিভা বাদের তাঁরা অল্প বিস্তর পাগল হয়ে থাকেন।

গায়কের কণ্ঠ পরীক্ষা—

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকরা আর কেবলমাত্র মস্তিষ্ক পরীক্ষার মধ্যে নিজেদের কার্যকলাপ ধরে রাখতে চায় না, তার পরিধি অনেকখানিই ব্যাপক হয়েছে; এবং গায়কের কণ্ঠের সুরলহরী কি কারণে এমন মধুর স্বর্গীয় হয়ে ওঠে কঠনালীর পরীক্ষা করে তাঁরা এর কারণ বের করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গায়ক এনরিকো কারুসো—বার স্মৃদুর কণ্ঠের 'tenor' আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কারুর কণ্ঠে পাওয়া যায় নি তাকেও এই বৈজ্ঞানিকদের হাতে পড়তে হয়েছিল।

১৯২১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, এবং তাঁর দেহ সমাধি লাভের পূর্বেই নেপোলিয়ন ও স্মিথ্‌র মত তাঁকে নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা চলে।

কারুসোর বেলায় বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে কঠনালীর সর্ব মোটা পার্থক্যের মধ্যেই গায়কের কণ্ঠস্বরের গুণ নির্ভর করে। কিন্তু কারুসোর ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকরা কি প্রতিপন্ন করেছিলেন জানা নেই, তবে এটুকু জানি যে অস্ত্রোপচারের ফল বিশেষ কিছু সন্তোষজনক হয় নি।

কয়েক বৎসর আগে অপর একজন বিখ্যাত গায়িকা ডেম

নেলী মেলবা যখন মারা গেলেন তখন, কয়েকজন বৈজ্ঞানিক
অম্লরূপ অস্ত্রোপচারের জন্যে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠলেন।
কিন্তু মেলবা ছিলেন জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী, তাই
জনমতের প্রতিবাদে বৈজ্ঞানিকরা আর ছুরি ধরতে সাহস
করলেন না এবং মেলবার দেহের সঙ্গে তাঁর স্নধাকষ্ঠের গোপন
তথ্যও সমাধিস্থ হোলো।



জর্জ বার্গার্ড শ'

অপরাধ মনোবৃত্তির কারণ—

অপরাধীদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে এই ধরণের
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার হয়ত প্রয়োজন আছে, কারণ সমাজের
মঙ্গলের জন্যই অপরাধীদের মনোবিশ্লেষণ করা দরকার, এবং
দেখা গেছে যে অপরাধমনোবৃত্তি বংশানুক্রমে চলে এসেছে,
কিন্তু প্রতিভার ক্ষেত্রে এ সত্য কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি
উপরন্তু এর বিপরীতটিই অধিকাংশ স্থলে ঘটেছে।

অপরাধীদের পিতামাতার মধ্যে অপরাধের লক্ষণ দেখা

যায়, কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ লোকের ঘরেও বিরাট
প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হোতে দেখা গেছে।

নেপোলিয়নের মস্তিষ্ক ছিল আকারে ছোট এবং ডীন
সুইফটের ছিল মস্তবড়, তথাপি এরা দুজনেই ছিলেন বিরাট
প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি; কারুসো ও মেলবার কণ্ঠনালীর
তুলনামূলক পরীক্ষা করলে হয়ত দেখা যেতো সম্পূর্ণ উন্টো
ধরণের তবুও তাঁরা দুজনেই তাঁদের অপূর্ব কণ্ঠমাধুর্যের জন্তে
বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। সেক্সপীয়রের মস্তিষ্ক
পরীক্ষা করলে বৈজ্ঞানিকরা হয়ত দেখতেন যে তা আকারে ও
ওজনে নিতান্তই সাধারণ, অথচ সেক্সপীয়রের কাব্য-প্রয়াস ঠিক
তাঁর বিপরীত সাক্ষ্যই দেবে।

বৈজ্ঞানিকরা যদি তাঁদের এই চেষ্টার দ্বারা কোন একটা
প্রণালী আবিষ্কার করে নিরেট মুখ লোকদের মধ্যে কিছু
পরিমানে বুদ্ধির যোগান দিতে পারতেন অথবা, বেতারের
মারফতে প্রায়ই যেসব উৎকর্ষ ও ভয়ঙ্কর গলার পরিচয় পাই
তাঁদের গলার স্বর যদি একটু মধুর করে দিতে পারতেন তাহলে
বলা যেতে পারত যে প্রত্যেক মৃত মহাপুরুষের মস্তিষ্ক সংগ্রহ
করে অথবা প্রত্যেক কোকিলকণ্ঠ গায়িকার কণ্ঠনালী ছেদন
করে তাঁরা উপযুক্ত কাজই করেছেন।

দুঃখের বিষয়, বৈজ্ঞানিকরা আমাদের এখনও দ্বিতীয় কারুসো
দেখাতে পারলেন না; এবং যদি আমরা সুসোলিনীকে বলি
আধুনিক নেপোলিয়ন আর বার্গার্ড শ' কে বলি বিংশ শতাব্দীর
সুইফট তাতে বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্বের কিছু নেই।

বার্গার্ড শ' কে যখন তাঁর এই মস্তিষ্ক ইন্সপেক্টর করার সম্বন্ধে
প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা প্রত্যেক
বৈজ্ঞানিক বারা সার্জনের ছুরি দ্বারা প্রতিভার কারণ খুঁজে
বার করবার জন্তে সচেষ্ট, তাদের বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মিঃ শ' উত্তরে বলেছিলেন—“আমার মাথায় যে কিছু
আছে এবং আমি যে তা অন্যকে দিয়ে যেতে পারি এ সম্বন্ধে
আমার কোন ধারণাই ছিল না।” অর্থাৎ যদি কেউ
বার্গার্ড শ' হতে চায় তবে বিজ্ঞান তাঁকে তা করতে পারবে না।

মেয়েদের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী •

বর্তমান যুগে স্ত্রী-শিক্ষার পদ্ধতি যে কিরূপ হওয়া উচিত—সে বিষয় কিছু বলতে গেলে, সর্বপ্রথম আমাদের আধুনিক শিক্ষার কুফল ও সফলগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে হবে। উৎকৃষ্ট শিক্ষাই যে জীবনের সম্পদ তুল্য সহায়তাকারী, জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ এবং জাতিকে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ, উন্নত ও মহনীয় করে তোলবার প্রথম সোপান—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এবং এই শিক্ষাও যে নারীজাতির একান্তভাবে প্রয়োজন এ বিষয় কোনও মতবৈধ থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষা দানের পদ্ধতি কোন আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হলে মেয়েদের শিক্ষা অর্জন সার্থক হবে—এ সমস্যাটি বড়ই জটিলতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। একথা অবিস্মরণীয় সত্য যে—বর্তমানের নারী-শিক্ষার ধারা আদৌ মেয়েদের উপযোগী নয়। এই শিক্ষা প্রবর্তনের মূলটী এই কথা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করছে। রাজ্য পরিচালনার সুবিধার জন্ত কতকগুলি কেরানী তৈয়ারীর উদ্দেশ্যেই এই শিক্ষার প্রবর্তন লর্ড মেকালে করেছিলেন। তবে এ বিষয় দেশের উন্নতিকামী মনীষিবৃন্দ যে আলোচনা না করেছেন এমন নয়। কিন্তু একটা সর্বসম্মতকারী মতের একান্ত অভাবেই আজও পরিপূর্ণভাবে তা কার্যে পরিণত হয়ে উঠতে পারছে না।

অনেকে বলেন, “শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের কোনও স্বতন্ত্র ধারা থাকতে পারে না। কেননা উত্তর জীবনে নারীকে যখন হতে হবে শিক্ষিত স্বামীর যোগ্য স্ত্রী, তখন পুরুষের সমান শিক্ষা মেয়েদের একান্তভাবেই প্রয়োজন। নারী ও পুরুষের বিভিন্নমুখী শিক্ষার ধারা পুত্রী অন্তরের ধারাকে মিলিত করতে পারবে না—ফলে সংসার হবে ব্যর্থ, মরুময়; জীবনের সফলতার আলো তাদের অন্তর্জ্বল, প্রান হবে।”

অনেকে বলেন, নারী ও পুরুষের কর্মজীবনে কোনও

বিভিন্নতা নেই; থাকতে পারে না স্বতরাং উভয়ের শিক্ষা ধারা একমুখী হওয়া উচিত যার দ্বারা নারী পুরুষের কর্মজীবনে তার পাশে দাঁড়াতে সামর্থ্য লাভ করবে। কেননা এই অর্থসমস্যার যুগে নারী ও পুরুষের উপার্জন ব্যতীত সংসারের গতি অচ্ছল হতে পারে না।”

আর এক দল বলেন—আধুনিক শিক্ষার ধারা নাকি মেয়েদের আদৌ উন্নত করতে পারে না,—করে অবনত, উচ্ছ্রাবল, অসংযমী। তাঁরা মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতা করতে গৃহকারাগারে অবরুদ্ধ করে রাখেন। এদের মধ্যে অধিকাংশরাই আবার পুস্তকগত শিক্ষা দেওয়াটাকেও নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন ও অমিতব্যয়িতা বলে মনে করেন। এবং কয়েকজন গৃহশিক্ষকের আয়ত্যাধীনে বিদ্যালয়ের শিক্ষামুখায়ী মেয়েদের শিক্ষা প্রদান করে থাকেন—এর মূলে কলার শ্রেষ্ঠতম বিবাহের ইঙ্গিত সম্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা কিন্তু এই যুক্তিগুলিকে কোনও মতেই সমর্থন করতে পারি না, মনে হয় এই কথাই, এর ফলে স্ত্রীপীকৃত ব্যর্থতায় নারীর শিক্ষা অর্জন পুঞ্জিভূত হয়ে উঠবে; ভারতের বৈশিষ্ট্য শ্রোতের মুখে ভূণের মত ভেসে যাবে। ভারতনারীর আদর্শ খর্ব হবে।

পুরুষের সম শিক্ষা অর্জন—নারীর শিক্ষা লাভকে সার্থক করে না, পুরুষের সমকক্ষতা লাভের নিদারুণ একটা প্রয়াস শিক্ষা অর্জনের মূলে মুখ্যতম উদ্দেশ্য হয়। ক্রমশঃ দেখা যায় এই মনোবৃত্তি তাদের পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার অদম্য বাসনায় পর্যাবসিত হয়।

কিন্তু জগতের এই বিরাট কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করা নারীর কর্তব্য নয়। সহযোগিতা করা নারীর কর্তব্য। সহযোগিতা, উদ্যম ও প্রেরণা দ্বারা তাকে কর্মসজীব করে তোলাই নারীর প্রকৃত ধর্ম। পরবর্তী জীবনে পতি পত্নীর অন্তরের স্রোত

একমুখী হওয়ার চেয়ে, নারীর উচ্চ ও প্রসারিত হৃদয়ের, স্নেহময় দূরদৃষ্টির সম্যক উপলব্ধি, শক্তির প্রকৃত জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃত্তির পরিচয় প্রদান করাই নারীর শিক্ষা অর্জনের পরিপূর্ণ সার্থকতা।

যারা বলেন নারী ও পুরুষের কর্মজীবন বিভিন্নমুখী হতে পারে না—একমুখী হওয়া কর্তব্য; কিন্তু নারী ও পুরুষের দেহ গঠনের পার্থক্যই প্রমাণ করছে, নারীর প্রধান কর্মজীবন তার অন্তঃপুরে। সন্তানের জন্ম প্রদান তাদের কর্তব্যেই হবে। তবে একথা সত্য যে সন্তানের জন্মপ্রদান করার চেয়ে, তাকে তিলে তিলে গঠন করে তোলাই সব চেয়ে কঠিন। এই দায়িত্ব গ্রহণ করা একমাত্র জননীর কর্তব্য। হয়তো বা প্রশ্ন আসতে পারে, পাশ্চাত্যের অনেক দেশে স্টেটের পরিচালনায় সন্তান গঠন কি সম্ভব হয় না?

হয়তো বা সম্ভব হয়, গড়ে ওঠে শিশুরা স্বাস্থ্যে বীৰ্য্যে সম্পন্ন হয়ে কিন্তু প্রত্যেক মাসুকের উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিকাশই প্রকৃত মানবতার পরিচয়; এবং জননীর শিক্ষার প্রভাবেই শিশু উন্নত হতে সমর্থ হয়।

অতএব নারীর কর্মজীবন কোনও মতেই বাহির প্রাঙ্গণে হতে পারে না। তার ফলে পুরুষের বেকারসমস্যা বেড়ে যাবে—নারী তার কর্তব্য ও আদর্শ জীবনযাত্রা হতে বিচ্যুত হবে। তবে নারীকে বাইরের জগতের সাথে যোগ রাখতে হবে, প্রস্তুত থাকতে হবে, যে কোনও সমস্যাই তার স্মৃতিতে উপস্থিত হোকনা কেন; সে যেন তার সমাধান করতে অগ্রসর হতে পারে। অর্থাৎ নারী বাইরের যে কাজ গ্রহণ করবে, তার মধ্যে যুক্তি থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন।

যারা আধুনিক শিক্ষার শুধু মন্দ প্রান্তটা দেখে মেয়েদের স্কুল কলেজের স্বন্দর জীবন যাত্রা হতে বঞ্চিত করেন, গৃহের অবরুদ্ধ কারাগারে বন্দী করে রাখেন—তাদের মতকেও আমরা সমর্থন করি না। মেয়েদের চরিত্রের পবিত্রতা ও পঙ্কিলতা সমস্ত গৃহশিক্ষার উপর নির্ভর করে—এ বিষয় কোনও মতেই বিদ্যালয় অপরাধী হতে পারে না। ওই গৃহের অবরোধ প্রথায় মেয়েরা দল মেলে ফুটে উঠতে ক্ষীণ নিজীব ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। বাইরে যে একটি বিশাল জগৎ আছে, সে সম্বন্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ হয়, বাইরে

জগতের সাথে আদান প্রদান করতে শেখেনা ত্বরী, পরাধীনতার নিরন্তর বন্ধনে একটা স্বাধীন ভাব মনে জেগে উঠতে পারে না, এবং চিন্তাশক্তি হয় না সুরিত। চলার গতি মুক্ত ও অবাধ হয় না। এই ভয় স্বাস্থ্য, অকর্মণ্য জড় পদার্থ মেয়েদের কাছে সংসার সমাজ, কোনও কিছুই আঁশা করতে পারে না। ফলে ভয়স্বাস্থ্য শিশুসংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যায়; জাতি গঠনের পথে তারাই অন্তরায় স্বরূপ হয়।

তাহলেই বোঝা যায়, শিক্ষা নারী জাতির একান্ত ভাবে প্রয়োজন, তবে সে শিক্ষা মেয়েদের উপযোগী না হলে শিক্ষা অর্জন তাদের সার্থক হবে না।

এখন কথা এই, বর্তমানের এই চলিষ্ণু যুগে কিরূপ শিক্ষা নারীর উপযোগী হবে?

শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা, এবং শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের উত্তরই—বর্তমানের এই সমাজ মীমাংসার প্রথম সোপান হবে। কিন্তু মেয়েদের এই শিক্ষা অর্জনের মূলে কোনও একটা অর্থের ইঙ্গিত সম্পৃষ্ট হয়ে ওঠে না, ডিক্রীর মোহ, যোগ্য স্বামী লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং ফ্যানসন ও ঠাইলকে আয়তাবীন করা শিক্ষা লাভের তাদের মুখ্যতম উদ্দেশ্য হয়। সেইজন্য শিক্ষা অর্জনের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা কি এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই তাদের মনে জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে না। তবে এর জগ্ন মেয়েদের দায়ী করা চলে না। শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

প্রত্যেক দেশের শিক্ষা দানের প্রণালী অনেকটা একরূপ হলেও জাতিগত বৈশিষ্ট্য সেই শিক্ষার মূলে অন্তর্নিহিত থাকে। এই জাতিগত বৈশিষ্ট্যের অভাবেই মেয়েদের শিক্ষা অর্জন সার্থক হয় না। এদেশের মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য কি সে কথা তারা বুঝতে পারে না। তাই স্রোতের মুখে ভুগের মত ভেসে চলে তারা। পাশ করে, ডিগ্রী পায়, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে শিক্ষা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না। কার্যকরী হয় না। ফলে এই শিক্ষার প্রভাবে তারা মার্জিত রুচিতে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করলেও, স্নেহময় মস্তিষ্ক, ও সুরিত চিন্তা শক্তির পরিচয়

প্রদান করিতে সমর্থ হলেও—এই শিক্ষা মেয়েদের নারী-জেনোচিত কোমল বৃত্তিগুলির পুষ্টি সাধনের পথে প্রতিকূল স্বরূপ হয়ে উত্তর জীবনে যথেষ্ট বিরোধ সৃষ্টি করে।

এই প্রমাণগুলি বর্তমান মেয়েদের শিক্ষা ধারার কুফল—সুফল গুলিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। অতএব এই কুফল বিদূরণে, সুফলগুলির আয়ত্তাধীনে যে শিক্ষার প্রবর্তন হবে, সেই শিক্ষা নিশ্চয়ই এ দেশের মেয়েদের উপযোগী শিক্ষা হবে। স্বতরাং বর্তমানের শিক্ষাধারাকে কিছু কিছু পরিবর্তিত ও সংস্কৃত করতে হবে। এই শিক্ষা পরিবর্তনের মূলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য কি, এই কথাই সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে। শিক্ষা শব্দের অর্থটিকে বিশ্লেষণ কল্পে সম্যক উপলব্ধি হয়, মানব জীবনের সমষ্টিগত জ্ঞান, ও অভিজ্ঞতা লাভই শিক্ষা অর্জনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। নারী-পুরুষের উভয়েরই এই প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে বিভিন্ন মানব-মনের বিভিন্ন রুচির পরে, তবে এই প্রয়োজনীয়তাকে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তির পরে

পরিবর্তন করা একান্তভাবে উচিত। তবেই শিক্ষা প্রদানের রীতিতে একটি অর্থের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হবে এবং প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্যের কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষা অর্জন সার্থক হয়ে উঠবে। মাতৃভূমি ভারতের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য—সমগ্র জাতির স্বমুখে পথপ্রদর্শক রূপে কল্যাণ ও স্নেহের প্রদীপ জালিয়ে রাখাই ভারত-নারীর আদর্শ। স্বতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বিভিন্নমুখী শিক্ষার ধারা একান্ত ভাবে প্রয়োজন—এবং সেই শিক্ষাই নারীকে তার যাত্রাপথে একটি আদর্শ সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেবে। পুরুষ ও নারীর একমুখী শিক্ষার আয়ত্তাধীনে—অনর্থক মেয়েদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহসম্পদকে অকালব্যর্থ্যে পরিণত করে। বহুব্যাপ্ত শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে কি কোন সার্থকতা ও অর্থের ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট হতে পারে? উচ্চ গণিতশাস্ত্র উচ্চ

বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থ ও তর্কশাস্ত্র উত্তর জীবনে কি তাদের কোনও উপকার সাধিত করতে পারবে? বয়ং করবে অপকার সাধনই। কেননা বারো তেরো বৎসরের মধ্যে মেয়েদের যৌবন উন্মেষিত হয়, এই সময় যদি তারা কঠিন ঔক কব্ধে কব্ধে অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলে স্বাস্থ্যসম্পদকে অকালভগ্নতায় ব্যর্থ করে, তবে সেই মেয়ের

কাছে তার পরবর্তী জীবনে কেউ কি সবল সুন্দর সন্তানের কামনা করতে পারে?

অতএব মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাগুলির পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন না হলেও উচ্চ প্রাথমিক হাতে শিক্ষা-ধারার কিছু কিছু পরিবর্তন একান্তভাবেই আবশ্যক এবং পুস্তক নির্বাচনে অত্যন্ত সূক্ষ্মতম বিচার ও চিন্তাশক্তির প্রয়োজন। যে পুস্তক মেয়েদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে সেই পুস্তক নির্বাচন সার্থক হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই পুস্তক নির্বাচনের সূক্ষ্মতম বিচার-শক্তির অভাবে মেয়েদের শিক্ষা অর্জন ব্যর্থ হয়ে যায়।

• স্বতরাং মেয়েদের শিক্ষা প্রদানের মূল মন্ত্রই হবে—তারা যেন পরবর্তী জীবনকে সুন্দর, স্বচ্ছ, সার্থক ও মহনীয় করে তুলতে পারে। তবেই মেয়েদের শিক্ষাধারায় একটি অর্থের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, এবং শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা কি তা উপলব্ধি করা যাবে, উদ্দেশ্য সাধন হবে।

যেমন তাদের ঘরে এবং বাহিরে সামঞ্জস্যের সঙ্গে যোগ-সুত্র রেখে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন, শিশু পালন করতে হবে, নিজের জাতির বিষয় চিন্তা করতে হবে, সমাজের রাষ্ট্রের উন্নতি করতে হবে। এই আদর্শই বর্তমানের মেয়েদের শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এবং প্রধানতম লক্ষ্য হবে। তবেই মেয়েদের শিক্ষা অর্জন সার্থকতার বেদীমূলে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে।

সৌষ্ঠব ও রম্য বিকাশে নিপুন গৃহরচনার পরিচয় প্রদান করাই গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের পরিপূর্ণতা। স্বতরাং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, মিতব্যয়িতা ও পারিপাট্য সম্বন্ধে চাই মেয়েদের ঐকান্তিক অভিজ্ঞতা। এই জ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, রন্ধনবিদ্যা খাদ্যদ্রব্য ও আলো বাতাসের সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন এবং মিতব্যয়িতা সূক্ষ্মতলে গৃহরচনায় পারদর্শিতা লাভ করে সৃষ্টিহীন হতে পারে এ বিষয় ব্যবস্থা করতে হবে। এদেশের মেয়েদের নিষ্ঠায়, ত্যাগে, মাধুর্যে স্নেহে স্বামীর আদর্শ সহধর্মিনী হওয়া জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য, কর্তব্য ও ধর্ম। তারা যেন পরবর্তী জীবনে শিক্ষার সহায়তায় এই লক্ষ্যকে আয়ত্তাধীন করতে পারে। সহধর্মিনী মানে শুধু স্বামীর বিলাসসঙ্গিনী নয়।

যে স্ত্রী জননীর স্নেহ উদ্বেলে, জায়ার ভালবাসায়, তনয়ার শাসনে সেবায়, মন্ত্রীর স্তম্ভনায়, সাধিকার ভক্তি অর্চনায় এবং স্বহৃদের গানে গলে স্বামীর বেদনা ও আনন্দের ভাগ সমান অংশে গ্রহণ করে ছায়ার মতই পারে স্বামীর পাশে বিরাজ করতে সেই মেয়েই হয় প্রকৃত আদর্শ স্ত্রী। আমার মনে হয় প্রকৃত জ্ঞানীর স্বপ্ন বিচারে পুস্তক নিবাসন এ বিষয়ে সহায়তা করবে।

আদর্শ জননী শিশু পালনে সার্থকতা লাভ করতে পারবে। যে-মেয়ে সমর্থ হবে তার পরবর্তী জীবনে আপন সন্তানকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, চরিত্রে, জ্ঞানে উন্নত, মননীয় এবং জাতির সম্পদতুল্য রূপে গঠন করে তুলতে সেই মেয়েই আদর্শ জননীর আসনকে অলঙ্কৃত করবে, সমৃদ্ধ করবে। মায়ের উপরই সন্তানের চলার পথের পবিত্রতা, পঙ্কিলতা, ব্যর্থতা, সার্থকতা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রয়োজন এই সকল বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। শিশু মৃত্যুর হার আমাদের দেশে অত্যধিক—অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জননীর অজ্ঞতাই এর মূল থাকে। সেই জন্তু এই সম্বন্ধে মেয়েদের সম্যক জ্ঞান প্রয়োজন। তারা যেন তাদের শিশু সন্তানকে মৃত্যু ও দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারে এবং তাদের নিত্যকার খুঁটিনাটি রোগগুলি হতে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ধাত্রী শিক্ষা এ বিষয়ে মেয়েদের প্রচুর সহায়তা করবে। এই সন্তানই জাতি গঠন করবার প্রথম সোপান ও ভবিষ্যত জাতির নাগরিক।

অন্তঃপুরের নারীর বতর্বা, এইখানেই স্ত্রী সম্পাদনে পরিপূর্ণতা লাভ করবে; কমিনীরূপে বহির্জগৎকেও তার কল্যাণবর্ষী স্পর্শে সহায়তা করতে হবে। এর জন্তু নারীকে দরদ দিয়ে দেশকে ভালোবাসতে হবে, সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং জাতির দুঃখদুর্দশার কথা অন্তরে সম্যক অনুভব করে তার লাঘব করবার চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং তাদের মনে দেশপ্রেম, জাতীয়তাপ্রেম জাগ্রত করে তোলা শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্ততম প্রধান লক্ষ্য হবে। গঠনমূলক কার্য্য করাই মেয়েদের সমাজসেবার প্রথমতম সোপান। সমাজকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বেড়া জাল হতে মুক্ত করাই জাতির উন্নতি সাধনের স্বপ্রশস্ত

পথ। তবে আমাদের দেশে এই কুসংস্কারের অন্ত নেই, তবে জাতিভেদ প্রথা, পর্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহ—এইগুলি জাতিকে উন্নত হওয়ার পথে প্রচুরতম বাধার সৃষ্টি করে। এর মূলে আছে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা। সুতরাং মেয়েদের এই নিরক্ষরতা বিদূরণ ও শিক্ষার প্রসার করতে হবে। যদিও এ কথা সত্য যে প্রচুরতম অর্থ, রাষ্ট্রের সহায়তা ব্যতিরেকে এ উদ্দেশ্য সাধন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তবুও সে জন্তু পিছিয়ে পড়লে চলবে না, অজ্ঞান দেশের কথা ভেবে, অপরিণীম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, সহিষ্ণু হতে হবে। সম্ভবদ্বন্দ্ব শক্তিতে মহিলা সম্মেলনের আহ্বান করে, শিক্ষার মর্ম তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, পাঠস্পৃহা তাদের মনে জাগ্রত করে তুলতে হবে। তবেই তারা অন্ধকার কারাগারের ভেতর থেকে আলোর আভাশ অন্তরে অনুভব করতে পারবে।

উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারাই মেয়েরা তাদের কর্মময় জীবনকে সার্থক করতে ও এই আদর্শকে আয়ত্তাধীন করতে সমর্থ হবে। তবে এই অর্থসমস্তার যুগে শিক্ষাকে অর্থকরী ভিত্তির পরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কার্য্যকরী শিক্ষা মেয়েদের প্রদান করতে হবে। তারা যেন পরবর্তী জীবনে প্রয়োজন মত একমাত্র শিক্ষয়িত্রী ব্যতীত, অজ্ঞ সহপাঠ্যে, স্বাধীনভাবে অর্থ অর্জন করতে পারে। সূচিশিল্প, ধাত্রীবিদ্যা, বয়ন, চিত্র ও সঙ্গীতকলা শিক্ষাগুলি তাদের যোগ্য শিক্ষা হবে। কেননা প্রত্যেক মেয়ের শিক্ষয়িত্রী পদ প্রাপ্তির যোগ্য শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে দেখা যায় অর্থের প্রতিকূল আবহাওয়ার তাদের যাত্রাপথ বড়ই দুর্ভাগ্যবশত হয়, অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে তাদের কলঙ্কিত জীবনও যাপন করতে হয়। এ বিষয়-ক্ষেত্র-গুরুমুদয় দত্ত প্রতিষ্ঠিত “সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি”র শিক্ষা, এবং প্রদেয়া লেডি অবলা বস্তুর রাণীবিদ্যা মন্দিরের শিক্ষা পদ্ধতিগুলি অনুকরণযোগ্য। তবে প্রত্যেক মেয়ের প্রত্যক্ষভাবে অর্থার্জনকে আমরা সমর্থন করি না, এর মধ্যে কোনও যুক্তির সন্ধান পাই না। এর ফলে নারী হবে তার কর্তব্য হতে বিচ্যুত। একযোগে যদি নারী ও পুরুষ উভয়েই কর্মক্লান্ত দেহ ও মন নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তবে কে কার সেবানির্ব্বরে প্রতি

বিদূরণ করবে? সেবা ও স্নেহের মূর্তিমতী রূপই এ দেশের মেয়েদের প্রকৃত রূপ ও আদর্শ। স্বতরাং বিধবা, স্বামীস্নেহ বঞ্চিতা, অজ্ঞাতকুলশীলা এবং নিতান্তই দরিদ্র যারা, তারা যেন কারও অনুকম্পার আশ্রয় গ্রহণ না করে, অর্থকরী ও কার্যকরী শিক্ষার দ্বারা আত্মনির্ভরশীলা হতে পারে এবং নিজের দেশের ও দেশের উপকার সাধন করতে পারে। এই প্রমাণগুলি হতে সম্যক উপলব্ধি করা যায়, মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন কেন? উদ্দেশ্য কি?

অতএব সেই শিক্ষাই মেয়েদের উপযোগী হবে যে শিক্ষাপদ্ধতিতে একটী অর্থের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এবং যুক্তি প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে পারবে। এবং সেই শিক্ষা অর্জন দ্বারাই মেয়েরা সার্থক হবে, সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে উন্নতি সাধন করবে, জাতি পরম

উপকৃত হবে ও জ্ঞান গৌরবের আভিষেক আশুত হয়ে উঠবে।

তবে শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি মেয়ে দেখা যায়—যারা হয় বুদ্ধিসম্পন্ন ও অপারিসীম প্রতিভাশালিনী; এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান অর্জনই শিক্ষালাভের মুখ্যতম উদ্দেশ্য হয়। এই সকল মেয়েদের পুরুষের সমশিক্ষা প্রদান করে তাদের প্রতিভা ও চিন্তাশক্তিকে বিকশিত ও সুরিত করে তোলা একান্ত ভাবে কর্তব্য। কেননা এই সকল মেয়েদের প্রতিভা দেশ ও সমাজকে অনেক কিছু প্রদান করতে পারে। তবে গৃহশিক্ষার আয়তাবধানে তাদের স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করতে হবে, সংযম শিক্ষা দিতে হবে। তবেই হবে সে শিক্ষা সার্থক।

জীবাণু

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

জীবাণুর (Bacteria) নাম আমরা সকলেই শুনেছি, ওদের সঙ্গে পরিচয়ও অনেকের সঙ্গেই আছে। কিন্তু জীবাণু যে উদ্ভিদ তা হয় তো অনেকেরই জানা নেই।

উদ্ভিদ বললেই আমরা মনে করি তার ডাল থাকবে, গুড়ি থাকবে, পাতা থাকবে, শিকড় থাকবে। জীবাণুর এ সব কিছুই নেই। তবু জীবাণুকে উদ্ভিদ বলা হয়। তার কারণ জীবাণুর খাদ্য পরিপাক করবার ক্রিয়া উদ্ভিদের মত। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের মতো নয়। নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যেও জীবাণু একেবারে সর্বনিম্নতম শ্রেণীর উদ্ভিদ। তাদের দেহ মাত্র একটি কোষে (cell) তৈরী। এরা বংশ বাড়াই নিজের দ্বিখণ্ডিত করে।

জীবাণু! এত ছোট যে খালি চোখে তো দূরের কথা আতস দিয়েও তাদের দেখা যায় না। তাদের দেখবার জন্য রীতিমত জোয়ালো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবশ্যক। ২৫ হাজার জীবাণুকে যদি পাশাপাশি রেখে এক রেখার

সারবন্দী করে সাজানো যায় তাহলে সে রেখাটির আয়তন হবে মাত্র এক ইঞ্চির মত।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে তাকালে তাদের চেহারা দেখায় নানা রকমের। কোন কোন জীবাণুর চেহারা গোল বলের মতো, কোন কোন জীবাণুর চেহারা ডিমের মতো একটু লম্বা ধরণের, কোন কোন জীবাণু দেখতে ইঁকুপের মত মোচড়ানো, কোন কোন জীবাণুর চেহারা অতি ক্ষুদ্র একটি খড়কে কঠির মতো। এ ছাড়া আরো নানা রকমের জীবাণুতে আমাদের চারপাশের হাওয়া পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

জীবাণুর মতো অত বড় শক্ত মানুষের আর কিছুই নাই। আমরা যেসব অস্থে ভুগি তার অধিকাংশই হয় এই সব জীবাণুর আক্রমণে। টাইফয়েড, কলেরা, ডিপ্‌থিরিয়া, বন্ট্রা প্রভৃতি অতি সাংঘাতিক রোগের

আলাদা আলাদা জীবাণু আছে। শরীরের মধ্যে তাদের আক্রমণেই আমাদের এসব রোগ হয়।

যেদ্রুপেই হ'ক এই সব জীবাণু আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমাদের রক্তকে আক্রমণ করে। রক্তকে আক্রমণ ক'রেই এরা সংখ্যায় বাড়তে থাকে হু হু ক'রে। একটা কেটে হয় দুটো, দুটা কেটে হয় চারটা, চারটা কেটে হয় আটটা। এইভাবে দেখতে দেখতে আমাদের শরীরের রক্ত এই সব জীবাণুতে একেবারেই ছেয়ে যায়। তখন শরীরের যে কোন জায়গা হতে রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করলে তার ভিতরে দেখতে পাওয়া যায় এই সব রোগের অসংখ্য জীবাণু। এই সব জীবাণু দেখেই ডাক্তাররা আমাদের শরীরের রোগ নির্ণয় করেন। তখন ডাক্তারদের চেষ্টা হয় সেই সব জীবাণুকে মারবার।

কিন্তু একবার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করলে তাদের মারা তেমন সহজসাধ্য কাজ নয়। ওরা যে রকম হু হু করে বাড়ে তাতে ডাক্তারদের চিকিৎসাশাস্ত্র অনেক সময়েই তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না। সেই জন্য শরীরকে রোগমুক্ত করে রাখতে হ'লে প্রথম দেখা দরকার যাতে আমাদের শরীরে এই সব জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে।

আমাদের শরীরে এই সব জীবাণু প্রবেশ করে নানা পথে। আমরা যা খাই, যা পান করি তার মধ্যে জীবাণু থাকতে পারে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে হাওয়ার ভিতর দিয়ে জীবাণু আমাদের শরীরের ভিতর প্রবেশ করতে পারে, শরীরের কোথাও কেটে গেলে সেই ক্ষত স্থানের রক্তের মধ্যেও জীবাণুর আক্রমণ হতে পারে।

যা কিছু নোংরা, যা কিছু ময়লা তাই অধিকাংশ জীবাণুর খাত। তাদের গায়ে উদ্ভিদদেহের পাতার সবুজ রং নেই। সেই জন্য তারা অগাছ উদ্ভিদের স্থায় নিজেদের খাত নিজেরা তৈরী করতে পারে না। তাই তাদের জীবন ধারণের জন্য নির্ভর করতে হয় অন্তর তৈরী খাতের উপর। কোন জীবকে মেরে ফেলে রেখে দিলে দু'এক দিনের মধ্যেই তা পচতে আরম্ভ করে। এই পচবার কারণ মৃতদেহের উপর জীবাণুদের আক্রমণ। জীবাণু কোন কিছুকে আক্রমণ করেই নিজের শরীর হ'তে এক

রকমের রস নির্গত করে। সেই রস কাজ করে অনেকটা হজমী রসের মতো। তাতে মৃতদেহকে পচিয়ে তার ভিতরের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানকে আলাদা করে ফেলে। তাই হয় তখন তাদের খাত। জীবাণু যদি না থাকতো তাহলে কোন জিনিষই পচতো না।

ডাক্তারগণ আমাদের শরীরের মধ্যে কোন কোন রোগকে ঠেকাবার জন্য টিকে দিয়ে থাকেন। বসন্তের টিক আমরা প্রায় প্রতি বৎসরই নিয়ে থাকি। তাছাড়া টিকে নিয়ে টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগের আক্রমণ-কেও ঠেকানো যায়।

টিকে নিয়ে কী করে যে রোগ ঠেকানো যায় সে সম্বন্ধ আমাদের অনেকেরই কোন জ্ঞান নেই। কবিরাজেরা অনেক সময় রোগের এক বিষকে ক্ষয় করবার জন্য শরীরে অন্য এক বিষ প্রয়োগ করে থাকেন। এ রকম ব্যবস্থাকে বিবেচনায় রাখা বলা হয়। টিকে দেওয়া ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকমের।

আমাদের শরীরে জীবাণুর আক্রমণ হলেই রক্তের মধ্যে এক রকমের বিষ জমে। তখন শরীরের নিজ হ'তেই চেষ্টা হয় সেই বিষকে নষ্ট করবার। শরীরের যেসব কোষে (Cell) জীবাণুর আক্রমণ হয়, শরীর সে সব কোষ থেকে তখন এক রকমের রস বের করে। এই রসকে বিষনাশক রস (antitoxin) বলা যেতে পারে। এই বিষনাশক রস যখন জীবাণুর আক্রমণজনিত বিষকে নষ্ট করতে পারে তখনই আমরা রোগমুক্ত হই। নষ্ট করতে না পারলে সেই রোগ বাড়ে, তখন রোগ হয় কঠিন।

আমাদের দেহ-কোষের যে এইরূপ বিষ-নাশক রস বের করবার ক্ষমতা আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের শরীরে হাম, মাম্পস্ (mumps), ছকিংকাফ প্রভৃতি রোগের আক্রমণ হলে। একবার এসব রোগ কারোর হ'লে পুনরায় এ সব রোগ তাদের প্রায়ই হয় না, হ'লেও খুব দীর্ঘ কাল পরে হ'য়ে থাকে। এই সব রোগ হয় জীবাণুর আক্রমণে। এই সব জীবাণুকে ক্ষয় করবার জন্য শরীররক্তের মধ্যে যে বিষ-নাশক রস জন্মায়, তা রোগ সারবার পরেও আমাদের রক্তের মধ্যে বহুদিন ধরে জমা থাকে। যতদিন রক্তের মধ্যে এই বিষ-নাশক রস

জমা থাকবে ততদিন হাম, মাম্পাস প্রভৃতি রোগ আমাদের আর আক্রমণ করতে পারে না।

টিকে দিবার প্রথার আবিষ্কারও হয় প্রথম এই নিয়মকে ভিত্তি করেই। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে জেনার (Jenner) নামক একজন চিকিৎসক প্রথম টিকের বীজ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখতে পান যাদের একবার গো-বসন্ত Cow-pox হয় তাদের প্রায়ই আসল বসন্ত হয় না। তখন তিনি এর কারণ অহুসন্ধানে নিযুক্ত হন। সেই অহুসন্ধানে নিযুক্ত হয়ে অনেক চিন্তার পর তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাই আজ টিকের বীজে পরিণত।

গো-বসন্ত তেমন মারাত্মক ব্যামো নয়। এ রোগে মানুষ বড় একটা মরে না। এই রোগ হলে শরীরের মধ্যে যে বিষ জমে সেই বিষকে নষ্ট করবার জন্ত আমাদের শরীর রক্তের মধ্যে পাল্টা যে বিষ-নাশক রস জন্মায় তা যে শুধু গো-বসন্তের বিষকেই নষ্ট করে ক্ষান্ত থাকে তা নয়, আসল বসন্তের জীবাণুকেও নষ্ট করে আমাদের রক্তের মধ্যে তাদের আর বাড়তে দেয় না। তাতেই একবার কারোর গো-বসন্ত হলে শরীরের মধ্যে আসল বসন্তের আক্রমণকে ঠেকাবার শক্তি থাকে তাদের বেশী।

আসল বসন্তের টিকে গো বসন্তের গুটীর পুঁজ থেকে তৈরী করা হয়। প্রথমে বসন্তের পুঁজের জীবাণু নিয়ে কোন একটি স্থস্থ সবল বাছুরের গায়ে তা প্রবেশ করিয়ে তার গায়ে সে রোগ জন্মানা হয় তখন বাছুরের গায় বসন্তের গোটা উঠে যে পুঁজ হয় সে পুঁজই বসন্তের বীজ। টিকে দেবার সময় ভাতাংগণ সেই পুঁজেরই খানিকটা আমাদের শরীরের চামড়া কেটে রক্তের মধ্যে মিশিয়ে দেয়। সেই পুঁজের মধ্যে থাকে গো-বসন্তের জীবাণু। তার আক্রমণে টিকে দিলে আমাদের জ্বর হয়, টিকের ক্ষতও ফুলে ওঠে। পূর্বেই বলা হয়েছে গো-বসন্ত তেমন মারাত্মক ব্যামো নয়। কিন্তু গো-বসন্তের এই আক্রমণকে নষ্ট করবার জন্ত আমাদের দেহ-কোষ রক্তের মধ্যে যে বিষ-নাশক রস জন্মায় তা গো-বসন্তের জীবাণুকে নষ্ট করে আমাদের শরীরে আসল বসন্তের আক্রমণকেও ঠেকিয়ে রাখে। তাতেই টিকে নিলে আসল বসন্তের আক্রমণকে অনেক পরিমাণে ঠেকিয়ে রাখা যায়।

জীবাণুতত্ত্ব আবিষ্কার হওয়ার চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ করে অস্ত্রোপচারের বিশেষ উন্নতি হয়েছে। এই বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তুর সাহেব। ১৮৮০ বৎসর পূর্বে খুব সামান্য অস্ত্রোপচারও নিরাপদ ছিল না। তাতেও অনেক লোক প্রাণত্যাগ করতো। কারণ তখন জীবাণুর আক্রমণ হ'তে ক্ষত স্থানকে মুক্ত রাখার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আমাদের চারিদিকের হাওয়ায় যে অজস্র জীবাণু ছড়িয়ে আছে আর সেই জীবাণু যে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে আমাদের রক্তকে বিষাক্ত করে ফেলতে পারে এ জ্ঞান তখন কারোরই ছিল না। বৈজ্ঞানিক পাস্তুর সাহেবই প্রথম একথা লোফ-সমক্ষে প্রচার করেন। তখন তাঁর একথায় কান দেওয়া কেউই প্রয়োজন বোধ করেন নি। বরং এজন্ত তখন তাঁকে অনেক বিক্রপ, অনেক উপহাস সহ করতে হয়েছিল। ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিকিৎসক লর্ড লিষ্টার (Lord Lister) পাস্তুর সাহেবের এই আবিষ্কারকে প্রথম কাজে লাগান। এখন বড় বড় সব অস্ত্রোপচারই তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে হ'য়ে থাকে। অস্ত্রোপচারের এই প্রথার প্রধান বিশেষত্ব এই অস্ত্রোপচারের সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র, ডাক্তারদের পোষাক, হাতের দস্তানা, ব্যাণ্ডেজের তুলো, কাপড় প্রভৃতি যাবতীয় জিনিস পূর্বে ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় এখন খুব অল্প অস্ত্রোপচারই লোকের প্রাণহানি হয়ে থাকে।

নানাবিধ ছোঁয়াচে রোগের জন্তও দায়ী এই সব জীবাণুই। সর্দি লাগা এইরূপ একটি ছোঁয়াচে রোগ। এই রোগের জীবাণুর আক্রমণেই আমাদের সর্দি হয়। আমরা মনে করি ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়েছে। ঠাণ্ডা লেগে যে সর্দি হয় না তার প্রমাণ পাওয়া গেছে মেক অভিয়ানকারীর অভিজ্ঞতা হ'তে। মেকপ্রদেশ প্রায় বারমাসই বরফে ঢাকা থাকে। সেজন্ত সেখানে ঠাণ্ডাও বেশী। কিন্তু এ পর্যন্ত প্রায় কোন মেক অভিয়ানকারীই সর্দিতে ভুগেছেন ব'লে শোনা যায়নি। ঠাণ্ডায়ই যদি সর্দি হ'তো তাহ'লে তাদেরই সর্দিতে সবচেয়ে বেশী ভুগতে হ'ত। মেকপ্রদেশ সর্দিদা বরফে ঢাকা থাকে ব'লে সেখানে খুব অল্প জীবাণুই টিকে থাকতে পারে। সর্দির জীবাণুও

সেখানে জন্মাতে পারে না। তাতেই মেরু অভিযানকারীদের সেখানে সন্ধিতে ভুগতে হয় না। বরফের দেশে জীবাণু জন্মাতে পারে না বলে সেখানে কোন জিনিস পচেও কম। দেখা গেছে যিনি সন্ধিতে ভোগেন তার কাছাকাছি কেউ বেশীক্ষণ থাকলে তাকেও সন্ধিতে ধরে। তার কারণ একজনের দেহের সন্ধির জীবাণু হাওয়ার ভিতর দিয়ে অন্তের দেহে-নিঃশ্বাসের সঙ্গে চালাচালি হয়।

এতো গেল রোগের কথা। জীবাণু যে কেবল আমাদের রোগেই ভোগায় তা মনে করলে ভুল হবে। এদের মত আমাদের বন্ধুও কেউ নয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এরা যে আমাদের কত বিষয়ে সাহায্য করে তা বলে শেষ করা যায় না। দুধ জমে যে দই হয় তা এই জীবাণুরই জন্ত। দইয়ের সাঁজোতে থাকে এক রকমের জীবাণু। সেই জীবাণুই দুধকে জমিয়ে দই করে। বিশেষ বিশেষ মাখন ও চিজের (cheese) যে বিশেষ বিশেষ স্বগন্ধ ও স্বাদ তাও এই জীবাণুরই জন্ত। মাছের বা মাংসের বিশেষ বিশেষ রান্নায় আমরা যে ভিনিগার ব্যবহার করি তাও তৈরী হয় জীবাণুরই সাহায্যে। ভিনিগারে থাকে আপেল ফলের রস। সেই সেই রসের মধ্যে এক জাতি জীবাণু জমিয়ে ভিনিগার তৈরী করা হয়। চাপাতার অনেকটা স্বাদও এই জীবাণুই আমাদের দেয়। চা পাতা গাছ থেকে তুলেই রোদে দিয়ে শুকানো হয় না। বাগান থেকে তুলে এনে প্রথমে তাদের ফেলে রাখা হয় আলো হাওয়াহীন অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে। সে অবস্থায় পাতার মধ্যে জন্মে এক জাতি জীবাণু। সেই জীবাণু পাতার ভিতরকার চিনি ও খেতসার জাতি পদার্থকে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। পরে তাই ষ্টিমে সেকে কালো চা তৈরী করা হয়। চীনেরা যে চা খায় তার পাতার রং আমাদের চা পাতার রঙের মতো কালো নয়। তাদের চা পাতার রং থাকে সবুজ। তারা বাগান থেকে চা পাতা এলেই রোদে শুকোতে দেয়। কালো চায়ের স্থায় তাদের পাতায় জীবাণু জন্মাতে দেয় না বা ষ্টিমে সেকে কালো করে না।

সেই জন্ত চীনে চায়ের বাটি হাতে গন্ধ বের হয় ভুবুভুবু ক'বে, তাতে শরীরও চাঙ্গা করে সহজে। যে স্বভাণের জন্ত ককো তামাক আমাদের এতটা প্রিয় সে স্বভাণও পাই আমরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির জীবাণু হতেই। চায়ের মতো তামাকের পাতকেও ক্ষেত হ'তে তুলে এনেই রোদে দিয়ে শুকানো হয় না। ঘরের ভিতরে ভাঁজে ভাঁজে ফেলে রেখে প্রথমে পাতার জল মেরে নেওয়া হয়। সে সময় পাতায় জন্মে নানা জাতি জীবাণু। সেই জীবাণু হ'তেই তামাক পাতার গন্ধ হয় ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

মানুষ জন্ত জানোয়ারে যেমন জীবাণুর আক্রমণে নানা রকমের রোগ হয় তেমনি গাছেরও নানা রকমের রোগের জন্ত এই জীবাণুই দায়ী। বরং জন্ত জানোয়ার অপেক্ষা গাছ ও নানা জাতির ফসলের উপরই তাদের আক্রমণের জোর বেশী। এমন গাছ এমন ফসল নেই যার মধ্যে কোন না কোন জাতির জীবাণু খাবার খুঁজে পেতে না পারে। তাই প্রতি বৎসর জীবাণুর আক্রমণে নানাবিধ ফল ও ফসল এত নষ্ট হয় যে তার পরিমাণ করে ওঠা শক্ত। তাদের মারবার জন্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গার কৃষিবিভাগ থেকে নানা রকমের ঔষধ ও নানা রকমের আরক আবিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও বিশেষ কৃতকার্য হওয়া যায়নি।

জীবাণু গাছের শক্তও বটে আবার তাদের মত গাছের এমন বন্ধুও আর নেই। জীবাণু না থাকলে গাছের পক্ষে বেঁচে থাকাই শক্ত হ'ত। মাটির মধ্যে গাছের নাইট্রোজেন খাদ্য বা মজুত আছে জীবাণুই তা ভেঙ্গে গাছের খাদ্যরূপে পরিণত করে। সুটি জাতির গাছ এই জীবাণুর সাহায্যেই তাদের শিকড়ে নাইট্রোজেন জমাতে পারে। এই নাইট্রোজেন গাছের একটি প্রধান খাদ্য। এ না হ'লে গাছ বেঁচে থাকতে পারে না। গাছ বেঁচে আছে বলে পৃথিবীতে মানুষ জীব জন্ত সবাই বেঁচে আছে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি মানব সমাজের রোগ ও স্বাস্থ্য দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য এমন কি জীবন ও মৃত্যু অনেক পরিমাণে জীবাণুর উপরই নির্ভর করছে।

লক্ষ্মীর বাঁপি

এগুণে নূতন কিছু করার দেশ যে আমেরিকা, সেটা স্বীকার করতাই হয়। সেই আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসের একজন বিশ্ববরেণ্য মনীষি নির্ণয় করবার চেষ্টা করছেন—মানুষ অপরাধী হয় কেন, আর তা'র প্রতিকারই বা কি? গবেষণা চলছে বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে। স্বাধীনতার নামে স্বৈরাচারী ব্যক্তি মাঝেই যে দুর্বল এবং তা'রাই যে অপরাধী শ্রেণীর তালিকা পুঙ্খ করে, সেটা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। আমাদেরও অজানা নাই—দীনাতিদীন হীন প্রকৃতির মানুষ স্বাবিকতার শক্তিতে যুবরাজ অঙ্গদের মত ছেঁড়া গদীতে বসবার অধিকার পেয়ে হরড'কেও আউটহেরড' করবার প্রয়াস পায়। তা'দের চাল-চলন দেখে কাক ও ময়ূরপুচ্ছের কথাই মনে পড়ে অবশ্য। পূর্বে মনে করা যেত, এসকল রোগ বা অপরাধের ঔষধ—প্রতীকার হচ্ছে জল-বিছাট বা শব্দর মাছের চাবুক। কিন্তু আমেরিকার নব চিকিৎসা-বিজ্ঞান বুঝিয়ে দিচ্ছে ও রোগ বা অপরাধের খণ্ডন হয় মস্তিকে ঠিক মত অস্ত্রোপচার করতে পারলে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জয় হোক! অপরাধী অপরাধ-মুক্ত হ'লে সংসার হবে ভূস্বর্গ। কিন্তু সেটা হওয়া সম্ভব কি? সম্ভব হ'লে অপরাধী থাকবে না আর সারা সংসারে।

১৭ই আষাঢ়ের আনন্দ-বাজার পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা প্রবর্তনে স্ভার আশুতোষ শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে অনেক কিছু জানবার কথা আছে। যা'রা রামছাগলের পিঠে সওয়ার হ'তে পারে না, অথচ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙ্গিয়ে বাংলা সাহিত্য-রূপ হাতী চড়তে চায়, তারা ও প্রবন্ধটা মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে বিশেষ উপকৃত হ'বে।

আষাঢ়ের “প্রবাসীতে” বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের “কনগ্রেস” বাংলা তথা ভারতের লোককে মনের খাদ্য দিয়েছে প্রচুর। রবীন্দ্রনাথের যদিও কবুল জবাব—পলিটিক্সের তিনি ধার ধারেন না, ও পথে তিনি আনাড়ি, তাঁ'র ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী “কনগ্রেস”

প্রকাশ ক'রে দিয়েছে ও “টিক্সটা” তিনি যত ভাল বুঝেন, তত ভাল বুঝবার লোক বাংলা দেশে খুব বেশী নাই। গান্ধী-সুভাষী মনস্তত্ত্ব তিনি যে ভাবে পরিস্ফুট ক'রে দেখিয়েছেন, সে দেখান তাঁ'র পক্ষেই সম্ভব। হিটলার-মুসোলিনী বুদ্ধিতে যা'রা শক্তির অপব্যবহার করে, কবীন্দ্রের ভাষায় তা'রা বুঝবে কি—পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হ'য়ে সঞ্চিত হ'য়ে ওঠে, সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্ভাবিত করে।

অন্ধ বালক-বালিকাদের কল্যাণ-কামনায় কলিকাতা-অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরলোক-গত সাহ বিহারী শাহ মহাশয়। তাঁ'র পুণ্য নামের স্মৃতি ঘোষণায় প্রতিবৎসর স্মৃতি-সভা যেমন হ'য়ে থাকে, এ বৎসর আষাঢ় মাসে তেমনই হ'য়েছিল। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত ক'রে ছিলেন ব্যারিষ্টারপ্রবর মিষ্টার এ, সি, ব্যানার্জি। সেবাদর্শী শাহ মহাশয়ের গুণকীর্তনে মিষ্টার ব্যানার্জি হ'য়েছিলেন পঞ্চমুখ। কিন্তু কি করলে কর্মবীরের স্মৃতি যাবচল্য দিবাকরো মানবহৃদয়ে জাগরক থাকে, সে বিষয়ে আলোচনা আদৌ হয় নাই। তবে একটা কথা—মহাপ্রাণ শাহ মহাশয়ের কর্মই তাঁ'র স্মৃতি ঘোষণা করবে। শাহ সম্বন্ধে প্রসাদ কবির বাণী উদ্ধৃত করি—

“আকাশ-বাতাস ভ'রে আছে

তোমার স্মৃতি-মহিমায়,

বিশ্ব আজি নিঃশ্ব হ'ল

সথে, তোমার অ-দেখায়।”

শাহ মহাশয় অনেক উচ্ছে উঠে প'ড়েছিলেন ব'লে তাঁ'বে অকারণে হিংসা করবার “মুখে মধু জুড়ে বিষ” বুক্ত মহানুভবের অভাব হয় নাই। তথাপি কবির বাণী ছাপাও হয়েছে, আর সে বাণী সফলও হয়েছে বিরাটকর্মী শাহজীর কর্মগুণে।

আষাঢ় সংখ্যার “শনিবারের চিঠি”তে প্রকাশিত নারায়ণগঞ্জ সাহিত্য-সমিতির রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ বাংলা “রবীন্দ্রনাথ” পাঠ করে আমরা অতীব প্রীত হয়েছি। সভাপতি ছিলেন বন্ধুবর কবি মোহিত লাল মজুমদার। কলিকাতা-হাইস্কুলে যখন তিনি শিক্ষকতা করতেন, তখন থেকেই আমরা তাঁর কবি-প্রতিভা ও রবীন্দ্র-প্রীতির পরিচয় পাই। এখন তিনি একজন প্রতিভাশালী কবি ও সাহিত্যিক। অজাতশত্রু হওয়া তাঁর পক্ষে বোধ হয় সম্ভব নয়, কেননা সত্য শিব সুন্দরের পূজার সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করা আর মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার চেষ্টায় “হাঁজী হাঁজী” বলা তাঁর দ্বারা চলতে পারে না। এ গুণ না থাকলে অঙ্গদের পদ অলঙ্কৃত করা চলতেই পারে না হয়ত। পরের লেখা যাঁরা নিজের ব’লে চালা’তে লজ্জাভব করে না, বংশ পরম্পরায় উপকার পেয়ে অকৃতজ্ঞতার চাপরাশি বুকে এঁটে যাঁরা হঠাৎ সাহিত্যিক হ’য়ে আবুহোসেনী-চাল চালে, তাঁরা মোহিতলালকে ঠিক বুঝতে পারবে না, বুঝতে চাইবে না। কিন্তু তা’তে মোহিতলালের গৌরব-শ্রী লাভ করার পক্ষে কোনোই অসুবিধা হ’বে না। স্বার্থের দায়ে যাঁরা বাহিরে রবীন্দ্র-ভক্ত, অমুক ভক্ত, তমুক ভক্ত, আর মনে মনে আত্মভক্ত, তেমন গুপ্ত দর্পাদম্বী পর-শ্রীকান্তর প্রতীকের প্রশংসা অর্জন না করাই মোহিতলালের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

—○—

কিছুকাল যাবৎ ক্রমাগতই শুনে আসা যাচ্ছে, প্রতীচ্য-শিক্ষার দোষেই আমাদের ছেলেমেয়েরা নষ্ট হ’য়ে গেল। কথাটা হয়ত কতকটা ঠিক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ নষ্ট হওয়ার মতই যদি বহাল থাকল, অদ্যাবধি, শিক্ষার ধারাটা প্রাচ্যের মতই প্রবর্তিত হ’ল না কেন মতবাদীদের দ্বারা? ন’সে পাগলার মত প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট হাঁড়ী ভাঙ্গা আর সেই সঙ্গে “আর পারি না” বলা সহজ-বুদ্ধির পরিচয় নয়। আমাদের মধ্যে ধর্ম-শাস্ত্র আলোচনা করা দূরের কথা, সংস্কৃত ভাষার অল্পশীলন করাটাও লজ্জার জিনিষ হ’য়ে দাঁড়িয়েছে। আর আশুতোষ এবং তাঁর পরবর্তী অনুশাসকগণের চোখ-বাহানীতেই বাংলা ভাষা, যে ভাষা নোবেল-প্রাইজ বাঙ্গালীর ঘরে পৌছে দিয়েছে—

“বন্দেমাতরম্” যে ভাষায় রচিত, এখনো মাথা তুলে আছে সে অথবা কোনো রকমে। অম্লকরণপ্রিয়তা যদি প্রতীচ্যের মদ্যটার দিকেও ঝুঁকে পড়ে, তবে অম্লকরণশীল যাঁরা, তাঁদের ভুলপথ থেকে ফিরিয়ে আনা দায় হ’য়ে উঠে। ও শাসন কতকটা ঘরের লোকের হাতে, আর কতকটা শিক্ষাগুরু হাতে। পাকা ইংরাজীনবীশ ত বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার, সূর্যকুমার আর গুরুদাস, আর আশুতোষ প্রভৃতি বহু মনীষিই ছিলেন সোনার বাংলায়। কৈ তাঁরা ত নষ্ট হন নাই ইংরাজী শিক্ষার গুণে। শিক্ষা-ধারার উপরই ভাল মন্দ হওয়া নির্ভর করে অনেকটা। জন্মগত প্রকৃতি স্বভাবকেও বাদ দিলে চলে না। তবে স্বভাবও বদলায় স্কুল-শিক্ষার গুণে। হামবড়া, কুচক্রী, নিল্লজ্জ, স্বার্থের দায়ে অপরের সর্বনাশ করা-চরিত্রের গুরু-দ্বারা যে মানুষ তৈরী হ’তে পারে না, বরং অমানুষই গড়া হয়, এ কথাটা খাঁটি সত্য। বাংলা তথা ভারতের গুরুকুল প্রাচীন শিক্ষা-ধারা নূতনের আলোয় প্রবর্তিত ক’রে দেখুনই না কেন, আমাদের সোনার ছেলেমেয়েরা আবার সোনার চাঁদ হর কিনা।

—○—

“আমরা বাঙ্গালী” মন্দ নয়-রকমের একখানা বড় কেতাব। গ্রন্থকার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিশানন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—এইচ. চ্যাটার্জি। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইয়ের বিশেষ পারিপাটা নাই। তবে লেখার ভঙ্গী ও উদ্দেশ্য প্রশংসাহ। কেতাবখানি বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে সচল হওয়া হয়ত উচিত; কিন্তু হ’বে কিনা বলা শক্ত। অনেক মনীষির লেখা সঙ্কলন ক’রে বঙ্গ, বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতা, শ্রেষ্ঠত্ব, মনীষা ও প্রভাব ঘোষণা করবার চেষ্টা করেছেন—প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন গ্রন্থকার। বাংলা লেখার এই তাঁর প্রথম হাতেখড়ি। কিন্তু লেখা অনেকটা পাকা হাতের। লেখার ভুলত্রুটি যে একেবারে নাই, এ কথা হলপ্ ক’রে বলা চলে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গ্রন্থকার কার্পণ্য করলেন কেন—সে কথা বলা কঠিন। বাঙ্গালী জাতিটাকে যিনি সারা জগৎবাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাঁর কথাটা লেখার কালে সহসা “স্পেস্” ক’রে গেল কেন—এ প্রশ্ন করলে তিনি কি উত্তর দিবেন? সর্বাধিকারী যে “অধিকারী”

নয়, এ জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের থাকা খুবই উচিত ছিল। রাজকুমার “লক্ষ্মী টাইমসের” প্রকাশক ছিলেন না, সম্পাদক ছিলেন। ডাক্তার স্বর্ধকুমারের চেষ্টায় রাজকুমার কলকাতায় এসে কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই যে “হিন্দু পেট্রিয়ারের” সম্পাদক হন, টেগোর-ল’ লেকচারার হন, “হিন্দু-ল’ অফ ইন্ডিয়া”-এর গ্রন্থকার হন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক হন, এ সকল কথা গ্রন্থে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। ডাক্তার স্বর্ধকুমারের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিশেষ কিছু জানা নাই ব’লেই মনে করতে হয়। অজ্ঞাত ক্রটিও যথেষ্ট আছে। তা’ সত্ত্বেও গ্রন্থখানি সমাদৃত হ’বার যোগ্য। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের আমরা জয় ঘোষণা করি।

—o—

কলিকাতা-ট্রাম-কোম্পানীর গাড়ীগুলির জানালা একদিকে লোহার গরাদে দিয়ে বন্ধ, আর একদিক কিন্তু বেবাক খোলা। এমন খোলা-জানালায় শিশু-আরোহীর পতন ও দৈব দুর্বিপাকের ভয় অল্প নয়। এর প্রতিকার হওয়া উচিত। মহিলাগণের বসবার আসনের সংখ্যাও বৃদ্ধি হওয়া দরকার। একখানা অতবড় গাড়ীতে মহিলাগণের জগ্ন মাত্র দুইটা আসন যথেষ্ট নয়। গাড়ীর সংখ্যাও বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরোহীবর্গ বাজুড়-ঝোলা হ’য়ে রাজধানীর পথে যে ভাবে যাতায়াত করে, সেটা ভীতিপ্রদই। এমন যাতায়াতে দুর্বিপাক যে-কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে। এ ভাবে গাড়ীতে

ভীড় করতে দেওয়া হয় কেন, সেটাও দুর্বোধ্য। কর্তৃপক্ষের আমরা মনোবোগ আকর্ষণ করি।

—o—

জার্মানী-জাপানের রুদ্রমূর্ত্তি দেখে অনেকেই ভয় পান। তাঁরা ভাবছেন বোধ হয়, ও রুদ্রতায় ভারতের ঘটবার সম্ভাবনা। ভয়টা অমূলক ব’লেই আমরা মনে করি। একটা এসডেনী-খেলা, কি এক আর্থটা—খ-মার্গের ভয়। বাজী যদি ভারতের ঘাড়ের উপর দিয়ে হ’য়েও যায়, ভারত যে ভারতসাগরে ডুববেনা, এটা সুরনিশ্চিত। শক্তি অত্যন্ত সজাগ। ভারত, ছেলের হাতে মোয়া স্তরাং মার্ত্তি।

—o—

সাহিত্য-ক্ষেত্র এখন সাহিত্যিকারণ্য হ’য়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকের মুখেই শুনা যায়। আদম্ স্মারির মত সাহিত্যিক-স্মারির ব্যবস্থা করলে কেমন হয় অহিফেনসেবী রনফো অহিফেনের মাত্রা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছেন। এটা হেস হাসির কথা; কিন্তু ভাববার কথাও নয়কি? “হিতবাদী” বচন প্রচার ক’রে প্রশংসা অর্জন করেছে। “রমানা” “বুড়োজালিও” অ-প্রশংসার হ’বে না ব’লে মনে করা যায়। “তরুণ সাহিত্য-সম্মেলন” সেটা করবে কি?

—o—

কেন্দ্র সমিতির কথা

বিগত ৮ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত স্বভাষচন্দ্র বসু পুরীর বসন্ত-কুমারী বিধবাপ্রশম ও তৎসংলগ্ন স্কলটি পরিদর্শন করেন। আশ্রমে তাঁহাকে খাবার নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল; ছাত্রীরা সম্বন্ধে রন্ধন ক’রে তাঁকে ভোজন করিয়ে পরিতুষ্ট হয়। একটা সিন্ধের কাপড়ে অভিনন্দন লিখে একখানা কাঁসার থালায় শাঁক, রুপার প্রদীপ ও কর্পূরের মালা সাজিয়ে তাঁকে

অভিনন্দন দেওয়া হয়। আশ্রমবাসিনীরা তাঁর শুভাগমনে বিশেষ আনন্দলাভ করে।

শ্রীমরলা লাহিড়ী,
বসন্তকুমারী বিধবাপ্রশম,

লগুনের পত্র

শ্রীযুক্ত হিমাংশুবালা ভাটুড়ী

(গত জুন মাসে ইংলণ্ডে নিখিল বিশ্ব-পল্লী-মহিলা সম্মেলনের যে ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন (Triennial Conference of the Associated Country women of the world) হইয়াছে তাহাতে হিমাংশুবালা ভাটুড়ী সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি আমাদের সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি এবং মফঃস্বলস্থ মহিলা সমিতিগুলির অবগতির জ্ঞাত নিম্নোক্ত পত্র লিখিয়াছেন।)

এদেশে সম্প্রতি সরোজনলিনী সমিতি ও তাহার কার্য-কলাপ জানার জন্ত বেশ একটা উৎসাহের ভাব বোঝা যাইতেছে। আমাদের সমিতির বিষয়ে ভাল বলিতে পারে তেমন কয়টা মেয়ে এ সময় আমার সঙ্গী পাইলে বড়ই উপকার হইত। ওয়েল্‌স; Ireland, Essex, Oxford সর্বত্রই—সে সব স্থানের Institute আমায় আগ্রহ করিয়া নিয়া গিয়াছে ও তথায় খাওয়া থাকার সমস্ত খরচ বহন করিয়াছে। কোনও কোনও Institute আমায় যাতায়াত খরচও দিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারিবে, আমাদের সমিতির বিষয়ে জানার জন্ত এদের ভিতর কত আগ্রহ। Hospitality কমিটিও ডেলিগেট ও ডিজিটাসদের জন্ত নান্না ব্যবস্থা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার কোন সন্যোগ নিবার অবসরই পাই নাই—এক Institute হইতে অন্য Institute যাইতেই সময় কাটিতেছে। আমাদের দেশের নারীজাতির বিষয়ে এদের অজ্ঞতা দেখিয়া সময় সময় যেমন আশ্চর্য্য বোধ হয় তেমনি ইহাদের sincerity ও আমাদের সমিতির সহিত সংযোগ রাখিয়া পত্রাদি দ্বারা sister-link রাখিবার আগ্রহ দেখিয়া আনন্দ বোধ হয়।

নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার পত্র পাইতেছি—আমাদের Caste system ও পর্দা প্রথা, লিখিতে পড়িতে না-জানা ইত্যাদি বিষয়ে বহু প্রশ্ন সবাই করিতেছে। Caste system নিয়া পৃথিবীব্যাপী India বিষয়ে এক অদ্ভুত ধারণা—প্রায় সব Institute এ এ question

উঠিয়াছে—এবং প্রায় সকলের পক্ষে এ ধরণের ডিজাসা আছে। শ্রীমতী চাক্ষুশীলা ধরের ঠিকানা অনেককে দিয়াছি—Oct. আন্দাজ বোধ হয় Indiaতে এদেশ হইতে পত্র যাইবে। আপনার প্রেরিত ঠিকানাগুলি পাইয়া আমার বড়ই সুবিধা হইয়াছে—নানাজনকে ঐ সব ঠিকানা দিতে পারিয়াছি। তবে অনেকই India তে পত্র না দিয়া আমায় পত্র দিতেছে—প্রত্যহ আমার নিকট বহু পত্র আশিতেছে—ইংলিশ ছাড়া ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায়ও পত্র অনেক পাইতেছি—তাহাদের সঙ্গে চেষ্টা করিতেছি যাহাতে ইংলিশে India তে পত্রালাপ চালায়। এই চিঠি লেখার কাজে আমায় এখন বহু সময় দিতে হইতেছে—তবে একবার—আপনার প্রেরিত ঠিকানাগুলির সহিত ইহাদের সংযোগ করিয়া দিতে পারিলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দিকেই মঙ্গল হইবে—আমারও পত্র লেখার ভিড় এত থাকিবে না। নমুনাস্বরূপ হাতের কাছে যে চিঠিখানা আছে তাহা এবং তাহার যে উত্তর দিয়াছি সেই নকল যাহা রাখিয়াছি তাহার কপি আপনাকে পাঠালাম। ইহা পাঠে অনুমান করিতে পারিবে India তে ইহারা কি ধরণের চিঠি লিখিতে পারে।

একটা নরওয়ের মেয়ে প্রকাণ্ড এবং সুন্দর একটা পত্র দিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্তসার—“Dear Sister, Friend's House এ No 17 Room এ তুমি S. N. বিষয়ে—তাহার জীবনী যতটুকু বলিয়াছিলে—তাহা যত ভাবি ততই জানিবার বাসনা প্রবল হইতেছে। আমরা নিজেরা পছন্দ করিয়া জানিয়া শুনিয়া বিবাহ করি—তবু সুখী হইতে পারি না—তোমরা বোধ হয় বিবাহিত জীবনে আমাদের অপেক্ষা সুখী হও—কারণ তোমরা যতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া সংসারে শান্তি আন—আমরা হয়ত শান্তির সংসারও নষ্ট করিয়া তুলি। কিসে তোমাদের সহিত সংযোগ রাখিয়া আঁমরা—বিশেষ আমি আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা হইতে পারি সে বিষয়ে আমায় সাহায্য করিতে পার কি? তোমার Association বিষয়ে যাহা বলিয়াছ তাহাও আমার ভাল লাগিয়াছে—তাহার ভিতর—তোমাদের Association আমার Institute কে কোন কোন ডিজাইন—(যাহা তুমি এগজিভিশনে No 5

সেকশনে রাখিয়াছিল) পাঠাইতে পার কি?—আমি আমার Institute কে তোমার Calcutta Associationএর সঙ্গে যোগ রাখার জন্য ভারী উৎসুক—তাহার প্রধান কারণ কিসে আমাদের মেয়েরা তোমাদের মেয়েদের কাছ হইতে শান্ত ও সংযমী হইবার শিক্ষাটা নিতে পারে।

অন্ত মেয়ে হাদ্দেরীর—“My dear friend—তোমার speech এ বলিয়াছিল West হইতে তোমাদের অনেক কিছু নিবার আছে—ভাবিয়া দেখি আমাদেরও তোমাদের নিকট হইতে শিখিবার যথেষ্ট আছে। তোমার speech এ তোমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতা, অভাব-অনটন, লেখাপড়া-না-জানা ইত্যাদির যতটুকু ইঙ্গিত করিয়াছিলে—তাহা ছাপাইয়া তোমাদের মেয়েদের চরিত্র-সংযম—গরীর সংস্কার—গুছাইয়া জীর স্থখী চিত্ত থাকিবার চেষ্টা—ও সরোজনলিনীর Lifeএর যে ছবিটা দিয়াছিলে তাহা বার বার মনে উদয় হয়। তোমাদের সুগুণগুলি আমবা আমাদের দেশীয় প্রথা ও আমাদের নিয়ম-কানূনের ভিতর দিয়া কি ভাবে নিতে পারি, সেই চিন্তা এখন আমার মনে। ইহার পর যদি তোমার Speechএর এক একদিনের এক এক Subject লইয়া সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে কি তুমি Indiaতে অন্তান্ত কয়টি মেয়েদের সঙ্গে আমার যোগ করিয়া দিতে পার? তোমার Speechএর সে কথা আমার বেশ মনে আছে যে—তোমার দেশেও যথেষ্ট মন্দ প্রথা আছে—বাগড়াটে মেয়েমাছুষ, অগোছাল জী, নিষ্ঠুর স্বামী এ সব আছে—কিন্তু তাহা বলিবার জন্য তুমি এত বড় কনফারেন্সে আস নাই—তেমনি অপরের কি কি দোষ আছে তাহাও তুমি দেখিতে চাও নাই—তুমি চাহিয়াছিলে তোমার ভাল দিকটা দেখাইতে ও আমাদের ভাল দিকটা দেখিতে—তেমনি তোমার কথায় আজ বলি—মন্দ দিকটা নয়—হিন্দু নারীর বাস্তবিক ভাল দিকটা আমাদের দেখিতে দাও—সরোজনলিনীর মত কয়টি মেয়ের সঙ্গে আমাদের পত্রালাপের সুযোগ করিয়া দাও।

জার্মানী—তোমার কথা যত ভাবি ততই ভারতের নারীজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়ে। কি শান্তিপূর্ণ জীবন তোমরা কাটাও—তোমাদের বিধবাদের সংযম,

ভগবানে বিশ্বাস আমরা কি করিয়া শিখিতে তোমাদের Associationএ কি এ নিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়? Caste system কি করিয়া Avoid কর?

ইংলিশ গ্রামকয় সুন্দর চিঠি আছে—তবে সবই System ও আমাদের বাল্য বিবাহ বিধবা ইত্যাদি প্রশ্ন—কি কি বই পড়লে Indiaর বিষয়ে জানতে পারা যায়—ভাল ধারণা হবে—তাহাই অনেকের জিজ্ঞাস্য। মেয়ের—ভারতীয়, নারীর স্থখের সংস্কার—সাধারণ যাত্রা প্রণালীর সহিত এ দেশে কি ভাবে চলতে তাহাই জিজ্ঞাস্য। এইরূপ বহু পত্র পাইতেছি—কি গোটাকয়েকের সংক্ষিপ্ত সার লিখিলেও পত্র পুঁথি কিছু বক্তব্য ফুরাইবে না। Oxford সমিতি পত্রালাপের জন্য উৎসুক হয় ও কনফারেন্স সময় যখন সম্ভব হইবে বলিয়া জানাই, তখন ভাবিতেও পারি নাই—ব্যাপারটা সত্যই এমন দাঁড়াইবে। এখন এ কাজে কত সফল, জার্মান লেখা চিঠি বাদ দিয়া শুধু ইংরাজী চিঠি সহিত আপনি যে সব ঠিকানা দিয়েছেন তাদের কত করিয়া দিতে চেষ্টা করিব—ও পত্রালাপ যত সহজ হইবে ব্যবস্থায় থাকিব—এত সব পত্রের ভিতর সব চেয়ে simple চিঠিখানাই এ পত্রমধ্যে পাঠাইলাম—এ সব ধরনের চিঠি উত্তর দেওয়া ও ঘর সংস্কার weather নিয়ে কেউ দিলে তাহার জবাব দেওয়া সকলেই পারবে।

Viscountess Halifan সরোজনলিনী সমিতির বিষয়ে জানার জন্য সত্যই খুব ইচ্ছুক। Ireland ফিরে এসে তার চিঠি Wait করছে, দেখলাম। সমিতির তার সঙ্গে বার কয় দেখা হ'ল—প্রত্যেক বারই আমাদের সমিতি বিষয়ে নানা বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছেন—বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা একখানা চেয়েছেন—শুধু কাছে রাখতে জঙ্গে, ও দেখলেই সরোজনলিনী সমিতির কথা মনে পড়বে এই ইচ্ছা। ভাবছি—যদি বঙ্গলক্ষ্মীর ভাদ্র বা আশ্বিন কোন এক সংখ্যায়—তিনি আমায় যে প্রাইভেট চিঠি লিখেছেন তাহা ছাপিয়ে সেই মাসের এক পত্র কপি Viscountess Halifanএর নামে পাঠিয়ে দেবে বেশ হয়। পত্র ছাপাবার ইচ্ছা থাকিলে জানাব—পাঠিয়ে দেব। সে পত্রে আমাদের কাজে তাহার

Wishes নিয়েছেন। কনফারেন্সে আমার সঙ্গে দেখা। তাঁহার। যখন হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছিলেন তখন মঙ্গল কামনা করে পত্র দিয়েছেন তাতে অসুস্থ হইয়া সত্যি তিনি সেরোজনলিনী সমিতি বিষয়ে ভেবেছিলেন।

(রাণীবাটের স্বনামধন্য জমিদার।) সেরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কার্যে সহায়ার্থ পূর্বে ৬৭০ টাকা দান করিয়াছেন। বর্তমান মাসে পুনরায় ১৫০ টাকা দান করিলেন।

আজীবন-সভা

নিম্ন লিখিত ভ্রমহোদয়গণ গত মাসে কেন্দ্রসমিতির আজীবন-সভা হইয়াছেন; তাঁহাদের এই সহায়তা ও সহানুভূতির জন্য কেন্দ্রসমিতি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

মিঃ দুর্গাপ্রসাদ খৈতান, মিঃ দেবীপ্রসাদ খৈতান, মিঃ বালকিষণ পোদ্দার, মিঃ রামেশ্বরলাল গুনরীওয়াল, মিঃ অমৃতলাল ওবা, মিঃ জে, কে, মিত্র, মিঃ এন, বি, গাঙ্গুলী, ডাঃ এস, সি, বসাক, মিসেস্ উমারানী চৌধুরানী, (সন্তোষ); মিঃ সূদীন্দ্রনাথ মিত্র।

সেরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কার্যে সহানুভূতিশীল হইয়া অধিকৃত মঙ্গলনাথ পালচৌধুরী,

পরলোকে লেডী নির্মলা সরকার

গত ১লা আগষ্ট তারিখে স্বনামধন্য ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার মহোদয়ের সহযোগিতা লেডী নির্মলা সরকার পরলোক গমন করিয়াছেন। লেডী সরকার গত ১৯৩০ খৃঃ অব্দে সেরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক স্মৃতি সভায় নেত্রী স্ব করিয়াছিলেন; তিনি চিরদিনই নারীজাতির মঙ্গল-কার্যে সহানুভূতিম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মহা-প্রয়াণে আমরা গভীর দুঃখানুভব করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের বেদনাশূন্য জ্বালা

রাজবৈদ্য শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কোনও নিঃস্ব রোগী যদি বলেন আমার বিশেষ আত্মীয় চিকিৎসক রহিয়াছেন। তাহা দ্বারা ঔষধ তৈরী করিলে আমার বিশেষ উপকার হয়। তখন সেই চিকিৎসক মাকাতার আমলের শাস্ত্রোক্ত ঔষধে, বর্তমান যুগোপযোগী কার্য হয় না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমার আবিস্কৃত ঔষধ কিছুদিন ব্যবহার করুন পরে শাস্ত্রোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইবে।

ইহার সরল ব্যাখ্যা করিলে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় যে প্রথমে আমাকে শোষণ করিবার অধিকার দিন, পরে আপনাকে মুক্ত করিয়া দিব।

অনভিজ্ঞ, আশ্রিত, রোগক্লিষ্ট মানবসমাজের, তাহাদের এ কাপট্যনীতি বুঝিবার সামর্থ্য কোথায়?

তমস্কনের আকর্ষণে ভ্রান্ত মনের সত্য আবিস্কার কখনও সম্ভব নহে। এবং প্রতি কবিরাজেরই পূর্ব পুরুষ

মহামানব নহেন, ইহাদের আবিস্কার উদ্যত যমদণ্ডের দ্বারাই মাহুষকে মরণের পথে নিয়া যায়।

এ ভ্রান্ত ঔষধের প্রয়াণে কত জীবন যে অকালে এই স্বন্দর সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে কে?

যে মহাপ্রাণ সাধকবৃন্দ জীবনের প্রতি স্তর দিয়া মানব জাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহাদেরই গুণগাঁথা কীর্তন করিয়া রোগীদিগকে মুক্ত করতঃ তিলে তিলে অর্থ স্বত্ব, শাস্তি ও জীবনের সৌন্দর্য হরণ করিয়া নিতেছেন। তাহাতে জনসমাজ ক্রমশঃই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। ইহার তুল্য কলঙ্কময় অবস্থা চিকিৎসকবৃন্দের আর কি হইতে পারে?

বর্তমান যুগের চিকিৎসকদের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইয়াছে এই যে, যে ভাবেই হউক অর্থ উপার্জন করা।

অর্থ উপার্জনই যদি বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ হয় তাহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

অতএব বর্তমান সময়ে মানসিক দুর্দিনের ভিতর দিয়া আয়ুর্বেদের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ কোনই গবেষণা নাই।

খবরের কাগজ বাহির করিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় আয়ুর্বেদীয় সভা সমিতির আড়ম্বর যুক্ত বিজ্ঞাপন।

অর্থ উপার্জনের কুশলতায় সিদ্ধহস্ত বুদ্ধিজীবী কবিরাজ-বন্দ, সভাপতি হওয়ার জন্তই জমকাল নান দিয়া এক একটি সভার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। এই প্রচারের উদ্দেশ্য হইয়াছে এই যে জনসমাজে প্রধান চিকিৎসকরূপে পরিচিত হওয়া।

এই সব সভাগুলিতে যাহা আলোচিত হয় তাহা প্রায়ই প্রাণশূন্য। গিলিত চর্চনের অল্পরূপ কতগুলি কথার সমষ্টি ভিন্ন গবেষণামূলক কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না।

খবরের কাগজগুলিও এই সব মহাসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না পারিয়া তাহা জমকাল আকারে বড় বড় হরপে তাহাদের অভিভাষণ প্রকাশ করিয়া তাহাদের দুর্নীতিরই প্রদর্শন দেন। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সভাপতি, অভিযান সমিতির সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি নামের আড়ম্বরে ম'ল্লের মনকে বিভ্রান্ত করা।

নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটির প্রতি লক্ষ্য করিলেই অল্পমন্ধিস্থ বন্ধুবর্গের নিকট তথ্য আরও সুন্দরভাবে প্রস্ফুট হইবে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার চরম গৌরব পারদ ও হরিতাল, ইহা দ্বারা যক্ষ্মা, ক্যানসার, কুষ্ঠ প্রভৃতি দুর্ভিতক্রমণীয় রোগ অতি সহজ আরোগ্য হয়। ইহা ভ্রমভাবে ব্যবহার হইলে অতি অল্প সময়ে কঠিনতম রোগেও আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

এ গৌরব যাবতীয় চিকিৎসাপদ্ধতিকে স্নান করিয়া রাখিয়াছে। ইহা চিরসত্য।

এ মহারত্ন ঔষধগুলি সাধারণের উপকারে আসিতে পারে, সংখ্যাভীত আয়ুর্বেদীয় সভার অধিবেশন হইয়া গেলেও আজ পর্যন্ত এদিক্কে কোনরূপ গবেষণাই হয় নাই, হইবে কিনা তাহা ও সন্দেহ।

দু'এক জন প্রতিভা সম্পন্ন চিকিৎসক যে ভাবেই হউক প্রস্তুতের কৌশল অর্জন করিয়াছেন। হয়ত তিনি

তাহারই প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদ মহাসভার সভাপতি। সে সভাপতির অভিভাষণ হইতে সম্বন্ধহীন বাজে কথার বহর ভিন্ন প্রকৃত আয়ুর্বেদের উৎকর্ষলাভের কোনরূপ সাহায্যই পাওয়া যাইতেছে না।

আয়ুর্বেদের বিষয়বস্তু এবং চরম সিদ্ধান্ত সত্যি গৌরবজনক হইলেও চিকিৎসাক্ষেত্রে দান্তিকতার স্থান অত্যন্ত নিম্ননীয় ও অশোভনীয়। চিকিৎসার সমাধান একমাত্র ভগবদ্রূপেই সাধিত হয় ইহা জানা সত্ত্বেও এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রণালী হইতে আয়ুর্বেদই একমাত্র শ্রেষ্ঠ তম এইরূপ যুক্তব্যঞ্জক সনদ টুটিই ইহাদের অভিভাষণের প্রতি স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠে।

কিড বে প্রকৃত ঔষধের উৎকর্ষতা দান করা যায় এবং ঔষধ ব্যবহারের সহজ, সরল প্রণালীর পছা আবিষ্কার করা যায়, প্রকৃত জনসমাজের উন্নতিকর এই জাতীয় কোন গবেষণায়ই ইঙ্গিত থাকে না।

নানাপ্রকারের অব্যর্থ ফলদায়ক অনেক ঔষধ রহিয়াছে যে যাহা স্থিতপ্রজ্ঞ চিকিৎসকদের গবেষণায় এখনও সত্যরূপে উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

পৃথিবীতে দেখা যায়, যে সব সাধক তিল তিল করিয়া জীবনের সৌন্দর্য্যকে বিসর্জন দিয়া যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার প্রচারেই পৃথিবীর মানব-সমাজের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাতেই তাহাদের জীবনেরও স্বার্থকতা সাধিত হইয়াছে।

টেলিগ্রাফ, রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, টর্পেডো, এবং ঔষধের বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্মরহস্য, জন সমাজে প্রচার হইত না, যদি সক্ষীর্ণ হৃদয় নিয়া সে মহাসাধকরা কার্য আরম্ভ করিতেন। তাহাদের মৃত্যুর সাথে সাথেই এই সব বিলীন হইয়া যাইত।

এ যুগেও যে সব সত্য সাধক আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক রোগের অজান্ত ঔষধ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ও সক্ষীর্ণ হৃদয়ের জন্ত তাহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

কোন অঙ্গ প্রক্ষাঘাতে (প্যারালাইসিস) আক্রমণ করিলে যেমন সে অঙ্গে বেদনার বোধ থাকে না, সেই

প্রায় চিকিৎসকদিগেরই মন, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতির উপর পক্ষাঘাতে আক্রমণ করায় মানুষের দুঃসহ জালাতেও তাহাদের অঙ্গে বেদনার আঘাত অনুভূত হয় না।

আজ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের প্রতিভার দৃষ্টান্ত না পাইয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের ও আদর্শ অতি নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে।

যে নাড়ীবিজ্ঞান আয়ুর্বেদের প্রাণস্বরূপ ছিল সে নাড়ী-জ্ঞান, কোন লাগরের কোন অতলতলে চলিয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবে কে? এখন নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ণয় করা প্রায় চিকিৎসকেবুই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

আজ বেশীদিনের কথাও নহে মাত্র ৪০।৫০ বৎসর পূর্বেও যে সব সাধকরা নাড়ী স্পর্শ করিয়া রোগের পবিণতি এবং ৬ মাস পূর্বেই মৃত্যুর স্থনির্দিষ্ট তারিখ বলিয়া দিতেন, তাহা এখন স্বপ্নের উপকথার জায়ই জনসমাজের মনে স্থান পাইয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থীর মনেও নাড়ী জ্ঞানের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে আর সে প্রেরণা আসিতেছে না। তাহার নাড়ীর পরিবর্তে থাশ্মোমিটার, মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া রোগ নির্ণয়ে যত্ববান হন।

সাধকদের ঔষধের শক্তিও ছিল অপ্রাপ্ত, যেন প্রাণের প্রতি স্পন্দন দিয়াই ঔষধের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাই কত দূর বিশ্বাস ছিল স্বহস্তে প্রস্তুত ঔষধের প্রতি।

বর্তমান চিকিৎসকদের সে শ্রদ্ধা ও প্রাণের প্রেরণা না

থাকায় স্বহস্তে প্রস্তুত ঔষধেও বিশ্বাস পাইতেছেন না। তাই অস্থানেভেদে এলোপ্যাথিক ঔষধের যোজনা এবং ইন্জেক্শান ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন এরূপ বহুলক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

নাড়ীজ্ঞানের অপ্রাপ্ত শক্তি না দেখিয়া, ঔষধের প্রত্যক্ষ শক্তি দেখিতে পাইয়া, ঔষধের নাম পরিবর্তন ও ইচ্ছামত ঔষধের যোজনা দেখিয়া এ আদর্শভ্রষ্ট অবস্থাতে যে সব চিকিৎসক প্রস্তুত হইতেছেন তাহা প্রায়ই পাশ্চাত্য চিকিৎসার আদর্শে গঠিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মানব জাতির দুঃখের জালা-মহামানব ঋষিদের হৃদয়েই বাজিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধর আমরা, আমাদের এ পরিণতি অত্যন্ত দুঃখজনক।

• সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের সত্যলব্ধ জ্ঞান আমাদের চিকিৎসক সমাজ যখন সংঘত মনোবৃত্তির দ্বারা গ্রহণ করিবেন তখনই সে স্বর্গদিন-আসিবে বাহার প্রভাবে মানব জাতির জীবন অভিনব সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিবে।

অপ্রীতিকর সমালোচনার ব্যথিত চিত্তে কলঙ্কের ইতিহাস প্রচার করিবার উদ্দেশ্য হইয়াছে এই যে ইহাতে যদি চিকিৎসক সমাজের হৃদয় সত্যাস্থেবী হইয়া ঋষিদের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন, তবেই আমার এ প্রয়াসের সার্থকতা।

এরূপ অগ্রাগ্র আরাও গুরুতর বিষয় রহিয়াছে যাহা স্মরণ পাইলে সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

দুরারোগ্য ক্যানসার রোগের চিকিৎসা

বিনা পারিশ্রমিকে ৭ দিনের চুক্তিতে সর্বপ্রকার ক্যানসার রোগ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। আরোগ্য না হইলে পারিশ্রমিকের দাবী নাই।

রাজবৈদ্য শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভিষগ্ শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, রিদ্দ্যারত্ন, কবিভূষণ। ২০৬২ অশ্বার মাকুলার রোড, কলিকাতা।

ডাঃ শিবপ্রসন্ন মিশ্র

সম্প্রতি লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে ডাঃ শিবপ্রসন্ন মিশ্র এম, বি (কলিঃ) এল, আর, সি, পি (লণ্ডন), এম,



ডাঃ শিবপ্রসন্ন মিশ্র

আর, সি, এন্স ইংল্যান্ড বিলাতের জ্বর-রোগ ও খাজী বিজ্ঞার সর্বোচ্চ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া এম, আর, সি, ও জি (M. R. C. O. G.—Lond.) উপাধি পাইয়াছেন। ডাঃ মিশ্র বিলাত বাইবার পূর্বের কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জ্বর-রোগ ও প্রসূতি

বিভাগে সুনামের সহিত দুই বৎসরের অধিককাল সিনিয়র রেসিডেন্ট, হাউস সার্জনের কার্য করিয়াছিলেন। এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদিগের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই বিশেষ সম্মানের অধিকারী হইলেন। তিনি এই দেশে গ্রেট লণ্ডন হাসপাতাল, লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতাল, হ্যামারস্মিথ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ হাসপাতাল প্রভৃতিতে কার্য করিয়াছেন। বিশ্ব্যাত প্রফেসর জেমস ইয়ংএর প্রিয় ছাত্ররূপে হাসপাতালে হাতে কলমে জ্বর-রোগ সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন। জ্বর-রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গ্রীনস্মারমিটেজ প্রভৃতি তাঁহার কেসবক ও থিসিস-এর অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ডাঃ মিশ্র তাঁহার ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার সর্বোচ্চ নম্বর পাইরা প্রথম হইয়াছেন। ক্লিনিক্যাল-এর একজামিনর, জ্বর-রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সুবিখ্যাত ডাঃ এভারলি হল্যান্ড তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ সন্তোষজনক মন্তব্য করিয়াছেন—“Your clinical is very satisfactory, it couldnot have been much better than that,”.

ডাঃ মিশ্র স্বদেশ প্রত্যাগমন করিবার পূর্বে জ্বর-রোগ সম্বন্ধে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্ত কিছুদিন ঐদেশে থাকিতে মনস্থ করিয়াছেন।

ডাঃ মিশ্র বশোহর জেলার নামটা গ্রামের শ্রীযুক্ত সতীনাথ মিশ্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শিল্প-রসিক শ্রীযুক্ত অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক (Folk Art of Bengal) প্রণেতা শ্রীযুক্ত অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় Under graduate ছাত্রাবস্থা থেকেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার জন্য ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পাঠ্য শেষ করিয়া ইনি শীঘ্রই ইংলণ্ডে লোকশিল্প সম্বন্ধে গবেষণা এবং মিউজিয়াম ট্রেনিং শিখিতে যাইতেছেন। ভারতবর্ষে ইনিই এই বিষয়ে অগ্রণী; আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।



চরম অবসাদের মুহূর্তে

ঠিক বিপ্লব না হলেও অনেকটা সেই জাতীয় ব্যাপারের লক্ষণ দেখা গিয়েছিলো কিছুদিন আগে আইরিশ ফ্রি স্টেটে। সেখানে আপিসে চা খাওয়া বন্ধ করে' নিয়ম করার ফলে একদল সরকারী চাকুরের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছিলো। এই নতুন নিয়মের কারণ দেখিয়ে বলা হয়েছিলো যে চাকুরেরা চা খেতে অত্যন্ত বেশি সময় ব্যয় করে' তাদের অধিকারের অপব্যবহার করেছে। ধনীকদের হালচাল মাঝে মাঝে সত্যিই বিরক্তিজনক; এ ক্ষেত্রে তো সে কথা বিশেষভাবেই খাটে। কারণ আজকাল উচ্চশিক্ষার দিনে একথা প্রায় সর্ববাদীসম্মত যে রোজ এক পেয়ালা চা খাবার জন্য লোকজনদের অল্পক্ষণের ছুটি দিলে তা'র ফলে তা'রা অনেক বেশি ভালো কাজ করতে পারে।

যে সব আপিসে বা কারখানায় বিবেলবেলা এই তাজাকরা পানীয় উপভোগ ক'বার জন্য ৫১০ মিনিটের বিরাম কিম্বা অল্পরকম সুবিধা দেওয়া হয়, তাদের সংখ্যা আজকাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কলকারখানার মালিক এবং শ্রমিক উভয়ের পক্ষেই এই বিশ্রামের এবং তার সঙ্গে এক পেয়ালা চায়ের জন্য কতখানি, সরকারী এবং বেসরকারী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিলেতের অনেকগুলি কারখানায় তা'র

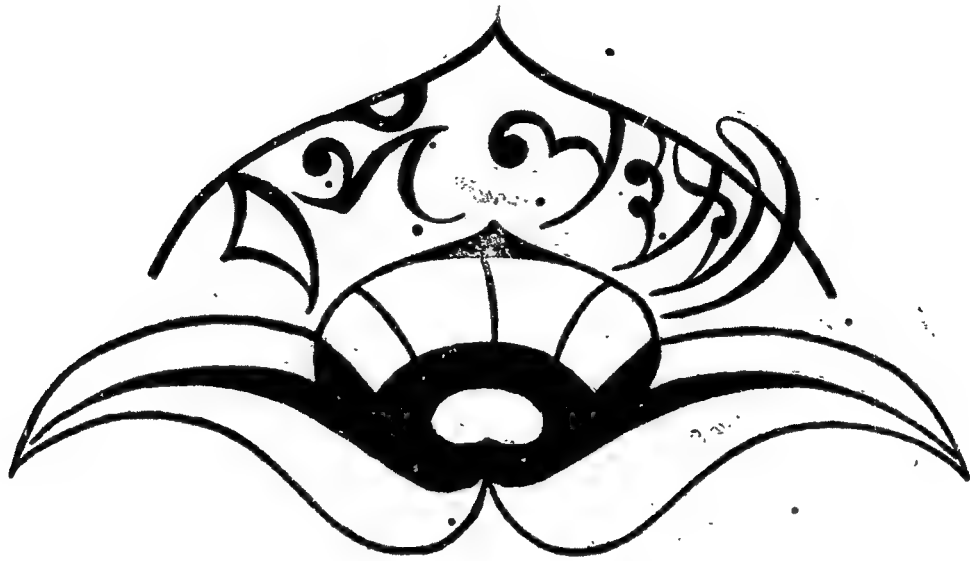
পরীক্ষা হয়ে গেছে। ফলে এসম্বন্ধে সকলেই একমত হয়েছেন যে, যে-সব জায়গায় চা দেওয়া হয়েছে সে-সব কারখানার লোকেরা যে কেবল বেশি সজ্জি আর শৃঙ্খলাবদ্ধ তা নয়, এ-সব জায়গায় মাল তৈরীও স্পষ্টতই বেশি হয়। ব্রিটিশ কলকারখানা এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চা এবং বিশ্রামের যে সুফল কলছে তা নিজেরা পরীক্ষা করে' দেখে সেই সব প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন।

একথা সকলেই জানে যে এক পেয়ালা চা শরীর ও মনকে তাজা করে' তোলে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে আপিসে যারা কাজ করে কিম্বা কলকারখানায় যারা খাটে তাদের উপরই এই চা আর বিশ্রামের ফল ভালো না হয়ে পারে না। দুপুর বেলায় খাওয়া এবং রাত্রির খাওয়ার মাঝখানে যে দীর্ঘ সময় যায় তাতে কর্মক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়। বেলা চারটে যখন বাজে তখন ঘনিয়ে আসে 'চরম অবসাদের মুহূর্ত'—শরীরের সহিষ্ণুতা তখন এসে পৌছয় দৌর্বল্যের শেষ সীমায়। ঐ মুহূর্তে চা না হ'লে চলেই না।

বঙ্গলক্ষী



কালিদাস-ভট্ট



চতুর্দশ বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৪৬

১১শ সংখ্যা

সত্ৰাটি পঞ্চম জজ্জের প্রার্থনা

শিখাও আমারে প্রভু নিয়ম বার্থ্যতা
শিখাও আমারে প্রভু ভাবের মর্যাদা !
তাজিতে শিখাও মোরে ভাবুকতাভূতি
মন্দ যাহা ত্যাজ্য তাহা জ্ঞানীর পদ্ধতি !
আমায়ে শিখাও তুমি যেন আমি কভু
অনর্থক তোষামোদে তুষি নাকো প্রভু ।
আমিও ভুলি না যেন তুচ্ছ প্রশংসায়,
এ ছয়ের মূল্য মোর কাছে তুল্য প্রায় ।

যদি মোরে ডাক কভু সহিবার তরে
পশুতুল্য সহি যেন নীরব কন্দরে,
যদি মোরে জয়ী কর জীবন সংগ্রামে
সন্তুষ্ট পরাণে তাহা লই তব নামে ।
হারিতে যদিপি হয় কভু এ জীবনে
সহাস্র বয়ানে তাহা বরি লব মনে,
অসম্ভব তরে যেন কাঁদি না কখন,
গিয়াছে জীবনে যাহা যাউক এখন ॥

অনুবাদিকা—শ্রীনলিনী সোম

রবীন্দ্রনাথের পল্লী-সংগঠনের সঙ্কল্প

শ্রীহেমলতা দেবী

গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে পূজাপাদ রবীন্দ্রনাথের “শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ” পড়ে সেই সময়কার কয়েকটি কথা স্মরণ হোল। ঐ প্রসঙ্গে কথাগুলি উল্লেখ করলে অনেকের হৃদয় ভাল লাগতে পারে।

জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে বাংলার পল্লীর সঙ্গে কবির পরিচয় হয়, পল্লীর প্রতি তাঁর প্রাণের দরদ জাগে, একথা কবি নিজেই বলেছেন। সেই টান তাঁকে টেনে এনে পল্লী-সংগঠন কাজে প্রবৃত্ত না করে ছাড়ে নাই, সুরুল গ্রামের সুরহং শিল্পকেন্দ্র শ্রীনিকেতন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পল্লীর সংগঠন ও পল্লীবাসীর উন্নত জীবন আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে উঠেছিল কবির মনে। প্রতিনিয়তই তাঁর অন্তরে একটা চেষ্টা জাগতো, কি করে পল্লীর কাজ করে উঠবেন। প্রথম পরগণাতে চেষ্টা শুরু করেন, তার ফল ফলেওছে সেখানে নানারূপে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন তাঁকে টেনে এনে শিক্ষাকেন্দ্র গঠন করালো—আজ যেটি বিশ্বভারতী নাম নিয়ে পৃথিবীর সকল সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটাবে বিধিমতে।

এর পাশে পল্লী-উন্নতির পত্তন করবার জগৎ সুরুলকুঠি এসে পড়ল তাঁর হাতে যেন অভাবনীয়-রূপে। শ্রীনিকেতনের পূর্বতন ডাকনাম সুরুলকুঠি। শোনা যায় নীলকর সাহেবদের এই সম্পত্তি নীলামে কেনেন রায়পুরের সিংহমহাশয়রা। ইদানিং সিংহ মহাশয়দের সে-কুঠি আর তেমন কাজে

লাগছিল না, পড়ে থাকতো অকেজো হয়ে। কবি গেলেন ইংলণ্ডে, সেখানে সিংহ মহাশয়দের সঙ্গে দেখা হয়ে এককথায় সুরুলকুঠি কিনে ফেলেন কয়েক হাজার টাকা দিয়ে। কবির তখন অর্থসঙ্কট বিষম, তবু তাঁর অন্তরের পল্লী-প্রেরণা যেন তাঁকে কিনে ফেলতে বাধ্য করল কুঠিটি এক কথায়। লেখাপড়া সেই সুদূর ইংলণ্ডেই হয়ে চুকলো।

সম্পত্তি এদেশে, দূর দেশে বসে বেচাকেনা, বাড়ীটির তখনকার হাল জানা ছিল না কারো। শান্তিনিকেতনে খবর এল,—সুরুলকুঠি কিনেছি, তোমরা দখল নাও।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার স্বর্গীয় স্বামীর উপর ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের; দখল নেওয়ার আদেশ এসেছিল তাঁরই কাছে। দখল নিতে গিয়ে দেখেন, বাড়ীটির বহু খিলান ফাটা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, দেওয়ালের গায়ে ফাটল হয়ে গাছ বেরিয়েছে নানারকম। বলেন, অনেকটা টাকা খরচ না-করলে এ বাড়ী বাসযোগ্য হবে না। আমাকে বলেন, সেই খবর কবিকে চিঠি লিখে জানাতে।

খবর পেয়ে উত্তরে কবি যে পত্র লেখেন সেই পত্রখানিতে কবির সেই সময়কার মনোভাব জানা যায়। ধার-করে-কেনা বাড়ী, সেই বাড়ীর এই দুর্গতি তাঁকে ব্যথা দিয়েছিল।

আজ শ্রীনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁর সে বেদনা উপশম হয়েছে, সন্দেহ নাই।

৫
508, W, High Street
Urbana
Illanois

২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

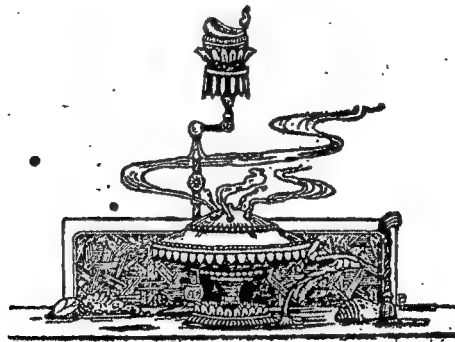
কল্যানীয়াসু,

বৌমা—তোমাদের কাছে সুরুলের বাড়ীর বর্ণনা শুনে বোঝা গেল, আমার ভাগ্যের কিছু পরিবর্তন হয় নি। কেনাবেচার বাজারে আমাকে চিরদিন ঠকতেই হবে—ঠকার সীমা যদি ঐ টাকার থলির মধ্যেই বদ্ধ থাকে তাহলেও তেমন ক্ষতি নেই, ফাঁড়া তাহলে ঐখানেই কেটে যায়। যাহোক, কাজ যখন সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে গেছে তখন লোকসানের দিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে পরিতাপ করে কোন ফল নেই—ওর মধ্যে যতটুকু লাভ আছে, তা যত সামান্যই হোক, সেইটেকেই প্রচুর জ্ঞান করে তাকে যথাসাধ্য ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করা কর্তব্য—ওর দেয়াল ফাটা, ওর গাছগুলো বুড়ো, ওর চারদিকে জঙ্গল, এ বলে মন ভারি করে বসে থাকলে ঠকাটাকে কেবল দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলা হবে। যে আটহাজার টাকা আমার গেছে, সে ত গেছেই,—কিন্তু তার বদলে যেটুকু পেয়েছি

তাকে পেয়েছি বলেই গণ্য করতে হবে। আমার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ওটাকে কি রকমে কাজে লাগাতে পারা যেতে পারে তা এতদূর থেকে বল! এবং ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে শক্ত। তোমরা সকলে পরামর্শ করে যেরকম ভাল বোধ কর তাই করো। আর কিছু না হোক, জমি অনেকটা আছে ওর মধ্যে, কিছু কিছু চাষ হতে পারে না কি! সন্তোষের গোয়াল ঘরের কল্যাণে গোবরের সারের ত অভাব হবে না। এখন থেকে ফল গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে ওতে যথেষ্ট পরিমাণ সার দিতে পারলে হয়ত আমার সময় ছেলেদের জন্য কিছু কিছু আম পাওয়া যেতে পারে।

এতদিনে তোমাদের এই পৌষের উৎসব চুকবুক গিয়ে এগারই মাঘের আয়োজন চলছে। আমাদের এখানকার দিনগুলি শান্তভাবে চলে যাচ্ছে। বাড়ী ঘর, লোকজন, জল-বাতাস আলাপ-আলোচনা, চাল চলন চিন্তাচেষ্টা অল্প রকমের—ডাঙার মানুষের জলের মধ্যে অবগাহন স্নান যেমন, আমাদের জীবনের পক্ষেও সম্পূর্ণ বিদেশের মধ্যে এই আপাদমস্তক ডুব দিয়ে যাওয়াও ঠিক সেই রকম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পণের দায়

শ্রীরেণু লাহিড়ী

বর্তমানে আমাদের বাঙালা দেশে অনেকগুলি সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ অর্থ সমস্যা, বেকার সমস্যা, বিবাহ সমস্যা ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিবাহ সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতেছে একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল না হইলেও সামান্য ভুল হইবে কারণ যে সমস্যাটির সমাধান অতি শীঘ্রই প্রয়োজন তাহা বিবাহ নয়, পণপ্রথা। এবং ইহার সাথে বিবাহের অতি নিকটতম সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে যে এই পণপ্রথা কি শাস্ত্র সম্মত? অর্থাৎ আমাদের শাস্ত্রে কি লেখা আছে যে কন্যার পিতা বরপণ দিতে বাধ্য? সম্ভবতঃ শাস্ত্রে একথার উল্লেখ নাই তবে কন্যাকে যে সম্বন্ধা এবং সালস্কারা দান করিতে হইবে সে কথা শাস্ত্রেতেই লিখিত আছে। অর্থাৎ কন্যার পিতা জামাতাকে ও কন্যাকে তাঁহার সাধ্যমত যৌতুক দিবেন। তিনি যদি ঐশ্বর্যশালী হন তবে হয়তো অগ্রপক্ষ তাঁহার নিকট হইতে রাজকন্যা এবং অর্ধেক রাজস্ব অনায়াসেই আশা করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি ঐশ্বর্য-বঞ্চিত হন তবে আপনার সামর্থ্য অনুসারে কন্যাকে ও জামাতাকে যৌতুক দিবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের বাঙালা দেশ হইতে এই রীতি বহুদিন হইল তিরোহিত হইয়াছে। তাহার পরিবর্তে যে পণ গ্রহণ করার প্রথা বর্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা আজ আমাদের দেশকে দেউলিয়া করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ভারতের প্রায় বহুদেশেই পণপ্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু আমাদের বাঙালা দেশের স্থায় উৎকট বর-পণ-প্রথা আর কোনও দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশের সমাজ ধুরন্ধরেরা এই ক্ষতিকারক সমাজ-প্রথাটির উচ্ছেদ সাধনের উপায় চিন্তা করিয়া দেখেন না। সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায় কত কুমারীর হৃদয় বিদারক অকাল মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার

মূল থেকে এই পণপ্রথা। তাহারা মৃত্যুবরণ করিয়া দরিদ্র পিতাকে অর্থদান হইতে মুক্তি দেয় তবুও আমাদের অন্ধ সমাজের চেতনা জাগে না। ইহাতে আমাদের বর্তমান সমাজ চতুর্দিক হইতে যে কত পঙ্গু ও ক্ষতি কারক হইয়া উঠিতেছে তাহা এক বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। ভগ্নী স্নেহলতার আত্মহত্যার কথা বোধ করি কেহই ভোলেন নাই। কন্যার পিতা দেউলে হইলেও কোনও ক্ষতি নাই তবু অর্থের লোভ কেহই ত্যাগ করিতে পারিবেন না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা অর্থকেই বিবাহ করিতে চান, কন্যাকে নহে।

আমরা নিজেদের সভ্য বলিয়া গর্ব করিয়া থাকি অথবা তাহা না হউক সভ্য দেশের সংস্পর্শে যে নিরন্তর বাস করিতেছি একথা তো আর অস্বীকার করিতে পারি না! পাশ্চাত্যের কত ভাল কত মন্দ আমরা অন্ধের স্থায় অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা নিজেদের কত ভাল বিসর্জন দি, সে বিষয়ে মুহূর্তের তরেও ক্রক্ষেপ করি না। কিন্তু এই কুপ্রথাটির বিলোপ সাধন আমাদের পক্ষে কোনও ক্রমেই সম্ভবপর হইতেছে না কেন? অথচ সাত সাগর তের নদীর পার হইতে সেই সভ্য শ্বেতাঙ্গ আমাদের দেশের বহু ক্ষতিকর সমাজপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, যেমন সতীদাহ, গঙ্গায় সন্তান নিক্ষেপ ইত্যাদি। যদিও জানি রাজা রামমোহন রায়ে মত মহাত্মা ব্যক্তির সহযোগীতা কিছু কম নহে। তথাপি প্রেরণা আসে তাঁহাদেরই দিক হইতেই। কিন্তু আজ এতবৎসর পরেও কি এ বিষয়ে আমাদের তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে? সারদা আইন পাশ হইবার পর আমাদের দেশের ও সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ ব্যক্তি এই আইনকে কল্যাণকর বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে এটি ডাউরি বিল

পাশ হইবে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল যদিও এখন সে সম্বন্ধে কোনই খোঁজই পাওয়া যায় না। সম্প্রতি সিদ্ধদেশে পণপ্রথার বিরুদ্ধে একটি আইন পাশ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে যে যাহারা পাঁচশত টাকার উপরে যৌতুক দিবেন অথবা যৌতুক লইবেন তাঁহারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। অর্থাৎ আমাদের দেশে এ বিষয়ে কেহই চিন্তা করিয়া দেখেন না। নিজেদের দেশে যতক্ষণ নিজেরা না জাগিব ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও কিছুই কল্যাণকর অথবা মঙ্গলজনক কার্য আমাদের দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। অপরের পরে আমরা যতই নির্ভর করি না কেন তবুও সে চিরদিন পর হইয়া থাকবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিষয় বলি। পৃথিবীর সকল দেশে সকল গ্রামে এবং পল্লীতে ভিক্ষুক আছে এবং সেই রকম ইংল্যান্ডেও আছে। কিন্তু এ বিষয়ে ইংল্যান্ডে স্বেচ্ছাবস্থা থাকিলেও ভারতবর্ষে কিছুই নাই।

সে যাহা হউক, যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের সমাজ-নেতারা এই সম্বন্ধে না দৃষ্টি দিবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা এ প্রথার উচ্ছেদ সাধন আশা করিতে পারি না।

পণপ্রথা মাত্রই ক্ষতিজনক, সে কতাপণ হউক অথবা বরপণই হউক। পণমূলক বিবাহকে স্বত্তিতে আসুর বিবাহ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। ভগবান মনু (মনুসংহিতার ৩য় অধ্যায় ৩১ শ্লোক) বলিয়াছেন—

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিনং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ
কন্যাপ্রদায় স্বাচ্ছন্দ্যাদাস্বরোধম্ উচ্যতে।”

অর্থাৎ শাস্ত্রমতে নয় পরন্তু স্বেচ্ছামতে কন্যার পিতাদিকে এবং কন্যাকে অর্থ দিয়া যে কন্যা গ্রহণ তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। এই বিবাহের ফলে ক্রুরকর্মী মিথ্যাবাদী ধর্ম ও বেদবিষেবী পুত্র সকল জন্ম গ্রহণ করে।

বর্তমান বঙ্গসমাজে ধনীর সংখ্যা অল্প এবং মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীই অধিক। প্রকৃতরূপে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে এই পণপ্রথা বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত সমাজটিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অর্থাৎ এই মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি বিনষ্ট হইয়া গেলে অধুনা সমগ্র বঙ্গসমাজও মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িবে। যে পরিবারে হয়তো পাঁচটি কন্যাসন্তান আছে সে স্থলে কন্যার পিতা

বিবাহের জন্য উপযুক্ত পণের অর্থ যোগাইতে অসমর্থ হইলে বস্তুতঃ তাহাদের বিবাহও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। আর যদিও কোনক্রমে দুইতিনজনের বিবাহ ব্যবস্থা করিতে পারিলেন তথাপি অপর কয়েকজনের অবস্থা কি হইবে? তিনি যদি আবার অকালেই দেহত্যাগ করেন তবে আমাদের বঙ্গসমাজের সেই অবিবাহিত কন্যাদের অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের সমাজে সচরাচর পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিতান্ত হীনচক্ষে দেখা হয়, ইহার কারণ আর কিছুই নহে শুধু ঐ পণপ্রথা। অর্থাৎ কন্যার অভিভাবকেরা ভাবিয়া থাকেন যে আমার এই কন্যার বিবাহের সময় আমাকে এত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এমন কড় অবলা আছে যাহারা নিবিবাহে সকল অত্যাচার সহ করে। যদিও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা ইত্যাদির জন্য তাহার অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন তবুও কন্যার বেলায় একসঙ্গে অর্থ ব্যয় করিতে হয় এবং পুত্রের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম হয় বলিয়াই পুত্র ও কন্যার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্যের প্রাচীর গড়িয়া তোলেন। যদিও এ হেন ভেদাভেদ অত্যন্ত শিক্ষিত সাধারণের মধ্য হইতে ক্রমশঃ বিলীণমান হইতেছে এবং স্ত্রের বিষয়, সেই সকল সমাধ হইতে এই বরপণের অর্থদান করাও কমিয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালী যদি আজ ধনী হইত, আজ যদি সে শিল্পোন্নতিতে যথেষ্ট উন্নত হইত অথবা ভারতের অগ্রাগ্র দেশ হইতে অবাঙ্গালী আসিয়া বাঙ্গালার যাহা আছে তাহা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া লুটিয়া না লইয়া যাইত তবে হয় তো বরপণ, ক্ষতিজনক না হইতেও পারিত। কিন্তু আজ আমাদের সেদিন নয়—আজ আমাদের দেশে মূর্ত্তমান অর্থসমস্যা দেখা দিয়াছে, এবং দিন দিন আরও বাড়িতেছে।

এগুলি ব্যতীত আরও একটি কারণ আছে যাহার জন্য এই পণমূলক বিবাহ মধ্যবিত্ত সমাজকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে। আগেই বলিয়াছি অর্থসমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যাও আবার ভীষণরূপে দেখা দিয়াছে। এই দুইটির সম্বন্ধ অতি নিকট। বেকার সমস্যা যদিও আগে ছিল তবুও বর্তমানে এই সমস্যার

বাড়িবার কারণ আমাদের দেশে কশের অভাব। সে যাহা হউক, দেশের যুবকেরা বলিতেছে—“চাকুরী না পাইলে বিবাহ করিব না।” আবার অনেক ক্ষেত্রে তাহারা বিবাহ করিতে একেবারেই নারাজ। অনেকের হয়তো মনে মনে বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকে কিন্তু অপর দিকে পিতা হয়তো পণ করিয়া আছেন—“এত পণ না হইলে ছেলের বিবাহ দিব না।” সুতরাং পুত্রের গোপন ইচ্ছা গোপনেই থাকিয়া যায় এবং পিতার মনোমত পাত্রী অল্পমঙ্গল করিতে করিতে তাহার বয়সও বাড়িয়া যায়। আমাদের পরিচিত একজন ভদ্রলোক আছেন যিনি সত্যিই পণ করিয়াছেন—“এত টাকা না হইলে ছেলের বিবাহ দিব না।” বলা বাহুল্য তাহার ছেলের বিবাহ এখনও হয় নাই। অপর দিকে কতরাং পিতা উপযুক্ত পণের অর্থ যোগাইতে পারেন না এবং কতরাং বয়সও বাড়িয়া যায়। ইহার পর বিবাহের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? কারণ বিবাহের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে যাহার মধ্যে সকলেরই বিবাহ হওয়া উচিত। ছেলেরা ব্যবসা বাণিজ্য ও বাহিরের আমোদ-প্রমোদে ডুবিয়া থাকিতে পারে কিন্তু মেয়েরা কি লইয়া থাকিবে? তাহারা যতই শিক্ষিতা ও আলোকপ্রাপ্তা হউক না কেন আর যতই ডিগ্রীধারিণী হউক না কেন, সকলের শেষে তাহাদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। তাহাদের পিতামাতা ও অগ্রাশ্রয় অভিভাবকেরা এই ইচ্ছাই করিয়া থাকেন। এইগুলি ছাড়া পণমূলক বিবাহ অনেকের জীবনে বিষময় হইয়া উঠে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক দুঃখ ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা সব দিক দিয়া মধ্যবিত্ত সমাজের কল্পপ অনিষ্টকর তাহা সকলেরই উপলব্ধি করা উচিত। বাঙ্গালী যদি আজ বাঙ্গালীকে না দেখিবে তবে তাহাকে দেখিবে কে? এই প্রকার বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালীর ঔদাসীন্য আর অধিক দিন থাকিলে কোনও দিন হয়তো এমন দিন আসিবে যখন সত্যিই এই মধ্যবিত্ত সমাজ ধীরে ধীরে অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; অথচ বাঙ্গালার বহু স্বনামধন্য ও প্রথিতযশা ব্যক্তি এই মধ্যবিত্ত ঘরের জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আনন্দমোহন

বসু, বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু সকলেই এই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন। অবশ্য আমরা যদি এই ইচ্ছাই করি—বাঙ্গালী জাতিই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাক—তবে আমাদের এই ঔদাসীন্য কিছুমাত্র আশ্চর্যজনক হইবে না।

এখন এই বলিয়া শেষ করি যে আজ বাঙ্গালার শুধু নারী নহে অথবা নর নহে—নর-নারী উভয়েই এ বিষয়ে কঠোর কর্তব্য গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ উভয়ের শক্তি এবং উভয়ের প্রেরণা একত্রিত না হইলে কোনও কিছুই মঙ্গলজনক অথবা কল্যাণকর আশা করা যায় না।

“কোনও কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষী নারী।”

আজ যদি সত্যিই দেশের যুবকেরা এই পণপ্রথার প্রতিকার না করেন—তবে যেন দেশের মেয়েরা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সংসাহস রাখেন। আমাদের দেশের “ভিভোস বিলের” প্রয়োজন আছে কি না আছে সে বিষয় জানি না—তবে শুনিতেছি ইহা পাশ হইবে—অথচ যাহার প্রতিকার শীঘ্রই প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কেহই চিন্তা করিয়া দেখেন না। আমরা আশা করি, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে সকল নারী সদস্তা আছেন তাহারা নিশ্চয়ই দেশের ও দেশের উপকারের জন্ত এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন এবং ইহার প্রতিবিধান করিতে তৎপর হইবেন। ভারতের তথা বাঙ্গালার নারীর আজ ইহা প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এই মহাকর্তব্য সমাপন করিতে যতখানি সংসাহস ও শক্তির প্রয়োজন, আশা করি বাঙ্গালার নারী তাহা রাখিবেন এবং জাতির এই দুর্দিনে দেশকে—জাতির ও সমাজের কল্যাণসাধন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। নিজের দেশকে যদি অগ্রাশ্রয় পাশ্চাত্য দেশের তায় গড়িতে ইচ্ছা করি তবে সর্বাগ্রে জাতিগঠনকার্য্যে ব্রতী হওয়া একান্ত আবশ্যক। জাতিগঠনকার্য্যে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার এবং দেশের নারী যদি সেই সাম্য অধিকারের মূল্য না বোঝেন অথবা না রাখেন তবে হয়তো এমন একদিন আসিবে যখন এই লুপ্তপ্রায় বাঙ্গালী জাতিকে পৃথিবীর অগ্রাশ্রয় জাতি স্বরণ রাখিবে কিনা সন্দেহ।

নিমন্ত্রণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে পড়ে যেন এককালে লিখিতাম
চিঠিতে তোমারে প্রেমসী অথবা প্রিয়ে ।
একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম,—
থাক্ সে কথায়,—লিখি বিনা নাম দিয়ে ।
তুমি দাবি করো কবিতা আমার কাছে,
মিল মিলাইয়া দুক্ল হৃদয়ে লেখা,
আমার কাব্য তোমার ছায়ায় যাচে
নম্র চোখের কপ্প কাজলরেখা ।
সহজ ভাষায় কথাটা বলাই শ্রেয়,—
যে-কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে,—
সময় ফুরোলে আবার ফিরিয়া যেয়ো,
বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে ।
গৌরবরণ তোমার চরণমূলে
ফলসাবরণ সাড়িটি ঘেরিবে ভালো ;
বসনপ্রাস্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোজ প্রান্তে সফ পাড় ঘন কালো,
একগুছি চুল বায়ুউচ্ছ্বাসে কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে,
ডাহিন অলকে একটি দোলন চাঁপা
তুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গীর সনে ।
বৈকালে গাঁথা যুধীমুকুলের মালা
কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিলে সাঁঝে ;
দূরে থাকিতেই গোপন গন্ধঢালা
সুখ সংবাদ মেলিবে হৃদয় মাঝে ।
এই সুযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—
আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুপীর ছল
রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা—
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভুল ।

আরেকটা কথা ব'লে রাখি, এইখানে,
কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই,
স্বর দিয়ে সেটা গাহিব না কোনো গানে,
তুচ্ছ শোনাবে তবু সে তুচ্ছ কই ।
একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত ।
বেতের ডালায় রেশমি কমাল টানা
অরুণ বরণ আম এনো গোটাকত ।
গদ্য জাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ে,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায় ।
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়,
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায় ।
ঐ দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোঁগায় স্থূলতার জয়ভাষা,
জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠর-গুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা ।
তথাপি পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে কথা কবির গভীর মনের কথা
উদরবিভাগে দৈহিক পরিতোষ,
সঙ্গী জোঁটায় মানসিক মধুরতা ।
শোভন হাতের সন্দেশ পানতোয়া,
মাছ মাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবা-মাধুর্য্যে হোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয় ।
বুঝি অল্পমানে চোখে কৌতুকে ঝলে
ভাবিছ বসিয়া সহস গুণধরা,
এ সমস্তই কবিতার কোঁশলে
মৃদু সংকেতে মোটা ফরমাস করা !

আচ্ছা না হয় ইঙ্গিত শুনে হেসো,
 বরদানে দেবি, না হয় হইবে বাম,
 খালি হাতে যদি আসো, তবে তাই এসো,
 সে ছুটি হাতেরও কিছু কম নহে-দাম ।
 সেই কথা ভালো, তুমি চলে এসো একা
 বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে,
 স্তব্ধ গ্রহের দুজনে বিজনে দেখা,
 সন্ধ্যা তারাটি শিরীষ ডালের ফাঁকে ।
 তারপরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে
 ভুলে ফেলে য়েয়ো তোমার যুথীর মালা,
 ইমন বাজিবে বঙ্গের শিরে শিরে
 তারপরে হবে কার্যালেখার পালা ।
 যত লিখে ঘাই ততই ভাবনা আসে
 লেফাফার পুরে কার নাম দিতে হবে,
 মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে
 কোন দূর যুগে তারিখ ইহার কবে ।
 মনে ছবি আসে,—বিকিমিকি বেলা হোলো,
 বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;
 কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো,
 তবু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি ।
 কুঙ্কুম ফোঁটা তুরঙ্গমে কীবা,
 শ্বেত করবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে,
 পিছন হইতে দেখিছু কোমল গ্রীবা
 শোভন হয়েছে রেশম-চিকন চুলে ।
 তাত্র খালায় গোড়ে মালাখানি গৌণে
 সিন্ধু কমাঁলে যত্নে রেখেছ ঢাকি,
 ছায়াহেলা ছাদে মাতুর দিয়েছ পেতে
 কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি ?

আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি
 গোখলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে,
 দেয়ালে ঝুলিছে শেদিনের ছায়া-ছবি,
 শব্দটি নেই,—ঘড়ি টিক্‌টিক্‌ করে ।
 ঐ তো তোমার হিসাবের ছেঁড়াপাতা,
 দেবাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি,
 কতদিন হোলো গিয়েছ, ভাবিব না তা,
 শুধু রচি ব'সে নিমন্ত্রণের চিঠি ।
 মনে আসে, তুমি পূব জানালার ধারে
 পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে,
 উৎসুক চোখে বুঝি আশা করো কারে,
 আলগা আঁচল মাটিতে পড়েছে ব'সে ।
 অধেক ছাদে রোজ নেমেছে বৈকে,
 বাকি অধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া ;
 পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
 চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া ।
 এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
 আপাতত এটা দেবাজে দিলেম রেখে ;
 পারো যদি এসো শব্দবিহীন পায়
 চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে ।
 আকাশে চুলের গুচ্ছটি দিয়ে পাত্তি,
 এনো সচকিত কঁাকনের রিনিরিন্,
 আনিয়ো মধুর স্বপ্ন-মঘন রাতি,
 আনিয়ো গভীর আলম্বন দিন ।
 তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা,
 স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরী ধারা,
 মুগ্ধ গ্রহর ভরিয়া তোমাতে দেখা,
 তব করতল মোর করতলে হারা ।



আশ্রয় ভিক্ষা

শ্রীমীরা মুখোপাধ্যায়

কেন যে জীবন খানি

আজো হেথা রয় ফুটে,

কেন যে স্নেহের ধারা

মরম নিড়াড়ি উঠে,

সব কালো তবু আলো

কেন যে খুঁজিতে চাই,

চিররুদ্ধ কণ্ঠ তবু

অফুট রাগিনী গাই,

আঘাতের ক্ষতে চিত্ত

যাতনায় খসে যায়,

তবুও ঔষধি তরে

ঘুরি কি ব্যাকুলতায় !

শক্তিহীন ক্ষীণ দেহ

চরণ অবশ হ্রাস,

বহুদূর দূরান্তরে

তবু প্রাণ ছুটে যায় ;

কোথা পথ ! পান্থাবাস

কোথা এসে বিরাম গেহ

এ আর্ন্ত অনাথ জনে

দিবে কি আশ্রয় কেহ ?

যৌগিক

৩রাধাচরণ চক্রবর্তী

[পূর্বানুবর্তি]

আমরা ছ'জন যেন নদী সাঁত্রে কূলে উঠেছি !...
অতলার উপমা অশেষকে চমৎকৃত করে !...অতলার হাসি
যেন তাঁকে নতুন আলোকে পথ দেখাতে চায় ।

তার উদাত্ত দৃষ্টি মুগ্ধতায় আনত হয় ওর মুখের ওপর ।
মুখের ওপর এবং সর্বাঙ্গের সিক্ততার ওপর ।

বৃষ্টির ধারা ওকে সদানন্দীম্মাতারই রূপ দিয়েছে ।
সত্যই ও' নদী সাঁত্রে উঠে এসেছে এইমাত্র যেন ।
বাইরে প্রবল বৃষ্টিধারা ব্যাকুল জলকলরবে প্রবাহিত হ'য়ে
চলেছে,—ঘরের মেঝেতেও প্রক্ষিপ্ত সজলতা, রণা নয়, যেন
ভেজা মাটি ।...ঘরে দাঁড়িয়ে থেকেই অশেষের মনে হয়
দাঁড়িয়ে রয়েছেন নদীর ডাঙায় ।

ওর দৃষ্টির পরিক্রমা অতলার দেহে সঙ্কোচের হর্ষ আনে ।
ওর দৈহিক স্বজুতা আসে অবনমিত হ'য়ে, নিম্নদৃষ্টিতে
নিজেরই দেহের দিকে চায় ।

ভেজা আঁচলটাকে এপাশ থেকে ওপাশে বুক বেড় দিয়ে
ঘুরিয়ে নেয় ।

আন্তে আন্তে চোখের পাতা উঠিয়ে আনে ।—একই
জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন জামাইবারু ।

চোখের পাতা নামিয়ে এনে বলে, “কি ভাবছেন
জামাইবারু ?...ভিজে কাপড়ে অস্থখ করবে যে,—বদলে
ফেলুন ।”

অশেষ ওর প্রশ্নের প্রথমার্ধের জবাব দেন : “ভাবছি না,....”

একটু থেমে বলেন, “দেখছি।”

অতলা এবার মুখ তুলে একই সঙ্গে নিজের দেহের দিকে এবং অশেষের মুখের দিকে চেয়ে বলে, “আমিও বড় কম ভিজিনি—তাই ?”

অশেষের স্বর-বিহ্বলতা ঢাকতে পারে না : “না ; তুমি ভারী সুন্দর—তাই ?”

একটা অকারণ বেদনা অতলার চোখের পাতা দু’টিকে নামিয়ে দেয়। চোখের কোণ ছলছলও করে বুঝি। ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

অশেষের বিহ্বলতা অল্পতপ্ত হয়। বলেন, “কোন কঠিন কথা বললুম তোমাকে-কি....”

অতলার ওষ্ঠ অর্ধ উন্মিত হয়ে কাঁপে। কিছু বলবে, কিন্তু খুঁজে পায় না কি বলবে।

মুহূর্তেরও মুহূর্ত। সহসাই—

একবারেই আকস্মিক,—বিশ্ময়করভাবে অপ্রত্যাশিত একটা দমকা হাওয়ার মতই উর্দ্ধবাহু হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতলা অশেষের বুকের ওপর।

এক-পা পিছিয়ে গিয়ে অশেষ আপনাকে দৃঢ়ভাবে সামলিয়ে দাঁড় করান। অতলার বাহু তাঁকে অক্টোপাসের মত নিবিড় বেঁটন করে ধরেছে.....ওর মুখ তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে গেছে এক দেহের মত।

মুহূর্তের উত্তেজনায় একবার ছলে ওঠে অশোকের সমগ্র শরীর। তারপরই আশ্চর্য ধীরতায় সবলে ওর দেহসংলগ্নতা বিচ্ছিন্ন করে বসিয়ে দেন ওকে পাশের চেয়ারটিতে।

ভাঙা গলায় বলেন, “তোমার অস্থিরতা আমাকে দুঃখিত করল.....ভালো নয়।”

অতলা উপড় হয়ে পড়ে টেবলের ওপর। তারপর ফুলে ফুলে কাঁদে.....সে কি কারা! ওর এক চোখের জলে ভিজিয়ে যায় ওর হাতের কজ্জী; অস্ত্র চোখের জল শুষে নিতে থাকে টেবলে-পাতা রটিং প্যাডটা।

একটা চাপা অস্থিরতা নিয়ে অশেষ এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করে ফেরেন।

* * * *

“আজ যেন পা স্লিপ করবার পালা পড়েছে”—
অতলার এই স্বগতোক্তি যেন ওর মনের তিরস্কার।

ওর বাইরের মন ওকে তিরস্কার করে। আর ওর ভেতরের মন দেয় ওকে এক দুর্কোথ্য দৈবের সংকেত।

পা পিছলাবার একটা সাক্ষাতিক রেখাঙ্কর অভাবনীয় ভাবে পরিলিখিত হয়ে যায় ওর স্মৃষ্টি চিন্তায়। স্থূলতর হ’য়ে ফুটে ওঠে তা ভাষান্তরে : পদস্থলন। কি জানি বাইরের ঘটনার সঙ্গে প্রচ্ছন্ন মানসিকতার কি নিগূঢ় যোগসূত্র আছে! মনের চিন্তা কি বাস্তব সংঘটনে অভিনয়িক রূপ পায় না নাটকীয় অল্পক্রেমে একটা ঘটনা মননের ভেতর দিয়ে এসে আর এক ঘটনার সূত্রপাত করে ?
.... ওর ললাটে চিন্তার রেখা পড়ে।

পদস্থলন—কিন্তু কার পদস্থলন ?.....দেবনাথের—
না, কি ? হ্যাঁ, তা’ ছাড়া আর কার ? তাঁর সন্ন্যাসের, তাঁর ব্রহ্মচর্যের বিচ্যুতি ঘটছে না কি সংসারধর্মে ত্রুটি হওয়ায় ? বিবাহ কি ব্রহ্মচর্যের ব্যতিক্রম নয় ?—স্বনিশ্চয়। সেই ভাবী ব্যতিক্রমেরই ভাবনা তাঁর মগ্ন মনের ভেতর দিয়ে এসে দিড়ির ধাপে পা স্লিপ করিয়েছে তাঁকে।

সন্দেহ কি !.....অতনী ওর মনস্তাত্ত্বিকতার অশিক্ষিতপটুত্ব মনে করে, একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে ও’। এবং—

এই সিদ্ধান্তের পরিশিষ্টে—

হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কি সমাধান হতে পারে যে, সেই দেবনাথের ঘটনাই ভীতিপ্রদভাবে ওর অজ্ঞাত মননে যে ছায়াপাত করেছিল, সেইটাই বেরিয়ে পড়েছে এক অসতর্ক পদক্ষেপে ওর নিজের পা পিছলাবার রূপ নিয়ে।

এই সিদ্ধান্ত এবং এই-ই ওর একমাত্র সমাধান।.....

কিন্তু—

মিলের ভেতর একটা গৌজামিলের খোঁচার মত ওর মনের ভেতর তবু যেন একটা অঁচড় থেকে যায়।.....ও’

ভয়ে ভয়ে ভাবে, ও' কি জানে না, এমনভাবে ওর ভেতরেও একটা পদস্থলনের প্রবণতা আসছে—?

একজন অধ্যাপকের স্ত্রীর পক্ষে.....

একজন অপরিচিত পরপুরুষ দেবনাথ। সত্যি ত', দেবনাথ ওর কে? অথচ—অধ্যাপকের স্ত্রীর পক্ষে..... না, না, ও' ত' এমন কোন কাজ করেনি যার জন্যে ওকে অনুতপ্ত হ'তে হবে। ওর মার্জিত আচরণ, ওর সম্মতজন, ওর ভদ্রতাবোধ—তার কি ক্রটি হয়েছে কিছু? কেউ বলতে পারে।

দেবনাথ আসবার পর থেকে, অতসী নিজের সব কাজ সকল ব্যবহারগুলো একে একে বিশ্লেষণ করতে করতে আসে। না—ত', অন্তর চোখে দূরের কথা, ওর নিজের চোখেও ধরা পড়বার সম্ভাবনা নেই ওর কাজের ক্রটি।

কিন্তু কাজের আগে আছে মন—আছে মনন। ও চিন্তাতেও কি কোন—?

অতসীর বুকে উদ্বেগের দোলা লাগে।.....ওর মন ওর কথার জবাব দেয় না,—মনন যায় মনের আব'ডালে লুকিয়ে।

হঠাৎ ও' ধরে' ফেলে ওর হৃদপিণ্ডের বিকৃত ভাব। ওর বুকের মধ্যে গভীর শব্দে যেন একটা উত্তেজনা বাজছে। এই উত্তেজনা.....

এই উত্তেজনা ওর সেই পা পিছ'লাবার পর থেকে। ও পা পিছ'লিয়ে পড়েছিল,—

পড়েছিল—কিন্তু শীতল শানের ওপর নয়.....

একটা উত্তপ্ত সজীব রক্তমাংসের স্পর্শ ওর দেহের রোমাঞ্চে জেগে' ওঠে। ওর দেহকে ব্যাধিগ্রস্তের দেহের মত ঘর্ষিত করে' তোলে।

দুর্যোগ তার অবরোধ অপসারণ করে। ঘোলাটে আকাশের প্রত্যন্তে চাঁদকে দেখা যায়। গৃহকন্ড মাছুষ ছয়ার খুলে' বাইরে আসে।

নিয়মতান্ত্রিকতার সাড়া ব্যতিক্রমকে সতর্ক ও সচেতন করে' তোলে।—

“অতি, ভেজা কাপড়ে অমন করে' পড়ে' থেকো না— ছিঃ।” বলে' অশেষ বাই'র এসে দাঁড়াল।

একটা পাতলা ধোঁয়াটে রঙের মেঘ ধীরে ভেসে যাচ্ছে চাঁদের মুখের ওপর দিয়ে—চাঁদকে দেখায় চাঁদের ছায়ার মত।...চাঁদের মুখে কে যেন কমলার গুঁড়ো মাখিয়ে দিয়েছে।

অশেষ এদিক থেকে দালানের ওদিকে চলল।

অতলার অসাড়তা জন্ততায় সপ্রতিভ হ'য়ে দাঁড়ায়। ও' “উঠেই ক্ষতহস্তে বস্ত্র পরিবর্তন করে' ফেলে। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে আসতে এক মুহূর্তও দেরী হয় না।

মেঘচ্ছায়ায় মলিন হ'য়ে চাঁদের আলো এসে ওর মুখে পড়ে। ওর পরিষ্কার কাপড়খানাকেও সেই চাঁদের আলোয় ময়লা দেখায়। নিজের মুখ ও' নিজে দেখতে পায় না, মুখভাবে কি মলিনতার ছাপ পড়েছে?

একেবারেই কে ওর গায়ের ওপর এসে পড়েছে। ওঃ, দিদি।...পাশ কাটিয়ে দাঁড়ায় এবং দিদির মুখের দিকে চায়। চাঁদের আলোয় তার মুখ কেমন পাণ্ডুর দেখাচ্ছে।

দৃষ্টি মুখ থেকে দেহে নামে।—“এ কি দিদি, তুমিও ভিজ্' গিয়েছ এমন?”

অতসীর চোখ প্রশ্ণকারিণীর সূক্ষ্ম দ্বিগ্নে ফিরে' আসে। —“তুইও ভিজ্'ছিলি নাকি,—কপড় বদলিয়েছিসু?”

দিদির পেছনে পেছনে চলতে চলতে যেন বলে, “হ্যাঁ। তুমি শীগ' গির ছেড়ে ফেলো এখন ভেজা কাপড়, দিদি।”

অতসী ভেজা কাপড় ছাড়ে আলনার সামনে দাঁড়িয়ে। আলনার পাশে অতলার ছাড়া সাড়ী বেঁসে অশেষের ছাড়া ধুতি।

—“তোরা জামাইবাবুও ভিজ্'ছেন দেখছি।”

অতলা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানায়: “হ্যাঁ দিদি, সবাই। যে বিষ্টি, আর তার যে ছাট'...দেখছ না, মেঝের এতটা পর্য্যন্ত ভিজ্' গেছে।”

একটু থেমে বলে, “ঐ টেবলটাও, কাগজ-পত্রও।”

বলে 'আঙুল তুলে' টেবলটাকে প্রদর্শন করে। ব্রটিশ প্যাড্‌ওর চোখের জল সব শুষে' নিতে পারে নি।

অতসী বলে, "সত্যি বাপু, যে বিষ্টি—ঘরে থেকেও সবাই ভিজ়ে' চুপ্‌সে গেলাম একেবারে।"

...এ ঘরের ভেজা মেঝের 'পরে এসে পড়ে' ওঘরের ভেজা মেঝের প্রতিবিম্ব।—অতসী দেখে।

অতলা দেখে—তার দিদির সীমন্তের ওপর বিছাতের আলোক পড়ে' রক্তিম বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে।

অশেষ লক্ষ্মীনাথকে নিয়ে ফিরে' আসছেন। পাঞ্জাবী হোটেলের শরণাপন্ন না হ'লে আর উপায় নেই। উলুনটা শুধু ভিজ়ে'ই যায় নি, ভেঙেও গেছে।

অতিথির ঘরের সামনে দিয়ে আসতে আসতে ঘরের দিকে একরার চান—অতিথির সঙ্গে চোখোচোখি হয়।

যেন হয় নি, এমনি ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে' আসতে আসতে স্মরণ করেন: আজ দু'দিন মাত্র এই অতিথি এসেছেন তাঁর গৃহে।

সদ্য ঘুম থেকে উঠে' নীতীশ অবাক্‌ হয় আব'হাওয়ার আমূল বদলি দেখে'। কি গরম ছিল, আর এখন শীত শীত কবুছে। মেঝের ওখানটায় কতটা জল দাঁড়িয়ে গেছে আবার! আঁচলের মুড়া গায়ে টেনে সে এসে মাঝের দরজার সামনে দাঁড়ায়।

দেবনাথ পায়ের শব্দে চোখ তুলে' চাইতেই সে বলে, "মিঃ স্বামীজি, খুব ঝড় বিষ্টি হয়ে গেল নাকি? পড়তে পড়তে আমার চোখ বুজে এসেছিল একটু, এরি মধ্যে..."

দেবনাথ বলেন, "হ্যা—ঝড় নয়, তবে খুব বিষ্টি।"

নীতীশ আক্‌শোষের স্বরে বলে,—"একদম মাটি! বিষ্টি আমি ভারি পছন্দ করি, অথচ এন্‌জয় করতে পারলুম না।—কি বলেন আপনি?"

দেবনাথ শুধু বলেন, "হ্যা, এন্‌জয়েবল্‌।"

গভীর রাত্রি ঔঠপুটে তর্জনী তুলে' থমকে আছে বাড়ীটার দিকে চেয়ে। বেতলা বাতাস এসে মাঝে

মাঝে শুধু স্তব্ধতার আঁচলে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। আকাশকে কে যেন কোদাল দিয়ে কুপিয়ে রেখে গেছে, এমনি এবড়ো খেবড়োভাবে ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণধূসর মেঘের সারি। চাঁদ যেন মাঠের আলিপথ দিয়ে একা পায়ে হেঁটে পরিব্রজে চলেছে।

বৃষ্টির ধারারেখা এখনও চিহ্নিত হ'য়ে আছে দেয়ালের গায়ে, ছাদের কাণিসে, আলিসায়। তার ওপর এসে পড়েছে নিশ্চল চাঁদের আলো। বস্তুতাত্ত্বিকতা যেন চোখের জলের স্বপ্ন দেখছে।

পর পর তিনটি বর দীপহীন অন্ধকারে স্তিমিত হ'য়ে আছে। যারা ঘরে শুয়ে আছে তারা ঘুমিয়ে আছে কি জেগে আছে কে জানে? আঁধার তাদের চাঁদের মুড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

বাইরের মাল্লখটি—

একটা মটকা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢেকে অশেষ শুয়ে আছেন। নিশ্চলতা যদি নিজার পরিচায়ক হয় তবে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। চাঁদের আলোয় দেখা যায়, চোখের পাতা দুটো বোজা।

কিন্তু চাঁদের আলোয় শুধু চোখের পাতা নয় গোটা মুখটাকেই দেখা যায় এবং মুখের ভাবও।

মুখভাবে ভাব পরিবর্তনের আলোক-ছায়া। মনের চিন্তার যে বিচিত্র বৃহ্নি চলেছে, তারই প্রতিচ্ছায়া এসে কাঁপছে তাঁর মুখের ওপর। অশেষ যে চোখ বুজে' জেগে আছেন তার আর ভুল নেই।

অশেষ ভাবছেন—

এ কোন্‌ অতিথিকে আমন্ত্রণ ক'রে গৃহে নিয়ে এল অতসী! শুধু নিয়ে এল না, নিয়ে এসে দাঁড় করাল এমন স্থানে, যে.....

অশেষ বুকের ভেতর মনের চোখ দিয়ে চান। যেন বুকের ভেতরই সেই স্থানটি রয়েছে, যেখানে অনভিপ্রেত কেউ এসে দাঁড়িয়েছে!.....

এমন স্থানে.....তাঁর পঞ্জরতলের হৃদপিণ্ডের ভেতর

যেন কার পদার্পণের কঠিন আঘাত এসে বেজেছে। তাঁর বৃকের বড় বেদনার স্থানে.....

অপরিচিতের প্রবেশ। কিন্তু এ'কে অনধিকার প্রবেশ বলবেন কেমন ক'রে তিনি! তাঁরই জ্বী দিয়েছে তাকে প্রবেশের অধিকার।

প্রবেশের অধিকার, আত্মীয়তার অভ্যর্থনা এবং তারপর আতিথ্যের শেষ উপহারস্বরূপ গৃহের যে মহার্ঘ্য জিনিষটি নির্দিষ্ট হয়েছে.....

অতলা যেন মনে মনে এসে পড়েছে তাঁর গভীর মননে। সজীব ভাবমূর্তি—প্রতিভা ও সপ্রতিভতা সমতায় মিলে দিয়েছে তাকে আশ্চর্য্য রুচিরূপ রূপ.....আবার সেই রূপকে ছাপিয়ে সে আরও অপরূপ.....সে.....

অধ্যাপকের সংস্কারী বহির্মন একবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়, কিন্তু তাঁর শিল্পী অন্তর্ম্মন তখনই চলে সংস্কারকে অতিক্রম করে।

হাঁ, তাঁর গৃহের ঐশ্বর্য্য; এবং তিনি যেমন গৃহের অধিকারী তেমনি এই ঐশ্বর্য্যেরও অধিকারী।

এই অধিকারের সীমায় দাঁড়িয়ে মনোবীক্ষণ দিয়ে অশেষ একবার মনের মগ্নতায় আলোকপাত করতে চান।.....

অধিকারীত্বের দাবীতে এই ঐশ্বর্য্যকে নিয়ে তিনি...

না-না, ছিঃ! এত ইতর নন তিনি, কার্য্যতঃ তো নয়ই, চিন্তাতেও না। এই ঐশ্বর্য্যকে তিনি মলিন স্পর্শে কলুষিত করতে চান, এও কি সম্ভব?

উপভোগ—কিন্তু তার মধ্যে ভোগের উত্তাপ নেই। বৈষ্ণব পদাবলীর পারমার্থিকতা দিয়ে তিনি তাঁর বাসনাকে সমর্থন করতে যান! কিন্তু—

যে বাসনার মূলে তাঁর এই অধিকারিত্বের দাবী প্রবল হয়ে জেগে আছে, সেই স্বার্থপর বাসনার কি পারমার্থিক অর্থ হতে পারে? অতলাক স্বাধিকারে রেখে তাঁর বাসনা কি চায় তার কাছে? সত্যি—কি চায়!

বিশুদ্ধতায় বাসনাকে সমর্থন করেন, কিন্তু বাসনার উত্তাপকে অস্বীকার করতে পারেন না!—

উত্তাপ দেয় আগুনের অস্তিত্বের সাক্ষ্য। সেই উত্তাপের মূল আরিকার করতে অশেষ আবার ফেলেন তাঁর সন্ধানী আলো!...টকটকে রক্তের রঙ কামনার আগুণ।

এই কামনার আগুণে তিনি আপনাকে দগ্ধ করতে চান।...

তা নাভ কি! তিনি কি মনে করেন, একটি মেয়ে, যে আজন্ম কুমারীত্ব স্বীকার করে' তাঁর গৃহের অবরোধে থাকবে একান্ত ভাবে তাঁরই অধিকারকে অশ্রয় করে, সে কি সেই মেয়েটিরই আত্মার উন্নতির জন্তে? মিছে কথা,—এখানে' অশেষ মেয়েটির দিক দিয়ে কিন্তু বিচার করছেন না, নিজের দিক দিয়ে নিজের উপভোগকেই সমর্থন করছেন—হতে পারে তা তাঁর নিছক মানস উপভোগ।

কিন্তু মন থাকে দেহের ভেতরেই বাগা বেঁধে। তাঁর এই মনের পেছনে কি একটা রক্তমাংসের দেহ নেই? এবং—সেই মেয়েটিরই মন কি দেহ ব্যতিরিক্ত?

অশেষের মন একটি স্নুকুমার মনের নাগাল ধরতে গিয়ে একটা স্নুকুমার দেহের সঙ্গে প্রতিহত হয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায় অতর্কিতে!

মন নয়, তাঁর দেহও। তাঁর বৃকের সঙ্গে প্রগাঢ়ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে কার দেহ...

অশেষ যেন সবলে কারকে ঠেলে ফেলছেন এম্মি ভাবে বৃকের চাদরটাকে একবার ঠেলে' তুললেন, আবার—টেনে নামালেন। তাঁর গায়ের সেই মট্কার চাদরখানা যেন চাদর নয়—জীবন্ত মাহুষ! সেই জীবন্ত মাহুষকে তিনি ছ'হাত দিয়ে বৃকের ওপর চেপে ধরেছেন।

ক্রমে শিথিল বাহু খণ্ডিত হয়ে বৃক থেকে সরে আসে। তাঁর বিভ্রান্তি পর্য্যন্ত বাসনার তাপে উত্তপ্ত! সেই উত্তাপ তাঁর আত্মসমর্থনকে বিদ্রূপ করে।

এ তাঁর বাসনার স্থান। বৃকের স্পন্দনে বেদনার মত বাজে তাঁর বাসনার স্থান। কোন আগন্তুক অতিথি নয়, এই বাসনার স্থানে তাঁরই ছায়ামূর্তি করছে বিচরণ!...একটা দারুণ আত্মগ্লানি তাঁর মুখের ভাবে ফুটে ওঠে। যা তিনি

বদনা বলে অহুভব করছেন তা তাঁর অতৃপ্ত বাসনার
পূন্য।

কিন্তু শুধু তাই কি? না ত'। আরও একটা পৃথক
বদনার আন্তর তিনি যেন স্পষ্টই অহুভব করেন। কি
হতে পারে তা?

এখানে অতলা নয়—অতসীর ভাবমূর্তি, তাঁর পরিচ্ছদের
মার্জিত রুচি, তার দেহীর ওপর চিত্তসৌন্দর্যের আবেদন
চিহ্নিত করেছে। সে শুধু সুন্দরী নয়, স্থূললিতা।...হ্যাঁ
এখানেই অতসীর স্থান—এখানেই শেষে তাঁর গোপন
হৃদয় দিয়ে দেবীর পদ্মাসন রচনা করেছেন এবং এখানে
আর কারুর প্রবেশ-অধিকার নেই, দেবীর একক পূজারী
অশেষ ছাড়া।

এবং এখানেই অনধিকার প্রবেশ করেছে এক
হুঃসাহসিক অতিথি। স্পর্ধা।

অশেষের মুখের ভাবে একবার উন্নীর উদ্দীপনা জাগে।
ভাব পরিবর্তন তখনই আবার সেই উদ্দীপনায় বিবাদে
কালিমা ঢেলে দেয়। প্রত্যক্ষের মতই তিনি দেখেন,
দেবীর দেহের ওপর এ আগন্তকের মলিন ছায়া এসে
পড়েছে,...প্রসন্ন দেবী অভয় দানের ভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্ত
টোলেন করে' আছেন।

অভয়ের পরে বর—। অশেষের মুখ মুতের মুখের
মতই একেবারে নীরত বিবর্ণ হয়ে পড়েছে।

শুধু ভক্ততা, অভ্যর্থনা, আতিথ্য মাত্রই নয়, এসব ছাড়া
আরও বিশেষ কিছু যেন অতিথির দিকে উন্মুখ হয়ে উঠছে
আতিথ্যদানকারীর দিক থেকে। সে যে কি...

অশেষ আবার গোড়া থেকে অতিথির দুটি দিনকে
মনোবিশ্লেষকের মত বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন।

বিশ্লেষণের ধারা ধরতে পারা কঠিন। চাদরটাকে
টেনে মাথা ঢেকে ক্যাম্পখাটের শিয়রে নামিয়ে দেওয়া
হয়েছে। ক্যাম্পখাট শুদ্ধ শায়িতের মুড়ি দেওয়া
মুড়িটাকে দেখলে একটা মিসর দেশীয় কফিন বলে মনে
হয়। একটা মমি যেন কফিনের তলে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস
ফলছে।

রাত শেষ হ'য়ে প্রত্যুষের ক্রম স্পষ্ট হা গাছের আব-
ডালের কুঁড়ির মত স্ফুটনোন্মুখ হ'য়েছে কিন্তু তখনও ফুল
হ'য়ে ফুটে ওঠেনি। আভার আভাস আসছে অথচ প্রথম
আলোর চরণপাত হয়নি।

* প্রত্যুষকে প্রদোষ ব'লে ভ্রম হয়। একটা দুঃসহ
পিপাসা নিয়ে 'জেকে' উঠে' অশেষের তাই হয়েছে। দুটির
দিনে যেন অবলায় ঘুমিয়ে সাঁঝ-আধারীতে জেকে
উঠলেন।

ভ্রম-দূর হ'তে দেবী হয় না; কিন্তু পিপাসাটা তাঁর ভ্রম
নয়। শিয়রের দিকে হাত বাড়ালেন অভ্যস্ত ভঙ্গীতে।
অভ্যস্ততা আহত হয়, যেমন তাঁর মাথার দিকে প্রতাহ এক
গাস জল ঢাকা থাকে আজ তা নেই।

নিয়মের ব্যতিক্রম। অশেষের স্বপ্ন বোধ বিস্তৃত
হয়। যে নিয়মটাকে অতসী কর্তব্যের মত পালন করে'
নিয়মিত রেখেছে এতদিন, আজ তার বিচ্যুতি ঘটেছে কি
জানি কেমন করে'।

বিস্ময় এবার ব্যথিত হয়। তাঁর স্ত্রীর মনাযোগের
সম্পূর্ণতা তার স্বামীর দিক থেকে আংশিক লক্ষ্যচ্যুত
হয়েছে।

অশেষের মন যেন আশ্চর্য্যভাবে ছিজ্রাষেবী হয়ে
ওঠে।—দিদি ভুল করেছে কিন্তু বোনও ভুলে গেছে ওর
দিদির ভ্রম সংশোধন করতে। অতি যেমন তাঁর দিকের
সব কাজেই একবার শেষ তবির ক'রে যায়, আজ তা
যয়নি।

অশেষ কি ভেবে একটু হাসলেন এবং একটা দীর্ঘশ্বাসও
ফেললেন।

আভা আর একটু স্পষ্টতা লাভ করেছে। অশেষ
বিছানায় উঠে' বসেছিলেন; এবার বিছানা ছেড়ে উঠে
দাঁড়ালেন। না,—আর শুয়ে কাজ নেই, স্বপ্ন-নিদ্রার
অস্বস্তি ভালো করে' মুখ-চোখ ধুয়ে ফেললেই যাবে।

হুবোন ঘরের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে,
আভার স্পষ্টতরতার ছজনেরই মুখ দেখা যায় বাইরে

থেকে। অশেষ আর একটু জানালার দিকে এগিয়ে যান। দৃষ্টির ভেতর দিয়ে তাঁর অহুমান প্রসারিত হয় : একজনের মুখে অভিমানের বেদনা, অল্পজনের মুখে বিরাগের উন্মনতা।

চোখ-মুখ ধুতে যাচ্ছেন নীচে। হাত বাড়িয়ে মটকার চাদরখানা নিয়ে গায়ে জড়ালেন—শীত-শীত লাগচে; অমনি একবার পার্কের দিক থেকেও একটু ঘুরে আসবেন শরীরের জড়তা কাটিয়ে আনতে।

জানালার সামনাসামনি আর একবার দাঁড়ান। অতলার মুখে অভিমান, অতসীর মুখে বিরাগ।

আরও একবার হাসেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলেন একই সঙ্গে। হাসি দিয়ে স্পর্শ করেন অভিমানকে, দীর্ঘশ্বাস দিয়ে বিরাগকে।

অশেষ দালান ঘুরে' নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে চলেন।

লক্ষ্মীনাথকে ডেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিতে না ব'লেই অশেষ দোর খুলে' বেরুলেন এবং বাইরে থেকে কড়া ধরে' কপটি জোড়া আগে টেনে বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর সন্তপিত নীরব নিষ্ক্রমণ লক্ষ্য ক'রে কেউ যদি বলত' অজায় হ'ত না যে, সংসারবিরাগী মানুষ গোপনে গৃহত্যাগ করে' চলেছে।

এতিনিউয়ের খোয়া-ঢালা ফুটপাথের ওপর প্রভাতের প্রথম আলোক এসে পড়ে। পথটা যেন বৈরাগোর বর্ণে অল্পরঞ্জিত। অশেষের মুখের ভাবের স্নান গাভীর্ঘ্য বিরাগীর মুখের মতই।

আঃ!—কীকায় এসে তিনি যেন নিষ্কৃতির হাঁফ ফেলে বাঁচলেন, এমনিভাবে একবার নিশ্বাস ফেললেন। মুখের স্নান গাভীর্ঘ্যে একটা শাস্তভাবের ছায়া এসে পড়ে। স্বথের অভাব যথেষ্ট আছে তবু যেন স্বস্তি পেলেন,—এমনি ভাব।

কিন্তু স্বস্তিই বা কোথায়,—গৃহ তাঁকে পথেও অহুসরণ করছে।...

সামনেই পার্ক—রাস্তাটা পার হ'লেই হ'ল। অশেষ

মুখ তুলে' চাইলেন। একটা পাম গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের রক্তচ্ছটা এসে তাঁর মুখের ওপর পড়ে।

...অতলার রক্তিম অভিমান।

অতলা অভিমান করেছে। ঘুরে মাঝখানেও ওর মুখে লেগে রয়েছে সেই অভিমানের ছাপ, অশেষ নিজের চোখে দেখে এসেছেন। তিনি কি জানেন না, ও কত বড় অভিমানী?

ছোটখাটো কত ব্যাপারেই যে ওর এমনি অভিমান... কথায় কথায় অভিমান! চোঁট ফুলিষ্য তোলে, গালের কোল রাজা হ'য়ে ওঠে।—আবার চোখের কোণও ছলছল করে' ওঠে ওর কতবার; হয়ত' সামান্য কারণে কি অকারণেই।

কিন্তু ওর চোখে যে সাত সাগরের জল লুকিয়ে ছিল অমন করে', অশেষ কি আগে জানতেন!

ও কত কৈদেছে এবং কেমন করে' কৈদেছে.....! অশেষ সত্যই আর কারকে অত কান্না কাদতে দেখেননি এমনিভাবে। সে কি কান্না!.....বাইরে থেকে দেখতে যা তুচ্ছ অভিমান বলে' মনে হয়, ভেতরে তা' আসলে গভীর প্রাণের দুঃখ।

কিন্তু কিসের দুঃখ—এবং কে ওকে এই দুঃখ দিলে? নির্কোষ বালিকা। এ তোমার আত্মবাতী দুঃখ—তোমারই নিজের সৃষ্টি। যা' একেবারেই সম্ভব হ'তে পারে না, সেই অসম্ভবকে তুমি সম্ভব করতে চাও? তোমারই নির্বুদ্ধিতা!

কিন্তু—

হ'তে পারে এ অতলার নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু ওর দুঃখের মূলে এই নির্বুদ্ধিতা থাকলেও তা' ওর দুঃখ ত' বটে—গভীর দুঃখ। এই দুঃখ.....

এ'কে ঠিক দুঃখ না ব'লে বিক্ষোভ বলাই সম্ভব। ওর বেদনা শুধু গভীর বলে'ই ত' দুঃসহ নয়, গোপন বলে'ই তা অসহ। ও মুখ ফুটে' যে বলতে পারে না ওর বেদনার কথা কারকে! তাঁকেও কিছু বলতে পারেনি.....কিছুই ও বলেনি শুধু বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে.....।

অশেষ আপনাকে অপরাধী বলে মনে করেন। নিজের প্রতি আরোপ করেন নিশ্চয়তার অপরাধ। সত্যি তিনি এত নিশ্চয়! ওর গোপন বেদনায় ওকে কি ছোটো সান্না দিতে পারতেন না গোপনে, যে, 'তুমি মুখে না বললেও বুঝেছি তোমার গোপন বেদনা, আমি তোমাকে সান্না দিচ্ছি—সহানুভূতি প্রকাশ করছি। কিন্তু তুমি কি কিছুতেই শান্ত হ'তে পারছ না—?'

গোটা পার্কটাকে বার চারেক বেড় দিয়ে ঘুরে' অশেষ পার্ক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবলেন, আজই তিনি ওকে সান্না দিয়ে যেমন করেই হোক শান্ত করতে চেষ্টা করবেন। ওকে গোপনে ডেকে.....।

ক্রমশঃ

লিলি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

(১)

পরকে আহা এমন করে আদর কে দিলি,
এ কি পরিপূর্ণ শোভায় ফুটেছে লিলি ?
বিদেশিনী বলে তারে যায় নাক চেনা,
পরকে এমন আপন করা আর ত দেখি না,
দেহে তাহার লাবণ্যেরি খেলছে বিজলি।

(৩)

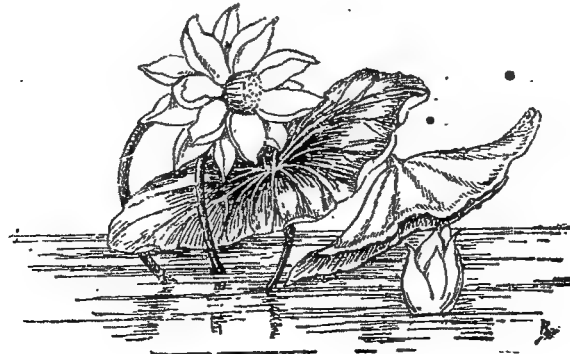
চাইনে মোরা জানতে জাতি গোত্র জাতি তার,
প্রীতি সে যে স্তম্ভিমতী, ফুলের কি বাহার !
এক দিকেতে অর্দ্ধধরা, এক দিকে প্রণয়,
ক্ষুদ্র কুসুম কিন্তু তাহার শক্তি ত কম নয়,
সকল চেয়ে আপন তাহার ফুলের মিছিল-ই।

(২)

কঠিন মাটি, প্রথর রবি, বায়ু ছরন্ত,
তবু তাহার উৎসবের আর নাইক যে অন্ত।
যেন প্রতি তৃণলতা আদর করে তায়,
গুহ্র স্বদেশ তুলিয়েছে তায় শ্রামল মমতায়,
প্রফুল্ল সে হেথায় ফুলের দলেতে মিলি।

(৪)

একান্ত ও ঘরের মেয়ে নয়কো হা-ঘরে
রূপ মিশেছে আসি রূপের গঙ্গাসাগরে।
বর্ণ হল বর্ণহারী ডুবে অমৃতে
অপ্সরীরা যোগ দিয়েছে আনন্দ নৃত্যে
বুকে আমার পুলকের আজ হীরক-জুবিলি।



দক্ষিণ-ভারত-পথে

(পূর্বানুভূতি)

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র যোগ

১১০ ভাড়া দিলে একখানি 'জ্যাভকা' চারিটা প্রাণী লইয়া যাইতে পারে। ষ্টেশন মাষ্টারমহাশয়ের অনুগ্রহে এবং পরামর্শে আমরা ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে অবস্থিতি করিলাম। রাত্রিতে একখানি কাঠ ক্লাশ গাড়ীতে অতি আরামে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইলাম। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে একেবারে বাধাশূন্য—কেবল বালুকা ও জলরাশি। শেষ রাত্রে শুভ জ্যোৎস্নালোকে এই স্থানটি উদ্ভাসিত হইয়া অতি রমণীয় শ্রী ধারণ করিল। চিত্ত পরম আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তেলেঙ্গী ষ্টেশন মাষ্টারের রাত্রিকালে বিদায়কালীন সতর্কবাণী এবং আশঙ্কা কিছুই তখন দৃষ্টিতে আর রহিল না। কেবল তখন সেতুবন্ধ ও ধনুষ্কোটার মহিমার কথা মনে উদয় হইল—

পিতৃগাং তৃপ্তিদং স্থানং হুয়ং রামেণ নির্মিতম্।

সেতুম্বে ধনুষ্কোটিয়াং গন্ধমাদন পর্বতে ॥

ধনুষ্কোটা, রাম সাগর বন্ধন করিয়া যে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহারই সেতুমূল। এইখান হইতে লক্ষা ধীপ (আধুনিক সিংহল) ৬০ মাইল দূর। এই স্থানে রাম সীতা উদ্ধার করিবার জন্ত লক্ষ্য তাঁহার বিপুল সৈন্য-বাহিনী সমবেত করেন এবং সমুদ্র লঙ্ঘন হেতু সেতু বাধিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। রামায়ণে আছে বিশ্বকর্মার পুত্র নলরাজার কোশলে বানরগণের সাহায্যে রামচন্দ্র এই সেতু নির্মাণ করিতে লক্ষ্য হইয়াছিলেন। হুমান গন্ধমাদন পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া আনয়ন করিয়া এই সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, রামেশ্বর দ্বীপ সেই গন্ধমাদন পর্বতের অংশ।

রামেশ্বর মন্দির হইতে দুই মাইল বালুকাময় পথ দিয়া যাইলে শত ফুট উচ্চ একটি টীলার (ছোট পাহাড়ের মাথায়) উপর একটি পাথরের ছোট দ্বিতল মন্দির বিরাজিত, তাহাই "রামঝড়কা"। এই মন্দিরের উপর হইতে দেখা

যায় চতুর্দিকে সমুদ্র, মধ্যস্থলে যেন পদ্মের মতন এই রামেশ্বর দ্বীপ ভাসিতেছে। এই ঝড়কা হইতে অনন্ত জলরাশির মতো একটি ধূসর রেখা দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে দেখা যায়। এইটি রামের সেতু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ভারত হইতে লক্ষা ধীপ ৬০ মাইল ব্যবধান। তার মধ্যে কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জ এই সেতু নামে অভিহিত। এই ৬০ মাইলের কিয়দংশ মায়ার দ্বীপ, কতকটা জলময় পাহাড়, কিয়দংশ সেতু-ব-ভগ্নাংশপ্রায়। ভারত ভূখণ্ডের শেষ স্থান মাণ্ডাপম, মাণ্ডাপমে সিলোন যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষাও হয়। সেই স্থান হইতে রামেশ্বর দ্বীপের ভারতের দিকের প্রথম স্থল পাঞ্চম, পাঞ্চম যোজকের দুই মাইল বিস্তৃত একটি জলময় পাহাড় অবস্থিত, ইহাই গন্ধমাদন পর্বতের অংশ। পূর্বে ভাঁটার সময় এই শৈলের উপর দিয়া পদ্ম-জ-যাতায়াত করা যাইত। এখন কিন্তু ভাঁটার সময় এই পাঞ্চম যোজকে শৈল শ্রেণীর উপর ১৮ ফিট জল থাকে। ষ্টীমার যাতায়াতের জন্ত পাঞ্চমের তীরস্থ জলময় পাহাড় ভাইনামাইট দিয়া উত্থািত দেওয়া হইয়াছে। এখন ছোট ছোট ষ্টীমার যাতায়াত করিতে পারে। মাণ্ডাপম হইতে পাঞ্চম দুই মাইল এক যোজক অবস্থিত, এই যোজকের উপর রেল যাতায়াতের জন্ত সেতু নির্মিত হইয়াছে। যখন ট্রেনে করিয়া এই সেতু পার হওয়া যায় তখন যেন সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি মনে হয়। চারিদিকে জলের মধ্য দিয়া যাওয়া যেমন মনোবম তেমন বিষয়কর।

রামেশ্বর দ্বীপ ১২ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল বিস্তৃত। ইহার শেষ অংশে ধনুষ্কোটা, তৎপরে ১৬ মাইল সেতু-ব-ভগ্নাংশরূপে বণিত দ্বীপপুঞ্জ, জোয়ারের সময় এই স্থান জলে মগ্ন হইয়া যায়, ভাঁটার সময় বালি ও পাথর জাগিয়া উঠে—রামঝড়কা স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান হইলে যেন কল

রেখা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের বা দ্বীপের অংশ, তাহার পরই ১৮ মাইল দীর্ঘ ও আড়াই মাইল বিস্তৃত মান্নার দ্বীপ। এখানে লোকজনের বসতি আছে। এই দ্বীপটি রামচন্দ্রের সেতুর অংশ, এখানে একটি ছোট স্তূপ কেন্দ্র ও ছোট সহর শোভা পাইতেছে। ইহার পর দুই মাইল ভাঙ্গা পাহাড়ের শৃঙ্গ জলমগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা পার হইলেই লক্ষা দ্বীপ। এই স্থানে সমুদ্রের জল খুব কম গভীর, ভাঁটার সময় কখন কখন মান্নার দ্বীপ হইতে মানুষ ও গরু পার হইয়া লক্ষায় যায়।

কবির কল্পনাকে বোধ হয় বাস্তবে পরিণত করিয়া থাকিবেন। পাশ্চাত্য দেশবাদীরা ইহার নাম “এডামস ব্রীজ” বলিয়া থাকেন। কারণ ইহার অস্তিত্ব অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে।

কিন্দাস্তী, সেতুর নির্মাণ শেষ না হইতে রাবণ সেতু ভগ্ন করিয়া দেয়। রামচন্দ্র পুনঃ তাহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাবণ পুনঃ পুনঃ সেতু ভাঙ্গিয়া দিতেন, বিভীষণ রামচন্দ্রকে সেতুর উপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। শিবলিঙ্গ থাকিলে রাক্ষসরা সেতু ভাঙিতে



শিবকাঞ্চির মন্দির

পূর্বে ভারত হইতে লক্ষা দ্বীপ পর্য্যন্ত এই রামচন্দ্রের সেতুর উপর দিয়া লোকসকল লক্ষায় যাতায়াত করিত। এমন কি ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দেও যাতায়াত হইয়াছিল। ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল ঝড়ে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে এই স্থান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। তদবধি গমনাগমন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মাণ্ডাপাম হইতে সিংহল পর্য্যন্ত যে কাল রেখা দেখা যায় এবং রামের সেতু রূপে গণ্য, তাহার উভয় পার্শ্বে সাগরের জল অল্প গভীর এবং তরঙ্গবিহীন। কেবল মধ্যভাগে উটের পিঠের ছায়া বালি ও পর্বত। এই সেতু বাস্তবিক রামচন্দ্র বন্ধন করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায় না, প্রকৃতির এই প্রকার রহস্যময় লীলাকেই

পারিবে না। কারণ মহাদেব রাবণের ইষ্ট দেবতা। রামচন্দ্র শিবের আরাধনা করিয়া সেতুর মূলে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং সেই লিঙ্গই রামেশ্বর নামে অভিহিত।

কিন্তু সেতু মাহাত্ম্য গ্রন্থে অস্বরূপ প্রবাদ আছে, রাম লক্ষা বিজয় করিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই লিঙ্গই এখনও রামেশ্বর মহাদেবরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। আর সেই সময় সাগর রামচন্দ্রের নিকট তাহার বন্ধন মোচন করিবার জন্য অস্থরোধ করেন। বন্ধন মোচন না হইলে শূগল ও কুকুর সাগরের পবিত্র বক্ষোপরি যাতায়াত করিয়া সমুদ্রকে বহু ক্লেশ প্রদান করিবে। রামচন্দ্র সাগরের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, লক্ষণকে

সেতুর তিন স্থান ভাঙ্গিয়া দিতে আজ্ঞা করেন, লক্ষণ অগ্রজের আদেশে ধনুর অগ্রভাগ বা কোদণ্ড দ্বারা তিনটি স্থান কর্তন করিয়া দেন। প্রথম রামেশ্বর দিকে যেখানে সেতুর মূল, কর্তন করেন তাহাই ধনুস্কোটি বলিয়া খ্যাত।

আর একটা প্রবাদ, রাবণ বধের পর সেতু থাকিলে রাক্ষসগণ আসিয়া উৎপাত করিবার সুবিধা পাইবে সেইজন্য তাঁহার অমুচরণ রামচন্দ্রকে সেতু ভাঙ্গিয়া দিতে অমুরোধ করিলে তিনি ধনুকের দ্বারা মূল ভাগ কর্তন করেন, সেই স্থানটাই ধনুস্কোটি। সেই কারণেই তীর্থ যাত্রীদের ধনুস্কোটিতে অর্ঘ্য বা রজত ধনু দান করিবার বিধি আছে।

হিন্দু শাস্ত্রে কেবল বিশিষ্ট বিশিষ্ট যোগে সমুদ্র স্নান বিধেয়। কিন্তু, সেতু, সিদ্ধ ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, ত্রিবাঙ্গামে এবং জগন্নাথধামে সমুদ্র স্নান সর্বসময় করণীয়। রবি, মঙ্গল ও শুক্রবার সমুদ্র স্নান নিষিদ্ধ কিন্তু সেতুতে সর্ব দিনেই সিদ্ধ। সেতুতে সমুদ্র স্নানে কেবল পুণ্য হয় না, সমুদ্রশীলী হওয়া যায়।

সেতুপতি

রামনাদের রাজারাই সেতুপতি, সেতুর অধিকারী, যুগ যুগান্তর হইতে তাঁহারা রামেশ্বর শিবের এবং সেতুর যাবতীয় দেব-দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। এই সব দেবমন্দিরের ব্যয়ের জন্য তাঁহারা প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়াছেন। রামেশ্বরের মন্দিরের মণ্ডপের ও প্রক্ৰমা-পথের ধামে এই সব সেতুপতিগণের প্রমাণ আকারের মূর্তি খোদিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রক্ৰমা পথের প্রশংসা করিয়া ফারগুসন সাহেব তাঁহার "Indian Eastern Architectur" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—The glory of this temple resides in its corridors. These extend to nearly 4000 feet in length. The breadth varies from 17 to 21 feet free floor space, and their height is apparently about 30' feet from the floor

to centre on the roof. Each Pillar or pier is compound, 12 in height, standing on a platform 5' from the floor, and richer and more elaborate in design than those of Parvati Porch at clidambaram.

Report of the Madras Epigraphical Department—1910 গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় সেতুপতিদের বিষয় কয়েকটি প্রসিদ্ধ শিলালিপির পাঠ আছে। অনেকগুলিই রামেশ্বরমের মন্দিরের প্রাচীর-গায়ে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রঘুনাথ সেতুপতি ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে টাঙ্গোরের রাজাকে ভীষণ এক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাদ্রাসগুদি, দেব-কোঠাই প্রভৃতি কয়েকটি মহল অধিকার করেন। আর একখানা লিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় বীর তিরুমলাই সেতুপতি, মহীশূরের রাজাকে দ্বাহুরা আক্রমণ কালে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি ১৬৪৫ হইতে ১৬৭০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। একখানি তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় দালভয় (সেনাপতি) কাত্তাদেবর রমানাদের মন্দিরের ব্যয় নির্মাণার্থে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়াছিলেন—১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ২০শে নভেম্বর। হীরণ্য-গর্ভ রবিকুল সেতুপতি, মাথুবিজ্ঞান সার্তাই নামে এক মল্ল একটা হস্তীর লেজ ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মন্দির হইতে তাহাকে নিত্য ধোঁরাক পাইবার ব্যবস্থা করিয়া যান—১৬২৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুন দিবসে।

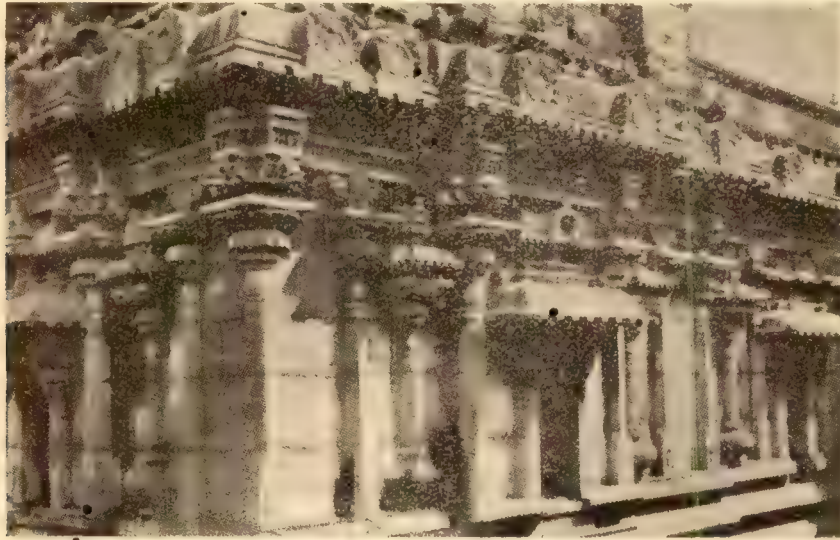
নবাব আসরং যখন সেতুপতি রামনাথ পাক্তারাম ও ৫১২ জন মহাজনকে ত্রিচিনাপল্লিতে বন্দী করিয়া রাখেন এবং দেবতার সম্পত্তি দখল করেন তখন রামেশ্বর মন্দিরের সেবায়েৎগণ নবাব আসরং এবং দেওয়ান রায়ের নিকট দরবার করিয়া সম্পত্তি ফেরৎ পাইয়াছিলেন, সেইজন্য এক চুক্তিনামা ১৭৭২ সালের ২০শে আগষ্ট সম্পাদন হয়। তারিখটা শিলায় উৎকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আর একজন সেতুপতি কাওদেবর ১৬৩৫ শকে রাজত্ব করিতেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ যজ্ঞ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

১৭৭৩ খৃঃ ত্রিচীনপল্লির নবাব ও ইংরাজরা মিলিত হইয়া সেতুপতি কাত্তাদেবরকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ত্রিচীনপল্লীর পার্শ্বস্থিত রাজ্য দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

ধনুস্কোটির স্থানের স্থানের ৩৪ মাইলের মধ্যে কোন লোকের বসবাস নাই। কেবল এ-টা ছোট মন্দির আছে। অতি প্রত্যুষেই ষ্টেশনের সন্নিকটবর্তী পল্লী হইতে পাণ্ডা, ব্রাহ্মণ, ভিখারীগণ আসিয়া সমবেত হয়। ব্রাহ্মণেরা বিস্তৃত সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করাইয়া পূজা ও আত্মাদি সম্পন্ন করান। ১১০ টাকার মধ্যে সর্বস্বফল পাইবার মতন পূজাদি সমাধান হইয়া যায়। শঙ্খ, বিষ্ণু আদি সমুদ্রের রত্নরাজি এখানে পাওয়া যায়। দুই ঘণ্টার মধ্যে স্নান ও করণীয় কর্ম সমাধান হইয়া যায়।

প্রধান উপকরণ ও ঐশ্বর্য। দক্ষিণ ভারতের পরম গৌরব সেই সাগরের স্বরূপ যখন ধনুস্কোটি ও কুমারিকায় দেখা যায় তখন চিত্ত প্রফুল্ল এবং শ্রীভগবনের চরণে অর্পিত হয়।

• দক্ষিণ ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চরম ও পরম শিক্ষাশ পূর্বত ও সাগরের সংযোগ। চিরমলয়মাকৃত সিন্ধু শৈলশিখরমালা সমাচ্ছন্ন পূর্বঘাট উপকূলে সাগর তীরে বসিয়া যিনি একবার নবোদিত অকণ্ঠের তরুণ কিরণমালা অবলোকন করিয়াছেন তিনিই দক্ষিণ ভারতের প্রাকৃতিক



বিষ্ণু কাকির মন্দির

ভারতের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া একবার সেই মহান সৃষ্টি-কর্তার কথা মনে উদয় হয়। সেই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয়। ঐ এই শব্দই ব্রহ্মের প্রকৃতি; ইহাই ঋক, যজু, সাম বেদের সমষ্টি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অভিব্যক্তি; ইহাই অধ, উর্দ্ধ, মোক্ষ, সৃষ্টি; স্থিতি, প্রলয়; মণ্ডলস্থর শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ গিরি মহন্ত মহারাজের এই প্রকার ব্যাখ্যা মনে আগ্রসিত হইল।

প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যে এই বিষয়ে যে দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারতের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। সাগর ও পর্বত—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দুইটি

ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়াছেন। চিহ্নের শৈলশিখরমালা বিক্ষিপ্ত দিগন্তবিস্তৃত স্থির শাস্ত অসূরাশি, ওয়ালটেয়ারের মৃৎনিদানধ্বনিত ফেননীলোদ্গিমালা ধৌত পর্বততলের অপূর্ব বেলাভূমি, দূরগতসিন্ধুবারি-সেবিত অপূর্ব শ্রামল-শোভাস্বিক সিংহাচল ও বাজীর অত্যাচ্ছন্ন শৃঙ্গ, প্রাকৃতিক মাধুর্য্য জড়িত এবং আয়াসক্লান্ত সৌন্দর্য্য মণ্ডিত নীলজল-রাশিময় মাস্তাজের অপূর্ব হারবার, অপূর্ব কারুশিল্প সম্ভার মণ্ডিত মহাবালিপুরমের দেউলের পদধৌত নীলাঙ্গুরাশি, স্থলের শেষ প্রান্তের বালুকাময় ধনুস্কোটির বেলা ভূমিতে সাগর ও মহাসাগরের সঙ্গমের রহস্যময় লীলা,

ভারতের শেষ বিন্দু কুমারিকা অন্তরিপের পদ ধৌত ভারত মহাসাগরের মহান দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, এমন রমণীয় দৃশ্য আর কোথাও বুঝি নাই। সাগরের অনন্ত অসীম গভীর ভাব, পর্তুগের চির রমণীয় বিশালত্ব মানব মনকে আলোড়িত করিয়া দেয়। আপন, পর, ভূত, ভবিষ্যৎ সকলই ভুলাইয়া দেয়, এক বিশাল সাম্য ভাবে চিত্ত ভরিয়া যায়, আনন্দে মন নৃত্য করে।

কেবল প্রাকৃতিক শোভা সম্পদে দক্ষিণ ভারত গরীয়ান নহে, শিল্প নৈপুণ্য এবং পুরাতত্ত্বেও দাক্ষিণাত্যের গৌরব

পরম আদরনীয়। দাক্ষিণাত্যের গিরিশিখর সদৃশ গগনচুম্বিত গোপুরাম, সপ্তপ্রাকারবেষ্টিত বিশাল আয়তনের মন্দির প্রাঙ্গণ, শত ও সহস্র শুভযুক্ত মণ্ডপের কারুকার্য, জলবিহার নিকেতন সহ টেপাকুলাম জুড়য়ে আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। মন্দিরগুলি পঞ্চ বা সপ্ত প্রাকারে বেষ্টিত। তাহাদের কেন্দ্রস্থলে হেমকলসমণ্ডিত বিমান বা গর্ভগৃহে রমণীয় বিগ্রহমূর্তি স্থাপিত। যেন প্রাণময়, মনোময়, হৃদয়ময়, পঞ্চকোষের মধ্যে পরমাত্মার অধিষ্ঠান।

মুসাফির

জীবনের গান বাজে অনাহত বীণে

মরণের মায়া ছায়াপথে পথে আঁকে,

জীবন মৃত্যু দুইটি প্রান্ত চিনে

ওরে মুসাফির, দেখে নে দুনিয়াটাকে !

লক্ষ্মীহারা

(পূর্বানুবৃত্তি)

বন্দে আলী মিয়া

পঞ্চম দৃশ্য

[বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ এবং ক্ষণে ক্ষণে মেঘ গর্জনের শব্দ শ্রুত হইবে]

কৌশিক : আকাশে ভয়ানক মেঘ হয়েছে, একটু দ্রুত চলো নির্মলা।

নির্মলা : দ্রুত পদেই তো যাচ্ছি প্রভু। অলক্ষণের মধ্যে যেতে হলে শহরের পথ ছেড়ে বনের পথ ধরতে হয়—সেই পথে কি যাবো ?

কৌশিক : তাই চলো। আমি বুঝতে পারছি নির্মলা আমাকে পৃষ্ঠ দেশে বয়ে নিয়ে যেতে তোমার কত কষ্টই না হচ্ছে।

নির্মলা : স্বামীই নারীর দেবতা। কিছু মাত্র কষ্ট আমার নাই যতক্ষণ তুমি আমার কাছে আছো।

[মুনি মাণ্ডব্যের মস্তকে পাদস্পর্শ হওয়ায় তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ]

মাণ্ডব্য : কে ? কে তুই পাতকী ধ্যানভঙ্গ করিলি আমার ? শত শত বর্ষ ধরি মহা-ব্রহ্মা আরাধনা করি, কোন্ মূঢ় ভাঙ্গিলি রে ধ্যান ! ও : বুঝিয়াছি মহাব্যাধি কুষ্ঠরোগী মহাপাপী কৌশিকের পাদস্পর্শে ব্রহ্মে হারাইলুম আমি। উপযুক্ত শাস্তি দেবো তার, ওরে ওরে কুষ্ঠি পাপী, অভিশাপ দিচ্ছি তোরে, রজনী প্রভাত কালে প্রাণ হারাইবি তুই।

কৌশিক : হায়, কি ছূর্তাগ্য মোদের। নির্মলা এতদিতে পতিহারা হইলে গো তুমি ; মহর্ষির অভিশাপে প্রাণ আজি হারাইলুম আমি। অকালে - বৈধব্য ভোগ অদৃষ্টে তোমার।

নির্মলা : কোন ভয় নাহি দেব। ব্রহ্ম জ্ঞানে মদগর্ভে স্থাষি দেয় অভিশাপ ; সতি নারী হই যদি আমি, পতি ধ্যান পতি জ্ঞান পতি ব্রহ্ম হয় যদি মোর, আমি দিই শাপ, এ রজনী না হবে প্রভাত। অনন্ত কালের সম হইবে এ রাত্তি, মিথ্যা

কভু হবে না কোঁ ইহা, দেখিবে জগৎ বাসী—দেখিবে গো অন্তরীক্ষে গ্রহ তারা যত, সূর্য্য নাহি দেবে দেখা পূর্ব্বাকাশ পরে। বৈধব্য নাহিক কভু ঘটবে আমার।

কৌশিক : বন্ধ তুমি সতী নারী এ নশ্বর ধরায়, দেখিবে সতীর তেজ পতিব্রতা রমনীর পবিত্র বাণীয়ে আজি প্রত্যক্ষ করিব।

[ব্রহ্মার প্রবেশ]

অনীমাণ্ডব্য : চারিদিকে সহসা কেন হয় আলোকিত ! উদিল কি সূর্য্য দেব অমানিশা কালে ? কে, কে গো তুমি ?

ব্রহ্মা : ব্রহ্মা আমি। হে স্বার্থান্ধ মানব, তুচ্ছ স্তূথ ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি করিছ কলহ। বহুক্ষণ রাত্রি শেষ হয়ে গেছে, তবু এখনো অন্ধকার হয়নিকো দূর। সতী নারী নির্মলার বাণী কভু মিথ্যা নাহি হবে, হে স্থাষি মাণ্ডব্য, অভিশাপ কর প্রত্যাহার।

অনীমাণ্ডব্য : পদ্মযোনি লহো প্রণাম। মহা পাপী কুষ্ঠ রোগী পাদস্পর্শ দিয়া আজি মোর ভাঙ্গিয়াছে ধ্যান ; ধ্যান যেবা টুটায়ছে—সেই মোর শত্রু ;—তারে নাহি ক্ষমা দেবো আমি।

ব্রহ্মা : শোনো মুনি হে অনীমাণ্ডব্য তোমাদের স্বার্থের সংসারে সৃষ্টি মোর ধ্বংস বুঝি হয়। পশু পক্ষী নর নারী ক্ষুৎপিপাসায় সবে করে হাহাকার। তুমি শুনিলে না মম অনুরোধ ; হে সতী নির্মলা দেবী, রোষ সঘরিয়া অভিশাপ কর প্রত্যাহার। সূর্য্যদেব দেখা দিন উদয় অচলে, রক্ষা হোক সৃষ্টি আমার।

নির্মলা : হে প্রভু জগৎ পালক লহো প্রণতি। আমি অতি অভাগিনী নারী, স্বামীরে আশ্রয় করি আছি দেব স্তূথে বাঁধি ঘর। পতি হারাইয়া কভু বাঁচিবনা এমর জগতে। বৈধব্য যাতনা কভু নারিব সহিতে। স্বামী যদি ত্যজে ধরাধাম, আমারেও তার সনে লহো প্রভু তুমি।

ব্রহ্মা : অতীব সঙ্কট ; একের দোষেতে কতু অপরের শাস্তি নাহি হবে। শোন সতী, আজ্ঞা মোর করহ পালন ; অভিশাপ কর প্রত্যাহার। ক্ষণ তরে বৈধব্য দুঃখ ভোগ করো তুমি, অতঃপর জীয়াইব পতিরে তোমার।

নির্মলা : হে পদ্মধোনি, পালিবারে পারি দেব তব অনরোধ যদি তুমি রোগ মুক্ত করে দাও পতিরে আমার, দাও তার সর্বদেহ নিরাময় করি, যৌবনের শক্তি আর লালিত্য তাহার দয়া করে দিও ফিরাইয়া।

ব্রহ্মা : তথাস্তু। তাই হবে সতী, সিদ্ধ তব হবে মনস্কাম।

[স্বর্গের অম্বরীদের গীত ধ্বনি দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে]

জয় জয় সতী নির্মলা দেবী জয় জয় তব জয়

সতীর গুণ্য প্রাণ পায় পতি হয় ব্যাধি নিরাময়

জগৎ রহিবে যত দিন ভরি

সতী নারী সবে তব নাম স্মরি

পতির চরণ সেবা করি তারা হবে চির নির্ভয় ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

লক্ষহীরা : প্রণাম নাও ঠাকুর—প্রণাম নাও ঠাকুর—

নির্মলা : জয়ন্তু। আমাদের পাতার কুটীরে তুমি এসেছো লক্ষহীরা! তুমি রাজেন্দ্রানী—আমরা ভিখারী। আমাদের অতীব ভাগ্য।

লক্ষহীরা : ভাগ্য আমার যে তোমার ন্যায় দেবীর দর্শন পেলাম, আমি বিস্মিত হই এই যে দেবতার দেবতা স্বয়ং ব্রহ্মা অবধি তোমার জন্তে সজ্জ হ। পতিধান, পতিজ্ঞান, পতি সেবা যার ব্রত সে সাক্ষাৎ ভগবতী ; নরকের যুগ্ম কীট আমি, আমাকে তোমার চরণ ধূলা দাও দেবী।

কৌশিক : নির্মলার সতীত্বের শক্তি পরীক্ষার সুযোগ তো তুমিই দিয়েছ। লক্ষহীরা, তোমার গৃহে যদি গত কল্যাণ সঙ্কায় আমরা না যেতুম—আসবার সময়ে ওরূপ বাড় বৃষ্টি আরম্ভ না হতো তবে আমাদের বন-পথে তো আসবার প্রয়োজন হতো না, স্ততরাং কুষ্ঠ রোগও আরোগ্য হতো না—মরণ অবধি আমাকে নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হতো। লক্ষহীরা, তুমিই আমার উদ্ধারের মল সূত্র—তোমার নিকটে আমরা কৃতজ্ঞ।

লক্ষহীরা : আমি সর্বজনঘৃণ্য সামান্ত নারী মাত্র। তোমার স্বাক্ষরী পত্নী যেন পরশমণি, তাঁর সংস্পর্শে এসে ব্রীদন আমার এক নবীন আলোক পেয়েছে—সেই আলোকের দীপ্তিতে দেখতে পেয়েছি মনে আমার সঞ্চিত আত্ম-যুগ যুগান্তের কলুষ কালিমা—কত আবর্জনা। মনে হর তোমার চরণ ধূলা নিত্য মাথায় নিয়ে দেহ মন পবিত্র করি, পাতক ক্ষয় করি। ঠাকুর, তুমি কত জন্মের সাধনায় এই সাক্ষাৎ পার্শ্ববর্তীকে পত্নীরূপে পেয়েছো, আর আমি একজন ঘৃণ্য পাতকী হয়েও তাকে বিনা আয়াসেই লাভ করেছি,—একী অল্প ভাগ্য আমার! অনেক তপস্তা করে ভগীরথ নামকে এনেছিলেন, কিন্তু মহাপাতকীরা তো আজ বিনা আয়াসেই সেই গঙ্গা স্পর্শ করে মোক্ষ লাভ করে।

নির্মলা : লক্ষহীরা, তোমার জীবন শ্রেয়তর হোক—তোমার মন পবিত্রতর হোক, পরজন্মে সতী সাবিত্রী হয়ে জন্মগ্রহণ করো।

লক্ষহীরা : হ্যাঁ ঠাকুর, এই আশীর্বাদ করো, যখন পর জন্মে তোমার পায়ের ধূলি হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারি।

কৌশিক : লক্ষহীরা!

লক্ষহীরা : কেন ঠাকুর?

কৌশিক : তুমি আমার তত্ত্বজ্ঞানের গুরু। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তোমার নিকটে গিয়েছিলেন অনেক লালসা নিয়ে—তুমি দিলে জননীর স্নেহ, ভগ্নীর সেবা। তুমি আমার দিব্য-দৃষ্টি। হীরা মণি মাণিক্য মুঠা মুঠা আনাগর ভিক্ষা দিয়েছো তুমি, তাই তোমার কাছে দয়া চিন্তা করতে সাহস পাচ্ছি। দয়া করে আমার ক্ষমা করো লক্ষহীরা।

লক্ষহীরা : তুমি তো আমার কাছে অপরাধ করে নি ঠাকুর, তবে কেন ক্ষমা চেয়ে পাগভাগী করছো।

কৌশিক : কাম-লালসায় আমি অতি অপরাধী লক্ষহীরা, সতী নির্মলার তেজ-প্রভাবে আমার হৃদয়ভাব আলো পরিবর্তিত হয়েছে; এখন কী মনে হচ্ছে জানো লক্ষহীরা, কাল রাতে ছিলে তুমি লালসার ইন্ধন, আজ যেন অগ্নি কন্যা।

লক্ষহীরা : এই কথাই তোমার নিকট থেকে শুনতে চাই।

ঠাকুর। গতকল্য তোমার 'পরে আমার 'যে'রূপ মন ছিলো
আজও তা অচঞ্চল আছে। তুমি পিতা আমি কন্যা।

নির্মলা : স্বর্গ হতে দেবতারা শঙ্খ-নির্নাদ করছেন
শুনতে পাচ্ছে লক্ষ্মীরা ?

লক্ষ্মীরা : মা ঠাকুরণ, অতি বড়ো হতভাগিনী আমি—
মহাপাতকী আমি ! আমার হরিপাদপদ্ম লাভের কী হবে
জননী ! আমার পথ দেখিয়ে দাও মা, আমার গতি-মুক্তির
উপায় তুমি বলে দাও ঠাকুরণ। (বাস্পরুদ্ধ স্বর)

কৌশিক : তুমি কাদছো লক্ষ্মীরা, কাদো। অনুতাপে
পাপ ক্ষয় হয়।

নির্মলা : লক্ষ্মীরা, ভগবান কাউকে বঞ্চিত করেন না ;
পর জন্মে নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

লক্ষ্মীরা : পরজন্ম ! পরজন্মের যে অনেক দেবী
মা ঠাকুরণ। এজন্মে কী একান্তই অসম্ভব ?

নির্মলা : তা কেন মা, তাঁর ইচ্ছায় সকলি সম্ভব।
সত্যভক্তিতে ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্ম পূজা করো, সতীর
সতী মা দুর্গার ব্রত করো লক্ষ্মীরা, দেবাদিদেব ভগবান বিশ্বনাথ
তোমায় মুক্তি দেবেন।

লক্ষ্মীরা : মা জননী, আজ যে পরম সত্যের সন্ধান
পেয়ে গেলুম—এই হোক আমার জীবনের ব্রত। প্রণাম নাও
মাঠাকুরণ, প্রণাম নাও বাবা ঠাকুর—আজ আসি তবে।

গান

জীবন ভরি মরেছি ঘুরে পথে পথে,

তোমায় মাগো পেলাম নাকো কোঁনো মতে।

অকাজে মোর কাল অপচয়

তোমায় ডাকার হয় না সময়

অদিনে আজ এসো মাগো মনোরথে ॥

আমার মনের মলিন ধূলায়

তোমার পায়ের চিহ্ন ভুলায়

তাই কি ভবানী সরে গেলি আমাহতে ॥

[গানটি দূর হইতে দূরান্তরে বাইয়া মিলাইয়া গেল]

সপ্তম দৃশ্য

(বাহিরে ঘণ্টা ধ্বনি শ্রুত হইল)

দ্বারবান : বাইরে একজন শ্রেষ্ঠি আপনার দর্শন প্রার্থী
রাণী মা।

লক্ষ্মীরা : নাঃ, আর নয়। তাকে ফিরে যেতে বলো।
লক্ষ্মীরা'র মৃত্যু হয়েছে। সে লক্ষ্মীরা এ জগতে আর নাই।
হাঁ করে দাঁড়িয়েছি কখন—যা। আমি যা বললুম তাই
বলে শ্রেষ্ঠিকে বিদায় করে দে।

দ্বারবান : যে আজ্ঞা রাণীমা।

সহচরী : তোমার মাথা ধারাপ হয়েছে বুঝি সই লক্ষ্মীরা,
হাতের লক্ষ্মী পায়ের ঠেলে কেন এমন করে ? এক্ষুনি এক
লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দর্শনি মিলতো।

লক্ষ্মীরা : তা হোক সই, আর না। বিতৃষ্ণা এসেছে
জীবনের ওপরে। এত অল্প বয়সে কত জনের যে সর্বনাশ
করেছি, হায়, আমার রূপের অনলে কত পতঙ্গ যে গুড়ে
ছারখার হয়েছে তার অবধি নাই। সমাজে আমার স্থান
কোথায় জানো সই—পুতিগন্ধময় নরকেরও নিম্নতম দেশে।
কত সংসার আমার জন্যে দগ্ধ হয়েছে, কত সতী নারী চোখের
জলকে জীবনের সঙ্গী করেছে ! আমি পিশাচী, আমি
সর্বনাশী আমার নিখাসে বিষ আছে জানিস সই সবাইকে মানা
করে দিস কেউ যেন আমার কাছে না আসে।

সহচরী : সহসা তোমার এরূপ চিন্তা পরিবর্তনের কারণ
কি সই ?

লক্ষ্মীরা : কি আর বলি তোমাকে সই ইহকালের সুখ
সম্ভোগ নিয়ে রয়েছি মত্ত, পরকালের কথা কি একবারও ভেবে
দেখেছি ? চোখ মুদে ত থাকবেনা সই নরকের ভীষণ
অগ্নিকুণ্ড থেকে তোমাকে রক্ষা করবে কিসে ? উঃ মনে
করতেও বুক কেঁপে ওঠে।

ভয় ত হবেই ভাই। মা জগৎজননী মা আদ্যাশক্তি
মা ভবানী মা শঙ্করী বুকে শক্তি দে মা জননী। তোর
চরণ প্রান্তে স্থান পাবার যোগ্য আমাকে করে নে দেবী !
লক্ষ্মীরা'র মৃত্যু হয়েছে, তারি নাম নিয়ে জন্মেছে আর এক
লক্ষ্মীরা। দ্বারোয়ান—দ্বারোয়ান।

দ্বারবান : কী আদেশ রাণী মা ?

লক্ষ্মীরা : সিংহদ্বারের বৃহৎ ঘণ্টাটা খুলে দাও। কেহ
যেন প্রবেশ করতে না পারে আমার সিংহদ্বার দিয়ে। জিজ্ঞাসা
করলে বলো—দেখা হবে মা।

দ্বারবান : যে আজ্ঞা রাণী মা।

লক্ষ্মীরা : একবার একুনি কৌশিক ঠাকুরের বাটীতে গিয়ে তাঁকে এবং ব্রাহ্মণীকে আমার বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে আসবি। কাল প্রাতঃকালে দুখানা স্বর্ণ শিবিকা সঙ্গে নিয়ে তাঁদের এখানে আনবার ভার তোর ওপরে।

দ্বারবান : যে আজ্ঞা রাণী মা।

সহচরী : তোমার চিত্ত অপ্রকৃতিস্থ সই, একটা গান গাও।

লক্ষ্মীরা : গান শুনবে সই? শোনো—

—গীত—

মনের আমার আর কাত কাল

ঘুমিয়ে রবে এমন করে!

থাকতে সময় ঠিক হয়ে নাও

দীনের প্রভুর নাগাল ধরে।

পার হতে যার নাই পাথের

ভবে সে আজ সবার হের

তাই বলি মন এই বেলা যাও

আঁধার হতে আলোর সরে।

সে জননী দয়াল এমন

অপরাধ সে হোক না যেমন

সব যে তিনি করেন ক্ষমা তাঁর করুণায় জগৎ তরে ॥

—অষ্টম দৃশ্য—

নির্মলা : কী জন্তে স্মরণ করেছো লক্ষ্মীরা?

লক্ষ্মীরা : কেন, কন্টার বাটীতে কী পিতামাতাকে আসতে নেই মা ঠাকুরণ?

নির্মলা : তা কেন, নিশ্চয়ই আছে। তোমার মুখের কথাই তো আমাদের পক্ষে বথেষ্ট লক্ষ্মীরা। শিবিকা, দ্বারবান ইত্যাদি প্রেরণের তো কোনো আবশ্যক ছিলনা।

তোমার সঙ্গে এই গৈরিক বাস কেন লক্ষ্মীরা?

লক্ষ্মীরা : মা ঠাকুরণ!

নির্মলা : কেন লক্ষ্মীরা?

লক্ষ্মীরা : আজ আমার বড়ো আনন্দের দিন—আজ আমার মুক্তির দিন। আমি অনেক ভেবেছি, অনেক চিন্তা

করেছি, কিন্তু কোন কূল কিনারা পাইনি মা, কাল রাতে মা আদ্যাশক্তি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন। তিনি যা আদেশ করে গেছেন, আমাকে পালন করবার সুযোগ দাও মা।

নির্মলা : কী, বলো?

লক্ষ্মীরা : সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে আমার সাধন হবে না। এতকাল ঐশ্বর্য নিয়ে থেলা করেছি—বিশা প্রাসাদের মাঝে দেহটাকে বন্দী রেখে স্বথের পরিবর্তে শূন্য নরকে বাবার পথ পরিষ্কার করেছি মা। আজ জীবন-মধ্যাহ্নে তোমার আশীর্বাদে সত্যের আলো দেখতে পেয়েছি—সেই আলোকে স্নান করে দেহ মন পবিত্র করে আমাকে দেবদেব বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় পেতে যেতে হবে। পবিত্র যোগিনী জীবনের কী অপূর্ব শান্তি!

কৌশিক : মা লক্ষ্মীরা, তুমি এখনো বালিকা; এরূপ কষ্ট কি তোমার সোনার দেহে সহ্য হবে মা?

লক্ষ্মীরা : বাবা ঠাকুর, কষ্ট ভোগেই তো পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত।

কৌশিক : তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো হয়েছে মা, আর প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মীরা : প্রয়োজন মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যুর পরে এই মহাপাপিনী আদর্শ সতী হবার যোগ্যতা লাভ করবে।

কৌশিক : তাই বুঝি তোমার এই যোগিনীরূপ?

লক্ষ্মীরা : অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যোগ না রাখলে সাধনায় বিঘ্ন হয় বাবা ঠাকুর।

কৌশিক : সত্য বটে।

লক্ষ্মীরা : তুমি নীরবে কী ভাবছো মা ঠাকুরণ?

নির্মলা : ভাবছি লক্ষ্মীরা, তুমি মানবী না স্বর্ণ ভ্রষ্ট দেবী। তোমার তাগ জগতে অতুলনীয়।

লক্ষ্মীরা : তা নয় মা, এ অতি সাধারণ; পদধূলি দাও মা, আমি বাই।

নির্মলা : কোথায় যাবে মা তুমি?

লক্ষ্মীরা : লোকালয় হতে দূরে—নির্জন অরণ্য-দেশে।

নির্মলা : আমরাও তোমার সঙ্গে যাব লক্ষ্মীরা।

লক্ষ্মীরা : তোমরা কেন মা ঠাকুরণ—তোমাদের এই জন্মেই মুক্তি। যাত্রাকালে আমার শেষ মিনতি—কন্টার

দক্ষিণা তোমাদের গ্রহণ করতে হবে। মা ঠাকুরণ, আমার নিশ্চিন্দা : মা, লক্ষ্মীরা—শোন মা, আমার একটা সমগ্র ঐশ্বর্য্য, দাস দাসী, সৌধ সবই তোমাকে আর বাবা কথ্য রাখ।
ঠাকুরকে ধর্ম্ম সাক্ষ্য করে দক্ষিণা দান করলুম; গ্রহণ করে লক্ষ : মায়ায় বেঁধোনা জননী, আমি চললুম, শেষ বিদায়।
আমায় সংসার থেকে মুক্তি দাও মা ঠাকুরণ।

নিশ্চিন্দা : তা হয় না লক্ষ্মীরা। তোমার অনুগ্রহের দানে আমাদের কোনো অভাব আর তো নাই। তোমার বিষয় তোমারি থাক।

লক্ষ্মীরা : দত্ত দ্রব্য পূর্নঃ গ্রহণে মীমাংসাপ। তোমার আদর্শ পতিভক্তি-মহিমায় সতীত্বের মাঝে আমি যে ধন পেয়েছি—পৃথিবীর ধনীর তর কাছে তুচ্ছতম। বাবাঠাকুর মা ঠাকুরণ, জন্মের মত তোমাদের চরণ ধূলি দাও—সেই হোক আমার সমগ্র জন্ম জন্মান্তরের পাথের। বিদায়—বিদায়

মায়ায় বেঁধে রাখিস নাকো

যেতে দেমা আমার পথে,

যাবো আমি সেই দেশেতে

সাধনার পুষ্পরথে।

মিনতি তোমায় মাগো

পিছু হতে ডেকো না গো

আলোয় মোরে দাওগো যেতে

পাপের এ অঁধার পথে ॥

যবনিকা

ভুল

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী*

বঞ্চিত চিত্তের সঞ্চিত বেদনা আজি এ একেলা দিনে,
বরিষার ঘন সঙ্কীর্ণ ধারায় ক্রন্দিত এ মোর বীণে।

মনে পড়ে কার আঁখি-জলধার

নিরঞ্জন ঘরে শুধু বার বার,

*অন্ধকার মাঝে এ অন্তর মন কার মুখ লয় চিনে।

কোন অভীতের কোন সরণীর

তটিনীর কোন কূলে

দৃষ্টি বিনিময় কিছু নয় আর

হোলো পলকের ভুলে

তারপরে হায় কত দিন যায়

গভীর আঁধারে, ভরা জ্যোছনায়

শরতে ফাগুনে, মনে সেই কথা

বার বার উঠে ছলে

কেতকীর ফুলে এনেছে আবার কাঁটা দিয়ে ঘেরা স্মৃতি

আগায় তুলিতে বেদন নিশীথে বিরহ করুণ-প্রীতি

বাদলা বাতাসে চলেছে হতাশে

দিশাহারা মন স্তব্ধ আকাশে

বাদামের গাছে হোখা ঘন বাজে পল্লবের মৃদু গীতি।

কেতকীর ফুলে এনেছে আবার কাঁটা দিয়ে ঘেরা স্মৃতি।

টিউব রেলওয়ে

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীরাধাভূষণ বসু

লণ্ডনে একটি আগার গ্রাউণ্ড ট্রামওয়ে লাইনও আছে। এটি লণ্ডনের হোলবর্ন (Holborn) নামক পল্লীর অন্তর্গত থিওবাল্ডস্ রোড (Theobald's Road) হ'তে আরম্ভ করে ওয়াটারলু ব্রিজ (Waterloo Bridge) পর্যন্ত গিয়ে আবার সাধারণ ট্রামওয়ের সঙ্গে মিশে গেছে। এটিকে কিংসওয়ে সাব-ওয়ে (Kingway Subway) বলা হয়। প্রথমে এই আগারগ্রাউণ্ড ট্রামওয়ে লাইনে ছোট ছোট ট্রাম গাড়ী যেত। আজকাল এই লাইনটি খুব চওড়া এবং বড় করা হ'য়েছে এবং এখন এই পথে ছ'তলা ট্রামগাড়ী যাতায়াত করে।

সাধারণ টিউব রেলওয়ে, ডাক-বিভাগের টিউব রেলওয়ে এবং আগার গ্রাউণ্ড ট্রামওয়ে ছাড়া লণ্ডনে আরও একপ্রকার মাটির নীচে যাতায়াত করার রাস্তা আছে—তাকে সাধারণতঃ সাবওয়ে (Subway) বলা হয়। মার্বল আর্চ (Marble Arch), পিক্যাডিলি সার্কাস (Piccadilly Circus), টটেনহাম কোর্ট রোড (Tottenham Court Road) প্রভৃতি অত্যন্ত জনবহুল রাস্তা এবং স্থানগুলো এক একসময়ে এত ভীড় হয় যে, তখন রাস্তা পার হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। এইজন্তে ঐ সকল স্থানে মাটির তলা দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেখানে মাটির তলা দিয়ে এই রকম রাস্তা আছে, সেখানে অনেক স্থলে মাটির নীচে সিগারেট, ফল, জামা পোষাক প্রভৃতির দোকান, হাত-মুখ ধোওয়ার ঘর প্রভৃতিও আছে।

টিউব রেলওয়ের কারখানা মাটির নীচে—সুতরাং গাড়ী তৈরী, মেরামত, রং-করা প্রভৃতি সকল রকম কাজই মাটির নীচে করতে হয়। ঐ সকল ভিপো এবং কারখানাতে রাত্রে গাড়ী ধোওয়া, মোছা, মেরামত প্রভৃতি হয়, কারণ দিনের বেলায় গাড়ী অনবরত চলাফেরা করে বলে দিনের বেলা তা' করা সম্ভবপর নয়। লণ্ডনের সমস্ত টিউব রেলওয়ে লাইন-গুলোতে যত গাড়ী যাতায়াত করে তাদের মোট সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

প্রতিদিন প্রায় বার লক্ষ লোক লণ্ডনের মাটির নীচস্থ টিউব ট্রেনে যাতায়াত করে। এত সংখ্যক যাত্রীদিগকে প্রত্যেক নিয়মিতভাবে টিকিট সরবরাহ করাও এক কঠিন ব্যাপার। এইবার সেই সম্বন্ধে বলছি। নিতান্ত ক্ষুদ্র বা জনবিরল ষ্টেশনে ব্যতীত আর সকল ষ্টেশনেই একটি করে বুকিং অফিস (Booking office) অর্থাৎ টিকিট ঘর আছে—সেখানে বুকিং ক্লার্ক (Booking Clerk) টিকিট বিক্রয় করে। কিন্তু এক একসময়ে যাত্রীর ভীড় এত বেশী হয় যে একজন কিংবা দুজন বুকিং ক্লার্কও পেরে ওঠে না। সেইজন্তে প্রত্যেক ষ্টেশনেই অটোম্যাটিক স্লট মেশিন (Automatic Slot Machine) থাকে—এই যন্ত্রগুলো ইলেক্ট্রিক চলে এবং আপনিই কাজ করে। এক পেনি হতে ছ পেনি পর্যন্ত দামের টিকিট এই রকম যন্ত্রে পাওয়া যায়। প্রত্যেক যন্ত্রে কত কত দামের টিকিট পাওয়া যায় এবং সেই টিকিটে কতদূর কোন্ ষ্টেশন পর্যন্ত বাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে লেখা থাকে। পেনি মুদ্রা ফেলার জন্তে একটি স্লট (Slot) অথবা ছিদ্র থাকে—তা'ই থেকে ঐ সকল যন্ত্রগুলোর ঐ রকম নাম হয়েছে। এই ছিদ্রটি আবার এমনি যে পেনি ভিন্ন অস্ত্র কোনও মুদ্রা তার মধ্য দিয়ে যেতে পারে না—আর, যদিও বা অস্ত্র কোনও মুদ্রা জোর ক'রে ভিতরে চালিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে ও টিকিট পাওয়া যাবে না। আবার—মেকীমুদ্রা দিলে যন্ত্রগুলো কাজ করে না—টিকিটও বা'র হয়ে আসে না। সুতরাং এই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে টিকিট বিক্রয় করাতে রেল-কোম্পানীর কোনও প্রকার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যে রকম দামের টিকিট প্রয়োজন ঠিক সেই দামের টিকিট দিতে পারে এই রকম একটি স্লট মেশিনের সামনে গিয়ে নিদিষ্ট সংখ্যক পেনি মুদ্রা ফেলে দিলেই নিমিষের মধ্যে আপনিই টিকিট বা'র হ'য়ে আসে। আবার পিক্যাডিলি সার্কাস, হোলবর্ন, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি জনবহুল ষ্টেশনগুলোতে একরকম স্লট মেশিন থাকে যাতে প্রয়োজনমত টিকিট ত পাওয়া যায়ই, উপরন্তু বাকী পয়সাও ফেরৎ পাওয়া যায়। মনে কর, ভূমি পিক্যাডিলি সার্কাস হ'তে টটেনহাম

কোর্টরোড ষ্টেশনে বাবে—এই পথের ভাড়া ছ'পেনি। কিন্তু তোমার কাছে খুচরা ছ'পেনি নেই—একটি শিলিং আছে। তুমি টিকিট পাওয়া যায় এমন একটি স্লট মেশিনের সামনে গিয়ে শিলিং লেখা ছিদ্রপথে তোমার শিলিংটা ফেলে দিলে—বাস্—পলক না ফেলতেই অল্প একটি ছিদ্রপথে একটি ছ'পেনির টিকিট এবং বাকী দশ'পেনি তোমার সামনে বনাং করে বা'র হয়ে এল; এই সকল ব্যাপার এবং ব্যবস্থা দেখতে ভারী মজার এবং বিস্ময়কর, 'নিঃসন্দেহ! শিলিং এর মত ছ'পেনি মুদ্রার ও ছিদ্র পথ আছে—সেখানে একটি ছ'পেনি মুদ্রা দিলে ছ'পেনি অথবা তিন'পেনির যেমন প্রয়োজন টিকিট এবং বাকী পেনিও পাওয়া যায়। ঐ সকল বড় বড় ষ্টেশনে আবার রেজকী দেওয়ার জন্তে বিশেষ রকম স্লট মেশিন থাকে—তা'দের কাজই হচ্ছে শুধু

বিক্রয় এবং রেজকী দেওয়ার এই প্রকার সকল যন্ত্রই ইলেকট্রীকে চলে এবং এত দ্রুত কাজ করে যে টিকিট বিক্রয় করার যন্ত্র থেকে ঘণ্টায় এক হাজারেরও বেশী টিকিট পাওয়া যায়।

বুকিং অফিসে যে টিকিট বিক্রয় হয় তা অনেক স্থলে আমাদের দেশের রেলওয়ে ষ্টেশনের টিকিট বিক্রয়ের মত। ষ্টেশনের নাম টিকিটের দাম প্রভৃতি বিবরণ ছাপাতে লেখা টিকিট স্তরে স্তরে আলমারীতে সাজান থাকে—যাত্রীরা কোথায় বাবে বললেই বুকিং ক্লার্ক সেই ষ্টেশনের টিকিটের দাম নিয়ে টিকিট দেয়। কিন্তু এই ভাবে টিকিট বিক্রয় করাতে অনেক বেশী সময় লাগে বলে, আজকাল বড় বড় এবং জনবহুল ষ্টেশনে রলটিক মেশিন নামক একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে বুকিং অফিসে টিকিট বিক্রয় করা হয়। এই যন্ত্রে কোনও



আগার গ্রাউণ্ড ট্রেন পথে চলিতেছে

রেজকী দেওয়া। মনে কর, তোমার কাছে একটি আড়াই শিলিং অথবা ছ' শিলিং মুদ্রা আছে, কিন্তু তোমার একপেনি অথবা ছ'পেনি টিকিটের প্রয়োজন; টিকিট ঘরে গিয়ে টিকিট কাটতে অনেক সময় লাগে—তাতে দেবী হয়ে যেতে পারে। অল্প টিকিট কাটার জন্তে যে সকল স্লট মেশিন থাকে, সেগুলোতে মাত্র ছয় পেনি এবং এক শিলিং মুদ্রা দেওয়া যায়। এই রকম অবস্থার রেজকী দেওয়ার জন্তে যে আলাদা যন্ত্র থাকে, তাতে তোমার আড়াই শিলিং কিংবা ছ'শিলিং মুদ্রাটি ভাঙিয়ে খুচরা করে নিয়ে আবার টিকিট বিক্রয় করার যন্ত্রের ছিদ্রপথে দিলে টিকিট পাওয়া যাবে। এই প্রকার খুচরা অথবা রেজকী দেওয়ার যন্ত্রের টিকিট

নির্দিষ্ট ষ্টেশনের টিকিট ছাপান এবং সাজান থাকে না। এটি দেখতে অনেকটা টাইপ রাইটারের মত এবং এটিতে টাইপ রাইটারের মত অনেকগুলো চাবি অথবা বোতাম আছে। প্রত্যেকটি বোতামে ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেশনের নাম লেখা থাকে। যাত্রীরা বুকিং অফিসের সামনে গিয়ে কোথায় যাবে বলা মাত্রই বুকিং ক্লার্ক সেই ষ্টেশনের বোতামটি টিপে দেয়—সঙ্গে সঙ্গেই রলটিক মেশিন হতে সেই ষ্টেশনের নাম, দূরত্ব, ভাড়া প্রভৃতি বিবরণ ছাপা হয়ে টিকিটখানা যাত্রীর সামনে বার হয়ে আসে। যদি কোনও যাত্রীর কাছে ঠিক বা ভাড়া সেইমত খুচরা বা ভাঙ্গানি পয়সা না থাকে, তা'হলে সে তার কাছে বা আছে

তাই দেখ—বুকিং ক্লার্ক রলটিক মেশিনের মতই আর একটি মেশিনের একটি বোতাম টিপলেই টিকিটের ভাড়া বাদে বাকী পয়সা যাত্রীর সামনে বার হয়ে আসে। এই দ্বিতীয় যন্ত্রটির নাম চেঞ্জ-গিভিং-মেশিন (Change Giving Machine) অর্থাৎ খুচরা রজকী দেওয়ার যন্ত্র। প্রত্যেক বড় টিউব স্টেশনে বুকিং ক্লার্কের শ্রুতি যন্ত্র থাকে—একটি রলটিক মেশিন এবং অপারটিং গিভিং মেশিন। বুকিং ক্লার্ক হু হাতে যন্ত্রে কাজ করে। ক মেশিন এত দ্রুত কাজ করে যে, ঘণ্টায় ১০৪৫ খানা টিকিট বিক্রয় করতে পারে। অক্সফোর্ড সার্কাস নামক

টিউব রেলওয়ে লাইনের মর্নিংটন ক্রেসেন্ট (Mornington crescent) নামক স্টেশনে এই রকম ব্যবস্থা আছে।

এত দ্রুত টিকিট বিক্রয় করা ভিন্ন যাত্রীদের বহুপ্রকারের খবরাখবর নিয়েই আছে—সেগুলোও বুকিং ক্লার্কের কাজ। স্ততরাং বেশ বুঝতে পারছি, বুকিং ক্লার্কের কাজ নিত্যন্ত সাজা নয়। যে পরীক্ষা পাশ করে টিউব স্টেশনের বুকিং ক্লার্ক হওয়া যায় তাতে সর্বসমেত ৪৩টি প্রশ্ন থাকে। এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারলে তবে বুকিং ক্লার্ক হওয়া যায়। শুধু বুকিং ক্লার্ক বলে নয়—টিউব রেলওয়েতে যারা দরওয়ান



আগার গ্রাউণ্ড পোষ্টাল টিউব ট্রেনে মেলব্যাগ বোঝাই করা হইতেছে।

জনবহুল টিউব স্টেশনটি একদিন সন্ধ্যাবেলা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, ১১৭৪ জন যাত্রী এক ঘণ্টায় টিকিট কিনে গেল—অর্থাৎ প্রতি তিন সেকেন্ডে একজন। এত দ্রুত টিকিট বিক্রয় করা এবং সঙ্গে ভান্ডানি বা রেজকী দেওয়া বুকিং ক্লার্কের সাধ্যাতীত। স্ততরাং রলটিক মেশিন এবং চেঞ্জ-গিভিং মেশিন—এই দুটি যন্ত্র না হলে চলে না।

আবার, কোনও কোনও স্টেশনে এত অল্প সংখ্যক যাত্রী যাওয়া আসা করে যে, সেই সকল স্টেশনে লিফটম্যান অথবা লিফট চালকই টিকিট বিক্রয় করে। তা ছাড়া ঐ সকল স্টেশনে স্লট মেশিনেও টিকিট পাওয়া যায়। লণ্ডনের হাম্পস্টেড

অথবা থবরদারীর কাজ করে, তাদের প্রশ্নপত্রেও ২৬টি প্রশ্ন থাকে। টিউব রেলওয়ের কর্মচারীদের পরীক্ষাগুলোর মধ্যে ড্রাইভারের পরীক্ষাই সর্বাপেক্ষা কঠিন—এটিতে সবশুদ্ধ ৮৫টি প্রশ্ন থাকে।

লণ্ডন ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য সহরে আগার গ্রাউণ্ড অথবা টিউব রেলওয়ে খুব সামান্যই আছে—তার প্রধান কারণ, লণ্ডন অতি পুরাণ সহর—পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরা সহর বললেই হয়—তার ওপর লণ্ডনের রাস্তাগুলো অত্যন্ত অপ্রশস্ত। লণ্ডনের রাস্তায় এত লোক চলাচল করে যে, তত সড়ক রাস্তা লোকজন মোটর, বাস প্রভৃতির জন্তে যথেষ্ট নয়। অত

জমীর দাম ভরানক বেশী ব'লে বর্তমান রাস্তাগুলোর ছ'ধাবের খর, বাড়ী ভেঙ্গে ফেলে সেগুলো প্রশস্ত করাও সম্ভবপর নয়। সুতরাং বহুদিন থেকেই লগুনে লোকেদের মাটির নীচ দিয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। সে তুলনায় ইউরোপের অস্ট্রা স্ট্র স্ট্র, যেমন—প্যারিস্ (Paris), বার্লিন্ (Berline) প্রাগ্ (Prague), অথবা আমেরিকার নিউইয়র্ক্ (New York), ব্রজিলের বুনাঙ্গ্ (Buenos Aires) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নতুন এবং আধুনিক স্ট্র এবং ঐ সকল স্ট্রের রাস্তা খুবই প্রশস্ত। সুতরাং ঐ সকল স্ট্রের লোকেদের মাটির নীচ দিয়ে যাওয়ার তত প্রয়োজন হয় না।

লগুন ভিন্ন প্যারিস, বার্লিন, ম্যাড্রিড্, নিউইয়র্ক্ এবং বুনাঙ্গ্ এরাসে আগার গ্রাউণ্ড্ এবং টিউব্ রেলওয়ে আছে। রাশিয়ার অন্তর্গত মস্কো স্ট্রও টিউব্ রেলওয়ে তৈরী হচ্ছে এবং সে'টি শীঘ্রই খোলা হবে। প্যারিসের আগার গ্রাউণ্ড্ লাইনগুলো বেশী দীর্ঘ নয়—সেইজন্তে একটু বেশীদূর যেতে হ'লেই এক লাইন হতে আর এক লাইনে গাড়ী বদল করতে হয়—তা' নিতান্ত অসুবিধাজনক। প্যারিসের আগার গ্রাউণ্ড্ লাইনে আপ্ এবং ডাউন্ড্ দুটি লাইনই একাট বড় টানেলের মধ্যে সাধারণ রেলওয়ে লাইনের মত পাশাপাশি চলে—লগুনের মত আপ্ এবং ডাউন্ড্ লাইনের জন্তে দু'টি পৃথক টানেল্ অথবা টিউব্ নেই।

নিউ ইয়র্কের আগার গ্রাউণ্ড্ রেলওয়ের নাম ইন্টার বরো র্যাপিড্ ট্রানজিট্ কোম্পানী (Inter-Borough Rapid Transit Company) —কিন্তু তা'কে সাধারণতঃ স্কন্দ হ'বে।

সাব্‌ওয়ে (Subway) বলা হয়। এটির খানিক অংশ মাটির নীচে এবং খানিক অংশ মাটির ওপরে। নিউইয়র্কের আগার গ্রাউণ্ড্ রেলওয়ে লাইনে দূরত্বনির্বিশেষে ভাড়া একই—অর্থাৎ যতদূরই যাওয়া যাক না কেন, ভাড়া সমানই লাগে। লগুন কিংবা প্যারিসে দূরত্ব বিশেষে ভাড়া দিতে হয়—অর্থাৎ যতদূর যাওয়া যায় ততদূরের ভাড়া লাগে। নিউইয়র্কের আগার গ্রাউণ্ড্ রেলওয়ের একটি বিশেষ স্ট্র এই'বে, স্ট্রের যে সকল অংশে সর্বাপেক্ষা অধিক যাতায়াত করে সেই সকল স্থানে চারটি ক'রে লাইন তৈরী এই চারটি লাইনের মধ্যে দু'টিতে সাধারণ ট্রেন চলে—সেই লাইনের ট্রেন প্রতি স্টেশনে থামে; বাকী দু'টি এক্সপ্রেস্ (Express) ট্রেন চলে—এগুলো অল্প সং স্টেশনে থামে এবং খুব দ্রুত চলে। যা'দের কাজের তত বেশী এবং শীঘ্র যাওয়া প্রয়োজন, তা'রা ঐ এক্সপ্রেস্ ট্রেনে যায়।

বুনাঙ্গ্ এরাসের আগার গ্রাউণ্ড্ রেলওয়ে মাত্র সাড়ে চার মাইল দূর।

বর্তমানে পৃথিবীতে যেখানে যেখানে আগারগ্রাউণ্ড্ কিংবা টিউব্ রেলওয়ে আছে তা'দের সকলের মধ্যে লগুনের আগার গ্রাউণ্ড্ এবং টিউব্ রেলওয়েই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং লগুনের টিউব্ রেলওয়ের গাড়ী এবং অস্ট্রা স্ট্র সকল প্রকার ব্যবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট। তবে অনেকে বলেন যে, মস্কোতে যে নতুন টিউব্ রেলওয়ে লাইন তৈরী করা হচ্ছে সে'টিও লগুনের মতই সুন্দর হ'বে।

রাত্রিতে

শ্রীস্বধীরকুমার রায়

চক্রবালে নামছে আঁধার

দূরের পাখী আসছে ঘরে,

দল বাঁধিয়া দিনের স্মৃতি

আসছে নেমে তন্দ্রা পরে।

এদের মাঝে কোন স্মৃতিটি

লাগছে প্রাণে মধুরতম ?

তোমার স্মৃতি হাসছে উজল

দূর আকাশে চন্দ্র-সম।

শ্রীকাশীপুর দাস গুপ্ত বি এ

সুপ্রভার বখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি প্রায় ১টা, ক্লোরোফর্মের উৎকট গন্ধ তখনও তাহার নাকৈ লাগিয়া রহিয়াছে। কয়েকঘণ্টার জন্ত সে যেন কোন্ এক অজানা জগতে চলিয়া গিয়াছিল, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহার জীবনের উপর দিয়া যে অভাবনীয় দুঃসহ ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহার খবর সে কিছুই জানে না, জানিবার কথাও নয়। শরীর তাহার নিতান্ত দুর্বল, উঠিবার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিল না; কিন্তু কেন সে আজ এভাবে শুইয়া আছে? আর তাহার শরীরই বা এত দুর্বল কেন? কই তাহার ত কোন অস্থ করে নাই? ধীরে ধীরে একটী একটী করিয়া তাহার সব কথা স্মরণ হইল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গৌরব মাতৃস্ব সে আজ অর্জন করিয়াছে—দিনের পর দিন মাসের পর মাস পরম যত্নে আপনার দেহের রক্ত দিয়া অন্তরের স্নেহরসে যাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে সে আজ প্রথম তাহাকে মা বলিয়া ডাকিবে, আজ সে মা; কিন্তু কই সে—তাহার সন্তান! বিছানার আশে পাশে তাহার দুর্বল ব্যাকুল হস্ত কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইল, একটা নিদারুণ অজানা আশঙ্কায় তাহার সারা অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিল।

হাসপাতালের একটা ক্ষুদ্র কক্ষে জানালার পাশে একখানা চেয়ারে বসিয়া সুনীল বাইরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এই অবিরাম একটানা বৃষ্টিপতন-ধ্বনি, বাইরের ঘনরুদ্ধ মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বর্ষার তাণ্ডব নৃত্য, বিদ্যুৎ বিদীর্ণ আকাশের মাঝে প্রকৃতির এই উদ্দমতা তাহার মনকে উদাস করিয়া দিল। কি নিষ্ঠুর রাত্রির রূপ! বৃষ্টির একটানা টিপ্ টিপ্ শব্দ ছাড়া আর কোথাও এতটুকু শব্দ নাই; শুধু মাঝে মাঝে দূরে কোথাও হুএকটা কুকুরের বুক-ফাটা আর্তনাদ! অন্ধকার আর এই ভয়াবহ পারিপাশ্বিকতা মনে আনে গভীর চঞ্চলতা।

দীর্ঘ কণ্ঠে সুপ্রভা স্বামীকে ডাকিল। সুনীল উঠিয়া শিয়রের কাছে বিছানার উপর আসিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। খানিকক্ষণের জন্য উভয়েই

নীরব; মনে হইল সুপ্রভা বুঝি আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ সুপ্তোখিতের মত সে বলিয়া উঠিল—“ওগো আমার সন্তান? সে কোথায়? আমার দেখাবে একবার তাকে।” কণ্ঠে তাহার ব্যাকুলতা, চোখে ব্যাকুল চাহনি।

সুনীল ধীরে ধীরে কহিল—“অধীর হয়ো না স্ত্রী; তুমি আর একটু বিশ্রাম কর, তোমার শরীর এখনও দুর্বল। ভালই আছে, একটু পরেই নাস তাকে তোমার কাছে নিতে আসবে।” বলিতে বলিতে সুনীলের কণ্ঠ একটুখানি কাঁপিল। উঠিল।

সুপ্রভা তাহার ব্যাকুল ক্লিষ্ট দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর তুলিতে ধরিল। তাহার চোখে জল—সারা মুখে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেন? তবে কি তাহার আত্মজ সন্তান—বাহার জন্য এতদিন সে আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল তাহার কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? সে কি বাঁচিয়া নাই! বিবাহের পর পাঁচটা বৎসর কাটিয়া গেছে। এই পাঁচ বৎসরে স্বামীকে চিনিবার পরিপূর্ণ অবকাশ সুপ্রভা পাইয়াছে। আজ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া একটা নিদারুণ অমঙ্গলের আশঙ্কা তাহা মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

কিন্তু কি করিবে সে! আজ সে নিতান্ত অসহায়। বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার স্নানার্থ তাহার নাই। তাহার সন্তানের খবর তাহাকে কে বলিয়া দিবে! স্বামীর কাছ হইতে কোন কথা জানিবার প্রত্যাশা সে করিতে পারে না। নাসকে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন জবাব পাইল না। কি নিষ্ঠুর এই নাসের দল—কোন কাজেই যেন এতটুকুও আন্তরিকতা নাই। তারা সেবা করে কলের পুতুলের মত, কিন্তু এ সেবা অত্যাচারেরই নামান্তর। প্রতিটি মিনিট একটা অজানা আশঙ্কার ভিতর দিয়া কাটিতে লাগিল।

সকাল ৭টার ডাঃ রায় সুপ্রভাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গভীর—খানিকক্ষণ আগে তাঁহার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গেছে। এই সৌম্য দর্শন,

শান্ত প্রকৃতির মানুষটাকে সুপ্রভা শিশু বেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে। তাঁহার এ মূর্তি সে কোনোদিন দেখে নাই। তাই নিস্তব্ধ বিশ্বয়ে সে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাঃ রায় বিছানার পাশে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। সুপ্রভা কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—“আমার আসতে বড় দেরী হয়ে গেছে, মা। তুমি মনে মনে হয়ত আমার উপর রাগ করছে। আমার ক্ষমা করো। তোমার কাছ থেকে তোমার সন্তানকে কিছুক্ষণের জন্তে দূরে সরিয়ে রাখতে আমি বাধ্য হয়েছি; তাতে তোমার প্রাণে কতখানি ব্যথা বেজেছে, আমার এ সন্তর বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমি তা সারা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি। আমাকে এ কঠিন কর্তব্য পালন করতে হয়েছে তোমার, এবং তোমার সন্তানের মঙ্গলের জন্তে। তোমার এতটুকু বয়েস থেকে তোমায় আমি দেখে আসছি—স্নেহ করেছি নিজের কন্যার মত। আমি জানি, আজ যে কথা আমি তোমায় বলব, যত কঠিনই হক না কেন, তা সহ্য করার মত শক্তি তোমার আছে।”

একটা অজানা ভয়ে সুপ্রভার মাতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। সে অশ্রুচক্ষুরে বলিল—“কি হয়েছে আমায় একটু থুঁলে বলুন—এ সন্দেহের মধ্যে আমায় আর রাখবেন না—আমি আর সহ্য করতে পারছি নে।” তাঁহার নিরুদ্ধ অশ্রুজল আর বাঁধন মানিল না।

“তোমার সন্তান পূর্ণাঙ্গ হয়েই জন্মেছে কিন্তু……” এই পর্যন্ত বলিয়াই ডাঃ রায় থামিলেন।

“থামবেন না, কি হয়েছে বলুন।”—সুপ্রভা যেন ভাঙিয়া পড়িল।

“মাথায় একটা ফোটক নিয়ে শিশুটি জন্মেছে—ফোটকটি যদিও এখন ছোট, কিন্তু এর পরিণাম বড় ভয়াবহ।”

কিছুক্ষণ সুপ্রভার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না, নিজকে সামলাইয়া লইবার জন্তই হয়ত সে কয়েক মিনিট চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল—তাঁহার দুঃখ বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। স্নানীল কাছেই বসিয়াছিল, নিজের ক্রমাল দিয়া সম্মুখে তাঁহার চোখ দুটি মুছাইয়া দিল।

সকলেই নীরব। ঘরে স্থচ পড়িলেও বুঝি বা শব্দ পাওয়া

যায়। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সুপ্রভাই প্রথম ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করিল—“সে কি বাঁচবে না?”

ডাঃ রায় শুধু সংক্ষেপে বলিলেন—“ভগবানকে ডাক। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। অন্তর্যামী—যিনি ছনিয়ার গতি-প্রগতি নিয়ন্ত্রিত কছেন, তাঁর লীলাখেলা বুঝবার মতো ক্ষমতা মানুষের কোথায়, মা! তিনি যে সব কিছুই কুণ্ডলিকার জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছেন—কুণ্ডলিকা কেটে না গেলে তাঁর ইচ্ছাকে মানুষ বুঝবে কেমন করে? শুধু মনে রেখ, তিনি মঙ্গলময়।”

সুপ্রভার পলকহীন উদাস দৃষ্টি জানালার বাইরে নিবদ্ধ ছিল—সে যেন কোন এক অচেনা জগতে চলিয়া গেছে—পৃথিবীর অনেক উর্দে—যেখানে নাই সুখের্থের জন্ত কোন লালসা, দুঃখ ব্যথার জন্ত কোন অভিযোগ। ডাঃ রায়ের কোন কথা তাঁহার কানে প্রবেশ করিয়াছিল কিনা কে জানে। হৃদয়ের নিষ্ঠুর নিয়তি, একটা তরুণ বুদ্ধকিত মাতৃহৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষাকে এমন নিশ্চয় আঘাতে ধূলিস্থাপ্ত করিয়া তোমার কি লাভ হইল—আর দুঃখ যদি দিলেই, তবে এমন করিয়া আর একটি ক্ষুদ্র শিশুর ভবিষ্যৎকে ইহার মধ্যে জড়িত করিলে কেন? তাঁহার ত কোন দোষ নাই; সে ভূমির স্পর্শ লাভ করিল, কিন্তু আলো বাতাস উপভোগ করিল কই? যে ববনিকার অন্তরাল হইতে সে এই পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বাহিরে সেই অন্ধকার রাজ্যে সে হয়ত আবার চলিয়া যাইবে; কিন্তু বাহারা এই দুঃখ-স্মৃতি বুকে বহন করিয়া এ জগতে বাঁচিয়া থাকিবে, প্রতিনিয়ত সংসারের শত কার্যের মাঝে সেই স্মৃতির তীক্ষ্ণ ফলক আঘাতের পর আঘাত হানিয়া তাহাদের অন্তরকে জর্জরিত করিয়া তুলিবে না কি?

এই একটানা নীরবতার মধ্যে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। নিজকে কতকটা সম্বরণ করিয়া লইয়া সুপ্রভা আবার জিজ্ঞাসা করিল—“এর কি কোন প্রতিকার নেই? অপারেশন করে অথবা অন্য কোনো প্রকারে?”

ডাঃ রায় বলিলেন—“তোমায় মিথ্যে আশা দিতে চাইনে, মা। অপারেশন মানেই মৃত্যু। মানুষের হস্তক্ষেপ এখানে ব্যর্থ হবে। তাতে দুঃখই শুধু বাড়বে, ফল কিছু হবে না। তার চাইতে এর চিকিৎসার সম্পূর্ণ তার প্রকৃতির হাতে ছেড়ে

দাও। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির চাইতে বড় চিকিৎসক আর কেউ নেই।”

“তাকে আমি একবার দেখতে পারি কি?”—সুপ্রভার কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত।

ডাঃ রায় নাসকে ইঙ্গিত করিলেন। কয়েক মিনিট পরে নাস টা কবল দিয়া জড়াইয়া ছোট শিশুটিকে সুপ্রভার বিছানার একপাশে শোয়াইয়া দিল।

শিশুটির মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুপ্রভা চমকাইয়া উঠিল; তাহার চোখের সামনে সে যেন একটা বিভীষিকা দেখিয়াছে। এ যেন একটা মাংসপিণ্ড—মানুষের আকৃতি এরূপ কুশ্লী হইতে পারে, সে ত কোনদিন কল্পনাও করে নাই। মুখের চেহারার একটা ভয়ঙ্কর কদর্যতার ছাপ, ভ্রুর চিহ্নটুকুও নাই—সবটুকু নাসিকা যেন চোখের ভিতরে ঢুকিয়া গেছে। মাথার বিস্তীর্ণ নীল স্কেটকট দেখিলে মনে হয়, কোন ভারী স্তম্ভর আঘাতে যেন উহা খেঁলাইয়া গেছে। মনে মনে সে বলে—
“হা ভগবান, তোমার কাছে কি অপরাধ আমি করেছিলাম, যে এমন করে আমার শাস্তি দিলে। এ জিনিষ ত আমি তোমার কাছে কোনদিনও চাইনি; এ ছবিবিসহ পুঞ্জীভূত গ্রানির বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে না দিলে কি তোমার সৃষ্টিগৌরব এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হত? আমার মাতৃস্বকে এমনি অপমানিত করে কি লাভ হ’ল তোমার?” সুপ্রভা আর ভাবিতে পারে না। তাহার অশ্রুসজল চোখ ঝাপসা হইয়া উঠে, সারা অন্তর উজাড় করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হয়।

ঠিক সেই সময়ে বিছানার উপরে শায়িত শিশুটা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কি করণ, কি মর্মস্পর্শী সেই ক্রন্দনের সুর। সুপ্রভা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার অন্তরের সমস্ত বেদনা, হতাশার দীনতা কে যেন এক মুহূর্তে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল—তাহার বহুক্ষিত মাতৃস্ব শিশুটিকে সম্মুখে পরম আগ্রহে বুকে তুলিয়া লইল। এই ত তাহার সন্তান—বত কুৎসিত, বত অসুন্দরই হউক না কেন, এ তাহার নিজেরই সন্তান। সে ইহার মা। ইহাকে ভাল না বাসিয়া সে থাকিবে কেমন করিয়া? আপনার বক্ষের ক্ষীরধারায় সে ইহাকে বাঁচাইয়া তুলিবে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি সে শিশুটির ক্ষুদ্র গণ্ডে পরম স্নেহে চুষন রেখা আঁকিয়া দিল।

হঠাৎ সে যেন বিচলিত হইয়া উঠিল। আকুল কণ্ঠে ডাঃ রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“ডাক্তার বাবু, ওকে বাঁচাতে হবে—আমি ওকে চাই—ও যে আমার—আমারি সন্তান।” বলিয়াই অত্যধিক উত্তেজনায় সুপ্রভা জ্ঞান হারাইল।

* * * *

খুকুর জন্মের পর তিনটা বৎসর অত্যন্ত হইয়া গেছে। নিশিদিন ঐকান্তিক সেবা বত্রে মৃত্যুর অমোঘ গ্রাস হইতে সুপ্রভা ইহাকে টানিয়া আনিয়াছে। খুকুর জন্ম-মুহূর্তে শোকা-ভুরা জননী শোকের যে বীভৎস মুর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাই স্থতির ত্বরে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য সুপ্রভা ইহার নাম রাখিয়াছে অশোকা। সেদিন বত ব্যথা, বত হুঃখ সে পাইয়াছে, বত শোকাশ্রু সে ঢালিয়াছে বিধাতার পায়ে, তা কি চিত্রগুপ্তের খতিয়ানের খাতায় জমা হইয়া নাই? সেই মূল্যের বিনিময়ে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার অশোকা কি পাইবে না নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন সুখ?

সুপ্রভার মাতৃহৃদয় ইহাকে ভালবাসিয়াছে সারা অন্তর দিয়া—অশোকা আজ তাহার নয়নের মণি—এক মুহূর্ত সে ইহাকে চক্ষের আড়াল করিতে পারে না। সে কথা বলিতে শিখিয়াছে—আধ আধ ভাষায় সে যখন তাহাকে মা বলিয়া ডাকে, তখন সুপ্রভার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে—গভীর আবেগে সে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরে—আদরে সোহাগে তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে—সে যে মা।

সে দিন রবিবার। বাইরের ঘরে বসিয়া সুনীল রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতেছিল—

যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন

যা পাই নে বড়ো সেই নয়।

চিন্ত ভরিয়া র’বে ক্ষণিক মিলন

চির বিচ্ছেদ করি জয় ॥

বিশ্ব করির প্রতি সে তার অন্তরের নতি জানায়।

ডাকপিয়ন চিঠি দিয়া গেল—বড় একখানা খামের চিঠি। খুলিয়া পড়িতেই সুনীলের সারা মুখে একটা বিধাদের ছায়া পড়িল। ডাঃ রায়ের চিঠি—মোটর-দুর্ঘটনায় তিনি আহত হইয়াছেন—বাঁচিবার আশা নাই। তাহার নাস টির ঘটনা-স্থলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সুনীলকে অনুরোধ

করিয়াছেন সে যেন বৈকাল ৫টার সময় সুপ্রভা এবং থুকুকে লইয়া অবশ্যই তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করে।

সুনীল একটু ভাবিত হইল। থুকুকে লইয়া যাওয়ার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে, তার যুক্তি সে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। নির্দিষ্ট সময়ে তাহার ডাঃ রায়ের বাড়ী উপস্থিত হইল। একটি ছোট কামরায় একখানা সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর ডাঃ রায় শায়িত আছেন, তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্বরে সহরের প্রসিদ্ধ ধনী মিঃ সেন, তাঁহার স্ত্রী, তাঁহাদের তিন বৎসরের শিশু কন্যা এবং একজন পুলিশ অফিসার ছাড়া বাইরের লোক আর কেহই ছিল না। হঠাৎ তাহাদের ছোট মেয়েটির দিকে চোখ পড়িতেই সুনীল এবং সুপ্রভা উভয়েই এক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণের জন্য তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু সময়ের জন্য সুপ্রভা সেদিক হইতে কিছুতেই চোখ ফিরাইতে পারিল না। সে আপন মনে বলিল—“অসম্ভব, আমার চোখ হয়ত আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে। এ হ’তেই পারে না।”

মেয়েটির মুখ যেন সুপ্রভার মুখখানির সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। বয়সের তারতম্য ছাড়া আর কোথাও এতটুকু পার্থক্য নাই। তাহার নীল চোখ, সুচিকন ক্রম্বল, কোকড়ান চুল, ডান গালের টোল, এমন কি কপালের উপর ত্রিকোণাকার জন্ম-চিহ্ন সবই যেন সুপ্রভার আপনার নিজের। এ যেন তাহার ছোট বেলাকার একখানি অলংকার।

“আমি কি পাগল হয়েছি”—সুপ্রভা মনে মনে বলে। স্বামীর মুখের দিকে সে একবার তাকাইয়া দেখিল, তিনিও মেয়েটির দিকে তাকাইয়া আছেন। মিঃ এবং মিসেস সেন একবার সুপ্রভার দিকে একবার তাঁহাদের মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। একমাত্র ডাঃ রায়ই নীরব, শান্ত, সমাহিত।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ডাঃ রায় আস্তে আস্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন—“আমার জীবন-দীপ নিবে আসছে—আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি যে কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই আমাকে পরলোকে পাড়ি জমতে হবে। তিন বৎসর পূর্বে যে অন্যায় যে অবিচার আমি করেছি, তা সংশোধন করতে না পারলে পরলোকে আমার আত্মা শান্তি পাবে না। এ সুদীর্ঘ তিন বৎসর ধরে প্রতিটি দিন, প্রতি মুহূর্ত আমি করেছি আমার

পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি কি বলতে চাইছি, আপনারা হয়ত আমাকেটা অনুমান করতে পারছেন”—ডাঃ রায় একটু থামিলেন, কথা বলিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল।

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মিসেস সেন বলিয়া উঠিলেন “আপনি কি বলতে চান?” তাঁহার স্বর তীক্ষ্ণ এবং মুচ্ছাগ্রস্ত রোগীর মত অসংলগ্ন।

ডাঃ রায় তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি মিসেস সেনের মুখের উপর তুলিয়া ধরিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন—“আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যে মেয়েটিকে আপনি আপনার নিজের বলে জানেন, সে আপনার নয়; সে সুপ্রভার। আর তিন বৎসর আগে যে মেয়েটিকে সুপ্রভা স্নেহে, প্রেমে, সেবায়, মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছে, সে আপনার।”

• “না—না—না।” বলিয়াই মিসেস সেন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সকলেই নির্বাক। সকলেরই মুখের ভাষা বুঝি নিঃশেষ হইয়া গেছে। সুপ্রভার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল—সুনীল বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া এইমাত্র আগিয়া উঠিয়াছে—আর মিঃ এবং মিসেস সেন ভীত শঙ্কিত।

মিসেস সেনই প্রথম কথা কহিলেন—“এ সত্য নয়, এ অলম্ব্য মিথ্যা; ঐ—ঐ কুৎসিত শিশু কথখনো আমার হতে পারে না।” ঘৃণায় তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সুপ্রভার চোখে আগুণ জলিতেছে। আশোকাকে ঘৃণা করিবার অধিকার মিসেস সেনকে কে দিল? পরক্ষণেই তাহার মনে হইল অশোকা ত আজ আর তাহার নয়—ঐ সৌন্দর্যের প্রতিমাটিই তাহার, এতক্ষণ কি তাহার অবচেতন মন ইহাকে আপনার সন্তান বলিয়া চিনিতে পারে নাই!

“মিসেস সেন, অনুগ্রহ করে আমায় শেষ করতে দিন। তারপর আমাকে বা খুঁসি আপনি বলবেন”—ক্ষীণকণ্ঠে ডাঃ রায় বলিলেন।

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মানুষ যেভাবে কথা বলে, ডাঃ রায় সেইভাবে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—“তিন বৎসর পূর্বেরকার সেই রাত্রিটার কথা হয়ত আপনাদের মনে আছে, মিসেস সেন! আপনিও হাসপাতালে এলেন, সুপ্রভাও এল। প্রায় একই সময়

আপনাদের উভয়ের সন্তানই ভূমিষ্ঠ হল। সুপ্রভার জন্তে কোন বেগ পেতে হয় নি—তার সন্তান সুপুষ্ট-সুশ্রী হয়ে জন্ম নিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বলে আপনার বেলা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়েছিল। আমার অক্ষমতাই বলুন, আর যাই বলুন না কেন, অস্ত্রোপচারের সময় আপনার শিশুর মাথায় চোট লাগে। আমি জানি আমার এ অপরাধের ক্ষমা নেই। আমি আপনাদের খুব ভাল করেই চিনতাম—আমি জানতাম আপনারা আমার সহজে ছড়বেন না—এর জন্তে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। আমি সুনীল এবং সুপ্রভার সারল্যের সুযোগ নিলাম। আপনার সন্তান সুপ্রভাকে দিয়ে সুপ্রভার সন্তান আপনাকে দিলাম।” তারপর সুপ্রভার দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন—“তোমার এ বুড়ো ছেলেকে ক্ষমা করতে পারবে, মা? আমি যে ক্ষতচিহ্ন তোমাদের বুকে রেখে গেলাম, জানি, এ ক্ষত কোনদিন শুকাবে না। তোমরা আমার অভিসম্পাত দাও—আমি মাথা পেতে নোবাঁ। কিন্তু এ গোপন সত্যকে আমার মনের অন্ধ কক্ষে চাবি বন্ধ করে আমি স্বর্গে গিয়েও শান্তি পেতাম না।”

বেশ আরব্যোপভাস রচনা করেছেন আপনি—মিসেস সেনের কণ্ঠস্বর শ্রবণমিশ্রিত। “এখন নিশ্চয়ই বলবেন যে আমার সন্তান ওদের দিয়ে ঐ পেঙ্গুইন মতো মেয়েটা আমি নিই—এই ত?”

সুপ্রভা হয়ত সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল—তাহার অন্তরের পরতে পরতে আনন্দের শ্রোত বহিয়া গেল। এই অপরূপ শিশুটি তাহার—সে ইহার মা।

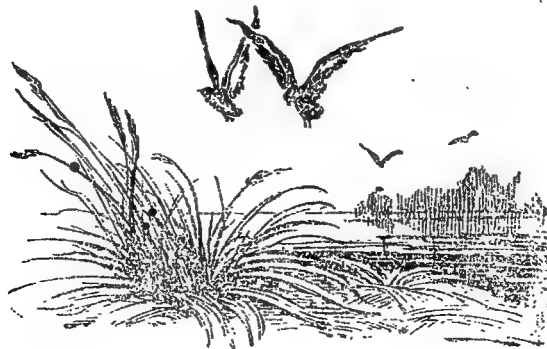
পরক্ষণেই অশোকের কথা তাহার মনে হইল। সে

ইহাকেই ত আপনার কণ্ঠা বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে—কত বিনিদ্র রজনী ইহাকে বুকে ধরিয়া কাটিয়াছে—ভগবানের নিকট কত সুকঠোর তপস্যা করিয়াছে ইহার জীবন-ভিক্ষা করিয়া। ইহাকে সে নির্বিকারে ভাল-বাসিয়াছে—মৃগ হইয়াছে ইহার অন্তরের সৌন্দর্য্যে; ইহাকে বিলাইয়া দিয়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া? ঐ শিশুটি তাহার কাছে আগন্তুক বই ত নয়—সে ত তাহাকে ভালবাসে নাই—জন্মের পর হইতে এই তিনটা বৎসর একদিনও ত তার কথা ভাবে নাই। তবে কেন সে চাহিবে উহাকে? না—না, অশোকাকে ছাড়া তাহার দিন চলিবে না। নিরন্তর ভারনার মধ্যে সুপ্রভা তন্ময় হইয়া গেল।

মিসেস সেনের অস্বাভাবিক চীৎকার শব্দে সুপ্রভা জাগ্রত হইল। তিনি বলিতেছেন—“না না, কিছুতেই আমি হুংসিত মেয়েটাকে আপন সন্তান বলে গ্রহণ করতে পারব না—ওর কদম্ব চেহারার দিকে আমি চাইতে পাচ্ছি নে, ও কখনও আমার সন্তান হতে পারে না।”

সুপ্রভা চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। রাগে তাহার হৃৎচোখ দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। মিসেস সেনের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া সে উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—“সাবধান হয়ে কথা বলবেন। আমার সন্তান সম্বন্ধে এরূপ জঘন্য উক্তি করবার অধিকার আপনার নেই—আপনি চাইলেই একে পাবেন মনে করেছেন?—আমি একে মৃত্যু করেছি, আমি এর মা।”—বশিরাই সুপ্রভা অশোকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

ডাঃ রায় বুঝি চোখ বুজিলেন।



বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর দান

শ্রীমতী ঘোষ এম, এ,

কৌতুকনাট্য—কতকগুলি ক্ষুদ্র নমুনা মাত্র। হাস্যরসের মধ্য দিয়া কথোপকথনের অবসরে রচিত বলিয়াই ইহাকে কৌতুকনাট্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; ইহার মধ্যে ভাঁড়ামি বা কুকটির কোন ইঙ্গিত নাই অথচ লেখিকার কৌতুক ব্যঙ্গ করিবার অপূর্ণ ক্ষমতার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ লাভ হয়। বৈজ্ঞানিকবর, সৌন্দর্য্যাহরণ প্রভৃতি উচ্চ রসের সৃষ্টি করিয়াছে। এই জাতীয় রচনা বঙ্গ সাহিত্যে এই প্রথম।

দেবকৌতুক—কাব্যনাট্য। লক্ষী এবং রতি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিবার জন্য মতে উর্বশী এবং মেনকা নামী দুইটি নারীকে সৃষ্টি করেন। অবশেষে দেখা যায় যে অপরূপ রূপ সম্পন্ন উর্বশীকে গ্রহণ না করিয়া রাজা সর্বগুণ সম্পন্ন মেনকা-কে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সেনাপতি বিবাহ করেন উর্বশীকে ইহাতে লক্ষীরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। পুস্তকে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত উচ্চাঙ্গের হয় নাই তবে ইহার কাব্যরস সূক্ষ্ম।

পাকচক্র—প্রহসন। কর্তা গিমির অজ্ঞাতসারে হরিবাবুর নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছিলেন এখন নিজপুত্র বিনোদের সহিত হরিবাবুর কন্যার বিবাহ দিয়া পূর্বঋণ শোধ করিয়া আরও পাঁচ হাজার লইতে ইচ্ছুক; গিমির তাতেও মন উঠে না তিনি নগদ দশ হাজার চাহেন। নতুবা তিনি তাহার বোনের শাশুড়ির সহিষ্ণু পাতান মেয়ে অতি প্রিয়পাত্রী বিধবা শশীমুখীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন। চক্রান্ত কর্তার ভগ্নীপোতের শালার পোষ্যপুত্র এবং তাহার ডান হাত, সে অবশেষে এক চক্রান্তদ্বারা গিন্নীকে বোকা বানাওয়া বিনোদের সহিত হরিবাবুর কন্যার বিবাহ দেয় এবং নিজে তাহার প্রেমিকা শশীমুখীকে বিবাহ করে। পুস্তকের উৎসর্গপত্রে লেখিকা বলিয়াছেন :

তুমি যতনে যত খুলিবে তত

পড়িবে পাকে বাঁধা,—

প্রাণে ছুটিবে হর্ষ ধারা...

কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তবে হাস্যরস সৃষ্টি করিতে গিয়া কর্তাগিন্নী যেন একটু মাত্রা ছাড়িয়া গিয়াছেন।

বইখানির প্রতি দৃষ্টির শেষে গান দিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

কনেবদল তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রহসন। একটি মনোরম গল্প উচ্চাঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চরিত্রগুলিকে সুন্দর ভাবে দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া একটি সুন্দর পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীধর এবং শশিনাথ বিবাহযোগ্য যুবক। শ্রীধর চায় একটি বয়স্ক এবং শিক্ষিতা বিবাহ করিতে কিন্তু বিলাতফেরৎ শশিনাথ চায় ঠিক তার বিপরীত। বন্ধুদের মধ্যে স্থির হয় যে তাহাদের জন্য নির্বাচিত পাত্রী তাহারা বদল করিয়া লইবে। কিন্তু মাঝে চক্রান্ত করিয়া তাহাদের উভয়কে অতি কুৎসিত একটি পাত্রী দেখান হয় ফলে প্রতারণা করিবার জন্য উভয়ে উভয়কে দোষারোপ করে এবং তাহাদের স্ব স্ব নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করে।

বইখানির একটি মাত্র দোষ যে ক্ষেপী এবং ভোলাকে লইয়া একটু বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার মধ্যে লেখিকা যে নির্মল এবং উচ্চাঙ্গের হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা বিরল। শ্রীধর, শশধর সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে প্রহসনগুলির মধ্যে ইহা চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

নিবেদিতা : বাঙ্গালী বিধবার মর্মস্পর্শী করণ চিত্র লইয়া এই নাটিকাখানি রচিত। কিন্তু গল্পাংশে ঘাত প্রতিঘাতের অভাব থাকায় নাটিকাখানি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। একমাত্র হেমার-মার চরিত্রটি উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।

রাজকন্যা : নাট্যোপন্যাস পিতাকে তাহার বিমাতার মোহ হইতে মুক্তি দিবার জন্য রাজকন্যার আত্মদান। নাটকের ঘটনায় দ্রুত পরিবর্তন চমৎকারিত্ব এবং অভিনবত্ব যথেষ্ট আছে। যাহাতে সাধারণের মনে একটি রেখাপাত করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে লেখিকার প্রতিভার সেই উজ্জলতা নাই। অপ্রত্যাশিত ঘটনা এবং প্রতিপদে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির মোহে

তাঁহার প্রতিভা ব্যয়িত হইয়াছে। মাতঙ্গিনী রাজকন্যা এবং গ্রন্থকুমার চরিত্র হিসাবে মন্দ নয়। নাটকের সংলাপ ভাল।

অতৃপ্তি নাট্যকাব্য; কাব্যের দিক দিয়া ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানুষের অতৃপ্তির বেদনা লেখিকা কাব্যের ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,

মুগ্ধাঙ্গ কাব্য নাট্য; কলিরাজার অত্যাচারে সমস্ত দেবগণ ধ্যানমগ্ন মহাদেবের শরণাপন্ন, মহাদেব ত্রিলোক ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভগবতীর পরামর্শে বিষুণু যুগ প্রবর্তন; নাটকের যাতপ্রতিঘাত অতিসামান্য গল্পাংশও স্পষ্ট নয়। কিন্তু নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় নন্দী ও ভৃঙ্গীর রসসৃষ্টি। এমন সূক্ষ্মভাবে রসসৃষ্টি করিতে যথেষ্ট সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব অনেকখানি নির্ভর করে, নাটকের অভিনয়পযোগী গুণের উপর। অবশ্য অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে অভিনয়ের দিক হইতে সাফল্য লাভ না করিলেও সাহিত্যে তাহা এক উজ্জ্বলতম তারকা রূপে রহিয়াছে, অতৃপ্তিকে আবার অভিনয়পযোগী নাটক সাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করে নাই। প্রথমটির উদাহরণ স্বরূপ Marlow's Tamberaine, রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর প্রভৃতি এবং দ্বিতীয়টির উদাহরণ Charley's Aunt, রবীন্দ্রনাথের বাঙীওয়ালী প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

স্বর্ণকুমারী দেবীর নাট্যকাব্য এবং কাব্যনাট্যে গীতি কবিতার প্রাধান্য খুব বেশী, অধিকন্তু সংলাপ (dialogue) কাব্যময় ও দীর্ঘ হওয়ার ফলে অভিনয়পযোগী হইতে পারে নাই। যে কারণে তাঁহার কাব্য উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সে কারণেই তাঁহার নাটিকা বা গীতিনাট্য উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই। তবে তাঁহার বসন্ত উৎসব এবং কনে বদল অভিনয়পযোগী হইয়াও সাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়া থাকিবে।

বিজ্ঞান: বাঙ্গালী জাতির প্রতি অসীম অনুরাগ স্বর্ণকুমারী দেবীকে বিজ্ঞান-সাধনার নিয়োজিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের আদিম জন্মভূমি বটে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মভূমি ইউরোপ। সুতরাং বাঙ্গালী যদি আধুনিক বিজ্ঞান শিখিয়া নিজের দেশের কাজে প্রয়োগ করিতে পারে তাহা হইলে বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইয়া তাদের আর থাকিতে হইবে না, প্রতিপদে বিদেশীর সাহায্য লইতে হইবে না।

‘পৃথিবীর’ ভূমিকায় তিনি এই কথাই বলিয়াছেন; ‘জ্ঞান চর্চার দ্বারাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হয়, বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে বুদ্ধিবৃত্তি সূক্ষ্মতা লাভ করে ও কল্পনা-সম্ভূত সিদ্ধান্ত হইতে আমরা মুক্তি লাভ করি, বদল ইহাই নয়, যদি জাতীয় উন্নতি করিতে হয়, যদি ব্যবহৃত স্রুতের বুদ্ধি করিতে হয় ত বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রয়োজনের গুরুত্ব বর্তমান না ভারতবর্ষীয়গণের অস্বাভাবিক প্রবেশ করিবে ততদিন আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতির আশা নাই। দরিদ্রতাই আমাদের উন্নতির পথের প্রধান বাধক, বিজ্ঞানের ক্ষমতা বলেই একমাত্র সে দারিদ্র্য মোচন হইতে পারে। এ দেশে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে তখন আমাদের আর অন্য জাতির উপর নির্ভর করিতে হইবেনা। কি শিল্প, কি বাণিজ্যে সকল বিষয়েই আমরা স্বপ্রধান হইতে পারি। আজকাল ইউরোপীয়গণ আমাদের এই রত্নগর্ভা ভারতভূমি আসিয়া আমাদের দেখাইয়া রত্নসকল লুণ্ঠিয়া লয়েন, আমরা যখন তাহাদের মত শিক্ষিত হইব তখন আমাদের আর একটা হৃদয়া থাকিবে না।...সেইদিন সর্বতোভাবে আমাদের উন্নতি হইবে, ধনে মানে যশে আমরা অন্ত স্নানভা জাতিদিগের সমবল হইতে পারিব।’

‘পৃথিবী’ কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি, যথা সৌরপরিবারবর্তী পৃথিবী, পৃথিবীর গতি প্রণালী, পৃথিবীর উৎপত্তি, ভূপৃষ্ঠের ভূগর্ভ এবং পৃথিবীর পরিণাম।

এক কথায় পৃথিবীর সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সহজ ভাষায়, অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত তিনি ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং মনীষা যে কতখানি ছিল তাহা এই পৃথিবীই পরিচয় দেয়। তাঁহার পূর্বে বাংলা ভাষায় এ জাতীয় কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতীতে সৌর জগৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাও যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচায়ক। সে যুগের শিক্ষাহীনতার যৌর অন্ধকারের মধ্যে বিজ্ঞানের স্বর্ণালোক জালিবার বাসনা এবং সাফল্য লাভ একজন বঙ্গনারীর পক্ষে যে কত বড় শক্তির এবং বৈদগ্ধ্যের পরিচয় তাহা বিশেষ ভাবে না বলিলেও বোধ করি চলে। বইখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে Statesman and Friend, of India বলেন: The writer brings a great research and vast information to bear

upon her book. The work does great credit to the writer. We have no hesitation in saying that this is the best book in popular astronomy and geology in Bengali language.

ভারতীর সাধনাই স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ সাধনা। সেদিন অন্তঃপুরে বসিয়া ভারতীর বীণায় যে স্বরের বঙ্কার তুলিয়া ছিলেন, তাহা হয়ত শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে স্বরের রেশে আজ সমস্ত আকাশ-গগন মুখরিত, তাহার মধুরতায় হৃদয় সানন্দে পরিতৃপ্ত। আমরা ভারতী পত্রিকার কথা বলিতেছি। একজন মহিলার পক্ষে এরূপ উচ্চাঙ্গের একখানা পত্রিকা দীর্ঘ দিন ধরিয়া পরিচালনা অত্যন্ত শক্তির কাজ; স্বর্ণকুমারী দেবী সেই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সে যুগে সাহিত্যরথী অনেক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কয়জন সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ উচ্চাঙ্গের পত্রিকা এরূপ দীর্ঘদিন ধরিয়া পরিচালনা করিতে! শুধুমাত্র অর্থবল থাকিলে হয় না, আগ্রহ থাকিলে হয় না, শিক্ষা থাকিলে হয় না, ইহার জন্য চাই অক্লান্ত সেবা, চাই অসীম উদ্যম এবং সাহস, অপরিসীম স্বার্থত্যাগ, আন্তরিক ভালবাসা। স্বর্ণকুমারী দেবীর এই সমস্ত গুণরাজি ছিল তাঁই তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীর জন্মের মাত্র কয়েক বৎসরের পর দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন সময়াভাবে ভারতী উঠাইয়া দিতে চাহিলেন তখন স্বর্ণকুমারী দেবী ইহার ভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করেন।

তিনি তখন বলিয়াছিলেন “আমাদের দেশের এবং বাদলা ভাষার বর্তমান অবস্থায় ভারতীর ন্যায় একখানি পত্রিকার অকাল মৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এইরূপ অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি।” ইহার পর সুদীর্ঘ আঠার বৎসর কাল (ছই বারে) ভারতীর সম্পাদনা করেন। যখনই ভারতী মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে তখনই স্বর্ণকুমারী মাতার ন্যায় তাহার সেবা করিয়া তাহার রোগ পাণ্ডুর মুখে জীবনী শক্তির উল্লাস আনিয়া তাকে আবার ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাতার এই অক্লান্ত সেবা ও স্বার্থত্যাগ ছিল বলিয়াই ভারতী এই দীর্ঘ দিন বাঁচিয়াছিল।

পত্রিকা হিসাবে ভারতী সেকালে অদ্বিতীয় ছিল। তাহার কারণ ইহার কতকগুলি নিজস্ব ধারা ছিল। ভারতীর ছিল অপূর্ণ

নির্ভিকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা যে উচ্চদের নয় তাহা ভারতীর সমালোচনাই প্রথম সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কথা তৎকালীন অন্যান্য পত্রিকার মত ভারতী দলাদির পক্ষিলতায় নিজেকে ডুবাঁইয়া বৈশিষ্ট্য হারায় নাই; শুধু তাহাই নহে, এ যুগের গীতিকাব্য ভারতীর কুঞ্জবনেই প্রথম ফুটিতে আরম্ভ করে, এ যুগের মৌলিক ছোট গল্প ভারতীর বীণায়ই প্রথম বঙ্কার দিয়া উঠে কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কথা যে ভারতী যত লেখককে গড়িয়া তুলিয়াছে এমন আর কেহ করে নাই, তাই জগদানন্দ রায় মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, মাতা যেমন শিশু পুত্রের অক্ষর পরিচয়ে সাহায্য করেন শ্রীমতি স্বর্ণকুমারী দেবী সেই প্রকারেই সাহায্য করিয়াছেন (ভারতী ১৩২৩) ভারতীতে স্বর্ণকুমারী দেবীর উৎসাহ এবং চেষ্টায় বাঁহারা লিখিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম আমরা এখানে দিতেছি,—বলেন্দ্র নাথ, সত্যেন্দ্র নাথ জ্যোতিরিন্দ্র, নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, স্নহীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নীলেন্দ্রকুমার রায়, রায় জলধর সেন বাহাদুর, অক্ষয় কুমার বড়াল, শ্রীশকুমার মজুমদার, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্র মোহন সিংহ, কৈলাস চন্দ্র সিংহ, হরিশাধন মুখোপাধ্যায়, প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, ইন্দিরা দেবী, গিরীন্দ্র মোহিনী দেবী, সরোজ কুমারী দেবী, নিস্তারিনী দেবী, শরৎ কুমারী চৌধুরাণী, অম্বরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, মনিলাল বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্র মোহন মুখো, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির নাম-উল্লেখ যোগ্য। সাহিত্যরসিক এই সব সাধকের মধ্য দিয়া স্বর্ণ কুমারী দেবী চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন।

সাহিত্যজগতে ভারতীর আসন যে কতখানি ছিল তাহা সে-যুগের একজন লেখিকার নিকট হইতে আমরা জানিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন “সেকালে ভারতীর মত পত্রিকা বড় বেশী ছিল না এবং ভারতীর স্থান মাসিক সাহিত্য জগতে প্রধান ছিল। মহিলা দ্বারা সাহিত্য রচনা করা দূরে থাকুক তখন মহিলা পত্রিকার সংখ্যা বিরল ছিল বলিলেও চলে। এমন সময়ে শ্রীমতি স্বর্ণ কুমারী দেবী ভারতীর সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ করিলেন। সেই সময় আমার মনে হইল, একদিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ্যাশাসন দণ্ড হাতে লইয়া জগতে রমণীর গৌরববর্দ্ধন করিতেছেন আর একদিকে আমাদের ক্ষুদ্র বাংলা দেশের সাহিত্য

শাসনদণ্ড হাতে লইয়া স্বর্গকুমারী আমাদের বঙ্গরমণীর মুখ
উজ্জ্বল করিতেছেন। (নিস্তারিণী দেবী, ভারতী ১৩২৩)

সুদীর্ঘ কাল সম্পাদনার পর অবসর কালে তিনি বাহা
বলিয়াছিলেন তাহা এ বিষয়ে প্রনিধান যোগ্য : স্মৃতি সুশীল
সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ও মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করাই
ভারতীর প্রধানতম কর্তব্য ছিল, আত্মশুদ্ধি একটি ক্রতব্য ছিল
নূতন লেখকদিগকে গড়িয়া তোলা।.....যখন এই সম্পাদন
ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন ফলাফল লাভক্ষতি গণনা করিয়া
ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। কর্মের আনন্দই কর্মে উত্তেজিত
উৎসাহিত করিয়াছিল। আজ সে উৎসাহ উত্তেজনার দিন
ফুরাইয়া গিয়াছে.....আজ শ্রান্তক্লান্ত দেহমন একান্তই নিরুত্তি
লোলুপ। কিন্তু প্রবৃত্তিতে আনন্দ আছে, নিরুত্তিতে কি নাই?
দানের তৃপ্তি কি গ্রহণের তৃপ্তি হইতে অল্প? পূজার মাহাত্ম্য
কি বিসর্জনেই ঘনীভূত নহে? বস্তুতঃ ত্যাগের মধ্যেই মুক্তির
আনন্দ বিরাজিত। ব্রত গ্রহণ করিয়া আমি যে উদ্‌যাপনে
অবসর পাইলাম, ইহাই আমার কর্মের প্রকৃত পুরস্কার।”

দেবী ভারতীকে বন্দনা করিয়া স্বর্গকুমারী দেবী একদিন
গাহিয়াছিলেন :

ওগো কমল-আসনা, রঞ্জিনী-বীণাপাণি।

আমি কাহারেও আর জানি না, ভারতি

তোমারেই শুধু জানি।

ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা

জানি না প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা—

তোমারি পর্বে অর্ঘ্য রচিয়া

জীবন ধন্য মানি।

আমি জানি না তঁহা ভাল কি মন্দ,

বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ,

শুধু প্রীতি পূরিত পরমানন্দ

তোমারি চরণে দানি।

আমি না চাহি অন্য বিভব স্বাদি

চাহিনা মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি

তোমারি প্রসাদ লভিবার সাধ

• • তোমারি অমৃত বাণী।

তঁহার এই সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।
বঙ্গ সাহিত্যের কমলবনে যে ফুল তিনি সবলে ফুটাইয়া
গিয়াছেন, আজিও তাহা স্নান না হইয়া স্তবাস ছড়াইতেছে।
তিনি বলিয়াছেন, পূজার আয়োজনে ফুলমালা হইতে রত্নমালা
গাঁথিয়াছি; জানি না সে ফুল পারিজাত না অপরাজিতা, সে
রত্ন হীরকমণি না কঙ্কর সে বিচার আজি তোমরা কর;
ভারতীকে মাল্যভূষিত করিয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি
আমি শুধু তাহাই জানি।

বাঙ্গালী যদি আজও সে বিচার না করিয়া থাকে বা এই
স্বল্পকালের মধ্যেই তাহাদের শ্রেষ্ঠ লেখিকাকে ভুলিয়া গিয়া
থাকে, তবে বলিব, বাঙ্গালী একটি অস্বাভাবিক জাতি।

ক্ষণিকা

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

নয়নে তোমার শফরীর চপলতা

গতি নৃত্যের বিদ্যুৎ বল মল—

আমার নয়নে বালকের বিহ্বলতা

কৈপে কৈপে উঠে মোর সরসীর জল।

উতল চেউয়ের—আবেগ বিধুর বণী

সরসী মুখর শুনি সেই কানাকানি

নয়নে জড়িত মরমের শতদল।

রবির প্রসাদ শশীর সুষমা মাখি

তুমি রহ সখি ক্ষণেক অচঞ্চল

হৃদয়ে আমার ক্ষণেক বুঝিয়ে রাখি

স্থির করি আঁখি ছলছল টলমল।

তব আলোখ্য অচপল থাকে নাকো

ছরাশ ললনে!

মিনতি, ক্ষণেক থাকো।

অন্ধ-প্রেম

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

আট

ব্রজেশ্বরের বাড়ীর সম্মুখে যে বাগান, তাহার অপেক্ষাও সুন্দর বাগান বাড়ীর পশ্চাৎভাগে। পুষ্করিগীর দুই পার্শ্বে দুর্বাদল শোভিত দুই খণ্ড জমি—দেখিতে সবুজবর্ণ কার্পেটের মত। সেই জমির চারি পার্শ্বে নানা প্রকার ফলের গাছ। তাহারই অদূরে কেয়ারী করা ভূখণ্ডে নানাবিধ ফলের গাছ, মধ্যে মধ্যে লতামণ্ডপ। সব জী-বাগান পুষ্করিগীর উত্তর দিকে। মর্মর প্রস্তর নির্মিত কয়েকটি সুন্দর মূর্তি বাগানের শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। ছেলে-খেলার ছোট ছোট পাহাড়, স্বর্ণা প্রভৃতি বাগানটার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক। পুষ্করিগীর জল স্বচ্ছ কাচ সদৃশ। বাপীতটে সবুজ তৃণ ও নানাবর্ণের পুষ্প গুচ্ছে অতুল শোভা।

সেই বাগানের একটি মর্মর-বেদীর উপরে উপবিষ্ট রত্নমালা ও কিশোর। সমরটা—অপরূহ। অন্তর্মিত সূর্য্যের রক্তিম আভা তখনো উচ্চশির বৃক্ষপ্রভাগে ছড়াইয়া আছে। বিহগ কুলের কলকাকলীতে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে সেই সবেমাত্র।

এমন সৌন্দর্য্য উপভোগ্য করিতে পারে নাই সেই অন্ধ কিশোর কিশোরী। সেই কথাই তাহাদের মধ্যে হইতেছিল। কিশোর বলিল—

“ও হুংথ ক’রে লাভ নাই কিছুই। যা’ পাওয়া যায় না, তা’র জন্ত হুংথ করলে, হুংথ বাড়ে অকারণে। এর চেয়ে শোঁনা-কথায় বতটুকু আনন্দ, সেই আনন্দটা ভোগ করাই ভাল।”

“ঠিক বলেছ কিশোরদা। বাবার মুখে শুনে শুনেই এই আনন্দ এতদিন ভোগ ক’রে এসেছি। কোন্ ফুল কেমন ক’রে ফোটে, কোন্ পাখী কেমন ক’রে ডাকে, নদী কেমন ক’রে ব’য়ে যায়, পাহাড়ের রূপ কি—কত উঁচু, কি সব থাকে সেখানে, চন্দ্র-সূর্য্য-তারকায় আকাশের কেমন শোভা, বৃক্ষ-লতা-আকাশ-প্রান্তর, জীবজন্তু প্রভৃতির সকল কথাই আমার মনের চোখের সামনে ধ’রে দিতেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সকল সময়ে কাছে

থেকে সুন্দর-অসুন্দর সবই আমাকে চিনিয়ে দিয়েছেন বাবা। এমনি ক’রেই কেটে গেল বছর পোনের।”

“তুমি ভাগ্যবতী, তাই অমন বাবা পেয়েছ। আমিও যা’ কিছু শিখেছি, সব আমার মায়ের কাছ থেকে। দেখ রত্ন, অন্ধ আমরা সবই দেখি মনের চোখে। কিন্তু একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি না—আমরা। কারণ সেটা আমাদের মনের চোখে কেউ ধ’রে দেয় নাই।”

“কি বলত কিশোরদা?”

“না—সেটা আর বলব না। বললে জ্যাটাইমা হয়ত রাগ করবেন। আমাকে তিনি ত ভাল চোখে দেখেন না।”

“কেন কিশোরদা, বাবা ত সব মিটমাট ক’রে দিয়েছেন। তোমার এখানে থাকা সম্বন্ধে কেউ আর কোনো কথা বলতে পারবে না—মা’ও নয়।”

“সেটা ত হ’ল দয়া। অন্ধকে তা’র বাপ্ একজন ভদ্র-লোকের স্বন্ধে চাপিয়ে দিয়েছেন ব’লে, ভদ্রলোক দয়া ক’রে আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছেন; কিন্তু তা’ই ব’লে তোমাতে-আমাতে সমান স্তরে থাকা চলেনা ত।”

“চলতেই হ’বে, কেননা, তোমাকে আমার ভাল লাগে। আমার কেমন মনে হয়েছে, তুমি যেন আমার কেউ, আর আমিও যেন তোমার কেউ। দুই অন্ধে গল্প স্বল্প ক’রে আমরা বেশ আছি কিশোরদা। সেই আনন্দটার মাঝে মাঝে তুমি অমন ক’রে বাধা দাও কেন বলত?”

“তা জানি না। তবে এটা জানি, একদিন-না-একদিন এখান থেকে আমাকে যেতেই হ’বে। তা’তে তোমারও হুংথ, আর আমারও হুংথ। চ’লে গেলে তোমার কণ্ঠস্বরই শুধু আমার স্বরণে থাকবে। রূপত আর মনে করতে পারবো না, দেখি নাই ব’লে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়—যদি এক মুহূর্তের জন্তও তোমার-আমার দেখাদেখি হ’য়ে অনন্ত কালের জন্তও আবার অন্ধ হ’য়ে যাই, তা’তেও আমার অনন্ত স্বপ্ন।

তোমার কথা বলতে পারিনা অর্থাৎ, আমার কথাই আমি বললাম।”

“কি বলছ, কিশোরদা! আমাদের ছাড়াছাড়ি হ’তে যা’বে কেন? তা’র পাকাপাকি ব্যবস্থা বাবাই ক’রে দিয়ে যাবেন, দেখো তুমি। থাক্গে সে তুচ্ছ কথা। ভগবানের সখ্কে কি বলতে বলতে থেমে গেলে তুমি?”

“কি বলছিলাম, ঠিক মনে নাই। তবে চাঁদুদার মুখে শুনেছি, ভগবানের ছোট ছোট অংশ আমরা; স্তূতরাং আমরাও ভগবান।”

“ভারী মজার কথা ত! এ যদি সত্যি হয়, তবে কোনো মানুষই কোনো দিন কোনো অস্ত্রায় করতে পারবেনা ত। কারণ, ভগবান কখনো অস্ত্রায় করেন না। বেশ হয়েছে—মা, দাদাদের ও বৌদিদিকে বলব—ওগো তোমরাও ভগবানের অংশ, খবরদার, কখনো কারো উপর অস্ত্রায় করোনা আর। আচ্ছা কিশোরদা! তা’তেও যদি কেউ অস্ত্রায় করে, তা হ’লে কি হ’বে?”

“ওর জবাব আমি ত দিতে পারবনা রতু। ও কথা বলতে পারেন চাঁদুদা।”

“বেশ, কিন্তু আর একটা কথাও ঐ সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে হ’বে কিশোরদা। জিজ্ঞাসা করো ত ভগবানকে কেউ দেখতে পায় কিনা?”

“আরে নাও কথা! সেটা ত তিনি আগে ভাগেই ব’লে দিয়েছেন। চাঁদুদা বলেন কি জান? এই একজন মানুষ যেমন আর একজন মানুষকে দেখে, ভগবানকে আমরা ঠিক সেই ভাবে দেখতে পাই দেখবার জোর ইচ্ছা তেমন থাকে যদি।”

“তা হলেই ত মুন্সিল কিশোরদা! অমন জোর-ইচ্ছা হওয়া ত ভারী শক্ত। তা’র উপর আমরা হলাম অন্ধ; দেখব কি ক’রে?”

“সে কথাও আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক’রেছিলাম। বলেন—বাহির-চোখের চেয়ে অন্তর-চোখে ভগবানকে আন্টো ভাল ক’রে দেখা যায়, বুঝা যায়, চেনা যায়।”

“বেশ মজার কথা ত! তা হ’লে তুমি-আমি এইবার এক সঙ্গে ব’সে ভগবানকে খুব জোরে ডাকব, আর ভাবতে ভাবতেই তাঁকে পেয়ে যা’ব, মনের চোখে দেখে নেব। বলত,

বলত, তোমার সেই কবিতাটা কিশোরদা। সে কবিতার সঙ্গে চাঁদুদার কথার অনেক মিল হয়। আচ্ছা, কিশোরদা, চাঁদুদার সঙ্গে তোমার এত কথা কখন হয় বলত?”

“তা জান না বুঝি! আমি যে নিত্য তাঁ’র কাছে যা’ই লুকিয়ে লুকিয়ে। তাঁ’র আশ্রমে অন্ধদের তিনি বিদ্যালয় করেন। ছেলে-মেয়ের দল জড় হয় খুবই সেখানে।”

“কৈ, তুমিও কিছু বল নাই, আর বাবাও নয়—কেন বলত?”

“আমি যা’ই সেখানে লুকিয়ে—জ্যাঠাইমার ভয়ে। চাঁদুদা লোক এসে নিয়ে যায় সেখানে আমাকে। আর তোমার কথা—

• বঙ্গগম্ভীর স্বরে মাধবী পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—“রতু!”

রতুময়ী একটুও ভয় না পাইয়া উত্তর দিল—“কি?”

• মাধবী বলিল—“সন্ধ্যার পরে তুমি যে এখানে—আর কিশোরের সঙ্গে? ভেবেছিলাম কি?”

রতুময়ী ব্যগ্রতার সহিত বলিল—“আর তুমি আমাকে বকা-ঝকা করতে পারবে না মা, ভগবানের অংশ তুমি! তুমি অস্ত্রায়টা করতেই পার না। হাঁ কি না, কিশোরদাকে বঙ্গ জিজ্ঞাসা কর।”

চাৎকার করিয়া উঠিয়া মাধবী বলিল—“খাম্ বেয়াদব মেয়ে! লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ব’সে আছিস কত্তার আব্দারে আর দ্যাখ্ কিশোর, ক্ষেপ যদি তোকে রতুর সঙ্গে এমনভা আত্মীয়তা করতে দেখি, গলা টিপে তোকে বাড়ী থেকে বাণ ক’রে দিব যে, এটা স্থির জেনে রাখিস—হাঁ।”

রতুময়ী খুব গম্ভীর ভাবে বলিল—

“বাবা কি ব’লে দিয়েছেন তোমাকে, তা বোধহয় তোমার মনে আছে মা! তা’র ওপর তুমি ভগবান কি ভগবতী’র অংশ। তোমার মুখ দিয়ে অমন সব পচাল কথা বেরোর কেন ক’রে বলত?”

বিকৃত কণ্ঠে মাধবী বলিল—

“ওসব শ্রাকামীর কথা রাখ তুমি। ভগবান-ভগবতী ক’রে মাথা ধরিয়ে দিল তুমি বেয়াদব কোথাকার। তারপর কত্তার কথা! ওসব আমি মানিনা। অমন উপদেশ হানা চের শুনেছি। শুনে শুনে বিরক্ত হ’য়ে পড়েছি।”

রতুময়ী বলিল—

তা’ না মান, নাই মানলে। তুমি বাবার কথা না মান,

আমিও মানবনা তোমার কথা। ব্যস, শোধবোধ হ'য়ে যাবে।”

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মাধবী বলিল—

“কি বললি, কি বললি পোড়ারমুখী? কিলিয়ে মুখ ভেঙ্গে দিব যে, তা বুঝি জানিসনে?”

সে কথার উত্তরে রত্নমালা হাসিতে হাসিতে বলিল—

“তা তুমি পারবেনা মা। যাইহোক, শোন বলি

তোমায়। বাবাকে চিনে ভগবানকে চেনবার পথে দাঁড়িয়েছি আমি। তুমি বুখাই ভয় দেখাচ্ছ আমাকে।”

মাধবী স্তম্ভিত হইয়া গেল। রত্নমালাকে কোনো কথাই আর বলা চলিল না মাধবীর।

[ক্রমশঃ

লক্ষ্মীর বাঁপি

“বিদ্যাসাগর” বললে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বুঝায়, হীরেন্দ্রনাথ বললে তেমনি বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভিন্ন আর কা'কেও মনে পড়ে না ব'লেই বাংলা তথা সারা ভারতের মনীষিবৃন্দের ধারণা। যে যুগে পি, আর, এস, হওয়া অ-সহজ ছিল, তিনি সেই যুগের পি, আর, এস। এটর্নী হিসাবেও তিনি স্প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম-বিদ্যায় তাঁ'র জন্মগত অধিকার। এই অধিকার নিয়ে পণ্ডিত-সমাজে তিনি সমাদৃত হ'য়েছেন। স্থায়ী-সাহিত্যে তাঁ'র দান অতুল্য। স্বভাবসিদ্ধ সাহিত্যিক-দানবীর যে কয় খানি অমূল্য গ্রন্থ আমাদের দান করেছেন, “প্রেম-ধর্ম” তাঁ'র মধ্যে অন্ততম। “প্রেম-ধর্ম”র সাবলীল ভাষা, ভাব-সম্পদের অল্পরূপ। কিন্তু মুষ্কিল এই, ভাষা সহজ সরল হ'লেও শাস্ত্র-জ্ঞান না থাকলে “প্রেম-ধর্ম” বুঝা কঠিন। উপন্যাস-প্লাবিত বাংলা দেশে এ গ্রন্থের করজ্ঞান পাঠক হ'বেন, সেটা ঠিক ক'রে বলা খুবই হুঃসাহসের কায। তথাপি বলব— এমন সব গ্রন্থ বাঙ্গালীকে পড়তে হ'বে, আর এই শ্রেণীর গ্রন্থই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে রাখতে হ'বে। প্রাচীন ঋষিদের মধুকরা মধুবিদ্যা দত্ত হীরেন্দ্র অপক্লপ কৌশলে প্রচার করেছেন, বাঙ্গালী জাত টাকে প্রবুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন! এই কারণেই তিনি সমগ্র জাতির ধন্যবাদের-পাত্র। বৈষ্ণব-পদাবলীর যৎসামান্য পুঁজিপাটা নিয়ে ষাঁ'রা কারবার করেন, পুঁজি বাড়ানোর জন্য “প্রেম-ধর্ম” তাঁ'দের চির-শিক্ষণীয়। পরম ভাগবত হীরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণের আসন পাবারই যোগ্য। এ আসন একদিন রাজা প্যারীমোহন

মুখোপাধ্যায় হীরেন্দ্রনাথকে যখন দিবার প্রস্তাব করেছিলেন তখন “প্রেম-ধর্ম” প্রচারিত হয় নাই। রাজা প্যারীমোহন আজ জীবিত থাকলে “প্রেম-ধর্ম” পাঠান্তে হয়ত প্রস্তাবটা তিনি কাষে পরিণত করবার চেষ্টা করতেন। “প্রসাদ-কবি” রচিত “ক্যালিস্পিংএ নিমন্ত্রণ” পুস্তিকায় সে বিষয়ের ইঙ্গিত আছে। “প্রেম-ধর্ম” গ্রন্থের কথায় অনেক পুরাতন কথাই আমাদের মনে পড়ে। গ্রন্থখানির সমালোচনা বিশদভাবে করবারই আমাদের ইচ্ছা থাকল।

কলিকাতা-অন্ধ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা লোকান্তরিত লালবিহারী সাহ মহাশয়ের পৌত্র এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার সাহর পুত্র শ্রীমান অমল কুমার সাহ আমেরিকা যাত্রা করেছে। শ্রীমানকে হয়ত একদিন এই অন্ধ-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হ'বে। স্বতরাং এই সময় থেকেই ও বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবার প্রচেষ্টা ভাল। অন্ধ-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এরূপ স্থলে অন্ধজনের মঙ্গলে সুশিক্ষক তৈরী করার চেষ্টা, বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়। ষাঁ'রা শ্রীমানকে আমেরিকা পাঠালেন এবং ষাঁ'রা তাকে সাদর আহ্বানে নিয়ে গেলেন আমরা তাঁ'দের ভূয়সী প্রশংসা করি। যোগ্যতা-চিহ্নিত হ'য়ে শ্রীমান সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে দেশে ফিরে আসুক এবং দেশ-মাতৃকার সুসন্তান বলে পরিচিত হোক, এই আমাদের আশীর্বাদ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্মকর্তা মিষ্টার জেসি মুখার্জিকে “nature's gentleman” বলেই আমরা জানি। তাঁর উপর তিনি কর্মকুশল ব্যক্তি। তাঁর কর্মকুশলতায় কর্পোরেশনের কায়স্থচাকরুপেই সম্পন্ন হয়ে আসছে বহুকালাবধি। এ সত্ত্বেও কর্মকর্তার ক্ষমতা যে কি কারণে খর্ব করা হয়েছিল, বিধাতা পুরুষই সে কথা বলতে পারেন। কর্মকর্তার উপর কড়াকড়ি করায় আফিসের কায়ে নানা অস্থবিধা ও বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল বলেই অনেকে ধারণা ও বিশ্বাস। বিবেকী লোকের চেষ্টায় কর্মকর্তার লুপ্ত শক্তির কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার হয়েছে শুনে আমরা আশ্বস্ত ও আনন্দিত হ’লাম। পূর্ণশক্তি তিনি ফিরে পেলেই আমরা অধিকতর আনন্দ লাভ করতাম। তাঁর পাপ কোন্‌খানে, জানিনা; কিন্তু পাপ করলেই যে প্রায়শ্চিত্তের কড়ি একদিন গ’ণে দিতে হয়, এটা জানি ও বিশ্বাস করি। ধর্মের জয় চিরদিনই—এটা অবিংবাদী সত্য। এই সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তব্য পালন করে তাঁর পদের গৌরব বর্দ্ধন করুন, এই প্রার্থনা। প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী ও পরোক্ষে কার্যহস্তারকগণের উদ্দেশে “মানস কুঞ্জের” কবির ভাষায় বুক ফুলিয়ে মুখোপাধ্যায় বলতে পারেন—

“তুষ্ট হও, কষ্ট হও, রহিব হেথায়
যতদিন কর্ম-সূত্র ছিঁড়িয়া না যায়।”

এ বৎসর প্রথম কিছুদিন অনাবৃষ্টির পর অতিবৃষ্টি, জলপ্লাবন ও ঝড়ে সারা বাংলা দেশে খণ্ড প্রলয় হয়ে গেল। অসংখ্য নর-নারী এই প্রলয়-পয়োধি জলে হয়েছে গৃহহীন—মৃত্যুমুখেও পড়েছে অনেকে। জীব জন্তুর ত কথাই নেই। বৃক্ষাদি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে বহু স্থলে। শস্তাদির ক্ষতি যে ভাবে হয়েছে, তা’তে মনে হয়, দুর্ভিক্ষটা সুভিক্ষা বাংলার দ্বারে উপস্থিত হ’ল বলে। মহামারীর করাল বদন বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব নয়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—অশান্তভাবে এমন বৃষ্টি জীবনে তিনি আর কখনো দেখেন নাই। “জলপ্লাবন” উপন্যাসে বর্ণিত প্লাবন-

কাহিনী এবারকার প্লাবনের কাছে হার মেনেছে বলে শুন যাচ্ছে। বাংলার ভাগ্যাকাশ সকল দিকেই ঘন ঘটাচ্ছ। বাংলার মানুষ এখন চাকরী-স্থলে চাকরী পায় না, ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমল পায় না, চাম-বাস জমীদারি প্রভৃতি থেকে আয় করতে পারে না। তাঁর উপর ভগবানের মার—এই ভীষণ বণ্ণ। এ অবস্থা দেখেও বাদ্দালী আপনাআপনি বিদ্রবিসম্বাদ করে, পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করে, পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গুজ-ঘোষণা করে—এটা কত বড় লক্ষণ ও স্ফোভের কথা!

“আমাদের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ বায় সম্পাদিত “স্পোর্টস ও ক্রীন্” সাপ্তাহিক পত্রখানি গুণাই “বেঙ্গল লন্টেনিস এসোসিয়েশনের” মুখপত্র নহে, পত্র রীতিমত “Official organ”। বিগত এই অগাধের কাগজখানি আমরা পেয়েছি ও পাঠ করে খগেন্দ্রকে “দারোগা হ’ও” বলে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু নানাবিধ ভেবে থামা খেয়ে যেতে হ’ল। “বেঙ্গল লন্টেনিস এসোসিয়েশনের” official organ” এর সঙ্গে “Screen” থাকার আবশ্যকটা ঠিক বুঝে উঠতে পারা গেল না। পত্রখানিতে কেবল স্পোর্টস এর কথা থাকলেই আমরা হ্রীত হতাম। কারণ, “বেঙ্গল লন্টেনিস এসোসিয়েশনের” মুখপত্রখানির লেখার ভঙ্গী ভাল এবং তাহা পাংক্তে। বিদেশী খেলার পরিবর্তে হাড়ডু প্রভৃতি দেশী খেলা দেশে পুনঃপ্রচলিত করার চেষ্টা করলে শ্রীমান খগেন্দ্র অনেকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। খিঁয়েরটার বা পরদার ছবি দেখে স্বাস্থ্যোন্নতি করা সম্ভবপর নয়। বাংলার ঘরে ঘরে এখন স্বাস্থ্য সবল দেহ নরনারীর বিশেষ আবশ্যক হ’তে পড়েছে। খেলা-ধুলায় আমরা আমাদের পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারি বলেই অনেকে বিশ্বাস। স্তত্রায় ক্রীন্দা গুটিয়ে রাখতে চাই আমরা আপাততঃ।

বাংলা ভাষাটাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃক বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছেন বলে, কেহ কেহ রটাচ্ছেন—উচ্চশিক্ষিত কোনো বাদ্দালীই স্বজন স্বগণ ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ও ভাষায় পত্র-ব্যবহার করেন না। আমরা এ কথা

তীব্র প্রতিবাদ করি। আমরা জানি—শ্রাব্ মন্থ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীমাদ্রাসাদ মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রাব্ বিজয়চন্দ্র মহত্ব, বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এটর্নিপ্রবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সাহ, কাব্‌মাইকেল্ কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার মণীন্দ্রনাথ বসু, অবসরপ্রাপ্ত শ্বেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাণীর বর-পুত্রগণ তাঁদের এক কবি-বন্ধুর সহিত খাটী বাংলা ভাষাতেই পত্র-ব্যবহার করেন এবং সে সকল পত্রের অনেকগুলি স্থায়ী-সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। যেটুকু আমরা অবগত আছি, সেইটুকুই বলা গেল মাত্র। আরো কত শত মনীষির মধ্যে এভাবে পত্র-ব্যবহারের চল আছে, তাঁর ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। অতীত যুগে যে সকল উচ্চশিক্ষিত মহাত্মা বঙ্গবাণীকে বঙ্গের বাণী বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে বাণীকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করেছেন, প্রাতিঃস্মরণীয় শ্রাব্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরবের আসন দিয়ে গেছেন, ডক্টর শ্রীমাদ্রাসাদের প্রযত্নে যে ভাষা মহাবিদ্যায়তনে প্রবর্তিত, সে ভাষার বিরুদ্ধে অমন গুপ্ত অভিযান চলবে না কোনো মতেই। মিথ্যার রটনাটা স্ফার্প্রণোদিত বলেই মনে হয়। কিন্তু অরসিকেষু জনেযু রসস্ত নিবেদনং শিরসি মা লিখ—মা লিখ—মা লিখ।

—৭—

গান গেয়ে মানুষকে যেমনটা বশ করা যায়, এমনটা আর হয় না কিছুতেই। সেই গান-গাওয়া মানুষটা যদি আবার তালে “জল উঁচু নীচু” বলতে পারে, শক্তিমানের সেবা করতে পারে, শক্তিমানের করুণায় তাঁর প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই সকল সেবক স্বার্থান্ধ হয়ে অহংএর প্রভাবে যে সৈরাচারী হয়, এমনটা প্রায়শঃই দেখা যায়। দিন পেয়ে তাঁরা দীনবন্ধুকেও ভুলে যায় এবং তাঁরাই হয় কংসের অপেক্ষাও অত্যাচারী। এই জাতীয় একটা গব-চন্দ্রের অপূর্ব কাহিনী জনরবের জিহ্বায় বিঘোষিত হচ্ছে।

কাহিনীটি একটা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পর্কে। গান-গাওয়া স্তাবকটি ছিল এক কালে সেই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। সত্যাসত্য নির্ণীত হ'লেই মানুষটির কাহিনী আমরা প্রকাশ করব।

—৪—

সরকারী-কাজের পর পঞ্চায় বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণান্তর আর কোথাও কাজ করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে একটু আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। এ বিষয়ে আন্দোলন বাড়বে বলেই মনে হয়। এমন আন্দোলন হওয়া উচিত কিনা, সে বিষয়ে অনেকেই আমাদের প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে এইটুকু বলা যায়, ষাঁদের স্বাস্থ্য অটুট, কাজের খাতিরে কাজ করা ষাঁদের অভ্যাস, ক্ষমতার ষাঁরা অপব্যবহার করেন না, তাঁরা যদি অবসর গ্রহণ করেও চাকুরী-ক্ষেত্রে “পুনশ্চ” করেন, তা'তে তত দোষ হয় না। কিন্তু কলপের জোরে, স্তবপাঠ করে, দলাদলির শক্তিতে ষাঁরা “শ্রীবিশু” করেন আর চাকুরীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই হা-আ-কা চালান, তাঁদের অর্ধ-চন্দ্রের ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। কয়েকটি এমন “মনিষ্যার” কথা আমরা জানি, ষাঁরা এই প্রকৃতি নিয়ে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে মানবতার অমর্যাদা করেছে। ধর্মের ঢাক একদিন না-একদিন বাজবে অবশ্য। এরূপ ক্ষেত্রে আপাততঃ আমাদের কোনো কথা না বলাই ভাল।

—৫—

যুদ্ধ-মেঘ প্রতীচ্য-আকাশে ঘনীভূত হচ্ছে। গর্জ্জন ত চলছেই, বর্ষণও বিলম্ব হবে না, রাজনৈতিক জ্যোতির্কোভাদের এইরূপ ধারণা। আমাদের কিন্তু মনে হয়, এ কাল-মেঘও কেটে যেতে পারে। না কাটলেই সারা বিশ্বে দারুণ বিপদ। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগেও যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ চলতে পারে, সেটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে “গরজ্জ্কা নেহি লাজ”। সেটা স্বতন্ত্র কথা অবশ্য।

—৬—

অসহ্য সহ্য করবার শক্তি নারীর মত যে পুরুষের নাই, এ কথা বললে অতিশয়োক্তি হয় না বোধ হয়। প্রাচ্যে

ও পাশ্চাত্যে নারী সম্বন্ধে ঐ একই কথা। এ শক্তিটা নারীর স্বভাবজাত। সম্প্রতি একটা মহীয়সী মহিলার ঐরূপ অদ্বৈত সঙ্কল্পের কথা শুনা গেছে চন্দ্র কলিকাতা হৃদয় রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন থেকে। ৬লক্ষ্মী পুত্রের দিন ফলাদি কাটতে গিয়ে শ্রীমতী নয়ন মঞ্জরীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের শিরা কেটে যায় ভীষণভাবে। স্বস্তোপচারের আবশ্যক হয় তা'তে। ডাক্তার আর কে চক্রবর্তী বলেছিলেন—ক্রোরোফর্ম না ক'রে হাতের চেটো প্রতৃতি ষ্টিচ করা চলবে না।" রোগিণী ক্রোরোফর্ম করতে বিশেষ ভাবে নিবেদন করেন এবং মুখ এতটুকুও বিকৃত না ক'রে ডাক্তারের ছুরী, কাঁচি, স্কেল প্রভৃতির সাহায্যে আত্মরিক রক্তের "কোড়াফুড়ি"র উপদ্রব সঙ্কল্পে অপূর্ণ সহ্যপূর্ণের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু ওতেই সহ্য-পূর্ণের শেষ করেন নাই তিনি; গৃহস্থালী-কর্ম, পুত্র-কন্যার আহাঙ্গাদির দিকে লক্ষ্য রাখা, নিয়মিত স্বামী সেবা, নিত্যকর্ম যথাযথরূপে প্রকল্পচিত্তে করায় সে দিনও ব্যতিক্রম হয় নাই তাঁর। অথচ তিনি ধনিকের প্রপৌত্রী, ধনিকের পুত্রবধূ এবং ধনীর পত্নী। তাঁর সংসারে দাসদাসির সংখ্যা যথেষ্টই। সতী-সম্বিত্তির দেশে এমনটা হওয়া স্বাভাবিকই। কিন্তু অধুনা প্রগতির যুগে এ আদর্শ বিরল হ'য়ে আসছে। সেই কারণেই এই সামান্য জিনিষটারও উল্লেখ করলাম আমরা এমন ভাবে। নির্ধনের সংসারেও একালে বিলাসিতার উপদ্রব ভীষণভাবে বেড়ে উঠেছে, অশিক্ষা, কুশিক্ষার বহু শাস্তির সংসারে অশান্তি প্রবেশ ক'রে "সাজান বাগান" শুকিয়ে দিচ্ছে। শ্রীমতী নয়ন মঞ্জরীর দৃষ্টান্তে অশান্তি-সাহাঙ্গায় শাস্তি-তরু মুঞ্জরিত হ'য়ে "ওয়েসিস্" গ'ড়ে উঠে, এই আমাদের প্রতিনিয়ত কামনা।

— — —

"অল ইণ্ডিয়া রাইডিং ইন্সটিটিউটের" অক্সান্তকর্মী পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য কলিকাতায় ইন্সটিটিউটের সুপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে অর্থসংগ্রহের জন্য বিশেষ উদ্যোগী। ডক্টর শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার জে. সি. মুখার্জি, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত নির্মল চাঁদ বড়াল প্রভৃতির সঙ্গে দেখা ক'রে গেছেন তিনি। অর্থ সম্ভবতঃ রাজধানী থেকে সংগ্রহ করা পণ্ডিতজীর পক্ষে খুব কঠিন হ'বে না। কিন্তু

পণ্ডিতজীর জানানর দরকার—বাহালীর ছেলে-মেয়েদের তা'তে সুখ-সুবিধা কতটা? সর্বজনবরণ্য পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের ভ্রাতৃপুত্র পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য বিবেকী ব্যক্তি। সমস্রাটার সমাধান করা তাঁর পক্ষে কঠিন হ'বে না ব'লেই মনে করা যেতে পারে।

— — —

অকাল জনদেহের মত বছর তের চৌদ্দ পরে স্রাজ-গির্জা বাভারের মালিক স্বর্গত ব্রজনাথ দাসের সহসা স্মৃতি-সভা হ'য়ে গেল। এ 'সহসা'র কারণ স্মৃতি-সভার কল্প-পক্ষই স্বলুতে পারেন। দাস মহাশয়ের পৌত্রাদি ও অন্যান্য স্বগণ স্বজনেরা বহু চেষ্টা ক'রে "প্রসাদ-কবির" কাছ থেকে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়ে নিয়ে গিছিলেন, সে পত্র যদি ছাপার অক্ষরে বাহির হ'ত, তা হ'লে "সাধারণ" এ "সহসা"র কারণ "কম" করতে পারত। কিন্তু সেটা একটা নিগূঢ় কারণে অপ্রকাশিতই র'য়ে গেল। সে যাই হোক, ব্রজনাথ দাস যে একজন ভগবৎ বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন এবং দান-ধর্মে যে প্রকার তাঁর আস্থা ছিল, তাতে যে তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন এবং চির-শান্তি ভোগ করছেন, সেটা মৃত্যুর মতই সত্য। স্মরণীয় ব্যবসায়-বুদ্ধির জোরে দাস মহাশয় সামান্য থেকে অসামান্য হ'য়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা হ'য়েছিল নিজেই শক্তিতে। বিলাসিতা-বর্জন তাঁর ছিল প্রথম কথা। এখনকার যুগে জীবিত থাকলে মেয়েদের কাপড়-চোপড়ের বস্তা, সাবান-পাউডার, স্নো, গন্ধদ্রব্য, প্রভৃতির পাহাড় দেখে তিনি বোধ হয় পাগলই হ'য়ে উঠতেন। তারপর গানে সজ্জাত বংশের কুমারী কন্যা ও মহিলাদের মাতামাতি দেখলে তিনি কি করতেন, তা ভেবেই পাওয়া যায় না। যেখানে মুদীর দোকানের বিলের চেয়ে জুতা-জামা-কাপড়ের দোকানের বিল অস্ততঃ তিন গুণ বেশী, সেখানে সর্বত্যাগী ব্রজনাথের যোগ্য স্থান পাওয়া কঠিন। ব্রজনাথ সত্যি খাটা মাহুষ ছিলেন। সেকালের ব্রজনাথকে একালে দেখতে পাওয়াই যায় না একপ্রকার। এমন প্রকৃতির ব্যক্তি পৃথিবীতে যত জনগ্রহণ করেন, বিশ্বসংসারের পক্ষে ততই মঙ্গল।

— — —

মহিলা-সমিচার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গের বাহরের জিলা বোর্ডে বঙ্গনারী

শ্রীমতী উমারানী বসু—পূর্ণিয়ার খাতনামা কংগ্রেস কর্মী
শ্রীযুক্ত অনাথ বসু মহাশয়ের পত্নী পূর্ণিমা ডিষ্ট্রিক্ট জিলা
বোর্ডের এক সভা মনোনীতা হইয়াছেন। বাঙ্গালায় কোন
জিলা বোর্ডে এখনও কোন বঙ্গললনা সভা হন নাই।

জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে! মহারাজা যোগেন্দ্র নাথ রায়
(নাটোর) এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুক্ত
রণেন্দ্র মোহন ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।
কলিকাতার সকল বিশিষ্ট ওস্তাদরা এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
ও শ্রীমতী সরলা দেবী বিচারক ছিলেন।

বিশিষ্টা মহিলা শিল্পী

শ্রীমতী শীলা ব্যানার্জি, লণ্ডনের সেন্টাল স্কুল অব আর্ট
বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আগমন
করিয়াছেন। সম্প্রতি চৌরঙ্গী রোডে এক ভবনে তাঁহারই
অঙ্কিত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধারায় অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্রের
প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেইগুলি হইতে এই তরুণী শিল্পীর
শিল্পনিপুণতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার
তুলিতে অঙ্কিত বাভেরিয়েন বাদ্যকার, দক্ষিণ ফ্রান্সের
চিত্রাবলীতে তাঁহার রংফলানর কৃতিত্ব ও অঙ্কনের সামঞ্জস্যের
জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বঁচিত মাছ কুটা চিত্রখানি তাঁহার
ভারতচিত্র অঙ্কন-পদ্ধতির নিপুণতার পরিচয় প্রদান করে।

করাচীতে বঙ্গনারী শিল্পী

শ্রীমতী তরুণা চাটার্জি করাচীতে শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁহার
অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।
এ প্রশংসা মৌখিক স্বাবকতা নহে, তাঁহার পারদর্শিতায় মুগ্ধ
হইয়া করাচীর আর্ট স্কুলের অগ্রতম শিক্ষক রূপে কর্তৃপক্ষ
তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। চিত্রাঙ্কনে বাঙ্গালী লাহোর,
লঙ্কো, মাদ্রাজ, দিল্লী আদি প্রদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার
করিয়াছে এবং করিতেছে। সমর গুপ্ত, অসীত হালদার,
দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, মুকুল দে ও বরদা উকীল মহাশয়-
গণকে সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ রূপে দেখিতে পাই।



শ্রীকল্যাণী চাটার্জী

ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী মিনতি ব্যানার্জি
(ভিক্টোরিয়ার ছাত্রী) ক্রপদে সর্বশ্রেষ্ঠ পদক পাইয়াছেন। কুমারী
প্রতিমা গুপ্ত, কুমারী সুরমা সেন, কুমারী আভা আইচ
(আশুতোষ কলেজের ছাত্রীরা) নানা পদক ও পুরস্কার লাভ
করিয়াছেন।

মেয়ে সঁতার

সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় ছাত্রীর কৃতিত্ব

বর্তমান বর্ষে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের যে
প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে তাহাতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী যোগদান
করিয়াছিল। সঙ্গীতের আদর্শ উচ্চ না হইলেও ইহার

দক্ষিণ কলিকাতা সঁতার প্রতিযোগিতায় কুমারী কল্যাণী
চাটার্জি মেয়েদের মধ্যে সর্ব প্রথম হইয়াছে। ভবানীপুর
পদ্মপুকুরে যে সঁতার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেই স্থানে এই
মেয়েটি সঁতার শিক্ষা করেন।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২।০, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে পাওয়া যাইবে। ২৪৯ পৃঃ ডবল ক্রাউন, সুন্দর এষ্টিক কাগজে নূতন টাইপে মুদ্রিত।

কোন জাতির সহিত পরিচয় লাভ করা যায় তাহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া, সেই জাতির আচার, ব্যবহার, সমাজ-নীতি, ধর্মরীতির যাবতীয় তথ্য প্রকাশ পায় নাট্যাভিনয়ে। সেই নাট্যশালার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালী জাতির পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। বাঙ্গালা নাট্যশালার এই বিচিত্র ইতিহাস শুধু সাহিত্যিকের নহে, সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক; ব্রজেন্দ্রবাবুর অল্পসঙ্কীর্ণতা, সাহিত্যানুরাগ ও অধ্যবসায় সুপরিচিত। তাঁহার পুস্তকটিতে পুরাতন তথ্যের সুস্পষ্ট পরীক্ষণ ও নূতন তথ্যের সমস্ত সন্ধান বিশেষভাবে রহিয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর আড়ম্বরহীন অধ্যবসায়ের তায় তাঁহার রচনা অতি মিষ্ট। তথাপি প্রত্যেকটি তথ্য তারিখ বা ঘটনা প্রমাণ সংযোগে বিবৃত হইয়াছে, এবং এই তথ্যানুসন্ধানী অত্যাশ্চর্য্য ও অসতর্ক-উক্তি-বিরহিত রচনার দ্বারা প্রকৃত ঐতিহাসিকের উপযুক্ত হইয়াছে। নাট্যশালার ইতিহাসের মৌলিক উপাদানের সহিত লেখকগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। এ পর্য্যন্ত এই বিষয় যে সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ নহে। কিন্তু এই পুস্তকখানিতে অধিক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১৩৪১ সালে হয়, কিন্তু ইহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পুস্তকের চাহিদা ও

আদর ইহা হইতেই উপলব্ধি হয়। বর্তমান সংস্করণ আমূল পরিশোধিত এবং নূতন তথ্য সমাবেশে দ্বিগুণ মূল্যবান হইয়াছে। কয়েকটি পুরাণ নট নটী ও নাট্যকারের চিত্রে বইখানির সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছে। পুস্তকখানির সহিত বাঙ্গালা নাটকের তালিকা সম্বলিত হইয়াছে। ইহা খুবই মূল্যবান। এই পুস্তকের বহুল প্রচার আমাদের কামনা করি। আজকাল অনেক ছাত্র ও ছাত্রী বাঙ্গালা সাহিত্য ও গতি জানিতে ও আলোচনা করিতে উৎসুক, তাহাদের পক্ষে পুস্তকখানি অতিশয় মূল্যবান। নাট্যশালার ইতিহাসের সহিত একশত বৎসরের বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের পরিচয় এবং উদ্যানীভূত সমাজের নিখুঁত চিত্র এই পুস্তক পাঠে দেখা যায়।

শ্রীজ্যোতিষক্স ঘোষ

বঙ্গরবি আশুতোষ—মূল্য ছয় আনা, দেশবন্ধু চিত্ররঞ্জন—মূল্য পাঁচ আনা, দেশ নামক সুরেন্দ্রনাথ, মূল্য আট আনা প্রাপ্তিস্থান, মডার্ন বাইণ্ডার্স, ৩৪ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

তিনখানি পুস্তকই শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় প্রণীত এবং আদর্শ জীবনী শতকের প্রথম তিনখানি বই। ইহাতে সংক্ষেপে বাঙলার তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করা হইয়াছে। আদর্শ জীবনী শতকের উদ্দেশ্য যদি ইহাই হয় যে, ইহাতে শতজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনকথা আলোচনা করা হইবে, তাহা হইলে আমরা সেই উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিতেছি। আলোচ্য তিন খানি বই-ই ভাবে, ভাষায় এবং ঘটনা নির্বাচনের দিক দিয়া চমৎকার হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় স্বাস্থ্য ও শক্তি-সাধনায় বিজয় মল্লিকের দান

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়

বাঙ্গালী দুর্বল! বাঙ্গালীর দুর্বলতার গ্লানি একদা তবুও ইহা নিঃসংশয়ে সমগ্র জাতির শিরে তুলে দিয়ে ছিল
বিধাতার অভিশাপের মতই সমস্ত জাতির স্বক্ষে জগদল অপমানের দুর্বিসহ কলঙ্কের বোঝা—আর নির্ঝিবাদে এই
পাথরের মতই চেপে বসেছিল এবং তাঁরই ফলে তার অপমানের বোঝা বহিতে বহিতে আমরাও হয়ে পড়েছিলাম



শ্রীযুক্ত বিজয় মল্লিক—মাল্লিকহেল্থ হোমের ডিরেক্টর

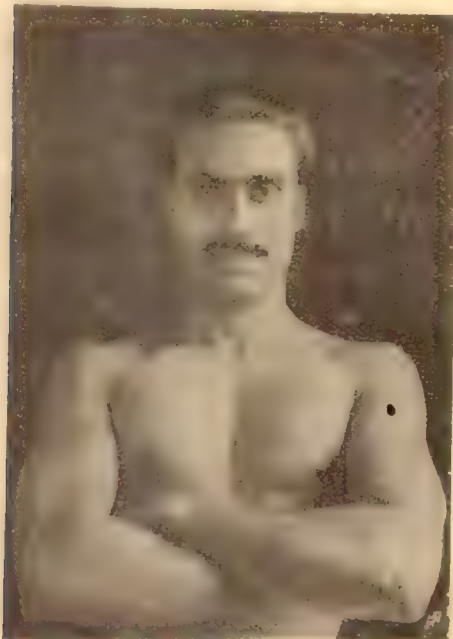
দেহ ঘিরে নেমে এসেছিল অসাড় পঙ্গুতা। বাঙ্গালীর এই চলচ্ছক্তিহীন জড় পদার্থ। রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্তে
শক্তিহীনতার ইতিহাসে যতই গোলমাল থাকুক না কেন— নিষ্পেষিত হতে হতে এক সময়ে আমাদের যৌবনের পরে

নেমে এসেছিল অকাল বার্ককো এবং নিদারুণ হতাশা। যৌবনের উজ্জ্বল প্রাণশক্তির বদলে সমগ্র জাতির মুখে প্রতিফলিত হয়েছিল অকাল বার্ককোর অপরিণীত ক্লিষ্টতা। মাঠে, ঘাটে, পথে, প্রান্তরে যেখানেই হোক—চিনি নিতে মোটেই বেগ পেতে হ'ত না যে জাতির মেরুদণ্ডরূপ এরাই বাংলার তরুণের দল। এদের দেখলেই মনে হ'ত—এরা যেন জীবনটাকে যথে নিয়ে চলেছে অতি কষ্টে।

জগতের জয়যাত্রার অভিযানে এরা শুধু ছিল বিশ্ববিমুগ্ধ

আঘাতের প্রয়োজন হয়েছিল বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে। আজ হয়তো আবার আমরা বেঁচে উঠছি কিন্তু সে বঁচা সহজ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে দিয়ে নয়—আঘাতের নিঃসর যন্ত্রণার চেতনায়; তবুও আশার কথা, আজ আমাদের মধ্যে যে ইচ্ছে ও চেষ্টা জেগেছে ভবিষ্যতে একদিন তা জয়যুক্ত হবেই।

আমাদের যৌবনের প্রাণশক্তির প্রাচুর্যকে কিরিত্তে আনতে হলে সমগ্র জাতিকে ক'রতে হবে সবল ও শক্তিশালী



শ্রীযুক্ত অপূর্ণ বন্দোপাধ্যায়—স্বঠাম দেহ প্রদর্শন

দর্শকমাত্র—সে অভিযানে অংশ নেবার কোন কল্পনাই ক'রতে পারত না ওরা। যাক সে অভিশপ্ত জীবনের পথে আজ যবনিকা প'ড়ে গেছে—নূতন জীবনের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।

বাঁচতে হ'লে চাই সর্বাঙ্গে দেহ ও মনের পরিপূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য। কিন্তু আমাদের এর কোনটাই ছিল না—তাই এক সময় সমস্ত শক্তি ও প্রেরণার উৎসাহগুলিই শুকিয়ে গিয়েছিল। একটা জাতি যখন কর্মহীনতার আওতায় প'ড়ে দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে তখন তার প্রয়োজন হয় নিঃসর আঘাতের এবং আমাদেরও এই



শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়
স্বস্ত্রের পেশী চালনা প্রদর্শন করিতেছেন

—তবে আমরা বাঁচতে পারবো বাঁচার মতো ক'রে। জাতীয় স্বাস্থ্য ও শক্তি নির্ভর করে প্রত্যেক নরনারীর স্বাস্থ্য ও শক্তি সাধনার উপরে—এবং এই সাধনার পথে এগোতে হ'লে চাই প্রেরণা ও আদর্শ। তাই আজ আমি এমন একটা যুবকের কথা বলব যিনি নিজেকে প'ড়ে তুলেছেন শক্তিসাধনার পথে—এবং তাঁর এ সাধনা আজ সফল হয়েছে—কারণ তিনি শুধু নিজেকেই গড়েন নি শক্তিমান ক'রে সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণাও জুগিয়েছেন—জাতিকে শক্ত ক'রে প'ড়ে তোলবার।

এঁর নাম শ্রীবিজয়কুমার মল্লিক।

ইনি উপর্যুপরি ছয়বার ভারত পেশী সকালন প্রতিযোগিতায় বিদেশী প্রতিযোগীদের নিকট হ'তে জয়মালা ছিনিয়ে নিয়ে দেশের গৌরব রক্ষা করেছেন এবং আজও সে জয়মালা তেমনই অটুট আছে। জাতীয় ইতিহাসে এটা একটা কম গৌরবের বিষয় নয়। অবশ্য এঁর সম্বন্ধে আর নতুন ক'রে কিছু বলা আমি নিম্নয়োজন মনে করি— কারণ সমস্ত বাংলা তথা ভারতের স্বাস্থ্য ও শক্তিকামীদের



ত্রিযুক্ত সৌরীন বিশ্বাস—ক্ষীত অবস্থায় বক্ষ ও কটীর ১৮"

প্রভেদ প্রদর্শন।

নিকট ইনি বিশেষভাবেই পরিচিত। ইনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বালক বালিকা ও যুবকদের স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জনের জন্য ভবানীপুর ১৭ নং মোহিনীমোহন রোডে "মল্লিক্স হেলথ হোম" (Mallick's Health Home) নামে একটা ব্যায়ামাগার স্থাপন করেছেন। ইনি শুধু এই একটা মাত্র প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা নন, সারা বাংলাদেশ জুড়ে ইনি প্রায় সত্তোরটির অধিক ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সবগুলিই অবশ্য "মল্লিক্স হেলথ হোমের" শাখা। মানান্সপ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী ও অসুবিধার আওতায় গ'ড়ে হ্রত এই শিশু প্রাচীনগুলি আজও লোকচক্ষুর সম্মুখে

উজ্জল হয়ে ফুটে উঠতে পারেনি; কিন্তু তবুও আশা করা যায় যে এরাই অচির ভবিষ্যতে জাতির দুর্বল মেরুদণ্ডকে নোজা ও সবল ক'রে তুলতে পারবে।

পরিশেষে আর একটা কথা না বললে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এতদিন নারীজাতিকে আমরা বাইরের সকল সংস্পর্শ থেকে মুক্ত ক'রে অন্দরের মধ্যেই টেনে রেখে দিয়েছি; বাইরের মুক্ত বায়ুটুকু পর্যাস্ত এদের দখলে ছেড়ে দিইনি। কিন্তু একথা হ্রত আমাদের জানা ছিল না অথবা জানতে চাইওনি যে জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির পক্ষে এ মনোভাব যেমনই অকল্যাণকর তেমনই ক্ষতিকারক। পুরুষ এবং নারী, এই নিয়েই গ'ড়ে ওঠে একটা সম্পূর্ণ জাতি; আর জাতির সুস্থতা নির্ভর করে উভয়েরই সবল স্বাস্থ্যের উপর। কিন্তু একচক্ষু হরিণের মত আমরা নারীর দিকটা অনাবশ্যক বোধে একেবারেই বাতিল ক'রে দিই; তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা একেবারেই উদাসীন থাকি—অথচ জাতিকে গ'ড়ে তোলবার গোঁড়া পত্তনই হয় এই নারীদের দ্বারা। জননী যেখানে স্বাস্থ্যহীনা সেখানে সন্তান সবল স্বাস্থ্য পাবে কোথায়? কাজেই আজ এদিকটাও চোখ খুলে চেয়ে দেখবার সময় এসেছে। একটু আশার কথাও বটে যে ইতিমধ্যে দু'একজন উপযুক্ত লোক এদিকটা দেখতে শুরু করেছেন এবং বিজয়কুমার মল্লিক এঁদের অন্যতম। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বহু বালিকা উপযুক্ত ব্যায়ামচর্চা দ্বারা দৈনিক সুসমা ও সবল স্বাস্থ্যলাভে সক্ষম হয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদে মল্লিকের আন্তরিক প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়ে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করুক।

এই বিখ্যাত ব্যায়ামবীরের সুযোগ্য ছাত্রের দুইখানি ছবি এবং কয়েকটি সুযোগ্য ছাত্রের নাম দেশের ভাইদের সামনে উপস্থিত করছি। আশা করি আমাদের প্রাচীন ঋষিবাণ্যটী "বীরভোগ্যা বহুধরা" যেন বিশ্বতির অতল তলে তলিয়ে না যায়।

সৌরেন বিশ্বাস, অপরূপাণ ব্যানার্জি, অসিত গুপ্ত, অনিল ঘোষ, পাঁচু পাল, শঙ্কুনাথ চ্যাটার্জি।

KING GEORGE THE FIFTH'S PRAYER

Teach me to be obedient to the rules of the game.

Teach me to distinguish between sentiment and
sentimentality

Admiring the one, and despising the other.

Teach me neither to proffer nor to receive cheap praise.

If I am called upon to suffer, let me be like
a well-bred beast that goes away to suffer in silence.

Teach me to win, if I may. If I may not win, then
above all teach me to be a good loser.

Teach me neither to cry for the moon nor spilt milk. *

* সম্রাট পঞ্চম জর্জের এই প্রার্থনার অন্তর্বাদ প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

বসন্তকুমারী বিশ্বব্রাহ্মের প্রতি উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রীর বাণী

তোমাদের কাছে আমার কয়েকটা কথা বলিবার আছে। তোমরা সংসারের কোন ভয় রাখিও না, দেশ তোমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে। তোমাদের আরো ভাল করিয়া দেশের সেবা করিতে হইবে, ভগ্নীকণ্ঠে, কষ্টাক্রমে, জননীরূপে। নারীর যে ভার্যার কর্তব্য সেটা তোমাদের শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু অবশিষ্ট কর্তব্য (ভগ্নী, কষ্টাক্রম ও জননী) তোমাদের অধিক মনঃসংযোগ করিতে হইবে। ভার্যার “আমার গৃহ, আমার স্বামী” এই অহংকার তোমাদের নাই—তাই দেশকে তথা দেশবাসীকে মাতার মেয়ে, ভগ্নীর প্রীতিতে, কষ্টের সেবায় পূর্ণ কর। এই স্থানে যে তোমরা শিক্ষা পাইতেছ ইহাই যথেষ্ট নয়—এই যে সীবনকার্য ও অন্যান্য কলাশিক্ষা—এই সকল জীবনের গৌণ কার্য। শ্রীচৈতন্য বলিতেন, অতি সামান্য আহার ও পরিধান লইয়া জীবনকে ধর্ম ও সেবার কার্যে নিয়োজিত করা উচিত। সুতরাং ভাল খাওয়া ও ভাল পরার চিন্তা ত্যাগ করিয়া জীবনের মূখ্য কার্যের দিকে দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করিবে। এই সময়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিলে তোমাদের দ্বারা উত্তম সেবাকার্য সাধিত হইতে

পারে। চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান হইলে পল্লীতে পল্লীতে দরিদ্রদিগের সেবা করিয়া প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। এই কার্য পুরুষদিগের অপেক্ষা মেয়েদের দ্বারা অধিকতর সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। তোমরা এইভাবে ত্যাগের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, দেশকে সেবা কর। উড়িয়া, বাদ্রালী, মারাঠি, পাঞ্জাবী, হিন্দু, মুসলমান সকল বিভেদ ভুলিয়া মাতার ন্যায় কল্যাণকামিনী হইয়া দেশকে সেবা ও প্রেমে সার্থক কর।

তোমরা যে সকলেই মিলের প্রস্তুত শাড়ী পরিধান করিয়াছ ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। নিজ হাতে সুতা কাটিয়া বর্ধের শাড়ী পরা প্রত্যেকের কর্তব্য। বর্ধের শাড়ী পরিধান করিলে সৌন্দর্য ও পবিত্রতা মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। এই কার্যে তোমরা বাহা সাহায্য চাহিবে তাই আমি দিতে প্রস্তুত। বর্ধগ্রহ পাঠ করিবে। শ্রীমদ্ভগবৎ যে বতটা পার পড়িবে। ইহা ৫০০০ বৎসর পূর্বের লিখিত আমাদের দেশের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ভগবৎ প্রেম ও সেবা ধর্মদ্বারা দেশ ও জীবনকে সার্থক কর। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার আশীর্বাদ।

পোলাণ্ডের একখানি পত্র

আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর মন পোলাণ্ডের উপর তৃপ্ত। যে দেশের অধিবাসী স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন, ধন, ঐশ্বর্য্য সমস্ত পণ করিয়া রণরঙ্গে মতিয়াছেন সেই পোলাণ্ডের রাজধানীর পিলসুডাঙ্কী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাদ্গা ভাষার অধ্যাপক হইতেছেন বাদ্গালী শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ঘোষাল। যুদ্ধ ঘোষণা হইবার প্রাকালে মাত্র ১০ দিন পূর্বে একখানি পত্র তিনি শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। যে স্থান হইতে লিখিয়াছেন, হয়ত তাহাতে এখন জানি না তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে। ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গলকামনা ও বাদ্গা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবিত পোলিশ জাতির জয় কামনা করিতেছি।

Ryeerska 10 m. 6
Stare miasto
Warsaw, Poland
20. VIII. 39.

সবিনয় নিবেদন,

আষাঢ় মাসের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে আপনার “বাদ্গা ভাষার রাষ্ট্র ভাষা হইবার দাবী” নামক পুস্তকের কথা পড়িলাম। বাংলা ভাষার যে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবার অতি সমীচীন ও গ্রাম্য সঙ্গত দাবী আছে এ কথা অদূর ভবিষ্যতে সর্ববাদী স্বীকৃত হইবে, এরূপ ভরসা করি। এ বিষয় আমি বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিয়া আসিয়াছি। আপনার পুস্তিকা হইতে এই দূর দেশে বসিয়া বাদ্গা ভাষার দাবীটিকে বাচাই করিয়া লইতে চাহি। বাদ্গালায় আজ এমন একটি যুগ আসিয়াছে যখন আর থিওরি লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় নাই। যদি বাদ্গা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সত্যই সমীচীন হয়, ত সে দাবীকে সমগ্র ভারতের কাছে গর্বভরে গাঙীধ্বের সহিত পেশ করিতে হইবে। আশা করি আপনার মত কর্মী পুরুষ এ বিষয়ে যত্নবান হইবেন। আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা গ্রহণ করুন।

বিনীত—

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

মিঃ এল, পি, মিশ্র

ই. বি. আর-এর নবনিযুক্ত জেনারেল ম্যানেজার

গত ৭ই সেপ্টেম্বর মিঃ এল, পি, মিশ্র মিঃ এইচ, জি, স্যাক্সের নিকট হইতে ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মিঃ মিশ্র ১৯১১ সালে ষ্টেট রেলওয়ে সার্ভিসে যোগদান করেন এবং ১৯১৮ সালে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে তিনি বুরোদা ষ্টেট রেলওয়ের ডেপুটি ম্যানেজার ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন।

ইউরোপের রেলওয়ে পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য মিঃ মিশ্র ১৯২৭ সালে ইউরোপ যাত্রা করেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে তিনি রেলওয়ে বোর্ডের অধীনে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে জেনেভা এবং ওয়াশিংটন চুক্তি সম্পর্কিত বিশেষ কার্যে নিযুক্ত হন। ১৯৩২ সালে মিঃ মিশ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ডেপুটি এজেন্ট নিযুক্ত হন। তিন বৎসর ঐ পদে কার্য্য করিবার পর তিনি হাওড়ার ডিভিশন্সাল সুপারিণ্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে তিনি ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বর নিযুক্ত হন। হাওড়ায় ডিভিশন্সাল সুপারিণ্টেন্ডেন্টরূপে কাজ করিবার সময় তিনি যাত্রীদের সুবিধাকল্পে নানা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ সময় তিনি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য যে সিট্‌ রিজার্ভ করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তাহা রেলওয়ে তদন্ত কমিটি কর্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে।

আমরা ইঁহার দীর্ঘ জীবন ও সাক্ষ্য কামনা করি।

কেন্দ্র স্রমিতির কথা

কাঁচরাপাড়া মহিলা সমিতি

গত ২৬শে আগষ্ট কাঁচরাপাড়া মহিলা সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় হাইন্ডমাস ইন্সটিটিউটে মহিলাদের একটি সভা হয়। কেন্দ্রসমিতির প্রধান প্রচারক শ্রীযুক্ত স্বধীরলাল সরকার বি-এ ও মহিলা-কর্মী শ্রীযুক্তা স্ববোধবালা ঘোষ উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং ম্যাজিক-ল্যাপাৰ্ণ-সহযোগে মহিলা সমিতির কাৰ্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় তিন শত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মাণিকতলা মহিলা সমিতি

গত ২৮শে আগষ্ট মাণিকতলা মহিলা সমিতির উদ্যোগে মাণিকতলা মহিলা রেড-ক্রস-সোসাইটির গৃহে মহিলাদের একটি সভা হয়। কেন্দ্রসমিতির প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী ও মহিলা-কর্মী শ্রীযুক্তা স্ববোধবালা ঘোষ উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং মিসেস ঘোষ “জাতি গঠনে মহিলাদের স্থান” সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক ল্যাপাৰ্ণ-সহযোগে মহিলা সমিতির কাৰ্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় ২ শতাধিক মহিলা যোগদান করেন।

জানবাজার করপোরেশন বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা-সমিতি

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তার স্বরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (জানবাজার) করপোরেশন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা কিরণবালা রায়ের উদ্যোগে মহিলাদের একটি সভা হয়। কেন্দ্রসমিতির প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ও মহিলা-কর্মী শ্রীযুক্তা স্ববোধবালা ঘোষ সভায় যোগদান করেন; মিসেস ঘোষ সমাজ-শিক্ষা উপকারিতা ও মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক-ল্যাপাৰ্ণ-সহযোগে মহিলা-সমিতির গঠন-প্রণালী, কাৰ্য্যধারা এবং শিশুমঙ্গল ও মাতৃ-মঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় ৪ শত মহিলা যোগদান করেন।

প্রচার কার্য্য :-

কেন্দ্রসমিতির কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, মহাশয় প্রচার কার্য্যের ধারাহুয়ায়ী কলিকাতা সহরের পল্লীতে পল্লী মহিলা-সমিতি গঠন করিবার জন্ত প্রত্যেক ওয়ার্ড স্থানীয় সমিতি ও করপোরেশন বালিকা বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় প্রচার কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবেন। বহু স্থান হইতে এই কার্য্যে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে।

দ্রষ্টব্য

বর্তমানে কাগজ ইত্যাদির দর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্ত বঙ্গলক্ষ্মীর কলেবর যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। মূল্য পূর্ববৎ রহিল।

প্রয়োজন হইলে কাগজের কোয়ালিটিও পরিবর্তিত হইতে পারে। আমরা আন্তরিক চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে বঙ্গলক্ষ্মী পাঠকদিগের নিকট প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদির সমৃদ্ধিতে পূর্ববৎ আদরীয় হইতে পারে।

ব: স:

সরোজনলিনী নারী-শিক্ষা শিক্ষালয়

আধুনিক কালে নারী শুধু পুরুষের সহধর্মিণী নন, তিনি সহকর্মিণী ও সহভাগিনী। জগতের সর্বত্র নারী আজ আপন কর্মপ্রতিভায় পুরুষের সহযোগিতা করিতেছে, সাহায্য করিতেছে—স্থখে দুঃখে বিপদে সম্পদে সে আজ পুরুষের সমপ্রাণা সখী।

কিন্তু বাংলা দেশে ঘরে ঘরে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং অনাথা রমণীগণ উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে দিন দিন ব্যক্তি এবং সমাজের ভার স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে। স্বভাবের সংসারে 'স্বামীহীন', স্বামীপরিত্যক্তা বা অবিবাহিতা বয়স্ক কুমারীকে আর আত্মীয়গণ সহজপোয়া মনে করেন না। ইহারা অনেক স্থলেই পরের গলগ্রহ হইয়া এক হাতে চোখের জল মুছিয়া অন্য হাতে অনাদরের অগ্নে কেন প্রকারে জীবন্ত অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন।

বদ্ধ রমণীগণের অজ্ঞতা ও সর্কারিতা দূর করিয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বিনী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি কলিকাতায় একটি সুবৃহৎ শিল্প শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় হইতে যে সব ছাত্রী উত্তীর্ণ হন তাহাদের সকলেই স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের বিদ্যা অর্জিত করিয়া থাকেন। মাত্র দুই বৎসর মনোযোগ দিয়া শিক্ষা করিলে যে কোনও সাধারণ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক নিজের শক্তিতে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে। এখানে বহু প্রকার অর্থকরী শিল্প শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লেখা পড়াও শিক্ষা দেওয়া হয়। ষোল বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালিকাগণকে এই স্কুলে ভর্তি করা হয় না। সুতরাং বয়স্কনিষ্ঠাদের সহিত একযোগে পাঠ করিবার লক্ষ্য হইতে বয়স্ক মহিলারা নিস্তার পাইয়া থাকেন। বিধবা, বিবাহিতা অথবা কুমারী যে-কোন

মহিলা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এখানে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

হিন্দু ছাত্রীগণের স্বল্পবায়ু সুরক্ষিতভাবে থাকিবার জন্য বিদ্যালয়-সংলগ্ন একটি বোর্ডিং আছে, উক্ত বোর্ডিংএ হিন্দু আচার নিয়মাদি যথা সম্ভব পালন করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা অল্পস্বত হয়।

নানাবিধ কুটীর-শিল্প যাহা সরোজনলিনী শিল্প-শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার যে-কোন একটি ভালরূপে আয়ত্ত করিলে একজন মহিলা গৃহের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়াও দৈনিক আট আনা হইতে এক টাকা উপার্জন করিতে পারেন। আধুনিক বেকারসমস্তার দিনে এই স্বল্প আয়ও মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবারের শোচনীয় অস্বচ্ছলতার কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে নিশ্চিত সাহায্য করিবে।

সরোজনলিনী শিল্প-শিক্ষালয় আজ চতুর্দশ বর্ষকাল বাঙ্গালার নারীকে ব্যগ্র আহ্বান জানাইতেছে, “এস, কর্ম-মুখর পৃথিবীতে তোমাকে আত্মনির্ভরশীলা করিয়া স্বস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা সাহায্য করিব।” আশা করি বাঙ্গলার মাতা-ভগিনী-কন্ঠাগণ এই আহ্বানে সাড়া না দিয়া পরিবেন না এবং দলে দলে এই শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া নিজের ও সমাজের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিবেন।

সম্পাদিকা—

ক্রীতীরজবাসিনী সোম

সরোজনলিনী নারী-শিল্প-শিক্ষালয়,
৬০বি, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা

নববধূটি

শ্রীরাধাকৃষ্ণসাহা

কে বসি ঘরের কোণে

কুতূহলী জনমনে

সলাজে সবার পানে

চায় মিটি-মিটি ;

লজ্জাবতী-লতা ও যে নববধূটি ।

কি যেন কাহারে খোজে,

কেবা-ওর ব্যথা বোঝে,

বলিতে পারে না সে যে

কোন কথাটি ;—

মুক মেঘশিশু যেন

নব বধূটি ;

সখিতে সলাজে চলে,

পাছে কেহ মন্দ বলে,

দোষ ধরি নানা ছলে

কি খুটিনাটি

চকিতা হরিণী তাই নববধূটি ।

যতনে রাখিবে বৃকে

নব-বধূটি ।

সংসার-সাগরে পাড়ি

দিতে ভীতা সে আনাড়ি

অকুল পাথারে দাঁড়ি

স্বামী মাঝিটি ;

ভুলে যেন যেও নাগো

নব বধূটি ।

ছোট ছেলে মেয়ে যত

গল্প করে নানা মত

অধরে ফুটায় মিত

স্নান হাসিটি

বোটা ছেঁড়া ফুল যেন

নব বধূটি ।

পিতা-মাতা স্নেহ ক্রোড়ে

স্বাধীনা সে ছিল যে রে

রচিবে কেমন কোরে

নব নীড়টি,

পিঞ্জরেতে পোরা পাখী

নব বধূটি ।

বিপদে সম্পদে আর

লয়েছে যে তব ভার

সেই তব সহকার

ভূমি লতাটি,

তার আদরের শন নববধূটি

নিবেদন

আগামী ২রা কার্তিক ৮শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা আরম্ভ হইবে ।

বঙ্গলক্ষ্মীর কার্তিক সংখ্যা আগামী ২২শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর বাহির হইবে । বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন বিজ্ঞাপনের নূতন বা পরিবর্তিত কপিসমূহ ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে অফিসে অত্যাশ্রক পাঠান । উক্ত তারিখের পর আর কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্তন করা যাইবে না ।

কাৰ্য্যাবাহক—বঙ্গলক্ষ্মী

জানি কেন চাই

শীতের দিনে শরীর উষ্ণ করে তুলবে, আর গরমের দিনে দেহে এনে দেবে শীতলতার অনুভূতি, এ-রকম পানীয় জগতে একটিমাত্র আছে। বলা বাতল্য আমরা চায়ের কথাই বলছি।

গরমের দিনে গরম চা কেন চাই? চাই এই জন্ত যে চা খেলেই শরীরে খুব ঘাম বেরুতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। গরমের দিনে আমরা নিয়মিত চা খান তাঁরা একথা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন। দেহের উত্তাপ স্বৈদরূপে বার করে' দিয়ে চা তাড়াতাড়ি শরীর শীতল করে দেয়। বাস্তবিক অতি তপ্ত শরীরকে শীতল করবার এই হচ্ছে প্রাকৃতিক পন্থা।

এ-কথা আজ সর্ববিদিত যে মানুষ তা'র জীবনযাত্রাকে প্রকৃতির সঙ্গে যতখানি খাপ খাইয়ে নিতে পারে, ঠিক সেই পরিমাণেই তা'র জীবনের গতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। প্রকৃতির নিয়মকে এড়াবার কোনো উপায়ই যখন মানুষের নেই, তখন সে নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলাই ভালো। দৃষ্টান্ত হিসেবে গরমের কথাই ধরা যাক না কেন! যখন খুব গরম লাগে, শরীর যখন অত্যন্ত তপ্ত হয়ে যায়, তখন আমাদের শরীর থেকে ঘাম বেরোয়। বাইরের তাপ এবং শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা এই দুইয়ের মধ্যে প্রকৃতি সামঞ্জস্য রাখে দেহের উত্তাপকে স্বৈদরূপে বার করে দিয়ে। গরমের দিনে চা খেলে—শরীর শীতল করবার সেই প্রাকৃতিক উপায়কেই মেনে নেওয়া হয়। কারণ চা-ও শরীরের তাপ স্বৈদরূপে বার করে' দিয়ে শরীর শীতল করে দেয়।

গরমের দিনে চা খাওয়ার অভ্যাস যে কত তাড়াতাড়ি দেশের লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তা লক্ষ্য করবার বিষয়। গ্রীষ্মকালে ভারতে চা-প্রচার আন্দোলনের প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্সন বোর্ডের কমিশনার কিছুদিন আগে বলেছিলেন:

“আমি যে-বছরের কথা আলোচনা করছি (১৯৩৭-৩৮) সে-বছরে তৈরি চায়ের দোকান এবং ফিরিওয়ালার সংখ্যা মোটেই কমেনি; বরং যে-সব জায়গায় আমাদের কাজ হচ্ছে, সেখানে শতকরা অন্ততঃ পঞ্চাশটি বেড়ে গেছে। সাধারণতঃ গরমের ক'মাস চা বিক্রি কমে যায়, এবং অনেক তৈরি চায়ের দোকান বন্ধ হয়ে যায়। এ-জিনিসটা বর্তমানে অনেকটা থেমে গেছে ব'লে স্পষ্টই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে অনেক জায়গায় নতুন চায়ের দোকান খোলা হয়েছে—এরকম খবরও এসেছে। অথচ কয়েক বছর আগেও এটা অনেকে একেবারে অসম্ভব বলেই মনে করতেন।”

এ-সব অভিজ্ঞতার মধ্যেই সত্যের আভাস পাওয়া যায় বেশি, আর, চায়ের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা যায়। গরমের দিনে, সমস্ত দিনের খাটুনির শেষে, অথবা শক্ত খেলা, দীর্ঘ একটানা ভ্রমণ কিম্বা অল্প যে কোনো রকমের শারীরিক বা মানসিক শ্রমের পরে এক পেয়াল। গরম চায়ের মত তাজা-করা জিনিষ আর কিছুই নেই।

জরায়ু চিকিৎসায় সাফল্য

জরায়ুতে ক্যান্সার, জরায়ু ক্ষতি ও অসহ্য বেদনা, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতিতে সপ্তাহ মধ্যেই আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। সম্ভবস্থলে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ না করিয়াও চুক্তিবদ্ধ ভাবে চিকিৎসা করা হয়।

রাজবৈজ্ঞানিকবিরাজ শ্রীমহেশচন্দ্র ভিষকশাস্ত্রী

২০৬২ আপার সাহুলার রোড, শ্রামবাজার, কলিকাতা।

বঙ্গলক্ষী—



শ্রী রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব



১২শ সংখ্যা

কাটিক, ১৩৪৬

১৩শ সংখ্যা

২ কফিয়ার

শ্রীমদ্বৈষ্ণৱীয় ঠাকুর

লিখি কিছু মাধ্যম—

যে দশা এ অভাগার লিখিতে দেয়া যাও ?
 মোরুদি যেরুদি চাপড়ের যুগে সে,
 পরজোকগত তারি আত্মার উদ্দেশ্যে
 আশা দি জেয়ার যের আঁজ তার আঁজ কী।
 বদন্তত অনন্তত আত্মীয় পরিজন,
 গতিজাত ব্যক্তি যে কেহ, কেহ হরিজন,
 আশা দি চরণজাত তাদোদের খাদ্য কী।
 আত্মীয় নিরত চাই যদি জোট shelter,
 এক কোটা বাকি নেই নেয়-যাম-তেজোর,
 যশস্বির দিনের বেলা কত আত্মদা কী
 আল তোর যিহু দিই অতি আত্মদা,
 পিঠ চাপড়ের সেটা যে আত্মদা,
 ৫ কলজ আগার জেয চটিকোড়া, খাদ্য কী
 পুজোর বাজারের আঁজ যদি জেয না জিটাই,
 চিটাই জিটোর যতো কলমচি না জিটাই,
 সম্পাদকের মাথে যের মোড়া দি কী ॥

১৩০/১৩

বসন্তাশ্রম



ବରଜେତେ ଶୋଭା ସାଧିଲି କଥା । ଡିଆକସ୍ତ୍ର ବଜାଏ
 ନିମନ୍ତେ ଡୋକା ଛିଲ ଡାବ ଡାଲ । କାବି
 ଡାଲକ ଡିଫିଫି ଡାଲ । ଡେବିଲି ଡେବିଲି ।

କବିର ସ୍ମରଣ ଶ୍ରୀତି

[illegible]

কবি* বহুদিন “দেহলি” * ছেড়ে চলে গেছেন, এক্ষণে তাঁর বাস উত্তরায়ণে ; সেখানে তাঁকে বিশেষ যত্ন ও সুব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। তাঁর বর্তমানের জীর্ণ দুর্বল শরীরে যাতে কোনরূপ কষ্ট অনুবিধ না হয় সেজন্য অহরহ লক্ষ্য রাখা হয়। কোন অভাব নাই, অসুবিধা নাই, তবুও কবি এই নূতনকে ছেড়ে পুরাতন ‘দেহলি’ যাবার জন্য ব্যাকুল। দেহলির দোতালার ছোট একখানি ঘরে এখন তাঁর সঙ্কলন হওয়া অসম্ভব, পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও কবিকে নিরস্ত করতে পারা যাচ্ছিল না। শেষে নিজের চোখে বাড়ীখানি দেখে এসে এখন আর সেখানে বাস তাঁর সম্ভব নয় বরং যে পত্রখানি লিখেছেন এখানে সেখানি উদ্ধৃত না করে আমরা পারলুম না। এই ঘটনায় কবির পুরাতন প্রীতি কত প্রবল, বোঝা যায়।

পুরাতনকে নূতন করে ভাববার, দেখবার ও গ্রহণ করবার শক্তি কবির অসাধারণ।

* বর্তমানে “দেহলি” আমাদের বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ও

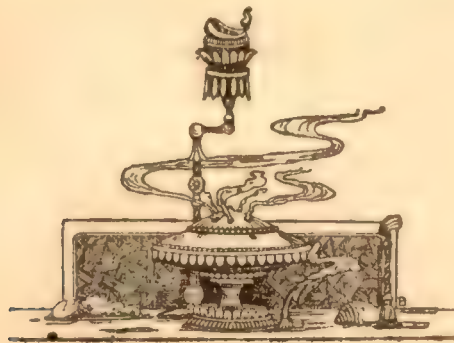
উত্তরায়ণ

শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল।

কল্যাণীয়াসু, .

প্রভূত পুঁথিপত্র, কালিকলম, রং তুলি, পানি কাগজ প্রভৃতি উপকরণে ভারাক্রান্ত আমা দিনযাত্রা। হিসাব করে দেখা গেল, আমা আনুষঙ্গিক নিয়ে তোমার কুলায়টিতে আমা কুলাবে না। বিশেষত বর্তমানে তোমাদের পূর্বের মত বিরল-বসতি নয়। আমা অকাজের জগে যে নিভৃত পরিবেষ্টনের আবশ্যক সে ওখানে মিলবে না ; পুরোনে পুরোনে কাপড়ের মতো, এক সময় যা গায়ে হয়েছিল আর এক সময়ে ছাট হয়ে যায়। অতএব নোঙর তুলতে পারলুম না, সেখানে আছি সেইখানেই বাঁধা রইলুম। অল্পকালের জগে বোঝা-বহাবহির উপসর্গ স্বীকার করতে মন রাজি হোল না। ইতি ২৩/৬/৩৯

কাপালী



মৃত্যু

কবিশেখর শ্রীবাণিদাস রায়

সংসারীরা মৃত্যু চায়—আপনার রচিত সংসারে,
আপনার চিরজনমের ভিটাতে পুত্র-কন্যা-মিত্র-কলত্র
বন্ধু দ্বারা পরিবৃত হইয়া বেদনায় বিগলিত
নয়নগুলির তলে।

কবিরা মৃত্যু চায়—পিক-কুহরিত কুসুম-
সুবাসিত কুঞ্জকাননে বসন্ত পূর্ণিমায় অথবা
কাশকুসুম-বীজিত স্বর্ণালোকে উজ্জ্বল শরৎপ্রভাতে
গিরিপ্রান্তরে!

সাধকেরা মৃত্যু চায় সুরধুনীতীরে ভগবানের
নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে। বীরগণ মৃত্যু চায়,
সম্মুখ সমরে ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রাখিয়া দেশের
অরাতিদল দলন করিতে করিতে বিজয় লক্ষ্মীর
পদতলে।

আর আমি মৃত্যু চাই—জলহীন শুষ্ক মরু
প্রান্তরে অমাবস্তার অন্ধকারে! কেন এ অদ্ভুত
বাসনা? হায়, আমি যে স্নেহপ্রেমে ভরা বিচিত্র

সুখমা-মাধুরী-মণ্ডিত এই বিশ্বভূমিকে নিতান্ত
নির্বোধের মত ভালবাসিয়াছি। আমি কেমন
করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় চাহিব!
এই বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য্য, সকল মাধুর্য্য, সকল
মঙ্গল্য আমাকে ঘিরিয়া অশ্রুপাত করিবে,—আর
আমি চলিয়া যাইব! সে যন্ত্রনা আমি সহিতে
পারিব না। আমি তাই সেই স্থানে এবং সেই
সময়ে মৃত্যু চাই, যেখানে আমার মৃত্যুশিয়রে কেহ
অশ্রুপাত করিবে না, চারি পাশে কেহ স্নেহহকরণ
দৃষ্টিতে চাহিবে না—নিসর্গের কোন মাধুর্য্য, সৃষ্টির
কোন ঐশ্বর্য্য, বিশ্বের কোন সৌন্দর্য্য আমার মৃত্যু-
যন্ত্রণা বাড়াইবে না, আমার মৃত্যুমান নয়নে কেহই
মমতার ছায়া ফেলিবে না। হে মহাকাল, যদি
আমাকে অকালে হত্যা করিতে চাও, তবে নিসর্গ-
মাতার অঙ্কে নয়—আমার তুলসীমঞ্চের তলে নয়,
সুরধুনীর পবিত্র তীরে নয়, আমাকে হত্যা কর
জলহীন, জনহীন মরুপ্রান্তরে।

ভাবনার কথা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

সকলেই যদি কবি হয়ে ওঠে, অকবি থাকিবে কারা,
সকলেই যদি লেখক হয়, ত' কোথা পাঠকের পাড়া?
সকলেই যদি কবিতায় ভাবে আপন ভাবনামালা,
কল্পনা-জাল বুনে চলে যদি, বাড়িয়াই যাবে জালা!
স্বামী কবি হবে, গৃহিনীও কবি, শাণ্ডী-খণ্ডর কবি,
রাধুনীও কবি, ঝি-চাকরও কবি,—সে বড় করুন ছবি!

স্বতরাং কবি সকলে হয়োনা, কিছুটা অকবি থাকো,
নহিলে আমরা তোমাদের ঘরে কলিকা পাইব না কো!
লিখি যা, তা লিখি কেমন করে যে, অবাক হবে না ভেবে,
কত আশা জাগে হৃদয়ে মোদের! সে ওড়ে কি বালি দেবে!
তুলিবেনা কেহ কলরাকার লেখকের লেখা পড়ে?
পাঠিকা পাঠক নাটিকা নাটক তোমরাই তোলা গড়ে!

প্রাচীন ভারতে লৌহ-শিল্প

ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস

অনেকেরই ধারণা এই যে পুরাকালে ভারতবর্ষে কেবল দর্শন, পুরাণ ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বেরই সমধিক বিকাশ হইয়াছিল। বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতবাসীর জ্ঞান খুব কম ছিল এবং ইংরাজিতে যাহাকে material civilisation বলে তাহা বড় একটা ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর ধারণাও কতকটা এইরূপ। কিন্তু আমার নিজের মনে হয় যে কোনও জাতি কেবলমাত্র এক বিষয়েই বড় হয় না। ইংরাজিতে বলিতে গেলে বলিতে হয়—a nation cannot be great in compartments। যে জাতি বড়, সে প্রায় সকল বিষয়েই বড় হয়। আধুনিক কালের ইংলও প্রভৃতি দেশ শুধু বিজ্ঞানেই বড় নহে, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, দান, ধর্ম সম্বন্ধেও ছোট নহে। ভারতের অতীত গৌরবের দিনেও ভারত শুধু যে দর্শন শাস্ত্রের চর্চার জন্যই বড় ছিল—সে কথা আমি মানিতে প্রস্তুত নহি। সেইজন্য আমি পূর্বে দশ-বার বৎসর যাবত প্রাচীন ভারতে লৌহ প্রভৃতি ধাতু শির ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা আমার Iron in ancient India, এবং Copper in ancient India নামক দুইখানি পুস্তকে সম্মিলিত করিয়াছি।

আজ আপনাদিগকে প্রাচীন ভারতের অলৌকিক লৌহ শিল্পের কথা বলিতেছি। আজকাল অবশ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্প জগতের সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, লৌহ ভিন্ন কোনও কাজই আজকাল সম্পাদিত হয় না। বাস্তবিক এই যুগকে লৌহ-যুগই বলা চলে। অবশ্য প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে লৌহের প্রচলন আধুনিক কালের মত ছিল না, কিন্তু যাহা ছিল তাহা প্রাচীন কোনও দেশেই ছিল না, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি।

এক্ষণে অতি সংক্ষেপে প্রাচীন ভারতের অলৌকিক লৌহ শিল্পের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিতেছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা প্রথমেই বলি। ঐ যুগে দক্ষিণ ভারতে লৌহের অল্পশস্ত্র ব্যবহৃত হইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইউরোপে প্রথমতঃ পাথরের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

ঐযুগকে Paleolithic ও তৎপরে Neolithic যুগ বলা হয়। সেই যুগের পর ব্রজ ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত। সেইজন্য ইউরোপ খণ্ডে Neolithic যুগের পর ব্রজ যুগ। ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রথমে প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত সত্য, কিন্তু Neolithic যুগ এর পর ভারতে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের যুগ সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তাহা এইরূপ—বিস্ফোরিত পদার্থ উত্তর ভারতে সর্বত্র তাম্রনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত, এবং এই সকল অস্ত্র পূর্ব দিকে আদাম প্রদেশ, পশ্চিমে আফগানিস্তান এবং দক্ষিণে মধ্য প্রদেশ (Central Provinces) পর্যন্ত সর্বত্র বহুল পরিমাণে ভূমধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা দ্বারা ও মহেঞ্জোদারো খনন করিয়াও এইরূপ বহু অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। এগুলির অধিকাংশই তাম্র নির্মিত, তবে কোনও কোনও অস্ত্র ব্রজ নির্মিত। এই যুগ খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০০ হইতে খৃঃ পূঃ বৎসর হইবে। উত্তর ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে লৌহের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় না।

দক্ষিণ ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত্র ব্যবহারের ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। দক্ষিণ ভারতে তাম্র নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় প্রাচীন লৌহের মস্ত। লৌহ নির্মিত ধুলা, কুঠার, সৈন্ট, ছোরা প্রভৃতি বহু প্রাগৈত কবর খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। তবেই দেখা গেল প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে দক্ষিণ ভারতে লৌহের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার বহুল পরিমাণে ছিল। এগুলি এখন অনেক মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে Neolithic যুগের পর লৌহ যুগ ভারতের নিজস্ব, ইউরোপে ইহা দেখা যায় না।

বৈদিক যুগ

বৈদিক যুগে আমরা প্রধানতঃ ছয়টি ধাতুর ব্যবহার দেখিতে পাই—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, লৌহ ও সীসক। লৌহকে ‘অয়স’ বলা হইত। পরে লৌহ ও তাম্রকে পৃথকভাবে যথাক্রমে ‘কুম্ভায়স’ ও ‘লৌহিতায়স’ বলা হইয়াছে। বৈদিক যুগের পর লৌহ ব্যবহার সর্বত্র দেখিতে পাই। বৌদ্ধ যুগের

ও পরবর্তী কালের লৌহ শিল্পের বহু নমুনা এখনও বিদ্যমান। লৌহ মরিচা ধরিয়া যায়, তাহা নহিলে আরও অধিক সংখ্যক নমুনা আমরা পাইতাম। তবু আমরা এখনও যাহা পাই তাহাও কম নহে। কয়েকটি বিশিষ্ট নমুনার পরিচয় এখানে দিতেছি।

লৌহ স্তম্ভ	দিল্লী	পঞ্চম	শতাব্দী
লৌহ স্তম্ভ	ধার	দ্বাদশ	"
লৌহ স্তম্ভ	আবু শৈল	পঞ্চদশ	"
লৌ কামান	ভারতের সর্বত্র বোড়শ ও সপ্তদশ		



দিল্লীর লৌহস্তম্ভ

লৌহমল (slag)

লৌহ কীলক (bolts, hinges)

বুদ্ধগয়া ২৫০ খৃঃ পূঃ

লৌহ কীলক,

পুৰী ভুবনেশ্বর

ষষ্ঠ শতাব্দী

লৌহ কড়ি

লৌহ কড়ি

কোনারক ত্রয়োদশ

অষ্টম শতাব্দী

"

এই সকল নমুনার মধ্যে কয়েকটির একটু বিশদ পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

দিল্লীর লৌহ স্তম্ভ

দিল্লীর কুতব মিনারের নিকট যে বড় লৌহ স্তম্ভ আছে তাহা জগদ্বিখ্যাত। উহা পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত। এটি

একটি জয়স্তম্ভ। স্তম্ভটি সর্বসমেত ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা। নিম্ন দিকে ইহার ব্যাস ১৬৪ ইঞ্চি এবং মাপার দিকে ১২ ইঞ্চি। উপরের ৩৭ ফুট অংশ কারুকার্য সমন্বিত এবং এই অংশে একটি খোদিত লিপি আছে। লিপির অক্ষরের আকার দেখিয়া উহা পঞ্চম শতাব্দীতে নিৰ্মিত বলিয়া স্থির হইয়াছে। পঞ্চম শতাব্দীর লৌহ শিল্পের এই অদ্ভুত নিদর্শন দেখিয়া কি রাসায়নিক, কি প্রত্নতাত্ত্বিক, কি ইঞ্জিনিয়ার সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ফাউশান সাহেব লিখিয়াছেন—

“It opens our eyes to an unsuspected state of things to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron large than any that had been forged even in Europe up to a very late date & not frequently even now”. একজন ইঞ্জিনিয়ারের মত—
“Nothing heretofore brought to light in the history of metallurgy seems more striking to the reason as well as the imagination, than this fact that from the remote time when Hengist was ruling Kent to Cedric landing to plunder our barbarous ancestors down to our Third Henry……when the largest and best forging producible in Christendom was an axe or a sword blade—these ancient people in India possessed a great iron manufacture whose products Europe even half a century ago could not have equalled.”

এইরূপ আরও বহু বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করা যাইত, বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। এই লৌহ স্তম্ভটির লৌহ মরিচা ধরে নাই এবং ১৪০০ বৎসর পরেও উহার উপরের খোদিত লিপি ঠিক পূর্বের মতই এখনও পড়া যায়। রাসায়নিক পরীক্ষা যত্নে হইয়াছে যে উহা বিশুদ্ধ পেটা লৌহ (wrought iron) এবং এই লৌহের তাল (blooms) উত্তম অবস্থায় পিটাইয়া পিটাইয়া জোড়া দেওয়া হইয়াছে এবং সে জোড়া

দেওয়ারব্যাপারএ মননিপুণতার সহিত করা হইয়াছে। জোড়ার দাগ পর্যন্ত দেখা যায় না।

ধারের লৌহ স্তম্ভ

দিল্লীর এই লৌহ স্তম্ভটি জগদ্বিখ্যাত। কিং Archæological of survey of Indiaর রিপোর্ট ও অন্যান্য পুস্তক ঘাঁটিয়া ভারতের আরও দুইটি লৌহ স্তম্ভের কথা জানিতে পারিয়াছি এবং বৈজ্ঞানিকগণের দুইটি লৌহ স্তম্ভের প্রতি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।



ধারের লৌহস্তম্ভ

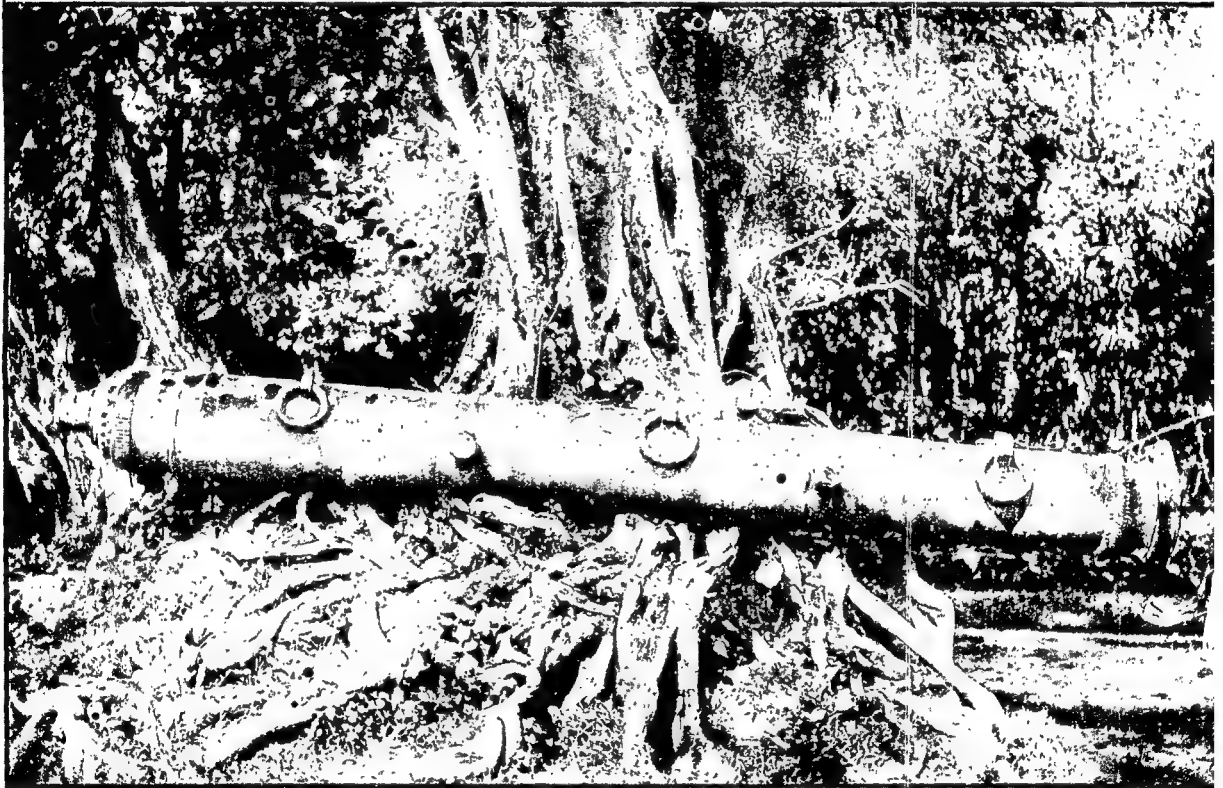
এই দুইটির মধ্যে একটি স্তম্ভ—দেশীয় ধার রাজ্যে অবস্থিত এবং সেইজন্য ইহাকে ধারের লৌহস্তম্ভ বলা হয়। এই স্তম্ভটি দিল্লীর লৌহ স্তম্ভ হইতে অনেক বড়। উহার সম্মুখ দিকের ব্যাস ৪৩ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং দিল্লীর স্তম্ভটি মাত্র ২৩

৮ ইঞ্চি লম্বা। এই স্তম্ভটি চতুষ্কোণ আর দিল্লীর স্তম্ভ গোলাকার। এই স্তম্ভটি লোক সমাজে অজ্ঞাত থাকিবার কারণ ইহা ভগ্নাবস্থায় তিনটুকরা হইয়া তিন জায়গায় পড়িয়া আছে। প্রথম খণ্ডটি ২৪ ফুট ৩ ইঃ ছোট মসজিদের উত্তর দিকের দরজার নিকট অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় আছে, দ্বিতীয় খণ্ডটি ১১ ফুট ৭ ইঃ আনন্দ হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে এবং তৃতীয় খণ্ডটি ৭ ফুট ৬ ইঃ লালবাগ সরকারী উদ্যানের দেওয়ালের গাথনির

নাই। সে বাহ্য হউক রাসায়নিক বিশ্লেষণে ঠিক হইরাছে উহাও পেটা লৌহ হইতে নিশ্চিত। উহা দ্বাদশ শতাব্দী ভারতীয় লৌহ শিল্পের নিদর্শন। ইহাও জয়সন্ত

আবু সোলের উপর লৌহস্তম্ভ

ভারতের তৃতীয় লৌহ স্তম্ভ রাজপুতনার আবু শৈবে অচলেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত। ইহা ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে নিশ্চিত—আকৃতিতে ছোট, ১২ ফুঃ ৯ ইঃ উচ্চ এবং উহ



মুর্শিদাবাদের জাহানকোষা কামান

ভিতর প্রোথিত আছে। আর একটি অংশ পাওয়া যায় না। এই অংশগুলি জোড়া দিলে এই ধার স্তম্ভ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম প্রাচীন লৌহস্তম্ভ রূপে পরিগণিত হইবে। আমি পূর্বে উহা জোড়া দিয়া নিৰ্মাণ করিবার জন্য ভারতসরকারের প্রত্ন-তাত্ত্বিক বিভাগে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালীন ডিরেক্টর সাহেব আমায় জানাইয়াছিলেন যে উহার নিৰ্মাণ কল্পে ২০ হাজার টাকা লাগিবে এবং অত টাকা ভারত সরকারের নাই। ধাররাজ্য যদি এ কাজ করে তাহা হইলে ধাররাজ্য পৃথিবীর মধ্যে এই স্তম্ভের জন্যই একটি দর্শনীয় স্থান হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ

মন্তকে একটি ত্রিশূল আছে। কথিত আছে যে পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিনের রাজত্বের শেষভাগে হিন্দু বা মুসলমানদিগকে হারাইয়া দিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র গালাইয়া এই স্তম্ভটি বিজয় স্তম্ভরূপে নিৰ্মাণ করিয়াছিল। এই তিনটি লৌহস্তম্ভ প্রমাণ করিতেছে যে ৫ম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে লৌহ শিল্প অক্ষুণ্ণ ছিল।

ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোণারকের মন্দিরের লৌহের কড়ি বরণা

আর এক দিক দিয়া ভারতের প্রাচীন লৌহ শিল্পের পরিচয়

পাওয়া যায়। সেটা হইতেছে মন্দির নির্মাণকালে লৌহের কড়ি বরগার ব্যবহার। উড়িষ্যার প্রাচীন হিন্দু মন্দির সমূহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহের কড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। তার উপর আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর আটকাইবার জন্য কীলকের (iron bolts) ব্যবহার ও ঐ সকল মন্দিরে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ভুবনেশ্বর মন্দির সপ্তম, পুরীর মন্দির দ্বাদশ ও কোনারক মন্দির নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। এ সকল মন্দির গুলিতে যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহার কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা এখনও বিদ্যমান। পুরীতে এক গুঁড়ুটি বাড়ীতে দুই শতের উপর লৌহের কড়ি, বরগা ও কীলক আছে। কোনারকের অন্ধ ভূপ্রতিষ্ঠিত মন্দির হইতে ২৯ খানি লৌহের কড়ি পাওয়া গিয়াছে। ইহার একটি ৩৫ ফুট লম্বা ৭ ইঞ্চি চওড়া। এ গুলিও সব পেটা লৌহের দ্বারা তৈয়ারি।

লৌহ নির্মিত কামান

পরবর্তী মুসলমান যুগে লৌহ ব্যবহারের অল্পপ্রকার উপায় দেখিতে পাই। সেটা হইতেছে কামান নির্মাণ কার্যে। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সময় ভারতের প্রথম মোগল সম্রাট বাবর সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে কামান ব্যবহার করেন। তাঁহার পর মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সহিত স্রব্ধ কামান ভারতে প্রস্তুত হইত। এই সকল কামান অধিকাংশই লৌহ নির্মিত। পিত্তল নির্মিত কামানও ছিল। অবশ্য বন্দুক ত সহস্র সহস্র নির্মিত হইত। আইন আকবরীতে এই সকল লৌহ কামান ও বন্দুক কিরূপে লৌহ হইতে নির্মিত হইত তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এগুলি এখনও ভারতের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বিজাপুরের লণ্ড কেশব কামান ২১' ৭" লম্বা। উহা আওরঙ্গজেব ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিজাপুরের আর একটি কামান ৩০' লম্বা। গুলবার্গার কামানও প্রায় সেইরূপ

লম্বা হইবে। বাদশা দেশের—ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, প্রভৃতি স্থানেও এই সকল কামান এখনও দেখা যায়। দাবাদের কামানের গায়ে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে জানিতে পারা যায় যে উহা জাহাঙ্গীরের আমলের ঢাকা দারোগা শের মহম্মদ ও ইন্স্পেক্টর হরবল্লভ দাসের বধানে জনার্দন কর্মকার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। সকল কামানের লৌহও পেটা লৌহ। ঐ লৌহের গোলাকার বলয় পিটাইয়া পিটাইয়া কামান তৈয়ারী হইত। অনেক কামানে এই গোলাকার বলয়গুলি দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের কামান এমন নিপুন কারিগর নির্মাণ করিয়াছিল যে জোড়ার দাগ একেবারে অদৃশ্য। এই সকল কামান দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের প্রাচীন লৌহ শিল্প বেশ সজীব ছিল এবং সম্রাটগণ ঐ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত উল্লেখ্য যুদ্ধে নমুনা হইতে আমরা ভারতের প্রাচীন ও মধ্য যুগের লৌহ শিল্পের বেশ একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া পারি। আমি সেই চেষ্টাই করিয়াছি আমার 'Iron in ancient India'তে। ভারত আবার ইতিহাসকে পুনর্নবীকরণ করিতেছে। ভারতে আধুনিক কালে আবার লৌহ শিল্প পুনরুত্থান হইতেছে। এই পুনরুত্থানের কথা স্মরণে রাখা বারান্তরে বলিব।

পূর্বেই বলিয়াছি যে উপরোক্ত সকল লৌহই পেটা লৌহ। পেটা লৌহ ছাড়া লৌহের আরও দুইটি প্রকার আছে—ইস্পাত (Steel) ও ঢালাই-লৌহ (Cast iron)। ইস্পাতও ভারতে জানা ছিল। কিন্তু ঢালাই লৌহ খুব কমই জানা ছিল। ইস্পাতের ইতিহাস বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ট্রেনের কামরায়

শ্রীআদ্যনাথ রায় চৌধুরী

চেয়ারে শুয়ে এম, মজুমদার। ‘সাহেব’ ডাক নাম। সামনে মেলা আছে সংবাদ পত্রের ডানা দুটো। ‘কমার-সিয়েল ইন্টেলিজেন্স’এর পাতায় দৃষ্টিটা তার রয়ে গেছে আটকে। একেবারে পাসের ‘কল্যাণে’ বাঙ্গলা বিজ্ঞাপন— ‘গোবর্দ্ধনের আখড়া, ব্যায়াম ও মালিশে বৃদ্ধ যুবা হয়, পাতলা হয় মোটা।’ চোখ দুটো তার দেখে ফেলে কথা ক’রে; দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে আসে মন অন্ত সংবাদে। “ভগবান গড়েছেন যেমন তেমনিই থাকতে হ’বে,” এই হচ্ছে নূতন অভিজ্ঞতা। শরতের মেঘের মত কালো মুখটা তার আরও মলিন হ’য়ে যায়। তবে সে মলিনতা ক্ষণস্থায়ী।

হঠাৎ মনে পড়ে “যেতে হ’বে সেই ট্রেনে।” চাকরের সাহায্য পেয়ে তৈরী হ’তে বেশী দেরী হয় না। আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। খানসামা টিকিট ক’রে আনে, কোন শ্রেণীর? চায়ের দাম চুকোতে দেরী করেনি সাহেব। বক্সিস দিয়েছিল বুঝি বয়টাকে।

হুস্ হুস্ ক’রে বাঁশী বাজিয়ে, মাটি কাঁপিয়ে, বাত্মী গুলিকে জাগিয়ে চঞ্চল করে দিয়ে, ঢোকে ট্রেন। পিতলের নম্বর বাঁধা লোহার বেড়াটা নিয়ে আদান প্রদান যে কখন হ’য়ে গেছে, কেউ কি তা’দেখে? টিকিট বাবু যেন এসে আগলে দাঁড়িয়েছেন যাবার রাস্তা। মুটের চীৎকার, আর পান ওয়ালার জ্বন্দন শোনে সবাই, ডাকে ছচারজন।

বীর পদক্ষেপে মজুমদার ঢোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। ক্ষীণ বাঁশী জানিয়ে দেয়, ‘গার্ডের পতাকাটা নড়ে, দেখবার জন্তে। বালক কাণ খাড়া ক’রে শুনতে চায় ইঞ্জিনের চীৎকার, আর ফৌস ফৌসানি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলতে থাকে ট্রেন; আর তেমনি নিঃশ্বাস ফেলে মাথা চুকিয়ে নেয় বিরহী বিরহিণীর দল; যেন বাঁচা গেল।

নির্জন কামরা, দামী গদি আঁটা; ভারতের বিলাস, আর ট্রেনের মালিকের মোটা আয়। চার মিনিট পেরোতে না পেরোতে বাতাসের ছোঁয়া লাগে সাহেবের মনে। নীচের

দিকে বেরিয়ে যায় একটা ছোট নদী; জল আছে কি নাই, বোঝা যায় না।

• মনেরও বিরাম নাই, ছোট ট্রেনের মতই। “ব্যবসাটা এই সময় দাঁড়িয়ে যেতে পারে; চাই কি যুদ্ধটা টিকলে হয়।” আর কিছু ভাবে না সাহেব। কিছা ভাবে, খুব বেশী, এলোমেলো, যা’ তা’। এমনি করে যখন অনেকটা সময় কেটে যায়, তখন ফিরে আসে জ্ঞান, কামরার মধ্যে। বুঝতে সাহেব পারে, চিন্তাগুলোর একটা ধারা আছে; পুরান খাল বেয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে চিন্তার ধারা যেখানে সে পুষ্ট হ’য়েছে,

সেখানে একটা নেশা আছে। সাহেব ভাসিয়ে দেয় মনটাকে—

—“সাত বছরের আগের কথা, তখন ছিলাম ছাত্র;” বন্ধুদের কথা মনে পড়ে তার,—তা’রা ঠাট্টা কোরত, ঝগড়া কোরত, ভালবাসত।” গদির ওপর চাদরটা বিছিয়ে নেবার কথাটা মনে আসে। সাদা চাদরের ওপর বসে ‘ইন্ডোনাথকে জাগিয়ে তোলে চোখের সামনে। ‘সবিতা ছিল, ইন্ডোনাথ ছিল; স্বন্দর সে জীবন। পরীক্ষার ভাবনা ছিল, আর ছিল বাবার টাকা। সামান্য ‘ফটো’ নিয়ে তা’দের সঙ্গে ঝগড়া কোরেছি; ঝগড়াটা ছিল কত মধুর। আজ আর সে ‘ফটো’ নাই, যার ফটো সে কোথায়?”

এলিয়ে দেয় দেহটিকে চাদরের বুকে। ‘পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে টানতে থাকে—“হোষ্টেলের পাশে থাকত প্রশান্ত সরকার। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ব্যবহারটা ছিল ভাল।” ধোঁয়া ছাড়ে সাহেব; ধোঁয়ার মাঝে দেখতে পায় কার কুণ্ডলাহিত কেশ?

—“খেলা দেখে ফিরছিলাম। সাধারণ নিয়মে জল নেমে পড়ায়, দাঁড়িয়েছিলাম যে বারান্দায়, সেটা প্রশান্ত বাবুর বাড়ী। দরকার পড়েছিল ছাতার আর সেটা পেয়ে-

ছিলাম পূর্ণিমার হাত দিয়ে।” তারপর অনেক কথা, সব স্বাভাবিক, সহজে জন্মায়।”

মজুমদার সাহেব পা’ ছুটোকে তুলে দেয় বেঞ্চ; একেবারে শুয়ে পড়ে এই অবেলায়। দেহের মত মনটাও যেন ক্রমেই লতিয়ে পড়ছে! তবু ছুটছে যে তার মন।

—“পূর্ণিমার বাবা প্রশান্ত বাবুই পেড়েছিলেন কথাটা। পূর্ণিমার মাকে বোলতাম কাকীমা। হয়ত কাকীমাই কথাটা পাড়িয়েছিলেন তাঁকে দিয়ে। তিনি স্নেহ কোরতেন, প্রায়ই নিমন্ত্রণ কোরতেন। প্রশান্ত বাবু বলেছিলেন—তোমার বাবা যাতে রাজী হ’ন মনি, তার চেষ্টা কোরো। পূর্ণিমা আমার বড় ভাল মেয়ে, তোমাকেই দেবো ভার; চেষ্টা কোরো। বাবাকে রাজী করাতে পারি নাই। তখন বাবা ছিলেন বড়লোক। সহজেই প্রেমের বিয়ে পছন্দ কোরলেন না। দাম নাকি আমার অনেক বেশী।”

নিবিয়ে যাওয়া ‘পাইপটা ধরিয়ে নিতে দেবী তার হয় না। কোন একটা ‘ষ্টেশনে’ দাঁড়িয়ে যায় গাড়ীটা, মনটাও সাথে সাথে। আবার গাড়ী ছোটে, মন ছোটে আবার।

—“আজ আর বাবা নাই; কিন্তু পূর্ণিমাও নাগালের বাইরে। কুমোর ওপরে বসে’ সবিতা ঠাট্টা করেছিলো, ‘একেবারে রাধিকার দশ লক্ষণ প্রকাশিত প্রকটিত উদ্ভাসিত উদ্বেলিত’ তাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ মন্তব্য পাশ করেছিলো—“দূর, এ যে আধুনিকা, দশম লক্ষণে এঁরা পৌছন না। বুঝছে আজ মণি মজুমদার—দশম দশা পায় আধুনিকারা, যেমন পেয়েছে আমাদের পূর্ণিমা।”

একদিন চা খেতে খেতে, পূর্ণিমার চোখে যে ভাষা আঁকা আছে দেখেছিল, সে কি ওর মনে পড়ছে না? পড়ছে ব’লেই বিরক্ত হ’য়ে, এতক্ষণ হাতে ধরা ছিল যে পোড়া কাঠিটা দেশলাইএর, সেটা দেয় ফেলে। তিন হাত পিছিয়ে পড়ে কাঠি, মনটাও।

—“বলেছিল পূর্ণিমা—“মণিদা তোমার ক’ইন্তাল কোন মাসে? এপ্রিল এ? সে ত আর দেবী নাই।” যখন উত্তর দিলাম, “না দেবী নাই,” তখন চুপ ক’রেই ছিল সে। শেষে বলেছিলো—“তারপর চ’লে যাবে?” যাওয়া যে স্বাভাবিক সেটা সেও জানত। তাই আমার উত্তর না

পেয়েও কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল পূর্ণিমা। মা’ক’থা থেকে ব’লে ফেলেছিল, “পড় না তুমি, ফাঁকি দিয়ে অ’হুঁ দাঁও জানি।”

চলে এসেছিল মণি। পাঁচ মাস পরে চিঠি পেয়েছিল “মণিদা কাগজে দেখলাম তুমি পাশ করেছ।”

“বাবার মত হয় নাই—পূর্ণিমার বিয়ে হ’ল কোন বিলাসবাবুর সঙ্গে। আর আমার জুড়ি খুঁজতে লাগলেন খটক। এমনি ক’রে বছর দেড়েক কেটে গেল তারপরও। মাঝখানে একবার পেয়েছিলাম অপরিচিত বিলাসবাবুর পত্র—“আপনার সঙ্গে পরিচিত হ’তে চাই। শুনেছি আপনার কথা, আপনার প্রশংসা পূর্ণিমার মুখে কৃতকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে রাখতে চাইনি। তাই নিঃস্বস্তার উত্তর।”

শেষে বাবার কথায় গেলাম কনে দেখতে। বাবার আপ্যায়িতটা মনে পড়ছে; কিন্তু মনে ত পড়ে ক’নের মুখটা কেমন।

দ্রৈণের আলো জলে ওঠে। চমকে উঠে মজুমদার সাহেব; দেখে, কখন কোন ফাঁকে এক ভ্রমর উঠে বসে আছে সেই কামরায়। চিন্তার ফাঁকের মত পারেনি বুঝতে সে এই নবাগতের কথা। লজ্জিত যায় মনে।

স্বন্দর সন্ধ্যায় মনের আকাশ রাঙা হ’য়ে ওঠে আবার ছেঁড়া মেঘে জোড়া ল্লাগে। আবার ওঠে ছাপিয়ে—কামরা ছাড়িয়ে, ট্রেন ছাড়িয়ে, টেলিগ্রাফ তার ছাড়িয়ে, সবুজ মাঠের অপর পারে, নীলাকাশের স্তম্ভ কোলে চ’লে যায় সে। কি হয়েছে তার জীবনে? ব’লে চ’লে গেছেন কোন্ দিন। বিয়ে তার হ’ল না মাঝখান থেকে মনটা উঠেছে ভারি হ’য়ে। আজ বাবা গেছেন, পূর্ণিমাও গেছে। মনে আছে পূর্ণিমার শেষ কথা—“মণিদা, খোঁজ ত নাও না, আমিও নিই না দেখবার সাধ হয়েছিল তাই ডেকে পাঠিয়েছি।” অনেক আবেল তাবোল বকেছিল। শেষে বিনা অসাক্ষাতেও যে কটা কথা বলেছিল, তার দাম কত? “পারি নাই সব দিতে আমার স্বামীর পা দোষী হয়ত আমিই, কিন্তু উনি যে চান নাই কিছু দান

ওঁর কে এক বিলেত ফেরৎ বান্ধবী আছে, ওঁর নিজেরও ইচ্ছা বিলাতে থেকে ভাল ক'রে আরও কিছু পড়াশুনা করেন।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—“আচ্ছা মণিদা, জগতে টাকা আর সম্মানটাই বড়, না? আর সব মিছে?” ঠিক বুঝি নি তখন। যখন শুনলাম পূর্ণিমার মৃত্যুর এক মাস পরেই বিলাস চ'লে গেছে বিলাত, তখনও স্থগা করছিলাম তাকে। কিন্তু আজ যেন মনে হয় টাকা আর সম্মানটাই ছলভ। কি হয় এসব প্রেমে ভালবাসায়?”

যেখান নামবার সেইখানেই নামে মজুমদার সাহেব। একজন কর্মচারী সম্মান দেখিয়ে নিয়ে যায় ওকে। নিজের মটরে চড়ে বসে সাহেব। অনেকদূর গিয়ে হঠাৎ সাহেব

ব'লে ওঠে—“আচ্ছা মানেজার বাবু, সে লতিকা মেয়েটির বাবা কি এসেছিলেন আর?”

“আজ্ঞে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা আপনার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়েটা—”

• “আপনি কি ভাবেন?”

• “আমি ত বলি ভালই।”

“আমি ভেবে দেখলাম, সারা রাস্তা ঐ কথাটাই ভাবছিলাম, বিয়ে করবার দরকার, অন্ততঃ শাস্তির জন্তে। কেমন? আচ্ছা লতিকার বাবাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন!”

শরৎ সমাগমে

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

নীল নভোতল করে বলমূল

আজি-অপরূপ মাধুরী ভারে ;

জেগেছে হ্যালোক ভূ-লোকের বৃকে

যেন-রে, বরণ করিতে পারে।

তরুণ-রবির স্বর্ণ-কিরণে

খচিত ধরতী কমিত হিরণে ;

খেত মনোহর শিউলী টগর

সাজায় দিব্য বরণ-ডালা,—

রক্তজবার গাছ ভ'রে যায়

রাঙা ফুলে দিক্ করিয়া আলা।

শ্রাম নিচোলের আঁচল উড়ায়ে

হাসিছে প্রকৃতি পুলক' ভরে ;

কত না কুসুম চুনি পান্নার

দীপ্তি ফুটিছে তাহার পরে !

সবুজ সোনালী ধাত্তের ভার

মাঠে মাঠে যেন নাহি ধরে আর ;

মন্দ হাওয়ায় চামর ছলায়

পথের দুপাশে কাঁশের বন ;

শাখীর শাখায় আগমনী কার

গাহিছে মধুর বিহগগণ।

গভীর দীঘির কালোজলে আজ

শত শতদল নৃত্য করে ;

নীল ফুলে-ফুলে অপরাজিতার

সারাটি অঙ্গ গিয়াছে ভরে,

আজিকে রূপে ও রসে ও গন্ধে

মেতেছে বিশ্ব পরমানন্দে ;

বানহারা ভরা তটিনী ছুটিছে

সাগরের পানে কলস্বরে !

শক্তিপূজার সার্থকতা

শ্রীনিখিলচাঁদ বড়াল

জীবনসংগ্রামে জীব নিয়ত নিরত।
পক্ষে দ্বন্দ্বসংকুল আততায়ী। একপক্ষ অধর
জিত করে; তখন হয় আনন্দ। সেই বিজয়া-
গীতা হ'য়ে ওঠে মাতালের তামস উৎসবে। তখন
গাড়ে অলক্ষ্যে যুদ্ধের মঙ্গল রেণু। মাতিয়া উঠে
তার দল ঈর্ষার কশাঘাতে। ঈর্ষার পেষণে রণমদ
ওঠে হু হু করে। দাবানলের সৃষ্টি হল যেমনি; সেই
ন পুড়ে ঝলসে গেল প্রবৃত্তি ফুলরাশি। প্রবৃত্তি যায়
নিবৃত্তি আসে। তখনি হয় প্রয়োজন শক্তি পূজার। শক্তি-
পূজার সার্থকতা মুক্তির নির্মাণ আনন্দে! সকল দুঃখের
মুক্তিই নির্মাণ বাণে বৃত্তির অরিকুলকে চিরধ্বংসের সমর-
ক্ষেত্রে বলীন করে। শক্তি ও মুক্তি পাশাপাশি এসে দল
করে দাঁড়ালেই সকল বন্ধনের বিজয় বিসর্জন হয়। এই
খানেই শক্তি পূজার শেষ ও সার্থকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।
তারপর শুধু অবিচ্ছিন্ন স্ব্থ; তারপর আবার শান্তিশ্রী; তার
পর অমোঘ প্রতিষ্ঠা; শেষে পূর্ণ আনন্দ ও অভিলষিত
অভিষেক।

দুর্কলতা পুঞ্জীভূত হয়ে সমস্ত প্রাণটাকে অধীনতার
শৃঙ্খলে বেঁধে বিফলতার কারাগৃহে অন্ধ মুক করে ফেলে
রেখেছে; হতাশ গুহার অন্তরালে বদ্ধ জীব থেকে থেকে
মরীচিকার উন্মাদনায় আত্মহারা। আশা-চপলার চমক
মাঝে মাঝে কারা বাতায়নের অন্ধদৃষ্টি ঝলসাবার চেষ্টা
কছে; কিন্তু সাধ্য কি তামস ঘন ভেদ করে কারাপ্রাচীরের
বুক চিরে বন্দীর ঘরে প্রবেশ করে! তবুও চলেছে দ্বন্দ্ব,
আলো ও অন্ধকারের মধ্যে। আলো চায় অন্ধকারা ভেদ
করে বন্দীর বৃকে ঝলক পলক পলকে বুলিয়ে দিয়ে যায়;
কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার গভীর ঘন তামস প্রভাব ছেড়ে যেতে
চায় না যুগ সঞ্চিত কারান্ধকার! বন্দী কারাগৃহে! আলোক
উচ্ছ্বাস কামনায় চিত্ত তার অনুরণিত! বন্দী কারাগৃহে বসে
চিরবাহিতের স্বপ্ন দেখে। একদিন তার স্বপ্ন জাগরণে সার্থক
হবে একদিন নিশ্চয়ই তার অবরুদ্ধ দুর্কলতা শক্তির স্পর্শ

পেয়ে দলিত খলিত—অধীন ক্ষুদ্র প্রাণে সার্থক স বলতার
আকার ধরে, চিরক্লিষ্ট বন্দীর বন্ধন দুঃখ মোচন করতে
পারবে! সেই দিনই হবে সাধকের শক্তি পূজার সার্থকতা।
শক্তি পূজা এনে ছিল মুক্তির আলো। আলোর বরণায় স্নান
করে ঘনতমোদানব স্নিগ্ধ শান্ত মুর্তি দেবের পূজায় ব্রতী
হল, স্বরূপ হল অন্ধকারে আলোর পূজা। স্বরূপ হল দুর্বলের
শক্তি পূজা বল, বুদ্ধি, ষক্তি, শ্রী, মেধা ও বিজ্ঞান এসে জুটল
শক্তি পূজাঘর্নে জয় নির্মাণ্য নিয়ে। ছুটে এল কারা
ছেড়ে বন্দী! টুটে গেল সব বন্ধন। মুক্তির আলো
ছড়িয়ে গেল কারাব প্রাচীর প্রাঙ্গনে! ভেঙ্গে গেল
অধীনতার নিগড়। স্বাধীন মুক্ত জীব শক্তিপূত অলে
সজ্জিত। শক্তির সমরে অন্ধ মুক নীরব স্পন্দনকে জীবনের
দ্রুত ভীম ভ্রমণে চকিত বিতাড়নে জীবন্ত আবেশে পরিণত
করা এই শক্তির সাজের উদ্দেশ্য। এবং ইহাই শক্তি পূজার
সার্থকতা।

জীবনই শ্রেয়ঃ। মরণ চির দিনই অপ্রিয়। জীবনে
পুলক মরণ জয়ে মাতিয়ে তুলেছে,—জীবনকামী জীবকে।
মরণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে জীবন্ত জীবকুল। জীবন-
ব্যাকুল জীবকুল মরণের আত্মদালনকে অগ্রাহ করে ছুটে
চলেছে অমর অমিয়রাশির ভাঙার লুঠ করতে। এই
অভিযানের মূলে শক্তি অন্তর্নিহিত। এবং অন্তর্নিহিত
শক্তির বাহ্যিক পূজাভূতানই আমাদের চিরাচরিত শারদীয়া
শক্তি পূজা।

শক্তিপূজার মূল উৎস বিজ্ঞানের মূলে। অজ্ঞানের
ঘনতম ঘূচে গেলে, বিজ্ঞানের অমোঘ আলোক অঙ্কুরে
শক্তি পূজার প্রারম্ভ। শক্তিপূজায় অন্ধ মুক সংস্কার মাত্র
নাই; আছে শুধু বিজ্ঞান বিতান ও মার্জিত মহাবিপ্লার
বিজয় ভেরী। বাজে ঢাক; ঢাক নয় শুধু মাদল! যে যে
বিজয় মাতন মাত্র। পূজায় আছে সত্য। সত্যে আছে
অমোঘ ধর্ম। অমোঘ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আমাদের এই
শক্তিপূজা। শক্তি পূজার ফল, অদম্য বল ও জীবন

প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা জয়, সফলতা, অনন্ত পূর্ণা ও অবধা
প্রভাব, এই হল, শক্তি পূজার সার্থকতা।

পশু স্বভাব সমরে অস্থির যুদ্ধে এগিয়ে এল স্থরের দল।
হেরে গেল স্থর। অস্থির তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ধ্বংসের
দ্বারে। সেখানে দ্বারী ছিলেন অস্থিরদলনী শক্তি স্বরূপা
যোগমায়া। অস্থরের প্রসার রুদ্ধ হল শক্তিতোরণে।
লাগল যুদ্ধ শক্তি ও অস্থরের মধ্যে। শক্তির কোপে অস্থর
হ'ল শক্তিহীন। শক্তিহীন শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জড় কি
ক'রে করে! শক্তির পাদমূলে অস্থর নিহত হল। শক্তির
জয়। স্থরাস্থরের যুদ্ধের ফল, শক্তির জয় ও মুক্তির প্রতিষ্ঠা।
পশু রাজ সিংহকে বাইন করে শক্তি স্বরূপা শ্রীশ্রীচণ্ডী বা
আমাদের চিরপূজিতা শারদীয়া যোগমায়া মা, সমগ্র ইন্দ্রিয়
গ্রামকে দমনায়ত্তে রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন। পশু রাজ সিংহ
বাহিনী শ্রীশ্রীহর্গার অস্থর সত্যদ্রোহী শক্তিহীন মনস্তত্ত্বের
পরিচয় দিচ্ছে। তারপর আরও আছে। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী
প্রতিমা শক্তিমান জীবের সৌন্দর্য ও মাধুর্য স্বরূপের প্রতিষ্ঠা
পরিচয় দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রতিমা শক্তিমান জীবের
অন্তরস্থ বিদ্যা, মেধা ও বুদ্ধিবস্তুর শক্তিপূত প্রতিষ্ঠার প্রমাণ
দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীকার্ত্তিক দেব প্রতিমা শক্তিমান সাধকের জয় বিগাস
পরিচয় দিচ্ছেন, শ্রীশ্রীগণেশদেব দেব, প্রতিমা শক্তিমান

বৈজ্ঞানিকের অন্তরস্থ বিদ্যা ও বিদ্বান
 দিচ্ছেন। এইরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝা
 শক্তি, জয়, বিজ্ঞান, মৌলব্যা ও বিদ্যা বুঝা
 প্রকাশ্য নিয়ে সাধকের চিত্তে পূর্ণশক্তি
 প্রতিপাদন কচ্ছেন। সাধক শক্তিপূজা
 মূর্তিযাত্রের পূজা করেন না, শক্তি ও
 প্রতিমা পূজা করেন। এই পূজার সার্থকত
 আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ প্রেতাণ এবং পরি
 নীতি সমাধি !

ভারত এই শক্তিপূজার সার্থকতা ভুলেই নিবীৰ্য্য পড়িল।
পর পদনেহী দলিত অলিত, হীন জাতিমাত্র ! ভারত
শক্তি পূজার পূণ্য বেদী তখন ছিল ভারতে মুক্তি
• অমোঘবাণী ও সর্বত্র শক্তির শাসন। আজও ভারত
যেন তার চিরাচরিত শক্তির পূজায় নিত্য মুখরিত হয় ;
আজও যেন ভারতের ঘরে ঘরে শক্তি প্রতিমার মহতী পূজা
ঘটে পটে রটে, আজও ভারত আশা করে তার সমুজ্জল শক্তি
পূত দিনগুলি আবার ফিরে আসবে ! আবার বিজয়
বিতানে শক্তির রণ দামামা বেজে উঠবে বলহীনের আর্ত-
নাদের মধ্যে আততায়ীর উত্তপ্ত রক্তদীপ্ত পাংকলুষ বীর্য
ক্ষেত্রে । শক্তি পূজারী ভারত বিশ্ব বিজয়ী চিরদিনই ।

তোমার কথা

শ্রীশুকুমারি মুখোপাধ্যায়

বাজার হিসাব লিখে লিখে শেষ—

ইচ্ছা হল কবি হওয়াই বেশ ।

লিখতে গিয়ে দেখি, ওমা মোটে

কলমখানা একেবারে না-ছোটে।

তবু আমার চাপলো মনে রোধ

লিখতে হবে যা-হয় কিছু হোক।

অনেক ভেবে মাথামুণ্ডু খুঁড়ে

তোমার কথাই লিখি পাতাজুড়ে !

বাঁশীর তানে

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

—গল্প—

দাছ, একটা গল্প ব'লো না?—সুনীলা দাদামহাশয়ের কাছ ঘেসিয়া বসিল।

গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে বাহির করিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া অনিল বাবু বলিলেন—

—কিসের গল্প শুনবি, বল?

—সুনীলার জেষ্ঠা ভগিনী তার ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া সেই স্থানে বসিয়া বলিল—ভূতের গল্প বলুন, দাছ!

—এই অন্ধকার রাতে ভূতের গল্প শুনে তোরা ভয় পাবি—

—না দাছ, আমাদের একটুও ভয় ক'রবে না, আপনি বলুন। আমি ভূতের গল্প শুনে বড় ভালবাসি।

—ভয় করবিনে...সত্যি বল্ছিস ত?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ...মিথ্যে কেন বলবো—বলুন!

—তবে শোন—একটা সত্যিকার গল্প—

সুনীলা উঠিয়া বলিল—একটু থামুন দাছ—আমি এক ছুটে ছোট মামা আর সেজ মাসীকে ডেকে আনছি।

হাসিয়া অনিল বাবু বলিলেন—মজলিস্ জমাতে চাস্ বুঝি!

—ওরা গল্প শুনে ভালবাসে—বলিয়া সুনীলা দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল, এবং তখনই তার মামা, মাসীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া বলিল—রলুন দাছ...এইবার।

বার দুই গড়গড়ার নলে টান দিয়া অনিল বাবু বলিলেন—শোন সব চুপ করে...ভয় পাসনে।

*

*

সে অনেক দিনের কথা—তখন তাদের দাছ কলেজে পড়ে। আমার বাবা পশ্চিমে রেল চাকরী করতেন। তাঁর নানান জায়গায় বদলির জন্তে আমাকে একাই সহরে থেকে পড়তে হ'তো। বাবার মাইনে কম থাকায় বোর্ডিং

বা লজে থাকার মত সামর্থ্য আমার ছিল না। আমার মতো দুটি গরীর বন্ধু আমার ছিল। তারা হিন্দুস্থানী। আমরা তিনজনে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া নিয়ে ছিলাম। পালা ক'রে, নিজেরাই রান্না ক'রতাম।

সে দিন শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। পশ্চিমে ঐ দিন খুব আনন্দের। তোরা যেমন ভাইদ্বিতীয়া মানিস, তারা ঐ দিনটিকে তেমনি মনে করে। ভাইকে রাখি বাঁধে, তার কল্যাণ কামনা করে...সেদিনটি ওদের খুব বড় উৎসব।

কলেজের ছুটি থাকায় শঙ্কর এসে বললে, তার এ আত্মীয় তাকে নিমন্ত্রণ করেছে, সে যাবে। আমি বললাম—ফিরবে কখন?

—সন্ধ্যার আগে।

—রামচন্দ্র কাল সন্ধ্যায় তার বোনের বাড়ী কে গাঁয়ে গেছে, কাল আসবে—তুমি ও থাকছ না, তবে রাত্তির রান্নার দিকেও ছুটি!

শঙ্কর বলল—তাই কি হর! তুমি কি খাবে?

—একটা দিন না হয় উপোস দেওয়া যাবে।

—না—না—রান্না না কর, পুরি কিনে খেও।

—সে দেখা যাবে, এখন—তুমি ত যাও।

শঙ্কর বার হয়ে যাবার সময় বললে,—দেখ ভাই! যেন উপোস ক'রে থেকো না, আজ তেওহারের দিন, তাহলে আমি ভারী কষ্ট পাব মনে!

আমি হেসে বললাম—না—না!—পেট জ্বলে, তুমি আপনিই খেতে হবে, তুমি ভেবো না।

দিনের বেলায় খুব খানিক ঘুমিয়ে ওঠার পর, বিকেলে দিকে মনে করলাম একটু বেড়াতে যাব কিন্তু আকাশে দিকে তাকিয়ে সে আশা ছাড়তে হলো। শ্রাবণ

আকাশ ঘন-ঘটা করে আসছে। দিনের অন্তিমটুকু পর্যন্ত বুঝবার উপায় রাখেনি। এ সময় বেড়াতে যাওয়া যে বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তা বুঝাই, লঠনটি জালিয়ে একখানি ইংরাজী নভেল নিয়ে বসলাম। একটু পরেই মৃদলদ্বারে বৃষ্টি নামল। কখন যে সন্ধ্যা উত্রে, রাত হয়ে গেছে, বোঝা যায়নি। খিদে বোধ হওয়ায় বই বন্ধ করে উঠলাম। বৃষ্টির জোর দেখে শঙ্করের ফিরবার আশা ত্যাগ করে আহারে বসলাম।

খাওয়ার পর আমার প্রিয় বাঁশীটি বার করলাম। বন্ধু মহলে, এই বাঁশীর জগে আমার খুব আদর ছিল। তারা বলত, এমন বাঁশী তারা নাকি শোনেনি আর।

আপনমনে আমি বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছিলাম, কোন হুঁসই আমার ছিল না যে কতক্ষণ বাজাচ্ছি। হঠাৎ খোলা দরজার সামনে একটা ছায়া দেখলাম। ভাবলাম শঙ্কর এসেছে; কিন্তু সদর দরজা আমি নিজে হাতে বন্ধ করে এসেছিলাম, আমার সন্দেহ হ'লো সে এলো কি করে! তবে কি আর কেউ? চোর? কিন্তু তখন মনে হ'লো, না, নিশ্চয়ই শঙ্কর।

বাঁশী বন্ধ করে, আমি বললাম—দরজার পাশে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, এ দিকে এসো—

আমার ভাকে কিন্তু সে এলো না, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

হেসে আমি বললাম, তুমি ভেবেছ, আমাকে ভয় দেখাবে! কিন্তু আমি ভয় করি নে—কেন ওখানে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বৃষ্টিতে ভিজছ, এস ভেতরে।

সে ঘরের মধ্যে এসে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আমার আলোটি নিবে গেল। বিশ্বয়ে আমি শুধু তার দিকে চেয়ে রইলাম।

আমাকে সে বললে—তুমি ভয় করনা...?

তার দিকে চেয়েই আমি বললাম—না। সে আমার এত নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল, তবু অন্ধকারের মধ্যে এক দীর্ঘ ছায়া ছাড়া আর কিছুই আমার দৃষ্টিতে আসেনি, আর অত

কাছে থাকলেও মনে হচ্ছিল, তার গলার স্বর যেন কোন পাতালপুরী হ'তে ভেসে আসছে।

আমার কথা শুনে সে বিকট ভঙ্গীতে হেসে উঠল। বললে, আমাকে দেখে তোমার একটুও ভয় করছে না?

ভয় যে আমার একবারেই হয়নি, তা নয়—কিন্তু আমি মুখে তা প্রকাশ না করে জোরের সঙ্গে বললাম—মোটাই নয়—

তোমার ত খুব সাহস! তুমি বাঁশী বাজাও খুব মিষ্টি।

আমি বললাম—তুমি কে?

—সেখা শুনে লাভ কি তোমার!

—লাভ কিছু না হ'লেও শুনেতে দোষ কি?

—দোষ আছে। সে শুনে, তোমার আর এ সাহস থাকবে না—তার চেয়ে তোমার বাঁশী বাজাও।

—অত ভীতু আমি নই—ব'ল তুমি কে?

—পরিচয় দিতে এখানে আসিনি, তোমার বাঁশীর তানে টেনে এনেছি—বাজাও, আবার বাঁশী বাজাও।

আমার কিন্তু তখন আর বাঁশী বাজাবার মত অবস্থা ছিল না, মনের ভিতর বেশ একটু ভয় ঢুকেছে; বললাম, —তোমার পরিচয় না শুনে আর আমি বাজাব না।

—আমার পরিচয়...এ জগতে আর নেই।

—তবু ব'ল তুমি কে?

—আমি কে? আমি কেউ নই।

—কেউ নও?

—না—না আমি কায়া নই, ছায়া, হাওয়া—সঙ্গে সঙ্গে একটা দুমকা বাতাসে আমার ঘরের জানালা দরজাগুলি একসঙ্গে একবার খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। আমি চমকে চেয়ে দেখি ছায়া মূর্তি আর সেখানে নেই।

* * * *

শুনীলারা ভয় পাইবে না বলিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ হইলে দেখা গেল তাহারা সবকটি এক সঙ্গে জড়াইয়া আছে।

মৌগিক

৩রাধাচরণ চক্রবর্তী

পূর্বানুবৃত্তি

রক্তমা কেটে সূর্যালোক এবার দীপ্ত গুহতার ছড়িয়ে পড়েছে। রোদমুখো চলতে হ'চ্ছে বলে অশেষ মুখ নাগিয়ে চলেছেন। লাল থোয়া ঢালা ফুটপাথের ওপর সাদা রোদ পড়ে' পথটাকে দিয়েছে বিরাগের গৈরিক বর্ণ।—অতসীর মুখে তিনি এমনি একটা কঠিন বিরাগের ভাব দেখে' এসেছেন। তার পাণ্ডুর পীত-রক্তাভ মুখে এই ইন্টার টুকরোগুলোর মতই একটা কঠিনতা!

অতসী যেন কঠিন ভাবে তার সীমাবদ্ধ বিশেষ স্থানটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তার স্বামিত্বপ্রধান সংসারের দিক থেকে, তার দিক থেকে। মানুষের যে চিন্তের দুর্বলতার সংস্কারের বন্ধন, সেই বন্ধনে টান পড়েছে বলে' অশেষের নিজের সংস্কারও কেমন অল্পচিত বোধ হয়। সে যেন...

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে' গেল, অতসীর গতকল্যের আশ্চর্য্য সীমন্ত-প্রসাধনের কথা। অমন স্থূল সিঁছরের রেখা আর কোন দিন ওর সীমন্তে তিনি দেখেন নি; স্বামিত্বের স্বীকৃতি... সংস্কারের আজ্ঞাবহতা...

কিন্তু—বাইরের অভ্যাস এবং ভেতরের স্বভাব। ওর স্বভাবের বিচলতাই ওর অভ্যাসকে বাড়িয়ে দিয়ে অমন অস্বাভাবিক করে' তুলেছে। ওর অজ্ঞাতেই ওর মন যেন ছদ্মবেশ পরিয়ে দিয়েছে ওর আচরণে।

...ওর মন ওর আয়ত্তে নেই!

কিন্তু—

কি এখন কর্তব্য তাঁর? কি করে' ওর বিরাগী মনকে ফেরাতে পারেন তিনি এখন? পথের মাঝখানেই কি কর্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন। দাঁড়িয়েই থাকেন করেক মুহূর্ত। রৌদ্রতাপের ভেতর দিয়ে তাঁর মনের পরিতাপই যেন তাঁকে প্রতপ্ত করে' তুলেছে। এত সকালেই এ কি রদ্দুর!

যেন কর্তব্য নির্ণীত হয়েছে...অশেষ আবার চলতে শুরু করেন।

হ্যাঁ, এই তাঁর কর্তব্য! কোনপ্রকার কৃত্রিমতার ছাড়া তিনি নিতে চান না—কোন কৌশল বা বাধা নয়। ওর একটা স্বাধীন সত্তা আছে, বেহেতু ও' ছেলেমানুষ নয়। ওর মন আছে এবং মনন আছে; ওই বিচার করে' পথ নির্ণয় করতে যখন তিনি নিজের বিচারে কর্তব্য নির্ণয় করলেন।

না,—তিনি কোন পরিণত মনের স্বাভাবিক প্রতিহত করতে চান না কোন প্রকারেই। কারণ মানুষের মনকে জোর করে' ঠকাবার ব্যর্থতা—তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সমূহে পড়েছেন।...তিনি আত্মবঞ্চনা করতে চান না।

ওর বিরাগ যদি বিবর্তিত হ'য়ে তাঁর দিকেই আবার ফিরে' আসে, তিনি নব-প্রণয়ীর মত পূর্বরোগের স্বাদ গ্রহণ করতে সেই অহুরাগের ভেতর। আর ওর বিরাগ যদি ওর মনকে অজ্ঞাত পরিবর্তেই উন্মুখ করে' তোলে তাতেও তিনি ওর প্রতি দোষারোপ করবেন না। তিনি শুধু—

অশেষের হৃদপিণ্ডটা একবার মোচড় দিয়ে উঠতে চান। চাদরের তল দিয়ে সবলে বুকেটাকে চেপে ধরেন। এ তাঁর সংস্কারের দুর্বলতা।...হ্যাঁ, তিনি শুধু সংস্কারমুক্ত শিল্পীর মত উদার দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে' চলবেন বিষয়বস্তুর স্বাভাবিক পরিণতির ছন্দ।

চাদরের মুড়ার কপালের ঘাম মুছে ফেলতে ফেলতে অশেষ এসে অতিথির তৃতীয় দিনে প্রবেশ করলেন।

নীচের দালানের একেবারে এদিকে সরে' বাঁ'র দেয়ালে মুখোমুখি ওরা দু'বোন দাঁড়িয়ে আছে—একজন দেহের ঠেসান দিয়ে, অল্পজন তার কাঁধের ওপর হাত রেখে। ওদের দুজনেরই মুখে উদ্বেগের চিহ্ন—দৃষ্টিতে ব্যাকুলতা।

অশেষ দোর পেরিয়ে দালানে পা দিতেই ওদের দুজনের মুখে একই সঙ্গে তাঁর চোখে পড়ে। ওরা এমন মুখের ভাব নিয়ে

দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন দারুণ উৎকর্ষার সঙ্গে কার প্রতীক্ষা করছে।

চির-পরিচয়ের বিশেষ ছুটি স্থানে—ওদের দুজনের চোখে চোখ তুলে' তাকাতেই ওদের দৃষ্টির সঙ্গে মিলে তাঁর দৃষ্টির বিষয়—ওদের দুজনের দৃষ্টি দুটি হাতের মত একই সঙ্গে তাঁর মনকে স্পর্শ করে' যায়।

মুহূর্তেই ওরা দুজন চোখ নামিয়ে নেয়। অতলার নত মুখে খুসীর চাপা আভা,—অতসীর আনত চোখের কোণে ছ'কণা
• অশ্রু বিন্দু হ'য়ে দানা বেঁধে উঠছে।

অশেষের বুঝতে দেবী হয় না যে প্রতীক্ষার পাত্র তিনিই।
কিন্তু তাঁর জন্যে ওরা...

কি এমন হয়েছে!... অশেষের কোঁতুল হয় এবং একটু উদ্বেগও যে না হয় তা' নয়।

তিনি এগিয়ে আসতে আর একবার অতলার মুখের দিকে এবং অতসীর চোখের দিকে চান। ধীরে বলেন, “কি হয়েছে, এমন করে' দাঁড়িয়ে আছ এখানে এসে?”

অতসী মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। তার চোখের কোণের কারুণ্য ফোঁটা ভেঙে গালে ঝরে' পড়তে পারে। অশ্রু মুখ করে' কৌশলে চোখের কোণ হাতের পিঠে মুছে ফেলল।

অতলা সলজ্জ হেসে বলে “আমি না—দিদি। সকালে কখন উঠে' কোথায় আপনি বেরিয়ে গেলেন যে জামাই বাবু, বাড়ীর কাক পক্ষীতেও জানে না। আপনি যে কি! এমন করে' ত' কোনদিনই বানানা কখনো? তাই দিদি ভেবে 'অস্থির!... আমিও দিদির সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে আছি এখানে।”

একটু থেমে বলে, “ভাগ্যে আপনি শীগ'গির এলেন।”

অশেষ অভিভূত। এই সংসারে এখনো প্রধান স্থান অধিকার করে' আছেন তিনি। তিনি জোর করে' তাঁর ছলছলে চোখ দুটিকে আয়ত্তে আনেন।

“দুজনই সমান ছেলে মানুষ!”—অশেষের স্বর প্রগাঢ় হ'য়ে ওঠে। তিনি স্পর্শ করেন অতলাকে, অতলাহাতে বেঁটন করে' ধরতে যান অতসীকে।

আশ্চর্য! অতলা তড়িৎস্পৃষ্টের মত স্পর্শকে প্রত্যাখ্যান করে' সরে' দাঁড়ায়।

অতসী নিম্প্রহ উপেক্ষায় তাঁর বেঁটনকে অতিক্রম করে' ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে' চলে।

অতসী ওপরে উঠে' গেল একবারও পেছন ফিরে' না চেয়ে। অতলা সিঁড়ির গোড়াতেই একপাশে সরে' দাঁড়িয়ে রইল—অশেষকে আগে উঠবার পথ ছেড়ে দিয়ে। অশেষ সিঁড়িতে এক পা উঠিয়ে তেমনি অবস্থাতেই মুখ ঘুরিয়ে অতলার দিকে চান।

• ওর মুখ একবারেই ভাবসম্পর্কহীন এবং চেয়ে আছে ও' কার দিকেই না চেয়ে।

• অশেষ না বলে' থাকতে পারলেন না, “এমন অভিনয় করবার কি প্রয়োজন ছিল?”

অতলা মুখ তুলে' চায়।

অশেষ আবার বলেন, “অভিনয়টা মন্দ হয়নি; কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল এর?”

অতলা হঠাৎ কঠিন স্বরে বলে, “অভিনয় আমি করিনি; দিদির জিজ্ঞাসা করবেন বরং সে করছে কি না।”

—“কোন অভিনয়ের কথা বলছি না বুঝেই ত' জবাব দিলে বেশ!”

—“কি?”

এবার অশেষই অভিনয়ের ভঙ্গীতে নিরুত্তরে মুখ ফিরিয়ে ওপরে উঠে' যান।

অশেষ এদিক থেকে গিয়ে বারান্দায় টেবলের সামনে দাঁড়ালেন, ওদিক থেকে দেবনাথ এসে উপস্থিত হলেন নীতিশের কাঁধে হাত দিয়ে।

অশেষের সৌজন্তে অতসী পর্যন্ত বিস্মিত হল। “নমস্কার আনুন, আনুন দেবনাথ বাবু! আমার জন্তে আজ আপনার মর্গিং টায়ের এতটা দেবী হয়ে গেল। ওরা দুজনই ছেলেমানুষ, আমার জন্তে অপেক্ষা না করে যদি...”

দেবনাথ প্রতিনমস্কার করে' হেসে বললেন, “ধন্যবাদ, কিন্তু দেবী করে' চা খাওয়াই আমার অভ্যাস এবং আপনার মতই আমি মর্গিং ওয়াকে অভ্যস্ত। তবে আজ আমার উঠতে সত্যি একটু দেবী হ'য়ে গেছে, তার ওপর আবার বৌদি দিলেন বাধা।”

অতসী বলল, “কিন্তু যারা মর্গিং ওয়াকে বেরোন তাঁরা সকলেই মর্গিং-টি শেষ করে' বেরিয়ে থাকেন।”

অশেষ বললেন, “আপনার বৌদি এখানে আমার অপরাধের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—আপনার নয়!”

দেবনাথ বললেন, “ও! আপনি চা না খেয়েই বেরিয়ে-
ছিলেন বলে?”

অশেষ মুঁহু হেসে বললেন, “না; আমার মনুষ্যস্বভাবের জন্ত
আপনাকে চা না খেয়েই বেরোতে হচ্ছিল বলে।”

কৌতুক না বিজ্ঞপ। অতসী বুঝতে পারে না। তাঁর
কর্ণমূল রাঙা হয়ে ওঠে।

অতসীর মুখের দিকে চেয়ে উচ্চহাস্তে অশেষ বলেন, “আমল
কথা কি জানেন, আপনার বৌদি’ আর বৌদির’ ঐ বোনটি,
এই অভিযোগ-অনুযোগের মূলে ওরা দুজনই সশরীরে বর্তমান,
অর্থাৎ, ওদের কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচ ঘটিকার চা খাওয়ার
বাধা পড়েছে আজ আমার মর্গিৎ ওয়াকের জন্তে...ওদের কষ্ট
হয়েছে।”

হঠাৎ হাসি থামিয়ে অশেষ তাঁর মুখে একটা কৃত্রিম কষ্টভাব
ফুটিয়ে তুললেন।

কেউ না হেসে থাকতে পারল না, এমন কি অতলাও—যে
এতক্ষণ অটুট গান্ধীয়া রক্ষা করে আসছিল।

ওদের হাসির একান্তে অশেষ একমুহূর্ত গম্ভীর হয়ে
রইলেন। সে গান্ধীয়া অকৃত্রিম।...এ তাঁর স্বাভাবিক
স্বতঃকৌতুক নয়,—কৌতুকের অভিনয়। কিন্তু মানুষের
মনের যে রহস্যময় পরিণতিকে তিনি শিল্পীর চোখে অধিগত
করতে চান, তার অনুকূল আবহাওয়া প্রস্তুতির জন্তে এরূপ
অভিনয়ের প্রয়োজন আছে! এই কৃত্রিমতা তাঁর বীক্ষণ
যন্ত্রের অনুবর্দ্ধক কাচ যার ভেতর দিয়ে ধরা যাবে অলক্ষ্যকে
লক্ষ্যের গোচরে।

দেবনাথের চোখে ধরা পড়ে যায় অশেষের ভাবান্তর।
একটু অপ্রস্তুত ভাবে নিজের হাসিটাকে সংযত করতে করতে
বলেন, “আপনার কথাতেই আমরা হাসছি অথচ আপনি
একেবারেই গম্ভীর।”

অশেষ এই হাসিকে উপলক্ষ্য করেই চমৎকার একটি
তর্কের সুর এনে ফেললেন। “জানেন না, কি, বড় হিউমারিষ্টের
লক্ষণ, সে নিজে হাসবে না কিন্তু আর দশজনকে হাসাবে?
এর কারণ কি বলতে পারেন?”

অতলা ও অতসী হাসি একই সঙ্গে থেমে যায়। ওরা
দুজন দৃষ্টিবিনিময় করে। অতলা ভাবে, আবার তর্ক হ’ল
স্বক। অতসী ভাবে, হেসে বেন সে অপরাধ করেছে।

দেবনাথ একটু ভেবে বলেন, “হিউমারিষ্ট না হেসে-আ
দশজনের হাসিকে এন্জয় করেন।”

অশেষ বলেন, “না; এন্জয় নয়, এক্সপেরিমেন্ট করেন—
প্রয়োগকে প্রযুক্তির দিক থেকে। গান্ধীয়াটা তাঁর মাথা
কাটি।”

অল্পদূরে লক্ষ্মীনাথ বসে” হাফবয়েল্ড ডিমের খোসা
ছাড়াচ্ছে। ঠোণ্ডের ওপর কেটলিতে চায়ের জল টপক
করে’ ফুটছে। অতলা সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবে,
মাপকাঠি দিয়ে জামাইবাবু দেবনাথ বাবুকে মাপছেন।

অতসী অতলার অনুসরণ করতে করতে ভাবে, মাপকাঠি
কাটি দিয়ে উনি তাদের তিনজনকেই আশাত করছেন।

“চা প্রস্তুতির দিকে চাইতে চাইতে দেবনাথ বললেন, “এ
সৃষ্টির ক্ষেত্রে আপনার কথা মেনে নেওয়া যায় না। উপ-
ভোগের ওপরে পরীক্ষার স্থান দিয়ে কোন বড় রকমের রসক
হাতে পারে না।...এখানে অবশ্য খেজুরের রসের বণ-
হচ্ছে না।”

অতসী জানান্তিকে অতলাকে বলে, “তোঁর জামাই বা
সত্যি আর্টের রসকে খেজুরের রস করে’ তুলতে চান।”

অতলা হেসে বলে, “এ তর্কের মারপ্যাচ দিদি, খেজুরের
রস থেকে আবার খেজুরের কাঁটাও বা’র হয়ে দাঁড়াবে হয়ত।”

অশেষ বলেন, “অলঙ্কার শাস্ত্রে যে খেজুরের রসকে
তালিকাভুক্ত করা হয় নি, তা আমার জানা আছে। কিন্তু
অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধানগুলি গড়ে’ উঠেছে উপভোগের ও
পরীক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েই।”

দেবনাথ উপেক্ষার ভাবে বলেন, “অলঙ্কার শাস্ত্রও কাঁটা
ব্যাকরণ বিশেষ।”

অতলা ডিমের ডিস এবং অতসী চায়ের ট্রে নিয়ে আ-
গিছে আসছে। পেছন থেকে অতসী বসল, “আর্ট জিনিফার
ব্যাকরণে বাইরেই। একথা স্বীকার করা উচিত।

অতলা আর জামাইবাবুর প্রতি পক্ষপাত রক্ষা করতে গ-
না। দিদির সমর্থন করে’ বলে, “আর্ট ফর্ আর্টস সেক-
কথাটাই সত্যি।

অশেষ হঠাৎ হো হো করে’ হেসে উঠলেন। হাসি
থামিয়ে বললেন, “পরীক্ষাক্ষেত্রে একটা বড় রকমের হিউ-
আজ পরীক্ষিত হ’ল, যে—”

অতলার মুখে বিশ্বয়ের ভাব ফোটে। অতসী ও দেবনাথের মুখে সংশয়ের ভাব। তিনজনেরই নীরব প্রশ্ন চোখে ফুটে ওঠে : “কি?”

“তিনজনই তোমরা সমান দরের বড় আর্টিষ্ট।” বলে অশেষ আবার হাসলেন।

অশেষের কথায় কিসের শ্লেষ! আর্ট সম্বন্ধে দেবনাথের বই পড়া জ্ঞান অনেক কম অশেষের তুলনায়। দেবনাথ একটু ইতস্ততঃ করে এবং ওরই মধ্যে অতসীর দিকে একবার অপাঙ্গে চেয়ে বললেন, “আর্টের জন্তই আর্ট—একথার মত ভেদ আছে।”

অশেষ সহজ ভাবে বললেন, “থাকতে পারে। কিন্তু আমার নিজের মত হচ্ছে, আর্ট ফর্ আর্টস্। যদিও আমি রস-বিচারে হাস্যরসকে উচ্চস্থান দিইনে।”

অতসী এবার বলতে সাহসী হয়, “কিন্তু তুমি নিজে একজন স্বভাব হাস্যরসিক।

অশেষ মনে মনে একজন বাঙালী কবির একটি কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করেন : আপনার ব্যাধিটারে হাসি দিয়ে চলি উপহাসি’...

মুহূ হেসে মুখে বলেন, “মানুষের রসের খোরাক জোগাবার জন্তে।”

দেবনাথ বলেন, “কিন্তু আপনি নিজে রসাপ্রিয় হন না, অস্ত্রে যখন হাসে, আপনি গম্ভীর হয়ে থাকেন।”

অতলা জামাই বাবুর মুখের দিকে চেয়ে মিনতির স্বরে বলে, “এখন আর একটিও কথা নয়—শুধু চা।

ক্রমশঃ।

সাধনা

শ্রীপুষ্পরেণু দাশ

ধর্মের গুণ মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব সমস্ত প্রবৃত্তির সর্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য। সেই সামঞ্জস্যকে ভগবানে সমর্পণই হইতেছে শ্রেষ্ঠ সাধনা। আমাদের দেশে ধর্মই চিরকাল শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়া আসিয়াছে, এই গর্বে আমরা গর্বিত হই। কিন্তু তাহা হইলে আমাদের কেন অধর্মের অত্যাচার, এতো অপমান, লাঞ্ছনা, এতো দুঃখ দুর্দশা?—তাহার কারণ আমরা এতদিন ধর্মের ও পুণ্যের নামে অবিচার, অপমান এবং অত্যাচার করিয়া আসিয়াছি। যাহারা দুর্বল, নিঃস্ব, অদহায় সেই সকল নরনারীকে উপেক্ষা ও ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া আমরা গুটিকতক প্রাণী ভগবানের আরাধনা করিতেছি। কিন্তু তাঁহাকে তো পাই নাই; তাহার কারণ কি? যেখানে অবিচার, যেখানে উৎপীড়ন, যেখানে বৈষম্য, সেখানে ভগবান কোনকালে ধরা দেন না। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ কবি, মনীষী, সাধু, সন্ন্যাসী, বলিয়া গিয়াছেন—মানুষকে ভালবাসিতে পারিলে, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিলে, সর্বশক্তিমানের শ্রেষ্ঠ সাধনা করা হয়। অনেকে পুষ্প-চন্দন-ধূপধুনা গঙ্গাজলের আড়ম্বরে

শজ ঘণ্টা নিনাদিত করিয়া ভাবেন, আমি ভগবানকে অতি নিভুল ও নিখুঁত ভাবে পূজা করিতেছি। কেহ শিখাতে পুষ্প বাঁধিয়া ঘন ঘন শিখা আন্দোলনে উচ্চৈশ্বরে অর্থবোধহীন সংস্কৃত উচ্চারণে শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া ভাবিতেছেন আমার ন্যায় কেহ পূজা করিতে পারে না। কোন নিষ্পৃহ অনাসক্ত ভক্ত সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া সকল রকম দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা, দারিদ্র, দুরবস্থা হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া, নির্জনে জপতপে নিমগ্ন থাকিয়া ভাবেন, আমিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সাধক। কিন্তু অবোধ! জানেনা যে ভগবান কোনদিনই তাহার নিকটে নাই এবং নিকটে আসিবেন কিনা সন্দেহ। রবিবাবুর একটি কবিতায় পাই :—

“অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্কোপনে
নয়ন মেলে দেখেরে চেয়ে
দেবতা যে নেই ঘরে।”

পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ধর্মপ্রাণ উদারচেতা স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :—

“বহুজন সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।”

প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন “সবার উপরে মানুষ
সত্য তাহার উপরে নাই।” কুম্ভদরঞ্জন মল্লিকের “শ্রীধর”
কবিতায় পাই—শ্রীধর সম্যাসীকে সংসার ছাড়িয়া নির্জনে
আসিয়া আবার কেন পশুপক্ষীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছেন,
জিজ্ঞাসা করিলে সম্যাসী উত্তর দিয়াছিলেন—

“জীবের মাঝারে দেবতা পেয়েছি বলিতে পারিনা ভয়ে,
আমার চোখে যে এক হয়ে গেছে জীবালয়ে দেবালয়ে।”

ইংরেজ কবি Cleridge তাঁহার “Ancient
mariner” নামক কবিতায়ও ঠিক এই ভাবের কথাই
উল্লেখ করিয়াছেন—

“He prayeth best who loveth best,
All things both great and small.”

সুতরাং দেবতা কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ নহেন।
তাঁহার স্থান মন্দিরে নহে, তীর্থক্ষেত্রে নহে, ঐশ্বর্য বিলাসিতার
ভিতর নহে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরামের মধ্যে নহে কিন্তু তাঁহার
স্থান হইলঃ ধূলামাটির উপর, দীন দরিদ্রের কুটারে, হীন পতিতের
মাঝে। দেবতা কোন নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন। তিনি
পূজার আড়ম্বর, বিলাসের জাঁকজমক, ঐশ্বর্যের নৈবিদ্য চাহেন
না, তিনি চাহেন প্রাণের পূজা, হিংসাঘেয ভুলিয়া মানুষের প্রতি
মানুষের সেবা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভালবাসা, দয়া। তিনি
নীচ, অখ্যাত, ঘৃণিত, সর্বহারাদের মাঝে নিত্য বিরাজ করেন।
কবি গাহিয়াছেন—

“বেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন,
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—”

সবার নীচে’ সবার পিছে
সব হারাদের মাঝে।”

ভগবান রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ, ~~ব্রাহ্মা~~ বীণ্ডুষ্ঠ,
হজরৎ মহম্মদ, প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য দেব, পরমহংস
শ্রীরামকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি দরিদ্র ও হীনজাতির ভিতর লীলা
করিয়া গিয়াছেন।

সুখ্যবংশ-অবতংশ সর্বগুণসম্পন্ন দয়ার অবতার শ্রীরামচন্দ্র

অতুল ঐশ্বর্যের ভিতর লালিত পালিত হইয়াও পিতৃ-অর্থে
চতুর্দশ বৎসর বঞ্চল ধারণ পূর্বক ভীষণ হিংস্র প্রাণী
সংস্পর্শে কঠোর জীবন যাপন করিয়াছিলেন; গৃহক চণ্ডার
আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভ্রাতৃসম্বোধনে আনিদ্রন্য শ
আবদ্ধ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। অসাধারণ
নামধেয় কপিসেনার সাহায্যে সীতা উদ্ধার করিয়া তাহার
মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। সেজন্য আজও আমরা রামচন্দ্রের
সেনা বলিয়া বনর হত্যা করিতে পারি না। প্রিয়ভক্ত হনুমান
আজও রামানুচর বলিয়া অনেকের পূজ্য।

যিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন, বৃদ্ধিবলে ভারতকে একীভূত ও
জ্ঞানবলে অপূর্ব নিকাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, সেই পুণ্য
প্রধান শ্রীকৃষ্ণের খেলার সাথী ছিল গোপ গোপিনীরা। তিনি
তাহাদের প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাহাদের সঙ্গে কেহ কেহ
কেহ প্রিয়া, কেহ মাসি, কেহ মেশো এই সম্পর্ক পাশ্চাত্য
যমুনাতীরে, নিকুঞ্জবনে মধুর বংশীবাদন করিয়া আকুল
গোপগোপীদের প্রাণ মাতাইয়া মধুর লীলা করিয়া
গিয়াছেন। মথুরা-বৃন্দাবনবাসীদের কৃষ্ণ বিনা গতি ছিল না।

শাক্যকুলতিলক শাক্যসিংহ মায়ায় সংসারে রোগের
ছুঃখ দারিদ্রের তীব্র তাড়নে উৎপীড়িত জীবের মুক্তি
হইয়া গৃহত্যাগ করেন এবং কঠোর সাধনার দ্বারা নিব্বাণের
পথ প্রদর্শন করিয়া অবশেষে “বুদ্ধ” অর্থাৎ জ্ঞানী নামে
খ্যাত হন। রাজকুমার হইয়াও তিনি ঐশ্বর্য বিলাসিতা
প্রতি চির উদাসীন। যখন তাঁহার প্রধান শিষ্য অনাচার
প্রভু বুদ্ধদেবের জন্ত ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন তখন
ঐশ্বর্যশালী, বগিক সকলেই স্বাধাধা পূর্ণ করিয়া স্বর্ণ
মণি মাণিক্য এমন কি কেহ কেহ অঙ্গের অভরণ
উন্মোচন করিয়া ভিক্ষুককে সমর্পণ করিল, কিন্তু ভিক্ষুক
গ্রহণ না করিয়া বলিলেন—

“ওগো পৌরজন করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান,
দেহ তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।”

ভগবান বুদ্ধ পার্থিব ধনসম্পদের প্রত্যাশী নহেন। তিনি
মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বিমুক্ত অন্তর ভিক্ষা চাহেন। ‘ভিক্ষা
পরম ধর্ম’ ইহাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। সামান্য পশুপক্ষ

তিনি অন্তরে দারুণ ব্যথা অনুভব করিতেন। নৃপতি বিহিসার
পুত্রোষ্টি যজ্ঞার্থে ভগবানের উদ্দেশে যখন পশুবলি দিতে উদ্যত
তখন ভগবান বৃদ্ধ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মুক বলিদানরূপ
নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—

মহারাজ—

হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম উপার্জন ?

দেবতুষ্ট হিংসায় কি হয় ?

মহাশয়, জানিও নিশ্চয়,

হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে ।”

তাঁহার দেহান্তের পর যে সময় জগৎ পাপে ভারাক্রান্ত,
চতুর্দিকে তান্ত্রিকের আবির্ভাব, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে পৃথিবী কলুষিত
সর্বত্র হাহাকার-ধ্বনি উখিত, তখন জগতবাসী কাতরকণ্ঠে সেই
করণামর বোধিসত্ত্বকে আহ্বান করিতেছে—

“জগত-ব্যথাভরে মাগিছে জোড় করে

এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,

এস হে এস শ্রেয় ! এস হে মৈত্রেয় ।

ক্রুরতা-মৃত্যুর করহে অবসান ।”

কারণ সর্বশক্তিমান ভগবান সর্বলোকের সর্বহিতে রত, তাই
তিনি প্রায় স্থা অর্জুনকে বলিয়াছেন—

“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্টতাং ।

ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥”

তাই পৃথিবীর লোক ব্যথাতুর হইয়া সেই ভিখারী জগজ্জয়ীকে
আবার মর্ত্যে আসিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে—

“হে বোধিসত্ত্ব হে ! মাগিছে মর্ত্য বে

ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায় ॥”

অনাথের নাথ দীনের গতি সর্বশক্তিমানের কর্ণে মর্ত্যবাসীর
এ আকুল আর্তনাদ পৌছাইয়াছিল। তিনি মর্ত্যে শ্রীচৈতন্য
দেব নামে আবির্ভূত হইলেন। তিনি প্রেমের দেবতা—
তাঁহার করুণ হরিরোল শব্দ নবদ্বীপ-বাসীকে আকুল করিয়া
তুলিল। তাঁহার নিকট কি যবন, কি চণ্ডাল, কোন জাতিভেদ
ছিল না। ভাবাবেশে-উন্মত্ত হইয়া চণ্ডালকেও তিনি মধুর
হরিনামের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছেন। যবন হরিদাস তাঁহার
একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। জগাই-মাধাইয়ের জ্ঞায় পাশাপাশিও
তিনি স্নমধুর হরিনামে ভুলাইয়া পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া
ছিলেন ; তাই তাঁহাকে বলা হয়—

“পাতকী তারিতে প্রভু হন অবতার রে

হরিনামে পার পাবে ভব পারাবার রে

নাম ভব, নাম চিন্ত, নাম কর সার রে ।”

জগাই মাধাই যখন হরিনাম সহ করিতে না পারিয়া শ্রীমৎ
নিত্যানন্দ প্রভুকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল তখনও
তিনি এক হস্তে কপালের রক্ত মুছিতে মুছিতে অপর হস্তে
তাঁহাকে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

“মেরেছো কলসীর কানা,

তাই বলে কি প্রেম দেব না !”

প্রভু যীশু অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
তিনি যদি ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার অসীম লীলা খেলা
সাদ্ধ করিতেন তাহা হইলে আজ আমরা তাঁহার মাহাত্ম্য
বুঝিতাম না, তাঁহাকে ভগবান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম
কিনা সন্দেহ। তিনি দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধারণ
মহুসের জায় দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে স্নেহ, দয়া, মায়া ও ক্ষমা
বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ধনী অপেক্ষা দরিদ্রকেই তিনি বেশী
ভালবাসিতেন। তিনি হীন পতিতদের ভিতর সর্বদা বিরাজ
করিতেন। পাপীদের ঘৃণা না করিয়া পাপের পথ হইতে বিমুখ
করিয়া তাহাদের পুণ্যপথের জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিতেন।
সেইজন্য তাঁহাকে ত্রাণকর্তা বলা হয়। একবার তিনি সমরীয়
দেশে যাইবার পথে একটি স্থলোকে কুয়া হইতে জল তুলিতে
দেখিয়া বলিলেন—

“Give me to drink”

সমরীয় রমণী বলিলেন—

“How is it that thou being a Jew
askest drink of me, which am a woman of
Samaria? For the Jews have no dealings
with the Samaritans.”

কিন্তু মহাত্মা যীশু তাঁহার হস্ত হইতে জল পান করিয়া
ছিলেন। জীবের প্রতি জীবের ক্ষমা, দয়া, মায়া, স্নেহ থাকা
উচিত তাহা তিনি তাঁহার অমূল্য জীবন অসহ যন্ত্রণা সহ ক্রমে
উৎসর্গ করিয়া দেখাইয়াছিলেন এই বলিয়া—

“Father, forgive them ; For they know
not what they do”

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সর্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া সমদর্শন ও

বিশ্বপ্রেমের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া “যত মত তত পথ” এই বিশ্বোদার ধর্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমী বিবেকানন্দ “স্বদেশ মন্ত্র” প্রবন্ধে ভারতবাসিগণকে ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া দেখাইতেছেন, আমাদের ভিতর ভেদাভেদ নাই আমরা সকলেই সেই মহাশক্তির অংশ সুতরাং আমরা সকলেই সেই ৩য় মহামায়ার পূজায় অত্মোৎসর্গ করি—

“হে ভারত ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের জন্ত বলি প্রদত্ত, ভুলিও না তোমার সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি, যেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।”

সুতরাং রামকৃষ্ণধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিতরও উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মুর্থের কোন প্রভেদ নাই। তাঁহার অধিকাংশ শিষ্য যদিও সন্ন্যাসী কিন্তু প্রত্যেকেই কর্মসন্ন্যাসী, কর্মযোগী। আজও পরমহংসদেবের জন্মোৎসবে উচ্চ, নীচ, দরিদ্র, হিন্দু, খৃষ্টান সকলেই মাটিতে একাসনে বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

সুতরাং ভগবানের নিকট শুচি অশুচি, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, পাপীপুণ্যবানের বিচার নাই। কিন্তু আমরা সেই সবহারাণের মাঝে ভগবানের অন্বেষণ না করিয়া ধন ঐশ্বর্যে গর্বিত হইয়া নিঃস্ব দরিদ্র জনসাধারণকে ঘৃণা করিয়া অস্পৃশ্য করিয়া তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া সমাজের উচ্চাসনে বসিয়া মুষ্টিমেয় লোক ভগবানের আরাধনা করিতেছি, তাহার ফলে আমরা ভগবানের আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপই লাভ করিয়াছি। মানবের প্রতি মানবের এই অসম্মান, এই অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া ভগবান হুঃখে ক্ষোভে রোষে আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অসীম প্রেমের অধিকারী নই, তাই আজ আমাদের এতো হুঃখ কষ্ট, দারিদ্র, দুর্দশ। এতদিন যাহাদের ঘৃণা অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি তাহাদের যদি প্রাণের সহিত ভালবাসিতে, তাহাদের ব্যথার ব্যথী হইতে, তাহাদের প্রাণে প্রশ্ন মিশাইয়া দেশের ও দেশের অভাব মোচন করিতে পারা যায়, তাহা ইহলে আবার বোধ হয় ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করা সহজ হয়। শ্রীলক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে একটি কবিতায় পাই—

“অনাহারে কে রয়েছে, কাঁদিছে কোন ব্যথাতুর,
শোক হুঃখে লাঞ্ছনায় আজি কার অন্তর বিধুর,

কে রয়েছে ঘুমাইয়া অজ্ঞতার নিবিড় তিমিরে
আলোকের যাত্রা পথে দৈন্ত্রহত কারা আসে ফিরে!
আজিও ফিরিছ তাই পথে পথে করিয়া সন্ধান,
অন্ধজনে করিতেছ দ্বারে দ্বারে জ্ঞানালোক দান।”

সুতরাং স্বয়ং ভগবানের অন্তর যখন আমাদের হৃৎক্ষেত্রে, জাগ্রত চক্ষু সদা সর্বদা আমাদের উপর রহিয়াছে, আমাদের অভাব মোচনার্থে যিনি দিব্যরাত্র পরিশ্রম করিতেছেন, তখন আমরা সামান্য মানুষ হইয়া কি স্পর্দ্ধায় তাঁহার সৃষ্ট জীবিত অবহেলা, অনাদর করি? হুইটম্যান বলিয়াছেন—

And I say to mankind, Be not

Curious about God,

For I who am curious about each,

Am not curious about God.

সুতরাং হুইটম্যানের মতই এখন আমাদের ভগবানের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া মানুষের চিন্তাতে মনপ্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে, মানবের উপকার মানবের উন্নতির জন্ত কর্মক্ষেত্রে অবদান হইয়া আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য, সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত করিতে হইবে। তাই আজ এই বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে প্রতি উৎসাহের সহিত আমাদের আহবান করিয়া বলিতেছেন—

রাখো রে ধ্যান থাক্বে ফুলের ডালি,

ছিঁড় ক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি,

কর্মযোগে—তার সাথে এক হয়ে

ধর্ম পড়ুক করে।

সুতরাং এই কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে ভগবানের মুখোপাওয়া যাইবে। দেশের ও দেশের সেবার মধ্য দিয়াই ভগবানকে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জীবকে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্বিচারে প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে বন্ধন করিতে পারিলে ভগবানের অস্তিত্ব, ভগবানের মাহাত্ম্য সর্বত্র অনুভব করা যাইবে। সংসারক্ষেত্রে আপনাকে লইয়া বিব্রত রাখিবার জন্ত কেহ আসে নাই। প্রত্যেকের জীবন সকলের জন্য, সকলের জীবন প্রত্যেকের জন্ত। ইহাই জীবনের মূলপরিণতি। জীবনের সার্থকতা—কর্ম সাধনার ভিতর ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ।

ভগবানকে পাইবার জন্ত আমাদের স্বর্গে বাওনার কোন আবশ্যক নাই, তাঁহাকে পাইবার জন্য পরনোকের

মাতিয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝখানেই ভগবানের আবির্ভাব জানিয়া যে মানুষ ধন্য হয়, তাহার পক্ষে বাহ্য আড়ম্বর করিয়া তীর্থ যাত্রা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভগবানের নিয়ন্ত্রিত কর্ম প্রাণ, মন শক্তি নিয়োজিত করিতে পারিলে পৃথক সাধনার দরকার নাই। পরমারাধ্য সাধু তারাচরণও বলেন, “ভগবানকে পাইবার জন্য বাহ্যিক আড়ম্বরের কি প্রয়োজন, মন-মাংস তাহার নাম

জপিয়া, দেশের ছুঃখ দৈন্য দারিদ্র্য দূর কর, চরিত্রবলে বলীমান ও সত্যাত্মসন্ধানী হও, কোন পৃথক সাধনার দরকার হইবে না।” স্তব্ধতা ভগবানের স্থান ধূলার ধরনীতে; কোন নির্দিষ্ট স্থানে নহে, কে জানে কখন কোন বৈশেষ্যে তিনি আমাদের কুটীরে পদার্পণ করেন। তাই সদা সর্বদা মনপ্রাণে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

অপরাজিতার মৃত্যু

নির্মলকুমার ভট্টাচার্য্য

অপরাজিতার মৃত্যু হইয়াছে—সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

সংবাদটা আকস্মিক ভাবে আসিয়া মনকে নিদারুণ আঘাত দিয়া গেল।

সেই অপরাজিতা—যে একদিন দূরন্ত দখিনা বাতাসের মত আমার কাণে কাণে বলিয়া ফেলিল—‘তোমায় আমি ভালবাসি।

তখন আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। হাঁ, না, কোন কিছুই উত্তর দিতে পারি নাই। সে আমার মুখের দিকে খানিক তাকাইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গিয়াছিল।

* * * *

বহুদিন পূর্বের কথা। শঙ্কর গিয়াছিল বোম্বাইয়ে সমুদ্র দেখিতে। তখন সেখানে আমি একটা ছোট-খাট চাকুরি করিতাম। বন্ধুত্বের দাবী লইয়া সে আমারি গৃহনাগরী আশ্রয় খানিতে পদার্পণ করে।

বাংলা দেশের শ্রামল আবহাওয়া ছাড়িয়া পর্য্যন্ত আমার কোন কিছুই ভাল লাগিত না। নিজেকে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতাম। অফিসের নিত্যন্ত দরকারি সহকর্মী কয়েকজন ছাড়া অন্য কেহই আমাকে চিনিত না। স্তব্ধতা পুরাতন বন্ধুকে পাইয়া একান্তে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতাম। কিন্তু সে সাধে বাদ পড়িল। কিছু দিন বাইতে না বাইতে বন্ধুত্ব আমার নিকট অতিশয় দুঃখাপ্য হইয়া পড়িলেন।

অনন্তোপায় হইয়া পুনরায় অভ্যুত্থানে চলিতে লাগিলাম। অতঃপর যথাসময়ে স্নানাহারাদি সমাপনেও দেখিলাম বন্ধুত্বের ব্যাঘাত ঘটতেছে। কবে যে কখন আসেন ও কখন বাহির হন তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল।

ইহাৎ একদিন মাঝরাতে খান্কা খাইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, বন্ধুত্বই আমাকে জাগাইয়াছেন। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, পরদিন প্রত্যুষেই তাঁহার বিবাহ।

আমার সম্মুখে ধরণী যেন দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গেল। এক শাস ভ্রমণে আসিয়া বিবাহ!—কাহার সঙ্গে, কবে এবং কি প্রকারে?—

শঙ্কর উত্তর দিল—এখানকারই একটি মেয়ের সঙ্গে, জাতে মারাঠী—কিন্তু দেখিস্ কি অপূর্ব সুন্দরী!

—কিন্তু তা হ’লেই কি বিয়ে করার যথেষ্ট কারণ হ’ল?— আমি বলিলাম।

উত্তর হইল—নয় তো কি?—ইহাৎ সমস্ত প্রসঙ্গ চাপা দিয়া শঙ্কর বলিল—দেখ, মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের দেশকে বড় ভালবাসে—আমি সেখানকার অধিবাসী ব’লেই আমার গলায় মালা দিতে চায়। ওর জীবনের সাধ, বাংলা শিখবে। ইংরিজি অনুবাদের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার রস ও সমগ্র ভাবে পায় না। আমি হাঁ, না, কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। শঙ্কর এ কথা সে কথা বলিয়াই চলিতে লাগিল। কবে

মালাবারে বেড়াইতে গিয়া মেয়েটির সঙ্গে দেখা। তারপরে আলাপ ও ক্রমে প্রণয়। ভাবিলাম, হয়তো বা সত্য সত্যই তাহার প্রেমে পড়িয়াছে। সারাটি রাত বিনা ঘুমে কাটিয়া গেল।

প্রভাত হইতেই শঙ্কর লাগিয়া গেল সাজপোষাক করিতে। খানিক বাদে একখানি ট্যাক্সি থামার আওয়াজ হইল। কিঞ্চিৎ পরে আমাদের ঘরের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল এক অষ্টাদশী তরুণী, যাহাকে সত্যই সুন্দরী বলা চলিতে পারে। আমাকে নমস্কার করিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিল—

—আপনিই নিশ্চয় সমীর বাবু?

প্রত্যুত্তরে—হাঁ, বলিয়া তাহাকে বসিতে বলিলাম। তাহার পর বলিয়া চলিল একথা সে কথা। বারে বারে আমার নিকট বাংলা শিখিবার আরজি পেশ করিল। আমিও প্রতিবারেই আশ্বাস দিলাম। তিনজনে ট্যাক্সি করিয়া বিবাহ রেজেষ্ট্রি অফিসে উপস্থিত হইলাম। সেখানে ইতিপূর্বেই শঙ্করের স্থানীয় কয়েকটি বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহ কার্য আরম্ভ হইল। কাগজপত্রে কিন্তু দেখিলাম যে শঙ্করের প্রকৃত পরিচয় গোপন রহিয়াছে। কানপুরের উকিল বলিয়া সে নিজেকে পরিচয় দিয়াছে। আমি যে কি করিব কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া চূপচাপ রহিলাম। তাহারই কিছুদিন পরের কথা।

মাঝের কদিন শঙ্করের সহিত দেখা করিবার জন্ত অস্বাভাবিক কোতূহল হইত। কিন্তু তাহার টিকি মেলা ভার। শেষ পর্যন্ত দেখা মিলিল। একদিন অন্তর্কিতে আমার নিকট আসিয়া হাজির। বলে—তোর তো ওদিকে পা বাড়াবারই অবসর নেই, কি ব্যাপার? অপরাজিতা আজ ক'দিন থেকে তাগাদা দিয়ে আমার পাঠালে। দেখ, তোর এই অল্পপস্থিতিটা কত বিস্ত্রী দেখায় জানিস? ও মনে করে যে আমার এই বিয়েতে আমার বন্ধুবান্ধব তথা আত্মীয়-স্বজনের কোনই অনুমোদন নেই। আর তা ছাড়া এতে করে বাদ্দালীসমাজের অনুদারতা প্রকাশ পায়।

শঙ্কর প্রায় একরকম টানিতে টানিতেই আমাকে লইয়া গেল। সেখানে বাইয়া দেখি, ইতিমধ্যেই মেয়েটি আধভাঙ্গা বাংলা বেশ শিখিয়াছে। আমি বলিলাম—এই তো বেশ শিখেছেন আর আমার বোধ হয় মাষ্টারি করার দরকার হবে না।

উত্তরে সে বলিল—না—না মোটেই নয়, আপনাকে বাংলা শিখবো।

তাহার পর সে দিনটা সমস্তক্ষণই কাটিল অতি সঙ্গে। অপরাজিতা রাখিয়া আমাদের খাওয়াই-ভাঙ্গা উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথের গানও গাহিয়া শুনাইল।

কিন্তু সেই দিন রাত্রেই শঙ্কর বলিল—কি কলিকাতায় যাইবে, আমি যেন অপরাজিতাকে দেখা করি ও বাংলা শিখাইতে থাকি। শঙ্কর চলিয়া গেল।

এইরূপ ভাবে পুরা একটি মাস কাটিয়া গেল। শঙ্কর চিঠি দিত। যত দিন যাইতে লাগিল ততই তাকে গেল। তবে মাঝে মাঝে অপরাজিতার নামে ম' টাকা পাঠাইত।

ক্রমে ছয়মাস কাটিয়া গেল। শঙ্করের আর পাস্তা নাই। ইদানিং অপরাজিতাকে একটু অধিক দেখিতাম। তাহার যেন কি বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইত। কিন্তু নিজের বন্ধুর অপরাধ স্বতঃই তাহাদের নিকটে মস্তক অবনত করিয়া রাখিত। এ হেন অবস্থাতেই অপরাজিতা নিজেকে আমার কাছে উজাড় করিয়া চাহিল।

আর অপরাজিতাদের গৃহে বাই নাই। শঙ্করকে লিখিয়াছিলাম, কোনই উত্তর পাইলাম না। তাহার দিন পরে আমার ওখানকার চাকুরিটি গেল।

কলিকাতায় নিরবচ্ছিন্ন ছন্দ-বিহীন জীবন দিনের আগাইতে থাকে কোন্ এক অনির্দিষ্ট নিশানা কস্মীব্যস্ততার ভুলিতে থাকি যে মানুষের মনের ভিতর গোহ আজিও বাঁচিয়া আছে।

বড় দিনের সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কিছুদিন ছুটি খাওয়ার কয়েকজন বন্ধুর সহিত মধুপুরে বেড়াইতে দলের মধ্যে কিশোরীদের ওখানে একখানি বাড়ী বেপরোয়া কটিকে সেখানি দিল সাদর স্বাগত সম্ভাষণ।

মধুপুরের কপিলমঠে তখন উৎসব চলিতেছিল। আশংখ্যা বহু। বন্ধুরা সকলেই প্রায় সেইখানেই মন বসাইয়া কিন্তু নির্জনতা উপভোগ করিতে বাইয়া কোলাহলের আমার মোটেই ভাল লাগিত না—হউক না তাহা আশংখ্যা

একদিন সন্ধ্যার পরে বন্ধুরা মাঠে চলিয়া গেলে পর আমি একা একা গিরিডি রেললাইন ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোরে থাকাকালীন সন্ধ্যার সেপাই সাজিয়া যে মাঠে তাঁবু গাড়িয়া কাটাইয়া ছিলাম জীবনের স্মৃতিভরা কয়েকটা রাত, তাহারই হারাণো স্বতিকে নূতন করিয়া খুজিয়া পাইতে মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

বিগত দিনের মাদকতা-জাগানো পিছনে ফেলা মাঠ মনে হইল যেন চাহিয়া রহিয়াছে আমাদের চলিয়া যাওয়া পথপানে। 'যে যায়গাটার আমাদের মেসিং, স্টেট গাড়া হইত সেইখানে পা দিবামাত্র পিছন দিক্' হইতে আওয়াজ হইল—
—হ্যালো, ওল্ড বয়—

চাহিয়া দেখি—শঙ্কর, সঙ্গে একটা বছর তিনেকের ছোট মেয়ে।

আবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম—মুখে কোন কথা সরিল না।

শঙ্করই প্রথম কথা কহিল—ঐ আমার গেরে চঞ্চলা—
অপরাজিতার দান।

অপরাজিতার দান, কথাটিতে চম্কাইয়া উঠিলাম।

বলিলাম—কিন্তু অপরাজিতা কোথায়?—

• উত্তরে শঙ্কর শুধু আপন কন্যার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—এই যে এখানে, দেখতে পাচ্ছ না।

• বলিলাম অপরাজিতা আর ইহজগতে নাই। মৃত্যুর মধ্যে তাহার অপরাধের মহিমা রাখিয়া গিয়াছে কন্যার মুখে।

শঙ্করের সহিত তাহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর অপরাজিতার মৃত্যু সম্বন্ধে নানা প্রশ্নে জানিলাম যে আমার চলিয়া আসার রাত্রেই সে আত্মহত্যা করিয়াছিল। বাড়ীর সকলে তাহার অন্তঃস্বভা অবস্থার কথা জানিত। চিকিৎসকগণের সাধ্যমত যত্নে জীবন্ত কণ্ঠটি ধরণীর বুকে পদার্পণ করিয়া ছিল।

শঙ্করের ধারণা অপরাজিতা তাহারই উপেক্ষায় মরিয়াছে।

• আমার মন ভুলিতে চেষ্টা করে একটি নিঃসহায় জীবনের করুণতম ইতিহাস। আবার ভাবি, এই পুরাণো পৃথিবীতে এটুকু একটা অতিসাধারণ বৈচিত্র্য।

পল্লী-ক্রীড়াগীতের আলোচনা

শ্রীনীগোপাল দাশ

ছোট শিশুদের দেহ পুষ্টির জন্য খেলাধুলার চর্চা প্রায় সমস্ত সুসভ্য দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে অত্যন্ত দেশের খেলাধুলা ও ব্যায়ামের সঙ্গে আমাদের দেশের ব্যায়াম বা খেলাধুলার যথেষ্ট পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের খেলাধুলা ও ব্যায়ামে শুধু ছোট শিশুদের দেহের উন্নতি সাধন হয়, এমন নয়—শরীরের উন্নতির সঙ্গে ছোটদের শিশুমনে কবিত্বশক্তি ও কল্পনা শক্তিও কত এগিয়ে চলে। শরীরের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বভাব হৃদয়ে জাগিয়ে দেবার জন্য সুললিত ছড়াগানের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের শিশুদিগকে বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলা শিক্ষা দেওয়া হয়। তারা মনের আনন্দে গান গেয়ে গেয়ে খেলাধুলা করে। এখনও পল্লীগ্রামের ছেলে মেয়েদের ভিতর বিভিন্ন প্রকারের

খেলাধুলার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করার ও বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলার ছড়াগান ও খেলার রীতি সংগ্রহ করবার চেষ্টা আমরা করছি। এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু সংগ্রহ থাকলে আমাদের জানালে সুখী হ'ব। পল্লীগ্রামের এই খেলাধুলাগুলি সাধারণতঃ মিষ্টিসুরে গেয়ে খেলতে হয়, তাই এ গুলিকে আমরা ক্রীড়াগীতি বলব। এই ক্রীড়াগীতি গুলি বহু প্রকারের। কোনগুলি ছুটছুটি করে খেলতে হয়, কোনগুলি বা একজায়গায় বসে খেলতে হয়। এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রাণ হচ্ছে সুললিত গান। এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি খেলাধুলার গান বা ছড়া দিলাম, পরে ইহার বিষয় আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

এগুলি সাধারণতঃ একস্থানে বসে ৪৫ জন বা ততোধিক

ছেলে মিলে করেকটি গুটি বা পাথরের বুড়ি নিয়ে খেলতে
হয়।

ফুলন ফুলন ফুলনাটি
দোলন, তেলন তেলনাটি
ঝাম ঝাম ঝামাটি
জোড় ঝামাটি।
বকুল বকুল বকুলাটি
জোড় বকুলাটি।
সুসম সুসম সুসমাটি
জোড় সুসমাটি।
হাত পোড়া পোড়া
বেগুন পোড়াটি।

লণ্ট, ঘণ্ট
শাক ঘণ্টাটি।
পঞ্চ পাখা
ছয়ে রেখা
সাতে শালিক নাচে,
আটে বাঁধা বাটে
নয়ে নয়টি বোড়া
দশে পড়ল জোড়া,
এগারয় এক-রলি
বারয় ফীরের পুলি
তেরয় তেজ্জ কাটা
চৌদ্দয় চৌশিকটা
পোনারয় রূপার বাটা
ষোলয় সতরশ্বি

ফুলন ফুলন ফুলনাটি
একে দোলনাটি
একে তেলনাটি
ঝাম ঝাম ঝামাটি
একে জোড় ঝামাটি
সুসম সুসম সুসমাটি

একে জোড় সুসমাটি
কদম কদম কদমাটি
বকুল বকুল বকুলাটি
একেজোড় বকুলাটি
তারা তারা তারাটি
মুখ পচা মুখ পচা মুখপচাটি
একে জোড় মুখ পচাটি
হাত চাপড়া বেগুন পোড়া
হাত চাপড়াটি
হাত চাপড়া বেগুন পোড়া
হাত চাপড়াটি।

নোস্তুকসা ভাত গরসা নোস্তা কসাটি
হাড়ীকে বদলে বদলে বস
পঞ্চ পাখা
তোয়ার মুখে ঢাকা
ছয়ে রেখা
সাতে শালিক নাচে
আটে বাঁধা বাটে
নয়ে নয়টি বোড়া
দশে দিলাম জোড়া
এগারয় একরলি
বারয় ফীরের পুলি
তেরয় তেজ্জ কাটা
চৌদ্দয় চৌকি খাটা
পোনেরয় পানের বাটা
ষোলয় বস্তি বুড়ি

চাবি খেলা

এতল বোতল তামাক তেতল
ধরত তেলে ধর না
ক দাপ খাব বল না
দাদার কড়ি দিদিকে দিস।

ঘা ঘোর জানি

গোলাকার বৃত্তের আকারে হাত ধরাধরি করে অস্ত্র সবাই
দাঁড়িয়ে যায়। আর একজন রাজা হয়ে সেই বৃত্তের মাঝে
দাঁড়িয়ে ছড়া বলে অস্ত্রাস্ত্র সবাই সুন্দর ছড়ায় তার ঈত্তর করে।

এতটুকু পানি (রাজা)
ঘা ঘোর জানি (অস্ত্রাস্ত্র সবাই)
এতটুকু কাদা (রাজা)
মগিরে রাজা (অস্ত্রাস্ত্র সবাই)
এতটুকু রক্ত (রাজা)
ইটে মারি শক্ত (অস্ত্রাস্ত্র সবাই)
এতটুকু জলে আমার হার হারাল (রাজা)
কোন কোন রাজার ছেলে নিয়ে পালাল (অস্ত্রাস্ত্র সবাই)
এ দিক দিয়ে যাব (রাজা)
কুড়াল ছুড়ে মারব (অস্ত্রাস্ত্র সবাই)
এ দিক দিয়ে যাব (রাজা)
আগুন ছুড়ে মারব (অস্ত্রাস্ত্র সবাই)
এ ধারটা কাটব (রাজা)
দাদা এলে বলে দেব (অস্ত্রাস্ত্র সবাই)

ইকড়ি—বিকড়ি

ইকড়ি বিকড়ি চাম চিকড়ি
চামের কাটা মজুমদার
ধেয়ে এল দাস্তদার
দাম্বদারের হাঁড়ি কুড়ি
চাল কাড়তে হল বেলা
ভাত খাসে বোনাই শালা
ভাতে পড়ল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি
কোদাল হ'ল ভোতা
খা শিরালের মাথা।

ইচিং বিচিং

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
তাতে পড়ল মাকড় কিচিং

মাকড় কিচিং নড়ে চড়ে
সত গোপ্তা ডিম পাড়ে
ডিম নিয়ে থোকা থোকা
মায়ুন ঠাকুর বলে গেছে
ছুরি না কাঁটা?

মেঘরাণী

ওলো মেঘরাণী

হাত পা ধুয়ে ফেলাও পানি
চিনি বনে চিকচিকানি
ধান বনে হাটু পানি
কলা তলার গলা জল
গবগবায় নেমে পড়
আনি বানি জানি না,
পরের ছেলে মানি না
ঠিক দুপুর বেলা
ভূতে মারে ঢেলা
ভূতের নাম রসি
হাঁটু গেড়ে বসি।

আগাডুম বাগাডুম

ঘোড়াডুম সাজে,

ডাইনে মোরা

বাগর বাজে।

বাজতে বাজতে

গেল ঢুলি

কমল ফুলি

টোরাটি

স্বর্ষামার বিরাটি

আয় স্বর্ষা হাটে বাই

পানের বোটা কিনে খাই

একটা পানের বোটা

মায়ে বিয়ে ঝগড়া

হলুদ বনে কলুদ ফুল
তার মায়ের টগর ফুল
কচি কচি কুমড়ার বোল
ওরে খোকা পা তোল।
লগ্না লাঠি চন্দন কাঠি

চন্দন নামে কাঁ কা
ইজির বিজির ঝিঝির ঝাঁ
প্রজাপতি উঠে যা।

ছড়া গানগুলির প্রথম দুইটি ব্যতিবেকে অন্যান্য সব
সত্যজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

অমর

শ্রীসমর গুহ

কথাটা বহুদিনের। অবশেষে সত্যই বিবাদটা একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ যুদ্ধের আকার ধরিল।

মতিপুর আর শ্রীপুরের মনোমালিন্য বহুদিনের। পাশাপাশি গ্রাম, একগ্রাম বলিলেও চলিত, মাঝে যদি খালটির ব্যবধান না থাকিত। খালে আবার বৎসরের সাত আট মাস জল থাকে। তখন এ পারের লোক ওপারে যায় ঝগড়া করিতে; তারপর নববর্ষায় খাল যুবতীর মত উচ্ছল হইয়া উঠে তখন দুই পাশের লোকই স্ব স্ব গৃহে বসিয়া আগামী কালের ঝগড়াটা ভাবিয়া দুইটা গ্রামই ছোট, দুয়েরি অধিবাসীর সংখ্যা সমান। জমিদার আছে স্তত্রাং বিবাদ করিবার প্রায়শ্চিন্ত। গ্রামের ছেলেরা লাঠি ধরিতে গিয়া বিচলিত হইয়া শক্তির অভিক্রম

হয়। অনেক ছেলে মেয়ে সেখানে খেলা করিতেছিল, হেঁ ও তাহাদের দলে জুটিয়া যায়। বেশ সকলে মিলিয়া খেলা করিতেছে এমন সময় কি কারণে বিরক্ত হইয়া হলুদ বনের একটা বাগককে কামড়াইয়া দেয়। সেও ব্যথায় তাতর হইয়া হাতের কঞ্চিটা দিয়া অত্যন্ত প্রহার করিতে থাকে হলুদের কুকুরকে। কুকুর একে ছোট তত্পরি নিদারুণ প্রহারে চীৎকার করিতে লাগিল। কুকুরের ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া খেলা করিয়া ছল্ল রণক্ষেত্রে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এই, কেন নবছ আমার কুকুরকে?” “বেশ করবো মারবো—আরো না মারো”, একদল ছেলে চীৎকার করিয়া বলিল, “কামড়াবে, হানা মারবে না!” বলিয়া প্রহার চালাইতে লাগিল।

হলু বীররসে কণ্ঠ স্ফীত করিয়া আদেশ দিল—

“এই, থবরদার বলছি, মেরো না। ফের মারলে পাবাবে ক্ষে দেব।”

সে একটু বেশী হইয়াছিল। প্রহার চালাইতে লাগিল, “হা—

নিজের স্বপক্ষে অথও যুক্তি দেখাইয়া পিতার নিকট প্রকাশ করে। জমিদার সবটুকু না শুনিয়াই জলিয়া উঠিলেন।

মতিপুরের লোকেরা শুনিল, শ্রীপুরের লোকেরা চক্রান্ত করিয়া একা পাইয়া তাহাদের ক্ষুদে জমিদার-তনয়টিকে প্রহার করিয়াছে—এ একরূপ তাহাদের সমস্ত মতিপুরকেই অপমান করা।

অতএব শ্রীপুরকে উচিতমত শাস্তি দিতে সমস্ত মতিপুর বন্ধ-পরিকর হইল।

জমিদার বাড়ীর আঙ্গিনায় মত্ত সভা বসিল।

গ্রামের সব লোকই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় পরাণ মণ্ডল উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘আমরা এই যে শাস্তি দিতে যাচ্ছি শ্রীপুরকে, তারা তা জানে?’

সভার একপাশ হইতে কয়েকটি যুবক চীৎকার করিয়া উত্তর দিল, “জানলেই বা—ক্ষতি কি? আমরা ত লুকিয়ে যাচ্ছি না।”

পরাণ বয়সোচিত গাভীরা রাখিয়া বলিল, “ক্ষতি আছে বৈ কি। তারা যখন জানে তখন তারা সাধ্যমত বাধা দিতে চেষ্টা করবে এ বিষয়ে কোন ভুল নেই। আর তারা বেশ তৈরী থাকলে তাদের হটান খুব সোজা হবে না, এটা বোঝা যাচ্ছে।”

তাহার কথার ধরণে বিরক্ত হইয়া কয়েকটি যুবক নিজেদের মাংসপেশীর দৃঢ়তা পরীক্ষা করিল। বৃন্দাবন ঢালী বলিল, “আমাদের লাঠীগুলোও তেল খাইয়ে পাকানো পরাণ খুড়ো।”

পরাণ হাসিয়া বলিল, “তোমাদের সামর্থ্য আমার সন্দেহ নেই বৃন্দাবন, তবে কথাটা হচ্ছে আমাদেরও ভাল করে তৈরী হয়ে এগুতে হবে।—দলবদ্ধ হয়ে যেতে হবে—আর সেই জন্তেই আমাদের মধ্যে একজন দলপতি চাই।”

“চাই-তো! চাই-ই তো!” সকলেই তাক সমর্থন করিল।

পরাণ মণ্ডল সভার একপাশ হইতে নিতাইকে টানিয়া সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইলেন। নিতাইর বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু শরীরে ভঙ্গন ধরে নাই। শালগ্রামের মত দীর্ঘ দেহ, দৃঢ় পেশী, শক্তির ছাতি। নিতাই অপ্রস্তুতের মত কি বলিতে গেল কিন্তু সভার লোকের অহুমোদনের কণ্ঠে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। গ্রামের পুরোহিত আসিয়া নিতাই দাঁসের প্রশস্ত কপালের উপর দইএর ফোঁটা আঁকিয়া দিল। কেহ বা থৈ ছড়াইতে লাগিল, জমিদার বাড়ীর ভিতর হইতে উল্লুধ্বনি শোনা গেল। নিতাই পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিল।

ঠিক হইল, পরদিন হইতে নিতাই গ্রামের লোকদিগকে ঠিকমত বুদ্ধ শিক্ষা দিবে এবং তাহার উপযুক্ত হইয়া উঠিলেই শ্রীপুরের দিকে রওনা দিবে।

সভা ভাঙ্গিলে নিতাই গৃহে ফিরিয়া আসিল। নিতাইএর স্ত্রী নন্দরাণী শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে বাহিরে আসিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিল।

একগাল হাসিয়া নন্দরাণী বলিল, “আমি শুনেছি গো, সব শুনেছি, তোমার সবাই সর্দার করেছে!”

নিতাইর মুখে সেরূপ আনন্দ ছিল না। একটা অশ্রু ভরে তাহার ইজিয়া আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল। তিনি কহিল, “কার কাছে শুনলে?”

“বাঃ! বংশী এসে বলে
অভিভূতা হইয়া নন্দরাণী
আমায়? বলে
আবার

কিছুক্ষণ পর নিতাইর ছেলে বংশী ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণে সে সমস্ত গ্রামটাই ঘুরিয়া আসিয়াছে; উৎসাহে তাহার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বয়স তাহার বছর কুড়ি, শরীরে শক্তি অসাধারণ। ঘরে ঢুকিয়া সহসা নিতাইকে প্রণাম করিয়া বলিল, “বেশ হোল বাবা! ছুজনেই একসঙ্গে যাওয়া বাবে শ্রীপুরে, কি বল? দেখা যাক্ কার লাঠির জোর—তোমার না আমার।”

নিতাই কোন উত্তর দিল না। দাঙ্গা হাঙ্গামার নামে সে কোন উৎসাহ-ই পাইতেছিল না উপরন্তু নানা ভয় আসিয়া তাহার সাহস কাড়িয়া লইতেছিল।

বংশী কিন্তু তখনও বলিতেছে, “আমার বিরুদ্ধে লাঠি ধরে কেউ দাঁড়াতে পারে না বাবা। আমরা তুমি বা তা ভেবে না, ছেলেরা আমাদের ভীষণ খাতির করে। আর আমাদেরই ত’ তারা সর্দার করতে, খালি পরাণ জেঠা তোমার নামটা তুললে তাই তারা চেপে গেল। তোমার কথা ত’ সবাই শুনেছে।”

সত্যই ত! কে না শুনিয়াছে নিতাইএর হাতের লাঠির অদ্ভুত শক্তির কথা—তাহার হাতের সড়কির অব্যর্থ লক্ষ্যের কাহিনী। গ্রামের ছেলেদের বীরত্বের আদর্শ হইয়া জীবিত নিতাই।

অথচ কে বিশ্বাস করিবে এই কথা যে নিতাইএর হৃদপিণ্ডটা খামিয়া বাইতে চায়। বংশীর মুখের দিকে নিতাই লজ্জার তাকাইতে পারিল না।

পিছাইবার মুখ নাই, তবু নিতাই গিয়া জমিদারকে একবার বলিল, “কর্তাবাবু, শ্রীপুরের লোকদের ক্ষমা যেনা করে দিন না?—মিথ্যে আবার—”

কথাটা শেষ করিবার আগেই জমিদার উচ্চৈশ্বরে হাসিয়া উঠিলেন, “বল কি নিতাই, কেন, ভয় পেলে নাকি?” তারপর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “শ্রীপুরের ছেলে বড়ো সব বতঙ্গণ পর্যন্ত না ছলুর পা’ ধরে মাপ চাইবে ততক্ষণ তাদের কারুর নিস্তার নেই।”

অগত্যা নিতাই ছেলেদের খেলিবার কৌশলগুলি শিখাইতে লাগিল। কিন্তু মনের ভয় তাহার গেল না। রাতে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে, অলক্ষিতে একটা সড়কি আসিয়া তাহার বুকেটা এ ফোড় ও ফোড় করিয়া দিয়াছে বা হাতের লাঠীটা পড়িয়া গেল। সর্বাঙ্গ ঘামে সিক্ত হইয়া যায়, জাগিয়া উঠিয়া

ডাকে, “নন্দ। বাতিটা জাল” নন্দরাণী ঘুমের পোকেই দেয়, “না, না, বংশীকে নিও না সঙ্গে—ওর তো বাবে—ছেলে মানুষ।”

নন্দরাণী। ঘুমাইয়াও সবসঙ্গে পুত্রকে দাঙ্গাহাঙ্গামা বিপদের আশঙ্কায় সরাইয়া রাখিতে চায়। নিতাই আরো বাড়িয়া চলে।

অবশেষে বাত্মার পূর্বের দিন।

সমস্ত দিনটাই নন্দরাণী নিতাইর অঙ্গগুলিকে মুছিয়া তুলিল। বৈকালে নিতাই বাড়ী আসিয়া তাহার বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে—সাদরে অঞ্চল দিয়া খানি মুছাইয়া নন্দরাণী বলিল, “খেটে খেটে খেতে খেতে মুখ বসে গেছে। নাও, এবার হাত ধুয়ে কিছু খাও। সোটা আমি গুছিয়ে নিচ্ছি”

নিশ্চয়ই আসিয়া নিতাই আহারে প্রবৃত্ত হইল।

বিপদের আশঙ্কায়, প্রাণের ভয়ে মুখ বিবর্ণ হইল।

এই কথাটা নিতাই নন্দরাণীকে বলিতে পারিল না।

তাহার সম্মুখে বসিয়া নন্দরাণী বলিতে লাগিল, “কি ভীষণ ডানপিটে হয়েছে। আমার কথা কানে না। আর কাকেই বা বলবো। ত্রিশ বছর আগে এমনিটি ছিল। মেঘবরণ চরটা দখল করতে জমিদার ছুটলো, এদিকে তুমিও বাড়ীতে নিরুদ্দেশ। ভয়ে একবার এদিক, একবার ওদিক করতে লাগলে নাওয়া খাওয়া ছাড়লেন। তিনটা দিন পরে পাইল চর দখল করে তুমি ফিরে এলে।” রামদর্দার কি তোমার করলে, বললে, অমন লাঠি ধরতে দেখিনি

নিতাই অতীত বীরত্বের স্মৃতিতেও উৎফুল্ল হইতে পারিল না; মনে হইল, এ যেন অস্ত্র কাহিনী শুনিতেছে তথাপি একবার জিজ্ঞাসা করিল, “আজেনে তোমার ভয় হয় নি নন্দ?”

“হয়েছিল একটু। কিন্তু পুরুষ মানুষ তুমি তোমায় ঢেকে রাখতে পারি নে।”

সমস্ত রাত নিতাইএর ঘুম হইল না। কল্পনা পাইল, রক্তে ধালের জল লাল হইয়া উঠিয়া আর্তনাদ, লাঠির ঠোকাঠুকি, সড়কীর বিদ্যাবিত্তৎস দৃশ্য। নিতাইর মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল

দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি তখন প্রভাতের পর্ধ্যায়। একটু পরেই যাত্রা করিতে হইবে। ভয়ে নিতাইর বুক স্তব্ধ! হয়ত এই যাত্রাই তাহার শেষ যাত্রা। পুনরায় কাল আবার উষা দেখিতে পাইবে কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। পঞ্চাশ বছরে কি মায়াই না জন্মিয়াছে এই পৃথিবীর উপর, এই নখর দেহটির উপর। ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজিকার দাঙ্গায় বীরত্ব অর্জন করিবে এই আশায় বংশীর মুখটা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ছোট্ট একটুকরা কাগজে নিতাই লিখিল, “বংশী! আমি যেতে পারবো না—আমার ভয় করছে। জমিদার বাবুকে বলিস, নিতাই—তাদের বীরা নিতাই মরে গেছে।”

চিঠিটি ঘুমন্ত বংশীর হাতে গুঁঁছিয়া দিল তারপর বাহিরে আসিয়া সকলের অলক্ষ্যে নিতাই গ্রামের নির্জন পথ ধরিয়া অজানা পথে যাত্রা করিল।

দ্বিপ্রহরের সূর্য্য প্রথর হইয়া উঠিলে নিতাই হাঁটা বন্ধ করিল। মানসিক অবসাদে ও অতিরিক্ত পথ চলায় দেহ ক্লান্ত ছিল; বিশাল একটি বট গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে নিতাই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম বখন ভাঙিল তখন বেলা শেষ হইয়া গিয়াছে; পশ্চিমের আকাশকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া মাঠের প্রান্তে অবস্থিত বৃক্ষরাজি মসীরেখার মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে। নিতাই আবার মতিপুরের দিকে ফিরিতে সুরু করিল।

রাত্রি ক্রমেই ঘনাইয়া আসিল। গভীর অন্ধকারে আপনাকে লুকাইয়া নিতাই গ্রামে ফিরিল। লজ্জায় পা আর চলিতে চায় না। গ্রামের ছেলে দাঙ্গা করিতে গিয়াছে,

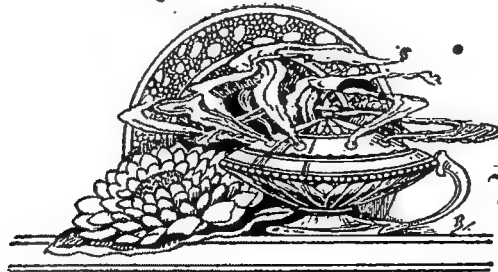
শ্রীপুরের প্রান্তে খালের দিকটা মশালের আলোতে উজ্জ্বল। অতি সঙ্গোপনে নিতাই জমিদার বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল; সর্বাঙ্গ তাহার কাঁপিতেছিল; জমিদারের নিকটে আসিয়া তাহার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া নিতাই কাঁদিয়া উঠিল, “আমার মাপ করণ কর্তাবাবু।”

জমিদার ফলাফলের গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন। সহসা পদপ্রান্তে নিতাইকে দেখিয়া উঠিয়া বলিলেন, “তুমি আবার অসুস্থ শরীরে এলে কেন নিতাই? সকালে বংশীর মুখেই আমি শুনেছি তোমার অসুস্থের কথা। বংশী নিজেই নেতা হয়ে নিয়ে গেছে সবাইকে শ্রীপুরে” শুনিয়া নিতাই প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গেল তারপর বলিল, “বংশী নিয়ে গেছে?” বংশীর মঙ্গলামঙ্গল চিন্তায় সে ভিতরে ভিতরে উদ্ভাস্ত হইয়া উঠিল।

জমিদার উত্তর দিলেন, “কেন সে পারে না নাকি? তুমি ভাব কি—ছেলে তোমার লাঠিখেলায়—সর্দার গিরিতে তোমাকেও ছাড়িয়ে গেছে নিতাই! এইমাত্র খবর পেলুম—শ্রীপুরের সেরা লাঠিয়াল গোবিন্দ বংশীর হাতে চোট খেয়ে মাটি নিয়েছে।”

তথাপি নিতাইর চিন্তা দূর হইল না। বিবর্ণমুখে বাড়ী চুকিতেই নন্দরাণী দাওয়ায় বসিয়াছিল, চীৎকার করিয়া উঠিল, “শুনছ গো। বংশীটা গেছে লেঠেলদের সাথে—ছেলেমানুষ বাছা আমার—সে কি আর ফিরবে গো।”

নন্দরাণী কাঁদিতে লাগিল আর দাওয়ায় তাহার পাশে বসিয়া নিতাই ভারিতে লাগিল, অতীতের কিছুই মরে না। অতীতের নিতাই বাঁচিয়া রহিয়াছে বংশীর মধ্যে আর নিতাইর বাপ মা রূপ নিয়াছে নিতাই এবং নন্দরাণীর মধ্যে।



দক্ষিণ-ভারত-পথে

কন্থাকুমারী অন্তরীপ

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

বিশ্বের পরম প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যশালী পবিত্র স্থান কন্থাকুমারী অন্তরীপ (কেপ কমোরীণ) তিন সাগরের মোহনায় পশ্চিমঘাট পর্বতমালার প্রান্ত সীমায় অবস্থিত। প্রকৃতির চিরসুখকর সৌন্দর্যেরই আকর ত্রিবাঙ্গুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই কমোরীণ।

মাদুরা হইতে ট্রেণে ২৮ মাইল যাইয়া তিনিভেলি ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইতে হয়। তিনিভেলি হইতে মোটর যোগে ৬৪ মাইল যাইলে কন্থাকুমারী, নিজস্ব মোটরকার ভাড়া যাতায়াতে ১৫ পনর টাকা মাত্র। সময় মতন

হ্রদের তীর দিয়া, অদূরে মাক্‌মালার অবয়বের দৃশ্য সমুখ দিয়া মোটর গাড়ী ছুটিতে থাকে, প্রতি মাইনে প্রায় পরিবর্তিত হয়, ধীরে ধীরে পর্বত ও সমতল ভূমি অপসারিত হইয়া যায়। যেন ছায়াচিত্রের দৃশ্য চোখের উপর ভাসিয়া যায়।

নীলাবধর ও নীলাবধর অসীম অপূর্ণ মনোরম দৃশ্য— ভগ্নমূলের নীলাভা এবং সাগর নীরের প্রশান্ত অনন্ত নীল রং যেমন মহান, তেমনি গরীয়ান। ধীরে ধীরে মোটরকার যতই কুমারিকার সমীপবর্তী হইতে থাকে, ক্রমশঃ উত্তপ্ত



কেপ কমোরীণের পথের দৃশ্য

ভাড়ার (শেয়ারে) মোটর বাস পাওয়া যায়। প্রতি জন ২৫০ টাকা ভাড়া লাগে। আর একটি পথ ত্রিবাঙ্গুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিভেন্দ্রাম সহর হইতে পঞ্চাশ মাইল মনোরম পথ দিয়া মোটরে কেপ কমোরীণ যাওয়া যায়।

সারা পথটি শ্রামল শস্তক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আকিয়া বাকিয়া চলিয়াছে। কখনও বা তাল নারিকেল কুঞ্জ পার্শ্বে রাখিয়া, কোথায় বা স্বচ্ছ পল্লবপুঞ্জ ও নীল জলরাশিপূর্ণ

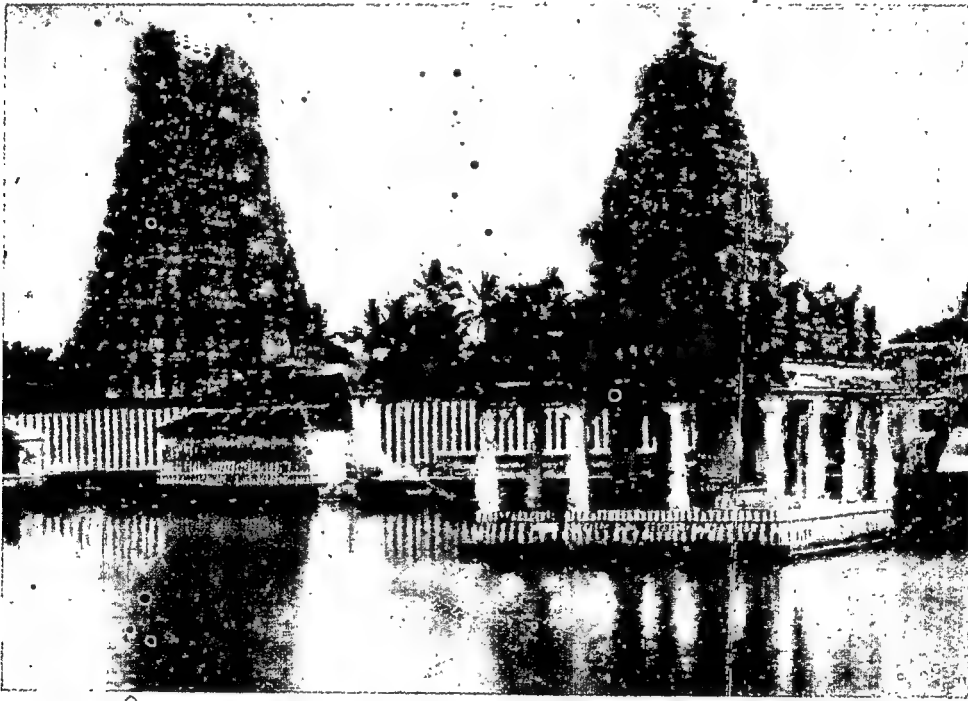
বায়ু মকরানিল স্পর্শে স্নানীতল হইয়া পরম প্রীতিদায়ক হইয়া উঠে। বিচিত্র স্তম্ভের পথ দিয়া বেলাভূমির উপর তরুণ আসিয়া উপস্থিত হইলে কুমারিকা দর্শন পাওয়া যায়।

ত্রিভেন্দ্রাম হইতে নাগরকইল দিয়া কেপকমরীণ আসিবার পথটি বিশ্বের মনোমুগ্ধকারী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যভূষিত পথের মধ্যে পরম রমনীয় একটি পথ। কেপ হইতে ৮ মাইল উত্তরে পথের ডানপাশে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন স্থচীন্দ্রম শিবের

মন্দির বিরাজিত। ভারতের দেউলের মধ্যে এই মন্দির এক শ্রেষ্ঠ মন্দির। ইহার স্বল্প কারুকার্য, অপূর্ব স্থাপত্য কৌশল; অতি উচ্চ ও গাভীর্ষ্যপূর্ণ দেউলচূড়া, সুন্দর গোপুরম, পবিত্র তীর্থ মাহাত্ম্য, হিন্দু-শিল্পীর অপার শিল্প-নিষ্ঠা, পারিপার্শ্বিক স্থানের সৌন্দর্য এবং সমারোহের রথযাত্রা যুগযুগান্তর হইতে যেমন খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তেমনই লক্ষ লক্ষ নরনারীকে আকর্ষিত করিয়া থাকে। এই মন্দিরে শিবের নটরাজের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

বালুকণায় পরিণত হয়। সেইজন্ত কণাকুমারীর বালুকণা যেন ধাতু শস্ত্রেরই মতন।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে যে দেশ “কেরল” নামে খ্যাত, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত—ত্রিবাকুর, কোচিন ও মালাবার। এই কেরল প্রদেশই “পরশুরাম ক্ষেত্র” নামে অভিহিত। প্রবাদে প্রকাশ, পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষেপ করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করেন। সেই পাপক্ষয় করিবার জন্ত বিশ্বামিত্র ঋষি একটি বৃহৎ যজ্ঞ করিবার পরামর্শ প্রদান



সুচীন্দ্রাম মহাদেবের বিশাল দেউল

এই সুচীন্দ্রাম মহাদেব কণাকুমারী দেবীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দেবী প্রথমে সম্মত হন। বিবাহের লগ্নও স্থির। ত্রিভুবনের লোকও নিমন্ত্রিত। কিন্তু বিবাহ হইল না, দেবীর মত শেষ মুহূর্ত্তে পরিবর্তিত হয়। শিব দেবীর মন ভুলাইবার জন্ত বহু কৌশল অবলম্বন করিয়াও অকৃতকার্য হন। উৎসবের চাউল আদি যাবতীয় সামগ্রী শিবাহুচর নন্দী ভৃঙ্গী আদির তাণ্ডব লীলায় নিক্ষিপ্ত হইল। সেই শস্যকণা

করেন। এই মহা যজ্ঞ সমাপনান্তে পরশুরাম কণাপ মুনিকে দক্ষিণা স্বরূপ ভারতভূমি দান করেন। তখন তিনি ভারতভূমি-ত্যাগ করিয়া কন্যা কুমারীতে গমন করেন সেখানে বহু বর্ষ ব্যাপিয়া বরুণদেবের কঠোর তপস্যায় রত থাকেন। সাগরপার হইবার বা বাসভূমির জন্তই এই তপস্যা। বরুণদেব স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া পরশুরামকে বর প্রদান করিলেন—তাঁহার বাসস্থানের জন্ত যতদূর পর্যন্ত তিনি আপন পরশু (কুঠার) নিক্ষেপ করিতে পারিবেন,

ততদূর ভূমি সমুদ্রগর্ভ হইতে উথিত হইয়া তাঁহার বাসভূমি হইবে। পরশুরাম কন্যাকুমারী হইতে উত্তরে সজোরে আপন পরশু নিক্ষেপ করিলে গোকর্ণে পতিত হইল। বরুণদেব সমুদ্রগর্ভ হইতে এই প্রদেশটি উদ্ধার করিয়া পরশুরামকে প্রদান করিলেন। সেই কেরলদেশই পরশুরামের ক্ষেত্র।

স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, প্রফুল্লতা, পবিত্রতা, নব উদ্যম চিত্তে যোগায় কেপকমোরিণের ঐশ্বর্য্য। মানবের চক্ষু প্রাণ ভরিয়া প্রকৃতির লীলা দর্শন করে, হৃদয় মহিমায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। বদললনা কবি সরোজিনী দেবী গাহিয়াছেন—

প্রাণেন্নাদনাকারী তরঙ্গ লীলা দেখিয়া তাহার সহিত করিবার বাসনা সম্বরণও করিতে পারেন নাই। জীবন করিয়া সম্বরণে রত হন, এবং অতি কষ্ট ও বিপদ করিয়া জলের অভ্যন্তরস্থিত পর্বত শৃঙ্গে সাঁতার দিয়া হইত ছিলেন। এখন সেই পাহাড় 'কিচনায় রক' নামে খ্যাত।

তীর নীরালা, তথাপি তরঙ্গের মৃদু মন্দ নৃত্য গভীর সমুদ্রের আলোড়িত গর্জ্জন স্থানটির নির্জনত করিয়া অপার আনন্দ প্রদান করে। অনন্ত নীলাশ্বরাশি মধ্যে সূর্য উদয় ও অস্ত বিধ সৌন্দর্য্যের পরম দৃশ্য অতুলনীয় দৃশ্য। সমুদ্রের ফেনিল নীল বারি যখন



কুমারিকা অন্তরীপের তীরের দৃশ্য

Ah ! What pleasant visions haunt me,
As I gaze upon the sea !

All the old Romantic legends,

All the dreams came back to me.

গুধু কবি ও সাধকরা কুমারিকার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন না, কঠোর বীরহৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। ভারতের শ্রেষ্ঠ সেনাপাত লর্ড কীচনার, কেপ কমোরিণ যুদ্ধ কালীন হৃদয় সংরক্ষণের অপূর্ব আড্ডা, সেইজন্ত কেবল মুগ্ধ হন নাই, তার অপার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সাগর মোহনার

করে, করিতে করিতে আসিয়া তীরের পর্বতাংশে আছড়াইয়া পড়ে বা জলমগ্ন গিরিকে আলিঙ্গন করে তখন এক পরম রমণীয় দৃশ্য সৃজিত হয়। সূর্য সন্ধ্যা সন্ধ্যা পাতা বেষ্টিত ছোট ছোট কুটীরগুলি যেন স্তব্ধ ছবির মতন দেখায়। যখন গোখুলির রক্তিমচ্ছট প্রান্তে বিলীন হইয়া সন্ধ্যার কালো ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসে, তখন যে অপার গাভীর্ঘ্য ও পরম হৃদয় পূরিত করে, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুভ জোৎস্না পুলকিত রজনীতে নীলাশ্বরাশির উন্মিষ

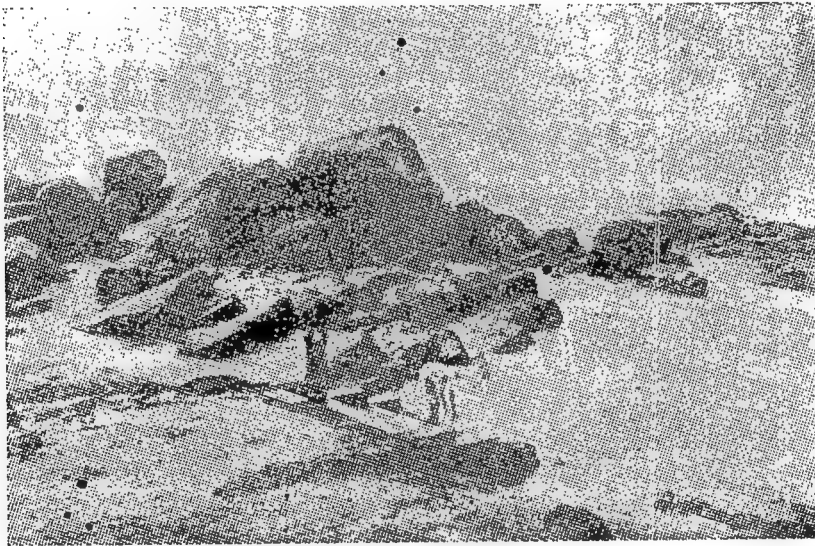
উপায় রজত কিরণচ্ছটা ও ঘন তালতমাল বনরাজি পরিবৃত স্থল প্রান্তের জ্যোৎস্না কিরণ উদ্ভাসিত দৃশ্যের মতন সৌন্দর্যের বিকাশ পৃথিবীতে বিরল।

এই অপরূপ স্থানে দেবীর কুমারী মূর্তি বিরাজিত। কোন অতীত যুগ হইতে আছেন, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণায় আবিস্কৃত হয় নাই। মন্দিরটি প্রস্তর নির্মিত। অভ্যন্তরে সূর্যালোক প্রবিষ্ট হয় না। সমুদ্রের দিকের দ্বারটি বন্ধ রহিয়াছে। যখন ভারতের সৌভাগ্যরবি প্রথর ছিল তখন সমুদ্রাভিমুখের পূর্ব দ্বারটি সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। দেবীর শিরশোভিত মুকুটের মণির উজ্জলতা দিক নির্ণয় বাতির

সময় মন্দিরটি অত্যন্ত মনোরম দৃশ্য ধারণ করে, পূজার গুরু গভীর মন্ত্র ও মৃদু ষট্টানিনাদ, সাগরের ঢেউয়ের কল মিনাদের সঙ্গে যখন মিশিয়া যায়, তখনকার অতি মধুর শব্দে মন মুগ্ধ করে।

কেপ কোরিণে স্নান করিলে সর্বতীর্থ-স্নানের পুণ্য অর্জন হয় এবং সকল কলুষ বিনাশ হইয়া যায়। মন্দিরের তিন ধারে নানা তীর্থ ঘাট বিরাজিত। মাতৃ ও পিতৃতীর্থ দুইটি সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ।

মন্দির হইতে দুই ফালং দূরে চক্রতীর্থটি পরম বিশিষ্টতা পূর্ণ। এখানকার জল লবণাক্ত নহে। মাতৃতীর্থ



মাতৃ-তীর্থ

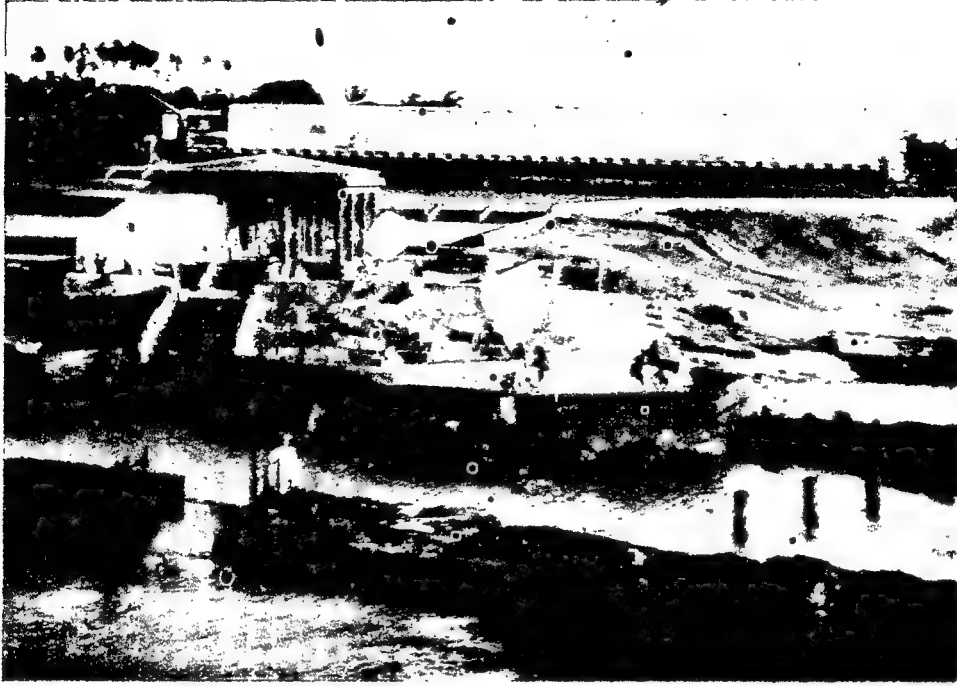
(লাইট হাউসের কার্য করিত)। বিদেশীয় বণিক জলদস্যু এই মন্দির লোভে আকৃষ্ট হইয়া তাহা অপহরণ করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু দেবীর মহিমায় তাহাদের পাপ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। তদবধি পূর্ব দ্বারটি বন্ধ আছে।

দেবীর মূর্তি ধূসর প্রস্তরে (গ্রানাইট) গঠিত। তাহার শিরে বহু মূল্য রত্নখচিত মুকুট। দেবীর নীল চক্ষু দুইটি অনন্ত নীলাম্বরীশির উপর শুল্ক। দেবী তুষারের ন্যায় স্বচ্ছ ও পবিত্রতার প্রতীক। সন্ধ্যাকালীন দীপদান ও পূজার

(মাংক) ঘাটের সোপান সরল ও সোজা, জল স্থানিস্থল ও শান্ত। মাত্র এক কোমর গভীর, চারিদিকে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত থাকায় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই বেষ্টিত বহিরাংশে স্নান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। জল ঘূর্ণাবর্ত ও পর্তসম্মূল। এখানে স্বামী স্ত্রীতে একত্রে স্নান করা বিধেয়।

কেপের জলবায়ু পরম উপকারী, সমুদ্রের মলয়ানিলে

বাতাসের উত্তাপ ও শীতলাত প্রীতিদায়ক হয়। কুয়াসা এখানকার ভ্রমণকারীদের সরকারী বাঙ্গলোটি যেমন এখানে বিরল, বারিপাত অল্পক্ষণ স্থায়ী। গ্রীষ্মকালে মধ্যে স্থানে অবস্থিত, তেমনই প্রীতিকর। 'কুমারী মন্দির'



চক্রতীর্থ



কুমারিকার পল্লীপথ

মধ্যে বারিপাত গরম হ্রাস করে। শীতকালের শুষ্ক স্বরূপ- রোম্যান ক্যাথলিক গীর্জাটি মনোরম স্থানে নির্মিত, কিরণ ও সমুদ্রের বাতাস স্থানটিকে সর্বদা গরম রাখে। পরম চিত্তাকর্ষক স্থান।

কেপ কমরিণ হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে পূর্বঘাট শৈলমালার অন্তরে ধুকধুকর ত্রায় একটি গিরি শোভা পাইতেছে। সমুদ্র হইতে তিন সহস্র ফিট উঁচু— এই গিরি শৃঙ্গে স্বাস্থ্য নিবাসরূপে অনেকে নীড় স্থাপিত আছে। মলায়নিল প্রবাহে গিরি পরম স্থালায় এবং ইহার জলবায়ু অতিশয় উপকারী। নানা প্রকার ভেষজ বনস্পতি এই পর্বতগাত্রে জন্মায়। বৈজ্ঞানিক জগতে 'মাউন্ট অব

মেডিসিটাল হার্ব' নামে পর্বত বিখ্যাত। দেশী প্রবাদে এই গিরি 'মহামেধ' ওষধি' নামে প্রচলিত। ত্রৈত্যয়ুগে এইখান হইতে হনুমান বিশাল্যকরণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতির অফুরন্ত অসীম, অগ্নান সৌন্দর্যের আকর এই অন্তরীপকে দেখিলে চিত্ত প্রীতি ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া যায়।

সীতার বারমাসী

শ্রীমন্তেজ নাথ দাশ বি-এ

বাংলা দেশের পল্লী-সাহিত্য বারমাসী গান গুলিকে প্রেমের কবিতা নামে অভিহিত করা বাইতে পারে। প্রাচীন বাংলায় পল্লী কবিরাই বারমাসী কবিতার রচয়িতা। পল্লীর অধিবাসীরা এই সকল বারমাসী সঙ্গীত গাহিয়া একটা অনাবিল আনন্দ লাভ করে। পল্লী প্রদেশে বারমাসী সঙ্গীত গুলি খুবই জনপ্রিয়। নায়ক-নারিকার বিরহ, মর্ষ ব্যথার উপর ভিত্তি করিয়া গ্রাম্য কবি এই সব গান রচনা করিয়াছেন। কবিতা গুলির ভাষা নির্ঝরিনীর মত মুক্তপ্রাণ এবং উপমা ও চিত্রগুলি মনোরম, অতুলনীয়। এই গান গুলির ভিতর দিয়া আমরা প্রাচীন বাংলায় পল্লীর নায়ক-নারিকার সত্যকার সরল প্রেমের পরিচয় লাভ করি। এই কবিতাগুলিতে প্রাচীন সামাজিক রীতি নীতির বহু উপকরণ পাওয়া যায়। নারিকার বেদনা-বিধুর চিত্তের অস্থিরতা কবি অশেষ রচনা নৈপুণ্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি প্রিয়জন-বিয়োগজনিত ব্যথিত হৃদয়ের চিত্তব্যাকুলতার আত্মপ্রকাশ হইতেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্য গুলি রচিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য "মেঘদূত" নির্বাসিত যক্ষের বিরহবিলাপ লইয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীরাধিকার বিরহ লইয়াই রচিত হইয়াছে। বারমাসী গীতিকা গুলির মধ্যে অন্তঃসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই এগুলির ভিতর বিরহচঞ্চল

তরুণ পল্লী কবিদের চিত্তব্যাকুলতার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি রহিয়াছে। আজও সেই বিরহসুর গ্রামের মাঠে মাঠে, নদীতে নদীতে গণমনের অন্তরে অন্তরে বাঙ্কার তুলিতেছে।

শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনীতে আমরা যে সুন্দর বারমাসী পাইয়াছি, তাহা সুশীলার বারমাসী নামে খ্যাত। শ্রীমন্ত রাজকন্তা সুশীলাকে বিবাহ করিয়াছেন। পিতাপুত্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আগ্রহাষিত আর রাজকন্তা সুশীলা স্বামীকে সিংহলে আর এক বৎসর অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতেছেন। সুশীলা শ্রীমন্তের নিকট সিংহলের বার মাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; তাহাতেও শ্রীমন্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন না। তখন রাজকন্তা স্বামীকে সিংহলী সুরৈশ্বর্যের যে ছবি দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার কিরদংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

বৈশাখে চন্দ্রনাদি তৈল দিবে সুশীতল বারি।

সন্ধ্যালি গামছা দিব ভূষা কস্তুরি ॥

জ্যৈষ্ঠে পুষ্প শয্যা করি দিব চাঁদোয়া টানায়।

হাস্ত পরিহাস্তে যাবে রজনী বাহিয়ে ॥

আষাঢ়ে দেখহ ঘন নাচয়ে ময়ূর।

দৃষ্টে নবজলধর ডাকয়ে দাহুর ॥

শুন প্রাণনাথ তুমি শুন প্রাণনাথ ।
 নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাতি ॥
 আবেণে বিদেশে ত্যজিয়া লোক আইসে নারীপাশে ।
 কেমনে কামিনী ছাড়ি যাবে পন্থবাসে ॥
 ভাদ্রে মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি ।
 চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী ॥
 মধুঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস ।
 আর না করিহ প্রভু উজানীর আশ ॥
 ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে ।
 তিথি দৌলমঞ্চ আমি করিব রচনে ॥
 সখি মিলি গাব সবে বসন্তের গীত ।
 আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত ॥

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

এখানে “লীলার বারমাসী” হইতে আমাদের সুপরিচিত করে কটী সারি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

“আইগ আইস বন্ধুরে বইগ মোর কাছে ।
 দেখিব তোমার মুখে কত মধু আছে ॥
 তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হইম লতা ।
 বেইড়া রাখম ষোগল চরণ চাইড়া যাইবা কোথা ॥
 সিন্দূর মাখিয়া কন্তারে দিয়াছ অধরে—
 কাল কজ্জল রাঙ্গা তার ছই পাশে ।
 বর্ষাকাল্য তারা যেমন মেঘের উপর ভাসে ॥
 সুন্দর বদন লীলার মাটিতে পড়ে চুল ।
 তার মধ্যে দন্ত লীলার নাহি বায় দেখা ।
 ছল্লভ মুক্তা যেন বিহুর মধ্যে ঢাকা ॥”

অপরূপ বারমাসী গীতিকাতে আমরা পাইয়াছি

“বৈশাখে বৈদাশী বন্ধু বড় দয়ামন্ত ।
 অভাগিনী রাখিকা আমার ছুখের নাই অন্ত ॥
 ভাদ্রেতে ভরা নদী ছুফল পাথার ।
 কেমনে আসিবে হরি না জানে সীতার ॥
 আশ্বিনে অধিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে
 অবশ্য আসিবে হরি পূজা দেখিবারে ॥
 অগ্রহায়ণ মাসেতে ক্ষেতে পাকা ধান ।
 বৃন্দাবনে কৃষ্ণ নাই কে করিবে লবাণ ॥
 (লেখকের সংগ্রহ, ‘বাংলার শক্তি’ ।)

সুশীলা, লীলা বা রাধার বিরহব্যথায় রচিত বারমাসী গীতিকা ছাড়া সীতার বিরহ কাহিনী লইয়াও যে বাংলা দেশে গীতিকা রচিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করা গিয়াছে । “সীতার বারমাসী” যে উত্তর বঙ্গের পল্লীতে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে ।
 উত্তর বঙ্গের পল্লীপ্রদেশ হইতে পল্লী গীতিকা, প্রাচীন হস্ত লিখিত পুথি, পল্লীশিল্প প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে করিতে রাজসাহী জেলার পল্লী অঞ্চল হইতে মানিক দত্ত বৈষ্ণব “শ্রীজগন্নাথ বা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা” ও কবি জগন্নাথ রচিত “পদ্মাপুরাণ” নামক যে দুইখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি (বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত) সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একখানি খণ্ডিত প্রাচীন হস্তলিখিত কাগজে “সীতার বারমাসীর” সম্বন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায় । প্রাপ্ত কাগজের অনুরূপ লিপিটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

“শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণায়

নমঃ,—

অথ শিতা বারমাসী—

একদিন ভগ্নী নয়া জনক নন্দিনী ॥
 কহিতে লাগিল যত বনের ছুখের কাহিনী ॥
 জানকির প্রতি জিজ্ঞাসিল তিন জন ॥
 কি প্রকার প্রান দিদি বনে ছিলে তিন জন ।
 সিতা বলে বনে বখন প্রথম প্রবেশ ॥
 মন দিয়া শুন সবে আমাদের ক্লেশ ॥
 প্রথম মধু চৈত্র মাস কাননে গমন ।
 তপসীর বেশ হৈল ভাই ছই জন ॥
 মাথে জটা আর দোহার বন্ধ পরিধান ।
 অগ্রপথে জান প্রভু দুর্বা দল শ্রাম ॥
 পশ্চাৎ লক্ষণ জায় হস্ত ধর্ম্মধর ।
 প্রবেশ করিলাম সব বনের ভিতর ॥
 বৈশাখ মাস হইল বাড়িল দিন আর ।
 প্রথমে হৈল রুদ্র অতি খরতর ॥
 চলিতে না পারি দেখি কমল লোচন ।
 ব্রিষ্ণ নীচে বৈশে কান্দি ছুখের কারণ ॥”

খণ্ড কাগজ খানিতে ইহার পর আর কিছুই লিখিতে হয় নাই, কাজেই অবশিষ্ট দশ মাসের বর্ণনা কিরূপে করা হইয়াছে জানিবার উপায় নাই।

সীতার বারমাসীর যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, বনবাস কালে রাম, লক্ষ্মণ, ও সীতাকে যে সব ব্যথা

সহ করিতে হইয়াছিল; সেগুলির কতকটা চিত্র পল্লীকবি এই বারমাসীতে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

এই সব লোক সঙ্গীত এখনো বাংলার বহুস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। বঙ্গভাষার সেবকগণকে ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র করিতে অরুরোধ করি।

অন্ধপ্রেম

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

(নয়)

সামান্য একখানা একতলা বাড়ী—ভাঙ্গা। বে-মেরামতে মনুষ্য-কঙ্কালের মত ইটের কঙ্কাল স্বরূপ সেখানা কোনো রকমে দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর পশ্চিম দিকে খড়ের চালে গোয়াল ঘর—তবে গরু নাই সেখানে। সেই ঘরখানা এখন বৈঠকখানায় পরিণত। বাড়ীর মালিক—উদয়নারায়ণ।

কঙ্কালসার কোঠাবাড়ীতে তিনখানি মাত্র ঘর! এক খানা অব্যবহার্য—ছাদ নাই। আর দুইখানা মন্দের ভাল। কাজেই গোয়ালঘর খানাকেই বৈঠকখানা করিতে হইয়াছে। রাত্রিকালে সেইটাই আবার উদয়ের শয়ন মন্দির হয়।

এই মাহুঘটারই একদিন ধনকুবের বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। ব্রজেশ্বরের কুপায় সেই মাহুঘেরই এখন এই দুর্দশা। তাহার মাথা খারপ হইয়া গিয়াছে তাতাতেই।

উদয়নারায়ণ ঘরে বসিয়া ভাগ্যকু সেবন করিতে ছিল আর আপন মনে একজনের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছিল। প্রদীপের স্তীর্ণ আলোকে তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। তবে তাহার ভীষণতা বচন-ভঙ্গীতেই বুঝা যাইতেছিল। যাহার উদ্দেশ্যে এই গালি ও অভিশাপ, সে ব্যক্তি ব্রজেশ্বর।

বিজয়া কিছু আহাৰ্য্য লইয়া ঘরে প্রবেশান্তর কহিল—

“মুখটা ধোও, কিছু খেতে হ’বে; সমস্ত দিনটা না খেয়ে কাটিয়েছ।”

“কেন খাব, বল দেখি? আর কিইবা খাব? খাবার কিছু ত রাখে নাই বেজা? তবু কিন্তু খেতে হ’বে, খেয়ে বাঁচতে হ’বে, বেঁচে অপমানের প্রতিশোধ নিতে হ’বে। তা’র একটা ছেলেকে অন্ধ করেছে, বাকী আছে আর একটা। সুবিধে পেলোই সাবাড় করব—বুঝেছ?”

“ও সব বুঝব পরে, খাও আগে।”

“কিন্তু আমার অন্ধ ছেলে কিশোরটার খুব খবরাখবর করে সে! তা’ করুক, প্রতিশোধ নিতে হ’বে কিন্তু। এ শর্মা যে সেটা ছাড়বে না, তা’ তোমায় ব’লে দিচ্ছি বিজু—হাঁ। তুমি যে ভাবছ, খাইয়ে-দাইয়ে আমাকে ঠাণ্ডা করবে, আর স্বামি ভাল ছেলেটার মত ঘরে চুপ করে বসে থাকবে, সেটা হচ্ছে না আর। সমস্ত দিনটা অনাহারে আছি, শুধু রাগ বাড়বার জন্যই। রাগ যত বাড়বে, কাষ তত হ’বে প্রতিশোধ নেবার—হাঁ।”

“তা’ সে নিওখন—খাও ত আগে।”

“ইস, ভারী চালাকি তুমি, আমাকে ভোলা’বে বটে! ঐ নচ্ছার বেজাটা যে আমার সর্বস্ব চুরি করে আমার স্ত্রী-পুত্র সকলকে পথে বসিয়েছে, আমাকে কুকুরের অধম করেছে; সেটা ভুলে যাচ্ছ বুঝি? ভুলতে চাও, তুমি ভোল—আমি পারব না। ওদের প্রাণ নিয়ে প্রাণ দোবো, এ হচ্ছে আমার দৃঢ় সংকল্প।”

“তা’তে লাভ? প্রাণই গেল যদি—”

“চুপ, চুপ; কথা কয়ো না আদৌ। ও সব কথা বুঝবে না তুমি। এমনভাবে সর্বস্ব হ’য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরই ভাল। অনেক সহ করেছে, আর পেরে উঠছি না। এতদিন সব শেষ ক’রে দিতাম। পারিনি কেবল তোমারই জন্ত। এইবার ঠিক করেছে, প্রথম বলি দিব তোমাকেই। তা’তে রক্ত আমার ফুটে উঠবে টগবগ ক’রে। ছুটবে তাতে রক্ত-গঙ্গা। হা—হা—হা।”

কথা বলিয়াই উদয়নারায়ণ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরেই বাড়ের মত বাহিরে ছুটিয়া যাইবার সে চেষ্টা করিল। পাগল স্বামীকে ঘরের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টায় বিজয়ার ব্যস্ততা বাড়িয়া উঠিল। ফল হইল তাহার বিপরীত। উদয় নারায়ণ ভীষণ রাগিয়া উঠিয়া বলিল—

“এত বড় স্পর্ধা! আমার গায়ে তোমার হাত! খুন ক’রে ফাঁসী যাব, বিজয়া, বিজয়া দেখত দেখত আমার তলোয়ারখানা আছে কোথায়? অন্ধ ছেলেটাকে তোরা আটকে রেখেছিস, রাখ। বলি নাই কিছু টি। তাই ব’লে সগোষ্ঠিকে তুই বে-ইজ্জত করবি ছুঁচো বেজা? দ্যাখ তুই, তোরা কি হাল করি। এই খানাদার, এই ধরু ধরু বেজা। গুলি-গুলি—গুড়ুম।”

বেপথুমানা শরীরে বিজয়া বলিল—

“স্থির হও, স্থির হও, অমন করছ কেন তুমি। ওকি—ওকি।”

আপন কণ্ঠ-নালী সজোরে চাপিয়া ধরিয়া উদয়ের তখন আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা। বিজয়া তাহাতে প্রাণপণে বাধা দিয়া তারস্বরে সাহায্যের প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু সাহায্য করিবার লোকের একান্ত অভাব সে পল্লীতে। কাষেই কাতর-আত্মার উত্তর দিল না কেহই। পাগল স্বামীকে লইয়া বিজয়া মহা বিপদেই পড়িল।

বাশী বাজাইয়া চাঁদু সেই পথ দিয়া ফিরিতে ব্যাকুল-আত্মা শুনিয়া আতঙ্কের দ্বারে উপস্থিত বলিল—

“কে ডাকে গা, তোমাদের বাড়ীতে বিপদ বৃদ্ধি। বিপদটা যে কি, বিজয়ার কথায় চাঁদু বুঝি। উদয় তখন ভীষণ বিক্রমে বাড়ীর বাহিরে চায়। বিজয়া আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চাঁদুকে দেখিয়া উদয় অধিকতর বিক্রম করিতে লাগিল। তাহার ধারণা—চাঁদু তাহাকে খানার ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্ত খানাদারকে পাঠাইয়াছে। বিজয়া খানাদারকে বন্ধুর করিয়াছে—দেখিয়া সে চাৎকার করিয়া উঠিল।

চাঁদুর সঙ্গে একজন ভারী জোয়ান অন্ধ যুবক দৃষ্টিশক্তি না থাকিলেও স্পর্শ-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি অসাধারণ। তাহার কাণে কাণে কি একটা বস্তুর আত্মবাহুগুলের মধ্যে উদয়কে চাঁদু ঠেলিয়া আঁকোপাস্ যে ভাবে জীবজন্তু ধরে, কতকটা সেই উদয়কে অন্ধ চাপিয়া ধরিল। অন্ধ কণ্ঠ হইয়া উদয়ের হাত-পা নাড়িবার পর্যন্ত আর ক্ষমতা না। চাঁদু বিজয়ার উদ্দেশে বলিল—

“নিশ্চিন্ত থাক মা, মান্নঘটা ঘরের বাইরে হা বাড়ীতে পারবে না। তার’পর যা হয় হ’বে।”

কথা শেষ করিয়াই চাঁদু আবার বাশীতে বাশীর স্বরে কি মোহিনী-শক্তি ছিল, কে জানে শুনিয়া কেমন যেন তন্দ্রালসে সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অবসরে অন্ধ যুবকটিকে সঙ্গে লইয়া চাঁদু বাটার চলিয়া গেল।

পূজার পূর্বে হেমলতা দেবীর সম্পূর্ণ নূতন ধরনের গল্পপুস্তক “দেইলি”
কবিশ্রী বীন্দ্রনাথের মন্তব্যসহ বাহির হইতেছে।

বিমান আক্রমণ ও তাহার প্রতিনিরোধ

ডাঃ এস, এন্ দাশ, এম্-বি, ডি-পি-এইচ

বিমান আক্রমণের সম্পূর্ণ নিরোধ ব্যবস্থা সম্ভব নহে। বিমান আক্রমণ হলে আক্রান্ত দেশের অধিবাসীদের কষ্ট হবেই, তবে যাতে কষ্ট, ক্ষতি ও মৃত্যুহার কম-হয় ও ব্যাপক না হয় তজ্জগত উপায় ও ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমরা সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধেই বলিব।

প্রথমেই বলা ভাল যে আমাদের দেশে উপস্থিত যুদ্ধে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা খুব কম কারণ আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে স্বদূর ইউরোপ হইতে আসিয়া এখানে একটি বোমা ফেলিতে হইলে জার্মানিকে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ যোগাইতে হইবে এবং তাহা বিশেষ কার্য্যকরী বা লাভজনক হইবে না। অতঃপক্ষে একথাও সত্য যে বিমান শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্ব্বল কসিয়া যাইতেছে ও যুদ্ধের আনুসঙ্গিক বিপদ সীমাহীন হইয়া পড়িতেছে। কাজেই আজকালকার দিনে সকলেরই বিমান আক্রমণ ও তাহার নিরোধ ব্যবস্থাদি জানা একান্ত আবশ্যিক কারণ বাষ কখন আসিয়া পড়িবে কেহই জানে না। যুদ্ধের অবস্থার কখন কি পরিবর্তন হয় ও কোন দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপক হইয়া পড়িবে তা কেহই বলিতে পারে না। কলিকাতা সহরতলী ও সহরের সম্মুখ কলকারখানাগুলি ও অধিবাসীদের রক্ষার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব সরকার বাহাদুর, কলিকাতা করপোরেশন ও অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সহযোগে করিতেছেন। আমাদের সকলেরই হইতে সাধ্যমত সাহায্য ও যোগদান করা দরকার। বিপদের সন্মুখীন হইলে সরকার বাহাদুর তাহাদের একটি এয়ার ক্রাফ্ট কামান লইয়া বা যুদ্ধ বিমান উড়াইয়া লড়াই করিবেন সত্য কিন্তু সর্বসাধারণের ঐকান্তিক সাহায্য ও বিপদে ধৈর্য্য না থাকিলে সরকার বাহাদুরের চেষ্টা ফলবতী বা কার্য্যকরী হইবে না। সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার দায়িত্ব সরকার বাহাদুরের সহিত আমাদেরও পূর্ণ মাত্রায় আছে। সরকার বাহাদুর প্রজার রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্ত এক পক্ষে

যেমন লড়াই দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন অল্প পক্ষে সেই মত পুলিশ বা রক্ষী সৈন্য মোতায়েন করতঃ শৃঙ্খলা রক্ষা, যানবাহনাদি নিয়ন্ত্রণ, বা আরও নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গুলি করিতেছেন। আমরাও সহযোগিতা দ্বারা, তাহার নির্দেশ সকল পালন করিয়া, ও যথাসাধ্য সাহায্য দিয়া তাহার ঐ প্রশংসনীয় উদ্যম কার্য্যকরী ও সাফল্যমণ্ডিত করিলে আমাদের দায়িত্ব পালন করা হইবে। এইভাবে কার্য্য করিলে সম্পত্তি ও জীবন অনেকাংশে রক্ষা পাইবে।

সরকার বাহাদুর কিভাবে আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চান? তাহা হইতেছে এই যে সাধ্যমত প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মরক্ষার বস্ত্র ও যন্ত্রাদি যেমন গ্যাস প্রতিরোধক মুখস রাখিবেন। অন্যাসে ও অল্পব্যয়ে যাহাতে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই সরকার বাহাদুরের। নিজ কর্মচারীদের শ্রমহরী, রক্ষী বা পুলিশদের বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ত ব্যবস্থা গভর্ণমেন্ট বাহাদুরের।

আমাদের স্ত্রীলোকদের (women folk) বৃদ্ধ, কন্ন ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে সরাইবার ভার আমাদের নিজেদের। 'শত্রু বিমান আক্রমণ' আসন্ন এই সম্বন্ধে ধ্বনি হইবামাত্র পূর্ব হইতে প্রস্তুত মাটির নীচে আত্মরক্ষার স্থানে পলাইবার ভারও আমাদের উপর। তবে কথা হইতেছে এই যে বাঙ্গলা দেশে মাটির নীচের ঘর বাসোপযোগী হয় না কারণ sub-soil water অর্থাৎ জমির নীচের জল ঐরূপ ঘরের উর্দ্ধে থাকায় নীচের ঘরটা সর্বদা আর্দ্র বা সেঁতসেঁতে থাকে বা চুষাইয়া পড়ে। সেকারণ কলিকাতার বাহিরে গ্রামাঞ্চলে যাহাদের থাকিবার উপায় আছে তাহারা পূর্বাঙ্কেই সপরিবারে তথায় চলিয়া যাইলে সর্বাপেক্ষা ও সর্বরকমে ভাল হয়। বিশেষ স্বার্থের জন্ত যাহাদের কলিকাতায় থাকিতে হইবেই তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কলিকাতার উপযুক্ত মেয়র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিশিথনাথ সেন মহাশয় যেক্রপ তৎপরতার সহিত

বিমানাক্রমণ হইলে করপোরেশন হইতে সাধারণের ধন, প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন তজ্জন্ত তিনি সকলের ধন্যবাদার্থ।

এখন বিমান আক্রমণ হইবার সময় আমাদের কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে দু একটা কথা বলিব। বিমান আক্রমণ হইবার আগেই সঙ্কেতধ্বনি হবামাত্র রাজিকালে সকলেই দীপ নির্ধারণ করিবেন। বিমানাক্রমণ সাধারণতঃ রাজিকালেই বেশীর ভাগ হয়। তারপর বাটার নিম্নতলস্থ বেশী মজবুত কোন ঘরে জানালা দরজা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বিপদের সময়টুকু কাটাইবেন।

সাধারণের সুবিধার জন্ত প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় একটি করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইতেছে। মৃত, আহত বা পীড়িত ব্যক্তিদের বিমানাক্রমণের অব্যবহিত পরেই স্ট্রচার এম্বলেন্স যোগে তথায় চিকিৎসার্থ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তথায় প্রাথমিক সাহায্য দিবেন। কলিকাতা সहरটিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক অংশের জন্ত একজন করিয়া warden ও তাহার অধীন একটি কার্য্যকরী সভা থাকিবে।

এ বিষয়ে করপোরেশনের প্রত্যেক কাউন্সিলর warden হিসাবে সাহায্য করিবেন। সেইজন্ত মাঝে মাঝে নিকট তাঁহারও ধন্যবাদার্থ। জন সাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে থাকিবেন তাহা না হইলে নগর বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। এখন সहरটিকে করপোরেশন ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

বিমান আক্রমণ কি ভাবে হয় সে বিষয়েও দুই একটি কথা বলা ভাল। সাধারণতঃ বোমা ফেলিয়া বা ফিউজ চালক বিমানখানিকে খুব নীচে নামাইয়া machine gun চালাইয়া বিপক্ষের সম্পত্তি ও জীবন-হানি করে, এ উদ্দেশ্যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া ভয় (panic) করা ও বিপক্ষের মর্ধ্য স্থান (vital point) আঘাত করা। এতদুদ্দেশ্যে নানা প্রকার বোমা হয়। যেমন—Explosive Bombs, Gas Bombs, Incendiary Bombs, Combined Bombs, Stinging of ইত্যাদি।

পরে এই গুলির বিষয় কিছু কিছু বলিব।

সুন্দর প্রিয়তম

শ্রীজিতেন্দ্র বক্সী

[দাদু হইতে]

কত দিন গেল পথ চাহি' তব

সুন্দর প্রিয়তম,

দরশন বিনা কঠিন জীবন

এখনো গেল না মম।

কত দিন তব পাই নাই দেখা,

গেল কাটি' বহুদিন—

যুগ যুগ সম প্রহর, কালের

সাগরে হইল লীন।

কাটাছ প্রহর, যেন শত যুগ,

রজনী করিছ ভোর।

আসার লগন গেল ধীরে বয়ে—

কুই এলে চিত-চোর?

নয়ন তোমায় হেরে নাই, প্রভু

তাই নিতি পথ চাপ,

বিরহিণী হিয়া জাগে সে বিরহে

উতলা চকোর প্রায়।

জয়ী.

শ্রীদীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি,

প্রণব বড়লোক নয়। তাকে গরীবও বলা চলে না। বাপের জমান টাকা সে যা পেয়েছে তাতে একলার বেশ এক রকম চলে যায়। প্রণবের কিন্তু তাতে চলে না। তার কশরগ আছে। প্রণব উচ্চাকাঙ্ক্ষী। মোটর গাড়ীর কারখানা করতে চায় সে। একেবারে দিশী মোটর। ভারতের শিল্পজগতে সে নাম রেখে যেতে চায় চিরকালের মত। মাথার ভিতর ছিল তার অনেক পরিকল্পনা। সেগুলি ফুটিয়ে তোলবার জন্তে চাই তার টাকা। কে তাকে দেবে টাকা? বিশ্বাস করে একটি নবীন ইঞ্জিনিয়ারের সখ মোটাবার জন্তে দেবে টাকা কে? এদিকে প্রণবও পণ করেছে। ষতদিন না সে কৃতকার্য হবে ততদিন সে নিজের সুখশান্তি ঘর সংসার কোন বিষয়েই মন দেবে না, এমন কি রেবার বিষয়েও ভাববে না। রেবা তার অনেক দিনের বন্ধু। সে জানে একদিন না একদিন রেবা তার স্ত্রী হবে। তার মোটরখানা তৈরী হলেই সে রেবাকে বিয়ে করবে, এ কথা সে রেবাকে অনেকবার বলেছে। তার কথা শুনে রেবা কেমন ম্লান হাসি হাসে।

নিজের পুঁজি যা ছিল সব নিয়ে প্রণব গেল সাঁওতাল পরগণার একটি গ্রামে। ছোট্ট একটি কুটারে থাকে সে। একটি সাঁওতাল চাকর করে তার দেখা শোনা। প্রণবের সাঁওতাল চাকর অর্জুনের মেয়ে রূপাও থাকে সে কুটারে। বাপের সঙ্গে প্রণবের দেখা শোনার ভার সেও ভাগ করে নিয়েছে আধাআধি। রূপা সুন্দরী। সঘনো কাঁচের ঘরে রক্ষিত অর্কিডের মত নয়, বুনো গোলাপের মত, বনের হরিণ শিশুর মত, বরগার জলের মত।

কুটার সংলগ্নই প্রণবের কারখানা। কয়েকজন সাঁওতাল অর্জুন ও রূপাকে নিয়েই তার কাজ চলে কারখানার। স্বর্ধ্যোদয় থেকে স্বর্ধ্যাস্ত পর্যন্ত প্রণব তার মস্তিজাত এই মোটরশিশুটির জন্ম উপলক্ষে থাকে। তার বিশ্বাস সে একদিন তার এই সৃষ্টিটিকে দশের সামনে বের করতে পারবে। কাজ চলে তার খুবই কম চলে। ষতটাকা চালবার দরকার

তার কিছুই ত সে চালাতে পারে না, তাই ত তার কাজ সাদ হতে লাগছে এতু দেরি। মাঝে মাঝে তার ধৈর্যচ্যুতি হয় কিন্তু রূপাই আবার তাকে তার নিজের কাজের উপর বিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়। মোটর করা বন্ধ করলে রূপার চলবে না। সে যে প্রণবের হাতের তৈরী মোটরের হবে প্রথম যাত্রী।

মাঝে মাঝে প্রণব আসে কোলকাতায়। দেখাও হয় রেবার সঙ্গে। এবার রেবা তাকে একটি অতুরোধ জানালে। সুরেশবাবু ধনী। অনেকগুলি কলকারখানা পেয়েছে সে উত্তরাধিকার স্বত্রে। এ ছাড়া সে সিভিলিয়ান। সম্প্রতি তার একটি মিলের শ্রমিকরা করেছে ধর্মঘট। শ্রমিকদের নেতা হ'ল ভুবনমোহন। প্রণবের অন্তরঙ্গ বন্ধু। রেবা চায় প্রণব ভুবনকে বলে ধর্মঘট থামায়। সুরেশবাবু শ্রমিকদের অনেক কিছু দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। লেখা পড়া তিনি কিছু করেন নি কিন্তু তিনি রেবাকে কথা দিয়েছেন। রেবার পিতৃবন্ধু তিনি। রেবাকে কথা দিয়ে কথা ভাঙবেন না সে বিশ্বাস রেবার ছিল। এর উপর প্রণবের কোন কথা বলা চলে না। সে অনেক বুঝিয়ে স্বাক্ষরে রাজি করাল ভুবনকে। ধর্মঘট বন্ধ হ'ল। সুরেশবাবু তাঁর কথা রাখলেন না। উণ্টে কি একটা ছতো করে ভুবনকে পাঠিয়ে দিলেন দু'মাসের জন্তে কারাগারে। প্রণব স্তম্ভিত। বন্ধু তার গেল জেলে, প্রণবকে জেলে গেল বিশ্বাসঘাতক। রেবা এল তাকে দেখতে। চোখে তাঁর জল ভরা। সে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছিল সুরেশবাবুকে। কথা ভাঙার দায় হ'তে মুক্তি পাবার জন্ত সুরেশবাবু রেবাকে কথা দিয়েছেন যে তিনি প্রণবকে টাকা ধার দেবেন। রেবা সেই প্রস্তাব করলে প্রণবের কাছে। স্বগাভরে চলে গেল প্রণব।

কাজে আর বায় না মন। রূপার লেখা-পড়ার ভার নিয়ে ছিল প্রণব সে কাজেও আর তার মন বসে না। রূপা বকে বকে, কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষে রূপা ভাবলে, হয়ত টাকার অভাবে প্রণব পারছে না কাজ চালাতে। সে গেল

তার ছোট্ট টিনের বাক্সর কাছে। তার ভিতর একটি ছোট্ট কোঁটার ছিল তার পার্থী বা কিছু সব। মার দেওয়া একটি সোনার নখ, বাপের দেওয়া এক জোড়া রূপোর মল, পুরান মনিব বাড়ীর বড় বোয়ের দেওয়া এক জোড়া কানের বুমকো আর বহু দিনের জমান ৫টি টাকা। সে কোঁটাটি নিয়ে গিয়ে দিল প্রণবের কাছে। গয়নাগুলি বেচে আর টাকা নিয়ে সে যেন তার কারবারের কাজ শুরু করে দেয়। গ্রাম্য বালিকা রূপা কেমন করে বুঝবে প্রণবের কারখানার রান্ধুসে ক্ষুধা রূপা তার যথাসর্বস্ব দিয়েও মেটাতে পারে না।

আবার কাজে নামল প্রণব। টাকা আনবার জন্তে তাকে ফের আসতে হ'ল কোলকাতায়। ভুবন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে এ খবর সে পেয়েছিল কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে সে পারল না। ভুবনই এল। লজ্জায় প্রণবের মাথা হল হেঁট। ভুবন বললে—“আমায় ক্ষমা কর প্রণব, আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম; সুরেশবাবুর টাকা নিয়ে তুমি কারবার চালাবে তাই ইচ্ছা করে আমার কাজে বাধা দিয়েছিলে তাকে খুসী করবার জন্তে। সে ভুল আমার ভেঙ্গেছে। রেবা দেবীর মুখে শুন্‌লুম, সুরেশবাবুর একটি পরসাদ তুমি গ্রহণ করনি—”

প্রণবের মোটর খানি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সে সবত্রে নিজের হাতে গোড়ে তুলেছে। আর অল্প দিনের মধ্যেই সে তার গাড়ীটিকে রাস্তায় বের করতে পারবে। আর অল্প কিছু টাকা জোগাড় করতে পারলেই হয়। টাকার চেষ্টায় ফের তাকে আসতে হ'ল কোলকাতায়। মেট্রো সিনেমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল সে হেঁটে। লোকের ভীড়ে তার চলা বন্ধ হ'ল। প্রকাণ্ড একটা রোলস্ রয়েস এসে দাঁড়াল। সিনেমার দরবান সমস্তমে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। গাড়ী থেকে নামল একটি সুসজ্জিতা সুন্দরী। মেরেটি প্রণবকে দেখে গেল চমকে। কাছে এসে বললে—“প্রণব, আমার সঙ্গে বাড়ী চল, অনেক কথা আছে—” কলের পুতুলের মত প্রণব গিয়ে বসল রেবার গাড়ীতে। কোথা থেকে রেবা এ গাড়ী পেল, কি করে এত হীরে মুক্তার অধিকারী হ'ল রেবা, এই প্রশ্ন সে একবারও করলে না। গাড়ী এসে ঢুকল একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে। প্রণবকে নিয়ে রেবা প্রবেশ করল তার বসবার ঘরে। রেবা বললে—একটা কথার জবাব দাও প্রণব, বিবাহের যৌতুকের সময় মেয়েরা যে টাকা বা গহনা পায় সেটা ত' তখন তার

নিজের জিনিষ হয়ে যায়, তাতে ত' আর অত্যাচার থাকে না এমন কি বে দিয়েছে তারও না—ঠিক কি শুধু বললে—“হ্যাঁ!” অল্প একটু খেমে রেবা ধীরে ধীরে লাগল—আমি শিরে করেছি, বিবাহের যৌতুক স্বরূপ টাকা তিনি আমায় দিয়েছেন। এ টাকাতে এখন কোন অধিকার নেই। সেদিন তুমি তাঁর টাকা নাও আমার এ টাকা তোমায় নিতে হবে। তুমি বে করেছ তা তোমাকে শেষ করতে হ'বে। দশের কাছে দেখাতে হবে তুমি শুধু স্বপ্নের জাল বুনে সময় নষ্ট করবে দেশে একটা নতুন শিল্প স্থাপন করে দেশের কাজে তোমাকে দেখাতেই হবে—শেখ প্রসূরের খোঁদাট ব মত দাঁড়িয়েছিল রেবা, চোখ তার বন্ধ, শুধু দুইটি ন দুই গালে চক্‌চক্ করছিল দু' ফোঁটা চোখের জল। করে বসেছ রেবা, তুমি এ কি করেছ—” প্রণব দ থেকে বেরিয়ে গেল।

মোটর শেষ হয়েছে। কাল তাতে চড়ে প্রণব বাবে। তার আগে রূপাকে একবার গাড়ী করে বেড়াতে হবে। প্রণবের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু মনে তা কৈ! কাল সে এখানকার বাস উঠিয়ে দিয়ে বাবে এখানকার দেনা পাওনা সে সব চুকিয়ে দিয়েছে, বেরবে জয় বাজায়। সন্ধ্যাবেলা সে আর বাড়ীতে পারলনা। বেড়াতে বেরল নদীর ধারে। হাঁটতে সে যে কখন স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে সে প্রায় নি। স্টেশনের কোলাহল গাড়ী-খোঁড়া মোটরের ভীড় মনে হয় না এখান থেকে কিছু দূরে গেলেই একটি নিরুপম যুগ্ম গ্রামের দেখা পাওয়া যায়। অল্পমনস্ক ভাবে প্রণব। কখন তার পায়ের কাছে মোটর বাস এসে তা সে টেরও পায় নি। হঠাৎ কে যেন তারে সন্নিহিত করে দিলে কিন্তু যে তাকে পথ থেকে সরাল সে নিশীথ সরতে পারে নি। গাড়ীখানা তাকে চাপা দিল ঠেলে প্রণব কাছে গিয়ে দেখে গাড়ীর নীচে পড়ে আছে কোলে পাথরের মূর্তির মত রূপার মৃতদেহ। রূপাই গাড়ীর হ'ল প্রথম যাত্রী।

কতকগুলি বছর কেটে গেছে। প্রণবের নূতন আবিষ্কৃত মোটর সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মস্ত বড় কারখানার মালিক এখন সে।

যে ক্ষুদ্র গ্রামটিতে প্রণব প্রথম কাজ করেছিল সে গ্রামবাসীরা তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য একটি সভার আয়োজন করেছিল। সেখানকার ডিষ্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নী

এই অলুষ্ঠানের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করলেন। সভানেত্রী নিজের হাতে প্রণবকে মালা পরিয়ে দেবেন বলে বন্ধুরা প্রণবকে জোর করে যে উচ্চ মঞ্চে সভানেত্রী বসেছিলেন সেখানে নিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটপত্নী প্রণবের গলায় মালা পরিয়ে বলেন—“আজ তুমি জয়ী—” প্রণব একবার শুধু রেবার দিকে চাইল। ধীরে ধীরে বল—“জয়ীই বটে!”

কেন্দ্র সমিতির কথা

বঙ্গীয় তাঁতশিল্প প্রদর্শনী—গত সেপ্টেম্বর মাসে ওয়েলিংটন কোয়ারে যে তাঁতশিল্প প্রদর্শনী হয়, তাহাতে সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয় হইতে তাঁতে প্রস্তুত গালিচা, সতরঞ্জের আসন, বিছানার চাদর, ঝাড়ন, তোয়ালে প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিল্প দ্রব্যও পাঠান হয়।

দমদম মহিলা সমিতি—গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্র সমিতি হইতে সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ প্রতিভা সেন বি-এ, বি-টি, মিসেস্ সুবোধ-বালা ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত সুধীরলাল সরকার দমদম মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। এই স্থলের জনৈক প্রাক্তন ছাত্রীর উৎসাহে দমদম কলোনীতে এই মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতি বর্তমানে ভালই চলিতেছে।

দিনাজপুর মহিলা সমিতি—১লা অক্টোবর দিনাজপুর মহিলা সমিতির উদ্যোগে “আনন্দবাজার” নামে একটি মহিলা শিল্প প্রদর্শনী গঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে মাত্র মহিলাদের প্রস্তুত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য দ্বারা ষ্টল তৈরী করা হয়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার ক্রেতা, বিক্রেতা এবং দর্শক সকলেই মহিলা। এই মেলা উপলক্ষে কেন্দ্র সমিতি হইতে মহিলা কর্মী শ্রীযুক্ত সুবোধবালা ঘোষ এবং পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী তথায় গমন করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর একটি মহিলা সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় প্রথম মিসেস্ ঘোষ “সমিতির উপকারিতা” সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে পণ্ডিত শাস্ত্রী ম্যাজিক লঠনের সাহায্যে সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রচারকার্য—দিনাজপুর হইতে কর্মীদ্বয় পুর্ণিয়া, আরারিয়া এবং সৈয়দপুর যাইবেন।

ম্যাটি কুলেশন পরীক্ষার ফাইন আর্ট কোর্স

কলিকাতা সহর ও মফঃস্বলের কোন কোন স্থলের ছাত্রীরা আগামী ১৯৪০ সালের ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষার জন্য ফাইন আর্ট কোর্স নির্বাচন করিয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ছাত্রীদের ঐ বিষয়টি শিক্ষা লাভের অসুবিধা ঘটিতেছে।

যদি যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রী ঐ বিষয়টি গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষা ও পরিচালনার জন্য,

বোধ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্লাস খুলিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে। যে যে স্থলের ছাত্রীরা বিষয়টি নির্বাচন করিয়াছে সেই স্থলের অধ্যক্ষ মহাশয়রা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে গত্র লিখিয়া আবেদন করেন, তাহা হইলে বোধ হয় যথোচিত ব্যবস্থা হইতে পারে।

এ বিষয়ে আমরা বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী

বর্তমান বর্ষে মাত্র ১২ জন ছাত্রী এম.এ. পাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সংস্কৃততে নীলিমা সেন গুপ্ত ও সুনীলা গুহ এবং ফিলজফিতে (দর্শনে) অনিমা সেনগুপ্ত প্রথম শ্রেণীতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে ঐ বিষয়ে আর কোন ছাত্র ও ছাত্রী পাশ করে নাই।

ইংরাজিতে সরমা বসু (তৃতীয়) ইকনমিকসে কমলা দাস গুপ্ত (২য়) মিসেস কনক বসু রায় চৌধুরী (৩য়) বাঙ্গলায় মিস খাদেজা খায়তুন, অমৃতা সেন, বীণাপানি ঘোষ দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এবং সাধনা সরকার গণিতে এম-এ পাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ-
ছাত্রী

মনীষা সেন ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন এবং তিনিই একমাত্র পরীক্ষার্থিনী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইংরাজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অঞ্জলি ঘোষ (Mrs sen Gupta) বীণা গুহ, কল্যাণী দেবী, লক্ষ্মী হালদার, অমিয়া চৌধুরী; তৃতীয় শ্রেণীতে রেণু সেন, যুইফুল বসু, মীনা গুহ, শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mrs Chakraborty) উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সংস্কৃততে লীলাদাস গুপ্ত, স্মৃতি দাস, দ্বিতীয় শ্রেণীতে, কমলা বাগচি বাঙ্গলায় প্রথম শ্রেণীতে সপ্তম হইয়াছেন। শোভনা সেন, গীতা গুপ্ত, স্মৃতিলাতা দাস গুপ্ত, অনীলা দেবী দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং শান্তিময়ী দাসগুপ্ত, প্রিয়লতা দাসগুপ্ত ও উমা দত্ত তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়াছেন।

স্বধাকর্ষ বসু হিন্দীতে দ্বিতীয় শ্রেণী হইয়া পাশ করিয়াছেন।

ইতিহাসে আশালতা মিত্র, লীলা মিত্র, দ্বিতীয় শ্রেণীতে

এবং ফুলরাণী ঘোষ ও সূচরিতা দাস তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এনুসিয়েন্ট, হিষ্ট্রি ও কালচারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বীণা পাণী বসুরায় পাশ করিয়াছেন। পলিটিক্যাল ইকনমিক শাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আশালতা দত্ত, কল্যাণী সেন অশোকা রাও ও অমিয়া দেবী তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়াছেন।

এম, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রী

স্ববীরা নন্দী একমাত্র ছাত্রী এম, এস, সি ত্রিতীয় বর্তমান বর্ষে লাভ করিয়াছেন। বোর্টানীতে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

যুদ্ধে ভারতীয় ছাত্রীদের কর্মতৎপরতা

জার্মানদের সহিত গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার পর যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্রী গ্রেটব্রিটেনের নানা শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়া শিক্ষার জন্ত অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারা অনেকে জার্মান বা গেনে স্থান না পাওয়ায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়া সেখানকার বিদ্যায়তনগুলিতে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সব ভারতীয় ছাত্রীগণ যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবাকর্ত গ্রহণ করিয়া এম্বুলেন্সে সানন্দ চিত্তে যোগদান করিয়া সেবাকর্ত্যের শিক্ষাগ্রহণ করিতেছেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রীর শিক্ষা বিবরণ

ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রীদের অধ্যয়ন করার সুযোগ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে অনেক শাস্ত্রে বিশেষতঃ ডাক্তারী ও শিক্ষাপ্রদান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে সেই শিক্ষা ছাত্রীরা বিলাতে পাইয়া থাকেন। নিম্ন তুলনামূলক হিসাবে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয় সংক্ষেপে হই

কমিশনারের শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৩৫-৩৬ শালে—৭৮টী ছাত্রী

১৯৩৬-৩৭ „ —১০১ „

১৯৩৭-৩৮ „ —১২৮ „

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ১৯৩৭-৩৮ ছিল ১১৪ জন। ভারতীয় ছাত্রীরা অধিকাংশই হয় শিক্ষা কিম্বা ডাক্তারী বিষয় অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। সরকারী বৃত্তি পাইয়া মাত্র ৯ জন ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করেন। একজন

মহিলা এম, আর, সি, পি (এডিনবার্গ) ও ৩১ জন চিকিৎসা বিষয়ক ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। ১৮ জন মহিলা লণ্ডনে শিক্ষাবিষয়ক ডিপ্লোমা লাভ করিয়াছেন। দুইজন কেমব্রিজের সার্টিফিকেট এবং ৪ জন ছাত্রী লণ্ডন টিচাস সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন।

কুমারী অমিয়া ব্যানার্জি অর্থশাস্ত্রে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স হইতে এবং কুমারী রমা ব্যানার্জি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রী পাইয়াছেন।

শুকতার

শ্রীমতী নলিনী সেন

নিশীথ তিমিরাক্ষর তলে
অগণিত তারকার জ্যোতির্ময় দীপশিখা জলে,
অলক্ষ্যে সে ছায়া পথ বাহি—
ধীরে এল শুকতার রাত্রির তিমির অবগাহি।
তজ্জাভরা আঁখি মেলি খোলা মোর বাতায়ন পাশে,
আলসে বসিয়াছিহু স্বপ্নময় স্থতির আবেশে,
শব্দহীন স্তব্ধমোনাকাশ
আলোর বন্দনাগীতি পূর্বাচলে হয়নি প্রকাশ,
বিহঙ্গের অক্ষুট কুঞ্জে,
পল্লবের মুহু শিহরণে,
শুধু মর্ম্মরিত বনতল,
অশ্রুর শিশির মিলিত—দিগন্তের আঁখি ছলছল।
রাত্রির গভীর বাণী সম
দেখা দিল শুকতার বক্রপায় স্নিগ্ধ অর্জুণম
নত করি সক্রপণ আঁখি
ঘন স্থপ্তি ঘোরে যগ্ন ধরণীতে লইল নিরখি।
সৃষ্টির মাধুরী দিয়ে আঁকা
স্বর্গের অমৃত বিন্দু—অপরূপ জ্যোতির্ময় লেখা

সম্ভোপনে কি যে তার ভাষ,
অসীমের কি ইঙ্গিত অকস্মাৎ করিল প্রকাশ!
অনিমেঘ আঁখি তুলে কেন থাকে মুখ পানে চেয়ে;
সে কি কভু ছিল এই আমাদের ধরণীর মেয়ে!
খেলেছি কি তার সাথে বসন্তের পুষ্পবীথি তলে
কুসুম ভরেছি সাজি; হালো মালা-গাঁথিবার-ছলে
হৃদয়ের বিনিময়? বাধা কি পড়িল তার সাথে
বিকশিত মধু যামিনীতে!
তারপর হারাইলু তাকে
বিশ্বস্তির ঘন অন্ধকারে
মরণ সিঁদুর বৃকে গেল হারাইয়া
সে বিচ্ছেদ বেদনায়—নিশিদিন ফিরিলু কাঁদিয়া।
তাই বৃষ্টি ওর পানে চাহি—
স্থতির তরণী আসে বিশ্বস্তির পারাবার বাহি—
যেন মনে পড়ে,
কতদিন বারবার সম্ভোপনে ডেকেছে সে মোরে,
রেখে গেছে কানে কানে হৃদয়ের স্খাভরা বাণী—
সে আমার শুকতার! পরিচিতা মর্ম্মের সঙ্গিনী!

আনন্দাশ্রম

শ্রীপ্রেমা দেবী

স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। স্বামীজীকে অবধূত রামহরি বাবা নামে একজন বিখ্যাত মহাপুরুষ প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। পুরুষ-রমণী নির্বিশেষে তাঁহার গৃহী ও ত্যাগী শিষ্য এবং ভক্তের সংখ্যা অগণিত। ত্যাগী শিষ্যদের ভিতর কাঁহারও কাঁহারও যশঃ সৌরভ অলঙ্ঘনীয় ভারত সীমা ছাড়িয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতাক্ষেপে সমৃদ্ধ ভোগবিলাসী নরনারীদিগকেও নিতান্ত মুগ্ধ করেছে। যথার্থ সাধক, প্রেমিক এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা সেই সব কৃতি মহাত্মাদের অনেকেই মর্ত্য লীলা পরিহার করে স্বধামে চলে গেছেন, সামান্য দু'একজন এখনও সাক্ষী স্বরূপ আছেন মাত্র।

অবধূত বাবার সাক্ষ্য শিষ্যদের অত্যন্ত স্বামী সৌবর্ণানন্দ যৌবনে প্রধান গুরু ভ্রাতাদের নির্দেশক্রমে হুদুর পাশ্চাত্য দেশে ঘুরে ঘুরে ত্রিতাপদগ্ধ জীবের শান্তি-লাভের মহৌষধি শ্রীগুরুদত্ত উদেশ্যমুত বিতরণ করতে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ইউরোপ আমেরিকার বহু মিস ও মিসেস এই প্রিয়দর্শন ও স্ববক্তা ধর্মোপদেষ্টার শিষ্যত্ব গ্রহণে ধস্তাধরত। অনেকে স্বামীজীর শূন্য ভিক্ষার ঝুলিতে এমন ভক্তি অর্ঘ্য বর্ষন করতেন যে ঝুলি উপদায়ে ক্রমে ব্যাকের ভাঙার পরিপূর্ণ হ'ল। এইরূপে ভাগা গগনে যখন অল্পকূল হাওয়া বইতেছিল, তখন সৌবর্ণানন্দজীর নূতন নূতন কৃতিত্বও বাড়তে লাগল। 'সজ্জৎ শরণং গচ্ছামি' এই পুরাতন প্রথার ঘোর বিরোধী হয়ে ইহা দাস মনোভাবের পরিচায়ক বলে যেমন বজ্র নির্ঘোষে প্রচার করতে লাগলেন, তেমনই তিনি আদর্শ স্থাপনার্থ স্বয়ং গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বতন্ত্র হয়ে পড়লেন। গুরু ভ্রাতৃগণ-পরিচালিত যে মণ্ডলী এককাল বৃকে ধরে পোষণ করছিল, সেই মণ্ডলীরই উচ্ছিন্ন স্বরূপ সৌভাগ্যে গর্বেষাক্ত হ'য়ে, আজ একদিকে যেমন তাহাকেই বুদ্ধাঙ্গুলি দেখান হ'ল, তেমনই ক্রটি

বিচ্যুতির জন্ত গজনার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং স্বাধীন যদুচ্ছা বিলাসের পথও নিষ্কটক হ'ল। প্রাচ্যে কঠোর নিষ্পন্ন কোপীনবস্ত ত্যাগের জীবন পাশ্চাত্যে ঐশ্বর্য্য সিঞ্চে সরস ও সতেজ হ'য়ে নূতন শ্রী ধারণ করল। অল্পকূল শিষ্য শিষ্যাগণের (বেশীর ভাগই শিষ্যা) ঐকান্তিক আগ্রহে ও বদান্ততায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যে লস এঞ্জেলসে মগরীতে এক সুস্বাদু উদ্যান বাটিকায় 'আনন্দাশ্রম' (Happy cot of self Realization) স্থাপিত হ'ল। স্বামীজীর আধ্যাত্মিক গবেষণা ও আত্মচিন্তার উপদেশ শ্রবণে এবং উদার ও প্রীতিপূর্ণ সঙ্গলাভে ভোগবিলাসে চরম দশাপ্রাপ্ত নরনারী এক নূতন আনন্দ উপভোগ করতে লাগল।

এইরূপে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর সৌভাগ্যের কোলে কাটাবার পর সৌবর্ণানন্দজীর জীবনশ্রোতে যখন বার্লিনের ভাঙ্গাপতিত হ'ল, তখন এই আনন্দের হাট ভেঙ্গে স্বদেশে যাবার জন্ত প্রাণ তাঁর ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। তবুসময়ে ব্যাকের একাউন্ট ভারতের ব্যাকে ট্রান্সফার করিয়ে জরাজীর্ণ কতক মিস ও মিসেস শিষ্যসহ স্বামীজী স্বদেশে যাত্রা করলেন। এই শুভসংবাদ ভারতে সকল বিধে বিধানে বিবোধিত হ'ল। তিনি ইংলও হ'য়ে পৌছলেন। তাঁহার প্রশংসাকারী দেশী বিদেশী তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। স্বীকৃতি তদীয় গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর তখনকার অধ্যক্ষ গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ স্বামী যুক্তানন্দজী বার্লিনে উপেক্ষা করে আন্তরিক প্রবল উৎসাহে সম্পর্ক-বিন্ধন কনিষ্ঠ গুরুভাইকে দীর্ঘকাল পর স্বাগত অভিনন্দন জানাবার জন্ত বহু সাক্ষোপাদসহ উপনীত হ'য়েছিলেন। বেসামান্য অবতরণের পর কিছুদিন 'ইণ্ডিয়া হোটেল' থেকে নানা প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে বহুস্থানে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ভারতের দুরবস্থা ও তার প্রতিকারোপায় সম্বন্ধে তিনি

তৈজোদৃপ্তভরে ঘোষণা করতেন—“শিক্ষাহীনতাই ভারতের সকল দুর্দশার হেতু। শিক্ষার অভাব হচ্ছে এই দুর্গতির মূলে। পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলকেই আক্ষরিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। যেদিন স্পর্ধা করে আমরা বলতে পারব যে, আমাদের দেশে নিরক্ষর কেউ নাই, সেইদিন বিশ্বের সভায় সভাজাতি বলে শ্রেষ্ঠ আসন আমরা লাভ করব। শতকরা নব্বই জন যে দেশে নিরক্ষর, সে দেশ মাহুষের নয়। যদি সত্য কিছু জাত ও ধর্ম থাকে, সে হচ্ছে আমরা জাতে মাহুষ, হিন্দু মুসলমান, দৈত্য, দানব ইত্যাদি কোন স্বতন্ত্র জাত নই। আর ধর্মও মাহুষের ধর্ম, যথার্থ মাহুষ্য বিকাশকারী আচার ব্যবহারই আমাদের ধর্ম। শিখা, দাড়ি, পাগড়ি, ফেজ বা আলখাল্লা চাপকানের ভেতর ধর্ম নাই। যে ধর্ম নাম করে এক মাহুষ অপর মাহুষকে ঘৃণা করে, স্নেহ কাকের বলে গালাগাল দেয়, পরস্পর কুকুরের মত কামড়ি করে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে—তাহা কি ধর্ম? শিক্ষিত ব্যক্তি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে দেশের নায়কত্ব করলে তবে দেশে যথার্থ কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হবে। রাস্তায় নিষ্কিপ্ত পরের উচ্ছিষ্ট একটুকরা রুটির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে আমরা মাথা ফাটাফাটি করি; হিন্দুরাজ মুসলমান রাজ প্রতিষ্ঠার হুঃস্বপ্ন দেখে হুনিজার ব্যাঘাত করি; আমাদের মত অমাহুষ আর আছে কি? সারা পৃথিবী দেখে এলাম ‘সবাই জাগ্রত, ভারত শুধুই ঘুমিয়ে পড়ছে’। আমাদের দুর্ভিক্ষে আমাদের নিজেদের বলতে পারছি যে, আমরা পড়াশুনা করতেই দেশের সর্বত্র আজ শিক্ষা, শোক ও হুঃখের স্থান প্রজ্জলিত। স্ব স্ব নিত্যান্ত হীন ও অনর্থকর মন্তব্য পরিহার করে আমরা সত্যিকার মঙ্গল সাধনের জন্ত সকলকে এক প্রাণে মনন করতে হবে। এক সার্বভৌম জাতীয় দল ছাড়া কোন দল থাকবে না। হিমালয় হতে কুমারিকা এবং পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত আমরা সব একজাত, এক দেশবাসী। আমাদের স্থখ দুঃখ, জীবন মরণ সব এক। ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে নামাবার মত অধর্ম, মুখতা আর কিছু হতে পারে না। যদি ধর্ম করতে হয়, যদি ঈশ্বর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে

হয়, তবে মহাজনের অমরবাণী স্মরণ রাখতে হবে, যথা—
“বহুৰূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা থুজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম যেই জন করে সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।”
জীবনপী শিবের নররূপী নারায়ণের ক্ষুধা তৃষ্ণায় অন্নজল, হোগে ঔষধ ও শুক্রা, বিপদে অভয় ইত্যাদি দানের দ্বারা সেবা করতে পারবে তবে ত খাঁটি ধর্মসাধনা হবে।
* স্বাধীন দেশ থেকে সবে মাত্র আসায় তাঁর টাটকা সোঁত বাণী সকলকে বেশ নূতন আশ্বাদন প্রদান করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের চারিদিক থেকে অস্বস্তি আসতে শুরু হল। স্বামী সৌবর্ণানন্দজীও ভারতে নবাগত। সদিনী দিককে দেশের প্রধান প্রধান স্থান দেখাবার ইচ্ছায় সারা ভারত ভ্রমণের জন্ত প্রস্তুত হলেন। প্রধান গুরুভাই মৃত্যুঞ্জয়জী তাঁহাকে ভারত ভ্রমণের পর হৃষীকেশের মণ্ডলীতেই বাকী জীবন একত্র বাসের জন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। তিনি তখনকার মত স্বীকৃতি দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাগণ সমভিব্যাহারে ভারত ভ্রমণে বহির্গত হলেন। সর্বত্রই বিপুল সাদর অভিনন্দন, প্রশংসা ও জয় জয়কারের অন্ত নাই। এইরূপ আনন্দ সঘর্দনার ভিতর দু’তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ব স্বীকৃতি অনুসারে তিনি হৃষীকেশে গুরুমণ্ডলীতে যেয়ে উপস্থিত হলেন। মণ্ডলীর বিরাট আশ্রমবাটির বহির্ভাগস্থ একটি বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত বিতলগৃহে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হল। মণ্ডলীতে বেশ আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। এই হৃষীকেশের প্রতি ধূলি কণা সৌবর্ণানন্দের পূর্ব স্মৃতি জাগিয়ে তাঁহাকে অসীম আনন্দ দিতে লাগল। কি করে তিনি নিত্যন্ত বাল্যবয়সে পিতৃভবন ত্যাগ করতঃ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে হরিদ্বারের কুন্তুলেলায় এসে বাবা রামহরি পরমহংসের দর্শনলাভ করেন তাঁহারই অপার দয়ায় হৃষীকেশের মণ্ডলীতে আশ্রিত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, সেই সব স্মৃতিপথে জাগতে লাগল। ব্রহ্মচারী গুরুভাইদের সঙ্গে একত্রে শয়ন, একত্রে জাগরণ, একত্রে স্নান, একত্রে ভোজন, একত্রে তপস্যা, একত্রে অধ্যয়ন, একত্রে সঙ্গীত সাধন, শ্রীগুরুদেবের শিক্ষা, উপদেশ ও আদর্শ গ্রহণ, নির্দিষ্ট আশ্রমের নানা কাজে যোগদান, আশ্রমের উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্রে পালাক্রমে খনন, রোপন ও সেচনাদি অসংখ্য কার্যাবলী ইত্যাদি সব মনে

হাকে আনন্দে বিভোর করে তুলল। পার্শ্বত্যাগী শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের লীলাক্ষেত্র এই পুণ্য আশ্রমপীঠে
র মনোহর দৃশ্যাবলী, নৃত্যশীলা শ্রোতস্বিনীর বক্র
নিলাদ, তপঃক্ষেত্রের বিরাট ও উদার পবিত্রভাব
যেন পূর্বেরকার সরল আর বালকের অবস্থায়
গল। পরিণত বয়সের গৌরবশ্রীত স্বামীজীত্বের
বলিয়ে দিতে লাগল। বয়স ও সময়ের ব্যবধান
আর আশ্রমবাসী তরুণ ও বালক, ব্রহ্মচারীদের
কিছু করবার জন্ত তাঁহার প্রাণে ব্যাকুল উৎসাহ
লাগল। এইরূপ আনন্দে স্বয়ং বিভোর থেকে এবং
ভাগ মাকিণী শিষ্যাদের বিলাতে বিলাতে যখন
র সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ এবং পক্ষের পর যখন
ট যেতে লাগল, তখন হঠাৎ একদিন মণ্ডলাধীশ
বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা
জন্ত স্বামী সৌবর্ণানন্দকে নিজ নিভৃত প্রকোষ্ঠে
ঠালেন।
র্ণানন্দ উপস্থিত হলে প্রবীণতর মুক্তানন্দজী
ত তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিকটে বসালেন
স্বরে বলতে লাগলেন, “ভাই! আমরা ত জীবনের
স্ত উপনীত হয়েছি। এখন বাকী ক’টা দিন

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের লীলাক্ষেত্র এই পুণ্য আশ্রমপীঠে
গেলেই জন্ম সার্থক। আর সব ভাইদের ত গুরুদেবের
স্বধামস্ব করেছেন, মাত্র দু’চার জন অবশিষ্ট আছি, যিনি
এখন আমার ডান হাত হয়ে কাছে থাকলে আমি শান্ত
বল পাই। তুমি এখানেই স্থায়ী হয়ে মণ্ডলীর গৌরব
কর, এই আমার একান্ত ইচ্ছা। অতীতে যা হ’বার
গেছে, সে সব তুল গিয়ে গুরুদেবের শিক্ষা, আদর্শ ও
শাসনকে সার্থক করার জন্ত প্রাণপাত করাই উচিত নয়
আমরা কে কোথায় জন্মেছিলাম, আত্মীয় স্বজন ঘর-বাড়ি
সব ছেড়ে ছুড়ে গুরুদেবের আকর্ষণে এখানে এসে জুটেছি
যা কিছু এই মণ্ডলী। নিজস্ব বলে স্বতন্ত্র কিছুই না
কিছু করা বা রাখাও আদর্শের বিরোধী। গুরুদেবের
আদেশ ও আদর্শকে সার্থক করবার জন্ত সবাই যথাসা
চেষ্টা করেছি। আমাদের কেহই ত স্বতন্ত্র কিছু ক
নাই, যে যা করেছি, সবই ত এই মহামণ্ডলীর জন্ত
কোন মুহূর্তের জন্তও ভাবতে হয় নাই কোন অভাব এ
পরিণামে কি হবে না ভেবে শ্রীগুরুকৃপায় বিপদ-সম্পদ
জ্ঞান করে জীবনভেলা ভাসিয়ে চলেছি।”

ক্রমশঃ

দোসর

শ্রীমীর চটোপাধ্যায়

সন্ধ্যা তারা সন্ধ্যা তারা
আমায় বলে যাও,
রাতের শেষে কোন্ বিদেশে
তোমরা তরী বাও।
দিনের আলো মুখ লুকালো
সেই আধারের গায়,
ঘামটা ফেলে নয়ন মে’লো
সাঁঝের নিরালায়।
ধরায় ও কী! তোমার ছায়া
মাটির কোলে বলে?—

বধূর হাতে তুলসী মূলে
প্রদীপ হয়ে জলে।
তোমার বুকে আলোর মালা
খসল তারি ফুল?
ধরায় সে কি দোসর সেজে
তাই ঘটাল ভুল!
সন্ধ্যা তারা সন্ধ্যা প্রদীপ
হায় কী বিফল টান,
সাঁঝের শুভ দিঠির মাঝে
নিষ্ঠুর ব্যবধান ॥

ভিখারী

(সাহিত্য)

শ্রীকালীকুমার চট্টোপাধ্যায়

যে পরের নিকট চায় সেই ভিখারী। তার নিজের কিছু সঞ্চিত আছে কিনা সে প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। এই ভাবে ভিক্ষুক চিরদিনই আছে আর একমাত্র এই ভারতেই ভিক্ষাব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।

হিন্দু ভারতের ভগবান ভিখারী—স্বয়ং দেবাদিদেব কুবেরের ভাণ্ডার উপেক্ষা করিয়া অন্নপূর্ণার দ্বারে একমুষ্টি অন্নের জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে চিরদিনই দাঁরস্থ। ‘ভিক্ষা দাও’ না বলিলে, ভিক্ষা না লইলে ব্রাহ্মণ কুমারের বিজ্ঞপ্ত লাভ ঘটে না। যুগান্তের ভগবান বামনরূপে ভিক্ষায় বাহির হন। আধুনিক যুগে ভিখারীকে “দরিদ্র নারায়ণ” ইত্যাদি বিরূপ আখ্যায় উপাধি বর্ষণ করিলেও তাহাদের সেবার সময় বেকার বাবুর দল টিকিট বিতরণ পূর্বক ফুটপাতে পিচুরী পরিবেশন করিয়া পরে দরিদ্রদের পূর্বে কার্যসমাপ্তি করিয়া অধিবেশন করিয়া হিসাব রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ ও আয়ব্যয় পরীক্ষকের নাম ছাপিয়া কর্মী সাজিতে পারিলেই নেতার পর্যায়ে হান পাইয়া থাকেন। এই দরিদ্র সেকালে নারায়ণ ছিল না বটে কিন্তু অতিথিরূপে গৃহস্থের অনটনের সংসারে তাহার নিজের ও সন্তান ক্ষুধার ভোজ্য গুরুরূপে অর্থ পাইত, গৃহস্থ অনশনে থাকিত বা প্রসাদ পাইত। অতিথির নরমাৎস নোভ ও ফলে সন্তান বলি ইত্যাদি কল্পনা প্রসূত বলিগা ছাড়িয়া দিলেও গৃহস্থের একজনের একবেলায় আহাৰ্য্য অনায়াসে অতিথি সেবায় ব্যয় করিবার কথা মানিয়া লইলে ক্ষতি কি? তাহার পর, ইসলাম জগতের অতিথি সংস্কার চিরপ্রসিদ্ধ। পুত্রহস্তাও অতিথিরূপে প্রতিহিংসা ইহাতে নিস্তার পায়। মরুভূমির রক্তলোলুপ বেহুইন সেও আতিথ্যের অবতার বিশেষ। বৌদ্ধজগতে স্বয়ং তথাগতের স্বরূপ রাজকুমাররূপে নহে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে। খৃষ্টান জগতে যিহুদীশ্রেষ্ঠ শলা ও বর্ষাবিক্র অবস্থায় ভ্রান্ত মানবের জন্ম বিশ্বপিতার নিকট মার্জনাভিখারী; আজও করণ প্রার্থনা সেই অদৃশ “ঈশ” হইতে “পিতা ক্ষমা কর; পিতা

ক্ষমা কর’ বলিয়া ভ্রান্ত মানবকে দিক্দিগন্তে প্র অন্বেষণ করিয়া চলিয়াছে। বৈষ্ণবের নিমাই নিতাই ভিখারী, ব্রজর বনে বনে কালিন্দীর বু প্রেমের কাদান আজও ভিক্ষা দাও বলিয়া আলো সঙ্গে তরঙ্গ হিল্লোলের সঙ্গে পাগলের মত ঘুরিয়া তেছে। বাশীর বিরাম নাই। নৃপূরের নিরু চাওয়ার ক্লাস্তি নাই, পাওয়ারও অবসাদ নাই।

এই দেশটো ভিখারীর, ভারত ভিখারীর, সারা ভিখারীর। ভিখারীর শ্রেণীভেদ নাই, ভিখারী তুমি ধনবৃবের, প্রাসাদে বাস কর, পা দাও না, বেশ আছে কিন্তু তোমার ডাইনামের পাশে উকি ঝুকি মারিতেছে কে বলত? তোমা নয়ভিখারী ধূলিমলিন হস্তে কজ্জল কলহিত চক্ষে চশমাটা বা তোমার সিগারেট কেসটা কিম্বা একটা টুকরা অথবা একটা পয়সা ভিক্ষা করিতে আনি লজ্জায় ও ভয়ে উকি ঝুকি মারিতেছে, কি জানি মানবের সিংহাসন হইতে দানবের অন্ধরূপে প্রমোথ থাক, সেই সন্দেহে। সে যাহা চাহিতে আসিয়া হামাগুড়ি দিয়া তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া চাওয়া ভিনিষটা তাহাকে দিয়া তাহার হাসি হুশো চুবা খাও, দেখিবে সেই ভিখারী বিদায় করি পাইবে, নিলামে পরের মহাল ডাকিয়া লইয়া কখনও পাওনি। মন্দিরে মসজিদে গির্জায়, মঠে যেথা দেখিবে দানের ঝুলি তোমার অপেক্ষা করিতে পথে যেখানেই যাও “ভিক্ষা দাও” “ভিক্ষা দাও” কথ—শুধু স্বপ্নের বদল বা সঙ্গতের হের ফের।

সে ভিখারী যে তোমাকে মারিয়া ধরিয়া লুণ্ঠন করিতে চাহে না। সে ভিখারী, তোমাকে বিতরণ করিয়া তাহার বিনিময় চাহিবে না। সে তোমার হইয়া হর-কে-নয় করিয়া নামলায় জয়লাভ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ବିଜୟ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି, କଟକ, ୧୯୮୩, ୮୫, ବି.

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରତି

३९॥७॥ ७७॥

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

বন্ধু নিবেদন—

আজ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অপার ও সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপন দাতাগণ, ও সমিতির ভূমিকা প্রভৃতির আর্থিক সহনুভূতি এবং অনুগ্রহে বঙ্গলক্ষী ১৪শ বর্ষ কার্তিক সংখ্যায় পূর্ণ হইল। ই চন্দ্র বৎসর যাবত সর্বসাধারণের নিকট হইতে বঙ্গলক্ষী যে সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইয়া সিয়ালে, আশা করি আগামী অগ্রহায়ণ মাস, অর্থাৎ ১৫শ বর্ষেও তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইবে না।

নববর্ষের বঙ্গলক্ষী প্রবন্ধ, গল্প, কবিতাদি ও বিভিন্ন চিত্রসম্পাদে অধিকতর মনোরম করার জন্য ষ্টা করা হইবে। এক দ্বাখ্য অগ্রহায়ণের বঙ্গলক্ষীকে সর্বসাধারণের করিবার জন্য পূর্ব বৎসর অপেক্ষা অর্থ ও পরিশ্রমের কোন প্রকার বর্ণনা সমাজলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতি হইতে করা হইবে না।

যাহার নতুন গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে ইচ্ছা করেন তাহারা যেন অবিলম্বে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হন। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকা অর্থাৎ যাহাদের পূর্বপ্রদত্ত বার্ষিক চাঁদা আগামী কার্তিক মাসে শেষ হইয়া যাবে, তাহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নববর্ষের বার্ষিক চাঁদা কার্তিক মাসের মধ্যেই মনিঅর্ডার যোগে ইয়া দাখিল করেন। তাহা হইলে আর তাহাদের অনর্থক ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না এবং তাহারা পুরাতন বৎসরের বঙ্গলক্ষী হইতে অন্তিমক তাহারাও যেন পত্রযোগে কার্তিক মাসের মধ্যে জানাইয়া করেন।

কার্তিক সংখ্যা বঙ্গলক্ষী পাওয়ার মাত্ৰ দিনের মধ্যে আমাদের পুরাতন গ্রাহকদের নিকট পৌঁছন আদেশ না মনিঅর্ডার না পাইলে বুঝিব যে ভিঃ পিঃ গ্রহণে সম্মতি আছে।

এতদেব গ্রাহকের মধ্যে আমরা গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছ হইতে কোনও প্রকার দাবাদি না ইলে, ১৫শ অগ্রহায়ণের পর হইতে পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট দেয় বার্ষিক চাঁদার জন্য গ্রহায়ণ দাখ্য। বঙ্গলক্ষী ভিঃ পিঃ দাখ্য পাঠাইব।

অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন যাহাদের অবাচ্ছেনা বসন্ত কোন ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়া অথবা নারীমঙ্গল সমিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১৫শ নিবেদন ৩১

বিনীত

কার্যাবস

বঙ্গলক্ষী

কাব্যসার রোগের অভিনব চিকিৎসা

যদি কোনসার রোগ :- জরায়ু কৃশানসার, জরায়ু স্বনীতি, অমল বেদনা, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, শ্বেত স্রাব, রোগ প্রভৃতি রোগে সত্তা নুমেই আশ্চর্য মল দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। সম্ভবস্থলে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ না করিয়া চিকিৎসা করা হইবে।

রাজস্ব—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভিনকৃশাজী, কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাভূমি কবিভূষণ।
২০৬২ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

ভেবে দেখলে উপায় আছে

জনহিতৈষীরা কোনোদিন মদ খাওয়া সমর্থন করেন না। কিন্তু আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তুলে' যান যে মানুষের প্রকৃতি লোহায় গড়া নয়। মদ খাওয়া যাদের অভ্যাস হইতে মদ ছেড়ে দিলে তাঁদের শরীর ও মনের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। কাজেই কাউকে মদ ছাড়াবার আগে তার প্রতীকায়ও ভেবে দেখা দরকার। বৈজ্ঞানিক বা মনস্তত্ত্ববিদরা কিন্তু এসমস্যাটাকে অগ্রভাবে সমাধান করতে চেষ্টা কবেছেন। তাঁরা খুঁজে বার করতে চেষ্টা কবেছেন এমন কোনো উপায় যার সাহায্যে মদ্যপের পক্ষে মদ ছাড়া সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। জনহিতৈষী এবং বৈজ্ঞানিকদের কেবল এক বিষয়ে মিল দেখা যায়—এঁরা সকলেই চান যে মানুষ নৈতিক উন্নতির উচ্চতর স্তরে উঠে যাক।

ভারতবর্ষের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে এ-দেশের লোকের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতির সহায়ক হিসেবে চায়ের ব্যবহারের সম্ভাবনা আজ দেখা দিয়েছে। সুরা-বর্জন আন্দোলন শাজ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই সংসর্কে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমাদের মনে জাগে—ইয়োরোপে চা না করেছিলো এদেশে কি তা হতে পারে না? এই যে আমাদের অগণিত শ্রমজীবী—এবা যা উপার্জন করে তা হয়তো দ্রুত নিয়ে খেয়ে পরে' থাকার পক্ষেও যথেষ্ট নয়; এবা বেতাবে থাকে তা হয়তো বর্ণনার অতীত—কিন্তু তবু অজানতা আর ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে, বহু কষ্টে উপার্জিত পয়সা খরচ করে' অনিষ্টকর তাড়ি খার দেশী মদ এবা খাবেই। এ-অবস্থা থেকে উদ্ধার কবুবার উপায় কি?

অবশ্য শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার এবং আর্থিক উন্নতিই এদের সর্বপ্রথমে দরকার। কিন্তু এদেরকে এই তাড়ি খাওয়ার বদ অভ্যাস এবং ও আর্থিক দুর্বস্থা থেকে রক্ষা কবুবার আশঙ্ক। সে হচ্ছে, তুষ্টিবাদ এবং তাজাকরা প কারণ চা খেলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় কোনো নেশা নেই। চায়ের প্রচলন এদেশে করলে জনহিতৈষী এবং সমাজনেতাদের পক্ষে যে ভারত অনেক পরিমাণে এগিয়ে যাবে নেই।

আমাদের দেশের জনসাধারণের উপর চা বিস্তৃত হবার যে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে সে সম্বন্ধে একখানি বিখ্যাত দৈনিক ২২ বৎসর আগে লিখে

“যে সব জাতি আজ চা খাচ্ছে, তাই

তাদের পুরোনো মদ খাওয়ার অভ্যাস ফিরি কথা বলানাই করা যায় না। ভবিষ্যতে পৃথিবী লোক যে চাই খাবে এটা কেবল সম্ভাবনার নিঃসন্দেহ। যারা মদ্যপানের বিরোধী তাঁরাই এ অবস্থা আন্তরিকভাবে চান তা নয়, পৃথিবী নৈতিক উন্নতির জন্তু খার কিছুমানও আগ্রহ তাঁর আদর্শের এ সফলতা একান্তভাবে বাঞ্ছনা

কিছুদিন আগে মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী স্বাক্ষর করার সময় বলেছিলেন যে চা হচ্ছে “দরিদ্রের আগাদের দেশের দরিদ্র, পদদলিত জনগণের ধীরে ধীরে বিজ্ঞান লাভ করতে পারছে—তা’ নিদর্শন।